সুচিত্রা ভট্টাচার্য

কাছের মানুষ

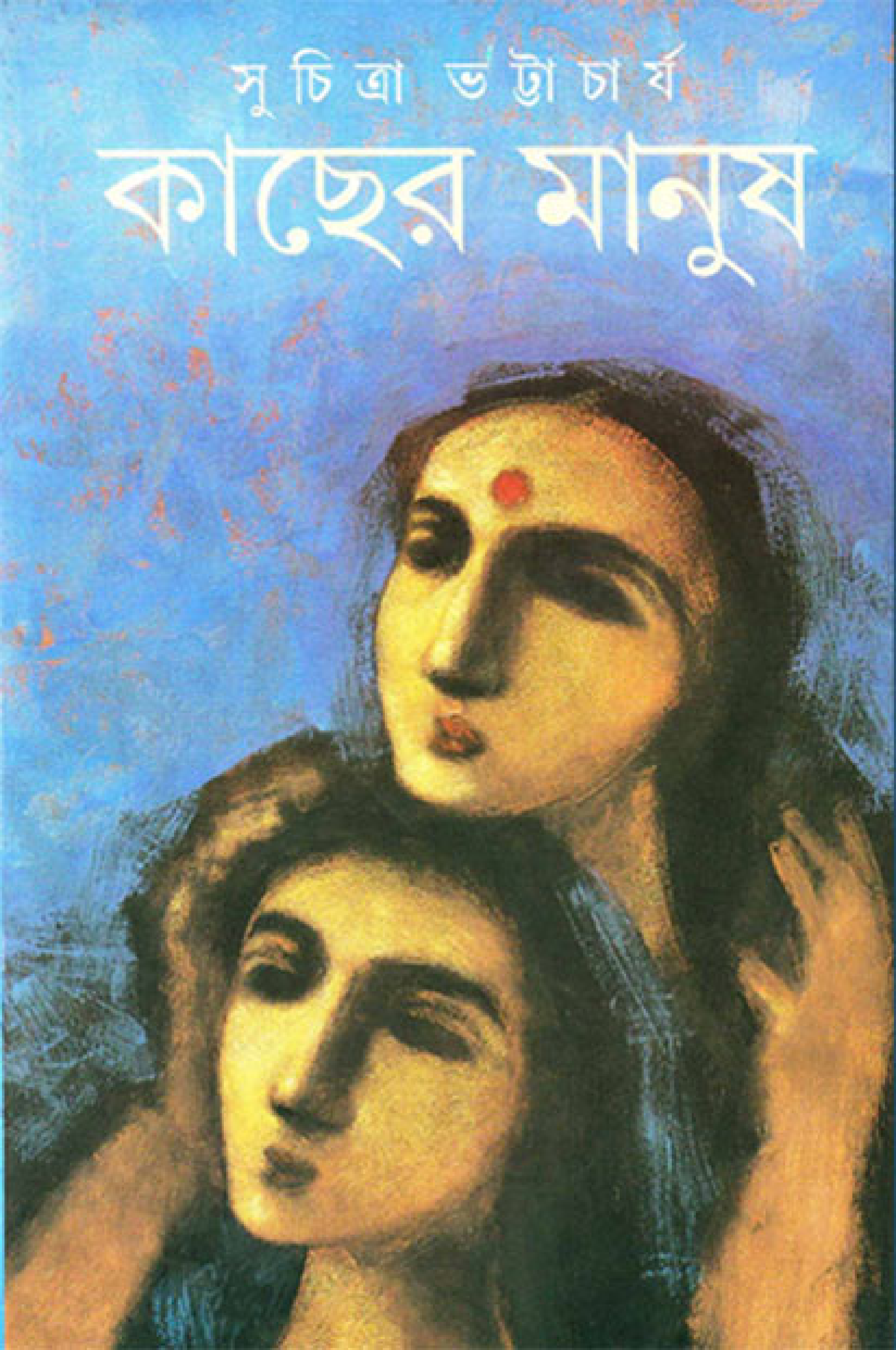

কাছের মানুষ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮
সপ্তম মুদ্রণ মার্চ ২০১০

© সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা
প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম,
যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি)
মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য
সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত
আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-541-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৩৫০.০০

মণিকুন্তলা কেশান
সুমিত কেশান
আত্মজনেষু

কাছের মানুষ

১

বাস থেকে নেমে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরছিল তিতির। দেরি হয়ে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। মা এত করে তিনটের মধ্যে ফিরতে বলল, সেই এখন তিনটে চল্লিশ। কী কুক্ষণে যে দেবস্মিতার বাড়ি গেল আজ!

তিতিরের আজ বাড়ি থেকে বেরোনোর একটুও ইচ্ছে ছিল না। কি করবে, বন্ধুরা জোর করে টেনে নিয়ে গেল। মাধ্যমিক পরীক্ষা কবে শেষ হয়ে গেছে, মাসখানেক কারুর সঙ্গে যোগাযোগ নেই তাই আজ জোর আড্ডার আয়োজন। দেবস্মিতাদের বাড়ি। গেটটুগেদার। লাঞ্চ। অবিরাম ভিডিও। হই-হল্লা। অমন একটা দঙ্গলে গিয়ে পড়লে সহজে ছাড়ান পাওয়া যায়!

দোকানপাট এখনও খোলেনি। চৈত্রের দুপুর সবে দিবানিদ্রা সেরে আড়মোড়া ভাঙছে। রোদের ঝাঁঝ এখনও বেশ প্রখর।

লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হল তিতির। বেঁটে পাঁচিল ঘেরা আধবুড়ো বাড়িটার সামনে এসে হাঁপ জিরোল দু'পলক। মরচে ধরা লোহার গেট হাঁ হয়ে আছে। যেমন থাকে। গ্যারেজঘরে প্রেস চলছে। যেমন চলে। সদর বন্ধ।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে গেছে। খুলেছে সন্ধ্যার মা। তাকে ভেদ করে বড়ঘর টপকে গেল তিতির। কোনওদিকে না তাকিয়ে ওপরে উঠছে। উঠতে উঠতে তীর ছুঁড়ে চলেছে,— মা কখন বেরোল?

—এই তো মিনিট দশেক।

—একা গেল?

—সঙ্গে তোমার দাদা গেছে।

—কিছু বলে গেছে?

—কই, না তো!

সন্ধ্যার মা'র শেষ উত্তরের আগেই তিতির দোতলায়। বাঁয়ে কাকিমাদের ঘর তালা বন্ধ। ডান দিকে তিতিরদের ঘর দুটোও। মাঝখানের প্যাসেজে একা একা গড়াগড়ি খাচ্ছে রোদ্দুর।

চাবি কোথায় আছে তিতির জানে। প্যাসেজের মাঝামাঝি টেলিফোন স্ট্যান্ড, স্ট্যান্ডের ঢাকার নিচে চাবি রেখে যায় মা।

ধীরেসুস্থে দুটো ঘরেরই তালা খুলল তিতির। নিজেদের ঘরে ঢুকতে গিয়েও কি ভেবে পাশের ঘরে এসেছে। ইশ, যা ভেবেছে তাই। বিশ্রী ছত্রাকার হয়ে আছে গোটা ঘর। এতদিন পর বাবা বাড়ি ফিরবে, আজও এ ঘর এমন অগোছাল থাকার কোনও মানে হয়!

ঝটপট চোখ মুখে একটু জল দিয়ে এসে কাজে নেমে পড়ল তিতির। ত্বরিত হাতে। লঘু ছন্দে। বাবার খাটে ফরসা চাদর বিছিয়ে দিল একটা। সব দিক টান করে তোশকের নিচে গুঁজে দিল সযত্নে। পরিষ্কার পিলোকভার বার করে ঢাকা পরাল বালিশে, পরিপাটি করে মাথার দিকে রাখল। চেপে চেপে ফুলিয়ে দিল বাবার প্রিয় গোদা প্যাশবালিশ। খাটের বাজুতে বাবার পাজামা পাঞ্জাবি

ভাঁজ করে রাখল, সঙ্গে সাদা তোয়ালে। দ্রুত হাতে কোনার টেবিল সাফসুফ করে নিল একটু। দাদার বিদেশি ডটপেন টেবিলের তলায় গড়াচ্ছে, তুলে ড্রয়ারে ভরল। ময়ূরপাখা ঝাড়ন আলতো বোলাল কাঠের আলমারির গায়ে, টেবিলে, বুককেসে, দাদার বিছানায়। আলনাতে ডাঁই প্যান্টশার্ট পাজামা সবই প্রায় দাদার, আলগা গুছিয়ে রাখল এক এক করে।

উফ, দাদাটা যেন কী ! সব কিছুতে এত আমার আমার ভাব অথচ একটা জিনিসের ওপর এতটুকু মায়া নেই ! দামি অ্যাভিস জিনসটা পর্যন্ত হেলাফেলায় মাটিতে গড়াচ্ছে। টু-ইন-ওয়ানের চতুর্দিকে গাদাখানেক ক্যাসেট যেমন তেমন ছড়ানো !

দাদার জিনস আলমারিতে তুলে তিতির দরজায় সরে এল। ঘাড় অল্প কাত করে ভুরুতে ভাঁজ ফেলে নিরীক্ষণ করল পুরো ঘরটাকে। নাহ্‌, মোটামুটি মন্দ সাজানো হয়নি। দেরি করে বাড়ি ফেরার ঝাড়টা বোধহয় বেঁচে গেল।

নিজেদের ঘরে এসে সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে নাইটি পরল তিতির। নিজেদের ঘর মানে তিতির আর তিতিরের মা'র ঘর। এ ঘরে কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। ব্রিটিশ আমলের কুড়ি বাই ষোলো ঘরে ডবল বেড খাট আলমারি ড্রেসিংটেবিল টিভি শোকেস, সবই ঝকঝকে তকতকে। শুধু আলোটাই যা কম এ ঘরে। সকালের দিকে পুবের জানলা দুটো দিয়ে তাও যা হোক আলো আসত, পাশেই পাঁচতলা ফ্ল্যাট উঠে রুখে দিয়েছে আলোটুকু। উত্তরের জানলারাই যা ভরসা এখন। তবে ওই দুটো জানলা দিয়েও বাইরের খুব একটা কিছু দেখা যায় না। নীচের এক ফালি জংলা ঝোপ, ঝোপের গায়ে তিতিরদের আধভাঙা পাঁচিল, তার পাশে কাচের টুকরো বসানো এক খাড়াই দেওয়াল, দেওয়ালের ওপারে রুন্টুদের ডানামেলা চারতলা বাড়ি আর এক চিলতে আকাশ, ব্যস।

এতে অবশ্য কাজ চলে যায় তিতিরের। জানলার সামনে চোখ বুজে দাঁড়ালে ঠিক একটা গন্ধ পেয়ে যায় সে। তাদের বাড়ির সামনের দিকের খোলামেলা জায়গাটার গন্ধ। রোদে পোড়া দুপুর ক্রমশ জুড়িয়ে আসার গন্ধ। মায়াবী বিকেল মাখা পৃথিবীর গন্ধ। ওই ঘ্রাণ বলে দেয় সামনের রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ছে, না কমছে, উল্টো পারের লালে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ কতটা ঝুঁকে আছে বুড়োটে বাড়িটার দিকে, সাইকেল রিকশার অবিরাম হাঁকাহাঁকিতে কিভাবে টগবগ ফুটছে গোটা পাড়া, রোদ্দুর কেমন বিরস মুখে সরে যাচ্ছে ঢাকুরিয়া ব্রিজের দিকে।

ইচ্ছে করলে তিতির অবশ্য দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষেও দেখতে পারে। সামনের ঝুলবারান্দায় গিয়ে। তবে এখন তার জো নেই। বারান্দাটা তার বড় কাকার। লাগোয়া ঘর দুটোতে তালা এখন। কাকিমা আউট। আজ শনিবার, অ্যাটমকে নিয়ে আঁকার ক্লাসে গেছে কাকিমা, সেখান থেকে সুইমিং ক্লাব ঘুরিয়ে টেবিল টেনিস কোচিং-এ নিয়ে যাবে। ফিরতে কম করে সাতটা।

তিতির উত্তরের জানলায় এসে দাঁড়াল। গ্যারেজ ঘর থেকে একটানা শব্দ ভেসে আসছে। মোটা মোটা দেওয়াল টপকে নিচের ওই আওয়াজ দোতলার এই পিছন দিকটায় তেমন প্রকটভাবে পৌঁছয় না। তবু শব্দটা থাকে সারাদিন। ঘটাংঘট। ঘটাংঘট। কোলাহলহীন সময়ে ওই একঘেয়ে শব্দের সুরে বড় নির্জন হয়ে ওঠে বাড়িটা।

অথচ বাড়ি এখন ঠিক তত নির্জনও নয়। তিতির জানে, এ মুহূর্তে একতলার ঘরে দাদু আছে, ছোটকাকারও বাড়ি থাকা বিচিত্র নয়, সন্ধ্যার মাকে তো দেখেই এল, মিনতিদিও নিশ্চয়ই টুকটাক কাজ সারছে একতলায়। এ ছাড়া প্রেসঘরে মেশিনদাদু আর কম্পোজিটার দুজন তো আছেই। তবু যে কেন বাড়িটাকে এত নিঝুম লাগে এখন !

মেঘহীন আকাশ অনেক উঁচুতে উঠে আছে। রুন্টুদের বাড়ির ডগায় লেপটে আছে নিস্তেজ সূর্যরশ্মি। ভাঙা পাঁচিল টপকে একটা ছোট্ট ঘূর্ণি ঢুকে পড়ল জংলা ঝোপে। কাঠিকুটি কুড়িয়ে পালাতে গিয়েও নেমে যাচ্ছে বার বার। পাক খেয়ে মরছে।

হঠাৎই তিতিরের মনের ভেতর থেকে অন্য মন কথা বলে উঠল,— তিতির, তোমার বাবা আজ আসবে না।

তিতির শিউরে উঠল। কেউ জানে না তিতিরের আসল মনটার ভেতরে, অনেক অনেক ভেতরে, আলাদা একটা ছোট্ট মন ঘাপটি মেরে থাকে। খুব ছোট্ট। সর্ষেদানার মতন। না না, তার থেকেও ছোট। পোস্তদানার মতন। হুটহাট যত সব বেয়াড়া কথা বলতে শুরু করে মনটা। যা ইচ্ছে তাই বলে। আর আশ্চর্য, কথাগুলো সব ফলেও যায়!

এই যেমন কাল রাত্রে মা খাটে বসে স্কুলের খাতা দেখছে, তিতিরের চোখ শব্দ কমানো টিভির পর্দায় মগ্ন, দুম করে মনটা বলে উঠল,— একটু পরেই বাড়িতে একটা হল্লাগুল্লা হবে তিতির।

তিতির বলল,— বেট!

—বেট।

হলও তাই। দাদা আড্ডা মেরে নটার পর বাড়ি ফিরল, ফিরেই ও ঘরে গাঁকগাঁক করে রোলিংস্টোন চালিয়ে দিয়েছে, মা খাতা ফেলে ও ঘরে গিয়ে কি বলল, ওমনি সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুমার! দাদা কাঁই কাঁই করতে করতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, রাত্তির এগারোটা অবধি তার টিকিটি নেই!

গত মাসে শেষ রোববার ছোটকাকা বলল পার্ক স্ট্রিটে চাইনিজ খাওয়াবে। সন্ধে থেকে সেজেগুজে বসে আছে তিতির, টুক করে মন বলল,— ড্রেসটা ছেড়ে ফ্যালো তিতির, ছোটকাকা আজ তোমার কথা ভুলেই গেছে।

তিতির বলল,— লাগি শর্ত্?

— ল্যাগি শর্ত্।

ও মা, অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল কথাটা। ছোটকাকা সেদিন বাড়িই ফিরল না। ফিরল পাঁচ দিন পর। কোন ফিল্ম-পার্টির সঙ্গে নাকি আউটডোরে চলে গিয়েছিল। চাঁদিপুর। ফিরে এসে দু হাতে কান মুলল,—এমা, একদম তোর কথা মনে ছিল না রে!

পোস্তদানা মন আবার কুনকুন করছে,— তোমার বাবা আজ রিলিজ হবে না তিতির।

তিতির বিড়বিড় করে বলল,— হতেই পারে না। হসপিটালে কাল আমার সামনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মা'র কথা হয়েছে। আজ বাবাকে ছেড়ে দেবে। মা, দাদা এক্ষুনি এসে পড়বে বাবাকে নিয়ে।

—নো চান্স। তোমার বাবা আজ আসতেই পারে না।

—ইশশ্, বাবা আজ আসবেই।

—কক্ষনও না।

বিস্বাদ মুখে জানলা থেকে ফিরল তিতির। বাবা আজ দু সপ্তাহ হল বাড়ি নেই। ঠিক ঠিক হিসেব করলে পুরো পনেরো দিন। যদি অবশ্য হসপিটালে ভর্তি হওয়ার রাতটাকে বাদ দেওয়া হয়। ক'দিন ধরেই মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হচ্ছিল বাবার, টুকটাক পেইন কিলার খেয়ে চেপে রাখছিল। সেদিন সন্ধেবেলা যন্ত্রণায় প্রায় সেন্সলেস। ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। কি কেস? না, লিভার গেছে। তা লিভারের আর দোষ কি! তার ওপরে তো কম অত্যাচার যায় না! কেন যে বাবা ওসব ছাইপাঁশ গেলে! ভাল লাগে না, একটুও ভাল লাগে না তিতিরের। এবার থেকে বাবাকে কড়া ওয়াচে রাখতে হবে।

প্যাসেজে ফোন বাজছে। অন্যমনস্ক পায়ে ফোনের দিকে গেল তিতির।

—কে? তিতির কথা বলছ? আমি ছন্দা আন্টি।

তিতির সামান্য উচ্ছ্বসিত হল,— কেমন আছ আন্টি?

—ভাল। তোমার বাবা বাড়ি চলে এসেছেন?

—এখনও আসেনি। মা আনতে গেছে।

—ও। আচ্ছা, তোমার আঙ্কল হসপিটালে গেছে কিনা জানো?

—না তো আন্টি। দাদা গেছে। আঙ্কলেরও কি হসপিটালে যাওয়ার কথা?

—ও, তুমি জানো না? আসলে তোমার আঙ্কল, নার্সিংহোম থেকে ফিরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল তো, আমি ভাবলাম বোধহয় তাহলে যাবে। ... দেশ থেকে লোক এসেছে জরুরি খবর নিয়ে ...

—আজ আঙ্কলের ল্যান্সডাউনের চেম্বার আছে না ?

—হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি একটু পরে ওখানেই ফোন করে নিচ্ছি। তোমরা সবাই কেমন আছ ? ভাল আছ তো ?

—হ্যাঁ আন্টি। টোটো কেমন আছে ?

—টোটো আর বাড়ি থাকে কই! পরীক্ষার পর থেকে তো সারাক্ষণ উড়ছে। রাখি এখন, কেমন ?

টেলিফোন রেখেও রিসিভারটা খানিকক্ষণ ছুঁয়ে রইল তিতির। ডাক্তার আঙ্কল কি গেছে হসপিটালে ? যেতেই পারে। বাবাকে নিয়ে যা ভাবনা আঙ্কলের! মা-টা যেন কী! কতবার করে আঙ্কল বাবাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে বলল, মা কেয়ারই করল না! কী এমন হাতিঘোড়া খরচা হত নার্সিংহোমে রাখলে! ডাক্তার আঙ্কলের রেকমেন্ডেশান থাকলে ঠিক ডিসকাউন্ট পাওয়া যেত। মা কিছুতেই কথা শুনল না। এত্ত জেদ মা'র!

তিতিরের বাবা আর বড়কাকার পৃথক পৃথক দুই এলাকার মাঝখানে চওড়া প্যাসেজটা অনেকটা সেতুর মতো। পশ্চিমে সার সার তিনটে কাচের জানলা, মাথায় লাল নীল সবুজ কাচের নকশা। শেষ বেলার আলো পড়ে রঙের মলিন ছটা তিরতির করে কাঁপছে প্যাসেজে।

তিতির কাঁপনটা দেখছিল। দেখছিল আর ভাবছিল নার্সিংহোমে কত আরামে থাকতে পারত বাবা! ধবধবে ঘর! মিল্ক হোয়াইট নরম বিছানা! এসি-র আরাম। সদাসতর্ক সেবা। তার বদলে হসপিটালের ওই আধানোংরা পেয়িং বেড, ছারপোকা, ধেড়ে-ইঁদুর আর নিমপাতা খাওয়া নার্স!

মা কি বাবাকে আরও কষ্ট দিতে চায়!

তিতির পায়ে পায়ে নেমে এল একতলায়।

নীচে কন্দর্পের ঘর তালাবন্ধ। মানে ছোটকাকা হাওয়া। তিতির বড়ঘরে উঁকি মারল। জয়মোহন এক মনে বসে পেশেন্স খেলছেন।

ঘরে ঢুকতে ঠিক সাহস পাচ্ছিল না তিতির। সে নাইটি পরে রয়েছে, নাইটি পরে নীচে ঘোরাঘুরি করলে তার দাদু রাগ করেন।

জয়মোহন নাতনির উপস্থিতি টের পেয়েছেন, ডাকলেন,—আয়।

দোনামোনা করে শেষ পর্যন্ত তিতির ঢুকেই পড়ল।

সামনের দিকের ওই ঘর এ বাড়ির যৌথ সম্পদ। আগে নাম ছিল বৈঠকখানা, এখন বলে বড়ঘর। নামই বদলেছে, চেহারা নয়। জন্ম থেকে এ ঘরের খুব একটা বদল দেখেনি তিতির। মেঝে থেকে একটুখানি লতাপাতা আঁকা সবজে দেওয়াল। কড়ি বরগা থেকে লম্বাডাঁটি ফ্যান ঝুলছে। তিন দেওয়ালে তিনটে পালিশ ওঠা কাচের আলমারি, পুতুল আর কাপ-মেডেলে ঠাসা। পিছন দেওয়ালে এক অভিসারিকার অয়েল পেন্টিং। বিবর্ণ। পাশের দেওয়ালে একটা হলদেটে বাঁধানো ছবি। জয়মোহনের বাবা দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসার রায়বাহাদুর কালীমোহন ব্রিটিশ গভর্নরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। প্রখর অনুমানশক্তি ছাড়া পঞ্চান্ন বছর আগের তোলা ওই ছবির নাক মুখ চোখ কিছুই বোঝা যায় না। তবু ঝুলছে ছবিটা। ঘরের মাঝ বরাবর গোটা পাঁচেক সাবেকি আমলের টানা সোফা ইউ শেপে সাজানো। রঙ-জ্বলা কাশ্মীরি কার্পেট। ঢাউস সেন্টার টেবিল।

সেন্টার টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে তাস। সেদিক থেকে চোখ না তুলে জয়মোহন বললেন,—মিনতি কী করছে রে ? এখনও আমার ছানা দিল না!

—দেবে, দেবে। ছটফট করছ কেন ?

—আর কখন দেবে! পাঁচটা বেজে গেল, এরপর আর হজম হবে ?

মিনতি সুদীপদের রাতদিনের কাজের লোক। জয়মোহনের দেখাশুনা করার জন্য সুদীপ একটা আলাদা টাকাও দেয় তাকে। তবু প্রয়োজনের সময়ে জয়মোহনের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম লুকোচুরি খেলা চলে তার।

তিতির হাঁক দিল,— মিনতিদি, দাদুকে ছানা দাওনি এখনও ?

মিনতির বদলে রান্নাঘর থেকে তিতিরদের সন্ধ্যার মা'র উত্তর ভেসে এল,— মিনতি তো এখানে নেই।

—নির্ঘাত মেশিনঘরে গেছে। এত চুলবুলি হয়েছে মেয়েটার।

তিতির ফিক করে হেসে ফেলল। দাদুর মুখের যা ভাষা হচ্ছে দিনদিন! মিনতিদিও পারে। স্বামী নেয় না, দু বেলা পেটের ভাত জুটত না, কোথায় প্রাণ ঢেলে কাজ করবি, তা নয় কাকিমা না থাকলেই পুট করে প্রেসে চলে যায়। দুই কম্পোজিটারের সঙ্গেই সমান তালে মোহব্বত চালিয়ে যাচ্ছে।

তিতির বলল,— সন্ধ্যার মা আমাদের কি জলখাবার করছে দেখব ? খাবে কিছু ?

—দ্যাখ। যদি বেশি তেল-ফেলে ভাজা না হয় দিতে বল একটু।

রান্নাঘর থেকে ঝপ করে ঘুরে এল তিতির,— ঘুগনি করছে। চলবে ?

—বল একটু দিতে। ক্ষিদে পেয়েছে। দীপু আসুক, ওই মিনতিটাকে আমি তাড়াচ্ছি।

—ওর পেছনে আদাজল খেয়ে লাগলে কেন ? তিতির হাসছে,— তাস দ্যাখো। মিলল একবারও ?

—এবার মিলে যাবে। তুই ঘুগনিটা দ্যাখ।

দাদুর জন্য ঘুগনি এনেও একটু সিঁটিয়ে গেল তিতির। খুব অল্পই এনেছে, তবু কাকিমা জানতে পারলে ঠিক বকাবকি করবে। তিতিরদের ঘর থেকে দাদুর আবোল-তাবোল খাবার দেওয়া কাকিমা একদম পছন্দ করে না। কাকিমাকেও দোষ দেওয়া যায় না। একটুতেই এমন পেটখারাপ হয়ে যায় দাদুর!

জয়মোহনের শরীর ভাল মতোই গেছে। হার্টের অসুখ তাঁর বহুদিনের, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই। না ভুল হল। তার আগে থেকেই শরীর ভাঙছিল। বারো বছর আগে ব্যবসাটা পুরোপুরি উঠে যাওয়ার পর থেকেই ভাঙনের শুরু। তবু তখনও বিস্তর হাঁটাচলা করতেন। ছোট্ট তিতিরকে নিয়ে লেকে চক্কর তো বাঁধা রুটিন ছিল তাঁর। তিতির নিজের মনে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে চরে বেড়াত, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা জমাতেন জয়মোহন। ফিরে এসে মগ্ন থাকতেন রেডিওতে। পরের দিকে টিভিতে। সাত বছর আগে স্ত্রী গত হলেন, জয়মোহনের নিশ্বাসের কষ্টও বাড়তে লাগল। বাইরে বেরোনো কমে এল ক্রমশ। মেজাজও ক্রমে তিরিক্ষি। গত বছরের আগের বছর থেকে মানুষটা সম্পূর্ণ ঘরবন্দি। হৃদযন্ত্রে নতুন উপসর্গ এসেছে। ডাইলেটেড হার্ট। লেকের এক-আধজন পুরনো বন্ধু তাও এখনও দেখা করতে আসেন মাঝে মাঝে। ভারী, কিন্তু বাইরের পৃথিবীর বাতাসের মতো। সারাদিন ধরে জয়মোহনের এখন তিনটিই কাজ। পেশেন্স। খিটখিট। আর খাইখাই।

তাস ফেলে চাকুম-চুকুম শব্দে ঘুগনি খাচ্ছেন জয়মোহন। শেষ মটরদানাটাও তারিয়ে তারিয়ে চুষলেন। তারপর বাঁধানো দাঁতে একটু চিবিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেললেন দানাটা।

—তোদের সন্ধ্যার মা তো বেশ বানিয়েছে রে!

—তাই ?

একটু ভাজা জিরের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে আরও ভাল হত।

—একেই বলে নোলা! তিতির মৃদু ধমক দিল,— তোমার তাসটা এবার মেলাও।

জয়মোহন টাগরায় জিভ বোল্যাচ্ছেন,— ধুস, ও আর মিলবে না।

—হাল ছেড়ে দিলে ?

—হাল তো ছেড়ে বসেই আছি রে বুড়ি। এখন শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা। কথাটা বলেই হঠাৎ থম মেরে গেলেন জয়মোহন। খুব বেশি ভাল লাগার মুহূর্তে, অথবা খুব বিষণ্ণ সময়ে জয়মোহন তিতিরকে বুড়ি বলে ডেকে ওঠেন। তিতিরের ঠাকুমার দেওয়া নামে।

তিতির নিষ্পলক দেখছিল জয়মোহনকে। এক সময়ে কত মজার মজার গল্প বলত দাদু! নিজের

ছোটবেলার গল্প। এই ঢাকুরিয়া জায়গাটার শহর হয়ে ওঠার গল্প। কোথায় জলা ছিল, কোথায় আমবাগান ছিল, কোথায় শেয়াল ডাকত সব যেন দাদুর ঠোঁটের ডগায় ঘুরে বেড়াত সারাক্ষণ। তিতির শুনতে না চাইলেও দাদু শোনাবেই। ভাঙা রেকর্ডের মতো একই গল্প। একই ইতিহাস।

কবে থেকে সব গল্প ফুরিয়ে গেল দাদুর!

ঘরে আলো এখন অতি ক্ষীণ। চশমা খুলে চেপে চেপে দু চোখ ঘষছেন জয়মোহন। দৃষ্টি বাইরের মরা দিনের দিকে। আনমনে বলে উঠলেন,— তোর মা এখনও ফিরল না যে বড়!

প্রশ্নটা মাকে ঘিরে নয়, বাবাকে ঘিরে। তিতির বুঝল। বাবার সঙ্গে ইদানীং দাদুর বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ। কাট্টি। মুখোমুখি হলেই দুজনে লাল চোখে দেখে দুজনকে। গরগর। ঘড়ঘড়। তবু বাবাকে নিয়েই দাদুর সব থেকে বেশি উদ্বেগ। তিতির এ কথাও বোঝে।

তিতির কোমল স্বরে প্রশ্ন করল,— তোমার মন কেমন করছে, না দাদু?

—উঁ-উঁ? কই, না তো।

—লাই।

—কার জন্য মন কেমন করবে? ওই কুলাঙ্গারটার জন্য? মদোমাতালটার জন্য?

—দাদু ভাল হবে না। তুমি যাকে গালাগাল করছ, সে কিন্তু আমার বাবা।

—তোর বাবা তো আমার কি? সে আমার ছেলে নয়? তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারব না!

—পারবে। আমার আড়ালে।

—ইহ্, খুব যে বাবার জন্য দরদ! তোর বাবা তোর দিকে তাকায়? তোদের কথা ভাবে? ফুলের মতো ছেলেমেয়ে দুটো ফুটে উঠল, কোনওদিন তাদের চোখ মেলে দেখেছে? সারাক্ষণ তো চুর হয়ে আছে।

—আহ্ দাদু।

—তুইই শুধু ফোঁস করিস, তোর দাদা মোটেই এত সাপোর্ট করে না বাবাকে। বাপ্পা তোর বাবার নামে কত ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ করে যায় জানিস?

—জানতেও চাই না। সাপোর্টও করি না। তিতির উঠে ঘরের টিউব লাইট জ্বেলে দিল। আবার এসে বসেছে জয়মোহনের সামনে— বাবার অনেক দুঃখ আছে, এ কথা তো এগ্রি করবে?

—তুই আর প্যালা দিস না। কিসের দুঃখ, অ্যাঁ!

—বা রে, বাবার একটা বিজনেসও লাগল না যে! দুধের এজেন্সি নিল, লোকে টাকা মেরে দিল। ক্যাটারিং-এর বিজনেস ধরল, জমল না ... প্রেসটা...

—ও ব্যবসার জানেটা কি, যে জমবে? জয়মোহন তপ্ত হলেন,— আমার রানিং বিজনেসটাকে এক্কেবারে শুইয়ে দিল! লোনের পর লোন তুলে গেল ব্যাঙ্ক থেকে, ও ডি বাড়িয়েই যাচ্ছে, এদিকে পার্টিকে ক্রেডিটে মাল দেওয়ার কোনও কমতি নেই। আর টাকা আদায়ের সময় বাবু চিৎপাত হয়ে শুধু ঠ্যাং নাচাচ্ছেন!

লোন, ও ডি, ক্রেডিটের মারপ্যাঁচ বোঝে না তিতির। তবে হ্যাঁ, বাবা লোকটা একটু কুঁড়ে আছে। মা বলে ঠাকুমাই নাকি পুতুপুতু করে বাবার বারোটা বাজিয়েছে। যে যাই বলুক, বারোটা বাজা লোকদের কি বাবার মতো অত বড় একটা মন থাকে? এই দুনিয়ার সব লোকই যে ভাল এটা ভাববার মতো হার্ট কটা আছে? বাবার ছাড়া?

জয়মোহন সমানে গজগজ করে চলেছেন,— বাবার কথা ভুলে যা। মাকে দেখে শেখ। যে দিন থেকে তোর বাবার প্রেসটার হাল ধরেছে সেদিন থেকেই কেমন চলছে রমরমিয়ে! দুর্লভ তো বলছিল, ও নাকি আর একা হাতে সামাল দিতে পারছে না, আরেকটা মেশিন বসালে ভাল হয়।

জাগতিক সব বিষয়েই ইন্দ্রাণীর দক্ষতা অসীম। ইন্দ্রাণী অনেক বেশি হিসেবি। গোছানো। গভীর শৃঙ্খলাপরায়ণ। আদিত্যর থেকে সে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। এসব তিতিরের ছোট থেকে

দেখে। তিতিরের ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর কী নিপুণ চালে সংসারটাকে ভাগ করে নিল ইন্দ্রাণী ! আদিত্যর প্রেসের তখন টরেটক্কা দশা, ইন্দ্রাণীর তখন শুধু স্কুলের চাকরিটাই সম্বল, তবু ইন্দ্রাণী আর দেওরের বোঝা হয়ে থাকতে চায়নি। সুদীপ অনেক বড় চাকরি করে, গোটা সংসার সে মুখ বুজে টেনেওছে অনেক দিন, তাও ইন্দ্রাণী বুঝতে পারত সুদীপ যা করে সবটাই তার বাবা-মা'র মুখ চেয়ে করে। দাদা-বৌদিদের ভালবেসে নয়। মার শ্রাদ্ধের সময় কথাটা বেশ ফুটে উঠেছিল তাদের হাবভাবে। সুদীপেরও। রুনারও। পৃথগন্ন হওয়ার সময় সুদীপ স্বেচ্ছায় ভার নিল বাবার, চতুর খেলোয়াড়ের মতো ইন্দ্রাণী মেনে নিল ব্যবস্থাটাকে। আদিত্য হাউমাউ করা সত্ত্বেও। ইন্দ্রাণী জানত শ্বশুরকে তখন তার কষ্টেশিষ্টে দু বেলা ভাত দেওয়ার ক্ষমতা হয়তো আছে, কিন্তু বুড়ো মানুষের ভাতেই সব নয়। শ্বশুরমশাইয়ের হার্টের অসুখ দিন দিন বাড়ছে, তাঁর ডাক্তার ওষুধের রাজসিক খরচা চালিয়ে যাওয়া তার সাধ্যের বাইরে। যদি জোর করে ভার নেয়ও, বাপ্পা তিতিরের টিউটর ছাড়াতে হবে, তাদের দুধটা মাছটা বন্ধ করতে হবে, আরও অনেক ছোটখাট সাধআহ্লাদ বিসর্জন দিতে হবে বহুদিনের জন্য। এত সব তথ্য তিতির জেনেছে তার মা'র ক্রোধের সংলাপ থেকে।

শুধু একটা কথাই তিতিরের মাথায় ঢোকে না। মা কেন জোর করে ছোটকাকাকে টেনে নিল নিজের ভাগে ? ছোটকার তো রোজগারপাতির কোনও স্থিরতাই নেই ! কবে, কোন জন্মে একটা সিনেমায় বা টিভি সিরিয়ালে একটা রোল পাবে, সেই অ্যাক্টিং-এর টাকাও হয়তো খেয়েই উড়িয়ে দেবে, নয়তো নিজের স্কুটারে পোড়াবে, তবুও ?

সন্ধ্যার মা ঘুগনি দিয়ে গেছে, তিতির অন্যমনস্ক মুখে বাটিতে চামচ ডোবাল। মা'র আরও অনেক আচরণেরই থই পায় না তিতির। গত মাসে তিতিরের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে দাদা তিন দিন পৌঁছে দিয়ে এল তাকে, একদিন স্কুটারে ছোটকাও। বাকি ক'দিন রোজ বাবাই সঙ্গে গেছে, নিয়েও এসেছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে সেন্টারের গেটে। মা একদিনও গেল না, নিতেও এল না। অথচ দাদার হায়ার সেকেন্ডারির সময়ে মা স্কুল থেকে ফিরেই ছেলেকে টিফিন দিতে ছুটত। পড়িমরি করে। তিতির যেদিন প্রথম বড় হল সেদিনও মা তাকে কিছুই শেখায়নি। কাকিমা বুঝিয়ে দিয়েছিল সব। আদর করে। ভালবেসে।

মা দাদাকে অনেক বেশি ভালবাসে। বাসুক গে যাক, তিতিরের বাবা আছে।

বাইরে ট্যাক্সির শব্দ। তিতির লাফিয়ে উঠেও বসে পড়ল। জয়মোহনও নড়েচড়ে উঠেছেন। মিটারের টুং টুং-এ দুজনেই টানটান।

ইন্দ্রাণীরা নয়, রুনা ফিরল।

রুনা ঘরে ঢোকার আগে মিসাইলের বেগে ছুটে এসেছে আট বছরের অ্যাটম। ঘরে ঢুকেই সাঁ সাঁ দুটো পাক খেয়ে নিল।

পোস্তদানা মন কি আজও জিতে যাবে ?

তিতির নিবে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে,— কি রে, তোর টিটি ক্লাস আজ হল না ?

—হচ্ছে। আমি করলাম না। দাদুর তাসগুলো ঘাঁটছে অ্যাটম।

তিতির চোখ নাচাল,— কেন ?

—সুইমিং-এর সময় মাসলপুল হল তো, তাই।

রুনা স্তব্ধ চোখে ছেলের লাফঝাঁপ দেখছিল, গটগট করে ভেতরে এল, ছেলের কান ধরে টানল হিড়হিড়,— এই তোমার মাসলপুল, অ্যাঁ ? বাড়ি এসেই তিড়িংবিড়িং ? চলো, তোমার হবে আজ।

অ্যাটম ঝাঁকি দিয়ে কান ছাড়িয়ে নিল,— আমার তখন সত্যিই পায়ে ব্যথা লাগছিল। বাড়ি এসে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

—পাজি কোথাকার ! তিতির ভাই-এর গাল টিপে দিল,— আজ কী ড্রয়িং শিখলি রে ?

—কোকোনাট ট্রি আর ভেজিটেবলস।

জয়মোহন নীরবে শুনছিলেন, টকাস করে বললেন,— বেগুন কী করে আঁকতে হয় শিখেছিস ?

—বেগুন ? মানে ব্রিন্‌জল ? বোধহয় শিখেছি। অ্যাটমকে খানিক চিন্তান্বিত দেখাল,— কেন বলো তো ?

—অনেক দিন বেগুন ভাজা খাওয়া হয়নি। একটা এঁকে দিস তো, ভেজে খাব।

বান ঠিক জায়গাতেই বিঁধেছে। রুনার ভুরুতে ভাঁজ,— খেতে শখ হয়েছে বললেই হয়। অত প্যাঁচের কি দরকার ?

—থাক। জয়মোহন দমে গেলেন,— ডাক্তার বারণ করেছে, কোত্থেকে আবার কি হবে।

রুনা কথা বাড়াল না। তিতিরের দিকে ফিরল,— দিদিরা এখনও ফেরেনি ?

পলকে তিতিরের মুখ আবার ফ্যাকাশে,— কি জানি কি করছে মা-রা !

রুনা অ্যাটমের হাত ধরে দরজার দিকে টানল। অ্যাটম এখনই ওপরে যেতে রাজি নয়। কাতর অনুনয় জুড়েছে,— আরেকটু থাকি না মা এ ঘরে। দাদু আমাকে কার্ডস চেনাবে।

—না। তোমাকে সামস প্র্যাকটিস করতে হবে।

—কাল তো সানডে মা। কাল করব।

—কালও করবে। আজও করবে। লাস্ট উইকের ক্লাস টেস্টে তুমি দুটো কেয়ারলেস মিসটেক করেছ। টুয়েন্টিতে সিক্সটিন পেয়েছ, লজ্জা করে না।

অ্যাটমের ঘাড় ঝুলে গেল। বোধহয় লজ্জাতেই। তাকে নিয়ে রুনা যখন প্রায় সিঁড়ির মুখে, জয়মোহন চেঁচিয়ে বললেন,— আজ কিন্তু মিনতি আমাকে ছানা দেয়নি।

রুনার উত্তর উড়ে এল,— আজ দুধ আসেনি। কাগজে দেখেননি, আজ গভর্নমেন্টের দুধের গাড়ির স্ট্রাইক।

—তাহলে তোমরা চা খাচ্ছ কী দিয়ে ?

—গুঁড়ো দুধ। ওতে ভাল ছানা হয় না।

—অ।

জয়মোহন ঝিম মেরে গেলেন।

দাদু-নাতনি বসে আছে শব্দহীন। টিউব লাইটের আলোতেও ঘরটা কেমন যেন নিষ্প্রভ। বাইরের অন্ধকার থেকে একটা হাওয়া ঘুরে ফিরে আসছিল। সঙ্গে পথচলতি লোকেদের টুকরো কথাবার্তা। প্রেস থেমে গেছে।

এক সময়ে জয়মোহন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দীর্ঘ ঋজু শরীর এখন বেশ কুঁজোটে মেরে গেছে। হাঁটার গতিও বড় মন্থর। নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,— যাই, একটু টিভি খুলে বসি। খবর শুনব।

তিতির বলল,— আমিও ওপরে যাচ্ছি।

—যাওয়ার আগে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে যাস। দিনকাল ভাল নয়, হুটহাট লোক ঢুকে পড়তে পারে।

নিজের বিছানায় শুয়ে একটা মিলস অ্যান্ড বুনের পাতা ওল্টাচ্ছিল তিতির। বইটা দারুণ রোমান্টিক। ম্যাচো হিরো বার বার নরম মেয়েটাকে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। ছেলেটা যত তাকে দূরে সরায়, মেয়েটার আকর্ষণ বাড়ে তত। এরকম গল্প পড়তে পড়তে শিহরন জাগে তিতিরের শরীরে, চোখে জল এসে যায়। দুনিয়া ভোলে তিতির।

আজ বইটাতেও তিতিরের একটুও মন বসছিল না। নিচে একটা বেল বাজার প্রতীক্ষায় তার স্নায়ু সজাগ।

সাড়ে আটটা নাগাদ বেল বাজল। হরিণ পায়ে ছুটে যাচ্ছিল তিতির, পোস্তদানা মন ধমকে উঠল,— থামো তিতির।

শ্রান্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে সুদীপ। তার পিছনে রেলিং ধরে এক-পা এক-পা করে বাপ্পা। সবার শেষে ইন্দ্রাণী। তার মুখে যেন ডাঙশ মেরেছে কেউ।

২

আদিত্য ফেরেনি। কবে ফিরবে তার ঠিকও নেই।

হাসপাতালে বেশ একটা রই রই কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে আদিত্য। কাল রাত্রে কোন এক ওয়ার্ডবয়কে দিয়ে দিশি পাঁইট আনিয়েছিল, মনের সুখে চড়িয়েছে রাতভর। ব্যস, শেষ রাত থেকে ব্যথা শুরু। কাটা পাঁঠার মতো বিছানায় দাপিয়েছে সারা সকাল। দুপুর থেকে কড়া সিডেটিভ দিয়ে ফেলে রেখেছে ডাক্তার। ইন্দ্রাণী আর বাপ্পা যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছয়, আদিত্যর ঘোর তখন সবে কাটছে। কুঁই কুঁই করছে যন্ত্রণায়। ভিজিটিং আওয়ার। ওয়ার্ড ভর্তি রুগীদের দর্শনার্থী। অনেকেই আড়ে-ঠারে আদিত্যর বিছানার দিকে তাকাচ্ছে, রুগীরা চাপা স্বরে শোনাচ্ছে আদিত্যর কীর্তিকলাপ, বেশ কয়েকটা নার্সও হেসে হেসে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে।

মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে হচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। কী অপমান! কী লজ্জা!

রুনা ইন্দ্রাণীর কাঁধে হাত রাখল,— আর ভেবে কি হবে? যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো। কী হাল হয়েছে মুখচোখের!

ইন্দ্রাণী বসেই রইল বিছানায়। নড়ল না। খাটের এক পাশে পা ঝুলিয়ে তিতিরও গুম। সব শুনে কেমন যেন ভেবলু মেরে গেছে মেয়েটা। ও ঘরে বাপ্পাও চুপচাপ শুয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে।

সুদীপ দরজায় এসে দাঁড়াল,— একটু চা দিতে বলো তো।

রুনা স্বামীর দিকে ফিরল,— এখন চা? একবারে রাতের খাওয়া সেরে নিলে হত না?

—সবে তো নটা। বলো না একটু। মাথাটা একদম জ্যাম মেরে গেছে। বৌদিকেও দাও। যা টেনশানটা গেল।

রুনা মিনতিকে হুকুম করে ঘুরে এল,— তোমরা সেই ওয়ার্ডবয়টাকে ধরতে পারলে না?

—কাকে ছেড়ে কাকে ধরব? সব কটাই তো সমান।

—তবু লোকটার তো একটা শাস্তি হওয়া উচিত!

ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের ফাঁকে শুকনো হাসি ফুটল,— একজন লোভে ছোঁকছোঁক করছিল, আরেক জন তাকে সাপ্লাই দিয়েছে, দোষ তো দুজনেরই।

—এটা একটা কথা হল দিদি! পেশেন্ট বিষ চাইলে তুই তাকে বিষ এনে দিবি?

—টাকা পেলে কেন দেবে না? রোজগার করতে গেলে অত বাছবিচার চলে না।

—কিন্তু আমার প্রশ্ন একটাই। দাদা ওখানে টাকা পেল কোত্থেকে?

একথা তো মাথায় আসেনি! ইন্দ্রাণী চকিতে মেয়ের দিকে তাকাল। মেয়েও চমকে তাকিয়েছে মা'র দিকে। দু দিকে ঘাড় নেড়ে ডুকরে উঠল মেয়ে,— বিশ্বাস করো, আমি দিইনি।

ইন্দ্রাণী কঠোর চোখে দেখছিল মেয়েকে,— তোর কাছে চেয়েছিল?

তিতির চোখ মুছল,— ন্‌না।

ইন্দ্রাণীর বিশ্বাস হল না। কাল সে যখন নার্সের সঙ্গে কথা বলছিল, অনেকক্ষণ আদিত্যর কাছে একা ছিল মেয়ে। তখন যদি দিয়েও থাকে মেয়ে কি স্বীকার করবে?

সুদীপ খাটে এসে বসেছে। ফিরেই স্নান টান সেরে সে এখন বেশ তাজা। ফরসা পাজামা গেঞ্জি পরেছে। গায়ে বডিট্যাল্কের হালকা হালকা ছোপ। সুবাস।

একটা সিগারেট ধরাল সুদীপ,— তোমাকে একটা কথা বলব বৌদি?

—কী?

—আমার পরামর্শ শুনবে? কাল যদি দ্যাখো দাদা খুব একটা ইমপ্রুভ করেনি তাহলে স্ট্রেট নার্সিংহোমে ঢুকিয়ে দাও। নাহলে বলো, আমি ব্যবস্থা করছি।

ইন্দ্রাণী ঠাণ্ডা চোখে সমবয়সী দেওরের দিকে তাকাল,— কী লাভ? সেখানেও ঠিক একটা

ওয়ার্ডবয় জুটে যাবে। বড় জোর দিশির জায়গায় বিলিতি আসবে।

— তোমার সব সময়ে কেমন নেগেটিভ অ্যাটিচিউড বৌদি! শুভাশিসদা বলে দিলে নার্সিংহোম টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স ওয়াচে রাখবে।

—হুঁহ্। একটা পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকের যদি নিজের ওপর নিজেরই না কনট্রোল থাকে, অন্য লোক ওয়াচ রেখে কতক্ষণ ঠেকাবে!

—অ্যালকোহলিক পেশেন্ট নিয়ে কি এসব অভিমান সাজে বৌদি? আই মাস্ট সে, তোমার শুভাশিসদার অ্যাডভাইসই শোনা উচিত ছিল। ব্লু হেভেনে থাকলে অ্যাদ্দিনে দাদা পুরো ফিট হয়ে যেত।

ইন্দ্রাণীর চোয়াল শক্ত হল। যেখানে মানুষের জোর, সেখানেই মানুষের দুর্বলতা, এ কথা কে বোঝে? কথা ঘোরানোর জন্য বলল,— কাল যাই। দেখি। তারপর যা ভাবার ভাবা যাবে।

—বেশি ভেবো না। ডু সামথিং। আর তুমি যা নিয়ে চিন্তা করছ সেটার জন্য কোনও প্রবলেম হবে না। আমি অফিসে মেডিকেলের জন্য যা পাই তাতে বাবার ওষুধপত্র কভার করেও কিছু পড়ে থাকে। সো আই ক্যান প্রোভাইড সামথিং। বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর চোখ দেখে একটু হোঁচট খেল সুদীপ,— এমনি না নাও, টেক ইট অ্যাজ লোন।

—সে হবেখন। ইন্দ্রাণী উঠে পড়ল,— তুমি তো আছই।

—বাই দা বাই। সুদীপও দাঁড়িয়েছে,— আমাদের কি কারুর আজ রাতে হাসপাতালে থাকার দরকার ছিল?

—ডাক্তার তো সেরকম কিছু বলল না!

শিথিল পায়ে ইন্দ্রাণী বাথরুমের দিকে এগোল। সুদীপ যেন আজ বড় বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে দাদাকে নিয়ে। সুদীপের প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক মিলতে চায় না ব্যাপারটা।

প্যাসেজের বাঁ দিকে পাশাপাশি দুটো বাথরুম। সমান সাইজের। সুদীপদেরটা অনেক আধুনিক। গিজার, টেলিফোন শাওয়ার, কমোড, কী নেই! গত বছর বাথরুমের দেওয়ালে ইটালিয়ান টাইলস বসিয়েছে সুদীপ। সঙ্গে বাহারি বেসিন-আয়নাও। তুলনায় ইন্দ্রাণীর বাথরুম বেশ শ্রীহীন। সাদামাটা। শুধু বেসিনের আয়নাখানা দারুণ চকচকে। বেসিনটাও। রোজ নিজের হাতে বেসিন-আয়না পরিষ্কার করে ইন্দ্রাণী।

আয়নায় ইন্দ্রাণী নিজেকে দেখছিল। সামনের অগাস্টে তার বয়স হবে উনচল্লিশ, কিন্তু এখনও তার ত্বক বিস্ময়কর রকমের মসৃণ। তার ছিপছিপে শরীর এখনও প্রায় নির্মেদ। ছোট্ট কপাল। ঘন ভুরু। ডিম্বাকৃতি মুখ। এত পরিশ্রমেও তার চেহারা এতটুকু টাল খায়নি। এখনও অনায়াসে তাকে তিরিশ-টিরিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথার পাশের শিরা দুটো আবার দপদপ করে উঠল। শরীর জুড়ে অসহ্য জ্বালা জ্বালা ভাব। টান মেরে একে একে দেহের সমস্ত আবরণ খুলে ফেলল ইন্দ্রাণী। ফুলফোর্সে ছেড়ে দিল শাওয়ার। মরুভূমির তৃষিতা নারীর মতো স্নান করছে সে, প্রতিটি জলকণা শুষে নিচ্ছে রোমকূপে। আহ্ আরাম। আরাম। আরাম।

শরীর কিছুটা শীতল হওয়ার পর ইন্দ্রাণী চেঁচিয়ে মেয়েকে ডাকল,— তিতির আমার একটা শাড়ি সায়া দিয়ে যা তো। সাদা ব্লাউজটাও।

তিতির দরজার ফাঁকে জামাকাপড় গলিয়ে দিয়ে বলল,— তাড়াতাড়ি বেরোও। মিনতিদি চা রেখে গেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে ইন্দ্রাণীর শরীর-মন আরও ঝরঝরে হল। নাহ্, চা-টার খুব দরকার ছিল। সন্ধ্যার মা রাতের রান্না সেরে চলে গেছে, এ সময়ে চা খেতে হলে ইন্দ্রাণীকে নিজেকেই বানাতে হত। প্যাসেজের এ-পাশটায় কাঠের টেবিলে ছোট্ট স্টোভ রাখা আছে, সঙ্গে টুকটাক কাপ ডিশ বাসনপত্র। চা, গুঁড়ো দুধ, চিনি। লোকজন এলে লাগে। স্টোভটা পাম্প স্টোভ, তিতিরকে

রতপক্ষে ইন্দ্রাণী ওই স্টোভে হাত দিতে দেয় না। তিতির চাইলেও।

পাশের বাড়িতে খুব জোরে টিভি চলছে। হিন্দি সিরিয়ালের সিংহনাদে হুমহুম দশ দিক। উত্তরের জানলার পর্দা সরানো, ওপারে থমকে আছে তরল অন্ধকার। তাপ বিকিরণ করে করে শীতল হচ্ছে পৃথিবী।

তিতির ঘরে নেই। টেবিলের ওপর ডাঁই পরীক্ষার খাতা। ইন্দ্রাণী খাতাগুলো গুনছিল। এখনও আটত্রিশটা দেখা বাকি। তার স্কুল বাংলা মিডিয়াম, এখনও অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয়নি, সামনের বৃহস্পতিবার নাগাদ বেরোনোর কথা। নাহ্, কাল কি হয় না হয়, রাত্তিরে কিছু দেখে রাখতেই হবে। দিয়ে দেবে সোমবার। স্কুলে তার দেরি নিয়ে কোনও কথা উঠুক একদম চায় না ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী খাতাগুলো খাটে রাখল। রোল ধরে সাজাচ্ছে। টিকটিক স্কুটারের আওয়াজ হচ্ছে নীচে। বিপুল শব্দ তুলে গ্যারেজের শাটার উঠছে। নামল। প্রেস মেশিনের পাশে রাত্রে স্কুটারটা রাখে কন্দর্প।

একটা খাতা শেষ করার আগেই কন্দর্প ওপরে হাজির। ঠোঁটে শিস, হাতে ঘুরন্ত চাবি। চেয়ার টেনে বসল,— কী ? বড়সাহেব আজ খুব খেল দেখিয়েছে তো ?

—ফাজলামি কোরো না। আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

—আরে, এ হল বিগিনিং অফ দ্য এন্ড। ধসছে। ঝট উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করছে কন্দর্প। সে যতক্ষণ বসে থাকে তার চেয়ে বেশি সময় আয়নায় দেখে নিজেকে। তার গোঁফ-দাড়ি সব সময়েই মোলায়েম করে কামানো। টকটকে ফরসা রঙ। চ্যাপ্টা নাক। ঈষৎ ঢুলুঢুলু চোখ। একেবারে ইন্দ্রাণীর সুন্দরী শাশুড়ি বসানো।

ইন্দ্রাণী বলল,— নিজের দাদা সম্পর্কে এভাবে বলতে বাধে না তোমার ?

—তুম তো জানতি হো, যো সহি বাৎ হ্যায়, উও কন্দর্প জরুর বোলেগা। দাদা তো কি আছে ? সব লোকই তো কারুর না কারুর দাদা বাবা কাকা।

—তুমি তো বলবেই ! তোমরা সব এক গাছের ফল। তোমাদের কারুর মধ্যেই কোনও মায়াদয়া টান নেই।

—ভুল কনসেপশান। গাছ এক ঠিকই, তবে সব ফল এক ট্রিটমেন্ট পায়নি ভাবীজান। তোমার পতিদেবতার মতো কে আর তুলোয় মুড়ে মানুষ হয়েছে ?

—যে ছেলে রোগাভোগা হয়, তার ওপর মায়ের একটু বেশি টান থাকেই।

—রোগ ? রোগ তো মনগড়া।

—তোমার দাদার ছোটবেলায় প্লুরিসি হয়নি ?

—ছাড়ো তো ! কবে ছ বছর বয়সে কার প্লুরিসি হয়েছে, না টিবি হয়েছে, তার জন্য তার সারাজীবন ভারী কাজ করা বারণ ? বেশি পড়াশুনো করা বারণ ? মাঠে খেলাধুলো করা বারণ ? তার জন্য সব স্পেশাল স্পেশাল খাবার ! দুধের সর তোলা থাকবে ! মাছের পেটিটি রাখা থাকবে ! আলাদা করে মাংস ! ডিম !

কন্দর্পের কথার ভঙ্গিতে বেশিক্ষণ গোমড়া থাকা কঠিন। ইন্দ্রাণী হেসে ফেলল,— অ্যাই, তুই এত জেলাস কেন রে ?

—হব না ? উনি নাদাপেটা হয়ে খাচ্ছেন, আর আমরা ভাইবোনরা বেড়ালবাচ্চার মতো জুলজুল করে দেখছি ! যদি কিছু এঁটোকাঁটা জোটে ! তার পরও জেলাসি আসবে না বলছ ?

—সেই জেলাসি এখনও আছে ? দাদাটির এই হাল দেখেও ?

—নো। আমার এখন করুণা হয়। এ টোটাল ব্যর্থ লোক, দিনরাত বউ-এর ঝাড় খাচ্ছে ... !

কন্দর্প হাসতে হাসতেই বলছে কথাগুলো। ইন্দ্রাণীর শুনতে ভাল লাগছিল না। নিশ্বাস চেপে বলল,— সে যে কত দুঃখে ঝাড়ি, তা যদি কেউ বুঝত !

—অ্যাই দ্যাখো। সিরিয়াস হয়ে গেলে! তোমার সঙ্গে একটু মজাও করা যায় না মাইরি! আরে বাবা, আমিও কি খুব সাকসেসফুল ম্যান নাকি?

—নও বুঝি? তবে যে খুব বাতচিৎ শুনি?

—চিমটি কাটছ? কাটো। আমি অলপ্রুফ। কন্দর্প দরজার দিকে গেল একবার, সুদীপদের ঘরের দিকে কি যেন দেখছে, ফিরে এসে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল,— আচ্ছা বৌদি, আজ ব্যাপারটা কী বলো তো?

—কী ব্যাপার?

—মেজসাহেব আজ যে বড় হসপিটালে গিয়েছিল?

সুদীপ পারতপক্ষে হাসপাতালে যায় না। যাওয়ার কথাও ছিল না আজ। অফিস থেকে ফিরতে তার সাধারণত দেরিই হয়। নটা। সাড়ে নটা। ফিরে নিজের ঘরে ঢোকার আগে একবার এদিকে আসে, দাদার শরীরের খোঁজখবর নিয়ে যায়। আজ বাপ্পাই ঘাবড়ে গিয়ে হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল সুদীপকে। ইন্দ্রাণীকে না জানিয়েই। জানলে কক্ষনও ফোন করতে দিত না ইন্দ্রাণী।

কন্দর্পকে অবশ্য কথাটা বলল না ইন্দ্রাণী, উল্টো প্রশ্ন করল,— কেন? দাদার ওপর ভাই-এর টান থাকতে পারে না?

—হুঁ, তা পারে।

—পারে নয়, আছে। জানো, আমাকে জোরাজুরি করছিল কালই তোমার দাদাকে নার্সিংহোমে ট্রান্সফার করার জন্য? বলেছে যা খরচা লাগে দিয়ে দেবে।

—বলছিল বুঝি? কন্দর্প খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যেন কিছু ভাবছে। সিগারেটটা চেপে চেপে নেবাল অ্যাশট্রেতে। উঠে দাঁড়াল,— খেতে যাবে না?

—হুঁ। যেতে তো হবেই।

—আমি এগোচ্ছি। তোমরা খাওয়ার ঘরে এসো।

কন্দর্প চলে গেল।

আদিত্যর খাটের উল্টোদিকে বাপ্পার সিঙ্গল খাট, খাটে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে বাপ্পা, তিতির কি সব লিখছে টেবিলচেয়ারে বসে। ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে ছেলেকে ঠেলল,— অ্যাই ওঠ। খাবি না?

বাপ্পা অল্প নড়ল,— উ উঁ উঁ।

—চল বাবা, খেয়ে আসবি চল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল বাপ্পা,— কটা বাজে?

—অনেক বাজে। চল, দুপুরের পর থেকে তো কিছু পেটে পড়েনি।

খাটের প্রান্তে বসে উনিশ বছরের শরীরটাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ কসরত করল বাপ্পা। ছেলেটার ওপরেও বেশ ধকল গেছে আজ। সে এ সবে একটুও অভ্যস্ত নয়, করতে ভালও লাগে না তার। সুদীপ এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত বিস্তর ছোটাছুটি করতে হয়েছে তাকে। ডাক্তার, ওষুধ, একটা ওষুধ তো আবার আট-নটা দোকান ঢুঁড়ে আনতে হয়েছিল। তার ওপর আবার ছেলের মানেও লেগেছে খুব।

তিতির কখন নিঃসাড়ে নীচে নেমে গেছে। বাপ্পাও টলতে টলতে এগোচ্ছে। আলো পাখা নিবিয়ে ঘর দুটো টেনে দিল ইন্দ্রাণী।

সিঁড়ির সামনে এসে সুদীপদের ঘরের দিকে ইন্দ্রাণীর চোখ চলে গেল। হাওয়ায় পর্দা উড়ছে। রুনা নাইটি পরে ক্রিম ঘষছে মুখে। খুব লো ভলিয়্যুমে শব্দ বাজছে টিভির। সুদীপ দেখছে বোধহয়।

তিতির গ্যাসে খাবার দাবার গরম করে নিয়েছে। খাওয়ার আয়োজন খুব সামান্য। রুটি, বিকেলের ঘুগনি, ডিমের কারি, স্যালাড। বাপ্পা স্যালাড খেতে ভীষণ ভালবাসে।

চারটে প্রাণী নিঃশব্দে খাচ্ছিল। বরফ ভাঙতে কন্দর্প মাঝে মাঝে খুচখাচ রসিকতা জুড়ছিল

তিতিরের সঙ্গে, ঠিক জমছিল না। নিজেও যেন ঠিক উৎসাহ পাচ্ছিল না কন্দর্প।

তিতির প্রায় কিছুই না খেয়ে উঠে গেল। ইন্দ্রাণীরও মুখে তেমন রুচি নেই। একটা রুটি আর একটু ঘুগনি বহুক্ষণ ধরে খুঁটল সে। বাপ্পাই শুধু গোগ্রাসে খাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে গোটা সাতেক রুটি খেয়ে ফেলল, নিজের ডিম শেষ করে হাত বাড়াল মায়ের ডিমের দিকে।

পুরনো আমলের ঢাউস ফ্রিজ ইন্দ্রাণীর ভাগে পড়েছে, খুব একটা ঠাণ্ডা হয় না আর। রিলেটা প্রায়ই গণ্ডগোল করছে। ইন্দ্রাণী পড়ে থাকা খাবার ফ্রিজে তুলে বাসনকোসন সিঙ্কে নামাল। ওপরে ওঠার আগে জয়মোহনের ঘরে গেল একবার। রুটিন মাফিক।

হাল্কা নীল নাইটল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে পুরোপুরি ঘর অন্ধকার করে ঘুমোতে পারেন না জয়মোহন। ভয় পান।

অবছা আলোয় মানুষটাকে ভাল ঠাহর হচ্ছিল না ইন্দ্রাণীর। পায়ে পায়ে মশারির খুব কাছে গেল। জয়মোহনের চোখ বন্ধ। সমান বিরতিতে ওঠানামা করছে জীর্ণ খাঁচা। হঠাৎ দেখলে বৃদ্ধ আদিত্য বলে ভ্রম হয়। একই রকম লম্বাটে গড়ন। ভরাট চৌকো মুখ। তীক্ষ্ণ নাক। প্রশস্ত কপাল। চিবুকের কাছটা সামান্য ছুঁচোলো।

ইন্দ্রাণী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল খানিকক্ষণ। ঘুমন্ত মানুষকে কী যে অসহায় দেখায়! ড্রিপ লাগানো অসুস্থ মানুষকেও! আদিত্য কেমন ছেতরে পড়ে ছিল হাসপাতালের বেডে! নির্জীব! প্রতিরোধহীন!

সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এল ইন্দ্রাণী। সিঁড়ির দিকে এগোতে গিয়ে কি যেন ঠেকল পায়ে। শুকনো পাতা একটা। কাল বিকেলে ছোটখাট কালবৈশাখী এসেছিল, তখনই বোধহয় উড়ে এসেছে। ইন্দ্রাণী পাতাটা তুলে ফেলে দিল। ঠিক তখনই আবার কন্দর্প ডাকল,— বৌদি?

ইন্দ্রাণী কন্দর্পর দরজায় এল,— কী হল?

—এই টাকাটা রাখো। পাঁচশো আছে।

ইন্দ্রাণী হেসে ফেলল,— খবর খুব আঁতে লেগেছে বুঝি? সত্যিই তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।

কন্দর্প মাথা চুলকোল,— তা নয়। টাকাটা তোমাকে আমি আগেই দিতাম। গত মাসে চাঁদিপুরে এই ছবির শুটিং করতে গেলাম না, সেই যে গো 'ছোট পিসিমা'... দুহাজার দেওয়ার কথা, আটশো পেয়েছি। তাও বাকিটা দিতে চায় না, পাঁচশো ঠেকাচ্ছিল....

ইন্দ্রাণী আবারও বলল,— তুমি আর বড় হলে না।

—আবার ঠাট্টা করছ? নাও, টাকাটা রেখে দাও। এ মাসে আবার দেব। একটা টিভি সিরিয়ালে কাজ পাচ্ছি। হিরোর প্যারালাল রোল। একটু ভিলেন ভিলেন ভাব আছে। আমাকে কি ভিলেন বেমানান লাগবে বৌদি?

—লাগবে। ইন্দ্রাণী হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল— তোমাকে একমাত্র জোকারটাই ভাল মানায়। হাত পা নেড়ে হাসবে, লাফাবে, ডিগবাজি খাবে, গাছ থেকে ঝুলবে...বলতে বলতে মুখে আঁচল চেপে হাসছিল ইন্দ্রাণী,— তোমাকে যা দেখাবে না!

কন্দর্প ভুরু কুঁচকোল,—অত হেসো না। একটা গম্ভীর খবর আছে। স্কুপ।

—তোমার স্কুপ? মানে আবার কেউ তোমার প্রেমে পড়েছে? ইন্দ্রাণীর হাসির দমক বাড়ছে,— আবার তো ল্যাং খেয়ে হাত পা ভেঙে পড়ে থাকবে। এই নিয়ে কবার হল? তেত্রিশ?

—আজ্ঞে না। এটা প্রেম ফ্রেম নয়, রিয়েলিটির স্কুপ। মেজসাহেব একটা জম্পেশ মতলব ভাঁজছে, খবর রাখো?

—কী মতলব?

—ভেতরে এসো, বলছি।

কন্দর্পর ঘর ঠিক ব্যাচেলারদের ঘরের মতো নয়। বেশ সুশৃঙ্খল। ঘরের কোণে সেতার ঢাকা দেওয়া আছে। পাশে বাঁয়া তবলাও। র‍্যাকে কিছু নাটকের বই। টেবিলে ভি সি পি। কয়েকটা

ভিডিও ক্যাসেট। ভি সি পি ওপরে নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে ক্যাসেটগুলো দেখে কন্দর্প। বেশির ভাগই ইংরিজি সিনেমা। দু'-একটা নিজের অভিনয়ের ক্যাসেটও আছে। সবই যত্ন করে রাখা। এমনকী বিছানার ওপরের চাদরটা পর্যন্ত টানটান।

ইন্দ্রাণী বিছানায় বসল,— কী হল, বলো ?

—ভাবছি তোমাকে বলব কি না। মানে বলা ঠিক হবে কি না ! কন্দর্প সিগারেট ধরিয়ে ফুক ফুক টানছে,— আচ্ছা, এই বাড়িটা আর পেছনের জায়গাটা মিলিয়ে কতটা জমি আছে বলো তো ?

—আমি অত জমির মাপ টাপ বুঝি না। তোমার দাদা তো বলে আট কাঠা।

—বাহ, তুমি তো ফাইন ইনফরমেশান রাখ ! এবার বলো তো, আট ইন্টু দেড় লাখ কত হয় ?

—বারো। কেন ? কী হয়েছে ?

—দাঁড়াও না, ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আচ্ছা, এ বাড়ির ভ্যালুয়েশান কত হবে ?

—জানি না।

—জানা উচিত ছিল।

—আমার জানার দরকার নেই।

—আছে। আছে। কন্দর্প চোখ ঘোরাল,— মেজসাহেব বাবাকে পটানোর চেষ্টা করছে। এ বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানাবে।

ইন্দ্রাণী থ হয়ে গেছে। এত বড় একটা প্ল্যান আঁটছে, অথচ সুদীপ একবারও তো তার সঙ্গে আলোচনা করেনি ! আদিত্য নয় এখন এ বাড়ির ফালতু, ইন্দ্রাণীও কেউ নয় ? ইন্দ্রাণীর ছেলেমেয়ে কেউ নয় ?

কন্দর্প হাসছে মিটিমিটি,—কী ? ব্যোম মেরে গেলে যে ? তবে যাই বলো, প্রোপোজিশানটা মন্দ নয়। আমাদের পার হেড একটা করে ফ্ল্যাট অ্যান্ড ওয়ান ল্যাক ক্যাশ।

আত্মাভিমানে ইন্দ্রাণী পলকে রুখে দিল কষ্টটাকে,— বাবা কি বলছেন ?

—ওটাই তো মেজদার মেন হার্ডল। বাবাকে কাটাতে পারলেই গোল ফাঁকা। বাট নিধিরাম সর্দারকে বাগে আনা যাচ্ছে না। বুঢ়ঢাবাবুর এ বাড়ি নিয়ে যা সেন্টিমেন্ট ! ঢাকার জমি বেচে এসে গ্র্যান্ডফাদার এখানে বাড়ি বানিয়েছিলেন। কত জলাজঙ্গল সাফ করে। ডাকাত তাড়িয়ে। দ্যাখো না, পুরনো কথা বলতে গেলে কেমন তুলতুলে হয়ে যায় লোকটা !

—হবেই তো। বাবার কাছে এ বাড়ি কি শুধু বাড়ি ? কত স্মৃতি !

—স্মৃতি-ফিতি সব হাতে লণ্ঠন করে ধরিয়ে দেবে। নিধিরাম বেশি দিন লড়তে পারবে না। অলরেডি একটা প্রোমোটার এসে গেছিল থলি নাচাতে।

—কবে ?

—তা, ধরো দিন সাতেক আগে।

ইন্দ্রাণীর বুকে কুটুস করে একটা পিঁপড়ে কামড়াল। তার প্রতি জয়মোহনের একটা আলাদা দুর্বলতা আছে, ইন্দ্রাণী জানে। এ বাড়িতে সে বউ হয়ে আসার ঠিক দুমাসের মাথায় জয়মোহনের একমাত্র মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। এক মোটর মেকানিকের সঙ্গে। জয়মোহন তখন উন্মাদ প্রায়। অন্নজল ত্যাগ করার দশা। সে সময়ে ইন্দ্রাণীই ঘিরে রেখেছিল শ্বশুরকে। কখনও জোর করে, কখনও বুঝিয়ে সুজিয়ে ক্রমে স্বাভাবিক করে তুলেছিল মানুষটাকে। তখন থেকেই এক অদৃশ্য মায়াবন্ধনে জড়িয়ে গেছেন জয়মোহন। তিনি বলতেন, এ শুধু আমার বড় বউ নয়, এই আমার মেয়ে। তারপর অবশ্য অনেক জল বয়ে গেছে গঙ্গায়। জয়শ্রী এখন আর তত পর নেই। তার সন্তানটি জন্মানোর পরেই জয়মোহন দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষমা করেছিলেন মেয়েকে। কিছুটা স্ত্রীর চাপে, কিছুটা ইন্দ্রাণীর উপরোধে। রাগটাও তখন কমে এসেছিল অনেক, সময়ের পলি পড়ে।

ইন্দ্রাণীর ওপর জয়মোহনের বিশেষ দুর্বলতার আর একটা কারণও আছে। মোটা দাগের। সেটা হল অনুশোচনা। আদিত্যর মতো অকালকুষ্মাণ্ডের জন্য ইন্দ্রাণীকে নিয়ে আসার পরিতাপ।

সেই জয়মোহন এত প্রোমোটার-টোমোটার কিছুই জানালেন না ইন্দ্রাণীকে ? হাঁড়ি আলাদা হয়ে ইন্দ্রাণী এখন এত পর ?

ইন্দ্রাণী ক্ষুণ্ণ মুখে বলল,—বাবার তো একটা মেয়েও আছে। তাকে তোমরা হিসেবে ধরেছ তো ?

—নো তোমরা। শুধু মেজদা। আমাকে একদম এর মধ্যে ট্যাগ করবে না।

—কেন ? তুমি ভাগ নেবে না ?

—নেব ? কন্দর্প যেন উদাসী বাউল,—নিলেও হয়, না নিলেও হয়।

—অ্যাক্টিং কোরো না। ইন্দ্রাণীর গলা ধরে এসেছে,—এ বাড়ির সব্বাইকে চেনা হয়ে গেছে আমার। কেউ নিজেরটুকু কম বোঝে না।

কন্দর্প হেসে ফেলল,—দাদাও ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার দাদাও। তিনি হলেন সব থেকে সেয়ানা। ভাল মতো বুঝে গেছে যাই করে বেড়াক না কেন, ছেলেমেয়েদের আমি ঠিক সামলে নেব। স্বার্থপর। স্বার্থপর।

কথাটা যেন ধাক্কা মারল কন্দর্পকে। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়েছে সে। বাইরে এখন কিছুই দৃশ্যমান নয়, শুধু এক আধভাঙা পাঁচিল পাহারা দিচ্ছে জানলাকে। টিউবের আলো পড়ে পাঁচিলের ক্ষত যেন আরও দগদগে।

কন্দর্প ক্ষতগুলো দেখছিল। বলল,—রাগ কোরো না বৌদি, তুমিও কিন্তু কোনওদিন দাদার হাল ধরার চেষ্টা করোনি। তুমি যদি গোড়ায় একটু শক্ত হতে, কিংবা একটু নরম, তাহলে হয়তো দাদা...

ইন্দ্রাণী নিঝুম হয়ে গেল। কথাটা তো মিথ্যে নয়। আবার সত্যি ভাবলেও এই মুহূর্তের ক্ষোভ, এই মর্মবেদনা, সব নিরর্থক হয়ে যায়।

ছোট্ট শ্বাস ফেলে ইন্দ্রাণী প্রসঙ্গ ঘোরাল,—সাত দিন আগে প্রোমোটার এসেছিল সে কথা তুমি আজ বলতে গেলে কেন ? সাত দিন আগেই তো বলতে পারতে !

—প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। খবরটা আজই পেয়েছি বলে।

—কে বলল তোমাকে ? বাবা ?

—ছি বৌদি, স্কুপের সোর্স জানতে নেই। ধরে নাও এটা আমার সিক্রেট এজেন্সির খবর।

ইন্দ্রাণী উঠে পড়ল। কন্দর্পকে এখন খুঁচিয়ে লাভ নেই। তার এই দেওরটি মাঝে মাঝেই কথা নিয়ে এরকম রহস্য করে, আবার মন হলে নিজেই ব্যাকব্যাক করে বলে ফেলে সব কিছু। এটাও বলবে।

রাত গাঢ় হচ্ছিল। শহরের কোলাহল এখন অনেক ঝিমিয়ে এসেছে। হঠাৎ হঠাৎ রাস্তা মাড়িয়ে উদ্দাম ছুটে যাচ্ছে কোনও সাইকেল রিকশা। তার হর্নের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ পলকের জন্য ছিঁড়ে দিচ্ছে স্তব্ধতাকে। রাতচরা পাখির মতো। যান্ত্রিক শব্দ ছড়িয়ে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন পার হল ঢাকুরিয়া। বোধহয় শেষ ট্রেন। ক্রমশ বিলীয়মান তার আওয়াজ দীর্ঘক্ষণ রেশ রেখে দিল ঘরের বাতাসে।

একটা হিংস্র মশার বাহিনী হইহই করে বেরিয়ে পড়েছে। কাজেকর্মে জেগে থাকা মানুষকে তারা একটুও তিষ্ঠোতে দেয় না এ সময়ে। গান শোনায় আর পিন ফোটায়। তাদের এড়াতে মশারির ভেতর বসে খাতা দেখছিল ইন্দ্রাণী। ঝড়ের গতিতে নটা খাতা দেখে ফেলল। দশটা। এগারোটা। ক্লাস নাইনের ইংরিজির খাতা, বেশ মন দিয়ে দেখতে হয়। উফ, এখনও সাতাশটা ?

ইন্দ্রাণীর শরীর ভেঙে আসছিল। পাশে তিতির অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গুটিসুটি মেরে। ছোট থেকেই মেয়েটার এরকম কুঁকড়ে শোওয়ার অভ্যেস। যেন ঘুমের মধ্যেও অরক্ষিত। যেন আত্মরক্ষা করছে।

আচম্বিতে ফোন বেজে উঠল। লহমায় বিদ্যুৎ খেলে গেছে ইন্দ্রাণীর স্নায়ুতে। হৃৎপিণ্ড কেঁপে গেল।

এত রাতে কার ফোন এল ! হাসপাতাল থেকে এল না তো !

আদিত্যর কি তাহলে... !

সুদীপের দরজায় খিল নামছে। ত্রস্ত পায়ে টেলিফোনের দিকে ছুটল ইন্দ্রাণী।

৩

শুভাশিস ফোন ধরে আছে। ধরেই আছে।

বেশ খানিকক্ষণ রিঙ বাজার পর ওপারে স্বর ফুটল। কাঁপা কাঁপা, —হ্যালো ?

—শুয়ে পড়েছিলে ?

—শুয়েই তো পড়ার কথা। ইন্দ্রাণীর স্বরে বিরক্তি,— এত রাতে ফোন করার কোনও মানে হয় ! রুনা নার্ভাস হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এত টেনশানের পরে...

—কেন ? আবার টেনশন কিসের ?

—ও। তুমি তো জানো না। আদিত্যকে আজ হসপিটাল থেকে ছাড়েনি। ও আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

—সে কি ! স্কচের পলকা দোলা ঝাঁকুনি মারল শুভাশিসের মাথায়,— কালও আমার পাইনের সঙ্গে ফোনে কথা হল ! পাইন বলল হি ইজ পারফেক্টলি অলরাইট !

—ঠিক বলেছিলেন। কিন্তু কাল রাতে... ইন্দ্রাণী শীতল স্বরে আদিত্যর আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়ে চলেছে, শুভাশিস মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছিল। পারছে না। দু-এক পেগের বেশি সে খায় না কখনও। আজ কথা বলতে বলতে একটু মাত্রা চড়ে গেছে। শব্দের শীতল ধারা কানে এসেও জড়িয়ে যাচ্ছে বার বার।

পার্টি প্রায় শেষের মুখে। একে একে বিদায় নিচ্ছে অভ্যাগতরা। পুলকরা চলে গেল। ভাস্কর-দীপারা দরজায় এগোচ্ছে। যেতে গিয়েও ভাস্কর পিছন ফিরে শুভাশিসকে হাত নাড়ল। কেউ তেমন নেই আর। যারা আছে তাদের বেশির ভাগেরই চরণ ক্রমশ শিথিল। যুগলনাচ যদিও থেমেছে অনেকক্ষণ, নীপা-সমীরণ এখনও দোলার চেষ্টা করছে। স্টিরিওতে নিচু পর্দায় বেজে চলেছে মাদক অ্যারাবিয়ান টিউন।

শুভাশিস জড়ানো শব্দরাজিকে কোনওক্রমে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে শুনল। খানিকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল,— আমি এরকমই একটা ভয় পাচ্ছিলাম। ভোগো আরও কয়েকদিন।

—হুঁ। ইন্দ্রাণী একটু চুপ থেকে প্রশ্ন করল,— কোত্থেকে ফোন করছ ? বাড়ি থেকে ?

—না, নিউ আলিপুর থেকে। অরূপদের আজ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি।

—চৈত্র মাসে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি !

—ওদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ। ওরা অত দিনক্ষণ মানে না।

—ও। ছন্দা যায়নি ?

—পার্টি হবে, ছন্দা আসবে না ? শুভাশিস আরও নির্লিপ্ত করল গলাটাকে, — এসেছে। নিজের মতোই আছে। গ্লাস নিয়ে বসেছে একটা।

ও প্রান্ত চুপ।

—কী হল, চুপ করে গেলে ? রুনা এখনও সামনে আছে নাকি ?

—না। ইন্দ্রাণীর গলা নেমে গেছে হঠাৎ,— তুমিও তো খাচ্ছ !

শুভাশিস হা হা করে হাসল। খুশিহীন সশব্দ হাসি,— আমি খাই, তবে তোমার বরের মতো নয়। আমাকে নিয়ে অন্তত তোমাকে হসপিটালে ছুটতে হবে না।

—আদিত্যও ও কথা বলত এক সময়। প্রসঙ্গটা থাক। আমার ঘুম পাচ্ছে। এক কাঁড়ি খাতা ছড়ানো আছে। আর কিছু বলবে তুমি ?

শুভাশিস রিসিভারে গরম নিশ্বাস ফেলল,— আমার কথা শুনতে আজকাল তোমার ক্লান্তি লাগে,

না রানি ?

দূরভাষ নির্বাক।

রিসিভারে শব্দহীন তরঙ্গের অস্তিত্ব বড় শূন্য লাগছিল শুভাশিসের। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি যেন মুহূর্তগুলোকে দীর্ঘায়িত করে দিচ্ছে। স্বর নামিয়ে শুভাশিস শূন্যকে শোনাল,— কাল দেশে যাচ্ছি।

—হঠাৎ ?

—বিকেলে তুফান এসেছিল। বাবা খবর পাঠিয়েছে মা'র কন্ডিশন আবার ডিটোরিয়েট করছে। শুভাশিস দম নিল,— সময় বোধহয় এসে গেল।

—তারপরও তোমরা পার্টিতে গেছ ! খবরটা পেয়েও !

শুভাশিস একটু সময় নিয়ে বলল,— ঘরে বসে থেকেই বা কি করতাম ? দুশ্চিন্তা ? আজ এমনিও কি যাওয়া হত ? হুট করে তো আর চেম্বার বন্ধ করে দেওয়া যায় না। সোম-মঙ্গলবার গোটাপাঁচেক অপারেশনের ডেট দেওয়া আছে, নার্সিংহোমগুলোতে ফোন করে ডেট ডেফার করলাম...

—তুমি একা যাচ্ছ ?

—না। সবাই। কাল ভোরে।

—যাও। ইন্দ্রাণীর স্বর সামান্য কোমল শোনাল,— যত খারাপ ভাবছ, তত খারাপ তো নাও হতে পারে।

ইন্দ্রাণী সান্ত্বনা দিচ্ছে শুভাশিসকে ! হাসি পেয়ে গেল শুভাশিসের। এসব ছেঁদো কথায় কি সান্ত্বনা পায় মানুষ ? আর সান্ত্বনাই বা কিসের ? মা'র মৃত্যু বলতে যে শোকময় দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেরকম কোনও ছবি তার চোখে নেই। মা'র মৃত্যুসম্ভাবনার কথা শুনলে তবেই তো মনে পড়ে, মা বেঁচে আছে ! এরকম একজন না বেঁচে-থাকা মানুষের জীবনে একটা লিখিত পূর্ণচ্ছেদ কি নতুন কোনও মাত্রা যোগ করে দুঃখে ?

শুকনো হেসে শুভাশিস বলল, —নাথিং টু কনসোল রানি। মা'র ডেথ ইজ ওভারডিউ। পরোয়ানা এসে গেছে, মা রিসিভ করতে চাইছে না। দু-এক পল থেমে আবার বলল, — লেটস টক আবাউট দ্য লিভিং। ব্লু হেভেনে আমার বলাই আছে, এখনও তোমার বরকে আমার নাম করে আডমিট করতে পারো।

—ভাবি একটু।

—এখনও দ্বিধা ? শুভাশিস কপালে বুড়ো আঙুল ঠুকল,— দ্বিধা থাকা ভাল রানি। তবে দেখো দ্বিধা যেন কারুর বিপদের কারণ না হয়।

—তুমি বলছ একথা ?

—বলছি। যাই হোক, ভাল থেকো। অ্যান্ড রিমেমবার, নাথিং টু ওরি।

ফোন রেখে শুভাশিস বসে রইল চুপচাপ। দু-হাত ছড়িয়ে দিল সোফার কাঁধে। আরও কি একটা কথা যেন বলার ছিল ইন্দ্রাণীকে ? কি কথা ? কি কথা ? মনে পড়ছে না। অনেক দরকারি কথা আজকাল বড় তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায় মন থেকে। পরে মনে পড়লেও কথাটা আর তেমন দরকারি থাকে না। উদ্বেগের ঘর্ষণে কি ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে স্মৃতি !

অতিকায় ড্রয়িংরুমের অন্য প্রান্তে উৎপল আর উৎপলের বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে ছন্দা। ছন্দা কি লক্ষ করছিল শুভাশিসকে ? বোঝা যাচ্ছে না। ঘরটাতে ইচ্ছাকৃতভাবেই আলো বড় কম। এ ধরনের জমায়েতে আলো বেশি থাকলে মেজাজ আসে না, মৌতাত এসে এসে ফিরে যায়।

বাজনা থেমে গান বাজছে এখন। এলটন জন। কোমল গাঢ় স্বরে আন্দোলিত হচ্ছে কক্ষ, বিষণ্ণতার সুখে ডুবে যাচ্ছে আবদ্ধ পৃথিবী।

শালিনী হই হই করে সামনে এল,— এই শুভাশিস, আর কিছু নাও।

—না গো, ভাল লাগছে না। বুশ শার্টের পকেটে সিগারেট খুঁজল শুভাশিস। প্যান্টের পকেটেও

হাতড়াল। নেই। নিচে গাড়িতে কি প্যাকেটটা পড়ে আছে ? সেটাও মনে পড়ছে না।

শালিনী দেখছিল শুভাশিসকে। বলল, —তুমি আজ এত খামোশ কেন বলো তো ? মাকে নিয়ে ওরিড ?

—না, তেমন কিছু না। যা হওয়ার তা তো হবেই। উপর দিকে আঙুল দেখাল শুভাশিস,—ফেট। ডেসটিনি।

—দেন ? থিংকিং অ্যাবাউট এনি পেশেন্ট ? এত রাতে কোথায় ফোন করছিলে ?

শালিনীর কিছুই নজর এড়ায় না। সবার খাওয়া-দাওয়াও তদারক করছে, কার কখন গ্লাস খালি হচ্ছে তারও। অরূপ ভাগ্য করে একটা বউ পেয়েছে বটে। মারাঠি মেয়ে, দিল্লিতে পড়াশুনো, এখন দিব্যি কলকাতায় গুছিয়ে বাঙালি বরের সংসার সামলাচ্ছে। প্র্যাকটিসও করছে চুটিয়ে। গাইনি হিসেবে কলকাতায় যথেষ্ট নামও হয়ে গেছে শালিনীর। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এই নারীটিকে বেশ পছন্দই করে শুভাশিস। কেবল মহিলার এই প্রশ্ন করার অভ্যাসটিই শুভাশিসের বিলকুল না পসন্দ।

শুভাশিস এড়ানোর ভঙ্গিতে বলল,— ও একটা রুটিন কোয়্যারি করছিলাম। নাথিং সিরিয়াস। কিন্তু ম্যাডাম, আমার যে এখন সিগারেটের স্টক ফিনিশ। দ্যাখো না, তোমার বরের কাছে পাও কিনা।

—তোমরা বাঙালিরা এত স্মোক করো কেন বলো তো ? স্পেশালি বাঙালি পুরুষরা ?

—কারণ আমরা বাঙালিরা জানি পুরুষদের পেটে বাচ্চা হয় না।

শালিনী খিলখিল হেসে উঠল, — ইউ নটি ! বিয়িং এ ডক্টর এটা কিন্তু অমার্জনীয় অপরাধ।

শুভাশিস আরও তরল হওয়ার চেষ্টা করল,— কি অপরাধ বললে ? আরেকবার বলো।

—অমার্জনীয়। আনপারডেনেবল।

—বাহ ! তোমার বাংলার ভোকাবুলারি তো বেশ বেড়ে গেছে ! অরূপ কি রোজ শেখাচ্ছে ? টাইম পায় কখন ?

—নো স্যার। আমি নিজেই শিখে নিই। অরূপ ফরূপ লাগে না। অ্যান্ড ফর ইওর ইনফরমেশান দা ওয়ার্ড ইজ ফ্রম স্যানসক্রিট। শালিনী ভুরু নাচাল,— ডোন্ট সিট আইডল। টেক সামথিং। শিভাস রিগ্যালটা খোলা হল, একটুও নেবে না ?

—নিজে তো খাও না, অন্যকে খাওয়াতে এত উৎসাহ কেন ? মাতাল দেখতে মজা লাগে বুঝি ?

—মন্দ লাগে না। দ্বিতীয় ব্যোমশেলটা ছুঁড়ল শালিনী,— টলটলায়মান পুরুষ আমার বহুৎ ফানি লাগে।

—টলটলায়মান ! এটাও কি সংস্কৃত থেকে ?

—ঢেঙা। শালিনী দু-হাতের বুড়ো আঙুল নাচাল, —একটু কাবাব নেবে ? প্রচুর পড়ে আছে এখনও। লিকুইড পেলে কেউই সলিড টাচ করতে চায় না !

—ট্যানজিবল সলিড হলে চাইবে না কেন ? বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে একটু নিয়মমাফিক মাপা আদিরসাত্মক রসিকতা করল শুভাশিস, ছদ্ম উৎসাহে বলল,— যেমন ধরো তুমি। তোমার বাহুবল্লরী আমাকে আলিঙ্গন করলে, অথবা তোমার ওষ্ঠ আমার অধর স্পর্শ করলে, অথবা তোমার...

—দাঁড়াও। আমি ছন্দাকে বলছি। শুভাশিসের কাঁধে আলগা চাপড় মেরে শালিনী হাওয়া হয়ে গেল।

ছন্দা নয়, অরূপকে পাঠিয়েছে শালিনী। সঙ্গে শিবাজি। অরূপের বন্ধু। কবি হিসেবে শিবাজির মোটামুটি পরিচিতি আছে কলকাতায়। মেডিকেল কলেজে পড়তে অরূপের খুব কবিতার নেশা ছিল, তিন বন্ধু মিলে লিটিল ম্যাগাজিনও বার করত একটা। আকাশ। তা সেই আকাশ কবেই উবে গেছে, কিন্তু তার সুবাদে কিছু কবিবন্ধু রয়ে গেছে অরূপের। শিবাজির আবার অন্য পরিচয়ও আছে। সে এক নামজাদা পেন্ট কোম্পানির উঁচুতলার অফিসার।

অরূপের থেকে নিয়ে বিলিতি সিগারেট ধরাল শুভাশিস। জোরে জোরে টানল কয়েকবার, চোখ

বন্ধ করে বসে রইল। আহ! চাপ চাপ ধোঁয়া ঢুকছে মাথায়। উজ্জীবিত হচ্ছে মস্তিষ্কের কোষ।

চোখ খুলে শুভাশিস ঘড়ি দেখল,— এবার তো উঠতে হয় রে।

ঘরময় সোফা টেবিল ছড়ানো। অরূপ সোফায় বসে টেবিলে পা তুলে দিল,— আরে বোস, তাড়া কিসের? কাল তো রোববার!

—বাহ, বললাম না কাল দেশে যাচ্ছি। ভোর ভোর বেরোতে হবে। রোদ্দুরে ড্রাইভ করতে কষ্ট হয় রে।

অরূপ থমকে গেল,— ঠিক আছে, আরেকটু বোস। গেলেই তো চলে যাবি। আজকাল তো আমাদের আর আড্ডাই মারা হয় না।

—আজ অনেক হয়েছে। রাত কত হল খেয়াল আছে?

অফিসার কবি একটু তফাতে ছোট সোফায় বসেছে। নেশাচ্ছন্ন চোখে ঘোষণা করল,— রাত কত হল? উত্তর মেলে না।

শুভাশিস আড়ে দেখে নিল কবিকে, তারপর অরূপকে বলল,— সারারাত যদি আমরাই বসে থাকি তাহলে তোর আর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি করে কি লাভ? খাট-ফাট সাজিয়েছিস ফুল দিয়ে? জানিস তো বিয়ের বারো বছর পর নতুন করে ফুলশয্যা করতে হয়?

—হাঃ! ফুলশয্যা! আমার বউ এখন বিছানায় পড়বে আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। আমাদের শালা বিয়েতেই ফুলশয্যা হল না, এখন বুড়ো বয়সে পুষ্পচয়ন!

—কেন? ফুলশয্যা হয়নি কেন? কবি অফিসার ঢক করে পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে দিল,— তোমরা কি দিল্লিতে লিভ টুগেদার করতে নাকি?

—না রে ভাই, আমার অত বুকের পাটা নেই। তাছাড়া আমার মনে হয় বিয়ে না করা মেয়েমানুষের সঙ্গে শুলে গা দিয়ে কেমন আঁশটে গন্ধ বেরোবে।

—আঁশটে গন্ধ! হোয়াই আঁশটে গন্ধ?

—ব্যাপারটা খুব ফিশি তো, তাই।

কথাটা বেশ মনে ধরল শিবাজির। খালি গ্লাস চেটোর উল্টো পিঠে রেখে ব্যালান্স করছে,— গন্ধটা পেয়েছেন আপনি কোনওদিন?

—ছি। আজকে কোনও পাপ আলোচনা করতে নেই। আজ বড় পুণ্যের দিন। অরূপের কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল।

—কেন? পুণ্যের দিন কেন? কবি-মাতালেরও চোখ পিটপিট, তুমি আজকের দিনে একজন মহিলার ফিজিক্যাল জুরিসডিকশানে এনক্রোওচ করেছিলে বলে?

প্রলাপগুলো কানে আসছিল শুভাশিসের, কিন্তু সে কিছু শুনছিল না। শুনতে চাইছিলও না। কানের ভেতর দিয়ে শব্দরাজি ঢুকলেও বধিরত্বের আকাঙ্ক্ষায় মস্তিষ্কের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল সে। দরজা ভেদ করে তবু দু-একটা শব্দের কুচি অগ্নিময় অঙ্গার হয়ে বিঁধছে। পোড়াচ্ছে।

শুভাশিস উঠে দাঁড়াল। একটু তাজা হাওয়া চাই।

—কি রে, কী হল?

—নাহ, একটু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ঘরটা কেমন স্টাফি হয়ে গেছে।

ড্রয়িং হল সংলগ্ন অরূপদের ব্যালকনিটাও বেশ প্রকাণ্ড। শোভিত। পুরোটা গ্রিলে মোড়া। মাঝখানে বেতের দোলনা স্টিল চেনে ঝুলছে। গ্রিলে ঝুলন্ত কিছু কারুকাজ করা রঙিন টব, বারান্দা ঘিরে টবে টবে উদ্যানের সমারোহ। বেলফুল, মল্লিকা, পাতাবাহার। আলোমাখা অন্ধকারে শুভাশিস বেলফুলের গন্ধ পাচ্ছিল। বেতের দোলনায় বসে সাততলা থেকে দেখছিল নীচের পৃথিবী। কোন অতলে লিলিপুট লাইটপোস্টগুলো নতমস্তকে আলো ফেলছে রাস্তায়। সুনসান রাস্তা বেয়ে একটা গাড়ি ছুটে গেল। বোধহয় জিপ। পুলিশের।

অরূপ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন, হাতে পানীয়ের গ্লাস। সেও জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে।

শুভাশিস আনমনে বলল,— তোদের ফ্ল্যাটটা কিন্তু দারুণ। মাটির পৃথিবী কত শান্ত লাগে না এখান থেকে ?

—হুঁ, ধুলো-মশা নেই, ঝুটঝামেলা নেই। শালুর জেদেই কেনা হল, এখন দেখছি ইনভেস্টমেন্টটা খারাপ হয়নি।

—শালিনীর জেদ বলছিস কেন ? তোর এদিকটা ভাল লাগে না ?

—সত্যি বলব ? প্রথম প্রথম ভাল লাগত না। নর্থের ছেলে, ভেবেছিলাম ওদিকেই থাকব। বড়জোর সল্টলেক ফল্টলেক। বাবা-মা'র কাছাকাছিও থাকা হত ! পিপিটাও গোড়ার দিকে খুব মনমরা ছিল। স্কুল থেকে ফিরে সারাক্ষণ একা একা থাকা... মেড সারভেন্টসদের কাছে... এখন অবশ্য ফ্ল্যাটে অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। আমিও ভাল আছি। বেশ নিরবলম্ব শূন্যে বিরাজ করছি।

—তোর মেয়ের কোন ক্লাস হল রে ?

—ফাইভে উঠল। অরূপ নেশাচোখে হাসল,— তোর ছেলে তো এবার মাধ্যমিক দিল, তাই না ?

—হুঁ, আমি অনেক এগিয়ে আছি।

—তোর শালা আর্লি ম্যারেজ, ওখানেই তুই হ্যান্ডিক্যাপ নিয়ে নিয়েছিস।

ভেতরে এক তুমুল হাসির রোল উঠেছে। মহিলারা হেসে কুটিপাটি। নীপা ঢলে ঢলে পড়ছে ছন্দার পিঠে। ছন্দা শালিনীর পিঠে গুম গুম কিল মারছে।

অরূপ মুখ বাড়াল,— ব্যাপার কী, অ্যাঁ ? রাতদুপুরে ঘরে শেয়াল ডাকে কেন ?

—দেখুন না অরূপদা, আপনার বউটা... ছন্দা হাসির তোড়ে আর এগোতে পারল না।

নীপারও ঘোরলাগা চোখে হাসির বুদবুদ,— ইশশ, শালুটা কি অসভ্য অসভ্য জোকস শোনাচ্ছে !

— কী জোকস ? আমরাও একটু শুনি।

—শুনবেন ? একটা মেয়ে না একদিন স্নান করতে গেছে...

—অ্যাই নীপা, কী হচ্ছে কি ? এগুলো সব ফিমেল জোকস না ? দরকার হলে শালু নিজে বরকে শোনাক, আমরা কেন ?

নীপা ঢলে পড়ছে,— কেন ? বললে কী হয়েছে ? বলি না।

ইত্যকার কথোপকথনের মধ্যে অরূপ উৎসাহ হারিয়েছে রসিকতা শোনার। শুভাশিসকে বলল,— তুই তখন ভাস্করের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিস তো ?

বিব বিব সিগনাল পাঠাচ্ছে মগজ। অরূপ এবার কাজের কথায় আসবে ! আড্ডা তো স্রেফ বাহানা ! এসব পার্টিতে কে আর নিছক আড্ডা চায় ! শুভাশিস অল্প খেলল,— কি ব্যাপারে বল তো ?

—নার্সিংহোমের ব্যাপারে। আর দেরি করে কী লাভ ? বেয়াল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল, আর কবে শুরু করব ?

—কর না। আমি তো আছিই সঙ্গে। শুভাশিস মনোযোগী কিন্তু ভঙ্গিটা উদাস,— বাট ভাস্করের ওপরে বেশি ডিপেন্ড করিস না।

—কেন ? হি ইজ আ রিয়েল বুল। অসুরের মতো খাটতে পারে। সব হসপিটালের সঙ্গে ওর চেন আছে। আমরা ওকে ইউটিলাইজ করতে পারব। আর এটা তো মানবি, ভাস্কর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজটা ভাল বোঝে ?

—ওটা কোনও ব্যাপার নয়, এনি লেম্যান ক্যান ডু ইট। তাছাড়া আমরা অ্যাকাউন্টস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে প্রফেশনাল লোক লাগাব। পাকা মাথা। তারাই ট্যাক্স ফ্যাক্স ঝুটঝামেলা যা আছে সামলাবে। ভাস্করকে নিয়ে কি প্রবলেম জানিস ? ওর নেচারটাই খারাপ হয়ে গেছে। খালি অন্যের কেস খাওয়ার টেন্ডেন্সি ! ওকে ঠিক রিলাই করা যায় না।

অরূপের চটকা ভেঙে গেছে— ও থাকলে তুই থাকবি না ?

—ওর না থাকাটাই প্রেফার করব। বাঘ ফেউ নিয়ে ঘোরা পছন্দ করে না। তাছাড়া হোয়াই ভাস্কর ? নিজেরা নার্সিংহোম করলে আমরা তিনজনই কি যথেষ্ট নয় ? তুই পেডিয়াট্রিকস, শালিনী গাইনি আর আমি সার্জারি।

—তাহলে ভাস্করকে অফই করে দিই, কী বল ? অরূপের পাকস্থলী থেকে অ্যালকোহল যেন উবে গেছে, ব্যবসায়িক স্বরে বলল,— তাহলে এস্টিমেটটা শুরু করে ফেলি ?

গভীর বৈষয়িক আলোচনায় ডুবে গিয়ে দুই বন্ধুর হুঁশ নেই আর, চেতনা ফিরল ছন্দার ডাকে,— ফিরবে না ? একটা বাজে কিন্তু। সকালে উঠে আবার গোছগাছ আছে।

—এই যাই। এখনই। বলে আবার ডুবে গেল শুভাশিস। একটা নতুন কিছু গড়তে গেলে কতরকম প্যাঁচপয়জার করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করতে ভারি ভাল লাগছিল তার। তবে বেশিক্ষণ সে সুযোগ হল না, ছন্দা এসে হিড়হিড় করে টানছে তাকে। অরূপের ফ্ল্যাট এখন পুরো ফাঁকা।

পথ জনহীন। পাশে নির্বাক ছন্দা। সোঁ সোঁ ছুটছে শুভাশিসের সাদা মারুতি। রক্তলাল ক্রসচিহ্ন নিয়ে। নিঃসাড়ে। ছন্দা এত চুপ কেন আজ ? নেশা হলে ছন্দা বেশি বকে। অবিরল পরচর্চা করে যায়। উত্তরের তোয়াক্কা না করেই ভেঙে পড়ে হাসিতে। আজও তো বেশ টানছিল ! তবে !

পাশে বাক্যহীন প্রতিমা বসিয়ে গাড়ি চালাতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল শুভাশিসের। সে কি এখন গাড়ির যন্ত্রাংশ ? ক্লাচ ব্রেক স্টিয়ারিং এরকম কিছু একটা ?

সাঁই করে দুর্গাপুর ব্রিজ পেরিয়ে শুভাশিস আর চুপ থাকতে পারল না। আলগাভাবে বলল,— তখন কী জোকস শোনাচ্ছিল শালিনী ?

ছন্দার সিটে হেলানো মাথা একদিকে কাত। দখিনা বাতাসে তার চোখের পাতা যেন লক্ষ টন পাথরের মতো ওজনদার। বন্ধ চোখে ঠোঁট নাড়ল ছন্দা,— তুমি শুনে কী করবে !

শুভাশিস আরেক বার আড়চোখে দেখল বউকে,— বলবে না ?

গাড়ি চেতলা ব্রিজে উঠল। বাতাস বাড়ছে। আরও বাড়ছে। ছন্দা নিথর।

হাওয়াটা বেশ লাগছিল শুভাশিসের। অ্যালকোহল আর হাওয়া যেন রাজযোটক। চিন্তাভাবনা থিতিয়ে আসে। উদ্বেগ সরে যায়। এই কি সুখ ?

শুভাশিস ঠাট্টা করল,— ক' পেগ খেয়েছ আজ ?

—যতই খাই, তোমার কী !

সাদার্ন মার্কেটের গায়ে শুভাশিসের ফ্ল্যাট। রাসবিহারীর মোড়ে এসে শুভাশিস গাড়ি ঘোরাল,— হঠাৎ মুড অফ কেন ? বেশ তো ছিলে এতক্ষণ !

অকস্মাৎ ছন্দার গলা ভারী,— তুমি তখন কাকে ফোন করছিলে ? অত রাত্তিরে ?

—কই ? কখন ! না তো !

যাহ বাবা ! না চাইতেই কেন মিথ্যে বেরিয়ে এল মুখ থেকে ? অপাঙ্গে ছন্দাকে দেখল শুভাশিস। ছন্দার চোখ খুলে গেছে। একটা ফুটপাতের ছেলে ফাঁকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে, তাকে সামলে শুভাশিস এগোল। সাবধানী স্বরে বলল,— ও হ্যাঁ, একটা ফোন করেছিলাম বটে। সানশাইনে পরশু একটা অপারেশান করেছিলাম, কেসটার কিছু পোস্ট অপারেশনাল কমপ্লিকেশান হচ্ছে তাই নিয়ে... ছন্দা দুম করে বলল,— ইন্দ্রাণীর বরের আজ হসপিটাল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা না ?

শুভাশিসের সতর্ক চোখ উইন্ডস্ক্রিনে স্থির,— আজই তো ডিসচার্জ হওয়ার কথা।

—তুমি খোঁজ নিলে না ?

শালা আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে তো ! প্রশ্ন করছে না, যেন টিপে টিপে পরীক্ষা করছে। ধুস, গোড়াতেই সত্যি বলে দিলে হত। শুভাশিস চাল ঘোরাল,— ভেবেছিলাম চেম্বার থেকে বেরোবার

আগে খবরটা নেব... চেম্বারেও এত ভিড় ছিল... ! মা-র ব্যাপারটা নিয়েও মনটা এমন ডিসটার্বড হয়ে আছে।

ছন্দা যেন টুক টুক করে দাবার বোর্ডে বোড়ে এগোচ্ছে,— অরূপদার বাড়ি থেকে একটা ফোন করতে পারতে !

—দেখলে না রাতদুপুর অবধি কী গ্যাঞ্জামটা ছিল ওখানে ? শুভাশিস পাল্টা চালে নৌকো বাঁচানোর চেষ্টা করল,— তারপর কি কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোন করা যায় ?

নৌকো বোধহয় বাঁচল না, ছন্দা মুখ বেঁকাল,— তাও তো বটে।

মরিয়া হয়ে শেষ চাল দিল শুভাশিস,— তুমিও তো ফোন করে একটা খোঁজ নিতে পারতে।

—আমার অত সময় নেই।

খেলা মুলতুবি হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে ঝটিতি পোশাক বদলে নাইটিতে ঢুকে পড়ল ছন্দা, ছেলের ঘরের দরজা ঠেলে একবার দেখে নিল ছেলেকে। ঘুমোচ্ছে। শুভাশিস যখন বাথরুম থেকে স্নান সেরে বেরোল তখন ছন্দা শুয়ে পড়েছে নিজের খাটে।

শুভাশিস খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিল। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া অ্যান্টিরুমে ঢাউস আলমারি, আলমারির মাথা থেকে স্যুটকেস পাড়ল। প্রায়ই তাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয়। সেমিনারে। কনফারেন্সে। দিল্লি। বোম্বে। ম্যাড্রাস। বাইরে কোথাও যাওয়ার আগে নিজের জিনিসপত্র নিজের হাতে গোছায় শুভাশিস। সেই কৈশোর থেকেই। কে আর কবে তাকে গুছিয়ে দিয়েছে ! মা ? সে তো থেকেও নেই। বউ ? সে তো নিজেরটুকু ছাড়া আর ছেলেরটুকু ছাড়া কিছুই বোঝে না পৃথিবীতে। টাকা ছাপানোর মেশিনকে বিয়ে করেছে ছন্দা, মেশিনটা তার কাছে মেশিনই। মাঝেমধ্যে মোবিল গ্রিজ দেয়, এই না কত ! তার কাছে শুভাশিসের কোনও প্রত্যাশা নেই।

যত্ন করে স্যুটকেসটা মুছল শুভাশিস। নভেম্বরে একবার বম্বে গিয়েছিল, তারপর আর যাওয়া হয়নি কোথাও, বেশ ধুলো জমেছে খাঁজখোঁজে। সময় নিয়ে খুব যত্ন করে পরিষ্কার করল বাক্সটা।

ওয়াড্রোব খুলে শুভাশিস মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। হ্যাঙারে সার সার স্যুট ঝুলছে। খাসির মাংসর মতো। প্রতি শীতে নিয়ম করে একটা-দুটো করে বানানো হয়, পরা হয় না। জমে যায়। ভরে যায় ওয়াড্রোব। পুলওভার আর বুশ শার্টেই কেটে যায় শুভাশিসের হিমঋতু। বাইরে শার্ট-ট্রাউজারস, বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি, এতেই শুভাশিস ভারি স্বচ্ছন্দ থাকে।

শুভাশিস দু সেট করে পাজামা-পাঞ্জাবি আর শার্ট-ট্রাউজারস চালান করল স্যুটকেসে। স্টিল আলমারির লকার থেকে টাকা বার করল কিছু। থাক, কোথায় কি লাগে না লাগে, হাজার দশেকই সঙ্গে থাক। টর্চ আর ক্যালকুলেটারও নিয়ে নিল। যদি সময় সুযোগ পাওয়া যায় মাধবপুরে বসে নার্সিংহোমের একটা রাফ এস্টিমেট করবে। অরূপের সঙ্গে ভাল করে বসার আগে নিজের একটা স্কেচ মাথায় থাকা দরকার। তবে মাধবপুরে গিয়ে এবার সময় পাওয়া যাবে কি ! কে জানে কি অবস্থা ওখানকার ! যত সকালে পারা যায় কাল বেরিয়ে পড়তে হবে।

বেরোতে বেরোতে পরদিন অবশ্য খানিকটা বেলাই হয়ে গেল। এখান থেকে এটুকু যাবে, ছন্দার গোছগাছ শেষই হতে চায় না। ঠিক মতো ব্রেকফাস্ট হল না বলে একগাদা স্ন্যাকস সঙ্গে নিল। ক'দিনের জন্য যাচ্ছে তার ঠিক নেই স্যুটকেস ভর্তি করে শাড়ি নিয়েছে। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নাইটি হাউসকোট পরে না বলে সুতির শাড়ি নিল গোটা ছয়েক। দামি শাড়ি দু-তিনখানা। নেব না নেব না করে টুকটাক কসমেটিকসও নিল কিছু। শেষ মুহূর্তে ম্যাজেন্টা রঙের ব্লাউজ খুঁজে পেল না বলে দুটো শাড়ি বার করে রাখল, তার বদলে আর দুটো বাছতে নষ্ট করল আরও খানিক সময়। ঠাণ্ডা জল ভর্তি ওয়াটার কনটেনার, চা ভর্তি ফ্লাস্ক আর গাদা খানেক স্ন্যাকসের প্যাকেট নিয়ে সে যখন গাড়িতে উঠল, তখন সূর্য বেশ কটমট করে তাকাচ্ছে।

টোটো বহুক্ষণ আগে নিজের কিটসব্যাগ গুছিয়ে নিয়েছে, গাড়িতে বসে অধৈর্য হাতে হর্ন বাজাচ্ছে

বার বার। তার পরনে ফিকে নীল জিনস আর ষাঁড় খ্যাপানো লাল টিশার্ট। শুভাশিস গাড়ি স্টার্ট করতেই সে ছন্দাকে খোঁচাল,—আমরা কত দূরে যাচ্ছি মা ?

ছন্দা ভ্রূকুটি করল,—কেন, তুই জানিস না ?

—মাধবপুরের ডিসট্যান্স ঠিক কতটা মা ?

ছন্দা ফিক করে হাসল,—পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার হবে।

—তাই বলো। আমি ভাবলাম মাধবপুর বোধহয় ম্যাপ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে! হুগলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে সেই কাশ্মীর পাঞ্জাবের কাছাকাছি!

ছন্দা বলল,—ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে ?

শুভাশিস গাড়ির রেয়ারভিউতে ছেলেকে দেখছিল। মাধ্যমিক দিয়েই টোটো যেন ক'দিনে হঠাৎ বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। মাথায় অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে শুভাশিসকে, এখনই প্রায় পাঁচ নয়। নরম কালচে ঘাসে ভরে গেছে তার মুখ। পেশিতে কাঠিন্য আসছে। কণ্ঠস্বরেও। কী গম্ভীর ভঙ্গিতে খ্যাপাচ্ছে মাকে!

টোটো বলল,—মা, কটা বেডকভার সঙ্গে নিয়েছ তো ?

ছন্দার মুখ থেকে কাল রাতের বিষাদ মুছে গেছে, তার মুখ এখন ঝকঝকে আকাশটার মতো হাস্যময়। ঠোঁট টিপে বলল,—নিয়েছি।

—টুথপিক ?

—তাও নিয়েছি।

—তাহলে এখন মাধবপুর না গিয়ে যদি জঙ্গলেও যাই কোনও প্রবলেম হবে না, কী বলো ?

—এবার কিন্তু মারব টোটো। নীল প্রিন্টেড বাঙ্গালোর সিল্কের আঁচল কাঁধে গুছিয়ে পিছনের সিটের দিকে ঘাড় ঘোরাল ছন্দা,—হ্যাঁ রে, আমি কি সব নিজের জন্য নিই ? তোদের জিনিস তোদেরই কাজে লাগে। সেই সে সেবার মুসৌরি বেড়াতে যাওয়ার সময়ে আমি যখন সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কেট নিচ্ছিলাম, তোরা হেসে কুটিপাটি হলি, মনে আছে ? হোটেলে কি ব্ল্যাঙ্কেট দেয় না মা! কেন ফালতু লাগেজ বাড়াচ্ছ! তোর বাবা তো আমাকে বলল লাগেজ ম্যানিয়াক। শেষপর্যন্ত কাজে লাগেনি ? ট্রেনের এসিতে যখন দুজনে রাত্তিরে কাঁপছিলি, তখন কী হয়েছিল ? কারা গায়ে দিয়েছিল ব্ল্যাঙ্কেট ?

টোটো তবু খ্যাপাচ্ছে,—তোমার তো হেভি মেমারি মা। পাঁচ বছর আগের কথা এখনও ভোলোনি! রিয়েলি ইউ আর গ্রেট মম!

—আমি কিছুই ভুলি না। ছন্দা সুযোগ পেয়ে একটু কটাক্ষ করে নিল শুভাশিসকে,—চিপসের প্যাকেটটা খোল এবার।

মা-ছেলেতে লঘু মেজাজে কথা বলে চলেছে, যেন কোনও আনন্দভ্রমণে চলেছে দুজনে! শুভাশিস একটাও কথা বলছিল না। তার মা'র সঙ্গে তার বউ ছেলের মানসিক সংযোগ প্রায় নেই বললেই হয়। থাকার কথাও নয়। বিয়ের পর প্রথম দুটো বছর ছন্দা যখন বাবা-মা'র সঙ্গে ছিল, একটু-আধটু সেবা করেছিল বিকৃতমস্তিষ্ক শাশুড়ির। কাছে যেতে ভয় পেত খুব, তবুও। তাও তখন মা অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। এখনও ছন্দা যায়, কাছে গিয়ে একটু বসে ভয়ে ভয়ে। টোটো তো ঠাকুমার ধার মাড়ায় না। কোনও দিনই না। ওদের যে মা'র জন্য তেমন মানসিক উদ্বেগ আসবে না, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু শুভাশিসেরও কি আসছে ? তেমনভাবে ? তারও কি কোনও দিন একটুও নিকট সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল মা'র সঙ্গে ? কারুর সঙ্গেই কি তার তেমন মানসিক সম্পর্ক আছে ? এই পৃথিবীতে ?

ভাবনাটা আসতেই চকিতে কাল ফোনে ইন্দ্রাণীকে না বলা কথাটা মনে পড়ে গেল শুভাশিসের। তিতির। কাল ফোনে তিতিরের কথাই জিজ্ঞাসা করবে ভাবছিল। গত সপ্তাহে সর্দিজ্বর হয়েছিল মেয়েটার, সেদিন খুব কাশছিল হাসপাতালে। আদিত্যকে দেখতে গিয়ে। মেয়েটার কাশি কমল কি

না কে জানে !

আশ্চর্য ! কথাটা কেন এখনই মনে পড়ল শুভাশিসের !

৪

শিবসুন্দর বললেন,—কী মনে হচ্ছে তোমার ?

পলকহীন চোখে মনোরমাকে দেখছিল শুভাশিস। কী বিশীর্ণ চেহারা হয়েছে মা-র ! অশীতিপর বৃদ্ধার মতো হাত-পায়ের চামড়া শিথিল ! খসখসে ! ফাটাফাটা ! কপালে গালে অসংখ্য বলিরেখা। গলা কুঁচকে ঝুলে পড়েছে ! মাথার প্রতিটি চুল সাদা ! মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে তার মা এখন এক লোলচর্ম বৃদ্ধা ! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন ঘুরন্ত পাখাটার দিকে। পিঙ্গল চোখের মণি সম্পূর্ণ বোধহীন। ডিসেম্বরে কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিল শুভাশিস, সেদিনও মাকে তার এত জরতী লাগেনি।

শিবসুন্দর আবার প্রশ্ন করলেন,—কী বুঝছ ?

শুভাশিস বিড়বিড় করে বলল,—অ্যালজাইমার।

—সে তো হয়েছেই। ব্রেন সেল শুকিয়ে আসছে।

—খুব র‍্যাপিড বাড়ছে, তাই না ? একটা সি.টি. স্ক্যান করাবে ? স্টেজটা ক্লিয়ার বোঝা যেত।

—আর নাড়াঘাটা করে কী লাভ ! শিবসুন্দর যেন একটু দূরমনস্ক,—স্ক্যান করে তো আর ব্রেনের চেহারা বদলানো যাবে না !

মনোরমার মাথার কাছে অলকা দাঁড়িয়ে। অলকা তুফানের বউ, এই সংসারযন্ত্রটাকে সেই এখন চালায়। রান্নাবান্না, ঘরদোর সামলানো, আর শিবসুন্দরের দেখাশুনা করা ছাড়াও মনোরমার সেবাশুশ্রূষার বড় একটা ভার এখন তার ওপর বর্তেছে।

অলকা বলে উঠল,—বৃহস্পতিবার থেকে মা কিছু মুখে তুলতে চাইছিলেন না। খাওয়াতে গেলে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিচ্ছিলেন।

শিবসুন্দর জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, জানলার বাইরে চোখ ফেলে বললেন,—তার পরই সুগারটা সাডেনলি ফল করল। আবার হাইপোগ্লাইসিমিয়ার অ্যাটাক। সুগার কাউন্ট পঞ্চাশে নেমে গেছিল।

শুভাশিস মনোরমার দিক থেকে চোখ সরাল না,—এবার কদ্দিনের ইন্টারভ্যালে হল ?

—তা ধরো প্রায় চার মাস। পরশু গ্লুকোজ ইঞ্জেকশান দিলাম, গতবারের মতো তাড়াতাড়ি রেসপন্ড করছিল না। সেকেন্ড দিন ইঞ্জেকশানের পর থেকে রেসপন্স বেটার এল।

—আজ সুগার কাউন্ট দেখেছ ?

—সকালে দেখেছিলাম। বাড়ছে। সত্তর মতন উঠেছে। অ্যান্ড দি গুড থিং ইজ, ফ্লাকচুয়েট করছে না। মনে হচ্ছে কন্ডিশনটা স্টেডি হয়ে গেল।

শিবসুন্দর পুরনো আমলের ডাক্তার হলেও তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট আধুনিক, শুভাশিস জানে। বাবার ডায়োগনিসিসেও বড় একটা ভুল হতে দেখিনি সে। এখনও বাবা নিয়মিত মেডিকেল জার্নাল উল্টোয়, বেশ কয়েকটা বিদেশি পত্রপত্রিকাও আসে এই গ্রামের বাড়িতে। সেই বাবা যখন বলছে অবস্থা স্টেডি, তখন নিশ্চয়ই স্টেডি।

আসার পথে কোত্থেকে যেন এক টুকরো বাতাস জমাট বেঁধেছিল বুকে, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে বাতাসটা।

ইন্দ্রাণীর কথাই ফলে গেল !

শুভাশিসের ঠিক ভাল লাগছিল না। মা এবারেও মুক্তি পেল না। বাবা যে কী অদ্ভুত ক্ষ্যাপাটে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ! বিয়াল্লিশ বছর ধরে !

তুফান নিচের উঠোন থেকে ডাকছে,—শুভদা, বৌদি, বাথরুমে জল দেওয়া হয়েছে, তোমরা চান করবে তো করে নিতে পারো। এই টোটো, তুই যাবি নাকি আমার সঙ্গে? পুকুরে?

ছন্দা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে শাশুড়িকে, টোটো দরজায় নিশ্চল।

তুফানের ডাকে সামান্য ইতস্তত করল টোটো। দোতলার বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকল,—পুকুরে যাব? আগের বারের মতো গায়ে র‍্যাশ-ট্যাশ বেরোবে না তো?

—কিচ্ছু হবে না, চলে আয়। ফাল্গুন মাসে পুকুর পরিষ্কার করা হয়েছে, পানা টানা কিচ্ছুটি নেই।

পুকুরটা পিছনে। পাড় ঘেঁষে একটুখানি সবজি বাগান, অলকার তৈরি। সামনে কিছুটা কাঁচা মাটির উঠোন, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার ওপারে প্রকাণ্ড এক আমগাছ। মাঝখানে শিবসুন্দরের পাকা দোতলা বাড়ি। দোতলায় তিনটি ঘর। একতলাতেও। আগে তুফান ওপরে শিবসুন্দরের কাছাকাছি থাকত, এখন বউবাচ্চা নিয়ে নেমে গেছে নীচে, চেম্বারের পাশের ঘর দুটোতে। ইদানীং শিবসুন্দর স্ত্রী নিয়ে ওপরে একা থাকাই পছন্দ করেন। দোতলা থেকে নামেনও না খুব একটা। চেম্বার, রুগী অথবা বিশেষ কোথাও যাওয়া ছাড়া। শুভাশিসরা এলে তাদের জন্য দোতলার কোণের দিকের অর্ধবৃত্তাকার বড় ঘর খুলে দেওয়া হয়। ঘরটা রোজই ঝাড়পোঁছ হয়, ধুলো ময়লার চিহ্নটুকুও থাকে না কোথাও। শুভাশিসরা এক আধদিনের জন্য এলেও। শিবসুন্দর আধুনিকমনস্ক মানুষ, দোতলাতেও দুখানা বাথরুম পায়খানার ব্যবস্থা রেখেছেন। বাথরুম দুটোও তকতকে থাকে সবসময়।

শুভাশিসের মাঝে মাঝে ভারি আশ্চর্য লাগে। কার জন্য এই বয়সে গৃহ সাজিয়ে বসে আছে বাবা? কিসের প্রত্যাশায়? শুভাশিসরা এ গ্রামে এসে কি থাকবে কোনওদিন? অসম্ভব।

বাবাও যে শেষজীবনে এখানে এসে থাকবে, এটাই কি ভাবা গিয়েছিল? শুভাশিস জানে বাবার প্ল্যান ছিল শেষ চাকরিস্থলে বাড়ি বানিয়ে থেকে যাওয়ার। সেই মতোই এগোচ্ছিল সব কিছু। রিটায়ারমেন্টের ঠিক আগে, বারাসত হাসপাতালে পোস্টেড যখন, বাবা আমডাঙায় একটা জমিও পছন্দ করেছিল। কাঠা দশেক। স্কোয়ার টাইপের। একেবারে বাস-রাস্তার ধারে। শেষ পর্যন্ত কেনা হল না। বাবার হাতে টাকাপয়সা বেশি ছিল না, দেশের জমি বাড়ি বেচতে এসেছিল, দেশ থেকে ফিরে গিয়েই মত বদলাল। বলল, আমডাঙাতেই যদি থাকতে পারি, তো মাধবপুর নয় কেন?

যে কথা, সেই কাজ। রিটায়ার করেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে সোজা মাধবপুর। ঠাকুর্দা মারা যাওয়ার প্রায় বাইশ বছর পর পাকাপাকিভাবে এ বাড়ির তালা খুলল। ঝড়ের গতিতে দোতলা উঠে গেল। একটু একটু করে বাবার শিকড় গজিয়ে গেল এখানে। মাত্র দশ বছরে। বাড়ির এতদিনকার পাহারাদার জ্ঞাতিস্বজনরা খুশি। মাধবপুরের মানুষজনও খুশি। গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার এসেছেন। কথায় কথায় আর তাদের রামনগর ছুটতে হবে না।

প্রথম দিকে বাবার এই মাধবপুরে আসাটা শুভাশিসের একদম পছন্দ ছিল না। অনেক বার বলেছিল, রিটায়ারমেন্টের পর তোমরা আমার কাছে এসে থাকো। বাবা রাজি হয়নি। কলকাতার ওপর বাবার তীব্র বিতৃষ্ণা। বোধহয় কিছুতেই ভুলতে পারে না, ওই শহর বাবার স্ত্রীকে চিরজীবনের মতো অসুস্থ করে দিয়েছে।

শুভাশিস বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চৈত্রের রোদ্দুর ঝাঁপাচ্ছে উঠোনে। শুকনো বাতাসে দোল খাচ্ছে ঝাঁকড়া গাছের গোছা গোছা কচি আম। হালকা গরম ভাপ উঠছে মাটি থেকে। বেড়ার ধারের টিউবওয়েল পাম্প করে খাওয়ার জল তুলছে অলকা। ছন্দা বাথরুমে।

শিবসুন্দরও বারান্দায় এলেন,—তোর কাছে সিগারেট আছে?

—আছে। শুভাশিস প্যাকেট লাইটার বাড়িয়ে দিল। মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে থাকার সময় থেকেই সিগারেট ধরেছে শুভাশিস। ছুটিছাটাতে বাড়ি এলে প্রথম প্রথম লুকিয়ে লুকিয়ে

টানত।

হঠাৎই একদিন শিবসুন্দর ধরলেন ছেলেকে,—কবে থেকে হল অভ্যেসটা ?

শুভাশিস আমতা আমতা করেছিল,—মানে আমি ...

শিবসুন্দর হেসেছিলেন,—আমিও মেডিকেল কলেজে ঢুকে ধরেছিলাম। ডেলি কটা খাও ?

শুভাশিস মাথা নিচু করেছিল,—তেমন একটা খাই না।

—দাঁতে নিকোটিনের ছোপ পড়ে গেছে যে ! শিবসুন্দর হাসছিলেন, —অভ্যেসটা না করলেই ভাল করতে হে। আমি ধরে পস্তাচ্ছি। এনিওয়ে, লুকিয়ে খেয়ো না, তাতে লাঙসের সঙ্গে ব্রেনটাও অ্যাফেক্টেড হয়।

শুভাশিস অবাক,—ব্রেন অ্যাফেক্ট করবে কেন ?

—এসব ছোটখাট ব্যাপার আনডিউলি গোপন করার চেষ্টা করলে মনে একটা পাপবোধ জাগে। মস্তিষ্কের পক্ষে সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। অ্যান্ড ইউ নো, আ ডক্টর মাস্ট অলওয়েজ হ্যাভ এ ক্লিয়ার কনসেন্স। বড়দের সম্মান অসম্মান সিগারেটের ধোঁয়ার ওপর ডিপেন্ড করে না। সম্মানবোধ হৃদয় থেকে আসে। তুমি আমার সামনেই খেয়ো।

হায় রে ! হৃদয় কি কখনও বিবেককে সাফ থাকতে দেয় ! এত চাহিদা হৃদয়ের !

সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করছিলেন শিবসুন্দর। বললেন,—তুমি কি আজকাল আর দিশি খাও না ?

শুভাশিস প্রশ্নটা এড়াতে চাইল। গম্ভীরভাবে বলল,—তোমার কিন্তু এবার সিগারেটটা ছেড়ে দেওয়া উচিত বাবা।

শিবসুন্দর বালকের মতো হাসলেন,—চেষ্টা তো করছি। কমিয়েও দিয়েছি অনেক। সারা দিনে বড় জোর পাঁচটা।

—এই সিগারেট দু প্যাকেট রেখে যাব, ধীরেসুস্থে খেয়ো। এগুলো মাইল্ড আছে, পেপারের কোয়ালিটি ভাল, তোমার পক্ষে লেস হার্মফুল।

—অলরাইট। যাও, চানটান সারো গে। অলকা এক্ষুনি খাওয়ার তাড়া লাগাবে।

শুভাশিস বাবার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখছিল। হাইট খুব বেশি নয় মানুষটার, কিন্তু চেহারায় এক উঁচু ব্যক্তিত্ব আছে। এখনও দিব্যি শক্তপোক্ত শরীর, চলাফেরাটি দৃপ্ত, যাকে বলে—ম্যান অফ ফুল কনফিডেন্স। কে বলবে সত্তর পেরিয়ে গেছে বাবা !

ভরপেট খেয়ে আমগাছতলায় নেয়ারের খাটিয়া পেতে শুল শুভাশিস। গ্রীষ্মকালের দিকে দেশে এলে এখানেই দুপুরটা কাটে ভাল। ঘন পাতাভরা গাছের ছায়ায়, হালকা ঢুলুনিমাখা হাওয়ায় যে আরাম লুকিয়ে থাকে, এ বাড়ির দোতলার ঘরখানায় সেটা পায় না শুভাশিস। কিংবা বলা যায়, এটা এক ধরনের শহুরে বিলাস। তা যাই হোক, পথের ক্লান্তি আর বিশ্রামের স্বস্তি মিলিয়ে শুভাশিসের ঘুমটিও হল ভারি চমৎকার। গাছতলায় সে যখন জেগে উঠল তখন তার শরীর বেশ টাটকা। মেজাজ ফুরফুরে।

সূর্য ক্ষয়াটে মেরে গেছে। বাড়িতে কারুর সাড়াশব্দ নেই। শুধু অলকা একতলার দাওয়ায় বসে কি একটা সেলাই করছে। পাশে আপন মনে খেলা করছে তার দেড় বছরের মেয়ে।

অলকা শুভাশিসকে দেখে উঠে দাঁড়াল,—দাদা, চা করব ?

—হ্যাঁ করো। এক্ষুনি এক কাপ গরম চা দরকার। শুভাশিস উঠোনে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল,—কাউকে দেখছি না যে ? কোথায় সব ?

—দিদি একটু রাঙাজেঠিমাদের বাড়ি গেছে। ঝিমলি ডেকে নিয়ে গেল। বাবা গেলেন বেতিয়া। জরুরি কল এসেছিল। ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে।

—বাকি দুই মক্কেল ? টোটোবাবু কি এখনও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন ?

—না। এই তো দুজন হাঁটতে বেরোল। শ্মশানের দিকে গেল মনে হয়।

মাধবপুরের শ্মশানটি রীতিমতো বিখ্যাত। আশপাশের বিশ গাঁয়ের লোক বলে মাধবপুরের শ্মশান সাক্ষাৎ শিবের থান। দূর দূর থেকে অনেকেই এ শ্মশানে দাহ করতে আসে। শিবের মন্দিরও আছে একটা। বারো মাসই সেখানে দু-চারটে জটাজূটধারী সন্ন্যাসী এসে আস্তানা গাড়ে। জম্পেশ গাঁজার আসর চলে দিনরাত। গত বছর এক রক্তচক্ষু তান্ত্রিক এসে আসর জমিয়েছিল। লোকটা গ্রামে ঢুকে খাবার-দাবারের জন্য হামলা করত, কারণবারি পান করে টঙ হয়ে থাকত সর্বক্ষণ, পঞ্চায়েতের লোকজন ধমকধামক দিয়ে তাড়িয়েছিল লোকটাকে। শ্মশানের ধারে প্রকাণ্ড এক অশত্থ গাছও আছে, গাছটাকে ঘিরে ছোটখাটো মেলা বসে। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। ওই শ্মশান সম্পর্কে টোটোর ভীষণ কৌতূহল।

অলকা চা এনেছে।

শুভাশিস চায়ে চুমুক দিচ্ছে, অলকা নড়ছে না সামনে থেকে। মৃদু কণ্ঠে বলল,—বিস্কুট দেব ?

—না না, ওরে বাবাহ। দুপুরে যা খাইয়েছ, গলা অব্দি উঠে আছে। ফাইন রেঁধেছিলে মুরগিটা।

—কী আর এমন যত্ন করতে পারি ? আপনি একটু বাড়িয়ে বলেন। অলকা লজ্জা পেল যেন,—দাদা, আপনারা কি কালই চলে যাচ্ছেন ?

দূরে, বহু দূরে, অথচ দূরত্বের হিসেবে যেটা মাত্র পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার, সেখানে যে একটা শহর আছে সে কথাটা প্রায় স্মরণে ছিল না শুভাশিসের। মনে পড়তেই গলায় একটা টক ঢেকুর উঠল। বেজার মুখে বলল,—দেখি। মা'র যখন ইমিডিয়েট কোনও ডেঞ্জার নেই ... ওদিকে অনেক কাজও তো ...

—দাদা, একটা কথা বলব ?

—বলো।

—এটা তো ঠিক আপনাদের নিয়মের আসা নয়, উপরি আসা। এক-দু দিন থেকে যান না। আপনারা এলে বাবার খুব ভাল লাগে।

—বাবা বুঝি বলেছে তোমাকে ?

—না। আমার মনে হয়। তাছাড়া শুধু বাবা কেন, আমাদেরও ভাল লাগে।

শুভাশিস হেসে ফেলল, উত্তর দিল না। তুফানের বউটি বেশ লক্ষ্মীমন্ত হয়েছে। হাতে পায়ে খাটতে পারে। বুদ্ধিমতী। চাপাডাঙা কলেজের অফিস ক্লার্কের মেয়ে। ওই কলেজেরই পাস গ্র্যাজুয়েট। বাবার নিজের পছন্দ করা মেয়ে, দেখতে সুন্দরী নয়, তবে শরীরে বেশ যৌবন আছে। অলকা আসার পর তুফান এখন অনেক ঝাড়া হাত-পা, সংসারের কাজকর্ম বউয়ের হাতে ছেড়ে কম্পাউন্ডারিতেই বেশি মনোযোগী এখন।

শুভাশিস চা খেয়ে দোতলায় উঠছিল, অলকা পিছন থেকে ডাকল,—দাদা, একটা কথা তখন আপনাকে বাবার সামনে বলিনি। মা সত্যিই কেমন হয়ে গেছিলেন সেদিন !

শুভাশিস ভুরু কোঁচকাল,—কেমন ?

—কী যে বলি ! সে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি। এই চার বছরে এক দিনও মায়ের ওরকম মূর্তি দেখিনি। সকালবেলা বাবা তখন চেম্বারে, আমি মাকে চান করাতে এসেছি, হঠাৎ কী যে হয়ে গেল মা'র ! আমাকে খামচে ধরেছেন ! জামাকাপড় গায়ে রাখতে চাইছেন না ! বিছানায় ধরে রাখা যায় না ! গঁগঁ আওয়াজ উঠছে মুখ থেকে ! ঠিক মনে হচ্ছিল, একটা সাংঘাতিক রাগী মানুষ কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু রাগে গলা দিয়ে কথা ফুটছে না ! আমি তো ভয়ে বাবাকে ... ! তারপরই তো একদম অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

—হুঁ। শুভাশিস সামান্য চিন্তিত,—স্কিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট তো, কখন কি আচরণ করবে কিছুই প্রেডিক্ট করা যায় না। সেরিব্রাল অ্যাটাক যে হয়নি, এটাই ভাগ্য।

শুভাশিস দোতলায় এসে গেঞ্জির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়াল। মনোরম এক বিকেল গুটিগুটি পায়ে আঁধারের দিকে এগোচ্ছে। হুশহাশ বাতাস বইছে। চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে এলে মন্দ হয়

না। কি ভেবে মত বদলাল শুভাশিস। পাঞ্জাবি খুলে টাঙিয়ে দিল দেওয়ালের হুকে। পায়ে পায়ে মনোরমার ঘরে এসেছে।

মনোরমা ঘুমোচ্ছেন। পাতলা চাদরে শরীর আকণ্ঠ ঢাকা। ঈষৎ ফোলা ঘুমন্ত মুখ ফ্যাকাশে, সাদা! খুব আস্তে আস্তে ওঠানামা করছে মনোরমার বুক।

হঠাৎই শুভাশিসের একটু ছুঁতে ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে। পালসটা একবার দেখবে কি? আটফাটা মাটির মতো শুখা চামড়ায় আস্তে হাত বোলাবে? থাক, যদি মা জেগে যায়!

দৃশ্যটা পুরনো। বহু পুরনো। তবু হুড়মুড় করে ধেয়ে এল আচমকাই। খুব ছোটবেলায়, তখন বোধহয় বয়স পাঁচ কি ছয়, একবার চুপিসাড়ে মা'র ঘরে ঢুকেছিল শুভাশিস। বাবা হাসপাতালে গেলে দরজা বন্ধ থাকত মা'র ঘরের, ছোট শুভাশিস টুলে উঠে দরজা খুলেছিল। শীতের দুপুর, বালিশে চুল বিছিয়ে ঘুমোচ্ছে মা, লাল সিঁদুরের চাকা লেপটে আছে কপালে। মাকে দেখে একটুও পাগল মনে হচ্ছে না, এত প্রশান্তি, এত মাধুর্য মা'র মুখে! মা'র খুব কাছে মুখ এনে বালক দেখছিল মাকে। ঝট করে মায়ের চোখ খুলে গেল। দৃষ্টি দু-এক সেকেন্ড স্থির। যেন চেনার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎই ভয়ার্ত শিশুর মতো চিৎকার করে উঠেছে মা। বুঝি শুভাশিস নয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক রক্তখেকো খুনি। দেখতে দেখতে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। হাত মুঠো হয়ে গেছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত সজোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চাইল সামনের প্রাণীটিকে। পর মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে বালকের দেহে। পাঁচ বছরের ছেলেটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। ছেলের বুকের ওপর চেপে বসে প্রাণপণ শক্তিতে গলা টিপে ধরেছে মা। জান্তব গর্জনে শিউরে উঠল নিঝুম দুপুর। ছোট্ট শুভাশিস কোনওক্রমে ছাড়িয়ে নিয়েছিল নিজেকে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে। ছিটকে পালিয়েছিল ঠাকুমার কাছে।

এই তার মা! তার গর্ভধারিণী!

মনোরমার ঘর থেকে এক পা এক পা করে বেরিয়ে এল শুভাশিস। এতদিন পর নতুন করে মন খারাপ হওয়ার কোনও মানে হয় না, মন আর খারাপ হয়ও না, তবু আজ শুভাশিস কেমন এক বিষাদে ভরে যাচ্ছিল। একদল নির্বোধ মানুষের নৃশংসতা কিভাবে পিষে দিয়ে গেছে একটা জীবনকে!

শুভাশিস যখন দু মাসের, ঠিক তখনই ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা। ছেচল্লিশের ষোলোই অগাস্ট। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে। কলকাতায় সেদিন শুরু হয়েছে ভয়াবহ দাঙ্গা। শহর কেঁপে উঠছে রণোন্মাদদের হিংস্র উল্লাসে। এন্টালিতে, বাপের বাড়িতে, শিশুপুত্র কোলে ত্রাসে কাঁপছে এক যুবতী। তার দাদা সারা রাত বাড়ি ফেরেনি, দাদার সন্ধান করতে গিয়ে বাবাও নিখোঁজ। তিনটে বাড়ি পরে এক মুসলিম পরিবারের সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা ছিল মনোরমার বাবার। তাদেরই পাহারায় দুঃস্বপ্নের রাত কাটল। মনোরমার। মনোরমার মা'র। পরদিন সকালে খোঁজ পাওয়া গেল দাদার। নোনাপুকুর ডিপোর সামনে ট্রাম লাইনে পড়েছিল তার লাশ। তলোয়ারের কোপে ক্ষতবিক্ষত। আর বাবাকে পাওয়া গেল হাসপাতালে। তাঁরও বুকে পিঠে ছুরির আঘাত।

ভয়ঙ্কর আতঙ্কে সেদিন থেকেই মস্তিষ্ক বিকল হতে শুরু করে মনোরমার। ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন, মুখে কোনও শব্দ নেই, শুধু দু হাতে আঁকড়ে আছেন তাঁর শিশু সন্তানকে। শিবসুন্দর তখন কলকাতায় ছিলেন না, ছিলেন মেদিনীপুরে। খবর পেয়ে তিনি যখন এসে পৌঁছোন তখন পিউপেরিয়াম সাইকোসিস ভাল মতন গেড়ে বসেছে মনোরমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বেশ কয়েকজন বড় ডাক্তারকে দেখানো হল। ওষুধ ইঞ্জেকশান শক থেরাপি কিছুই বাদ যায়নি। কোনও লাভ হল না, খুব দ্রুত অবস্থার অবনতি ঘটল মনোরমার। কখনও বা একদম চুপ, কখনও বা নিজের মনে বিড়বিড়, কখনও আবার হিংস্র ধরনের উন্মাদিনী। প্রথম প্রথম চেনা লোক দেখলে কিছু মানসিক প্রতিক্রিয়া হত, পরে সেটুকুও মুছে গেল। নিজের স্বামীকেও আর চিনতে পারেন না। বেঁচে থাকার কয়েকটা ন্যূনতম ধর্ম ছাড়া আর কিছুই টিকে নেই মানুষটার।

পুরনো কথা বড় তেতো। হাঁ হাঁ করে গিলে খায় সময়কে। ফুটে ওঠা বিকেল ঝুপ করে নিবে গেল। একটা একটা করে নক্ষত্র জাগল আকাশে। তারায় তারায় ভরে গেল নভোমণ্ডল। গ্রামদেশের বিজলি আলো কমতে কমতে চলে গেল একেবারে। আবার এল। আবার গেল। এল। ঝিঁঝি ডাকছিল।

রাতে শোওয়ার আগে ছন্দা জিজ্ঞাসা করল,—আমরা কাল ফিরছি তো ?

শুভাশিস অন্যমনস্ক। বিকেলটা এখনও সেঁধিয়ে আছে মনে। বলল,—কী যে করি ? কালকের দিনটা ভাবছি থেকেই যাই। ওখানে দু দিন কাজকর্মও অফ করা আছে!

—থেকে যাবে ? বাবা যে বলছিলেন মা এখন ভাল!

—এসব পেশেন্টদের কিছুই বলা যায় না। হেলথের যা কন্ডিশান, যে কোনও সময়ে ওয়ার্স হয়ে যেতে পারে। শুভাশিস বিছানায় শুল,— তাছাড়া অলকাও বলছিল, আমরা এলে বাবার ভাল লাগে...

—অলকার কথা বাদ দাও। মহা ঘোড়েল মেয়ে। সামনাসামনি মুখমিষ্টি, পেছনে যা চালানোর চালিয়ে যাচ্ছে। সংসার খরচের টাকাও তো এখন ওর কাছে থাকে।

—তো ?

—চান্স পেলেই বাপের বাড়িতে টাকা সাপ্লাই দিচ্ছে। অঘ্রান মাসে বোনের বিয়ে হল, দামি নেকলেস দিয়েছে একটা।

—তুমি কোত্থেকে জানলে ?

—মাধবপুরের সবাই জানে। রাঙাজেঠিমা বলছিলেন, তোমরা এবার একটু নজরটজর দাও, নইলে যে সব বারো ভূতে খেয়ে শেষ করবে।

—যত সব আগলি রিমার্ক! শুভাশিস বিরক্ত,—তুফানরা কি বারো ভূত ?

—ওই হল। মুখে তোমরা যাই বলো, আশ্রিত তো বটে!

শুভাশিসের হাই উঠছিল। লো ভোল্টেজে অলস গতিতে ঘুরছে পাখা। জানলার বাইরেও বাতাস বড় কম।

ছন্দা আঁচলে ঘাড় গলা মুছল,—তুফানকেও যত তোমরা আলাভোলা ভাব, তত আর নেই। বিয়ে করে তুফান অনেক পাল্টে গেছে।

কে এসব কূটকচালি ঢোকাচ্ছে ছন্দার মাথায়! জ্ঞাতিরা ? প্রতিবেশীরা ? শুভাশিসের হাসি পেয়ে গেল। তুফান পাল্টে যাবে ?

সেই তুফান! নর্থবেঙ্গলের তুফানগঞ্জ থেকে বাবার তুলে আনা তুফান! বাপ-মা মরা ছেলে, হেলথ সেন্টারের দাওয়ায় পড়ে থাকত, ক্লাস সিক্সের শুভাশিসের সঙ্গী হবে ভেবে ছেলেটাকে বাড়ি নিয়ে এল বাবা। সেই থেকে তুফান এই পরিবারের সদস্য। শুভাশিসের ভাই। জামা জুতো খাওয়া থাকা শোওয়া কোনও কিছুতেই ছেলের সঙ্গে তার তফাত রাখেননি শিবসুন্দর। লেখাপড়ায় তুফানের মাথা খুব ভাল ছিল না, তবু অনেকটাই শিখেছে। টেনেটুনে হায়ার সেকেন্ডারিতে সেকেন্ড ডিভিশান। ঘষে ঘষে দু বারে বি এ। শিবসুন্দরকে ছেড়ে নড়বে না বলে চাকরির চেষ্টাই করেনি কোনও দিন। শুভাশিসের জন্যও প্রাণ দিয়ে দিতে পারে সে। শুভাশিস জানে।

শুভাশিস চোখ বুজে বলল,—শুয়ে পড়ো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

অলকা বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, ছন্দা মশারির ভেতরে এল। আলগোছে বালিশে মাথা রেখে বলল,—আজকাল আমার মশারির ভেতর শুলে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে।

শুভাশিস দেওয়ালের দিকে ফিরল,—কী করতে হবে ? মশারিটা খুলে দেব ?

—হ্যাঁ, তারপর ম্যালেরিয়ায় কোঁ কোঁ করি! তুমি তো তাই চাও। ছন্দাও পিছন ঘুরে শুয়েছে,—আমার কী ? আমি যেখানে খুশি থাকতে পারি।

—শুধু এই মাধবপুরে ছাড়া।

—মোটেই না। এখানে আমার ভালই লাগে। কলকাতার থেকে ফার বেটার। তোমারই এখানে মন বসে না।

ইঙ্গিতটা কোন দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পারছিল শুভাশিস। আবার একটা হাই তুলে বলল,—তুমি কি এখন একটা ফুল ফ্লেজেড ঝগড়া করতে চাও নাকি ? চলো, বারান্দায় গিয়ে বসি। হয়ে যাক ঘণ্টা খানেক।

ছন্দা সাড়া করল না, কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। খানিক পরে বলল,—টোটোটা এখানে একদম বোর হয়ে যায়। ভোল্টেজের যা হাল, টিভি দেখা যায় না, নিজের কোনও সার্কল নেই ...

—একটু হ্যাবিট করুক। দেশ বলে কথা।

সকালে পিছনের সবজিক্ষেতটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল শুভাশিস। ছোট্ট জমিতে পটল ঝিঙে ঢ্যাঁড়োশ কুমড়ো আর কত রকম শাক ফলিয়েছে অলকা ! একটা কুমড়ো তো একেবারে ম্যাগনাম সাইজ ! মিনিমাম কিলো পাঁচেক ! ক্ষেত পরিক্রমা সেরে শুভাশিস বাবার চেম্বারেও উঁকি দিল একবার। বারান্দার বেঞ্চিতে ভাল ভিড়। এ গ্রামের থেকেও আশপাশের গ্রামের লোকই বেশি। গোটা অঞ্চলে বাবার চিকিৎসার খ্যাতি আছে। তুফানও কম্পাউন্ডারিতে রীতিমতো দক্ষ এখন। ক্ষিপ্র হাতে মিকশ্চার বানিয়ে চলেছে। রুগীদের নাম ধাম লিখছে জাবেদা খাতায়। চেম্বারের কোণে যথারীতি বাক্স রাখা, রুগীদের সাধ্য মতো ফিজ জমা পড়ে বাক্সে। শুভাশিস দেখল তুফানের পাশে বসে টোটো টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছে বাক্সটাকে।

শুভাশিস ছেলের দিকে চোখ নাচাল। মানে, কি রকম হচ্ছে ?

টোটোও ইঙ্গিতে উত্তর দিল। ভালই। বেশ নোট-ফোট পড়ছে।

বারান্দার এক রুগী শুভাশিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। লোকটাকে চেনে শুভাশিস। মাধবপুরেরই লোক। কপালে ইয়া বড় আব। দেখলেই হাত নিশপিশ করে। গত বার লোকটাকে বলেওছিল কলকাতায় এলে বিনা পয়সায় কাটিয়ে দেবে। লোকটা আমল দেয়নি। কেন দেয়নি, বোঝে শুভাশিস। কলকাতায় তার যতই রমরমা থাক, মাধবপুরে সে শুধুই শিবডাক্তারের ছেলে। যদিও বাবা মাঝে মাঝেই এখান থেকে পেশেন্ট পাঠায় তার কাছে। সার্জারির কেস। তারাও ফিরে এসে বলে শিবডাক্তারের ছেলে অপারেশান করল। ব্যাপারটা অবশ্য উপভোগই করে শুভাশিস। সফল মানুষের তত-সফল-নয় বাবার পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার মধ্যে এক ধরনের আত্মগরিমাও থাকে।

বিকেলের দিকে এলোমেলো হাঁটতে বেরোচ্ছিল শুভাশিস। দুপুরভর বিশ্রী গুমোট ছিল, ছোট্ট এক ঝলক ঝড় হয়ে গেছে খানিক আগে। সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বারিবিন্দু। জলকণার স্পর্শে প্রকৃতি ভারি স্নিগ্ধ। কোমল। শুভাশিসের মনটাও চিন্তাশূন্য এখন। দুপুরে নিজের হাতে গ্লুকোজ স্টিকে মা'র রক্তবিন্দু পরীক্ষা করেছে, সুগার একেবারে নরমাল। নব্বই। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মা।

শিবসুন্দর স্ত্রীকে একবার দেখে এসে বললেন,—চলো, আমিও একটু ঘুরে আসি। অলকা, তুমি একটু নজর রেখো তো।

টোটো বলল,—চলো তুফানকাকা, আমরাও যাই।

তুফান বলল,—কোন দিকে যাবি ? আজও শ্মশান ?

—না। আজ রাজবাড়ি।

মাধবপুরের রাজবাড়ি অবশ্য দর্শনীয় কিছু নয়। শুধুই এক অতিকায় ধ্বংসস্তূপ। ভাঙাচোরা খাঁচা। রাজাবিহীন। রাজ্যবিহীন। দরজা জানলাবিহীন। ছাদবিহীন। লাল পাতলা ইটের পিঞ্জরে এখন সাপখোপের বাস। মানুষ দূরে থাক, কুকুর বিড়ালও ওই ধ্বংসস্তূপে ঢুকতে অস্বস্তি বোধ করে। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা পুরুষানুক্রমে দেখে আসছে বাড়িটাকে। রাজবাড়িতে রাজা কে ছিল, আদৌ কেউ ছিল কি না, এ নিয়ে বিস্তর কিংবদন্তি চালু আছে। এর কোনওটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস

হয় না শুভাশিসের।

টোটো তুফান দ্রুত চলে গেছে। শুভাশিস আর শিবসুন্দর রাস্তা ধরে ধীর লয়ে হাঁটছিল। বহুকাল পরে বাবার পাশে পাশে হাঁটছে শুভাশিস। ভাল লাগছে। শৈশবের মতো। এ সময়ে স্মৃতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে মাথায়।

অসাবধানে শুভাশিস হোঁচট খেল একটা। সদ্য ফেলা ইট এখনও রাস্তার সব জায়গায় বসেনি ভাল করে, উঁচু হয়ে আছে জায়গায় জায়গায়।

শিবসুন্দর বললেন,—সাবধান।

শুভাশিস বলল,—রাস্তাটা পিটোয়নি দেখছি!

—আর পিটোনো! ফেব্রুয়ারি মার্চে দু হাততা টাকা আসে পঞ্চায়েতে, কি করবে ভেবে না পেয়ে রাস্তায় কাঁড়ি কাঁড়ি ইট ফেলে দেয়। তারপর কে কার কড়ি ধারে।

—তা যাই বলো, যখন এসেছিলে তখন তো সবই কাঁচা পথ। নানারকম অ্যাকশন প্ল্যানে তাও মোরাম বেছানো রাস্তা পেয়েছ! মেন রোড থেকে রাস্তাটা তো পিচ-টিচ ঢেলে একেবারে দারুণ করে দিয়েছে।

—হুঁ, কাজ হচ্ছে না, তা নয়। আটাত্তরের বড় ফ্লাডটার পর থেকেই হচ্ছে। দশ বছরে কতগুলো ডিপ টিউবওয়েল বসে গেল! শ্যালো বসল!

কথা বলতে বলতে খালপাড়ে এসে পড়েছে দুজনে। খাল বলতে, দামোদরের একটা সরু স্রোত। কোন কালে পথ ভুলে নদী থেকে বেরিয়ে এসেছিল স্রোতটা। দামোদরও মজে গেছে, স্রোতটাও এখন এক শীর্ণ নালা মাত্র। তবে বর্ষাকালে উপচে যায়। তখন মরা স্রোত ছুটে যায় মাইল দশেক দূরের বড় জলায়। এ অঞ্চলের লোকরা যাকে বলে কালিয়ার বিল।

দূরে তুফানের সঙ্গে হাঁটছে টোটো। খালের ওপারে ক্ষেতের আল বেয়ে। ভাঙা রাজবাড়ির সামনে দিয়ে। তুফান দু হাত নেড়ে টোটোকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে, টোটো প্রবলভাবে ঘাড় নাড়ছে। ভগ্নস্তূপের ওপারে সূর্য অস্তগামী। প্রাচীন বাড়ি, তুফান, টোটো, দুজনের হাতমুখ নাড়া, এখন এক অনুপম সিল্যুয়েট।

শুভাশিস সিল্যুয়েটটা দেখছিল।

শিবসুন্দর মৃদু স্বরে বললেন,—কাকা ভাইপোয় খুব ভাব।

শুভাশিস হাসল,—ভাব আছে, তবে দুজনের মতের মিল হয় না। তুফান যত সব আজগুবি গল্প শোনাবে আর টোটো কলকাতায় গিয়ে আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করবে। স্ট্রেঞ্জ! তুফানের একটা কথাও বিশ্বাস করে না, তাও বাবুর শোনা চাই।

—তা হোক। এভাবেই যদি টান গড়ে ওঠে! শিবসুন্দর মুহূর্তের জন্য উদাস,—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

—কী?

—ছন্দা বলছিল, তুমি নাকি শিগগির নিজের নার্সিংহোম খুলছ?

—এখনও কিছু ঠিক নেই, প্ল্যান চলছে।

—তোমার তো প্র্যাকটিস যথেষ্ট ভাল, আলাদা করে নার্সিংহোম খোলার দরকার পড়ল কেন?

—অন্যের নার্সিংহোমে অনেক ঝামেলা হয়। ইচ্ছে মতো অপারেশানের ডেট ফেলা যায় না। পছন্দ মতো স্টাফ থাকে না সব জায়গায়।

—এগুলো কি তোমার যথেষ্ট যুক্তি বলে মনে হয়?

শুভাশিস ফস করে সিগারেট ধরাল,—যুক্তি কি না জানি না. পরের নার্সিংহোমে কাজ করে সুখ নেই বাবা।

—সুখ জিনিসটা নিজের মনের ব্যাপার শুভ। আমি তো হসপিটালে হসপিটালে কাজ করেই জীবন কাটিয়ে দিলাম। রিটায়ারমেন্টের আগে কোনওদিন প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করিনি। তোমার

কি মনে হয় আমি খুব আনহ্যাপি ছিলাম ? অথবা তুমি খুব কষ্টে বড় হয়েছ ?

শুভাশিস নীরব।

শিবসুন্দর বললেন,—এম. এস. করার পর তুমি কোনও হসপিটালে জয়েন করলে না, আমার ভাল লাগেনি। বাট আই ডিডনট অবজেক্ট। প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলে, তাও আমি চুপ ছিলাম। তোমার কি মনে হয়, তুমি ঠিক রাস্তায় চলেছ ?

শুভাশিস একটু একটু উত্তপ্ত হচ্ছিল। সামান্য রুক্ষভাবেই বলল,— তোমাদের সময়ে হসপিটাল ছিল বেস্ট পসিবল মেডিকেল হেলপ। এখন কী অবস্থা হয়েছে সে খবর রাখো ? ওয়ার্ডবয়রা অ্যালকোহলিক পেশেন্টকে মদের বোতল সাপ্লাই করছে ! তাদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। রাজনীতি, ইউনিয়ন, ধান্দাবাজি, সব মিলিয়ে পুরো নরক। কাউকে দিয়ে কাজ করানো যায় না। পেশেন্ট ঠিক ট্রিটমেন্ট পায় না। যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে, তারা তো নার্সিংহোমের সুখসুবিধা চাইবেই।

—বাহ্, তোমরাই না এক সময়ে কমন পিপলের কথা ভেবে ডাক্তারদের কাছে উড়ো চিঠি পাঠাতে ? বেশি ফিজ নিলে ভয় দেখাতে ?

শুভাশিস গোঁজ হল,—আমি পাঠাইনি।

—তুমি নিজে পাঠাওনি, তোমার কমরেডরা পাঠিয়েছিল। তুমি সেই মুভমেন্টে ইনভলভড ছিলে !

উফ, যৌবনের সেই ক্ষততে কেন আঙুল লাগাচ্ছে বাবা ! শুভাশিস মরিয়া হয়ে বলল,—নিড, আউটলুক, জীবনের মতো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় বাবা।

—বদলায়, কিন্তু কতটা বদলায় ? ফিসফিস করে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন শিবসুন্দর,—যা ভাল বোঝো করো। তবে মনে রেখো, আ ডক্টর মাস্ট হ্যাভ ক্লিয়ার কনসেন্স।

মাসকলাই-এর ক্ষেতে এক ঝাঁক শালিখ নেমেছে। হুড়োহুড়ি করছে এ পাশে ও পাশে। দুটো টুনটুনি কোত্থেকে ঝাপটে এল। টোটো-তুফান আল বেয়ে ফিরছে।

শুভাশিসের বুক গুড়গুড় করে উঠল। চোখের সামনে দুলছে একটা সময়। দুলছে এক নারীর মুখ। দুলছে। দুলছে।

৫

দুলুনিমাখা দুপুরটা হঠাৎই তেতো হয়ে গেছে আদিত্যর। অথচ একটু আগেও এই ভাবটা ছিল না। রোজকার মতোই ঘণ্টাখানেক আগে আদিত্য ভাত খেয়েছে আজ। সঙ্গে সেই স্বাদ-বর্ণ-গন্ধহীন মাছের ঝোল। মশলাবিহীন পেঁপে আলুর তরকারি। ডাল-ফালও ছিল, আদিত্য মুখে তুলে দেখেনি। দেখেও না কোনওদিন। নুন মিষ্টি পেঁয়াজ আদা রসুন গরম মশলা, এ সবের মধ্যেই যে আদিত্যর বিন্দু বিন্দু সুখ লুকিয়ে থাকে, হাসপাতাল কী জানে তার কথা ! না জানুক, আদিত্য মনে আর খেদ আসতে দেয় না। ওই সব বিস্বাদ খাবার খেয়েই রোজ একটা করে উদ্গার তোলে, আর অমনি খাদ্যরা পেটে গিয়ে আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ শুরু করে দেয়। ক্রমশ এক ভরভরতি ঝিম ভাবে ছেয়ে যেতে থেকে তার শরীর। ফোঁটা ফোঁটা আলস্যের তৃপ্তি স্ফটিকের দানা হয়ে গড়াতে থাকে বুকের অন্দর মহলে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। বড় ভাল লাগে, বড্ড ভাল লাগে আদিত্যর। দুপুরের নার্স দমদেওয়া পুতুলের মতো ওষুধ গিলিয়ে দিয়ে যায়, জিভে গলায় তেতো সর পড়ে, তবু ওই হামাগুড়ি দেওয়া তৃপ্তিটুকুকে কিছুতেই আদিত্য কোলছাড়া করে না। তেতো স্বাদ মরে আসে এক সময়ে, দুপুরের ঘোরলাগা বিশাল ওয়ার্ডের সঙ্গে তাল রেখে ধীরে ধীরে চোখে তন্দ্রা নামে।

কিন্তু আজ যে দিনটাই অন্যরকম। তরল ওষুধের প্রতিটি অণু-পরমাণু আজ মেসেজ পাঠাচ্ছে মাথায়। আদিত্য, আজ তোমার মেয়াদ শেষ। হাসপাতালে এই তোমার শেষ খাওয়া।

আদিত্য কষটে মুখে নার্স মেয়েটিকে বলল,— জল দাও, শিগগিরই জল দাও।

শ্যামবর্ণ কৃশাঙ্গী মেয়েটি ফিক ফিক হাসছে,— দেব। আগে আবার হাঁ করুন।

অবাধ্য শিশুর মতো আদিত্য কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েটি দু আঙুলে টিপে ধরেছে আদিত্যর নাক। পরিবর্ত ক্রিয়ায় মুখ খুলে গেল। টক টক দুটো বড়ি ঢুকে গেল গহ্বরে। এগিয়ে এল জলের গ্লাস।

আদিত্য ঢক করে পুরো জল খেয়ে নিল। রাগ রাগ মুখে বলল, — এই শেষ। আর তোমাদের জারিজুরি খাটছে না।

—ভালই হল। আমাদের ছুটি, এবার বউদি আপনার হ্যাপা পোয়াবে।

—পোয়াবেই তো। হাসিমুখে সব করবে।

আশাটা একটু বেশি হয়ে গেল কি ? ইন্দ্রাণীর মুখে হাসি আর ফোটে কোথায় ! আদিত্য পলকের জন্য ভাবল। ফের বলল, — আর যাই হোক তোমাদের মতো সব সময়ে মুখ ঝামটা দেবে না।

—ও। আমরা বুঝি সারাক্ষণই মুখ ঝামটা দিই ?

—তাছাড়া কি ! কী মেজাজ তোমাদের, বাপস ! আদিত্য চোখ ছোট করল, —তুমি পরশুদিন আমাকে বকোনি ? বলোনি, আমার হাত-পা বেঁধে রেখে দেবে ? তোমাদের ওই নীলা মেয়েটা বলেনি আমার কান মুলে দেওয়া উচিত ?

—বলবেই তো। কম জ্বালান জ্বালিয়েছেন আপনি ? ওষুধ খাওয়ানোর টাইমে সুঁই সাঁই ঘর থেকে কেটে পড়ছেন, বারান্দায় গিয়ে যখন তখন ফুক ফুক বিড়ি টানছেন, রাতদুপুর অবধি এর বিছানা ওর বিছানায় গিয়ে গপ্পো জোড়া.... আপনার জন্য স্যারের কাছে কম বকুনি খেয়েছি আমরা ! আবার যখন নড়তে পারছিলেন না, তখন তো তিন মিনিট অন্তর অন্তর হুকুম। এই দাও ! সেই দাও ! মেয়েটির চোখে ঝিলিক খেল গেল,— যান না বাড়িতে, দেখব বউদির ক'দিন মেজাজ ঠিক থাকে !

আদিত্য কেমন গুটিয়ে যাচ্ছিল। মাসখানেক ধরে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চাখছিল অন্য একটা জীবন, মেয়েটা কেন যে বার বার বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয় ! আহা, সত্যিই যদি বাকি জীবনটা এই হাসপাতালেই কাটিয়ে দেওয়া যেত ! ফিরে গিয়ে আবার তো সেই ঘর ! সেই অশান্তি ! বাবার কটমট চাউনি ! ইন্দ্রাণীর বরফ চোখ !

ভাবতে গিয়ে আদিত্য আরও সিঁটিয়ে গেল। জোর করে নিজেকে সাহস জোগাতে চাইল, — যাই বলো বাপু, বাড়ির সুখই আলাদা। নিজের খাট, নিজের বিছানা.... ! বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কি তোমাদের এই ওয়ার্ডের তুলনা হয় ?

—হুঁহ, বাইরের পৃথিবী ! মেয়েটি মুখ বেঁকাল, —ও সব জানা আছে আমাদের।

—সব জেনে ফেলেছ ? এই বয়সেই ?

—নয়তো কি ? বউ-টউ সব সাত দিন যত্ন করে, তারপর মুড়ো ঝাঁটা দেখায়। আমরা বলে তাও আপনাদের অত্যাচার সহ্য করি।

সাত দিনের যত্ন বলতে ঠিক কতটা যত্ন বোঝায় হিসেব করতে পারল না আদিত্য। মুষড়ে পড়া গলায় বলল, —আমি তোমাদের খুব কষ্ট দিয়েছি, না ?

—থাক। বাড়ি গিয়ে এবার মজাসে থাকুন।

—রাগ করো কেন ? তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে। আরে বাবা বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের বকাঝকা মাইন্ড করিনি। ছোট বোনরা কি দাদাকে বকে না ? আদিত্য আপোসের চেষ্টা চালাল। পেটের ডান দিকে সামান্য জমাট ভাব। মাছ ভাতের মিশ্রণ থম মেরে আছে পাকস্থলীতে। পেটে একবার আলতো হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, —তোমরাও বাপু কেমন যেন আছ ! আমি হাঁকডাক করলেই আসার দরকারটা কি ? আমি মানুষটা তো এরকমই। সারাজীবন লোককে জ্বালিয়ে মারলাম। একটু চোখ কান বুজে থাকতে পারো না ?

মেয়েটির মুখে হাসি ফিরেছে। কালো চোখের মণিতে টলটল এক মরূদ্যানের ছায়া। এই আধক্ষ্যাপা মাঝবয়সী রুগীটা ডাকলে কেন যে তারা না এসে পারে না ! ডাকের সময় বাবা, ছেলে, ভাই— সবারই আবদার যেন ফুটে ওঠে লোকটার স্বরে।

হাসিতে মায়া মাখাল মেয়েটি, —জ্ঞানপাপী। নিন শুয়ে পড়ুন। চুপটি করে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকুন তো দেখি। চোখ বুজে বাড়ির কথা ভাবুন। আপনি আজ ফিরে গেলে বাড়িতে সবাই কত খুশি হবে ! বউদি। আপনার ছেলে। আপনার মিষ্টি মেয়েটা।

আদিত্য সত্যি সত্যি চোখ বুজল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে আর কেউ নয়, ভেসে উঠেছে মেয়ে। পরীর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট ডানা মেলে। ঝালর ঝালর দুধসাদা ঘাগরা পরে। নাচছে। খেলছে। হাসছে। বাবা আমি সিনডেরেলা। আহ্, সুগন্ধী বাতাসে ভরে গেল হৃদয়। লাইজল ডেটল ফিনাইলের উগ্র ঝাঁঝ আর নেই এ ভুবনে। কোথাও নেই। চার বছরের তিতির সত্যিকারের পাখি হয়ে হাঁটছে। বাবার হাত ধরে। মুখে টুকটুকে লাল প্লাস্টিকের ভেঁপু। স্টেশন প্ল্যাটফর্মের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে দিয়েছে বাবা। হঠাৎ হঠাৎ ভেঁপু বাজিয়ে উঠছে মেয়ে। চমকে চমকে উঠছে কেজো পথচারীর দল। হেসে গড়িয়ে পড়ছে বাবা মেয়ে দুজনেই।

সেই ভেঁপুর শব্দে এখনও যেন মুখরিত দশ দিক। এই ওয়ার্ড। এই ঝিমিয়ে আসা দুপুর। জেট প্লেনের গতিতে ছুটন্ত বাইরের শহর। বন্ধ চোখের পাতায় বন্দি নিঃসীম ব্রহ্মাণ্ড।

বিশ্বময় এখন আনন্দের বিস্ফোরণ। তিতিরের ভেঁপু বাজছে।

হঠাৎ পুরনো এক যাতনায় আদিত্যর বুক ব্যথিয়ে উঠল। ছোট থেকেই বাপ্পা বড় দূরের, তার মা-ও। আপন বলতে শুধু তো ওই মেয়ে। মেয়েকেও আদিত্য তেমন করে কিছু দিতে পারল কই ! দেওয়ার ইচ্ছে চাগাড় দিয়ে উঠলে ফাঁকা পকেট হাতড়াতে হয় শুধু। আবার কখনও যদি বা হাতে দু-চার পয়সা আসে, অন্য ইচ্ছেয় তখন মন টালমাটাল। ইচ্ছেটা যে কী ভয়ঙ্কর ! কী দুর্নিবার !

আদিত্যর বোজা চোখ টিপ টিপ, আমি ঘোর পাপী রে তিতির। নইলে তোর দেওয়া পয়সাতেও মদ খাই !

—কী হল রায়দা ? শেষদুপুরে শুয়ে শুয়ে কার ধ্যান হচ্ছে ?

আদিত্য চোখ মেলল।

বেডের পাশে চেয়ার টেনে বসেছে তার নতুন বন্ধু রঘুবীর,— বাড়ি গিয়ে কি করবেন কিছু ঠিক করা হল ?

পেটের চাপ কমেছে অনেকটা, খাবার দাবারগুলো বুঝি এতক্ষণে পৌঁছেছে যথাস্থানে। বালিশ খাড়া করে বিছানায় উঠে বসল আদিত্য, — ঠিক তো করাই আছে। শুয়ে বসে জিরোব ক'দিন।

ঝাঁকড়াচুলো, ইয়া বড় বড় দাড়ি, প্রকাণ্ডকায় মানুষটি চোখ কুঁচকে দেখছে আদিত্যকে,—যাহ বাবা, সাত দিন ধরে কি এই কথাই হল ? এত সব স্কিম-টিম করলাম, বাড়ি যাওয়ার নামেই সব মন থেকে হাপিশ !

—না না না, সব মনে আছে। আদিত্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, — আসলে শরীরটা বড় দুর্বল তো ! হাঁটতে গেলে এখনও মাথা টলে যায় ....কান ভোঁ ভোঁ করে....

— রাখুন তো মশাই শরীর-ফরিরের দুর্বলতা। মনের জোরে শরীর ফেরে। মন চাঙ্গা, তো শরীর ভি চাঙ্গা।

— তা যা বলেছেন।

— বলেছি মানে ! শালা আমাকেই দেখুন না। আপনার আমার কেস তো আলাদা কিছু নয়। দুজনেই আমরা জলপথের যাত্রী। সাঁতরাতে পারিনি, দম কমে গেছিল, তুলে এনেছে। আপনার এই প্রথম বার, আমার হল গিয়ে থার্ড টাইম। যখন মাসি এসে এখানে পুরে দিয়ে গেল, তখন তো ডাক্তার বহুত শাসিয়েছিল ! বলেছিল, যম নাকি এবার আর খালি হাতে ফিরবে না। কেমন দিয়েছি ব্যাটাদের মুখে ঝামা ঘষে ? তাও আপনার মতো এক মাস ধরে কুঁ কুঁ করছি না ! আমার চেহারা দেখে

এখন কেউ মালুম করতে পারবে, রঘুবীর চাটুজ্যে ক'দিন আগে মরতে বসেছিল ? পারবে না। ভাঁটার মতো দু চোখ ঘোরাচ্ছে লোকটা, —এর বিকজটা কি জানা আছে ?

আদিত্য সম্মোহিতের মতো দু দিকে মাথা নাড়ল। রঘুবীর লোকটাকে যত দেখছে ততই বিমূঢ় হচ্ছে সে। বিমুগ্ধও। দেখে লোকটার বয়স বোঝা যায় না, আদিত্যর থেকে তিন-চার বছরের ছোটও হতে পারে, সমবয়সী হওয়াও বিচিত্র নয়, দু-চার বছরের বড় হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। দিন দশেক আগে যেদিন এল হাসপাতালে, সারা রাত কী আর্তনাদই না করেছিল ! চিৎকারের চোটে গোটা ওয়ার্ড রাতভর ঠায় জেগে ! তিন দিনের মধ্যে ভোজবাজি দেখিয়ে দিল লোকটা ! দিব্যি খাড়া হয়ে বসল বিছানায় ! গায়ের রঙ একটু মেটে মেরে যাওয়া, চোখের নিচে কিছু কালি আর হনু দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসা ছাড়া ছ ফুটি দানবটার বহিরঙ্গে রোগের কোনও চিহ্নটি নেই। তাগড়াই খাঁচা, চাপ চাপ পেশি, সবই অটুট।

রঘুবীর টুল টেনে ঘন হল আরেকটু, —বিকজটা হল মন। বুঝলেন মশাই, মন। আমি শরীর আর মনের ডাইভোর্স করিয়ে দিয়েছি। শরীর রইল বর্ধমান, তো মন গেল রাজস্থান। শরীরে কোন আধিব্যাধি এল তো এল, মনকে সে আমার টাচ করতে পারবে না। শরীর হল গিয়ে জড়বস্তু, মানুষকে কাহিল করে তার সাধ্য কি !

— তা বটে। আদিত্য বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাল, — তাহলে কোনটা শুরু করা যায় বলুন।

—সে তো আপনি ঠিক করবেন। চার-পাঁচটা লাইন আপনার সামনে ফেলে দিয়েছি। যেটা ধরবেন সেটাতেই শাইন করবেন। দরজায় মারুতি বাঁধা থাকবে।

আদিত্য অপ্রতিভ মুখে মাথা চুলকোল,— না না, আপনি বলুন।

—স্টোনের লাইন ধরুন। পাশে আমি অ্যাস্ট্রোলজার আছি। জমি-বাড়ির কারবার শুরু করুন। পার্টি আর ইনফরমেশানে ফ্লাড করে দেব। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে মিলিটারি ক্যাম্পের পেছনে চোদ্দতলা বাড়িটা দেখেছেন ?

—হ্যাঁ। পেল্লাই উঁচু। অত উঁচুতে কী করে যে থাকে মানুষ ! আমার তো বাবা ওই টঙে উঠতে গেলে বুক ধড়ফড় করবে।

— উঁচুতলার লোকরা উঁচুতেই থাকতে ভালবাসে। ও কথা ছাড়ুন, বাড়িটা কে তৈরি করেছে কিছু জানা আছে ?

— জানি। আমার এক বন্ধু ওখানে রড সাপ্লাই-এর কনট্র্যাক্ট পেয়েছিল। ওর মুখে নামটা শুনেছি। কি যেন পুরিয়া !

—নানপুরিয়া। লোকটা সকাল সন্ধে আমার কাছে এসে পড়ে থাকত। ওকে তো ওই জমি আমিই করিয়ে দিলাম। অনেক ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সামলে।

আদিত্যর কৌতূহল বাড়ছিল, — প্রবলেম কী ছিল ?

— জমিটাতে একটা খাটাল ছিল যে। খাটালঅলাদের তোলা কি সোজা কথা ! বলে কর্পোরেশান গভর্নমেন্টেরই প্যান্ট হলদে হয়ে যায়। নানপুরিয়া তো চিন্তায় মরোমরো। কী হবে রঘুবীর ? কী হবে রঘুবীর ? শুনতে শুনতে একদিন খুব মায়া হল। দিলাম এক তান্ত্রিক প্যাঁচ কষে।

— তান্ত্রিক প্যাঁচ ! সেটা কী জিনিস ?

— আছে। বিঘ্নবিনাশ। সাত দিনে আঠেরোটা মোষের ডেডবডি গড়াগড়ি খেতে লাগল খাটালে। আর খাটালের মালিক দীনদয়াল আমার প্যায়ে পড়ে গেল, বালবাচ্চা নিয়ে মরে যাব ঠাকুর। প্রাণটা আবার কেঁদে উঠল, রফা করে দিলাম। চার লাখ ক্যাশ নিয়ে ব্যাটা মোষ হাঁকিয়ে চলে গেল কাঁচরাপাড়া। নানপুরিয়ার দৈত্যপুরীও সরসর উঠে গেল।

প্রশ্ন করতে এবার আদিত্যর গলা কাঁপছে, — আপনার কত হল ?

—আমার ? দাড়িগোঁফের জঙ্গলে রঘুবীরের অনাবিল হাসি,— নিলে তো অনেক কিছুই নিতে

পারতাম রায়দা। ওই বিল্ডিংয়েই নানপুরিয়া একটা ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কী করি, গুরুর বারণ যে।

— আপনার গুরু আছেন নাকি ? বলেননি তো আগে ?

— এ কি বলার মতো গুরু ! এ হল মহাগুরু। আমার পিতৃদেব। কত তন্ত্রমন্ত্র শিখিয়েছেন, তাঁর জ্ঞান বিদ্যা সবই আমাকে দান করে গেছেন তিনি। সঙ্গে একটাই কড়া হুকুম। দ্যাখ ব্যাটা, তুই হলি গিয়ে ব্রাহ্মণ সন্তান, ভিক্ষেয় তোর কোনও লজ্জা নেই, কিন্তু খবরদার কমিশন খাবি না। সৎ সরল নিরহঙ্কার মানুষ দেখলে জান দিয়ে সাহায্য করবি, কিন্তু ভুলেও তাদের টাকা ছুঁবি না। তা আমিও পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলি। সত্যি তো, ভিক্ষেতে আমার লজ্জা কী ? আমার নিজের দেশই তো সারা দুনিয়ার কাছে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে কিনা ?

—বেড়াচ্ছেই তো। সেন্ট পারসেন্ট ভিক্ষে করে চলছে। কথাটা বলে ফেলে রীতিমতো অনুপ্রাণিত বোধ করছিল আদিত্য।

রঘুবীর কোনও সমর্থনের ধার ধারে না, কথা বলেই চলছে, —এই এখানে এসে আপনার ওপর মন পড়ে গেল। শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্তে বিছানায় বসে সূর্যস্তব করছি, সোজা আপনার মুখে চোখ আটকে গেল। আহ, কী প্রশস্ত ললাট ! কী প্রশান্তি দু নয়নে ! সূর্যদেব যেন ধী মূর্তিতে বিরাজ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এ মানুষের তো হাটের মাঝখানে পড়ে থাকা উচিত নয় ! এঁর তো রাজচক্রবর্তী হওয়ার কথা। তাই না যেচে আপনার সঙ্গে আলাপ করলাম। ওয়ার্ড-ভরতি এত তো পেশেন্ট, দেখেছেন আর কারুর সঙ্গে রঘুবীর চাটুজ্যেকে আড্ডা জমাতে ?

আদিত্য বেশ কয়েকবার শুনেছে কথাগুলো, তবু নতুন করে বিহ্বল হয়ে পড়ছিল সে। এত বড় পৃথিবীতে কোথায় ছিল রঘুবীর তার ঠিকঠিকানা নেই। দমদমের কাছে মধুগড় না কি এক জায়গায় থাকে, তিন কুলে এক মাসি শুধু সম্বল, কোন ভাগ্যবলে যে লোকটার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল ! আদিত্যর মনে হচ্ছিল ইন্দ্রাণী এসে দেখুক, মদ খাওয়ার সবটাই খারাপ নয়। নেশাটা ছিল বলেই না অসুখটা এল ! আর অসুখ না এলে কি আজ খাতির জমত পরশপাথরটার সঙ্গে।

আদিত্য আবিষ্ট স্বরে বলল, —কিন্তু আমার যে কোনও ব্যবসাই লাগে না। কতভাবে কত চেষ্টা করলাম...

—লাগবে কী করে ? এই তো সবে আপনার শনির সাড়ে সাতি কাটতে শুরু করেছে। পরশু আপনাকে বললাম না, পাশার দান ঘুরছে এবার। এখন আপনি যাতে হাত দেবেন তাই সোনা।

—বলছেন ?

—বলছি। তবে ওই সব দুধ-ফুধ আর ধরা চলবে না। দুধের টাকা চলকে চলকে পড়ে যায়। রঘুবীর দার্শনিকের মতো উদাস, —দুধের ঋণ এ জগতে কে আর শোধ করে রায়দা ! চলেন, একটা বিড়ি খেয়ে আসি।

—বিড়ি কেন ? আরেকটা ভাল সিগারেট হোক।

পরশু শুভাশিস এসেছিল আদিত্যকে দেখতে। ইন্দ্রাণীকে লুকিয়ে গুনে গুনে চারটে বিদেশি সিগারেট দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, দিনে একটার বেশি খাবেন না। আদিত্য কথা রেখেছে। পরশু একটা খেয়েছিল, কাল একটা। আজ সকালে একটা দিয়েছে রঘুবীরকে। আরেকটা থাকার কথা। মিটসেফ হাতড়াতে গিয়ে মনে পড়ে গেল। উহুঁ, থাকবে না। একটা তো ওয়ার্ডবয় নিয়েছে।

আদিত্য তোশকের তলা থেকে বিড়ি বার করল, —পাঁচটা আছে। আপনি চারটে রেখে দিন। আমার তো ছুটিই হয়ে যাচ্ছে।

প্যাসেজের প্রান্তে, বাথরুমের ধারে এসে বিড়ি ধরাল রঘুবীর, —যাই বলুন রায়দা, বিড়ির মৌজই আলাদা। আপনার ডাক্তার বন্ধুর ফরেন সিগারেটে এত চার্ম নেই।

আদিত্য সরলভাবে বলল, —আমার বন্ধু না, আমার ওয়াইফের বন্ধু। সেই কলেজ লাইফের।

—তাআই ! বউদির বিয়ের আগের বন্ধু ! তা ভাল।

রঘুবীরের কণ্ঠে কি বিদ্রূপ ? লোকটার ধূসর মণিদুটোর দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারল না আদিত্য। চোখ তো একইভাবে ঝিলিক দিচ্ছে ! নাকি দেখতে চাইছে আদিত্যর অন্তঃস্থল !

আদিত্য দৃষ্টি সরিয়ে নিল। চোখ মেলে দিল প্যাসেজের বাইরে। চৌখুপি তারজালের ওপারে মানুষের আনাগোনা। কত রকমের মানুষ ! শোকার্ত। বিমর্ষ। খুশি। আত্মমগ্ন। তিন ছোকরা ডাক্তার গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তর্ক করতে করতে চলেছে। ঘাড় নিচু করে দ্রুত পায়ে তাদের টপকে গেল তরুণীর দল। সামনের পুকুরপাড়ে সিমেন্টের বেঞ্চিতে একা যুবক। তার পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে বাদামি নেড়ি কুত্তা। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের ঝাঁঝ এড়িয়ে। পুকুরের জলে সাদাটে নীল আকাশের ছায়া। আদিত্য ছায়াটা দেখছিল।

রঘুবীর শেষ টান দিয়ে তারজালের বাইরে বিড়ি ফেলে দিল, —তাহলে রায়দা, কোনটায় নামবেন ঠিক করলেন ? স্টোন, না জমিজমা ?

আদিত্য অন্যমনস্ক মুখে তাকাল, —কোনটায় নামি বলুন তো ? সবই তো ভাল। শুধু আমার কপালেই যা টেকে না।

—এবার টিকবে। চোখ বন্ধ করে নেমে পড়ুন। যে দুটো ব্যবসা বললাম তাতে কোনও মার নেই। মানুষের ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর ইচ্ছেও প্রবল, জমি-বাড়ির পিপাসাও অনন্ত। এ গ্রহে যতদিন মানুষ নামক জীবটা থাকবে, এই দুটো ব্যবসাও বনবন চলবে।

ওয়ার্ডের ভেতর থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসছে। খর গলায় চেঁচাচ্ছে মহিলাকণ্ঠ, —সাঁইত্রিশ নম্বর ? অ্যাই সাঁইত্রিশ নম্বর ? এ তো আর পারা যায় না ! গেল কোথায় বল তো ?

আদিত্য হাসছে টিপি টিপি, —দেখছেন কাণ্ডটা ! সাঁইত্রিশ নম্বর আমাদের মতোই নির্ঘাত কোথাও গিয়ে বসে আছে ! হয়তো কোথাও বসে বিড়ি খাচ্ছে ! হা হা।

—ত্যাৎ, সাঁইত্রিশ নম্বর তো আপনিই।

—অ্যাঁ ? তাই তো ! কী করি এখন ! সব্বোনাশ করেছে। আদিত্য পড়িমরি করে দৌড়ল। সে যে এই ঘরে নেহাতই একটা নম্বর, এক মাস ধরে এখানে থেকেও কিছুতেই সেটা মাথায় থাকে না তার।

বেডের সামনে এসে আদিত্য নার্সারির বাচ্চাদের মতো কড়ে আঙুল তুলল, —একটু বাথরুমে গিয়েছিলাম দিদি।

মধ্যবয়সী নার্স মহিলার মুখে ভাবান্তর নেই। গম্ভীর মুখেই বলল, —বুঝেছি। শুয়ে পড়ুন।

বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়ল আদিত্য। এই মহিলাটিকে গোটা ওয়ার্ডের সকলেই বেশ ডরায়। মুখরা আর গোমড়া হিসেবে বিশেষ খ্যাতি আছে মহিলার। ঝড়ের গতিতে মহিলা আদিত্যর হাতে ফেট্টি বেঁধে ফেলল, ফসফস প্রেশার মাপল, নিয়মমাফিক থার্মোমিটার ঢোকাল আদিত্যর মুখে। আঙুলে নাড়ি টিপল।

রঘুবীর আদিত্যর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ গমগমে গলা অস্বাভাবিক মিহি করে সে বলল, —দিদি, একটা কথা বলব ?

মহিলার চোখ হাতঘড়িতেই স্থির, —জায়গায় যান। শুনছি গিয়ে।

—এখানেই বলি না ? হঠাৎ মনে এল কথাটা...

মহিলা যেন পাথরস্তম্ভ !

রঘুবীরের গলা আরও মিহি, —দিদি, আপনি কাইন্ডলি একটা দু রতির মুনস্টোন ধারণ করুন।

মহিলার চোখ টেরচা হয়েছে, —কেন বলুন তো ?

—আপনি একটা ডিপ্রেশানের মধ্যে আছেন। আপনার নিকট আত্মীয়রা আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আপনার তাদের কাছে অনেক প্রত্যাশা, তারা কিছুই পূরণ করতে পারে না। তাদের ঘিরে মনটা সব সময়ে চঞ্চল হয়ে থাকে আপনার।

মহিলার কপালে ভাঁজ ফুটছে, —কী করে বুঝলেন ?

—আপনার কপাল দেখে। আপনি চিরকালই নিজের মধ্যে নিজে খুব একা, তাই না ? আপনার সর্বক্ষণ মনে হয়—কিচ্ছু ভাল লাগছে না, কিচ্ছু ভাল লাগছে না, ঠিক ?

আদিত্যর মুখ থেকে থার্মোমিটার বার করে ট্রেতে রাখল মহিলা, —আপনি কি জ্যোতিষ করেন ?

—ওই একরকম। শখের। লোকজনের দুঃখকষ্ট দেখলে দু-চার কথা বলে ফেলি। কে ভোগাচ্ছে আপনাকে ? ছেলে ?

পাথর গলে গেল, —আপনি হাত দেখেন ?

—না, আমি করকোষ্ঠী বিচার করি না। কপালের লিখন পড়ি।

—কপালেও লেখা থাকে ?

—থাকে। কপালেই তো বিধাতাপুরুষ ভাগ্য লেখেন। হাত দেখা ভড়ং। আমি বলছি আপনি একটা মুনস্টোন পরে নিন।

—ছেলের সুমতি ফিরবে ?

—ফিরতেও পারে। তবে আপনার মন শান্ত হবে।

আদিত্যর বিমোহিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে রঘুবীর নিজের বিছানায় চলে গেল। ফিরেও তাকাল না।

বিকেল ঘনিয়ে আসছে। কোনও কোনও রুগী দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম সেরে উঠে বসেছে বিছানায়। অনেকে চারটে বাজার প্রতীক্ষায় উসখুস। তাদের আনমনা চোখ বার বার চলে যায় প্রবেশ পথের দিকে। চায়ের গাড়ি এসে গেল।

আদিত্য তার কল্পজগতে ডানা মেলে উড়ছিল। এ জগৎ একান্তই তার নিজের। তার এই মনোভূমিতে বিশ্বসংসারের কারুর প্রবেশাধিকার নেই। স্ত্রী-পুত্রের নয়, বাবা-ভাইদের নয়, বন্ধুবান্ধবের নয়, এমনকী তিতিরেরও নয়। যৌবনের শুরু থেকেই আদিত্যর গভীর বিশ্বাস তারই আশেপাশে, কোনও এক জায়গায় লুকিয়ে আছে তার সাফল্যের চাবিকাঠি। সাফল্য মানে অর্থ। চাবিটা খুঁজে পেলেই অতি সহজে রাশি রাশি টাকা এসে যাবে তার হাতের মুঠোয়। আদিত্য চাবিটারই সন্ধান করছে আযৌবন। কখনও আধো তন্দ্রায়, কখনও বা জেগে জেগেই। অসংখ্য গোপন শুঁড়িপথ চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় আদিত্যর। যে-কোনও একটা পথ ধরে এগোতে ইচ্ছে হয়, এগোয়ও। কিন্তু কিছুটা গিয়েই পথের মুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন আর একটা পথ খোঁজো। আবার হোঁচট খেয়ে রন্ধ্রপথে ফিরে আসা। অথচ আদিত্য ঠিক জানে, পথটা আছে। আছেই। খুব কাছে। খুব সহজে সেখানে পৌঁছনো যায়।

কোথায় আছে চাবিটা ?

রঘুবীর কি সেই চাবিকাঠির সন্ধান দিতে এল ? এত দিন পর ?

আদিত্য ভাবছিল। ভেবেই চলেছিল। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘর পার, কখন ওয়ার্ডে দর্শনার্থীর ভিড়, কিছুই যেন চোখে পড়েনি তার।

ভাবনা ভেঙে বাস্তবে ফিরল আদিত্য। তিতির এসেছে। সঙ্গে কন্দর্প। আদিত্যর দু চোখ ইতিউতি খুঁজল পিছনে। ইন্দ্রাণী নেই।

তিতির কাছে এসে চোখ পাকাল, —এ কী ! তুমি এখনও রেডি হওনি যে বড় !

আদিত্য আড়মোড়া ভাঙল, —তোরা এসে গেছিস ?

কন্দর্প কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, —আমাদের দেখে ভূত মনে হচ্ছে নাকি ?

—তুই তো ভূতই। চিরকালের ভূত। তা বলে আমার মেয়েটা কেন ভূত হতে যাবে রে ?

আদিত্য হাত বাড়িয়ে তিতিরকে ছুঁয়ে নিল। আসমান রঙ সালোয়ার-কামিজ আর সাদা মেঘরঙ ওড়নায় তিতির যেন আজ জীবন্ত আকাশ। চুল উল্টে বেঁধে লম্বা বেণী ঝুলিয়েছে। ইন্দ্রাণীর থেকে সে অনেক বেশি ফরসা, প্রায় দুধে আলতা রঙ। কিন্তু মুখ একেবারে ইন্দ্রাণী বসানো।

মাঝে মাঝে আদিত্যর ভারি বিস্ময় জাগে। ইন্দ্রাণীর প্রতিবিম্ব হয়েও এই মেয়ে এত কোমল হল কোন যাদুতে !

কন্দর্প তাড়া লাগাল, —বউদি তো কাল তোমার প্যান্টশার্ট রেখে গেছে, যাও পরে নাও।

—যাচ্ছি যাচ্ছি, এত তাড়া দিচ্ছিস কেন ?

—মনে হচ্ছে তোমার ফেরার ইচ্ছে নেই !

—ধরেছিস ঠিক। আরও কটা দিন থেকে গেলেই হত। বেশ ছিলাম। কত বন্ধুবান্ধব হয়ে গেছে এখানে। প্যান্টশার্ট কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগিয়েও কি ভেবে আদিত্য ফিরল, —চাঁদু, তোর বউদি কেন এল না রে ?

—শুধু বউদি কেন, দেখছ না, গতবারের পুরো টিম বদলে দেওয়া হয়েছে ? ওরা সব্বাই এবার ব্যাকআউট করে গেছে। যদি এসে দেখে আবার তুমি....

তিতির দ্রুত হাতে মিটসেফ থেকে বাবার জিনিসপত্র বার করছিল, কন্দর্প তার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। হালকা ধমকের সুরে তিতির বলল, —ছোটকা, তুমি বকবক করবে, না বাবার কাগজপত্র রেডি করতে যাবে ?

ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে নার্স ডাক্তারদের ঘর, কন্দর্প সেদিকে এগোল।

বাথরুমে জামাকাপড় বদলাচ্ছিল আদিত্য। এই ক'দিনেই প্যান্টের কোমর বেশ ঢলঢলে হয়ে গেছে, শার্টও যেন সামান্য লতপত। মাত্র এক মাসে এত্ত রোগা হয়ে গেল সে। ছ্যাতলাধরা আয়নায়, বিকেলের বিষণ্ণ আলোয়, আদিত্য নিজেকে দেখছিল। দেখাই সার, তেমন কিছু বুঝতে পারল না। শুধু গাল দুটোই বুঝি অল্প বসে গেছে।

আজ ইন্দ্রাণী না আসায় প্রথমটা মনে মনে একটু অসহায়ই বোধ করছিল আদিত্য। স্ত্রী সামনে থাকলে এক শক্ত ভূমির স্পর্শ পায় সে। একটা মজবুত পাকাপোক্ত অবলম্বন। আবার এখন যেন একটু একটু স্বস্তিও হচ্ছে। ইন্দ্রাণী থাকলে একটা দমচাপা ভাবও থাকে বইকি।

ফিরে এসে আদিত্য দেখল তিতির তার জিনিসপত্র সব পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়েছে। প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে নিয়েছে পেস্ট, ব্রাশ, কাচের গ্লাস, আধা-ভিজে তোয়ালে। আর একটা বিগ শপারে আদিত্যর জামাকাপড়, ওষুধপত্র এক্সরে প্লেট। শুধু সাবানটা নেয়নি, পড়ে আছে মিটসেফের মাথায়। পাশে মিষ্টির বাক্সটা।

বাক্স থেকে একটা আধশুকনো কড়াপাকের সন্দেশ বার করল তিতির, —এটা তুমি কাল খাওনি ?

—জানিসই তো মিষ্টি আমার ভাল লাগে না।

—এটা একটা কথা হল ? তোমাকে ডক্টর পাইন বলেছেন না, বেশি করে কার্বোহাইড্রেট নিতে ! ডক্টর আঙ্কলও তোমাকে কত করে বুঝিয়ে গেল !

—ডাক্তাররা অনেক কিছুই বলে। যে যা বলবে খেতে হবে ?

—তাই বুঝি ? আচ্ছা। বাড়ি চলো। মেশিনদাদুকে বলে রেখেছি রোজ দুপুরবেলা তোমার জন্য আখের রসের ব্যবস্থা করবে। দেখি খাও কিনা।

ঠিক যেন শৈশবের মা। আদিত্যর চোখে বাষ্প জমছিল। ছোটবেলার মতোই আদুরে স্বরে বলল, —মিষ্টি খেলে আমার একদম মুখ মেরে যায় রে।

—কিসে ভাল থাকে মুখ ? আজেবাজে জিনিস খেলে ? চাপা গলায় হিসহিসিয়ে উঠল তিতির।

—তুইও বলছিস ?

—হ্যাঁ, আমি বলছি। এবার ব্যথা হলে কেউ তোমাকে দেখবে না। আমিও না।

কন্দর্প কাগজপত্র নিয়ে ফিরেছে। তার মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল। গর্বিত মুখে বলল, —তোরা আমাকে পাত্তা দিস না, যারা চেনবার ঠিক চেনে।

তিতির ভুরু বেঁকিয়ে তাকাল, —কে তোমাকে চিনতে পারল ছোটকা ?

—দু-দুজন সিস্টার। দেখেই বলল, আপনাকে টিভি স্ক্রিনে দেখেছি না !

এমন অ্যামিউজড় হয়ে দেখছিল আমাকে ! অটোগ্রাফ চাইল। না করতে পারলাম না।

—কোন সিস্টারটা গো ? কালো দাঁত উঁচুটা ? না বুলডোজারটা ?

আদিত্যও মেয়ের রসিকতায় যোগ দিল, —আহ তিতির, চাঁদুকে অত হেলাফেলা করিস না, দেখবি হয়তো বেরোনোর সময় মবড হয়ে যাবে।

বেরোনোর মুখে সত্যি সত্যিই মবড হল কন্দর্প। ওয়ার্ডবয় সুইপাররা ঘিরে ধরেছে তাকে। বখশিস চাই। কন্দর্প প্রাণপণে দর কষাকষি করে চলেছে তাদের সঙ্গে। তিতির বিরক্ত মুখে লোকগুলোকে দেখছিল।

আদিত্য অন্য পেশেন্টদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। পরশু রাতে মারা গেছে একজন, তার বেডের সামনে এসে দু দণ্ড দাঁড়াল। বিছানা খালি নেই, আর একজন এসে গেছে। এই এক মাসে কত আসা-যাওয়াই যে দেখল ! কেউ ফেরে নিজের ঘরে, কারুর ঘর মুছে যায় পৃথিবী থেকে। নাকি মোছে না ? সেও একটা ঘর পায় ! এক অনন্ত শান্তির আশ্রয় !

নিশ্বাস চেপে রঘুবীরের কাছে এল আদিত্য। একা একা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে রঘুবীর। অল্প অল্প পা নাচাচ্ছে। আদিত্যকে দেখে নড়ল না।

আদিত্য রঘুবীরের হাত চেপে ধরল, —কবে আবার দেখা হচ্ছে ?

রঘুবীর মিটিমিটি হাসছে, —যা যা বললাম মনে আছে ?

আদিত্যর স্বর কেঁপে গেল, —আছে। কিন্তু আমি পারব তো ?

—আমি তো আছি সঙ্গে। রঘুবীর আদিত্যর হাতে চাপ দিল, —মাঝে তো আর মাত্র কটা দিন। আপনি মন রেডি করুন, আমি আসছি।

৬

—এসেছ তাহলে ? জয়মোহন সোজাসুজি ছেলের দিকে তাকালেন না। যেন বিবর্ণ দেওয়ালটার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। অথবা ফিকে মেরে যাওয়া পুরনো ছবিটার সঙ্গে।

আদিত্য সোফায় বসে পড়ল। হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময়েও মনে হচ্ছিল শরীরে আবার জোর ফিরে এসেছে, আজ থেকেই নতুন উদ্যমে কাজে লেগে পড়া যায়, ট্যাক্সিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ছেড়ে গেল শরীরটা। বহির্বিশ্বের কোলাহল ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁপিয়ে পড়ল কানের পর্দায়, পোড়া পেট্রল ডিজেলের গন্ধে নাড়িভুঁড়ি গুলিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এল দেহ। গোটা পথ তিতির আর কন্দর্প কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে, হাসি তামাশাও করছিল, আদিত্য কোনও কথাতেই মন দিতে পারেনি। প্রাণপণে শরীরের হৃত বল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল সে। তবু শেষ রক্ষা হল না। ট্যাক্সি থেকে নামার মুহূর্তে আঁধার ঘনিয়ে এল চোখে। হাঁটু কেঁপে গেল।

এখনও কাঁপছে। হাতের থাবায় থর থর দুই উরু চেপে ধরল আদিত্য। ঘন ঘন নিশ্বাস টানছে। পূর্ণ করে নিতে চাইছে ফুসফুস।

তিতির বাবার কাঁধে হাত রাখল, —জল খাবে ?

—খেতে পারি। তালুটা শুকিয়ে গেছে।

জল খেয়ে খানিকটা স্থিত হল আদিত্য। সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল।

জয়মোহনের টেবিলে আজ তাস নেই। আড়চোখে তিনি দেখছেন ছেলেকে, —তোমার শরীর এখনও সারেনি মনে হচ্ছে ?

—না, অনেকটা সেরেছে। নইলে কি হাসপাতাল ছাড়ে !

—কে জানে, হাসপাতাল তো রুগী তাড়াতে পারলে বাঁচে। তোমার মুখচোখ এখনও ভাল নয়।

—না না, সত্যি আমি ভাল আছি। এই একটু উইকনেস আর কি। পথের একটা ধকল গেল।

—হুম। পেটে বেদনা-টেদনা নেই তো আর ?

আদিত্য ফ্যাকাসে হাসল, —তেমন একটা নেই। তবে জিভের স্বাদ একেবারে গেছে। স্রেফ সেদ্ধ সেদ্ধ খাওয়া !

—নিজের অত্যাচার নিজেকেই শাস্তি দেয়। আশা করি শিক্ষাটা পেয়েছ।

আদিত্য চোখের পাতা খুলল। জয়মোহন দেওয়ালের ছবির দিকেই তাকিয়ে আছেন। টিউবলাইটের আলো টেরচাভাবে পড়ে তাঁর মুখের অর্ধাংশ আলোকিত, বাকিটা ছায়াময়। যেটুকু দৃশ্যমান সেটুকুনিও যেন বড় বেশি ক্লিষ্ট, ভাঙাচোরা, বড় বেশি বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল আদিত্যর। তাদের পিতাপুত্রের সম্পর্ক এখন যে স্তরে এসে ঠেকেছে তাতে বাবার মুখ বড় একটা দেখা হয়ে ওঠে না আর। এখন তো দেখা শুধু বিতৃষ্ণায়। ক্রোধে। এই মুহূর্তে স্থির তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখটিকে কেমন অচেনা লাগছিল আদিত্যর।

এত নিকট-মানুষ কী করে যে এমন অচেনা হয়ে যায় !

তিতির ডাকল, —চলো বাবা, এবার ওপরে যাবে তো ?

বাবার কাছে আর একটু থাকার ইচ্ছে আদিত্যর। মুখ ফুটে প্রকাশ করল না আকাঙ্ক্ষাটা। ঘুরিয়ে বলল, —এক্ষুনি উঠলে হাঁপিয়ে যাব। আরেকটু রেস্ট নিয়ে নিই।

—আমি তাহলে ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে ওপরে যাই ? দরজার কাছে থামল তিতির, —তুমি একা একা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে পারবে ?

—পারব। না পারলে ডাকব তোকে।

—তুমি এখন কি খাবে ? হরলিকস ?

আদিত্য নাক কুঁচকোল।

—মা চিকেনস্যুপ করে রেখেছে, দিয়ে যাব ?

—পরে দিস। এখন কিছু খেতে ভাল লাগছে না।

জয়মোহন জিজ্ঞাসা করলেন, —হ্যাঁ রে তিতির, চাঁদু তোর সঙ্গে গেল, ফিরল না তো ?

—ফিরেছে। তিতির সিঁড়ি থেকে উত্তর দিল, —মেশিনঘরে মা'র সঙ্গে কথা বলছে।

—ও। বউমাও তাহলে ফিরে এসেছে। আপন মনে বললেন জয়মোহন।

আদিত্য আলগা প্রশ্ন করল, —ইন্দ্রাণী বুঝি বাড়ি ছিল না ?

—বাড়িতে আর কতটুকুন থাকতে পায় বেচারা ! স্কুল থেকে ফিরেই সারাক্ষণ অর্ডার পেমেন্ট ডেলিভারি... আজও তো ডালহাউসি না কোথায় বেরোল পেমেন্ট কালেকশানে।

—ও।

জয়মোহন সোফা থেকে উঠে পড়লেন। অস্থির পা। এদিক ওদিক হাঁটছেন। থামলেন। কি যেন বলতে চাইছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে বলেই ফেললেন, —শরীরটা সেরে উঠলে এবার অন্তত কাজেকর্মে একটু মন-টন দাও। বয়স তো অনেক হল।

—হুঁ, একটা কিছু তো করতেই হবে।

—একটা কিছু কেন ? প্রেসটাকেই দ্যাখ। বউমা একটু ছুটি পায়। একা হাতে আর কত দিন সামলাবে ! বাইরে বাইরে ঘোরা, প্রেসে বসে প্রুফ দেখা, স্কুল, ছেলেমেয়ে...

—কেউ যদি শখ করে খাটে, আমি কী বলব ? স্কুলের চাকরিতে তো এখন ভালই মাইনে, এখন আর এক্সট্রা বার্ডন নেওয়ার দরকার কী ?

জয়মোহন বহুকাল পর ছেলের সঙ্গে নরম করে কথা বলার উৎসাহ পাচ্ছেন যেন, —ঠিকই তো, এক্সট্রা বার্ডন নেবে কেন ? তোরই তো প্রেস, এবার তুই চালা।

কথাটা যে এদিকেই ঘুরে যাবে আদিত্য ভাবেনি। একটু অসহিষ্ণুভাবে বলল, —লেটার প্রেসের ব্যবসা ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে বাবা, ওসব আর চলে না।

—কে বলল চলে না ? বউমা কত অর্ডার পাচ্ছে, দুর্লভরা প্রায় দিন ওভারটাইম করে...

—করুক গে, ওতে তেমন প্রফিট নেই। আমি জানি।

—তুমি জেনে বসে আছ ? বউমা বুঝি তবে বেগার খাটে ?

—অতশত জানি না। প্রেস আমার পোষাবে না। আমি অন্য কিছু করব।

জয়মোহন থমকে গেলেন, দু-এক মুহূর্ত চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে, —অন্য কিছু মানে ? কী করবি তুই ?

—করব একটা। হালকাভাবে বলল আদিত্য, প্ল্যানটা ভাঙল না।

জয়মোহনের স্বরে রুক্ষতা বাড়ছিল,— কি করবি খুলে বলা যায় না ?

আদিত্য রঘুবীরের মুখটা দেখতে পাচ্ছিল। ভাঁটার মতো চোখবিশিষ্ট এক দৈবপ্রেরিত পুরুষ। রহস্য করার ভঙ্গিতে হাসল একটু, —আহা চটছ কেন ? শুরু করলে তো দেখতেই পাবে।

—আমি দেখতে চাই না। আমি জানতে চাই।

আদিত্য দম নিল, —উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? প্রেশার বেড়ে যাবে যে। হাইপার টেনশানের রুগীর কি মাথা গরম করা ভাল ?

—তার মানে প্রেসটা তুই দেখবি না ?

—সম্ভব নয়।

—বউমা এত কষ্ট করে মরা ব্যবসাটাকে দাঁড় করাল...! জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে শুরু করেছে জয়মোহনের, কপালের শিরা দপদপ। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন, —লজ্জা করে না বলতে ? এক সময়ে তুইই না প্রেস প্রেস করে নেচেছিলি ?

শুধু নাচেইনি আদিত্য, তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু করেছিল। সে এক লম্বা ইতিহাস। মহাভারতও বলা যায়। প্রায় অষ্টাদশ পর্বের। তার কর্মকাণ্ডের অমর কাহিনী।

সেই মহাভারতের আদিতে ছিল দুধ-পর্ব। জয়মোহনের ব্যবসা ভাগীরথীতে ডুবে যাওয়ার পরই আদিত্যর মাথায় দুধ ঢুকল। পাড়ার এক হাফ-মস্তানের সঙ্গে পার্টনারশিপে দুধের এজেন্সি। এসব এজেন্সিতে সবাই প্রায় মানথ্‌লি কার্ড করায়, আদিত্য বলল, নো। ডেলি দুধ, ডেলি ক্যাশ। বলেই বিপদ ! আদিত্য মুখচোরা মানুষ, চেনাপরিচিতরা মাঝে মাঝে ধারে দুধ নিয়ে যায়, মুখ ফুটে কিছুতেই আর পয়সা চাইতে পারে না আদিত্য। মাস কয়েক পর দুধ-কোম্পানিকে ড্রাফট দেওয়ার সময় ব্যাপারটা নজরে পড়ল পার্টনারের। তুড়ে গালাগাল করল আদিত্যকে। ফল হল উলটো। গোঁয়ার আদিত্য পার্টনারের ওপর চটে গিয়ে আরও বেশি করে দুধ বিলি শুরু করল। মাসিমা, দুধ নিয়ে যান, এ গভর্নমেন্টের গরুর দুধ নয়, দারুণ ছানা হবে। বউদি, জমিয়ে ক্ষীর করুন। এই বুলি, একটা দুধে তোদের হয় নাকি ? আরেকটা নে। আহা, পয়সার কথা কে শুনতে চেয়েছে ? খা, প্রাণের সুখে খা।

সাত দিন ধরে দুধের নদী বয়ে গেল পাড়ায়। তারপর শুরু হল মুষল পর্ব। পার্টনার লোকাল পার্টির হোমরাচোমরা, তাদের দল তখন গোটা ভারতবর্ষে প্রবল প্রতাপে দাপাচ্ছে, সেই জোশে সে দিল একদিন আদিত্যকে পিটিয়ে। এমনিতে আদিত্য ঘাড়ঝোলা ধরনের নিরীহ, কিন্তু খেপলে সে একেবারে মহিষাসুর। সে-ও পরদিন নিজেদেরই দুধের দোকানে ভাঙচুর করে এল খানিক হাফ-মস্তানের বাড়ি গিয়ে তুমুল চেঁচামিচি করল, আছড়ে ভেঙে দিয়ে এল তার কাচের টেবিল। তারপর ক'দিন পাড়ায় সে কী টেনশান ! এই লাগে তো সেই লাগে। তা শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটল না। হুড়মুড় করে ইলেকশান এসে গেল, হাফ-মস্তানের পার্টি হেরে ভূত, সেই ছোকরাও পাড় ছেড়ে ধাঁ। দুধ-ব্যবসা কফিনে।

এরপর ভোজ পর্ব। ইন্দ্রাণী তখন মরিয়া হয়ে লিভ ভ্যাকান্সিতে ঢুকেছে একটা স্কুলে, বাপ্পা বছর সাতেকের, তিতিরের তখন চারও পোরেনি। কলেজের এক বন্ধু আদিত্যকে অনেক দিন ধরে তাতাচ্ছিল, দুজনে মিলে নামল ক্যাটারিং-এর ব্যবসায়। প্রাথমিক পুঁজিপাটা এবারও জয়মোহনের। কিছুটা ইচ্ছেয় দিলেন তিনি, কিছুটা অনিচ্ছায়। ইচ্ছের কারণ ছেলে যদি বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে একটু

থিতু হয়ে দাঁড়াতে পারে। অনিচ্ছার হেতু দুধপর্বের শিক্ষা।

তা এ ব্যবসা চলেছিল কিছু দিন। প্রায় বছর দেড়েক। সঙ্গী বিমল বলিয়ে-কইয়ে ছেলে, স্পোকেন ইংলিশে তুখোড়, ঝটঝট বেশ কটা বিয়ে অন্নপ্রাশন শ্রাদ্ধ ধরে ফেলল। কাজ এগোচ্ছিল ভাল। রান্নাবান্নার গুণমানের ওপর আদিত্যর কড়া নজর, বিমল সামলায় নিমন্ত্রিতদের আদর-আপ্যায়ন। ঝঞ্ঝাট এল কাজকর্ম একটু বাড়ার পর, যখন দিনে দুটো তিনটে কনট্র্যাক্ট এক সঙ্গে জুটছে। দুই বন্ধু স্থির করল যে, নিমন্ত্রণ বাড়ি যে সামলাবে, তার প্রফিটটা তার। বিমল ঠিকই চালাতে লাগল, আদিত্যর হয়ে গেল মুশকিল। তার এস্টিমেট ভুল হয়, পোলাও কম পড়লে মুরগি বেঁচে যায় ডেকচি ডেকচি, পাহাড়ের মতো চপ কাটলেট জমে যায়। প্রথম প্রথম তো আদিত্যর দারুণ ফুর্তি। যা খাবার বাঁচে বেশির ভাগ বাড়িতে নিয়ে চলে আসে। তিন দিন ধরে বাড়ির সবাই চপ ফ্রাই গেলে। পাড়াপড়শি বন্ধুবান্ধবরাও পোলাও-মাংসে বঞ্চিত হয় না।

কিন্তু এভাবে আর চলে ক'দিন! ব্যবসার মূলে টান পড়তে আরম্ভ করল। তখনও আদিত্যর মদের নেশাটা তেমন পাকাপোক্ত হয়নি, খায় মাঝে সাঝে, কখনও কখনও বেহেড হয়েও ফেরে, আবার হয়তো টানা পনেরো দিন ছুঁয়েও দেখে না বোতল। এক দিনই খুব বেশি টেনে ফেলেছিল, বিমল বেঁকিয়ে চুরিয়ে দু-চার কথা শুনিয়ে দিল তাকে, যেন মদ খেয়েই ব্যবসার টাকা ওড়াচ্ছে আদিত্য। মুখে আদিত্য বলল না কিছু, শুধু ব্যবসাটা আলাদা করে নিল। আর পুরোপুরি গেঁথে গেল কাদায়।

এই রকম এক সময়ে প্রেসের উদ্‌যোগ পর্বের সূচনা। এক পৈতে বাড়িতে আড়াইশো ফিশফ্রাইএর পর্বতের সামনে বসে আছে আদিত্য, গুমোট গরম আর তার পরের ভারী বৃষ্টিতে অর্ধেক নিমন্ত্রিত গরহাজির, যারা এসেছে তারাও ফ্রাই-এর বহর দেখে গলায় আঙুল ডুবিয়ে বমি করতে চায়, কারণ আদিত্য তখন মরিয়া লাভের আশায় কচি হাঙর ছাড়া আর কিছুর ফ্রাই করে না, আদিত্য গালে হাত দিয়ে ভাবছে কতগুলো ফ্রাই নর্দমায় ফেলবে আর কতগুলোই বা দিয়ে যাবে পৈতেবাড়িতে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তার রণেনের সঙ্গে দেখা।

রণেন আদিত্যর ন্যাংটোবেলার বন্ধু। একসঙ্গে দুজনে স্কুলে পড়েছে, হজমি খেয়েছে, নিষিদ্ধ বই দেখেছে, মৈথুনরত কুকুরদের একসঙ্গে ঢিল ছুঁড়েছে দুজনে। এছাড়া লেকে বিড়ি খাওয়া, স্কুল কেটে উত্তমসুচিত্রা এসব তো আছেই। কলেজে গিয়ে দুজনে দুদিকে ছিটকে গেল। রণেন পড়ল ইঞ্জিনিয়ারিং, আদিত্য জেনারেল স্ট্রিম। পাড়া ছেড়েও চলে গেল রণেন। বহুকাল পর পৈতেবাড়িতে দেখা হয়ে দুজনেই উচ্ছ্বসিত, আদিত্যর দুর্দশা দেখে রণেন তো হেসে খুন।

প্রেসের পরামর্শটা রণেনই দিল। পরামর্শ, না দুর্বুদ্ধি, আদিত্য অবশ্য আজও বুঝে উঠতে পারেনি। প্রথমটায় আদিত্যর মতো ভোলেভালা ইন্‌সানও এক ঢোঁকে বুদ্ধিটা গেলেনি। সে প্রিন্টিং প্রেসের কিছুই বোঝে না, তাদের ক্যাটারিং-এর মেন্যুকার্ড পর্যন্ত নিজে ছাপাতে যায়নি কোনওদিন, বিষাক্ত সিসে ফিশে নিয়ে কাজ হয় বলে পা পর্যন্ত রাখেনি প্রেসে, সে করবে ওই ব্যবসা! নিজে!

রণেন ভাজা হাঙর খেতে খেতে তাকে বুঝিয়ে দিল লাভ লোকসানের খতিয়ান। না লোকসানও নয়, শুধুই লাভের হিসেব। সঙ্গে কয়েকটি মহৎ টোপ। রণেন তখন এক টাইপ ফাউন্ড্রির ইঞ্জিনিয়ার, সে ধারে বিশ তিরিশ কেজি টাইপ দেবে। ক্যানিং স্ট্রিটের দুজন বড় কাগজ-ডিলারের সঙ্গেও তার দহরম মহরম, তাদের ঘর থেকে ক্রেডিটে কাগজ তুলতে পারবে আদিত্য। ভাল মেশিনও রণেন সস্তায় পাইয়ে দেবে।

শুনতে শুনতে আদিত্যর বুকে দুন্দুভি বাজছিল। আহা, এ যেন কাগজ ছাপা নয়, নোট ছাপা। ব্যস, ক্যাটারিং ডকে।

পরদিন থেকেই অভিযান শুরু। রণেনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু প্রিন্টিং মেশিন দেখা হয়ে গেল। নতুন দেখে, পুরনো দেখে, ঠিক পছন্দসই আর হয় না। হয়তো বা কান ঘেঁষে বেঁচেই যেত আদিত্য, কিন্তু বিধি বাম। শয়তান অলক্ষে হেসে একটা ভাল সেকেন্ডহ্যান্ড হাইডেলবার্গ মেশিনের

সন্ধান দিয়ে দিল। চ্যান্ডেল অ্যান্ড প্রাইস সিস্টেমের মেশিন, পুরনো হলেও বেশ ঝকঝকে চেহারা, হাফ ডিমাই সাইজে কাগজ ছাপা যায়। শয়তানের কৃপায় দামও কম, মাত্র চল্লিশ হাজার। মেশিন দেখে, দাম শুনে রণেন উচ্ছ্বসিত, দেখাদেখি আদিত্যও। ঘনিয়ে এল যুদ্ধ পর্ব।

আদিত্যর হাতে টাকাকড়ি তখন প্রায় শেষ। বাবা বউ কাউকে না জানিয়ে মা'র দুজোড়া বালা বিক্রি করে আদিত্য মেশিন অ্যাডভান্স করে চলে এল। তারপর শুরু হল জয়মোহনের ওপর চাপ। টাকা দাও। টাকা দাও। জয়মোহন তখন ঠেকে ঠেকে ঘাঘু, ফুৎকারে ছেলের বাই উড়িয়ে দিলেন। পরে গিন্নির বালা বেচা হয়েছে শুনে রেগে অগ্নিশর্মা। তবে তিনি ছেলের চুলের ডগাও ছুঁতে পারলেন না। তার আগেই শুরু হয়ে গেল তাঁর ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ। হিটলারি কায়দাতে বাঙালি ঢঙ মিশিয়ে। সারাদিন কান্নাকাটি করেন শোভনা, সারারাত আত্মহত্যার ভয় দেখান, কারণে অকারণে মাথা ঠোকেন দেওয়ালে। আমার খোকন এতদিনে একটা রাস্তা খুঁজে পেল, তুমি তাকে একটুও সাহায্য করবে না! এর সঙ্গে আদিত্যর ফোয়ারা তো ছুটছেই। আগলাক, আগলাক, টাকা নিয়ে যক্ষ হয়ে বসে থাকুক। শালা বাপ তো নয়, দশরথ। সব দরদ শুধু মেজ ছেলের জন্যে। সুদীপের অপরাধ তার জীবনের প্রথম চাকরিটা হয়েছিল বাবার সুপারিশে। ইন্দ্রাণী তখন না পারে শাশুড়িকে থামাতে, না পারে আদিত্যকে। দুমুখো আক্রমণে শেষ পর্যন্ত সাদা পতাকা তুললেন জয়মোহন। আদিত্যর দুই ব্যবসায় তাঁর অনেক গিয়েছে, তবু একটা ফিক্সড্ ডিপোজিটের টাকা তুলে দিয়ে দিলেন। তাতেও হল না। শুভাশিসের তখন ঘন ঘন যাতায়াত এ বাড়িতে, তার কাছ থেকে ধার নিল বাকিটা। আদিত্যর তীব্র আগ্রহে সেও খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, ইন্দ্রাণীর বারণ না শুনেই দিয়ে দিল হাজার বিশেক।

এবার শল্য পর্ব। টাকা তো জোগাড় হল, কিন্তু জায়গা কই? বউবাজার কলেজস্ট্রিট পাড়ার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ধাতে সইবে না, কাছেই কোথাও ঘর-টর চাই। তখনই আদিত্যর শুভানুধ্যায়ীরা কানে ভাসিয়ে দিল গ্যারেজঘরটার কথা। তিয়াত্তরের গোড়ার দিকে নিজের ল্যান্ডমাস্টারটা বেচে দিয়েছিলেন জয়মোহন, তারপর থেকে গ্যারেজ ফাঁকাই পড়ে ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ফাঁকা নেই। সুদীপের আগের অফিসের ডেপুটি ম্যানেজার তখন গাড়ি রাখছে গ্যারেজটায়। সুদীপ তখন সেই ওষুধ কোম্পানির জুনিয়ার অ্যাকাউন্টস অফিসার, সদ্য বিয়ে করেছে। সেই পড়ল ফাঁপরে। অফিস-বস্ পাবলিক গ্যারেজে গাড়ি রেখে রোজ তেল চুরির দুখভরা কহানী শোনাত, সুদীপই যেচে তাকে খুলে দিয়েছে গ্যারেজঘর। এখন কোন্ মুখে তাকে হঠায়? দাদাকে সে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল, বাবার কাছে গিয়ে গাঁইগুই করল, রুনাও নববধূর লাজ বিসর্জন দিয়ে শাশুড়িকে অনুরোধ করল, কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ওই গ্যারেজঘরই চাই। সুদীপও এর পর পাল্টা চিৎকার জুড়ল। বাড়িতে ওই সব ঘটাংঘট চলবে না। উটকো লোক দরজায় ভিড় করবে। বাড়ির শান্তি বিঘ্নিত হবে। রায়বাড়ির ফ্যামিলি প্রেস্টিজ নেই? দুই ছেলের টাগ-অফ-ওয়ার দেখে চুল ছিঁড়ছেন জয়মোহন, আদিত্য দুম করে একদিন গদা চালিয়ে সুদীপের উরু ভেঙে দিল। অফিস-বসের ড্রাইভারকে অকারণে যাচ্ছেতাই অপমান করে বসল। নিজে তালা কিনে লাগিয়ে দি গ্যারেজঘরের শাটারে।

বেচারা সুদীপ আর কী করে! কলকাতায় তো আর দ্বৈপায়ন হ্রদ নেই যার পাড়ে সে ভগ্নউরু নিয়ে শুয়ে থাকবে! অগত্যা স্যারের হাতেপায়ে ধরে ক্ষমা চাইল, বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বন্ধ করে রইল টানা দু মাস।

শুরু হয়ে গেল আদিত্যর প্রেস। কর্ম পর্ব। ঘটাংঘট।

ক'দিন আদিত্য খুব খাটল। অফিসে অফিসে ব্যাগ নিয়ে ঘোরে, দপ্তরিপাড়ায় যায়, পরিচিতদের বৃত্তটি তার বেশ বড়, তাদের দৌলতে কাজও জুটল মন্দ না। কিন্তু আদিত্যর উৎসাহ কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো, বড় দ্রুত কমতে থাকে। আদিত্য আবিষ্কার করল এ ব্যবসাতেও প্রচুর চোরাবালি। ভাগ্যবলে যে মেশিনম্যানটিকে সে প্রথম থেকে পেয়েছিল, সে লোকটি ভাল। দুর্লভ দাস।

ফাঁকিবাজ নয়, ব্যবহারটি মধুর, আদিত্যকে খুব সম্মান দিয়ে কথা বলে, কাজেকর্মে বেশ দক্ষ। কিন্তু কম্পোজিটাররা ? উফ !

প্রথম এল গড়বেতার এক মায়াবী তরুণ। স্বপ্নালু চোখ, কোমল মুখ, ভারি মিতভাষী। মাস দুয়েকের মধ্যে আদিত্যর মনে হল প্রেসঘর যেন কেমন হালকা হালকা ঠেকছে। কিসে এত হালকা লাগে ? ক'দিনেই টের পেল ঘরটা নয়, হালকা হয়ে গেছে টাইপবক্স। তক্কে তক্কে থেকে বুঝল রোজ মুঠো মুঠো টাইপ সরাচ্ছে ছেলেটা। একদিন কাজ সেরে বেরোনোর সময় ধরলও ছেলেটাকে, তোমার পকেট দেখব। মায়াবী তরুণ স্বপ্নালু চোখ মেলে বলল, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন দাদা ? ছিঃ ! আদিত্যর ঘাড় ঝুলে গেল, পকেট বোঝাই টাইপ নিয়ে চিরতরে বিদায় নিল প্রথম কম্পোজিটার। দ্বিতীয় জন বারুইপুরের। একমাসও টেকেনি সে। দশ টাকা মাইনে বেশি পেয়ে যাদবপুরের এক প্রেসে চলে গেল। তৃতীয় জন বিরাটির। সপ্তাহে রুটিন করে তিন দিন ডুব মারত, আদিত্য খোঁজখবর করে দেখল, তার কাজে ডুব মেরে বউবাজার পাড়ায় খেপ খাটে সে।

এদের নিয়ে আদিত্য সর্ষেফুল দেখছে, তার ওপরেও শতেক হ্যাপা। এই কাটারের কাছে যাও। ওই বাইন্ডারের কাছে যাও। ব্লকমেকারদের পিছন পিছন দৌড়ও। এত কি সে পারে !

যা পারে তা অবশ্য সে করেছে। পাড়ার পুজোর বিল হ্যান্ডবিল ফ্রি ছাপিয়ে দিয়েছে। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে নিয়ে গেছে। ছাপা খরচ দূরস্থান, কার্ডের পয়সাটাও চাইতে পারেনি আদিত্য।

আদিত্যর দম শেষ হয়ে যাচ্ছিল।

কাজ সময় মতো না ওঠার দরুন নতুন অর্ডার বন্ধ। বকেয়া পেমেন্টের জন্য নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে অফিসগুলো। ঠিক টাইমে ডেলিভারি না পেয়ে বাড়ি বয়ে খিস্তিখাস্তাও করে গেল অনেকে। কাগজের দোকানে টাকা বাকি। বাইন্ডিংখানায় টাকা বাকি। রণেনের ফাউন্ড্রিতে টাকা বাকি। রণেনের বউ ইন্দ্রাণীকে এসে কথাও শুনিয়ে গেল কিছু।

শেষে আদিত্যর আঁকড়ে ধরার একমাত্র মহীরুহটিরও পতন হল। তার মা মারা গেলেন।

বিষাদপর্ব শুরু হল। আদিত্য ঢুকে গেল কুঠুরিতে। মুহ্যমান ব্যাঙ হয়ে। লোকজন এলে সাড়া করে না। প্রেসে যায় না। দিনরাত বুকে গোদা পাশবালিশ চেপে শুয়ে থাকে। আর সন্ধে হলেই সোমরস।

ওদিকে গোবদা মেশিন নিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে দুর্লভ।

ঠিক তখনই প্রেসঘরে পা দিল ইন্দ্রাণী। স্কুলের চাকরি তখন তার পার্মানেন্ট, দুপুরের দিকে প্রেসে বসতে শুরু করল সে। শুভাশিসের সুপারিশে নতুন অর্ডার এল। বেশির ভাগই ডাক্তারদের প্যাড, ডাক্তারদের কার্ড, নার্সিংহোমের ছোটখাট কাজ। অহোরাত্র পাহারা দিয়ে দিয়ে তুলেও ফেলল কাজগুলো। ধীরে, কিন্তু একটু একটু করে আশার আলো জ্বলল। এক পরিচিতের সুবাদে আর এক পরিচিত, এক কাজের সুবাদে অন্য কাজ, এই করে করে আয়তন বাড়ল ব্যবসার। একজন কম্পোজিটারে আর চলে না, বছর দুয়েক হল আরেকটা রানিং কম্পোজিটার রেখেছে। একটা মেশিনে কাজ ওঠাতে মাঝে মাঝেই হিমসিম দশা হয়। ইচ্ছে করলে অর্ডার ডেলিভারি পেমেন্টের জন্য লোক রাখতে পারে, রাখেনি। এখনও সবই নিজের হাতে করে ইন্দ্রাণী। এই স্থিতিশীল দশাতেও।

আদিত্য সব জানে। সে যে একদম প্রেসে যায় না তা নয়, মাঝে মধ্যে যায়। মন হলে অল্প স্বল্প প্রুফ দেখে, ইন্দ্রাণীর হুকুম মতো এক আধদিন বাইন্ডার কাটারদের ঘরেও টুঁ মেরে আসে।

কিন্তু প্রেস এখন আর তার নিজের নয়। ইন্দ্রাণীর।

ওই প্রেসের জন্য কেন নতুন করে মাথা ঘামাবে আদিত্য ! ফুঃ।

জয়মোহন ঝুম হয়ে বসে। সদ্য রোগফেরত ছেলের ওপর হঠাৎ চেঁচামেচি করে ফেলে বেশ অবসন্ন যেন। ঘাড় নিম্নমুখী, মুখ অল্প হাঁ, ফুসফুস অনভ্যস্ত দাসের মতো চালু রাখতে চাইছে

রক্তসংবহন।

আদিত্যরও জিভ খরখরে, তালু শুকিয়ে গেছে। খরখরে জিভ বোলাল তালুতে। বলল, —কেন যে চেঁচাও ! শরীরে সয় না তোমার, জানোই তো।

জয়মোহন মুখ তুললেন। কষ্ট করে হাসলেন একটু, —কেন যে তুই প্রেসটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাস না, আমি বুঝি।

—বোঝো ?

—হুঁ। হিংসে। বউমা পারল, তুই পারলি না, এটাই তোকে পোড়ায়, না রে খোকন ?

বহুক্ষণ পর আদিত্যর হাসি পেয়ে গেল। হিংসে ? হিংসে শুধু মানুষকে ছোটই করে না, কখনও চরিত্রে ব্যক্তিত্বও এনে দেয়। আদিত্য জানে। কিন্তু ওই অনুভূতিটা যে তার মনে জন্মালই না কোনওদিন ! অজস্র কারণ থাকা সত্ত্বেও।

আদিত্য টুকটুক হাঁটু নাচাল, —তোমার ঢিলটা লাগল না বাবা। আমার ওসব হিংসে টিংসে নেই। জানো না মালখোররা হিংসুটে হয় না !

জয়মোহন তিড়িং করে উঠলেন, —কত বার করে বলেছি না, আমার সামনে তুই ওই ভাষায় কথা বলবি না !

—যাহ বাবা, আমি তো মালখোরই। তুমিই তো বলো।

—আমি বলি বেশ করি। তুই কেন বলবি রে হারামজাদা ?

—এটা কিন্তু বিলো দা বেল্ট হয়ে যাচ্ছে বাবা।

—বিলো দা বেল্ট আবার কি ? তোর পাছায় লাথি কষানো উচিত। তুই বউটার জীবন নষ্ট করেছিস, ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট করছিস, আমাদের সুখশান্তি নষ্ট করেছিস, তোর কথা ভেবে তোর মা দগ্ধে দগ্ধে মরেছে, আমার ব্যবসার সর্বনাশ করেছিস। আমার অমন চালু তেল সাবানের ব্যবসা...একটা ব্যাংক লোনও রিপে করেছিলি তুই ?

—থামো থামো। একটা বুনো সাইক্লোনের মেঘ আছড়ে পড়ল আদিত্যর বুকে। দুর্বল শরীরে সর্বশক্তি দিয়ে ভেতরের রাগটাকে হিম করে ফেলল আদিত্য। আজ সে কিছুতেই স্নায়ুর ওপর দখল হারাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, —অনেক দিন ধরে তুমি তোমার ব্যবসা ওঠা নিয়ে আমাকে খোঁটা দিচ্ছ। আজ একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

—কিসের ফয়সালা রে অকম্মার ধাড়ি ! তুই শুয়ে বসে থেকে আমার ব্যবসাটা ডোবাসনি ?

—ননাআ। কেন ডুবেছে শুনতে চাও ? বললে এ বাড়িতে তোমার সম্মান থাকবে ?

—কিসের ভয় দেখাচ্ছিস তুই আমাকে ? কী করেছি আমি ?

—কোম্পানির টাকা তুমি রেসের মাঠে ওড়াওনি ? শেয়ার মার্কেটে ফাটকা খেলতে গিয়ে কত হেরেছিলে তুমি ? পাঁচ লাখ ? দশ লাখ ? কত ? আমাকে তো তুমি তোমার বিজনেসের লাশ আগলাতে বসিয়েছিলে ! ভেবেছিলে ন্যালাখ্যাপা ছেলে, কিচ্ছুটি টের পাবে না, তাই না ? নিজে লুটে পুটে খেয়ে, আমার ঘাড়ে সব লায়েবিলিটি, অ্যাঁ ?

জয়মোহন এত বড় ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, আমূল কেঁপে উঠেছেন। একটি শব্দও মুখ থেকে বেরোল না। সামনে ঝুঁকে পড়ে দম নেওয়ার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। তামাটে মুখ নীল।

আদিত্য চাপা স্বরে বলল,— এসব কথা আমি বলতে চাইনি কোনওদিন। তুমি বলতে বাধ্য করলে। একটা লোক সবে হাসপাতাল থেকে ফিরেছে, তার সঙ্গে কোথায় হাসি মুখে দুটো কথা বলবে, তা নয় শুধু গালাগাল ! যাও, সরবিট্রেট মুখে রেখে শুয়ে পড়ো গে যাও।

জয়মোহন অনড়। আদিত্য উঠে দাঁড়াল। প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মাথায়। মস্তিষ্কের কোষগুলো তরল নেশা চাইছে। সমগ্র দেহকাণ্ড জুড়ে এক জংলি ষাঁড় দাপাদাপি করছে তার। সব প্রাণরস এখন অঙ্গার।

রেলিং খামচে আদিত্য ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙছিল। সাত-আট দিন পর আবার যেন পেটে ক্ষুরের খোঁচা !

দোতলায় সুদীপদের ঘর যথারীতি বন্ধ। রুনা ছেলে নিয়ে রোজকার মতোই বেরিয়েছে। আদিত্য সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কোনও দিকে না তাকিয়ে। বিছানায় শোওয়ার আগেই ছুটে এসেছে তিতির। টুক করে ঘরের আলো জ্বেলেছে। বাবার মুখচোখ দেখে ভয় পেয়ে গেল,— তোমার কষ্ট হচ্ছে বাবা ?

আদিত্য বালিশে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে দিল,— না।

—তুমি প্যান্ট-শার্ট বদলাবে না ! কাচা পাজামা-পাঞ্জাবি রেখে দিয়েছি !

—থাক। পরে বদলাব।

তিতির আদিত্যর কাছে এসে ঝুঁকল, —তোমার এখন কোনও ওষুধ নেই ?

—না।

তিতির সন্দিগ্ধ চোখে বাবাকে দেখছিল, —মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে ? মাকে ডেকে দেব ?

—আহ, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দে। আলো নিবিয়ে দরজাটা টেনে দিয়ে যা।

ঘর ধূসর অন্ধকারে ভরে গেছে। দয়ামায়াহীন, কর্কশ অন্ধকার। এ অন্ধকার মানুষকে একটুও রেহাই দেয় না। চোখ বন্ধ রেখেও অন্ধকারের ক্রূরতা এড়াতে পারছিল না আদিত্য। তার সমস্ত স্নায়ু দু আঙুলে পেঁচিয়ে যেন টানছে কোনও আলোহীন শক্তি। টাং টাং শব্দ অনুরণিত হচ্ছে মাথায়।

তবে আদিত্যর রাগ চড়তেও যতক্ষণ, পড়তেও ততক্ষণ। এই হ্যাডডাম ফ্যাডডাম সে তো চায়নি, তবু কেন বাবার সঙ্গে মুষ্ঠিযুদ্ধটা হয়েই গেল আজ ! এত দিন ধরে সঞ্চয় করে রাখা গোপন বিষটুকু কেন উগরে দিল ! এ কি অসংযম ? না চিত্তের মূঢ়তা ? নাকি নেশার সর্বগ্রাসী টান ? যার পিপাসায় আকুল হয়ে আছে শরীর !

বাড়ি ফিরেই বুড়ো মানুষটার শঙ্কা আর উদ্বেগমাখা যে মুখটা প্রথম দেখেছিল, সেটাই আদিত্যর মনে বাজছিল বার বার।

আদিত্যর দুচোখ জলে ভরে গেল। আদিত্য কাঁদছিল। আর আশ্চর্য, কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়ে। স্বল্পস্থায়ী ঘুম ছিঁড়েও গেল। ইন্দ্রাণী এসেছে ঘরে।

পলকের জন্য বিভ্রম এসেছিল আদিত্যর। এটা ঘর, না হাসপাতাল ? পিট পিট চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখল কয়েক সেকেন্ড।

ইন্দ্রাণীর হাতে খাবারের থালা। বিছানার ধারে টুল টেনে থালাটা রাখল। থালায় চার পিস টোস্ট, ছানা, সামান্য সেদ্ধ সবজি। বাটিতে টলটল করছে মুরগির স্যুপ। নুন গোলমরিচ ছড়ানো। একটা জলের বোতল আর গ্লাস পাশে রেখে বলল, —তোমার জন্য আলাদা করে জল ফুটিয়েছি। এ জল ছাড়া অন্য জল খাবে না কিন্তু।

হাসপাতাল ফেরত রুগণ্ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এই প্রথম সংলাপ !

আদিত্য উঠে বসে বোতলের দিকে হাত বাড়াল। গ্লাসে না ঢেলে বোতল থেকেই সরাসরি খানিকটা জল ঢালল গলায়।

ইন্দ্রাণী বলল, —আগে জল খাচ্ছ কেন ? খেয়ে নাও।

—বড় তেষ্টা। আদিত্য বিড় বিড় করে বলল কথাটা। খাবারের দিকে দেখল, —এত আমি খেতে পারব ?

—যতটুকু পারো খাও।

—দীপুরা কেউ এল না যে ? বাড়ি ফেরেনি ?

—এসেছিল। ঘর অন্ধকার দেখে ডাকেনি।

—বাপ্পা ?

—বাপ্পা এখনও আসেনি। কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় আজকাল! এদিকে সামনে পরীক্ষা! একদম বই নিয়ে বসে না।

—ও। কথা খুঁজে না পেয়ে স্যুপে চামচ ডোবাল আদিত্য। জিভে ছোঁয়াতেই গৃহের অনুভূতি। বাড়ি ঢোকার পরে এই প্রথম। সুস্বাদু স্যুপ বেশ কয়েক চামচ খেয়ে ফেলল। ইন্দ্রাণী খুব যত্ন করে বানিয়েছে বোঝা যায়।

ইন্দ্রাণীকে একটু পাশে বসতে বলবে আদিত্য? একটু যদি বসে? কয়েক সেকেন্ড?

চাওয়াটা কি খুব বেশি হয়ে যাবে?

ইন্দ্রাণীর মুখ অসম্ভব শান্ত। কপালে একটি ভাঁজও নেই।

আদিত্য কাঁপা কাঁপা স্বরে ডাকল, —ইন্দু... !

৭

মুহূর্তের জন্য শরীর শিরশির করে উঠেছিল ইন্দ্রাণীর। মুহূর্তের জন্যই। এমন গাঢ় স্বরে তাকে খুব কমই ডাকে আদিত্য।

কয়েক পল মানুষটাকে দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণী বলল,—কিছু বলবে তুমি?

আদিত্য পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল,—দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো না।

ইন্দ্রাণী ছেলের খাটে গিয়ে বসল। নিচু স্বরে বলল,—বলো কি বলবে।

আদিত্য তক্ষুনি কিছু বলল না। সুদীপদের ঘর থেকে অ্যাটমের তীক্ষ্ণ সরু স্বর উড়ে আসছে। রুনা বোধহয় জোর ফলাচ্ছে ছেলের ওপর। হয়তো খাওয়া নিয়ে। নয়তো শোওয়া। নয় পড়া। অথবা অন্য কোনও মহতী আকাঙ্ক্ষায়।

খাওয়া থামিয়ে আদিত্য ওঘরের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। যেন দেওয়াল ফুঁড়ে দেখছে কিছু। হঠাৎই অন্যমনস্কভাবে বলল,—দীপুর বউটা বড় মারকুটে।

—অ্যাটমও একটু বেশিই চেঁচায়। অকারণে।

—ছেলের পেছনে অত লেগে থাকার দরকার কি?

—যাকে ছেলে মানুষ করতে হয়, সেই বোঝে।

—তাও তো বটে।

—কী বলবে বলো, আমার সময় কম।

—হ্যাঁ বলি। আদিত্য দু ঢোঁক জল খেল,—তোমার খাটুনি খুব বেড়ে গেছে, না ইন্দু? চিরটা কাল খেটে মরলে।

—যে যেমন কপাল নিয়ে জন্মায়।

—এবার তোমাকে ঠিক বিশ্রাম দেব। একটা ভাল লাইন পেয়েছি।

—তাই। ইন্দ্রাণী বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—তুমি বাথরুমে যাবে তো? ঘুরে এসো। তোমাকে ওষুধ দিয়ে আমি নীচে যাব।

বাধ্য বালকের মতো বাথরুমে যাচ্ছে আদিত্য, ইন্দ্রাণী আদিত্যর হাঁটাটা দেখছিল। চলার ভঙ্গি এখনও বেশ অসুস্থ। একটু বা লগবগে। যেন একটা ভর পেলে সুবিধে হত মানুষটার।

তিতির ওষুধ প্রেসক্রিপশন বাপ্পার টেবিলে সাজিয়ে রেখে গেছে, আদিত্য বাথরুম থেকে ফিরতেই পর পর তাকে ওষুধগুলো খাইয়ে দিল ইন্দ্রাণী। নিপুণ সেবিকার মতো। দম দেওয়া যন্ত্রের মতো। একটা তরল, দুটো বড়ি। আদিত্যর মুখ দেখে বুঝতে পারছে আরও কিছু বলতে চায় লোকটা, তবু খুব একটা আমল দিল না। আলমারির থেকে মশারি বার করে টাঙিয়ে দিল খাটের ছত্রিতে।

পাজামা-পাঞ্জাবিতে নিজেকে বদলে নিয়েছে আদিত্য। বসে আছে নিজের বিছানায়। খানিকটা বায়নার সুরে বলল,—এখন শুয়ে পড়ব? আমার ঘুম তো কেটে গেছে।

—থাক, তবু শুয়ে থাকো। ইন্দ্রাণী মশারির কোণ গুজছিল। ঝট করে মনে পড়ে গেল কথাটা। ক'দিন ধরেই খচখচ করছে। সোজা হয়ে বলল,—দীপু যে গত রোববার হসপিটালে গিয়েছিল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা হয়েছে ?

—কী ব্যাপারে ?

—চাঁদু বলছিল, দীপু নাকি এই বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে চায়। এই নিয়ে তোমাকে কিছু বলেছে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম কি একটা বলছিল বটে। মন দিয়ে শোনা হয়নি।

সুদীপ তা হলে কথাটা আদিত্যকেও বলেছে! তার মানে অনেকটাই এগিয়েছে তলে তলে! আদিত্যর ঠাকুর্দার আমলের বাড়িটার প্রতি ইন্দ্রাণীর যে তেমন কোনও মোহ নেই, তা সুদীপ ভালমতোই জানে। তবু কেন ইন্দ্রাণীর কাছে লুকোচ্ছে কথাটা। ফ্ল্যাট হয় তো হোক না, ইন্দ্রাণী কি বাধা দিতে যাবে ?

ইন্দ্রাণী সামান্য ঝাঁঝিয়েই উঠল,—কোথায় মন থাকে তোমার ? কি বলল সেটাও একটু ভাল করে শুনতে পারোনি ? শুধু নিজের সুখ। নিজের সুখ।

আদিত্য ম্লান হয়ে গেল। মিন মিন করে বলল,—ঠিক আছে, আমি দীপুকে আবার জিজ্ঞেস করে নেব।

—না, দীপুকে এই নিয়ে আর একটা প্রশ্নও করবে না।

—ঠিকই তো, দীপুর সঙ্গে কেন কথা বলব ? বাবার সঙ্গে কথা বলি। বাবাই তো এ-বাড়ির মালিক। কথাটা বলেই কেমন চুপসে গেল আদিত্য। হঠাৎই উৎকণ্ঠা মাখা গলায় প্রশ্ন করল,—ডাক্তার কি রাত্তিরে আসবে ?

—না। শুভাশিসের আজ কাজ আছে। কাল আসতে পারে।

—আজ এলে ভাল হত। বাবাকে একটু চেক করে যেত।

ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকে তাকাল,—কেন ? কী হয়েছে বাবার ?

—শরীরটা মনে হল ভাল নয়। আদিত্য ঢোক গিলল,—তখন কথা বলতে গিয়ে বেশ হাঁপাচ্ছিল।

জালের ভেতর কুঁজো হয়ে বসে আছে আদিত্য। ঠিক যেন ফাঁদে পড়া এক মানুষ! ইন্দ্রাণীর হঠাৎ কেমন মায়া হল। মানুষটার সবই আছে। হৃদয় আছে। হৃদয়ের প্রসারতা আছে। টান-ভালবাসা আছে। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো লোভ-কাম-নেশা কোনও কিছুরই কমতি নেই। অথচ কিছুই আবার তেমন করে নেইও। যেন প্রলম্বিত শৈশবে বিচরণ করে মানুষটা।

এমন একটা লোকের সঙ্গে কী কথা বলবে ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী নরম করে বলল,—বাবার ভাবনা আমরা ভাবছি। তুমি নিজের শরীরটাকে আগে সারাও তো দেখি। কী চেহারা করেছ!

আদিত্য ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল,—আমি একটা খুব বাজে লোক, তাই না ইন্দু ? অপদার্থ। গোঁয়ার। নেশাড়ু।

ইন্দ্রাণী কোমল ভ্রূকুটি করল,—সবই তো বোঝো। এখনও নিজেকে একটু বদলাতে ইচ্ছে করে না ?

—এবার বদলে যাব। আদিত্য শিশুর মতো হাসল,—মাইরি জীবনে আর কোনওদিন মাল ছোঁব না। মা কালীর দিব্যি।

—থাক, মা কালীকে তুলে আর নিজের পাপ বাড়িও না।

ইন্দ্রাণী বিছানার পাশ থেকে সরে এল। মনটা ভারী হয়ে আসছিল তার।

এ বছর প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কবির ভাষায় যাকে বলে দারুণ অগ্নিবাণ, বৈশাখের শুরু থেকে

তাই হেনে চলেছে সূর্য। শহরের পিচরাস্তা গলে যাচ্ছে তবু মাসভর তাপের কমতি নেই দিনমানে। ক'দিন হল অবশ্য আবহাওয়ার পরিবর্তন এসেছে একটু। তাপের সঙ্গে সারাদিন গরম শুকনো বাতাস বইত, বন্ধ হয়েছে সেই হাওয়াটা। তার বদলে এসেছে এক অসহ্য বাষ্পময় গুমোট। সূর্য উঠতে না উঠতেই গুমোট শুরু হয়ে যায়, দুপুরে ঘামভেজা শরীরে হাঁসফাস করে মানুষ, বিকেল হলেই কোথা থেকে ছুটে আসে একটা ছোট্ট কালো মেঘ। নিমেষে বিশাল আকার ধারণ করে গোটা আকাশের দখল নিয়ে নেয় মেঘটা। সাঁই সাঁই ঝড় ওঠে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসে শনশন। রুপোলি বিদ্যুতে চিরে যায় আকাশ। বৃষ্টি নামে। ঝমঝম ঝমাঝম। বড় জোর মিনিট দশেক। দিনের ক্লেদ মুছে যায়, মানুষজনকে সুখ বিলিয়ে উধাও হয়ে যায় মেঘখণ্ড। সন্ধে হতেই আকাশ জুড়ে জলসা বসায় তারারা। ভারি মনোরম এক বাতাস বয়। বুক জুড়োনো। বহুক্ষণ।

আজও যেন আকাশের সেরকমই মতিগতি। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাপের ঝাঁঝটা টের পাচ্ছিল ইন্দ্রাণী। চিট পিট গরমে ঘাড় গলা ভিজে যাচ্ছে, বনবন পাখার নীচেও চ্যাটচ্যাট করছে গা।

বিছানা ছেড়ে এক কাপ চা করে খেয়ে নিল ইন্দ্রাণী। দোতলাতেই। চটপট স্নানটাও সেরে নিল। যতক্ষণ শরীর ঠাণ্ডা থাকে ততক্ষণই আরাম। আজ রবীন্দ্রজয়ন্তী, ছোটখাট একটা ফাংশান আছে স্কুলে। ছাত্রীরা নাচবে, গাইবে, আবৃত্তি করবে, ক্লাস টেনের মেয়েরা ছোট নাটকও করবে একটা। স্কুলের সব টিচারকেই এসব অনুষ্ঠানে শেষ অবধি থাকতে হয়। প্রায় অলিখিত আইন। স্কুলের পর আজ একবার বাপের বাড়িও যাবে ইন্দ্রাণী।

আলমারি থেকে ইন্দ্রাণী একটা লাল পাড় সাদা তাঁতের শাড়ি বার করল। স্কুলে সে সাদা শাড়ি পরে যাওয়াই পছন্দ করে, আর আজ তো পরতেই হবে। এটাও আইন।

শাড়ি পরতে পরতে আয়নায় তিতিরকে দেখতে পাচ্ছিল ইন্দ্রাণী। এই গরমেও দু পা মুড়ে ঘুমোচ্ছে মেয়ে। পুবের জানলার পর্দা ভেদ করে এক টুকরো আলো এসে পড়েছে তিতিরের পাশ-ফেরা মুখে। ওইটুকু রশ্মিতেই তিতিরের মুখখানি যেন আধফোটা রজনীগন্ধার মতো অমলিন।

তিতিরকে দেখে মাঝেমাঝে ইন্দ্রাণীর আর একটা মেয়ের মুখ মনে পড়ে যায়। তারও বয়স ষোলো। অপরাহ্নবেলায় স্কুল থেকে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরছে মেয়েটা। ফিরেই ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দিল পড়ার টেবিলে। স্কুলের জামা বদলে ঝটপট পরে নিয়েছে রঙিন স্কার্ট-ব্লাউজ। আবার ছুটছে। ছুটতে ছুটতে জলখাবার খাওয়া। ছুটতে ছুটতে মা'র বকুনি। ছুটতে ছুটতে বন্ধুদের আড্ডায়। হি হি হা হা। ওই বয়সে কত রকম যে গল্প থাকে মেয়েদের ! গল্প। শুধুই গল্প। স্বপ্নের। কল্পনার। বিশ্বাসের। নিষিদ্ধ রোমাঞ্চের। যত না কারণে হাসি, তার বেশি অকারণে। তারপর যেই রাস্তার বাতিটি জ্বলল, ফেরো নিজ নিকেতনে। সেখানে ভাইয়ের সঙ্গে নিত্যনতুন খুনসুটি। বইখাতার দুনিয়ায় ডুব। রেডিওতে অনুরোধের আসর। এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি। আবার পড়াশুনা। আবার স্কুল। পরীক্ষা। গরমের ছুটি। পুজোর ছুটি। বাবা। মা। ভাই। তারপর ? তারপর ?

তারপর মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই সব কেমন গুলিয়ে যায়। গোপন ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ইন্দ্রাণীর বিশ্ব।

কোমরে কুঁচি গুজে কাঁধে প্লিটগুলোকে সাজাল ইন্দ্রাণী। তিতিরকে দেখে মাঝে মাঝে একটা আতঙ্কও হয় তার এখন। কেন যে হয় ! তিতির তো সম্পূর্ণভাবেই তার আত্মপ্রতিকৃতি। প্রায় প্রতিবিম্বসদৃশ ! ওই আধফোটা রজনীগন্ধাকে সে যে বহুবার ভ্রূণ অবস্থায় হত্যা করতে চেয়েছিল, লক্ষ বার মৃত্যুকামনা করেছে তার, সেসবও তো এখন প্রায় বিস্মৃত অতীত, কেউ জানবেও না কোনওদিন, তবুও কেন এই ভয় ?

ইন্দ্রাণী কাঁধে ছোট ব্রোচ লাগাল। কপালে এক বিন্দু লাল টিপ। মেয়েকে আলতো ঠেলল,—তিতির ওঠ, আমি বেরোচ্ছি।

তিতির চমকে উঠে বসল। তার ঘুম খুব পাতলা, প্রায় তিতির পাখির মতোই। বোধহয় কোনও স্বপ্নও দেখছিল সে, এখনও তার রেশ লেগে আছে ঘন আঁখিপল্লবে।

ইন্দ্রাণী আয়নায় ফিরে আলগা সিঁদুর ছোয়াল সিঁথিতে,—আমি আজ দুপুরে ফিরব না, মনে আছে তো ?

তিতির দু চোখ রগড়ে বুঝি স্বপ্নটুকু মুছল। ঘাড় কাত করল এক দিকে।

—বাবার খাওয়া দাওয়ার ওপর একটু নজর রাখিস।

—হুঁ।

দিন দশেক হল বাড়ি ফিরেছে আদিত্য, এখন সে অনেকটাই তাজা। তবে এখনও চোখে চোখে রাখতে হয় তাকে। তার জিভের স্বাদ বরাবরই তামসিক, এর মধ্যেই ছোটখাট উৎপাত শুরু করেছে রান্নাঘরে। পরশু সন্ধ্যার মার কাছ থেকে জোর করে কষা আলুর দম নিয়ে খেয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে আবার পেটে ব্যথা ওঠার উপক্রম। নেশাটা এখনও শুলোয়নি, এইটুকুই যা বাঁচোয়া। শুভাশিস পই পই করে বলে দিয়েছে সামান্য অনিয়মেই এসব রুগীদের গ্যাসট্রিক ধরে যায়। আরও মাসখানেক আদিত্যকে সাবধানে রাখতে হবে।

ইন্দ্রাণী বলল,—দেখিস আবার যেন উল্টোপাল্টা খেয়ে না বসে।

তিতির ছোট্ট হাই তুলে হাসল,—চান্স নেই। আমি আজ বাবাকে নামতেই দেব না।

—হুঁহ কী আমার পাহারাদার রে! কালও তো বেরিয়ে গেছিল! মোড়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল।

—সে তো মাত্র একবার। আজ আর হবে না।

তিতির উঠে বাথরুমে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বাপ্পার গলা। ভাইবোনে বাথরুমের দখল নিয়ে লড়াই বেধে গেছে।

ইন্দ্রাণী প্যাসেজে এল—তুই আজ এত তাড়াতাড়ি উঠেছিস যে!

বাপ্পার পরনে শর্টস, গা খালি। বাথরুমের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে সে। ইন্দ্রাণীকে দেখে বলল,—দ্যাখো না মা, বলছি আমার কাজ আছে, তাড়াতাড়ি বেরোব, তোমার মেয়ে...

তিতির হাউমাউ করে উঠল,—আমি ওকে কিছু বলিনি মা। ওই আমাকে টেনে বার করে দিল।

—মিথ্যে কথা।

—তুই মিথ্যেবাদী।

ইন্দ্রাণী চোখ পাকাল,—আস্তে। চেঁচিও না। সবাই ঘুমোচ্ছে। বাপ্পা, তিতিরকে ছেড়ে দাও।

তিতির বাপ্পাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

বাপ্পা গজ গজ করছে,—এটা কিন্তু জাসটিস হল না মা।

ইন্দ্রাণী হাসি চাপতে পারল না। তালঢ্যাঙা চেহারা হয়েছে ছেলের, এক দিন অন্তর দাড়ি কামায়, এখনও ঠোঁট ফোলানোর অভ্যেসটা গেল না। হাসতে হাসতেই বলল,—জাসটিস পরে হবে। এই সকালে তুই চললি কোথায় ?

—বলব না।

—এখন বেরোচ্ছিস, ফিরবি কখন ?

—বলব না।

—তোর না পরশু থেকে পরীক্ষা ? বই নিয়ে বসবি না তুই ?

—বলব না। বলেই বাপ্পার দাঁত বেরিয়ে গেছে,—দুৎ, ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা আবার পরীক্ষা নাকি ? সব্বাইকে পাস করিয়ে দেয়।

—তুই বড় ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছিস বাপ্পা।

—তুমি বড় কিপটে হয়ে যাচ্ছ মা। বাপ্পা আবদেরে শব্দ দিয়ে ভোলাতে চাইছে ইন্দ্রাণীকে,—তুমি বেরিয়ে গেলে প্রবলেম হত, পঞ্চাশটা টাকা ছাড়ো তো। আরজেন্ট দরকার।

—গত সপ্তাহেই তো দুশো টাকা নিলি ! এর মধ্যে শেষ ?

—ও টাকা একটা কাজে লেগে গেছে ।

—কী কাজ ?

—ক্রমশ প্রকাশ্য । তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তোমার টাকা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট হয়নি । হবেও না । দাও দাও, টাকাটা দাও ।

বাপ্পা কিছু চাইলে কেন যে না দিয়ে পারে না ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণী কপট রাগে বলল—নাও, মনের সুখে ওড়াও ।

বাপ্পা দু আঙুলে টাকাটা নাচাচ্ছে,—ধরো এটা লোন । উইথ ইন্টারেস্ট ফেরত দিয়ে দেব ।

—হুঁ, সেই ভরসাতেই তো আছি ! ইন্দ্রাণী একটা নিশ্বাস চেপে পায়ে চটি গলাল,—যে চুলোয় খুশি যাও, দয়া করে ঘরে ঢুকে দুমদাম বাবার ঘুম ভাঙিও না ।

তিতির বেরোতেই লম্ফ দিয়ে বাথরুমে সেঁধিয়ে গেছে বাপ্পা । দরজা বন্ধ করেও একটু ফাঁক করল,—আমি তোমার হাজব্যান্ডকে কখনই ডিসটার্ব করি না মা । তোমার হাজব্যান্ডই আমাকে ডিসটার্ব করে । বাই হিজ রয়াল প্রেজেন্স । বলেই সশব্দে দরজা বন্ধ করেছে ।

বাপ্পার স্বভাব পুরো সুদীপ বসানো । কথাবার্তা হাবভাব হাঁটাচলা সব কিছুতেই বড়কাকা তার আইডল । তার নির্ভরস্থলও । ভূত ভবিষ্যৎ অনেক কিছু নিয়েই কাকার সঙ্গে পরামর্শ চলে তার । লেখাপড়াতে বাপ্পা মন্দ নয়, হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন ছিল, চেষ্টা করলে সায়েন্স-এর কোনও সাবজেক্টে অনার্স নিতে পারত, নেয়নি । তার বদলে অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স পড়ছে । কাকার কথায় । সুদীপের মতে, সায়েন্সের একটা সাধারণ ছাত্র হয়ে বি-এসসি এম-এসসি পড়ার চেষ্টা করার থেকে কমার্সের উঁচু দিকের ছাত্র হলে আখেরে বেশি লাভ । বাপ্পা অসাধারণ মেধাবী কিছু নয়, বৈজ্ঞানিক, গবেষক কোনও কিছুই হওয়ার তার সম্ভাবনা নেই, তবে কেন সে ফালতু ওদিকে ঘষটাবে ! কথাটা ভুলও তো নয় । বাপ্পা যদি তার বড়কাকার কথাও মেনে চলে মন্দ কি ! না হয় বাপ্পা সুদীপের মতোই হল ! একটু উদারতাও থাকবে, একটু আত্মকেন্দ্রিকতাও থাকবে । আবার এ-জগতে চলার মতো ব্যবসায়িক বুদ্ধিটুকুও । এই না যথেষ্ট !

নীচে নেমে ইন্দ্রাণী একটু নিশ্চিন্ত হল । রান্নাঘরে সন্ধ্যার মা এসে গেছে । দুপুরে ইন্দ্রাণী বাড়ি ফিরবে না, সন্ধ্যার মা আজ ডুব মারলে বেশ অসুবিধেই হত ।

বড়সড় রান্নাঘর অদৃশ্য পাঁচিল তুলে দু ভাগ করা । এক দিকে মিনতি চায়ের জল চড়িয়েছে, অন্য দিকে সন্ধ্যার মা । এবার ধীরে ধীরে এ বাড়ির দিন শুরু হবে ।

সন্ধ্যার মা বলল,—চা হয়ে গেছে বউদি, খেয়ে বেরোও না ।

ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল । সাতটা পাঁচ । আটটার আগে ফাংশান শুরু হবে না, আর এক কাপ চা খেয়ে যাওয়াই যায় । কি ভেবে বলল,—থাক ।

কন্দর্প ঘরে নেই । ফেরেনি এখনও । কাকডাকা ভোরে লেকে জগিং করতে চলে যায় সে । ফ্রি হ্যান্ডও করে । ফিগার ঠিক রাখা সম্পর্কে সে বেশ সচেতন । ফিরতে ফিরতে আটটা বাজে তার । সকালের প্রথম চা সে বাড়ির বাইরেই খায় ।

বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ইন্দ্রাণী রুটিন মতো শ্বশুরের ঘরের দরজা ঠেলল । ঘুমোচ্ছেন জয়মোহন । উঁচু বালিশে মাথা রেখে । মৃদু মৃদু নাক ডাকছে । আদিত্য বাড়ি ফেরার পর থেকেই শরীরটা সুবিধের নেই শ্বশুরমশাইয়ের । নিজের ঘরের নিভৃত কোণটি ছেড়ে বেরোনই না বড় একটা । কথাবার্তা কম বলছেন, অবরে সবরে টিভি দেখেন, অনেক রাত অবধি হাঁপান বসে বসে । এই সকালের দিকেই যা একটু গভীর নিদ্রা আসে তাঁর ।

বড়ছেলেকে নিয়ে কি বেশি দুর্ভাবনা শুরু হয়েছে মানুষটার ! নাকি মেজছেলে বেশি চাপ সৃষ্টি করছে । অথবা ছোটছেলের বাউন্ডুলে জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তা ! জয়মোহনের যা অসুখ তাতে কোনও উদ্বেগই মাত্রায় স্থির থাকে না, চড় চড় চড়তে থাকে পর্দা ।

ইন্দ্রাণী আস্তে দরজাটা টেনে দিল। আহা ঘুমোন, ঘুমোন শান্তিতে। যেটুকুনি সময়ে ঘুমোয় মানুষ সেটুকুই তো মুক্তি।

বাইরে এক কুৎসিত সকাল গোমড়া মুখে ইন্দ্রাণীর প্রতীক্ষায়। সূর্যদেব এরই মধ্যে পূর্ণ মহিমায় ভাস্বর, তবে তাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ধোঁয়া ধুলোর আড়াল থেকে জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড মেঘনাদের মতো তাপ নিক্ষেপ করে চলেছে। পথচারীদের বিরক্ত দৃষ্টি বার বার আকাশের দিকে, প্রভাতফেরির শিশুরা গলদঘর্ম, দূর থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্রসঙ্গীতও কেমন এক অপ্রসন্ন ভাব গুলে দিচ্ছে বাতাসে।

ইন্দ্রাণীর স্কুল যাদবপুরে। বাড়ি থেকে হাঁটা আর বাস মিলিয়ে মিনিট পনেরো লাগে। মাঝারি সাইজের স্কুল। আটশো মতন ছাত্রী। জনা কুড়ি শিক্ষিকা। স্বাধীনতার পর পরই স্কুলটা হয়েছিল, এ অঞ্চলে মোটামুটি নাম আছে কাদম্বিনী গার্লস স্কুলের, গত বছরও মাধ্যমিকে প্রথম একশো জনের মধ্যে এই স্কুলের দুটি মেয়ে ছিল।

স্কুলে পৌঁছে ইন্দ্রাণীর খানিকটা ভাল লাগল। অল্পবয়সীদের চঞ্চলতার একটা আলাদা মাদকতা আছে, এদের সান্নিধ্যে এলে হৃদয়ের অনেক ভারই সাময়িকভাবে লঘু হয়ে যায়। স্কুলে এসে বহুদিনই এই অনুভূতি হয়েছে ইন্দ্রাণীর। আজও হচ্ছিল। রাশি রাশি কিশোরী এক আনন্দোৎসবের প্রস্তুতিতে হুটোপুটি করছে, লম্বা করিডোর ধরে ছুটে যাচ্ছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ উঠছে, হুড়মুড় নামছে, একটি মেয়ে চিৎকার করে ডেকে চলেছে বান্ধবীকে, উত্তর না দিয়ে হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে বান্ধবী, এই সমস্ত শব্দই যেন ধমনীতে রক্তের প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়। আজও দিচ্ছিল।

উৎসব শুরু হতে হতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। হেডমিস্ট্রেস নীলিমাদি একটু দেরি করে এসেছেন, সেই জন্য। নীলিমা অত্যন্ত রাশভারি ধরনের মহিলা। বছর পঞ্চান্ন বয়স, অবিবাহিতা, মেয়েরা তাঁকে যমের মতো ভয় পায়। অন্যের দেরি হলে তিনি প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু নিজের সম্পর্কে কোনও কথা ওঠা তাঁর পছন্দ নয়। কারণ থাকলেও না। আজকের উৎসবটি পরিচালনা করছে নিবেদিতা আর সুলেখা। দুজনেই প্রায় ইন্দ্রাণীর সমবয়সী। ছোট্ট একটু অনুষ্ঠান হবে, তবু তার জন্যই তারা রীতিমতো সিরিয়াস। তাদের হাতে হাতে লিখিত অনুষ্ঠানসূচি ঘুরছে। আধ ঘণ্টার গীতিআলেখ্যটি ভাব ও ভাষার সুতোয় গেঁথেছে নিবেদিতা, ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে দিয়ে শেষ মুহূর্তেও সেটা রিহার্সাল করাচ্ছে টিচার্স কমন রুমে। মেয়েটির থেকেও নিবেদিতার গলা অনেক বেশি আবেগে থরথর।

তা শেষ পর্যন্ত উৎসব মন্দ হল না। ছাত্রীরা তাদের সাধ্যমতোই নাচ গান অভিনয় করল। ছাত্রীদের পর দুজন শিক্ষিকাও গান গাইল। অণিমা আর রেবা। অণিমার গলা প্রায় পেশাদার শিল্পীদের মতোই, সে প্রত্যেক বারই দুটি করে গান গায়, আজও গাইল। রেবা একবার স্টেজে উঠলে নামতেই চায় না। প্রতিটি গান শেষ করে সে একবার সহশিক্ষিকাদের দিকে তাকায়, একবার ছাত্রীদের দিকে, তারপর আবার হারমোনিয়ামের বেলো টানতে শুরু করে। স্কুলের সেক্রেটারির বোন সে, তার স্বামী স্থানীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাবশালী, শিক্ষিকাদের মধ্যেও তার একটা বড়সড় ঘোঁট পাকানোর দল আছে, তাকে নীলিমাও সমঝে চলেন।

ইন্দ্রাণী ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। কমলিকাকে বার দুয়েক খোঁচালও—কিরে এ যে এগারোটা বেজে গেল, আমরা উঠব না ?

—দাঁড়াও, আগে রেবার সাধ মিটুক।

—সাধ মিটতে মিটতে আমাদের যে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। ইন্দ্রাণী ফিসফিস করল,—আনন্দধারা কেমন বেসুরে গাইল দেখলি ? আ আ আ আ টেনেই যাচ্ছে। অসহ্য।

সুলেখা রেবার উপদলের সক্রিয় সদস্যা, সে ইন্দ্রাণীর ফিসফিস শুনতে পেয়েছে। মধুর হেসে ইন্দ্রাণীকে বলল,—তুই তো ভাল গাইতিস এককালে, একটা গা না।

—ধুস, আমি আর গান গাই না।

—গা না একটা। তোর এত ভাল গলা ছিল। কথাটা বলেই নিষ্ঠুর হেসে হেডমিস্ট্রেসের দিকে তাকিয়েছে সুলেখা,—ইন্দ্রাণীকে একটা গাইতে বলুন না বড়দি, কত দিন ওর গান শুনিনি!

স্কুলে ইন্দ্রাণী পারতপক্ষে কারুর সম্পর্কে মন্তব্য করে না। একটু এড়িয়ে এড়িয়ে থাকে। ক্লাস নেয়, যেটুকু দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয় সেটুকু পেশাদারি দক্ষতায় পালন করে, দলাদলিতে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। কেন যে আজ মন্তব্যটা করে ফেলল!

ইন্দ্রাণী বলল,—কবে কোন কালে গাইতাম, গান আমি ভুলেই গেছি।

—একটা চেষ্টা করুন না ইন্দ্রাণীদি, ঠিক পারবেন।

—হ্যাঁ ইন্দ্রাণীদি, আজ আমরা আপনার গান শুনবই।

—গাও ইন্দ্রাণী। মেয়ে দারোগার গলায় হুকুম ছুঁড়লেন নীলিমা,—গান অ্যালজেব্রার ফরমুলা নয়, লোকে অত সহজে ভোলে না।

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে উঠতেই হল। হারমোনিয়াম টেনে বসল স্টেজে। স্কুলের হলে ছোট স্থায়ী মঞ্চ। পিছনে রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ছবি। ফুল। ফুলের মালা। ধূপ। ইন্দ্রাণী চোখ বুজল। বুকটা টিপটিপ করছে। কত কাল পর হারমোনিয়ামের রিডে আঙুল ঘুরছে। কাঁপছে। চোখ খুলল।

চোখের সামনে স্কুল নেই, ছাত্রীরা নেই, শিক্ষিকারা নেই, শুধুই এক মেঘলা আকাশ। রজনীগন্ধার গন্ধ মাখা। ধূপের সুরভি মাখা।

সহসা কাল মুছে গেল। ইন্দ্রাণী পিছিয়ে গেছে একুশটা বছর।

কলেজ সোশ্যালে গান গাইছে ইন্দ্রাণী। সামনেই এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। ঠিক সেকেন্ড রো'তে বসে আছে শুভাশিস। চোখ বার বার ফিরে যায় চোখে। আঁখিতে আঁখি ভেসে থাকে।

কী গান গেয়েছিল সেদিন ইন্দ্রাণী? ওই যুবকের চোখে চোখ রেখে? মনে পড়ছে না। কিছুতেই মনে পড়ছে না।

পরের লহমাতেই মনে পড়ে গেছে। হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে! কেউ নয়, কাউকে নয়, শুধু শুভাশিসকেই গান শোনাচ্ছে লাজুক তরুণী। সাক্ষী এক সজল আকাশ।

দু'চোখ ভরে গেল বাষ্পে। ইন্দ্রাণীর ক্লান্ত স্বর গেয়ে উঠল, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।

৮

একি! কী হয়েছে তোমার? ঘরে পা রেখেই ইন্দ্রাণী শিউরে উঠল।

ধীরাজ বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। মুখ শুকনো। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। একটা পা সামান্য মোড়া, অন্য পা ছড়ানো। ছড়ানো পায়ের পাতা মোচার মতো ফুলে আছে।

মেয়েকে দেখে ধীরাজের নিষ্প্রভ চোখে আলো জ্বলে উঠল,—এসেছিস তুই!

—এই দশা হল কী করে? কোথায় পড়লে?

ইন্দ্রাণীর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন উমা, বললেন,—আর বলিস না, বুড়ো বয়সে তোর বাবা এমন এক একটা কীর্তি করে বসে!

কয়েক দিন আগেই ফুটন্ত জল পড়ে হাত পুড়েছিল ধীরাজের। দুপুরে উমা ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁকে না ডেকে নিজে নিজেই চা করতে গিয়েছিলেন, তার থেকেই ওই বিপত্তি।

ইন্দ্রাণী অধীর স্বরে বলল,—হয়েছিলটা কি? ভূমিকা ছেড়ে আসল কথাটা বলবে?

—গত মঙ্গলবার পেনশন তুলতে গেছিল, ভিড়ের চাপে...

ধীরাজ বললেন,—আমি বলছি। এক তারিখ তো মে ডে-তে ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল, তিন তারিখেও কি একটা যেন...কি যেন ছিল গো?

উমা বললেন,—ব্যাঙ্ক স্ট্রাইক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বুধবার তো স্ট্রাইক ছিল। দেওয়ালে দেওয়ালে সব চার্টার অফ ডিমান্ডস টাঙিয়েছে দশ দফা না বারো দফা দাবি...

—আহ্। মেয়ে যা জিজ্ঞেস করছে সেই কথা বলো।

—ও হ্যাঁ। তা হয়েছে কি, আমি পেনশন তোলার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, একটু আগে আগেই বেরিয়েছিলাম...ক'টা নাগাদ যেন ?

উমা গোমড়া মুখে খাটের এক ধারে বসলেন,—আবার বেলাইনে ঢুকে গেলে ?

—না না বলছি তো। এই সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরোলাম। গ্যাসটা শনিবার ফুরিয়ে গেছে, আগে নামটা লেখালাম গিয়ে। কবে দেয় না দেয় ! ওদের তো আবার সাপ্লাইয়ের ঠিকঠাকানা নেই। আগের বার তো তেইশ দিনে...

ধীরাজের কথাবার্তা ইদানীং একেবারেই অসংলগ্ন। পারম্পর্যহীন। সতেরো বছর আগে একমাত্র ছেলে তনুময় নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছেন মানুষটা। তার আগেও যে খুব নিখুঁত ফিটফাট মাপাজোপা ছিলেন তা নয়। বাসে ছাতা ফেলে আসছেন, ডিম কিনতে গিয়ে পান কিনে আনছেন, ভুল বাসে উঠে অফিস পৌঁছতে দেরি করে ফেলছেন, এসব ঘটনা ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে ইন্দ্রাণী। তবু যেন এত অন্যমনস্ক ছিলেন না মানুষটা ! এখন যা দশা, প্রকৃত কাহিনী তাঁর মুখ থেকে উদ্ধার করাই দুরূহ।

ইন্দ্রাণী তবু ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকেই প্রশ্ন করে করে জানল ঘটনাটা। মাসের এক তারিখ আর তিন তারিখ বনধ, দু' তারিখ খুব ভিড় হয়েছিল ব্যাঙ্কে। বিশাল লাইন পেনশনভোগী বৃদ্ধদের। ধীরাজ টোকেন নিয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ ক্যাশ কাউন্টারে গোলমাল। কাউন্টারের ছেলেটি বুঝি কোনও এক সহকর্মিণীর সঙ্গে হাসি-মশকরা করছিল, ঘণ্টাভর দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধ অসহিষ্ণু হয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করে ফেলেন। পত্রপাঠ কাউন্টার থেকে উঠে চলে যায় ছেলেটি। বৃদ্ধের দলও উত্তেজিত, সবাই মিলে ছোটেন ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজার ছেলেটিকে অনেক বোঝায়, কিন্তু ছেলেটি অনড়। টেটিয়া বুড়োকে ক্ষমা চাইতে হবে। বৃদ্ধরাও অবিচল। ক্ষমা ! ওই অভদ্র ছোকরার কাছে ? কক্ষনও না। ম্যানেজার এসে বসুন কাউন্টারে।

এমত মহারণের মাঝে ধীরাজ নার্ভাস হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি আজন্ম ভীতু ধরনের মানুষ, বাসের কন্ডাক্টরের সঙ্গে কোনও যাত্রীর বচসা লাগলে সেই বাস থেকে নেমে যেতে পারলে বাঁচেন, ব্যাঙ্কের ভেতরে ওই চেঁচামিচিতে হাত-পা কাঁপছিল তাঁর। হঠাৎ আবার কাউন্টার খোলার রব ওঠে, তাড়াহুড়ো করে ব্যাঙ্কে ঢুকতে যান ধীরাজ, উত্তেজিত ও উৎপীড়িত গ্রাহকদের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যান তিনি। ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা তখনও গ্রাহকদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরেছে না জিতেছে সেই দ্বন্দ্বে বিভোর, তারা কেউ এগিয়ে আসেনি ধীরাজকে তুলতে। সৌভাগ্যক্রমে পাড়ারই একজন তাঁকে উঠিয়ে পৌঁছে দিয়ে যায় বাড়িতে। টোকেন জমা দিয়ে পেনশনের টাকাটাও।

সব শুনে ঝুম হয়ে দু দণ্ড বসে রইল ইন্দ্রাণী। মাত্র ন দিন এখানে আসেনি, তার মধ্যেই এই অ্যাক্সিডেন্ট ! মির্জাপুর বৈঠকখানার দিকে প্রায়ই আসতে হয় তাকে। এলেই ঢুঁ মেরে যায় বাপের বাড়িতে। সপ্তাহে এক দিন দু দিন তো বটেই। টানা সতেরো বছর ধরে এটা তার রুটিন। ক্বচিৎ কখনও ব্যতিক্রম হয়েছে এই নিয়মের।

বাবাকে দেখতে দেখতে বুকটা কনকন করছিল ইন্দ্রাণীর। এতটুকু ছোট্টখাট্টো শরীর ! হাড়পাঁজরা বেরিয়ে আছে ! বোতলের কাচের মতো চশমার নীচে নিষ্প্রাণ বড় বড় চোখ ! টকটকে ফর্সা রঙে বাদামি ছায়া ! বিছানায় বসে আছে জবুথবু ! কী যে করে ইন্দ্রাণী এই বাবাকে নিয়ে ! সামনের আশ্বিনে বাবার বয়স হবে উনসত্তর। আজকাল এটা তেমন বয়সই নয়, বহু মানুষই এই বয়সে চাকরি খুঁজে বেড়ায়। বাবার তেমন রোগব্যাধিও নেই, তবু যেন বড় বেশি নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। দৃষ্টি নিবে আসছে, মস্তিষ্ক ক্রমশ দুর্বল, স্মৃতিশক্তি প্রায় শূন্য। তবু একা সব কাজ সামলাতে

হয় মানুষটাকে। বাজার। রেশন। ইলেকট্রিক বিল। মুদির দোকান। গ্যাস। কেরোসিন। ইন্দ্রাণী যখনই আসে, যথাসাধ্য করে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে আর কতটুকুন ?

সহসা বাতাসে আছড়ে পড়ে এক অদৃশ্য চাবুক। মলিন দেওয়ালে ফুটে ওঠে এক জোড়া বিস্ফারিত চোখ। বিস্ময় মাখা। যন্ত্রণা মাখা। ঘৃণা মাখা।

কোথায় যে চলে গেল তনুটা !

বাবা-মা'র মুখ চেয়েও কি তনু এখন ফিরে আসতে পারে না ? এ জীবনে ইন্দ্রাণীর মুখ না হয় আর না'ই দেখল !

ইন্দ্রাণী বিষণ্ণ মুখে বলল,—তোমরা আমাকে একটা খবর দিতে পারোনি ?

উমা শ্বাস চেপে বললেন,—কাকে দিয়ে খবর দিই বল ?

—পাশে টুনুমাসিদের বাড়ি থেকে একটা ফোন করতে পারতে।

ধীরাজ বলে উঠলেন,—আমি তোর মাকে বলেছিলাম, তোর মা করল না।

উমা অপ্রস্তুত স্বরে বললেন,—ওকে মিছিমিছি ব্যস্ত করে কি লাভ হত ? বেচারার নিজেরই বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা ! আদিত্যকে নিয়ে কম ঝক্কি গেল।

—ও ঝক্কি তো আমার থাকবেই মা। না মরা পর্যন্ত।

—বালাই ষাট। ও আবার কি ছিরির কথা ! তা আদিত্য এখন আছে কেমন ?

—আছে। দিব্যি আছে।

—শরীর একটু ফিরেছে ?

—শুয়ে বসে স্যুপটা জুসটা খাচ্ছে, শরীর তো না ফেরার কথা নয় মা।

—আহা, ওভাবে বলছিস কেন ? কত বড় একটা ধাক্কা সামলে উঠল !

ইন্দ্রাণী কথা বাড়াল না। বাবার পায়ের কাছে গিয়ে বসল। আলতো করে হাত বোলাল ফোলা জায়গাটায়। বেশ গরম হয়ে আছে। ভারী গলায় বলল,—ডাক্তার দেখিয়েছ ?

—দেখিয়েছি।

—কাকে ?

—বিশ্বাস ডাক্তারকে। দিলু ডেকে এনেছিল।

দিলু মানে দিলীপ। পাড়ার পুরনো বাসিন্দা। তিন-চারটে বাড়ি পরেই থাকে। ইন্দ্রাণীর থেকে বছর পাঁচেকের বড়। বিয়ে থা করেনি। ফুটবল মাঠ, পাড়ার ক্লাব আর কর্পোরেশনের চাকরি নিয়ে সদা ব্যস্ত। পাড়ার দুর্জনেরা বলে, এক সময়ে নাকি ইন্দ্রাণীর ওপর ঘোরতর দুর্বলতা ছিল দিলীপের। ইন্দ্রাণী মানে না। এ বাড়িতে চিরকালই দিলুর সহজ যাতায়াত।

ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করল,—ডাক্তার কী বলল ? মুচকেছে ?

—তাই তো বলেছিল। মলম দিয়েছে, পেন কিলারও দিয়েছিল কয়েকটা।

—এক্সরে করতে বলেনি ?

—ব্যথা না কমলে করতে বলেছে।

—কমেছে ?

—কই আর ! কালও তো সারা রাত উঃ আঃ করছিল।

ধীরাজ করুণ মুখে বললেন,—পা তো মাটিতে রাখতেই পারছি না। বাথরুমে যেতে গেলেও তোর মা'র কাঁধে ভর দিয়ে...

—তবু এক্সরেটা করাওনি ? ইন্দ্রাণী ঘুরে তাকাল মা'র দিকে,—জানো কত সময়ে চুলের মতো সরু ফ্র্যাকচার হয় ! ডিসলোকেশানও হতে পারে ! গোড়াতেই ট্রিটমেন্ট না হলে কত দিন ভোগাবে তার ঠিক আছে !

—বুঝি। কিন্তু কি করে নিয়ে যাই বল ? আমি কি একা টানতে পারি ?

—দিলুদাকে বলতে পারতে।

—তাকে আর কত বলি ! ডাক্তারবদ্যি করল, দুবেলা খবর নিয়ে যায়, নিজে থেকে বুড়োবুড়ির যা হোক কিছু বাজার করে দিয়ে যাচ্ছে...

—তবুও মেয়েকে খবর দেওয়া যায়নি ?

—রাগ করিস কেন ? তুই-ই তো দেখিস। ভাবলাম খবর পেলেই তো হাঁচোড়-পাচোড় করে ঢাকুরিয়া থেকে মানিকতলা ছুটে আসবি, বরং দেখি আর ক'টা দিন ! যদি কমে যায় !

ইন্দ্রাণীর বুক মুচড়ে উঠল। আসল কথা টাকা। টাকা নেই ! এ জি বেঙ্গলের সাধারণ চাকরি করা বাবা ক'টা টাকা আর পেনশান পায় ! বড় জোর হাজার দেড়েক। সঙ্গে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ মেরে কেটে তিন-চারশো। এই টাকাতে বাড়িভাড়া আছে, দুটো প্রাণীর খাওয়া আছে, ওষুধবিষুধ আছে, ছোটখাট লোকলৌকিকতা আছে। মা'র আবার প্রেশার হাই, সারা মাস প্রেশারের বড়ি খেতে হয়, তার একটা খরচা আছে। এর পরও কি একশো-দেড়শো টাকা হুট বলতে বার করা যায় ! অথচ মা সে কথা মুখ ফুটে বলবে না। কিছুতেই না। ইন্দ্রাণী দিতে চাইলেও হাঁ-হাঁ করে উঠবে। অদ্ভুত সব থিয়োরি মা'র ! মেয়ের টাকা মানে অন্য সংসারের টাকা ! বিবাহিত মেয়ের নিজের রোজগারেও মা বাবার অধিকার নেই !

ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে বলল,—আমি আজ ডাক্তার এক্সরে সব করিয়ে তবে যাব। উঁহু, তর্ক নয়, আমার খুব খিদে পেয়েছে। ভাতটাত আছে ?

—এক্ষুনি ফুটিয়ে দিচ্ছি। উমা খুশিতে ঝলমল,—যা, ঝট করে চান সেরে চলে আয়। গরমে তো একেবারে বেগুনপোড়া হয়ে এসেছিস !

—তা তো হয়েছিই। যা রোদ্দুর !

পাখার তলায় বসেও ঘাম শুকোচ্ছিল না ইন্দ্রাণীর। আঁচলে মুখ মুছল ভাল করে। দ্বিধান্বিতভাবে বলল,—চান যে করব, জল আছে ?

—ওই আছে একরকম। তোদের বাড়ির মতো আয়েশ করে হবে না, তবে হয়ে যাবে।

—দিবাকরদারা জল ঠিক দিচ্ছে এখন ?

—আধ ঘণ্টা করে দেয়। দু বার। ছিরছির করে পড়ে।

—আমি কি আর একবার ওদের সঙ্গে কথা বলব ?

—থাক, বার বার বলে কেন মুখ নষ্ট করবি ! ওরা তো চায়ই আমরা কষ্ট-টষ্ট পেয়ে উঠে যাই।

—আবার কি কিছু শুনিয়েছে নাকি ?

—শোনাতে হয় না, হাবেভাবে বোঝা যায়।

ধীরাজরা এ বাড়িতে এসেছেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ইন্দ্রাণী তখন খুবই ছোট, তনুময় হয়নি। আগে তাঁরা থাকতেন বিডন স্ট্রিটের পাশে এক গলিতে। বাড়িটা বেশ প্রাচীন, তবে মন্দ ছিল না। বিশাল বিশাল সাইজের ঘর, প্রায় হলঘরের মতো। বড় বড় দরজা জানলা। এক টুকরো ছাদ। চিলেকোঠায় ঠাকুর ঘর। শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্যই একটা আলাদা গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক। দোতলার রেলিংয়ের বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়ালে সোজা হেদুয়ার জল দেখা যায়। ভাড়াও ছিল অনেক কম, মাত্র ষাট টাকা। বহরমপুর থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসে প্রথম ওই বাড়িটাতেই নতুন বউ নিয়ে উঠেছিলেন ধীরাজ। তা সেই বাড়ি কপালে সইল না। কলকাতায় অবাঙালি ব্যবসায়ীদের ভিড় তখন বাড়তে শুরু করেছে, উত্তর প্রদেশের এক কালোয়ার মাত্র আশি হাজার টাকায় কিনে নিল গোটা বাড়ি। কিনেই একতলা দোতলার ভাড়াটেকে নোটিস। একতলার দত্তরা গ্রাহ্যই করল না, দোতলার ধীরাজ ভয়ে চুপসে গেলেন। কালোয়ারটি বোধহয় ধীরাজের নাড়ি টের পেয়েছিল, হেদুয়ার মোড়ে তিন-চারটে জবরদস্ত চেহারার লোককে পিছনে দাঁড় করিয়ে, মধুর ভাষায় ভয় দেখাল একদিন। তনুময় তখন সবে উমার পেটে এসেছে, গর্ভবতী স্ত্রী আর শিশুকন্যা নিয়ে পড়িমড়ি করে মানিকতলার এই বাড়িতে উঠে এলেন ধীরাজ। এ বাড়ির ঘর তিনটে আগের বাড়ির

মতো বড় না হলেও ছোট বলা যায় না । ভেতরের দিকে একটা চওড়া বারান্দা আছে, এক ফালি উঠোনও । যখন এসেছিলেন তখন নতুন ছিল বাড়িটা, ধীরাজরাই এ বাড়ির প্রথম ভাড়াটে ।

আগের বাড়ির স্মৃতি ইন্দ্রাণীর কাছে খুবই আবছা । শুধু রেলিংতোলা বারান্দাটুকু যা চোখে ভাসে কখনও-সখনও । প্রখর দুপুরে, সূর্য যখন মাঝগগনে, মাথার কাঠের ঘেরাটোপ দিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া রোদ্দুর এসে পড়ত বারান্দায়, ঝিলমিল একটা ঢেউ খেলত সারা দুপুর । বাকি সব সময়েই বারান্দা ছায়ায় মোড়া । ঘুলঘুলিতে বুকুম-বুকুম পায়রার ডাক । ওই ছেঁড়া ছেঁড়া রোদ্দুরের ঢেউ, ছায়ার নিঃশব্দ ঘোরাফেরা আর পায়রার বুকুম-বুকুম এখনও মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণীর স্বপ্নে আসে । বহু দূরে ভাসমান ছবির মতো । রহস্যময় । অস্পষ্ট ।

তবে ওই বাড়ির প্রতি ইন্দ্রাণীর তেমন কোনও টান নেই । থাকার কথাও নয় । তার যা টান ভালবাসা সব এই মানিকতলার বাড়িটাকে ঘিরেই । এখানেই সে অনেক কিছু পেয়েছে । মুক্তোদানার মতো শৈশব । পান্নারঙ কৈশোর । প্রথম যৌবনের হীরকদ্যুতি । ইন্দ্রাণীর শৈশবের সব চেয়ে স্মরণীয় প্রাপ্তিও এখানে এসেই । তার ভাই । ছোট্ট ইন্দ্রাণীর মনে বহু দিন বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তনু বুঝি লুকিয়েছিল এই বাড়ির কোনও আনাচে-কানাচে, টুক করে একদিন কি করে যেন খসে পড়ল মা'র কোলে ! ভাইকে আদর করার সময়ে যেন এই বাড়িরই নতুন নতুন গন্ধটা পেত ইন্দ্রাণী ।

ধীরাজ উমাও এখানে এসে স্বস্তি পেয়েছিলেন । বিডন স্ট্রিটে বাড়িঅলার তেমন প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব ছিল না, তারা থাকত শ্যামবাজারে, মাসে মাসে এক বুড়োবাবু এসে ভাড়া নিয়ে যেত, ব্যস । এখানে মাথার ওপর বাড়িঅলা । অচিরেই তাদের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব হয়ে গেল । একতলা থেকে মোচা শুক্তুনি যাচ্ছে দোতলায়, দোতলা থেকে নেমে আসছে হরেক রকম আচার । ওপরের মনোতোষবাবু এককালে সশস্ত্র বিপ্লবীদলে ছিলেন, মুরারিপুকুর বোমা মামলায় জেলও খেটেছেন, তিনি তো তনুময়ের জন্মের পর একেবারে আত্মহারা । যেন নিজেরই ঘরে নাতি এসেছে । তাঁর স্ত্রী তনুময়ের জন্য সর্ষের বালিশ বানিয়ে দিলেন, মনোতোষবাবু সংগ্রহ করে আনলেন খাঁটি ইটালিয়ান জলপাইয়ের তেল । ইন্দ্রাণী সারাক্ষণ ঘুরছে ওপরের পুতুলদির পায়ে পায়ে । ওপরেই স্নান, ওপরেই খাওয়া, ওপরেই ঘুম ।

কবে থেকে যে সেই ঘনিষ্ঠতায় চিড় ধরতে শুরু করল ! পঁয়ষট্টিতে মনোতোষবাবু যখন মারা গেলেন তখনও সম্পর্ক তত তিক্ত হয়নি, তিনি বিদায় নেওয়ার বছর দশেকের মধ্যে শত্রুতা তুঙ্গে । আপোসি ধীরাজ যথাসাধ্য ভাড়া বাড়ালেন । দেড়শো থেকে ধাপে ধাপে আড়াইশো । আড়াই থেকে সাড়ে তিন । মনোতোষের ছেলে দিবাকর সাধারণ এক ড্রাফটসম্যান । সে এই ভাড়াতে ভীষণ অসন্তুষ্ট । তার স্ত্রী যখন তখন ওপর থেকে ময়লা ফেলছে নীচে, কারণে অকারণে জল কমিয়ে দিচ্ছে, ছুতো পেলেই চারটি কথাও শুনিয়ে দেয় ঠারে ঠোরে । ধীরাজদের ঘরের কলি পর্যন্ত ফেরানো হয়নি আজ এক যুগ । তনুময় নেই, ইন্দ্রাণী থাকে না, এই নির্বিরোধী বুড়োবুড়িকে ঘাড় ধরে তোলাও মুশকিল, তাই বোধহয় তাদের আক্রোশও বেড়ে চলেছে দিন দিন । ছোটবেলায় যে দিবাকর ঘুড়ি ওড়ালে ইন্দ্রাণী তনুময় বিশ্বস্ত পার্শ্বচরের মতো লাটাই ধরে থাকত সেই দিবাকর এখন যেচে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না । সামনাসামনি পড়লে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় । ছেলেমেয়ে তিনটেকেও মহা ত্যাঁদোড় তৈরি করেছে । এইটুকু গেঁড়ি গেঁড়ি ছেলেমেয়ে তিতিরকে দেখে অসভ্য অঙ্গভঙ্গি করে ! বাপ্পা তো রেগেমেগে চড়ই কষাতে গিয়েছিল একদিন ।

ইন্দ্রাণী রাগত স্বরে বলল,—ওদের হাবভাব তোমাদের অত বোঝার দরকার কি ? একদম চোখ কান বুজে থাকবে ।

—তাই তো থাকি । উমা উদাস,—জানিস পয়লা বৈশাখ রাতুলরা উঠে গেল । ওখানে নতুন ভাড়াটে আসছে । দু হাজার টাকা ভাড়া । পঁচিশ হাজার সেলামি । তার ওপর আবার বাড়ি সারানোর জন্য দশ হাজার আগাম । রাতুলরা মাত্র চারশো টাকায় ছিল ।

ইন্দ্রাণী মা'র শেষ কথাগুলো শুনছিল না, প্রশ্ন করল,—কোথায় গেল রাতুলরা ?

[illegible]। রাতুল বড় বাড়ি করেছে। যাওয়ার দিন রাতুলের মা'র আনন্দ যদি দেখতিস!

রাতুল তনুর খুব বন্ধু ছিল। একই সঙ্গে ভর্তি হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। যাদবপুরে। রাতুল [illegible], তনু সিভিল। হায়ার সেকেন্ডারির আগে থেকেই রাজনীতিতে মন চলে গিয়েছিল তনুর। রাত জেগে নানান লিফলেট পড়ত, গোপন রাজনৈতিক পত্রপত্রিকাও। কলেজে ঢুকেই [illegible] ঝাঁপিয়ে পড়ল নকশালপন্থী আন্দোলনে। রাতুলও সঙ্গে ছিল তার।

তনুদের আন্দোলন কবেই থেমে গেছে। মুক্তির দশকের স্বপ্ন এখন প্রাগৈতিহাসিক ছলনা। রাতুল এখন পুরোপুরি গৃহী। সি এম ডি এ-র প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। বউ সুন্দরী আধুনিকা। ফুটফুটে একটা মেয়েও আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে। ফুল ফ্যামিলি বছরে পনেরো দিন মুসৌরি নৈনিতাল বেড়াতে যায়। একটা বাড়িও হাঁকিয়ে ফেলল। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে।

আর তনু?

একটা জমাট ডেলা গলায় নিয়ে বাথরুমে এল ইন্দ্রাণী। আধো অন্ধকার অপরিসর জায়গাটুকুতে সার সার জলপাত্র। গোটা পাঁচেক বালতি আর গামলায় জল টলটল। কী কষ্ট করে জল সঞ্চয় করে মা! ইন্দ্রাণী কিছুতেই প্রাণে ধরে জলটা খরচ করতে পারছিল না। মগে একটু তুলে মুখে চোখে ছিটোল শুধু।

বাহাত্তরের সেই কালসন্ধ্যায় রাতুলই সংবাদটা এনেছিল। ইন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়িতে। তনু সাংঘাতিকভাবে আহত। এক ডাক্তারের ফ্ল্যাটে গোপনে চিকিৎসা চলছে তার।

এক বৈশাখ মাসে কমিউনিস্ট পার্টির নতুন বিভাজন দিয়ে যে সংগ্রামের প্রকাশ্য সূচনা, তার শহুরে ধরটি তখন প্রায় স্তিমিত। সশস্ত্র সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক বিপ্লব সব তখন স্তব্ধপ্রায়, চারদিকে কেবল রাজনৈতিক খুনজখম আর পুলিশের বলগাহীন অত্যাচার। গত এক দেড় বছরে বারাসত, ডায়মন্ডহারবার, কোন্নগরে বেশ কয়েকটা গণহত্যা হয়ে গেছে, এদের সকলকে ছাপিয়ে গেছে বরানগর কাশীপুর। সেখানে রাজনৈতিক প্রতিশোধের নেশায়, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার তাণ্ডবে, দেড়শো জনেরও বেশি টাটকা যুবক শেষ। আন্দোলনের নেতারা চরম মতানৈক্যে ভুগছেন। শহরে সংগ্রাম মুলতুবি রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

তনুময় তখনও বাড়িছাড়া। এক দিকে পুলিশ খুঁজছে তাকে, অন্য দিকে বিপক্ষ দলের অস্ত্রধারীরা। তারই মধ্যে গোপনে এক আধ দিন মাঝরাতে বাড়ি আসে তনু, ভোরের আগে পালিয়ে যায়। ছেলের জন্য চিন্তায় চিন্তায় ধীরাজ উমার বিনিদ্র রাত কাটে। এই বুঝি তনুর কিছু ঘটে গেল!

এমন সময়ে ওই মারাত্মক খবর! ইন্দ্রাণী উদভ্রান্তের মতো রাতুলের সঙ্গে তক্ষুনি ছুটেছিল। তখনও নিয়তির খেলা টের পায়নি সে।

ডাক্তারের ফ্ল্যাটের বেল টিপতেই দরজা খুলেছে ডাক্তার। ইন্দ্রাণী তড়িৎস্পৃষ্ট। শুভাশিস!

তিন বছর পর সেই প্রথম শুভাশিসের সঙ্গে দেখা।

শুভাশিসকে সেই মুহূর্তে কী অচঞ্চল দেখাচ্ছিল! তার বুকেও যে আফ্রিকান ড্রাম বাজছে, এতটুকু বুঝতে পারেনি ইন্দ্রাণী।

শান্ত স্বরে শুভাশিস ডেকেছিল,—এসো। তনুময় আমার কাছেই আছে।

শুভাশিসের তখনকার ফ্ল্যাটটা বেশ ছোট্ট। দু কামরার। চেতলায়। ভেতরের ঘরে শুয়েছিল তনু। দরজা থেকে ওই ঘরের দূরত্ব কতটুকুই বা, বড় জোর দশ-বারো পা। ওইটুকু পথ অতিক্রম করতে কত আলোকবর্ষ হেঁটেছিল ইন্দ্রাণী! বিছানায় আধো অচেতন শুয়ে আছে একমাত্র ভাই, কাঁধে উরুতে তার পাইপগানের গুলির ক্ষত, মাথায় লোহার রডের আঘাত, তবু ইন্দ্রাণীর চোখ বার বার ঘুরে যায় অন্য দিকে। একটা ধারালো নখ আঁচড়ে ফালা ফালা করে দেয় হৃৎপিণ্ড।

...আদিত্যের সঙ্গে বিয়ের মাত্র এগারো দিন বাকি। কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় একটু আগে দুই পার্টিতে বোমাযুদ্ধ হয়ে গেছে। পুলিশে পুলিশে চারদিক ছয়লাপ। প্রেসিডেন্সি কলেজের পাশের গলিতে

তখনও পড়ে এক তরুণের টাটকা মৃতদেহ। কলেজ স্কোয়্যারে একা একা দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী। ত্রস্ত। উদ্বিগ্ন।

শুভাশিস আসবে। শুভাশিস কথা দিয়েছে আসবে। আজই নিতে হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

মাথার ওপর বৃষ্টিহীন শ্রাবণের চড়া রোদ্দুর। বাতাসে বারুদের ঘ্রাণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় গেল ইন্দ্রাণীর।

শুভাশিস এল না।

ইন্দ্রাণী বিপদ ভয় তুচ্ছ করে খুঁজছে শুভাশিসকে। হাসপাতালে গেল, নেই। কলেজে নেই। মরিয়া হয়ে শুভাশিসের হোস্টেলে। সেখানেও নেই শুভাশিস। আগের দিন সকালেই নাকি চলে গেছে কলকাতার বাইরে। কবে ফিরবে কেউ জানে না।...

রাতুল চলে যাওয়ার পর ফ্ল্যাটে মাত্র তিনটি প্রাণী। প্রতিপক্ষ দলের শিকার হয়ে একজন অসাড় পড়ে আছে বিছানায়, একজন কাঠের পুতুলের মতো তার শুশ্রূষা করে যাচ্ছে, তৃতীয় জন স্থবির। নির্বাক। পুরনো অপমানে বিদীর্ণ হচ্ছে তার হৃদয়।

তনুর তখনও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি, জ্ঞান এসে এসে চলে যাচ্ছে। ইন্দ্রাণী যখন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফেরার জন্য উঠেছে, তখনই শুভাশিস ডাকল পিছন থেকে,—তুমি কি আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবে না রানি ?

ইন্দ্রাণী কঠিন মুখে বলেছিল,—কী বলব ?

—কিচ্ছু বলার নেই ! আমাকে গালাগাল করতে পারো, আমার গায়ে থুতু ছেটাতে পারো, বাট ডু সামথিং।

—কী লাভ ?

—তোমার লাভ নেই, আমার আছে। আমি যে সব বলতে চাই রানি।

—কৈফিয়ত ?

—না। কনফেশান।

কেন সেদিন দেখা হয়েছিল শুভাশিসের সঙ্গে ? কেন তনুর বন্ধুরা তনুকে নিয়ে গিয়েছিল শুভাশিস সেনগুপ্তর কাছেই ? আরও তো অনেক ডাক্তার ছিল কলকাতায় ?

সেদিন যদি শুভাশিসের সঙ্গে দেখা না হত কত অন্যরকম হতে পারত সব কিছু। তনু হারিয়ে যেত না ! বাবা মা এমন অবলম্বনহীন হয়ে পড়ত না ! ইন্দ্রাণীর বুকেও বিঁধে থাকত না অসংখ্য গোপন কাঁটা !

স্যাঁতসেতে কলঘরে উমার জমানো জল থেকে বাষ্প উঠছে। বাষ্পটুকু মেখেও শরীরের জ্বালাপোড়া ভাবটা যাচ্ছিল না ইন্দ্রাণীর।

খাওয়ার সময়ে উমা বললেন,—যদি রাগ না করিস তো একটা কথা বলি ?

গরম ভাতে আলুসেদ্ধ ঘি মেখে গোগ্রাসে খাচ্ছে ইন্দ্রাণী। ক্ষিদে তো পেয়েছিলই, কিন্তু ক্ষিদেটা যে কত জব্বর খেতে বসে টের পাচ্ছে। স্কুলের মিষ্টির প্যাকেট হজম হয়ে গেছে কখন। আলুসেদ্ধ ভাত এখন যেন অমৃত। খেতে খেতেই বলল,—বলে ফেলো।

উমা গলা নামালেন,—বেলেঘাটায় তারাপীঠ থেকে এক সাধু এসেছে, ভূত ভবিষ্যৎ সব নাকি বলে দেয় !

—তাই বুঝি ?

—তোর বিশ্বাস হচ্ছে না ! টুনুর ননদ গিয়েছিল, সাধুবাবা বলেছিলেন সাত দিনের মধ্যে মেয়ের জন্য ভাল পাত্রের সন্ধান এসে যাবে, তিন দিনের মাথায় টুনুর ননদাই একটা ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের খবর পেয়ে গেছে !

—বাহ, দারুণ গপ্পো তো ! কাক তাল গাছে বসল, ওমনি তাল খসে পড়ল !

—ওরকম করছিস কেন ? চল না একবার।

—গিয়ে ?

উমা চুপ করে গেলেন। ইন্দ্রাণীরও খাওয়ার গতি ধীর হয়ে গেল। মৃদু স্বরে বলল,—ওসব করে এর কী হবে মা ! অনেক তো করলে !

উমা বড় করে শ্বাস ফেললেন,—শুধু আমি কেন, তুইও একবার দর্শন করে আসতে পারিস।

—আমি ! কেন ?

—আদিত্যর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন সাধুবাবা !

—তা আমি কেন ? যার ভবিষ্যৎ জানতে চাও তাকেই নিয়ে যাও। তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

—স্বামীর ভবিষ্যৎ আর স্ত্রীর ভবিষ্যৎ কি আলাদা হয় রে বোকা ? যে কেউ একজন গেলেই হল।

—তুমি যে এখনও কোন যুগে পড়ে আছ মা ! ইন্দ্রাণী হাসল,—শোনো, তোমার জামাইয়ের ভবিষ্যৎ বলবে এমন সাধুবাবা এখনও জন্মায়নি। কৈলাস থেকে স্বয়ং শিব নেমে এলেও তোমার জামাইকে সেলাম ঠুকে ষাঁড়ের পিঠে চেপে হাওয়া মারবে। বলবে, ওরেব্বাস এ যে আমার ওপরে তিন কাঠি !

মেয়ের কথার ভঙ্গিতে উমাও হাসছেন,—যাই বলিস বাপু, যখন মা বলে এসে প্রণামটি করে, তখন কিন্তু মনটা একেবারে জুড়িয়ে যায়।

আদিত্যর ওপর উমার অসীম স্নেহ। নেশাভাঙ সব কিছু মিলিয়ে আদিত্যই তাঁর কাছে সাক্ষাৎ শিব।

ইন্দ্রাণী মাকে আর খোঁচাল না। বলল,—ঠিক আছে, এর মধ্যে এসে একদিন নিয়ে যাবখন।

উমা চারাপোনার ঝোল ঢেলে দিলেন মেয়ের পাতে। কয়েক সেকেন্ড চুপ। আবার একটা লম্বা শ্বাস পড়ল,—আমি তো ভবিতব্য মেনেই নিয়েছি। তোর বাবার জন্যই যাওয়া। মানুষটার দিকে তার তাকানো যায় না।

ইন্দ্রাণী খাওয়া থামিয়ে মাকে দেখছিল। একঘেয়ে সুরে বিনবিন করে চলেছেন উমা,—সন্ধে হলেই নেশার মতো টিভি খুলে বসবে। কি দেখে, না নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা ! কাগজ খুলেও শুধু একটাই জিনিস পড়ার নেশা ! নিরুদ্দেশের খবর আর দুর্ঘটনার খবর ! কোথায় কোন বেওয়ারিশ ঘড়ি পাওয়া গেল... রেল দুর্ঘটনায় কারা মরল তাদের নাম ধাম ! যত দিন যাচ্ছে, তত এই পাগলামিটা বাড়ছে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে...

—আহ মা, থামবে ? ইন্দ্রাণী প্রায় ককিয়ে উঠল,—আর কোনও কথা নেই তোমার ? এতক্ষণ এসেছি, একবার তো কই নাতি নাতনির খবর জিজ্ঞেস করলে না ?

বাইরে হঠাৎ ঝমঝম শিলাবৃষ্টি শুরু হয়েছে। সামনের উঠোনে আছড়ে আছড়ে পড়ছে বড় বড় বরফের গুলি। পড়েই ভেঙে চৌচির। কাচের টুকরোর মতো ছিটকোচ্ছে চারদিক। স্প্লিনটার হয়ে।

—তারা তো ভালই আছে। বেঁচেবর্তে আছে। উমা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছলেন।

ইন্দ্রাণী বলল,—ঘরে যাই চলো। একটু গড়িয়ে নিই, তারপর বাবাকে নিয়ে বেরোব।

উমা দূরমনস্ক। ফিসফিস স্বরে বললেন,—তোর কী মনে হয় রে ইনু ?

—কিসের কী ?

—ছেলেটা কি এখনও বেঁচে আছে ?

৯

তিতিরই প্রথম দেখল রঘুবীরকে। প্রেসঘর থেকে।

একটু আগে-আগেই সাজগোজ সেরে নেমে এসেছিল তিতির। বন্ধুরা আসবে। দেবস্মিতা হিয়া আর

ঝুলন। দুপুরে আজ তাদের সিনেমার প্রোগ্রাম। জন্নৎ আউর জাহান্নম। ঝুলনের টিকিট কেটে রাখার কথা।

দুটো বাজতে দশ। আড়াইটের আগে বন্ধুদের আসার চান্স নেই। সদরের সামনে পায়চারি করতে করতে প্রেসঘরে উঁকি দিয়েছিল তিতির।

দিয়েই অবাক। অ্যাটম! দিব্যি টুলে পা ঝুলিয়ে বসে গল্প করছে মেশিনদাদুর সঙ্গে!

—কি রে, তুই না গরমের ছুটির টাস্ক করতে বসেছিলি? উঠে এসেছিস যে?

অ্যাটমের মুখে ধূর্ত হাসি,—জিওগ্রাফির আনসার করাতে করাতে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল।

—তুইও সঙ্গে সঙ্গে কাট্টিস? কাকিমার যদি একবার ঘুম ভাঙে...

—মিনতিদি চা না দিলে মা'র ঘুম ভাঙবেই না। পরমানন্দে পা নাচাচ্ছে অ্যাটম,—মিনতিদি বেরিয়ে গেছে, আমি দেখেছি।

—মহা শয়তান হয়েছিস তো তুই!

—অ্যাই দিদিভাই, দশটা পয়সা দে না।

—কী করবি?

—অ্যাটম চোখের ইশারায় মেশিনদাদুকে দেখাল।

মেশিনম্যান দুর্লভ দাস হাসছে মিটিমিটি। এক তাড়া কাগজ গোছ করতে করতে ঘাড় দোলাচ্ছে,—বিনি পয়সায় হবে না গো দাদুভাই। দশটা পয়সা দাও, একটা স্বপ্ন কিনে নিয়ে চলে যাও। আর রাতভর মজাসে দ্যাখো।

মেশিনদাদু খেলাটা অ্যাটমের সঙ্গেও শুরু করেছে! বছর সাত আট আগেও মেশিনদাদুর সঙ্গে তিতিরের খুব জমত খেলাটা। পাঁচ পয়সা দিলে একটা স্বপ্ন। দিনে একটার বেশি স্বপ্ন কখনই নয়।

ট্যাঁকে পয়সাটা গুঁজে মেশিনদাদু বলত, —চোখ বোজো।

তিতির বলত,—বুজেছি।

—এই নাও স্বপ্ন। এইইই দুটো ডানা লেগে গেল তোমার পিঠে। ওড়ো এবার। ওড়ো। উড়ছ? এ-বার সোওওজা আকাশে উঠে যাও। আকাশে কত তারা ঝিকমিক করছে দেখতে পাচ্ছ? কোন তারাটাকে ছোঁবে তুমি? বেশ, ওই সবজে তারাটাকে ছোঁও আগে। ওর নাম পুষ্যা। এবার চলো হস্তার কাছে। স্বাতীর সঙ্গেও একবার দেখা করবে নাকি?

কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! স্বপ্নটা রাত্তিরে সত্যি সত্যি চলে এসেছে তিতিরের ঘুমে! দু হাতে মেঘ সরিয়ে ডানা মেলে উড়ছে তিতির!

এককালে এ রকম কত স্বপ্ন যে মেশিনদাদুর কাছ থেকে কিনেছিল তিতির! মাছ হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। পিঁপড়ে হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। ফুল হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। প্রজাপতি হওয়ার স্বপ্ন। গাছ হওয়ার স্বপ্ন।

তিতির হাসতে হাসতে বলল,—তোমার স্বপ্নের রেটটা বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে?

দুর্লভ ঘাড় দুলিয়েই চলেছে, —মাগগিগণ্ডার বাজার রে দিদি। ওই দামে আর পেরে উঠি না।

—তা বলে একেবারে ডবল? পাঁচ পয়সা থেকে দশ পয়সা?

—আলু পটলের দামই তো পাঁচ-দশ গুণ বেড়ে গেল রে, স্বপ্নের দাম তো একশো গুণ বাড়া উচিত, ঠিক কি না?

দুই কম্পোজিটার রোবটের মতো টাইপ সেট করে চলেছে। তার মাঝেই ঘাড় ঘুরে যাচ্ছে এক আধবার। মধ্যবয়সী দুই কর্মী পুরুষের মুখেও হাসির আলগা ছোপ।

তিতির দু দিকে মাথা নাড়ল। মেশিনদাদুটা এখনও একই রকম রয়ে গেল। মনেও। চেহারাতেও। পঞ্চান্নতে যা, পঁয়ষট্টিতেও তাই। সেই বুড়োটে মার্কা কুঁজো শরীর। মাথা জোড়া চকচকে টাক। কুচকুচে কালো ফ্রেমের চশমা। পরনে সদাসর্বদা ধুতি ফুলশার্ট। টায়ারের চটি। আর যখনই দ্যাখো সঙ্গে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ রয়েছে। একটা লম্বা ডাঁটির ছাতাও। যার কাপড়

ক্রমে কালো থেকে ধূসর।

ছোট্টখাট্টো মানুষটিকে দেখে প্রথম দিন কী অবাকই না হয়েছিল তিতির! এই মেঠো লোকটা অত বড় একটা মেশিন চালাবে!

মেশিন চালু হতেই বাপ রে কী দাপট লোকটার! এই সুইচ টেপে! ওই মেশিনের অংশ খুলে ঝ্যাট ঝ্যাট কালি মাখিয়ে দেয়! ঠকঠক মেশিনের এখান ঠোকে, ওখান ঠোকে! বাবার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, হাত কাজ করে চলেছে অন্য দিকে! ঝাঁই ঝাঁই কাগজ লাগিয়ে যাচ্ছে মেশিনে! যেই না কাগজ গেল, বিশাল ভারী একটা কালো চাকা আপনাআপনি লাফিয়ে ছাপ ফেলে দিল কাগজে! অবলীলায় কথা বলতে বলতে লোকটা সরাচ্ছে কাগজ! আবার ভরছে! আবার সরাচ্ছে! ভরছে! একটি বারের জন্যও ফিরে তাকায় না মেশিনের দিকে! কী উদাসীন, অথচ কী নিখুঁত!

অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে ছোট্ট তিতির একদিন ভাব জমাল লোকটার সঙ্গে। দিন শেষে কাজের পালা সাঙ্গ করে হাত পা ধুয়ে দুর্লভ দাস তখন আবার নিপাট হাটুরে।

ভয়ে ভয়ে তিতির জিজ্ঞাসা করেছিল,—অ্যাই, তুমি কি ম্যাজিশিয়ান?

গামছা পরিপাটি ভাঁজ করে ক্যাম্বিসের ব্যাগে রাখছিল দুর্লভ, তিতিরের প্রশ্নে তার চোখ পিটপিট,—হুম, আমি জাদুকর। কিন্তু তুমি কী করে টের পেলে দিদিভাই?

—বা রে, ম্যাজিক না জানলে কেউ মেশিনের দিকে না তাকিয়ে কাগজ ছাপাতে পারে?

দুর্লভ হা হা হেসে উঠেছিল। বাবাহ, ওইটুকু জিরজিরে মানুষটার হাসিতেও কী জোর! হাসতে হাসতেই লোকটা যেন হুবহু ম্যানড্রেক হয়ে গেল!

তিতিরের চোখ গোল গোল,—কার কাছে ম্যাজিক শিখলে গো?

—সে ছিল বটে এক খোঁড়া জাদুকর। ম্যাজিকটা তার কাছেই শেখা গো দিদি।

—ধ্যাৎ, জাদুকর আবার খোঁড়া হয় নাকি?

—হয় গো হয়। ওই জাদু শেখাতে শেখাতেই তো খোঁড়া হয়ে গেল বেচারা।

—কেন?

—সে অনেক লম্বা গল্প গো দিদি। শুনবে তুমি?

উত্তেজনায় দুর্লভের শার্ট খামচে ধরেছিল তিতির,—হ্যাঁ শুনব। এক্ষুনি শুনব।

—তো শোনো। সেই জাদুকরটা ছিল ভারি অদ্ভুত। ম্যাজিক শেখা শেষ হলে শিষ্যরা যখন তাকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইত, তখন সে বলত, দক্ষিণা দিবি? বেশ। দে তবে, আমার ঠ্যাং-এ একটা জোরসে লাঠির বাড়ি মেরে দে। তারা হাঁ হাঁ করে উঠত, তা কী করে হয় গুরুজি? তুমি আমাদের শিক্ষা দিলে, আমরা কি তোমাকে মারতে পারি? তা জাদুকর বলত, সেই জন্যই তো মারবি। অন্যকে কিছু শেখালে মানুষের মনে অহঙ্কার দানা বাঁধে। লোকের কাছ থেকে পাওয়ার আশা বাড়ে, যাকে বলে কিনা লোভ। জানিসই তো অহঙ্কার আর লোভেই মানুষের পতন। সেই অহঙ্কার আর লোভ যাতে মনে বাসা না বাঁধে তাই আমার এই বিধান। তা যারা ম্যাজিক শেখে তারা আর কি করে? দিত গুরুর পায়ে একটা করে লাঠির ঘা। সেই ঘা খেতে খেতেই লোকটা শেষে খোঁড়া হয়ে গেল।

গল্পের মাথামুণ্ডু বোঝেনি তিতির, শঙ্কিত প্রশ্ন করেছিল,—তুমি যদি আমাকে ম্যাজিক শেখাও তোমাকেও কি মারতে হবে?

—সেরকমই তো গুরু জাদুকরের নির্দেশ দিদিভাই।

নির্দেশটা মনঃপূত হয়নি তিতিরের, কাগজ ছাপার কাজটাও তাই শেখা হয়ে উঠল না আর। তবে দোস্তিটা সে দিন থেকেই জমে গেল। দুর্লভ দাস বনে গেল তার মেশিনদাদু। অফুরন্ত আজগুবি গল্পের ভাঁড়ার। স্বপ্ন বেচার ফেরিঅলা।

দুর্লভ দাসের বাড়ি সেই মেদিনীপুরের কোন গণ্ডগ্রামে। হাওড়া থেকে প্রথমে বাগনান যাও, সেখান থেকে বাসে মানকুর ঘাট, তারপর নৌকো। রূপনারায়ণ বেয়ে শিলাই নদী। শিলাই নদীর

পাড় থেকে আরও ক্রোশ খানেক হেঁটে তবে ফণিমনসা গ্রাম। দেশগাঁয়ে একটা চালাবাড়ি আছে দুর্লভের, বিঘে দুয়েক জমিও। তে-ফসলি উর্বর জমি। ছোট মেয়েজামাই দেখভাল করে। বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে হাওড়ায়। একজনকে বাকসিতে, অন্যজনকে আমতায়। বহুকালের বিপত্নীক দুর্লভ এখন কালেভদ্রে দেশে যায়, গড়িয়ার এক মেসেই তার স্থায়ী বসবাস। প্রথম যৌবনে কলকাতায় পা রেখে শহরটার মোহে পড়ে গিয়েছিল, মোহ এখন মায়া। সময় পেলেই একা একা চরে বেড়ায় শহরের রাস্তায়। তিতিরদের প্রেসের ওপরও তার এক আজব মমতা।

তিতির হাসতে হাসতে অ্যাটমের হাতে একটা দশ পয়সা দিল,—নে, দাদুর ঝুলি থেকে শিগগিরই একটা স্বপ্ন বার করে নে।

মেশিনে চাপানোর আগে ফ্রেমে আঁটা টাইপ পরখ করছে দুর্লভ। পয়সা খুঁটে গুজে বলল,—আজ কিসের স্বপ্ন চাই ? মাছ, না পাখি ?

—ধুস, আমি রোজ রোজ মাছ পাখি নেব না। আমাকে একটা যুদ্ধ দাও।

—যুদ্ধের কি স্বপ্ন হয় নাকি দাদুভাই ?

—কেন হবে না ? একদল সোলজার আক্রমঅঅণ বলে তেড়ে যাচ্ছে, আরেক দল আক্রমঅঅণ করে তেড়ে আসছে...তুমি টিভিতে দ্যাখোনি ?

—টিভি তো যন্ত্র দাদুভাই, যন্ত্র থেকে কি স্বপ্ন বার করা যায় ?

—যায়ই তো। আমার সব বন্ধুরা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখে। আমি ছাড়া।

—ও সব বাজে স্বপ্ন। এসো, আমি বরং তোমাকে একটা নতুন স্বপ্ন দিই। বিশাল এক সমুদ্রের স্বপ্ন। মনে করো তুমি নীল জল হয়ে গেছ...

—না। ও স্বপ্ন বিচ্ছিরি। অ্যাটম চেঁচিয়ে উঠল,—আমি যুদ্ধের স্বপ্নই চাই। আমার সব বন্ধুরা স্বপ্ন দেখে ফাইট প্র্যাকটিস করে আসে, আর রোজ টিফিনে আমাকে হারিয়ে দেয়। আমিও স্বপ্নে ফাইট প্র্যাকটিস করে সকলকে হারিয়ে দেব।

দুর্লভ কেমন নিবে গেল,—যুদ্ধের স্বপ্ন আমার কাছে তো নেই দাদুভাই।

—তা হলে একটা এমনি মারপিট দাও। ঢিসুম ঢিসুম।

—তাও নেই।

অ্যাটম যেন চিন্তায় পড়ে গেছে, মাথা চুলকোতে চুলকোতে পা দোলাচ্ছে। হঠাৎ বলল,—একটা স্টারট্রেক দাও তা হলে। সুইচ টিপব, অন্য প্ল্যানেটে চলে যাব। পথে কেউ পড়লে গুলি করে উড়িয়ে দেব। তুমি মিস্টার স্পককে দ্যাখোনি ? খাড়া খাড়া কান ? দেখে মানুষ মনে হয়, অথচ মানুষ নয় !

—নাহ। দু দিকে মাথা নাড়ে দুর্লভ।

অ্যাটম খেপে যায়,—তা হলে তোমার কি আছে ? ফাইটিং নেই, মেশিনগান নেই, সুপারম্যান নেই, স্পাইডারম্যান নেই, মিস্টার স্পকও নেই। আমি তোমার কাছ থেকে পয়সা দিয়ে পচা স্বপ্ন কিনব কেন ? বলেই দুর্লভের খুঁট থেকে পয়সাটা টেনে বার করে নিয়েছে অ্যাটম। কেউ কিছু বোঝার আগে এক ছুট্টে ঢুকে গেছে বাড়িতে।

বিমর্ষ মুখে মেশিনে ম্যাটার তুলছে দুর্লভ। ঠুকঠুক কয়েকটা নাট-বল্টু ঠুকল। রোলার দিয়ে কালি বোলাল চাকায়।

তিতির ঠোঁট টিপে হাসছিল,—কি, অ্যাটমের কাছে ফেল মেরে গেলে তো ?

—শুধু অ্যাটম কেন রে দিদি। গত মাসে বাকসি গেলাম, বড় খুকির কাছে, সেখানেও দেখি আমার দুই নাতি মেশিনগান নিয়ে যুদ্ধ করছে ! আলপথে দাঁড়িয়ে ! মনে হচ্ছে তোদের টিভির দৌলতে এ বার আমার ব্যবসাটা লাটে উঠল।

—তা কেন ? তুমিও টিভি দেখে দেখে পোক্ত হয়ে নাও। নতুন কায়দায় ব্যবসা জমাও। একটু ভায়োলেন্স ফায়োলেন্স দাও।

—স্বপ্ন তো আর ট্রেনের লজেনচুস নয় রে দিদি যে, যা হোক করে আমায় বেচতে হবে। ম্রিয়মাণ দুর্লভ ঝট করে তিতিরের দিকে ফিরেছে, —আচ্ছা দিদি, তোদের টিভির কি মন আছে? নিজের মতো করে ভাবতে পারে?

—তা পারে না।

দুর্লভ উদাস,—যে নিজে ভাবতে পারে না, সে পৃথিবীতে বেশি দিন টিকতেও পারে না। তা সে কে বা মানুষ, কি বা যন্ত্র। তোরাই একদিন ঘাড়ে করে ওই বাক্সকে নর্দমায় ফেলে দিবি, দেখে নিস।

দুর্লভের উদাসীনতা তিতিরের মধ্যেও যেন চারিয়ে যাচ্ছিল। আনমনা চোখ বাইরের রাস্তায়।

আর ঠিক তক্ষুনি সামনে রঘুবীর!

ঠাঠা কুকুরতাড়ানো রোদ্দুরে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ড্যাবড্যাব দেখছে তিতিরদের বাড়িটাকে।

তিতির এগোবে কি এগোবে না ভাবার আগেই লোকটা হাত নেড়ে ডাকল তিতিরকে,—এই যে খুকি, শোনো একটু। তুমি আদিত্যবাবুর মেয়ে না?

তিতিরের মেজাজ মুহূর্তে খাট্টা। স্কার্ট ব্লাউজে তাকে একটু ছোটখাট দেখায় ঠিকই, তা বলে লোকটা তাকে খুকি বলে ডাকে কোন সাহসে! বাসট্রামের কন্ডাক্টাররাও আজকাল তিতিরের সঙ্গে দিদি আপনি ছাড়া কথা বলে না।

মুখে যথাসম্ভব প্রবীণত্ব আনল তিতির,—আপনি হসপিটাল থেকে কবে রিলিজড হলেন?

—আজ নিয়ে ধরো গিয়ে দশ দিন। ফালতু কটা দিন বেশি আটকে রাখল।

—কমপ্লিটলি সেরে গেছেন? তিতির আরও ভারিক্কি।

—পেটের ব্যথা আমার অঙ্গের ভূষণ খুকি। এই যেমন ধরো আমার দাড়িগোঁফ। রেখেছি আছে, কামিয়ে ফেললেই নেই। অথচ আবার গজাবে। ব্যথাটাও তেমনি। লোকটা হে হে হাসছে,—যাও খুকি, তোমার বাবাকে ডেকে দাও।

তিতির ভুরু কুঁচকোল,—বাবা এখন ঘুমোচ্ছে।

—ঘুম থেকে তুলে দাও। বলো রঘুবীর চাটুজ্যে এসেছে।

—ঘুমোলে বাবাকে ডাকা বারণ। বাবা রাগ করে।

—আমার নাম শুনলে রাগবেন না, লাফিয়ে বেরিয়ে আসবেন। কী নাম বলবে বলো তো?

তিতির বেজার মুখে বলল,—রঘুবীরবাবু।

—বাবু ফাবু নেই। শুধু রঘুবীর। রঘুবীর চাটুজ্যে। ওফ, রোদ্দুরটাও আজ চড়িয়েছে বটে! যাও, তাড়াতাড়ি ডাকো। ওঁর প্রয়োজনেই আমার এত দূর আসা। বলেই সুট করে বড় ঘরে ঢুকে পড়েছে লোকটা। তিতিরকে একটুও পাত্তা না দিয়ে সোজা বসে পড়ল লম্বা সোফায়। খাকি প্যান্টের পকেট থেকে বিড়ি বার করল, আঙুলে ঘোরাচ্ছে। জংলা ছোপ বুশশার্টের ওপরের বোতাম দুটো খুলে দিল। হুকুমের স্বরে তিতিরকে বলল,—ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে যাও তো খুকি। আর এক গ্লাস জল এনে দাও।

বিরক্তির থেকেও এ বার তিতিরের অস্বস্তি হচ্ছিল বেশি। বাবার বন্ধুরা বড় একটা বাড়িতে আসে না, এলেও তাদের দেখে দাদুর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এ রকম একটা অমার্জিত বে-সহবত লোক বাবার খোঁজে এসে বড় ঘরে বসে পড়েছে দেখলে দাদু হয়তো কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে। তাছাড়া লোকটা তিতিরের হাফ-চেনা, ক'দিন যা হসপিটালে দেখেছে, বাবার সঙ্গেও কতটুকু ঘনিষ্ঠতা কে জানে, এই উটকো লোকের হাতে গোটা একতলাটা ছেড়ে যাওয়া কি উচিত হবে? নীচে এখন মিনতিদি সন্ধ্যার মা নেই, দাদুও ঝিমোচ্ছে নিজের ঘরে, ছোটকা আউট, ভরদুপুরে একা একতলায় তিতির এখন কী যে করে? অ্যাটমকে হাঁক মেরে ডেকে পাহারায় বসাবে?

ঝটিতি রান্নাঘর থেকে কাচের গ্লাসে জল নিয়ে এল তিতির। লোকটার হাতে না দিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও ফিরে এল বড় ঘরের দরজায়।

সন্তর্পণে পর্দার আড়াল থেকে তিতির লক্ষ করছিল রঘুবীরকে। এক ঢোকে জল শেষ করে আপন মনে আড়মোড়া ভাঙছে লোকটা। শব্দ করে করে হাতের আঙুল মটকাল। লাল গোল্লা গোল্লা চোখ ঘুরছে চার দেওয়ালে। সিলিং-এ। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। কাচের আলমারির সামনে গিয়ে চোখ ছোট করে কাপ-মেডেলগুলো দেখছে। আলমারিতে চাবি দেওয়া থাকে না, লোকটা কিছু সরাবে না তো ? না, বড় বড় পা ফেলে লোকটা এবার দাদুর বাবার ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ডান হাতের তর্জনী ঘষছে দেওয়ালে। আচমকাই গমগমে গলায় বলে উঠল,—কী হল খুকি, তুমি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেন ? বললাম না, বাবাকে খবর দাও !

ওরেব্বাস ! লোকটার মাথার পিছনেও চোখ আছে নাকি ! ভীষণ চমকে তিতির দুদ্দাড়িয়ে ওপরে ছুটল। বাবার ঘরে ঢুকেও হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঠেলল আদিত্যকে।

দুপুরের ঘুমটি আদিত্যর বড় প্রিয়। রাতের ঘুম তার ন্যায্য পাওনা, দুপুরেরটা উপরি। আদিত্যর ভাষায় এ ঘুম হল স্টেশনের টিকিট চেকারদের পকেটে জমে ওঠা খুচরো পয়সা। একে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার কী যে সুখ !

এই সুখটুকুর জন্যই এ জীবনে কোনও বাঁধাধরা চাকরি করা হয়ে উঠল না আদিত্যর।

জয়মোহনের ব্যবসা যখন ডুবডুবু তখন আদিত্য একবার একটা চাকরিতে ঢুকেছিল। এক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে। নিজের চেষ্টাতেই। কাজটা খুব ভারী ছিল না, অ্যাকাউন্টসের খাতাপত্র লেখা, সেলস পারচেজ দেখা, এই সব। মাইনেও মন্দ নয়, সব মিলিয়ে সাড়ে ছশো। তা সে চাকরি আদিত্যর পোষাল না। ওই ঘুমেরই কল্যাণে। দুপুরের টিফিনটি পেটে পড়লেই কী যে হত ! রাজ্যের ঢুলুনি এসে জড়ো হত চোখের পাতায় ! হাটের মাঝে ভুসভাস নাক ডেকে উঠত। প্রথম কিছুদিন অফিস কলিগরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও, হঠাৎ একদিন অফিসের এক ফক্কড় বেফাঁস মন্তব্য করে বসল। এক ঘর পুরুষ-মহিলার সামনে রসিয়ে রসিয়ে বলল, আহা রে ঘুমোবে না ! সারা রাত ওভারটাইম খাটলে কি আর দিনের ডিউটি করা যায় ! দেখুন দেখুন, রাত জেগে জেগে আদিত্যদার চোখের নীচে কেমন কালি পড়ে গেছে ! বলেই আদিত্যর দিকে তাকিয়ে গাল-জোড়া হাসি, বউদিও কি আপনার মতো সারা দিন ঢোলে আদিত্যদা !

ছোকরার কথার কায়দায় সে এক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি অবস্থা ! গোটা অফিস হেসে কুটিপাটি। লজ্জার চোটে পরপর ক'দিন ঘুম তাড়ানোর জন্য খুব মেহনত করল আদিত্য। করিডোরে হনহন পায়চারি, দারোয়ানের কাছ থেকে খৈনি, অফিস ছেড়ে ডালহাউসি পাড়ায় এলোমেলো চরকি, কিছুই বাদ দিল না। মরিয়া হয়ে লালদিঘিতে মাছ ধরা পার্টিদের পাশে বসে একদিন গল্পও জুড়তে চেষ্টা করেছিল। সিটে বসলেই আবার সেই ভুবনমোহিনী ঘুম ! সেই ভুসভাস নাক ডাকা ! শেষে মাইনেটা নিয়ে ধুৎতেরি বলে ছেড়ে দিল চাকরি, গোঁত খেয়ে ফিরে এল বাবার ব্যবসায়। চাকরির চিন্তাকে সেদিন থেকেই চিরবিদায়।

কিন্তু আজ অত সাধের ঘুমটি ভাঙতেও আদিত্য মোটেই খেপচুরিয়াস নয়। রঘুবীরের নাম মন্ত্রবত ক্রিয়া করেছে। তিতিরকে অবাক করে ধড়মড় উঠে বসল বিছানায়,—রঘুবীর এসে গেছে ! বসা, বসা। আমি এক্ষুনি আসছি।

তিতির হাঁ হয়ে বাবাকে দেখল দু পলক, তবে নীচে এসে লোকটার প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেল না সে। বন্ধুরা দরজায়।

ঝুলনের পরনে ফ্যাকাসে নীল জিনস আর সাদা টিশার্ট। দেবস্মিতা হিয়া সালোয়ার-কামিজ। তিনজনেই তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে।

হিয়া ধমকের সুরে তাড়া লাগাল,—এই চল চল, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।

দেবস্মিতা হাত ঝাপটাল,—ইশ, ফার্স্ট সিনটা মিস হলে আমি মরেই যাব। স্টার্টিং-এ দারুণ একটা গান আছে।

ঝুলন বলল,—তোর জন্যই তো দেরি হল ! তুই ড্রেস করতে এত সময় নিলি ! ম্যাচিং টিপ চাই ! ম্যাচিং নেলপালিশ চাই !

—কী করব, ম্যাচিং মেকআপ ছাড়া বেরোলে দিদি যে ভীষণ ক্যাট ক্যাট করে !

—ইইহ, কী দিদির চামচি রে !

—যা বলেছিস। আহ্লাদী না আহ্লাদী !

—পরে ঝগড়া করিস। চল চল !

কোনওক্রমে বাবার বার্তাটুকু রঘুবীরকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিতির। বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার মজাই আলাদা। উল্টোপাল্টা ভাবনারা ফুড়ুত করে উড়ে পালায়।

গ্রীষ্মদুপুরের ঝাঁঝকে তুড়ি মেরে চার বন্ধু ছুটছে হুড়মুড়িয়ে। দশ পা ছোটে, তিন পা হাঁটে, আবার ছোটে বিশ পা। জনহীন রাস্তায় কোত্থেকে এক সাইকেল রিকশা ঝুলনের দিকে ধেয়ে এল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু চোখ টিপে বন্ধ করেছে ঝুলন, যেন না দেখতে পেলেই রিকশাটা হাওয়ায় ভ্যানিশ হয়ে যাবে ! রাস্তার মধ্যিখানে ঝুলনের স্ট্যাচু দেখে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছে বাকি তিনজন। হাসতে হাসতে সিনেমার তাড়া ভুলে গেল। হাসতে হাসতে হাসির ঝরনা হয়ে গেল চার টিনএজার।

সেই ঝরনা বয়েই চলেছে। বয়েই চলেছে। দুনিয়া জুড়ে এখন শুধু হাসি আর হাসি। চতুর্দিকে এত হাসির উৎসের মাঝে কী করে যে গোমড়া থাকে মানুষ !

ঘামে থসথস লোকটা কেমন হাঁটতে গিয়ে হাঁসফাস করছে দ্যাখ ! হিহি। মাথায় আবার রঙিন লেডিজ ছাতা ! হিহিহি। দ্যাখ দ্যাখ গলন্ত পিচে কুকুরটার পায়েও কেমন ছ্যাঁকা লাগছে ! হি হি হি হি।

রাস্তা টপকে এক লাফে বাস স্টপে পৌঁছে গেল ঝুলন ! মাঝপথে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে হিয়া তিতির ! হিহি। তিতির হিয়াকে সাহায্য করতে গাড়ির স্রোত রুখে দিল টিঙটিঙে ট্রাফিক পুলিশ ! হিহি হিহি। এমা, দেবস্মিতা কিছুতেই পার হতে পারছে না ! আবার একটা ইয়া বড় লরি। হিহি হিহি। হিয়া তিতির ঝুলন মিনিবাসের পাদানিতে, দেবস্মিতা হ্যান্ডেল ছুঁতেই ছেড়ে দিল বাসটা ! হিহি হিহি ! দেবস্মিতার জন্যই বাস আবার দাঁড়িয়ে গেছে হিহিহিহিহি। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণা চার যাত্রিণী পেয়ে অন্যমনস্কতার ভনিতায় চুল সেট করে নিচ্ছে রুক্ষ-মুখ কন্ডাক্টার ! হিহি। হেল্পারের গলা হঠাৎ হুবহু মিঠুন। হিহিহিহি। টিকিট কাটতে এসে কন্ডাক্টার জ্যাকি শ্রফের লুক দিচ্ছে ! হিহি হিহি। অ্যাই অত হাসিস না, বাসসুদ্ধ সবাই দেখছে হাঁ করে ! হিহি। সিনেমাহলের সামনে ভিড়, কী ভিড় ! কত লোক টিকিট না পেয়ে কেমন কেবলুশ মুখে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখ ! হিহি। অন্ধকার হলে লাইটম্যান সিটে আলো না ফেলে দেবস্মিতার মুখে টর্চ মেরে ফেলেছে ! হিহিহিহি। সামনের রো-এর দুটো ছেলে তিতিরদের দেখতে পুরো একশো আশি ডিগ্রি ঘাড় ঘুরিয়ে ফেলল ! আহা রে, ভেঙে না যায় ! হিহিহি। অ্যাই বি সিরিয়াস ! হিহি। চতুর্মুখী হাসির ফোয়ারাকে দাদু-স্বরে ধমক দিল এক আধবুড়ো ! হিহিহিহি। তোরা হাসি থামাবি ! হিহি। আমির খান গাছের আড়ালে চুমু খাচ্ছে জুহি চাওলাকে ! চিমটি কাটছিস কেন ! হিহি।

শো ভাঙার পর বহতা ঝরনা খানিক ধীর লয়ে ফিরল। ছবিটা ভালই ছিল, প্রচুর নাচগান আছে, পরিমিত মারপিট আছে, উদ্দাম প্রেমও আছে অনেক। শুধু শেষ দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার জোড়া মৃত্যু একটু মনমরা করে দিয়েছে চারজনকে। নীরবে ভেলপুরি খেতে খেতে জুহি আমিরের শোকে মৌনতা পালন করছে চারজন।

দেবস্মিতা শোকার্ত স্বরে বলল,—আমির মরে গেছে আমি ভাবতেই পারি না।

হিয়া ভেলপুরি শেষ করে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল,—তুই কি রে ! খালি আমিরকেই দেখলি, জুহির ডেথটা বুঝি ডেথ নয় ?

—আমির ইজ আমির। আমির সামনে থাকলে আমি আর কাউকে দেখিই না।

—এক কাজ কর, আমিরকে প্রোপোজ করে একটা চিঠি লিখে ফ্যাল।

—দুৎ, ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েও আছে।

—সো হোয়াট! আরেকটা করবে। ফিল্ম স্টাররা ইচ্ছে করলেই যটা খুশি বিয়ে করতে পারে।

তিতির বলল,—শুধু ফিল্মস্টার বলছিস কেন? বস্তিস্টাররাও পারে। আমাদের মিনতিদির বর তিনটে বিয়ে করেছে, সন্ধ্যার মা'র বর দুটো।

দেবস্মিতা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—ছেলেদের কী মজা রে! যা খুশি তাই করতে পারে।

হিয়া গোমড়া হয়ে গেল,—মেয়েরা করে না? একটার বেশি বিয়ে মেয়েরাও করতে পারে।

—সে তো ডিভোর্স করে। কথাটা বলে ফেলেই তিতির আড়ষ্ট হয়ে গেল। হিয়া কিছু মনে করল না তো?

হিয়ার মা-বাবার বছর পাঁচেক হল ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বাবা-মা'র সংঘর্ষের সময় হিয়া ভীষণ স্পর্শকাতর হয়ে গিয়েছিল। একটুতে কেঁদে ফেলত, একটুতে রেগে যেত, সামান্যতম হাসিঠাট্টাকেও বিদ্রূপ ভেবে অনর্থ করত বহু সময়ে। এখন অবশ্য হিয়া অনেকটা সামলে গেছে। বছর দুয়েক আগে আবার বিয়ে করেছে হিয়ার মা।

তিতিরের অপ্রস্তুত মুখ হিয়া খেয়ালই করেনি, ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল,—ডিভোর্স করে বিয়ে করা তো আইন মেনে করা। এ ছাড়া কর্ডলাইন নেই? কত মেয়ে হাজব্যান্ডকে শিখণ্ডী খাড়া করে অন্যের সঙ্গে ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ লাইফ লিড করছে তার খবর রাখিস? এই মহিলারা তোদের ওই মিনতিদিদের বরগুলোর থেকে অনেক বেশি ডার্টি। আই হেট দেম। আই হেট দেম।

চকিত উত্তেজনায় হিয়ার শ্যামলা মুখে আঁধার নেমেছে। তিতির দেবস্মিতা থতমত চোখে দেখছিল হিয়াকে। হিয়ার বুকে আবার কোনও নতুন কাঁটা ফুটল কি?

ঝুলন খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—অ্যাই দ্যাখ দ্যাখ।

—কী?

—এ দিকে নয়, তোদের পেছনে।

তিতির চমকে ঘুরল।

পাঁচ-ছ হাত দূরে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক মোটরবাইক। বাইকে বসে তাদের দিকেই তাকিয়ে এক তরুণ! হলদে টিশার্ট! গলায় চেন! হাতে স্টিলের বালা!

১০

ছেলেটার চোখে চোখ পড়তেই মুখ ঘুরিয়ে নিল তিতির।

দেবস্মিতা জিজ্ঞাসা করল,—কে রে? তোর চেনা?

—চেনা নয়, চেনা হতে চায়। ঝুলন ছেলেটার দিক থেকে চোখ সরায়নি,—মনে হয় আমাদের ওদিকেই থাকে।

—কী করে বুঝলি?

—দু দিন টিভি সেন্টারের সামনে আমার গায়ের কাছে এসে মোটর সাইকেল থামিয়েছে। একদিন ফলো করে আমাদের হাউজিং-এও ঢুকেছিল। আজ দেখছি এখানেও হাজির!

—তোর আবার বেশি বেশি! হয়তো এটা চান্স অকারেন্স। হয়তো ছেলেটা এমনিই সিনেমা দেখতে এসেছে।

—মোটেই না। আমাকে ফলো করেই এসেছে। আমার যেন এখন মনে হচ্ছে তখন ওকে ঢাকুরিয়া বাস স্ট্যান্ডেও দেখেছি। পেট্রল পাম্পের দিকটায় দাঁড়িয়েছিল।

তিতির হাঁ হয়ে শুনছিল। যখন সে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে থাকে তখন অজস্র সিগনাল বিব বিব করে তার মাথায়। কী ঘটবে, কী ঘটছে তার একটা আগাম ইঙ্গিতও পেয়ে যায় সে। কিন্তু

বাইরে বেরোলে সে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। চারপাশের কে কাকে কিভাবে দেখছে, কখন দেখছে, কেন দেখছে—কিছুই গোচরে আসে না তার।

হিয়া এখন আবার স্বাভাবিক, ক্ষণকাল পূর্বের উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই মুখেচোখে, ফিকফিক হাসছে সে। বলল,—তুই তোর অর্ণবকে বল না, অর্ণব ওকে শুইয়ে দেবে।

গত বছর থেকে ঝুলন লেক গার্ডেন্সের একটা ক্লাবে ক্যারাটে শিখছে, অর্ণবের সঙ্গে তার সেখানেই পরিচয়। অর্ণব সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র, ক্যারাটেতে সদ্য ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে, ঝুলনের সঙ্গে একটা নরম সরম সম্পর্কও গড়ে উঠেছে তার। তিতিররা সবাই জানে। ঝুলন নিজেই গল্প করেছে।

ঝুলন বলল,—অর্ণব লাগবে না, ওই ছেলেকে আমি একাই হ্যান্ডেল করতে পারি। আমি শুধু ওর সাহসের লিমিটটা দেখতে চাইছি।

দেবস্মিতা বলল,—বি স্পোর্টিং ঝুলন। রাস্তাঘাটে এ রকম একটু আধটু হয়ই। ছেলেটার হয়তো তোকে খুব পছন্দ হয়েছে! হোয়াটস সো রঙ ইন ইট?

—নাথিং রঙ। কিন্তু আপেল আঙুর দেখার মতো করে দেখবে কেন? দ্যাখ দ্যাখ চোখ দুটো দ্যাট। ঝুলন কাঁধ নাড়াল,—ধরব নাকি?

তিতির শিউরে উঠল,—ধরে?

—স্ট্রেট জিজ্ঞেস করব হোয়াট ডাজ হি এক্সপেক্ট? আ হিট? অর আ কিক?

দেবস্মিতা হেসে উঠল,—যদি বলে ফ্রেন্ডশিপ?

—বন্ধু হতে চাইলে রাস্তায় ইরিটেট করবে কেন? আসবে, কথা বলবে, চলে যাবে। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল।

ফোলা ফোলা গাল ছেলেটি এবারে বেশ উসখুস করছে। গম্ভীর মুখে দেখছে চারদিক। মাঝে মাঝে গভীর চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করছে আকাশ। তারই ফাঁকে ঠারে ঠোরে দেখে নিচ্ছে ঝুলনদেরও।

হিয়া ছেলেটাকে অপাঙ্গে দেখে নিল,—না রে, এ শুধু ফ্রেন্ডশিপের কেস নয়, একটু ফক্কার ফ্রেন্ডশিপেরও ভাব আছে। তোকে নিয়ে ফ্লাই করতে চায়।

হিয়ার কথায় খিলখিল হেসে উঠেছে দেবস্মিতা ঝুলন। তিতিরও। হাসির তোড়ে রথে উপবিষ্ট রোমিও হকচকিয়ে গেছে। হঠাৎ কি ভেবে বাইকে স্টার্ট দিয়ে মানে মানে কেটে পড়ল ছোকরা।

ঝুলন বুড়ো আঙুল তুলল,—দেখলি! মরালি কত কাওয়ার্ড!

দেবস্মিতা বলল,—হেববি ভড়কি খেয়েছে।

—মনে পাপ আছে বলেই ভড়কি খেয়েছে। এই তো সেদিন দুটো ছেলে স্মার্টলি আমার সঙ্গে আলাপ করল, গোলপার্কে আমার সঙ্গে নামল, আমাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়াল, আমরা অ্যাড্রেস এক্সচেঞ্জ করলাম, আমি ওদের বাড়িতেও ইনভাইট করেছি, বাপি মা'র কাছে ওদের গল্প বলেছি...

তিতিরের হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছিল। ঝুলনের মতো করে তার ভাববার ক্ষমতাই নেই। তাদের পাশের নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির একটা ছেলে খুব টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে তাকে, বারান্দায় গিয়ে একটু দাঁড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও পাঁচতলার ব্যালকনিতে হাজির! ছেলেটাকে রাস্তায় ধরে তিতির কখনও জিজ্ঞাসা করতে পারবে, তুমি কী চাও? অসম্ভব। তিতির তখন বারান্দা থেকে সরে আসতে পারলে বাঁচে! কেউ যদি যেচে আলাপও করে তিতিরের সঙ্গে, তিতির কি ঝুলনের মতো করে কথা বলতে পারবে? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে? সেই গল্প আবার বাড়িতে এসে বলবে মাকে! ওরে বাবারে!

বেলা পড়ে এল। একটা নরম হলুদ আলো ছড়িয়ে গেছে পথেঘাটে। এই আলোতে এখন কোনও কিছুই অসুন্দর নেই। মানুষের অসহ্য ভিড় না। যানবাহনের কর্কশ চিৎকারও না। কদর্য শহরের গায়ে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে শেষ সূর্য।

হাঁটছে চার বন্ধু। ভিড় ঠেলে। হেলে দুলে।

হিয়া বলল,—এই আমাদের বাড়ি যাবি?

—এখন ? ঝুলন ঘড়ি দেখল। তার বাবা আটটার আগে বাড়ি ফেরে না, মা'রও আজ অফিসে কি মিটিং আছে, ফিরতে দেরি হবে, একা বাড়িতে ভূতের মতো বসে থাকতে একটুও ভালবাসে না ঝুলন। অলস মেজাজে বলল, —তা যাওয়া যায়। গেলে কী খাওয়াবি ?

—কী খাবি বল ? ঠাম্মা আজকাল বাড়িতে দারুণ পিৎজা বানাচ্ছে। চিজ আর ক্যাপসিকাম দিয়ে। আজ বোধহয় ঠাম্মা কুলপিও বসিয়েছে।

কুলপির নামে ঝুলন এক পায়ে খাড়া।

দেবস্মিতা ক্ষীণ আপত্তি জানাল,—হিয়াদের বাড়ি গেলে দেরি হয়ে যাবে রে। তার চেয়ে আমাদের বাড়ি চল, আমাদের বাড়ি থেকে সবার বাড়ি সমান দূর।

ঝুলন মুখ বেঁকাল,—তোদের বাড়ি ! সুস্মিতাদি এখন বাড়ি আছে না ?

—হুঁ। তা আছে।

—তা হলে বাবা আমি যাচ্ছি না। সুস্মিতাদি ধরলেই আবার লেখাপড়া নিয়ে জ্ঞান মারতে আরম্ভ করবে। কেন যে তোর দিদিটা জে এন ইউ থেকে ফিরল ! হ্যাঁ রে তোর দিদিকে দিল্লি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি তো ?

দেবস্মিতা মিইয়ে গেল। সুস্মিতা তার থেকে সাত বছরের বড় হওয়ার সুবাদে এখনও তাদের নার্সারির মেয়ে মনে করে। জে এন ইউ থেকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশানে এম এ করে দিন পনেরো হল কলকাতায় ফিরেছে। বাড়িতে এখন তার চরম দাপট। মর্ডান ফ্যাশান থেকে মর্ডান ওয়ার্ল্ড সবেতেই তার অগাধ পাণ্ডিত্য। মাধ্যমিকে সুস্মিতা থার্ড হয়েছিল, সুস্মিতাই দেবস্মিতার একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত এ কথা সকাল সন্ধে বাবা মা'র মুখ থেকে শুনতে হয় দেবস্মিতাকে। শুনতে হয় বন্ধুদের টিটকিরিও। নিজের দিদিটিকে নিয়ে যথেষ্ট হীনম্মন্যতায় ভোগে দেবস্মিতা।

তিতির বলল, —তোরা যা রে, আমি যাব না।

হিয়া চোখ পাকাল,—কেন ?

—মা বাড়ি ফিরে আমাকে না দেখলে হেভি রেগে যায়।

—বেশি খুকিপনা করিস না তো ! আজ বাদে কাল হয়তো কলেজে ভর্তি হবি, এখনও এত ম্যা ম্যা কিসের ?

ঝুলন বলল, —চল না রে তিতির। রেজাল্ট বেরিয়ে গেলে আমরা কে কোথায় ছিটকে যাব তার ঠিক আছে ! আর হয়তো এমন জমিয়ে আড্ডা মারাই হবে না।

তিতির দুর্বল হয়ে পড়ছিল, তবু দোটানা ভাবটা যাচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকেই তার ওপর মা'র কড়া নির্দেশ, যেখানেই থাকো অন্ধকার হওয়ার আগে বাড়ি ফিরবে। আজ কি একবার ভাঙবে নিয়মটা ?

ঠিক এই গোধূলি সন্ধের মুহূর্তে বাড়ির পরিস্থিতি কী রকম সেটাও মনশ্চক্ষে দেখে নিতে চাইল তিতির। ষণ্ডামার্কা দাড়িয়ালটা আছে, না গেছে ? দাদুর যদি লোকটার সঙ্গে মোলাকাত হয়ে থাকে তা হলে নির্ঘাত বাবার সঙ্গে একটা ফাইটিং হয়ে গেছে। মির্জাপুরের দপ্তরিপাড়া হয়ে মা মানিকতলাতে যাবে আজ, ওখানে দাদুভাই-এর পায়ের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি, মা কি ফিরতে পারবে আটটার আগে ? এত ভিড়, এত জ্যাম... !

পোস্তদানা মনটাকেও একবার টোকা দিয়ে দেখল তিতির। উঁহু, তিনি আজ নীরব। অর্থাৎ বড় কিছু ঘটছে না।

তিতির মনস্থির করে ফেলল। যাবে। মা তো তার কোনও কাজেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় না, আজ নয় আরও একটু বকলই। দাদা তো রোজই দেরি করে ফেরে, সে না হয় একদিন... ।

হিয়ার বাড়ি যাদবপুর স্টেশনের পুব দিকে। আট-দশ বছর আগেও এ অঞ্চলে একটা গ্রাম গ্রাম ভাব ছিল, এখন শহর এ দিকে দ্রুত পাখা মেলে দিয়েছে। প্রচুর হাল ফ্যাশানের বাড়ি, ফ্ল্যাটবাড়ি, দোকান বাজার আর মানুষে জমজমাট চারদিক। একটা লম্বা টানা ঝিল ছিল এখানে, এখন তার

চারপাশ বাঁধিয়ে নাম হয়েছে লেক। লেক ছাড়িয়ে আরও কিছুদুর গেলে বাস মিনিবাসের স্ট্যান্ড। তার পাশেই হিয়াদের ছোট্ট একতলা বাড়ি। ছিমছাম। আধুনিক।

হিয়ার ঘরের দেওয়াল জুড়ে সার সার পোস্টার। সবই পুরুষ খেলোয়াড়দের। উইম্বলডন ট্রফি হাতে বরিস বেকার। বোলিং অ্যাকশনে কপিলদেব নিখঞ্জ। অডি গাড়ির বনেট ছুঁয়ে রবি শাস্ত্রী। গোঁফজোড়া হাসিতে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ময়ূরনীল টিশার্টে হিম্যান ইমরান খান। কাঁধে বুট দিয়েগো মারাদোনা।

তিতির হিয়ার খাটে শুয়ে পোস্টারগুলো দেখছিল। যখনই আসে, দেখে। ইশ, তার যদি হিয়ার মতো একটা নিজস্ব ঘর থাকত! পোস্টারে পোস্টারে ঠিক ভরিয়ে ফেলত দেওয়াল।

তবে ওই সব ছবি নয়, তিতিরের পছন্দ অন্যরকম। ক্রিকেট ফুটবল টেনিস তিতির মাঝে মাঝে দেখে টিভিতে, দাদার সঙ্গে বসে, কিন্তু খেলাধুলোর মানুষরা তাকে তেমন টানে না। ফিল্মস্টারদের ছবিও দেওয়ালে ঝুলছে ভাবতে ভারি অস্বস্তি হয় তিতিরের। অন্ধকার ঘরে তিতির নিদ্রামগ্ন, দেওয়াল থেকে সার স্যর মানুষ অশরীরী আত্মার মতো দেখছে তাকে, দৃশ্যটা কল্পনা করলেই কী যে বেআব্রু লাগে নিজেকে! না, কোনও মানুষ নয়, তিতিরের দেওয়ালে থাকবে শুধু অপরূপ নিসর্গ। উত্তাল নায়াগ্রা জলপ্রপাত। সফেন প্রশান্ত মহাসাগর। অ্যামাজনের নিবিড় অরণ্য। সোনারঙ আদিগন্ত সাহারা। গম্ভীর হিমালয়।

আরও একটা ছবির খুব শখ আছে তিতিরের। গড়িয়াহাটের এক দোকানে দেখেছিল পোস্টারটা। বর্ণময় গোলাপক্ষেতের মাঝখানে ছোট্ট একখানা কাঠের দোতলা বাড়ি।

তিতিরের স্বপ্নের বাড়ি। তিতিরের স্বপ্নের বাগান।

ছোট্ট শ্বাস পড়ল তিতিরের। দাদাটা যেন কী! একটুও শখ নেই পোস্টারের! সারাক্ষণ শুধু ঝ্যাং ঝ্যাং গান! দাদার শখ থাকলে সেই অজুহাতে তিতিরও তো কিছু ছবি সাঁটতে পারত দেওয়ালে!

দেবস্মিতাও বিছানায় গড়াচ্ছে। গজল আর পপ সঙ ঝুলনের ভীষণ প্রিয়, হিয়ারও, কোণের কাবার্ড থেকে হিয়ার ক্যাসেটগুলো বার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ঝুলন।

দেবস্মিতা ফিসফিস করে বলল,—অ্যাই তিতির, একটা জিনিস লক্ষ করেছিস?

—কী?

—হিয়ার টেবিলটা দ্যাখ। রনির আগের ছবিটা চেঞ্জ করে একটা কারেন্ট ছবি লাগানো হয়েছে।

—হুঁ। রনিটা অনেক বড় হয়ে গেছে, না?

—হিয়ার মা'র সঙ্গে আমার একদিন মেট্রো রেলে দেখা হয়েছিল।

—তাই? কথা বলল তোর সঙ্গে?

—কেন বলবে না? সত্যি কথা বলতে কি আমিই প্রথমে চিনতে পারিনি। সেই কবে ফাইভ সিক্সে দেখেছি। মাসি আমাকে ডেকে খুব আদর করল, পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করল...।

—রনি ছিল সঙ্গে?

—দেখলাম না তো। মাসি অফিস থেকে ফিরছিল বোধহয়।

—ভাবতে কেমন খারাপ লাগে না রে? মাসির কাছে রনি, মেসোর কাছে হিয়া,...এ ভাবে ছেলেমেয়ে ভাগাভাগি...

—হিয়া তো প্রত্যেক শনিবার যায় মাসির কাছে। রনিও এ বাড়িতে আসে। রবিবার। বাবা-মা'রা ডিভোর্স করেই খালাস, কষ্ট তো...। দেবস্মিতা কথাটা শেষ করতে পারল না, হিয়া বড় ট্রেতে অনেকগুলো কুলপি নিয়ে ঢুকেছে, পিছনে হিয়ার ঠাকুমা।

হিয়ার ঠাকুমার বয়স প্রায় সত্তর, দেখে যদিও ষাটের বেশি মনে হয় না। হাসিখুশি, কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী চেহারা। ঘরেও তাঁর সাজসজ্জা টিপটপ, কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরেন, পায়ে সর্বদা বাহারি চপ্পল।

দেবস্মিতা তিতির সামান্য অপ্রতিভ বোধ করছিল। এরা তাদের কথা কিছু শুনে ফেলেনি তো!

মধুর হেসে হিয়ার ঠাকুমা বললেন,—আজ তো পিৎজা ব্রেড নেই রে ভাই। হিয়া যদি আগে বলে যেত... ! তোরা ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাবি ?

ঝুলন লাফ দিয়ে একটা কুলপি তুলে নিল,—শুধু ফ্রেঞ্চ কেন ঠাম্মা ? জার্মান ইটালিয়ান রাশিয়ান সব টোস্ট খেতে পারি।

দেবস্মিতা বলল,—তুমি বানালে আমি ইডলিও খেতে রাজি ঠাম্মা। যদিও ওই খাদ্যটি আমার দু চক্ষের বিষ।

হিয়ার ঠাকুমা বললেন,—তুই কেন চুপ রে তিতিরপাখি ?

অস্বচ্ছন্দ ভাব কেটে গেছে তিতিরের, তবু তিতির উত্তর দিল না, মৃদু হাসল শুধু। হিয়ার ঠাকুমাকে তিতিরের ভীষণ ভাল লাগে। তিনি কাছে এলেই অদ্ভুত এক শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে পড়ে সে। ভদ্রমহিলা খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ি বাপেরবাড়ি কারুর সাহায্য না নিয়ে একাই মানুষ করেছেন হিয়ার বাবা আর পিসিকে। সামান্য একটা প্রাইমারি স্কুলের চাকরি সম্বল করে। কত ঝড়ঝাপটা, কত অপবাদ গঞ্জনা সহ্য করে যে সেই দিনগুলো কেটেছিল, তার গল্প নিজেই তিনি শুনিয়েছেন তিতিরদের। অথচ একটি বারও অভাব অপমানের কথা তুলে খেদ জানাননি। কারুর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও নেই তাঁর।

তিতির একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, —আচ্ছা ঠাম্মা, তুমি কী করে হাসতে হাসতে ওই সব খেতে না পাওয়া দিনগুলোর গল্প বলো গো ?

হিয়ার ঠাকুমা বলেছিলেন,—দুর বোকা, এটাও বুঝতে পারলি না ? দুঃখ কষ্টের দিন মানুষ যদি লড়াই করে পার করে দিতে পারে, তবে সেটাই হয়ে ওঠে মানুষের কাছে সব থেকে সুখের স্মৃতি।

—যাহ্, কষ্টের দিন আবার সুখের স্মৃতি হয় নাকি ?

—হয় রে হয়, লড়াই করে বেঁচে থাকাতেই তো জীবনের সুখ। যে জীবনে কোনও ওঠাপড়া নেই, উদ্বেগ দুশ্চিন্তা নেই, সে জীবন হল চেনে বাঁধা কুকুরের জীবন। ও তো পানসে।

নিজে নিজেই দেশবিদেশের অনেক রান্না শিখেছেন তিনি, সেলাই ফোঁড়াই-এর হাতটিও তাঁর ভারী চমৎকার। ছোটবেলায় হিয়ার সমস্ত জামা হিয়ার ঠাকুমাই তৈরি করে দিতেন। নতুন নতুন ডিজাইন দিয়ে। কোনওটা আমব্রেলা কাট, কোনওটাতে ঘন হাকোবা কাজ, কোনওটাতে শুধু ফ্রিল আর ফ্রিল। ছেলে-ছেলের বউ বিবাদ করে আলাদা হওয়ার পর তাঁর সবটুকু জুড়ে এখন শুধু হিয়া আর হিয়া। বাবার থেকেও ঠাকুমার সঙ্গে হিয়ার সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড়।

ঠাকুমা চলে গেছেন। ঝুলন একটার পর একটা কুলপি শেষ করে চলেছে, কচকচ করে তৃতীয়টা শেষ করার পর যখন চতুর্থটার দিকে হাত বাড়িয়েছে দেবস্মিতা ঝুলনের হাত চেপে ধরল,—অ্যাই কী হচ্ছে কী ! তুই একাই সব খাবি নাকি ?

ঝুলন দেবস্মিতার হাত সরিয়ে আর একটা কুলপি প্লেটে তুলল। গম্ভীর মুখে বলল,—এ দুটো আমি খাচ্ছি না, অর্ণব খাচ্ছে।

—মানে !

—অর্ণবটা এত কুলপি খেতে ভালবাসে, ওর নাম করে আমিই খেয়ে নিলাম।

—উউউ, খুব যে প্রেম ? এদিকে বাসে ট্রামে যে বন্ধু বাড়াচ্ছিস, অর্ণব রেগে যাবে না ?

ঝুলন ভীষণ অবাক হল,—কেন, রাগবে কেন ! ওরা তো এমনি বন্ধু নয়, ওরা তো মাউন্টেনিয়ার ! শুশুনিয়াতে ট্রেনিং ক্যাম্প করে এসেছে। অক্টোবরে নেপাল যাবে, এভারেস্ট বেসক্যাম্পে ট্রেনিং করতে।

তিতির জোরে হেসে উঠল,—মাউন্টেনিয়ার বন্ধু হলে অর্ণব বুঝি জেলাস হবে না ?

ঝুলন রেগে গেল,—অর্ণব জেলাস হলে আমার কী ? কারা আমার বন্ধু হবে সে তো আমি ডিসাইড করব। তা ছাড়া অর্ণব জানেই তো আমি ও সব ডেঞ্জারাস স্পোর্টস কিরকম পছন্দ করি। ইনফ্যাক্ট আমি ঠিকই করে ফেলেছি হায়ার সেকেন্ডারির পর আমি মাউন্টেনিয়ারিং শিখব।

হিয়া এ বার খোঁচাচ্ছে ঝুলনকে,—পাহাড়ে উঠলে অর্ণব কিন্তু তোর হাত থেকে স্লিপ করে যাবে।

—আমার তাতে কলা।

দেবস্মিতা কুলপি চুষতে চুষতে অশ্লীল ভঙ্গিতে চোখ টিপল,—কোথায় অর্ণবই পাহাড়-টাহাড় এক্সপ্লোর করবে, তার বদলে তুই...

—অ্যাই ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ঝুলন কটমট করে তাকাল।

হিয়া তবু খেপাচ্ছে,—হ্যাঁ রে ঝুলন, তুই যখন অর্ণবের সঙ্গে কথা বলিস কী ভাষায় ডায়ালগ চালাস রে ? হুঃ হাঃ হুঃ। মানে আই লাভ ইউ ? হাঃ হুঃ হাঃ। মানে আই হেট ইউ ?

ঝুলনও হাসছে এতক্ষণে,—তোদের বলব কেন ?

—বলতে হবে না, জানি। ওদের খালি একটাই ভাষা, না রে তিতির ?

—কী বল তো ?

—যে ভাষায় আমির খান জুহি চাওলার সঙ্গে কথা বলছিল। গাছের আড়ালে গিয়ে। ঠিক কি না ?

—উফ। আবার সিনেমাটার কথা মনে করিয়ে দিলি তো ! দেবস্মিতা পাঁচমনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল,—আমিরটা কেন মরে গেল রে ? আমি আজ রাত্তিরে ঘুমোতেই পারব না।

—স্টুপিডের মতো কথা বলিস না তো। সিনেমা ইজ সিনেমা। হিয়ার বেতের চেয়ারে গা ছড়িয়ে দিয়েছে ঝুলন,—তোর আমির খানও দেখগে যা নিজের ডেথ সিন দেখে হ্যা হ্যা করে হাসছে। আর ইনি এদিকে ফুলটুসির মতো ফোঁপাচ্ছেন ! রিয়েল লাইফ আর সিনেমা এক নয়, এটা বুঝিস না ?

—রিয়েল লাইফে এ রকম হয় না বুঝি ? তিতির দেবস্মিতার পক্ষ নিয়ে ফেলল,—রোজ কাগজে যে এত এত প্রেমের জন্য সুইসাইডের খবর পড়ি সেগুলো কি ফলস ?

হিয়া পা তুলে বসল বিছানায়,—ফলস কে বলেছে ? পৃথিবীটাতে কি বোকার কমতি আছে ? প্রেম ইটসেলফ ইজ বোকামি।

—তার মানে রোমিও জুলিয়েট বোকা ? হীর রনঝা বোকা ? লায়লা মজনু বোকা ? সিরি ফরহাদ বোকা ?

—বোকা বললে বোকারাও লজ্জা পাবে। এরা হল বিশ্ব গাড়ল।

—যা বলেছিস। আমি তো বাবা ভাবতেই পারি না আমি একটা ছেলের সঙ্গে ট্রেন লাইনে গলা দিয়ে দিলাম ! পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম ! ওরে বাবাহ, কী জোর লাগবে রে। হাড় গুঁড়িয়ে যাবে !

তিতির ব্যথিত চোখে ঝুলনের দিকে তাকাল, অভিশাপ দিল মনে মনে। তুই যখন মাউন্টেনিয়ারিং শিখবি তখন এমনিই পড়ে হাড়গোড় ভাঙবে তোর। তোর কপালে বয়ফ্রেন্ড টিকতেই পারে না।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট এসে গেছে। প্রেমের জন্য আত্মহত্যা ভুলে চার বন্ধু এক সঙ্গে লাফ দিয়েছে খাবারে। বয়সের ধর্ম মতোই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যায় তারা। ঝরনা থেকে নদী হয়, নদী ফিরে ঝরনা। লাফিয়ে লাফিয়ে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে যায়, আবার নামে সমতলে।

তিতির হঠাৎ প্রশ্ন করল,—এই আমাদের রেজাল্ট কামিং উইকেই বেরোচ্ছে নাকি রে ?

দেবস্মিতা হাউমাউ করে উঠল,—ইশ, দিলি তো আড্ডাটা চৌপাট করে। আমি বলে কত কষ্টে পরীক্ষার কথাটা ভুলে আছি !

ঝুলন বলল,—তোর আবার চিন্তা কিসের ? কোয়েশ্চেন পেয়ে পরীক্ষা দিতে বসেছিলি...

—মোটেই কোয়েশ্চেন পাইনি। মিথ্যে কথা।

—তোদের টিউটোরিয়ালে পরীক্ষার আগে যে সাজেশান দিয়েছিল তার থেকে নাইনটি পারসেন্ট

অঙ্ক কমন আসেনি ?

—টিউটোরিয়ালে তো দেয়নি, অনিতা দিয়েছিল। ওর স্যার কোত্থেকে একটা সাজেশান পেয়েছিল সেটাই তো আমাকে... আমি কি জানতাম ওগুলোই পরীক্ষায় আসবে ?

—তুই তো আমাদের সাজেশানটা দিসনি ! সেলফিশ কোথাকার।

ঝুলনের কড়া কড়া কথা এতক্ষণ বেশ উপভোগ করছিল তিতির। পরীক্ষার আগের দিনই দেবস্মিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার অথচ দেবস্মিতা তখনও তাকে সাজেশানের কথা কিছু জানায়নি। সেই কোন নার্সারি থেকে এক সঙ্গে পড়ছে তারা, এতদিনের সঙ্গীদেরও ডিচ করল দেবস্মিতা, এই কি বন্ধুত্ব ! তিতিরের ছোট কাকার কথাই ঠিক। ছোটকা বলে, বন্ধু পাওয়া এ জীবনে বড় কঠিন রে তিতির। যারা একটু ওপরে উঠে যায় তারা বন্ধুকে ভাবে চামচা। যারা একটু নীচে পড়ে থাকে তারা ভাবে বন্ধু তাকে চালবাজি দেখাচ্ছে। আর যারা সমান সমান, তারা তো কখনওই বন্ধু নয়। তারা সবাই রেসের ঘোড়া। চান্স পেলেই বন্ধুকে ল্যাং মেরে ট্র্যাক থেকে বার করে দেয়।

ঝুলন চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেই চলেছে। দুর্বল ঢালের আড়াল থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেবস্মিতা। হিয়া তিতিরকে থামানোর চেষ্টা করল বার কয়েক, পারছে না। হাল ছেড়ে দুজনেই বসে রইল চুপচাপ। দেবস্মিতা যখন তার তূণ থেকে কান্নার ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় বার করে ফেলেছে, তখনই হিয়ার ঠাকুমা ঢুকলেন ঘরে। তাঁকে দেখে ঝুলন দেবস্মিতা উচ্চগ্রামে তাদের অভিযোগ জানাতে শুরু করেছে। একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছিল না হিয়ার ঠাকুমার। দু হাতে কান চাপা দিয়ে বললেন,—ওরে চুপ কর চুপ কর, এরপর তো আমি কালা হয়ে যাব।

দুজনেই ক্রোধে রক্তবর্ণ, দুজনেরই নাসারন্ধ্র স্ফুরিত, দুজনেই ফুঁসছে বিজাতীয় বিদ্বেষে।

হিয়ার ঠাকুমা বললেন,—বুঝতে পারছি তোদের পরীক্ষা নিয়ে কোনও ঝগড়া হচ্ছে।

তিতির কাঁদো কাঁদো মুখে বলল,—আমারই ভুল হয়েছে। আমি রেজাল্টের কথাটা না তুললেই পারতাম !

—এই তো সবে জীবনের প্রথম পরীক্ষাটা দিয়েছিস, এখনই তোরা মারপিট করে মরছিস ? এরপর বাকি জীবনটা কী করবি ?

ঘরের ভারী আবহাওয়া ক্রমে শীতল হয়ে আসছে। হিয়ার ঠাকুমা স্নিগ্ধ গলায় বললেন,—হ্যাঁ রে মেয়েরা, তোরা যে পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে ঝগড়া করছিস, জীবনে কে কি হতে চাস তাই নিয়ে কিছু ভেবেছিস ?

কেউ কোনও রা কাড়ছে না, অগত্যা হিয়াই বরফ ভাঙল,—তুমি তো জানই আমি ডাক্তার হতে চাই।

—থাম তো। ঠাকুমা স্নেহের ধমক দিলেন,—তুই হবি ডাক্তার। এখনও কারুর আঙুল কেটে গেলে ঘর থেকে পালাস ! ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ দেখলে চোখ বুজে বসে থাকিস ! মরা আরশোলা দেখলেও ভয়ে সিঁটিয়ে যাস ! তুই যদি ডাক্তার হোস তা হলেই হয়েছে !

হিয়া লজ্জায় অধোবদন। রাগ ঝগড়া দুঃখ ভুলে হিহি হাসছে বাকি তিনজন।

ঝুলন শিশুর মতো হাত তুলল,—আমি এক্সপ্লোরার হব ঠাকুমা।

—কী আবিষ্কার করবি ?

—হিমালয়েই কত অজানা জায়গা পড়ে আছে।

—তোর বাবা মা তোকে ছাড়বে ? তাদের একমাত্র মেয়ে তুই।

—বাপি একটু ক্যাচোর-ম্যাচোর করবে, আমাকে ছেড়ে বাপি থাকতেই পারে না। মা নো প্রবলেম। নিজেই তো ক'দিন আগে অফিস-কলিগদের সঙ্গে ট্রেকিং করে এল মা।

ঠাকুমা দেবস্মিতার দিকে তাকালেন,—তুই তো এদের মধ্যে লেখাপড়ায় সব থেকে ভাল, তুই কী হবি ?

দেবস্মিতা একটু ভেবে বলল,—দিদি বলছিল আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া উচিত।

—দিদির কথা ছাড়, তোর নিজের কী ইচ্ছে বল ?

দেবস্মিতা মাথা চুলকোল,—বাবার ইচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারির পর আমি জেনারেল স্ট্রিমে যাই। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে এম এসসি করে তারপর রিসার্চ।

—আর তোর মা'র কী ইচ্ছে ?

—বাবার যা ইচ্ছে, মা'রও তাই।

হিয়ার ঠাকুমা বালিকার মতো হেসে উঠলেন,—ওরে মেয়ে, আমি তোর ইচ্ছের কথা জিজ্ঞেস করছি।

দেবস্মিতা মাথা চুলকেই চলেছে। চুলকেই চলেছে।

তিতিরও মনে মনে উত্তর খুঁজছিল। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সে তেমন করে এখনও কিছু ভাবেইনি। আচ্ছা, নান হলে কেমন হয় ? তাদের স্কুলের সিস্টারদের মতো ? সিস্টার ভেরোনিকা ! সিস্টার সুজান ! সিস্টার অ্যানিস ! সিস্টার সুজান যখন স্কুলের চ্যাপেলে বাইবেল পড়েন, কী অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমায় ভরে যায় শান্ত হলঘরটা ! সিস্টারের লম্বা সাদা পোশাক থেকে অদ্ভুত এক জ্যোতি বেরোয় তখন ! এক পবিত্র আলোকবলয় !

মনের সাধ মুখ ফুটে প্রকাশ করতেই বন্ধুরা হিহি করে হাসছে। ঝুলন হিয়াকে চিমটি কেটে গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

হিয়ার ঠাকুমা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন তিতিরকে,—এই বয়সে এত বৈরাগ্য কেন রে ?

—না...মানে...

—নান হওয়া কত কঠিন জানিস ? নিজের সব সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিতে হয়। এ কাজ ঝুলনের এক্সপ্লোরার হওয়ার থেকে অনেক অনেক বেশি কঠিন। এ তো শুধু পাহাড় সমুদ্র জয় করা নয়, এ হল নিজের ভেতরের প্রকৃতিকে জয় করা। জাগতিক কামনা বাসনা লোভ ক্রোধ সব কিছুকে নিজের বশে আনা। এ কাজ পারবি তুই ?

বাড়ি ফেরার পথেও হিয়ার ঠাকুমার কথাগুলো কানে বাজছিল তিতিরের। সদরের সামনে এসে সব চিন্তা উবে গেল। প্রথম দিন বেপরোয়া হতে গিয়ে নটা বেজে গেছে প্রায়, না জানি মা আজ কতটা রগড়াবে !

নাহ, পবিত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার গুণ আছে। অনেক দিন পর তিতিরের পিসি এসেছে বাড়িতে, জোর গজল্লা চলছে দাদুর ঘরে। পরশু রাত্রে পিসিদের পাড়ায় একটা লোমহর্ষক চুরি হয়ে গেছে তারই সবিস্তার ব্যাখ্যান করছে পিসি, মা আর কাকিমা মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে শুনছে সেই কাহিনী। অ্যাটমেরও উত্তেজনায় চোখ বড় বড়। দাদুই একমাত্র চোখ বুজে নির্বিকার।

তিতিরকে কেউ খেয়ালই করল না। ইন্দ্রাণীও না। এ যাত্রা পার পেয়ে গেল তিতির। জুড়ে গেল গল্পগাছায়।

নিশুত রাতে আজব এক স্বপ্ন দেখল তিতির। স্কুলের চ্যাপেলে বুক উঁচু ডেস্কের পিছনে দাঁড়িয়ে তিতির বাইবেল পাঠ করছে। পরনে শ্বেতশুভ্র ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনীর সাজ। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা তার নয়, সিস্টার সুজানের। সামনে বসা অসংখ্য বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে সুর করে গেয়ে উঠল,

—আওয়ার ফাদার হুইচ আর্ট ইন হেভেন
হ্যালোয়েড বি দাই নেম,
দাই কিংডম কাম, দাই উইল বি ডান
অ্যাজ আর্থ অ্যাজ ইট ইজ ইন হেভেন...

প্রার্থনাসঙ্গীতের সঙ্গে একটা সেতার ঝঙ্কৃত হয়ে চলেছে। কখনও ক্ষীণ হয়ে আসে বাজনা, কখনও জোর। কিন্তু বেজেই চলেছে।

হঠাৎই গানের সুর ছিঁড়ে খুঁড়ে চ্যাপেলের দরজায় ধাক্কা মারছে একটা লোক, ভিখিরির মতো

চেহারা। শতচ্ছিন্ন জামাকাপড়। উসকো-খুসকো চুল।

নেশার ঝোঁকে টলছে লোকটা!

লোকটার মুখ দেখতে পাচ্ছিল না তিতির। বড় আবছা সব কিছু। সহসা চেঁচিয়ে উঠেছে মলিন আগন্তুক,—তিতির ফিরে আয়। তিতির ফিরে আয়।

বাবা!

ঝপ করে ঘুম ভেঙে গেল। তিতির অন্ধকারে চোখ খুলেছে। স্কুল নেই, চ্যাপেল নেই, মলিন আগন্তুকও নেই। শুধু বাজনার ঝঙ্কারটা রয়ে গেছে, মথিত করছে নিবিড় রাত্রিকে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড পর তিতির বুঝতে পারল। অনেক দিন পর মাঝরাতে সেতার বাজাচ্ছে ছোটকা।

রাতবাতির নীলচে আলোয় ভরে আছে নিশীথকক্ষ। পাখার হাওয়া ঘরময় চরকি খেয়ে মরছে। ছবিহীন ক্যালেন্ডার ছপছপ শব্দ তুলছে দেওয়ালে। রাত্রি এখন বড় শূন্য, অতি বিশাল।

শূন্যতাকে আরও শূন্য করে সেতারে মীড় টানছে কন্দর্প। যেন মীড় নয়, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে বাড়িটা। তিতিরও।

খানিক পরে চোখ মুছে পাশ ফিরল তিতির।

ফিরেই চমকেছে। মা জেগে আছে! মা'র চোখ কড়িবরগার দিকে স্থির।

১১

মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছিল রাত্রে। প্রকাণ্ড দানার ভারে থরথর কেঁপেছিল মেদিনী। তারই কিছু রেশ রয়ে গেছে ভোরের পথেঘাটে। লেকের ভাঙাচোরা রাস্তাটির খানাখন্দে জমে আছে ঘোলাটে জল। মাঠের ঘাসে পা পড়লে কাদা চলকে ওঠে।

কন্দর্প ছোট ছোট জলকাদা কাটিয়ে দৌড়চ্ছিল। দৌড় নয়, হাঁটা। আবার হাঁটাও নয়, দৌড় আর হাঁটার মাঝামাঝি এক ছন্দ।

ছন্দোময় গতিতে দুবার লেক চক্কর দিয়ে মহাকায় শিরীষ গাছের নীচে এসে থামল কন্দর্প। স্বাস্থ্যসন্ধানী মানুষের ভিড় আজ কম, বোধহয় কাল রাতের বৃষ্টির কারণেই, তবে কন্দর্পের টার্গেটটি এসে গেছে। লেকের পাড়ে একটা সিমেন্টের বেঞ্চি ধরে ওঠবস করছে অশোক মুস্তাফি। বৃষ্টি ধোওয়া স্নিগ্ধ সকালেও দরদর ঘামছে।

কন্দর্প একটু তফাত থেকে চেঁচাল,—দাদা আজ কতক্ষণ?

চর্বি থলথল বেঁটে শরীর ঘুরল সামান্য। উত্তর না দিয়ে আবার ওঠবস করে চলেছে। বিড়বিড় করে গুনছে, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ...

কন্দর্প ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পঞ্চাশ পর্যন্ত থাকতেই হবে। রোজ সকালে তার এই লেকে আসা শুধুই বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যচর্চা নয়, অনেক ছোটামোটা যোগাযোগও হয়ে যায় এখানেই। দুজন ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে এই লেকেই আলাপ হয়েছিল, টিভি সিরিয়ালের এক ক্যামেরাম্যানের সঙ্গেও। তাদের দৌলতে কন্দর্প কাজও পেয়েছিল চার-পাঁচটা। তবে তারা কেউই অশোক মুস্তাফির মতো এত বড় কাতলা ছিল না। লোকটা রেলের বড় সাপ্লায়ার, সম্প্রতি গোটা তিনেক বাংলা ফিল্ম প্রোডিউস করেছে, তার মধ্যে রমরমিয়ে ব্যবসাও দিয়েছে দুটো। হালে লেকের ধারে বিশাল ফ্ল্যাট কিনে হাওড়া থেকে চলে এসেছে। ভাগ্যিস লোকটার চর্বি কমানোর বাসনা চেগেছিল, তাই না আলাপ!

ব্যায়ামের পালা সাঙ্গ হল। সিটে বসে হাঁপাচ্ছে অশোক মুস্তাফি। মুখ হাঁ, আধখানা জিভ ঝুলছে বাইরে।

কন্দর্প গুটি গুটি পায়ে পাশে এল,—বর্ষা তাহলে এসে গেল দাদা।

হাঁ মুখ থেকে উৎকট ধ্বনি তুলে একটা বলবান বাতাস বার করল অশোক মুস্তাফি। মন্দ্র স্বরে বলল,—আসাই তো উচিত, নয় কি?

—তা ঠিক। জুনের মিডল হয়ে গেল, অফিসিয়ালি তো এইট্‌থ জুনই মনসুন আসার কথা।

—মনসুন কি কারুর হুকুমের চাকর যে ডেট মেনে আসবে?

—খাসা বলেছেন দাদা। সায়েনটিস্টরা এমন কায়দা মারে যেন ওরাই সুইচ টিপে মেঘ নিয়ে আসে।

—সায়েন্সটিস্টদের টিজ করবেন না, ওদের প্রেডিকশান আজকাল বেশ মেলে। লাস্ট ইয়ারে ক্যানিং-এর সাইক্লোনের ফোরকাস্টটা হুবহু মিলিয়ে দিয়েছিল।

—মিলবেই তো। কত সব মডার্ন ডিভাইস বেরিয়ে গেছে।

—ডিভাইস ফিভাইস কিছু নয় কন্দর্পবাবু, আসল হল অবজারভেশান। চোখ। পাওয়ার অফ স্পেকুলেশান। ইনট্যিউশান। খনার বচন পড়েননি?

—তা ঠিক। তা ঠিক। লোকটার বাজনায় সঙ্গত করতে কন্দর্প জান লড়িয়ে দিচ্ছিল। মৌসুমি বায়ু, বর্ষাকাল, কোনও কিছুই তার স্বর্গে বাতি দেবে না, অশোক মুস্তাফিকে খুশি করে তোলাই তার এখন প্রথম এবং প্রধান কাজ। প্রাণপণে খনার বচনই মনে করার চেষ্টা করল কন্দর্প। পেয়ে গেছে। লটারি পাওয়া মুখে বলল,—খনার বচনের কোনও তুলনা হয় না দাদা। কী সব লাইন! মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা। যদি বর্ষে আগনে, রাজা যান মাগনে। যদি বর্ষে মাঘের শেষ...

—ধুর, ওগুলো বস্তাপচা হয়ে গেছে। অশোক মুস্তাফি শর্টসের পকেট থেকে তোয়ালে রুমাল বার করে মুখ মুছছে। মাথার ওপর গাছের পাতা থেকে টুপ করে খসে পড়ল এক বিন্দু জল, পড়েই ছেতরে গেল। মুস্তাফি টেরচা চোখে তাকাল সেদিকে,—রোমান্টিক বচন একটাও মনে আসছে না? দূর শোভা নিকট জল, নিকট শোভা দূর জল...

কন্দর্প চুপসে গেল। মহিলা এ সব বচনও ঝেড়েছিল নাকি? একী প্যাঁচ মারা লাইন! মানে কী এ সবের অ্যাঁ? সাধে কী তোর শ্বশুর তোর জিভটাই কেটে নিয়েছিল!

মরিয়া কন্দর্প খানিকটা নির্লজ্জই হল এবার,—যাই বলুন দাদা, ওই সব খনা মনা হেনা, ইনট্যিউশানে এরা আপনার কাছে নস্যি। আপনি যেদিকে তাকান, সেদিকে সাকসেস।

—হল না। মুস্তাফি দু দিকে মাথা দোলাচ্ছে। একটি বছর পঁচিশেকের মেয়ে জগিং করতে করতে আসছিল এদিকে, হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর্চ করছে। সেদিকে জুলজুল তাকাল মুস্তাফি। মেয়েটা ভরাট শরীর ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ফেলল, লাল ট্র্যাক সুটে টানটান তার উদ্ধত যৌবন। বার কয়েক ধনুক হয়ে আবার জগিং শুরু করেছে মেয়েটি। দুলতে দুলতে দূরে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। আবলুশ কাঠের মতো গোদা গোদা উরু কাঁপাচ্ছে মুস্তাফি,—আমার ইনট্যিউশান খুব খারাপ কন্দর্পবাবু।

দাদা বলতে গিয়ে এবার কন্দর্প খানিকটা ছলকে গেল। বলল,—কেন স্যার?

—কাল রাতে বৃষ্টি হবে না ভেবে জানলা খুলে রেখেছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি অর্ধেক ঘর জলে ভেসে গেছে।

কন্দর্প হাল ছেড়ে দিল। এই লোকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়। সরাসরিই পেড়ে বসল কথাটা,—আপনার নতুন প্রোডাকশান তো শুরু হতে চলল দাদা, আমার কথাটা একটু মনে রাখবেন। আপনাকে আমি বলেছিলাম...

—কী কথা বলুন তো? মুস্তাফি স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের মতো তাকাল।

—ওই যে বলেছিলাম না, আমি একটু-আধটু অ্যাক্টিং করি...ছোট পিসিমাতে একটা ভাল রোল করেছিলাম...আপনি হয়তো দেখেছেন...ওই যে ইয়াং টুরিস্ট...চার দিনের কাজ ছিল।

—বাহ ভাল তো। টোকা দিয়ে আঁটো টিশার্ট থেকে ছোট্ট পোকা ঝেড়ে ফেলল মুস্তাফি,—কিন্তু

আমার ছবি কবে শুরু হবে তার তো ঠিক নেই ভাই।

—না দাদা, শিগগিরই শুরু হবে, আমি খবর পেয়েছি। আপনি রূপেনদাকে স্টোরি লিখে দিয়েছেন। স্টোরির আউটলাইনও যে আপনারই দেওয়া, তাও আমি জানি। নরেন ঘোষ ডিরেকশান দিচ্ছে। কি দাদা, ঠিক বলিনি ?

—বাহ বাহ, আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন! তা এটা জানেন না, বই-এর কাস্টিং প্রোডিউসার করে না, ডাইরেক্টরই করে।

—ও তো জেনারেল রুল, ও কি আপনার বেলায় খাটে দাদা ? আপনার শয়তানের মুখোশ হিট করার পর আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে একটা নাম। বাংলা ফিল্মের আন্ধেরার বাজারে আপনি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। কথাগুলো বলতে বলতে কন্দর্পের নজর চলে গেছে মুস্তাফির মোটা মোটা উরু দুটোর দিকে। কী কুৎসিত কালো লোমে ভর্তি! চোলাই মদের ব্লাডারের মতো পেটটাও কেমন ফেটে বেরোচ্ছে! তীব্র এক বিবমিষা ঠেলে উঠছিল কন্দর্পের গলায়, বমি সামলে বিনয়ে ফিরল,—আপনি বলে দিলে নরেনবাবু রিজেক্ট করতে পারবেন না।

—আমি তো ডাইরেক্টরদের ডিকটেট করি না ভাই।

শালা। মনে মনে চার অক্ষরের খিস্তি আওড়াল কন্দর্প ; মুখের হাসিটি বদলাল না,—ডিকটেট কেন বলছেন দাদা ? আপনার যে জহুরির চোখ, তা কি নরেনবাবু জানেন না ?

ট্র্যাক সুট পরা মেয়েটি আবার সিনে ঢুকে পড়েছে। সাঁতার ক্লাবের দিক থেকে ছুটে আসছে এদিকে। একই জায়গায় এসে দাঁড়াল। হ্রস্ব বেণীর পিছনে দু হাত চেপে মাথা ঠেকাচ্ছে হাঁটুতে। তেজি ঘোটকীর ভঙ্গিমায় টগবগ পা নাচাল কিছুক্ষণ।

অশোক মুস্তাফির চোখ চকচকে, দৃষ্টি সরছে না ট্র্যাক সুট থেকে,—আমাকে একটা মেয়ে জোগাড় করে দিতে পারেন ?

কন্দর্প তোতলা হয়ে গেল,—মমম মেয়ে! আআ আমি!

ট্র্যাক সুট সিন থেকে এগজিট নিচ্ছে। তার গমনপথের দিকে চোখ মেলে মুস্তাফি চাঙা,—আমি একটা নতুন মেয়ে চাই। একদম ফ্রেশ। আমার নেক্সট ফিল্মের জন্য। নায়িকার রোলে নয়, তবে প্রায় নায়িকা। বেশ চনমনে হবে। সিডাকটিভ হবে। নায়কের সঙ্গে ওই যে কি বলে, ইশক্ ফিশক্ করবে। কিন্তু হিরোকে সে পাবে না। ভেরি ভাইটাল রোল।

—গ্রুপ থিয়েটারের মেয়ে হলে চলবে দাদা ?

—না না, ওরা খুব ঠ্যাঁটা হয়। বেশি পাকা। আমার তৈরি দরকার নেই, গার্ডেন ফ্রেশ হলে নিজেই তৈরি হয়ে যাবে। শুধু ফেস খুব ম্যাগনেটিক হওয়া দরকার।

ঝপ করে দীপঙ্করের বউ-এর মুখটা মনে পড়ে গেল কন্দর্পর। কেন যে পড়ল! দীপঙ্কর তার কলেজমেট, কলেজে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতাই ছিল তার সঙ্গে। তারপর যা হয়, পাস করার পর যোগাযোগ কমে গেল। দীপঙ্কর ঢুকল একটা প্রাইভেট কোম্পানির সেল্‌সে, কন্দর্প আঁকড়ে ধরল অভিনয়। বছর দুয়েক আগে আচমকা মৌলালিতে দেখা। সদ্য তখন বাগুইআটিতে নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে দীপঙ্কর, বিয়েও করেছে বছর দেড়েক। দীপঙ্কর জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল কন্দর্পকে। খুব আদরযত্ন করল। দীপঙ্করের টুকটুকে বউ আর ছিমছাম ফ্ল্যাট দেখে কন্দর্পের তো মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। বন্ধুর সৌভাগ্যে মনে মনে বেশ ঈর্ষাই হয়েছিল সেদিন। সেই দীপঙ্কর মাস ছয়েক আগে দুম করে মরে গেল। কিডনির এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে। রাসবিহারীর আড্ডায় পল্লবের মুখে খবর পেয়ে কন্দর্প ছুটেছিল বাগুইআটিতে। গিয়ে দেখে, সে এক বিপর্যস্ত অবস্থা। এগারো মাসের বাচ্চা নিয়ে প্রায় অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে মধুমিতা। দীপঙ্করের অসুখে সমস্ত সঞ্চয় শেষ, মাথার ওপর ফ্ল্যাটের দেনা, প্রাণের দায়ে মধুমিতা একটা চিট ফান্ডের এজেন্ট হয়েছে। স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পরই। বেলার দিকে পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে লোকজনের এন এস সি-টেন এস সিও করায়, সেখান থেকেও কমিশন আসে দু-চার পয়সা। বিধবা মাকে কাছে এনে

রেখেছে, তিনিও আর এক দায়। মাত্র একদিনের পরিচিত স্বামীর বন্ধুকে লজ্জা সংকোচ ভুলে চাকরির জন্য কী করুণ মিনতি মধুমিতার ! কন্দর্প আর কোথায় চাকরি পাবে ? তাও চেনাজানা একে তাকে ধরে দু-তিনটে ছোটমোটো ইন্টারভিউ জোগাড় করে দিয়েছিল। সেই সূত্রেই আরও বার কয়েক আসা যাওয়া।

কন্দর্প নিজেকে ধমকাল। এই হাঙরটার সামনে মধুমিতাকে নিয়ে আসার কথা মনে এল কী করে তার।

ছেঁড়াখোঁড়া মেঘে ভরে আছে আকাশ। সূর্যতেও কেমন ভেজা ভেজা ভাব। সিক্ত গাছপালা একটা গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে। লেকের গা বেয়ে, যাচ্ছি যাব করতে করতে চলেছে এক মালগাড়ি। দূরের পাড়ে স্নানে নেমেছে লাইন ধারের বস্তির মেয়েরা।

কন্দর্প মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল,—দাদা আজ আপনার কালীবাড়ি যাওয়া নেই ?

অশোক মুস্তাফি ঘড়ি দেখল,—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। চলুন চলুন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে,—মেয়েটার কথা কিন্তু মনে রাখবেন। আমি অবশ্য অনেককেই বলেছি... আজকাল তেমন স্যাটেবল্ আনকোরা পাওয়া কঠিন। হেঃ হেঃ।

মন্দিরের দিকে এগোতে এগোতে মুখভাব বদলাচ্ছিল অশোক মুস্তাফির। ঘোড়েল কামুক ক্রমশ ভক্ত সাধক। মন্দিরের সামনে পৌঁছে মা মা স্বরে ব্রহ্মনাদ ছাড়ল বার কয়েক। প্রতিমার পদতলে বসে রোজকার মতো অশ্রুবিয়োগও করল।

কন্দর্প মন্দিরে ঢোকেনি, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গ্লাসে চা খাচ্ছে। মন্দিরের দৌলতে আশপাশে বেশ কয়েকটা দোকান তৈরি হয়ে গেছে। চায়ের দোকান। কোল্ড ড্রিঙ্কস, পান-বিড়ির দোকান। বিকেলের দিকে পাওভাজি ভেলপুরিও বসে। ছোটবেলায় কন্দর্প যখন এদিকে ফুটবল খেলতে আসত, মন্দিরের জায়গায় এখানে একটা চায়ের দোকান ছিল। জীর্ণ। শ্রীহীন। দুর্জনেরা বলে, সন্ধেবেলা নাকি চুল্লুও পাওয়া যেত। তারপর কিসব স্বপ্নাদেশ ফপ্নাদেশ হল, রাতারাতি গজিয়ে গেল মন্দিরটা। প্রথম কয়েক বছর বিশাল লাইন পড়ত ভক্তদের, দূরদূরান্ত থেকে সবাই চরণামৃত নিতে আসত। এখন ভক্তিতে কিছুটা ভাঁটার টান, তবে বিশেষ বিশেষ দিনে এখনও ভক্তসমাবেশ কম হয় না। আর রইস লোকেদের গাড়ির লাইন তো রোজই লেগে আছে। প্রণামীও ভালই পড়ে।

কন্দর্পের মনে ভক্তি-ভাব কম, তবু বুকটা শুলোয় মাঝে মাঝে—প্রণামীর বাক্সটার দিকে চোখ পড়লে। এরকম একটা স্কিম নিতে পারলে মন্দ হত না, মাস ছয়েকের প্রণামীর টাকায় নিজেই একটা ফিলম প্রোডিউস করতে পারত। হিরোর রোলে অবশ্যই সে স্বয়ং। পাশের স্কাইস্ক্র্যাপারটার মাথায় চোখ তুলল কন্দর্প। আকাশমিনারের মাথায় ওই তো দুলছে সিলভার স্ক্রিন ! পর্দায় ক্রেডিট।

টাইটেলে একটার পর একটা নাম ফুটে উঠছে। প্রযোজনা : কন্দর্প রায়। পরিচালনা : কন্দর্প রায় ! কাহিনী : কন্দর্প রায় ! অভিনয়েও প্রথম নাম কন্দর্প রায় ! আচ্ছা, নায়িকা কাকে নেওয়া যায় ? সুতন্দ্রা চন্দ্রাণী ঋতুশ্রী...নাহ্, এরা কন্দর্পকে বড় হেলাফেলা করে। অযোধ্যা পাহাড়ে শুটিং করতে গিয়ে চন্দ্রাণী কী বেইজ্জত করেছিল কন্দর্পকে ! ছোট্ট একটা রেপ সিন ছিল, ঠিক রেপও নয়, ধর্ষণের বিফল প্রয়াস। কন্দর্প যতবার চন্দ্রাণীর কাঁধ চেপে ধরে, তত বার হাসিতে লুটিয়ে পড়ে চন্দ্রাণী। অ্যাই প্লিজ কাতুকুতু দেবেন না, অ্যাই প্লিজ...। কাট কাট। ডিরেক্টর খুব ধমকাচ্ছিল কন্দর্পকে। আলুবাজদের মতো চেহারা করেছেন, একটা মেয়ের কাঁধ ঠিক করে চেপে ধরতে পারেন না ! গোটা ইউনিটের সামনে কন্দর্পর প্রায় কেঁদে ফেলার দশা। চাঁদিপুরে কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়ে একটা অপরূপ সোনারঙ ঝিনুক উপহার দিল ঋতুশ্রীকে, মুখ ভেংচে ঋতুশ্রী বলল, ইশ কী পচা গন্ধ বেরোচ্ছে ! ফেলে দিন। ফেলে দিন।

নাহ্, বম্বে থেকেই নায়িকা উড়িয়ে আনবে কন্দর্প।

অশোক মুস্তাফি চোখ মুছতে মুছতে বেরোচ্ছে, কন্দর্প মাটিতে নামল।

—কিহে, এখনও দাঁড়িয়ে আছ ? মুস্তাফি দেঁতো হাসছে,—এই দ্যাখো, তুমি বলে ফেললাম

আপনাকে।

উপন্যাসের নায়িকা আপনি থেকে তুমিতে এলে নায়কের যেরকম রোমাঞ্চ হয়, কন্দর্পের মুখেও অবিকল সেই আবেশ,—তুমিই তো বলবেন। আপনি হলেন গিয়ে পিতৃতুল্য মানুষ।

—বাপ ডেকে বয়সটা বাড়িয়ে দিচ্ছ হে!

—বাবা কি শুধু বয়সে হয় দাদা? বাবা হয় গুণে। বাবা হয় কর্মে।

—ফাইন বলেছ তো। তা থাকা হয় কোথায়?

এই তো কাছেই। ঢাকুরিয়ায়।

খোশমেজাজে দুলকি চালে হাঁটছে মুস্তাফি। দুলকি চালেই প্রশ্ন করল,—ঢাকুরিয়ার কোথায়?

—স্টেশনের একটু আগে। বাঁ-দিকে একটা স্কুল আছে, স্কুলের কাছে।

—ওখানে সান্যালদের বাড়িটা চেনো?

—খুব চিনি। বাড়িটা তো ভাঙা হচ্ছে। ঠিক তার উল্টো দিকেই পুরনো একটা বাড়ি আছে না...

—দোতলা বাড়ি? পাঁচিল দিয়ে ঘেরা? সামনে ছোট গেট?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বাড়িটাই আমাদের।

—গ্যারেজে একটা প্রেস আছে?

—হ্যাঁ। দাদার প্রেস।

—আই সি! কয়েক সেকেন্ড নীরব হয়ে কি যেন ভাবল মুস্তাফি। হঠাৎই বাচনভঙ্গি পুরো পাল্টে ফেলেছে,—তুমি তো বেশ খানদানি বাড়ির ছেলে হে! তোমার চেহারা দেখেই আমার গেস্ করা উচিত ছিল। নাহ্, তোমার জন্য একটা কিছু করতেই হয়। তোমার ঠাকুর্দা রায়বাহাদুর ছিলেন না?

—আ আপনি কী করে জানলেন?

—আমার ও পাড়ায় যাতায়াত আছে। তোমার ফ্যামিলির তো বেশ নাম আছে ঢাকুরিয়ায়।

জীবনে প্রথম নিজের পরিবারের জন্য গর্ব অনুভব করছিল কন্দর্প। লাজুক মুখে মাথা নামাল।

মুস্তাফি ঠাণ্ডা স্বরে বলল,—সন্ধেবেলা চলে এসো। আই মাস্ট ডু সামথিং ফর ইউ।

কী বলছে রে! নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না কন্দর্পের। কথা জড়িয়ে গেল,—কটার সময় যেতে হবে?

—বাই এইট চলে এসো। মুস্তাফি চোখ টিপল,—কোনখানে আসবে জানো তো?

আপনার ফ্ল্যাট আমি চিনি দাদা।

—তুমি ভারি ইনোসেন্ট কন্দর্প। মুস্তাফির চোখে কৌতুক,—নিজের ফ্ল্যাটে কি সিনেমার ডিস্কাশন চলে! লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটটায় চলে এসো।

ঠিকানাটা পলকে মেমারিতে পুরে নিল কন্দর্প। পথনির্দেশও।

ন'তলা অট্টালিকার সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়েছে মুস্তাফি। এরই সাততলায় তার পারিবারিক ফ্ল্যাট। কন্দর্প বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল, মুস্তাফি ফিরে ডাকল,—আসছ তো সন্ধেবেলা? আমি কিন্তু তোমার জন্য ওয়েট করব। ওনলি ফর ইউ।

এর থেকেও মধুর করে কি নায়িকারা আহ্বান জানায় নায়ককে? কন্দর্প ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরছিল। এক লোমশ ভাল্লুকের সঙ্গে মনোরম ভোর কাটানোর আত্মগ্লানি ধুয়ে যাচ্ছিল তার। অশোক মুস্তাফির মতো লোকেদের নির্লজ্জ তেল মারতে কী যে বিশ্রী লাগে! মাঝে মাঝে মনে হয়, গামছা পরে হাইড্র্যান্ট পরিষ্কার করাও এর থেকে সম্মানের কাজ। শিল্পীর যন্ত্রণা শিল্পের ধারকরা কতটুকু বোঝে? তবে হ্যাঁ, কন্দর্প এও জানে, এমন দিন থাকবে না, কন্দর্প রায়ের জন্য কোথাও না কোথাও দরজা খুলে যাবে। যাবেই। তখন এই সব কীট হয়ে থাকার মুহূর্তগুলোর চিহ্ন থাকবে না পৃথিবীতে।

হয়তো বা আজই তার শুরু।

বাড়ি ঢোকার মুখে ভাসন্ত মন গোঁত্তা খেয়ে গেল। কাপালিকটা সাতসকালে এসে গেছে। উল্টো

দিকের চায়ের দোকানে বসে পা নাচাচ্ছে।

কন্দর্পকে দেখে গলা চড়াল, রঘুবীর,—এই যে ছোট ভাই, প্রাতঃভ্রমণ হল ?

—না তো, ভোরবেলা নাইট ডিউটিতে বেরিয়েছিলাম।

রঘুবীর বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না। হ্যা হ্যা হাসছে,—ভোরে ওঠার অভ্যেস খুব ভাল। দেহে অযুত হস্তীর বল আসে। তোমার বড়দাকে কত বলি, সূর্যোদয়টা নিজের চোখে দেখুন রায়দা, আয়ু বেড়ে যাবে। কাকে বলা ! তিনি তো...এক কাপ চা চলবে নাকি ছোট ভাই ?

—না। কন্দর্প সাঁৎ করে বাড়িতে ঢুকে গেল।

ইন্দ্রাণী রান্নাঘরে জলখাবার তৈরি করছে। ছুটির সময়ে এটা সেটা রাঁধে ইন্দ্রাণী।

কন্দর্প রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল,—দাদার স্যাঙাত তো বাইরে এসে গেছে দেখলাম !

ইন্দ্রাণী ঘুরল না, ময়দায় সেদ্ধ আলু পুর ভরে বেলছে। চাকি বেলনে চোখ রেখেই বলল,—আমি দেখেছি। তোমরাই দ্যাখো।

—লোকটা কি পাকাপাকি গেঁড়ে বসল নাকি ?

—বোধহয়। রোজ সকালে দুটিতে মিলে বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিরছে সেই দেড়টা-দুটোয়। তারপর তোমার দাদার ভাতঘুমটি সাঙ্গ হলে আবার যুগলে হাওয়া।

—লোকটাও দুপুরে এখানে থাকে নাকি ?

—আগে থাকত না, ক'দিন হল থাকছে। এক পেট ভাত খেয়ে বড়ঘরের সোফায় ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়।

কন্দর্প আঁতকে উঠল,—বড়ঘরের সোফায় ! বাবা কিছু বলছে না ?

—বাবাকে তো প্রায় জপিয়েই ফেলেছে। অর্জুন গাছের ছাল গুঁড়ো করে এনে দিচ্ছে। ওতে নাকি হার্ট পেশেন্টদের উপকার হয় ! ধৈর্য ধরে বাবার মনের-প্রাণের কথা শুনছে ! কপাল দেখে নাকি বলেও দিয়েছে বাবার আয়ু আরও উনিশ বছর !

—হুম ; তাহলে তো প্রবলেম কেস। হেড কোয়ার্টারে শর্ট সার্কিট করে নিয়েছে। তা তুমি কেসটা টেক আপ করছ না কেন ?

—আমি বলতে গেছিলাম। তোমার দাদার সঙ্গে তুমুল হয়ে গেছে। কী সব মানের কথাবার্তা ! একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের পাতে দু'গাল অন্ন দিলে তোমার কি চাল কম পড়ে যাবে ! ইন্দ্রাণী গ্যাসে চাটু বসাল,—তাও আমি পরশু দিন লোকটাকে আলাদা ধরে দিয়েছি দু-চার কথা শুনিয়ে। কাল থেকে তাই আর সকালে ভেতরে ঢুকছে না, তোমার দাদার জন্য শিকারি বেড়ালের মতো ওই দোকানে ঘাপটি মেরে বসে থাকছে। এমন নিঘিন্নে লোক, অত কথার পরও কাল দুপুরে এসেছিল।

—ইজ ইট ?

—হ্যাঁ। তিতির বলল, আমি আছি কিনা দেখে নিয়ে তোমার দাদা চুপি চুপি খাইয়ে দিয়েছে। কী করি বলো তো ? কত আর পাহারায় থাকি !

কন্দর্প চৌকাঠে উবু হয়ে বসল,—দুজনে মিলে যায়টা কোথায় ? করে কী ?

—ভগবান জানে। বাইপাশের দু'ধারে ফাঁকা মাঠ আছে সেখানে নাকি সারাদিন চরে বেড়ায়। বাপ্পা কোন বন্ধুর মোটর সাইকেলে যাচ্ছিল, দু'দিন দেখেছে।

—মাঠে ! কন্দর্প হ্যা হ্যা হাসল,—ঘাস টাস খায় নাকি ?

—তাহলেও তো বুঝতাম বাড়ির কিছু সাশ্রয় হচ্ছে। ইন্দ্রাণী চাটুতে পরোটা সেঁকছে। চামচ দিয়ে বাদাম তেল ছড়াল,—আমার বড় চিন্তা হচ্ছে ভাই। তোমার শুভাশিসদা বলছিল, এসব লোকরা খুব ডেঞ্জারাস হয় ! হয়তো বড় কোনও ডাকাতির প্ল্যান আছে ! আগেভাগে ঢুকে ঘাঁতঘোঁত জেনে নিচ্ছে ! পরে একদিন গ্যাং নিয়ে এসে... ! তোমার দিদিদের পাড়ায় কি হল ? রাত্রিবেলা পুরো বাড়ির লোককে নিদালি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গোটা বাড়ির মাল ম্যাটাডোরে চাপিয়ে চম্পট ! সেখানেও নাকি এরকম একটা লোক ঘুরঘুর করত।

—দিদি আবার একটু এক্সট্রা ডায়ালগ মারে। সারাক্ষণ টিভি সিনেমা গিললে যা হয়! কন্দর্প জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে পরোটার গন্ধ নিল,—কাপালিকটার সম্পর্কে মেজসাহেব মেজগিন্নির কী কমেন্ট ?

—ওয়াচে রাখছে, ঝেড়ে কাশছে না। তবে অ্যাটমকে একদম কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

—হোয়াই ?

—রুনার ধারণা লোকটা নাকি বাণ মারতে পারে।

—ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া বাচ্চাদেরও বাণ লাগে !

—কম্পিউটারে জ্যোতিষ হচ্ছে, বাণ মারাটা কী আর বিচিত্র! ইন্দ্রাণী গ্যাস থেকে চাটু নামাল,—নাও, দুটো গরম গরম আলুপরোটা খেয়ে নাও।

—একটা দাও। আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে বেরোব। ফিরতে রাত হতে পারে।

অশোক মুস্তাফির কথা বলবে কিনা ভেবেও কন্দর্প সামলে নিল। আগে হোক তো। কাজটা পেলে তিতিরকে একটা দামি কোয়ার্টজ ঘড়ি কিনে দিতে হবে। বাপ্পার আছে, তিতিরের নেই, তিতির একদিন কন্দর্পের কাছে মনোবেদনা জানিয়েছিল। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোলে এটাই হবে তিতিরের গ্র্যান্ড উপহার।

কন্দর্প পরোটা ছিঁড়ে মুখে পুরল। হঠাৎ কি ভেবে বলল,— কাপালিকটা তো ডেফিনিটলি পাঁড় মালখোর ! দাদা আবার শুরু করেনি তো ?

মিনতি সুদীপদের বাজার নিয়ে ফিরেছে। মেঝেয় ঢালছে সবজি মাছ মাংস। তার কান বাঁচিয়ে ইন্দ্রাণী বলল,— এখনও শুরু হয়নি। তবে হলেই হল।

কন্দর্প বরাভয় দিল,— কিচ্ছু ভেবো না, তেমন বেচাল দেখলে বড়ঘরের খিল খুলে এমন পেটান পেটাব লোকটাকে... রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবে পুরো ওড়িশি পোজে হাঁটবে। এরকম... এরকম !

কন্দর্পের নৃত্যমুদ্রায় হিহি হেসে উঠেছে ইন্দ্রাণী। জলখাবার নিয়ে দোতলায় যেতে যেতে বলল,— চ্যাংড়ামি না মেরে এবার বাজারে যাও তো দেখি। এরপর তো মাছের আঁশও জুটবে না।

কন্দর্প কয়েক সেকেন্ড জরিপ করল সুদীপের বাজার। হেভি ওয়েট মার্কেটিং ! চিতলের পেটি ! মুরগির তাল ! নিধিরামের জন্য চারাপোনাও আছে ! বাহ্। বাহ্।

দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়ে স্কুটার নিয়ে বেরোল কন্দর্প। এ সময়ে কন্দর্পের অনেক কাজ। সেগুলো অবশ্য কাজ, না অকাজ— তা কন্দর্প জানে না। স্টুডিও পাড়ায় গিয়ে নতুন ফিল্মের খোঁজখবর নেয়, ছোটখাট রোল জোটাবার চেষ্টা করে। কিছু টেকনিশিয়ানের সঙ্গেও তার খাতিরের সম্পর্ক, তাদের মুখরোচক ঘোঁটে অংশগ্রহণ করে। পরিচালকদের অফিসেও মুখ দেখাতে যায়, পাছে মুখটা ভুলে যায় তারা। সময় থাকলে টিভি সেন্টারে যায়, ওখানেও দু-একটা স্নায়ুকেন্দ্র ছুঁয়ে আসতে হয় কন্দর্পকে। এখন টিভি সিরিয়ালের বাজার ভাল, টিভির উঠতি ডিরেক্টরদের মজলিশেও ঘোরে মাঝে মাঝে। তাদের চিত্রনাট্য রচনায় সাহায্য করে, নিদেনপক্ষে স্কুটার চড়িয়ে পৌঁছে দেয় এখান সেখান। স্টুডিও পাড়ায় তার একটা চালু ডাকনাম আছে। স্কুটার কন্দর্প। কন্দর্প নিজেও হিসেব করে দেখেছে এসব কাজে সে যত পেট্রল পুড়িয়েছে তাতে সহজেই একটা বাংলা ছবি তৈরি করে ফেলা যায়। তবুও অভ্যাসটা সে ছাড়তে পারে না। এ এক ভৌতিক নেশা।

কন্দর্প আর একটা কথাও ভাল মতন জানে। আর্টিস্ট হিসেবে সে খুব সুবিধের নয়। অভিনয় নিয়ে সে বিস্তর পড়াশুনো করেছে, অভিনয়ের প্রথাপ্রকরণ সম্পর্কে তার জ্ঞান গভীর, কিন্তু ক্যামেরা চালু হলেই কী যে হয়ে যায় তার ! স্পটলাইট সানগান রিফ্লেকটারের উজ্জ্বল ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অদ্ভুত এক বিক্রিয়া শুরু করে দেয়, অজান্তে আড়ষ্ট হয়ে যায় দেহ। অথচ রিহার্সালের সময়ে সে অন্য মানুষ, তার অভিনয় দেখে তাক লেগে যায় নামীদামি অ্যাক্টরদেরও। ছোটখাট রোলে তাও চলে যায়, বড় রোলে তাকে নিতে ভরসা পায় না কোনও পরিচালক। এখনও এই লাইন ছেড়ে একটা

[illegible] [illegible] করে নেওয়ার এলেম কন্দর্পের আছে, কিন্তু কৈশোর থেকে গড়ে ওঠা সম্মোহনী [illegible] সে এভাবে কোন শক্তিতে ? তাই এই নিত্যি ছোটা । নিত্যি যাতায়াত । নিত্যি হতাশা ।

আজও কন্দর্প নিয়মমাফিক বুড়ি ছুঁয়ে এল কয়েকটা । এক জায়গায় একটা কাজের প্রতিশ্রুতিও পেল । দুদিনের আউটডোর । আমতলার কাছে গড়ে ওঠা এক বিলাসবহুল রিসর্টে । সন্ধের মুখে রাসবিহারী আড্ডার টেবিলে একটু টোকা মেরেই অশোক মুস্তাফির লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল কন্দর্প । আটটার অনেক আগেই ।

ফ্ল্যাটে আর এক মক্কেল বসে । তাকে দেখে অবাক হল কন্দর্প, তবে চমকাল না । রূপেন । স্টুডিওপাড়ার ভাষায়, ক্যাংলা রূপেন । অশোক মুস্তাফির বিশাল অ-পারিবারিক ফ্ল্যাটময় দামি সোফা, কিন্তু রূপেন বসেছে কার্পেটে । আসনপিঁড়ি হয়ে । পাশে তাড়া কাগজ । আধখাওয়া হুইস্কির বোতল । জলের জগ । টইটুম্বুর অ্যাশট্রে । গ্লাস । একটা দুটো নয়, চার-চারটে । প্রতিটি গ্লাসে সোনালি পানীয় টলমল ।

মদ আর সিগারেটের মিশ্র ঝাঁঝ নাকে সইতে সময় নিল কন্দর্প । সোফায় বসবে কি বসবে না ভেবে, কার্পেটেই বসল ।

কাচের আলমারি থেকে আর একটা গ্লাস বার করছে মুস্তাফি,— চলে তো ?

কন্দর্প বিনীত গলায় বলল,— না দাদা, আমার ঠিক চলে না ।

—সে কী হে ! ফিলমলাইনে আছ, মাল চলে না ! একটা অন্তত নাও ।

—দিন তাহলে । খুব অল্প করে ।

ফিলম লাইনে হতাশ হয়ে মাঝে কিছুদিন যাত্রাদলে ঢুকেছিল কন্দর্প । রামধনু অপেরার সহনায়ক । নায়িকার নীরব প্রেমিক, শেষ দৃশ্যে ভিলেনকে মেরে কন্দর্পের মৃত্যু । খুব হিট করেছিল পালাটা । গোটা শীতকাল বীরভূম বাঁকুড়া মালদা কুচবিহার চষে বেড়িয়েছিল কন্দর্প । পকেটে গরম গরম নোট আসছে, নামও ছড়াচ্ছে দিকে দিকে । তবে নোট বা নাম তো আর ফোকটে আসে না, জোর চাপ পড়তে লাগল শরীরের ওপর । বিশেষ করে গলায় । নামে নীরব প্রেমিক হলেও খুবই উচ্চগ্রামের অভিনয়, গাঁ-গঞ্জের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা, উদ্দাম ছোটার ধকল—সব মিলিয়ে কন্দর্প ভারি কাহিল হয়ে পড়ল । তখন কিছুদিন মদ ধরেছিল । সহশিল্পীদের পরামর্শে । ধরেই উল্টো বিপত্তি । বুক আইঢাই, গা ম্যাজম্যাজ, গলা বসে যাওয়া, সবই চরমে । অম্বলের রোগও ধরে গেল ভাল মতন । সিজনটা পার করেই যাত্রাকে শেষ স্যালুট জানাল কন্দর্প । তাতেও রক্ষা নেই, ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরে বিছানায় পড়ে থাকতে হল টানা তিন মাস । তারপর থেকে সুরা দেখলে দূরে দূরেই থাকতে চায় কন্দর্প ।

অশোক মুস্তাফিও কার্পেটে বসেছে, কোলে লাল মখমলের তাকিয়া । গ্লাসে চুমুক মেরে বলল,— বুঝলে রূপেন, তোমাকে যা বলছিলাম, আমাদের কন্দর্পের জন্য একটা জম্পেশ ক্যারেক্টার তৈরি করো তো দেখি ।

রূপেন পুরো গ্লাস গলায় ঢেলে দিল,— আপনি বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ভেবে ফেলেছি অশোকদা । নায়কের একটা বন্ধু বানিয়ে নিচ্ছি ।

—কী রকম ?

—বাইরে খুব লাইফফোর্স আছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে স্যাড, একা । বেহালা বাজানো কেস ।

—মন্দ না । দাঁতে চেপে বিদেশি সিগারেট ধরাল মুস্তাফি,— ওই যেখানে নায়িকা ডুবে যাচ্ছে ওখানে কন্দর্পকে ঢুকিয়ে দাও ।

—কী করে হবে দাদা ? ওটা তো হিরোর সিন ।

—না, হিরো নয়, কন্দর্পই হিরোইনকে জল থেকে তুলবে । ওর থ্রু দিয়ে হিরোর সঙ্গে হিরোইনের আলাপ করাও ।

—হিরো কি তাহলে একটু মার খেয়ে যাচ্ছে না অশোকদা ?

—আহ, যা বলছি করো। যাও, ও ঘর থেকে কয়েকটা চিপসের প্যাকেট নিয়ে এসো।

বিদ্যুৎ বেগে খানিকটা হুইস্কি গ্লাসে ঢেলে নিল রূপেন, চোঁ খেয়ে ফেলল। খ্যাংরাকাঠির মতো শরীর টলমলিয়ে উঠে গেছে মধ্যবয়সী লোকটা।

মুস্তাফির খালি গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। ফুল আঁকা সিল্কের লুঙ্গি। দামি পারফিউমের ভুরভুর গন্ধ। হাসছে মিটমিট। কন্দর্পের উরুতে আলগা চাপড় দিল,— কি, খুশি তো ?

—কি যে বলেন দাদা ! কন্দর্প গদগদ,— আপনি দেখবেন, আমাকে নিয়ে আপনি ঠকবেন না।

—জানি জানি। তোমাকে নিয়ে আরেকটা ভাবনা করা আছে। হিন্দি বলতে পারো ?

—মোটামুটি পারি দাদা।

—মোটামুটি নয়, ভাল করে রপ্ত করো। কামিং মানথে দিল্লি যাচ্ছি, ওখানে মাণ্ডি হাউসের সঙ্গে আমার একটা প্রিলিমিনারি কথা হয়ে গেছে। একখানা বাহান্ন এপিসোডের ইয়ে নামাব ভাবছি। ন্যাশনাল চ্যানেলে।

হিন্দি সিরিয়াল ! সর্বভারতীয় প্রচার ! যাহ, নির্ঘাত স্বপ্ন।

রূপেনের গ্লাস ছাড়া বাকি যে তিনটে গ্লাস রয়েছে তার একটা ঠোঁটে তুলল মুস্তাফি। এক চুমুক খেয়ে নামিয়ে রাখল। এবার দ্বিতীয় গ্লাস তুলেছে।

ঘোর লাগা চোখে কন্দর্প দেখছিল মুস্তাফিকে।

মুস্তাফি গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল,— কৌতূহল হচ্ছে তো ?

কন্দর্প ভ্যাবলা মুখে বলল,— তা একটু হচ্ছে।

—এই যে গ্লাসটা দেখছ, এক নম্বর, এটা হচ্ছে এ কে মুস্তাফির। রেলের জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার। এই দু নম্বর ফর প্রোডিউসার অশোক মুস্তাফি। আর এই থার্ড হল শুধুই এ মুস্তাফির— মুস্তাফি, প্রোপাইটার, মুস্তাফি কন্সট্রাকশন। মাথায় ঢুকল কিছু ?

কন্দর্প বুদ্ধুর মতো দুদিকে মাথা নাড়ল।

—তবে খুলেই বলি। তোমাদের বাড়ির সামনে সান্যালবাড়ি ভেঙে আমিই মাল্টিস্টোরেড বানাচ্ছি। আমার কাছে খবর আছে, তোমাদের বাড়িটাও ভাঙার প্ল্যান চলছে। তোমার এক দাদা নিও বিল্ডার্সের দস্তিদারের সঙ্গে জোর কথাবার্তা চালাচ্ছে। অ্যাম আই রাইট ?

রূপেন চিপসের প্যাকেট খুলে চিবোচ্ছে খচমচ। শব্দটা হঠাৎ ভীষণ অশালীন লাগছিল কন্দর্পের। ঢোঁক গিলে বলল,— হতে পারে দাদা, আমি ঠিক খবর রাখি না।

মুস্তাফি তৃতীয় গ্লাসে লম্বা চুমুক দিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে কন্দর্পের কাঁধ জড়িয়ে ধরল,— পৃথিবীটা ভারি কঠিন ঠাঁই ব্রাদার। আ জাঙ্গল অফ ব্রিক উড অ্যান্ড স্টোনস। এখানে কি এত ইনোসেন্ট থাকলে চলে ? তোমার বাড়িতে তোমারও তো ইকুয়াল শেয়ার আছে, আছে তো ?

কন্দর্প মনে মনে বলল, অবশ্যই আছে, তবে বাবা বেঁচে থাকতে কিছু নেই।

—এবার থেকে খবর রাখো কন্দর্প। তোমার দাদাকে তুমি বিশ্বাস করো ক্ষতি নেই, কিন্তু হু ক্যান সে, তিনি বিহাইন্ড দা টেবল কিছু গুছিয়ে নিচ্ছেন না ? তোমাকে বঞ্চিত করে ? কী হল, বলো কিছু।

এ যেন সেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো !

কন্দর্প কাঠ হয়ে গেল।

১২

—তোমার নামে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি আছে।

দু পকেটে হাত দিয়ে বাড়ি ঢুকছিল বাপ্পা, জয়মোহনের কথায় চমকে দাঁড়াল,—তাই ! কখন এসেছে ?

জয়মোহন কাঠ কাঠ, —দুপুর টুপুরে হবে।

—দুপুরে ! আড়াইটে অবধি আমিই তো বাড়ি ছিলাম !

—তাহলে আড়াইটের পর হবে। আমি সময় মেপে রাখিনি।

ওফ, কী কথার কী উত্তর ! দিন দিন বুড়ো আরও খোঁচো হয়ে উঠছে। বাপ্পা গলা নামাল,—ঠিক আছে, ঠিক আছে। চিঠিটা দাও।

—চিঠি তো আমি নিইনি। পিওনের কাছে আছে।

—মানে !

—তোমার লেটার আমি কেন নিতে যাব ? জয়মোহনের টেবিলে অনেক দিন পর আজ তাসের সমারোহ,—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এখন থেকে এ বাড়ির কারুর ব্যাপারে আর নাক গলাব না।

—নাক গলানোর কি আছে ? পিওনের কাছ থেকে একটা চিঠি সই করে নিয়ে নেবে ...

—আমি সই করা ভুলে গেছি।

—স্ট্রেনজ ! ওপর থেকে কাউকে ডাকতে পারতে ?

—আমি কেন ডাকতে যাব ? একতলায় পড়ে আছি বলে কি আমি এ বাড়ির চাকর ?

—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি দাদু। জানো আমার কত ইম্পর্ট্যান্টি চিঠি আসার কথা ?

—তোমার তো ইম্পর্ট্যান্টি চিঠিই আসবে। বাঁ হাতের গোছা তাস থেকে ফটাস করে চারটে তাস চিত করলেন জয়মোহন,—তুমি বলে এখন ভি ভি আই পি লোক, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সকলের ঠিকুজি কুষ্ঠি তৈরি করছ... ।

বাপ্পার মেজাজ বিগড়ে গেল। বুড়ো সকালবেলা বেলের পানা খেয়ে আধঘণ্টা পরে ভুলে যায়, দাওনি দাওনি বলে বাড়ি মাত করে, অথচ দশ দিন আগের ঝাল ঠিক পুষে রেখেছে মনে !

সম্প্রতি বাপ্পার সঙ্গে জয়মোহনের একটা বাগযুদ্ধ ঘটেছিল। বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে। জয়মোহনের মতে রাজীব গান্ধী অতি বড় বংশের ছেলে, সুবোধ, নীতিশীল, তার পক্ষে দেশের জন্য কামান কিনতে গিয়ে কাটমানি নেওয়া কখনওই সম্ভব নয়। বাপ্পার রাজনীতিতে তিলমাত্র আগ্রহ নেই, সে শুধু আলগাভাবে বলেছিল, আজকাল যে কোনও ধরনের বড় কেনাবেচায় কাটমানি নেওয়াটাই দস্তুর, রাজীব গান্ধী যদি নিয়েও থাকে, এমন কিছু অন্যায় কাজ করেনি। ব্যস, এইটুকু তর্কেই জয়মোহন রেগে টঙ, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ছানার বাটি, দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলেন ঝাড়া তিন ঘণ্টা।

দোতলায় মা'র ঘরে ঢুকে বাপ্পা গম্ভীর সুরে বলল,—মা, ওই সেনাইল বুড়োটা কবে মরবে বলতে পারো ?

ইন্দ্রাণী টিভিতে সান্ধ্য সংবাদ শুনছিল, ছেলের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল,—ও কি ভাষা হচ্ছে দিন দিন !

—ঠিকই বলেছি। একটা ইউজলেস বুড়ো জগদ্দল পাথরের মতো বাড়িতে বসে আছে আর সুযোগ পেলেই লোকের পেছনে কাঠি দিচ্ছে। এমন লোকের বেঁচে থাকার দরকার কী ?

—কেন, তোর কি পাকা ধানে মই দিয়েছে ?

—আমার একটা দরকারি রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছিল, দাদু পিওনকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

—ও, তাই এত মেজাজ ! নিজে গিয়ে কাল পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে এলেই হয়।

—বাহ, চমৎকার সল্যুশান !

—নয়তো কি, বুড়ো মানুষের মরে যাওয়াটা সল্যুশান ? ইন্দ্রাণী ছেলের ওপর সহজে রাগে না, আজ রূঢ় হল,—পৃথিবীতে তোমার যাকেই পছন্দ নয় তাকেই মরতে হবে ?

বাপ্পার মনোগত অভিপ্রায় অনেকটা সেরকমই। এ পৃথিবীতে যা সে পছন্দ করে না, সেরকম কোনও কিছুর অস্তিত্বই তার কাছে অবাঞ্ছনীয়। তবু মা'র ধমকে খানিকটা সংযত করল নিজেকে। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ছুঁড়ে দিল,—তোমাদের টেলিফোন অফিসে আমি ঘুরে

এসেছি।

—দেখা করেছিলি অফিসারের সঙ্গে ? কিছু বলল ?

—নতুন আর কী বলবে ! এক টেপ চালিয়ে গেল। কেবল ফল্ট। বাড়ি যান। হয়ে যাবে। পাঠিয়ে দেব।

—তুই বলেছিস, কুড়ি দিন হয়ে গেল ফোন খারাপ হয়ে আছে ?

—তোমার তো মাত্র কুড়ি দিন ! কত জন ওখানে ছ মাস এক বছর ঘুরে বেড়াচ্ছে জানো ? ছোটকাকে বলো রাস্তায় যখন মিস্ত্রিরা কাজ করে তখন তাদের কাউকে ধরে কিছু পয়সা দিয়ে দিতে। তোমাদের লাইন ঠিক হয়ে যাবে।

—ছোটকাকা কেন ? তুইও তো করাতে পারিস। তোর বড়কাকা কিন্তু তোকেই দায়িত্ব দিয়ে গেছে।

অ্যাটমের ছুটি শেষ হয়ে আসছে, সুদীপ রুনা পরশু ছেলে নিয়ে পুরী বেড়াতে গেছে। সপ্তাহ খানেকের জন্য। গরমের ছুটি-পুজোর ছুটিতে সুদীপ বউ-ছেলে নিয়ে পবিত্র কর্তব্যের মতো ভ্রমণে যায়।

বাপ্পা দু-এক সেকেন্ড চুপ থেকে নিস্পৃহ গলায় বলল,—আমার কোনও দায়িত্ব ফায়িত্ব নেই। আমি কাউকে ফোনও করি না, কাউকে এ বাড়ির নম্বরও দিই না। দেখেছ, আজকাল আমার কোনও ফোন আসতে ?

—কেন ? ফোন করা নিয়ে কেউ তোকে কিছু বলেছে ?

—না। এমনিই। বাপ্পা এর বেশি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। কেজো স্বরে বলল,—তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি মা, যদি আমার চিঠিটা মিসিং হয় তাহলে আমি কিন্তু তোমার শ্বশুরকে ছেড়ে কথা বলব না।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কি এমন দরকারি চিঠি, তার কথা অর্ধেক হওয়ার আগেই বাপ্পা বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

এই বাড়িতে ইলেকট্রিক বিল টেলিফোন বিল এখনও আধাআধি ভাগ হয়। খরচ কমানোর জন্য প্যাসেজের আলো পারলেই নিবিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী, আজও দিয়েছিল। বাপ্পা খচ করে জ্বেলে দিল আলোটা। পুড়ুক পুড়ুক। যত খুশি কারেন্ট পুড়ুক। এ বাড়ির সঙ্গে শিগগিরই সব সম্পর্ক কাটাবে বাপ্পা।

নিজের ঘরে ঢুকে বাপ্পার মেজাজ আরও খাট্টা হল। যা ভেবেছে তাই, তিতির বাবার খাটে শুয়ে আছে। বই পড়ছে।

বাপ্পা এক টানে বইটা কেড়ে নিল,—দুপুরে আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর তুই কী করছিলি রে ?

তিতির উঠল না, শুয়ে শুয়ে ভুরুতে ভাঁজ ফেলল, —কেন ?

—কেন কী ? যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দে।

তিতির কয়েক মুহূর্ত ভাবার চেষ্টা করল,—বোধহয় বই পড়ছিলাম।

—বাড়িতে পিওন এসে ফিরে যায় একটু দেখতে পারিস না ?

—এসেছিল বুঝি ? তিতিরের চোখে যেন এখনও বইএর ঘোর, —তা হবে। আমি খেয়াল করিনি।

—তা করবে কেন ? যত সব ন্যাকা ন্যাকা উপন্যাসে মুখ ডুবিয়ে থাকবে। বইটার মলাট উল্টে দেখল বাপ্পা, —ইশ, এ যে বাংলা বই ! কী নাম ? ইছামতী ! বিভূতিইই ভূষঅঅণ বন্দ্যোপাধ্যায় ! এ লোকটা পথের পাঁচালী লিখেছিল না ?

তিতির ঠোঁট বেঁকাল, —ভাগ্যিস সিনেমাটা হয়েছিল, তাই তোর অন্তত একজন লেখকের নাম শোনা আছে !

—ফোট তো। আমার অত তোর মতো নাটক-নভেলে মুখ গুঁজে থাকার সময় নেই। আমার

অনেক কাজ।

—কী কাজ রে ?

—দেখবি দেখবি। টাইম এলে ঠিক দেখতে পাবি। বাপ্পা বোনের মাথায় আলগা চাঁটি মারল,—যা ভাগ, কাট তো এখন এখান থেকে।

দরজা বন্ধ করে একা ঘরে টেপ চালিয়ে দিল বাপ্পা। জ্যানেট জ্যাকসন। বিছানায় শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিল। গানের তালে পা নাচাচ্ছে জোরে জোরে।

সারাক্ষণ এই ধরনের উদ্দাম গানবাজনা শোনা বাপ্পার একমাত্র নেশা। উচ্ছল সঙ্গীতের ধ্বনি তার মাথায় গিয়ে ক্রমাগত যেন হাতুড়ির বাড়ি মারতে থাকে, ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে আসে স্নায়ু। আরাম লাগে বাপ্পার, খুব আরাম লাগে।

আজ বাপ্পা আরামের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছবিও দেখছিল। তার সামনে এখন ভেসে উঠেছে এক অপার সমুদ্র। আকাশের রঙ মেখে যার বর্ণ গাঢ় নীল। নীল সেই জল কেটে তরতর এগিয়ে চলেছে এক সামুদ্রিক যান। দূরে, বহু দূরে। চতুর্দিকে কোথাও কোনও পাড় নেই, লোকালয় নেই, এমনকী দিগন্তও হারিয়ে গেছে সমুদ্রে। জলে জলেই দিন যায়, রাত আসে। রাত আসে, দিন যায়।

চিঠিটা কি তবে এসে গেল !

চাপা উত্তেজনায় টানটান বাপ্পা উঠে বসল বিছানায়। আরও জোরে বাড়িয়ে দিল টু-ইন-ওয়ানের ভলিয়্যুম। দুই খাটের মধ্যবর্তী জায়গায় হাত পা ছুঁড়ে নাচছে।

হঠাৎই ভুস করে গান বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। আলো পাখা নিবে গেছে। লোডশেডিং।

বাপ্পা দরদর ঘামছে। জবজবে ভিজে শরীর হাঁসফাস করছে গরমে।

পাশের ঘর থেকে ইন্দ্রাণীর গলা শোনা গেল,—দাঁড়া বাপ্পা, ছুটোপুটি করিস না, মোম দিচ্ছি।

ধ্যাৎতেরি। ছিটকিনি খুলে বাপ্পা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সোজা ছাদে উঠে গেছে।

বিশ্রী একটা পাতলা পাতলা অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাড়ি থেকে ঠিকরে আসছে ইনভার্টারের আলো। চতুর্দিকের কালোর মাঝে ওই ছোপ ছোপ আলো কী যে অশালীন লাগে ! চিলচিৎকার করে একটা ইলেকট্রিক ট্রেন স্টেশন ছাড়ল। সাইকেল রিকশার স্রোত বিকট সুরে ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে। চাপা কোলাহল বিজবিজ করছে বাতাসে।

এই কলকাতা শহরটাকে এতটুকু ভাল লাগে না বাপ্পার। শুধু ধোঁয়া, শুধু ধুলো, শুধু আবর্জনা ! তার সঙ্গে চিটচিটে ভিড়, প্রায়স্থবির যানবাহন, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, দিনরাত লোডশেডিং, মিটিং মিছিল আন্দোলন, রাস্তার ভিখিরি, নাছোড়বান্দা হকার, ফুটপাথের ঝুপড়ি ! এই নরকে যে কী করে থাকে মানুষ ! এই শহরে বাপ্পার জন্মটাই একটা অ্যাক্সিডেন্ট। পালাতে হবে বাপ্পাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এই শহর ছেড়ে।

নিজেদের এই বাড়িটার প্রতিও কণামাত্র টান অনুভব করে না বাপ্পা। তার কাছে বাড়ি মানে একটা ষাট বছরের পুরনো কাঠের মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটা ভূখণ্ড। কোনও ভূখণ্ডে বাস করে এক ভিমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধ, কোনওটাতে এক ক্লাউন, কোনওটাতে সদাব্যস্ত কর্মী, কোনওটাতে অকর্মণ্য মাতাল। তবু এদের মধ্যে সদাব্যস্ত কর্মীটিকেই যা একটু প্র্যাকটিক্যাল মনে হয় বাপ্পার। যদিও তার স্ত্রীটি একের নম্বরের আপনি-কোপনি টাইপ। কারুর সঙ্গে বিবাদে না গিয়ে দিব্যি মিষ্টি মুখে নিজের আখের গুছিয়ে চলেছে। নিজেদের জন্য দামি দামি খাবার, হালফ্যাশানের নিত্যনতুন ফার্নিচার, শৌখিন বিলাসের উপকরণ। শুধুই নিজেদের জন্য ! তার সবেধন নীলমণি লাডলাটিকে বাদ দিলে থাকে আরও দুজন। একটা বোকাসোকা মেয়ে আর এক কঠিনমুখ নারী।

না। মা-বোনের প্রতিও তেমন কোনও জোরদার আকর্ষণ নেই বাপ্পার। কেন নেই, তা বাপ্পা নিজেই জানে না। জানার জন্য কখনও নিজেকে খুঁড়ে দেখার প্রয়োজনও বোধ করেনি বাপ্পা।

বাড়ির পুরো পরিবেশটাই তার কাছে অসহনীয়।

ইদানীং আর একটা চিন্তাও হঠাৎ হঠাৎ বাপ্পাকে চিমটি কেটে উঠছে। চিন্তাটা গোপন, অতি গোপন। বলতে গেলে চিন্তাটা প্রায় অবচেতনার স্তরে লুকিয়ে থাকে। শুভাশিস আঙ্কল মা'র বিয়ের আগের বন্ধু, মানুষটাও খুব ভাল, বাপ্পাও তাকে অপছন্দ করার কোনও কারণ খুঁজে পায় না, বিপদে আপদে আঙ্কল চিরকাল তাদের সাহায্য করে আসছে, চেম্বার শেষ করে প্রায় দিনই বাড়ি ফেরার পথে তাদের খবর নিয়ে যায়, তিতির বাপ্পা মা বাবা সকলের জন্য তার সমান উদ্বেগ, কিন্তু কেন ? এই কেনর উত্তর খুঁজতে গেলেই মস্তিষ্ক কেমন যেন বাগী হয়ে ওঠে, এক সুপ্ত বিষাদের চোরা স্রোতে ডুবে যেতে থাকে বাপ্পা। এই শহর, এই পরিবেশ আরও দুঃসহ হয়ে ওঠে।

চিঠিটা কি বাপ্পার জন্য কোনও আশা বয়ে এনেছে ?

কলেজের বন্ধু অনীকই প্রথম বাপ্পাকে সমুদ্রের ঠিকানাটা দিয়েছিল। সমুদ্রের ঠিকানা, না জাহাজের ? পৃথিবীর বহু দেশের অজস্র জাহাজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেয়, সমুদ্রপথে ঘুরে বেড়ায় গোটা পৃথিবী। সেই সব জাহাজের কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত কর্মী নিয়োগ করে, ভারতবর্ষ থেকেও প্রচুর লোক নেয় তারা। এ সব চাকরিতে মাইনে অনেক। তাছাড়াও নাকি অঢেল সুযোগ সুবিধা আর অফুরন্ত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। জাহাজ কোম্পানিগুলোর প্রচুর এজেন্ট ছাড়িয়ে আছে ভারতে, বিশেষত বোম্বাই উপকূলে। কিছু কিছু এজেন্সির কলকাতাতেও পোস্টাল অফিস আছে। সেরকমই বেশ কয়েকটা অফিসের নাম ঠিকানা এনেছিল অনীক। তারপরই অফিসে অফিসে দুই বন্ধুর মিলিত অভিযান। তাদের মাধ্যমেই বোম্বাই অফিসে বায়োডাটা পাঠানো। অনীক বাপ্পা কারওই হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট খারাপ নয়, প্রয়োজনীয় সব রকম যোগ্যতাও আছে, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও না কোথাও থেকে ডাক তারা পাবেই।

পরদিন বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই পোস্ট অফিসে গেল বাপ্পা। গিয়ে উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। যে পিওনের কাছে চিঠিটি আছে, সে তখনও আসেনি, সে আজ তার বাড়িটির ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে তবে আসবে। আজই বিল জমা দেওয়ার শেষ দিন, লম্বা লাইন পড়বে, কখন অফিসে পৌঁছবে ঠিক নেই, বাপ্পা যেন এগারোটার পরে আসে। নয়তো বিকেলে। নয়তো কাল। নয়তো পরশু। কেন একজন পিওন যথাসময়ে কাজে আসবে না, কেনই বা তার চিঠি অন্য কর্মচারীর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, এক্ষুনি যদি বাপ্পাকে জরুরি কাজে কাশ্মীর বা কন্যাকুমারিকা চলে যেতে হয় তাহলে ওই চিঠির কী হবে, এরকম ঝাঁক ঝাঁক কূট প্রশ্নে পোস্ট অফিসের লোকজনকে নাজেহাল করার চেষ্টা করল বাপ্পা, লাভ হল না। লোকগুলো এমন নিস্পৃহ মুখে বাপ্পার প্রশ্নগুলো শুনতে লাগল যে হাল ছেড়ে বাপ্পাকে বেরিয়ে আসতে হল ডাকঘর থেকে।

বাপ্পার হাতে এখন এক ঘণ্টার ওপর সময়, বাড়ি না ফিরে আর কি ভাবে সময় কাটানো যায়, ভাবছিল বাপ্পা। একবার অনীকের বাড়ি ঘুরে আসবে ? দেখা যাক অনীক চিঠিটা পেল কিনা ! নাকি ধীমানদের বাড়িতে টুঁ মেরে আসবে ? ধীমান দুটো বন জোভি কিনেছে, যদি ক্যাসেট দুটো হাতানো যায় ! রুন্টু সামার ভেকেশানে আই আই টি থেকে এসেছে, ওর সঙ্গে আড্ডা মেরেও একটা ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। গোলপার্কের ঠেক-এও এখন দু-চারজনকে পাওয়া যেতে পারে। যাবে নাকি !

থাক গে, বাপ্পা কোথাও যাবে না। সব আড্ডাতেই তো সেই একই কথা, এক তর্ক, এক ঠাট্টারসিকতা। ফিলম খেলা রাজনৈতিক নেতাদের মুণ্ডুপাত আর গার্লফ্রেন্ড। একই চর্বিতচর্বণ। সবই এত একঘেয়ে ! এত ক্লান্তিকর ! তার চেয়ে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চিতে বসে ট্রেনের আনাগোনা দেখা অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। আর সময় তো বহতা নদী, সে তো কাটবেই।

প্ল্যাটফর্মে উঠতেই পিছন থেকে হাঁক। বিষ্ণুপ্রিয়া ডাকছে। হাতে গোছা পোস্টকার্ড। মুখে সাংঘাতিক ব্যস্ত ভাব।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—কোথাও না। এমনিই।

—আমি জানি তুই কোথায় যাচ্ছিস। বালিগঞ্জ। এণাক্ষীদের বাড়ি। বিষ্ণুপ্রিয়ার চশমা সদাই নাকের ওপর নেমে আসে, আঙুল দিয়ে বার বার চশমা ঠেলে তোলা তার মুদ্রাদোষ। সেই কাজ করতে করতেই সে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল বাপ্পাকে। খপ করে হাত চেপে ধরল,—আজ তুই আমাদের বাড়ি চল।

অনুনয় নয়, আদেশ। বাপ্পা প্রমাদ গুনল। আড্ডার সঙ্গী হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দ না, তবে মেয়েটার এক উদ্ভট শখ আছে। প্রতিটি টিভি ক্যুইজের উত্তর পাঠানো। উদ্দেশ্য, মনোলোভা সব পুরস্কার জেতা। দু দিন গোয়াভ্রমণ ! তিন দিন ম্যানিলা ! চার দিন পাঁচ রাত নেপাল ! সাত দিন নিউ ইয়র্ক ! মারুতি গাড়ি ! এক কেজি সোনা ! দশ হাজার টাকার কসমেটিকস ! নিদেনপক্ষে ফ্রিজ টিভি মিকসি ! আরও নিদেনপক্ষে একটা দুটো অডিও ক্যাসেট কিংবা টিশার্ট ! আজ পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া অবশ্য একটা আলপিনও পায়নি। তার আগেই দেশের অন্য বিষ্ণুপ্রিয়াদের উত্তর হয়তো পৌঁছে যায় টিভিতে। কিন্তু বন্ধুদের জীবন উদ্ব্যস্ত হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রশ্নবাণে। কবে দিল্লি প্রথম তৈরি হয়েছিল ? শ্রবণবেলগোলায় কার অতিকায় মূর্তি আছে ? স্ট্যাটোসফিয়ারের উচ্চতা কত ? প্যালেজোয়িক এজ কবে থেকে শুরু ? মধুবালার প্রথম তিনটি ফিল্মের নাম কি ? শোলেতে গব্বর সিং কোন দিকে মুখ করে থুতু ফেলেছিল ? প্রশ্নের পর প্রশ্নের ধাক্কায় বন্ধুরা জেরবার।

আজ বাপ্পা ধরা পড়ে গেল !

বিষ্ণুপ্রিয়ার পোস্টকার্ডের গোছার দিকে অসহায় মুখে তাকাল বাপ্পা,—আজ আমাকে ছেড়ে দে।

পুরুষছাঁট চুল ঝাঁকাল বিষ্ণুপ্রিয়া,—একদিন নয় এণাক্ষীদের বাড়ি না গিয়ে আমার বাড়িতেই গেলি। অবশ্য তোর যদি ভাল না লাগে তো আলাদা কথা।

—বিলিভ মি বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি এণাক্ষীদের বাড়ি যাচ্ছি না, আমার কাজ আছে।

—কী কাজ ?

—আছে। পারসোনাল।

—আমাকে বলা যায় না ? বিষ্ণুপ্রিয়া চোখে চশমা ঠেলল,—কোথায় তোর কাজ ? প্ল্যাটফর্মে ?

—না, এই কাছেই। পোস্ট অফিসের কথাটা এড়িয়ে গেল বাপ্পা।

—তুই আমাকে কাটাতে চাইছিস ? আমি নয় এণাক্ষীর মতো নেকু নেকু কথা বলতে পারি না, আহ্লাদী আহ্লাদী হাসতে পারি না...

—বলছি কাজ আছে, এর মধ্যে এণাক্ষী আসে কোত্থেকে ?

—এণাক্ষীর নামে কিছু বললে তোর গায়ে ফোস্কা পড়ে, না ?

বাপ্পা হেসে ফেলল,—তুই এত জেলাস কেন রে ? এণাক্ষী না তোর ছোটবেলার বন্ধু ?

—বন্ধু না হাতি। সিম্পলি ক্লাসমেট। ওরকম পুরুষচাটা মেয়ে আমার বন্ধু হয় না।

—দাঁড়া এণাক্ষীকে বলব, তুই ওর নামে কি বলিস।

—বল গে যা। আই কেয়ার আ ফিগ। ওর স্কুলের কেচ্ছা তো সব্বাই জানে। দীপাঞ্জনের সঙ্গে...ছিঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্য দিকে মুখ ঘোরাল,—যাক গে, তুই যাবি আমার সঙ্গে ?

বাপ্পা গম্ভীর হল,—তোর তো এখন বাড়ি ফাঁকা। মাসিমা মেসোমশাই অফিস বেরিয়ে গেছে...

—সো হোয়াট ? তোর কি ধারণা তোকে আমি সিডিউস করতে নিয়ে যাচ্ছি ? বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ টিপল,—আমরা কিছু ক্যুইজ সলভ করতে পারি। পারি কিনা ?

বাপ্পা অস্বস্তিভরা মুখে চারদিকে তাকাল। প্ল্যাটফর্মে অফিসযাত্রীদের থোকা থোকা ভিড়, খানিক তফাতে কয়েকজন মধ্যবয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাস খেলছে। দুই বৃদ্ধ সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে হাত পা নেড়ে তর্কে মগ্ন। খালি ঝুড়ির ওপর আয়েশ করে বসে গুলতানি করছে এক দল ভেণ্ডার। মহিলা যাত্রীরা ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, তাদের উদ্বিগ্ন চোখ বার বার লাইনের দিকে। কেউই

বাপ্পা বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে দেখছে না।

তবু যে কেন বাপ্পার বুকে গুড়গুড় ভাব ?

বিষ্ণুপ্রিয়াদের বাড়ি আগে প্রায়ই যেত বাপ্পা। উচ্চ মাধ্যমিক থেকে তারা পরস্পরের সহপাঠী, ভাল নোটস তৈরি করার সুনাম আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার, নোটস দেওয়া নেওয়া ছাড়াও অনেক বিষয়ে তুমুল আড্ডা জমত দুজনের। সম্প্রতি বাপ্পার যাওয়াটা কমে এসেছে। কমাটা ঠিক বান্ধবীর উদ্ভট শখের কারণে নয়। একা বাড়িতে আজকাল কেমন বদলে যায় বিষ্ণুপ্রিয়া। অতি সামান্য সামান্য কথাতে বড় বেশি হাসে, ঈষৎ রুক্ষ মুখশ্রীতে চকিতে নেমে আসে কমনীয়তার ঢল, বিষ্ণুপ্রিয়ার আপাত চঞ্চল চোখ ভরে ওঠে অচেনা লাবণ্যে। সেই দণ্ডে বিচিত্র এক সিরসিরানি ছড়িয়ে পড়ে বাপ্পার শরীরে। সঙ্গে এক চোরা ত্রাসও।

বাপ্পার কি ভাল লাগে ! নাকি খারাপ লাগে ! বাপ্পা বোঝে না।

দ্বিধান্বিত মুখে বাপ্পা বলল,—না গেলে কি খুব রেগে যাবি ? তুই তো এখনই ক্যুইজ নিয়ে...আমার জি কে খুব পুওর রে বিষ্ণুপ্রিয়া। পাকিস্তানের রাজধানীর নামই আমার মনে পড়ে না ...

—থাক বুঝেছি। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে রহস্যময় হাসি,—তুই তোর কাজে যা।

ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া। রেললাইনের গায়েই তার বাড়ি, লাইন পার হওয়ার সময় একবার পিছন ফিরে তাকাল।

অপসৃয়মান বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফিরে ডাকতে তীব্র বাসনা জাগছিল বাপ্পার। ক্ষণিকের বাসনা দমিয়ে আনমনে ফিরল পোস্ট অফিসের সামনে।

জনা তিনেক পিওন যন্ত্রবৎ ছাপ মেরে চলেছে চিঠিতে, কর্মচারীরা ক্ষিপ্র হাতে ছোট ছোট কাঠের খোপে ছুঁড়ে দিচ্ছে চিঠিগুলো, তাদের নিপুণ হস্তচালনা এক দৃষ্টে দেখছিল বাপ্পা। অথবা সে কিছুই দেখছিল না।

এগারোটা নয়, বাপ্পার পিওন এল সাড়ে এগারোটায়। সইসাবুদ সেরে লম্বা বাদামি খাম হাতে পোস্ট অফিস থেকে যখন বেরোল বাপ্পা, সূর্য তখন মাঝগগনে। ঝলসাচ্ছে।

বুকের ভেতর নীল সমুদ্রের কল্লোল শুনতে পাচ্ছিল বাপ্পা। বার বার চিঠিটা দেখেও আশ মিটছে না। চিঠির মাথায় জ্বলজ্বল করছে প্রেরকের নাম। পাতা জুড়ে ফুটে আছে সাগরের ডাক। দি ওশান লাইনার্স। বম্বে। ইন্টারভিউ। দশই জুলাই।

মাঝে আর মাত্র সতেরোটা দিন !

আচমকা বাপ্পার বুকটা ধক করে উঠল। মা তাকে যেতে দেবে তো !

১৩

সকাল থেকে পর পর তিনখানা অপারেশান ছিল শুভাশিসের। তিন পৃথক পৃথক নার্সিংহোমে। হ্যাপিহোম, টোটাল কিওর, ব্লু হেভেন। দুটো অ্যাপেনডিসেকটোমি আর একটা হার্নিয়া অপারেশান। এইসব অপারেশানে ঝুঁকি কম, টাকা আসে হুড়হুড়। তৃতীয় দফা অস্ত্রধারণের পর বেলা দেড়টা নাগাদ অপারেশান থিয়েটার থেকে বেরিয়েছে শুভাশিস, ডাক্তারদের কক্ষে বসে সবে একটু জিরোচ্ছে, তখনই ব্লু হেভেনে ফোন এল ছন্দার।

—অ্যাই শুনছ ? দুরন্ত খবর ! টোটো দারুণ রেজাল্ট করেছে।

ও.টি থেকে বেরোনোর পরমুহূর্তে শুভাশিস কাটাছেঁড়ার কথা ভুলে যায়, তবে শরীর আর মগজের পরিশ্রান্তি রয়ে যায় বেশ কিছুক্ষণ, মাথা অবশ হয়ে থাকে।

শুভাশিস ছন্দার কথা ঠিক অনুধাবন করতে পারল না, —কীসের রেজাল্ট ?

—আশ্চর্য ! সকালে শুনে গেলে টোটোর আজ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোবে, খবরের কাগজের ফার্স্ট পেজে দিয়েছে...

—ও হ্যাঁ, সরি। কত পেয়েছে ?

—গেস করো। খুশিতে ফুটন্ত ছন্দা যেন জটিল হেঁয়ালি ছুঁড়ছে।

—স্টার তো পাবেই। চার চারটে টিচার খেটেছে পেছনে। শুভাশিস বাঁ আঙুলে শার্টের দুটো বোতাম খুলে দিল, —কত পেল ? এইট্টি পারসেন্ট ?

—হল না। আরও ওঠো।

—এইট্টি ফাইভ ?

—আরেকটু ওঠো।

কত উঠতে হবে রে বাবা ! প্রায় দেড় যুগ ধরে শুভাশিস তো খালি উঠেই চলেছে ! বিত্তে। সোনায়। যশে। প্রতিপত্তিতে। তবু তাকে আরও উঠতে বলে ছন্দা !

শুভাশিস খানিকটা লঘু সুরে বলল, —পাগলা কি র‍্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্ক পেয়ে গেল নাকি ?

—পেতে পারে। এইট্টি সেভেন পারসেন্ট সিকিওর করেছে, বুঝেছ ? সাতাশি পারসেন্ট। সাত সাতটা লেটার। টোটোদের স্কুলে টোটো সেকেন্ড হায়েস্ট।

—ইজ ইট ! শুভাশিস খুব বেশি অবাক হতে জানে না। তার পেশা তার বিস্ময়বোধ কেড়ে নিয়েছে। তবু বিস্ময়সূচক ধ্বনিই ঠিকরে এসেছে গলা থেকে,— দাও পাগলাকে দাও, ওকে একটু কনগ্র্যাচুলেট করি।

—ও কি এখন বাড়িতে থাকার ছেলে নাকি ? রেজাল্ট জানিয়ে লাফাতে লাফাতে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ছন্দার হাসিতে জলতরঙ্গ বাজছে,— বাড়ি ফিরে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার ছেলের নাচ যদি দেখতে !

—তুমিও তো নাচছ।

—নাচবই তো। আমার ছেলের জন্য ষোলো বছর ধরে আমি কম খাটছি ?

মাথার অবশ ভাব যাচ্ছে না কিছুতেই। এমন সময়ে কোনও আনন্দই পূর্ণ উচ্ছ্বাস আনে না। তার মাঝেও 'আমার ছেলে' শব্দবন্ধটি খুট করে কানে বেজেছে। রিসিভার ঘাড়ে চেপে নিপুণ কৌশলে সিগারেট ধরাল শুভাশিস। ঠাণ্ডা গলায় বলল, —তোমার পরিশ্রম কে অস্বীকার করছে ? তবে সব ক্রেডিটই তুমি একা নিয়ো না। টোটোর জন্য যে চারজন টিউটর ছিল তাদেরও একটু ভাগ দিয়ো। তারপর ধরো জেনেটিক ফ্যাক্টর বলেও একটা ব্যাপার আছে। আমি শুভাশিস সেনগুপ্ত, আমার বাবা শিবসুন্দর সেনগুপ্ত, এরাও তো লেখাপড়ায় এমন কিছু ফ্যালনা ছিল না। এদের ব্রেনের কিছুটা কি আর টোটো ইনহেরিট করেনি !

—জ্ঞান মারা ছাড়ো। কিচ্ছু ইনহেরিট করেনি। ও আমার ছেলে। শুধু মাদার্স সান।

—অলরাইট অলরাইট। আমি শুধুই পোশাকি বাবা।

—হ্যাঁ তাই। মুহূর্তের রুক্ষতা কমে ছন্দার গলায় আদুরে ভাব ফিরেছে,— আমি কিন্তু একটা পার্টি দেব।

—দিয়ো।

—মিনিমাম একশোজনকে ইনভাইট করব।

—কোরো।

—কোরো তো বলছ, তখন কিন্তু আবার কিপটেমি কোরো না। আমি প্রাণ খুলে খরচা করতে চাই।

—আমাকে অ্যাদ্দিন দেখেও কি তোমার খুব কিপটে বলে মনে হয় ?

—কিপটেই তো। সব ব্যাপারে কিপটে। সময়ের ব্যাপারে। ভালবাসার ব্যাপারে।

—কী করলে প্রমাণ হবে আমি কিপটে নই ?

—বলব ? করবে ?

—হুকুম করেই দ্যাখো।

—আজ সন্ধেবেলা তাড়াতাড়ি চলে এসো।

—এসে ?

—আমরা তিনজন মিলে হইচই করব। টোটোকে বাইরে ডিনার খাওয়াব। তারপর মাঝরাত অবধি একটা জয়রাইড...

—ব্যস এইটুকুন ? এতেই খুশি ? শুভাশিস সিগারেটে লম্বা টান দিল, ধোঁয়া ছাড়ল বুক খালি করে, শ্রান্ত শরীরে যথাসম্ভব প্রাণ আনার চেষ্টা করল,— কোথায় খাবে ? পার্ক ? গ্র্যান্ড ? হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল ? বলো তো টেবিল বুক করে দিচ্ছি।

—সে টোটো এসে ডিসাইড করবে। তুমি কটায় ফিরছ ?

—সাড়ে আটটা। বড় জোর নটা।

—কথাটা মনে রেখো। দেরি করলে টোটো কিন্তু খুব হার্ট হবে।

—ও কে বস।

শুভাশিস টেলিফোন ছেড়ে দিচ্ছিল, ছন্দা আবার বলল, —শোনো শোনো, আরেকটা কথা। বাবাকে কী করে মাধবপুরে খবর পাঠানো যায় বলো তো ?

শুভাশিস ভাবল একটু,— মনে হয় খবর পাঠানোর দরকার হবে না। তুফানই আজকালের মধ্যে এসে যাবে। তুমি বরং জলপাইগুড়িতে একটা ফোন করে দাও।

—আমার বাপের বাড়ি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার যাকে যা জানানোর জানিয়ে দিয়েছি। জামাইবাবুকেও অফিসে ফোন করে দিয়েছি। দিদি জামাইবাবু সন্ধেবেলা আসতে পারে।

—একেই বলে গুছোনো গৃহিণী।

—অনর্থক তেল মেরো না। নিজের কর্তব্যের কথা খেয়াল রাখো। টোটোকে তো আমাদের একবার মাধবপুর নিয়ে যাওয়া উচিত, কী বলো ?

—হুঁ। দেখি যদি পারি তো রোববারই... শুভাশিস ফোন রেখে দিল। কী একটা কথা যেন চক্রাকারে ঘুরছে মাথায়, অথচ মনে আসছে না। কি কথা ? ছন্দাকে কী কিছু বলার ছিল ? অথবা সদ্য সেরে আসা অস্ত্রোপচার সম্পর্কে কোনও নির্দেশ দেওয়ার ছিল সিস্টারকে ? নাকি কোনও জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভুলে যাচ্ছে সে ?

আলোর গতিতে আজকের বাকি দিনটাকে পড়ে নিতে চাইল শুভাশিস। এখান থেকে সোজা একবার গলফভিউ নার্সিংহোমে যেতে হবে, ওখানে দুটো পেশেন্ট আছে। সকালে রাউন্ডে যাওয়ার কথা ছিল, হয়ে ওঠেনি। ওখানে আজ অরূপও আসবে, ঠিক চারটেয়। দুজনে মিলে নিজেদের নার্সিংহোমের জন্য বিকেলে একটা বাড়ি দেখতে যাওয়ার কথা। তারপর ছটায় বেকবাগান পলিক্লিনিক। আর কিছু ? আর কিছু ?

নার্সিংহোমের কর্মচারী টেবিলে ধোঁয়া ওঠা কালো কফি রেখে গেছে, সঙ্গে প্লেটভর্তি নোনতা বিস্কুট। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কালো কফি আর সিগারেটই শুভাশিসের সঞ্জীবনী। সকালে বড়জোর দু পিস স্যান্ডুইচ, একটা আধসেদ্ধ দিশি মুরগির ডিম আর এক কাপ চা খেয়ে বেরোয় সে। ভরাপেটে কাজকর্ম করতে অসুবিধা হয় তার। ক্ষিদে ক্ষিদে ভাবটাই শরীরকে অনেক ঝরঝরে রাখে, মনঃসংযোগে সুবিধা হয়, আঙুলেরা ক্রীতদাসের মতো সাড়া দেয় ছুরিকাঁচির আহ্বানে।

কফিতে চুমুক দিয়ে শুভাশিস আর একটা সিগারেট ধরাল। টোটোর এত বড় একটা খুশির খবরও শরীরকে ঠিক তেমনভাবে উজ্জীবিত করতে পারছে না, মাথা থেকে পাহাড়ি জোঁক ছাড়ছে না কিছুতেই।

অথচ এমনটি তার হওয়ার কথা নয়। তার শরীরের খাঁচা যথেষ্ট মজবুত, সহজে কোনও রোগব্যাধি কাছে ঘেঁষে না, অসুরের মতো খাটার অভ্যাসও তার বহুদিনের। এম এস করার পর প্রথম প্রথম দিনে দশ-বারো ঘণ্টা পর্যন্ত অপারেশন থিয়েটারে কাটিয়েছে শুভাশিস। নিজের হাতে দু-একটা ছোটখাট কাটাছেঁড়া করা ছাড়া বেশির ভাগই তখন ছিল সিনিয়ার ডাক্তারদের সাহায্য করার

কাজ। তখন ছিল শেখার দিন, আর তাই মনঃসংযোগেরও প্রয়োজন হত অনেক বেশি। চোখ কান মাথা এক করে সিনিয়ারদের ছুরিকাঁচি চালানোর টেকনিক রপ্ত করার প্রয়াস বিস্তর ব্যায়াম করাত মগজকে। শরীরকেও। তখনও ক্লান্তি নামত রক্তমাংসের দেহে, স্নায়ু বিদ্রোহ করে উঠত, সাইরেন বাজত মস্তিষ্কে। তবে সেই ক্লান্তির প্রকৃতি ছিল যেন অন্য রকম। একচিলতে অবকাশেই কোষ তাজা হয়ে যেত। টগবগে ঘোড়ার মতো আবারও ট্র্যাকে নেমে পড়ত শুভাশিস।

আর এখন মাত্র তিন-চার ঘণ্টা অপারেশান ঘরে উপস্থিতি, তাও সঙ্গে সহকারী, এতেই যে কী বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে শরীর!

তবে কি শুভাশিসের যৌবন গোপনে ফুরিয়ে এল!

নার্সিংহোমের অফিসক্লার্ক ফাইল হাতে ঘরে এসেছে,— কয়েকটা ভাউচার সই করার ছিল স্যার।

শুভাশিস ছাইদানে সিগারেট গুঁজল,— দিন। কত তারিখ পর্যন্ত আছে?

—ফিফটিনথ জুন স্যার।

ভাউচারে পরপর সই মারল শুভাশিস। কম্পিউটার-চোখে টাকার অঙ্ক যোগ করে নিল। পনেরো দিনে মোট চব্বিশ হাজার। অর্ধেক ক্যাশ, অর্ধেক চেক। অ্যামাউন্টটা মন্দ নয়!

চেক আর ক্যাশের কৃত্রিম উত্তেজক খামগুলো ব্রিফকেসে ভরে শুভাশিস এবার যেন খানিকটা চনমনে হয়েছে। আলগাভাবে বলল, —আপনাদের একটু ব্যাকলগ চলছে মনে হচ্ছে?

—অডিট চলছিল স্যার, তার জন্যই...। নেক্সট উইক থেকে আপ-টু-ডেট হয়ে যাবে।

—দ্যাটস ফাইন।

—আপনি তো স্যার আজ এখানেই লাঞ্চ করবেন?

—ও শিওর।

লোকটা চলে যাওয়ার পর দ্রুত আর একটা সিগারেট শেষ করে শুভাশিস উঠল। আজকের অস্ত্রোপচারের কেসটি ছাড়াও এখানে তার আরও দুজন রুগী আছে, সহকারী সঙ্গে নিয়ে ঝড়ের গতিতে দেখে নিল তাদের। একজনের প্রেসক্রিপশান বদলাল সামান্য, সই করল অন্য জনের রিলিজ অর্ডারে, কবে আবার তার চেম্বারে চেক-আপে আসতে হবে তার তারিখও লিখে দিল। হাতের কাজ সেরে আবার যখন তার নির্দিষ্ট ঘরে ফিরল, তখন টেবিলে খাবার এসে গেছে।

বোধহীন মুখে খেয়ে চলেছে শুভাশিস। রাত্রি তার ভরপেট আহারের সময়, এখন শুধু পাকস্থলীতে খাদ্য ফেলার নিয়ম বজায় রাখা। চোদ্দশো স্কোয়্যার ফিট ফ্ল্যাটের অধীশ্বর শুভাশিস সেনগুপ্ত, পাশের ব্রিফকেসে হেলায় চব্বিশ হাজার টাকা ছড়িয়ে রাখা ডক্টর শুভাশিস সেনগুপ্ত বর্ণহীন ঝোল থেকে বিস্বাদ মুরগি তুলে চিবোচ্ছে, চামচে করে মুখে তুলছে টক দই, কচকচ কামড় দিচ্ছে শশায়। খাওয়ার ভঙ্গিটি যেন তার নিজস্ব নয়, যেন অবিকল তার মা মনোরমার। নির্বিকার যান্ত্রিক গলাধঃকরণ। খেতে খেতে অভিব্যক্তিহীন চোখ চতুর্দিকে ঘুরছে। দেওয়ালে এসে স্থির হল। ক্যালেন্ডারে লোলজিহ্বা শ্মশানকালী। কালী নয়, বুঝি মহাকাল। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে শুভাশিস। তাকিয়েই আছে। হঠাৎই তরঙ্গ কেঁপে উঠল শিরদাঁড়ায়।

আজ তো তিতিরেরও রেজাল্ট বেরিয়েছে!

কেমন রেজাল্ট করল তিতির?

তিতিরও কি হাসছে? লাফাচ্ছে? নাচছে? টোটোর মতো?

বুকের গভীরে চক্রাকারে ঘুরন্ত কথাটা আবিষ্কার করে ফেলেছে শুভাশিস! ভাবতেই এক মুক্তির অনুভূতি! খাওয়া ফেলে ক্ষিপ্র হাতে শুভাশিস টেলিফোন ছুঁল। পরক্ষণে সরিয়ে নিয়েছে হাত। ও বাড়ির টেলিফোনটা কি ঠিক হয়েছে? পরশুও তো...! কি ভেবে আবার রিসিভার তুলে নম্বর টিপল। বাজছে। বেজেই যাচ্ছে। বিকল দূরভাষ শব্দঝঙ্কার ফিরিয়ে দিচ্ছে শুভাশিসকে।

শুভাশিসকে ফিরিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রাণী!

কী করে যে এক্ষুনি তিতিরের খবর পাওয়া যায়?

শুভাশিস চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করল খানিকক্ষণ, একটি খাদ্যকণাও মুখে তুলতে পারল না। অস্থির চোখে ঘড়ি দেখল। দুটো চল্লিশ। এই মুহূর্তে কোথাও নড়বার উপায় নেই। গলফভিউতে যেতেই হবে এখন। যারা নার্সিংহোমে অনেক টাকা খরচ করে আসে, তারা ডাক্তারদের কাছে পেশাদারি দায়িত্ব আশা করবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

বাইরে বেরিয়ে মারুতিতে স্টার্ট দেওয়ার আগে ক্ষণকাল আকাশ দেখল শুভাশিস। পশ্চিমে হেলে দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ সূর্য। গায়ে মেঘের মলিন অ্যাপ্রন।

অরূপ বলল,— শালু কাল একটা কথা বলছিল, বুঝলি ?

স্টিয়ারিং-এ বসা শুভাশিসের গম্ভীর চোখ সামনের দিকে স্থির ছিল, সামান্য ঘুরল শুধু।

অরূপ বলল,— শালুর মতে আমাদের নার্সিংহোমে একটা প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিও থাকা উচিত।

—তাতে কিরকম মিটার চড়বে খেয়াল আছে ?

—কত আর ! এক্স-রে মেশিন না বসালে বড়জোর চার-পাঁচ লাখ।

—তুই এস্টিমেট করেছিস ?

—না, তেমন ডিটেলে কিছু করিনি, তবে ওর মধ্যে হয়ে যাবে মনে হয়।

—কেন আবার ফালতু ঝামেলা বাড়াচ্ছিস ? আরও স্টাফ লাগবে, প্যাথোলজিস্ট লাগবে... তার চেয়ে কোনও একটা ক্লিনিকের সঙ্গে পারমানেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নিলেই তো হয়। মাস গেলে কমিশনও চলে আসে, দায়দায়িত্বও থাকে না...

—নিজেদের ল্যাব থাকলে রেপুটেশন বাড়ে। আর তাছাড়া এখানে কমিশনের তো ব্যাপারই নেই, সবটাই লাভ। আমাদের ব্যাচের দীপককে প্যাথোলজিস্ট হিসেবে নিয়ে নিতে পারি।

—অ্যাজ এ পার্টনার ?

—নো। উই'ল পে হিম।

শুভাশিস চুপ করে গেল। গলফভিউতে মেট্রনের ওপর চেঁচামেচি করে মাথাটা এখনও টিপটিপ করছে। কোথায় কোন রুগীর বিছানায় সামান্য নোংরা দাগ রয়েছে, তার জন্য এত মাথা গরম করার কি যে দরকার ছিল ! নিজেদের নার্সিংহোম হলে অবশ্য ওইটুকু দাগও থাকতে দেবে না শুভাশিস।

সিগারেট ধরিয়ে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে কাঠি ছুঁড়ল অরূপ,— কি রে, কিছু বলছিস না যে ?

—কী বলব ?

—এগ্রি করছিস, না ডিসএগ্রি করছিস ?

—শালিনীর যখন ইচ্ছে, করেই ফ্যাল। কিন্তু ছোট করে। নো এক্সটারনাল কেস, শুধু নার্সিংহোমের পেশেন্টদের জন্য।

—অফকোর্স। শালুও তো তাই চায়। পরে যদি বাড়ানো যায়...

ট্রামলাইন টপকে দেশপ্রিয় পার্কের পাশের গলিতে ঢুকেছে শুভাশিস। পাশে একটা মেয়েদের স্কুলের গেটে রাশ রাশ বালিকার জটলা। কিছু উদ্বিগ্ন অভিভাবকও ঘোরাফেরা করছে সামনে। সাবধানে জায়গাটা পার হতে গিয়ে হঠাৎই শুভাশিসের চোখ চলে গেছে ডানদিকের ফুটপাথে। নতমুখে এক কিশোরী চোখ মুছছে, সঙ্গে সম্ভবত তার বাবা। সান্ত্বনা দিচ্ছে মেয়েকে। চকিতে বিচিত্র এক উদ্বেগে টিপটিপ করে উঠল শুভাশিসের বুক। অপাঙ্গে দেখল অরূপকে। নিশ্চিন্ত মুখে সিগারেট খাচ্ছে। টোটোর রেজাল্টটা কি বলবে অরূপকে ? থাক, অরূপের যখন রেজাল্ট বেরোনোর বিষয়টা মাথাতেই নেই, বুঝতেও পারেনি, তখন আর কেন প্রসঙ্গটা তুলে অকারণ এক উচ্ছ্বাসের মুহূর্ত গড়ে তোলা ?

আচমকা অরূপ চেঁচিয়ে উঠল— থাম থাম, কোথায় যাচ্ছিস ? আমরা তো এসে গেছি।

চমকে রাস্তার ধারে গাড়ি পার্ক করল শুভাশিস। পাশেই ছোট্ট কেতাদুরস্ত অফিস। গ্যারেজঘর। কাচের দরজা। প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল। বাড়িভাড়া পাত্রপাত্রী জমিজমা থেকে শুরু করে গৃহশিক্ষক, ছোটখাট চাকরি সব কিছুই মেলে এখানে। ফুটপাথ থেকেই দেখা যায় ভেতরে একটি মেয়ে টাইপ করে চলেছে খটখট।

অরূপ বলল, —নামবি নাকি ?

শুভাশিস অন্যমনস্কভাবে সিটে হেলান দিল,— নাহ, তুই ডেকে নিয়ে আয়।

ডাকতে হল না, দুই ডাক্তারকে দেখে এজেন্সির মালিক নিজেই বেরিয়ে এসেছে। নিভাঁজ প্যান্টশার্ট পরা মধ্যবয়সী লোকটা বিগলিত মুখে জানলায় উঁকি দিল,— এক্ষুনি যাবেন তো স্যার ?

অরূপ বলল,— বাড়িটা এখন দেখা যাবে তো ?

—অবশ্যই স্যার।

—তাহলে পেছনে উঠে পড়ুন। কদ্দূর ?

—এই তো কাছেই।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই এজেন্সির মালিকের ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে নিছক দালাল রূপে বিকশিত হয়েছে লোকটা। অরূপ আর শুভাশিসের মাঝখান দিয়ে মাথাটা প্রায় গলিয়ে দিয়েছে,— এই বাড়িটা দেখলে আর স্যার চোখ ফেরাতে পারবেন না। পছন্দ এবার হতেই হবে।

অরূপ ধমকের সুরে বলল,— সে তো আপনি যে বাড়ি দেখাচ্ছেন সে বাড়ি সম্পর্কেই এক কথা বলছেন।

লোকটা জিভ কাটল,— এ সে জিনিস নয় স্যার, একেবারে নার্সিংহোমের জন্যই তৈরি। শুধু রুগী এসে শুয়ে পড়লেই হয়। কী সব ঘর ! কী দারুণ লন ! কতটা জায়গা ! যা একটা গাড়িবারান্দা আছে না স্যার, আপনারা পর পর মারুতি সাজিয়ে রাখতে পারবেন।

—মারুতি তো ঢুকবে, অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে তো ?

—লজ্জা দিলেন স্যার। অ্যাম্বুলেন্স কি বলছেন, লাইন পাতলে ই এম ইউ লোকাল পর্যন্ত ঢুকে যাবে।

অন্যদিন হলে শুভাশিস লোকটার সঙ্গে ছোটখাট রসিকতা জুড়ত, আজ কেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছে না। সৌভাগ্যক্রমে বাড়িটা কাছেই, এসে গেল চটপট। এবং আশ্চর্যের বিষয়, দালালটির কথা খুব একটা মিথ্যে নয়। বাড়িটা একটু পুরনো হলেও বেশ প্রকাণ্ড। একতলা দোতলা মিলিয়ে গোটা আষ্টেক ঘর। সাহেবি আমলের পেল্লাই পেল্লাই সাইজের। দুটো তলাতেই দুখানা করে বিশাল বিশাল বারান্দা, লনটাও খুব একটা ছোট নয়, গাড়িবারান্দায় ট্রেন না ঢুকলেও লরি ঢুকে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। দুপাশে দুটো গেটও আছে। সব থেকে বড় কথা বাড়িটা একদম বড় রাস্তার ওপর। বাড়ির মালিক দুই ভাই কানাডায় থাকে, তাদের হয়ে এক বিহারি কেয়ারটেকার দেখাশুনো করছে বাড়িটার। সাইজের তুলনায় ভাড়াও বেশ কম। মাত্র বারো হাজার। সঙ্গে এক লাখ অ্যাডভান্স। বহিরঙ্গের ভোল পাল্টানোর খরচ।

মোটামুটি পছন্দ হলেও শুভাশিস ঠিক তক্ষুনি হ্যাঁ বলল না, গাড়িতে বসে দালাল কাম মালিক লোকটিকে ডাকল— তাহলে দত্তবাবু, আমরা নেক্সট মানডে আসছি।

—আজই একটা টোকেন অ্যাডভান্স করে গেলে ভাল হত না স্যার ? অনেক পার্টি ঘুরছে... আপনাদের ফ্ল্যাগটা পোঁতা থাকলে...

অরূপ ধমকাল,— বলছি না সোমবার আসছি ! আপনি আবার লোভে পড়ে সাতজনকে দেখিয়ে বেড়াবেন না।

—না, না, সে কী কথা ! আপনাদের ছেড়ে অন্য কাউকে... দত্তবাবু বিনয়ের অবতার,— স্যার, আমাকে আজ কিছু...

—আপনার এজেন্সিতে তো টাকা দেওয়া আছে !

—এজেন্সির টাকা স্যার এজেন্সির ঘরে চলে যায়। ওভাবে একটা অফিস মেইনটেন করা...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। অরূপ একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে দিল,— শাইন মারা অফিস খুলে বসেছেন... লেডি টাইপিস্ট... ছোঁক ছোঁক করার অভ্যেসটা তবু গেল না!

লোকটা হেঁ হেঁ করতে করতে চলে গেল।

ভিড় পথে শামুকের গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি। শুভাশিস জিজ্ঞাসা করল,— তোকে এখন কোথায় ড্রপ করব ?

—তুই এখন কোনদিকে যাবি ?

—বেকবাগান। ছটায় আজ পলিক্লিনিক আছে।

—আমাকে তাহলে মিন্টো পার্কে নামিয়ে দে। অরূপ অলসভাবে সিগারেট ধরাল,— আছিস ভালো। পলিক্লিনিক! চেম্বার! একদম্ জাল বিছিয়ে বসে আছিস, অ্যাঁ ? বলতে বলতে খিকখিক হাসছে, —উইকে একদিন গড়িয়ার চেম্বারে বসছিস, একদিন শ্যামবাজার চেম্বারে, পুরো নর্থ সাউথ একেবারে গ্রিপে, কি বলিস!

মনের ভেতর শুঁয়োপোকার নড়াচড়া, তবু বিদ্রূপ ফেরত পাঠানোর সুযোগ হাতছাড়া করল না শুভাশিস। মুখে হাসি এনে বলল,— আর তুই যে শালা হসপিটালের আউটডোর থেকে নিজের চেম্বারে বাচ্চা তুলে আনছিস, তার বেলা ? এর সঙ্গে শালিনী যেখানে যা ডেলিভারি করে বেড়াচ্ছে সব বেবিই তো তোর!

অরূপ চোখ টিপল,— মা বাবারা আজকাল চেম্বারই প্রেফার করে। আর তুইই বল, হসপিটালে কি ঠিকমতো বেবিদের ট্রিটমেন্ট করা যায় ? হসপিটাল মানেই কিলবিল কিলবিল!

—আআ, চেম্বারে কিলবিল করলে ক্ষতি নেই, তাই তো ? অরূপের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে টান মেরে নিল শুভাশিস,— আমার তো চেম্বারে ভাই একটা দুটোর বেশি পেশেন্ট আসে না।

—ওই একটা দুটোই তো খাজানা ভরে দিচ্ছে রে শালা। তোর হাতে পড়লেই তো চার হাজার গলে গেল। তারপর ধর যদি তেমন নধর মুরগা হয়... অরূপ হা হা হাসছে,— যাক গে, বাজে কথা ছাড়। এই বাড়িটা নেওয়াই ফাইনাল তো ? তাহলে কাল একবার শালুকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

—বাড়িটা একটু বেশি পুরনো না ? কেমন একটা স্যাঁতসেতে ভাব।

—স্যাঁতসেতে নয়, একে বলে শীতল পরিবেশ। ন্যাচারাল এয়ার কুলিং সিস্টেম। দোনামোনা করিস না, রাজি হয়ে যা। বাড়িটার সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্টটা লক্ষ করেছিস ? কাছেই অত বড় একটা হসপিটাল...

—তাতে আমাদের কী এল গেল ?

— তুই শালা একটা আস্ত গাড়ল। আরে এখন হসপিটাল মানে তো সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরী। পাশে মৃত্যুপুরী থাকলে নার্সিংহোমের পশার তুড়ি মেরে জমে যাবে। দেখছিস না সানশাইন কেমন রমরমিয়ে চলছে ?

—হু, তা ঠিক। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, শুভাশিস ওয়াইপার চালিয়ে দিল, —কেয়ারটেকারের কথা শুনে মনে হল মালিকরা বোধহয় আর দেশে ফিরবে না। দাঁও বুঝে কিনে নিলে হয় না ?

—কিছুদিন যাক আগে। এখনই অত বড় ইনভেস্টমেন্টে যাব না। ভেতরটা পুরো ডেকরেট করতে কত খরচা হবে ভাবতে পারছিস ? এমনিই তো ডাক্তারের ফাইল দেখলে ইনকাম ট্যাক্সের লোকগুলো চুলবুল করে, নার্সিংহোম খুলে বসলে পুরো স্টিকিং প্লাস্টার হয়ে সেঁটে যাবে। তার ওপর বাড়ি কিনলে... ওরে বাবা, আমি ভাবতে পারি না।

—ওকে। তাহলে বাড়িটা অ্যাডভান্স করে দিয়ে নেক্সট উইকে ইনটিরিয়ার ডেকরেটারের সঙ্গে বসে পড়ি। ওরা এস্টিমেট দিয়ে দিলে টোটাল বাজেট ফাইনাল করে ফেলব।

—তোর চেনা আছে কেউ ?

—আছে বোধহয় একজন। শুভাশিসের অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল ইন্দ্রাণীর স্কুলের এক কোলিগের

স্বামী মোটামুটি নামী ইন্টিরিয়ার ডেকরেটর। তাকে দিয়ে কাজটা করালে ইন্দ্রাণী হয়তো খুশিই হবে।

অরূপ বলল,—যাকে দিয়েই করাও, গোড়াতেই দুটো কন্ডিশন করে নেবে। পেমেন্ট হবে ক্যাশে। বিলের অ্যামাউন্টেও আমরা যা দেখাতে বলব তাই দেখাতে হবে। ইক্যুইপমেন্টস কেনার সময়ে তো আর কিছু করা যাবে না, এখানেই যেটুকু ব্ল্যাক খাইয়ে দেওয়া যায়।

অরূপকে তার মিন্টো পার্কের চেম্বারে নামিয়ে তড়িঘড়ি বেকবাগান পলিক্লিনিকে ছুটল শুভাশিস। ঢুকেই নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড়। কোনওদিন ছ-সাতটার বেশি রুগী থাকে না, আজ বারোজন নাম লিখিয়ে বসে আছে।

বিপন্ন মুখে রুগীদের ডাকছে শুভাশিস। একে একে। অধৈর্য চোখ বার বার ঘুরছে কব্জিতে। আটটার মধ্যে হয়ে গেলে একবার ইন্দ্রাণীর ওখানে...। হল না। চেম্বার খালি হতে হতে সেই ঘড়ির কাঁটা নটার ঘর ছুঁই ছুঁই।

টোটো-ছন্দা শুভাশিসের প্রতীক্ষায় বসে আছে। হয়তো বা ছন্দার দিদি জামাইবাবুও। ফিরতে হবে। ফিরতে হবে। ফিরতেই হবে বাড়ি!

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ঝমঝম ঝরে গেছে খানিক আগে। শরীরময় জলকণা মেখে ফিরছে শুভাশিসের সাদা মারুতি। মন্থর মনে। অসংখ্য যান যান্ত্রিক পশুর মতো চরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, তাদের জ্বলন্ত চোখের মণি ভেজা রাজপথে বিম্বিত হয়ে ঠিকরে ঠিকরে উঠছে, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে নয়ন। মধ্য আষাঢ়ের আকাশ লাল চাদরে ঢাকা।

বাড়ির খুব কাছে এসে শুভাশিস কাঁধে এক অদ্ভুত চাপ অনুভব করল। কে যেন ঠেলছে তাকে, ঘুরিয়ে দিচ্ছে তার স্টিয়ারিং। প্রাণপণ চেষ্টা করেও অদৃশ্য চাপটাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারল না শুভাশিস।

গাড়ির অভিমুখ বদলে গেল।

১৪

আলো ছিল ব্রিজের ওপাশটাতেও, এপারে অন্ধকার। মেঘলা রাতে নিষ্প্রদীপ এলাকাটুকু কেমন যেন আধিভৌতিক। অস্বচ্ছ। লোডশেডিং চলছে।

আধখোলা গেট ধরে কয়েক পল নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল শুভাশিস। প্রায় চোরের মতো। তারপর পায়ে পায়ে ঢুকেছে বড়ঘরে।

সেন্টার টেবিলে হ্যারিকেন। চিমনিটা ঘোর মলিন, ইতস্তত ভুসোকালির ছোপ, ফলত এক দীপ্তিহীন বিভায় স্তিমিত চার দেওয়াল। সামনের সোফায় জয়মোহন ঈষৎ কুঁজো হয়ে বসে। হাতে পাতলা জাপানি পাখা। নাড়ছেন মৃদু মৃদু।

পায়ের শব্দে জয়মোহন মুখ তুলেছেন। ঘোলাটে চোখ অভ্যস্ত ছায়ায় নিশ্চিন্ত,— অ, ডাক্তার। এসো, একটু অন্ধকার শেয়ার করো।

অমায়িক ডাক, তবু শুভাশিসের ভেতরে চোরা অস্বাচ্ছন্দ্য। ষোলো-সতেরো বছর ধরে এ বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত, তা সত্ত্বেও রয়ে গেছে ভাবটা। ঢোঁক গিলে আলগা হাসল শুভাশিস,— কতক্ষণ গেছে?

—আগে জিজ্ঞেস করো, ছিল কতক্ষণ।

—আজকাল সারাদিনই যাচ্ছে বুঝি?

—কেন, তোমাদের ওদিকে যায় না?

— যায় হয়তো। শুভাশিস সামান্য সঙ্কুচিত হল,— আমাদের বিল্ডিংয়ে তো জেনারেটর আছে, তাই আমরা ঠিক...

—অ ! সেই পাবলিক নুইসেন্স ? গলগল ধোঁয়া ? তোমরা শহরটাকে আরও দূষিত করে দিলে হে !

—আপনার টান আজ একটু বেশি মনে হচ্ছে ?

—শেষ বয়সে এই টানটুকুই তো সম্বল ।

—ওষুধগুলো ঠিক ঠিক খাচ্ছেন তো ?

—পেট তো এখন ওষুধ খেয়েই ভরে ডাক্তার । জিভের স্বাদের খাবার তো কবেই ভুলে গেছি ।

—ফলটল খাচ্ছেন না ? আপনি তো ফল খেতে ভালবাসেন ।

—আম তো তোমরা এ বছর খেতেই দিলে না । মিনতিকে কতবার করে বলি বাজার থেকে একটু খেজুর নিয়ে আয়, তা সে ছুঁড়ি আমাকে মোটে পাত্তাই দেয় না । দীপুরা নেই বলে সারাদিন এখন উড়ে বেড়াচ্ছে ।

শুভাশিস অন্দরের দিকে তাকাল । পিচঢাকা অন্ধকার । সঙ্গে এক গাঢ় নৈঃশব্দ্য ।

—কারুর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না যে ? কেউ নেই নাকি ?

—বউমা আছে । এই তো একটু আগে আমার মশারি টাঙিয়ে দিয়ে দোতলায় গেল ।

— তা আপনি শুয়ে পড়েননি কেন ?

—শান্তিতে শোওয়ার জো আছে ? দু-দুটো শয়তান মশারির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে । হুল উঁচিয়ে পিন পিন তেড়ে বেড়াচ্ছে । চোখের সামনে ঘুরছে তবু ব্যাটাদের দেখা যাচ্ছে না ।

শুভাশিস হেসে ফেলল,— আপনার নাতনির রেজাল্ট কেমন হল ?

—রেজাল্ট ? এ তো কঠিন প্রশ্ন ডাক্তার ।

—কেন ?

—দুপুরে মেয়ে মুখ তোলো হাঁড়ি করে স্কুল থেকে ফিরল । জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁরে রেজাল্ট কেমন হল ? মেয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, খুব খারাপ । খুব খারাপ । আমি ভাবলাম তাহলে বুঝি ফেল করেছে !

—তিতির ! ফেল ! কী বলছেন কি আপনি !

— না করার কি আছে ! করতেই পারে । ওর বাপ-ঠাকুর্দা সকলেরই এক আধবার গাড্ডু মারার রেকর্ড আছে । বংশের ধারা বজায় রাখতে গেলে ফেল মারাটা এমন কিছু অন্যায় নয় ।

শুভাশিস হতবুদ্ধি হয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়ল ।

জয়মোহন হাঁপাতে হাঁপাতেও হাসছেন ফিক ফিক,— না, না, অত ঘাবড়ানোর কিছু হয়নি । ও মেয়ের ফেল করার মুরোদ কোথায় ? বিকেলে চাঁদুর মুখে শুনলাম কি সব স্টার ফার পায়নি, তাই নাকি অত কান্নাকাটি । নম্বর পেয়েছে বাহাত্তর পারসেন্ট । চারটে সাবজেক্টে লেটার ।

শুভাশিসের পেশিগুলো অনেকটা শিথিল হল,— নাতনির রেজাল্ট তাহলে ভালই হয়েছে বলুন ?

—ভাল ? কে-এ জানে ! বৌমা তো বলছিল এ রেজাল্টও নাকি তেমন ভাল নয় । মেরে কেটে মন্দের ভাল । এই নম্বরেও তিতিরের নাকি ভাল জায়গায় ভর্তি হতে অসুবিধে হবে । আমরা তো বাবা জানতাম পাশ করলেই ছেলেমেয়ে কলেজে ভর্তি হতে পারবে... কি যে দিনকাল বানিয়েছ তোমরা ?

জয়মোহন নিজের মনে বকেই চলেছেন । এর পর আর কি কি বলবেন, মোটামুটি শুভাশিসের মুখস্থ । তাঁদের সময়ে পৃথিবী কত সুন্দর ছিল, কলকাতায় কত গাছপালা ছিল, সেই গাছে গাছে পাখি ডাকত, একে অন্যের ভাল ছাড়া কিছু চাইত না, চালের মন দুটাকা ছিল, মাছঅলা মাছ ফাউ দিত, গোয়ালা দুধে জল মেশাত না... আরও কত কি ! কেন যে পুরনো দিনকে এত সোনালি ভেবে আঁকড়ে থাকে মানুষ !

শুভাশিস বসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠছিল । সামনের এই বৃদ্ধ, আর তার বাবা, দুজনেই তো প্রায় সমবয়সী । অথচ দুজনে কত তফাত । পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন বাবার ধাতেই নেই ।

রুগীদের নিয়ে, মাকে নিয়ে, এত ডুবে থাকে বলেই কি ? তবে কি কাজকর্ম ছাড়া বেঁচে থাকা আর মৃত্যুভয় মানুষের মনকে অতীত আঁকড়ে ধরতে বাধ্য করে ?

নিঃসাড়ে উঠে পড়ল শুভাশিস। সুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে। পা টিপে টিপে দোতলার প্যাসেজে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়েছে।

তিতিরের চেয়ার-টেবিলে বসে আছে ইন্দ্রাণী। সামনে তাড়া কাগজ। প্রুফ বোধহয়। মোটা মোম জ্বেলে ঝুঁকে আছে কাগজের ওপর।

প্যাসেজের অন্ধকার থেকে বহুকাল পর শুভাশিস চুরি করে ইন্দ্রাণীকে দেখছিল। চেয়ারে বসা ইন্দ্রাণীর ঋজু ভঙ্গিমা, সোনালি দ্যুতিমাখা তার নাক মুখ চোখ, ঈষৎ ঘামভেজা মুখ থেকে আলোর বিচ্ছুরণ, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্করহিত এক নারীপ্রতিমার আত্মমগ্ন কলম চালনা— সবই নির্নিমেষে পান করছিল শুভাশিস। নাহ্, বিশ বছরে সময় এই নারীর কিছুই হরণ করতে পারেনি। ওই ইন্দ্রাণী যেন সেই সদ্য কলেজ সোশালে দেখা বৈদ্যুতিক উনিশ। মাঝে অতিক্রান্ত সময় শুধুই যেন এক নিষ্ঠুর মায়া।

হঠাৎই প্রতিমা প্রাণ পেল। সিক্ত কপাল মুছছে আঁচলে। মুখ না তুলেই বলল— বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? ভেতরে এসো। নীচে এতক্ষণ কী করছিলে ?

পলকের জন্য স্বরটাকে অলৌকিক ভেবে কেঁপে উঠেছিল শুভাশিস, পলকে বিভ্রম ঘুচেছে। ঘরে ঢুকে খাটে বসে পলকাভাবে বলল,— তোমার শ্বশুরমশাই-এর পেট অপারেট করছিলাম।

কপালে ত্রিশূল এঁকে ইন্দ্রাণী ঘুরেছে— কীইই ?

—ইয়েস। অপারেশান। তিতিরের রেজাল্ট বার করার জন্য। সত্যিই ভদ্রলোকের স্মল ইনটেসটিনটা কেটে ছোট করে দেওয়া দরকার। প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে।

—বুড়ো হলে সকলেরই ওই দশা হয়। তোমারও হবে। ইন্দ্রাণীর কপাল থেকে ত্রিশূল মুছল,— টোটোর রেজাল্ট কী হল ?

টোটো নয়, চকিতে ছন্দার মুখটা দেখতে পেল শুভাশিস। দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে ! নয়তো হানটান করছে !

ফিরে আসা অন্য ধরনের অস্বস্তিটা কাটাতে চাইল শুভাশিস। যেন অদরকারি তথ্য পেশ করছে এমন দায়সারা ভঙ্গিতে বলল, —ভালই করেছে। এইট্টি সেভেন পারসেন্ট না কত যেন পেয়েছে। গোটা সাতেক লেটার।

—বাহ্। বাহ।

খুশি হতে গিয়েও ইন্দ্রাণী কেমন চুপসে গেল। বিজিত খেলোয়াড় যেন অভিনন্দন জানাল বিজয়ীকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,— ছেলে এত ভাল রেজাল্ট করেছে, তুমি আজ এখানে এলে যে বড় ? তোমার আজ সোজা বাড়ি যাওয়া উচিত ছিল।

—ছেলের রেজাল্টের সঙ্গে আমার বাড়ি ফেরার কী সম্পর্ক ?

—এমন আনন্দের দিনে তোমার বউও তো তার স্বামীকে এক্সপেক্ট করতে পারে।

—হাহ্। শী ওনলি এক্সপেক্টস আ পার্টি। অ্যান্ড শী উইল গেট ইট। তার ছেলে আছে। ছেলে ছেড়ে সে কবে আর ছেলের বাবার কথা ভেবেছে ?

রহস্যময় আবছায়া ছড়িয়ে আছে ঘরে। ছায়ার আবরণ ভেদ করে ইন্দ্রাণী বুঝি পড়তে চাইছে শুভাশিসকে। কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে নীরস ভাবে বলল,— তোমার ছেলেও তো আজ তোমার সঙ্গ চাইতে পারে !

—আর আমি ? আমার কোনও চাওয়া নেই ? দুপুর থেকে জমে ওঠা অসহিষ্ণুতা সহসা বিস্ফারিত হয়েছে,— আমার কি তিতিরের রেজাল্ট জানার ইচ্ছে থাকতে পারে না ?

—তার জন্য তুমি আজ বাড়ি না গিয়ে এখানে চলে আসবে ?

শুভাশিসের গলা খাদে নামল,—আজ দুপুর থেকে তিতিরকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল রানি।

ইন্দ্রাণীর চোয়াল কঠিন হল,— তোমার নার্সিংহোমের কী খবর ? বাড়ি দেখতে গেছিলে আজ ?

—গিয়েছিলাম। কিন্তু তিতির কোথায় ?

—বাড়ি পছন্দ হল ?

—হয়েছে একরকম। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

—নার্সিংহোম করতে গেলে তোমাদের ট্রেড লাইসেন্স, হেলথ লাইসেন্স লাগবে না ?

—রানি, আমি একটা প্রশ্ন করেছি...

—তোমার আজ কী হয়েছে শুভ ? ছেলের রেজাল্টের খুশিতে নেশা ফেশা করোনি তো ?

—তুমি জানো এ বাড়িতে আমি কক্ষনো ড্রিঙ্ক করে আসি না।

—তাহলে উল্টোপাল্টা বকছ কেন ?

—তিতিরের জন্য ছুটে আসাটা অপরাধ ? তিতিরকে দেখতে চাওয়াটা অন্যায় ? তিতিরের খোঁজ করাটা উল্টোপাল্টা বকা ?

—আহ্ শুভ।

শুভাশিস গুম হয়ে গেল। তার আর ইন্দ্রাণীর সম্পর্কের মাঝে একটা অকথিত নিষিদ্ধ এলাকা আছে। পারতপক্ষে দুজনের কেউই এই এলাকায় ঢোকে না। আজ কেন এই অসংযম ? সুনসান দোতলা, এক মায়াবী অন্ধকার, ভেজা ভেজা বাতাস, বহুকাল পর ইন্দ্রাণীকে এভাবে নিভৃতে পাওয়া— এরাই কি বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে সংযমের ?

ইন্দ্রাণী জানলায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে শুভাশিসের কাছে ফিরল,— তোমার মাথায় আজ ভূত চেপেছে শুভ।

শুভাশিস বিমর্ষ মুখে বলল,— তা হবে। নইলে বাড়ি না ফিরে আজ এখানে ছুটে আসি ?

ইন্দ্রাণী আলগাভাবে শুভাশিসের কাঁধ ছুঁল—তিতির আদিত্যর সঙ্গে বেরিয়েছে। রাত্রে ওরা বাইরে খাবে।

—ও। তোমার বর তো বেশ ডিউটিফুল হয়ে উঠেছে দেখছি !

ইন্দ্রাণী হাত সরিয়ে নিল,— হওয়াই তো উচিত।

—ভাল। নেশা-টেশা ছেড়ে দিল... বউ ছেলে-মেয়ের দিকে মন বসছে... তোমরা এবার বেশ একটা হ্যাপি ফ্যামিলি হয়ে যাবে।

—ঠাট্টা করছ ?

—আমার সঙ্গে কি তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক ? তা তোমার ছেলেও কি তার বাবার সঙ্গে গেছে ? বাবার হাত ধরে ?

—গেছে। তবে হাত ধরে যায়নি। তিতির ওকে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে নিয়ে গেছে।

—তা তুমিই বা বাকি রইলে কেন ?

ইন্দ্রাণী ফিসফিস করে বলল,— আমি জানতাম, তুমি আসবে।

এক লহমায় বিহ্বল শুভাশিস। এইটুকু শোনার জন্যই কি সম্মোহিতের মতো আসা।

ইন্দ্রাণী আবার বলল,—বাপ্পাটাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো ? বম্বে যাওয়ার জন্য ভীষণ জেদ করছে।

শুভাশিস লঘু স্বরে বলল,— বাপ্পার বাবা কী বলে ?

—এখনও ঠাট্টা ? নাকি এখনও রাগ পড়েনি ?

শুভাশিস নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল,— যেতে চায় তো যাক না। ইন্টারভিউটা দিয়ে আসুক।

—অত দূরে একা একা যাবে ? ভাবতেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

—বম্বে কী এমন দূর ! ট্রেনে উঠবে, আর নামবে।

—তারপর যদি সত্যি সত্যি চাকরিটা হয়ে যায় ?

—হলে তো ভালই। কেরিয়ার তৈরি হয়ে যাবে।

—ছাই ভাল। কোথায় কোন দূরে চলে যাবে... জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়াবে... তুমি ওকে একটু বোঝাও না।

—কী বোঝাব ? বলব, মা-র আঁচলের তলায় বসে থাকো ?

— তা কেন ? বি.কমটা করে দরকার হলে এখানেই চাকরি খুঁজুক। এত তাড়াতাড়ি চাকরি করারই বা দরকার কী ? কস্টিং পড়ুক, চার্টার্ডের জন্য চেষ্টা করুক, কম্পিউটার কোর্স করুক...

—সবই ঠিক। তবে বাপ্পার যা বয়স, এই বয়সের ছেলেদের আটকানো যায় না। এই বয়সে সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, শুধু চোখের সামনে স্বপ্নটা ভেসে থাকে। জাহাজ সমুদ্র বিদেশ, সবই এখন ওর কাছে বড় রোমান্টিক।

—জানি। এই রোমান্টিক হওয়ার পরিণতি কি তাও জানি।

—তুমি কক্ষনও কিছু ভোলো না, তাই না রানি ?

—ভোলা কী সম্ভব ?

ভোলা যে সম্ভব নয়, সে কথা শুভাশিসও জানে। অনেক অনেক বছর আগে এরকমই এক রোমান্টিক নেশায় শহর ছেড়েছিল সে। তবে জাহাজ সমুদ্র বিদেশের স্বপ্ন নিয়ে নয়, তার চোখে তখন অন্য এক মায়াকাজল। এমন এক সমাজ গড়তে হবে যেখানে কোনও অসাম্য নেই, শ্রেণীভেদ নেই, শোষণ নেই, বঞ্চনা নেই, মানুষ তার ক্ষমতা মতো খাটবে, প্রয়োজন অনুযায়ী রোজগার করবে, সামান্য রুটি আর মাথার ছাদের জন্য দীর্ঘশ্বাস পড়বে না মানুষের। সে হবে এক স্বপ্নের সমাজ। সেই স্বপ্নের ঘোরেই ইন্দ্রাণীকে ভুলল শুভাশিস। ইন্দ্রাণীর বিয়ে স্থির হয়ে গেছে জেনেও রাতারাতি চলে গেল গ্রামে। পার্টির নির্দেশে। ঘোর যখন কাটল, তখন আর চোখে বিপ্লব নেই, ইন্দ্রাণীও পিছলে গেছে বহুদূরে।

দিগভ্রান্ত শুভাশিসের কী যে বিপন্ন দশা তখন !

শুভাশিস বলল, —রানি, একটা কথা বলব ?

—বলো।

—রোমান্টিসিজমের কথা বাদই দাও, বাপ্পার চিন্তার একটা প্র্যাকটিকাল দিকও আছে। এই শহরটা ফুরিয়ে আসছে, এখানে ব্রাইট ফিউচার হওয়া খুব কঠিন। বাপ্পা যদি এখান থেকে ছিটকে গিয়ে শাইন করে, সেও তোমার মঙ্গল।

—কিন্তু বাপ্পাকে ছেড়ে আমি থাকব কী করে ?

—অনেককেই তো ছেড়ে থাকা যায় না রানি, তবু ছেড়ে থাকতে হয়। এক সময়ে বিচ্ছেদটাই অভ্যেস হয়ে যায়।

আলো এসে গেছে। আরও খানিকক্ষণ উসখুস করে শুভাশিস উঠে পড়ল। তিতিররা ফেরার আগেই।

মনে যতক্ষণ একটা চিন্তা প্রকট হয়ে থাকে, অন্য চিন্তা ততক্ষণ ঘাপটি মেরে বসে থাকে পাশে। অনেকটা রিপুর মতো। ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হতেই ঘাপটি মারা চিন্তাটা কামড় বসাল শুভাশিসকে।

আজ কি বাড়িতে অগ্ন্যুৎপাত হবে ?

নাহ্‌, কিছুই হল না।

ছন্দাই দরজা খুলেছে। তার মুখচোখ প্রায় স্বাভাবিক।

সিঁটিয়ে থাকা শুভাশিস পাংশু গলায় বলল,— সরি। এক্সট্রিমলি সরি। বিশ্বাস করো, নটার মধ্যে ফিরে আসছিলাম, হুট করে পলিক্লিনিকে একটা ফোন এসে গেল। ব্লু হেভেনে আজ যে অপারেশান করেছি, সেই পেশেন্টের ক্যাটগাট সল্যুশান খুলে গেছে! গিয়ে দেখি ব্লিডিং হচ্ছে। প্রেশারও অনেক ফল করে গেছে ! কী যে ঝামেলা না... তোমাদের দিনটা নষ্ট করে দিলাম তো ?

ছন্দার ঠোঁটে হাসির রেখা,— আজ এমনিতেই যাওয়া হত না।

—ক্‌ক্‌ক্‌কেন ?

—টোটোর আজ সন্ধেবেলা বন্ধুদের সঙ্গে প্রোগ্রাম ছিল।

—তাই ? শুভাশিসের বুক থেকে পাথর সরে গেল,— দ্যাখ কাণ্ড ! আমি এদিকে ব্লু হেভেনে ছটফট করে মরছি। কোথায়, আমার ছেলে কোথায় ?

—তোমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, একটু আগে শুতে গেল।

—এত তাড়াতাড়ি ! সবে তো এগারোটা !

—সারাদিন হুড়োহুড়ি করে খুব টায়ার্ড। ডাকব ?

—থাক, কাল সকালেই... শুভাশিস ঠোঁট টিপল,— বুঝলে, ভাবছি টোটোকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

ছন্দা কোনও মন্তব্য করল না। ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে।

শুভাশিস পাশে গিয়ে দাঁড়াল—টোটোকে একটা দামি ক্যামেরা প্রেজেন্ট করব। লেটেস্ট মডেল। জাপানি। ফ্যান্সি মার্কেটে আমার একটা চেনা লোক আছে। ব্যাটা জেনুইন স্মাগলড্‌ গুডস সাপ্লাই করে। কি গো, ক্যামেরার আইডিয়াটা ভাল নয় ?

—ভালই তো। ছবি তোলার অভ্যেস তো ভালই।

—দেখো, তুমি আবার আমার প্ল্যান ফাঁস করে দিয়ো না।

রাত্রে শুভাশিসের ঘুম আসছিল না। চুপচাপ শুয়ে দু-নৌকোয় পা দেওয়া নিজের জীবনটার কথা ভাবছিল। মাঝেমধ্যেই ভাবনাটা ঘুরে ফিরে আসে, নষ্ট করে দেয় ঘুম। এই টানাপোড়েন আর কদ্দিন ? কোনওদিনই কি কোনও একমুখী চিন্তায় থিতু হতে পারবে না সে ? ইন্দ্রাণীকে ছেড়ে রাজনীতিতে গেল, সেখানেও দোটানা। আদর্শ বড়, না প্রেম বড় ? সমাজ বড়, না ব্যক্তি ? মহান আদর্শকে তখন মনে হল নীরস উচ্চাশা। আর স্বপ্ন যেন এক একবগ্গা ঘোড়া যার পিঠে সওয়ার হওয়ার ক্ষমতা নেই তার। তারপর ডাক্তারি আর ছন্দাকে নিয়ে যখন এক মসৃণ ভোঁতা জীবনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত শুভাশিস, তখনই আবার ফিরে এল ইন্দ্রাণী। আবার নতুন টানাপোড়েন। হয়তো বা তখনই একটা চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত, হয়তো শুভাশিস ছেঁটে ফেলত বালুরঘাটে রেখে আসা নতুন বউকে, হয়তো ইন্দ্রাণীও তার দু বছরের ছেলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসত, কিন্তু শুভাশিসের নিয়তি খণ্ডাবে কে ? পর পর কত কী যে ঘটে গেল। গুলিবিদ্ধ তনুময় সুস্থ হওয়ার আগেই নিখোঁজ হয়ে গেল শুভাশিসের ফ্ল্যাট থেকে ! বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সংবাদ এল শুভাশিসের সন্তান ধারণ করে বসে আছে ছন্দা ! ব্যস, আবার দোলাচল। ইন্দ্রাণী ততদিনে শামুকের মতো ফিরে গেছে নিজস্ব খোলে। এখানেও খেলাটা শেষ হতে পারত। হল না। একদিকে টোটো এল, অন্যদিকে সৃষ্টিরহস্যের নিয়ম মেনে এসে গেল তিতির। সম্পর্কের সুতোয় জট পড়ল আরও।

এই জট এখন শুভাশিস ছাড়ায় কীভাবে ? এ যেন এখন শুধু এক সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা। যার দুই প্রান্তই ডুবে আছে জলে। অথৈ জলে।

হঠাৎই শুভাশিসের হুঁশ ফিরল। ছন্দা এসেছে বিছানায়। একটি শব্দও উচ্চারণ না করে, একটুও প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে আচমকা শুভাশিসের শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উপোসি বাঘিনীর মতো আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, তোলপাড় করে দিচ্ছে শুভাশিসকে। নিজেই টান মেরে খুলে ফেলেছে রাতপোশাক। নগ্ন নারী হিংস্র কামে পুড়িয়ে মারতে চাইছে পুরুষকে।

শুভাশিসের শরীর তবু বরফপিণ্ড।

অন্ধকারে আরও গাঢ় অন্ধকার হয়ে ফুঁসছে ছন্দা,— কী নেই আমার মধ্যে ? কী নেই ? আজও কেন তুমি ওই মেয়েমানুষটার কাছে গিয়েছিলে ? কেন ? কেন ?...

১৫

জগৎ সংসারে সব ‘কেন’র উত্তর মেলা ভার। কিছু কিছু ‘কেন’ নিজে নিজেই হাত পা ধড় মুণ্ডু গজিয়ে বিকট আকার ধারণ করে। কিছু ‘কেন’র জন্ম হয় সমাজ সংসার মানুষের নিত্যনতুন চাহিদায়। আবার অজস্র ‘কেন’ শুরু থেকেই মোড়া থাকে কুয়াশার আবরণে, শেষেও তাই।

এত সব জটিল তত্ত্বকথা অবশ্য আদিত্যর মাথায় ঢোকে না, তবু মাঝে মাঝে ভাবনাগুলো তার কাছে আসে বইকি। আসতেই থাকে। অবিরল ঢেউএর মতো। সামুদ্রিক ফেনা হয়ে প্রশ্নেরা বুকে ছড়িয়ে থাকে। যে আদিত্যকে একটি দিনের জন্যও ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে বলেনি ইন্দ্রাণী, সেই আদিত্যকে হঠাৎ কেন ইন্দ্রাণী চাপিয়ে দিল তিতিরকে এগারো ক্লাসে ভর্তি করার দায়িত্ব? এই যে বাপ্পা আজ ইন্টারভিউ দিতে চলে যাবে দু হাজার কিলোমিটার দূরের এক শহরে, কেনই বা তাই নিয়ে আদিত্যর সঙ্গে একটি বারও আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করল না ইন্দ্রাণী? ছেলে চলে যাওয়ার চিন্তায় ইন্দ্রাণী যে ভেতরে ভেতরে গুমরোচ্ছে, এ কথা কি আদিত্য বোঝে না? খুব বোঝে। তবু তার সামনে কেন এতটুকু হালকা হয় না ইন্দ্রাণী?

রঘুবীর প্রশ্ন করল, —হল কী রায়দা, এত কি ভাবেন?

ঝমঝম বৃষ্টি ঝরে চলেছে বাইরে। চায়ের দোকানের বেঞ্চি থেকে ফুটো হয়ে যাওয়া আকাশটার দিকে তাকাল আদিত্য, —ভাবনার কি আর শেষ আছে রে ভাই?

—কেন, মেয়ের অ্যাডমিশন তো হয়ে গেছে?

—তা হয়েছে। তবু নতুন স্কুল, অচেনা পরিবেশ, আমার ভীতু মেয়েটা ঠিক মতো মানিয়ে নিতে পারবে কিনা...

রঘুবীর ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক মারল। হাসছে ফিক ফিক,—এত সব চিন্তা আপনি করেন?

—না করলে কি আর গিন্নি মেয়েকে ভর্তি করার ভার আমার ওপর ছেড়ে দেয়! আদিত্য দায়িত্বশীল পিতার হাবভাব আনল মুখে, —কী হ্যাপা যে গেল রে ভাই! ঘুম থেকে উঠেই ছোটো, ভর্তির ফর্মের জন্য বিশাল বিশাল লাইনে দাঁড়াও, সাত জায়গায় ঘুরে ঘুরে কোথায় মেয়ের নাম উঠল দেখে বেড়াও, এসব কি চাট্টিখানি কথা! কোথাও যদি আজ লিস্ট বেরোয়, তো কোথাও বেরোয় দশ দিন পর। একটা কোনও জায়গা টার্গেট করে বসে থাকলে...

—যাক গে, ঝামেলা তো চুকেছে। রঘুবীর আদিত্যর উচ্ছ্বাস থামাতে চাইল।

আদিত্য থামল না, —চুকেছে, কিন্তু প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছে। মেয়ে যে স্কুলে ভর্তি হতে চায়, তাদের লিস্ট বেরোল সব্বার শেষে। তা সেখানে ফার্স্ট লিস্টে মেয়ের নাম নেই। মাঝখান থেকে যে দুটো কলেজে নাম উঠেছিল, সেগুলোতেও অ্যাডমিশানের ডেট পার। তারপর সে যে কী টেনশান! মেয়ে মুখ কালো করে বসে আছে...

—মেয়ে ওখানে ভর্তি হতে পারল না? কোথায় হল তবে?

—নাহ, মেয়ের আমার লাক ভাল। সেকেন্ড লিস্টে নাম উঠেছে। গতকাল টাকাপয়সা জমা দিয়ে ভর্তির পালা সাঙ্গ করে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

আদিত্য সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে টান মারল। বৃষ্টিবাদলার বাজারে চায়ের দোকান প্রায় ফাঁকা। নটা বাজতে যায়, সকালটা তবু যেন আজ এগোতেই চাইছে না। পথঘাটের কোলাহলেও এক ধরনের নির্জীব আলস্য। আদিত্য অলস মেজাজে বলল, —আমি কোথায় মেয়ের রেজাল্ট দেখে ভাবলাম, যেখানেই যাবে মেয়ে আমার তুড়ি মেরে ভর্তি হয়ে যাবে। ও বাবা, গিয়ে দেখি সব বাপ-মা'র ছেলেমেয়েই ঝুড়ি ঝুড়ি নম্বর নিয়ে ঘুরছে। তাতেও কারুর তৃপ্তি নেই! এত এত নম্বর সব পায় কী করে বলুন তো?

—না পেয়ে উপায় আছে, বাপ মা'রা যা খাটায় ছেলেমেয়েদের! রঘুবীর সুজির বিস্কুট চিবোচ্ছে কচকচ, —বুলি ফুটতে না ফুটতেই হালে জুতে দিচ্ছে। তারপর শুধু টানো আর টানো।

পলকের জন্য অ্যাটমের কচি মুখটা আদিত্যর মনে পড়ে গেল। রুনা যে কি করে ছেলেটাকে নিয়ে ! একটুখানি আকাশের দিকে তাকানোরও ফুরসত নেই বেচারার। দীপুটাও কিছু বলে না ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে আদিত্য বিড়বিড় করল,—কেন যে এত খাটায় ! কেন যে এত খাটায় !

—কোনও বাপ মা'ই আজকাল আর ছেলেমেয়েদের ছাপোষা গেরস্থ দেখতে চায় না রায়দা। সব্বাইকেই বড় বড় চাকরি করতে হবে, লাখ লাখ টাকা কামাতে হবে, কথায় কথায় বিলেত আমেরিকা ছুটতে হবে...

এই ব্যাপারটাতেই আদিত্যর কেমন ধন্দ লাগে। সবাই যদি এক নম্বর হয়ে যায়, তবে দু নম্বর তিন নম্বর থাকবে কারা ? কিংবা কে জানে, এরপর হয়তো আর নিচের তলা, অগা বগা বলে আর কিছু থাকবেই না দুনিয়ায়। পণ্ডিত আর বিজ্ঞানীতে গিজগিজ করবে চারদিক। আচ্ছা, এমন একটা পৃথিবী যদি হয়ও, সেখানে বাপ্পা তিতিরের জায়গা থাকবে কোথায় ? বাপ্পা রাশি রাশি টাকা আনছে ঘরে, তিতির জিনস টিশার্ট পরে গটগট অফিস যাচ্ছে, খটাখট কম্পিউটার চালাচ্ছে, প্লেনে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে হিল্লি দিল্লি...

নাহ, তিতিরকে নিয়ে অন্তত তেমন কিছু আদিত্য ভেবে উঠতেই পারে না। স্কুলকলেজ পাশ করে একদিন তাকে কাঁদিয়ে মেয়ে চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি, হাতে হলুদের ছোপ, কপালে ডগডগে সিঁদুর নিয়ে ঘরদোর সামলাবে, কচি কচি নাতিনাতনি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে আদিত্যর কোলে, এই না যথেষ্ট ! ইন্দ্রাণীও কি এইটুকুতেই সন্তুষ্ট ? মনে হয় না। এত অল্পে খুশি হলে কি ছেলেকে অত দূরদেশে যাওয়ার জন্য এক কথায় ছেড়ে দিতে পারত !

সহসা বাইরের ঝমঝম বর্ষা সেঁধিয়ে গেল আদিত্যর বুকে। পক্ষীমাতার মতো কোন শিশুকাল থেকে বাপ্পাকে শুধু নিজের করে আগলে রেখেছে ইন্দ্রাণী। বাপ্পাও বাবাকে তেমন পছন্দ করে না, আদিত্য জানে। তবু এক সর্বগ্রাসী টান হঠাৎ কেন যে আদিত্যর বুকের মাঝে চারিয়ে যায়। হা হা করে ওঠে সমস্ত অস্তিত্ব ! এই অনুভূতির নামই কি অক্ষম পিতৃত্ববোধ !

ভাবনার চিমটিটা থেকে আদিত্য ছাড়াতে চাইল নিজেকে। কেজো গলায় রঘুবীরকে জিজ্ঞাসা করল,— আমরা তাহলে কখন যাচ্ছি আজ ?

রঘুবীর বিড়ি ধরিয়েছে, —ঠিক সাড়ে বারোটায় পৌঁছতে হবে।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে গেছেন ?

—পেয়েছি বলেই না বৃষ্টি মাথায় করে সেই দমদম থেকে ছুটে আসা।

—গিয়ে লাভ হবে কিছু ?

—মানে ! আরে, এ হল রোড কন্ট্রাক্টরির ব্যবসা। পাঁচ টাকার কাজে পঞ্চান্ন টাকা লাভ।

—কিন্তু সে কাজ আমাদের দেবে কেন ? আপনিই তো বলছেন লোকটা পার্টির লোক...

—শুধু পার্টির লোক নয়, মন্ত্রীর ডান হাত। যখন তখন দরজা ঠেলে মন্ত্রীর ঘরে ঢুকে যায়।

—নয় তাই হল। কিন্তু আমি তো পার্টি টার্টি করি না...

—দূর মশাই, কাজ দেওয়ার জন্য পার্টি লাগে নাকি ? কাজ দেবে, কমিশন নেবে, ঢুকে গেল। তবে যাকে কাজ দেবে তাকেও মোটামুটি চেনাজানা বিশ্বস্ত হতে হবে, তাই না ! আর তার জন্য তো আমিই আছি।

আদিত্যর খুঁত খুঁত ভাব তবু যায় না, —লোকটার সঙ্গে আপনার সত্যিই পরিচয় আছে তো ?

—আরে বাবা, কত বার বলব ? বলছি তো আছে। দু দিন-চার দিনের নয়, আজ বিশ বছরের পরিচয়। ওর হাড়হদ্দ সব আমার নখের ডগায়। রঘুবীর দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে চকচক হাসছে, —নকশাল আমলে লোকটা ছিল পুলিশের খোচড়। তারপর মা জননীর ভক্ত সেজে পাঁচ বছর কাটিয়েছে। তারপর যেই দেখেছে ডামাডোল, অমনই বেনো জল হয়ে লাল রঙে মিশিয়ে নিয়েছে নিজেকে। লোকটার ঘ্যাঁতঘোত জানি বলেই না এত খাতির আমার ! গিয়ে দেখবেন কেমন আমার দেওয়া দেড় রতির পান্না ধারণ করে আছে আঙুলে।

আদিত্যর তবু ঠিক বিশ্বাস হয় না। এই রঘুবীর লোকটার সঙ্গে তো কম দিন ঘুরল না, কিন্তু কি লাভ হয়েছে আজ পর্যন্ত ? শুধু হঠাৎ তেতে উঠে বাবার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়া ছাড়া ? হাসপাতাল থেকে ফেরা ইস্তক কোথায় না নিয়ে গেছে লোকটা ! ক'দিন তো ইস্টার্ন বাইপাসে নিয়ে গিয়ে দিনভর চরকি খাওয়াল। কি, না জমিগুলো দেখে রাখুন রায়দা, আমি মালিকদের ঠিকানা বার করছি। পার্টি ফিট করব আর টপাটপ বেচে যাব। কমিশন সবটাই আপনার। হা হতোস্মি। কেনার লোক তো দূরের কথা, একটি মালিকের নাম ঠিকানাও খুঁজে বার করা গেল না। মাঝখান থেকে জমির স্থানীয় দালালরা ক্রূর চোখে দাড়িওয়ালাকে জরিপ করল কয়েকদিন, তারপর একদিন মাঠের মাঝে চড়াও হয়ে শাসিয়ে গেল দুজনকেই। আর স্টোনের ব্যবসা ! তার কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল। প্রথমে বলল, আপনাদের বড় ঘরটা দিন, জ্যোতিষ কার্যালয় খুলব। বাবাকে খুব ভুজুং ভাজুং দেওয়ার চেষ্টা করল। অর্জুন গাছের ছাল, শ্বেতবিড়ালার মূল, আপনি একশো বছর বাঁচবেন, কত কি গ্যাস খাওয়ানো ! জানে না তো, ওই দুঁদে বুড়ো কী মেটিরিয়ালে গড়া ! যেই একদিন জোর হাঁপের টান উঠল, ওমনি দুর দুর করে দিল ভাগিয়ে। তারপর শুরু হল বাবুর নতুন বায়নাক্কা। একটা ভাল চেম্বার না খুললে স্টোনের ব্যবসা ভাল জমে না রায়দা। একটা চেম্বারের ব্যবস্থা করুন, আমি ক্রেডিটে পাথর এনে আপনার দোকান সাজিয়ে দিচ্ছি। পার্টি ধরে স্টোন গছানোর দায়িত্বও আমার। কোথায় এখন আদিত্যর টাকা ঝলঝলাচ্ছে যে দশ বিশ হাজার টাকা খরচা করে জ্যোতিষালয় খুলবে ! এদিকে নিজে তো ঠিক টুকটাক মক্কেল ধরে পাথর ধারণ করিয়ে চলেছে !

তবে লোকটার যে অনেক কেষ্টবিষ্টুর সঙ্গে পরিচয় আছে, এ কথাও আদিত্য অস্বীকার করতে পারে না। বেশ কয়েক জন হাই-ফাই ব্যবসায়ীর ঘরে আদিত্যকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে রঘুবীর। আদিত্য দেখেছে, তারাও বেশ খাতির করে কথা বলে জ্যোতিষী রঘুবীরের সঙ্গে। পুলিশের দুজন ডিসির বাড়িতেও রঘুবীরের অবাধ যাতায়াত। ওই পান্না চুনীর সুবাদেই।

আদিত্য দোনামোনা করে বলেই ফেলল, —দেখুন ভাই, অনেকগুলো দিন তো চলেই গেল। যদি কিছু হয় তো বলুন, নইলে আবার মান লজ্জা খুইয়ে প্রেসটার দেখাশুনাতেই নেমে পড়ি।

—আপনি আমার ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন রায়দা ! আমি বলে আপনার জন্য হন্যে হয়ে ছুটে মরছি... কোথায় এমন বৃষ্টিবাদলার দিনে মাসিতে আমাতে ঘরে বসে অফিসবাবুদের মতো খিচুড়ি তেলেভাজা খাব, তা নয় এমন দুর্যোগেও শুধু আপনাকে খবর দেওয়ার জন্য...

—আহা, অভিমান করেন কেন ? আদিত্য রঘুবীরের হাত চেপে ধরল, —কিছুই যে গুছিয়ে ওঠা যাচ্ছে না ভাই।

—এবার যাবে।

—কী করে যাবে ? রাস্তা সারানোর কনট্রাকটারিরই বা আমি কী বুঝি ?

—আপনার তো বোঝার দরকার নেই। কত বার তো বললাম, কাজ বুঝবে সেই ঠিকাদার যে আদতে কাজটা করবে। রাস্তায় লোক খাটাবে। আমাদের কাজ হবে শুধু গভর্নমেন্টের কাছ থেকে অর্ডারটি বাগানো, আর ওই ঠিকাদারের হাতে অর্ডারটি তুলে দেওয়া। আর গুনে গিঁথে ভাগের টাকাটি ঘরে তুলে আনা।

—এত সহজে টাকা রোজগার হবে ?

—হবে হবে। আপনি শুধু গভর্নমেন্টের খাতায় একবার নামটা এনলিস্টেড হয়ে যেতে দিন। রঘুবীর এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু গলা নামাল,—আবার সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাঅলা ছেলেটাকে পুরো ফিট করা হয়ে গেছে। ব্যাটা কাল অবধি দশ পারসেন্টের কমে রাজি হচ্ছিল না, অনেক রাত পর্যন্ত বাবা বাছা করে সাত পারসেন্টে নামিয়েছি। খুব চালু মাল। বুঝে গেছে, ওর ওই ডিপ্লোমার চোথা কাগজটি না দেখাতে পারলে আমাদের এনলিস্টমেন্ট হবে না। শালা এদিকে একটা কারখানায় কাজও করছে, আবার উপরিরও লোভ ষোলো আনা। তা থাকুক,

সাত পারসেন্ট শেয়ারেই থাকুক। বাকি তিরানব্বই তো আপনার আমার।

—তিরানব্বই নয়, যে কাজ দেবে তার ভাগটাও ধরুন।

—হুম। কাজ দেবে, ন্যায্য পাওনা তো নেবেই। তবে একটা কথা রায়দা, আপনাকেও কিন্তু মাঝে মধ্যে সাইটে যেতে হবে।

—সাইট মানে তো উদয়নারায়ণপুর ?

—এখন আপাতত উদয়নারায়ণপুর। ওখানেই মাইল পাঁচেকের কাজ পেলে জীবন কেটে যাবে।

—যাহ্, পাঁচ মাইল আর ক'দিনের কাজ ?

—আপনি এখনও সত্যযুগে পড়ে আছেন রায়দা ! পাঁচ মাইল রাস্তা শীতে শুরু করে বর্ষার আগে শেষ করবেন। বর্ষায় রাস্তা ধুয়ে যাবে, আবার শীতে শুরু করবেন। এইভাবেই বর্ষা আর শীত, বর্ষা আর শীত খেলতে খেলতে জীবন কেটে যাবে। রঘুবীর চোখ ছোট করল,—কনট্রাক্টারদের যদি কাজেই না লাগে তাহলে ভগবান কষ্ট করে বর্ষা আর শীত দুটো আলাদা ঋতুর সৃষ্টি করতে গেলেন কেন ?

আদিত্য চুপ করে গেল। টাল খাওয়া বিশ্বাসটা ফিরতে চাইছে না। রঘুবীরের ওপর আর এক বার নির্ভর করে দেখবে ? কিন্তু কাজটা কি এতই সোজা ! একটা কোম্পানি খাড়া করে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্টের খাতায় নাম উঠে গেল, কাজ আসতে লাগল ? তাই যদি হয় তবে যে কোনও লোকই তো এভাবে কমিশন খাইয়ে একটা ব্যবসা শুরু করে দিতে পারে !

রঘুবীর উঠে দাঁড়িয়েছে, —আপনি তাহলে ঠিক বারোটায় চলে আসছেন তো ?

আদিত্য অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল।

—কোথায় দাঁড়াবেন মনে আছে ? রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পশ্চিম গেটে। আমি বীরেনবাবুকে নিয়ে ঠিক বারোটায় কিন্তু ওখানে চলে আসছি।

বৃষ্টি একটু ক্লান্ত হয়েছে। ছাই রঙ মেঘে তবু ছেয়ে আছে আকাশ, বিরতির অবকাশে গুড়গুড় তামাক টানছে। ছিরছির জল ছিটিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে রিকশাবাহিনী। মানুষজন দ্রুত পায়ে গন্তব্যের দিকে চলেছে। একটা ভেজা কাক এসে চায়ের দোকানের চালে বসল। ক্ষুধার্ত স্বরে চিৎকার করছে। আর এক কাপ গরম চা খেতে খেতে আদিত্য রুনাকেও দেখতে পেল। ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরছে। রঙিন ছাতার আড়াল থেকে আড়চোখে তাকাচ্ছে চায়ের দোকানের দিকে। আদিত্যর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ছাতায় ঢেকে নিল মুখ।

বাড়ি ফিরে আদিত্য আগে ঝটপট দাড়িটা কামিয়ে নিল। স্নান খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে দেখল বাপ্পা ফিরেছে। দীপুর কাছ থেকে চেয়ে আনা স্যুটকেসে সদ্য কেনা ব্রাশ পেস্ট সাবান টুকিটাকি ওষুধপত্র ভরছে। ছোট্ট স্যুটকেস জামাকাপড়ে বোঝাই। কাল রাত্রেই সব গুছিয়ে দিয়েছিল ইন্দ্রানী, এখন খোলার পর বাক্সটাকে ঠিক মতো কবজা করতে পারছে না বাপ্পা। তাই দেখে তিতির মুখ টিপে হাসছে।

আদিত্য বলল, —সর, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

তিতির জোরে হেসে উঠল, —হাত দিয়ো না বাবা, ও কাউকে স্যুটকেস ছুঁতে দিচ্ছে না। আমি বললাম হাঁটু দিয়ে চেপে দিচ্ছি, তুই লাগা...

—অ্যাই, ফ্যাচোর ফ্যাচোর করিস না তো ! বাপ্পা কড়মড় করে উঠেছে, —হট সামনে থেকে।

আদিত্য নরম গলায় বলল, —তোর ট্রেন কটায় রে ?

—দুটো পঞ্চাশ। বাপ্পা আদিত্যর দিকে তাকাল না।

—কখন বম্বে পৌঁছবে ?

—টোয়েন্টি এইট আওয়ার্স লাগে। হিসেব করে নাও।

—ওখানে গিয়ে কোথায় উঠবি কিছু ঠিক করেছিস ?

—রাস্তায় থাকব না।

—দেখিস, স্টেশনের পাশের হোটেলগুলো বেশির ভাগ কিন্তু চোর হয়।

—হুঁহ। সব জায়গাই কি তোমাদের কলকাতার মতো ?

—তা নয়। তবু সাবধান করার জন্য বলা।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ছেলে বিরক্ত হচ্ছে বোঝা যায়, তবু আদিত্যর ছেলের সঙ্গেই কথা বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। আসন্ন যাত্রার উত্তেজনায় টানটান বাপ্পার মুখটা দেখে কেমন যেন মায়া জাগছিল তার। আলমারি খুলতে খুলতে ফের প্রশ্ন করল, —নিজের তালাচাবি নিয়েছিস তো ? হোটেলের তালাচাবি ব্যবহার করবি না।

—হুঁ।

—ফিরছিস কবে ?

—কাজ শেষ হলে।

—দু-একদিন বেশি থেকে যেতে পারিস। জুহু বিচ, মালাবার হিল...কত সুন্দর সুন্দর বেড়ানোর জায়গা আছে...মহাবালেশ্বর, খাণ্ডালা...

—আমি বেড়াতে যাচ্ছি না।

—তবু যদি সময় পাস...আদিত্য আর কথা বাড়ানোর ভরসা পেল না। আলমারির ড্রয়ারে হাতখরচ রেখে দেয় ইন্দ্রাণী, সেখান থেকে গোটা কুড়ি টাকা পকেটে পুরল। বেরোনোর আগে বাপ্পার পাশে এসে দাঁড়াল কয়েক সেকেন্ড। সঙ্কুচিতভাবে হাত রাখল ছেলের মাথায়, —সাবধানে যাস। দুর্যোগের দিন...বুঝিসই তো তোর মা এখানে...

কথা অসমাপ্ত রেখেই পথে নামল আদিত্য। আবার বৃষ্টি আসছে। আকাশ ঘন হয়ে ঝুলে আছে বহুতল বাড়িগুলোর মাথায়।

ছাতা হাতে হনহন পা চালাচ্ছে আদিত্য। বৃষ্টি নামার আগেই বাসে উঠে পড়তে হবে। বাস রাস্তার কাছাকাছি আসতেই সামনে কন্দর্প। আপাদমস্তক বর্ষাতিতে মুড়ে ফিরছে স্কুটারে। আদিত্যকে দেখে থামল, —বেরোচ্ছ কোথায় ? চারদিকে তো জল জমে গেছে।

—কাজ আছে রে। যেতেই হবে।

—পারো তুমি। এমন দিনেও তোমার কাজ ? কন্দর্প স্কুটার রাস্তার ধারে সরাল,—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল দাদা।

—ফিরি। রাত্রে শুনব।

কন্দর্প দু-এক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,—কথাটা খুব আরজেন্ট।

—আরজেন্ট তো সকালে বলিসনি কেন ? চা খেতে খেতে দোতলায় এলি...

—কথাটা বাড়িতে বলা যাবে না দাদা। কন্দর্প স্ট্যান্ড নামিয়ে স্কুটার ভাল করে দাঁড় করাল, —আমাদের সামনের সান্যাল বাড়িটা ভাঙা হয়েছে, দেখেছ ?

—হ্যাঁ দেখেছি। কেন ?

—যে লোকটা ওখানে ফ্ল্যাট বানাচ্ছে তাকে চেনো ?

—চিনি মানে দেখেছি। লোকটা নাকি ফিল্ম লাইনেরও লোক। আদিত্য এক গাল হাসল, —তোর সঙ্গে আলাপ আছে ?

—এতক্ষণ তো ওর সঙ্গেই ছিলাম। আমি ওর একটা ফিল্মে কাজ করছি।

—বাহ। আদিত্য ঘড়ি দেখছে। আকাশটাকেও।

—অশোকদা মানে ওই ভদ্রলোকের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল। কন্দর্প ঢোঁক গিলল, —অশোকদা আমাদের বাড়িটাও চায়। ভেঙে ফ্ল্যাট বানিয়ে দেবে।

আদিত্য হকচকিয়ে গেল। দীপু একবার হাসপাতালে বাড়ি ভাঙার কথা বলেছিল বটে, ইন্দ্রাণী

নিষেধ করায় এই নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি সে। দীপুও নতুন করে কথাটা তোলেনি। এখনও সেই ভাঙাভাঙির ভাবনাচিন্তা চলছে নাকি ?

আদিত্য ভুরু কুঁচকে তাকাল, —তো ?

—বাবার কাছে কথাটা কি করে পাড়া যায় ?

—তা আমি কী করে বলব !

—না মানে মেজদা মাঝে একটা খিঁচ বাধিয়ে রেখেছে তো। কি একটা প্রোমোটার ধরে এনেছিল, বাবা তাকে হুট আউট করে দিয়েছে। এখন আমার বলতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?

—এই কথার জন্য তুই আমাকে দাঁড় করিয়েছিস ?

কন্দর্প আদিত্যর হাতে হাত রাখল, —দ্যাখো দাদা, যে যাই বলুক, আমি জানি বাবার আসল উইকনেস হচ্ছ তুমি। বাবাকে তুমি যদি চেপে ধরো, বাবা জেদ রাখতে পারবে না।

—বাজে কথা। বাবা আমাকে দেখতে পারে না। আদিত্য চোখ সরু করে দেখছে ভাইকে, —তাছাড়া আমি বলতে যাবই বা কেন ? আমি তো বাড়ি ভাঙা চাই না।

—চাইবে না কেন ? ওই তো এখন বাড়ির ছিরি ! কোনও মেনটেনেন্স নেই, কলি ফেরানোর পয়সা নেই, ভাগের মা গঙ্গা পায় না দশা ! নতুন বিল্ডিং হলে একটা ঝকঝকে থ্রিরুম ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে। মোজাইক করা। সঙ্গে কিছু করকরে টাকাও।

—আমার ফ্ল্যাটবাড়ি ভাল লাগে না রে। কিরকম বস্তি বস্তি মনে হয়।

—টাকাটার কথা ভাবো। অন্তত লাখ খানেক করে দেবে। ক্যাশ। ওই টাকায় তুমি নতুন বিজনেস শুরু করতে পারো।

মুহূর্তের জন্য দোদুল্যমান হল আদিত্য। লাখ টাকা ! পরমুহূর্তেই সংবিৎ ফিরেছে। যে বাড়িতে মানুষ জন্মায়, বড় হয়, প্রতি পলে যে বাড়ি থেকে নিশ্বাস নেয়, তার ইট কাঠ বালি সিমেন্ট লোহা সবই তো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতো হয়ে যায়। আদিত্য চোখ বুজে বলে দিতে পারে তাদের বাড়ির কোথায় কটা দাগ আছে, দাদু ঠাকুমার মৃত্যুচিহ্ন হিসেবে কোন ঘরের মেঝেতে পেরেক পোঁতা আছে, সুদীপ আর সে ছোটবেলায় বল মেরে প্যাসেজের ঠিক কোন জায়গাটার ছালচামড়া তুলে দিয়েছিল একেবারে। আর আদিত্যর মা'র স্মৃতি তো লেপেজুপে আছে গোটা বাড়িতেই।

রাগত স্বরে আদিত্য বলল, —টাকার লোভ দেখাস না চাঁদু। নিজেদের বাড়ি হল নিজেদেরই শরীর, তাকে ভেঙে ফেলার কথা কী করে যে ভাবতে পারিস তোরা !

—শরীরও অনন্তকাল থাকে না দাদা। পরমায়ু ফুরোয়। বাড়িও একদিন ভাঙা পড়বেই। আজ, না হয় কাল।

—সে যখন হবে, তখন দেখা যাবে।

—যখন নয় দাদা, শিগগিরিই হবে। তুমি কি ভাবছ, মেজদা মেজবউদি এভাবে হাটের মাঝে থাকা চিরকাল মেনে নেবে ? একবার যখন মেজদা প্ল্যান করেছে, তখন বাড়ি ভাঙবেই। আর মেজদার নিও বিল্ডার্স যদি কাজটা পেতে পারে, তাহলে তুমি বলো, হোয়াই নট অশোকদা ? মেজদা কি সব ব্যাপারে ফেয়ার ডিলিংস করে ? নিজেরা সব থেকে ভাল ঘর দুটো নিয়েছে, দোতলার বড় বারান্দাটা নিয়েছে, বড় ভাই হিসেবে তোমার কি ওটা প্রাপ্য ছিল না ? তোমার আমার ঘরে ভাল মতন আলো-বাতাস ঢোকে ?

—তুই তো বেশ প্যাঁচালো হয়ে গেছিস চাঁদু !

—প্যাঁচালো নয়, প্র্যাকটিক্যাল। চোখ কান খোলা রাখা মানুষ।

—তা এতই যদি মরিয়া ইচ্ছে, নিজে গিয়ে বাবাকে বল। মুরোদে না কুলোয় তোর বউদিকে দিয়ে বলা।

—না না বউদি নয়। কন্দর্প যেন শিউরে উঠল, —তুমি প্লিজ বউদিকে এসব কথা বোলো না।

—কেন, বউদি নয় কেন ? এত ভাব তোদের...

—ও তুমি বুঝবে না। যতই হোক বউদি বউদিই। তুমি দাদা, দাদা। ব্লাড রিলেশান। কন্দর্প তোতলাচ্ছে, —আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কথা, এর মধ্যে বউদিকে টানা ঠিক নয়।

—আসল কথা বল তোর বউদিকে তুই ভয় পাস। আদিত্য হেসে ফেলল, —আমিও পাই রে।

কন্দর্প হাত কচলাল, —তাহলে তুমি বাবাকে বলছ ?

—বললাম তো আমি বাড়ি ভাঙা চাই না, আমি কেন বলব ?

—আমাদের জন্য বলবে। তিতির বউদি বাপ্পার কথা ভেবে বলবে। বাবা মারা গেলে বাড়ি ভাঙা হবেই, কিন্তু তখন মেজদা কনট্রোল নিয়ে নেবে। কি ডিল করবে, কোথায় আমাদের ল্যাঙ মারবে, তুমি টেরও পাবে না। আর অশোকদা করলে, আমাদের দিক আগে টানবে।

—দীপুকে তাহলে তখন ঠকানো যাবে বলছিস ? আদিত্যর মুখ তেতো হয়ে গেল। একটি কথাও আর বলতে শুনতে ভাল লাগছিল না তার। কন্দর্পের পিঠে আলগা চাপড় মেরে বলল, —ঠিক আছে, একটু ভাবি। বাড়ি বলে কথা ! বলেই দ্রুত হাঁটা শুরু করেছে।

বেশ কয়েক পা এগিয়ে আদিত্য ঘুরে তাকাল একবার। কন্দর্প নড়েনি। স্কুটারের পাশে স্থির দাঁড়িয়ে। তাকেই দেখছে।

১৬

রঘুবীরের দীর্ঘ কাঠামো বউবাজার স্ট্রিটের জনারণ্যে মিশে যাওয়ার পর আদিত্য স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার ডেরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব ঝুলোঝুলি করছিল রঘুবীর, বহু কষ্টে কাটিয়েছে। আগেও বার কয়েক নিয়ে যেতে চেয়েছে, যাব যাব করেও আদিত্যের যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বাব্বাহ্, মধুগড় কী কম দূর ! শেয়ালদা থেকে ট্রেনে দমদম, সেখানে থেকে নাকি আধঘণ্টার হাঁটা পথ ! ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে আদিত্যর।

আজ রঘুবীর খুব খোশমেজাজে আছে। এনলিস্টমেন্ট হতে যদিও এখনও অনেক দেরি, তবে চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। রঘুবীরের লোক একটি চিঠি জোগাড় করে দিয়েছে। মন্ত্রীর খাস সহকারীর হাতচিঠি। এই চিঠি নিয়ে রঘুবীর যাবে উলুবেড়িয়া, সেখানে যেন কার কার সঙ্গে দেখা করে বাকি বন্দোবস্ত সারবে। ইতিমধ্যে আদিত্যরও কিছু কাজ থাকবে কলকাতায়। ট্রেড লাইসেন্স করানো, পার্টনারশিপ ডিডের কাগজপত্র তৈরি, আয়কর বিভাগের সার্টিফিকেট জোগাড় করা, এই সব। এতগুলো ধাপ বাকি তবু চিঠি একটা হাতে পেয়েই রঘুবীরের কী উচ্ছ্বাস ! পারলে এখনই রাস্তায় রোডরোলার নামিয়ে দেয়।

আদিত্যও খুশি, তবে রঘুবীরের সঙ্গে মাতামাতি করার মতো মনমেজাজ নেই আজ। একে ছেলেটা চলে গেল, তার ওপর আসার পথে কন্দর্পের ওই সব মতলবি কথাবার্তা, নাহ্, মনটাই খিঁচড়ে গেছে বড়।

আজকাল মাঝে মাঝেই এরকম হচ্ছে আদিত্যর। কোনও কারণে মন একটু খারাপ হতে শুরু করলেই ক্রমশ এক অবসাদে ছেয়ে যেতে থাকে শরীর। কিছুই আর ভাল লাগে না তখন। খুশির খবরও না।

দুপুর অবধি ঝরে ঝরে এতক্ষণে ক্ষান্ত হয়েছে আকাশ। মনে হয় বর্ষণের পালা আজকের মতো শেষ। মেঘেরা তাঁবু গোটাচ্ছে। এক চিলতে বিষণ্ণ সূর্যও বুঝি দেখা গেল। বর্ষাবিকেলে অফিসপাড়ার ব্যস্ততায় কেমন স্যাঁতানো ভাব। গুটি গুটি ভিড় বাড়ছে বাসে ট্রামে।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সামনে থেকে ঢাকুরিয়ার মিনিবাসে উঠবে বলে এগোচ্ছিল আদিত্য। মন্থর পায়ে। জি পি ও-র সামনে এসে কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়ি ফিরেই বা এখন কী লাভ ?

দিব্যচক্ষে আদিত্য দেখতে পাচ্ছে, ঘর আঁধার করে শুকনো মুখে বসে আছে ইন্দ্রাণী, মনে মনে হিসেব করছে বাপ্পা এখন কত দূরে, তিতিরও নিশ্চয়ই বিকেলে বেরিয়েছে এদিক ওদিক, দীপুদের ঘর

আগল তোলা, নীচে বাহান্নটা তাসের সঙ্গে একা একা পাঞ্জা লড়ে চলেছে বাবা, দুর্লভদেরও ঝাঁপ ফেলার সময় হয়ে এল। কার কাছে এখন ফিরবে আদিত্য ! কেনই বা ফিরবে ?

হঠাৎ শংকরের কথা মনে পড়ে গেল আদিত্যর। হাসপাতালে তাকে দেখতে জয়শ্রীর সঙ্গে শংকর এসেছিল একদিন, তারপর অনেক কাল আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। শংকর শ্বশুরবাড়ি বড় একটা আসে না, আদিত্যই বরং অবরে-সবরে যায় বোন ভগ্নীপতির বাড়ি। বোনের থেকেও ভগ্নীপতির সঙ্গে তার হৃদ্যতা বেশি।

জয়শ্রী যখন শংকরের মতো সামান্য এক মোটর মেকানিককে বিয়ে করেছিল, তখন আদিত্যও চটেছিল খুব। কিন্তু রাগ ধারণ করে রাখা তার ধাতে নেই, ইন্দ্রাণীর গোপন পীড়াপীড়িতে সেই প্রথম যোগাযোগ করে বোনের সঙ্গে। লুকিয়ে লুকিয়ে শোভনার দেওয়া টাকা গয়নাও পৌঁছে দিয়ে আসত বোনকে। শংকরও তখন তাকে খাতির করত খুব, আসুন দাদা, বসুন দাদা করে তোয়াজ করত। এখনও যে করে না তা নয়, তবে শংকরের এখন ভোল পাল্টে গেছে। বারারবই সে করিৎকর্মা ছেলে, মোটর গ্যারেজে কাজ করতে করতেই এক বড় অফিসারকে জপিয়ে ঢুকে পড়ল তেল কোম্পানিতে। প্রথমে পিওন হয়ে চাকরির শুরু, তারপর বছর তিনেকের মধ্যে নাইট কোর্সে পড়ে ফিটারের সার্টিফেকেট জোগাড় করে ফেলল। আর তাকে পায় কে ! তেল কোম্পানির পেট্রল পাম্পে ঘুরে ঘুরে মেশিনপত্র সারাইয়ের কাজ তার, পাম্প মালিকদের দৌলতে তার হাতে এখন প্রচুর কাঁচা টাকা। কেষ্টপুরে একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। জয়শ্রী মাঝে মাঝেই এসে ইন্দ্রাণী রুনাকে নিত্যনতুন শাড়ি গয়না দেখিয়ে যায়। গত বছর শংকর সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িও কিনেছে একটা। ভাড়া খাটায়।

শংকরের অফিস কাছেই, কিন্তু বাইরে ঘুরে কাজ তার, তাকে কি এখন অফিসে পাওয়া যাবে ! গিয়ে একবার দেখলে হয়।

না, আদিত্যর কপাল ভাল। শংকর আছে অফিসে। ভীষণ ব্যস্তভাবে তোড়জোড় করছে বেরোনোর। আদিত্যকে দেখেই বলে উঠল,— আরে দাদা, আপনি ! চলুন চলুন, রোদ উঠে গেছে।

আদিত্য অবাক হল,— রোদ ! কোথায় ? এই তো বৃষ্টি থামল।

— বৃষ্টি থামা মানেই রোদ ওঠা। সকাল থেকে যা ঢালছিল আজ ! ভাবলাম বুঝি বানচালই হয়ে গেল।

—কী বানচাল ?

—ম্যাচ। ঝান্টুর আজ প্রথম বড় টিমের সঙ্গে খেলা। ইস্টবেঙ্গল। শংকর প্রায় টেনে বাইরে নিয়ে এল আদিত্যকে। ফুটছে উত্তেজনায়, —চারটে বেজে গেল। সওয়া চারটেয় কিক অফ। পা চালান তাড়াতাড়ি।

শংকরের সঙ্গে তাল রাখতে প্রায় ছুটতে হচ্ছে আদিত্যকে। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, —ঝান্টু এবার ফার্স্ট ডিভিশনে খেলছে নাকি ?

—কেন, আপনার বোন ও বাড়িতে বলেনি ?

—শুনিনি তো !

—খিদিরপুরে খেলছে। মোরগের মতো ঘাড় উঁচু করে ঝুঁটি ফোলাল শংকর, —ছেলেটাকে খুব গালমন্দ করতাম। পড়াশুনো নেই, সারাক্ষণ খালি ফুটবল আর ফুটবল। ছেলে বাপের মুখে ঝামা ঘষে এলেম দেখিয়ে দিয়েছে। গত হপ্তাতেও নাম উঠেছিল কাগজে। জুনিয়ার বেঙ্গলের ট্রায়ালে আছে।

আদিত্য বেশ লজ্জা পেল। একমাত্র ভাগ্নের সম্পর্কে এত খবর সে সত্যিই জানে না। শুধু জানে ঝান্টু একটু মাথামোটা, তিন-তিনটে টিউটরের কাছে পড়েও হায়ার সেকেন্ডারিতে ফেল মেরেছে। হাউ হাউ করে কথা বলে, যেখানে সেখানে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে বসে, বাপ্পা তিতিরের কাছে ঝান্টু

রীতিমতো হাসির খোরাক।

আদিত্য কৃষ্ণার সঙ্গে বলল, —দ্যাখো কাণ্ড ! ঝান্টুটা এত সব করে বসে আছে, আমি জানিই না ! আসলে আজকাল এত কম থাকা হয়.... । একটা ব্যবসায় নামতে চলেছি.....

শংকর শুনছে না। ছুটছে। লম্বা পেটানো শরীর দৌড়ে পার হয়ে গেল রাস্তা। বল পায়ে গোষ্ঠ পালকে কাটিয়ে। আরও শয়ে শয়ে মাঠে ধাবমান মানুষের সঙ্গে।

মাঠের বাইরে মাঝারি লাইন। সর্পিল। পুলিশ পিঠে ঘোড়ারা কাদা ছেটোচ্ছে ছপছপ। এই জল কাদা ভেঙে মাঠে ঢুকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না আদিত্যর, কিন্তু না'ও করতে পারল না মুখ ফুটে। ঝান্টু তবু ভাগ্নে বলে কথা !

খেলা শুরু হয়ে গেছে। এগারোটা লাল হলুদের সঙ্গে লড়ছে এগারোটা সাদা জার্সি পরা তরুণ। ছুটন্ত সাদা জার্সির ঝান্টুকে চিনতে পারছিল না আদিত্য। মাঝ-গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল, —এই শংকর, ঝান্টু কোথায় ?

শংকর ঘাড় ফেরাল না। সামনে চোখ রেখেই উত্তেজিতভাবে বলল,— ঝান্টুকে চিনতে পারছেন না ! ওই তো চার নম্বর। রাইট স্টপার।

—হ্যাঁ, তাই তো। ঝান্টুর স্বাস্থ্যটা তো বেশ ভাল হয়েছে !

—রোজ ওয়েট ট্রেনিং করে। উরু দাবনা এগুলো সব তৈরি করতে হবে না !

নেমেই ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। সাঁ সাঁ ধেয়ে আসছে লালহলুদ ফরোয়ার্ডের দল। সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সাদা জার্সি। পিছল মাঠে সাররা কেটে এক ফরোয়ার্ডকে শুইয়ে দিল ঝান্টু।

শংকর চেঁচিয়ে উঠল, —জিও মেরে লাল।

আদিত্য সপ্রশংস ভঙ্গিতে তাকাল, —ঝান্টুর গায়ে তো হেভি কষ হয়েছে !

—হবে না ? ওয়েট ট্রেনিং করে যে !

কর্নার পেয়েছে লালহলুদ। শূন্যে উড়ন্ত বল গোঁত খেয়ে নামছে গোলপোস্টের সামনে। হেড করার জন্য লাফিয়ে উঠল তিনটে লালহলুদ ফরোয়ার্ড, সঙ্গে ঝান্টুও। ফরোয়ার্ডদের টপকে ঝান্টুই হেড করেছে।

শংকর পাগলের মতো হাত ছুঁড়ছে, —সাবাশ ব্যাটা। চালিয়ে যা।

আদিত্য হাঁ হয়ে দেখছে ঝান্টুকে, —উফ, কতটা লাফাল !

—লাফাবে না ? ওয়েট ট্রেনিং করে যে !

বিশ-পঁচিশ মিনিট গড়িয়ে গেছে খেলা, গোল হয়নি এখনও। গ্যালারি ভর্তি ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক অধৈর্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। শংকরের উচ্ছ্বাস দেখে দু-চারজন কটমট তাকাচ্ছে এদিকে।

তখনই প্রথম গোলটা হল। ঝান্টুকে ইনসাইড ডজে টলিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ধেয়ে গেছে লালহলুদ ফরোয়ার্ড। গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে জালে ঠেলে দিয়েছে বল। পাঁচ মিনিট পর আবার গোল। এবারও ঝান্টুকে কাটিয়ে। গোটা গ্যালারি জুড়ে উল্লাসের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য ফিসফিস করে বলল, —ইশ, ঝান্টুটা ঠিক সামাল দিতে পারছে না।

—হুঁ।

—বুদ্ধিটা এখনও ঠিক তেমন পাকেনি তো।

—পাকবে কী করে ? সারাক্ষণ ওয়েট ট্রেনিং করে যে। শংকর ম্রিয়মাণ। হাফটাইম অবধি আর গোল হল না। শালা ভগ্নীপতি বেজার মুখে ঝালমুড়ি চিবোচ্ছে।

হঠাৎ শংকর বলল, —কি একটা বিজনেসের কথা বলছিলেন যেন ?

—হ্যাঁ। রোড কনট্রাক্টরির ব্যবসা।

—আপনি করবেন রোড কনট্রাক্টরি ? কে ঢোকাল মাথায় ?

—কে আবার ঢোকাবে ! ঝপ করে রঘুবীরের নামটা করতে ইচ্ছে হল না আদিত্যর। বলল,

—আমারই কয়েকজন চেনাজানা ছিল, তাদের থ্রু দিয়ে একটা কাজ বের করার চেষ্টা করছি।

—আমার কাছে কেন লুকোচ্ছেন দাদা ? শংকর চোখ টিপল,—এ নিশ্চয়ই আপনার সেই রঘুডাকাতের প্ল্যান।

নির্ঘাত জয়ি গিয়ে লাগিয়েছে। আদিত্য বোনের ওপর মনে মনে একটু চটে গেল।

শংকর ফের বলল, —লোকটা আজ পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কত টাকা খিঁচেছে ?

—কিছু নেয়নি তো !

—হতেই পারে না !

আদিত্য হেসে ফেলল, —মাইরি বলছি, আজ পর্যন্ত কিছু নেয়নি। উল্টে বাবার জন্য বিনে পয়সায় হার্টের ওষুধ এনে দিয়েছে, ফ্রি অফ কস্টে পলা দিয়েছে একটা।

—তাই ?

—হুঁউউ। বিশ্বাস না হয় জয়িকে বোলো বাবাকে জিজ্ঞেস করতে।

—আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। শংকর মুখ বেঁকাল,—তবে আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে লোকটা তেমন ঘোড়েল নয়। খুব একটা ক্ষতি করতে পারবে না।

—কী করে বুঝলে ?

—যে লোক আপনার বাবাকে পটানোর আশায় থাকে, সে আর যাই হোক পাকা ঘোড়েল হতে পারে না। আমার শ্বশুরমশাই কি পটবার চিজ ? আপনিই বলুন না ?

রঘুবীরের সঙ্গে বাবার সাম্প্রতিক সম্পর্কটা চেপে গেল আদিত্য। জয়মোহনের ওপর শংকরের প্রচণ্ড রাগ আছে, আদিত্য জানে। শংকর যখন জয়শ্রীকে নিয়ে পালিয়েছিল তখন শংকরের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছিলেন জয়মোহন। পুলিশের লোক বেশ কিছুদিন উত্যক্ত করেছিল শংকরকে। উনিশ বছরের মেয়েকে নাবালিকা প্রতিপন্ন করে শংকরকে নাবালিকা হরণের চার্জেও ফেলা যায় কিনা তা নিয়েও উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন জয়মোহন। সে সব কথা শংকরও ভোলেনি, জয়মোহনও না। মেয়ে-নাতিকে মেনে নিলেও জয়মোহন এখনও সোজা চোখে তাকিয়ে কথা বলেন না শংকরের সঙ্গে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে বিজয়ার প্রণাম সারে শংকর। জয়মোহনও ভাববাচ্যে আশীর্বাদ জানান জামাইকে।

বিরতির পর খেলা শুরু হয়েছে। খিদিরপুর বার কয়েক ক্ষীণ আক্রমণের চেষ্টা চালাল, সুবিধে হল না। উল্টে লালহলুদ আরও দুটো গোল পুরে দিল। দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় ঝান্টু কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে। হয়তো বা ওয়েট ট্রেনিং করার জন্যই !

গ্যালারি ফাঁকা হয়ে গেছে। সুনসান গ্যালারিতে বসে আছে শংকর। বিমর্ষ। হতাশ।

আদিত্য করুণ মুখে বলল, —ভেবো না, ঝান্টু আমাদের ভালই খেলে। শুধু অভিজ্ঞতাটারই যা অভাব।

—অভিজ্ঞতাটা হবে কোত্থেকে ? আট বছর বয়স থেকে হেড মেরে ঘিলুগুলো তো ইট করে ফেলেছে। শংকর ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, —কোথায় ভাবলাম এ বছর বড় টিমের এগেনস্টে খেলা টেলা দেখালে সামনের বছর ভাল দর উঠবে ছেলেটার ! সে গুড়ে কেরাসিন ঢেলে দিল পাঁঠাটা !

আদিত্যরও মনটা খারাপ লাগছিল। সামনে ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত মাঠ, পাশে এক নিরাশ পিতা, মাথার ওপর মলিন আকাশ, দিনান্তের বিবর্ণ ভাব—সবই অবসন্ন ভাবটাকে ফিরিয়ে আনছিল তার। খানিক বসে থেকে বলল,—চলো, এবার ওঠা যাক।

মাঠের বাইরে এসে একটানা কিছুক্ষণ গজগজ করল শংকর। তারপর বলল,—চলুন দাদা, কোথাও একটা গিয়ে বসা যাক।

—কোথায় আর যাবে ? চলো, তোমাদের বাড়িই ঘুরে আসি। জয়িটা বাড়িতে আসে, আমার সঙ্গে দেখা হয় না ...

—সে আরেক দিন যাবেন। আজ বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না দাদা। অ্যাদ্দিন পর দেখা হল,

একটু সুখদুঃখের কথা হোক ।

'সুখদুঃখের কথা' বাক্যবন্ধটি সাঙ্কেতিক । অর্থ, একটু পান টান করা যাক । কথাটা আদিত্যই ব্যবহার করত এক সময়ে । প্রথম প্রথম শংকর খুব হাসত, পরে কথাটা তারও লবজ হয়ে দাঁড়ায় ।

আদিত্য প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাল না,—না ভাই, আমি ছেড়ে দিয়েছি ।

—বলেন কী দাদা ! কী কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে ? হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়কে দিয়ে আপনি...

—ভুল করেছিলাম ভাই । কষ্টও পেয়েছি । পেটে সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা ।

—সে আপনি যেখানে সেখানে গিয়ে যা তা জিনিস খাবেন, তাতে তো লিভারের বারোটা বাজবেই । আমি কি আপনাকে আজে বাজে জিনিস খাওয়াই ?

আদিত্য ঘাড় চুলকোল,—উপায় নেই রে ভাই । গিন্নিকে কথা দিয়ে ফেলেছি । মেয়েও মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছে ।

শংকর চোখ পাকাল,—আপনি বলতে চান হাসপাতাল থেকে ফেরার পর আপনি আর মাল ছোঁননি ?

—সত্যিই ছুঁইনি । বলতে গিয়ে আদিত্য বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল । রঘুবীর যে কতদিন কতভাবে টেনেছে তাকে, আর কী নির্বিকার ঔদাসীন্যে মদ খাওয়ার প্রলোভনটাকে সে জয় করেছে, এটা ভাবতেই গর্বে বুক ফুলে উঠছিল তার । বাবা বউ ছেলে মেয়ে সকলকে দেখিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করলেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সে ।

শংকর আদিত্যর পিঠে আলগা চাপড় দিল,—ঠিক আছে, আপনাকে জোর করছি না । আমার সঙ্গে যেতে তো অসুবিধে নেই ?

আদিত্য আর আপত্তি জানাতে পারল না ।

পার্ক স্ট্রিটের বারে দুজনে বসেছে মুখোমুখি । চার পাশে গ্লাস বোতলের টুং টাং, শংকরের হাতে রঙিন পানীয়, বাতাসে সুরার ঘ্রাণ, হঠাৎ যেন একটু আতুর করে তুলছিল আদিত্যকে ।

শংকর বলল,—একটু বিয়ার নিতে পারেন দাদা । বিয়ার তো ঠিক সেই সেন্সে মদ নয় ।

আদিত্য এদিক ওদিক তাকাল,—না থাক, একবার যখন ছেড়েইছি, কেন আর বিয়ার খেয়ে নাম খারাপ করা ?

অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য এলোমেলো কথা শুরু করেছে আদিত্য । কখন যে বাপ্পা তিতিরের গল্প বলতে বলতে কন্দর্পের কথাটা তুলে ফেলেছে, আদিত্য নিজেই জানে না ।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিথিল শংকর পলকে টান টান । খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পাঁচ মিনিটে আদিত্যর পেট থেকে বার করে নিল সব কথা । ঝুম হয়ে বসে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল । তারপর বলল,—একদিক দিয়ে চাঁদু ঠিকই বলেছে । বাড়ি আপনাদের ভাঙা পড়বেই ।

আদিত্য কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল,—আমি বাড়ি ভাঙা মেনে নেব না ।

—আমি কি বলেছি মেনে নিতে ? আপনি বরং এমন একটা কিছু করুন যাতে সাপও মরে, লাঠিটাও আস্ত থাকে ।

—কী রকম ?

—একটা জুতসই পার্টি দেখে জমিবাড়ি সবসুদ্ধু বেচে দিন । তার থেকে আপনার ভাগটা আপনি নিয়ে নিন ।

—যাহ্, তা কী করে হয় ! বাবা বেঁচে থাকতে সবটাই তো বাবার । আমি ভাগ পাব কেন ? তাছাড়া বাড়ি ভাঙা বেচা কোনওটাই যে আমি চাই না ভাই ।

—তাহলে আর কী ! বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষুন । চাঁদু দীপু সবাই ওস্তাদ, প্রত্যেকে যে যারটি বুঝে নেবে । আপনাদের ওই বুড়ো কর্তা বেঁচে থাকতে থাকতেই । বুঝলেন ? এই যে চাঁদু আজ দেখল আপনি রাজি হননি, ও এখন কি করবে জানেন ? কালই দীপুর সঙ্গে প্যাক্ট করবে । ওরা

দুজনে প্ল্যান করে বাড়ি ঠিক ভাঙবেই। বাবাকেও ঠিক কবজা করে নেবে। মাঝখান থেকে আপনার আর মুখ থাকবে না।

আদিত্য চিন্তায় পড়ল,—তাহলে আমার কী করা উচিত ?

—গোটা ব্যাপারটাকে নিজের কনট্রোলে নিয়ে আসা উচিত। বলেন তো আপনার বোনকে বলে দিচ্ছি, সে আপনার দলে থাকবে।

জয়শ্রীরও যে বাবার বাড়িতে একটা ভাগ আছে, কথাটা আদিত্যর মাথাতেই ছিল না। দু-এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল,—তাও তো বটে। জয়িরও তো ও বাড়িতে একটা শেয়ার আছে।

—শেয়ার আছে কি নেই, সে আপনাদের ভাইবোনদের ব্যাপার। আমি এর মধ্যে কিছু বলব না। তবে আমি একটা সাজেশান দিতে পারি।

—কী ?

—দেখুন, শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতে বাড়ি বেচে টাকা ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাবটা বোধহয় ধোপে টিকবে না। অথচ বাড়িটা ভাঙা পড়বেই। আর তাই যদি হয়, আপনি কেন ম্যাক্সিমাম লাভটা উশুল করে নেবেন না ?

—না না, আমি না বড়ভাই ! ওসব করা আমার ঠিক হবে না।

—আলবত হবে। দীপু ভাল চাকরি করে, চাঁদুও শুনি এখন সিনেমা করে ভালই কামায়, ওদের মধ্যে আপনার অবস্থাই তো সব থেকে খারাপ। টাকার দরকার আপনারই বেশি। শংকর নড়ে বসল,—একটা ভাল বুদ্ধি দেব ? নিজেই আপনি দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট তৈরি করুন।

—ওরেব্বাস ! সে তো প্রচুর টাকার ধাক্কা ! অত টাকা আমি পাব কোথায় ?

—আহা, টাকা তো আপনার কাছেই হেঁটে হেঁটে আসবে। মাছের তেলে মাছ ভাজবেন। অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়ে ফ্ল্যাট তুলবেন। দাঁড়ান, হিসেব করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের জমি আছে আট কাঠা, ঠিক ? ওখানে ফ্ল্যাট তুললে চারতলা অবধি তো তোলা যাবেই। প্রতি তলায় চারটে করে ফ্ল্যাট হলে মিনিমাম ষোলোটা। আপনাদের ওখানে এখন ফ্ল্যাটের যা রেট যাচ্ছে তাতে চার লাখ করে তো দাম পাবেনই।

—তা পাব। আমাদের পাশের ওই ছোট্ট ছোট্ট ফ্ল্যাটগুলোই তো চার, সওয়া চার লাখে বিক্রি হয়েছে।

—তাহলেই দেখুন, ষোলটা ফ্ল্যাট, অর্থাৎ চৌষট্টি লাখ টাকা। এর থেকে আপনাদের তিন ভাইয়ের তিনটে ফ্ল্যাট বাদ দিন। কত থাকল ? বাহান্ন লাখ।

—শুধু তিন ভাই কেন ? তোমরা ফ্ল্যাট নেবে না ?

—আমার নাম কেন বলছেন দাদা ? আমি কে ? বলুন বোন।

—ওই হল। তুমি আর জয়ি কি আলাদা ?

—পৈতৃক বাড়ি সম্পত্তি দাদা, যার যার তার তার। এখানে কোনও হাজব্যান্ড ওয়াইফ নেই। শুধু যদি আমার মত চলত, তাহলে আমি ফ্ল্যাট নিতাম না। তবে মনে হয় জয়ি নেবে। ফ্ল্যাট না নিলেও তার বদলে ক্যাশ নিয়ে নেবে।

—বাপের জিনিস তো নেওয়াই উচিত।

—শুধু বাপের জিনিস বলে নয় দাদা, আপনি তো জানেনই, আপনার বোনের একটু খাঁই বেশি। এই যে দিবারাত্র ছুটছি, যে করে হোক পয়সা রোজগার করে আনছি, সবই তো তেনার চাপে। আমাকে কোনওদিন সুতির প্যান্টশার্ট ছাড়া অন্য কিছু পরতে দেখেছেন ? অথচ তাঁর কি না চাই !

আদিত্য দু হাত তুলে বাধা দিল,—থাক থাক, সে জয়ি না হয় নিলই কিছু। তারপর ?

—তারপর আবার কি। হিসেব করে দেখুন ষোলোটা ফ্ল্যাট তুলতে কত খরচা হবে ? ভাল মেটিরিয়াল দিয়ে, নিজে চব্বিশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে করালে লাখ তিরিশ পঁয়ত্রিশে নেমে যাবে। ভাইদের আরও লাখ দুয়েক করে দিয়ে দিন। আপনার হাতে তাহলে কত লাখ থাকল ?

ক্রমাগত লাখ শুনতে শুনতে মাথাটা কেমন গুলোতে শুরু করেছে আদিত্যর। এ যেন কুবেরের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত হচ্ছে সামনে। কত লক্ষ টাকা থাকছে তার হাতে? সাত লক্ষ? আট? দশ?

সংবিৎ হারিয়ে হঠাৎ শংকরের গ্লাস টেনে নিয়ে চোঁ চোঁ চুমুক মেরে ফেলল আদিত্য। অনেক দিন পর তরল আগুন নামছে কণ্ঠনালী বেয়ে। তৃষিত স্নায়ুরা পুলকে রিমঝিম নেচে উঠল। মুহূর্তে লাল হয়ে গেল মুখচোখ।

শংকর মিটিমিটি হাসছে,—আস্তে। ধীরে সুস্থে খান দাদা। আরেকটু বলি?

—বলো। তুমি আজ আমার মাথা খারাপ করে দিলে শংকর।

—দেখুন দাদা, আপনি কিন্তু নিজেই খাচ্ছেন, বউদির কাছে গিয়ে কিন্তু আমার নাম করবেন না।

—কেন তোমার নাম করব? আমি কি নাবালক? আমি কি নিজে খেতে পারি না?

দ্রুত আরও পেগ দুয়েক হুইস্কি সাবড়ে আদিত্য সুস্থিত হল। নেশা আস্তে আস্তে ধরছে মাথায়। ঘোর লাগা স্বরে বলল,—একটা কথা শুধু আমার মাথায় ঢুকছে না ভাই। নিজেরা তৈরি করলে যদি লাখ লাখ টাকা আসে, তবে লোকে প্রোমোটারের হাতে বাড়ি ছাড়ে কেন?

শংকরেরও গলা জড়িয়ে এসেছে,—সেসব আমি জানি না।

—প্রোমোটাররা কি আরও বেশি লাভ করে?

—আলবত করে। নইলে কি আর এমনি এমনি ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়? ওদের মাল-মেটিরিয়ালের হাল দেখেননি? ক'দিন পরেই ঝুরঝুর করে সব খসে পড়ে।

—আমি কিন্তু এক নম্বর মেটিরিয়াল দেব।

—দেবেন। আগে লাইন থেকে ভাই দুটোকে হঠান। বুড়োকর্তাকে কবজা করুন। তার পর।

—ও আমার বাঁয়ে হাত কা খেল। আদিত্য টুসকি বাজাল,—আমার কাছে বুড়োর একটা সিক্রেট আছে। তাই নিয়ে একটু চাপ মারলেই বুড়ো ধসে যাবে।

ওয়েটার আরও দু পেগ হুইস্কি রেখে গেছে। সঙ্গে সোডা। বরফ।

শংকর কাঁপা হাতে নিজের গ্লাসে সোডা মেশাল,—কী সিক্রেট দাদা?

—তোমাকে বলব কেন? আদিত্য নিট গলায় ঢেলেছে,—তুমি শালা আমার বাবাকে দেখতে পারো না, আমার ভাইদের দেখতে পারো না, আমার বোনের নিন্দে করো, আমার বউয়ের সঙ্গে তোমার বনিবনা হয় না...

—বেশ। বেশ। নাহয় নাই বললেন। আমাকে বলবেনই বা কেন? আমি শালা মিস্ত্রি মজুর মানুষ। তবে মনে রাখবেন বিপদের সময়ে আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কিন্তু গোটা দুনিয়ায় একজন মানুষই আছে। কে আপনাকে গ্যারেজ ঘরে প্রেস করার বুদ্ধিটা দিয়েছিল, অ্যাঁ? আমি না মনে করিয়ে দিলে বুড়োকর্তার ফিক্সড ডিপোজিটের কথা স্মরণে আসত আপনার! পারতেন প্রেস শুরু করতে?

নেশাচ্ছন্ন আদিত্য খানিকটা দমে গেল। তবু বাবা সম্পর্কিত কথাটা গিলে নিল প্রাণপণে। গ্লাস শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

শংকরের ট্যাক্সি ভেতরে ঢোকেনি, বাস স্টপে ছেড়ে দিয়ে গেছে আদিত্যকে। মাতাল আদিত্য বাড়ি ফিরছে। তিন মাস পরে আবার আজ এলোমেলো পড়ছে পা।

আধখোলা গেটের সামনে এসে মত্ত কণ্ঠ গর্জে উঠল,—অ্যাই শালা দীপু, অ্যাই শালা চাঁদু, তোদের চালাকি আমি ছুটিয়ে দেব আজ। আমাকে তোমরা ঠকাতে চাও, অ্যাঁ?

১৭

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন সিগারেট টানছিল সুদীপ। আধ ঘণ্টা ধরে বাড়িতে যে তাণ্ডবটা চলল আজ, এখনও সেটাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করে উঠতে পারেনি সে। রগ দুটো দপদপ করছে, রক্ত

চলাচল অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলেও এক চাপা হুঙ্কার এখনও হামলা চালাচ্ছে শরীরে। কী বিশ্রী কাণ্ডটাই না হয়ে গেল আজ !

অ্যাটম ঘুমিয়েছে। শুধু যেন এটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল রুনা। বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে বারান্দায় এসেছে,—ঢঙ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

সুদীপ খিঁচিয়ে উঠল,—কী করব ? নাচব ?

—নাচলেই পারো। দুই ভাই জগাই-মাধাই হয়ে নাচো, পাড়াপড়শি ডুগডুগি বাজাক। কী কপাল করে যে এসেছিলাম এ বাড়িতে !

সুদীপ খানিকটা সতর্ক হয়ে গেল। এগুলো রুনার মিসাইল নয়, মিসাইলের ভনিতা। ওদিকের লঙ্কাকাণ্ড শেষ, এবার এদিকের কুরুক্ষেত্র মুখর হবে।

হলও। রুনা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল,—অনেক হয়েছে। অনেক দিন ধরে সহ্য করছি, আর নয়। তুমি যদি এর বিহিত না করো তা হলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

—কী বিহিত করব ? বাঁশপেটা করব দাদাকে ?

—আমি ভাই হলে তাই করতাম। পিটিয়ে বেলেল্লাপনা ছুটিয়ে দিতাম।

এ কাজ রুনার পক্ষে অসম্ভব নয়, সুদীপ জানে। রাগলে মারধর করে খানিকটা পৈশাচিক সুখ পায় রুনা। পরশু রাত্রে জাপানের রাজধানীর নাম টোকিওর বদলে প্যারিস বলেছিল অ্যাটম, ছেলেকে মেঝেতে শুইয়ে তার পিঠে স্কেল ভাঙছিল রুনা, ছেলের যে ককিয়ে দম আটকে আসছে তাও রুনার নজরে ছিল না।

সুদীপের তুষ্ণী ভাবে গলার পর্দা একটু নামাল রুনা,—বাবার সঙ্গে স্ট্রেট কথা বলো। অসভ্যতার একটা লিমিট আছে। মদ গিলে এসে যাকে যা খুশি বলে যাবে, ভাইদের শালা শুয়োরের বাচ্চা বলবে, তা তো চলতে পারে না। ছেলে এতদিন ছোট ছিল, এখন বড় হচ্ছে, এই পরিবেশে সে মানুষ হবে ভেবেছ ?

—বাবার সঙ্গে কথা বলে কী লাভ ! কতবার তো বলেছি, বাবা বেঁচে থাকতে কিছু করা যাবে না। দেখলে না বাবা আমার লোকটাকে কেমন দুর দুর করে তাড়াল !

—তা হলে অন্য কোথাও চলো। তুমি তো অফিস থেকে বাড়িভাড়া পেয়ে যাবে, আমরা অন্য কোথাও ফ্ল্যাট দেখে উঠে যাই।

দু-এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল সুদীপ, তারপর বলল,—তাও হয় না। বাবার দায়িত্ব নিয়েছি, বাবাকে ফেলে যাওয়া যায় না।

—বাবাকে নিয়ে চলো !

—খেপেছ ? বাবা নিজের বাড়ি ছেড়ে নড়বে ?

—তা হলে এখানে পচে মরুন। হাগবও না, পথও ছাড়ব না, এ তো হয় না।

সুদীপ আবার ভাবল কিছুক্ষণ। পাঞ্জাবির পকেটের দেশলাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল আঙুলে,—নাহ্, তা হয় না। অনেক প্রবলেম আছে। একবার বাড়ির বাইরে গেলে পায়ের তলার মাটি সরে যায়। তখন কি আর বাড়ি ভাঙার ব্যাপারে আমার তেমন জোর খাটবে ? যারা তখন বাড়িতে গেঁড়ে বসে থাকবে, সবই তখন তাদের হুকুম মতো হবে, এটা বোঝো ?

—এই কুমিরছানা তুমি আমাকে অনেক দিন ধরে দেখাচ্ছ। আমি ছেলেকে আর এই পরিবেশে রাখব না ব্যস। কালই আমি অ্যাটমকে মা'র কাছে রেখে আসছি।

সুদীপ প্রমাদ গুনল। রুনা সব পারে। ছেলের বিষয়ে রুনা এতটুকু সমঝোতা করতে রাজি নয়। গত মাসে পুরীতে যেই একদিন হেঁচেছে অ্যাটম, ওমনি রুনার হুকুম জারি হয়ে গেল, সুদীপকে পর্যন্ত আর পা ছোঁওয়াতে দিল না জলে। চিলকা বাতিল, নন্দনকানন বাতিল, সারাক্ষণ শুধু হোটেলে বসে সমুদ্রের শোভা দেখো।

রুনাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল সুদীপ,—দেখো, যা হয় না তা ভেবে তো লাভ নেই। আমাকে

একটু ঘটনাটা ভাল করে খতিয়ে দেখতে দাও। দাদাকে তো আমি নিও বিল্ডার্সের নাম বলিনি, দাদা জানল কী করে ?

—এই না হলে পুরুষমানুষের বুদ্ধি ! চাঁদু বলেছে।

—চাঁদুই বা জানবে কোত্থেকে ? তুমি গল্প করেছিলে ?

—আমার অত পেট পাতলা নয়। তোমার ওই ছোট ভাইটি একটি মিটমিটে শয়তান। পেটে পেটে জিলিপির প্যাঁচ। শুনলে না তলে তলে নিজের প্রোমোটার ঢোকাচ্ছে ?

সুদীপ গুম হয়ে গেল। চাঁদুও যে এই লাইনে নেমে পড়েছে, এটা তার কল্পনাতেও ছিল না। লাট্টু মার্কা ছেলে, গানবাজনা যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে মজে থাকে, ফিলম; সিরিয়ালের লাইনে ঘষছে, সুবিধে হচ্ছে না—চাঁদুকে মনে মনে অনুকম্পাই করে সুদীপ। ছোট থেকেই উড়উড় ভাবের জন্য তেমন পছন্দও করে না। সেই ছেলেও যে এত শাহেনশা হয়ে উঠেছে কে জানত !

কেউ কোনও কথা বলছে না। রুনা হঠাৎ বলল,—তোমার প্রোমোটারের গল্প হয়তো তোমার বাবাও করে থাকতে পারেন। তিনি তো আবার আর এক কাঠি বাড়া। খাবেন পরবেন আমাদের, আর ঝোল টানবেন ওদিকের।

—যাহ্। বাবা দাদাকে বলবে ? অসম্ভব।

—দাদাকে কেন বলবেন ? তিনি তাঁর পিরিতের বউমাকে বলেছেন। সেখান থেকে দাদা শুনেছে।

—বউদি দাদার সঙ্গে এসব কূটকচালি করবে না।

—ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। তিনি তো আবার স্বামীর সঙ্গে গোপন কথা বলেন না। তাঁর তো গোপন কথা বলার লোক আছে !

প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল সুদীপ। বলল,—আজেবাজে কথা বলছ কেন ? হচ্ছিল কোন কথা, কোথায় চলে গেলে !

—বাড়ির কেচ্ছায় ওমনি গায়ে ছ্যাঁকা লেগে গেল ? তোমরা সবাই কি ভাবো বলো তো ? দুনিয়াসুদ্ধু লোক কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে ? বাপের বাড়িতে কৈফিয়ত দিতে দিতে আমার মাথা কাটা যায়।

সুযোগ পেলে শুভাশিস-ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এই ইঙ্গিতটা দেবেই রুনা। বিয়ের পর প্রথম প্রথম হাসিঠাট্টার ছলে বলত, এখন প্রতিটি মনোমালিন্যের সময়ে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সুদীপকে আহত করার জন্যে।

আর সুদীপ আহত হবে নাই বা কেন ? শুভাশিসকে সে কি কম দিন দেখছে ? সন তারিখ হিসেব করে বলতে গেলে রুনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার অনেক আগে থেকেই তার শুভাশিসের সঙ্গে পরিচয়। সেই কোন কালে, যখন তিতির হল তারও পাঁচ-ছ মাস আগে এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল শুভাশিস। কী শান্ত চেহারা, কী বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, কী মার্জিত ব্যবহার ! মাত্র ক'দিনের পরিচয়ে কিভাবে যেন আপন হয়ে গেল সংসারে। মা যে মা, যার অত খিটখিটে সন্দেহবাতিক স্বভাব ছিল, মা পর্যন্ত শেষের দিকে দুদিন শুভাশিসদা না এলে কেমন অস্থির হয়ে পড়ত। তারপর কত ঝড়ঝঞ্ঝা গেল সংসারের ওপর দিয়ে, একটু একটু করে অচল হয়ে পড়ল বাবা, সংসার পৃথক হল, শুভাশিসদা সব সময়ে পাশে পাশে থেকেছে তাদের। দাদাকে মদ ছাড়ানোর জন্য শুভাশিসদা কম উঠে পড়ে লেগেছিল ! পারেনি, সে অন্য কথা। সে তো বউদি নিজে স্ত্রী হয়েও পারেনি। তারাই বা ভাই হয়ে কী করতে পেরেছে ? যে রুনা বিশ্রী ইঙ্গিত করছে, তাকেও বিপদের সময় দেখেছে শুভাশিসদা। অ্যাটম হওয়ার সময়ে রুনার শরীরে কিছু মেয়েলি জটিলতা দেখা দিয়েছিল, এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যখন মা বাঁচবে, না বাচ্চা বাঁচবে, সেই চিন্তায় সুদীপের পাগল হওয়ার জোগাড়, শুভাশিসদা নিজে থেকেই তিন-চারজন বড় গাইনির সঙ্গে পরামর্শ করে, মেডিকেল বোর্ড বসিয়ে, কীভাবে রক্ষা করেছিল দুজনকেই !

রুনা সব ভুলে যায় ! কিছু মনে রাখে না রুনা। তার রাগ বড় চণ্ডাল !

সুদীপ বিষণ্ণভাবে বলল,—তোমার মনটা বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে রুনা।

রুনা এতটুকু দমল না। উল্টে বলল,—আমার মন তো ছোটই। যারা ছোট কাজ করে তারাই সব মহৎ মানুষ।

—শুভাশিসদা আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।

—ফ্রেন্ডটেন্ড দেখিয়ো না। কে কী করে বেড়ায় সব জানা আছে।

সুদীপ দপ করে জ্বলে উঠল,—একদম নোংরা কথা বলবে না। দশ বছর তো আছ সংসারে, কোনওদিন নিজের চোখে কোনও বেচালপনা দেখেছ দুজনের ?

—তুমি বলতে চাও রোজ দুপুরবেলা দিদি বেরোয় সবই প্রেসের কাজে ?

—নয়তো কি ? অর্ডার, পেমেন্ট কালেকশান, দপ্তরিপাড়া, সবই তো বউদি একা সামলায়।

—তোমাদের বোঝায়, তোমরাও তুষ্ট থাক। রুনা গলায় বিষ আনল, এবং উগরে দিল,—কোথায় কোন হোটেলে দুজনে ফুর্তি করে বেড়ায়, কে আর তার খোঁজ রাখে ?

—চোপ। আচমকাই জান্তব গর্জন ঠিকরে এসেছে সুদীপের গলা থেকে,—বউদির নামে তুমি একটাও নোংরা কথা বলবে না।

রুনা ভয় পেল না,—ওই সব মেজাজ অন্য জায়গায় ফলিয়ো। খুব তো গেছিলে আজ ল্যাঙ ল্যাঙ করে বউদির কাছে, ঝাড় খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এলে কেন ?

জোঁকের মুখে নুন পড়ল যেন, মিইয়ে গেল সুদীপ। দাদা যখন নিও বিশ্তার্সের নাম তুলে খিস্তিখাস্তা করছিল, বউদি তখন বিচিত্র চোখে দেখছিল তাকে। সে চোখে রাগ নেই, বিরক্তি নেই, ঘৃণা নেই, শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ। সুদীপ বেশিক্ষণ ওই দৃষ্টি সহ্য করতে পারেনি। মিনমিন করে বলেছিল,—আমি কথাটা তোমাকে বলতাম বউদি। আসলে ব্যাপারটা ঠিক মেটিরিয়ালাইজ করছিল না...

ইন্দ্রাণী ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল,—এখনই বা বলছ কেন ? আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি ? তোমাদের বাড়ি, ভাঙবে না রাখবে, সে তোমরা বোঝো। আমি তো বাইরের লোক।

সুদীপ করুণ মুখে বলেছিল,— তা হলে অন্তত দাদাকে থামাও।

ইন্দ্রাণী বলেছিল,—আমার ভারী দায় পড়েছে। তোমাদের ভায়ে ভায়ে খেয়োখেয়ি, এর মধ্যে আমি কেন নাক গলাব ?

সুদীপের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল,—রাতদুপুরে এই হল্লা আর ভাল লাগে না বউদি।

—ভাল না লাগলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমাদের রাস্তায় বার করে দাও।

রাত গভীর। রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই। লাইটপোস্টের আলোর ফাঁকে ফাঁকে নির্জন অন্ধকারকে বড় বেশি নীলচে লাগে এখন। গাঢ় কালশিটের মতো। দিনভর ধকলের পর কালশিটে গায়ে নিয়ে ঝিমোচ্ছে রাস্তাটা।

সুদীপ ঘরে ফিরল।

ঘরের এক দিকে অর্ধেক দেওয়াল জুড়ে টানা কাঠের ক্যাবিনেট। রুনা পছন্দ করে বানিয়েছে। অজস্র খোপে পুতুল, ফুলদানি, খেলনাপাতি, ছোট ছোট মূর্তি। ডান দিক বাঁ দিকে পর পর কটা ড্রয়ার। ওপরের ড্রয়ারটা খুলে ছোট্ট একটা হুইস্কির বোতল বার করল সুদীপ। আধ বোতলটাক আছে। ছিপি খুলে একটু খেয়ে রেখে দিল বোতল। জল ছাড়া খাওয়ার অভ্যেস নেই, গলাটা জ্বলে গেল। মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে এল নিশ্বাস।

শোওয়ার ঘরে রুনা শাড়ি ব্লাউজ ছেড়ে নাইটি পরছে। নাইটির বোতাম লাগাতে লাগাতে ড্রেসিংটেবিলের সামনে এল। বিদেশি নাইট ক্রিমের শিশি খুলে এক দলা ক্রিম লাগাল মুখে। বেঁটে টুলে বসল,—কী করছ ও ঘরে ? শুতে এসো। কাল সকালে অফিস আছে।

অন্য ঘরের বাহারি বেতের সোফায় হেলান দিয়েছে সুদীপ। বলল,— যাই।

—বউদির কথা খুব গায়ে লেগেছে ?

সুদীপ উত্তর দিল না। একটা কুশান কোলে নিয়ে সিগারেট ধরাল।

—বউদির জন্য যদি এতই দরদ, প্রোমোটারের কথাটা বউদির কাছে গোপন করেছিলে কেন ?

তরল আগুন অল্প অল্প ক্রিয়া শুরু করেছে মাথায়। কোণঠাসা বেড়ালের মতো ফ্যাঁস করে উঠল সুদীপ,—বেশ করেছি বলিনি। আমার ইচ্ছে।

—ইচ্ছে না হাতি ! আসল কথা বলো, ভয় পেয়েছিলে।

—কীসের ভয় ?

—সে আমি কী করে বলব ? কেন যে তোমরা দিদিকে এত ভয় পাও, তা তোমরা বাড়ির পুরুষরাই জানো। তোমার বাবা, অত যার হম্বিতম্বি, তাঁর চোখের সামনে রোজ বউমা ঘরে পরপুরুষ ঢুকিয়ে ফস্টিনস্টি করছে। একদিন নয়, বছরের পর বছর। তিনি ইন্দ্রদেবের লীলাখেলা ভেবে মোহিত হয়ে দেখছেন। আর তোমার হাড়েবজ্জাত ফিলমস্টার ভাইটি তো মহারানির হাতের পুতুল। যেমন নাচায়, তেমনি নাচে। আর তোমার দাদা ভেড়ারও অধম। মদ গিলে দেবদাস সেজে বসে আছেন।

কুশানটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে দাঁড়াল সুদীপ,—আর কেন ? এবার ক্ষান্তি দাও।

—কেন ক্ষান্তি দেব ? তোমার দাদার মুখ আছে, আমার নেই ?

—দাদাকে যা খুশি বলো, বউদিকে নিয়ে পড়ছ কেন ? তা ছাড়া দাদা তো তোমাকে কিছু বলেনি ! যা খিস্তিখাস্তা করেছে, ভাইদের করেছে। তোমার অত গায়ে লাগছে কেন ? দাদার এরকম চেল্লামিল্লি তুমি প্রথম দেখছ ? কুশলী খেলোয়াড়দের মতো ডজ করে প্রসঙ্গটা কাটাতে চাইল সুদীপ।

কাটল, কিন্তু তেজ নিবল না রুনার,— এই না হলে ভাই ! থাকো সারাজীবন দাদাবউদির পাপোশ হয়ে। মাঝে মাঝে গায়ে জুতোর ধুলো ঝেড়ে যাবে, চেটে চেটে চরণামৃত ভেবে খেয়ো।

নাহ্, রুনা আজ থামবে না। এবার ক্রমে অদম্য হয়ে উঠবে রুনা। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য যা খুশি বলে যাবে, তূণ থেকে বাছা বাছা তীর নিক্ষেপ করে যাবে অবিরাম। ইতরের বংশ ! অশিক্ষিতের ঝাড় ! আনকালচারডের গুষ্টি ! বনেদিআনার ঘোমটা টেনে খ্যামটা নাচছ ! সাহেবদের চামচাগিরি করে কবে দাদু একটা বাড়ি বানিয়েছিল, তাই নিয়ে বারফাট্টাই ! এখন জোর করে থামাতে গেলে আরও হিস্টিরিক হয়ে উঠবে রুনা। দুমদাম জিনিসপত্র ছুঁড়বে, ভাঙবে, আদরের ছেলেকেই হয়তো ঘুম থেকে ঠেলে তুলে ঠাস ঠাস চড় কষাবে মাঝরাতে। একবার নৈশযুদ্ধের সময়ে বারান্দা থেকে ঝাঁপ মারতে গিয়েছিল রুনা, কীভাবে যে সুদীপ আটকেছিল সেবার ! রুনাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছিল পাশের ঘরের ডিভানে, নিজের ভারী শরীরটা চেপে রেখে ছিল রুনার ওপর। তাকে আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করেছিল রুনা। তবে নরমও হয়েছিল। সব রাগ সাঙ্গ হয়েছিল এক মনোরম রতিক্রিয়ায়। সে যে কতদিন আগে !

আজ ওসবে এতটুকু উৎসাহ পাচ্ছে না সুদীপ। দরজা খুলে বাথরুমে গেল। বউদির ঘরে আলো জ্বলছে, দাদার ঘর অন্ধকার। বউদির ঘরের বাতি আজ নিববে না।

কেন যে বউদির ওপর রুনার এত রাগ তা সুদীপ বোঝে। যার বর সংসারে সব থেকে বেশি রোজগার করে, যে বউয়ের বাপের বাড়ি যথেষ্ট অর্থবান, তারই তো বাড়িতে বেশি দাপট থাকা উচিত। অথচ রুনা কোনওদিন সেভাবে নিজের দাপট প্রতিষ্ঠাই করতে পারল না। যখন হাঁড়ি এক ছিল তখনও না, এখনও না। এখনও রুনা যতই করে মরুক, একদম কিছু করে না যে তাও নয়, যথেষ্ট খেয়াল রাখে বৃদ্ধ শ্বশুরের, কিন্তু রুনার শ্বশুর আগে নাম করবেন বড় বউয়ের। বিয়ের পর চাঁদুকেও খুব বন্ধু করার চেষ্টা করেছিল রুনা। কারণে অকারণে হাতে টাকা গুঁজে দিত, একসঙ্গে সিনেমা থিয়েটার যেত দুজনে, হাই তুলতে তুলতে সারা রাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনত চাঁদুর পাশে বসে। আজ এই শার্ট আনছে, কাল প্যান্ট পিস আনছে, কী না দিয়েছে। তবু চাঁদুর বন্ধুত্ব

কিনতে পারল না রুনা। ভাগাভাগির সময়ে চাঁদু সুড়ুৎ করে বড় বউদির ক্যাম্পে চলে গেল।

রুনা তো হীনম্মন্যতায় ভুগবেই!

থাক, এখন কিছুক্ষণ একা থাক রুনা, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। সুদীপ বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা ছাদে উঠে এল।

সকালের বৃষ্টিতে ভিজে আছে ছাদ। শ্যাওলা হয়ে কিছুটা পিছলও। পা টিপে টিপে মাঝখানটায় এল সুদীপ, ভেজা সিমেন্টের ধাপিতে বসল।

বুকের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করছিল সুদীপের। কেন যে সে বাড়ি ভাঙার কথাটা বউদির সঙ্গে আলোচনা করেনি, তা কেউ জানে না। রুনাও না। জানলে আরও অনর্থ করত রুনা। নিও বিল্ডার্স ফ্ল্যাটবাড়ি তুলে তাদের প্রত্যেককে ফ্ল্যাট আর টাকা দেবে ঠিকই, কিন্তু বউদির প্রেসটা যে ভাঙা পড়বে তার জন্যে কিচ্ছুটি দিতে রাজি নয়। নতুন কোনও জায়গা তো নয়ই, ক্ষতিপূরণও না। এই অপ্রিয় কথাটা বউদিকে সুদীপ বলত কেমন করে? আর আজ যা অবস্থা দাঁড়াল, এর পর কি বললেও বিশ্বাস করবে বউদি?

শ্রাবণের রাত ভরে আছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে। চাঁদ নেই, তবু এক আলগা আলো ছড়িয়ে আছে আকাশে। একটা দুটো তারা দেখা যায়, কি যায় না। বাতাস নেই।

সহসা ছাদের প্রান্তে সুদীপের চোখ আটকে গেছে। ছায়ার মতো কে দাঁড়িয়ে ওখানে? তিতির না?

সুদীপ ডাকল,—এই তিতির, কী করছিস ওখানে?

আলসেতে ঝুঁকে থাকা তিতির ফিরল পিছনে,—কিছু না।

সুদীপ হালকা হওয়ার চেষ্টা করল,—ঘুমোসনি যে এখনও?

তিতির উত্তর দিল না। পায়ে পায়ে এসে পাশে বসেছে। মুখ নিচু করে চোখের জল মুছল।

তিতিরের মাথায় হাত রাখল সুদীপ,—কী হল রে তোর? কাঁদছিস কেন?

তিতিরের কান্নার দমক বেড়ে গেল। ফুলে ফুলে উঠছে শরীর, হেঁচকি উঠছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল,—আমরা কি আর কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে পারব না বড়কাকা?

সুদীপের বুকে সাইক্লোন বয়ে গেল। ভিজে এল গলা,—এখনই কি আমরা একসঙ্গে আছি রে তিতির?

১৮

সারা রাত ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখে আদিত্য। ঘুম এলেই অদৃশ্য কেউ যেন তার অবচেতনায় ভিডিও অন করে দিয়ে চলে যায়, আদিত্য একের পর এক চলচ্ছবি দেখে যেতে থাকে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মনুমেন্টের মাথায় উঠেছে আদিত্য, ইন্দ্রাণী তার হাত চেপে রয়েছে সজোরে, মুখে নববধূর লাজ! মাঝগঙ্গায় ডুবে যাচ্ছে ইন্দ্রাণী, ঝাঁপিয়ে পড়ে আদিত্য টেনে তুলছে তাকে। একটা প্রকাণ্ড গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় দোল খাচ্ছে দুজনে, মাথার ওপর গাছের পাতারা যেন হরেক কিসিমের নোট! আদিত্য পাতা ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেয় ইন্দ্রাণীর দিকে! আরও কত কী যে দেখে! কোনওদিন এসব কিছু ঘটেনি, তবু দেখে। ভোরের দিকে ঘুমটা গাঢ় হয়, সকালে উঠে স্বপ্নরা বেবাক ফর্সা।

ঘুম ভাঙার পর বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় স্বপ্নগুলোকে খোঁজে আদিত্য। মনে পড়েও মনে পড়তে চায় না। লুকিয়ে থাকে মাতৃগর্ভের স্মৃতির মতো। তাদেরই খুঁটে খুঁটে জড়ো করে শুরু হয় দিন।

আজ সে সব কিছুই হল না। ঘুম ভাঙতেই আদিত্য টের পেল মাথা অসম্ভব ভারী হয়ে আছে। চোখের পাতায় যেন দু-মনি পাথর চাপানো, খুলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। এরকম লাগছে কেন শরীরটা?

দরজায় তিতির। তার গম্ভীর স্বরে আদিত্য চমকে উঠল।

—তোমার চা নিয়ে আসব?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে। কাল রাতে সে বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফিরেছিল, তারই রেশ এখনও ঝনঝন করছে মাথায়। উত্তরের জানলা দিয়ে মলিন সূর্যরশ্মি এসেছে ঘরে, আলো খুব বেশি নয়, তবে তার রাতের ক্রিয়াকলাপের নমুনা দেখার জন্য যথেষ্ট। বাপ্পার শূন্য বিছানায় পড়ে আছে তার শার্ট। কোমরের বেল্ট আয়নার সামনে মেঝেতে গড়াচ্ছে। মাথার বালিশ পায়ের দিকে। ট্রাউজার কাদায় মাখামাখি। গা খালি। মাঝরাতে একবার বোধ হয় কারেন্ট গিয়েছিল, তখনই বুঝি গরমে খুলে ফেলেছে গেঞ্জি। মশারির তিনটে খুঁট লাগানো আছে ছত্রিতে, চতুর্থটি ঝুলছে, দুলছে ফ্যানের হাওয়ায়। কাল রাতে কি নিজের হাতে মশারি টাঙিয়েছে সে ? তিতির টাঙালে তো এমন হওয়ার কথা নয় !

আদিত্য মশারির ভেতরে বসেই চোখ পিটপিট করল। জড়ানো গলায় বলল,—কটা বাজে রে ?

—তা জেনে তোমার কী হবে ? চা খেলে বলো, এনে দিচ্ছি।

—তুই কেন ? সন্ধ্যার মা আসেনি ?

—চা দেওয়া ছাড়াও তার অন্য কাজ আছে। কবার করে ঘুরে যাবে ?

—বাব্বাহ্, তুই দেখি খুব রেগে আছিস !

তিতির উত্তর দিল না। তার দু চোখ সহসা জলে ভরে গেছে। ক্ষণিকের জন্য সজল চোখে তীব্র দৃষ্টি হেনে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল মেয়ে।

আদিত্যর বেশ অপরাধী লাগছিল নিজেকে। কেন যে কাল শঙ্করের সঙ্গে বসতে গেল ? বসলই যদি, এতটুকু সংযম রাখতে পারল না ? হাসপাতালে মেয়ের এত অনুনয়, মেয়েকে ছুঁয়ে হাজারবার প্রতিজ্ঞা, সব অবলীলায় উপেক্ষা করল ? সে এতই নরাধম !

বাথরুমে গিয়ে আদিত্য চেপে চেপে দাঁত ব্রাশ করল, কুলকুচি করল অনেকক্ষণ ধরে। যেন মুখ ধুয়ে ধুয়ে গত রাতের গ্লানি মুছে যাবে। বারবার জলের ঝাপটা দিল চোখে, আঁজলায় জল নিয়ে ঘাড়ে গলায় ছিটোল। যেন জল ছিটোলেই মিলিয়ে যাবে দুষ্কর্মের রেশ।

ভোরের দিকে মনে হয় জোর বৃষ্টি হয়েছিল, একটা শিরশিরে ভাব রয়েছে বাতাসে। আদিত্য বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে দাঁড়াল কয়েক সেকেন্ড। সুদীপ-রুনারা বেরিয়ে গেছে। বেলা বেশ বেড়েছে বোঝা যায়।

ঘরে ফিরে অন্যমনস্কভাবে বাপ্পার খাটে বসল আদিত্য। ঝুম হয়ে। অন্যমনস্কভাবেই শার্টের পকেট থেকে একটা দুমড়োনো সিগারেট বার করল। ধরাতে যাচ্ছে, তার আগেই তিতির চা এনেছে। হাতে দুখানা বিস্কুট।

—খালি পেটে চা খেয়ো না। পেটে ব্যথা উঠবে।

আদিত্য খপ করে মেয়ের হাত চেপে ধরল,—আমায় মাপ করে দে তিতির।

—তোমার বলতে লজ্জা করছে না বাবা ?

আদিত্য করুণ চোখে তাকাল,—মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে রে।

—হওয়ারই তো কথা।

—ওফ, ঘাড় নাড়াতে পারছি না। কেউ যেন ডাঙশ মারছে মাথায়।

—নেশার ডাঙশ। অবিকল ইন্দ্রাণীর গলায় কথা বলছে তিতির,—মদ পেটে পড়লে তুমি আর মানুষ থাক না বাবা।

আদিত্য ভয়ে ভয়ে চায়ে চুমুক দিল,—কাল খুব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেছি, না ?

—জানো না তুমি কী করেছ ?

—কী করেছি ?

—তোমার মনে নেই ?

আদিত্য দু-এক পল চুপ করে রইল,—বিশ্বাস কর, ঠিক মনে পড়ছে না। শংকর ট্যাক্সি করে নামিয়ে দিয়ে গেল...তারপর...তারপর...

—তুমি কাল পিসেমশাইয়ের সঙ্গে ছিলে ?

শংকরের নামটা বলে ফেলে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়েছে আদিত্য। চঞ্চল স্বরে বলল, —বল না কী করেছি ?

—কী করোনি তাই বলো। বড়কাকাকে চোরজোচ্চোর বলেছ, ছোটকাকে তো মারতেই যাচ্ছিলে। আর যা যা বলেছ তা আমি মুখেও উচ্চারণ করতে পারব না।

মুহূর্তে রাতটা জ্যান্ত হয়ে গেল। সব স্পষ্ট। সব স্পষ্ট। বিকট পশুর মতো দাপাদাপি করছে আদিত্য। ইন্দ্রাণী আটকাতে এল, তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে। দীপুদের দরজায় দুমদুম লাথি মারছে। তিতির সিঁটিয়ে আছে প্যাসেজে। মিনতি সিঁড়িতে মুখে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে। কে যেন চিৎকার করে কাঁদছিল ? অ্যাটম কি ?

ছি ছি ছি।

আদিত্যর হঠাৎ কী হয়ে গেল। তিতিরের হাত টেনে নিয়ে সেই হাতে ঠাসঠাস চড় কষাতে লাগল নিজের গালে, —আমি একটা নরকের পোকা। আমি জানোয়ার। আমি কুলাঙ্গার।

তিতির মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, পরক্ষণে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, —কী করছ কি ? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

— আমি পাগলই হয়ে গেছি। আমার মরে যাওয়াই উচিত। তুই আমাকে শাস্তি দে। মার আমাকে। মার মার, মেরে ফেল।

তিতিরের চোখ বেদনায় ভরে গেছে। একটু সময় নিল, শান্ত হতে দিল বাবাকে। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, —কেন তুমি আবার ওসব খেলে বাবা ?

ক্ষণিক উত্তেজনার পর আদিত্য ঝিমিয়ে গেছে। বসে আছে নতমুখে। শ্রান্ত স্বরে বলল,—আমি তো খাইনি রে। খেয়েছে সেই ভূতটা।

—ভূত !

আরও শ্রান্তি নেমেছে আদিত্যর গলায়, —তোকে বলেছিলাম না, আমার ভেতরে একটা ভূত আছে। সে যখন ভর করে আমার কিচ্ছুটি জ্ঞান থাকে না। সে যাই বলে, আমাকে তাই শুনতে হয়।

—সে কি শুধু তোমাকে আজেবাজে জিনিস খেতে বলে ?

—তা কেন ? আরও কত কথা বলে। তোদের কথাও বলে। বলে, তোর আমাকে নিয়ে খুব দুঃখ। বলে, আমার ওপর বাপ্পার খুব রাগ। আমার জন্য তোর মা যে একটুও সুখ পেল না, তাও বলে।

—হুঁহ। তুমি কত ভাব !

—আমি ভাবি না রে। আদিত্য মলিন হাসছে, —ভূতটা ভাবে।

—ছাই ভাবে ! ভূতটা কি জানে কাল সারা রাত্তির জেগে ছিল মা ? জানে মা'র নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল ?

আদিত্য ফস করে বলে ফেলল, —সে কি আমার জন্য ? তোর দাদার জন্য। তোর দাদা কাল চলে গেল।

—তুমি বড় নিষ্ঠুর বাবা।

আদিত্যর বুক টনটন করে উঠল। সে যে নিষ্ঠুর এ আর এমনকী নতুন কথা ! তার চারপাশের মানুষজনকে কোনওদিন সে এতটুকু স্বস্তি দিতে পারেনি। তবু মেয়ের মুখে কথাটা শুনতে কেমন যেন লাগে আদিত্যর, শেলের মতো বিঁধে থাকে বুকে। মেয়ে কি জানে এই নিষ্ঠুরতা দুর্বলতারই নামান্তর !

নাহ, আর নয়। বদলাতেই হবে নিজেকে। আজ থেকেই।

জীবনে লক্ষবার উচ্চারিত শপথ আরেকবার মনে মনে আউড়ে লণ্ডভণ্ড জামা গায়ে চড়াল

আদিত্য।

তিতির হাঁহাঁ করে উঠেছে, —কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

—একটু রাস্তায় ঘুরে আসি। নইলে মাথাটা ছাড়বে না।

—সন্ধ্যার মা জলখাবার করছে, খেয়ে বেরোও। কাল রাতে তো খাওয়া হয়নি।

—এখন ইচ্ছে করছে না রে। রান্না সেরে রাখতে বল, একটু পরে এসে ভাতটাত খেয়ে একেবারে বেরিয়ে যাব।

—আবার কোথায় বেরোবে ?

—কাজ আছে।

—ওই লোকটার সঙ্গে ?

—তুই যে আমার মা'র মতো জেরা শুরু করলি রে।

—রঘুবীর লোকটা ভাল নয় বাবা।

—কেন ভাল নয় ? লোকটা আমাদের কি ক্ষতি করেছে ? আমার জন্য উদয়াস্ত ছুটে মরছে... আদিত্য গলার আওয়াজ ভারিক্কি করল, —তুই ওর সম্পর্কে কোনও রিমার্ক করবি না। আমার খারাপ লাগে।

মুহূর্তে তিতিরের মুখ কালো, —ঠিক আছে, যেখানে খুশি যাও। তবে বলে রাখছি সূর্য ডোবার আগে বাড়ি ফিরবে।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। মেয়ের গালে আলগা টোকা মারল আদিত্য, —তোর স্কুল শুরু হচ্ছে কবে ?

—সামনের সোমবার থেকে। কেন ?

—তোর পাহারাদারির হাত থেকে বাঁচা যাবে।

—পাহারাদারির দেখেছ কী ? কালকের প্যান্ট জামা বদলাও। ওই পরে তুমি রাস্তায় যাচ্ছ !

নীচে কন্দর্প নেই। জয়মোহন কাগজে নিমগ্ন। জামাকাপড় বদলে টুক করে বেরিয়ে পড়ল আদিত্য।

দিনটা কেমন মরা মরা। মেঘের বেড়াজাল এড়িয়ে আলো ঠিক পৌঁছতে পারছে না পৃথিবীতে। উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় খানিকটা পায়চারি করে প্রেসের দরজায় এল আদিত্য। প্রেস নিয়ে তার আদৌ মাথাব্যথা নেই, প্রেসের ভবিষ্যৎ সে জানে, তবে দুর্লভকে তার বেশ পছন্দ। দুর্লভের সঙ্গে সময় অসময়ে কথা বলে মনটা অনেক হালকা করা যায়। আদিত্যর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে দুর্লভের।

কথায় কথায় রোড কন্ট্রাকটারির প্ল্যানের কথাটা বলল আদিত্য।

শুনেই দুর্লভ মহা খুশি, —এবার আপনি ঠিক পারবেন দাদা।

—বলছেন ?

—বলছি। আপনার মতো মানুষের কিছুতে একটা থিতু হওয়া দরকার।

—কিন্তু অত দূরে কাজ ....

—কী এমন দূর দাদা ? হাওড়া থেকে বাসে চাপলে দেড়-দু ঘণ্টার রাস্তা।

—দেড়-দু ঘণ্টা কি কম হল ? তার ওপর চেনা জায়গা নয়, মানুষজন কেমন জানি না...

—আপনি ভাল তো দুনিয়া ভাল। আর উদয়নারায়ণপুর জায়গা তো কিছু খারাপ নয়, আমি জানি।

—আপনি উদয়নারায়ণপুর চেনেন ?

—আমার মেজ মেয়ের বাড়ি তো আমতায়, ওখানে থেকে উদয়নারায়ণপুর আর কতটাই বা। গেছি এক-আধবার। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা, চাষবাস ভাল হয়। যেখানে চাষবাস ভাল হয়, সেখানকার লোকজন বড় একটা মারকুটে বজ্জাত হয় না।

—কাজেকর্মে অসুবিধে হবে না বলছেন ?

—অসুবিধে কিসের দাদা ? আপনি লোক খাটাবেন, তাদের ন্যায্য পাওয়া দেবেন, হুড়হুড় করে কাজ উঠে যাবে। দুর্লভ ঠোঁট টিপে হাসল, —তবে হ্যাঁ, আপনাকে খাটতে হবে।

—খাটতে আমি পারি দুর্লভবাবু, যদি টাকাপয়সা আসে। এই প্রেসের ব্যবসায়... চিটিংবাজে দেশ ভরে গেছে.... আপনার বউদি জেদ করে লড়ে যাচ্ছে....

দুর্লভ তর্ক করল না। অমলিন মুখে বলল, —আপনার যাতে মন লাগে দাদা, সেটাই করুন। কিন্তু করুন। ছাড়বেন না। লেগে থাকলে দুনিয়ায় কি না হয় ! আর রাস্তা সারাই শুনি তো বেশ ল্যাভের কাজ। কাজের মধ্যে থাকলে শরীর মন ভাল থাকবে আপনার।

আদিত্য নতুন করে মনে জোর পাচ্ছিল। শংকরের ওই সব মাথা-খারাপ করা ধান্দা থেকে সরে আসাই ভাল। ভাইদের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বাধিয়ে কী লাভ ! তার থেকে বরং সে হবে এক কাজে মানুষ। আজ থেকেই।

ইন্দ্রাণী ফেরার আগেই স্নান-খাওয়া সেরে আদিত্য বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে সামান্য ফাঁপরে পড়ল আদিত্য। ঠিক কি কাজ সে করবে আজ ? রঘুবীরের আজই উলুবেড়িয়া চলে যাওয়ার কথা, অনেকগুলো দায়িত্ব মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে রঘুবীর, সেগুলোই কি সারবে একে একে ? ইনকাম ট্যাক্স অফিসে যাবে ? কর্পোরেশান থেকে ট্রেড লাইসেন্স বার করা বেশ কঠোর পরিশ্রমের কাজ, সেটা করলে কেমন হয় ? নাকি পার্টনারশিপের কাগজ তৈরি করতে কোর্টে ছুটবে ? যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারটি নতুন অংশীদার হতে চলেছে, তাঁর নাম, ঠিকানা, অফিসের হদিশ সবই রঘুবীর দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে একবার আলাপ করে এলেও মন্দ হয় না। নতুন সঙ্গীর সঙ্গে চেনাজানা হওয়াটাও তো কাজের অঙ্গ, নয় কি ?

খানিক ভেবে কোর্টের কাজটাই আদিত্যের বেশি মনে ধরল। তার স্কুলের বন্ধু অপূর্ব শেয়ালদা কোর্টের উকিল, এখনও ন মাসে ছ মাসে এক-আধদিন তার সঙ্গে দেখা হয়, বহুবার সে বলেছে, কাজ থাকলে চলে আসিস। করে দেব।

ভাবা মাত্রই আদিত্য স্টেশনে এসেছে। রেল লাইনের ধার ঘেঁষে, প্ল্যাটফর্মের গায়ে বিশাল বিশাল হরফে স্লোগান, কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। বহুদিন আগে লেখা, ধুলোকাদায়, রোদে জলে ঝড়ে বিবর্ণ হয়ে এসেছে লেখাটা, অথচ আদিত্যর আগে তেমন করে নজরে পড়েনি। আজই বা কেন পড়ল ?

আজই আদিত্যর বাকি জীবনের প্রথম দিন, সেই জন্যই কি ?

টগবগ করতে করতে স্টেশন চত্বরে হাঁটছে আদিত্য, ট্রেন আসছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছে আদিত্য, ট্রেন আসছে না। স্টেশনের পাথরের বেঞ্চিতে বসে ঘনঘন ঘড়ি দেখছে আদিত্য, ট্রেন আসছে না। চোখের পাতা ভাতঘুমে ভারী হয়ে এল আদিত্যর, ট্রেন আসছে না।

শুধু ট্রেন না আসার জন্যই যে কত উদ্যমী পুরুষের উদ্যম মরে যায় !

আদিত্যর ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ট্রেন এল। কুমিরের মতো নিঃসাড়ে ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে। সর্বাঙ্গে ঝুলছে কাতারে কাতারে লোক।

এই ট্রেনে উঠতে পারবে আদিত্য ?

পারল। কীভাবে পারল জানে না। শুধু শেয়ালদায় পৌঁছে দেখল তার জামার দুটো বোতাম নেই, ঘড়ির ব্যান্ড খুলে ঝুলছে, মুখ চোখ চুলের দশা কহতব্য নয়। কনুইয়ের খোঁচায় খোঁচায় বুঝি ফাটল ধরে গেছে পাঁজরে। বিজবিজে ঘামের কটু গন্ধে গুলিয়ে উঠছে শরীর।

এবং আরও আশ্চর্য সে মরেনি !

বেঁচে থাকা আদিত্য কোর্টে এল। সে আজ কাজের মানুষ।

কত বাধা ! তবু কত বাধা ! অপূর্ব তার ঘরে নেই, আছে তিন নম্বর কোর্টে। আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করে তিন নম্বর ঘরে গেল আদিত্য। মোটামুটি ভিড় ঘর, কোনও মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ

চলছে। মিনমিন করে প্রশ্ন করছে এক উকিল, ফিসফিস করে ঝিমোতে ঝিমোতে উত্তর দিচ্ছে এক সাক্ষী। তাদের রহস্যালাপ কান খাড়া করে শুনছেন গোমড়ামুখো ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকটা উকিলও, অপূর্ব সমেত।

আদিত্য সামনে গিয়ে যথাসম্ভব নিম্ন স্বরে ডাকল,— এই অপু।

পঁয়তাল্লিশে মাথা ভর্তি টাক অপূর্ব ভুরু কুঁচকে ঘাড় ঘোরাল। আদিত্যকে দেখে রাগবি বলের মতো মুখটিতে হাসি ফুটেছে, — তুই ?

—তোর সঙ্গে একটা কাজ ছিল। অফিসিয়াল।

—পেছনে বোস। এই মামলাটার পরে আমার কেস। সেরে নিয়ে কথা বলছি।

—কতক্ষণ লাগবে। আমি কিন্তু অনেকক্ষণ এসেছি।

চালশে চশমা ঠিক করতে করতে সওয়াল জবাবে কান পাতল অপূর্ব, —আহ বোস না। এক্ষুনি হয়ে যাবে।

একদম পিছনের বেঞ্চিতে বসল আদিত্য। লম্বা টানা ঘরে মাথায় ওপর বেশ কয়েকটা ঘুরন্ত ফ্যান। মেঘলা আবহাওয়ায় ভারী মিঠে লাগছে হাওয়াটা। আদিত্য আরামে চোখ বুজল। দু-এক মিনিটের মধ্যেই সাক্ষীর ঝিমোনো ভাবটা সুখের মতো চারিয়ে গেল মাথায়। লোকজনের গুঞ্জন অচিরেই ঝিঁঝি পোকার ডাক। দুলে দুলে স্বপ্ন এসে গেল চোখে। .... দুধারে ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সরু লম্বা রাস্তা। রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে রোডরোলার। ঢর ঢর ঢর। রোডরোলারে ব্লু জিনস আর লাল টিশার্ট পরে বসে আছে আদিত্য, মাথায় বেতের টুপি, চোখে সানগ্লাস। যত দূর চোখ যায় রাস্তা জুড়ে কাজ করে চলেছে শ্রমিকের দল, ঝুড়ি করে স্টোনচিপস ফেলছে পথে, তরল পিচের ঝারি বোলাচ্ছে পাথরকুচিতে। রোডরোলার চালাচ্ছে রঘুবীর। তার গলায় অসংখ্য পাথরে গাঁথা এক ইয়া লম্বা মালা, কপালে কাপালিকের সিঁদুর। রোদ পড়ে পাথরের মালা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে রঘুবীর, —শীতে গড়ব, বর্ষায় ভাঙবে, হাহ হাহ হা। পাঁচ মাইলে কেটে যাবে জীবন, হাহ হাহ হা। ....

পাশ থেকে কে যেন খোঁচাল আদিত্যকে,— এই মশাই, ঘুমোচ্ছেন কেন ?

আদিত্য মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হল। একটা অসুখী চেহারার রোগা পুলিশ রুলের হালকা গোঁত্তা মারছে পিঠে। চোখ রগড়ে হাসল আদিত্য, — ঘুমোইনি তো !

—নাকে ক্ল্যারিওনেট বাজছে, আবার বলে ঘুমোইনি ! দেখুন, ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে দেখছেন। নাক ডেকে জেলে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে ?

আদিত্য উঠে পড়ল। পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই ! সর্বত্র পাহারাদার ঘাপটি মেরে আছে !

কাঁচাঘুম ভেঙে মাথা বিনবিন করছে, এক কাপ কষটে চা খেয়েও বিনবিনে ভাবটা যাচ্ছিল না আদিত্যর। ধ্যাৎতেরি, এর থেকে দুপুরে একটু গড়িয়ে নিয়ে বেরোলেই ভাল হত।

হন্তদন্ত হয়ে কোর্টরুম থেকে বেরিয়েছে অপূর্ব— কী বলছিলি বল।

আদিত্য হাই তুলে বলল,— একটা পার্টানারশিপ ডিড তৈরি করে দিতে হবে।

—কটা পার্টি ?

—মানে ?

—মানে কজনের মধ্যে পার্টনারশিপ ?

—তিনজন। আদিত্য একটা সিগারেট ধরাল।

দূর থেকে এক তালঢ্যাঙা লোক ডাকছে অপূর্বকে। টুক করে আদিত্যর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে নিল অপূর্ব,— এই ফাইলগুলো নিয়ে আমার ঘরে যা। আমি আসছি।

দু-চার পা গিয়েও অপূর্ব ফিরে এসেছে, দু-এক সেকেন্ড জরিপ করল আদিত্যকে, — নাহ, ফাইলগুলো দে। তুই ঘরে গিয়ে বোস। চলে যাস না যেন।

উকিলদের ঘরে যথারীতি চিটচিটে ভিড়। তার মধ্যে এক কালো কোট চামচ করে মুড়ি খাচ্ছে।

একজনকে ঘিরে মৌমাছির মতো চার-পাঁচটি মক্কেল, মূকাভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে সকলে। কেউ ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে যাচ্ছে। কেউ বেরিয়ে গিয়েই ঘরে ঢুকছে। একজন দেশলাই কাঠিতে ডিমসেদ্ধ গেঁথে গোটাটাই এক সঙ্গে মুখে পুরে দিল। আস্তে আস্তে নামছে ডিমটা। গাল থেকে কণ্ঠনালী, ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

আদিত্য গোটা সাতেক জাম্বো সাইজের হাই তুলে ফেলল। পঁচিশ মিনিট কেটে গেছে, এখনও অপূর্বর দেখা নেই। এভাবে কী কিছু হয়! বসে বসে কেটে গেল দিনটা!

অষ্টম হাইয়ের তুড়িটা বাজাচ্ছিল আদিত্য, অপূর্ব এসে পাশে বসল, —শেয়ার কি ইকুয়াল?

—মানে?

—মানে তোদের তিন পার্টনারের কি ইকুয়াল শেয়ার?

—না না, দুজন ইকুয়াল। একজনের কম আছে।

—নাম ঠিকানা সব নিয়ে এসেছিস?

—এই তো, ডায়েরিতে আছে।

—ডাটাগুলো লিখে দিয়ে যা। সামনের রোববার বাড়িতে আয়। রাত নটার পর।

—কী লিখে দেব?

—সব লেখ। কোম্পানির নাম লেখ, কার কত শেয়ার লেখ। পার্টনারদের বাবার নামও দিস।

—কিসের কোম্পানি জিজ্ঞেস করলি না? আদিত্য রাগবি বলের মতো মুখটার দিকে উৎসাহিত হয়ে তাকাল।

এবার অপূর্ব হাই তুলছে,—কী হবে জেনে? বাঙালিদের পার্টনারশিপ টেঁকে না। ডিডগুলো ছাগলে খায়। আমি মাল পাব, কাজ করে দেব, আমার কি! বলেই টেরচাভাবে আদিত্যর দিকে তাকাল। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে,— তুই লেখ আমি একটু পাঁচ নম্বরের পেশকারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।

আদিত্য ডায়েরি খুলে নাম-ঠিকানা লিখছে। লিখে বসে আছে। পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। কুড়ি মিনিট। আদিত্য বসেই আছে।

সন্ধের আগেই আদিত্য ফিরল।

ইন্দ্রাণী একাই ছিল। ঘরে। আঁচলে চোখ ঢেকে চুপচাপ শুয়েছিল সে।

অন্ধকার নামছে সবে, আদিত্য ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল, —অসময়ে শুয়ে আছ যে? মাথা ধরেছে?

ভুরু কুঁচকে একঝলক আদিত্যকে দেখে নিয়েই পিছন ফিরে শুয়েছে ইন্দ্রাণী। পায়ের দিকের কাপড় অনেকটা উঠে গিয়েছিল, পা দিয়েই টেনে নামিয়ে দিল,— আলোটা নিবিয়ে দাও।

আদিত্য তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিল। একবার আলো জ্বলে নেবার পর ঘরের অন্ধকার যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মশার তাড়নায় বিকেলের আগেই সমস্ত জানলা বন্ধ করে দেয় ইন্দ্রাণী, আজ করেনি। জানলার গায়ে যেটুকু আলো লেপটে আছে, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল আদিত্য। আবার ফিরল অন্ধকারে। বার দু-তিন পায়চারি করে খাটের এক কোণে বসেছে। সসংকোচে। যেন কাকপক্ষী শুনতে না পায় এমন স্বরে বলল,— ঝোঁকের মাথায় কাল একটা ভুল করে ফেলেছি। আর হবে না।

ইন্দ্রাণী কি শুনতে পেল? আদিত্য বুঝতে পারল না। আরেকটু গলা ওঠাল,— আমি চাঁদু দীপুর কাছে মাপ চেয়ে নেব।

ইন্দ্রাণী নিঃসাড়। বাঁকাচোরা কোলবালিশটা হয়ে শুয়েই আছে।

আদিত্যও আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না। খানিকক্ষণ হাতড়ে হাতড়ে অন্ধকার থেকে একটা কথা বার করল। জুতসই হবে ভেবে বলেও ফেলল, —বাপ্পা এতক্ষণে পৌঁছে গেছে। অবশ্য ট্রেন যদি না

লেট থাকে। ..... আজকাল ট্রেনের যা অবস্থা !... আজ শেয়ালদা যেতে গিয়েই আমার জামার দুটো বোতাম ছিঁড়ে গেল।

ইন্দ্রাণী চুপ।

আদিত্য এবার কথা বানাল,— বিজনেসের পেপ্যারস তৈরি করতে এক উকিলবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম, সে বলছিল, বম্বে যাওয়ার পথে আজকাল নাকি খুব ঠগজোচ্চোর উঠছে। ভুশাওয়াল থেকে। সেই যে গো যেখানে ভাল কলা হয়। তাস খেলার নাম করে ঢোকে, তাসের জুয়ায় সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওর এক বন্ধু নাকি বম্বেতে আন্ডারপ্যান্ট পরে নেমেছিল। বাপ্পা তাস খেলা জানে না তো ?

এতক্ষণে একটা হিমশীতল কণ্ঠ শোনা গেল,— কানের কাছে আজেবাজে বকে যাচ্ছ কেন ? আজ তোমার কোথাও আসর নেই ?

আদিত্য ভয় তাড়াতে জোর করে হেসে উঠল,— কাল একটা হয়ে গিয়েছিল বলে..... নেহাত একজন খুব ধরল......

—জানি। জয়ি দুপুরে এসেছিল। সব বলে গেছে।

এই না হলে মায়ের পেটের বোন ! একটা দিন তর সইল না, সব কথা এসে উগরে গেলি ! শংকরকে যে ইন্দ্রাণী তেমন পছন্দ করে না, আদিত্য জানে। তার সঙ্গে বসে মদ খেয়েছে, তারই বুদ্ধিতে ভাইদের এসে তড়পেছে, এ কথা যখন জেনেই গেছে ইন্দ্রাণী, তখন আর কি করা ! কাঁচুমাচু মুখে শাস্তির অপেক্ষায় বসে রইল আদিত্য।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ উঠে বসল,— আলোটা জ্বালো তো।

প্রায় দৌড়ে গিয়ে আলো জ্বেলেছে আদিত্য। ইন্দ্রাণী শান্তভাবে বলল,— শোনো, একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। ওসব মতলব তুমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো।

—আমি তো ঝেড়ে ফেলেছি। আদিত্য পলকে সুবোধ বালক,— তোমাকে সেই কথাই তো বলতে চাইছি, তুমিই শুনছ না।

—ঝেড়ে ফেলার ওই নমুনা !

আদিত্য ঘাড় চুলকোল,— কাল শংকর এমন লাখ লাখ টাকার হিসেব দেখাল। আমারও মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। তাই না.....

—তার জন্য যা মুখ পোড়ানোর সে তো পুড়িয়েইছ। মাথাতে আর ওসব প্যাঁচ ঢুকিও না।

—বলছি তো ঢোকাব না।

—হ্যাঁ। কথাটা মনে রেখো। ইন্দ্রাণী ঠাণ্ডা স্বরে বলল,—বাবা আজ জয়ির ওপর খুব চেঁচামেচি করেছেন।

—জয়ি কী বলেছিল বাবাকে ?

—আমাকে পুরো ভেঙে বলেনি। তোমরা, ভাইবোনেরা কেউ কি আমাকে পুরো কথা বলো ? দরকারের সময়ে বউদি, অদরকারে আমি অন্য বাড়ির লোক। তবে শুনে মনে হল তোমার আর শংকরের প্ল্যানটার কথাই কায়দা করে পাড়তে গিয়েছিল। খুব ধমক খেয়েছে। ওপরে এসে মুখ চুন করে বসেছিল।

—ঠিক হয়েছে। কেন বাড়ি ভাঙা হবে ! আমিও মোটেই বাড়ি ভাঙার পক্ষে নই। বিশ্বাস না হয় চাঁদুকে ডেকে জিজ্ঞেস করো। আমি কাল সকালেই চাঁদুকে মুখের ওপর কথাটা বলে দিয়েছিলাম।

—বলেছিলে, অথচ এক বেলাও নিজের মতিতে স্থির থাকতে পারলে না।

—এবার পারব। নতুন ব্যবসাটা শুরু হতে দাও.......

ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হাসল, —এবার কত টাকা জলে ফেলবে ?

—বলছি তো এবার টাকা লাগবে না। আদিত্য সামান্য লজ্জা পেয়েছে যেন, —ঠিকাদাররা কাজ

তুলবে, টাকাও তারাই লাগাবে। তা ছাড়া জলে ফেলার মতো টাকাই বা কোথায় এখন ?

—বলা যায় না, হয়তো আবার শুভাশিসের কাছে চেয়ে বসবে। ইন্দ্রাণী যেন কোনও শিশুকে সাবধান করছে, এমন ভঙ্গিতে বলল,— শুভাশিসের কাছে কিন্তু একদম চাইবে না বলে দিলাম। ওর আগের টাকাই এখনও শোধ করে উঠতে পারিনি। এখনও তিন-চার হাজার বাকি।

—অত হিসেব করে কড়ায়গণ্ডায় শোধ করারই বা কী আছে ? ডাক্তার কি তোমার কাছে টাকা চেয়েছে কখনও ? তুমিই তো জোর করে......

—এমন ছেলেমানুষের মতো কথা বলো। যতই সে সংসারের ঘনিষ্ঠ হোক, সে বাইরের লোক। তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, শোধ করতে হবে না ? আমার কি এটুকু আত্মসম্মানও থাকতে দেবে না তুমি ?

কোমল স্বরে কথাগুলো বলছে ইন্দ্রাণী, আদিত্য শুনছিল না। স্থির চোখে স্ত্রীকে দেখছিল। কেন যে হঠাৎ উথালপাতাল ঢেউ উঠছে বুকে !

ইন্দ্রাণীর চোখ জানলার বাইরে। আপন মনে বলল, — কারুর কাছে ঋণী থাকতে আমার ভাল লাগে না। কারুর কাছে না।

ইন্দ্রাণীর ঘাড় একটু ডান দিকে হেলে আছে, ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেছে দুই ঠোঁট, চোখের পাতা কাঁপছে তিরতির। কী অপরূপ যে এই ভঙ্গিমা ! শুভদৃষ্টির সময়েও ওইরকমই হেলানো ছিল ঘাড়টা, চোখের পাতা ওইরকমই কাঁপছিল তিরতির। তারপর কত দিন, কত মাস, কত বছর কেটে গেল, কই এখনও তো দৃশ্যটা এতটুকু আবছা হল না !

ইন্দ্রাণী অস্বস্তিভরা চোখে তাকাল,—কী দেখছ ?

আদিত্য ভেতর থেকে হাহা করে কেঁপে উঠল। ওরে বউ, তোকে দেখে দেখে যে তৃষ্ণা মেটে না আদিত্যর, এ কথা কি বুঝিস তুই ?

আচম্বিতে আদিত্যর ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না কৌশিকা সব এক যোগে ঝটাপটি শুরু করেছে। বুকের ঢেউয়ে দুলছে এক ডিঙি নৌকো। আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। কতকাল বউটা আর কাছে আসে না। বিয়ের পর যাও বা কিছুদিন ইন্দ্রাণীকে পেয়েছিল আদিত্য, সেও তো বরফের সঙ্গে সহবাস। নিজে থেকে কি ইন্দ্রাণী এসেছে কোনওদিন ?

এসেছিল। একবার। একবারই। টানা তিন-চার রাত আদিত্যকে লতার মতো আঁকড়ে ধরেছিল ইন্দ্রাণী। তারপরেই না তিতির এল ! তারপর একবারও তো আর....... ! কেন রে বউ, আদিত্যর কি কাম বাসনা ক্ষিধে কোনও কিছুই থাকতে নেই !

সম্মোহিত পতঙ্গের মতো হঠাৎই ইন্দ্রাণীর হাত চেপে ধরল আদিত্য। ইন্দ্রাণী সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিল না। যেন স্পর্শটাকে ঠিকঠাক বুঝে নিতে চাইছে। যেন শুষে নিতে চাইছে আদিত্যর উত্তাপ। শুধু হাতের ছোঁয়াতেই রক্তকণিকারা মাতাল ঘোড়সওয়ারের মতো ছুটছে আদিত্যর। নাচছে। হাসছে। টগবগ করে ফুটছে।

ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে হাতটাকে ছাড়িয়ে নিল। খানিকটা কেজো স্বরে বলল,— নীচে যাই। সন্ধ্যার মা তাড়াতাড়ি চলে গেছে, রাতের রুটি করতে হবে।

আদিত্য নিস্পন্দ। যাস না রে বউ।

খাট থেকে নেমে ইন্দ্রাণী দরজায় এসে দাঁড়াল,— চা খাবে ?

আদিত্য উত্তর দিল না। ফ্যাকাসে হাসল। ওরে তিতির, দেখে যা কে বেশি নিষ্ঠুর !

১৯

তিতির ঘুমোচ্ছিল।

স্কুলে বেরোনোর আগে তিতিরকে জাগিয়ে দিল ইন্দ্রাণী,—এই তিতির, ওঠ। উঠে পড়।

একবার চোখ খুলল তিতির। উম উম শব্দ করে আরও কুঁকড়ে শুল,—এখন কেন ? আগে সন্ধ্যার মা চা দিক।

—আজ নয় একটু তাড়াতাড়ি উঠলি। আজ না তোর ক্লাস শুরু !

কথাটা কানে যেতেই তিতির তড়াক করে উঠে বসেছে। সত্যিই তো ! আজই তার নতুন স্কুলে প্রথম দিন। আজ কি তার বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো সাজে !

আকাশ একেবারে মেঘমুক্ত। অনেক দিন পর ভারি সুন্দর একটা সকাল ফুটে আছে বাইরে। গাঢ় হলুদ রঙা রোদ্দুর আলোয় আলোময় করে রেখেছে সকালটাকে। ভ্যাপসা ভাব কেটে মিষ্টি বাতাস বইছে।

তিতির নতুন স্কুলে যাবে বলেই কি আজ এত আয়োজন ?

তক্ষুনি আর একটা কথা মনে পড়ে গেল তিতিরের। নতুন স্কুলে টোটোও পড়ে। সেই নার্সারি থেকে। টোটোর সঙ্গে দেখা হবে আজ।

কতকাল যে টোটোর সঙ্গে দেখা হয়নি। খুব ছোটবেলায়, ছ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত টোটোর সঙ্গে বেশ ভাবই ছিল। মাঝে মাঝেই মা বাবার সঙ্গে ভাইবোনে যেত ডাক্তার আঙ্কলের বাড়ি। টোটোর জন্মদিনে তো বটেই। তারিখটা ভারি মজার। ফার্স্ট এপ্রিল। গিয়েই তিতির চেঁচাত, এপ্রিল ফুল ! এপ্রিল ফুল ! খুব ঘটা হত টোটোর জন্মদিনে। এ তো আর তিতিরদের বাড়ির মতো নয় যে শুধু জুন মাসের আট তারিখে মেয়ের জন্য একটু পায়েস করে রাখল মা, আর ছোটকা বড় জোর রাত্রিবেলা বাইরে থেকে খাবার কিনে আনল ! অনেক লোকজন আসত টোটোদের বাড়ি। খুব হইহুল্লোড় হত। একবার একটা ম্যাজিক শোও করিয়েছিল ছন্দা আন্টি। দাদার সঙ্গে টোটোর খুব বনত না, টোটোর নতুন খেলনায় দাদা হাত ছোঁওয়ালেই টোটো গলা ফাটিয়ে চেঁচাত। বাপস, কী জোর ছিল টোটোর গলায় ! সেই টোটোই কিন্তু তিতিরকে খুশি মনে দিয়ে দিত সব কিছু। নিজের প্রিয় টয়গানটা পর্যন্ত অবলীলায় দিয়ে দিয়েছিল, নে তোকে এক্কেবারে দিয়ে দিলাম।

কবে থেকে যে ডাক্তার আঙ্কলের বাড়ি যাওয়াটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল ! বোধহয় সেই ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময়। সেও টোটোরই জন্মদিনে। কী যে হল সেদিন ! ছবির মতো সুন্দর ফ্ল্যাট বেলুন আর রঙিন কাগজে সাজানো, সব্বার হাতে চপ কাটলেট কেক মিষ্টি ঘুরছে, তিতিররা টোটোর নতুন বাইসাইকেল নিয়ে দারুণ উত্তেজিত, হঠাৎ থমথমে মুখে মা এসে হাত চেপে ধরল দুই ভাইবোনের। অনেক হয়েছে। এবার বাড়ি চলো। পিছন থেকে ডাক্তার আঙ্কল ডাকছে। ইন্দ্রাণী যেয়ো না। একটু বোসো। আমার কথা শোনো। মা শুনেও শুনল না। উল্টে ধমকে বাবাকেও বার করে নিয়ে এল বাড়ি থেকে।

সেই শেষ। ডাক্তার আঙ্কলের আসাটা কমল না, কিন্তু তাদের যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল চিরতরে। তিতিরের এখনও মনে আছে, পরদিনই ডাক্তার আঙ্কলের সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হয়েছিল মা'র। অনেক কষ্টে বাবা থামিয়েছিল মাকে। ছন্দা আন্টির সঙ্গে কি মা'র ঝগড়া হয়েছিল সেদিন ! কে জানে ! ছন্দা আন্টি তো তার পরেও ফোন করে, এবং তিতিরদের সঙ্গে তো বেশ ভালভাবেই কথা বলে। এই সেদিনও, যেদিন বাবাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হল, ডাক্তার আঙ্কলকে ফোন করেছিল তিতির, ছন্দা আন্টির গলা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল।

সে যাই হোক, মা'র মারপ্যাঁচ নিয়ে মা থাক, তিতির কিন্তু চিরকালই খোঁজ রেখে গেছে টোটোর। ডাক্তার আঙ্কলকে সব সময়ে টোটোর কথা জিজ্ঞাসা করে সে। ফোনে কথা হলে ছন্দা আন্টিকেও। টোটোর সঙ্গেও যে টেলিফোনে কথা হয় না এমন নয়, বছর কয়েক আগেও মাঝে মাঝেই হত। ইদানীং ফোনে টোটোকে কেমন গম্ভীর গম্ভীর লাগে। কি, কেমন আছ, ধরো বাবাকে দিচ্ছি, ব্যস।

টোটো কি অনেক বড় হয়ে গেছে ? সেই পুচকে টোটো ! তিতির নিজের মনে ফিক করে হেসে ফেলল। সে তো হয়েছেই। গত পুজোর আগের পুজোয় ডাক্তার আঙ্কলরা রাজস্থান বেড়াতে গেল, ফিরে এসে ছবি দেখিয়েছিল অনেক। উটের পিঠে রাজপুত বীরের মতো বসে আছে টোটো।

সানগ্লাস পরে অনিল কাপুরের পোজে টোটো দাঁড়িয়ে আছে, শুধু বুরুশ গোঁফটাই নেই ! হিহি। দাঁত মাজতে মাজতে বাথরুমের আয়নার তিতিরকে ধমকাল তিতির। হুবহু মা'র ভঙ্গিতে। হেসো না তিতির, তুমিও আর কচি খুকিটি নেই। তুমিও মেঘে মেঘে সিক্সটিন প্লাস। এই বয়সে তোমার ঠাকুমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল সে খবর রাখো ?

ইন্দ্রাণী নীচ থেকে ডাকছে তিতিরকে।

তিতির ব্রাশ মুখে সিঁড়িতে এল,—কী ?

ইন্দ্রাণী কর্তৃত্বের সুরে বলল,—শোনো, প্রথমদিন যদি একা অত দূরে যেতে অস্বস্তি হয়, বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।

তিতির আলগা ঘাড় নেড়ে সরে যাচ্ছিল, ইন্দ্রাণী আবার ডাকল,—হুটোপাটি কোরো না, পুরো কথা শোনো। বইয়ের যদি কোনও লিস্ট দেয় ভাল করে লিখে আনবে। আর বিকেলে বাড়ি থেকো। আমার স্কুলের একজন আসতে পারেন। তোমার শেফালি মাসি। বসিও। আমি মানিকতলা থেকে সন্ধের আগেই ফিরব।

মা বেরিয়ে যাওয়ার পরও তিতির দাঁড়িয়েই রইল। মনে মনে ভ্রূকুটি হেনে চলল মাকে। হুঁহ, একা স্কুলে যাবে না ! এতদিন তো একা একাই গেছে, কে রোজ রোজ হাত ধরে পৌঁছে দিয়ে এসেছে তিতিরকে ! বড় জোর ছোটকা স্কুটারে দু-চার দিন। তাও মেজাজ-মর্জি ভাল থাকলে। স্কুলটা অবশ্য কাছেই ছিল, দিব্যি হেঁটে হেঁটে রাস্তা দেখতে দেখতে চলে যাওয়া যেত। তা এই স্কুলই বা কি এমন দূর, বাসে চড়ে বেশি হলে দশ মিনিট ! তিতির কি একা একা বাসে উঠতে ভয় পায় ! ঝুলন যদি মা'র কথা শোনে তো খেপিয়েই মেরে ফেলবে তিতিরকে।

ঝুলনের কথা মনে পড়তেই তিতিরের মনটা অল্প ভারী হয়ে গেল। অনিতা ঋতশ্রী বিদীপ্তা মউ, স্কুলের বন্ধুরা আর কেউই তেমন সঙ্গে রইল না। শুধু ঝুলন আর হিয়া ছাড়া। তাও হিয়া চলে গেল সায়েন্সে, তিনি হবেন ডাক্তার ! ঝুলন আর্টস নিয়ে সঙ্গে আছে এটুকুই যা সান্ত্বনা। দেবস্মিতারও খুব ইচ্ছে ছিল তিতিরদের সঙ্গে ভর্তি হওয়ার। ফর্ম ফিল আপ করল, ফার্স্ট লিস্টে নামও বেরিয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ওর পাকা দিদিটা বোনের ইচ্ছেয় পেরেক গেঁথে দিল। উনি মেয়েদের যে নামী কলেজটিতে পড়েছেন সেখানেই ঢুকতে হবে বোনকে। হুকুম। দেবস্মিতা বন্ধু হিসেবে একটু স্বার্থপর, তবু সঙ্গে থাকলে তিতিরের ভালই লাগত। হিয়া তিতির ঝুলন দেবস্মিতা চারজনে একটা টিম তৈরি হয়েছিল, ভেঙে গেল। কী আর করা, হয়তো বা এখন থেকেই জীবনে বিচ্ছেদের পালা শুরু !

কষ্টের মধ্যেও একটা চাপা গুরগুর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিল তিতির। বুকের ভেতরে।

উত্তেজনাটা বুকে নিয়েই সময় কেটে গেল তিতিরের। উত্তেজনাটাই ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিল টকটক।

সন্ধ্যার মাকে তাগাদা দিয়ে ভাতের থালায় বসে গেছে তিতির। পৌনে নটায়। খেতে খেতেই টের পেল বড়কাকা অফিস বেরোচ্ছে। অ্যাটমকে নিয়ে কাকিমাও। সে রাত্রের পর থেকে বড়কাকা ভীষণ চুপচাপ হয়ে গেছে। কাকিমাও যেচে তেমন কথা বলছে না। তিতির খুব আশা করেছিল আজ অন্তত কাকা-কাকিমা তিতিরকে কিছু বলবে। নতুন স্কুলে যাওয়া নিয়ে। বলল না। শুধু অ্যাটম হেসে জিভ ভেঙিয়ে গেল একবার।

ঘরে এসে তিতির প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রথম দিন বইখাতা না নিলেও চলে, তবু দুটো একটা খাতা ঢোকাল কাঁধঝোলা ব্যাগে। ইংরিজি বাংলার টেক্সট বই সদ্য কেনা হয়েছে, কি ভেবে বইগুলো ব্যাগে পুরল। আলমারি খুলে বার করল নতুন ইউনিফর্ম।

ইউনিফর্ম গায়ে চড়াতেই মন আবার কটকট করে উঠেছে। ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় ধূসর পোশাকে এ কোন তিতির ? সেই কোন কেজি ওয়ান থেকে পরা চোখ ধাঁধানো নীলসাদা রঙ কেন হঠাৎ ধূসর হয়ে গেল আজ।

এ বাড়িতে এখনও প্রণামের রেওয়াজ আছে। পাশের ঘরে এসে তিতির বাবাকে ঢিপ করে প্রণাম করল একটা।

আদিত্য কাগজ পড়ছিল। চোখ কুঁচকে তাকাল,—এর মধ্যেই তৈরি ?

—হুঁ। দশটায় ক্লাস.....প্রথম দিন....একটু আগেই বেরোই।

—আমি যাব সঙ্গে ?

—কী হবে ? এই তো গিয়ে বাসে উঠব, আর নামব।

—ভেবে দ্যাখ। আমার কোনও অসুবিধে নেই...তোর মাও কিন্তু আমাকে বলে গেছে....

—কিচ্ছু লাগবে না বাবা। কারুর বাড়ি থেকে ইলেভেনের মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে যায় না।

বাপ্পা বম্বে থেকে ফেরেনি। তার শূন্য খাটটার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল তিতির। থাকলে দাদাও আজ একটা প্রণাম পেয়ে যেত।

কন্দর্প নেই। আদিত্যর তাণ্ডবলীলার পর দিনই আউটডোর শুটিং-এর নাম করে কেটে পড়েছে, চার দিন হয়ে গেল এখনও তার ফেরার চিহ্ন নেই। ছোটকার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে দাদুর ঘরে এল তিতির।

বাঁধানো দাঁতে খড়মড় টোস্ট চিবোচ্ছেন জয়মোহন। ঢোঁক গিলে বললেন,—স্কুল পাশ করে গেলি, এখনও ইউনিফর্ম ঘুচল না ?

—এটাও তো স্কুল। তিতির হাসল।

—এত বড় মেয়েদের এসব স্কার্ট-টাট পরানোর মানে হয় ? ঠ্যাং বেরিয়ে থাকে !

চোখ নামিয়ে পায়ের দিকটা দেখল তিতির,—কেন, এ তো বেশ ভালই আছে।

—কিছু ভাল নেই। এই বয়সে শাড়ি পরা উচিত। যা। যাওয়ার আগে মিনতিকে চা দিতে বলে যা তো।

মিনতিকে বলে বেরিয়ে এল তিতির। গেট খুলে তরতর পায়ে হাঁটতে যাচ্ছিল, পোস্তদানা মনটা পিনপিন করে উঠল,—খুব যে ফুর্তি ! অত ফুর্তি থাকবে না।

তিতির বলল,—কেন থাকবে না ? নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস.....

—স্কুলটাই তোমার ভাল লাগবে না।

—বললেই হল ! কত নামী স্কুল জানো ? কত কষ্ট করে ভর্তি হতে হয়, কী বিশাল বিল্ডিং, প্রতি বছর দু-তিনজন স্ট্যান্ড করে ওই স্কুল থেকে।

—করুক গে। তবু তোমার ভাল লাগবে না।

—লাগবে। তুমি চুপ করো।

স্কুলের সামনে এসে তিতির খানিকটা দিশেহারা হয়ে গেল। ওরে ব্বাস, এ তো স্কুল নয়, মহাসমুদ্র ! কাতারে কাতারে ছেলেমেয়ে গেট দিয়ে ঢুকছে তো ঢুকছেই। ভিড়ের চোটে রাস্তাঘাটের গাড়িঘোড়া বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তিতিরের চোখের সামনেই দৈত্যের মতো দুখানা স্কুলবাস এসে আরও ছেলেমেয়ে উগরে দিল। বড় স্কুল তো জানতই, কিন্তু কত হাজার ছেলেমেয়ে পড়ে এখানে ? তাদের স্কুলটাও এমন কিছু ছোট ছিল না, নার্সারি থেকে ক্লাস টেন মিলিয়ে হাজার খানেক মেয়ে তো পড়েই, তবে এই মহাসমুদ্রের তুলনায় সেটা যেন বড় জোর একটা দিঘি।

সত্যিই দুটো স্কুল কোনও দিক দিয়েই এতটুকু মেলে না। তিতিরদের স্কুলের কম্পাউন্ডটা ছিল বিশাল। পাঁচিল ঘেরা। গায়ে গায়ে ইউ শেপে সাজানো তিনটে দোতলা বাড়ি। মাঝখানে ফুটবল গ্রাউন্ড সাইজের এক মাঠ। সারা বছর সেই মাঠের রঙ ঘন সবুজ। তিন বিল্ডিং-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্লাসরুম, মেয়েদের হোস্টেল, টিচার্স রুম। এক পাশে ধ্যানগম্ভীর চ্যাপেল। তাদের রেক্টর সিস্টার ভেরোনিকা মানুষটি গম্ভীর, কিন্তু ভারি শান্ত। রুচিটিও তাঁর ভারি মনোরম। শীতকালে তিন বিল্ডিং-এর সামনেটা জুড়ে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, জিনিয়ার প্লাবন বয়ে যায়। সিস্টার ভেরোনিকা নিজে তদারক করে মালিকে দিয়ে প্রতি সপ্তাহে ঘাস ছাঁটিয়ে মখমল করে রাখেন মাঠটাকে। আহা,

কী অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী ওই স্কুলটার ! এই স্কুলের সব কিছুই কেমন অন্যরকম। স্কুল বাড়িটা প্রকাণ্ড, কিন্তু কেমন যেন বড্ড বেশি উঁচু, বড্ড বেশি খাড়া। বাড়িটা ঝকঝকে তকতকে, কিন্তু কেমন যেন বড় বেশি সাহেবি কোম্পানির অফিস অফিস ভাব। আর সবুজ এত কম। মাঠ নেই, লন নেই, তার বদলে একটা চাতাল। চাতালটা বড়সড়, কিন্তু সিমেন্টের। সেখানে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। গাছগাছালি যেটুকুনি আছে তা হল কিছু ছড়ানো ছিটোনো ফুলের টব।

ক্লাস খুঁজতেও তিতিরকে বেশ বেগ পেতে হল। এখানে এক একটা ক্লাসে অজস্র সেকশান, গুনতে গেলে ইংরিজি বর্ণমালা প্রায় শেষ হয়ে যায়। লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোন তলায় যাবে, কোন ঘরে ঢুকবে ভাবছে তিতির, হঠাৎ ঝুলন এসে হাত ধরে টানল,—চল চল, আমরা সেকেন্ড ফ্লোর।

—তুই ক্লাস দেখে এসেছিস ? তিতির বেশ নার্ভাস বোধ করছিল।

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। আমি তোর মতো কেবলু নাকি ?

ক্লাসে ঢুকে ঘাবড়ানো ভাব আরও বেড়ে গেল তিতিরের। ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই পরস্পরের চেনা, এই স্কুলেরই ছাত্রছাত্রী সব, বাকি মাত্র পনেরো জন এসেছে অন্যান্য স্কুল থেকে। যারা এ স্কুলের, তারা স্বচ্ছন্দে গল্পগুজব করছে নিজেদের মধ্যে, সে তুলনায় তিতিররা যেন একঘরে। তাছাড়া ছেলেদের সঙ্গেও আগে তো কখনও পড়েনি তিতির ! এতগুলো ছেলে থাকবে ক্লাসে। এদের মধ্যে কয়েকজনের অবশ্য বেশ নিরীহ সুবোধ চেহারা, দেখে ভাই ভাই মনে হয়। কয়েকজন রীতিমতো পরিণতদর্শন। ভাল মতো গোঁফদাড়ি গজিয়ে গেছে। গলার স্বরও হেঁড়ে হেঁড়ে। এদের সামনে স্যার বা আন্টিরা যদি কোনও প্রশ্ন করে, আর তিতির উত্তর দিতে না পারে, তবে তো তিতির লজ্জাতেই মরে যাবে।

তা সেরকম কিছু হল না। ক্লাসই হল না ভাল করে। ম্যানেজিং কমিটির কে একজন মারা গেছে, দু পিরিয়ডের পর ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল।

ঝুলনের বন্ধু তৈরি করতে সময় লাগে না, ক্লাস শেষ হতেই সে ঘুরে ঘুরে আলাপ জমাচ্ছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। দু-চার মিনিট ঝুলনের পাশে বোকা বোকা মুখে দাঁড়িয়ে রইল তিতির, তারপর সরে এল। ঝড়ের গতিতে নিচে নেমে এসেছে। স্কুলের মেন গেটের সামনে দাঁড়াল একটু। যেমন ঢুকেছিল তেমনই স্রোতের মতো বেরোচ্ছে সকলে। এদের মধ্যে টোটোরও তো থাকা উচিত।

উচ্ছল মেজাজে বেরোচ্ছে ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ ছুটির আনন্দে হাসছে, ছুটছে, চিৎকার করে ডাকছে পরস্পরকে। এক দল দৌড়ে স্কুলবাসে উঠে গেল, কেউ কেউ নিজেদের গাড়ির অপেক্ষায়। তিন জন মধ্যবয়সী শিক্ষিকা কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছেন, তাঁদের দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দাঁড়াল কয়েকটা ছেলেমেয়ে। তিতিরও সরল একটু, কিন্তু গেট থেকে চোখ সরাল না।

এক ঝাঁক নতুন বন্ধু জোগাড় করে বেরিয়ে আসছে ঝুলন। দুটো ষণ্ডা চেহারার ছেলেও আছে তাদের মধ্যে। ঝুলনেরই একা মুখ চলছে, বাকিরা বেশির ভাগই শ্রোতা।

তিতিরের সামনে এসে ঝুলন থামল,—তুই কখন নেমে এলি ? আমি তোকে খুঁজছি...

চোখ স্থির রেখে তিতির হাসল,— এই তো।

—কী করবি এখন ?

—বাড়ি যাব।

—কী হবে বাড়ি গিয়ে ? বাড়িতে তো জানেই চারটে অবধি স্কুল।

—তো ?

—সিনেমায় চল। নিউ এম্পায়ারে। এদের সঙ্গে দোস্তি হল, সেলিব্রেট করবি না ? বলেই ওস্তাদ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ঝুলন,—ও, তোর সঙ্গে তো আলাপ হয়নি। অ্যাই, এই হল তিতির। সরি, মঞ্জিমা।

একটা ছেলে হাত বাড়িয়ে দিল, — আমি সম্রাট।

একজন মাথা দোলাল,— আমি পাঞ্চালী।

একে একে নাম বলে যাচ্ছে সবাই, নামগুলো ঠিক ঠিক মাথায় ঢুকছিল না তিতিরের। বুকের কাঁপুনিটা যায়নি তখনও। তিনটে ছেলে হাত পা নেড়ে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে। লম্বা ছেলেটা কি টোটো ? উহুঁ।

গেটের দিকে চোখ রেখেই তিতির বলল,— না রে, আমি আজ বাড়িই যাই। বাড়িতে একজন আসার কথা আছে।

—ও কে। অ্যাজ ইউ প্লিজ। ঝুলন আবার কাঁধ ঝাঁকাল,— ডাসটিন হফম্যানের ফিল্ম ছিল, তুইই মিস করলি।

ঝুলনরা চলে গেল।

আনমনে বিল্ডিংটার মাথার দিকে তাকাল তিতির। বড্ড উঁচু ! বড্ড খাড়া ! এর থেকে তাদের দোতলাবাড়ি স্কুলটাই ভাল ছিল। অনেক কাছের মনে হত স্কুলটাকে। এই অট্টালিকা কি তার আপন হবে কোনওদিন ?

চারদিক ক্রমশ ফাঁকা হয়ে এল। চাতাল প্রায় নির্জন। দুটি মেয়ে সিঁড়িতে বসে কথা বলছে শুধু। টিফিনও খাচ্ছে। বাচ্চা মেয়ে, ফাইভ সিক্সে পড়ে বড় জোর। বাড়ির লোকের জন্য অপেক্ষা করছে মনে হয়।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াল তিতির। টোটোকে দেখতে পেল না।

পরের দিনও টোটোর দেখা পেল না তিতির। তার পরের দিনও না। গোটা সপ্তাহে একদিনও টোটোকে খুঁজে পেল না তিতির।

এই স্কুলে সায়েন্স সেকশান একেবারে ওপর তলায়। ফিফথ ফ্লোরে। ঝুলনকে নিয়ে সেদিকেও বার দুই-তিন গিয়েছিল তিতির। হিয়াকে ডাকার নাম করে। হিয়াদের ক্লাসে ছেলের সংখ্যা অনেক বেশি, এদের মধ্যে কোনটা যে টোটো ! হিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও তিতির জিজ্ঞাসা করতে পারল না। কোথায় যেন বাধছিল। ডাক্তার আঙ্কলও ক'দিন ধরে আসছে না বাড়িতে, নতুন নার্সিংহোম নিয়ে দারুণ ব্যস্ত, এলে টোটোর সেকশান ফেকশান জেনে নেওয়া যেত।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তিতির আর্টস নিয়ে পড়ছে, তার কম্বিনেশান ইতিহাস দর্শন আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান। সঙ্গে ইংরিজি বাংলা তো আছেই। দ্বিতীয় দিন ইতিহাসের ক্লাসে ঘটে গেল ঘটনাটা। ইতিহাসের শিক্ষিকার চেহারাটি বেশ রাগী রাগী, প্রথম দিন ক্লাসে এসে অন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের পরিধি পরখ করে দেখছিলেন তিনি। তিতিরকে প্রশ্ন করলেন, পলাশির যুদ্ধ কবে হয়েছিল। এত সোজা প্রশ্ন, তবু তিতির ঘাবড়ে গিয়ে বলে ফেলল,—এইট্টিন ফিফটি সেভেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠেছে ক্লাসরুমে। শিক্ষিকা বক্র চোখে দু-এক সেকেন্ড মাপলেন তিতিরকে, তারপর বিদ্রূপের সুরে বললেন,—কী করে যে মাধ্যমিক পাস করো তোমরা ! তোমাদের স্কুলে কি কিছু শেখায়নি ?

ঝুলন দুম করে উঠে দাঁড়াল,— ভুল করে বলে ফেলেছে ম্যাডাম। তার জন্য আপনি আমাদের স্কুলকে ইনসাল্ট করছেন কেন ?

—অ। তুমিও ওই স্কুলের ! শিক্ষিকা চোখ পাকালেন,— দল পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে ? বোসো।

ঝুলন বসতেই শিক্ষিকাটি আরও তিনটি প্রশ্ন ছুঁড়লেন তিতিরকে, আলেকজান্ডার কোন সালে ভারত আক্রমণ করেছিল ? দাস ডাইনেস্টির শেষ সুলতান কে ? তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ কবে হয়েছিল ?

কান দিয়ে তখন আগুন বেরোচ্ছে তিতিরের। একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারল না।

ঝুলনকেও দাঁড় করালেন শিক্ষিকাটি। সে অনেক মাথা চুলকে কোনক্রমে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সালটা বলতে পারল, বাকি দুটো পারল না। নিষ্ঠুর হেসে গোটা পিরিয়ড ঝুলন তিতিরকে

দাঁড় করিয়ে রাখলেন শিক্ষিকা।

ঝুলন বেপরোয়ার মতো দাঁড়িয়ে রইল। তিতিরের মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। প্রাণপণে প্রার্থনা করছিল এক্ষুনি অলৌকিক কিছু ঘটুক, ক্লাসরুম দ্বিধা হয়ে যাক, অথবা ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ুক বিল্ডিংটা।

অলৌকিক কি ঘটে ? ক্লাসরুম অক্ষতই রইল। আর ছেলেমেয়েদের জোড়া জোড়া চোখ, অস্ফুট হাসি, পুড়িয়ে দিতে লাগল তিতিরকে। তাদের স্কুলের সিস্টার রেবতীর ক্লাসে একবার একটা বিশ্রী শব্দ করেছিল বিদীপ্তা, সিস্টার শব্দের উৎসটা বুঝতে পারেননি, মেয়েদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন কে ওই শব্দ করল। বিদীপ্তা বিপদে পড়বে এই আশংকায় ক্লাসের একটি মেয়েও বিদীপ্তার নাম করেনি। ক্লাসসুদ্ধ মেয়েকে সিস্টার রেবতী কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন মাঠে। তখন তিতিরদের ক্লাস এইট। যথেষ্ট উঁচু ক্লাস, স্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা দেখছে, হাসছে, ভীষণ অপমানিত লেগেছিল তিতিরের। তবু যেন আজকের মতো নয়। এই অপমান কি এ স্কুলে থাকতে আর মুছবে কোনওদিন ?

বাকি দিনটা স্কুলে মাথা নিচু করে বসে রইল তিতির। বাড়ি ফিরেই বিছানা নিল।

ইন্দ্রাণী বাড়িতেই ছিল, মেয়েকে দেখে সন্দেহ হল তার। বলল,—কি হল, ফিরেই শুয়ে পড়লি যে !

তিতির থমথমে মুখে উত্তর দিল,— এমনি।

—শরীর খারাপ ?

—না।

মেয়েকে টেনে বসাল ইন্দ্রাণী। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল,—স্কুলে কিছু হয়েছে ?

দ্রুত দুদিকে ঘাড় নাড়ল তিতির, — না তো।

ইন্দ্রাণীর চোখ তীক্ষ্ণতর,—টোটোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

—না।

ইন্দ্রাণী যেন ঠিক বিশ্বাস করল না—এক স্কুলে পড়ছিস, অথচ দেখা হয়নি !

—বলছি তো হয়নি। তিতির একটু ঝাঁঝিয়েই উঠল,—অত বড় স্কুল, কে কোথায় থাকে দেখা হয় ?

ইন্দ্রাণী বিড়বিড় করে বলল,—কেন যে ওসব বড়লোকদের স্কুলে ভর্তি হওয়া ! যেমন বাবার শখ, তেমন মেয়ের শখ...

তিতির জোর করে হাসতে লাগল,—তুমি যে কি বলো না মা ! বলছি স্কুলে কিছু হয়নি !

পরদিন স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছিল না তিতিরের, গতকালের স্মৃতিটা সুঁচের মতো ফুটছে শরীরে। তবু তিতির গেল। মা কি ভেবে বসে এই মনে করে।

সেদিন স্কুলের রূপ অনেকটা বদলে গেল। ঝুলন সেদিন আসেনি, একা একা টিফিন খাচ্ছিল তিতির। দোতলার করিডোরে দাঁড়িয়ে। খেতে খেতে দেখছিল আকাশটাকে। দু-একটা খণ্ড মেঘ ধীর গতিতে ভাসছে, মেঘের রঙও পাঁশুটে নয়, ঘন সাদা। বৃষ্টি যেন চলে যাচ্ছে এবারের মতো।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা লম্বা হাত নেমে এল তিতিরের টিফিনবক্সে,—একি, বাটার টোস্ট ! এ তো চুয়িংগাম হয়ে গেছে রে ! বাহ বাহ, একটা ডিমসেদ্ধও আছে দেখছি !

তিতির কিছু বোঝার আগেই টিফিনবাক্স ফাঁকা। ঘুরে অপরাধীকে দেখতে যাচ্ছিল, তার আগেই একটা হালকা চাঁটি পড়ল মাথায়,—একা একা টিফিন খাচ্ছিস যে ? স্কুলের বন্ধু আসেনি বলে আমাদের পাত্তা দিচ্ছিস না বুঝি ?

মিতেশ সম্রাট পাঞ্চালী তৃণা দেবোপম। মিটিমিটি হাসছে পাঁচজন। লজ্জায় নিবে থাকা তিতির হঠাৎ জ্বলে উঠল,—মাথায় চাঁটি মারলি কেন ?

দেবোপম এখনই ছ ফুট। সুপুরি গাছের মতো শরীরটাকে নুইয়ে তিতিরের কানের কাছে মুখ

এনেছে সে,—কেন, তুই বিছানায় হিসি করে ফেলবি নাকি ?

পলকের জন্য লাল হয়ে গিয়েছিল তিতির, পরক্ষণেই পেট গুলিয়ে হাসি বেরিয়ে এসেছে। এ ভাবে যারা কথা বলে তাদের সামনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকা যায় !

টিফিনের সময়টুকুর মধ্যেই অনেকটা সখ্য জমে গেল। কে কোথায় থাকে, কার কোন ফিল্মস্টারকে পছন্দ, পপ শুনলে কার মাথা ধরে, মাধ্যমিকে কার কত টোটাল ছিল, সবই ক'মিনিটে জেনে গেল তিতির। দেবোপমের বোন যে এই স্কুলেই ক্লাস নাইনে পড়ছে, সে কথা জানাও বাকি রইল না।

ছুটির পরও চাতালে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আড্ডা দিল তিতির। সে কথা বলে কম, শোনে বেশি, আড্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে তাই অসুবিধে হয় না তার। কথা শোনার ফাঁকে ফাঁকে আজও তিতিরের চোখ ঘুরছিল চারদিকে। যদি টোটোকে দেখা যায় !

আচমকা ঘুরন্ত চোখ গেটের দিকে আটকে গেছে। রাস্তার ওপারে, ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ঝুলনের সেই অনুসরণকারী প্রেমিক ! আজও মোটরসাইকেলেই অধিষ্ঠান তার ! তাকাচ্ছে ইতিউতি ! তিতিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অন্যমনস্ক হয়ে গেল !

তিতির ছেলেটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। মোটরসাইকেল নেই।

বাড়ি ফিরে মোটরসাইকেলটার কথা মনেও রইল না তিতিরের। নতুন বন্ধুদের কথাই ভাবছিল। প্রকাণ্ড চেহারার ছেলে মানেই বাঘ ভাল্লুক নয়, এটা ভেবে মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল। পারিবারিক অবরোধ কুণ্ঠার ক্লেদ তৈরি করেছিল ভেতরে, সেটাও কেটে যাচ্ছে। ছেলেদের সঙ্গে ঝুলনের সহজ মেলামেশাও আর অস্বাভাবিক লাগছিল না।

বিকেলে বিপুল উৎসাহে জয়মোহনকে স্কুলের গল্প শোনাচ্ছিল তিতির। নাতনির সঙ্গে কথা বলতে জয়মোহন ভালইবাসেন, কিন্তু ইদানীং কী যেন হয়েছে তাঁর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলেই ঝিমিয়ে আসতে থাকেন। খাওয়া দাওয়া নিয়ে তখন আর খিটমিট করেন না, বসে থাকেন গুম হয়ে। মিনতি তাঁর রাগ ভাঙাতে পারে না, ডাকতে হয় রুনাকে।

স্কুলে তিতির ধৈর্যশীল শ্রোতা, কিন্তু বাড়িতে সে একাই কথক। একটানা বকবক করতে করতে হঠাৎ থামল সে,—ও দাদু, শুনছ তো ?

ঝিমন্ত জয়মোহন নড়ে বসলেন,— হ্যাঁ, শুনছি।

তিতিরের ঠোঁট ফুলে উঠল,—কিচ্ছু শোনোনি। কী বললাম বলো তো ?

—এই তো কী যেন বলছিলি। সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা-পড়া ভঙ্গিতে হাসলেন জয়মোহন,—কানটা কেমন ভোঁ ভোঁ করে রে বুড়ি। কিছু ভাল করে শুনতে পাই না।

—আগে তো বলোনি কখনও ?

—কত আর বলি। শরীরের কলকবজাগুলো তো কম দিন সার্ভিস দিল না ! এবার সব বিশ্রাম চাইছে।

দাদুর এ স্বর তিতিরের ভাল লাগে না। বড় নিরাশ, করুণ শোনায় যেন।

—ডাক্তার দেখাবে ? বড়কাকাকে বলব ?

—না না, কাউকে বলতে হবে না। শোনা, তোর গল্প শোনা।

তারপরও গল্প বলছিল তিতির, কিন্তু তেমন আর উৎসাহ পাচ্ছিল না। রাস্তার বাতি জ্বলতেই দোতলায় চলে এল।

সন্ধে হতেই আদিত্য বাড়ি ফিরেছে। সে এখন বেশ বাধ্য মানুষ, সারাদিন কোথায় যেন ঘুরে ঘুরে ঠিক সন্ধের মুখেই ফিরে আসে।

বাবার সঙ্গেও তিতিরের গল্প ঠিক জমে না। মেয়ের গল্পের থেকেও মেয়ের হাত মুখ নাড়া আদিত্যকে টানে বেশি, মুগ্ধ চোখে মেয়েকেই শুধু দেখে আদিত্য। সেই রাত্রে তার ক্ষণিক বিস্ফোরণ

মেয়ে যে ভুলে গেছে, তাতেই সে মহা খুশি। তবু বাবার সঙ্গে বহুক্ষণ কলকল করল তিতির। তার বয়স অন্যমনস্ক শ্রোতার চেয়ে মুগ্ধ শ্রোতাকেই বেশি পছন্দ করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলল সবই। শুধু দুটি কথা বাদ দিয়ে গেল।

ক্লাসে পড়া না পেরে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আর টোটোর সঙ্গে দেখা না হওয়া।

সেই রাত্রেই বাপ্পা ফিরল। প্রায় একটা নাগাদ।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সদরও আজ বন্ধ হয়েছে অনেক আগে। রাতদুপুরে ট্যাক্সি থেকে নেমে বেশ কিছুটা হাঁকডাক করার পর সাড়া মিলল বাড়ির। তিতিরই পড়িমরি করে নেমে দরজা খুলেছে।

বাপ্পার ট্রেন বিকেল চারটেয় হাওড়ায় পৌঁছনোর কথা, আট ঘণ্টা লেটে এসেছে। রাউরকেল্লার কাছে কোথায় যেন লাইনে ফিশপ্লেট সরানো ছিল, তারই জের। বাপ্পা ভীষণ ক্লান্ত, বম্বেতে কি হল, না হল, তা নিয়ে এখন কথা বলতে সে রাজি নয়, শশব্যস্ত বাবা মা বোনকে উপেক্ষা করে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়।

পরদিন সকাল থেকেই বাপ্পার অন্য মূর্তি। সারা ভারত থেকে নাকি দেড়শোর মতো ছেলেকে ডেকেছিল কোম্পানি, লিখিত পরীক্ষাতেই একশো জন বাতিল। ফিজিক্স অঙ্ক ইংরিজি, তিনটে পরীক্ষাই সে নাকি এত ভাল দিয়েছে, তার খাতায় হাত ছোঁয়াতে পারেনি কেউ। ইন্টারভিউ বোর্ডেও নাকি তাকে দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে নির্বাচকরা। বলে দিয়েছে, এক্ষুনি গিয়ে পাসপোর্ট রেডি করো, যে কোনওদিন ডাক যেতে পারে। আহা, অনীকও যদি চান্স পেত!

হাঁ করে দাদার কথা গিলছে, কিন্তু মনে মনে ছটফট করছিল তিতির। বাপ্পার ভাষণ শেষ হতেই নিজের গল্প বলতে গেল, বাপ্পা পাত্তাই দিল না। তার চোখের সামনে এখন নীল দরিয়া, সে কেন শুনতে যাবে কুয়োর ব্যাঙের কথা!

বোনকে নিষ্প্রভ করে ভারিক্কি চালে বাপ্পা বলল,—এখানকার প্যানপ্যানানি রাখ তো। বম্বেতে সমুদ্রের ধারে যখন মালার মতো আলো জ্বলে, তখন কী সুন্দর যে লাগে! কী বলে জানিস ওটাকে? কুইনস নেকলেস।

বাপ্পার ফেরার খুশিতে ইন্দ্রাণী আজ স্কুলে যায়নি। সেও তিতিরকে আলগা ধমক দিল,—তোর কথা তো রইলই। তা হ্যাঁ রে বাপ্পা, আর কোথায় কোথায় গেলি? এলিফ্যান্টা কেভ দেখেছিস? মালাবার হিল?

বিরস মুখে তিতির দাদার পাশ থেকে উঠে গেল। আর কক্ষনও সে দাদাকে স্কুলের গল্প বলতে যাবে না। কোনও বন্ধুর গল্পও না।

দু-তিন দিন কেটে গেল। আবার ফিরেছে বৃষ্টি। ঝরছে ঝমঝম।

সেদিন ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে বেরোচ্ছিল তিতির, হিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভিড় ঠেলে কাছে গিয়েই তিতির চমকে উঠেছে।

হিয়ার সঙ্গে টোটো!

এত দিন পর দেখা। কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকছিল তিতিরের। রাজস্থানের ছবির থেকেও টোটো যেন আরও খানিকটা লম্বা হয়েছে, গালও ভেঙেছে। ডাক্তার আঙ্কলের মতোই টকটকে রঙ, পেটানো শরীর। কাঁধটাও কী চওড়া এর মধ্যেই!

সংকোচ ঝেড়ে তিতির বলেই ফেলল,—কী হল, চিনতে পারছ না আমাকে?

হিয়ার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল টোটো, তিতিরকে দেখেই ভুরুতে ভাঁজ,—তুমি এখানে ভর্তি হয়েছ?

—ইশ, তুমি যেন জানো না! আঙ্কল বুঝি বলেনি তোমায়!

—না, বলেনি। টোটোর স্বরে প্রাণ নেই।

হিয়া দুজনকে দেখছিল, আর বিস্মিত হচ্ছিল,—তুই রাজর্ষিকে আগে থেকে চিনিস নাকি ?

তিতির মাথা নাড়ল। ধীরে, অতি ধীরে। এই টোটোকে সে কি সত্যিই চেনে !

২০

শিবসুন্দর হাঁটছিলেন। প্রসন্ন ভোরে।

ভোরে উঠে প্রায়ই খানিকটা হাঁটেন শিবসুন্দর। অভ্যাসটি তাঁর দীর্ঘকালের নয়, মাধবপুরে এসেই শুরু। কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শিবসুন্দর বিছানা ছাড়েন, নিয়ম মতো যোগব্যায়াম প্রাণায়াম করেন, বৃষ্টিবাদলা না থাকলে পূরক কুম্ভক রেচক সেরে বেরিয়ে পড়েন বাইরে। খালপাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে, ছোট্ট সাঁকোটি পার হয়ে পৌঁছে যান শ্মশানে। নাহ, কোনও শ্মশানবৈরাগ্য জাগেনি তাঁর, তবু যান। অশ্বত্থ গাছের নীচের বাঁধানো চাতালে বসে থাকেন কয়েক দণ্ড। তারপর ফেরা। শুরু হয় তাঁর দিন।

ভাদ্র মাস পড়ে গেছে। আকাশ এখন প্রায় নির্মেঘ। দু-চারটে শিমুল তুলোর স্তূপ ভাসছে বেখেয়ালে। হঠাৎ উপর পানে তাকালে নবীন ভাদ্রেই শরৎকে বড় মায়াবী লাগে। ধরিত্রী এখন স্নান সেরে গা মুছছে, তার স্নিগ্ধ ত্বক জুড়ে ঘন সবুজ আভা। মাধবপুরে তুলি ছুঁইয়ে গেছে প্রকৃতি।

সাঁকোর মাঝখানটিতে এসে দাঁড়ালেন শিবসুন্দর। কাঠের সাঁকো ধনুকের মতো বাঁকা, নীচ দিয়ে চৈত্র বৈশাখের মজা খাল কিশোরী নদী হয়ে পশ্চিমে বয়ে চলেছে। সরু, কিন্তু বেগবতী। শিবসুন্দর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলের শব্দ শুনলেন কিছুক্ষণ। ঘুমজড়ানো নিস্তব্ধ গ্রামে ওইটুকু ছলাতছলই বড় উচ্চকিত শোনাচ্ছে এখন।

আপন মনে শিবসুন্দর বলে উঠলেন,— এ বছর বোধহয় আর বন্যা এল না রে তুফান।

ছায়াসঙ্গী তুফান পিছনেই রয়েছে। সেও জলের দিকে তাকাল,—সময় এখনও যায়নি।

—এবার বর্ষা বড় কম হল।

—কম কোথায় ! চাষীদের তো খুশিই দেখছি।

—দূর, শ্রাবণে তেমন বৃষ্টি হল কই !

—ভাদ্রে ঢালতে পারে।

—তাহলেই তো বিপদ। ডি ভি সি জল ছাড়বে....গত বছর বন্যায় কেমন আন্ত্রিকের ধুম পড়েছিল মনে আছে ?

—নেই আবার ! ছুটে বেড়াতে বেড়াতে জিভ বেরিয়ে গেছে। কম দিন তো হল না এখানে, কিন্তু গত বারের মতো হাল....বাব্বাহ খুব হয়রানি !

—কপাল মন্দ থাকলে এ বছরও হবে।

—মনে হয় না। তুফান আড়মোড়া ভেঙে হাসল,—ইলেকশান আসছে। এ বছর রামনগর হেলথ সেন্টারে ওষুধপত্রের কমতি থাকবে না।

—হুম। সাঁকো পেরিয়ে এগোচ্ছেন শিবসুন্দর। এপারে রাস্তাটি মাটির। বেশ ক'দিন বৃষ্টি নেই, তবু মাটি এখনও বেশ তলতলে। একটু পা টিপে টিপেই হাঁটতে হচ্ছে শিবসুন্দরকে।

তুফান হাই তুলছিল। কাল খুব ধকল গিয়েছে তার। মনোরমার সারা মাসের ওষুধ ইনজেকশান, ডিসপেনসারির টুকিটাকি ওষুধপত্র, রুগীদের প্রাথমিক পরীক্ষার ছোটখাট কিছু সাজসরঞ্জাম কিনতে কলকাতা গিয়েছিল, ফিরেছে অনেক রাত্রে। শেষ বাসে। তার পরেও ঘুম ভাল হয়নি। মাঝরাতে কি একটা শব্দ শুনে তুফানকে জাগিয়ে দিয়েছিল অলকা। বলেছিল, পিছনের পুকুরে বোধহয় জাল ফেলছে কেউ। তুফান বেরিয়ে দেখে কেউ কোত্থাও নেই। শুধু নিশুত পুকুরে সরসর জল কাটছে রাতের হাওয়া। একটানা ঝিঁঝির ডাক, টিপটিপ জোনাকির জ্বলা-নেবা, জলের নির্জন শব্দ—মনটা যেন কেমন করতে লাগল তুফানের। এরকম হয় মাঝে মাঝে। বাকি রাত আর ঘুম আসে না।

বসে থাকে দাওয়ায়। আধো তন্দ্রা মেখে।

তুফান কথা বলে খোঁয়ারি কাটাতে চাইল, —টোটোর তো খুউব স্কুল চলছে বাবা।

—তোর দেখা হয়েছে টোটোর সঙ্গে ?

—পাঁচ মিনিটের জন্য। স্কুল থেকে ফিরে দু-চারটে কথা বলতে না বলতে মাস্টার এসে গেল। অঙ্কের। রাস্তা থেকে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে বহতা জলে ছুঁড়ল তুফান। গোল হয়ে ছড়াচ্ছে তরঙ্গ, পাড়ে এসে মিলিয়ে গেল।

তুফান ঢেউটাকে দেখছিল। হঠাৎ বলল,— আচ্ছা বাবা, টোটোর তো খুব মাথা, ওর এত টিউটর মাস্টার লাগে কেন ?

—পড়ার চাপ বেড়েছে না ! ওদের সিলেবাস এখন কত কঠিন !

—তার জন্য তো স্কুল আছে ? টোটো তো আর গাঁ-গঞ্জের হেঁজিপেঁজি স্কুলে পড়ে না, শহরের ফাঁকিবাজ মাস্টারদের স্কুলেও না ! ওর স্কুলের কত নাম, দুশো টাকা করে মাইনে ! ওর স্কুলেরই তো সব সামলানোর কথা।

—ওরে গোমুখ্যু, স্কুলের পড়ানো হল রোজকার ডালভাত। ওতে শুধু প্রাণধারণ হয়। আর টিউটর-টিউটোরিয়াল হল ভিটামিন ইনজেকশান। ওগুলো নিলে শরীরের তাগদ বাড়ে।

—তুমি, শুভদা, তোমরা তো লেখাপড়ায় খারাপ ছিলে না বাবা, তোমাদের কটা করে টিউটর ছিল ?

—আমরা ছিলাম হেলে চাষার মতো। স্কুলের মাস্টারদের কথাই থালা ভর্তি গিলে আমাদের শরীরে বল আসত। এখন সুষম আহারের যুগ। প্রোটিন ভিটামিন কার্বোহাইড্রেটের ব্যালান্স রাখতে হবে না ? ক্যালোরি মেপে ব্রেনে খাবার পৌঁছনোর কাজ কি স্কুলকে দিয়ে হয় ? তোর মাথায় এসব ঢুকবে না।

পিছন দিক থেকে একটা সাইকেল আসছে। শিবসুন্দররা সরে দাঁড়ানোর আগেই কাছে এসে থামল। মাধবপুরের কোনও বাসিন্দাই তাঁকে উপেক্ষা করে চলে যায় না, লক্ষ করেছেন শিবসুন্দর। দাঁড়ায়, দুটো কথা বলে, তারপর অনুমতি নিয়ে এগোয়। দশ বছর গ্রামে থাকার দৌলতে জোটা এই সম্মানটুকু উপভোগ করার চেয়ে শিবসুন্দর এতে মজাই পান বেশি।

—ডাক্তারবাবু কি মর্নিংওয়াকে ?

শিবসুন্দর ফিরে তাকালেন। সোমেন। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। রামনগর হাইস্কুলে বিজ্ঞান পড়ায়।

স্মিত মুখে শিবসুন্দর বললেন,—পুরনো লাঙসে একটু টাটকা অক্সিজেন ভরছি। তুমি এই ভোরে সেজেগুজে চললে কোথায় ?

—একটু মুসলমান পাড়ায় যাব।

বিশ-বাইশ ঘর মুসলমান আছে গ্রামে। থাকে গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে। শ্মশান পেরিয়ে আধ কিলোমিটারটাক যেতে হয়। কয়েক ঘর তাঁতি আছে, গামছা-টামছা বোনে। চাষের কাজও করে কেউ কেউ। কয়েকটি ঘর বেশ সম্পন্ন। শিক্ষিত। সম্প্রতি ওখানে একটা পোলট্রি ফার্মও হয়েছে। আরামবাগ হ্যাচারিজ থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মুরগির ছানা আসে, বড় হয়ে চালান যায় কাটোয়ার দিকে। স্থানীয় বিভিন্ন হাটেও যায় কিছু। পোলট্রির মালিক রফিক আহমেদ বেশ অর্থবান, তারকেশ্বরেও তার কিছু ব্যবসা আছে, নিজের পয়সায় কিছুদিন আগে পাড়ার ছোট্ট মসজিদটার সংস্কারও করে দিয়েছে। তার ভাইটি উচ্চশিক্ষিত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরিজির অধ্যাপক। গত মাসে ও পাড়ায় একটি বউ খুন হয়েছিল, পারিবারিক অশান্তির জের।

শিবসুন্দর খুব শঙ্কিত স্বরে বললেন,— আবার ও পাড়ায় কোনও বিপদ ঘটল নাকি ?

—না, না। একটা সালিশির কাজ আছে। ল্যান্ড ডিসপিউট।

গ্রামে থেকেও সালিশি, ল্যান্ড ডিসপিউট, এসব মাথায় ঢোকান না শিবসুন্দর। ঢোকাতে চানও

না। আলগাভাবে বললেন,—তোমাদের এসবও করতে হয় নাকি ?

—অনেক কিছুই করতে হয় ডাক্তারবাবু। সমাজ নিয়ে কাজ। কত ভাবে যে কমন পিপলের সঙ্গে ইন্টার‍্যাকশান বাড়াতে হয়।

—তা ঠিক।

—আপনি তো এলেন না আমাদের সঙ্গে। বছর পঞ্চাশের গোলগাল মুখে সামান্য অভিযোগের সুর,— এত বার করে বললাম, অন্তত পনেরোই আগস্ট আমাদের স্কুলের ফাংশানে আসুন, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান তো আর পলিটিকাল মিটিং নয়।

—সময় পেলাম না। ঘুঘুডাঙায় একটা কলে গেলাম, ফিরতে রাত হয়ে গেল।

—সামনের সপ্তাহে আসুন। আমরা পঞ্চায়েত অফিস থেকে একটা স্বাক্ষরতা ক্যামপেন শুরু করছি। আপনি এলে আমাদের ভাল লাগবে।

—আবার আমি কেন ? মধুর সকালটা তেতো হয়ে যাচ্ছিল শিবসুন্দরের, —রোগ ব্যাধি নিয়ে পড়ে আছি, বেশ আছি।

সোমেন বিনয়ী হাসল। খানিকটা মুরুব্বির ভঙ্গিতে বলল,— ডাক্তারবাবু, আপনি যেমন শরীরের ডিজিজ কিওর করার জন্য কাজ করছেন, আমরাও তেমনি সোসাইটির ডিজিজ কিওর করার জন্য কাজ করছি। নিরক্ষরতা কি অসুখ নয় ?

—সে তো বটেই। তবে কি জানো, আমি সারা জীবনের জানা বিদ্যে কাজে লাগিয়ে দু মুঠো পেটের ভাত জোটাই। আমার কাজের সঙ্গে তোমাদের কাজের তুলনা হয় ? তোমরা অনেক মহৎ।

—এইভাবে বলবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি কি টাকার জন্য এখানে এসে পড়ে আছেন ? আপনি গ্রামের উচ্চ জন, আপনাকে সঙ্গে পেলে.....

শিবসুন্দর নিরুত্তর থেকে সামান্য অন্যমনস্ক ভাব ফোটালেন মুখে। ইঙ্গিত বুঝে সোমেন সাইকেলে উঠল,— তাহলে আসি ডাক্তারবাবু। কথাটা একটু ভেবে দেখবেন। পারলে চলে আসুন....সামনের মঙ্গলবার বিকেলে।

খালধার বেয়ে যাচ্ছে সাইকেল। ক্রমশ ছোট হয়ে গেল।

তুফান গজগজ করে উঠল,— কথার কী কায়দা ! একটু ভেবে দেখবেন। ভেবে না দেখলে কী করবি তুই ?

—আহ, চটছিস কেন ? শিবসুন্দর হালকা চাপড় মারলেন তুফানকে,— রাজনীতির লোক, ওদের তো দল বাড়াতে হবেই।

—তুমি বোকো না তো বাবা ! মুখে সমাজ সমাজ করে, এদিকে নিজের ছেলের বিয়েতে পঁচিশ হাজার টাকা নগদ নিয়েছে। পঞ্চায়েতে জিতে এক বছরে টিন পালটে ছাদ পাকা করে ফেলল।

—থাক, সক্কালবেলা ঘোঁট করিস না। ভাল লাগে না।

ইদানীং গ্রামে এক অদ্ভুত চাপ অনুভব করছেন শিবসুন্দর। সব পার্টির লোকই হঠাৎ হঠাৎ হাজির হচ্ছে বাড়িতে, পরামর্শ নেওয়ার ছলে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিচ্ছে। যখন প্রথম এখানে আসেন, তখন ঠিক এমনটা ছিল না। রুগী-ডাক্তারখানা নিয়ে জীবনটা বেশ নিরিবিলিই ছিল, কেউই তেমন ঘাঁটাত না। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, পেশার সুবাদে অনেকের উপকার হয়েছে তাঁর হাতে। এতে হয়তো তাঁর মতামতের একটু মূল্য বেড়েছে গ্রামে। সেই মূল্যটাকেই রাজনৈতিক দলরা প্রভাব মনে করে। তাই বোধহয় তাঁকে দলে টানার আগ্রহও বেড়ে গেছে তাদের। কিন্তু তিনি তো এসব থেকে দূরে থাকতে চান। কেন তাঁকে একটু শান্তি দেবে না এরা ?

শিবসুন্দর শ্মশানভূমিতে এসে থামলেন। শ্রাবণ সংক্রান্তির মেলা ভেঙেছে সবে, সাধুরা এখনও সবাই যায়নি। শিবমন্দিরের দাওয়ায় বসে আছে তিনজন। গুটি কতক কালোকুলো পোড়া কাঠ এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, ভাঙা কলসিও গড়াচ্ছে। অদূরে। দাহকাজের অবশেষ। অশত্থ গাছের ওপারের মাঠে এখনও নাগরদোলাটা রয়েছে। কালও ম্যাজিকঅলার তাঁবুটা ছিল, আজ

নেই। ক'দিন আগের ভিড় একদম সুনসান।

শিবসুন্দর চাতালে বসলেন। খালের ওপ্যারে বিস্তীর্ণ চাষভূমি। ধানচারা লকলকিয়ে উঠেছে। সতেজ। সবুজ। দিনের প্রথম আলোয় ওই অনন্ত হরিৎ বর্ণ বড় অপার্থিব লাগে শিবসুন্দরের। দেখতে থাকেন, দেখতেই থাকেন তিনি। যেন শস্যের বেড়ে ওঠা নয়, দেখছেন জীবনের স্তর। বিকাশ। তাঁর অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ।

এখনকার ভরা ক্ষেতটি যেন শিবসুন্দরের অতীত। দুঃখ আনন্দ শঙ্কা উদ্বেগ বিস্ময় আশা নৈরাশ্য সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ। সুখের জন্য তিনি কখনও ল্যালায়িত ছিলেন না, তাই পূর্ণতায়ও কোনও ঘাটতি নেই। ধান কাটার পর যখন শূন্য হয়ে যাবে ক্ষেত্র, শুকনো খড়ের আগা বেয়ে কুয়াশার আস্তরণ জমবে ভূমিতে, তখন ওই প্রান্তরটিকে নিজের বর্তমান মনে হবে শিবসুন্দরের। রুক্ষ জমির মতোই নিরস বর্তমান। তবে আপাতরুক্ষ জমিও যে আদ্যন্ত নীরস নয়, এ কথাও জানেন শিবসুন্দর। জানেন মাটি তখন ভিজে থাকে শিশিরে। ওই শীতেই কোনও কোনওদিন প্রান্তরটি মিলিয়ে যায় নিবিড় কুয়াশায়। তখন মনে হয় চোখের সামনে যেন শুধুই তাঁর ভবিষ্যৎ। যার কোনও কিছুই তাঁর অজানা নয়, অথচ কুয়াশার অন্তরালে সে যেন আশ্চর্য রহস্যময়। চেনা হয়েও সম্পূর্ণ অচেনা।

কে ওই প্রান্তর সাজিয়ে রাখে শিবসুন্দরের জন্য ?

ঈশ্বর ? প্রকৃতি ? মানুষ ?

কেন রাখে ?

তুফান সাধুদের সঙ্গে গল্পগাছা জুড়তে গিয়েছিল। তিন সাধুর একটি মৌনী, সে তুফানের প্রশ্নবাণে বিরক্ত হচ্ছে খুব। বেজার মুখে তুফান চাতালে এসে বসল। খানিকক্ষণ চুপ থেকে উসখুস করতে শুরু করেছে,— বাবা ?

—উঁ ?

—মৌনীটাকে দেখেছ ? একদম ছোকরা। এই বয়সে সন্নিসী হল কেন বলো তো ?

দেবদ্বিজে ভক্তি নেই শিবসুন্দরের, সাধুসন্ন্যাসীদেরও খুব একটা ভাল চোখে দেখেন না তিনি। ক্বচিৎ কখনও দু-একটা সাধুর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছেন, বিরক্তি বাড়া বই কমেনি। বেশির ভাগই একটা দুটো ভাবের কথা বলে বিড়ি সিগারেটের জন্য হাত বাড়ায়। ভাবের কথা মানেও ফাঁপা কথা, একই গতের তত্ত্ববাক্য। বেদ পুরাণ কোরান বাইবেল, সবই অল্পস্বল্প ঘাঁটা আছে শিবসুন্দরের, শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি ছাড়া নতুন কিছুই সাধুরা বলে না। মাঝেমধ্যে শিবসুন্দর তাদের সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতাও করেছেন, জ্ঞানের পরিধি মাপতে চেয়েছেন, সাধুরা তাতে বড় রেগে যায়। রাগই যদি জয় না করতে পারো, তবে সাধুসন্ন্যাসী হওয়া কেন ?

হালকা চালে শিবসুন্দর বললেন— বিনি পয়সার ভোজ, যদি জোটে রোজ রোজ....

—হ্যাঁহ্, রোজ কি চোর্বচোষ্য জোটে নাকি ?

—ঠিক জোটে। নেশাটা তো জোটেই।

—তা যা বলেছ ! তুফান হাসছে,— ভক্তের যে অভাব নেই।

শিবসুন্দর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন,— হ্যাঁরে তুফান, তোর বউদির ভক্তিভাব এখন কেমন ? বেড়েছে, না কমেছে ?

—এই বয়সে ভক্তিভাব এলে সে কি আর কমে বাবা ? বাড়তেই থাকে। গত মাসে তো দেখে এলাম বিগ্রহ বসিয়েছে, কাল দেখি সব এলাহি ব্যাপার। সিংহাসন টিংহাসন করে ....সামনে রুপোর পঞ্চপ্রদীপ....আবার একটা ইলেকট্রিকের শিখা জ্বলছে সব সময়.....

—কোথায় করছে এসব ?

—শুভদার ছোট ঘরটায়। যেখানে আলমারি আছে, তার পাশটাতেই।

—তুই দেখলি ?

—আমায় নিয়ে গিয়ে দেখাল। ছোট্ট একটা সোনার গোপালঠাকুর রেখেছে। তাকে খাওয়াচ্ছে,

শোওয়াছে, তার জন্য বিছানা তৈরি হয়েছে, ছোট ছোট কোলবালিশ, মশারি, মাথার বালিশ....জরি বসানো লাল নীল সিল্কের জামাকাপড়ও বানানো হয়েছে।

—তুই কিছু বললি না ? শিবসুন্দরের গায়ে যেন কাঁটা ফুটছে।

—যার ভক্তি, তার ভক্তি। আমি কেন বলতে যাব ? তুমি নাস্তিক বলে কি সবাইকে নাস্তিক হতে হবে !

—তা নয়, তবে ছন্দার তো এসব ছিল না ! বছরে একবার হইহই করে সরস্বতী পুজো করল, লক্ষ্মীর পট আছে, ন মাসে ছ মাসে সত্যনারায়ণ করছে,....হঠাৎ দু-তিন মাসের মধ্যে এত বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল কেন ?

—হয়তো টাকা বেশি এলে ভক্তিও বেড়ে যায়।

—কেন ?

—হারাবার ভয়ে। তুফান ঠোঁট ওল্টাল,— তুমি হলে গিয়ে নাঙ্গা পুরুষ, তুমি এসব বুঝবে না বাবা।

তুফানের ঠাট্টায় হাসতে পারলেন না শিবসুন্দর। তুফান বোধহয় ঠিকই বলছে। ভক্তি তো এভাবেই আসে। হয় হারাবার ভয়ে, নয় পাওয়ার আশায়। শুভর চেম্বারেও নাকি ঠাকুরদেবতার বাঁধানো ছবি ঝোলে। তুফান গেছিল একদিন, নিজের চোখে দেখেছে। ঠাকুরদেবতায় কোনও অন্ধ বিদ্বেষ নেই শিবসুন্দরের, তবু বড় আফসোস হয় মনে মনে। বিজ্ঞান কি এই শিক্ষা দিল শুভকে ? শরীরকে এতকাল ধরে কাটাছেঁড়া করেও কি বোঝে না, প্রাণ এক বিশুদ্ধ রাসায়নিক বিক্রিয়া মাত্র ? অদৃশ্য শক্তির ওপর নির্ভরতা বুঝি এই বোধটাকেই দুর্বল করে দেয়।

বলব না বলব না করেও শিবসুন্দরের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,— শুভ এসব বাড়াবাড়ি নিয়ে কিছু বলছে না ছন্দাকে ?

—শুভদার সময় কোথায় ! নার্সিংহোম নিয়ে যা ব্যস্ত। লাখ লাখ টাকা খরচা হচ্ছে। পুজোর আগেই বোধহয় শুরু হয়ে যাবে। দেখলে না, মেলায় আসব বলেও এল না !

—টোটো এলে পারত। ওর এত মেলা দেখার শখ। বাবা-মা না আসুক, একাই আসত। এখন তো আর শিশুটি নেই। রেজাল্ট বেরিয়েছে কদ্দিন হয়ে গেল, ছেলেটার সঙ্গে তারপরে একবারও দেখা হল না।

—টোটোও বলছিল সে কথা।

—কী বলছিল ?

—বলছিল, আমি আর বাবা-মা'র ভরসায় থাকব না তুফানকাকা। ঠিক দলবল জুটিয়ে চলে যাব। হয় পুজোয়, নয় শীতে। খুব হুল্লোড় করব।

—ভালই তো। আসুক বন্ধুদের নিয়ে। আমাদের তো জায়গার কমতি নেই।

—হুঁ, নাতি আসা তো ভালই। তবে ছেলে ওভাবে এলে তোমার আরও ভাল লাগত। নয় কি ?

শিবসুন্দর উত্তর দিলেন না। শুভর সঙ্গে বন্ধনটা তাঁর গভীর হল না কোনওদিন, কেমন ছাড়া ছাড়া রয়ে গেল। কেমন ধারার যেন হয়েও গেছে ছেলেটা। ছুটছে। শুধু ছুটছে। এত অর্থ কী কাজে লাগে ? অর্থ কি সত্যিই সুখ আনে ! নাকি অর্থ উপার্জনের নেশাটাই সুখ ?

ফেরার পথে আর তেমন কথা বললেন না শিবসুন্দর।

পুবের জানলা দিয়ে রোদ এসেছে দোতলার ঘরে। আলোমাখা বিছানায় শুয়ে আছেন মনোরমা, এখনও ঘুমন্ত। স্ত্রীর এই ঘুমন্ত রূপটি দেখে হঠাৎ হঠাৎ শিবসুন্দরের বুক ধক করে ওঠে। মনে হয়, ঘুমের ঘোরে চলে যায়নি তো মনোরমা ! ভাল ভাবে ঠাহর করলে অবশ্য ভুল ভাঙে।

স্ত্রীর হাতটি নিজের হাতে তুলে নিলেন শিবসুন্দর। নাড়ি টিপলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রইলেন শুকনো কবজি। এই কবজি ধরে এক সময়ে হেঁটেছেন তিনি। অল্প দিন, কিন্তু বড় মধুর দিন।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে চলে গেছেন কাঁসাই নদীর পাড়ে। অথবা গির্জাঘরের দিকে। তখন এই বাহু কত মসৃণ ছিল। তাঁর হাতে ধরা থাকতে থাকতেই কবে যে শুকিয়ে গেল!

স্মৃতি থেকে শিবসুন্দর দ্রুত বর্তমানে ফিরলেন। ঝটপট যন্ত্র এনে মাপলেন স্ত্রীর রক্তচাপ। বারান্দায় এসে দেখলেন ডিসপেনসারির বাইরের বেঞ্চিতে রুগী এসে গেছে।

গম্ভীর নিশ্চিন্ত স্বরে শিবসুন্দর হাঁক দিলেন,— অলকা, আমার চা দিয়ে যাও।

রাত্রের খাওয়া সেরে দু-চারটে কাজ সারছিলেন শিবসুন্দর। গত সপ্তাহে জলপাইগুড়ি থেকে ছন্দার বাবার চিঠি এসেছে। মামুলি কুশল বিনিময়ের চিঠি। এখনও উত্তর দেওয়া হয়নি, উত্তরটা লিখলেন আগে। বহুদিন বেয়াই বেয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না, ভদ্রতা করে পুজোর সময় আসার জন্য আমন্ত্রণও জানালেন। লিখে মনে মনে একটু হাসিই পেল। পুজোর সময়েই আসতে লিখলেন কেন? রিটায়ার্ড মানুষের বারো মাসই তো পুজোর ছুটি! যে কোনও সময়ে এলেই তো হয়! কেটে কি লিখবেন আবার? থাক।

ডায়েরি লেখার একটা পুরনো অভ্যাস আছে শিবসুন্দরের। রোজ না হলেও, প্রায়শই লেখেন। মন্তব্যহীন। হৃদয়ের অনুভূতিবিহীন। শুধু কিছু ঘটনার উল্লেখ থাকে তাতে। তিনদিন পর শিবসুন্দর আজ আবার ডায়েরি লিখলেন।

......তুফান গতকাল কলকাতা গিয়াছিল। শুভ নার্সিংহোম লইয়া অতিশয় ব্যস্ত। ছন্দার পূজাপাঠ বাড়িয়াছে। টোটো বন্ধুদের লইয়া পূজায় বা শীতে আসিবে বলিয়াছে। আজ এবং কাল বৃষ্টি হয় নাই। মনো ভালই আছে।....

শেষ বাক্যটি শিবসুন্দরের মনঃপূত হল না। কেটে লিখলেন।

....মনোর পালসরিট আর প্রেশার আজ নরমাল। সুগার কাউন্ট দেখি নাই।.....

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। গোপনীয় কিছু লেখা নেই, তাও সন্তর্পণে টেবিলের ড্রয়ারের একদম ভেতরে ডায়েরিটা ঢুকিয়ে দিলেন শিবসুন্দর। দরজার দিকে তাকালেন,— কিছু বলবি?

তুফান দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় চুলকোচ্ছে,— হ্যাঁ, একটা কথা ছিল।

—দাঁড়া, আসছি।

মনোরমার মশারি ও মশারির মনোরমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে শিবসুন্দর বারান্দায় বেরোলেন আলতোভাবে টেনে দিলেন দরজাটা,— কি হয়েছে?

—একটা কথা ভাবছিলাম।

—বল।

—তোমাকে তো অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়...

—সে তো হয়ই।

—না ভাবছিলাম একটা মোপেড স্কুটার এরকম কোনও টু হুইলার যদি কিনে নেওয়া যায়...

—কী হবে? সাইকেলেই তো দিব্যি চলে যাচ্ছে।

—চলে যাচ্ছে না, কষ্ট করে চালিয়ে নিচ্ছ। তোমার আজকাল বেশিক্ষণ সাইকেল চালাতে কষ্ট হয়, আমি জানি।

—কিছু জানিস না। ওটা আমার এক্সারসাইজ।

—পরশুও তুমি কল থেকে ফিরে অনেকক্ষণ হাঁপাচ্ছিলে। আজ মাত্র দু কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে নীচে চুপচাপ বসে রইলে অতক্ষণ এগুলো ভাল লক্ষণ নয় বাবা।

—বাহাত্তুরে ধরল, এখনও এনফিসিমা অফ লাঙস হবে না? বিড়ি সিগারেট খাওয়া বুক...শিবসুন্দর সস্নেহ চোখে তুফানের দিকে তাকালেন,— এই বুড়ো বয়সে মোপেড-ফোপেড আমি চালাতে পারব না রে।

—তোমাকে কে চালাতে বলেছে? তুমি পেছনে বসে থাকবে, আমি চালাব।

—বুঝেছি। শিবসুন্দর হাসছেন,— তোর নিজেরই শখ হয়েছে।

তুফানের মঙ্গোলিয়ান ছাঁচের মুখে লাজুক হাসি,— আমার নয়, অলকার শখ। টিভিতে বিজ্ঞাপন দ্যাখে....রোজ বলে....

—তাই বল। তা টিভির বিজ্ঞাপন দেখে শখ বাড়তে শুরু করলে তো বিপদ রে!

—এটা ঠিক শখ নয় বাবা, এটা প্রয়োজনও।

—প্রয়োজন তো ইলাস্টিক, টানলেই বাড়ে। যাক গে, যা ভাল বুঝিস কর। শিবসুন্দর হাসতে হাসতে তুফানের কাঁধে হাত রাখলেন,— পো'র নামে পোয়াতিরই হোক। অলকা চুলে রঙিন ফিতে লাগিয়ে তোর পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াক।

চাঁদ উঠে গেছে। শুক্লপক্ষ। মিহি সরের মতো জ্যোৎস্না বিছিয়ে আছে চরাচরে। সামনের আমগাছে ঝিকঝিক করছে আলো, পাতার ফাঁক দিয়ে গাছতলাতেও লুটিয়ে পড়েছে চন্দ্রসুধা। আঁধারও আছে, তবে তরল। মায়াময়। বেড়ার ধারের শিউলিগাছে ফুল এসেছে সবে। স্নিগ্ধ কিরণে সাদা ফুল আসন বুনছে মাটিতে।

শিবসুন্দর বাতাসে কান পাতলেন,— রুমকি কাঁদছে কেন? এখনও ঘুমোইনি মেয়েটা?

—ঘুমিয়েই তো ছিল। উঠে পড়েছে বোধহয়। তুফান সিঁড়ির দিকে এগোল, — আমি কিন্তু কাল থেকেই খোঁজখবর নিচ্ছি।

দু-চার ধাপ নেমেও ফিরে এসেছে তুফান,— অলকা তোমাকে কিছু বলেছে?

—কী বল তো?

—বিকেলে দেবনাথ এসেছিল।

—ও হ্যাঁ, বলেছে। পুকুরটা বোধহয় ইজারা নিতে চায়। আগে একদিন বলেছিল।

—দিচ্ছ?

—ইচ্ছে তো নেই, দেখি কি করি। তুই তো কিছু সামলাতে পারিস না। অলকা বলছিল কাল রাতেও নাকি জাল ফেলার শব্দ শুনেছে।

—না নাহ, অলকার মনের ভুল। পাতলা ঘুম, উল্টোপাল্টা শোনে। তুফান দু-এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল,— তুমি সোমেনকে পাত্তা দাও না, দেবনাথকেই বা দেবে কেন?

—যা, শুতে যা। আমি কোনও পলিটিক্যাল পার্টিকেই পাত্তা দিই না। শুধু ভয়, পুকুর টুকুরে বিষ না মিশিয়ে দেয়। অত মাছ মরে যাবে.....

—সে সাহস হবে না। তুমি শুধু শক্ত থাকো।

তুফান চলে গেল।

শিবসুন্দর সিগারেট ধরালেন। সারা জীবন কোনও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ওপর আসক্তি ছিল না তাঁর। তবু অজান্তেই কত কী সম্পদ এসে যায় নিজের অধিকারে! দোতলা বাড়ি, পুকুর, শাকসবজির বাগান, কদিন আগে কয়েকটা হাঁস কিনেছে অলকা, তুফান টু হুইলার কিনবে, এরপর হয়তো রুমকির দুধের জন্য একটা গরুই কিনতে হবে। একেই কি সম্পন্ন গার্হস্থ্য জীবন বলে? এই সব তুচ্ছ সম্পদে ক্রমশ অধিকারবোধ জন্মাবে তাঁর, এক সময়ে এদের রক্ষা করতে আকুল হবেন তিনি, এই কি তাঁর নিয়তি?

সামনের পথ ধরে কয়েকটি যুবক ফিরছে। টুকরো ফিলমি গানের কলি উড়ে এল বাতাসে। রামনগরের ভিডিও হল থেকে ছেলেরা ফিরছে বোধহয়। শিবসুন্দরের জাঠতুতো দাদার নাতির গলাও শোনা যাচ্ছে না! টাপুও কি গিয়েছিল?

শিবসুন্দর ঘরে ফিরলেন। একটা মেডিকেল জার্নাল নিয়ে আধশোওয়া হলেন ইজিচেয়ারে। স্ত্রীর বিছানার পাশেই। রাত্রের দিকে বিদ্যুতের ভোল্টেজ ভালই থাকে, বইপত্র পড়তে অসুবিধা হয় না।

জার্নালটি বিদেশি, সদ্য এসেছে বাড়িতে। এলোমেলো উল্টোতে উল্টোতে একটি পাতায় শিবসুন্দরের চোখ আটকে গেল। বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক অসুখ নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

প্রধানত মাংসপেশির রোগসংক্রান্ত গবেষণা। কাল একটি শিশু এসেছিল ডিসপেনসারিতে, তারও এই একই অসুখ। মাত্র বছর চারেক বয়সেই শিশুটির হাঁটাচলার ভঙ্গি হাঁসের মতো হয়ে গেছে। খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে বেচারা। শিবসুন্দর জার্নালের পাতাটিতে ডুব দিলেন।

হঠাৎই মগ্নতা ছিঁড়ে গেল। কথোপকথনের আবছা শব্দ ভেসে আসছে। তুফান আর অলকার। তুফান কী যেন বলল, অলকা হেসে উঠল খিলখিল। তুফানও হাসছে। কথা বলছে জোরে জোরে।

গ্রামদেশ নিশুত এখন। ওই হাসি, ওই কথা, সুতীক্ষ্ণভাবে কানে বাজছিল শিবসুন্দরের। বুক থেকে একটা উষ্ণ নিশ্বাসও গড়িয়ে এল যেন। শুভ আর ছন্দাকে ওইভাবে কথা বলতে, হাসতে কোনওদিন দেখলেন না শিবসুন্দর। বিয়ের পর থেকেই দুজনের মধ্যে বড্ড বেশি দূর দূর ভাব। প্রথম সন্তান দেখে বাবারা কত উৎফুল্ল হয়, অথচ টোটো হওয়ার পর শুভকে এতটুকু আনন্দিত মনে হয়নি। বলতে গেলে তাঁর চাপে পড়েই বউ বাচ্চাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল শুভ।

অথচ তিনি তো শুভকে জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসাননি। অত তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। নেহাত ছন্দার বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল বালুরঘাটে, ছন্দাকে দেখেও মোটামুটি ভাল লেগে গেল, তাই না নিয়ম রক্ষার্থে বলেছিলেন ছেলেকে। শুভর আপত্তি থাকলে তিনি থোড়াই এগোতেন! তার পরও কত যুগ কেটেছে, টোটো মাধ্যমিক পাস করে গেল, তবু কেন দানা বাঁধল না সম্পর্কটা? ছন্দা যে হঠাৎ এত ঠাকুর-ঠুকুর শুরু করেছে, তার পিছনেও কি সেই ব্যবধান? অথচ তুফান অলকা....। শিবসুন্দর নিজেই বা ক'দিন প্রকৃত দাম্পত্যজীবন যাপন করেছেন! বড় জোর বছর দুয়েক। সেই ক'দিনের মধুর স্মৃতিই এখনও কী তীব্র বাঁধনে আটকে রেখেছে তাঁকে আর মনোরমাকে!

খট করে একটা শব্দ হল। চমকে তাকাতেই শীতল স্রোত বয়ে গেছে শিবসুন্দরের শিরদাঁড়ায়। মনোরমা বিছানায় উঠে বসেছেন! নিষ্পলক চোখে দেখছেন তাঁকেই!

শিবসুন্দরের কণ্ঠনালী শুকিয়ে এল। তালুতেও কেমন খরখরে ভাব। জিভ দিয়ে তালু ভিজিয়ে নিলেন শিবসুন্দর। ফিসফিস করে ডাকলেন,— মনো....

মনোরমার দৃষ্টি স্থির। একই রকম স্থির।

পুকুরপাড়ে ঝোপ হয়েছে হাস্নুহানার। ঝাঁঝালো মিষ্টি গন্ধ ঢুকে পড়ছে জানলা দিয়ে।

শিবসুন্দরের চোখ জ্বলজ্বল। গাঢ় স্বরে বলে উঠলেন,— মনোরমা, চিনতে পারো আমায়? আমি শুভর বাবা। শুভ, সেই যে তোমার ছেলে....তোমার কোলে ছিল....

উত্তর নয়, আর একটা শব্দ হল শুধু। মনোরমা ঝুপ করে শুয়ে পড়েছেন।

শিবসুন্দর আকুল স্বরে বলে চললেন,—মনো....মনো....একটি বারের জন্য অন্তত.....। যদি মরে যাই.....যদি মরে যাই....

২১

—আমি তোমাকে চিনতে পারিনি বিমান।

—তুমি আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।

—তুমি না থাকলে জয়ের সঙ্গে আমার দেখা হত কোনওদিন?

—হত। ঠিকই হত। এই পৃথিবীতে কার সঙ্গে কার দেখা হবে সবই বিধাতা স্থির করে রেখেছেন, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তবে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে শুধু সুখী দেখতে চেয়েছি।

—আমি জানি বিমান।

এর পর বিমান চোখ তুলে তাকাবে। সোজাসুজি নয়, একটু কোনাকুনি। আবার নামিয়ে নেবে মাথা। ব্যস।

লাঞ্চ ব্রেকে ডায়ালগগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছিল কন্দর্প। আজ শেষ হলে তার আর দুদিনের শুটিং বাকি থাকবে। তারপর কবে ডাবিং পড়ে... !

লাইটের লোকজনরা খাওয়া সেরে একে একে ফিরছে। ফ্লোরের বাইরে খানিক দূরে ছোট্ট এক পুকুর, পুকুরের ধার ঘেঁষে হাঁটছে ঋতশ্রী। একা নয়, ঋতশ্রী একা হাঁটা ভালবাসে না। সঙ্গে দিদি আছে তার। দিদিটি মধ্যবয়সী, পৃথুলা, সব সময়ে একটা কুপিত ভাব ফুটিয়ে রাখে মুখে। হাঁটতে হাঁটতে মহিলা কী যেন বলে চলেছে ঋতশ্রীকে। টিনের চেয়ারে বসে দশ-পনেরো হাত দূর থেকে শোনার চেষ্টা করল কন্দর্প, শুনতে পেল না। আবার মন দিল লিখিত সংলাপে। একই ডায়ালগ বার বার পড়লে শব্দের অনেক ভাঙচুর চোখে পড়ে যায়। কোথায় উচ্চারণের তীব্রতা বাড়বে, কোথায় কমবে, কখন গলা থেকে স্বর আসবে, কখন বা নাভি থেকে, সবই আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রূপেন সামনে এসে বসল—কি হে, কাজ তো ভালই চলছে !

কন্দর্প মুখ তুলে তাকাল। রূপেনের চোখে লালচে আভা। গন্ধ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। সকালেই টঙ্ !

কন্দর্প হাসল,— আপনি তো শুটিং-এ আসেন না, জানলেন কী করে ?

—আরে ভাই, লাইনের খবর কাকের মুখে পৌঁছে যায়। পকেট থেকে বিড়ি বার করল রূপেন। কি ভেবে আবার পকেটে রাখল, —একটা সিগারেট দাও তো হে। খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। জামাই আজ মাছের পিসগুলো বেশ সলিড দিয়েছিল।

কন্দর্প উত্তর দিল না, সিগারেট দেশলাই বাড়িয়ে দিল। জামাই যে কার জামাই, কে জানে ! স্টুডিও পাড়ার মিল সাপ্লায়ার, অর্ডার মাফিক খাবার দিয়ে যায়। কন্দর্প টেকনিসিয়ানদের সঙ্গে ক্যান্টিনে বসেই সেরে নেয় খাওয়াটা। নায়ক-নায়িকা আর সিনিয়ার আর্টিস্টরা মেকআপ রুমে। জামাই-এর রান্না মোটামুটি ভাল, তৃপ্তি করেই খায় সকলে।

সিগারেট ধরিয়ে ফসফস ধোঁয়া ছাড়ছে রূপেন। কয়লার ইঞ্জিনের মতো। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে টোকা মারছে কপালে। গলা নামিয়ে বলল, —পরিমল বলছিল।

—পরিমল তো ক্যামেরাম্যান, ও অ্যাক্টিং-এর বোঝেটা কী ?

—লাইনের পুরনো লোক, বোঝে বইকি ! ফ্লোরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুকখুক হাসল রূপেন, —বোঝে বলেই না মেয়েটা ওর গায়ে এঁটুলির মতো সেঁটে আছে।

বছর পঁয়তাল্লিশের ফরাসি কাটের দাড়ি গাট্টাগোট্টা পরিমল চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে লাইটম্যানদের। পাশে মণিকা। সহনায়িকা। নতুন মেয়ে, নরেন হোড়ের আমদানি। অভিনয়ে তেমন দড় নয়, তবে নিষ্পাপ মুখটি নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি। কথাবার্তায় একটু ছমকছল্লু ভাব আছে, কন্দর্পের ঠিক পছন্দ নয়।

কন্দর্প হাসি হাসি মুখটা ধরে রাখার চেষ্টা করল, —নতুন মেয়ে, ও তো একটু ক্যামেরা চাইবেই।

—শুধু কি অ্যাঙ্গেল ? এতক্ষণ তো নরেনকে খুব জপাচ্ছিল। রূপেন চেয়ারটা আর একটু কাছে টানল,— নরেন তোমার খুব প্রশংসা করছিল অশোকদার কাছে।

—নিজে থেকে প্রশংসা করল ! নরেনদা ! কন্দর্প সামান্য অবাক হল।

—না, অশোকদাই জিজ্ঞেস করছিল।

কন্দর্পর মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। মাথার ওপর শরতের আকাশটার মতোই। আকাশে যে এখন একটাও মেঘ নেই তা নয়, সে মেঘ কন্দর্পর মনেও আছে। অশোকদাকে কাজটা দিতে পারল না, চিন্তাটা এখনও খচখচ করে বুকে। অথচ অশোকদা তাকে কথা মতো রোলটা দিয়েছে। বড় রোল, নায়কের প্যারালাল প্রায়। আউটডোর ইনডোর মিলিয়ে কুড়ি বাইশ দিনের শুটিং। কন্দর্পর জীবনে এত বড় কাজ এই প্রথম। গৃহযুদ্ধের কাহিনী বলার সময়ে গলা কেঁপেছিল তার, এই বুঝি অশোকদা তাকে হাঁকিয়ে দিল ! কিমাশ্চর্যম্ ! অশোকদার শুনে ভুরুও কাঁপল না ! দু-এক সেকেন্ড অন্যমনস্ক হয়ে গেল শুধু। তারপর অবিকৃত মুখে বলল, —ঠিক আছে, বাড়ি তো আর পালাচ্ছে

না। তুমি আউটডোরের জন্য রেডি হয়ে নাও।

কন্দর্প ভয়ে ভয়ে বলেছিল, —নরেনদার সঙ্গে দেখা করব ?

—কিচ্ছু দরকার নেই, ঠিক সময়ে চলে যেয়ো। নরেনকে আমার বলা আছে। তোমার টিকিটও হয়ে গেছে। পরশু সকালে ট্রেন।

বাড়ির লোকজনের ওপর রাগে দুঃখে সেদিনই জামাকাপড় গোছগাছ করে কন্দর্প বেরিয়ে পড়েছিল। দু রাত হাওড়া কদমতলায় এক বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে চলে গেল শুটিং-এ। হাজারিবাগ। শুটিং-এ গিয়ে ভীষণ তেতো হয়ে থাকত মন। গভীর এক আত্মগ্লানিতে বিষিয়ে থাকত হৃদয়। সে কি অশোকদাকে ঠকিয়ে রোলটা পেল !

হয়তো এই আত্মধিক্কারই তাকে এবার ক্যামেরার সামনে অনাড়ষ্ট রেখেছে। প্রাপ্যর থেকে বেশি জুটে গেছে বলেই কি জান লড়িয়ে দিয়েছে কন্দর্প ? হতেও পারে। নইলে আধা রোমান্টিক দৃশ্যগুলোতে কন্দর্প কী করে অত সহজে উতরে গেল ! ঋতশ্রী যে ঋতশ্রী, যে একটা ছবি বার্লিন ফিলম ফেস্টিভালে গেছে বলে আজকাল জার্মান অ্যাকসেন্টে বাংলা বলছে, সে পর্যন্ত হাজারিবাগে শুটিং-এর পর হাত চেপে ধরেছিল কন্দর্পর।

কন্দর্প মনে মনে হাসল। অশোকদা দেখুক, জানুক, কন্দর্প তাকে প্রবঞ্চিত করে রোলটা নেয়নি। সে কাজ দিয়ে উশুল করে দেবে অশোকদার ঋণ। যদি ছবিটা লেগে যায়...।

ঋতশ্রীর দিদি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, ফিরে গেছে ফ্লোরে। হাতের ইশারায় ঋতশ্রী ডাকছিল কন্দর্পকে, কন্দর্প ঠিক দেখতে পাচ্ছে না।

রূপেন কন্দর্পকে ঠেলল, —যাও। মহারানির ডাক পড়েছে।

কন্দর্প সন্ত্রস্ত মুখে বলল,—কী ব্যাপার বলুন তো ?

—মাথা ধরেছে মনে হয়। টিপে দিতে বলবে। রূপেন চোখ মারল, —তোমারই দিন চলছে। হিরোর আজ শুটিং নেই, তুমিই সার্ভিস দাও।

কন্দর্প উঠে গেল।

পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলের দিকে তাকিয়ে আছে ঋতশ্রী। শ্যাওলা রঙ সালোয়ার-কামিজের ওপর সাদা শিফনের উড়নি, নায়িকার রূপটান লেপে আছে মুখে, চোখে বিদেশি ফটোসান। পানপাতা মুখ ফিরিয়ে মৃদু ঝাঁঝিয়ে উঠল, —ড্রাঙ্কার্ডটার সঙ্গে বসে কী গল্প করছেন ?

কন্দর্প একবার দেখে নিল রূপেনকে। এদিকেই তাকিয়ে আছে। বলল, —কিছু না। এমনিই বকবক করছিলাম।

—মানে আমাদের নিয়ে টিপ্পনি কাটছিলেন, তাই তো ?

—না না, বিশ্বাস করুন...

—আমি সব বুঝি। ঋতশ্রী ঠোঁট টিপল,—আপনার আজকাল এত পায়াভারি হয়েছে কেন ?

রোদে রঙিন হয়ে চশমার আড়ালে ঋতশ্রীর চোখটা কি হাসছে ? কন্দর্প বুঝতে পারল না। ভয়ে ভয়ে ঠাট্টা করার চেষ্টা করল একটু,— আপনার সঙ্গে কাজ করছি, পায়াভারি তো হওয়ারই কথা।

—বাহ, দিব্যি কথাও শিখে গেছেন দেখছি !

—শিখলাম কোথায় ! মকসো করছি।

—ফাজলামি রাখুন। সব সময়ে অত একা একা বসে থাকেন কেন ?

—কোথায় একা থাকি ! এই মাত্র ক্যান্টিনে সবার সঙ্গে লাঞ্চ করে এলাম, হইহল্লা করছিলাম...

—আমার সঙ্গেও তো কথা বলতে পারেন ! নাকি কথা বললে আমি কামড়ে দেব ?

স্টুডিওতে প্রবাদ আছে ঋতশ্রী নাকি সত্যি সত্যি এক প্রোডিউসারকে কামড়ে দিয়েছিল। সেই প্রোডিউসারটি ছিল বীরভূমের এক কোল্ড স্টোরেজের মালিক। প্রচুর টাকা নিয়ে এসেছিল লোকটা। যতটা না ফিলম করার মতলবে, তার থেকে বেশি নায়িকাদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করার প্রলোভনে। চিত্রনাট্য শোনানোর অছিলায় ডিরেক্টরের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল ঋতশ্রীকে,

সেখানেই বুঝি কাঁধে হাত টাত দিয়েছিল, তখনই কামড়টা খেয়ে যায়।

কন্দর্প হেসে বলল —আপনার দাঁতে জোর আছে, আমি জানি।

—শুধু দাঁতে নয়, হাতেও জোর আছে। দেখবেন ? আলগা চড় দেখাল ঋতশ্রী, —মুড অফ হয়ে যাচ্ছে, একটা গান শোনান তো।

—গান ! এখন ! এখানে !

—কেন, পরিবেশটা খারাপ ? সবুজ আছে, পুকুর আছে...

কন্দর্প ঢোঁক গিলল, —তা বলে এই ভরদুপুরে ভিড়ের মাঝে...

—ও বাবা, আপনি বুঝি আমাকে একান্তে গান শোনাতে চান ? ঋতশ্রী খিলখিল হেসে উঠল, —আপনাকে দেখে যতটা বোকা লাগে, ততটা তো বোকা নন !

কন্দর্প মনে মনে বলল, অনেক বেশি বোকা আমি। নইলে তোমাকে ঝিনুক কুড়িয়ে দিই !

কন্দর্পর অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মায়া হল ঋতশ্রীর। বলল,—আপনার গানের গলাটা কিন্তু সত্যিই ভারি চমৎকার। রেগুলার রেওয়াজ করেন ?

—এক সময়ে করতাম। এখন আর হয়ে ওঠে না। কন্দর্প বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, —এখন অল্পস্বল্প বাজাই। সেতার।

—গুরু কে আপনার ?

—মণিলাল নাগের কাছে শিখেছি এক সময়ে। এখন নিজেই পিড়িং পিড়িং করি।

—আপনার তো অনেক গুণ ! হাসি থামিয়ে গম্ভীর হল ঋতশ্রী, —স্মরজিৎ লাহিড়ি নেক্সট বই শুরু করছেন। পুজোর পর। আমার সঙ্গে কাস্টিং নিয়ে কথা হচ্ছিল। একটা রোলে আপনার নাম আমি রেফার করেছি। ছোট্ট, কিন্তু ভাইটাল রোল। করবেন তো ?

মুহূর্তে ঋতশ্রীর ঝিনুক প্রত্যাখ্যানের অপরাধ ক্ষমা করে দিল কন্দর্প। বলল, —এ তো আমার সৌভাগ্য। আপনি আমার কথা মনে রেখেছেন...

ঋতশ্রী কাঁধ ঝাঁকাল, —কোআর্টিস্ট হিসেবে এটা তো আমার ডিউটি। আগে আপনার কাজ আমার ভাল লাগত না, কাউকে বলিনি। এখন আপনি বেটার করছেন... ইউ নিড সাম ব্রেক।

ফ্লোরে লাইট তৈরি হয়ে গেছে, সহপরিচালক ছেলেটি বেরিয়ে এসে ডাকছে ঋতশ্রীকে। যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল ঋতশ্রী, —এই যে শুনুন, রোলের কথাটা কিন্তু চারদিকে বলে বেড়াবেন না।

—না না, আমি কেন বলতে যাব ?

—রূপেনবাবু-টাবু কেউ যেন জানতে না পারে। ঋতশ্রী ঝট করে চশমাটা খুলল,— লোকে কোনও কিছুই ভাল মনে নেয় না কন্দর্প, কদর্থ করে। অ্যান্ড আই হেট ইট।

নিজের মেকআপ রুমে ঢুকে গেছে ঋতশ্রী। হাজার হাজার কিলোওয়াট আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কন্দর্প। হালকা মেকআপ ঘাম হয়ে ঝরে পড়ছে। তোয়ালে রুমাল বার করে আলগাভাবে মুখে থুপল কন্দর্প।

সুদিন কি এসে গেল !

•

স্টুডিও থেকে বেরোনোর সময়ে গেটে অশোক মুস্তাফির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কন্দর্পর। মুস্তাফি এই সময়েই আসে, সাড়ে চারটে-পাঁচটা নাগাদ। থাকে শুটিং শেষ হওয়া পর্যন্ত। তার পরও নরেন হোড়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়, দুজনে একই সঙ্গে বেরোয় স্টুডিও থেকে।

কন্দর্প অতক্ষণ থাকে না। কাজ শেষ হলেই সে বেরিয়ে যায়। মুস্তাফিও তাকে আটকায় না কোনওদিন।

আজ আটকাল। গাড়িতে বসেই ধরল কন্দর্পকে।

—তোমার আজকে হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ দাদা।

—আর কতক্ষণ চলবে কাজ ?

—হাফ শিফট তো বটে। ঋতশ্রী মণিকার দুটো সিন বাকি, ঋতশ্রীর বোধহয় একটা সোলো কাজও আছে।

—তুমি এখন চললে কোথায় ? বাড়ি ?

—না, একটু রাসবিহারীর আড্ডায় যাব ভাবছি। রোজই তো সন্ধে হয়ে যায়, আজ একটু তাড়াতাড়ি ছুটি পেলাম...। কন্দর্প স্কুটারের স্টার্ট বন্ধ করবে কিনা ভাবছিল।

মুস্তাফি বলল, —তার ওপর পকেটেও আজ গরম... আজ পেমেন্ট পেয়েছ তো ?

কন্দর্প হাসিমুখে ঘাড় নাড়ল, —হ্যাঁ দাদা। চার হাজার।

মুস্তাফি ঘড়ি দেখল, —এক্ষুনি ঠেকে যেতে হবে না। অত ঠেক-টেকে যাওয়ার কি আছে ? এসো। কথা আছে।

কন্দর্প আশঙ্কিত চোখে তাকাল, —জরুরি কিছু ?

মুস্তাফি সোজাসুজি উত্তর দিল না, —তুমি নরেনের অফিসে বোসো, আমি ফ্লোর ঘুরে আসছি।

স্কুটার ঘোরাতেই হল কন্দর্পকে। বিকেল থাকতে থাকতে কাটতে পারলে ভাল হত আজ। ভবানীপুর থেকে তিতিরের জন্য একটা কোয়ার্টজ ঘড়ি কেনার ইচ্ছে ছিল। গোলেমালে মাঝখান থেকে তিতিরটা বঞ্চিত হয়েছে। এ কাজটা থেকে সর্বসাকুল্যে হাজার পনেরো পাওয়ার কথা, এরই মধ্যে দু খেপে নয় পেয়ে গেল, এখনও ঘড়িটা না কেনা অন্যায় হয়ে যাবে।

নরেনের কুঠুরিতে বসে নিজেকে খুঁড়ছিল কন্দর্প। নিজের মধ্যেই অদ্ভুত এক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে আজকাল। আগে দু-পাঁচশোর বেশি জুটত না, নিজে হাতখরচের জন্য সামান্য কিছু রেখে সবটাই তুলে দিত বউদির হাতে। আর এখন ? ক'দিন আগে পাঁচ হাজার পেল, কিছুতেই হাজার টাকার বেশি বউদিকে দিতে হাত সরল না। এবারও কি প্রাণে ধরে পাঁচ-সাতশোর বেশি দিতে পারবে ? মনে হয় না। গতবারও হাজার তিনেক ব্যাঙ্কে ফেলেছে, এবারও হাজার দুয়েক ঢুকিয়ে দেবে অ্যাকাউন্টে। হাতে একটু বেশি টাকা আসার পর থেকেই এরকম প্রবৃত্তি এল কেন তার ? অথচ টাকা হাতে না থাকার সময়ে ঠিক এর উল্টোটাই ভাবে সে।

কন্দর্প কি সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ?

অথবা নিজের জন্য একটু শক্ত মাটি তৈরি করতে চাইছে নিজেরই অবচেতনে ?

মুস্তাফি মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে গেছে। শুটিং নিয়ে দু-একটা মন্তব্য করেই কাজের কথায় এল, —শোনো, আমি পরশু দিল্লি যাচ্ছি।

সুদিন ! সুদিন ! কন্দর্পের হৃৎপিণ্ড কি পলকের জন্য লাফিয়ে উঠল !

কন্দর্প ক্ষুধার্তের মতো বলল, —ওই সিরিয়ালটার জন্য ?

—সিরিয়ালের খোঁজ তো নেবই।

—কবে নাগাদ শুরু হতে পারে কাজটা ?

—বলা কঠিন। আদৌ হবে কি না তাও সন্দেহ।

—কেন ?

—দেখছ না চারদিকে কী ডামাডোলের বাজার ! পুজোর পর ইলেকশন আসছে, এখন কি আর নতুন সিরিয়াল ছাড়ছে ?

—তাহলে আর দিল্লি যাচ্ছেন কেন ? কন্দর্প স্যাঁতানো গলায় বলল।

—অন্য কাজও আছে। রেল মিনিস্ট্রিতে। আমাকে তো এক ধান্দায় পড়ে থাকলে চলে না। তবে হ্যাঁ, মাণ্ডি হাউসেও ঢুঁ মারব।

কন্দর্প চুপ মেরে গেল।

মুস্তাফি বিদেশি সিগারেট ধরিয়ে গোল করে ধোঁয়া ছাড়ল, —হ্যাঁ, যা বলছিলাম... মানে তোমাকে যার জন্য ডাকা। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

—আমি...আআআমি !

—জানি পরশু তোমার শুটিং আছে। নরেনকে বলে দেব তোমার সিনগুলো সকালে টেক করে নেবে।

কন্দর্প জোর করে প্রতিবাদ করতে পারল না। কিন্তু তার মনে অবিরাম বেজে যেতে লাগল—আমি কেন ! আমি কেন !

অশোক মুস্তাফি চোখ সরু করে দেখছে কন্দর্পকে। কন্দর্পর অস্থিমজ্জা ভেদ করে ঢুকে যাচ্ছে দৃষ্টিটা। হঠাৎ হা হা করে হাসল, —জানি কী ভাবছ। ভাবছ, তুমি কেন ? তাই তো ?

কন্দর্প মাথা নামাল।

—শোনো। প্রথমত, আমি আমার লাইনের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরা পছন্দ করি না। সেকেন্ডলি, দা মোস্ট ভাইটাল রিজন হল, আমি একটু মেরুদণ্ডহীন, উচ্চাশাবিহীন লোকদের সঙ্গ ভালবাসি। অ্যান্ড ইউ নো, তুমি এই রোলটাতে একদম ফিট।

কন্দর্প পুরোপুরিই সেঁতিয়ে গেল। অপমানিতও বোধ করল যেন। তবে মুখে কিছু বলল না।

মুস্তাফি গলা তুলল,—কী হল, যাচ্ছ তো ?

—বলছেন যখন, যাব।

—গুড। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেছে মুস্তাফির, —আমি পুজোর পরে আর একটা ফিলম লঞ্চ করছি। লো বাজেট ফিলম। স্মরজিৎ লাহিড়ি ডাইরেক্ট করবে।

কন্দর্প বেশ চমকে গেল, —স্মরজিৎ লাহিড়ির বই আপনি প্রোডিউস করছেন ?

—লাইনে থাকতে গেলে সবই করতে হবে হে। লোকটা খুব এন এফ ডি সি, আর্ট ফিল্ম, প্রতিবাদী চলচ্চিত্র, রোম ফেস্টিভাল, কান ফেস্টিভাল দেখাত। সেদিন এক বন্ধুকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির। করুণ মিনতি, ইন্ডাস্ট্রিতে এত পয়সা ঢালছেন, আমাদের কথাও একটু ভাবুন। তা ভেবে দেখলাম, কিছু লাগিয়েই দিই। নামও হবে, আবার ওদিকে লসের খাতায় অঙ্কটাও একটু বাড়িয়ে দেখানো যাবে। আর যদি কোনও প্রাইজ টাইজ পেয়ে যায়, তাহলে বিদেশে বেচে, টিভিতে দেখিয়ে কিছু পয়সা তো ঘরেও ফিরবে, কী বলো ? ঋতশ্রীকে সাইনও করিয়ে নিয়েছি। ...বাই দা বাই, ছবিটাতে তুমিও একটা রোল করছ।

কন্দর্প মনে মনে বলল, জানি। মুখে অবাক হওয়ার ভান ফোটাল, —তাই ?

—ইয়েস ব্রাদার। তোমাদের ঋতশ্রী রোলটার জন্য একটা ক্যান্ডিডেট ফিট করেছিল। সুনির্মল সরকার। আমি বাতিল করে দিয়েছি। স্মরজিৎকে বলে দিয়েছি, ওই রোলে তুমিই আমার চয়েস। স্মরজিৎ রাজি হয়েছে।

কন্দর্প স্তম্ভিত হয়ে গেল। পুকুরপাড়ে ঋতশ্রীর অত রঙঢঙ, অত সহৃদয় ব্যবহার, সবই কি ছলনা ! না, সত্যিই মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

মুস্তাফি সিগারেট নেবাল, —তবে কি জানো, তোমাকে রোল দিয়েও লাভ নেই। তুমি জীবনে শাইন করতে পারবে না।

—এ কথা কেন বলছেন দাদা ? আমি কি এই ছবিতে খারাপ কাজ করেছি ? আর দু-একটা চান্স পেলে...

—কিচ্ছু হবে না। মুস্তাফি মাছি তাড়ানোর মতো উড়িয়ে দিল কথাটা, —কাজ অনেকেই ভাল করে, ওপরে ওঠে কজন ? ওপরে ওঠার জন্য আলাদা মেটিরিয়াল লাগে। সেটা তোমার নেই।

কন্দর্প অভিমানী গলায় বলল, —কী নেই আমার দাদা ? পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা...

—দুর দুর দুর। ফুটপাথে গামছা বিক্রি করতাম, পরিশ্রম অধ্যবসায়ের জোরে টাটা-বিড়লা হয়ে গেলাম, এ সব ছেঁদো গপ্পো ছাড়ো তো। আসল জিনিস যেটা দরকার, সেটা হল বুকের পাটা। পাপ করবার সাহস। রুথলেসনেস। আমি ছাড়া পৃথিবীতে কিছু নেই, এই মনোভাব। এসব আছে তোমার ? বাড়ির ছেলে বাড়িতেই মিনমিন করে থাকো, তুমি করবে উন্নতি।

—জানি দাদা, বাড়িটা করে দিতে পারলাম না বলে আপনি আমার ওপর রেগে আছেন..

—ধুস, ও কথা বোলো না। অপদার্থ মানুষদের আমার বেশ ভালই লাগে। একটা কেন্নো কেন্নো ভাব... ! তাছাড়া তোমার বাড়িটা না হলে কি আমি মরে যাচ্ছি ? হ্যাঁ, পেলে ভাল হত, কিছু ক্যাশ টাকা আসত। ইলেকশানে সব পার্টির গর্ভেই তো কিছু কিছু করে ঢালতে হবে। কবে কে কোন কম্মে লাগবে ঠিক নেই, ঝুলি পেতেই রয়েছে !

ছোট্ট অফিসঘরে আলো তেমন উজ্জ্বল নয়, বাইরেও বিকেল ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বিন বিন মশা ঘুরছে চারদিকে, ঘুরন্ত পাখার নীচেও অতর্কিতে হুল ফোটাচ্ছে।

মুস্তাফি উদাস মুখে বলল, —আমি কি নিজেই কিছু করতে পারতাম না ? পারতাম। গুণ্ডা ফিট করতে পারতাম, পার্টির ছেলেদের লেলিয়ে দিতে পারতাম, তারা দু দিনে তোমার বাড়ির লোকদের অতিষ্ঠ করে ছেড়ে দিত। কিন্তু তোমাদের ওই একটা বাড়ির পেছনে ছুটে আমার কী লাভ ? তবে এসব একেবারে করিনি তা তো নয়, প্রথম প্রথম করেছি। টালিগঞ্জে একটা দশ কাঠা জমিতে এক বুড়ি খুব ব্যাগড়া দিচ্ছিল। যতই টোপ দিই, খায় না। শেষে তিন মাস ধরে এমন হুড়কো দিয়েছিলাম, বুড়ি ভয়েই টেঁসে গেল। এখন আর ওসব ভাল লাগে না। তার ওপর সামনে ইলেকশান, কোত্থেকে কোনটা পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে যাবে, কাগজে নাম বেরিয়ে যাবে। ....বোঝই তো, ব্যবসা করতে এসেছি, একটু আড়ালে আবডালে থাকাই ভাল। মুস্তাফি দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল—যাক গে, কী আর করা। তোমার মতো একটা রঙ হর্সকে ব্যাক করেছি...আমার ইনটিউশ্যানটা সত্যিই খুব খারাপ।

কন্দর্প করুণ মুখে বলল, —আমি কী করি বলুন তো দাদা ? আপনাকে তো বলেইছি, ফ্যামিলিতে কী অশান্তিটা হয়ে গেল ! বাবা বেঁচে থাকতে কিছু হওয়ার নয়। আমার এখন কি কোনও হাত আছে ?

—বাপটাকে মেরে ফেলতে পারতে। মুস্তাফি হাই তুলল, —বয়স হয়েছে, তারপর শুনি তো হাঁপের টান, মুখে একটা বালিশ চেপে ধরতে পারতে ! কে কখন কোথায় মরবে সবই তো ব্রহ্মময়ী ঠিক করে রেখেছেন, নয় তাঁর লীলাটা তোমার হাত দিয়েই হত।

নিজের কথাটা নিজেরই খুব পছন্দ হয়েছে মুস্তাফির। হা হা হাসছে।

কন্দর্প ঘামছিল। পাখাটা কি ঘুরছে না ভাল করে ?

হাতের কবজিতে মশা বসেছে একটা, অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষছে। অন্যমনস্ক কন্দর্প কবজিতে হাত বোলাল, থেঁতলে গেল মশাটা। কয়েক ফোঁটা রক্ত লেপটে গেছে চামড়ায়। কন্দর্প উঠে দাঁড়াল।

মুস্তাফির হাসি থামেনি এখনও। হাসতে হাসতেই বলল, —আমি সত্যি সত্যিই তোমাকে খুন করতে বলিনি। শুধু বোঝাতে চাইছিলাম, কাকে বলে শাইন করার ইচ্ছে। জয় করার সর্বগ্রাসী বাসনা। প্যাশান ফর সাকসেস। তোমার লোভ আছে, প্যাশানটা নেই।

কন্দর্প গোমড়া মুখে বলল, —পরশু কখন যেতে হবে ?

—ঠিক চারটেয় বেরোব। তুমি এখানেই থেকো, আমি তোমাকে পিকআপ করে নেব। সাড়ে ছটায় ফ্লাইট।

কন্দর্প বেরিয়ে আসছিল, মুস্তাফি পিছু ডাকল, —তুমি কি রাগ করলে কন্দর্প ?

—না। আপনি সবই বলতে পারেন।

—আমি কিন্তু তোমাকে সত্যিই লাইক করি কন্দর্প। তোমার ওপর কি জানি কেন, আমার একটা উইকনেস এসে গেছে। মুস্তাফি গলা নামাল, —দেখো, আজ রাত্রেই বাবাকে যেন খুন করে বোসো না।

স্কুটার স্টার্ট করার সময়ে আবার নিজের হাতের কবজির দিকে চোখ পড়ল কন্দর্পর। রক্তটা শুকিয়ে গেছে। লাল রঙ এর মধ্যেই কালচে। রক্ত বলে বোঝাই যায় না।

লেকের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল কন্দর্প।

আজ আর রাসবিহারীর আড্ডায় যাওয়া হল না, ইচ্ছেই করছে না। গিয়ে হবেই বা কি ? অশোক মুস্তাফির বাক্যগুলো ক্রমাগত লাথি মারছে মাথায়, উত্যক্ত হয়ে আছে করোটি। মুস্তাফি কী চায় ? কী মনে করে কন্দর্পকে ? ক্রিমিকীট ? লেজ নাড়া লেড়ি কুত্তা ?

শরতের সন্ধ্যা বড় তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে গেছে। বাতাস বইছে পলকা। শুকনো বাতাস নয়, একটু ভিজে ভিজে ভাব আছে বাতাসে। বৃষ্টির স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেনি আকাশ।

পথের দু ধারে গাছের সারি ঘন পাতায় ছাওয়া। ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে রাস্তায়। কালো পথে যতটা আলো, ঠিক ততটাই অন্ধকার।

কন্দর্প আলো-আঁধারে স্কুটার থামাল। বাহন লক করে ঢুকল লেকে। পায়ে পায়ে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। লেকের এদিকটায় বাতি জ্বলছে না, বড় অন্ধকার হয়ে আছে জল। হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে পাড় ছুঁচ্ছে, জলে একটা শব্দ উঠছে মৃদু। একটু দূরের দ্বীপ কালো, ঘন কালো।

পায়ে পায়ে স্কুটারের কাছে ফিরল কন্দর্প। আবার আনমনে জলের ধারে চলে গেছে। আবার ফিরল।

ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরতেই এক তীক্ষ্ণ ডাক শুনে কন্দর্প সংবিতে ফিরেছে। থামল।

ব্যাঙ্কের গায়ে, রাস্তার চায়ের দোকান। সেখান থেকে ভাঁড় হাতে উঠে এসেছে পল্টু,—কী কেস করেছ বস ! পাড়ায় কী সব জিনিস আসছে !

কন্দর্প ভুরু কুঁচকে তাকাল,—কী হয়েছে ?

—বিকেলে তোমাকে একজন খুঁজতে এসেছিল। পুরো শ্রীদেবী।

—কে ?

—হাইটটা অবশ্য শ্রীদেবীর নয়, জয়া প্রদার মতো।

—কী নাম ?

—তা তো বলতে প্যারব না বস। আমি দত্তদার দোকানে সিগারেট কিনছিলাম, তোমার নাম করে ঠিকানা খুঁজছিল, বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম।

কন্দর্প ধাঁধায় পড়ে গেল। কন্দর্পর যে কোনও মেয়েবন্ধু নেই তা নয়, তার চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে অনেক মেয়েই প্রাথমিক ভাবে জমাতে আসে। পাড়ার। বেপাড়ার। কয়েক বার হালকা হালকা প্রেমেও পড়েছে সে। তবে একটা প্রেমও গাঢ় হওয়া অবধি টেকেনি। প্রেমিক হিসেবে কন্দর্প দারুণ পয়া, তার সঙ্গে তিন দিন ঘুরলেই ভাল ভাল সম্বন্ধ এসে যায় প্রেমিকাদের। এবং তাদের বিয়েতে গিয়ে কন্দর্প পেট পুরে খেয়ে আসে। ফিরে এসে তারিফ করে বরেদের, একটু ভারী বুকে। তাদেরই কেউ কি পথ ভুলে এসেছিল ?

কন্দর্প জিজ্ঞাসা করল, —বিয়ে হয়ে গেছে ?

—আমি তো মেয়েদের কপালের দিকে তাকাই না বস। পল্টু চা শেষ করে পায়ে চেপে গুঁড়োচ্ছে ভাঁড়,—তুমি এখন হিরো বলে কথা। দেখো, হয়তো কোনও হিরোইনই এসেছিল। চিনতে প্যারলাম না।

—কতক্ষণ আগে এসেছিল ?

—তা হবে সাড়ে চারটে-পাঁচটা। চলেও গেছে, আমি দেখেছি। তা বস তোমার ফিলমের শুটিং কতদূর ?

—হয়ে এসেছে। কন্দর্প চিন্তিত মুখে বলল।

—পাশ টাশ দিও। তোমার বই কিন্তু গুরু পয়সা দিয়ে দেখব না।

—দিই তো। দিই না ? কন্দর্প অল্প খিঁচিয়ে উঠে স্কুটার এগোল।

বাড়ি ঢুকতেই মিনতি। কন্দর্পকে দেখে হাসছে ফিক ফিক, —ছোড়দা, আপনি বাড়ি ফিরলেই

বড়বউদি আপনাকে দেখা করতে বলেছে।

—কেন ? কন্দর্প মুখ চোখ স্বাভাবিক রাখতে চাইল।

—সে আমি কী করে বলব ? হাসিটা আর একটু বেড়ে গেল যেন, —গিয়েই দেখুন।

মহা ফাজিল হয়েছে তো মেয়েটা ! এত আস্কারা দেয় রুনা !

নিজের বন্ধ ঘরের সামনে দু-চার সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কন্দর্প। ওপরে যেতে, বিশেষত ইন্দ্রাণীর ঘরে, এখনও বেশ অস্বস্তি হয় তার। সেদিনের সেই অশান্তির পর কন্দর্পকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি ইন্দ্রাণী। আউটডোর শুটিং থেকে ফেরার পরও না। প্রশ্ন করলে সব কথা উগরে দিয়ে খানিকটা লঘু হতে পারত কন্দর্প, সেই সুযোগটুকুও ইন্দ্রাণী দিল না। নিজে থেকেই ইন্দ্রাণী কথা বলেছে, গল্প করেছে, হাসিতামাশাও যে করেনি এমন নয়, কিন্তু সেদিনের প্রসঙ্গ আগাগোড়াই উহ্য রেখেছে। কেন যে রেখেছে, কন্দর্প তাও জানে। ইন্দ্রাণী কিছুই ভোলে না। ঠিক সময় বুঝে আঘাত করবে কন্দর্পকে। করবেই। আঘাতটা কোন দিক থেকে যে আসবে সেটা ভেবে ভেবে রয়ে গেছে অস্বস্তিটাও।

মেয়েটা কে এসেছিল ? জানতে কৌতূহলও হচ্ছে খুব।

কন্দর্প ওপরে উঠল। তাড়াতাড়ি নয়, শ্লথ পায়ে।

ইন্দ্রাণী সেলাই মেশিন নিয়ে মাটিতে বসে আছে। কি একটা যেন সেলাই করছে। বোধহয় জানলার পর্দা। কন্দর্পকে দেখে হাসল,—বোসো।

কন্দর্প পকেট থেকে ছোট্ট বাক্সটা বার করল, —দ্যাখো তো ঘড়িটা কেমন !

ইন্দ্রাণী খুলে দেখল, —বাহ, দারুণ ঘড়ি।

—তিতিরের জন্য কিনে আনলাম। তিতির কোথায় ? বাড়ি নেই ?

—বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছে। এক্ষুনি ফিরবে। ইন্দ্রাণীর মুখে আলগা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল, —তুমি এটা কিনতে গেলে কেন ? এর তো প্রচুর দাম। কত পড়ল ?

—তা দিয়ে তোমার কী হবে ! মাধ্যমিকে ভাল করলে আমি ওকে দেব বলেছিলাম...

—এত দামি জিনিস দেওয়া ঠিক নয়।

কন্দর্প সাহস করে বলে ফেলল, —এ তো বিটুইন আমি আর তিতির। এর মধ্যে তুমি নাক গলাচ্ছ কেন ?

ইন্দ্রাণী কি বলতে গিয়েও সামলে নিল। বাক্স বন্ধ করে খাটে রেখেছে। সেলাই মেশিনের হ্যান্ডেলে হাত রাখল, —তোমার খোঁজে একজন এসেছিল। কে বলো তো ?

—হ্যাঁ, রাস্তায় পল্টুও বলছিল। কে ?

—মধুমিতা।

—মধুমিতা ? কে মধুমিতা ?

—তা তো বলতে পারব না। বাগুইআটিতে থাকে বলছিল।

—ও, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। অবাক হলেও কন্দর্প বিস্ময়টা মুখে ফুটতে দিল না, —মধুমিতা মানে চিনেছ তো ? আমার সেই বন্ধু দীপঙ্কর... হঠাৎ মারা গেল... তার বউ। তোমাকে বলেছিলাম না খুব স্যাড কেস... একটা বাচ্চা আছে... !

—বলেছ হয়তো। তুমি তো কত কিছুই বলো, আমিই মনে রাখতে পারি না। সেলাই মেশিন চালানো শুরু করেছে ইন্দ্রাণী।

বউদি কি খোঁচা দিয়ে নিল একটু ! কন্দর্প আমল দিল না, —কি জন্য এসেছিল ?

—কিছু তো বলল না। দু-এক মিনিট কথা বলতে না বলতেই চলে গেল। মুখ চোখ দেখে মনে হল তোমার সঙ্গে খুব দরকার। বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

মাস তিন-চার ওদিকে যায়নি কন্দর্প। শেষ দিন মধুমিতাকে দুটো ঠিকানা দিয়ে এসেছিল। চাকরির। কন্দর্পর স্কুলের এক বন্ধু এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করছে, তার অফিসে

রিসেপশনিস্টের। আর নতুন একটা কুরিয়ার সার্ভিসে ডেস্ক জবের। তারপর আর খোঁজ নেওয়া হয়নি।

বাড়িতে এল কেন মধুমিতা ? নতুন কোনও অঘটন ঘটল কি ?

ঘড়ঘড় শব্দে সেলাইমেশিন চলছে। অবিরাম যন্ত্রসূচের ওঠানামা বিদ্ধ করছে নীল কাপড়টাকে। কন্দর্প চোখ সরিয়ে নিল।

হঠাৎই দৃষ্টি কবজিতে আটকেছে। রক্তের ছোপটা এখনও মিলোয়নি।

২২

স্কুলে টিফিনের সময় বেয়ারা একটা চিঠি দিয়ে গেল ইন্দ্রাণীকে।

ইন্দ্রাণী তখন গোগ্রাসে খাচ্ছিল। স্কুলে আসার আগে চা ছাড়া কিছু খেয়ে আসে না, এসেই পর পর চার পিরিয়ড ক্লাস থাকে, এই সময়টায় পেটের মধ্যে হাঁ হাঁ করে উনুন জ্বলে তার। সামনে একটা দোকানকে বলা আছে, তারাই স্কুলে এসে খাবার দিয়ে যায়। ইডলি ধোসা পরোটা তরকারি, এই সব। খাবারের স্বাদ কেমন বোঝার তর সয় না, স্টাফ রুমে ঢুকেই ইন্দ্রাণী কচকচ চিবোতে শুরু করে দেয়।

ইন্দ্রাণীর খাওয়া থামল। বাদামি লেফাফা। মুখ বন্ধ। ওপরে তার নাম টাইপ করা আছে ইংরিজিতে।

ইন্দ্রাণী আলগোছে খামটা ছিঁড়ল। চিঠি পড়তে পড়তে ক্রমশ ভুরুর ভাঁজ ঘন হয়ে এল। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে শো কজ করেছে!

স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বছর তিনেক ধরে একটা গণ্ডগোল চলছে ইন্দ্রাণীর। চাকরির স্থায়ীকরণের তারিখ নিয়ে। এই স্কুলে প্রথমে সে ঢুকেছিল একজনের ছুটির বদলি হিসেবে, পরে তার চাকরিটা পাকা হয়। চাকরি ঠিক কোন দিন থেকে পাকা হয়েছিল তাই নিয়েই ঠাণ্ডা লড়াই। ইন্দ্রাণীর মতে সার্ভিস বুকে যে তারিখটি লেখা আছে, সেটি ভুল, আইন মোতাবেক আরও তিন মাস আগে তার চাকরি স্থায়ী হওয়ার কথা। নিজের মত জানিয়ে স্কুল কমিটিকে অনেকগুলো চিঠি দিয়েছে ইন্দ্রাণী, একটিরও জবাব পায়নি। অসহিষ্ণু হয়ে গরমের ছুটির আগে বেশ রূঢ় ভাষায় আর একটি চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠির ভাষায়, চার মাস পরে, ম্যানেজিং কমিটির গোঁসা হয়েছে। কেন ইন্দ্রাণীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, জানতে চেয়েছে তারা।

চড়াং করে ইন্দ্রাণীর মাথা গরম হয়ে গেল। এমনিতেই ক'দিন ধরে তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। আদিত্য আবার উৎপাত শুরু করেছে বাড়িতে। কোথায় কি ব্যবসার লাইসেন্স বার করতে ঘুষ দিতে হবে, আজই হাজার টাকা দাও। কাল কোন উকিলকে ফিজ না দিলে চলবে না, পাঁচশো টাকা দাও। করপোরেশনে ট্রেড লাইসেন্স করাব, তিনশো টাকা দাও। অথচ বড় মুখ করে বলেছিল, এবার নাকি একটি টাকাও ল্যাগবে না। পরশু রাত্রে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতেই রাগ হয়ে গেল বাবুর, দু পাত্র গিলে চলে এল। আগের দিনের মতো হল্লা করেনি, এই যা রক্ষে। কিন্তু এ তো পুরোদস্তুর ব্ল্যাকমেলিং!

তবে এরকম হামলা তো ইন্দ্রাণীর জীবনে লেগেই আছে। শুধু এইটুকুনির জন্যই কি তার মেজাজ খারাপ ? না, তা বোধহয় নয়। শুভাশিসও বেশ কয়েকদিন ধরে আসছে না। ইদানীং তার আসাটা বড় অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাধি হয়েছে ইন্দ্রাণীর। শুভাশিস এলেও পাঁচ মিনিট তার সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে পারে না, কারণে অকারণে তর্ক বেধে যায়, আবার সে না এলেও মনটা কেমন হু হু করতে থাকে। শূন্য লাগে সব কিছু।

চটপট খাওয়া শেষ করে ইন্দ্রাণী হেডমিস্ট্রেসের ঘরে গেল। চেয়ার টেনে বসে খামটা ছুঁড়ল টেবিলে,—এটা কী ?

নীলিমা কতগুলো বিল পরীক্ষা করছিলেন। একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়েছেন,—পড়োনি ?

—পড়েছি বলেই তো আসা।

—উত্তর দিয়ে দাও, তুমি তো ইংরিজি ভাল লেখ।

—আমি জানতে চাই এর মানে কী ! আপনারা আমার ন্যায্য চিঠির উত্তর দেবেন না...

—তুমি ঠিক বলছ না ইন্দ্রাণী। চিঠিটা আমি দিইনি, ম্যানেজিং কমিটি দিয়েছে।

—ওই হল। আপনিও তাদের একজন।

নীলিমা বিলগুলো সরিয়ে রাখলেন, —হ্যাঁ একজন। আমিও তোমার চিঠির ল্যাঙ্গুয়েজে খুশি নই। তোমার জানা উচিত অথরিটিকে ওই ভাষায় চিঠি লেখা যায় না।

—কিন্তু অথরিটি আমার লেজিটিমেট ডিম্যান্ডকে ইগনোর করতে পারে, তাই তো ? আমার সার্ভিস বুক আজ পর্যন্ত ঠিক করা হল না, সেটা অন্যায় নয় ?

—তোমার সার্ভিস বুক সময় মতোই ঠিক করা হবে। যদি প্রয়োজন হয়। তুমি তো আর এক্ষুনি রিটায়ার করছ না।

—বাহ্, চমৎকার যুক্তি ! ইন্দ্রাণীর গলায় শ্লেষ, —তা এই চিঠি নিয়ে আমাকে কী করতে হবে ?

—বললাম তো, উত্তর দিয়ে দাও। মাথা গরম কোরো না, দু লাইনে সরি লিখে দাও, সব মিটে যাবে।

—আর যদি আমি দুঃখপ্রকাশ না করি ? সত্যিই তো আমি দুঃখিত নই। আপনাদের ইনএফিসিয়েন্সির জন্য আমি দুঃখিত কেন হতে যাব ?

—সেটাই তাহলে কমিটিকে জানিয়ে দাও। তারপর কমিটি যা করার করবে।

—কী করবে ? আমার চাকরি খাবে ?

—সেটাও ম্যানেজিং কমিটির ডিসিশান। তবে তুমি ক্ষমা চেয়ে নিলে গোড়াতেই মিটে যায়।

—বুঝেছি। ইন্দ্রাণী গটমট করে উঠে চলে এল।

টিচার্স রুমে ঢুকে কমলিকার সামনে আবার চিঠিটা ছুঁড়ে দিল ইন্দ্রাণী।

কমলিকা হকচকিয়ে গেছে। ইন্দ্রাণী স্কুলে শান্তই থাকে, তাকে এমন রুদ্রমূর্তিতে কমলিকা দেখেনি কোনওদিন। বলল,—কী হয়েছে ?

—চিঠিটা পড়। পড়লেই বুঝবি। এতদিন ধরে সিনসিয়ারলি পড়াচ্ছি, ছুটি নিই না, ক্লাস ফাঁকি দিই না, তার জন্য স্কুল কমিটি আমাকে পুরস্কার দিয়েছে।

চিঠি পড়ে কমলিকাও খেপে গেছে,— এ কী অন্যায় কথা ! আমরা কি কারুর খাসতালুকের প্রজা যে সব সময়ে পা চেটে কথা বলতে হবে ?

—সে তোরাই বল। আমি কি কারুর দয়ায় চাকরি পেয়েছিলাম ? নীলিমাদি আবার বলে ক্ষমা চাও !

কমলিকা ঘুরে ঘুরে অন্য শিক্ষিকাদের দেখাচ্ছে চিঠিটা। ঘণ্টা পড়ে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে ইন্দ্রাণী ছুটেছে ক্লাসে।

ছুটির পর জোর গজল্লা বাধল টিচার্স রুমে। এর মধ্যেই শিক্ষিকারা দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এক দল, তারাই সংখ্যায় ভারী, বলছে ইন্দ্রাণী যদি দুঃখপ্রকাশ করলে ঝামেলা মিটে যায় তবে তার তাই করা উচিত। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে গিয়ে কী লাভ ! কমলিকা আর অল্প কয়েকজন চাইছে ইন্দ্রাণী যেন একচুলও পিছিয়ে না আসে। আরও কড়া ভাষায় উত্তর দিক শো কজের। বেগড়বাই দেখলে উকিলের চিঠি ধরিয়ে দিক কমিটিকে।

আগুন মাথায় বাড়ি ফিরল ইন্দ্রাণী। আধ ঘণ্টা ধরে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়েও এতটুকু শীতল হল না মস্তিষ্ক। খেতে ভাল লাগল না, বিনা কারণে সন্ধ্যার মাকে মুখ করল খানিক। ঘরে এসে চিঠির মুসাবিদা করতে বসল। একটা জবরদস্ত জবাব দিতে হবে।

চিঠি লিখছে, আর কাটছে। লিখছে, আর কাটছে। কিছুতেই আর মনোমত উত্তর হচ্ছে না। চিঠির ভাষা আরও কড়া হতে হবে, কিন্তু যেন অভব্য না হয়ে যায়। যেন কেউ কোনও ফাঁক না ধরতে পারে।

হচ্ছে না। হচ্ছে না। একগাদা কাগজ কুটি কুটি করে ছিঁড়ল ইন্দ্রাণী। দুম দুম করে দুটো ঘরেরই জানলা বন্ধ করল। নেমে এল প্রেসঘরে।

দুই কম্পোজিটার টাইপ সেট করে চলেছে। উল্টোদিকের টুলে বসে আছে মিনতি। দরজার দিকে পিছন ফিরে কথা বলছে। দুর্লভের মেশিন চলছে একটানা।

ইন্দ্রাণী মিনতিকে ধমক দিল, —তুই কী করছিস এখানে ?

মিনতি অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল, —এই তো একটু বসে আছি। বাসন-কোসন মাজা হল...

—তোকে বলেছি না, এখানে যখন তখন আসবি না ? লোকের কাজে ব্যাঘাত হয়।

—আমি তো চুপ করে বসে আছি। মেশিনদাদুকে জিজ্ঞেস করো না...

—ঠিক আছে, ভেতরে যা। বাবা বোধহয় শোবেন, মশারিটা টাঙিয়ে দে গে যা। বড্ড মশা বেড়েছে।

মিনতির খুব একটা তাপ-উত্তাপ দেখা গেল না। গ্যারাজ ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শরীর মোচড়াচ্ছে,— উনি এখন শোবে না। ছোড়দার সঙ্গে কথা বলছে। বলতে বলতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাচ্ছে মিনতি।

চাঁদু কি আজও বেরোয়নি ! দিল্লি থেকে ফিরে একদিন কোথায় গেল, ফিরল সেই রাত দশটায়। তারপর থেকে ক'দিন শুধু শুয়েই আছে বাড়িতে। কাজকর্ম কি ঘুচে গেল চাঁদুর !

কোণে এক সেট চেয়ার টেবিল রাখা আছে। অফিস কাম প্রুফ দেখার জায়গা। ইন্দ্রাণী বসল।

বসেই প্রশ্ন ছুঁড়েছে, —দুর্লভবাবু, সানশাইনের জবটা ডেলিভারি দিয়ে এসেছেন ?

দুর্লভ মেশিন থেকে চোখ সরাল না, —কালই দিয়ে এসেছি বউদি।

—কবে পেমেন্ট দেবে বলল ?

—যেমন দেয়। সাত দিনে।

—মনে করে নিয়ে আসবেন। ভুলবেন না।

—আমি তো ভুলি না বউদি।

ইন্দ্রাণী কিছু বলতে পারল না। শুভাশিসের পরিচিত জায়গাগুলোতে অর্ডার ডেলিভারি পেমেন্টের জন্য ইন্দ্রাণী কখনও যায় না, দুর্লভকেই পাঠায়। বরাবরই যথাসময়ে টাকা আনে দুর্লভ, কোনওদিনই ভুলচুক হয় না। কাজটা দুর্লভের নয়, এর জন্য কোনও অতিরিক্ত টাকাও পায় না সে, তবু দায়িত্ব নিয়েই করে। তাকে কী বলবে ইন্দ্রাণী !

কিন্তু মন মানতে চাইছে না আজ। ইন্দ্রাণীর ভেতরের পুঞ্জীভূত ক্রোধ আছড়ে পড়তে চাইছে কোথাও। এতে যদি শান্ত হয় ভেতরটা।

কম্পোজিটরদের ধরল ইন্দ্রাণী—কর ব্রাদার্সের ম্যাটার রেডি হয়ে গেছে ?

—ওই তো প্রুফ তোলা আছে টেবিলে।

—আর কারা যেন শ্রাদ্ধের কার্ড ছাপতে দিয়ে গিয়েছিল ?

—এই তো খানিক আগে ডেলিভারি নিয়ে গেল।

—হুঁ। ইন্দ্রাণী অসহায় মুখে প্রুফ খুলে বসল। পেনসিল দিয়ে চেপে চেপে সংশোধন করছে। যেন টাইপে নয়, নীলিমার মুখেই পেনসিলের আঁচড় টানছে। হঠাৎই রুনার গলা শুনে চমকে তাকাল।

—দিদি, ও দিদি, এক্ষুনি এসো। তোমার ফোন।

ইন্দ্রাণী ভীষণ অবাক হল। রুনা তো কক্ষনও প্রেসঘরে আসে না ! তাদের মধ্যে বাক্যালাপও আজকাল কমই হয়, খুব প্রয়োজন না হলে রুনা কথাই বলে না। ফোন এলেও মিনতিকে দিয়ে খবর

পাঠায়। ঘুম ভাঙা চোখে রুনা ছুটে এসেছে কেন!

এক সেকেন্ডের লক্ষ ভগ্নাংশে কথাগুলো ভেবে নিল ইন্দ্রাণী। সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্বেগও ফুটে উঠেছে গলায়। অজান্তেই।

—কার ফোন ?

—তোমার মা'র। তোমার বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

উদভ্রান্তের মতো দৌড়েছে ইন্দ্রাণী। সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল শাড়ি, রেলিঙ ধরে পতন আটকাল। অসাড় হাতে রিসিভার তুলেছে, —কী হয়েছে ?

—তোর বাবা সেই সকাল সাতটায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। উমার গলা কান্নায় ভেঙে পড়েছে, —আমি এখন কী করব ইনু ?

নেহাইয়ের বাড়ি পড়ল ইন্দ্রাণীর মাথায়। মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যেন। আজই তো উনত্রিশে অগাস্ট! তনুর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার দিন!

আজকের দিনটাকে কী করে ভুলে গেল ইন্দ্রাণী! এত বড় ভুল।

হাতের সাড়হীনতা ছড়িয়ে গেছে গলায়, —কেউ খুঁজতে বেরিয়েছে ?

—কাকে বলব ? দিলুও তো এখন অফিসে। আমি টুনুদের বাড়ি থেকে...

—তুমি চিন্তা কোরো না। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

ফোনটা যেন হাত থেকে পড়ে গেল ক্রেডলে।

রুনা নীচে কন্দর্পকেও বলেছে, রুনার সঙ্গে কন্দর্পও এসেছে দোতলায়। উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল, —কখন থেকে... ?

ইন্দ্রাণীর স্বর ফুটল না।

কন্দর্প বলল, —চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

প্রাথমিক বিবশতা কাটিয়ে শক্ত হওয়ার চেষ্টা করল ইন্দ্রাণী। বেরোনোর আগে রুনাকে বলল,—তিতির বাপ্পা ফিরলে বাড়িতে থাকতে বলিস। আর ও যদি আসে, ওকে এক্ষুনি ও বাড়ি চলে যেতে বলবি।

ইন্দ্রাণী কি একবার শুভাশিসকে ফোন করবে এ সময়ে ? কোথায় করবে ? এখনও তো শুভাশিসের চেম্বারের সময় হয়নি, হয়তো কোনও নার্সিংহোমে আছে।

শুভটা সঙ্গে থাকলে একটু সাহস পাওয়া যেত।

ইন্দ্রাণী কী শুভাশিসের বাড়িতে ফোন করবে একবার ? থাক, ছন্দা আবার কি মনে করে!

কন্দর্প স্কুটার নেয়নি, ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। ইন্দ্রাণী পড়িমরি করে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পথ আর ফুরোয় না। এক একটা সিগনালে ট্যাক্সিটা বুঝি বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে থাকছে। ঢাকুরিয়া থেকে মানিকতলা কি এত দূর! এ যেন অ্যান্টার্কটিকা থেকে আলাস্কায় পাড়ি দেওয়া!

তনুময় নিরুদ্দেশ হওয়ার দিনটা বরাবরই খুব খারাপ যায়। প্রথম তিন-চার বছর উমা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, ইন্দ্রাণী শুয়ে থাকত বিছানায়, ধীরাজও সারাদিন নিঝুম। একবার তো উমার বেশ বাড়াবাড়িই হয়ে গিয়েছিল। সকাল থেকে বুকে ব্যথা, নিশ্বাসের কষ্ট, বিকেলে প্রায় এখন তখন অবস্থা। আদিত্য খবর পেয়ে হাঁকপাক করে ছুটেছিল শ্বশুরবাড়ি, শুভাশিসও চেম্বার ফেলে উপস্থিত। অক্সিজেন ইনজেকশান দিয়ে কোনওক্রমে সামলানো গিয়েছিল উমাকে। জয়মোহন-শোভনাও অনেক রাত অবধি বসেছিলেন বেয়াই বেয়ানের কাছে। তাঁদেরও খুব প্রিয় ছিল তনুময়।

তবে সময় স্মৃতিকে বিবর্ণ করে দেয়। ধীরে ধীরে দিনটাকেই ভুলে গেল সবাই।

শুধু তিনজন ছাড়া।

যাদের হৃদয় শূন্য করে চলে গেছে তনুময়, সেই দুজন। আর ইন্দ্রাণী।

উমা অবশ্য একটু একটু করে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। অনেক গভীর শোকও মেয়েরা আত্মস্থ করে নিতে পারে। হাহাকার থাকে, আগুন জ্বলে, তবু সব বুকে নিয়েই তারা সংসারের চাকাটাকে গড়িয়ে নিয়ে যায়। এই দিনটিতে উমা এখন রোজকার মতোই রাঁধাবাড়া করেন, ঠিকে ঝি সামলান, জল ভরেন, খবরের কাগজ উল্টোন, ভুলেও ছেলের নাম উচ্চারণ করেন না। কিন্তু ধীরাজ! এই দিনটিতে তিনি ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটাবেনই। একবার বাথরুমে পড়ে মাথা ফাটালেন, একবার খাটের কোণে ঠোক্কর খেয়ে জোর চোট লাগল, সেবার তো প্রায় বাসের নীচে পড়ছিলেন, পাড়ার এক কিশোর তাঁকে হাত ধরে টেনে না নিলে হয়তো সর্বনাশই ঘটে যেত। ইন্দ্রাণীও এই দিনটিতে কাঁটা হয়ে থাকে। স্কুল থেকে সোজা চলে যায় মানিকতলা। দুপুর সন্ধেটা কাটিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে। তিনজন একত্রে পরস্পরের অস্তিত্ব ছুঁয়ে পার করে দেয় দিনটা। চাপা এক শূন্যতার মধ্য দিয়ে।

এবারে ইন্দ্রাণীই দিনটাকে ভুলে গেল!

অথচ ক'দিন আগেও কথাটা মনে ছিল। গত সপ্তাহে তিতিরকে নিয়ে গিয়েছিল মানিকতলায়, সেদিনও কথায় কথায় উমাকে বলেছিল, আজ যাবে। তবু ভুলল!

ইন্দ্রাণীর এখন কান্নাও শুকিয়ে গেছে। তার এক অপরাধে চলে গেল তনু, আজ আর এক ভুলে কি বাবাকে হারাবে?

উমাকে ঘিরে বসে আছে পাড়ার মহিলারা। এ পাড়া এখনও সম্পূর্ণ আধুনিক হয়নি, পাড়াপ্রতিবেশীরা পরস্পরের খবর রাখে। উমা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে দুই যুবক অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে। ছেলে দুটো গোটা তল্লাট খুঁজে এসেছে, ধীরাজ কোত্থাও নেই।

ইন্দ্রাণী বসল না। কন্দর্পই বসতে দিল না তাকে। ধীরাজের কয়েকটা ছবি নিয়ে দুজনে ছুটল থানায়। নাম ধাম লিখিয়ে ডায়েরি করল, খুব একটা আশার বাণী শুনল না। শুধু ঘণ্টা কয়েক পরে আর একবার খবর নিয়ে যেতে বলল তাদের।

থানা থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, —এবার আমরা কী করব?

কন্দর্প কি যেন ভাবছিল। আড়ষ্ট গলায় বলল, —আমার মনে হয় একবার কাছাকাছি হাসপাতালগুলোতে খবর নেওয়া উচিত। মেসোমশাই বেখেয়াল মানুষ, যদি কিছু...

ইন্দ্রাণী ফ্যাকাসে হাসল। হাসি, না কান্না ঠিক বোঝা গেল না। বলল, —চলো।

মাঝে ক'দিন হাওয়া দিচ্ছিল, আজ এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রের গুমোটে ছটফট করছে শহর। সূর্য পশ্চিম আকাশের প্রান্তসীমায়, তবু যেন তাকে বড় বেশি তপ্ত লাগছে আজ। এখনও।

শ্যামবাজারের আর জি কর হাসপাতালে সন্ধান না পেয়ে শেয়ালদার নীলরতন হাসপাতালে গেল ইন্দ্রাণী আর কন্দর্প। সেখানেও আঁতিপাঁতি খুঁজল, নেই।

শেয়ালদা স্টেশনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল দুজনে। ক্লান্ত পায়ে। অফিস ছুটির ভিড়ে রাস্তায় গাদাগাদি অবস্থা। মানুষ ঠেলে এগোতে গিয়ে আরও দ্রুত শ্রান্ত হচ্ছিল ইন্দ্রাণী।

কন্দর্প আপন মনে বলল, —আর কোথায় যেতে পারেন বলো তো? ধর্মসভা হরিসভায় যান না তো? তাহলে এই পার্কগুলো একবার ঘুরে দেখা যায়।

—তা কি করে হয়! বাবাকে তো কখনও... অভ্যেস বলতে তো একটাই। নিরুদ্দেশের খবর পড়া, আর নিরুদ্দেশের ছবি দেখা! লালবাজারের ক্রাইম ব্রাঞ্চে তোমার কে একজন বন্ধু আছে বলেছিলে না, সে কিছু করতে পারবে?

—হুঁ। ওর অবশ্য অনেক হোল্ড আছে। হঠাৎই ইন্দ্রাণীর হাত চেপে ধরেছে কন্দর্প, —আচ্ছা, মেসোমশাইয়ের খুব নিরুদ্দেশের ছবি দেখার অভ্যেস বলছিলে না?

—হ্যাঁ। ওই একটাই তো নেশা। যেন ওর জন্যই বাবার বেঁচে থাকা। কিন্তু তুমি এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

—এক সেকেন্ড দাঁড়াও এখানে। আমি আসছি। বলেই হাত ছাড়িয়ে কন্দর্প ছুটেছে স্টেশন

চত্বরের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় উড়তে উড়তে ফিরল।

ধীরাজকে পাওয়া গেছে। জি আর পি অফিসে বসে আছেন ধীরাজ।

ইন্দ্রাণীকে দেখে ধীরাজ শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন, —আমি তনুর খোঁজ করতে এসেছিলাম, এরা আমাকে আটকে রেখেছে।

রেলপুলিশের লোকজনের কথা থেকে জানা গেল ঘটনাটা। রেলের বিভিন্ন স্টেশনে যে সব অজ্ঞাতপরিচয় লাশ পড়ে থাকে, অথবা যারা ট্রেনে কাটা পড়ে, তাদের অনেকেরই ছবি টাঙানো থাকে স্টেশনে। সেই ছবিগুলোর সামনে ঘুরছিলেন ধীরাজ, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান, ভাগ্যক্রমে বিশেষ চোট লাগেনি, রেলপুলিশের লোকেরাই তাঁকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসে। জ্ঞান ফেরার পর ধীরাজ শুধু নাম বলতে পেরেছেন, কিন্তু ঠিকানাটা এক একবার এক একরকম বলে যাচ্ছেন। রেলপুলিশের লোকরা সাহস করে ছাড়তে পারেনি তাঁকে, মেসেজ পাঠিয়েছে লালবাজারে।

ইন্দ্রাণী প্রকাশ্যেই কেঁদে ফেলল। কিছুটা আনন্দে, কিছুটা এক গোপন অনুশোচনায়।

তনুকে কি বাকি জীবনটা এভাবেই খুঁজে যাবে বাবা ?

মাথাটা ছিড়ে পড়ছিল ইন্দ্রাণীর।

রাত এখন গভীর। একটু আগে স্টেশন মাড়িয়ে শেষ ট্রেনটাও চলে গেল। অনেক রাত অবধি এ ঘর সরগরম ছিল আজ। আদিত্য সুদীপ রুনা কন্দর্প বাপ্পা কে ছিল না। তারাও এখন যে যার বিছানায়। সুদীপদের ঘর থেকে অন্য দিন বহুক্ষণ কথাবার্তার শব্দ শোনা যায়, আজ সে ঘর নিঃসাড়। পাশের ফ্ল্যাটবাড়িতে বোধহয় ভিডিও চলছিল, হঠাৎ ঝংকার বন্ধ হওয়ার পর সম্পূর্ণ শব্দহীন হয়ে গেছে চতুর্দিক।

একটি শব্দই শুধু শুনতে পাচ্ছে ইন্দ্রাণী। নিজেরই হৃৎপিণ্ডের লাবডুব। শব্দটা প্রতি মুহূর্তে আরও উচ্চগ্রামে উঠে মস্তিষ্কে টংকার হানছে।

কেন সে ভুলে গেল আজকের দিনটা। স্কুলের অশান্তির জন্য ? মিথ্যে কথা। তারই মনের ভেতর থেকে অন্য একটা মন জোর করে ভুলিয়ে দিতে চাইছে তার পাপবোধটাকে। যে বল্লমের খোঁচায় সে প্রতিদিন রক্তাক্ত হয়, তার ফলাটাকে ভোঁতা করে দিতে চায় কোন শক্তি ?

পর পর ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছে ইন্দ্রাণী। ঘর জুড়ে নিকষ অন্ধকার, তাই কি ছবি এত স্পষ্ট ?

... তনুময়কে দেখে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে আসছে শুভাশিসের ফ্ল্যাট থেকে। দু বছরের বাপ্পাকে বুকের কাছে নিয়ে রাত জাগছে। এ কোন পরীক্ষায় পড়ল সে ? যাকে সে পাগলের মতো চেয়েছিল, তাকে পেল না। যাকে পেয়েছে, তাকে সে এতটুকু চায় না। প্রার্থিত পুরুষ আবার ফিরে এসেছে। এখন সে কী করে ? পরদিন আবার গেল। পরদিন আবার। কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে প্রতিরোধের বর্ম। শুভাশিস ইন্দ্রাণীকে ফেলে চলে গেছে, শুভাশিস ছন্দাকে বিয়ে করেছে, এর পর আর তো ইন্দ্রাণীর কামনা থাকার কথা নয় ! তবু বাসনা জ্বলে উঠল দাউ দাউ।

পাশের ঘরে শুয়ে আছে তনুময়, এ ঘরে মিলিত হচ্ছে নারীপুরুষ। সংযম ভুলে। সংসার ভুলে। রাত্রি দিন এক হয়ে গেল। পরপর দু রাত ঘরে ফেরা হল না ইন্দ্রাণীর।

দ্বিতীয় রাতে ইন্দ্রাণী ধরা পড়ে গেল। তনুময়ের তখনও কাঁধের ক্ষতটা ভাল করে শুকোয়নি ঘুমের ওষুধে আচ্ছন্ন পাশের ঘরে। হঠাৎ কী করে যে উঠে এল ! কাচের জানলায় চোখ চেপে দেখছে দিদিকে। বিস্মিত চোখ চকিতে ঘৃণায় ভরে গেছে। শুভাশিসকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দ্রাণী ছিটকে উঠে বসল বিছানায়। আবরণহীন, অশক্ত ইন্দ্রাণী।...

তিতির অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার নিশ্বাসের উষ্ণ বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রাণীর কাঁধ।

ওই মেয়ে কে ?

ইন্দ্রাণীর লোভের ফসল ?

ইন্দ্রাণীর প্রেমের ফসল ?

ইন্দ্রাণীর চোখ ক্রূর হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দু হাতে মাথা চেপে উঠে বসল। চোখের মণি শ্বাপদের মতো জ্বলছে।

শেষ হয়ে যাক সব কিছু। নিশ্চিহ্ন হোক ইন্দ্রাণীর পাপ।

তিতিরের গলায় হাত রাখল ইন্দ্রাণী। আর একটু চাপ... আর একটু চাপ...

২৩

অরূপ বলল,— নিবি নাকি আর একটা ?

শুভাশিস সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে। বলল, —দে। ছোট করে। গায়ের ব্যথাটা মরুক।

অরূপ শুভাশিসের গ্লাসে অল্প সোনালি পানীয় ঢালল, —রিয়েলি, নার্সিংহোম তৈরির এত হ্যাপা কে জানত ! মুখে রক্ত উঠে গেল মাইরি।

শুভাশিস বোতল থেকে ঠাণ্ডা জল মেশাচ্ছে সুরায়। নিঃশব্দে চুমুক দিল। একটা প্রতিষ্ঠান গড়ার পিছনে কত যে খুঁটিনাটি থাকে, কাজে না নামলে বোঝাই যায় না। জরাজীর্ণ বাড়ির অন্দর ঝকঝকে করে তোলা, গাদা গাদা ফার্নিচার কেনা, মাপমতো পার্টিশান তুলে ডাক্তারদের চেম্বার নার্স-রুগীদের কেবিন বানানো, একটা আধুনিক অপারেশান থিয়েটার গড়ে তোলা, প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির সাজসরঞ্জামের বন্দোবস্ত, স্বাস্থ্যসম্মত রান্নাঘর তৈরি, যথেষ্টসংখ্যক বাথরুমের ব্যবস্থা রাখা, এসব কি মুখের কথা ! এর সঙ্গে আছে কাঁড়ি কাঁড়ি সরকারি লাইসেন্স, এখানকার ছাড়পত্র, ওখানকার শংসাপত্র, আরও কত কি !

শুভাশিসরা তিনজনই যে শুধু লোকবল তা নয়, কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য কর্মীও নেওয়া হয়েছে কয়েকজন। বেছেবুছে, বেশি টাকার টোপ দিয়ে, অন্য নার্সিংহোম থেকে ভাঙিয়ে আনা হয়েছে তাদের। এরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত। অর্থাৎ খুঁতখুঁতে, নার্সিংহোম লাইনের ঘাঁতঘোত জানা, এবং চুরিচামারিটা কমই করে। তবু নিজেদের একটা পেশাদারি নজর রাখতেই হয় শুভাশিসদের। রাজসূয় যজ্ঞ বলে কথা !

তা শুভাশিসরা রাখছেও। তিনজনেই। রুগী চেম্বার আর অপারেশানের ফাঁকে ফাঁকে যে যেমন সময় পায়। নতুন নার্সিংহোমের নাম শালিনীই দিয়েছে। স্যাস ক্লিনিক। শুভাশিস অরূপ শালিনী তিনজনের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে নাম। নামটা প্রথমে খুব পছন্দ ছিল না শুভাশিসের। তার ইচ্ছে ছিল কিওর হোম, এরকম ধরনের কিছু নাম দেওয়ার। শালিনী অরূপের স্যাসই বেশি পছন্দ। পার্টনারশিপের কাগজপত্র তৈরি করেছে অরূপ। শালিনী আর অরূপের ষাট পারসেন্ট, শুভাশিসের ভাগ চল্লিশ। সেই অনুপাতেই টাকা ঢালছে তিনজন।

এখন চলছে মেট্রন, ডায়েটিশিয়ান, কিপার, সুপারভাইজার, কেমিস্ট আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স নিয়োগের পালা। আজ নিয়ে পর পর তিন রবিবার বিকেলে ইন্টারভিউ চলল। নার্সিংহোমেরই অফিসে। আজ ইন্টারভিউয়ের পর সন্ধেবেলা শুভাশিসের একটু ঢাকুরিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, হল না। অটোক্লেভ আর বয়েলস্ অ্যাপারেটাস্ আজই কোম্পানি থেকে ডেলিভারি এসেছে, সে দুটোকে পরীক্ষা করতে গিয়ে সন্ধে গড়িয়ে গেল। তারপর অরূপ প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে এল বাড়িতে। প্রতিদিন বেশ কিছুক্ষণ নার্সিংহোম নিয়ে আলোচনা না করলে অরূপের দিনটাই বৃথা গেল মনে হয়।

কর্মী পুরুষরা কাজের আলোচনার চেয়ে কাজকেই বেশি ভালবাসে, তবু শুভাশিস এই সব মুহূর্তে অরূপদের সঙ্গ বেশ উপভোগই করে। সেন্টার টেবিলের কাচে পা তুলে দিল শুভাশিস, —শালিনী কোথায় রে, শালিনী ? আমরা খেটেখুটে এসে বসে আছি, মেমসাহেবের এখনও দর্শন নেই কেন ?

অরূপ চোখ তটস্থ করে পিছন ফিরে দেখল একবার। সামান্য গলা নামাল, —পিপিকে পড়াচ্ছে। কাল থেকে পিপির ফার্স্ট টার্মিনাল।

—শালিনী পড়াচ্ছে ! পিপির টিউটর নেই ?

—আছে। তবু মেয়েকে নিজে না পড়ালে শালুর তৃপ্তি হয় না।

—মেয়েদের যে কতরকম বাতিক থাকে!

—শালু ইজ আ ভেরি সিরিয়াস মাদার। আই মিন সেন্সেটিভ।

—আজকাল কোন মা তা নয় রে ভাই? কথাটা বলেই পলকের জন্য মনোরমার মুখটা মনে পড়ল শুভাশিসের। এখনকার মুখ নয়, যৌবনের মুখ। একটু বিষণ্ণ ভাব দুলে গেল বুকে। বিষাদটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল, —এই ছন্দাকেই দ্যাখ না। টোটোর ব্যাপারে ভালমন্দ কিছু বলতে যাই, হাঁ হাঁ করে তেড়ে উঠবে!

শালিনী দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে—অ্যাই, আমাকে নিয়ে কী ডিসকাশন হচ্ছে শুনি? জরুর অরূপ কিছু বদনাম করছে?

—কী কান রে! শুভাশিস এক ঢোঁকে গ্লাস শেষ করল, —তুমি মেয়েকে পড়াচ্ছ, না এদিকে কান পেতে আছ?

—মেয়েদের নাক-কান একটু শার্পই হয় ডক্টর। দাঁড়াও, আমি আসছি। মেয়েকে বোধ হয় বইতে বসিয়ে মিনিট পাঁচেক পর ফিরল শালিনী। সোফায় বসতে গিয়েও ফিরে গিয়ে মেয়ের ঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে দিয়েছে, —কেন শার্প হয় জানো?

—জানি। মেয়েদের অন্য ইনস্‌টিংক্টগুলো ভোঁতা হয় বলে।

—নো স্যার। মেয়েদের একটা ডগস্ ইনস্‌টিংক্ট থাকে। রাদার বিচেস ইনস্‌টিংক্ট। আমরা গন্ধ শুঁকে অনেক কিছু বুঝে নিতে পারি।

—ইজ ইট?

—নিশ্চয়ই। তোমার গন্ধ শুঁকেও অনেক কিছু বলা যায়।

—যেমন?

—যেমন... চোখ বুজে একটা লম্বা শ্বাস টানল শালিনী, —যেমন ধরো, তোমার সঙ্গে এখন ছন্দার রিলেশানটা খুব স্টেল।

শুভাশিস হাসার চেষ্টা করল, —বিয়ের সতেরো বছর পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে দরকচা মেরে যায়, এটা বলার জন্য গন্ধ শোঁকার দরকার হয় না ভাই।

—দরকচা? শালিনী অরূপের দিকে তাকাল, —হোয়াট ডাজ ইট মিন?

অরূপ হাসছে, —ওই তুমি যা বললে তাই। স্টেল। নীরস।

দরকচা শব্দটাকে বিড়বিড় করে বার কয়েক আউড়ে মেমারি ব্যাঙ্কে জমা করল শালিনী। তারপর বলল, —আরও কিছু শুনতে চাও? তোমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা প্রায় ননএগজিস্টেন্ট। তোমাদের ফিজিকাল রিলেশান ভীষণ অনিয়মিত। অ্যাট লিস্ট দেড়-দু মাসের মধ্যে ইউ ডিডন'ট হ্যাভ ইট।

সপাটে যেন চড় খেয়েছে শুভাশিস। মুহূর্তে মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার। প্রায় তোতলানো স্বরে বলল, —বাজে কথা। তুমি কিচ্ছু বলতে পারো না।

—তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো আমি ভুল বলেছি?

শুভাশিস অসহায়ের মতো পকেটে সিগারেট হাতড়াচ্ছে। তিন-চারবার লাইটার জ্বালিয়েও ধরাতে পারল না সিগারেট। আড়চোখে ফ্যানের দিকে তাকাল। ছন্দার সঙ্গে শালিনীর তো তেমন কিছু সখিত্ব নেই, শালিনী এ কথা বলছে কী করে! ষষ্ঠ অনুভূতি থেকে? অনাবশ্যক গম্ভীর স্বরে শুভাশিস বলল, —যত সব ফালতু কথা। সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে এলাম, কোথায় নার্সিংহোমের কথা জিজ্ঞেস করবে, তা না ছুটির দিন শুয়ে বসে শুধু অলস কল্পনা।

শালিনী কয়েক পলক স্থির নেত্রে দেখল শুভাশিসকে। তারপর চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বলল, —তোমার কি ধারণা ছুটির দিনটা আমার খুব আরামের দিন?

প্রসঙ্গ বদলে যাওয়াতে ভাদ্রের গরমও সুশীতল মনে হল শুভাশিসের। ঝুপ করে অনেকটা সহজ

হয়ে গেল, —নয় তো কি ! শ্যাম্পু করে চুল ফাঁপিয়েছে, নাক মুখ চোখ চকচক করছে, পার্লার ফার্লারে গিয়েছিলে নাকি ?

—এগেইন রঙ ! ছুটির দিনে আমার প্রধান কাজ কি জানো ? তোমার বন্ধুর জন্য রান্না করা। তোমার বন্ধু ছুটির দিন কাজের লোকের কুক করা ফুড খান না। তারপর সেকেন্ড কাজ এই বিশাল ফ্ল্যাট ডাস্টিং ক্লিনিং। তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখো তো, আজ পর্যন্ত কোনও টেব্‌লের ধুলো টোকা দিয়ে রিমুভ করেছে কি না।

অরূপ বলল, —এই শালু, তুমি কিন্তু ঠিক বলছ না। আমি আজ সকালে আমার বুকসেলফটা পরিষ্কার করেছি।

—কত মাস পর ?

—তা হবে দু-চার মাস।

—ফির লাই। মিনিমাম এক সাল বাদ। কেন করেছ, সেটাও বলো।

অরূপ অপ্রতিভ মুখে হাসছে।

শালিনী বলল, —ও বলবে না। পুরনো কয়েকটা ম্যাগাজিন আছে সেলফে, যাতে ওর নিজের পোয়েমস বেরিয়েছিল কলেজ লাইফে, সেগুলো পোকায় কাটছিল। নিজের জিনিস ছাড়া তোমরা কিচ্ছু বোঝো না।

শুভাশিস হেসে উঠেছে, —তোর বউ দেখছি হেভি ফেমিনিস্ট হয়ে গেছে রে !

শ্যালিনী গাল ফোলাল, —হাঁ, সহি বাত বললেই আমরা ফেমিনিস্ট হয়ে যাই ! আসল কথা কি জানো, আমরা মেয়েরা যতই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আই এ এস, আই পি এস, কি প্রাইম মিনিস্টারই হই, ইউ পিপল্‌, তোমরা সবসময়ে আমাদের কাছ থেকে সেবা চাও। ইউ এনজয় ইট। এই ফিউডালিটিটা, হু এভার ইউ মে বি, তোমাদের রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে। তোমাদের বউরা তোমাদের সমান কোয়ালিফায়েড হোক, কি না হোক, কিংবা জাদাই হোক, তারা বাইরে খেটে-খেটে বহুত রুপিয়া কামিয়ে আনুক, চাই না আনুক, তোমরা কখনও ঘরের কাজে তাদের সঙ্গে হাত বাঁটবে না। তোমাদের মেল ইগো তাহলেই শ্যাটার্ড হয়ে যাবে। ইস মাম্‌লে মে আমার মারাঠি বাবাও যা, আমার বাঙালি হাজব্যান্ডও তাই।

শুভাশিসের হাসি বাড়ল, —কথাটা ভুল বলোনি। কিন্তু ম্যাডাম, তোমরাই বা করো কেন ? তোমরাই তো আমাদের অভ্যেস খারাপ করে দিয়েছ।

—করি, বিকজ আমরা ঘরকে ভালবাসি। জঙ্গলের মানুষকে মেয়েরাই প্রথম ঘর দেখিয়েছে। ঘরের কন্‌সেপ্টটাই মেয়েদের। কিন্তু তোমাদের এখনও ঘরের প্রতি সেই অ্যাট্রাকশান তৈরি হয়নি।

অরূপ মিনমিন প্রতিবাদ জানাল এবার, —তার মানে তুমি বলতে চাও আমার এই সংসারটার ওপর কোনও টান নেই ? তোমার ওপর টান নেই ? পিপির ওপর টান নেই ?

—থাকবে না কেন ? আছে। কিন্তু সেখানে তোমার সেন্স অফ পোজেশানটাই বেশি। এই মেয়েটা আমার বউ। এই মেয়েটা আমার মেয়ে। মাইন। এই পোজেশানের ফিলিংটাই তোমাদের সংসারের সঙ্গে আটকে রাখে।

শালিনীর কথা শুনতে শুভাশিসের আর ভাল লাগছিল না। বলল, —শুধু সেন্স অফ পজেশানের জোরেই কি হাজার হাজার বছর ধরে সংসারগুলো চলছে ? লাভলেস ? প্যাশানলেস ?

—হয়তো সব সংসার নয়, কিন্তু বেশিরভাগ সংসারই। ডেজার্টে কি আর গাছ হয় না ? হয়, ওয়েসিসে হয়। কিন্তু গোটা মরুভূমির তুলনায় সে আর কতটুকুন ? শালিনী হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে, —এই যেমন ধরো তুমি। তোমার কতটা অ্যাটাচমেন্ট আছে তোমার সংসারের সঙ্গে ? তোমার স্ত্রীর সঙ্গেই বা তোমার কতটা অ্যাটাচমেন্ট আছে ? তুমি কি জানো তোমার বউ রাতের পর রাত ঘুমোতে পারে না !

কথাটা বলেই উঠে গেছে শালিনী। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে মেয়েকে কি বলছে,

মেয়েকে নিয়েই বেরিয়ে এল। বিশাল হলঘরের অন্য প্রান্তে এল শেপের ডাইনিং স্পেস। মেয়েকে টানতে টানতে খাবার টেবিলে বসিয়েছে শালিনী। চেয়ারে বসে ঢুলছে পিপি। হঠাৎই মুখ ফিরিয়ে শুভাশিসের দিকে তাকাল। ঘুম মাখা চোখে ছোট্ট একটু হাসি উপহার দিল শুভাশিসকে। আলগাভাবে একবার হাত তুলল। থম মেরে যাওয়া শুভাশিসও হাত নাড়ল একটু। শালিনী গলা তুলে রাতদিনের কাজের মেয়েটাকে ডাকছে।

অরূপ উঠে প্লেটে কাজুবাদাম নিয়ে এসেছে। দুটো গ্লাসেই হুইস্কি ঢালছে আবার। কপাল কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, —কিরে, শালুর কথায় মুড অফ হয়ে গেল নাকি ?

—নাআ। শুভাশিস ঈষৎ উদাস, —ভাবছি।

—কী ভাবছিস ? শালুটা খুব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে ?

—ভুলও তো খুব বলেনি রে। আমার তো সত্যি কোথাওই অ্যাটাচমেন্ট নেই। ছোটবেলা থেকেই এই ট্রাজেডি আমি ফেস করছি। বাবা সবসময়ে কেমন এক ঘোরে থাকত। হয় নিজের হসপিটাল আর রুগী নিয়ে, নয় মাকে নিয়ে। আমি যে একটা প্রাণী বাড়িতে আছি, বাবা বোধ হয় কোনওদিন সেটা ভাল করে ফিলই করেনি। কিংবা হয়তো করেছে, তার মতো করে। আমি বুঝতে পারিনি। মা... ডেড সোল ইন আ লিভিং বডি...

—বাদ দে ওসব কথা। হৃদয়বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলি কবে সব বেড ডেলিভারি দিচ্ছে ?

শুভাশিস অরূপের কথা শুনতে পেল না। আনমনে প্রশ্ন করল, —অরূপ, তোর তথাগতর কথা মনে আছে ?

—কে তথাগত ?

—তথাগত ঘোষ। সেই যে রে বিদ্যাসাগরে পড়ত, আমাদের হোস্টেলে খুব আড্ডা মারতে আসত ? লম্বা। দাড়িঅলা।

—অ। সেই চে গুয়েভারা ? তোর কমরেড ? দারুণ লেকচার দিত কিন্তু। রক্ত টগবগ করে ফুটত। তা সে পার্টি তো সত্তর-একাত্তরেই ভ্যানিশ !

—না, না, ভ্যানিশ করবে কেন ? তিয়াত্তরে ধরা পড়েছিল। কলকাতাতে। তুই তখন এখানে ছিলি না, তুই জানবি কী করে ! জেল থেকে বেরোল সেই সাতাত্তর-আটাত্তরে। আমিও খবর রাখতাম না, কোন একটা কাগজে যেন বন্দিমুক্তির লিস্ট বেরিয়েছিল, সেই দেখে জেনেছিলাম।

—কী চার্জ ছিল ওর এগেনস্টে ? অরূপের গলায় অলস আগ্রহ।

—সে কী করে বলব ! খুন ডাকাতি সশস্ত্র হামলার চেষ্টা, এসবই হবে। পুলিশ তখন থোড়াই চার্জশিট দিত ! এই মামলা সেই মামলায় জড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখত বছরের পর বছর।

—হুঁ, দিল্লিতে কানে আসত বটে। ওখানে এক ক্যাবিনেট সেক্রেটারির ভাগ্নের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার মুখে শুনতাম কিছু কিছু। সে ব্যাটাও কলকাতার মুভমেন্টে জড়িয়ে পড়েছিল, মামা বিপদ বুঝে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যায় ভাগ্নেকে। সে এখন আই এ এস। কর্নাটক ক্যাডারের।

—অনেকেই পরে আখের গুছিয়েছে। শুধু তথাগতটাই....। তথাগতর সঙ্গে বহুকাল পর দেখা হল বুঝলি। গড়িয়ার চেম্বার থেকে ফিরছিলাম, গাড়িটা হঠাৎ গণ্ডগোল শুরু করল। ক্লাচ প্রবলেম। নাকতলায় এক চেনা মিস্ত্রি আছে, তার গ্যারাজে নিয়ে গেছি গাড়ি, সেখানেই দেখি সামনে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছে তথাগত। আমি প্রথমটা চিনতে পারিনি। লম্বা চেহারা একেবারে কুঁজো মেরে গেছে। গালটাল আরও ভেঙে একদম খেঁকুরে মার্কা অবস্থা। ও অবশ্য আমাকে দেখেই চিনেছে। ভয়েসটা ওর এখনও একই রকম আছে। গমগমে। সেই পল রোবসনের মতো।

—ছেলেটা খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল। ফিজিক্স অনার্স পড়ত না ?

—ফিজিক্স না, কেমিস্ট্রি।

—তা হবে। ... কতদিন আগের কথা ! এখন করছে কী ?

—যা করত। রাজনীতি। সমাজ বদলানোর চেষ্টা।

—ওদের এখন আবার কিসের রাজনীতি ? সমাজ বদলের চেষ্টা তো কবে পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেছে ! শালা ইস্ট ইউরোপই এখন বলে যায় যায়... অরূপ টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়ার বৃত্ত তৈরি করছে। হচ্ছে না। বেঁকেচুরে যাচ্ছে বৃত্তগুলো। গ্লাসটা হাতে তুলে নিল, —আমাদের শিবাজিই তো একসময়ে খুব পার্টিবাজি করত। এখন কবিতায় আগুন ছড়ায়, মদ গেলে আর মালিকের হয়ে কোম্পানির ইউনিয়নের সঙ্গে দর কষাকষি চালায়। কীরকম টানতে পারে দেখেছিস তো ? মালের ঘোরে আবার দুঃখ করে বলে, উই আর অল ফ্র্যাগমেন্টেড মলিকিউলস। ওয়েটিং ফর দা ন্যাচারাল অ্যানিহিলেশান।

—আমিও তো তাই ভাবতাম। মনে হত সব শেষ হয়ে গেছে। দু-চারজন পুরনো কমরেড এখনও আসে বাড়িতে। কখনও-সখনও। খায়-দায়, হইহল্লা করে। কেউ কেউ পুরনো রাজনীতির নাম করে রিক্রিয়েশানের জন্য কিছু কাগজ-টাগজ বার করে, আমার কাছে মাঝে মাঝে চাঁদাও নিয়ে যায়। তা ভাল, কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। শেয়ালদায় মাইক চালিয়ে চেঁচায়, ব্লাড সারকুলেশানটা ঠিক থাকে। অন্য পার্টিদের গালিগালাজ করে, ব্রেনটা ফ্রেশ থাকে। কিন্তু ওদের দেখে এটা বোঝা যায়, ওদের আর দম নেই। বাট তথাগত ইজ ডিফারেন্ট। শান্ত। কমপোজড। সিংভূমের দিকে কোন কোন গ্রামে নাকি এখনও কাজ করে চলেছে।

—আবার সেই লোক খুনোখুনি !

—না রে, এবার ঠিক আর সড়কি বল্লম ধরা মুভমেন্ট নয়। শিক্ষার কাজ। মানুষকে কনসাস করার কাজ। তথাগত বলছিল মানুষ যদি নিজের মর্যাদা নিজে বোঝে, তা হলে সমাজ বদলানোর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। বিপ্লবটাকে চাপিয়ে দিতে হয় না। আর তার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষা। চেতনা। তুই বিশ্বাস করবি না, ঠিকমতো খাওয়া জোটে না, থাকারও নাকি কোনও পারমানেন্ট ডেরা নেই, কিন্তু কী জিল আর আত্মবিশ্বাস ! সেই যে চোখ দুটো দেখেছিলি, কথা বলতে বলতে সেগুলো আগের মতোই জ্বলে।

—দুনিয়ায় কতরকম যে পাগল আছে ! অরূপ আত্মগতভাবে হাসছে।

—পাগল ! তা হবে। শুভাশিসের দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা, —ওকে দেখার পর বাড়ি ফিরে সেদিন কি জানি কেন ঘুম এল না রে ! খালি মনে হচ্ছিল তথাগতর জীবনে তো সেই সেন্সে কোনও সাকসেস নেই ! বিশ বছর আগে যেখানে শুরু করেছিল এখনও সেখানেই ঘুরপাক খাচ্ছে, তার পরেও এত উৎসাহ থাকে কী করে। একেই কি অ্যাটাচমেন্ট বলে ? অ্যাটাচমেন্ট উইথ আইডিয়া ? অ্যাটাচমেন্ট উইথ কমন পিপল ?

শুভাশিস কেমন দূরে চলে যাচ্ছিল। অরূপ আলগা চাপড় দিল শুভাশিসের হাঁটুতে,—ছন্দার কথা ভাবতে গিয়ে এসব কথা আসে কোত্থেকে রে শালা ?

—কখন যে মানুষের কি মনে পড়ে যায় ! শুভাশিস সোফায় মাথা ঠেকাল,—আচ্ছা, তোর কী মনে হয় বল তো ? ইজ তথাগত এ হ্যাপি ম্যান ? নাকি ওটা ওর একটা প্রোজেক্টেড ইমেজ ?

—সে তোর তথাগতই জানে। অরূপ গ্লাসে ঠোঁট ছোঁওয়াল,—সুখের কথাই যদি বলিস, তাহলে বলি, সুখটাই বা কি এমন ডোডো পাখি রে ? সুখ তো ভাই পারচেজেবল কমোডিটি। লে লে বাবু ছ আনা, লে লে বাবু ছ আনা করে বিক্রি হচ্ছে। পয়সা থাকে ফ্যালো, কিনে নাও। কী, ভুল বলছি ?

অরূপের ঠাট্টায় শুভাশিস হাসতে পারল না। যেন নিজেকেই শুনিয়ে ফিসফিস করে বলল, —রাজনীতিটাকেই যদি ধরে থাকতে পারতাম !

অরূপ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে, —শালু শুনছ, শুভাশিস বলছে ও নাকি পলিটিক্সে থাকলে খুব সুখী হত !

শালিনী মেয়েকে খাওয়াচ্ছে, ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, —ভাল তো। পলিটিক্সই তো এখন হ্যাপিয়েস্ট প্রফেশান। নার্সিংহোম করতে গিয়ে যা খাটনি যাচ্ছে, তার থেকে অনেক কম লেবার দিয়ে অনেক

বেশি টাকা কামানো যেত।

—ওই পলিটিক্স নয়, এ একেবারে চাষির কুঁড়েঘরে থাকা পলিটিক্স। যেটা করতে গিয়ে শুভাশিস একসময়ে পালিয়ে এসেছিল!

—ও। সেই ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময়?

—হুঁউ। অরূপ শুভাশিসকে চোখ টিপল। গলা নামিয়ে বলল, —ডোন্ট ব্রুড মাই চাইল্ড। পলিটিক্স তোমার ধাতে নেই। বয়সের জোশে নেচেছিলে। মাঝখান থেকে তোমার সেই মেয়েটা ভোকাট্টা হয়ে বেরিয়ে গেল! কী যেন নাম ছিল মেয়েটার? ইন্দ্রাণী, না চন্দ্রাণী?

—ইন্দ্রাণী।

—মেয়েটা কিন্তু দারুণ অ্যাট্রাকটিভ ছিল। গায়ে-পড়া টাইপ নয়, বেশ সফট। রিজার্ভড। ওকে মিস করে তুই হেভি লস করেছিস।

শুভাশিসের অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল, —কেন, ছন্দাই বা কি খারাপ? হোমলি, কেয়ারিং...

—স্টিল শি ওয়াজ বিট ডিফারেন্ট। যেদিন হোস্টেলে তোকে খুঁজতে এল, সেদিন তো দেখেছিলাম, কী স্টেডি! শালা তুই পালালি গ্রামে বিপ্লব করতে, আর আমাকে টুপিটাপা দিয়ে যেতে হল। সে যে কী অকোয়ার্ড অবস্থা!

—ছাড় তো পুরনো কথা। শুভাশিস বেশ রেগে গেল হঠাৎ, —এক গপ্পো কতবার করবি?

—চটছিস কেন? অরূপ আর একটু খোঁচাল শুভাশিসকে, —গ্রামে যাওয়ার সময়ে কী ভেবেছিলি রে? মেয়েরা বিপ্লবের বাধা! তুই মহান কাজে জীবন উৎসর্গ করছিস! প্রেমিকা ঠিক বুঝতে পারবে কী মহান ব্রতে জান লড়িয়ে দিয়েছে আমার প্রেমিক! তাই তো?

শুভাশিস হিংস্র চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল। উত্তর দিল না।

অরূপ সোফায় হেলান দিয়েছে,—ব্যর্থ বিপ্লব, ভাঙা প্রেম, এগুলো নস্টালজিয়া হিসেবে দারুণ, কী বল?

শুভাশিস উদাসীন হাসি মাখবার চেষ্টা করল মুখে। অরূপের ওপর রেগে লাভ নেই। সে যত উত্তেজিত হবে, অরূপ তত আলপিন ফুটিয়ে যাবে ক্ষতস্থানে।

তরল স্বরে অরূপ বলল, —মেয়েটার সঙ্গে পরে আর দেখা হয়েছিল?

—নাহ্, কই আর! এত বড় শহর...! শুভাশিস দ্রুত উত্তর দিল। বছর আষ্টেক আগে বিলেত ঘুরে বউ, বাচ্চা, বিদেশি ডিগ্রি নিয়ে কলকাতা ফিরেছে অরূপ। প্রথমদিকে শুভাশিসের সঙ্গে খুব একটা যোগাযোগ ছিল না, হালফিল ঘনিষ্ঠতাটা বেড়েছে আবার। তবে এই ঘনিষ্ঠতা অনেকটাই পেশাদারি। ঠিক বন্ধুত্ব নয়, অন্তত যেমনটি কলেজে ছিল। এখন এই পর্দার আড়ালটুকু থাকাই বোধহয় ভাল।

আবার কি প্রশ্ন আসে ভয়ে শুভাশিস নিজেই বলে উঠল, —আমি তাহলে অপারেশান থিয়েটারের ফিটিংস টিটিংসগুলো শুরু করে দিই, তুই জেনারেটর এসি মেশিন এগুলো দ্যাখ।

—দেখব। দেখব। এত তাড়া কিসের?

—মহালয়ার আর ক'দিন বাকি আছে? হার্ডলি আ মানথ।

—মহালয়ার দিনই ওপেন করবি? নিজের ফাঁকা গ্লাস দু হাতের চেটোয় ঘোরাচ্ছে অরূপ, —পুজোর পর শুরু করলে ভাল হত না?

—না। টার্গেট ওইদিনই থাক। শুভদিন... যদি সব কাজ গুছিয়ে না উঠতে পারি তখন দেখা যাবে।

—এমনি সব কাজ হয়ে যাবে, শুধু তোর ইনটিরিয়ার ডেকরেশানটা ফিনিশ হলে হয়। তোর লোকটা কিন্তু হেভি স্লো।

শুভাশিস ঈষৎ আহত হল। নিজের ওপর রাগও হল খানিকটা। কেন যে যেচে ইন্দ্রাণীর বন্ধুর বরটাকে কাজ দিতে গেল! লোকটাকে ঝাড়তে গেলে ইন্দ্রাণী না এখন মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

আরও দু-একটা আপাত দরকারি কথা সেরে উঠে পড়ল শুভাশিস। দরজার দিকে এগোচ্ছিল, শালিনী মেয়েকে ছেড়ে ছুটে এসেছে, —এই যেয়ো না, দাঁড়াও। কথা আছে।

—আবার কিছু শুঁকবে নাকি ? শুভাশিস গলা ঠাণ্ডা রাখল, —সাড়ে নটা বাজে, আমার কিন্তু আর সময় নেই।

—তুমি রেগে যাচ্ছ কেন ? সত্যিই ছন্দা মাঝে মাঝে রাতে ঘুমোতে পারছে না। শালিনী নরম নিচু স্বরে কথা বলছে, —ওর লোয়ার অ্যাবডোমেনে একটা পেন হচ্ছে। কাল ও আমার চেম্বারে এসেছিল।

শুভাশিসের ভুরু ঘন হল।

শালিনীও গম্ভীর, —আমি চেকআপ করেছি। ছন্দার ইউটেরাসে ফাইব্রয়েড আছে। সাইজও মনে হল ভালই। আউটার ওয়ালে ফর্ম করেছে। ইমেডিয়েটলি আলট্রাসোনো করতে হবে।

—আশ্চর্য ! আমাকে কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও কোনও প্রবলেমের কথা বলেনি !

—সেই জন্যই তো বলছিলাম ডিয়ার, তোমরা বউদের ঠিক ঠিক খোঁজ রাখো না। তুমি ইউঁহি রেগে গেলে।

—সরি। কিন্তু ছন্দা... ! শুভাশিসের কথা ফুটছিল না।

—শোনো, কথা বলে মনে হল ছন্দার বোধ হয় তোমার ওপর একটা অভিমান আছে। ও যে আমার কাছে চেকআপে এসেছিল সেটাও তোমাকে জানাতে চায় না। রিপিটেডলি তোমাকে বলতে বারণ করেছে।

বিস্মিত হওয়ার থেকেও শুভাশিসের নিজেকে অপমানিত লাগছিল বেশি। শালিনীর শোকেসের গণপতিবাপ্পার মূর্তির মতো স্থাণু হয়ে রইল কিছুক্ষণ। মেয়েদের কোনও কাজেরই কার্যকারণ খুঁজে পাওয়া ভার। শুভাশিসকে হাস্যাস্পদ করে কী লাভ ছন্দার ? প্রতিশোধ ? নাকি এ শুধুই সহানুভূতি কুড়োনোর চেষ্টা ?

শুভাশিস তিতকুটে গলায় বলল, —বারণই যখন করেছে, তুমি আমাকে বললে কেন ? না হয় নাই জানতাম।

—মেরি মর্জি। ভাবলাম তোমার একটু আঁখ ফুটিয়ে দিই। এঁটো হাতে কথা বলতে বলতে ঠোঁট টিপে হাসছে শালিনী, —জানোই তো মহাভারতের জমানা থেকে মেয়েদের ওপর অভিশাপ আছে ? আমাদের পেটে কথা থাকবে না ! তুমি যেন আবার বাড়িতে গিয়েই ছন্দাকে বোলো না প্লিজ। ছন্দা তবে আমার ওপর খুব গুস্‌সা করবে।

শুভাশিস এক চোয়ালে হাসল। মনে মনে বলল, তোমাদের পেটে কথা থাকবে কি করে ! তোমাদের মনে এত প্যাঁচ !

ফেরার পথেও শালিনীর দেওয়া খবরটা মস্তিষ্কে চিমটি কাটছিল শুভাশিসের। এক রাশ অপমান ঘামের মতো বিজবিজ করছে শরীরে। হাওয়া বড় কম আজ, সুরাটাও যেন চড়ে বসেছে মাথায়। শুভাশিসের ভার ভার লাগছিল মাথাটা।

ফ্ল্যাটের নীচে কার পার্কিং-এ গাড়ি রাখতে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল শুভাশিস, —দারোয়ান ! অ্যাই দারোয়ান !

ছোকরা দারোয়ান কাছেপিঠেই ছিল। শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে, —কী হয়েছে সাব ?

—আমার গাড়ি রাখার জায়গায় অন্য গাড়ি কেন ? শুভাশিস আঙুল নাচাল।

—বোধহয় ভুল করে... সাব...

—তোমরা থাকো না এখানে ? দেখতে পারো না ? বলতে পারো না ? শুভাশিস আঙুল নাচিয়েই চলেছে, —আমার পয়সা দিয়ে কেনা জায়গায় অন্য লোক গাড়ি রাখে কী করে ?

শুভাশিস কখনও চেঁচামেচি করে না। তার রুদ্র রূপ দেখে দারোয়ান ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

শুভাশিস আবার গর্জে উঠল, —ওটা কোন ফ্ল্যাটের গাড়ি ?

—থ্রি সি সাব।

—থ্রি সি ? মানে গুপ্তা ?

—হাঁ। গুপ্তাজি। উনকা ড্রাইভার কথা শোনে না সাব, য্যায়সা ত্যায়সা রেখে দ্যায়।

—ঠিক হ্যায়, আমি দেখছি।

নাক দিয়ে আগুনের হলকা ছড়াতে ছড়াতে নিজের ফ্ল্যাটে এল শুভাশিস। কোনওদিকে না তাকিয়ে ফোনের সামনে বসেছে, ঝটঝট পাতা ওল্টাচ্ছে ডায়েরির। এখানকার প্রতিবেশীরা সচরাচর কেউ কারুর ফ্ল্যাটে যায় না, প্রয়োজন পড়লে টেলিফোনে কথা সারে। এটাই রেওয়াজ।

শুভাশিস বোতাম টিপল ডায়ালপ্লেটের,—গুপ্তাজি আছেন ?

—জি। কোথ্থ বলছি। আপ কউন ?

—ডক্টর সেনগুপ্ত ফ্রম টু বি।

—নমস্কার ডাক্তারস্যাব। বোলুন।

শুভাশিস সৌজন্যের ধার ধারল না। সরাসরি বলল, —আপনি কি লক্ষ করেছেন আপনার ড্রাইভার প্রায়ই আমার স্পেসে গাড়ি রাখছে ?

—না তো ডাক্তারবাবু।

—এবার থেকে একটু দেখবেন। আমি এ ধরনের ইনট্রুশন পছন্দ করি না। কাল সকালে যখন বেরোব, তখন যেন দেখি আমার স্পেসটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। অর ইউ আর গোয়িং টু হ্যাভ এ ব্যাড ডে। বুঝলেন ?

উত্তরের তোয়াক্কা না করে রিসিভার প্রায় আছড়ে রাখল শুভাশিস।

শুভাশিসের চড়া স্বর শুনে ছন্দা দৌড়ে এসেছে, —হল কী ? রাতদুপুরে কার ওপর ফোনে চেঁচাচ্ছ ?

—তা জেনে তোমার কি হবে ? শুভাশিস খিঁচিয়ে উঠল, —তোমার গোপালঠাকুর ঘুমিয়েছে ? না ঘুমিয়ে থাকলে যাও, ঘুম পাড়াও গে যাও।

—এভাবে কথা বলছ কেন ?

—কীভাবে বলতে হবে ? সুর করে ? গেয়ে গেয়ে ? শুভাশিস জুতো খুলে ছুঁড়ল সজোরে। জুতো রাখার র‍্যাক অবধি পৌঁছল না জুতো জোড়া, দু দিকে ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেদিকে দৃকপাত না করে উঠে গেল শোওয়ার ঘরে। বুশ শার্ট খুলে দলা পাকিয়ে ফেলল মেঝেতে।

ছন্দাও এসেছে পিছন পিছন, দেখছে শুভাশিসকে। বুঝি বা অনুধাবন করতে চায় কেন এই ক্রোধ।

দুপদাপ লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে গেল শুভাশিস। ছটাস ছটাস জল ছেটাল মুখে চোখে। পাগলের মতো। বেরিয়ে এসে চেপে চেপে মুখ ঘষছে তোয়ালেতে।

ছন্দা নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল,— খেতে দেব ?

—না।

—বাইরে খেয়ে এসেছ ? বেরোনোর সময় কিছু বলে গেলে না..... ৷ ছুটির দিন, এক সঙ্গে খাবে বলে ছেলেটা বসে আছে......

—কেন ঘ্যানঘ্যান করছ ? বলছি তো খাব না।

ছন্দা সামান্য কাছে এগোল,— শরীর খারাপ ?

—আমার শরীর নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। শুভাশিস খিঁচিয়ে উঠল।

ছন্দা মুহূর্তের জন্য থমকাল, পরক্ষণেই বিদ্রূপ হেনেছে, —হুঁ, তোমার শরীর নিয়ে মাথা ঘামানোর তো অন্য লোক আছে।

—আছেই তো। না থাকলেও শরীর নিয়ে বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে আমি ঢ্যাঁড়া পেটাতে যাব না।

কপালের ভাঁজ ঘন হয়েছে ছন্দার, —তুমি কি শালিনীদের বাড়ি গিয়েছিলে ?

সরাসরি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না শুভাশিস। ছন্দার আগের বিদ্রূপটা ছ্যাঁকা দিয়েছে গায়ে। এ বিদ্রূপ নতুন কিছু নয়, এ ধরনের খোঁচা বহু দিন ধরেই হজম করে আসছে শুভাশিস, আজ পারল না। অন্য দিনের মতো এড়িয়ে না গিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—শোনো, যাকে হিংসে করে তুমি আমাকে লোকসমাজে অপদস্থ করার চেষ্টা করো, তুমি তার নখের যোগ্যও নও। আশা করি কথাটা এবার থেকে মনে রাখবে।

—হ্যাঁ, আমি তো নখের যোগ্য নইই। হবই বা কী করে ? আমি তো আর তার মতো রঙঢঙ জানি না। জানলে তো তুমি আমার আঁচলেই বাঁধা থাকতে। ছন্দার মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। চেরা জিভে বিষ ওগরাচ্ছে সে,—লজ্জাও করে না, ছেলে মেয়ে বড় বড় হয়ে গেছে, এখনও দুজনে চালিয়ে যাচ্ছ !

—বেশ করছি। শুভাশিস গর্জে উঠল, —যা ইচ্ছে করি আমি, তোমার সুখে কমতি হয়েছে কোনওদিন ? কী পাওনি তুমি অ্যাঁ ? টাকা ফ্ল্যাট গাড়ি আরাম ছেলে কী নয় ? এই যে মুখের রক্ত তুলে খেটে মরছি, এসব কার ভোগের জন্য ? যখন যা চাইছ, হাতের কাছে এনে দিচ্ছি। তার বদলে আমি যদি কোথাও গিয়ে একটু শান্তি পাই......

—থাক থাক, চিৎকার করে আর নিজের কেলেঙ্কারির কীর্তন গাইতে হবে না। পাশের ঘরে ছেলে আছে, তাকে নয় নিজের কেচ্ছা না'ই শোনালে।

কথাটা বলেই ঝট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ছন্দা। শুভাশিসকে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে।

শুভাশিস ফুঁসছিল। সোজাসুজি শালিনীর কথাগুলো শুনিয়ে দিয়ে ঠাস ঠাস চড় কষালেই কি ভাল হত ? মিটত ঝালটা ? ছন্দার সঙ্গে সব সংঘর্ষই কেন যে শেষ হয় ইন্দ্রাণীতেই !

লম্বা একটা বাতাস টেনে খানিকক্ষণ বুকে ধরে রাখল শুভাশিস। দূরে কোথাও বোমাবাজি শুরু হয়েছে। কেওড়াতলার দিকে কি ? শ্মশানের দখল নিয়ে প্রায়ই দু দলে লড়াই বাধে আজকাল।

বোমার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে শুনতেই ছেলের ঘরে এল শুভাশিস।

টোটো মন দিয়ে একটা বই পড়ছে। ছেলের মুখ দেখে শুভাশিস আন্দাজ করার চেষ্টা করল ঝগড়ার কতটুকু কানে গেছে ছেলের। বুঝতে পারল না। টোটোর মুখটা কি আজকাল বেশি কঠিন হয়ে থাকে !

তরল কিন্তু সাবধানী স্বরে শুভাশিস বলল, —যা, খেয়ে নে। মা বসে আছে। তোর অরূপকাকুরা এমন খাইয়ে দিল....

টোটো চেয়ার ছেড়ে উঠেছে, —তোমার ফোন এসেছিল। দুবার।

—কোত্থেকে ?

শর্টস টিশার্ট পরা টোটোর মুখ থমথম করছে। শুভাশিসের দিকে না তাকিয়ে বলল, —ঢাকুরিয়া থেকে।

কে করেছিল ফোনটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল শুভাশিস। অস্বস্তি, বড় অস্বস্তি !

২৪

বিকেলে এই সময় থেকে জ্বরটা বাড়তে থাকে ইন্দ্রাণীর। বাইরের আলো যত কমে, চেতনাও বধির হয়ে আসতে থাকে ক্রমশ। চতুর্দিক এক গাঢ় কুয়াশায় ছেয়ে যায়, এক পাল মৌমাছি চাক ভেঙে বেরিয়ে এসে মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে অবিরল। কখনও কখনও এলোপাথাড়ি দংশনও করে চলে তারা। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা ! যন্ত্রণা মাথায় নিয়েই কুয়াশা ভেদ করে ইন্দ্রাণী চোখ চালায়। আবছা আবছা দেখতে পায় তিতির ঠায় বসে আছে

চেয়ারে। আদিত্য মাঝে মাঝেই ঘরে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, কখনও বা বিছানায় বসে কপালে হাত ছোঁয়াচ্ছে তার। বাপ্পাও আসে, তবে কম। এই সময়ে বাড়ি থাকলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে বাপ্পার। সন্ধে হলে পা টিপে টিপে উঁকি দেয় কন্দর্প, একটু রাত বাড়লে সুদীপ। রুনাকেও দেখা যায় মাঝে মাঝে। আসে, যায়, ফিসফিস করে কথা বলে তিতিরের সঙ্গে। হয়তো বা ফিসফিস নয়, স্বাভাবিক স্বরেই বলে, ইন্দ্রাণীই ঠিক শুনতে পায় না। হয়তো বা শোনেও। নদীতে ডুব দিলে আশপাশের কলরোল যেমন দূরাগত ধ্বনি মনে হয়, ঠিক যেন তেমনটিই শোনে ইন্দ্রাণী। অস্পষ্ট। জড়ানো। অসাড় চৈতন্যের ঘোরে ওই ধ্বনি, মানুষের ঘোরাফেরার ওই চলচ্ছবি, সবই বড় অলীক ঠেকে ইন্দ্রাণীর। মনে হয় যা দেখছে তা সত্যি নয়, এই বুদবুদ এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে। মিলিয়ে যাবে।

পাঁচ দিন ধরেই এই চলছে। জ্বর ছাড়ছে না কিছুতেই। গোস্বামী ডাক্তার বলে গেছে ভয়ের কিছু নেই, তবে অসুখ বোধহয় এবার বেশ ভোগাবে। কড়া অ্যান্টিবায়োটিকও শরীরের রস নিংড়ে নেবে অনেকটাই।

তিতির মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রাণীর। হাতে জলের গ্লাস আর রঙিন ক্যাপসুল, —একটু মাথা তোলো তো মা।

ইন্দ্রাণী প্রাণপণ শক্তিতে সামান্য ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। তিতিরই হাতের বেড়ে মাথা তুলে ধরেছে। নিপুণ সেবিকার মতো ক্যাপসুলটা দিয়ে একটুখানি জল ঢালল মা'র মুখে। অপেক্ষা করল, যতক্ষণ না ওষুধটা গিলতে পারে। তারপর সন্তর্পণে মাথা বালিশে নামিয়ে দিয়ে বলল,—আরেক বার মাথা ধুইয়ে দেব মা ?

ইন্দ্রাণীর চোখ আরও ঝাপসা হয়ে এল। ফ্যাকাসে মুখে ঘাড় নাড়ল একটু।

ইন্দ্রাণীকে বিছানার প্রান্তে এনে মাথায় জল ঢালছে তিতির। হুপহুপ আলতো চাপড় দিচ্ছে চাঁদিতে। চুল বেয়ে বালতিতে গড়িয়ে পড়ছে জল। শীর্ণ ধারায়।

ইন্দ্রাণী জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। শুধু বাইরের নয়, নিজের ভেতরেও। কোথা দিয়ে যেন এক নদী বয়ে চলেছে কুলকুল। এক নিরুদ্ধ কষ্টের পাষাণে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। পাষাণ বুঝি ক্ষয়ে যায়।

মায়ের মতো মমতায় ইন্দ্রাণীর সেবা করে চলেছে এ কোন মেয়ে! একেই কিনা সেদিন রাতে ইন্দ্রাণী নিজের হাতে.... !

ভাগ্যিস তিতির তক্ষুনি ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল বিছানায়! গলায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল, কী হয়েছে মা ? ডাকছ ?

ইন্দ্রাণী গোঙাচ্ছিল। তার মুখ চোখ দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল তিতিরের। মা'র কপালে গালে হাত রেখে বলেছিল,—এ কী ! তোমার গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে !

ইন্দ্রাণী সংবিৎ ফিরে পাচ্ছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল,—শরীরটা কেমন যেন লাগছে। ঘুম আসছে না।

—বাবাকে ডাকব ?

—না। কাউকে ডাকতে হবে না। তুই একটু আমার পাশে থাক।

—দেখব জ্বরের কোনও ট্যাবলেট আছে কিনা ?

—দ্যাখ।

তিতির মশারি সরিয়ে দ্রুত পায়ে বিছানা থেকে নেমেছিল। খুঁজে খুঁজে ওষুধ বার করল। খাইয়েও দিল তক্ষুনি। ইন্দ্রাণী শোওয়ার পরেও শুল না, বসে রইল পাশে। হাত বোলাল মাথায়। অনেকক্ষণ। কয়েক দণ্ড আগেও যাকে ডাকিনী মনে হয়েছিল, সেই যেন কোন মায়াবী কুহকে ঘুম পাড়িয়ে দিল ইন্দ্রাণীকে। তখনকার মতো।

সকালে জ্বরটা তেড়েফুঁড়ে এল। ওই ডাকিনীই ছায়ার মতো লেপটে রইল পাশে পাশে। ক'দিন স্কুলে গেল না, বাড়ি থেকেও বেরোয়নি এক পা, খাওয়ার সময় ছাড়া বড় একটা নীচেও নামেনি।

বেলার দিকে জ্বর কম থাকে ইন্দ্রাণীর, তখন কতবার বলেছে, —সারাক্ষণ ঘরে বসে আছিস কেন ? এর পর তো তুই অসুখে পড়বি !

তিতির হেসেছে,— তোমাকে অত ভাবতে হবে না তো। শরীরটাকে সারাও আগে।

—স্কুলে যাচ্ছিস না, পড়াশুনোতে যে পিছিয়ে পড়বি !

—পাঁচ-সাত দিনে কি আর এমন হাতিঘোড়া পড়া হবে ! যদি কোনও নোটস্ দেয় ঝুলনের কাছ থেকে নিয়ে নেব।

ইন্দ্রাণী আর কথা বাড়ায় না। পাশ ফেরে। অবসন্নের মতো। ঘুম আর জাগরণের এক মধ্যবর্তী দশায় কান জুড়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে থাকে সারাক্ষণ।

কিছু কি ভাবে ইন্দ্রাণী ! তাও বুঝি ঠিক জানে না।

তিতির বাথরুমে বালতি রেখে ফিরেছে। নরম তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে মাথা মোছাচ্ছে ইন্দ্রাণীর। মৃদু স্বরে বলল, —তোমার স্কুল থেকে আজ কমলিকা মাসি এসেছিল।

—তাই ? কখন ?

—দুপুরে। তুমি তখন খুব ঘুমোচ্ছিলে।

—ডাকিসনি কেন ?

—কমলিকা মাসি ডাকতে বারণ করল।

চকিতে নীলিমাদির সঙ্গে স্কুলে বাকবিতণ্ডার কথা ইন্দ্রাণীর মনে পড়ে গেছে। আবার কিছু ঘটল নাকি ? কমলিকা কি ওই ব্যাপারেই কিছু বলতে এসেছিল !

ইন্দ্রাণী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, —ডাকলে পারতিস। কয়েকটা দরকারি কথা ছিল কমলিকার সঙ্গে। ছুটির একটা অ্যাপ্লিকেশানও পাঠিয়ে দিলে ভাল হত।

—খবর তো পাঠিয়েই দিয়েছ। জয়েন করে চিঠি দেবে। তুমি তো আর কথায় কথায় ডুব মারো না।

—তবু একটা নিয়মকানুন আছে তো। কে কি ভাববে.... ! কথা বলতে বলতে ইন্দ্রাণীর ছোট্ট শ্বাস পড়ল। সত্যিই সে দায়ে না পড়লে কামাই করে না। অসুখ বিসুখও বড় একটা হয় না তার। শেষ কবে বিছানার পড়েছিল সে ? সেই বাপ্পার মাধ্যমিকের টেস্টের আগে। দিন পনেরো খুব ব্রংকাইটিসে ভুগেছিল। কেশে কেশে গলায় রক্ত ওঠার জোগাড়। তারপর এত দিন পরে এই মারাত্মক জ্বর।

ভেজা চুলে মেয়ের হাতের ছোঁয়া ভারি মিঠে লাগছিল ইন্দ্রাণীর। কেমন এক শিরশিরে ভাব বয়ে যাচ্ছে স্নায়ুতে। শীতল জলের স্পর্শে মাথার দপদপানি অনেকটা কম। আরাম লাগছে।

চোখ বুজে ইন্দ্রাণী হালকা স্বরে মেয়েকে প্রশ্ন করল, —হ্যাঁরে, তুই যে স্কুলে যাচ্ছিস না, কই তোর বন্ধুবান্ধবরা তো কেউ খোঁজ করতে এল না ?

—তাই তো দেখছি।

—তার মানে তোর বন্ধুরা তোকে মিস্ করে না ! এলেবেলে ভাবে !

তিতির আলতো হাসল,— হয়তো।

ইন্দ্রাণী দু-এক পল চুপ। তারপর খুব সাবধানে প্রশ্ন করল,— এখন স্কুলে টোটোর সঙ্গে দেখা হয় ?

—হয়। খুব রেয়ার।

—কথাবার্তা হয় ? কিছু বলে টোটো ?

—কী বলবে ?

ইন্দ্রাণী ঠিক উত্তর খুঁজে পেল না। টোটোর সঙ্গে বাপ্পা তিতিরের যেটুকু সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল, তা তো অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিয়েছে ইন্দ্রাণী। এখন আর কি কথা হবে দুজনের ?

সম্পর্ক যে গড়ে ওঠেনি, সে দোষ কি ইন্দ্রাণীর একার ? শুভাশিসের দোষ নেই ? ছন্দার দোষ

ছিল না ? ইন্দ্রাণী তো ছন্দার সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্কই রাখতে চেয়েছিল। ছন্দা তাকে একটুও সহ্য করতে পারে না জেনেও শুভাশিসের কথা রাখতে গিয়েছিল বার কয়েক। কী দরকার ছিল সেবার টোটোর জন্মদিনে তিতির বাপ্পাকে নিয়ে শুভাশিসের অত আদিখ্যেতা করার ? কী বিশ্রী মেজাজ দেখিয়েছিল ছন্দা সেদিন ! ইন্দ্রাণীর ওপর নয়, শুভাশিসের ওপর। কিন্তু উপলক্ষ যে তিতির বাপ্পা, তা কি ইন্দ্রাণী বোঝেনি ?

তিতির তোয়ালে কাঁধে উঠে দাঁড়িয়েছে,— এবার চুপচাপ শুয়ে থাকো। একটু হরলিক্স খাবে এখন ? করে দেব ?

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্ক ভাবে নাক কুঁচকোল, —গরম গরম চা দে একটু। দোতলায় স্টোভ জ্বালাস না যেন, কেরোসিনের গন্ধ বড় নাকে লাগে। সন্ধ্যার মাকে গিয়ে বল, ওই করে দেবে।

বাইরে আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আরেকটা দিন ফুরিয়ে এল। সন্ধ্যা নামছে। ধীরে, অতি ধীরে। আলোর বুকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে অন্ধকার।

তিতির ঘরে ফিরে আলো জ্বেলে দিল। জানলা বন্ধ করছে।

ইন্দ্রাণী বলল, —থাক না জানলা খোলা।

তিতির অবাক চোখে তাকাল, —তুমিই তো মশার জন্য জানলা বন্ধ রাখতে বলো !

—ঘরে বড় গুমোট লাগছে রে।

—লাগুক। ফুলস্পিডে ফ্যান ঘুরছে, এখন এই সন্ধেবেল্য জানলা খোলা থাকলে......' তিতির জানলার ছিটকিনি আটকাল, —শরৎকাল পড়ে গেছে, হিম পড়ে এখন এই জ্বরের ওপর আবার নতুন করে ঠাণ্ডা লাগলে আর দেখতে হবে না।

—ভাদ্রমাসে হিম ! হাসালি। ইন্দ্রাণী ক্লান্তভাবে পাশ ফিরল, —টিভিটা খুলে দে না। শুয়ে শুয়ে একটু দেখি।

শব্দ কম রেখে টিভি চালিয়ে দিল তিতির। চার-পাঁচজন লোক কি সব বকবক করছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিতির বলল,—আজ বোধহয় ডাক্তার আঙ্কল আসবে। কাল বাবা ফোন করেছিল।

মুহূর্তের জন্য বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল ইন্দ্রাণীর। কত হাজার বছর আসেনি শুভ ! মুখে বলল, —তোর বাবার আবার বেশি বেশি। খবর দিয়ে ডেকে পাঠানোর কি ছিল ? কাজেকর্মে ব্যস্ত রয়েছে মানুষটা !

—আমি ছিলাম পাশে। বাবা তোমার অসুখের কথা বলেনি।

—ও। ইন্দ্রাণী এতক্ষণে একটু যেন ঝিমিয়ে গেল।

প্যাসেজে অ্যাটমের গলা শোনা যাচ্ছে। চিৎকার করে একটা চলতি হিন্দি গানের কলি গাইছে অ্যাটম। রুনা কি বাড়ি নেই ? আদিত্যই বা গেল কোথায় ?

সন্ধ্যার মা চা নিয়ে এসেছে। সঙ্গে দুটো বিস্কুট। বিস্কুটে কামড় দিয়ে প্লেট সরিয়ে রাখল ইন্দ্রাণী। কাপ ধরতে হাত কাঁপছে। বসে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে বেশ। তবু একটু একটু করে চা-টা শেষ করল ইন্দ্রাণী। তাপ, স্বাদ, কিছুই টের পেল না।

আবার ঘোর নামছে চোখে। আবার ঝিঁঝি পোকার ডাক ছড়িয়ে যাচ্ছে মাথায়। গা-টাও গুলোচ্ছে কেমন। টিউবের লম্বাটে আলো বড় চোখে লাগছে হঠাৎ। শরীর শিরশির।

ইন্দ্রাণী চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। কাঁপা আঙুলে সুজনি টেনে নিল গায়ে। জোর করে কথা বলতে গিয়ে স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে,—তোর বাবা কোথায় রে তিতির ? ও ঘরে ?

—না। রঘুবীরবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল তখন, বোধহয় তার সঙ্গেই বেরিয়েছে। গোস্বামী ডাক্তারকে তোমার রিপোর্ট দেখিয়ে ফিরবে। তিতির টিভি বন্ধ করে দিল,—দাদা আজ মানিকতলায় গেছে।

ইন্দ্রাণীর নিশ্বাসে টান পড়ছে এবার, কষ্ট করে প্রশ্নটা করল,—আমার অসুখের কথা দাদু-দিদাকে

বলতে বারণ করেছিস তো ? বাবা শুনলে যা উতলা হয়ে পড়বে !

—সে কি দাদা জানে না ? নীচে দাদুই যা ছটফট করছে তোমার জন্য।

কষ্টের মধ্যেও একটা ভাললাগা চিনচিন করছিল ইন্দ্রাণীর বুকে। এ বাড়ির সবাই আবার কী সুন্দর একত্র হয়ে গেছে ! চাঁদু দীপূ যে ও ঘরে কথা বলে দাদার সঙ্গে, এ ঘরে বিছানায় শুয়েও ইন্দ্রাণী টের পায় বইকি ! হয়তো বা শুধু তার অসুখ নিয়েই আলোচনা হয়। তা হোক, সবাই এক সঙ্গে বসে কথা বলছে এই কি কম ! ভাবতে ভাল লাগে সে-ই এখনও এ বাড়ির প্রাণবিন্দু। তাকে ঘিরেই এ বাড়ির আলো জ্বলে, আলো নেবে, আনন্দ বিষাদ আবর্তিত হয়, আশা নিরাশাও বুঝি দোল খায় এ বাড়ির মানুষজনের মনে।

শুধু ইন্দ্রাণীই যে কেন কোনও কিছুতেই উৎসাহ পায় না আজকাল ! সবই বড় নিরর্থক, বড় অসার মনে হয়। চল্লিশে না পৌঁছেই কেন এত শ্রান্তি !

ইদানীং গোটা জীবনটাকেই কেমন যেন ভুল মনে হয় ইন্দ্রাণীর। শৈশবে মা বাবার আদরে বড় হয়ে ওঠা বালিকার ভূমিকা, প্রথম যৌবনে প্রেমিকার সাজ, তারপর এক দায়িত্বশীল ঘরনীর রূপ, এরাই কি ইন্দ্রাণী ? নাকি সে আদৌ ইন্দ্রাণীই নয় ? অন্য কেউ ইন্দ্রাণী সেজে বেঁচে আছে এত কাল ? তাহলে ইন্দ্রাণী কোথায় ?

ইন্দ্রাণী ডুবছিল।

সাড়ে আটটা নাগাদ শুভাশিস এল। একা নয়, সঙ্গে কন্দর্প। ইন্দ্রাণীর জ্বর তখন ভাল মতো চড়েছে। তার শিয়রে বসে কপালে জলপট্টি লাগাচ্ছে তিতির। জলের প্রলেপ শুকিয়ে যাচ্ছে মুহুর্মুহু।

শুভাশিস ঘরে ঢুকে প্রথমেই বিছানার কাছে গেল না। টেবিলে ইন্দ্রাণীর ওষুধপত্র পড়ে আছে, সেগুলো ঘেঁটে দেখল আগে। প্রেসক্রিপশান খুঁজল। পেল না।

তিতির বলল,—পাঁচ দিন হয়ে গেল। জ্বর ছাড়ছে না।

—হুঁ। চেয়ার টেনে খাটের ধারে বসল শুভাশিস, —আমাকে একটা খবর দিসনি কেন ?

তিতির উত্তর দিল না, পট্টি বদলাচ্ছে।

শুভাশিস কবজি টিপল ইন্দ্রাণীর। নাড়ি দেখছে। চিন্তিত মুখে বলল, —টেম্পারেচার চার্ট রাখছিস ?

—হ্যাঁ। বালিশের তলা থেকে তিতির একটা কাগজ বার করে দিল,— সকালে কম থাকে। বিকেলে বাড়ে।

মন দিয়ে কাগজে তাপমাত্রার ওঠাপড়া দেখল শুভাশিস।

জোর করে হাসি ফুটিয়েছে মুখে,—কী করে বাধালে ?

কুয়াশা গাঢ় এখন। শুভাশিস আবছা। ইন্দ্রাণী চোখ বুজল, —তোমার নার্সিংহোমের কাজ শেষ হল ?

—উঁহু। চলছে।

—শেফালির বর কাজ করছে ঠিক মতো ?

—করছে একরকম। তুমি বেশি কথা বোলো না।

ইন্দ্রাণী ক্ষীণ স্বরে বলল,—আমার কিচ্ছু হয়নি। এরা মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছে। বলতে বলতে চোখ খুলেছে, —তিতির, তোর ডাক্তার আঙ্কলকে চা দে।

তিতির উঠতে যাচ্ছিল, শুভাশিস বাধা দিল,— কিচ্ছু লাগবে না। তুই বোস।

জ্বরের তাপে ইন্দ্রাণীর মুখ টকটকে লাল। দু চোখ রক্তাভ। তার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে কন্দর্প। কুয়াশা মেখে সেও যেন কেমন ঘোলাটে।

ইন্দ্রাণী আবার চোখ বুজল। একবার মনে হল বাবার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা বলে শুভাশিসকে। ঠোঁট নাড়তেও ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া বলেই বা লাভ কী ? শুভ কি আর

দিনটাকে মনে রেখেছে ? তনুকেই হয়তো ভুলে গেছে শুভ !

শুভাশিস আর কন্দর্প নিচু স্বরে কথা বলছে। এলোমেলো কথা। শুনতে না চাইলেও কথাগুলো আবছাভাবে কানে আসছিল ইন্দ্রাণীর।

শুভাশিস বলছে,— সময়টা ভাল নয়। সিজন চেঞ্জের টাইম, চারদিকে খুব জ্বরজারি হচ্ছে। ভোগাচ্ছেও খুব।

কন্দর্প বলল,— আমাদেরই ভুল হয়ে গেছে। প্রথম দিকে পাত্তা দিইনি....ডাক্তার দেখানো হল তো এই পরশু।

—হুঁ, যে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিয়েছে, ওটা কাজ শুরু করতে ক'দিন টাইম লাগে। কটা ক্যাপসুল পড়েছে রে তিতির ?

—ছটা।

—এবার কমবে। দেখিস খাওয়া দাওয়াটা যেন ঠিক মতো করে। এ সময়ে অবশ্য জিভে স্বাদ থাকে না, তবু জোর করে খেতে হবে।

কন্দর্প বলল, —আমার মনে হয় বউদির জ্বরটা শুধু সিজন চেঞ্জের জ্বর নয়। অত বড় একটা টেনশান গেল.....

—কিসের টেনশান ?

ইন্দ্রাণী হঠাৎ প্রলাপগ্রস্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল, —আহ চাঁদু, তোমরা থামবে ? আমার অসুখ ছাড়া কি কোনও কথা নেই ?

কিছুক্ষণের জন্য গোটা ঘর নীরব। মাথার ওপর পাখাটাই যা শব্দ করে চলেছে একটানা।

খানিক পরে আবার সহজ গলায় কথা শুরু করেছে কন্দর্প। পরিবেশ হালকা করতে চাইছে। শুভাশিসকে প্রশ্ন করল,— কবে নাগাদ স্টার্ট হচ্ছে নার্সিংহোম ?

শুভাশিস জোরে একটা শ্বাস ফেলল। এত জোর যে তার নিশ্বাসের শব্দটাও অনুভব করতে পারল ইন্দ্রাণী। বুকটাকে খালি করে আলগা গলায় উত্তর দিচ্ছে শুভ,— ভেবেছিলাম তো মহালয়ার দিনই স্টার্ট করে দেব। এদিকে আবার একটা ফ্যাকড়া বেধে গেছে।

—কীরকম ?

—আর বোলো না, আজ দুপুরে আমার পার্টনারের কাছে করপোরেশানের এক লোক এসে হাজির। নানান ধরনের ভ্যানতাড়া শুরু করেছে হঠাৎ। কিসব নাকি আইন আছে, কোনও রেসিডেন্সিয়াল বাড়ির গোটাটাকেই নার্সিংহোম করা যাবে না। তার ওপর যেহেতু বাড়িটা পুরনো, করপোরেশানের ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে একটা স্পেশাল সার্টিফিকেটও নিতে হবে।

—কীসের সার্টিফিকেট ?

—বাড়িটা সেফ কিনা, ভেঙে পড়ে রুগীদের প্রাণহানি ঘটাবে কিনা, এই সব আর কি। যত সব ফালতু ব্যাপার। সেকেন্ড প্রবলেমটা অবশ্য মিটে যাবে। দু-চার হাজার গুঁজে দিতে হবে হাতে। প্রথম ফ্যাকড়াটাই ভোগাবে মনে হচ্ছে। লোকটা আমার পার্টনারকে নার্সিংহোম অ্যাক্ট ফ্যাক্ট দেখিয়ে ভীষণ ভয় দেখিয়ে গেছে।

—তাহলে কী করবেন এখন ? বাড়ির কিছুটা পোরশান ছেড়ে দেবেন ?

—নো চান্স। পনেরো-বিশ লাখ টাকা ঢালা হচ্ছে কি মুখ দেখতে ? বাড়ির একটা সেন্টিমিটার ছাড়ব না। আমার পার্টনারের সঙ্গে গোটা তিন-চার কাউন্সিলারের খাতির আছে। দরকার হলে তাদেরকে দিয়ে চাপ দেওয়াব। আরে বাবা, কিছু খেতে চাইছিস, সেটা খোলসা করে বল। পাঁচ-দশ হাজার আরও দিয়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু শুভাশিসদা, সব জায়গাতেই তো কিছু তেএঁটে বদখত লোক থাকে। ধরুন এমন লোকের পাল্লায় পড়লেন যে লোকটা টাকাই নেয় না, তখন ?

—ছাড়ো তো, টাকা আবার নেয় না ! রেটের হয়তো বেশি কম থাকে। শুভাশিসের গলা একটু

চড়েছে, —বুঝলে ভাই, সততা, দুর্নীতি, সব কিছুকেই আমরা অপটিমাম লেভেল অবধি মেনে নিতে পারি। সততারও একটা টলারেবল লিমিট আছে। তোমার যদি নিজের কিছু নেওয়ার না থাকে, তুমি ফাইলটা পাশের টেবিলে পাঠিয়ে দাও। নিজের সততা নিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, সেটা হবে শুচিবায়ুগ্রস্তের কাজ। সেটা লোকে সহ্য করবে কেন ? ঠিক তেমনি কোনও কাজের জন্য পাঁচ-দশ হাজার টাকা নেওয়াটা যদি দস্তুর হয়, নিয়ে নাও। তার জন্য কেউ তোমাকে চোর বলতে যাচ্ছে না। কিন্তু সেই কাজের জন্যই তুমি যদি পঞ্চাশ হাজার, এক লাখ দাবি করে বসো, আমি তোমাকে ছাড়ব কেন ! আরে বাবা, আমি তো ডাক্তার। চোর জোচ্চোর স্মাগলার নই। একথাও তো তাদের বুঝতে হবে।

কন্দর্প হাসতে হাসতে বলল, —গোটা বাড়ি যদি নার্সিংহোম করার নিয়ম না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার কাজটা একটু রিস্কি হয়ে যাবে শুভাশিসদা। আজ হয়তো কিছু হল না, নার্সিংহোম স্টার্ট করে দিলেন, কাল যদি কোনও বিপদে পড়ে যান ?

—সব আইনেরই ফাঁক থাকে রে ভাই। তেমন হলে আমাদের সেটা খুঁজে বার করতে হবে। বার করাও এখন কিছু কঠিন নয়। তার জন্য উকিল ব্যারিস্টাররা সব মুখিয়ে আছে। শুভাশিসও হাসছে, —সমাজ হল আমাদের এই শরীরটার মতনই। জার্ম আছে, ব্যাকটিরিয়া আছে, ভাইরাস আক্রমণ করছে, আমরাও লড়ে লড়ে বেঁচে আছি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, কোনও শরীর যদি একদম জার্ম ফ্রি হয়, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ডেঞ্জারাস। সে শরীর বাঁচবেই না। মজা কি জানো, ওই জার্মগুলোই শরীরে ইমিউনিটি তৈরি করে। তবে তারা বাড়াবাড়ি শুরু করলে, তাদের জন্যও রাস্তা আছে। ওই অ্যান্টিবায়োটিক। তোমার বউদি যা খাচ্ছে।

কন্দর্প আবার কি যেন প্রশ্ন করল, শুভাশিস আবার কি বলে চলেছে একটানা। ইন্দ্রাণী আর ঠিক ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না। শুভাশিসের আগের কথাগুলোই কেমন বিচিত্র লাগছিল তার। কফিহাউসে কি যেন সব বলত শুভ ? একটা পচাগলা সমাজ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে ! ধনিকশ্রেণী সমাজকে তো শোষণ করছেই, তার সঙ্গে মধ্যবর্তী সুবিধাভোগী শ্রেণীও এই রাষ্ট্রব্যবস্থার সুবিধে নিয়ে সুযোগ পেলেই শোষণ করে অন্যদের ! ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উকিল, কেরানি, ছোট ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ী, পাড়ার মুদি থেকে পার্কস্ট্রিটের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, সরকারি আমলা, বেসরকারি আমলা, কেউ এর ব্যতিক্রম নয় ! এই সমাজটারই খোলনোলচে বদলে ফেলে.... !

ইন্দ্রাণীর বমি পাচ্ছিল। সামনে যে মধ্যবয়সী মানুষটা কন্দর্পকে সমাজের রীতি প্রকৃতি বোঝাচ্ছে, সেই কি কফিহাউসের শুভাশিস ? নাকি শুভাশিসেরই খোলস পরে অন্য কেউ শুভাশিস সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে ? ইন্দ্রাণীরই মতো ?

ইন্দ্রাণী তিতিরের হাত চেপে ধরল,— আমি একটু বাথরুমে যাব রে।

শুভাশিস কন্দর্প কথা থামিয়ে হাঁহাঁ করে উঠেছে, —কী হল ?

ইন্দ্রাণী নিরুত্তর। তিতিরের কাঁধে ভর রেখে এগোচ্ছে বাথরুমের দিকে। দরজা বন্ধ করে বেসিনে ওয়াক ওয়াক করল খানিকক্ষণ। কিছুই বেরোল না। উল্টে পেটটা মুচড়ে উঠছে, ভারী রেলের ইঞ্জিন ঝমঝম শব্দ তুলে ছুটছে মাথায়। মুখে চোখে একটু জল ছুঁইয়ে সামান্য প্রকৃতিস্থ হল। বেরিয়ে এসে দেখল, আদিত্য এসে গেছে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে কথা বলছে রুনার সঙ্গে।

রুনা বলল, —কি হল দিদি, বমি করলে ? এত কাঁপছে কেন ?

আদিত্য তুরন্ত এগিয়ে এল। ধরেছে ইন্দ্রাণীকে। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, —খুব শরীর খারাপ লাগছে ?

ইন্দ্রাণী পা দুটোকে শক্ত রাখার চেষ্টা করল, —না। কী বলল ডাক্তার ? ব্লাড রিপোর্ট দেখে ?

—বলল, ম্যালেরিয়া নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জাই। তবে কাল-পরশুর মধ্যে জ্বর না কমলে হাই টেম্পারেচারের সময় আরেক বার ব্লাড করাতে হবে।

দু পাশে আদিত্য আর তিতিরকে নিয়ে টলমল পায়ে ঘরে ফিরছে ইন্দ্রাণী। গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। তেতো। এক ঢোঁক জল একটুক্ষণ মুখে রেখে গিলে নিল। যদি তেতো ভাবটা কাটে। চোখ বন্ধ করে শোওয়ার আগে একবার দেখল শুভাশিসকে। কেমন ধোঁয়াটে অবয়বহীন লাগছে শুভকে।

তিতির প্রশ্ন করল, —তোমার খাবার আনব মা ? একটু কিছু খেয়ে নেবে ?

—ভাল লাগছে না রে।

শুভাশিস কোমল ধমক দিল,— ওরকম করে না। শরীর আরও দুর্বল হয়ে যাবে। যা পারো সামান্য কিছু খাও।

শরীর কী শুভ ! খাঁচা ! কাঠামো ! খোলস !

প্রাণ কি শুধুই এক চিলতে বাতাস !

উৎকট হরিধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছে এক দল শববাহক। রাতের স্বল্পস্থায়ী নাগরিক নির্জনতা ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে তাদের চিৎকৃত উল্লাসে। ইটপাথরের জঙ্গলে প্রতিধ্বনি আর্তনাদ হয়ে ফিরছে বার বার।

ইন্দ্রাণীর ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে শরীর। বিছানাও ভিজে সপসপ করছে। হরিধ্বনি মিলিয়ে গেছে, তবু যেন তার রেশ এখনও রয়ে গেছে হাওয়ায়।

উঠে বসতে গিয়ে ইন্দ্রাণী অবাক হল। সন্ধেরাতের ভারী মাথাটা তুলোর মতো হালকা। বেশ ঝরঝরে লাগছে নিজেকে !

বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে বিছানা ছাড়ল ইন্দ্রাণী। তিতির অকাতরে ঘুমোচ্ছে। মশারির বাইরে থেকে ইন্দ্রাণী একবার দেখে নিল মেয়েকে। ভেজা ব্লাউজটা বদল করল। পা এখনও কাঁপছে অল্প অল্প। শিথিল পায়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। খুলে দিল বন্ধ জানলা।

শুক্লপক্ষের রাত ভরে আছে এক মলিন জ্যোৎস্নায়। মিহিন মেঘের চাদরে ঢেকে আছে পঞ্চমীর চাঁদ। বড় পাণ্ডুর, কৃশ দেখাচ্ছে চাঁদকে। একটু একটু হিম ভাবও যেন এসে গেছে বাতাসে।

বাথরুমে যাওয়ার জন্য নিঃশব্দে ভেজানো দরজা খুলল ইন্দ্রাণী। প্যাসেজের বাতিটা জ্বলছে। নিবিয়ে দিতে গিয়ে বাপ্পাদের দরজায় চোখ পড়ল। দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে।

দরজাটাকে টেনে দিতে গিয়ে ইন্দ্রাণী থমকেছে। প্যাসেজের আলো টেরচাভাবে গড়িয়ে আছে অন্ধকার ঘরে। সেই আলোতে পরিষ্কার দেখা যায় লম্বাটে রোগা শরীরটাকে। আধো আঁধারেও পিঠের ঠেলে ওঠা হাড় দুটো তাকিয়ে আছে যেন।

আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে জানলায়। ঘুমোয়নি।

২৫

গাট্টাগোট্টা ছেলেটা টুলে দাঁড়িয়ে একটানা বক্তৃতা করে চলেছে। হাত-পা ছুঁড়ে। মাথা ঝাঁকিয়ে। দেশ কাল সমাজ রাজনীতি কিছুই তার অজানা নেই। একটা একটা করে নেতাকে ধরছে, আর তার মুখোশ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কলেজগেটের বাইরে।

ধীমান বিরস মুখে বলল,—এ তো চৌষট্টি বগির মালগাড়ি রে ! চলছে তো চলছেই।

এণাক্ষী গাল ফোলাল,—পাক্কা পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল। এবার অন্তত থামুক।

—আর থেমেছে। দিনটাই আজ গন্।

বাপ্পারও মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কলেজে এসে ইকনমিকস আর রিসোর্স স্টাডিজ-এর ক্লাসটা সেরে আজ একবার পাসপোর্ট অফিসে যাবে ভেবেছিল বাপ্পা। দেড় মাস হয়ে গেল পাসপোর্টের ফর্ম জমা দিয়েছে, এখনও পুলিশ এনকোয়্যারির নামগন্ধ নেই ! কী যে হচ্ছে আরেকবার

গিয়ে দেখা দরকার। বড়কাকা বলে দিয়েছে আজ একবার বাপ্পা গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসুক, কাজ কিছু না হয়ে থাকলে বড়কাকার কোন চেনা ট্রাভেল এজেন্ট আছে, তাকেই লাগাবে বড়কাকা।

কিন্তু বাপ্পা এখন বেরোবে কী করে ? এই যা শুরু হয়ে গেছে ! আজকাল মিটিং থাকলেই ইউনিয়নের ছেলেরা কলেজের গেট বন্ধ করে দেয়। না দিয়ে উপায়ও নেই। শুধু মিটিং শোনার জন্য পাঁচ মিনিটও কলেজে থাকতে চায় না ছেলেমেয়েরা।

নাহ, সত্যিই বাপ্পার সময়টা এখন ভাল যাচ্ছে না। বম্বে থেকে ফেরার পর মনে খানিকটা হাওয়া-বাতাস খেলছিল, সেই ভাবটা ক্রমশ মরে আসছে যেন। ওশান লাইনার্স শিগগিরই চিঠি পাঠাবে বলেছিল, এখনও চিঠির চ দেখা যাচ্ছে না। পাসপোর্টের তো ওই ঝুলন্ত দশা। এর সঙ্গে একটার পর একটা উটকো ঝামেলা লেগেই আছে। কোথাও কিছু নেই, দাদু হঠাৎ মানিকতলা থেকে শিয়ালদা গিয়ে হারিয়ে গেল ! তাকে খুঁজতে গিয়ে মা এক জব্বর অসুখ বাধিয়ে বসল। অসুখের বাহানায় বাড়ির লোকজনের মধ্যে বেশ একটা মিলমিশ হচ্ছিল, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন তাও চোট। এবার বেশ ঘটা করেই বিশ্বকর্মা পুজো করেছিল মা। নিজে হাতে বিরিয়ানি রেঁধেছিল, খোঁচো দাদুটাকে চাখতে দিয়ে সে কী বিপত্তি ! মাঝরাতে উঠে হাহা করছে বুড়ো। বুক জ্বলে যাচ্ছে, গলা জ্বলে যাচ্ছে, এই যেন যায় যায়। ওষুধ-টোষুধ পড়ে কমল বটে, কিন্তু কাকিমা ঝুড়ি ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দিল মাকে। ব্যস, তারপর থেকে মা আবার গুম। কাজকর্ম করছে, কথাবার্তা বলছে, কিন্তু মুখোশটি আবার এঁটে নিয়েছে মুখে। জানে বুড়োর দৃষ্টিক্ষিধে, তবু কেন তাকে ওসব গিলতে দেওয়া ! এরই মধ্যে বাপ্পার অত দামি জাপানি ঘড়িটা ছিনতাই হয়ে গেল ভিড় বাসে ! বাবার দোস্ত তান্ত্রিকটাকে দিয়ে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালে কেমন হয় !

বাপ্পা বেজার মুখে জিজ্ঞাসা করল,—অ্যাই শেখর, কটা বাজে রে ?

শেখর ধীমান এণাক্ষীরা কলেজ বিল্ডিং-এর সিঁড়িতে গিয়ে বসেছে। শেখরের আগে ধীমান পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল,—তোর কটা চাই ?

—ফাজলামি রাখ। টাইম বল।

—ইন্ডিয়ান টাইম বলব ? না জি এম টি বলব ? চাইলে মস্কো নিউ ইয়র্কের টাইমও বলতে পারি।

বাপ্পা রেগেমেগে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধীমান চেঁচাচ্ছে,—চটিস কেন ? তোর যদি জাহাজের চাকরিটা মিলে যায়, তোকে তখন কতগুলো স্ট্যান্ডার্ড টাইম হিসেবে রাখতে হবে জানিস ?

প্রসঙ্গটা বন্ধুদের সামনে বেশি আলোচনা করতে চায় না বাপ্পা। এমনিতেই তো সবাই তাকে টিজ করে সারাক্ষণ, এরপর যদি কোনও কারণে না যাওয়া হয় তা হলে তো হ্যাটা দিয়ে দিয়ে পাগল করে দেবে।

শেখরের কাছে এসে ঘড়িটা নিজের চোখে দেখে নিল বাপ্পা। একটা চল্লিশ। মুখ বিকৃত হয়ে গেল আপনাআপনি,—ধুস, ক্লাস না হয়ে এই সব ক্যাচাল হবে জানলে কলেজে ঢুকতাম না।

—যেতিস কোথায় ? সিনেমা ?

—আমি তোদের মতো অত সিনেমার পোকা নই। আমার অনেক কাজ থাকে।

—কাজ মানে তোর সেই গঙ্গার ধার ?

শেখরের কথায় এণাক্ষী ধীমানরা মুহূর্তে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে,—মানে ?

—জানিস না ? ও এখন রোজ বিকেলে গঙ্গার ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে। ফোঁস ফোঁস দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—ওমা, তাই নাকি ? এণাক্ষী হিহি হাসছে,—কেন রে ইন্দ্রনীল, তোর এত কিসের দুঃখ ?

ভেতরে ভেতরে জ্বলে গেলেও বাইরে উদাসীন থাকার চেষ্টা করল বাপ্পা। নদীর ধারে বসে থাকার গল্পটা কেন যে বলতে গিয়েছিল শেখরকে ! কাউকে কি একটুও মনের কথা শোনানোর

উপায় নেই !

আজকাল এই এক নেশা হয়েছে বাপ্পার। বিকেল হলেই নদী কেমন টানতে থাকে তাকে। গঙ্গার ওপারে আকাশ বেয়ে তরতর নামতে থাকে সূর্য, নদীর পশ্চিম পাড় ছেয়ে যায় এক অলৌকিক আলোয়। লাল নয়, হলুদও নয়, ঠিক কী যে রঙ ! ওই বিভা মেখে দূরের কারখানার চিমনিগুলোও কেমন অপার্থিব তখন। ইটবালির কাঠামোরা যেন স্বর্ণরেণু মাখা। বাপ্পার বুক দুলতে থাকে। উজান স্রোতে ভেসে যায় খড়কুটো, কচুরিপানা। তিরতির কাঁপতে থাকে সোনার কুচির মতো ঢেউ। বাপ্পাও ভাসে তাদের সঙ্গে। স্রোত বেয়ে পাড়ি দেয় বহু দূর। অসমাপ্ত হুগলি সেতুর দুই ডানা বাপ্পার জন্য তোরণ তৈরি করে রেখেছে। সেই তোরণ পেরিয়ে, অজস্র জনপদ দুধারে ফেলে, ভাসমান লঞ্চ নৌকোদের কাটাতে কাটাতে বাপ্পা পৌঁছে যায় মোহনায়। বঙ্গোপসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। ভারত মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর, সেখান থেকে সুয়েজ, সুয়েজের সুড়ঙ্গ ভেদ করে ভূমধ্যসাগর, অতলান্তিক...। ধীরে সন্ধ্যা ঘনায়। আউটরাম ঘাটের খোলা জেটিতে গিয়ে তখন দাঁড়ায় বাপ্পা। নদী একটা আঁশটে গন্ধ ছড়ায়, আশ্চর্য এক বাষ্প ওঠে জল থেকে। বাষ্প, না নদীর নিশ্বাস ? বাপ্পার বুক জুড়িয়ে আসতে থাকে। নদীর নাব্যতা এখন কমে গেছে, বড় জাহাজ খুব একটা আসে না নদীতে। যা দু-একটা মাঝারি আসে, তন্ময় চোখে তাদেরই ফুটে ওঠা আলোগুলোকে দেখে বাপ্পা। গাঢ় নীল অন্ধকারে আলো ঝলমল জাহাজ কেমন অলীক মনে হয়। অদ্ভুত এক তৃপ্তি আর অতৃপ্তির ঘোরে বাপ্পা তলিয়ে যেতে থাকে। এক সময়ে ফেরে। নেশাচ্ছন্ন চোখে আবার এই শহর, সেই বাড়ি, সেই একঘেয়ে কিছু মুখ। বড় যন্ত্রণা হয় বাপ্পার।

এসব কথা বাপ্পার বন্ধুরা কী বুঝবে !

বাপ্পা ফ্যাকাসে মুখে হাসল,—গঙ্গার ধারে যারা যায়, সবাই কি দুঃখ সেলিব্রেট করতে যায় নাকি ? তোরা তো আইসক্রিমও খেতে যাস।

—একা একা তো যাই না ! তোর মতো।

—আমার ভিড় ভাল লাগে না।

—হ্যাঁ রে ইন্দ্রনীল, তুই কবি টবি হয়ে যাচ্ছিস না তো ! এণাক্ষী ভুরু কুঁচকে নিরীক্ষণ করল বাপ্পাকে,—তোকে অবশ্য অ্যাংরি পোয়েট খারাপ মানাবে না। কিন্তু তোকে তো তা হলে একটু দাড়ি রাখতে হবে। আর চুলটা...

—বাজে কথা রাখ তো ! যা দেখে আয় ওই ভ্যানতাড়া কখন শেষ হবে।

—এখন নো চান্স। দেখছিস না এবার সুরূপা উঠেছে ! এর পরও গোটা তিনেক আছে।

সুরূপা নামের মেয়েটি টুলে দাঁড়িয়ে চিলচিৎকার জুড়েছে। সরু গলায়। ইঁদুরকলে আটক কলেজ পড়ুয়ার দল যে যার নিজের নিজের আড্ডায় বিভোর। কলেজের চাতালে। সিঁড়িতে। করিডোরে। গেটের কাছেই শুধু যা জনাবিশেক ছেলেমেয়ের রাজনৈতিক জটলা। তাতেই মেয়েটি খুব উদ্দীপিত, ঝাঁঝ ছড়াচ্ছে পুরোদমে।

ভাবনা ফিসফিস করে বলল,—সুরূপাটা বড় বেশি অ্যাটাকিং লেকচার দিচ্ছে। যেভাবে নাম ধরে ধরে চোরফোর যা খুশি বলে যাচ্ছে...

শেখর বলল,—বলবেই তো। ফরেন থেকে আর্মস কিনতে গিয়ে কাটমানি খাবে, সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ফোলাবে...

—ফালতু বকিস না তো। প্রমাণ হয়েছে কিছু ? যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ কাউকে চোরজোচ্চোর বলাটা কী ধরনের লজিক ?

—বা রে, প্রমাণ না হলে চুরিটা বুঝি চুরি থাকে না ?

—অবশ্যই না। ধীমান গলা চড়াল,—যারা চোর চোর করে চেঁচাচ্ছে, তারাই বা কী এমন ধর্মপুত্তুর রে ? কলেজে অ্যাডমিশানের সময়ে ইউনিয়নের নাম করে যার কাছ থেকে যা পারল একশো টাকা দুশো টাকা খামচে নিল, সেই টাকাগুলো নিয়ে কী করেছে এরা ? পারবে এখন হিসেব

দিতে ?

—এই চুপ চুপ। করছিস কি ! এণাক্ষী চিমটি কাটল ধীমানকে, —চারদিকে ইউনিয়নের ছেলেমেয়ে ঘুরছে, কে কোথায় শুনবে...

—শুনুক গে। আই ডোন্ট কেয়ার। ওই সব দলবাজি নেতাবাজি জানা হয়ে গেছে আমার। যার পাঁচ পয়সার মুরোদ সে পাঁচ পয়সা চুরি করে, যার পাঁচ কোটির এলেম আছে সে পাঁচ কোটি মারে। এই নিয়ে এত শোর মাচানোর কি আছে ?

—শোর মাচাচ্ছে না, বল ভাট বকছে। ধীমানের কাঁধে হাত রাখল শেখর,—বেচারা মিনি লিডার হয়েছে, ওকে তো রুটিন লেকচার দিয়ে যেতেই হবে। তোর ভাল না লাগলে তুই ডায়েরিয়া হওয়া মুখ করে চুপচাপ বসে থাক।

—তাই তো আছি রে বাপ। কিন্তু আর কতক্ষণ ? একদিনও ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না, রোজ মিটিং, রোজ মিটিং ! প্রিন্সিপালও যখন-তখন ক্লাস ডিজলভ করে দিচ্ছেন... ! ভাল্লাগে ?

—বারে, সামনে ইলেকশান আসছে না ! মনে রাখিস ধীমান, তুই এখন একজন দায়িত্বশীল সিটিজেন। এবার প্রথম ভোট দিয়ে তোর ডেমোক্র্যাটিক রাইট এস্ট্যাবলিশ করবি। তোকে তো এখন বুকনি শুনতেই হবে। ডান, বাঁ, কম ডান, বেশি বাঁ, সব্বার।

—সে তো শুনছিই। রাস্তায় ঘাটে পাড়ায় পোস্টারে কোথায় শুনছি না ?

—কলেজেও শোন।

—শুনতে শুনতে কালা হয়ে যাব যে।

—কালা হতে পারলে তুই তো বেশ গুড সিটিজেন হয়ে গেলি। রিঅ্যাক্ট করার ঝামেলা অনেকটা কমে গেল। আমার বাবার এক মামা আছেন, ফ্রিডম ফাইটার। টেররিস্ট গ্রুপে ছিলেন। আন্দামানে জেলও খেটে এসেছেন। কিসব বিল্বপত্র তাম্রপত্র দিয়েছিল গভর্নমেন্ট, নেননি। সেই বুড়োদাদু কী বলেন জানিস ? বলেন গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য দরকার লাখ লাখ বোবা-কালা আর ঠুলিআঁটা সিটিজেন। তাদের একটা হাত শুধু সচল থাকলেই চলবে। ব্যালট পেপারে ছাপ মারার জন্য। আর ছাপ মারাটা হল এমনই এক ম্যাজিক, ওই ছাপের জোরে যে গদিতে বসবে, সেই মাল ঠিইক ছাঁচে পড়ে যাবে। পয়সা খাবে, চুরি করবে, গুণ্ডা পুষবে, ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে যাবে...। কথায় আছে না, যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ ! দাদু বলেন ডেমোক্র্যাসিতে নেতারা শুধু রাবণ নয়, কুম্ভকর্ণও বটে। কুম্ভকর্ণ ছ মাসে একদিন জাগত, এরা জাগে পাঁচ বছরে একবার। মাঝের সময়ে তুই ওদের কান ধরে টান, খিমচো, সুড়সুড়ি দে, কানের পাশে স্যাক্সোফোন বাজা, বডিতে গজাল ঠোক, নো হিলদোল।

—অ্যাই, তোর দাদুয়ালি গান থামা তো। নয়তো বল তোকেও একটা টুল দিই। সুরূপার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে যা।

—দিবি টুল ? না থাক। বেচারা লাইনে সবে শাইন করছে, আমি টুলে উঠলে ওর ভাত মারা যাবে।

শেখর আড়মোড়া ভাঙল, —কী রে ইন্দ্রনীল, তুই ব্যোম মেরে দাঁড়িয়ে আছিস যে ? কমেন্ট দে।

মন ভাল না থাকলে কোনও কচকচানিই ভাল লাগে না। দাঁত কিড়মিড় করে বাপ্পা বলল, —সব্বাইকে গুলি করে মারা উচিত। আমার হাতে যদি একটা মেশিনগান থাকত !

—কাকে আগে মারতিস ?

বাপ্পা হোঁচট খেল সামান্য। যেন বা একটু ধাঁধায় পড়ে গেল। প্রথম গুলিটা কার প্রাপ্য ? ওই টুলের সুরূপার ? নাকি এই মুহূর্তের অসহ্য বন্ধুবান্ধবদের ? না চোখের সামনে বিষের মতো ঘুরতে থাকা শহরজোড়া পিলপিল গড্ডালিকার ? উঁহু, চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। ওই নিশ্চিহ্ন করার কাজটাও বাড়ি থেকেই শুরু হওয়া উচিত। আচ্ছা, সবার আগে ডক্টর শুভাশিস সেনগুপ্তাকে হঠালে

কেমন হয় ? হাসি হাসি মুখ, তেলতেলে কথা, চুকচুকে চেহারার লোকটা মেশিনগানের গুলিতে ছেতরে পড়ে আছে... ! নট আ ব্যাড সাইট। নাকি আগে আদিত্যবাবুকে সাফ করবে ?

—কী রে, ভেবে পাচ্ছিস না তো ? ধীমান খোঁচাল বাপ্পাকে।

এণাক্ষী বলে উঠল,— আমি বলছি। আমি বলছি। ইন্দ্রনীল প্রথম গুলি করবে সেদিনের সেই সিনেমা হলের ছেলেটাকে।

—সত্যি কিছু রাগ আছে বটে ইন্দ্রনীলের। ভাবনা হাসছে মুখ টিপে,— এমন একটা কাণ্ড বাধাল !

ঘটনাটা গত সপ্তাহের। বন্ধুরা দল বেঁধে সিনেমায় গিয়েছিল, বাপ্পা দাঁড়িয়ে ছিল টিকিটের লাইনে। হঠাৎই একটা চালিয়াত ধরনের ছেলে বেলাইনে এসে কাউন্টারে হাত গলিয়ে দিল। ব্যস, বাপ্পাও সঙ্গে সঙ্গে কলার টেনে ধরেছে ছেলেটার। দেখতে দেখতে খণ্ডযুদ্ধ শুরু। বন্ধুরা বাপ্পাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার পরও সে যে কী সিন ! বাপ্পা মাটিতে পা ঠুকছে, ছেলেটাও তড়পাচ্ছে রাগে। দুজনেরই গলা থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে গরগর। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দমের অভাবে ছেলেটাই নিবে যায়।

ধীমান বোধহয় সেই রণক্ষেত্রেরই বিশেষ কোনও খণ্ডদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এণাক্ষীকে, হাসিতে কুটিপাটি হচ্ছে এণাক্ষী,— যাই বল, ইন্দ্রনীলের অ্যারোগেন্ট চেহারাটা কিন্তু ভীষণ কিউট। ওকে সেদিন একদম মেল গিবসনের মতো লাগছিল না ?

—ধ্যাত। মেল গিবসনের হাইট জানিস ? ভাবনা প্রতিবাদ করল,— গিবসন সিক্স ফিট প্লাস। চেহারাও কত রোবাস্ট !

—তবু কোথায় যেন একটা মিল আছে। এণাক্ষী ঠেলা দিল বাপ্পাকে,— কী রে ইন্দ্রনীল, যাবি নাকি একটা গিবসনের ফিল্ম দেখতে ? নিউ এম্পায়ারে ?

বাপ্পা গম্ভীর,— না, বললাম তো আমার কাজ আছে।

—কী ছাতার মাথা কাজ ?

—আছে।

—বাড়ির কাজ ?

—এত জেরা করছিস কেন বল তো ? বাপ্পা বেশ রুক্ষ এবার,— বলছি তো আমি সিনেমায় যাব না। আমার নিজের কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই ? সব সময়ে তোদের সঙ্গে ল্যাঙল্যাঙ করে ঘুরতে হবে ?

ধীমান শান্ত করার চেষ্টা করল বাপ্পাকে,— চটছিস কেন ? গেলে পারতিস। তুই তো অ্যাকশান ফিল্ম ভালবাসিস।

—সত্যিই ভাল লাগছে না রে। আমার একটা জরুরি কাজও আছে। বিলিভ মি।

বাপ্পার আকস্মিক রূঢ়তায় এণাক্ষীর মুখ থমথমে হয়ে গেছে। চিমটি কাটার মতো করে বলল,— ওকে ছেড়ে দে ধীমান। বিষ্ণুপ্রিয়া নেই তো, ও যাবে না। হ্যাঁ রে ইন্দ্রনীল, বিষ্ণুপ্রিয়া আজ ডুব মেরেছে কেন ?

—আমি কী জানি ? বাপ্পা হেসে ফেলল। বিষ্ণুপ্রিয়া এণাক্ষীকে দেখায়, এণাক্ষী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ! হাসিটা মুখে রেখেই বলল,— বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে আমার কী ?

—বেশ। কিছু যে নেই সেটা প্রমাণ করার জন্যই আজ চল।

শেখর চোখ টিপল,— অ্যাকশন ফিল্ম না যাস, রোমান্টিক চল। গ্লোবে। দারুণ ভিড় হচ্ছে।

—সে তো কাঁড়ি কাঁড়ি বেডসিনের জন্য।

এণাক্ষী ঠোঁট উল্টোল, —হট ফিল্ম দেখতে তোদের খুব মজা লাগে, না ?

—হুঁহ, তোদের যেন লাগে না ! স্ট্যালোনের বই দেখতে ছুটিস কেন ? শেখর বাপ্পার দিকে ঘুরল,— কী রে, যাবি ?

বাপ্পা উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। যাবে না যখন ঠিক করেছে তখন যাবেই না। ফালতু বকবক করে মাথা আরও গরম করার কোনও মানেই হয় না।

সুরূপা টুল থেকে নামার পর আবার একটি ছেলে উঠেছে। এ কলেজের নয়, অন্য কলেজের। বয়সটা একটু বেশি, ইউনিভার্সিটিরও হতে পারে। চিবিয়ে চিবিয়ে বেশ বক্তৃতা দিচ্ছিল, হঠাৎ বেশি আবেগ মেশাতে গিয়ে খকখক কাশতে শুরু করেছে ছেলেটা। এক অনুগামী দৌড়ে গিয়ে জলের গ্লাস ধরল তার মুখে। দুঢোক খেয়ে চলকানো আবেগ সামলাল ছেলেটা। নতুন উদ্যমে শুরু করেছে ভাষণ।

বাপ্পাকে ভুলে গিয়ে বন্ধুরাও নতুন করে মশগুল আড্ডায়। শেখরের এক বন্ধু গ্লোবে ছবিটা দেখেছে, তার কাছ থেকে শোনা গল্প তারিয়ে তারিয়ে পরিবেশন করছে শেখর। বাপ্পার মতো কাটখোট্টা নয় শেখর, বেশ রসালো করে গল্প বলতে পারে। শুনতে শুনতে এণাক্ষী ভাবনারা হাসছে হিহি। টীকা-টিপ্পনীও চলছে নানারকম। চারদিকে এখন মুক্ত দুনিয়ার রব। মেয়েরাও এখন আর ছেলেদের সঙ্গে গরম ছবি নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পায় না। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে তো নয়ই।

আচমকাই বাপ্পার নজর গেল করিডোরের দিকে। ক্লাসেরই আরও দু-তিনজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে আসছে অনীক। বাপ্পা হাত তুলে ডাকার চেষ্টা করল অনীককে। যেন দেখতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে অনীক মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অনীকটা যেন কেমন হয়ে গেছে! ইদানীং ভাল করে কথাই বলতে চায় না বাপ্পার সঙ্গে। যেন বাপ্পা ইন্টারভিউ পেল, অনীক পেল না, এর পিছনে বাপ্পারই কিছু কারসাজি ছিল।

এই তো সব বন্ধু!

মিটিং ভাঙার পর বাপ্পা দ্রুত কলেজ থেকে বেরিয়ে এল। বন্ধুরা আর হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করার আগেই।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভাসছে। সাদা মেঘ, নীল আকাশের চালচিত্রে প্রায় বকের পাখার মতো ধবধবে সাদা। ওই মেঘ বলে দেয় আকাশের আর কান্না নেই। পুজো এসে গেল।

বাপ্পা একটা ট্রামে উঠে পড়ল। আজ আর পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে লাভ নেই, পৌনে তিনটে বাজে, ওই অফিসে যে লোকটার সঙ্গে একটু মুখচেনা হয়েছে বাপ্পার, তাকে তিনটের পর কোনওদিনই অফিসে পাওয়া যায় না। তার চেয়ে বরং কাল-পরশু যাবে। আজ একবার জাহাজ কোম্পানির এখানকার অফিসটা থেকে ঘুরে আসা যাক। যদি কোনও নতুন খবর দিতে পারে ওরা।

জাহাজ কোম্পানির অফিস বলতে মূল কার্গো কোম্পানির বম্বেতে যে এজেন্ট আছে, তাদেরই একটা আঞ্চলিক পোস্টাল অফিস। ছোট্ট। নেতাজি সুভাষ রোডের এক পুরনো বিল্ডিং-এর চারতলায় পার্টিশান ঘেরা ফালি ঘর। দু-তিনটে মাত্র স্টাফ, একটাই পিওন। প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে এখানেই প্রথম এসেছিল বাপ্পা আর অনীক। তারপরও বেশ কয়েকবার এসে এসে এখানকার সকলের সঙ্গেই মোটামুটি ভাবসাব হয়ে গেছে।

এখানে এসেই বাপ্পা সুসংবাদ পেল। এই অফিসের মিস্টার পাতিল গত সপ্তাহে অফিসের কাজে বম্বে গিয়েছিলেন, তিনিই দিলেন খবরটা। লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে, ইন্দ্রনীল রায়ের নাম আছে লিস্টে, ট্রেনিং ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আরম্ভ হবে, অক্টোবর নভেম্বরের যে কোনও সময়ে চিঠি পেয়ে যাবে বাপ্পা।

হঠাৎই কুৎসিত বিষণ্ণ এক দিন সুন্দর হয়ে গেল বাপ্পার চোখে। অফিসপাড়ার বিজবিজে ভিড় আর তেমন অসহ্য লাগছে না। চড়া রোদ্দুরও যেন গায়ে ঠেকছে না আর। জি পি ও-র সামনে একটা অন্ধ লোক বাস ধরার জন্য অসহায়ভাবে ঘুরছিল, বাপ্পা হাত ধরে বাসে তুলে দিল তাকে। ভিড়ে হাঁটতে গিয়ে দু-তিনবার ধাক্কা খেয়েও বাপ্পা কটমট করে তাকাল না।

স্ট্র্যান্ড রোড ধরে কিছুটা হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল বাপ্পা। গঙ্গার নির্জনতা আজ আর তাকে যেন

তেমন টানছে না। কারুর কাছে একটা যেতে ইচ্ছে করছে। বুকের মধ্যে রাগ বিরক্তি দুঃখ জমাট বেঁধে গেলে মানুষ তা একা একা বয়ে বেড়াতে পারে, কিন্তু খুশির চাপ বড় অসহ্য। খুশিটাকে কারুর কাছে উজাড় করে না দিতে পারা পর্যন্ত কেমন যেন শান্তি হয় না।

কাকে গিয়ে শোনানো যায় খবরটা!

বিষ্ণুপ্রিয়ার মা দরজা খুলেছে। বাপ্পাকে দেখে এক গাল হেসে বলল,— তুমি যে আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ ইন্দ্রনীল! এত কাছে থাকো, অথচ একটি বারও আসো না...

বাপ্পা লাজুক হাসল,— এই তো এলাম। আপনি আজ অফিস যাননি মাসিমা?

—আজ একটু পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। পিয়া আর আমি।

—ও। তাই আজ বিষ্ণুপ্রিয়া কলেজ যায়নি! বাপ্পা এদিক-ওদিক তাকাল,— কখন ফিরলেন? এক্ষুনি?

—এই আধ ঘণ্টা হল এসেছি। যাও না, পিয়া ঘরেই আছে।

নিজের ঘরে টান টান শুয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া। হাত দুটো ছড়ানো। চোখ বুজে টেপ শুনছে। গুলাম আলির গজল। বাপ্পা ঘরে ঢোকার পরও চোখ খোলেনি।

বাপ্পার একটু একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরোয়া স্কার্ট টিশার্ট পরে শুয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া, স্কার্টটা উঠে গেছে হাঁটুর সামান্য ওপরে। বাদামি জংঘার অনেকটাই অনাবৃত। আঁটো টিশার্টের নীচে ছোট্ট দুটি স্তনও বড় বেশি প্রকট।

বাপ্পা নিজেকে ধমকাল। গলায় কি যেন আটকে গেছে, সেটাকে ঝাড়ল শব্দ করে।

চমকে চোখ খুলে উঠে বসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া,— কী রে, তুই!

বাপ্পা স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল,— পুজোর ড্রেস কিনে খুব ফুর্তি! কলেজ কেটে এখন শুয়ে শুয়ে গজল শোনা হচ্ছে!

—লাইনগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করছিলাম। বিষ্ণুপ্রিয়া চশমার ব্রিজ সেট করল নাকে। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় হাঁটুর নীচে টেনে দিল স্কার্ট— বুধবার বুধবার ফার্স্ট চ্যানেলে গানের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে দেখেছিস? রোজ একটা করে গজলের ওপর প্রশ্ন থাকে।

—তাই বল। ভেতরের খুশিটাকে কীভাবে প্রকাশ করবে ভেবে পাচ্ছিল না বাপ্পা। সত্যি বলতে কি বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে হঠাৎ এভাবে চলে আসার জন্য এখন কেমন যেন লজ্জাও লাগছে। বিষ্ণুপ্রিয়াকেই খবরটা প্রথম দিতে এল কেন? প্রথম কি মাকেই খবরটা দেওয়া উচিত ছিল না?

বাপ্পা খানিকটা বাধো বাধো গলায় বলল,— জানিস, একটা ভাল নিউজ আছে।

—কী রে?

—আমি তো বোধ হয় চললাম। ট্রেনিং স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বর থেকে।

—ওমা, তাই! এ তো গ্র্যান্ড নিউজ! বিষ্ণুপ্রিয়া লাফিয়ে উঠল, —তুই খালি হাতে এসেছিস কেন?

—কী খাবি বল? চল, এক্ষুনি দুটো রোল খাইয়ে দিচ্ছি।

—ইশ, শুধু রোল! তুই কী কিপটে রে! একদিন পার্ক স্ট্রিটে পার্টি দে। বলেই বিষ্ণুপ্রিয়া চেঁচাতে শুরু করেছে,— মা, ও মা...

বিষ্ণুপ্রিয়ার মা প্রায় তৎক্ষণাৎই ঘরে হাজির। হাতে প্লেটে করে বাপ্পার জন্য গরম প্যাটিস আর লাড্ডু। খবর শুনে সেও উচ্ছ্বসিত,— বাহ, খুব ভাল খবর। তা ক মাসের ট্রেনিং?

—তিন মাস। ম্যাড্রাসে।

—তারপর কী পোস্টে দেবে?

—আপাতত ডেক ক্যাডেট। তারপর যেমন যেমন প্রোমোশন হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ নাচাল,— প্রোমোশন হয়ে হয়ে ক্যাপ্টেন হওয়া যায়?

—শুনেছি তো হওয়া যায়।

—উফ, কী দারুণ। আমি ভাবতেই পারছি না আমার এক বন্ধু ক্যাপ্টেন হয়ে জাহাজ চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক দেশ ঘুরবি, না রে?

—হ্যাঁ। জাহাজ যেখানে যেখানে কার্গো নিয়ে যাবে...

বিষ্ণুপ্রিয়ার মা খাটে গিয়ে বসেছে,— তোমাদের শিপিং কোম্পানিটা কি ইন্ডিয়ান?

—না, না, ইন্টারন্যাশনাল। হেড অফিস সিঙ্গাপুরে। অনেক দেশে ওদের অফিস আছে। এশিয়ায়, ইউরোপে, আমেরিকায়। কনসাইনমেন্ট নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছে দেওয়াটাই মেন কাজ।

—নিশ্চয়ই পয়সাকড়িও ভাল দেয়?

—তা দেয়। বাপ্পা ঘাড় নাড়ল,— জব অ্যাসাইন্ড হলে প্রথম দিকে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে হাজার পনেরো তো দেবেই। এর সঙ্গে জাহাজে থাকা-খাওয়া, রিফ্রেশমেন্ট, এসব তো আছেই।

—খুব ভাল। খুউব ভাল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মা উচ্ছ্বসিত। বিষ্ণুপ্রিয়া তার থেকেও বেশি। লাফাচ্ছে। অজস্র খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে চলেছে দুজনে, বাপ্পাও সাধ্যমতো উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার এক পিসতুতো দাদা উনিশ বছর বয়সে এয়ারফোর্সে চলে গিয়েছিল, তাকে নিয়েও গল্প হল খানিকক্ষণ।

সন্ধের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি থেকে বেরোল বাপ্পা। বুকটা এখন অনেক ফাঁকা। ফুরফুরে। তবু যেন কোথায় একটা পিঁপড়ে কামড় বসাচ্ছে কুটুস কুটুস। বাপ্পা চলে গেলে কোথাও কি একটুও শূন্যতা তৈরি হবে না?

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে একটু কি মন খারাপও হতে পারত না বিষ্ণুপ্রিয়ার!

২৬

হুড়মুড়িয়ে পুজো এসে গেল।

মহালয়ার পর থেকে উড়ো মেঘে বৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে মাঝে। ব্যাপারি পশারিদের মাথায় হাত, পুজোর বাজার একটু জমলেই বৃষ্টি ধেয়ে আসে। চতুর্থীর দিন থেকে আকাশ সাফ হয়েছে, গরম ভাবও কমে গেছে অনেকটা।

অষ্টমীর দিন সকালে তিতিরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কন্দর্প। প্রতিবারের মতো উত্তর কলকাতার ঠাকুর দেখবে, কেষ্টপুরে জয়শ্রীর বাড়ি যাবে, মানিকতলায় তিতিরের মামার বাড়িতেও ঘুরে আসবে একবার। এবার সঙ্গে আরও একটা কাজ আছে কন্দর্পর, সেটাও সারবে।

কেষ্টপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে দশটা বেজে গেল। শংকর বাড়ি নেই, কোন এক পাম্প মালিকের বাড়ির দুর্গাপুজোতে গেছে, সন্ধেয় ফিরবে।

কন্দর্প মনে মনে একটু খুশিই হল। শংকর থাকলে এমন বকবক শুরু করে! গল্প মানে শুধুই আত্মপ্রচার। কাকে কী ভাবে ঠকিয়েছে, অফিসের কোন লোককে কী ভাবে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে, গভর্নমেন্টের কোন অফিসারকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছে, এই সব বারফাট্টাই। নিজেকে অবিরাম বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন করতে চায় যে লোক, তার সঙ্গ কি বেশিক্ষণ ভাল লাগে? মুস্তাফি কি কম ধূর্ত, তা বলে কি তার সব সময়ে এরকম হামবড়া ভাব আছে?

শংকর নয়, আজ কন্দর্প ঝান্টুর হাতে ধরা পড়ে গেল। ছোটমামাকে পেয়েই তার সমস্যার ঝাঁপি খুলে বসেছে ঝান্টু। ক্লাব তাকে এখন সাইড-লাইনে বসিয়ে রেখেছে! দু-পাঁচ হাজার টাকা ঠেকাবে বলেছিল, এখনও উচ্চবাচ্য করছে না! হাঁটুতে জোর চোট লেগেছে একটা, মালাইচাকি হঠাৎ হঠাৎ ঘুরে যায়, সারবে কি চোটটা! এরিয়ানের এক কর্মকর্তা তাদের ক্লাবে খেলার জন্য একসময়ে টোপ দিয়েছিল, এখন সে ঝান্টুকে একদম পাত্তা দিতে চায় না! ক্লাব ক্যান্টিনে প্র্যাকটিসের পর রোজ

তাকে বুড়ি মুরগির স্টু দেওয়া হয়! রোজ রোজ বুড়ি মুরগি খেলে ঝান্টুর কি অকালবার্ধক্য এসে যাবে না!

কন্দর্পর কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। ঝান্টুর কথায় এক ধরনের শিশুসুলভ সারল্য আছে বটে, কিন্তু এত নির্বুদ্ধিতা হজম করা কঠিন। কন্দর্প ঠাট্টার সুরে বলল,— তোর জীবনে দেখছি বেদনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তা হ্যাঁ রে, অষ্টমীর দিন সকালে বাড়িতে বসে বসে শুধুই সানাই বাজিয়ে যাবি? একটু প্যান্ডেলে গিয়ে বোস না। এখন কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে আসছে অঞ্জলি দিতে।

তিতির অনাবিল হাসছিল। সেদিকে চোখ পড়তে ঝান্টু লাল, —বাবা প্যান্ডেলে বেশি যেতে বারণ করেছে।

—আশ্চর্য! কেন রে?

—বাবা এবার পুজোর ভাইস প্রেসিডেন্ট তো। আমি সব সময়ে প্যান্ডেলে থাকলে বাবার প্রেস্টিজে লাগবে।

—আইব্বাস! শংকরদা ভাইস প্রেসিডেন্ট! জয়শ্রীর দিকে ঘুরল কন্দর্প,— কত খসল?

—সে ওই জানে ও কত দিয়েছে। জয়শ্রী গর্বিত মুখে উত্তরটা এড়িয়ে গেল। আলতো ধমক দিল ঝান্টুকে,— তোর কি ফুটবল ছাড়া পৃথিবীতে আর কথা নেই? অন্য গল্প কর।

তিতির বলল,— না গো পিসি, ঝান্টুদার মুখে ফুটবলের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। তুই বল রে ঝান্টুদা।

কন্দর্প উঠে দাঁড়াল,—তুই তা হলে শোন বসে বসে। আমি একটা চক্কর মেরে আসি।

অষ্টমীর সকাল বেশ রমরম করছে। পাশেই প্যান্ডেল, জোর গান বাজছে মাইকে। পুরনো দিনের আধুনিক গান। হঠাৎ হঠাৎ হেমন্ত-মান্নাকে রুখে দিয়ে পাড়ার অধিবাসীদের অষ্টমী পুজোর অঞ্জলি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে একটি ছেলে। গলা তার আবেগে থরথর, কিন্তু উচ্চারণটি বড় বদখত। বড্ড বেশি দন্ত-স-এর আধিক্য কানে লাগছিল কন্দর্পর।

ইদানীং এদিকটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছর আগেও জয়শ্রীরা যখন এখানে বাড়ি করে, তখনও অনেক ফাঁকা ফাঁকা ছিল। এখন চারদিকে অজস্র নতুন নতুন বাড়ি। চারতলা পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়িও উঠেছে প্রচুর। দেখে বোঝাই যায় না বিশ-পঁচিশ বছর আগে এসব অঞ্চলে দিনদুপুরে শেয়াল ডাকত।

কন্দর্প বারান্দায় বেরিয়ে পাড়াটা দেখছিল। জয়শ্রী পাশে এসে বলল,— যাবি কোথায় এখন?

—কাছেই। বাগুইআটিতে।

—বন্ধুর বাড়ি?

কন্দর্প আলতো ঘাড় নাড়ল, —হুম।

— ফিলম লাইনের বন্ধু?

—কেন, ফিলম লাইন ছাড়া আমার বন্ধু থাকতে নেই? কন্দর্প হেসে ফেলল, —প্রফেশনের লোকরা বন্ধু হয় না।

জয়শ্রী বলল— ফিরছিস কখন? দুপুরে খেয়ে যাবি তো? আমি অঞ্জলিটা দিয়ে এসে রান্না বসাচ্ছি।

—দুর, তোদের তো আজ নিরিমিষ। কন্দর্প নাক কুঁচকোল,— বচ্ছরকার দিনে নিরামিষ খাওয়া আমার পোষায় না।

—একদিন নয় গরিব দিদির বাড়ি নিরামিষই খেলি।

গরিবই বটে। কন্দর্প মনে মনে হাসল। বারোশো স্কোয়ার ফিটের বাড়ি বানিয়েছে, মেঝেতে মোজাইক পিছলোচ্ছে, দুটো ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, কালার টিভি, ভি সি আর, গাড়ি কিনে রাস্তায় চরাচ্ছে, এখন বোধ হয় নিজেকে গরিব বলতে আরামই পায় দিদি। বিয়ের পর পর যখন মনোহরপুকুরের আধা বস্তিতে থাকত, নুন আনতে পান্তা ফুরোত, তখন কিন্তু দিদি মুখ ফুটে নিজেকে

গরিব বলতে পারত না। দারিদ্র্য তখন সর্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরোত কিনা ! এখন শংকরদা টাকার মুখ দেখেছে, এখন নিজেকে গরিব বলে দিদি যদি সুখ প্যায় তো ভাল কথা। কিন্তু রুচিটা এরকম হয়ে গেল কেন ? বাড়ি করেছে পয়সা খরচ করে, কিন্তু কোনও ছিরিছাঁদ নেই। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মতো পর পর ঘর, অলিগলি প্যাসেজ, প্রতিটি ঘরে বিসদৃশ কিছু লফট, জানলার মাথায় মোটা মোটা সিমেন্টের লতাপাতা ! রঙগুলোও অসহ্য। বসার ঘরের দেওয়াল ক্যাটকেটে সবুজ, বাকি দুটো ঘর গাঢ় গোলাপি। দরজা জানলা গ্রিল সবই বিশ্রী ধরনের হলুদ। ভাগ্যিস ছাদ থেকে একটা মাধবীলতা ঝুলিয়েছে গ্রিলে, নাহলে বাইরে থেকে বারান্দাটার দিকে তাকানো যেত না।

বাড়ি তো বাইরের জিনিস, দিদির দিকেই কি আর তাকানো যায় ! রায়বাড়ির সেই ছিপছিপে মেয়ে এখন কী নিটোল পৃথুলা রমণী ! ভাবা যায় ওই মহিলা বউদির চেয়েও ছোট !

কন্দর্প হেলমেট হাতে নিল। সানগ্লাস চড়াল চোখে। একটু ঝুঁকে বলল, —তা গরিব দিদির আজ মেনু কী ?

—খিচুড়ি, গাওয়া ঘি, তিন রকমের ভাজা, চচ্চড়ি, খেজুরের চাটনি, মিষ্টি। তোর শংকরদা কাল বড়বাজার থেকে খুব ভাল মিষ্টি নিয়ে এসেছে। কী স্বাদ ! মুখে দিলেই গলে যায়।

কন্দর্প ভুরু নাচাল,— কোনও পেট্রল পাম্পঅলার থেকে বাগিয়ে এনেছে বুঝি ?

—না রে, কিনে এনেছে।

কন্দর্প বিশ্বাস করল না। শংকরদা যা চিজ, নিজের পয়সায় বড়বাজার থেকে মিষ্টি কিনবে ! আত্মীয়-স্বজন কে না জানে পাম্পে পাম্পে কিসব কারসাজি করে বেড়ায় শংকরদা। পাম্পঅলাদের তেল-ফেল চুরি করতে সাহায্য করে বোধ হয়। তার থেকেই নাকি শংকরদার এত রমরমা। ঠাটবাট দেখে যে কেউ ভাববে শংকরদা বুঝি অয়েল কোম্পানির কোনও ঘ্যামা অফিসার। আসলে যে মিস্ত্রি তা কে বলবে !

কন্দর্প গাল ছড়িয়ে হাসল,— বলছিস পয়সা দিয়ে কিনেছে ? ঝাড়া মাল নয় ?

—না রে বাবা না। তোদের আবার বেশি বেশি। বছরে একদিনও কি কিছু কেনে না ? জয়শ্রী আহত হয়েছে,— তোরা তোদের শংকরদার বাইরেটাই দেখলি, ভেতরটা দেখলি না।

—আহা চটিস কেন ? আমি তো ঠাট্টা করছি। তুই আজকাল মজাও বুঝিস না।

—তুই ঠাট্টা করছিস, সবাই করে না। তোদের সঙ্গে দাদার ঝামেলা হল, সকলে ধরে নিল তোর শংকরদাই বুঝি দাদাকে নাচিয়েছে। বাবা তো সেদিন আমার কথা কিছু বুঝতেই চাইল না। ভাবল, জামাই বুঝি বাড়ির জন্য ছোঁক ছোঁক করছে।

—আহ, বাবার কথা থাক না। নিধিরাম কি কোনও কথা সোজাভাবে নেয় ? তার কথা সব ধরতে গেলে অ্যাদ্দিনে আমাদের পুরো বাড়ি পাগল্যাগারদে ঢুকে যেত।

—সে তোরা বোঝ। জয়শ্রীর ঠোঁট ফুলছে,— আমার কিন্তু খুব মনে লেগেছে। কী খারাপ কথা আমি বলেছিলাম বাবাকে ? শুধু বলেছিলাম, তুমি কবে আছ কবে নেই, তুমি যাওয়ার আগে ছেলেদের একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাও। ফ্ল্যাটবাড়ি তুলে ভাইয়ে ভাইয়ে যদি আলাদা হতে চায় হোক, তুমি কেন আপত্তি করছ ? এতে আমার কি স্বার্থ ছিল রে ? শুনে রাখ চাঁদু, তোর শংকরদা যেমনই হোক নিজের পায়ে দাঁড়ানো মানুষ। সে ও বাড়ির ইট পর্যন্ত ছুঁতে চায় না। আমরা কি ভিখিরি ?

মেয়েরা যে কোন কথা থেকে কোথায় চলে যায় ! অশোক মুস্তাফির সঙ্গে সঙ্গত করার থেকেও এদের তালে তাল মেলানো অনেক বেশি কঠিন। যে লাইনেই কথা শুরু করো, ঠিক গরুর রচনায় ঢুকে যাবে।

কন্দর্প কাঁচুমাচু মুখে বলল,— মাইরি দিদি, অষ্টমীর সকালটা এমন গুলিয়ে দিস না।

—হ্যাঁ, তোদেরই পুজো আছে, আমার পুজো নেই ! বাবাকে পরশু পুজোর জামাকাপড় দিতে গেলাম, বাবা হাসিমুখে কথা পর্যন্ত বলল না। ভাল করে ভেবে দ্যাখ তো, আমি বাপের বাড়ির থেকে

কী পেয়েছি ? আমাকে যদি ঘটাপটা করে বিয়ে দিতে হত, কত খরচা হত বাবার ? মা'র চল্লিশ ভরি সোনা ছিল, ক'ভরি মেয়ের কপালে জুটেছে ? সাকুল্যে পাঁচ-ছ ভরিও না। বাবারই খালি অভিমান থাকবে, আমার থাকতে পারে না ?

কন্দর্প আবার ঘড়ি দেখল। এ তো মহা গেরো হল ! যে জন্য তেল পুড়িয়ে এত দূর আসা, সেটাই কি মাটি হবে নাকি ?

জয়শ্রী ফোঁচ করে নাক টানল,— আমার কথা শোনার তোর সময় নেই, না রে ?

কন্দর্প হতাশ,— বল না বাবা। কান তো পেতেই রেখেছি।

—কী আর বলব। বাবা নয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু বউদি ? তারও তো আমি চক্ষুশূল।

—যাহ, তুই আবার সবই বাড়াস।

—কিচ্ছু বাড়াই না। আমার সঙ্গে বউদির আজকাল ব্যবহারটা দেখেছিস ? ছাড়া ছাড়া। যখন আমাদের হা-ঘরে দশা ছিল, তখন খুব দয়া দেখিয়ে নাম কিনত। এখন ভগবান আমাদের দিকে একটু মুখ তুলে চেয়েছেন, ওমনি গায়ে জ্বালা ধরছে। মেজবউদির কথা তো আমি ধরিই না। সে অনেক পরে সংসারে এসেছে। তা ছাড়া তার বাপের বাড়ি বড়লোক, তার অনেক দেমাক। কিন্তু মেজদার ছেলেটা কি আমার কেউ নয় ? তাকে কখনও ভুলেও নিয়ে আসে আমার বাড়িতে ? এই যে তুই আজ তিতিরকে নিয়ে এলি, অ্যাটমকেও কি তোর সঙ্গে একটু পাঠাতে পারত না ?

—অ্যাটম এখন বাড়িতে কোথায় ! সে পুজোতে তো মামার বাড়ি গেছে।

—জানি, জানি, সব জানি। এমনি যেন কত আসে। মেজদা তো ভুলেই গেছে, মেজদার একটা বোন আছে। জয়শ্রী মাথা দোলাল,— সব তোলা থাকছে। সব সুদে আসলে পুষিয়ে দেব।

কন্দর্প শব্দ করে হেসে উঠল,— তুই এক কাজ কর দিদি। তুই তো আজ ফ্যামিলির কাউকেই ছাড়বি না, তুই বরং সবার ওপর যা যা ক্ষোভ রাগ দুঃখ আছে সব একটা কাগজে লিখে রাখ। আমি আজ ও বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রেস করে দেব। নামটা কী দেওয়া যায় বল তো ? অভাগিনীর মর্মবেদনা ?

জয়শ্রী দু-এক মুহূর্ত ভাইয়ের দিকে ছলছল তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল,— তুই হলি গিয়ে সব থেকে বজ্জাত। তুইও তলে তলে কিছু কম যাস না। ভান করিস যেন কিছুতে নেই, ওদিকে আবার...

—সাকসেসফুল আর কই হই রে দিদি ? চোট খেয়ে যাই। কন্দর্প বাইরে বেরিয়ে স্কুটারে স্টার্ট দিল,— খিচুড়িটা জম্পেশ করে বানা। ওতে আবার চোখের জলটল ফেলিস না। তার আগে তোর অঞ্জলিটা দিয়ে আয়, মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আজ রোদ বেশ জেল্লা মেরেছে। দারুণ ড্রেস দিয়েছে শহরটাও। পুজোর ক'দিন কলকাতা যেন একেবারে পটের বিবিটি হয়ে যায়। সকালেও রাস্তায় লোকজনের কমতি নেই। ছেলে বুড়ো সবারই প্রায় নতুন সাজ। আর মেয়েরা, তারা তো এখন অপ্সরী।

ভি আই পি রোডের বিশাল চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল কন্দর্প। এ রাস্তায় গাড়িঘোড়া বড্ড জোরে চলে। কন্দর্প চলেছে ধার ঘেঁষে। টুক টুক করে। দিদির কথাগুলো ভাববে না ভাববে না করেও কন্দর্প ঠিক তাড়াতে পারছিল না মন থেকে। শংকরদা বাড়ির ইট ছুঁতে চায় না। কে বলছে ? দিদি ! কত কি শোনা বাকি এখনও ! এমনিতে দিদিটা হ্যালহেলে ঝ্যালঝেলে। হাউহাউ করে কথা বলছে, সব সময়ে শো করার চেষ্টা করছে নিজেদের, ধ্যাবড়া সিঁদুর পরে পতিপুত্রের মঙ্গল কামনায় বছরে আটচল্লিশটা উপোস করছে, নিয়মিত সিনেমা দেখে রুমাল ভেজাচ্ছে ডজন ডজন, কিন্তু আসল ব্যাপারে ঠিক সেয়ানা। কেমন কায়দা করে কি পায়নি তার হিসেব দেখিয়ে দিল। নিধিরাম সটকালে নির্ঘাত নিজের ভাগের জন্য হামলা করবে। আরে বাবা, শংকর বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে যখন চম্পট দিয়েছিলি, তখন এসব মুদিখানার হিসেব মাথায় ছিল না ? নাহ, শংকরদার ট্রেনিং ভাল। দুজনে একটা নিখুঁত ইউনিট হয়ে গেছে। হেভি প্রেম দুজনের।

কবেই বা ছিল না ? পুরনো একটা ছবি মনে পড়ে গেল কন্দর্পর। বাবা মেয়েকে একা বেরোতে দেয় না, চাঁদুকে নিয়ে লেকে এসেছে জয়ি। লেকের পাড়ে অপেক্ষা করছে শংকরদা। ইঞ্জিনের মতো সিগারেটের ধোঁয়া বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। ভাইয়ের হাত ছেড়ে জয়ি দৌড়ে গিয়ে তার হাত জড়িয়ে ধরল। দুজনে হাতে হাত বেঁধে চোখ থেকে চোখে তরঙ্গ পাঠাচ্ছে। হঠাৎ চাঁদুর দিকে চোখ পড়তেই শংকর এগিয়ে এল,— চাঁদু, তুমি গোটা লেকটা একদমে কবার দৌড়ে ঘুরতে পারবে ?

চাঁদু বুক ফোলাল,— পাঁচবার।

—আমার মনে হয় তুমি পারবে না। হাঁফিয়ে যাবে।

—যদি পারি ? চাঁদুর আঁতে লেগেছে।

—ঝালমুড়ি খাওয়াব।

ঝালমুড়ি, তাই সই। সাঁ করে দৌড় শুরু করল চাঁদু। পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে। হাঁফাচ্ছে কুকুরের মতো। পাঁচ পাক শেষ করে খুঁজছে জয়ি-শংকরকে। নেই। তারা তখন ঝোপের আড়ালে। ঝোপ থেকে আচমকা শংকরের চাষাড়ে হাত বেরিয়ে এল। ঝালমুড়ির ঠোঙা সমেত। একা একা বেঞ্চিতে বসে ঝালমুড়ি খাচ্ছে চাঁদু। কী ঝাল বাপস ! টস টস জল গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে। বিশ হাত দূরে, ঝোপের আড়ালে তখন যুগল হাসির আওয়াজ। উম আম নানারকম শব্দ। ভয়ে চাঁদু ঘাড় ঘোরাতে পারছে না, লেকের জলের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক।

বাগুইআটির মোড়ে এসে কন্দর্প স্কুটার ঘোরাল। কী মুখই না সে ছিল তখন। তাও রক্ষে, বাবা জানতে পারেনি চাঁদুই ছিল জয়ির প্রেমের পাহারাদার। জানলে নির্ঘাত বড়ঘরের দেওয়ালে চামড়া ঝুলত চাঁদুর।

নিজের মনে হাসতে হাসতে তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে এসে থামল কন্দর্প। পুজোর দিন, হাতে করে একটু মিষ্টি নিয়ে এলে কি ভাল হত ? থাক। পকেটের মোড়কটায় কন্দর্প একবার হাত বুলিয়ে নিল। হেলমেট খুলল ধীরেসুস্থে। সানগ্লাসটাও।

মধুমিতা আছে তো বাড়িতে ?

দীপঙ্করের মেয়েটা দেখতে বেশ হয়েছে। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, পুতুল পুতুল মুখ, টুকটুকে রঙ। গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে কথা বলে পাকা বুড়ির মতন। তবে বড্ড রোগা। ফড়িংয়ের মতো। মেয়েটা ভোগেও খুব। গত মাসে কন্দর্প যেদিন এসেছিল, সেদিনও খুব কাশছিল মউ।

আজ অবশ্য মউ বেশ তরতাজা। কলকল করে চলেছে কন্দর্পের সঙ্গে। নতুন জামা জুতো বারতিনেক দেখানো হয়ে গেল। ফিতে ক্লিপও। এখন চলছে কটা ঠাকুর দেখেছে তার বিস্তারিত বিবরণ।

কন্দর্প জিজ্ঞাসা করল,— কোন ঠাকুরটা সব থেকে ভাল লাগল তোমার ?

মউ এক মুহূর্ত ভেবে ঠোঁট ওল্টাল,— একটাও ভাল না। শুধু অসুরগুলো ভাল।

—কেন ?

—বা রে, মা দুর্গার দশ হাতের সঙ্গে ওরা শুধু দু-হাতে লড়াই করছে যে। মা দুর্গার সঙ্গে তো আরও অনেকে আছে, অসুরের সঙ্গে কে আছে বলো ?

এভাবে তো কখনও ভাবেনি কন্দর্প ! মউ-এর গাল টিপে বলল,— খুব ভাল বলেছ। আমারও অসুরকেই বেশি পছন্দ। অসুর কত বড় বীর !

মউ চোখ পিটপিট করল,— বীর মানে কী গো কাকু ?

—যার খুউব সাহস। যে খুউব লড়াই করতে পারে।

—আর লড়াই করে হেরে যায়, তাই তো ? অসুরের মতো ?

কন্দর্প পলকের জন্য কেঁপে গেল। আলগা শ্বাস ফেলে বলল, —হ্যাঁ, কখনও কখনও হারেও

বইকি।

মধুমিতা চা এনেছে। সঙ্গে প্লেটে দুটো ছোট ছোট সন্দেশ। কাপ প্লেট কন্দর্পর সামনে রেখে বলল, —বীর শব্দটা আমার ভাল লাগে না।

কন্দর্প থতমত,— কেন ?

—বীররা বড় দাম্ভিক আর ভোগী হয়।

—এটা ঠিক বললে না। ভীষ্ম কি বীর নয় ? সেও কি দাম্ভিক ? ভোগী ?

—দাম্ভিক তো বটেই। ভোগীও। অম্বার মতো মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে, দাম্ভিক নয় ? আর ভোগ ? ইন্দ্রিয় জয়ের নেশাটাও তো এক ধরনের ভোগ কন্দর্পদা। আমি কি পারি, না পারি, সেটা লোককে জাহির করার সুখভোগ। সত্য পালনের দোহাই পাড়ার মধ্যে বাহাদুরি আছে ঠিকই, অহঙ্কারও কম নেই।

তর্ক করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না কন্দর্পর। চা খেতে খেতে অপাঙ্গে দেখছিল মধুমিতাকে। মাখন রঙের শাড়ি পরেছে মধুমিতা। পানপাতা মুখ, টিকোলো নাক, ছোট্ট কপাল, টানা চোখ, সবই যেন নিখুঁতভাবে গড়েছে কোনও অদৃশ্য কারিগর। দীপঙ্করটা কী হতভাগা ! কী করে মরতে পারল !

কন্দর্প খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল,— তোমার জন্য একটা খবর ছিল।

—কী ?

—এবার বোধহয় তোমার একটা কিছু হয়ে যাবে। আমার এক দাদার কথা বলেছিলাম না তোমাকে ? ঠিক দাদা নয়, দাদার মতো। ডাক্তার। উনি একটা নার্সিংহোম খুলছেন। কালীপুজোর পর পরই। পুজোর আগেই চালু হওয়ার কথা ছিল, কয়েকটা ঝামেলায় পড়ে হয়নি...

—আমি নার্সিংহোমে কী কাজ করব ?

—অফিস জব। আমি শুভাশিসদার সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা তোমাকে রিসেপশনিস্ট হিসেবে নেবে। সঙ্গে কিছু অফিসের কাজও করতে হবে। এই যেমন পেশেন্টদের রেজিস্টার মেনটেইন করা, টুকটাক বিল ভাউচার তৈরি করা। টেলিফোন-টোনও অ্যাটেন্ড করতে হবে। প্রথম দিকে অবশ্য খুব বেশি দেবে না, বড় জোর সাত-আটশো। পরে নার্সিংহোম জমে গেলে... কি, করবে তো ?

—করব না কেন ? তবে টিকব ক'দিন কে জনে ! মধুমিতার স্বর নিস্পৃহ।

—না, না, এখানে তোমার অসুবিধে হবে না। শুভাশিসদা একদম অন্য ধরনের লোক। জেনুইন জেন্টলম্যান।

—জেনুইন জেন্টলম্যান ! বলছেন ?

পাতলা ঠোঁট দুটো অল্প বেঁকে গেছে মধুমিতার। কন্দর্প একটু কুঁকড়ে গেল। মাঝে কন্দর্পের সুপারিশে একটা চাকরি পেয়েছিল মধুমিতা। কন্দর্পর স্কুলের বন্ধুর চেনা ছোট্ট অ্যাড এজেন্সিতে। বিভিন্ন কোম্পানিতে ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার কাজ। সেখানে কাজ করতে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল মধুমিতা। প্রায় কোম্পানিই সন্ধের পর আসতে বলে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার মালিক ঘণ্টার পর ঘণ্টা এতাল-বেতাল বকে যায়, তারপর খুবই সভ্যভব্য ভাবে হোটেল রেস্টুরেন্টে ডিনারের আমন্ত্রণ জানায়। দু-একবার মরিয়া হয়ে গিয়েছিল মধুমিতা। খাবারের অর্ডার দিয়েই তারা মধুমিতার আঙুল নিয়ে খেলতে শুরু করে, রঙিন পানীয় পেটে পড়লে তো কথাই নেই। সোজাসুজি প্রস্তাব আসতে থাকে তখন। লেটস হ্যাভ এ রাইড। ঘেন্নায় অপমানে বসকে বলতে গিয়েছিল। সে পরিষ্কার বলে দিল, মধুমিতার যেটা অ্যাসেট, সেই রূপটাকে ব্যবহার করার জন্যই চাকরি দেওয়া হয়েছে তাকে। বেহুলাপনা করার জন্য নয়। সেই চাকরি ছেড়েই কন্দর্পের বাড়িতে দৌড়েছিল মধুমিতা। ভাগ্যিস বউদিকে কিছু বলে ফেলেনি সেদিন !

মউ খাটের তলা থেকে পুতুলের বাক্স টেনে বসেছে। নিজের মনে বকবক করতে করতে সাজাচ্ছে মেয়ে পুতুলকে। সেদিকে চোখ রেখে মধুমিতা বলল, —আপনি কথাটাকে অন্যভাবে

নেবেন না কন্দর্পদা। আপনার কী দোষ ? আপনি তো আর জেনে বুঝে ওখানে পাঠাননি আমাকে।

কন্দর্পও দেখছে মউকে। বলল,— তাও আমার তো একটা দায় থেকেই যায়।

—কিচ্ছু থাকে না। লোকজন খারাপ হলে আপনি কী করবেন ? মধুমিতা হঠাৎ যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। নিচু স্বরে বলল, —এই যে রোজ সকালে পোস্ট অফিসে যাই, এন এস সি করে দু-চার পয়সা রোজগার করি, সেখানেই কি আমি কম মন্দ লোক দেখি ? কেউ ফর্ম ফিল আপ করার সময়ে ইচ্ছে করে গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে, একটু আধটু ছুঁয়ে নেয়। বুড়ো পোস্টমাস্টারটা পর্যন্ত বিনা কারণে সামনে বসিয়ে রাখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেদিন ইউনিট ট্রাস্ট করাতে একজন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি বাড়ি বেবাক ফাঁকা। বউ মেয়ে সব বেড়াতে গেছে। ভদ্রলোক খালি ফ্রিজ খুলে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ায়, মিষ্টি খাওয়ায় ! কাজের কথা পাড়তে গেলেই বলে, ওসব পরে হবে'খন, এসো না একটু গল্প করি। আমার স্বামী মারা গেছে শুনে ভদ্রলোকের কী দুঃখ ! প্রায় কেঁদে ফেলে ! শেষে কী বলল জানেন ? আমার টাকা জমিয়ে রেখে কি হবে ? আর তুমিই বা ক পয়সা কমিশন পাবে ? তার থেকে অনেক বেশি টাকা উনি আমাকে... ! বিধবা মানে কি বেওয়ারিশ কন্দর্পদা ? যার ইচ্ছে হবে একটু করে ঠুকরে নেবে ?

মধুমিতার স্বর ভিজে এসেছে। কন্দর্পর নার্ভাস লাগছিল। অস্বস্তি ভাব কাটাতে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাচ্ছিল বারবার। সাধারণত শোওয়ার ঘরে এসে বসে না সে। আজ মউ টেনে এনেছে। ফ্ল্যাটটা খুব বেশি পুরনো নয়, কিন্তু নতুন নতুন ভাবটা যেন চলে গেছে। সেই প্রথম দেখা চাকচিক্য আর নেই। বড় মলিন, বড্ড মলিন এখন।

কন্দর্প ঘড়ঘড়ে স্বরে প্রশ্ন করল, —তোমাদের ফ্ল্যাটের লোন আর কত বাকি ?

—পনেরো-ষোলো হাজার মতো।

—ওই ইনসিওরেন্সের টাকা থেকেই দিয়ে যাচ্ছ ?

—হুঁ। সে ঘটিও তো প্রায় খালি হয়ে এল। এখন আপনার বন্ধুর কটা পি এফ আর গ্র্যাচুয়িটির সুদের টাকাই যা ভরসা। চিট ফান্ডটাও যদি না উঠে যেত, তাহলে হয়তো দু-চার পয়সা কিছু আসত হাতে।

—ছাড়ো তো, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কন্দর্প চাঙা করতে চাইল মধুমিতাকে। হয়তো বা নিজেকেও। মুখে হাসি এনে বলল, —পুজোর দিন সকালে কেউ এত মন খারাপ করে ?

—মন খারাপ আমার আর হয় না কন্দর্পদা। ভয় পাই।

—কীসের ভয় ? বাঘভাল্লুকের ? তোমাকে কপ করে খেয়ে নেবে ? ফুঃ। কন্দর্প হাসিতে জোর আনল,— মউ দেখেছিস, তোর মা'টা কী ভীতু !

মউ ভুরু কুঁচকে মধুমিতার দিকে তাকাল,— মা'র সাহস নেই, আমি জানি। মা বীর নয়।

হা হা করে হেসে উঠল কন্দর্প। মধুমিতার মুখ চোখও একটু উজ্জ্বল হয়েছে। বলল,—অত দূর থেকে আসছেন, আজকে দুপুরে আমাদের এখান থেকে দুটো খেয়ে যান না।

—ওরেব্বাস, কোতল হয়ে যাব। আমি কি শুধু তোমার এখানে এসেছি নাকি ? ভাইঝিকে আমার দিদির বাড়িতে গ্যারেজ করে রেখে এসেছি। কেষ্টপুরে। ওখানে দিদি খিচুড়ি রান্না করে বসে আছে। না খেলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে। এমনিই আজ একটু তলতলে হয়ে আছে দিদি।

—কেন ?

—ওই সাংসারিক ঢেঁকুচকুচ খেলা আর কি। কখনও এ উঠছে ও নামছে, কখনও ও উঠছে এ নামছে। আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার হেভি জটিল। তুমি বুঝবে না।

মধুমিতা কী বুঝল কে জানে, কথা ঘুরিয়ে নিয়েছে,— আপনার ভাইঝিকে এখানে আনলেন না কেন ?

—আনব একদিন। ও আজ পিসির বাড়িতে জমে গেছে।

—ভাইঝি মানে আপনার যে বউদিকে দেখেছিলাম, তার মেয়ে তো ?

—হ্যাঁ। বড়দার মেয়ে। পৃথিবীতে যাদের ওপর আমার একটু একটু উইকনেস আছে, তিতির ইজ ওয়ান অফ দেম।

মধুমিতা হেসে উঠল— আপনার উইকনেস-লিস্ট মনে হচ্ছে খুব ছোট্ট ?

—ছোটই বলা যায়। আমি বেসিকালি লোকটা বেশ কঞ্জুস।

মউ পুট করে প্রশ্ন করল, —কঞ্জুস মানে কী কাকু ?

—কৃপণ। যে কাউকে কিচ্ছু দেয় না।

—তুমিও বুঝি কাউকে কিছু দাও না ?

—দিই। শুধু মউসোনাকে দিই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সন্তর্পণে মোড়কটা খোলার চেষ্টা করল কন্দর্প। শুধু মিল্ক চকোলেটটাই বার করতে চেয়েছিল, পারফিউমের শিশিটাও অবাধ্যতা করে বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে গড়িয়ে গেল।

শিশিটাই বেরোল, নাকি কন্দর্পর কোনও গোপন ইচ্ছে ছিটকে গেল মেঝেতে ?

মধুমিতা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়েছে শিশিটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে,— বাহ। এ তো বিদেশি পারফিউম ! নামটাও দারুণ ! পয়জন ! কার জন্য কিনেছেন ? বিশেষ কেউ ?

কন্দর্প জোরে জোরে দুদিকে মাথা নাড়ল,— না না, তেমন কারুর জন্য নয়। এমনিই দেখে ভাল লাগল, কিনে ফেললাম। তুমি নেবে ?

—আমি ! আমি পারফিউম নিয়ে কী করব ?

—মাখবে। কন্দর্প ঘামছে— পারফিউম মাখা তো খারাপ কিছু নয়। নাও না।

মধুমিতার চোখ তীক্ষ্ণ হয়েছে,— সত্যিই আপনি কারুর কথা ভেবে কেনেননি ?

—অত বলতে পারব না। এ কথা বলতে পারি, খারাপ মনে কিনিনি। তোমার না নিতে ইচ্ছে করলে নিয়ো না।

মধুমিতা খুলছে শিশিটা। গন্ধ শুঁকল। সহসা খানিকটা সুগন্ধী স্প্রে করেছে কন্দর্পর সাদা পাঞ্জাবিতে। নিজের শাড়িতেও লাগাল।

কন্দর্পর মনে হল হঠাৎ ক্যামেরার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কেউ। হাজার হাজার কিলোওয়াট আলো একসঙ্গে মুখে এসে পড়ল। ঝলসে দিচ্ছে চামড়া। হাত পা সব মুহূর্তে আড়ষ্ট।

কন্দর্প নড়ে ওঠার আগেই শব্দটা শুনতে পেল। দরজার বাইরে। প্রায় অদৃশ্য এক পায়ের শব্দ।

২৭

বিনতা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন,—তুমি ! তুমি কখন এলে ?

বাইরে পায়ের শব্দ পেয়েই কন্দর্প উঠে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্কুচিতভাবে বলল,—এই খানিকক্ষণ। মধুমিতাকে একটা চাকরির খবর দিতে এসেছিলাম।

বিনতার হাতে সন্দেশের বাক্স, দু-চারটে গাঁদা-দোপাটির পাপড়ি লেগে আছে বাক্সের গায়ে। মউয়ের মাথায় বাক্সটা ঠেকিয়ে নিয়ে জোরে জোরে বাতাস শুঁকলেন মধুমিতা,—এত সেন্ট কে মেখেছে ? তুমি ?

কন্দর্প আমতা আমতা করল,—না...মানে...আমি....

—খুব কড়া গন্ধ তো ! এ বুঝি তোমার ফিলম লাইনের অভ্যেস ?

মধুমিতার মা কন্দর্পকে অপছন্দ করেন তা নয়, তবে মাঝে মাঝে এরকম তির্যক ভঙ্গিতে কথা বলেন। কন্দর্প তো এ বাড়িতে বেশ কয়েকবার এল, কোনওদিন কি তার গা থেকে সেন্টের গন্ধ পাওয়া গেছে ? ফিলম লাইনের লোক ছাড়া আর কেউ কি কড়া পারফিউম মাখে না ?

কন্দর্পকে উত্তর দিতে হল না। মউ ঝুপ করে বলে উঠল,—কাকু তো সেন্ট মেখে আসেনি। কাকু মাকে একটা সেন্ট দিল, সেটাই তো মা কাকুর গায়ে লাগিয়ে দিল।

—অ। তাই বলো। বিনতার মুখ চকিতে গম্ভীর। খর চোখে একবার কন্দর্পকে দেখলেন, একবার মধুমিতাকে। তারপর ধমকের সুরে মেয়েকে বললেন,—কটা বাজে খেয়াল আছে? মউকে এখনও চান করাসনি যে বড়?

—কিছু বেলা হয়নি। ঠিক সময়েই করাব।

—হুঁহ্, তোমার আর সময় হয়েছে!

—আমি কন্দর্পদার সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলছি মা। মধুমিতার স্বরে অস্বস্তি। বিরক্তিও। ভার মুখে বলল,—শুনলে তো কন্দর্পদা একটা চাকরির খবর এনেছে।

—অরুণ তো তোকে একটা চাকরি করে দেবে বলে গেল।

—করে দেবে বলেনি। বলেছে চেষ্টা করবে।

—অরুণ যখন বলেছে, কিছু একটা করবেই।

—ছাড়ো তো। কে কত করবে সব জানা হয়ে গেছে। বাড়ি এলে সবাই ওরকম মুখে বলে যায়। সামনে দেখলে দরদ উথলে ওঠে, আড়াল হলেই ভুলে মেরে দেয়। আমার অবস্থা কী সুপ্রিয়াদি অরুণ জামাইবাবুরা জানে না? কমবার আমি ভিখিরির মতো ওদের বাড়ি গেছি?

—তোর আবার মান বেশি। আত্মীয়-স্বজনের কাছেই তো গেছিস, এতে ভিখিরি হওয়ার কি আছে?

—দুঃসময়ে কিছু চাইতে গেলে আত্মীয়রা ভিখিরিই ভাবে মা। চকিত উত্তেজনায় মধুমিতার নাকের পাটা লাল হয়ে উঠেছে, —আত্মীয়-স্বজনদের থেকে পর ভাল। কন্দর্পদার চেষ্টায় তাও যা হোক একটা কাজ জুটেছিল।

—সে কাজ তো তোমার কপালে টেকেনি বাছা।

কন্দর্পর সামনেই ঘরের আবহাওয়া ক্রমশ গরম হয়ে উঠছে। মা মেয়ের চাপান-উতোরের মাঝে কন্দর্পর বোধ হয় এখন নাক গলানো উচিত নয়। একটু যেন অনভিপ্রেতও লাগছে নিজেকে। তবু কন্দর্প ফস করে বলে ফেলল, —এবারের চাকরি টিকবে মাসিমা। চাকরিটা খুব ভাল।

—ভাল হলেই ভাল। বিনতা এক ঝলক জরিপ করলেন কন্দর্পকে, —আমার আজকাল মন থেকে বিশ্বাসটা বড় কমে যাচ্ছে বাবা।

বিনতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর কন্দর্প কী করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না। কেমন যেন ছোট লাগছে নিজেকে। কেন যে মিছিমিছি পারফিউম কেনার ভূত চাপল মাথায়!

দু-চার সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কন্দর্প বলল, —আমি এবার যাই।

মধুমিতার মুখ থমথম করছে। বলল, —না, আপনি এখন যাবেন না। আর একটু বসুন।

কন্দর্পর ন যযৌ ন তস্থৌ দশা। ঢোঁক গিলে বলল, —অনেক বেলা হয়ে গেছে। তোমরা চান-খাওয়া করবে... দিদিও বসে আছে...

—তা হোক, তবু বসুন।

—কেন জোর করছ মধুমিতা?

—না বসলে আমি কিন্তু মনে করব পারফিউমটা আপনি ভাল মনে আনেননি।

কন্দর্প করুণ মুখে বলল, —আমি কিন্তু সত্যিই খারাপ মনে আনিনি। ভাবলাম পুজোর দিন, চারদিকে এত হইচই আনন্দ, হাতে করে একটা উপহার নিয়েই যাই। এখন আমার কাজকর্মও ভাল চলছে....। আমি কি আগে কখনও এভাবে কিছু এনেছি?

—আমিও তো তাই ভাবতে চাই। মা কেন অন্যরকম ভাববে?

কন্দর্প হেসে সহজ হওয়ার চেষ্টা করল, —মাসিমার কথায় আমি কিছু মনে করিনি।

—সে আপনার মহানুভবতা। আমি হলে করতাম। হয়তো এ বাড়ির ছায়াও মাড়াতাম না

কোনওদিন।

—আহ্, তুমি ওভাবে নিচ্ছ কেন ? তোমাকে নিয়ে মাসিমার তো ভাবনাচিন্তা থাকবেই। এটাই তো স্বাভাবিক।

পারফিউমের শিশি আলতো করে ড্রয়ারে রাখল মধুমিতা। মউ খাটের ধারে পুতুলের সংসার নিয়ে ভারি ব্যস্ত, সেদিকে স্থির তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। যেন দেখছে, অথচ দেখছে না। আনমনে বলল, —মা'র অবস্থা আমি বুঝি কন্দর্পদা। কিন্তু বেশি ভাবনাচিন্তা কি মানুষের মনকে ছোটও করে দেয় ?

—ছোট করে দেয় না, ভীতু করে দেয়।

—না কন্দর্পদা, মা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। মধুমিতা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল, —চাকরিটা পেলাম, বাইরে বেরোচ্ছি, একটু তো ভাল পোশাক-আশাক পরতেই হয়, মা'র তাতেও আপত্তি। কেন বিধবা মেয়ে এত সেজেগুজে অফিস যাবে ! কেন ভাল শাড়ি পরবে ! কেন টিপ লাগাবে ! তাও তো মা জানে না চাকরিটা কী ছিল আমার। পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে দশ রকম লোকের সঙ্গে...

কন্দর্পর মুখ আবার কালো হয়ে গেল। অপরাধী মুখে বলল, —আমি সরি মধুমিতা। মনোতোষ তোমাকে ওর অফিসে চাকরি না দিয়ে ওরকম একটা অ্যাড এজেন্সিতে পাঠিয়ে দেবে আমি বুঝতে পারিনি।

—নাহ্, আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না। মধুমিতার মুখে বহুক্ষণ পর এক টুকরো হাসি ফুটেছে। পুজোর দিনের হাসি নয়, ম্লান হাসি, কিন্তু ভারি স্বচ্ছ। হাসিটা মুখে রেখেই বলল, —অন্যের দোষ নিজের ঘাড়ে কেন বারবার চাপিয়ে নিতে চান বলুন তো ? আপনার বন্ধু আপনার সম্পর্কে ঠিকই বলত।

—কী বলত দীপু ?

—সে আপনার শুনে কাজ নেই।

—স্টুপিড, গাধা, এইসব বলত তো ?

—ও সব বলবে কেন ? আপনার কি নিজেকে খুব বোকা মনে হয় ?

কন্দর্প মনে মনে বলল, হয় তো বটেই। না হলে কি আর ওই ভাল্লুক মুস্তাফিটার সঙ্গে পাইক বরকন্দাজের মতো ঘুরে বেড়াই ! লোকটা তাকে কী না বলে, তবু তার মুখে লাথি কষিয়ে কন্দর্প চলে আসতে পারে কই ! একটুখানি ভবিষ্যতের টোপে যে লোক মুস্তাফির লেজনাড়া মংগ্রেল বনে যায়, সে এক বিশ্ব আকাট ছাড়া আর কি !

কন্দর্প পাঞ্জাবির বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করল, —নিজেকে বোকা ভাবতে কার আর ভাল লাগে ! আসলে বলছিলাম এই জন্য, দীপুটা তো খুব চালাকচতুর ছেলে ছিল।

—কে যে চালাকচতুর, আর কে যে বোকা ! মধুমিতা মৃদু মাথা নাড়ল, —আপনার বন্ধু তো এত গুছোনো ছিল, এত হিসেবি, পাঁচ বছর পর কী হবে, দশ বছর পর কী হবে, বিশ বছর পর কী হবে, সব নখদর্পণে ছিল। নিজে কোথায় পৌঁছবে, সংসারের চেহারা কেমন হবে, সমস্ত ছবির মতো দেখতে পেত। অথচ ঘাড়ের কাছে যে মৃত্যু এসে থাবা নাড়ছে, লোকটা তা বুঝতেই পারল না ! একে আপনি চালাক বলবেন ?

কন্দর্পর একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল। মস্তিষ্কের গোড়ায় ধোঁয়া পৌঁছলে একটু ভাল লাগত এখন। পাঞ্জাবির পকেটে হাত রেখেও হাত সরিয়ে নিল কন্দর্প। দীপঙ্করটার ভীষণ সিগারেটের নেশা ছিল, ঘর জুড়ে ছড়িয়ে রাখত শৌখিন ছাইদান। মাছ, পাখি, আরও কত জন্তুজানোয়ারের আকারের। আজকাল আর একটাও ছাইদান দেখতে পায় না কন্দর্প, মধুমিতা সব সরিয়ে ফেলেছে। কন্দর্প বললে কি মধুমিতা বার করে দেবে না একটা ? দেবে। কিন্তু চাইতে বড় অস্বস্তি হয় কন্দর্পর।

মধুমিতা খাটের ধারটাতে বসেছে। আপন মনে বলল, —ভাবতে গেলে কত কীই যে অদ্ভুত

লাগে ! আমার একটু শরীর খারাপ হলে, মেয়ের একটু গা ছ্যাঁক ছ্যাঁক করলে, পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠত মানুষটা। আর মজা দেখুন, নিজের শরীরেই যে একটা কিডনি নেই, তা লোকটা জানতই না !

—ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনা মধুমিতা। হয়তো খুঁজলে দেখা যাবে আমাদেরও অনেক কিছুই নেই।

—হয়তো।

কন্দর্প একটু হালকা করতে চাইল মধুমিতাকে। হেসে বলল, —তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে। আমার সম্পর্কে দীপু কী বলত তোমাকে ?

—আপনি তো মহা নাছোড়বান্দা ! বললাম না শুনে কাজ নেই !

—বেশ। বোলো না তবে।

—রাগ করেন কেন ? আপনার বন্ধু আপনাকে কমপ্লিমেন্টই দিত। আপনার সঙ্গে তার খুব যোগাযোগ ছিল না, তবে আপনার কথা বলত মাঝে মাঝেই। বলত, আপনার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। আস্থা রাখা যায়। অসুখের সময়েও বলেছিল, বিপদে পড়লে কন্দর্পকে ডেকো। ও কিছু না কিছু করবেই। মধুমিতা চোখ বুজল, —শেষের দিকে বোধ হয় বুঝতে পারত আর বাঁচবে না।

কন্দর্পর ঠিক মাথায় ঢুকল না কথাটা। দীপঙ্কর কেন বলেছিল তার ওপর বিশ্বাস রাখা যায় ? কলেজে দীপঙ্কর মোটেই তেমন প্রাণের বন্ধু ছিল না, বরং কন্দর্পর থেকে জ্যোতি বিজন শ্যামলদের সঙ্গে দীপঙ্করের অনেক বেশি মাখামাখি ছিল। হ্যাঁ, পার্ট টু পরীক্ষার সময়ে দীপঙ্করকে খুব সাহায্য করেছিল কন্দর্প। পরীক্ষার হলে। একটাও প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারছে না দীপঙ্কর, দরদর ঘামছে, ইনভিজিলেটারের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে বারবার নিজের খাতা দীপঙ্করের সামনে মেলে ধরেছিল কন্দর্প। শুধু এইটুকুর জন্যই সে দীপঙ্করের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে গেল ?

মধুমিতাই বা কথাটা বলল কেন আজ ? কোনও গূঢ় কারণ আছে কি ?

কন্দর্প মনমরা হয়ে বলল, —তুমি কিন্তু দীপু মারা যাওয়ার পর আমাকে খবরও দাওনি মধুমিতা। অসুখের সময়েও...

—তখন কি আমি আমার মধ্যে ছিলাম কন্দর্পদা ? শ্বশুরবাড়ির লোকরা একরকম বলছে, বাপের বাড়ির লোকরা আর এক বলছে, আমার তখন মাথাই কাজ করত না।

কন্দর্প নিচু গলায় প্রশ্ন করল, —দীপুর দাদা খোঁজখবর নিতে আসছে ?

—আসে। ন মাসে ছ মাসে। এই তো বহুকাল পর মহালয়ার দিন এসেছিল। ভাসুর জা দুজনে এসে মউকে খেলনা জামাকাপড় দিয়ে গেল। ব্যস, কর্তব্য শেষ।

—সেই প্রস্তাবটা নিয়ে দীপুর দাদা আর কথা তোলে কোনও ?

—কোনটা বলুন তো ? ও আচ্ছা, ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে ওদের সংসারে গিয়ে থাকা ? ও হবে না।

—প্ল্যানটা কিন্তু ভাল ছিল। ফ্ল্যাটের ভাড়া থেকে তোমার লোনও শোধ হয়ে যেত, রাখা টাকায় হাত দিতে হত না...

—যা হবে না, তা আর আমি ভাবি না কন্দর্পদা। আত্মীয়স্বজন আসবে, আহা উহু করবে, কিন্তু দায়িত্ব কেউ নেবে না। আমি সার বুঝে গেছি। নিজের দাদারাই কেউ এগিয়ে এল না ! এক ওই মা'ই যা...

—সেই মা'র ওপর তুমি রাগ করো ! এ তোমার ভারি অন্যায়।

ভেতর থেকে বিনতা ডাকছেন মেয়েকে, মধুমিতা উঠে গেল। কন্দর্প জানলার ধারে গিয়ে ঝুঁকে একবার দেখল বাইরেটা। ঢাক বাজছে, ঢাকের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে। পাড়ার ছেলেরা পুজোর প্রসাদ বিলি করতে বেরিয়েছে বোধ হয়। বেলা অনেক হল। ঢাকের শব্দ মিলিয়ে যেতেই বাতাসে কান পাতল কন্দর্প। বিনতা কেন ডাকলেন মধুমিতাকে।

মধুমিতা ফিরতেই কন্দর্প বলল,—আমি তাহলে এবার আসি ?

—আবার কবে আসছেন ?

—শুভাশিসদার সঙ্গে আর একবার কথা বলে নিই।

—কালীপুজোর দিন থেকেই তো নার্সিংহোমটা শুরু হচ্ছে, তাই না ?

—উঁহু, কালীপুজোর পর। তার আগে তোমাকে তো একবার শুভাশিসদার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিতে হবে।

—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন তো ?

—কেন, আমি অ্যাড্রেস দিলে তুমি গিয়ে দেখা করতে পারবে না ?

—পারব। তবু আপনি গেলে...

—ঠিক আছে, যাব।

কথা বলতে বলতে কন্দর্প ফ্ল্যাটের দরজায় এসেছে। বিনতা রান্নাঘরে ছিলেন, একবার উঁকি দিয়েই আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। তড়িৎ গতিতে।

মউও খেলা ফেলে ছুটে এসেছে দরজায়, তার গাল ভর্তি মিল্ক চকোলেটের দাগ। কন্দর্পের হাঁটু ধরে টানল মউ,—আবার কিন্তু এসো কাকু। আমার খুব ভাল লাগবে ?

কন্দর্প আলগা আঙুল চালাল মেয়েটার চুলে, —খুব ভাল লাগবে ?

এক দিকে মাথা পুরো হেলিয়ে দিল মউ, —হুঁউউ। তুমি খুব ভাল। আবার কিন্তু চকোলেট এনো। বলতে বলতে মউয়ের মুখে সলজ্জ হাসি, —মা'র জন্যও সেন্ট এনো কিন্তু।

মউয়ের কথায় একটুও আধো আধো ভাব নেই, একদম স্পষ্ট উচ্চারণ। সাংসারিক দুর্যোগ শিশুদের বুঝি তাড়াতাড়ি বড় করে দেয়। কন্দর্প একবার আড়চোখে মধুমিতার দিকে তাকাল।

মধুমিতা ঠোঁট টিপে হাসছে। মেয়ের মাথায় আলগা চাটি মারল,—থাক, নিজে লোভী হয়েছ, লোভী থাকো। মা'র হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না।

ঠোঁট টিপে হাসলে মধুমিতার গালে একটা ছোট্ট টোল পড়ে। কেন যে পড়ে! কন্দর্প দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল।

মধুমিতাদের ফ্ল্যাটবাড়ির উল্টোদিকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি পড়ে আছে। জমিতে বালির স্তূপ, ইটের পাঁজা। পুজোর পরেই বোধ হয় বাড়ি উঠবে। জায়গাটার এক কোণে এখনও ঘন আগাছার ঝোপ। কালচে সবুজ ঝোপ ফুঁড়ে কোত্থেকে একটা মাত্র কাশগাছ মাথা ঠেলে উঠেছে, দুলছে হাওয়ায়। সাদা ফুল তার রোদ্দুরে ঝিকমিক। জংলা ঝোপের মাঝে ওইটুকু সাদা যে কী অপরূপ!

বিনতার অসন্তোষ মন থেকে মুছে যাচ্ছিল কন্দর্পর। ওই কাশফুল শুধু সুন্দর নয়, যেন এক পবিত্র বিষাদ। ওকে একাই মানায়।

কন্দর্প দিদির বাড়ি ফিরে দেখল তিতির নেই, ঝান্টুর সঙ্গে কাছেই কোনও ঠাকুর দেখতে গেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে খাবার থালায় বসে গেল কন্দর্প। পেট ঠেসে খেয়ে অলসভাবে গড়াচ্ছিল বিছানায়, জয়শ্রী আবার খুলে বসেছে অভিযোগের ঝাঁপি। বিনবিন করে বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে।

কন্দর্প ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল তিতিরের ঠেলায়, —ও ছোটকা, ফিরতে হবে না ?

ধড়মড় উঠে বসে চোখ কচলাল কন্দর্প, কোথায় আছে বুঝে নিতে তাকাল চারদিকে। হাই তুলতে তুলতে বলল, —কটা বাজে রে ?

—চারটে বেজে গেছে।

—তা হলে তো এখনও রোদ্দুর আছে। আর একটু শুয়ে নিই।

—একদম নয়, ওঠো বলছি। আমাকে বাগবাজার, কুমোরটুলি দেখাবে না ?

—আর কত দেখবি ? সবই তো এক।

—ঠিক আছে বেশ, ঠাকুর না হয় নাই দেখলাম। মানিকতলায় যাবে তো ?

—যাব। তাড়া কিসের ?

—তোমার তাড়া নেই, আমার আছে। দাদু দিদার সঙ্গে দেখা করে তাড়াতাড়ি পাড়ায় ফিরতে হবে।

—কেন, তোর কি বয়ফ্রেন্ড হয়েছে নাকি ? পুজোয় তোকে নিয়ে ফুচকা খাবে ? নাগরদোলা চড়বে ?

—আজ্ঞে না স্যার। আমার স্কুলের বন্ধুরা আসবে।

—কোন স্কুল ? চ্যাপেলবাড়ি, না অফিসবাড়ি ?

—আমার স্কুল। দেবস্মিতা আসবে, অনিতা আসবে, হিয়া ঝুলন আসবে..

—ব্যস, ব্যস, ব্যস। পুরো একটা লেডিজ গ্যাঙ বানিয়ে ফেলেছিস ? রাস্তাঘাটে ছেলেদের তাড়া করবি নাকি ?

—করতেও পারি। ছেলেরা যা বাঁদর হয়। জানো, ঝুলনের পেছনে একটা ছেলে...

—থামলি কেন ? রিপোর্টটা দে।

—না, দেব না। তুমি ওঠো তো। এবার কিন্তু আমি চিমটি কাটব। ও পিসি, বলো না ছোটকাকে উঠতে।

কাকা ভাইঝির খুনসুটি দেখে জয়শ্রী হেসে বাঁচে না, —ওরে চাঁদু, আমাদের তিতিরটাও কেমন দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল, অ্যাঁ ?

—হ্যাঁ, এখন কথা লুকোতেও শিখে গেছে।

জয়শ্রী বলল, —তোর মনে আছে, সেই যে আমরা হাসপাতালে দেখতে গেলাম তিতিরকে ? একটা কাচের ঘরে ওকে রাখা হয়েছিল ?

—খুব মনে আছে। তোরা সব আলোচনা করছিলি... প্রিম্যাচিওর বেবি...নেংটি ইঁদুরের মতো চেহারা হবে...বাঁচানো যাবে, কি যাবে না...

—তিতির কিন্তু আমাদের ভারি অবাক করে দিয়েছিল। আগে আগে হয়ে গেলে কি হবে, কী নাদুসনুদুস হয়েছিল বল ? টুকটুকে গোলাপি রঙ, এক্কেবারে ফুলের মতো। তবে মাথায় একদম চুল ছিল না!

—চুল ছিল না কি রে! বল পুরো টাক। টেকো মেয়ে দেখে বউদির সে কী মন খারাপ! কোলেই নিতে চাইত না। টেকো নাতনি দিনরাত ঠাকুরমার কোলে ওয়াঁ ওয়াঁ কাঁদছে। নেহাত টাকে গোবর ঘষে পরে চুল গজাল!

এবার সত্যি সত্যি কটাস করে কন্দর্পকে চিমটি কেটেছে তিতির, ফুড়ুক করে উড়ে গেছে পাশের ঘরে। সাজছে। কন্দর্পও চুলটুল আঁচড়ে ঝটিতি তৈরি হয়ে নিল। প্যান্ডেলে ঝান্টুকে টা টা করে কাকা ভাইঝি রওনা দিল স্কুটারে। মানিকতলার বুড়ি ছুঁয়ে যখন ঢাকুরিয়া পৌঁছল, কলকাতা তখন আলোয় আলোময়।

কন্দর্পদের পাড়ার পুজোটি বিশাল। কোনওবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আদলে প্যান্ডেল হয়, কোনওবার মীনাক্ষী টেম্পল। এবার তারা বানিয়েছে আংকোরভাটের মন্দির। সেই দেখতে স্রোতের মতো মানুষ ধেয়ে আসছে ঢাকুরিয়ায়। শহরের মানুষ। শহরতলির মানুষ। গ্রামের মানুষ। হেঁটে। বাসে। ট্রেনে।

ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে বাড়িটুকু পৌঁছতে কন্দর্পর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। এত ভিড়! এত ভিড়! মানুষের পায়ের চাপে কলকাতার না পাতালপ্রবেশ হয়! ওফ্, আজ আর কন্দর্প কোথাও বেরোচ্ছে না। স্বয়ং মা দুর্গা এসে ডাকলেও নয়।

তিতির বন্ধুদের প্রতীক্ষায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে, কন্দর্প একাই ঢুকল বাড়িতে।

বড় ঘরে জয়মোহনের কজন লেকের বন্ধু এসেছেন, জয়মোহন গল্প করছেন তাঁদের সঙ্গে। সামনে ফাঁকা চায়ের কাপ, জোর গজল্লা চলছে বুড়োদের। পুজোর পরেই ভোটের দামামা বাজবে, তাই নিয়ে এখনই সকলে উত্তেজিত। মাঝে মাঝে চাটনির মতো স্ত্রী পুত্রবধূদের নিন্দাও ঢালাও বিলি

হচ্ছে আড্ডায়। কন্দর্প মনে মনে হাসল, বাবার এখন মেজাজ ক'দিন শরিফ থাকবে।

ক্লান্ত কন্দর্প নিজের ঘর খুলছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। সুদীপ নামছে। ড্রেস মেরেছে খুব। নির্ঘাত শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। চোখাচোখি হতেই দুই ভাই অর্ধ-পরিচিতের মতো হাসল।

কন্দর্পকে পেরিয়ে গিয়েও হঠাৎ ঘুরে এল সুদীপ,—বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, তোর একটা ফোন এসেছিল।

—কার ফোন ? কন্দর্প সামান্য কেঁপে গেল। শালা অশোক মুস্তাফিটা আবার ডেকে পাঠাল না তো ! বলছিল সারা রাত আজ কোথায় যেন আসর জমাবে ! মুস্তাফির কাছ থেকে ফোন শুনলে মেজদাই বা কী ভেবে বসে... !

সুদীপ বলল, —এক ভদ্রমহিলার ফোন। তুই বোধ হয় তাদের বাড়ি সকালবেলা গেছিলি, মানিব্যাগ ফেলে এসেছিস।

দ্রুত পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিল কন্দর্প, —হ্যাঁ, তাই তো !

—কোন ঘোরে থাকিস ? সকালে ফেলে এসেছিস, এখনও খেয়াল নেই ? সুদীপ দু' পা এগিয়ে আবার দাঁড়াল, —সকালে তিতিরকে নিয়ে জয়ির বাড়ি গিয়েছিলি না ?

—হ্যাঁ। ওখান থেকেই...

—ও। সুদীপ কি যেন একটা প্রশ্ন করতে গিয়েও করল না। চলে গেল।

ঘরে ঢুকে আবার পকেটে হাত দিল কন্দর্প। কখন পড়ল মানিব্যাগটা ? পারফিউম বার করার সময় ? নাকি যখন পকেটে সিগারেট হাতড়াচ্ছিল, তখনই... ?

ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি আলনায় পরিপাটি করে ঝুলিয়ে ঘর অন্ধকার করে দিল কন্দর্প। টান টান শুয়ে পড়ল বিছানায়। মানিব্যাগে মধুমিতার একটা ছবি আছে, মধুমিতাই দিয়েছিল বায়োডাটার সঙ্গে, ছবিটা চোখে পড়লে মধুমিতা কিছু মনে করবে না তো ? আর মধুমিতার মা যদি পার্সটা ঘাঁটে... ! ধুস, যত সব ফালতু দুশ্চিন্তা। বাড়িতে অন্যের ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ কেউ মোটেই ঘেঁটে দেখে না। তবু যদি দেখে ? ধুস, দেখলে দেখবে। কন্দর্পর তো এখন আর কিছু করার নেই।

মানিব্যাগের চিন্তাটাকে জোর করে তাড়াতে চাইছে কন্দর্প, মানিব্যাগই ঘুরে ফিরে আসছে মাথায়। পিছন পিছন লাইন বেঁধে চলে আসছে অন্যরাও। মধুমিতার মা... মধুমিতা... মউ... চকোলেট.... পারফিউম.... পাঞ্জাবিতে ছিটিয়ে দেওয়া এক ঝলক সুগন্ধ.... মধুমিতার মা'র ভ্রূকুটি... মধুমিতার কঠোর অনুনয়... দীপঙ্করের নাকি খুব বিশ্বাস ছিল কন্দর্পর ওপর... একটা কাশগাছ সাদা ফুল নিয়ে একা একা দুলছে হাওয়ায়... দুলছে... একা...

কন্দর্প অলসভাবে উঠে বসল। আলো জ্বেলে বিছানায় নিয়ে এল সেতারটাকে। বহুকাল বাজানো হয়নি, সেতারের গায়ে ধুলো জমেছে যত্ন করে মুছল কন্দর্প।

বাইরে চাকভাঙা মৌমাছির কলরব। কলকাতা এখন উৎসবে মাতোয়ারা। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষোভ বেদনা নৈরাশ্য আজ ঢেকে গেছে প্রমোদের উন্মাদনায়।

কন্দর্প আঙুলে মেজরাফ লাগাল। সুর তুলছে সেতারে। ইমন-কল্যাণ।

২৮

পুজো শেষ হতেই হঠাৎ যেন পৃথিবীটা কেমন বদলে যায়। যে দিনটাকে এতদিন বিশাল মনে হত, সেই দিন যেন আচমকাই ছোট হয়ে যায় অনেকটা। বিকেল ফুরোতে না-ফুরোতেই ঝুপ করে সন্ধে নেমে আসে। পুজো তো মাত্র কটা দিন, তবু তার মধ্যেই কোত্থেকে একটা হিম হিম ভাব এসে যায় বাতাসে। ভোরের দিকে রাস্তাঘাট বাড়িঘর সব কেমন অল্প অল্প আবছা। তিতিরের মনটাও কেমন ভারী হয়ে যায় এ সময়ে। ভারী, না শূন্য ! শহর জুড়ে যত্রতত্র বিশাল বিশাল প্যান্ডেলের হাড়গোড় পড়ে আছে, দেখলেই তিতিরের বুক বড় হু হু করতে থাকে। ক'দিন আগেই কত কী ছিল,

এখন আর কিচ্ছুটি নেই। অত আলো অত গান আনন্দ উচ্ছ্বাস হঠাৎই এক হাহাকার মাত্র।

আরও একটা পুজো চলে গেল!

পুজোর ক'দিন আগে থেকেই বুকের ভেতর এক আশ্চর্য ধুকপুকুনি শুরু হয়েছিল তিতিরের। এবার পুজোটা হয়তো একটু অন্যরকম হবে। হয়তো এমন কিছু ঘটবে যা সে কল্পনাও করতে পারেনি কখনও। হয়তো ইট কাঠ পাথর পিচরাস্তা থেকে এক তুমুল আনন্দের বিচ্ছুরণ ঘটবে, রোদ্দুর আরও সোনালি হয়ে যাবে, সবুজ গাছপালা বুঝি বা হয়ে উঠবে আরও মায়াময়।

প্রতি বছরই তিতির ভাবে এরকম, কিন্তু বাস্তবে এসব কিছুই হয় না। রোদ্দুর বড় চড়া লাগে, মাইক আর ঢাকে তালা লেগে যায় কানে। এক আধদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে ফুচকা ভেলপুরি নাগরদোলা, বড় জোর লাইন লাগিয়ে কোনও রেস্টুরেন্ট, বাড়িতে একটু-আধটু ভালমন্দ রান্না, সন্ধেবেলা ঝলমল আলোর স্রোতে বিবশ হয়ে ভেসে বেড়ানো, সবই প্রায় যান্ত্রিক নিয়মে বাঁধা। নিজের মনে পুজো আসে, নিজের মনেই চলে যায়। আর পুজো ফুরোলেই মনে হয় এবার পুজো বড় ম্যাড়মেড়ে কাটল, এর থেকে আগের পুজোটা বুঝি ঢের ভাল ছিল।

কেন এমন হয়? এবার তো পুজোর দিনগুলো তেমন মন্দ কাটেনি তিতিরের! হিয়া আসেনি, তবে দেবস্মিতা ঝুলন অনিতারা সবাই এসেছিল। পিসির বাড়ি থেকে ফিরে অষ্টমীর সন্ধেটা তো দিব্যি কাটল তাদের সঙ্গে! ঝুলনের বয়ফ্রেন্ড অর্ণবও এসেছিল এবার, সে বেশ দাদাসুলভ ভঙ্গিতে সকলকে নিয়ে ঘুরেছে এদিক ওদিক, অদ্ভুত অদ্ভুত রঙ্গরসিকতা করে হাসিয়ে মেরেছে তিতিরদের। নবমীর দিনও, কথা নেই বার্তা নেই, নতুন স্কুলের বন্ধুরা এসে হাজির। মিতেশ সম্রাট পাঞ্চালী তৃণা। সঙ্গে কুলজিৎ আর তাদের বাড়ির ইয়া ঢাউশ জিপ। এসেই তিতিরকে নিয়ে টানাটানি, চল চল চল, ঝুলনকে তুলব। তারপর কোথায় না চরকি মারা হল সারাদিন! বেহালা গড়িয়া পার্কসার্কাস শ্যামবাজার গঙ্গার ধার সর্বত্র। সম্রাট এক বিচিত্রদর্শন বেতের টুপি পরেছে, তাতে আবার ময়ূরের পালক গোঁজা! কুলজিৎ তালপাতার ভেঁপু কিনে বাচ্চাদের মতো বাজিয়ে চলেছে অবিরাম! চলন্ত গাড়িতে কোরাসে গান চলছে একটানা, কেউ একটু থামলেই নতুন স্কুলের প্রমীলা ম্যাডামকে নকল করে নেকু নেকু সুরে ধমক দিচ্ছে ঝুলন! সেই মুহূর্তে তিতিরের মনে হচ্ছিল এত খুশির দিন জীবনে বোধ হয় আর কখনও আসেনি। অথচ পুজো যেতেই মুহূর্তগুলো কোথায় যে উবে গেল! পুজোর কটা দিন এখন শুধুই বিবর্ণ স্মৃতি। বড় ফিকে, ভারি একঘেয়ে।

তিতির আনমনে কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকাল। ফুলহীন গাছটাকেও বড় নিরানন্দ দেখাচ্ছে এখন। পড়ন্ত সূর্যের আলোতেও যেন ঝিমোচ্ছে গাছটা। ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে।

—কী রে তিতির, কী ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

তিতির চমকে তাকাল। কাকিমা। লক্ষ্মীপুজো কাটিয়ে কাল রাত্রেই কাকিমা বাপের বাড়ি থেকে ফিরেছে। একটু আগেও ঘুমোচ্ছিল অ্যাটমের পাশে, চোখ দুটো টোপা টোপা।

রুনা তিতিরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। টুক করে পাশের ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলাটা একবার দেখে নিল। বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে কায়দা মেরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, রুনাকে দেখেই তার হাবভাব দারুণ অন্যমনস্ক।

রুনা ফিক করে হাসল, —ছেলেটার দেখছি তোকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে!

পলকের জন্য চোখ তুলেই তিতির মুখ ঘুরিয়ে নিল। উদাসীন স্বরে বলল, —পাড়াটা কী তাড়াতাড়ি বদলে গেল, তাই না কাকিমা?

রুনা বড় হাই তুলল, —হুঁ, পর পর কতগুলো বাড়ি ভাঙা পড়ল। দত্তদের বাড়ি, গুপ্তদের বাড়ি, সান্যালদের বাড়ি....

—পুরনো বাড়িগুলোই ভাল ছিল।

—কেন?

তিতির ঠিক উত্তর খুঁজে পেল না। সব ভাল লাগার কি কারণ থাকে?

রুনা বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলল, —সান্যালদের বাড়িটা কী ছিল ভাব। ঝরঝরে অন্ধপুরী। স্যাঁতসেঁতে আনহেলদি ঘর, আলো ঢুকত না.... দেখিসনি ও বাড়ির লোকগুলো সূর্যের আলো না পেয়ে কেমন সাদা ইঁদুরের মতো ফ্যাকাসে মেরে গেছিল!

তিতির বিষণ্ণ হাসল। বুঝতে পারছে কাকিমার কথা কোন দিকে যাচ্ছে। বলল, —তা হলে তো আমাদের বাড়িতেও দাদু ছোটকার ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া উচিত।

—চাঁদু তো এমনিই ফ্যাকাসে।

—যাহ্, ছোটকা ফর্সা। টকটকে ফর্সা।

—ওই হল। পুরুষমানুষ বেশি ফর্সা হলে ফ্যাকাসে ফ্যাকাসেই লাগে। রুনা উল্টো দিকের নতুন বাড়িটার দিকে আঙুল দেখাল —ফ্ল্যাটগুলো কত সুন্দর হয়েছে দ্যাখ, কত রোদ বাতাস ঢুকছে...

—ঘরগুলো কিন্তু বড্ড ছোট হয়ে গেছে গো।

—বেশি বড় ঘর দিয়ে হবেটা কী? আগের মানুষদের সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি ছিল। যতটা দরকার ততটাই তো ভাল।

—কি জানি বাবা, ছোট ঘরে থাকতে হবে ভাবলে আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। বড় ঘরে কত আরাম করে থাকা যায়।

রুনা আবার হাই তুলল। একটুখানি কটমট করে যেন দেখলও তিতিরকে। তারপর রাস্তায় চোখ রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল পাশে।

তিতিরের আর বারান্দায় দাঁড়াতেও ভাল লাগছিল না। কাকিমা আবার এক্ষুনি কী কথা শুরু করে! তবে এই মুহূর্তে সরে যাওয়াটাও ভাল দেখায় না।

আরও মিনিট দু-চার সিঁটিয়ে থেকে সন্তর্পণে সরে এল তিতির। ঘরে ফিরে একবার উত্তরের জানলায় দাঁড়াল, একবার পুবের জানলায়। একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় শুয়েও উঠে পড়ল। ভাল লাগছে না। বাড়িতেই থাকতে ইচ্ছে করছে না।

দোতলাটা বড় বেশি নিস্তব্ধ এখন। ইন্দ্রাণী আদিত্য বাড়ি নেই, বাপ্পাও ঘুমোচ্ছে ভোঁস ভোঁস। প্রেস চললে নির্জনতারও একটা শব্দ থাকে, এখন তাও নেই। দুর্লভ দেশ থেকেই ফেরেনি এখনও। এই নিস্তব্ধতা অবশ্য থাকবে না বেশিক্ষণ, তিতির জানে। অ্যাটম উঠলেই গোটা দোতলা মুখর হয়ে যাবে। কিছুটা অ্যাটামের চিৎকারে, কিছুটা রুনার।

তিতির নাইটি ছেড়ে রানি রঙের নতুন সালোয়ার কামিজটা পরে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল উল্টে বেণী বাঁধল সযত্নে, ছোট্ট একটা লাল টিপ কপালে লাগাল, ড্রয়ার থেকে মা'র লিপস্টিক বার করে আলতো বোলাল ঠোঁটে। আয়নায় তিতিরের পূর্ণ প্রতিবিম্ব সুন্দর থেকে সুন্দরতর হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি ফেলে ভ্রূকুটি হানল কয়েকবার। নিজের মনে বলে উঠল, —বাহ্ তিতির, তোকে তো বেশ দেখাচ্ছে!

আয়নার তিতির অমনিই নড়েচড়ে উঠেছে, —এঁএঁহ্, একদম নার্সিসাসফুল হয়ে উঠলি যে!

তিতির ভুরু কোঁচকাল, —কেন, আমি দেখতে খারাপ?

আয়নার তিতির মুখ বেঁকাল, —হয়েছে হয়েছে। ড্রেস মারা তো হল, কিন্তু এখন যাবেটা কোথায়?

—দেখি। কোথাও একটা যাব।

—ঝুলনের বাড়ি গিয়ে লাভ নেই। ছুটির বিকেলে ঝুলন বাড়ি বসে থাকার মেয়ে নয়।

—সে কি আমি জানি না?

—হিয়ার বাড়ি যাবে ভাবছ কি?

—গেলে হয়। হিয়াটা অষ্টমীর দিন এল না...

—হিয়ার এখন অনেক নতুন নতুন বন্ধু, তাদের সঙ্গে বেরিয়েছিল হয়তো।

—অসম্ভব। হিয়া সেরকম মেয়েই নয়। নির্ঘাত শরীর খারাপ হয়েছিল। অন্য কিছুও ঘটে

থাকতে পারে।

—ওসব সান্ত্বনার কথা।

—মোটেই না। তুমি চুপ করো।

তিতির আয়না থেকে চোখ সরিয়ে নিল। জানলা চারটে পরিপাটি বন্ধ করে, দরজা আলগা টেনে, সিঁড়ির দিকে যেতে গিয়েও কি ভেবে পাশের ঘরে এল। বাপ্পা চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে, জোরে জোরে ঠেলল তাকে, —অ্যাই দাদা, আমি একটু বেরোচ্ছি।

বাপ্পা বিরক্ত মুখে চোখ কচলাল, —বেরো না, আমাকে খোঁচাচ্ছিস কেন?

—আমার হয়তো ফিরতে সাতটা আটটা হবে। মা শেফালিমাসির বাড়ি গেছে, এসে যদি খোঁজ করে তো একটু বলে দিস।

বাপ্পা শুনল কিনা বোঝাই গেল না। পিছন ফিরে শুয়েছে।

তিতির ঠোঁট ওল্টাল। জাহাজ জাহাজ করে দাদাটার মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে, তিতিরের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না ভাল করে। সারা দিন শুধু টেপ চালিয়ে গান শুনছে, নয় ঘুমোচ্ছে। বাড়ি থেকেও খুব কম বেরোয় আজকাল। লক্ষ্মীপুজোর দিন সকালে বিষ্ণুপ্রিয়াদি এল বাড়িতে, তাকে ভেতরে বসতেও বলল না, দুটো-চারটে কথা বলে দরজা থেকেই ভাগিয়ে দিল। কেন এমন করছে দাদা!

সূর্য ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপারে নেমে গেছে। পশ্চিম আকাশে গোলাপি আভা, মাথার ওপর আকাশ প্রায় বর্ণহীন। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ কানা ভাঙা থালার মতো ফুটে আছে আকাশে। দীপ্তিহীন, দ্যুতিহীন, অদ্ভুত এক ধূসর চাঁদ।

হিয়ার ঠাকুমা দরজা খুলতেই টিপ করে তাঁকে একটা প্রণাম করল তিতির, —কেমন আছ ঠাকুমা?

হিয়ার ঠাকুমা তিতিরকে জড়িয়ে ধরলেন, —আয় আয়। কতদিন পর দেখলাম তোকে! এদিকের রাস্তা ভুলেই গেছিস নাকি রে?

তিতির লাজুক হাসল, —না না, ভুলব কেন? আসলে স্কুল আরম্ভ হতেই এমন পড়ার চাপ... হিয়ার সঙ্গেও স্কুলেই দেখা হয়ে যায়...

—বুঝেছি বুঝেছি। বন্ধুই আসল, ঠাকুমাটা কেউ নয়।

তিতির অপ্রস্তুত মুখে অবস্থাটা সামাল দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ভেতর থেকে একটা সমবেত হাসির আওয়াজ শুনে থমকে গেছে।

হিয়ার ঠাকুমা চোখ ঘুরিয়ে বললেন, —যা, ভেতরে যা। তোর বন্ধুর ঘরে আজ জোর আড্ডা বসেছে।

তিতির হিয়ার ঘরে ঢুকে আমূল নাড়া খেয়ে গেল। টোটো বসে আছে হিয়ার খাটে। পাশে হিয়া। সঙ্গে আরও তিনটে ছেলেমেয়ে। হিয়াদের ক্লাসেরই। তিতিরের মুখচেনা।

তিতিরকে দেখেই হিয়া লাফিয়ে নেমেছে বিছানা থেকে, —ওমা তুই! ভালই হয়েছে এসেছিস। ভাবছিলাম আজকালের মধ্যেই তোর কাছে যাব।

তিতির কিছু একটা বলতে চাইল, কিছুতেই শব্দ ফুটল না গলায়।

—তুই আমার ওপর খুব রেগে আছিস, না? হিয়া দরজায় এসে হাত ধরল তিতিরের, —বিশ্বাস কর, অষ্টমীর দিন আমি যেতাম। বলতে বলতে হঠাৎ গলা নামিয়েছে হিয়া। প্রায় ফিসফিস করে বলল, —সে অনেক ব্যাপার। তোকে পরে বলব।

তিতিরের একটুও কৌতূহল হচ্ছিল না। শুধু শুনল কথাটা।

আড়ষ্টভাবে একটা বেতের চেয়ারে বসল তিতির। জিভে তালু ভিজিয়ে আরও আড়ষ্টভাবে টোটোর দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। অথবা হাসল না, অজান্তেই ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট।

টোটো হাসিটাকে আমলই দিল না। হিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,—তা হলে কী ঠিক হল?

প্রোগ্রাম ফাইন্যাল ?

হিয়া ঘরের বাইরে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, —অঞ্জন আর পিউ যাবে কি না জানি না, আমি যাচ্ছি। সৌমিকও যাচ্ছে।

অঞ্জন নামের ছেলেটি তড়িঘড়ি বলে উঠল, —না না, আমরাও যাব। কি রে পিউ, দু দিনের জন্য হলে যেতে পারবি না ?

পিউয়ের চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ভীষণ চিন্তিত মুখে ভুরুতে একরাশ ভাঁজ ফেলে সে বলল, —দেখি, কাল জানাব। কবে যেন যাওয়া হচ্ছে ?

টোটো বলল, —ফ্রাইডে ভোরে বেরোচ্ছি। আইদার সানডে নাইটে ফিরে আসব, নইলে সোমবার।

—কতক্ষণ লাগবে রে যেতে ?

—বললাম তো বাসে গেলে ঘণ্টা তিন-চার।

—এতজন গেলে প্রবলেম হবে না ?

—কত বার বলব, আমাদের বাড়িতে সাফিসিয়েন্ট জায়গা আছে। টোটো সামান্য খিঁচিয়ে উঠল, —যেতে হয় চল, অত কোয়েশ্চেন করিস না।

তিতির ঠিক বুঝতে পারছিল না কোথায় যাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে টোটোদের। শুধু টের পাচ্ছে সে আসার পর হিয়াদের আড্ডাতে যেন একটু ছন্দপতন হয়েছে। সে কি হংস মধ্যে বক যথা হয়ে গেল ?

হিয়া যেন তিতিরের অবস্থাটা বুঝতে পারল। টুক করে একবার ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল, —কি রে তিতির, তুই যাবি নাকি আমাদের সঙ্গে ? আমরা সবাই মিলে রাজর্ষিদের দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি।

তিতির প্রাণপণে সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল, —মাধবপুর ?

—ওমা, তুই গ্রামটার নাম জানিস ?

—জানি। আরও অনেক কিছু জানি।

—কী রকম ?

—যেমন ধর, মাধবপুরে রাজর্ষির দাদু ঠাকুমা থাকেন, কাকা কাকিমা থাকেন, একতলা দোতলা মিলিয়ে ছটা ঘর আছে, বাগান আছে, পুকুর আছে....। তিতির সপ্রতিভতা বাড়িয়েই চলেছে। টোটোর দিকে টেরচা চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসল,—কী, আমি ভুল বলেছি ?

টোটো নিরুত্তর।

তিতির আর একটু উচ্ছল হল, —আরও বলব ? রাজর্ষির দাদু দিদা এখন মাধবপুরে আছেন। জলপাইগুড়ি থেকে এসে পুজোর সময়ে রাজর্ষিদের বাড়িতেই ছিলেন, একাদশীর দিন মাধবপুরে গেছেন।

সৌমিক আর পিউ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, —তুমি এত কথা জানলে কী করে ?

তিতিরের মুখে রহস্যের হাসি। দেখছে টোটোকে।

হিয়াও ফিকফিক হাসছে, —বুঝতে পারছিস না তোরা ? ও তো রাজর্ষির রিলেটিভ, তাই না রে রাজর্ষি ?

টোটো হিয়ার দিকে তাকাল না। তিতিরের দিকেও না। সৌমিক পিউদের দিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, —না নাহ। রিলেটিভ ফিলেটিভ কিছু না। আমার বাবা ওদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। মাঝেমধ্যে ওদের বাড়ি যায়। মনে হয় বাবার মুখ থেকেই শুনেছে।

কথাটা তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়ে ফুটল তিতিরের বুকে। টোটো ভালমতোই জানে ডাক্তার আঙ্কল মোটেই তিতিরদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান নয়, ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। জেনেশুনেও টোটো হঠাৎ মিথ্যে বলল কেন ? তাও আবার ওরকম ব্যঙ্গের সুরে ?

তিতিরের মুখে আঁধার নামল। হিয়া অতশত লক্ষ করেনি, হালকা গলায় বলল,—কি রে, যাবি তুই আমাদের সঙ্গে ? চল না।

মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখতে চাইল তিতির। মাথা নেড়ে বলল— না রে, আমি যেতে পারব না। তোরাই যা।

হিয়া আর জোরাজুরি করল না। শুক্রবার কখন বেরোবে, কোন পথে যাবে, সঙ্গে কী কী নেবে তাই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে আবার। সৌমিক আরেকবার জেনে নিল গ্রামে গিয়ে মাঠে পটি করতে হবে কিনা। মাধবপুরের বাড়িতে টিভিও আছে জেনে টিনা বিস্ময় প্রকাশ করল, আশ্বস্তও হল। পুকুরে স্নান করতে সুইমিং কসটিউম লাগবে কিনা জেনে নিল অঞ্জন। প্রাথমিক বিরক্তি কাটিয়ে হাসি হাসি মুখে সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে টোটো।

কয়েক মিনিট মুখ কালো করে পাথরের মতো বসে রইল তিতির। যেন ঘরের ভেতর অচেনা পাখিরা দুর্বোধ্য ভাষায় কিচির-মিচির করছে।

খানিক পরে উঠে পড়ল,— আমি আজ চলি রে হিয়া।

হিয়া হাঁ হাঁ করে উঠল,— এক্ষুনি যাবি কি রে ? ঠাম্মা মাংসের চপ তৈরি করছে।

তিতির জোর করে হাসল,— শরীরটা আজ ভাল নেই রে। এখন যাই, আরেক দিন এসে ঠাকুমার হাতের চপ খেয়ে যাব।

—ঠাম্মা কিন্তু খুব রাগ করবে।

—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আমি ঠাকুমাকে বুঝিয়ে বলে যাচ্ছি।

অন্ধকার নেমে গেছে। বাস স্টপে না দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে সোজা হাঁটছিল তিতির। ঘাড় গুঁজে। পাশ দিয়ে পথচারীদের আনাগোনা, রাস্তা বেয়ে বাস রিকশা ছুটে যাচ্ছে, কোনওদিকে দৃষ্টি নেই তিতিরের। চতুর্দিক ধোঁয়াটে, জমাট বাষ্পের পর্দায় ঢাকা।

হাঁটতে হাঁটতে আলগোছে চোখ মুছল তিতির। রাশি রাশি কীট যেন অবিরাম দংশন করে চলেছে তাকে। অথচ রক্ত ঝরছে না। টোটোর সঙ্গে দেখা হলেই টোটো তাকে উপেক্ষা করে, অপমান করে, তবু কেন টোটোর ওপর ক্রুদ্ধ হতে পারে না তিতির ? এই টোটোই কি ছোটবেলায় নিজের সব খেলনা অবলীলায় দিয়ে দিত তিতিরকে ? এখন কেন তিতিরকে এত অপছন্দ টোটোর ? ডাক্তার আঙ্কল তিতিরদের বাড়ি আসে বলে রাগ ? নাকি ডাক্তার আঙ্কল তিতিরকে ভালবাসে বলে হিংসে ?

তিতির মাথা নিচু করে রাস্তা পার হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটর সাইকেল তার গায়ের কাছে এসে থেমেছে, —হাই !

কে রে বাবা ! তিতির ছিটকে সরে গেল। পরের লহমাতেই চিনতে পেরেছে ছেলেটাকে। ঝুলনের সেই অনুসরণকারী প্রেমিক।

ছেলেটা মোটর সাইকেল থামিয়েছে, তবে স্টার্ট বন্ধ করেনি। গর্জনরত যন্ত্রবাহনের পিঠে বসেই প্রশ্ন ছুঁড়ল, —তুমি এদিকে কোথায় ?

তিতির জবাব দিল না। হাঁটছে।

মোটর সাইকেলও এগোচ্ছে টিকটিক,— তোমার নাম তো তিতির, তাই না ?

হাঁটার গতি বাড়াল তিতির।

মোটর সাইকেল এগোচ্ছে একইভাবে, —তোমার বন্ধুর ব্যাপার কী বলো তো ? ক'দিন ধরে দেখছি না ?

তিতির ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, —আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন কেন ?

—বিরক্ত তো করিনি ! এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম, তাই জিজ্ঞেস করছি।

—মিথ্যে কথা। আপনি আমাকে ফলো করে আসছেন। উত্তেজনায় মুখচোরা তিতিরেরও গলা চড়ে গেল,— আমি দেখেছি আপনি আমার স্কুলের বাইরেও দাঁড়িয়ে থাকেন। যেদিন ঝুলন আসে

না, সেদিনও। কালকেও আপনি আমাদের বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন!

ছেলেটা নার্ভাসভাবে হাসছে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিক। রাস্তায় জনস্রোত এখন ভালই, দু-একজন ঘুরে ঘুরে দেখছেও এদিকে, তবে আজকাল আর কেউ তেমন খুচরো ঝামেলায় মাথা গলাতে চায় না। মজা দেখে, কিন্তু এগিয়ে আসার সাহস নেই, ইচ্ছেও নেই।

তিতিরের আজ এত সাহস এল কোত্থেকে! ভেতরের অভিমানই কি ভয়বোধ তুচ্ছ করে দিল তার! এক পা এক পা করে তিতির ছেলেটার দিকে এগোল। একদম সামনে এসে বলল,— আপনি আমার দিকে ওভাবে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকেন কেন? আমার বন্ধুর সঙ্গে সুবিধে হচ্ছে না বলে এখন আমার পেছনে লাগার মতলব?

ছেলেটার মুখচোখ পুরো বদলে গেছে। স্মার্টভাবের আর চিহ্নমাত্র নেই, তোতলাচ্ছে রীতিমতো,—আমি তো তোমার বন্ধুর পেছনে ঘুরি না! ওদের পাড়ায় আমার এক আত্মীয় থাকে, যাই মাঝে মাঝে....

—ফের মিথ্যে কথা? তিতির চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চিৎকারটা গিলে নিল। মোটর সাইকেলের ঠিক পিছনে টোটো! টোটোই তো।

কয়েক সেকেন্ড চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল তিতির। টোটো হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে যে! তাও একা!

টোটো অবাক চোখে তিতিরদের দেখছিল। তিতিরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ট্রাউজারের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে এল, —এনি প্রবলেম?

কী সর্দারি ভঙ্গি! কী কর্তারি মেজাজ!

পলকে কী যে হয়ে গেল তিতিরের। দুম করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। পরে তিতির বহুবার ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখেছে, সেদিন যদি সে হঠাৎ ক্রোধে অন্ধ না হয়ে যেত, তা হলে হয়তো অনেক কম জটিলতা আসত জীবনে। সুকান্ত নামের ছেলেটার অস্তিত্বই থাকত না!

তিতির আগুন চোখে ঝলসাল টোটোকে,—তোমার এখানে কী চাই? হঠাৎ এসে নাক গলাচ্ছ কেন?

টোটো থমকাল সামান্য, চোখ ঘুরিয়ে এক ঝলক জরিপ করল ছেলেটাকে। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল,—মনে হল ডিসটার্ব করছে তোমাকে!

—তুমি দেখছি মনে হওয়া দিয়ে অনেক কিছু বুঝে ফেলো। তোমার সব মনে হওয়া ঠিক নয়। ও আমার বন্ধু।

—এই মাত্র তুমি চেঁচাচ্ছিলে না?

—না। আমরা কথা বলছিলাম। বলেই মোটর সাইকেল ঘেঁষে দাঁড়াল তিতির। ছোটকার স্কুটারে চড়ার অভ্যস্ত কায়দায় মোটর সাইকেলের ব্যাকসিটে লাফিয়ে উঠে বসল। তার আকস্মিক রূঢ়তায় টোটোর পাংশু হয়ে যাওয়া মুখ চোখে পড়ল দু-এক সেকেন্ড। মুখটাকে আরও পাংশু করে দিয়ে ছেলেটা যেন তার কত কালের চেনা এমন ভঙ্গিতে বলল,— চলো চলো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

এ যে মেঘ না চাইতেই জল! খুশিতে উড়ে যাচ্ছে যন্ত্রযান। সাঁ সাঁ বাতাস কাটছে। উৎফুল্ল যুবক অনর্গল কথা ভাসিয়ে চলেছে হাওয়ায়। কোনও শব্দ কোনও কথাই তিতিরের মগজে পৌঁছচ্ছিল না। শুধু মাত্র নিজের হৃদযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। ঢকাং। ঢকাং। কেউ যেন অতিকায় হাতুড়ি পিটছে এক ফাঁকা লোহার স্তম্ভে।

যাদবপুর স্টেশনের কাছে এসে তিতিরের খানিকটা চেতনা ফিরল। এ কার সঙ্গে যাচ্ছে সে! কোথায় যাচ্ছে! কেন যাচ্ছে!

তিতির চিৎকার করে উঠল,— থামো।

মোটর সাইকেল মন্থর হল,—কী হল তোমার? বেশ তো যাচ্ছি। ভয় লাগলে আমার কাঁধটা

চেপে ধরো।

তিতিরের গায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগল,— না। আমি নামব।

—এখানে কেন নামবে ? তুমি তো ঢাকুরিয়ায় থাকো ! আমি তোমাকে পাড়ার মুখে ছেড়ে দিয়ে আসব।

—না। আমি এখানেই নামব। তীক্ষ্ণ গলায় ফুঁসে উঠল তিতির। সেই তীক্ষ্ণতা এত তীব্র, যে বেশ থতমত খেয়েছে যুবক।

মোটর সাইকেল থামল।

নেমেই হনহন করে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল তিতির, সুকান্ত পিছন থেকে ডাকল,— আবার কবে দেখা হচ্ছে ?

তিতির ফিরেও তাকাল না। তাকালে দেখত সুকান্তর চোখের মণি জ্বলছে আর নিবছে। জোনাকির মতো।

২৯

একপাল হাঁস প্রথম অভ্যর্থনা জানাল টোটোদের। নেচে কুঁদে সমবেত আগমন সঙ্গীত গেয়ে তারা মুখর করে তুলল শিবসুন্দরের বাড়ি। টোটোর বন্ধুরা বিমোহিত। সৌমিক উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল, —লাভলি। লাভলি। হিয়া হাঁটু ভেঙে বাও করল হাঁসেদের,— গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যারস।

টোটো হিয়ার কানে কানে বলল, —স্যার নয়, ম্যাডাম বল ! এদের সব ডিম পাড়ার জন্য রাখা হয়েছে।

শিবসুন্দর টোটোদের দেখে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। বললেন, —তোমরা কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? এসো, ভেতরে এসো।

ছেলেমেয়েরা ঢিপ ঢিপ প্রণাম করল শিবসুন্দরকে। মুহূর্তে শিবসুন্দরের বাড়ি সরগরম। পুকুর উঠোন সবজি-বাগানে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে টোটোর বন্ধুরা।

অলকা টুকির হাত ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। টোটোকে ডেকে বলল, —তোমাদের জন্য তোমার কাকা আমাদের পাশের ঘরটা রেডি করে রেখে গেছে। আর মেয়েরা থাকবে দোতলায়, বড় ঘরে। কি, অসুবিধে হবে ?

—নট অ্যাট অল। টোটো খুশিতে কাঁধ ঝাঁকাল,— দাদাই দিদুন কোন ঘরে আছে ?

—ওদের নিয়ে ভাবতে হবে না, ওঁরা দোতলাতেই থাকবেন। মাঝের ঘরে।

টোটো খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। দাদাই দিদুন এখন মাধবপুরে রয়েছেন, তার ওপর সে চারটে বন্ধু নিয়ে আসছে, থাকার কোনও সমস্যা হবে কিনা তা নিয়ে একটু ভাবনা তো ছিলই। হালকা ছলে একবারই বন্ধুদের যাওয়ার কথা বলেছিল, শুনেই সকলে লাফাতে শুরু করবে কে জানত ! আর একবার নাচিয়ে টোটো তাদের হতাশই বা করে কী করে !

একতলায় টোটোদের জন্য বরাদ্দ ঘরে পর পর তিনটে নেয়ারের খাটিয়া পাতা। ঢুকেই জুতোসুদ্ধু পায়ে সেই খাটিয়ায় গড়াগড়ি খাচ্ছে অঞ্জন আর সৌমিক।

শিবসুন্দরের সঙ্গে হিয়া পিউকে নিয়ে দোতলায় এল টোটো। অর্ধবৃত্তাকার বড় ঘরটির দরজা খুলে শিবসুন্দর বললেন,— কি, পছন্দ হয় !

—পছন্দ হয় মানে ? হিয়া পিউ জোড়া পেন্ডুলামের মতো ঘাড় নাড়ছে,— একসেলেন্ট। এত বড় ঘর, বিশাল বিশাল জানলা, বাইরে তাকালেই অমন টলটলে পুকুর... ! পুকুরে ওটা কী ফুল দাদু ? শালুক ?

—উঁহু। পদ্ম।

—ওমা তাই ! পিউ শিহরিত,— আমি কক্ষনও এভাবে পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখিনি। কী কিউট !

টোটো হাসি মুখে বলল, —শুধু পদ্মফুলের শোভা দেখলে হবে ? চানটান করবি না ?

শিবসুন্দর বললেন, —দাঁড়া, আগে একটু জিরিয়ে নে সবাই। হাতমুখ ধো, তোর কাকিমা জলখাবার তৈরি করছে খেয়ে নে... কোন সকালে বেরিয়েছিস...

—জলখাবার ! এখন ! পিউ প্রায় আঁতকে উঠল।

—কেন, তোমরা জলখাবার খাবে না ?

—না দাদু। আমাদের ট্যাঙ্কি একদম ফুল। তারকেশ্বর স্টেশনে পেট পুরে সিঙাড়া কচুরি জিলিপি খেয়ে নিয়েছি।

—তা বললে তো হবে না ভাই, এখন একটু খেতেই হবে। তোমাদের কাকিমাটি নইলে ছাড়বে না।

হিয়া পিউ অসহায় মুখে টোটোর দিকে তাকাল। টোটো বন্ধুদের হয়ে আর্জি জানানোর আগেই শিবসুন্দর টোটোর কাঁধে হাত রেখেছেন, —তুফান আর তোর দাদাই পোলট্রি থেকে মুরগি আনতে গেছে। ফিরলে তবে রান্না বসবে। এখন ট্যাঙ্কিতে আরেকটু ফুয়েল না নিলে অত বেলা অবধি টানবি কী করে ?

শিবসুন্দরের ফুয়েল বলার কায়দায় হিয়া পিউ হিহি করে হেসে উঠেছে।

ছন্দার মা স্মৃতিকণা স্নানে গিয়েছিলেন, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন,— কি রে, তোরা এসে গেছিস ?

শিবসুন্দর স্মৃতিকণাকে বললেন,— আসুন বেয়ান, এবার আপনি এদের একটু কম্পানি দিন। নীচে কয়েকটা পেশেন্ট বসিয়ে রেখে এসেছি, ঝটপট দেখে নিই গিয়ে।

শিবসুন্দর চলে গেছেন। স্মৃতিকণা ভারী শরীর গুছিয়ে খাটে বসলেন, —মেয়ে দুটো এত ঘেমে নেয়ে গেল কী করে রে ?

পিউ বলল, —বাবাহ, বাস থেকে নেমে এতটা রাস্তা হাঁটা কি মুখের কথা ! কতবার রাজর্ষিকে বললাম একটা ভ্যান রিকশা নে। কখনও ভ্যান রিকশায় চড়িনি, বেশ মজা করতে করতে আসা যেত। রাজর্ষি রাজিই হল না। খালি বলে, বেশি দূর নয়, হাঁট। এই তো সামনে, ওই তো গাছটার পর।

অভিযোগের ঝাঁপি খুলে বসেছে পিউ। টোটো লজ্জা পাচ্ছিল। বরাবর সে গাড়িতেই মাধবপুর এসেছে, বাস রাস্তা থেকে হাঁটাপথ যে কতখানি তার আন্দাজই ছিল না। গাঁয়ের লোকরা নাকি একটা কথা বলে। ডালভাঙা ক্রোশ। গাছের একটা ডাল ভেঙে হাতে নিয়ে হাঁটা শুরু করো, ডালটা যেখানে পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে, সেখানেই পূর্ণ হবে এক ক্রোশ পথ। বাস রাস্তা থেকে মাধবপুরের দূরত্ব নির্ঘাত ওই ডালভাঙা ক্রোশ।

টোটো অপ্রতিভ মুখে বলল, —কি রে হিয়া, হাঁটতে খারাপ লেগেছে ?

—একটুও না। আমার তো বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। দু পাশে কেমন ধানক্ষেত, হলুদ ধানগাছ নুয়ে নুয়ে পড়ছে, কত গাছপালা, রোদ্দুরও কত নরম... !

স্মৃতিকণা বললেন, —আজ তাত অনেক কম। কাল রাতে যা জোর একচোট বৃষ্টি হল !

পিউ বলল,— আমরা থাকতে থাকতে আবার বৃষ্টি হলে খুব মজা হয়। আমি কক্ষনও গ্রামের বৃষ্টি দেখিনি।

—গ্রামের বৃষ্টি আকাশ থেকেই পড়ে রে। পিউকে ভেংচে বেরিয়ে এল টোটো।

মা বাবাকে ছাড়া মাধবপুরে আসা টোটোর এই প্রথম। কাল রাতেও মা গাঁইগুই করছিল খুব। এতটা রাস্তা টোটোরা কী করে নিজেরা নিজেরা যাবে ! তাও আবার গাড়ি ছাড়া ! ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায় টোটোর। মা তাকে ভাবেটা কী ? এখনও দুধের দাঁত না ওঠা হামাটানা শিশু ? সারাক্ষণ

শুধু ছেলে ছেলে ছেলে ! অষ্টপ্রহর এই চাপ কাঁহাতক সহ্য করা যায় ! বাবাকে তুমি কব্জা করতে পারোনি, তাই বলে সারাক্ষণ টোটোর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে যাবে ! মাকে ভালবাসে বলে মা'র পায়ে দাসখত লিখে দিতে হবে টোটোকে ! তার কোনও স্বাধীন ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই !

সিঁড়ির পাশে মনোরমার ঘর। দরজা টেনে ভেজানো। সন্তর্পণে দরজা ঠেলে উঁকি দিল টোটো। বিছানায় মিশে বিছানারই অংশ হয়ে শুয়ে আছেন মনোরমা। কেন যে এরকম জড়পদার্থের মতো বেঁচে থাকা ? ওই মনোরমাকে দেখে টোটোর হৃদয়ে কোনওই উত্তাপ জাগে না, আবেগও আসে না, শুধু বুকটা অকারণে টিপটিপ করতে থাকে। সেই ছোটবেলা থেকেই।

ওই মহিলা তার বাবার মা !

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থেকে দরজাটা আবার টেনে দিল টোটো। নীচে নেমে দেখল ভেতর দাওয়ায় মাদুরে বসে জম্পেশ করে লুচি তরকারি সাঁটাচ্ছে অঞ্জন।

টোটোও পা ছড়িয়ে বসল মাদুরে, —সৌমিকটা কোথায় ?

—একটা ছড়ি নিয়ে হাঁস তাড়া করতে বেরিয়েছে।

—খাবে না ?

—সব কটা হাঁসকে পুকুরে নামিয়ে তারপরে খাবে।

টোটো ভুরু নাচাল, —ওই হাঁসগুলোর নাম জানিস ?

—হাঁসের আবার নাম কি ! হাঁস ইজ হাঁস। পাতিহাঁস। রাজহাঁস। অবশ্য আরেকটা হাঁসও আছে। ডোনাল্ড ডাক।

—নো স্যার। এগুলোকে বলে খাকি ক্যাম্বেল।

—ঢপ মারিস না। হাঁসের নাম খাকি ক্যাম্বেল ! আমি জানি না বলে তুই যা খুশি উল্টোপাল্টা পড়িয়ে দিবি ?

অলকা টোটোর খাবার নিয়ে এসেছে। বলল, —তোমার মেয়েবন্ধুরা নীচে এল না ?

অঞ্জন বিদঘুটে শব্দ করল গলায়,— ইইই, ওদের মেয়েবন্ধু বলবেন না। ওরা হেভি চটে যায়।

অলকা বিস্মিত হল,— কী বলব তা হলে ?

—শুধু বন্ধু বলুন। গেছো বন্ধু বলুন। বাঁদরি-টাদরি বললেও আপত্তি করবে না। কিন্তু মেয়েবন্ধু বললেই ফায়ার হয়ে যাবে।

—কেন ?

টোটোর সঙ্গে চোখাচোখি করে গাল ছড়িয়ে হাসল অঞ্জন, —সে ওরাই জানে।

টুকি মা'র পিছু পিছু এসে টোটোদের মাঝখানে বসে পড়েছে। দুজনের প্লেটের দিকে আশান্বিত চোখে তাকাচ্ছে। লুচির কোণা ভেঙে তার মুখে গুঁজে দিল টোটো।

অলকা হালকা ধমক দিল মেয়েকে,— টুকি, তুমি ভীষণ লোভী হয়েছ। ভাত খাওয়ার নামটি নেই, অন্যরা কেউ কিছু খেলেই...

টোটো চোখ বড় করে তাকাল টুকির দিকে,— এমা, তুই হেংলু হয়েছিস ?

টুকি দ্রুত দুদিকে মাথা নাড়ল।

—দেখেছিস তো তোর মা কেমন মিথ্যে মিথ্যে দোষ দেয় তোকে ? টোটো টুকির গাল টিপল, —বোনটা আমার হেভি মিষ্টি হয়েছে। ঠিক একটা সুগারকিউব।

টুকি আধো আধো বুলিতে বলল, —না, আচকিলিম।

—ও কে। আইসক্রিম। চকালেট বার।

অঞ্জনও এক টুকরো লুচি পুরে দিল টুকির মুখে,— উঁহু, ও একটা স্ট্রবেরি।

টোটো বলল, —আরেকটু বড় হ টুকি, তোকে আমি কলকাতায় নিয়ে চলে যাব।

অলকা হাসল,— নিয়ে গিয়ে ?

—ওখানেই স্কুলে ভর্তি করে দেব।

—আর আমি বুঝি মেয়ে ছেড়ে একা একা থাকব ?

টোটো চুপ করে গেল। ইচ্ছে করলেই কি টুকিকে নিয়ে যেতে পারবে টোটো ? এখানকার কেউই কলকাতায় গিয়ে থাকতে চায় না। দাদু তো থাকেই না, তুফানকাকা কাকিমাও ক্বচিৎ কখনও এক রাত আটকে গেলে হাঁসফাঁস করতে থাকে। কিসের এত টান বাপু মাধবপুরের ? সবজিবাগান। পুকুর ! বাড়ি ! হাঁস ! কী ? নাকি ওই মহিলার দায় ? বেচারা টুকিকেও এই গাঁয়ে পচে মরতে হবে। টোটো তো বাপু একটানা বেশি দিন মাধবপুরে এসে থাকতেই পারে না। দুদিনের জন্য এল, হইহই হল, বেড়ানো হল ব্যস, ওইটুকুই যথেষ্ট।

অলকা রান্নাঘর থেকে আরও দুটো করে লুচি এনে দিল অঞ্জন টোটোকে। জিজ্ঞাসা করল, —দিদি এখন কেমন আছে টোটো ?

—মা ? ঠিকই তো আছে।

—অপারেশন কবে হবে কিছু ঠিক হল ?

—কে জানে ! বলতে পারব না।

অলকা আর কথা বাড়াল না। টোটোও না। মা'র পেটে কিসব অপারেশান-টপারেশান করাতে হবে, তাই নিয়ে রোজই বাবার সঙ্গে এখন খিটিমিটি লাগছে মা'র। বাবা বলছে, করিয়ে নাও। মা'র জেদ, করাবে না। দাদাই দিদুন যে ক'দিন ছিল, সে ক'দিন যা সিজফায়ার চলেছে। এখন আবার শুরু হয়ে গেছে বক্সিং। তুমি চাও আমি অপারেশান টেবিলে মরে যাই ! আমি মরে গেলে তোমার সুখের রাস্তা পরিষ্কার হয় ! মা যে কেন হঠাৎ এত বেশি হিস্টিরিক হয়ে উঠল ? আগে তো এতটা ছিল না ! নাকি ছিল ? টোটোই ঠিক সেভাবে বুঝতে পারেনি ! অপারেশানটা করিয়ে নিলে যদি শরীরের কষ্ট কমে যায় তবে তো সেটা করিয়ে নেওয়াই উচিত।

নিজেকে কষ্ট দিতে কেন যে এত ভালবাসে মা ?

সিঁড়িতে ফটাস ফটাস শব্দ। হাওয়াই চটির। হিয়া আর পিউ নামছে। দুজনেই সালোয়ার কামিজ পাল্টে লঙ স্কার্ট পরে নিয়েছে। পিউর কানে ওয়াকম্যান। সিঁড়ির শেষ তিনটে ধাপ এক লাফে পার হল পিউ। মাদুরে বসে টুকিকে নিয়ে পড়েছে। চটকাচ্ছে মেয়েটাকে। ওয়াকম্যান কানে লাগিয়েই।

হিয়া সবজি বাগানের দিকে পা ঝুলিয়ে বসল। বাগান এখন ফাঁকা ফাঁকা। কিন্ডার গার্টেনের বাচ্চাদের মতো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুলকপি টোম্যাটো আর বেগুনের চারারা। না, দাঁড়িয়েও নেই, কাল রাতের বৃষ্টিতে তারা প্রায় ধরাশায়ী।

পা দোলাতে দোলাতে হিয়া জিজ্ঞাসা করল,— এই রাজর্ষি, এদের মধ্যে কোনগুলো ফুলকপির চারা রে ?

টোটোও কোনও গাছ চেনে না। আন্দাজে এক দিকে হাত দেখাল।

অলকা ঝিকঝিক হাসছে,— ওগুলো কপি হবে কেন ? ওগুলো তো বেগুনচারা।

—ওই হল। ওকে চেনালেই বা কত চিনবে ! টোটো পাশ কাটাতে চাইল। প্রাজ্ঞ মুখ করে প্রশ্ন করল, —আগেরবার এসে ইয়া বড় একটা কুমড়ো দেখেছিলাম, এবার যে কুমড়ো দেখছি না কাকিমা ?

—কুমড়ো আর লাগাচ্ছি না। জমিটা তো ছোট, অন্য গাছের বড্ড ক্ষতি হয়ে যায়।

—তাও তো বটে। টোটো ঘাড় নাড়ল।

হিয়া মুখ ঘুরিয়ে টোটোকে দেখছিল। টোটোর অজ্ঞতা ধরে ফেলে হাসছে ফিকফিক। টোটো অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

আটটা হাঁস ক্ষুদে নৌবহরের মতো টহল দিচ্ছে গোটা পুকুর। পদ্মফুলের কাছে এসে হঠাৎ হঠাৎ মুখ ডোবাচ্ছে জলে, কুশলী খেলোয়াড়ের মতো পুরো শরীর পাক খাইয়ে সোজা করছে, আবার সাঁ-সাঁ

সরে যাচ্ছে পুকুরের কোণে কোণে । এক ধূর্ত মাছরাঙা জলতলের খুব কাছ দিয়ে বিফলভাবে উড়ে চলে গেল । তার লেজের ছোঁয়ায় ঠিকরে উঠল কয়েক বিন্দু জল ।

দুটো হাঁস জলে নামেনি । এখনও তাদের কঞ্চি নিয়ে ধাওয়া করে চলেছে সৌমিক ।

টোটো চেঁচিয়ে ডাকল, —এই সৌমিক, হচ্ছেটা কি ? খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ।

—দাঁড়া, এই দুটোকে আগে জলে পাঠাই ।

—কঞ্চিটা আমাকে দে, আমি নামিয়ে দিচ্ছি ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘামভেজা মুখে টোটোকে কঞ্চি ছুঁড়ে দিল সৌমিক,— ঠিক আছে, তুইই ট্রাই কর ।

হাঁস দুটোকে দেখতে মজা লাগছিল টোটোর । কেমন ধূসর রঙ, তুলতুলে শরীর, কিন্তু ভারি পরিণত হাবভাব ! ঠিক যেন তার দিদুনটি । একই রকম দুলে দুলে হাঁটা ।

কঞ্চি হাতে হাঁস দুটোর পিছনে হাঁটছে টোটো । হাঁসেদের ভ্রূক্ষেপ নেই, টোটো কাছে গেলে তারা একটু দ্রুত ছোটে, আবার হাঁটে । ঢিকুর ঢিকুর ।

টোটো বেশ খেলা পেয়ে গেল । চরকি মেরে চলেছে গোটা পুকুর, ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে, —এই নাব নাব নাব ।

হিয়া পিউ অঞ্জন গলা মিলিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে, —বাক আপ রাজর্ষি । বাক আপ ।

টোটো ছুটতে শুরু করেছে । ছুটছে । ছুটছে ।

দুটো হাঁসই অত্যন্ত ঠ্যাটা । অবিরাম তাড়া খেয়েও জলে নামার কোনও লক্ষণ নেই তাদের, পাড় ধরে দৌড়চ্ছে দুলে দুলে । টোটো খুব কাছে গিয়ে পড়লে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাচ্ছে টোটোর দিকে, টোটোর কঞ্চি অগ্রাহ্য করে তেড়ে আসছে দু-চার পা, কর্কশ গলায় অভিশাপ দিচ্ছে টোটোকে । তাদের প্রতিরোধে পিছিয়ে যাচ্ছে টোটো, তাই দেখে কোরাসে হাসছে হংসযুগল । হেসে লুটিয়ে পড়ছে টোটোর বন্ধুরাও ।

টোটোর জেদ চেপে যাচ্ছিল । টোটোদেরই হাঁস টোটোকে বেইজ্জত করছে ! তাও কিনা বন্ধুদের সামনে !

চোয়াল কষে আবার লেগে পড়েছে টোটো । একটা হাঁসকে প্রায় নাগালে পেয়ে কঞ্চি ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিল, সুড়ুৎ করে কয়েক পা উড়ে গেল বদমাইশটা । শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না টোটো । পড়ে গেছে মাটিতে ।

বন্ধুরা দৌড়ে এল । কেউ ধরার আগে টোটো নিজেই উঠে বসেছে । হিয়া আলতো চাপড়ে পিঠ থেকে ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছিল, টোটো তার হাত সরিয়ে দিল ।

পিউ উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করল, —লাগেনি তো ?

রোষকষায়িত চোখে তাকাল টোটো, জবাব দিল না ।

বন্ধুরা ঝুপঝাপ বসে পড়েছে পাশে । চুপচাপ খানিকক্ষণ ।

টোটোর অস্বস্তি হচ্ছিল । অপমান ঢেকে হাসার চেষ্টা করল, —হাঁসের মাংস খেতে খুব ভাল, তাই না রে ?

—হ্যাঁ, ডাকরোস্ট দারুণ ডিলিশাস ।

—একটু হট, এই যা ।

—হট মানে ?

—হট মানে হট । খেলে শরীর গরম হয় ।

—হাঁসের বডিতে কি ফ্যাট বেশি থাকে ?

—না রে, ফাইবার বেশি । ছিবড়ে ছিবড়ে হয় ।

একটা বিষয় পেয়েই কথার ফুলঝুরি শুরু হয়ে গেছে । টোটো শুনছিল না । দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অবাধ্য হাঁসদুটোকে দেখছিল শুধু । বিড়বিড় করে বলল, —ওই হাঁস দুটোকে পুড়িয়ে খেলে কেমন

হয় ?

—যাহ্, এগুলো তোদের পোষা হাঁস না !

—পোষা বলে কি মাথা কিনে রেখেছে ?

হিয়ার মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল,— অত সুন্দর দুটো প্রাণীকে তুই মারতে পারবি ?

না পারার কি আছে ! টোটো নিজের মনে বিড়বিড় করল। টোটোকে যারা অপমান করে, টোটো তাদের সহজে ক্ষমা করে না।

মোপেডের আওয়াজ হচ্ছে বাইরে। ছন্দার বাবা আর তুফান ফিরল। মুরগি কিনে কেটেকুটে আনতে অনেকটাই বেলা হয়েছে তাদের।

তুফান ডাকছে টোটোদের। বন্ধুদের সঙ্গে উঠোন অবধি এসেও ঝট করে পুকুরপাড়ে ফিরে এল টোটো। খুঁজেপেতে একটা প্রকাণ্ড থান ইট জোগাড় করে হাঁস দুটোর দিকে তাক করে ছুঁড়ল। লাগল না, তবে ত্রস্ত দুই হাঁস ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে নেমে গেছে জলে।

টোটোর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল। বিজয়ীর হাসি।

৩০

শেষদুপুরে আমগাছ তলায় অন্ত্যাক্ষরী খেলার আসর বসেছে।

ছন্দার বাবা কমলেশ আসরের প্রধান উদ্যোক্তা। কমলেশ মানুষটি খুব রসিক, সারাক্ষণ মজার মজার কথা বলছেন। চাকরি সূত্রে ঘুরেছেন বহু জায়গায়, গল্পের ভাঁড়ারটিও তাঁর অফুরন্ত। মাত্র কয়েক ঘণ্টার আলাপেই হিয়া পিউকে বশ করে ফেলেছেন তিনি। অঞ্জন সৌমিক খাওয়াদাওয়ার পর একটু ঘুমোনোর তোড়জোড় করছিল, পুকুরে প্রমত্ত জলকেলি করে দুজনেই খুব ক্লান্ত, কমলেশ তাদেরও টেনে এনেছেন গাছতলায়। অলকা স্মৃতিকণা তুফান এমনকী টুকিও আসরে মজুত।

শিবসুন্দর আসেননি। বিশ্রাম নিচ্ছেন ওপরে। মধ্যাহ্নে একটু চোখ না বুজে নিলে বিকেলে কলে বেরোতে অসুবিধে হয় তাঁর। মনোরমাও আজকাল প্রায়শই দুপুরবেলার দিকে জেগে থাকেন, তাঁর পাশে থাকতেই হয় শিবসুন্দরকে।

গানের পর গান চলছে। ক দিয়ে শেষ, ক দিয়ে শুরু। ম দিয়ে শেষ, ম দিয়ে শুরু। সুরে বেসুরে মেতে উঠেছে গাছতলা। কমলেশের পুরনো গানের স্টক দারুণ, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খাচ্ছে পিউরা। মাঝে মাঝে বানিয়ে বানিয়েও গান গাইছেন কমলেশ, ধরতে পারলে চোট্টামি চোট্টামি করে চেঁচিয়ে উঠছে সবাই।

খেলার আঙিনা থেকে সরে এল টোটো। পুকুরপাড়ে গিয়ে বসেছে। একা হয়ে। ছোট ছোট ইটের কুচি তুলে আনমনে ছুঁড়ছে জলে। তির্যক তরঙ্গ গোল হয়ে হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পুকুরে। পদ্মফুল নেচে উঠছে তিরতির। সূর্য সরে যাওয়ার পর জল এখন ছায়াময়। কালো ছায়ামাখা পুষ্করিণী যেন আরও স্বচ্ছ। আরও নিবিড়।

টোটোকে খুঁজতে হিয়া এল পুকুরপাড়ে, —কি রে, এখানে এসে বসে পড়েছিস যে ?

টোটো ঘাস ছিঁড়ছে,— তুইও বোস না।

—খেলবি না ?

—ওসব চাইল্ডিশ খেলা আমার ভাল লাগে না।

—ইহ্, আজকাল বলে কত বড় বড় লোকেরা অন্তাকশরি খেলে ! স্কুল কলেজে কম্পিটিশান হচ্ছে, টিভিতে জোর প্রোগ্রাম হচ্ছে...

—হোক গে, ওসব লো আইকিউ গেম। পিউ সৌমিকদের জিজ্ঞেস করে দেখিস, আমি জীবনে ওসব খেলায় থাকি না।

হিয়া পাশে বসল, —যাই বল, অন্তাকশারিতে কিন্তু মেমারি শার্প হয়।

—আমার মেমারি যথেষ্ট শার্প। তিন বছর বয়সের ইনসিডেন্ট আমি মনে করতে পারি। গান গেয়ে গেয়ে মেমারিতে শান দেওয়ার আমার দরকার হয় না।

—ইশশ, লেখাপড়ায় ভাল বলে তোর দেখছি খুউব ইগো!

—ইগো থাকা কি খারাপ? লাইফে শাইন করতে গেলে ইগো মানুষকে কনফিডেন্স দেয়।

সব কটা হাঁসই এখন ভাসছে পুকুরে। স্থির। যেন নোঙর ফেলা নৌকো। অথবা আরও বেশি স্থির। পটে আঁকা ছবির মতো। অবাধ্য হাঁস দুটোও এখন ছবির অংশ। তাদের পৃথক করে চেনা যায় না আর।

পুকুরে চোখ ফেলে ফিক করে হাসল পিয়া। হাসিটুকু ঠোঁটে টিপে বলল, —কী খেলা তোর ভাল লাগে রে রাজর্ষি? ডাক চেজিং?

টেটো গোমড়া হয়ে গেল। চোখ সরু করে একবার দেখল হিয়াকে।

হিয়া একটুক্ষণ নিশ্চুপ। হঠাৎ কোমল স্বরে বলল,—এত সুন্দর পাখিগুলোকে তুই মারতে চাইছিলি?

টোটো হালকা গলায় বলল, —ওরকম বজ্জাতদের মারাই উচিত।

—তোর কথা না শুনলেই বুঝি বজ্জাত? ওদের নিজেদের কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?

—আমি অবাধ্যতা পছন্দ করি না।

—সুন্দর কিছু দেখলে তোর মায়া হয় না?

এই বয়সে কোনও কথাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া অসম্ভব! টোটো তর্ক জুড়ে দিল, —পৃথিবীতে সব সুন্দরই সুন্দর নয়। অনেক আগলি জিনিসও সুন্দর প্যাকেজে মোড়া থাকে।

—ফর এগজাম্পল?

—এগজাম্পল তো চোখের সামনেই ঘোরে। কত লোক দেখবি আপাতদৃষ্টিতে দারুণ সোবার, যে দেখে সেই বলে ওরকম আরেকটা ক্যারেকটার হয় না। কিন্তু একটু লোকটার ভেতরে ঢোক, দেখবি লোকটাকে যত ভাল ভাবছিস তত ভাল মোটেই নয়। রাদার কুৎসিত। কিংবা ধর, তুই কাউকে খুব রেসপেক্ট করিস, ভগবানের থেকেও তাকে সুন্দর মনে হয়, সেই লোকটার কোনও নেগেটিভ সাইড যদি তোর চোখের সামনে চলে আসে, তা হলে কি লোকটাকে তোর অত সুন্দর মনে হবে?

হিয়া হাঁটুতে থুতনি রেখে কি যেন ভাবল একটু। তারপর বলল, —সেটা ঠিক আছে। কিন্তু তার সঙ্গে ওই হাঁসেদের সম্পর্ক কী?

—নেইও বটে, আবার আছেও। যেসব অ্যানিমাল বেশি সুন্দর, তারা বেশি পাজি। সেবার রাজস্থানে একটা ময়ূরকে ভালবেসে গায়ে হাত বোলাতে গেলাম, অমনি ঠুকরোতে এল! তারপর ধর, সাপ কি দেখতে খারাপ? চিতা বাঘ? রয়েল বেঙ্গল টাইগার? বরং তুলনায় কুচ্ছিত প্রাণীরা অনেক বেশি ভাল। হাতি গণ্ডার হিপোপটেমাস, এরা প্রত্যেকেই অনেক আন্ডারস্ট্যান্ডেবল।

হিয়া হেসে ফেলল, —তোর দেখছি সুন্দরের ওপর একটা অ্যালার্জি আছে। সুন্দর দেখলেই তুই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাস।

—ঠিক তা নয়। বলতে পারিস খুব কনশাস হয়ে যাই।

—হুম, বুঝলাম।

—কী বুঝলি?

—বুঝলাম সেদিন কেন তুই আমার সুন্দর বন্ধুটার সঙ্গে অমন খারাপ ব্যবহার করেছিলি।

—কোন বন্ধু?

—তিতির।

—ও। টোটো অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

হিয়া বলল, —কত উৎসাহ নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে গেল, তুই... ! আমি লক্ষ করেছি স্কুলেও তিতিরের সামনাসামনি পড়ে গেলে তুই ওকে ইগনোর করিস । অথচ তোদের মধ্যে নাকি একটা ফ্যামিলি টাই আছে !

টোটো ভেতরে ভেতরে রেগে যাচ্ছিল । হিয়া কি একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়ছে না ?

হিয়া আবার বলল, —তোর বিহেভিয়ারটা কিন্তু ভারি স্ট্রেঞ্জ ! তিতির খুব হার্ট হয়েছে সেদিন ।

টোটো রাগটাকে চড়তে দিল না । যতই হোক হিয়া আজ তার অতিথি । মুখ অন্য দিকে রেখেই বলল, — তোর বন্ধু তোকে কিছু বলেছে নাকি ?

—নাহ । তিতির কারুর কাছেই কিছু বলার মেয়ে নয় । সেই কবে থেকেই তো দেখছি । এত সফট । এত টেন্ডার । আমরা তো পেকে ঝুনো হয়ে গেছি, ও এখনও কী ইনোসেন্ট ! একদম বাচ্চাদের মতো ।

হুঁহ । বাচ্চা না আরও কিছু । রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা লোফার মার্কা ছেলের সঙ্গে লাইনবাজি করছিল... ! দেবে নাকি হিয়াকে কথাটা বলে ? থাক, তা হলে আবার প্রশ্ন উঠবে সেই বা কেন তিতিরের পিছন পিছন বেরিয়ে এসেছিল সেদিন !

কেন বেরিয়ে এসেছিল টোটো ? যে মহিলার জন্য টোটোদের বাড়ির সুখ শান্তি বিপন্ন, তার মেয়েকে তো টোটোর অপমান করাই উচিত । কিন্তু সেই মুহূর্তে মেয়েটার শুকনো মুখ দেখে কেন যে মন খচখচ করে উঠল ! মায়া ? শৈশবের বন্ধুত্বের স্মৃতি ? কীই বা এমন বন্ধুত্ব ছিল ! মা চায় না বলে কবে থেকেই তো তিতির বাপ্পার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ছেড়ে দিয়েছে টোটো । ফোন এল তো বাবাকে ডেকে দিল, ব্যস । বাবার সঙ্গে কি সত্যি কোনও অন্য রকম সম্পর্ক আছে তিতিরের মা'র ? বাবাই বা কেন ওদের বাড়ি যাওয়া ছাড়তে পারে না ? মা এত ঝগড়া করা সত্ত্বেও ? নাকি মা-ই অহেতুক সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ? সহজ সরল সম্পর্ককে অকারণে জটিল করে তুলেছে ?

টোটো বুঝতে পারে না । টোটোর মা'র জন্য কষ্ট হয় । বাবার জন্যও । তবে মা বাবার দেখাদেখি টোটোও এখন মুখে নিখুঁত মুখোশ এঁটে নিতে শিখে গেছে । এক হাস্যোচ্ছল প্রাণবন্ত টিনএজারের মুখোশ ।

মুখোশটা এঁটে নিয়ে হাসল টোটো, —ফালতু বকবক ছাড় তো । আমরা কি এখানে শুধু বাড়িতে বসে থাকার জন্য এসেছি নাকি ? বেড়াতে বেরোবি না ?

গাছতলায় সমবেত হাসির রোল উঠেছে । জোর চেঁচাচ্ছে সৌমিক আর অঞ্জন । ঝগড়া লেগে গেল নাকি ! বাকিরা তা হলে হাসে কেন !

সূর্য দূরে বাঁশঝাড়ের মাথায় নেমে এসেছে । দুপুরের বিশ্রাম সেরে আবার পুরো দমে ওড়াউড়ি শুরু করেছে পাখিরা । একটা মৌটুসি পিছনের সজনে ডাল থেকে সমানে পিকপিক ডেকে চলেছে । নরম উত্তুরে বাতাস বইছে একটা । হালকা ভাবে ।

টোটো উঠে দাঁড়াল ।

তুফান বলল, —হবে নাকি খেলাটা ?

বন্ধুদের দিকে উৎসুক চোখে তাকাল টোটো,— খেললে হয় । এই, তোরা যাবি রাজবাড়ির দিকে ?

রাজবাড়ি নিয়ে তুফানের সঙ্গে এক আজব খেলা চলে টোটোর । মাইন্ড মাইনিং । হৃদয় খনন খেলা । ভাঙা রাজবাড়িটাকে নিয়ে ফি বার একটা করে গল্প ফাঁদতে হয় টোটোকে । তুফানকেও । গল্প মানে বাড়িটার একটা ইতিহাস তৈরি করা । কবে কোন রাজা বাড়িটা নির্মাণ করেছিল, রাজপ্রাসাদে যারা থাকত তারা কেমন ধারার মানুষ ছিল, কেনই বা বাড়িটা পরিত্যক্ত পোড়ো হয়ে গেল, কী করে হল, এই সব । তুফান বলে ওই গল্প থেকেই নাকি ধরা পড়ে কথকের মনের

চেহারা। টোটোর ফাঁদা কাহিনী শুনে তুফান এক সময়ে বলত টোটোর মনের ভেতর নাকি এক সন্ন্যাসী লুকিয়ে আছে। এখন বলে টোটো খুব হিসেবি, চতুর। তুফানের বানানো উপাখ্যান শুনে টোটোর বরাবরই এক মন্তব্য। তুফানকাকা পাগল। তার গল্পের গরু সর্বদাই গাছে চড়ে থাকে। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের দেখা হয়ে যায়। শশাঙ্কর বউ-এর নাম হয়ে যায় বাসবদত্তা। ওই রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ অলিন্দে ঘোরাফেরা ঘরে হর্ষবর্ধন, গোপন গর্ভগৃহে সভা বসে আলাউদ্দিন খিলজির। সামনের সরু খাল যোজনব্যাপী চওড়া নদী হয়ে যায়, সেই নদীতে মগ পর্তুগিজ জলদস্যুদের দেখতে পায় তুফান।

বন্ধুরা জানে এসব। টোটোই গল্প করেছে। কিন্তু ওই খেলায় মোটেই তাদের উৎসাহ নেই আজ। অঞ্জন হিয়া পিউ মন দিয়ে নিরীক্ষণ করছে তুফানের নতুন মোপেড। অঞ্জন বায়নার সুরে বলল,— কাকা, আমি একটু মোপেড চালাব ?

তুফান শশব্যস্ত হয়ে উঠল,— নিশ্চয়ই। চালাও না।... তুমি পারবে তো ?

—খুব পারব। কলকাতায় বাবার স্কুটারটা তো চালাই।

—পুলিশ ধরে না ? তোমার তো লাইসেন্স পাওয়ার বয়স হয়নি।

—সেভাবে কি চালাই ? ওই মাঝে মধ্যে একটু-আধটু....

—দেখো, সাবধানে যেয়ো। খোয়া ফেলা রাস্তা....উঁচু...নিচু....

তুফানের কথা শেষ হওয়ার আগেই অঞ্জন মোপেড চালিয়ে বেরিয়ে গেল। হিয়া পিউ তুফানকে ঘিরে ধরেছে, আমরাও চালানো শিখব কাকা।

—ঠিক আছে, হবে'খন। তুফানের তামাটে মুখে অনাবিল হাসি,— তোমরা একটা কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

—কিছু হবে না। আমরা ঠিক শিখে নেব।

—এক বিকেলেই ?

—আজ বিকেল আছে। কাল সারা দিন আছে।

টোটো মনমরা মুখে দূরের ধ্বংসস্তূপটাকে দেখছিল। সৌমিককে বলল,— খেললেই পারতিস। দারুণ সাইকোলজিকাল গেম।

—ধুস। সৌমিক খানিক তফাতে দাঁড়ানো তুফানকে দেখে নিল। মিচকি হেসে টোটোর কানের কাছে ফিসফিস করল,— ওই রকম পোড়ো বাড়িতে বসে কী করতে মজা লাগে বল তো ?

—কী ?

হাতের ইশারায় বোতল দেখাল সৌমিক, —এইটা। হেভি জমে।

টোটো সন্দিগ্ধ হল, —তুই ওসব এনেছিস নাকি ?

সৌমিক চোখ টিপল, —তোর তুফানকাকাকে ভাগা না। ....ক্যান বিয়ার আছে একটা।....বাবার।....ঝেঁপে এনেছি।

—কক্ষনও না। টোটোর গলা চড়ে গেল,— তোদের কতবার করে বলেছিলাম না মাধবপুরে এসব চলবে না ?

—খেপে গেলি তো ? শয়তানি হাসি হেসে টোটোর কাঁধ জড়িয়ে ধরল সৌমিক, —তোর একটুও সেন্স অফ হিউমার নেই। আরে, ঠাট্টা করছি রে।

—বাজে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

টোটো গুম। সৌমিক সব পারে। গত বছর দার্জিলিং-এ এক্সকারশানে যাওয়ার সময়ে ট্রেনে যা করেছিল ! বোতল-ফোতল কিনে....ট্রেনের টয়লেটে বারবার গিয়ে...ভাগ্যিস স্যাররা টের পাননি ! টোটোও অবশ্য চুমুক মেরেছিল একটু। তা বলে দাদুর এখানে এসে.... !

টোটোর রাগ রইল না বেশিক্ষণ। বন্ধুরা তার অবুঝ নয়। ঠাকুমাকে নিয়ে কোনও অশোভন কৌতূহল দেখায়নি, ঘরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারেনি, এটাও তো টোটোর বোঝা উচিত।

অঞ্জন ফিরছে না এখনও। পুরো এলাকা চক্কর মারছে বোধ হয়। তুফানের সঙ্গে শ্মশানের দিকে এগোল টোটোরা। গ্রামে আসার প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে গেছে বন্ধুদের, মাধবপুরের কিছু দেখেই তারা আর তেমন রোমাঞ্চিত হচ্ছে না। বিখ্যাত শ্মশানটি দেখেও না। শ্মশান ঘিরে যেসব কিংবদন্তি আছে সেসব শুনেও না। একমাত্র হিয়াই সান্ত্বনার মতো টোটোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখল শিবমন্দির, অশ্বত্থতলা, মড়া পোড়ানোর জায়গা। টোটোর ভাগ্যটাও খারাপ, শ্মশান আজ সাধুবিহীন।

অঞ্জন ফিরল সন্ধে নামিয়ে। হিয়া পিউয়ের আজ মোপেড শেখা হল না।

রাত্রে খেতে বসে শিবসুন্দর জিজ্ঞাসা করলেন,— কি, তোমাদের মাধবপুর ভাল লাগছে তো?

ভেতর বারান্দায় পাত পেড়ে খেতে বসেছে সকলে। সমস্বরে বলে উঠল, —ফ্যান্টাসটিক।

—একটু বোধ হয় বেশি বললে। শিবসুন্দর হাসলেন,— আমাদের মাধবপুর ফ্যান্টাসটিক লাগার মতো কিছু নয়। এখানে পাহাড় নেই, জঙ্গল নেই, সমুদ্র নেই....

—না না, তা নয়। অঞ্জন ঝটপট বলল,— যে কোনও আউটিংই আমাদের দারুণ লাগে। আমার তো সব দেখা হয়ে গেছে।

—গুড। কাল পারলে রামনগরের দিকে ঘুরে এসো।

—ওদিকে স্পেশাল কিছু আছে?

—পুরনো মন্দির আছে একটা। আর্কিটেকচারটা বেশ ভাল। সাবেকি আটচালা প্যাটার্নের।

—মন্দির-টন্দির আমাদের ভাল লাগবে না দাদু। কাল আমরা এখানেই ঘুরব ফিরব, পুকুরে অনেকক্ষণ ধরে চান করব....

কমলেশ বলে উঠলেন,— তোদের দেখে খুব হিংসে হচ্ছে রে। বয়সটা যদি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর কমিয়ে ফেলতে পারতাম।

টোটো ভুরু নাচাল,— কী করতে?

—তোদের মতো একপাল বান্ধবী জুটিয়ে বেড়াতাম।

—বান্ধবী তো সঙ্গেই আছে। শিবসুন্দর বললেন।

—বান্ধবী! কমলেশ আড়চোখে স্মৃতিকণাকে দেখে নিয়ে ছদ্ম শ্বাস ফেললেন, —আপনার বেয়ান বান্ধবী নন, উনি গন্ধমাদন। আমি ওঁকে বয়ে বেড়াই।

স্মৃতিকণা মৃদু ঝামটা দিলেন,— গন্ধমাদন কে বইত সেটা খেয়াল আছে?

—আছে বইকি। ভক্ত হনুমান। আমিও তো ভক্ত হনুমানই। বুক চিরে সীতা মায়ের অয়েলপেন্টিংটা দেখিয়ে দেব?

হাসির চোটে সবার বিষম লাগার জোগাড়। শিবসুন্দরও খকখক কাশতে শুরু করেছেন। দু ঢোক জল খেয়ে সামলালেন।

—আপনি পারেনও বটে। কথা বলতে বলতে টোটোর দিকে ফিরলেন শিবসুন্দর, —টোটো, তোর দাদাইয়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে?

—কী ব্যাপারে বলো তো?

—তোর দাদাই দিদুন তো আর মাধবপুরে থাকতে চাইছেন না, তোদের সঙ্গেই চলে যেতে চাইছেন।

—কেন দাদাই, তোমাদের তো কালীপুজোর আগের দিন যাওয়ার কথা!

—না রে ভাই, তোদের সঙ্গে ফিরলে আমার কত সুবিধে। অত বড় একটা লাগেজ ভাগাভাগি করে বওয়া যাবে।

স্মৃতিকণা চোখ পাকালেন, —ফের বাজে কথা? না রে টোটো, পুজোয় গিয়ে তোর মাসির বাড়ি একদিনও থাকিনি, ওরা খুব চটে আছে। ওখানে ক'দিন থেকে, তোর বাবার নার্সিংহোম ওপেন হওয়ার পর জলপাইগুড়ি ফিরব। আমাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরতে তোদের অসুবিধে হবে?

—কিছু মাত্র না। ইট উইল বি আওয়ার প্লেজার।

খেয়ে উঠে টোটোর বন্ধুদের তারা চেনাচ্ছিলেন কমলেশ। কৃত্তিকা, অভিজিৎ, লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল, সিকিয়ারস, রোহিণী আরও কত কি।

টোটো তারা চিনছিল না, আকাশ দেখছিল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশ ভরে আছে ঘাসফুলে।

পরদিন সকালে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

টোটোরা দোতলার বড় ঘরে আড্ডা মারছিল, হট্টগোল শুনে নেমে এল নীচে। শিবসুন্দরের চেম্বারে চার পাঁচটা লোক এসেছে, তাদের সঙ্গে জোর বাকবিতণ্ডা চলছে শিবসুন্দরের।

শিবসুন্দর উত্তেজিতভাবে বলছেন, —আপনারা ভেবেছেনটা কী ? আপনাদের মন্ত্রী আসছে বলে আমাকেও ল্যাঙ ল্যাঙ করে ছুটতে হবে ?

একজন মাঝবয়সী লোক প্রতিবাদ করে উঠল,— ওভাবে বলছেন কেন ডাক্তারবাবু ? আরও তো কত লোককে ডাকা হয়েছে। এটা ঠিক পলিটিকাল মিটিং নয়, লোকাল উন্নতি নিয়ে একটা ফ্রি ডিসকাশান।

—আমাকে উল্টোপাল্টা বোঝাবেন না। ইলেকশানের আগে এসব মিটিংকে কি বলে আমি জানি।

তুফান শিবসুন্দরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রায় পাহারা দেওয়ার ভঙ্গিতে। সেও বেশ উত্তেজিত, —আপনারা বাবাকে এরকম বারবার উত্যক্ত করছেন কেন ? বাবা তো আগেই যাবেন না বলে দিয়েছিলেন।

এক যুবক ধমকে উঠল,— আপনি চুপ করুন। যাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে তাঁকেই কথা বলতে দিন।

আলতো ঠেলে তুফানকে সরালেন শিবসুন্দর, —আপনারা কী চান বলুন তো ? আমি কোনও পার্টির মধ্যেই নেই, থাকবও না, এটা তো আপনারা বুঝেই গেছেন।

পিছন থেকে একজন বলল,— আপনি কিন্তু কাল দেবনাথদের বাড়ির মিটিং-এ গেছিলেন ডাক্তারবাবু।

—মিটিংএ যাইনি। দেবনাথের ছেলের জ্বর দেখতে গেছিলাম, তখন ওদের বাড়ি মিটিং চলছিল।

—আমাদের কাছে খবর আছে আপনি মিটিং-এ বসেছিলেন।

—ভুল খবর পেয়েছেন। আমি মিটিং-এর ঘরে বসে প্রেসক্রিপশান লিখছিলাম। শিবসুন্দর বাঁকা হাসলেন,— বাই দা বাই, আমি জানতে পারি আপনারা আমাকে কৈফিয়ত তলব করার কে ? আমি কি আমার কোনও দরকারে আপনাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি কখনও ?

—আমাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে কখনও না কখনও দরকার হয় ডাক্তারবাবু। মধ্যবয়সী লোকটির স্বর অতি নীরস।

—ধোপা নাপিত বন্ধ করার ভয় দেখাচ্ছেন নাকি ? শিবসুন্দর অট্টহাসি হেসে উঠলেন,— ডাক্তারদের সঙ্গে লেগে সুবিধে হয় না। ওয়েল, আপনারা এখন আসুন, আমার পেশেন্টরা বসে আছে। আপনাদের থেকেও ওদের দিকে আমার অ্যাটেনশান দেওয়াটা বেশি জরুরি।

লোকগুলো তবু বেরোয়নি, দাঁড়িয়ে আছে। শিবসুন্দর তাদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে একজন রুগীকে ডাকলেন, কথা বলতে শুরু করলেন তার সঙ্গে। লোকগুলো হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে, তারপর বেরিয়ে গেল।

তুফান মিন মিন করে বলল,— এত রেগে যাওয়ার কী দরকার ছিল বাবা ? ওরা এখন ঘোঁট পাকাবে...

কমলেশ ঢুকে পড়েছেন চেম্বারে। টোটোরাও।

কমলেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন,— মাধবপুরেও এসব শুরু হয়েছে নাকি ?

ক্ষণিক উত্তেজনা সামলে নিয়েছেন শিবসুন্দর। স্মিত মুখে বললেন, —দেখতেই তো পাচ্ছেন। এই এরাই আগে কী বিনয়ী ছিল ! পাওয়ার করাপ্টস এভরিথিং বেয়াই মশাই।

কমলেশ হাসতে পারলেন না। বললেন,— আমি মশাই ভীতু মানুষ। আমি তো বুঝি নীরব থাকাই ভাল। যাবেন বলে দিলেই পারতেন, পরে নয় একটা অজুহাত দেখিয়ে যেতেন না।

—নীরবই তো ছিলাম এত দিন। এখন দু পক্ষই বিরক্ত করতে শুরু করেছে। ওই যে দেবনাথের কথা বলে গেল, দেবনাথ নির্ঘাত রটিয়েছে আমি ওদের পার্টিতে জয়েন করছি। এদের ডেঁটে দিলাম, এখন আর ওরাও ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।

—তবু আমি বলব, চুপ থাকলেই পারতেন। বোবার শত্রু নেই।

—ভুল কথা। নীরবতা ততক্ষণই ভাল যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা সমর্থন বলে না মনে হয়। আপনার রামকৃষ্ণদেবও তো বলেছেন, ছোবল না মারিস, ফোঁস করতে দোষ কী? রুগীর হাতের নাড়ি টিপলেন শিবসুন্দর,— কী রে টোটো, তোরাও ওরকম মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, খেল গিয়ে।

বন্ধুরা দোতলায় ফিরে জোর আলোচনা জুড়েছে। গ্রামেও আজকাল রাজনীতি কেমন প্রবল হয়েছে তাই নিয়ে ঘোর তর্ক। শিবসুন্দরের সাহস দেখেও সকলে অভিভূত।

টোটো ঠিক খুশি হতে পারছিল না। দাদুর জন্য কেমন যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। একটা অসুস্থ মানুষ নিয়ে থাকে দাদু, পাশে তুফানকাকা আর কতটুকুই বা ভরসা?

রাত্রে শিবসুন্দরকে কথাটা বলেই ফেলল টোটো, —তোমার এখানে এসব ঝামেলা হচ্ছে, শুনলে তো বাবা টেনশান শুরু করে দেবে।

শিবসুন্দর হেসে টোটোর মাথায় হাত রাখলেন, —তোর বাবা আমার কথা ভাবে?

—ভাবে বইকি।

—তা হলে বাবাকে এসব বলিস না। চেপে যাস।

—কেন বলব না? নিশ্চয়ই বলব। তুমি এখানে শত্রু বাড়াবে....

—আহ টোটো শোন, আমার অ্যাবসেন্সে আমার এগেনস্টে কমপ্লেন করা কি ঠিক? আমি কেস ডিফেন্ডই করতে পারব না।

টোটো এক সেকেন্ড ভেবে বলল, —ঠিক আছে, নার্সিংহোম ওপেনিং-এর সময় তো আসছ, তখন তোমার সামনেই বলব।

শিবসুন্দর ধূর্তের মতো হাসলেন, —আমি তো তোদের নার্সিংহোম ওপেনিং-এ যাচ্ছি না।

—সে কী কথা। টোটো প্রায় আঁতকে উঠল, —বাবা যে ভীষণ দুঃখ পাবে। একটু গিয়ে দাঁড়াবে না?

—কিছু দুঃখ পাবে না। শিবসুন্দর গম্ভীর, —তোর বাবা জানে আমি যাব না।

৩১

ভাইফোঁটার পর দিন রঘুবীরের সঙ্গে উলুবেড়িয়া গেল আদিত্য। দেড়টা নাগাদ অফিসে পৌঁছে দেখল রঘুবীরের লোক চেয়ারে নেই। আগের দিনও ছিল না। কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় লোকটা! সরকারি অফিসে এখনও পুজোর আমেজ। টেবিলে কাজকর্ম নেই, অনেক চেয়ারই ফাঁকা। গোটা ঘরেই কেমন যেন ঝিমুনি ঝিমুনি ভাব। দেখে মনে হয় এখন যেন হেমন্ত নয়, শীত ঋতু।

এক ছোকরা নিবিষ্ট মনে বাংলা খবরের কাগজ খুলে শব্দজব্দ করছে। রঘুবীর তার টেবিলে গেল, —কি দীপকভাই, পুজো কেমন কাটল?

ছোকরার একটা চোখ কাগজ থেকে উঠেই নেমে গেল, —ভাল। আপনার?

—আপনারা ভাল থাকলে আমিও ভাল। সুজিতবাবু কোথায়?

—এসেছেন। আছেন।

—কিন্তু কোথায়?

—আমি তো আপনার মতো গুনতে পারি না, বলব কী করে ?

রঘুবীর একটু ঝুঁকল, —আমার অর্ডারটার কিছু খবর জানেন ?

—সুজিতদার কেস আমি ঠিক বলতে পারব না। রঘুবীরের দিকে ভাবিত মুখ ওঠাল ছোকরা, —তিন অক্ষরের শব্দ। র দিয়ে শেষ। মানে হল গিয়ে পাখি। কী হতে পারে ?

রঘুবীর যেন জানে অথচ রহস্য করছে এমন মুখে আদিত্যকে বলল, —কি রায়দা, বলে দিন।

আদিত্য মাথা চুলকোল। ঝপ করে মনেও পড়ে গেল, —খেচর ?

—তাই তো। হুঁ। খেচর। ছোকরা দ্রুত ছকে পেনসিল চালাল, —যান না, স্যার ঘরে আছেন। স্যারের সঙ্গে কথা বলে দেখুন।

দু' পা এগোতেই পিছু ডাকল ছোকরা, —কি রঘুবীরবাবু, একটা সিগারেট খাইয়ে গেলেন না ?

রঘুবীরের ইশারায় তড়িঘড়ি ফিরল আদিত্য। শুধু সিগারেটই দিল না, মিউজিকাল লাইটার ছোকরার মুখের সামনে ধরে জ্বালিয়েও দিল সিগারেট।

টুংটাং শব্দ বাজছে লাইটারে। একটা চেনা সুর।

ছোকরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল, —বাহ, দারুণ লাইটার তো ! ফরেন ?

আদিত্য আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল, —জাপানি। আমার ভগ্নীপতি প্রেজেন্ট করেছে।

ছোকরা জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। লুব্ধ স্বরে বলল, —কদ্দিন ধরে আমার একটা এরকম লাইটারের শখ !

আদিত্য ভয় পেয়ে গেল। সদ্য কালই জয়ির হাত দিয়ে লাইটারটা পাঠিয়েছে শংকর, এর মধ্যেই চোট হয়ে যাবে নাকি ? মিনমিন করে বলল, —আপনার পছন্দ ? বললে আনিয়ে দিতে পারি।

—থাক। অনেক দাম। লাইটার ফেরত দিয়ে অন্য শব্দের সন্ধানে ডুব দিল ছোকরা।

আদিত্য কথা বাড়াল না। খাজুরা করতে গেলেই এক্ষুনি গাঁটগচ্চা যাবে। গতবার উলুবেড়িয়ায় এসে একটা বিলিতি ডটপেন দিয়ে যেতে হয়েছে সুজিত মণ্ডলকে। চাঁদু গত বছর দিয়েছিল পেনটা। কী যত্ন করে ব্যবহার করত আদিত্য ! তা পেন যাক দুঃখ নেই, কিন্তু কাজ কেন বেরোচ্ছে না ? রঘুবীর আজ নিয়ে বোধহয় বার ষোলো এল এখানে। আদিত্য এই তৃতীয়বার। কবে থেকে খুড়োর কলের মতো অর্ডারটা ঝুলছে নাকের সামনে, কিছুতেই জুটছে না। আজ একটা হেস্তনেস্ত হওয়াই উচিত।

রঘুবীরের পিছন পিছন অফিসারের চেম্বারে ঢুকে আদিত্য দাঁড়িয়ে পড়ল। গোলগাল চেহারার স্যারটি এখন আহারে নিমগ্ন। টিফিনকৌটো খুলে রুটি আর ঢ্যাঁড়োশের চচ্চড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে থুপ করে রাখা এক দলা ছানা। ছোট্ট প্লাস্টিকের প্যাকেটে এক চিমটে চিনিও আছে।

ঘরে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এক্কেবারে নিকোনো। ফাইল কাগজ কিচ্ছুটি নেই। টেবিলের কাচের নিচে অসংখ্য ভিজিটিং কার্ড। এক কোণে ঘাড় নোয়ানো টেবিল ল্যাম্প, অন্য কোণে ডেট ক্যালেন্ডারঅলা দামি পেনস্ট্যান্ড। ডেট ক্যালেন্ডারে এখনও সেপ্টেম্বর মাস। পেনস্ট্যান্ডে কলম নেই।

বছর পঞ্চাশের স্যারটি আস্ত দুটো মানুষ দেখে বেশ বিব্রত যেন। আদিত্যরা তার খাবার কেড়ে নেবে এমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে টিফিনকৌটোর মুখ চাপা দিয়েছে দু হাতে, —কী ব্যাপার ?

লম্বা শরীর খানিকটা নোয়ালো রঘুবীর, —অর্ডারটার ব্যাপারে এসেছিলাম স্যার।

—কীসের অর্ডার ? কোন অর্ডার ?

—সেই যে স্যার উদয়নারায়ণপুরে কয়েকটা কালভার্ট সারানোর কাজ। মহালয়ার আগে এলাম... সুজিতবাবু ছিলেন... আপনার সঙ্গে কথা হল...। আপনি বললেন দু-একদিনের মধ্যে ইস্যু হয়ে যাবে।

—বলেছিলাম ? কী নাম আপনাদের ?

—ত্রিমূর্তি এন্টারপ্রাইস স্যার। বলতে গিয়ে আদিত্যর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, —আমরা

আগস্ট মাসে কোটেশন জমা দিয়েছি।

নামটা স্মরণ করার ছলে মুখের ভুক্তাবশেষ চিবিয়ে নিল স্যার। গিলল। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে টিফিন কৌটোর ঢাকনা বন্ধ করে হাত জড়ো করল কোলের কাছে। বলল, —হুম, মনে পড়েছে। অর্ডারটা তো এখনও হয়নি।

—কবে হবে স্যার ?

—এখন তো আর হবে না। ইলেকশানের ডেট ডিক্লেয়ারড হয়ে গেছে, এখন আর নতুন কোনও অর্ডার বার করা যাবে না।

কথাটা বুঝতে দু-এক সেকেন্ড সময় লাগল আদিত্যর, — তাহলে আমাদের কী হবে স্যার ?

—ওয়েট করুন। ইলেকশানের পরে নতুন গাভমেন্ট আসুক।

আদিত্য রঘুবীরের মুখের দিকে তাকাল। রঘুবীর আদিত্যর। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে পকেট থেকে সুজিত মণ্ডলের জন্য কেনা সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে টেবিলে রাখল রঘুবীর। বিনীত স্বরে বলল, —কোনওভাবেই কি কিছু হয় না স্যার ?

—না ভাই, হয় না। স্যার টেরচা চোখে প্যাকেটটা দেখল শুধু, ছুঁল না।

—আমরা অনেক আশা করে বসে আছি স্যার। তিন মাস হয়ে গেল...

—উপায় নেই ভাই। স্যার এবার সাত্ত্বিক মুখে প্যাকেটের সেলোফেন ছিঁড়ে সিগারেট বার করে ধরাচ্ছে, — আপনারা নতুন প্যার্টি, আপনাদের এখনও এনলিস্টমেন্ট হয়নি, এসব কাজ করলে তবে আপনাদের ক্রেডেনশিয়াল তৈরি হবে। এখন এই ভোটের মুখে আপনাদের অর্ডার দেওয়াটা অনৈতিক। এ সময়ে এমনিতেই গাভমেন্টের সব কাজকর্ম স্টপ হয়ে যায়...

অফিস্যারের ঘর থেকে বেরিয়ে মনে মনে গজগজ করছিল আদিত্য। এখন অর্ডার দেওয়া মহাপাপ, এদিকে শালা দিব্যি আদিত্যর কেনা সিগারেট ফুক ফুক টানছে! কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত কাজটা দিয়ে দিলে! ভোট বলে কি পৃথিবীসুদ্ধ সব কাজ বন্ধ হয়ে বসে থাকবে ? কে জানে বাবা, এর পর হয়তো কোনওদিন শুনবে ভোটের আগে সূর্যের আলো দেওয়া স্থগিত, নদীতে জল বইছে না, গাছেরা ফল ফুল ফোটানো বন্ধ রেখেছে! ব্যবসার নাম করে খেপে খেপে ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে হাজার আড়াই টাকা নেওয়া হয়ে গেল, একটাও কাজ না দেখাতে পারলে আদিত্য মুখ দেখাবে কী করে ? কাল ফোঁটা নিয়ে জয়িকে একশো টাকা দিল, তাও ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে চেয়ে! এখন ইন্দ্রাণী মুখে কিছু বলছে না বটে, কিন্তু যেদিন ধরবে সেদিন আদিত্যর ধুধধুড়ি নেড়ে দেবে। বাবাকেও বড় মুখ করে নতুন ব্যবসার গল্প শোনাল, এই বিশ বাঁও জলে পড়ে গেছে শুনলে বাবাও তো ড্যাং ড্যাং নাচবে!

কেউ বোধহয় আদিত্যর কাছ থেকে আর কিছু আশাও করে না। ইন্দ্রাণী তো এক-আধ দিনও জিজ্ঞাসা করতে পারে, কত দূর এগোল আদিত্য ? তিতির প্রশ্ন করতে পারে, বাবা কাজকর্ম কিছু পেলে ? কাউকেই কোনও সদুত্তর দিতে পারবে না আদিত্য, তবু তো মনে হয় কেউ বুঝি ভরসা করে আছে তার ওপর। এটুকুই কি কম ? এতেই বোধহয় বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। বিফল হওয়ার দুঃখটাও ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাতে পারে বুকে।

শব্দসন্ধানী ছোকরা ডাকছে আদিত্যকে, —কাজ হল ?

আদিত্যর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। আলতো ঘাড় নাড়ল দু দিকে।

—হয়ে যাবে। হয়ে যাবে। নির্লজ্জভাবে হাত বাড়াল ছোকরা, —বেরোবার আগে আরেক বার মুখাগ্নি করে যান।

বিরক্তি চেপে সিগারেট বাড়িয়ে দিল আদিত্য। ছোকরা আবার মন দিয়ে লাইটারের আওয়াজ শুনল। আদিত্য দ্রুত লাইটারটা পকেটে পুরল। ছেলেটার নজরে লাইটারটা না আজই বিগড়ে যায়!

ছোকরা হাসছে। বোধহয় লাইটার পকেটে পোরা দেখেই। উদাসভাবে বলল, —জিনিসটা সত্যিই দারুণ।

আদিত্য জোর করে হাসি ফোটাল, —ফ্যান্সি মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায়। দাম খুব বেশি নয়। শ খানেক। লাগবে আপনার ?

—থাক। ছোকরা রঘুবীরের দিকে ফিরল, —সুজিতদা তো এই মাত্র এসে বেরিয়ে গেলেন।

—তাই ? কোনদিকে গেছেন ?

—কোর্টের দিকে। যান না, পেয়ে যাবেন।

রঘুবীর উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল। পিছনে আদিত্য।

কোর্ট চত্বরে থইথই ভিড়। পুজো শেষ হতেই লোকজন নতুন উদ্যমে মামলা মোকদ্দমায় নেমে পড়েছে। অনেক দিন পর কোর্ট খুলেছে আজ, উকিলদের চেহারাতেও বেশ উপোসি বেড়ালের ভাব। অনেকেই ইতিউতি শিকারের সন্ধানে ঘুরছে।

সুজিত মণ্ডলকে পাওয়া গেল একটা চায়ের দোকানে। রঘুবীরকে দেখে গ্লাস হাতে উঠে এল লোকটা, —সাহেবের ঘরে গেছিলেন কেন ?

আদিত্য অভিযোগের সুরে বলল, —বা রে, এখনও অর্ডার হাতে পেলাম না, যাব না ? আপনি বলেছিলেন পুজোর আগেই পোস্টে চলে যাবে।

—যায়নি বুঝি ?

—কেন, আপনি জানেন না ?

—সবই জানি। তাবলে আপনারা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাবেন ?

রঘুবীর হেঁ হেঁ করল, —আপনাকে পেলাম না তাই..। স্যারের সঙ্গে তো একটু আলাপ পরিচয় রাখতে হয়।

—স্যার আপনাদের অর্ডার দিতে পারবেন ? ওই আলুভাতেটার নিজে থেকে একটাও সাইন করার মুরোদ আছে ?

আদিত্য একটু থিতিয়ে গেল, —উনি তো বললেন ভোটের আগে আর হবে না।

—হ্যাঁ, সেটা একটা প্রবলেম বটে। বছর পঁয়ত্রিশের সুজিতের মুখ-চোখ নির্বিকার, —আসুন, চা খেতে খেতে কথা বলা যাক।

আদিত্যর মুখ তেতো হয়ে গেল। লোকটার সঙ্গে বসা মানেই একগাদা পয়সা ধসে যাওয়া। নিজেই খাওয়াচ্ছে এমন মুখে টোস্ট ওমলেট ঘুগনি পরোটা মিষ্টি যা ইচ্ছে অর্ডার করে যাবে, আর ওঠার সময়ে নির্দ্বিধায় রঘুবীরকে দেখিয়ে দেবে। এবং রঘুবীর দেখাবে আদিত্যকে। দিব্যি খেলা।

আদিত্য কর্তৃত্বের সুর আনল গলায়, —এখন চা খাব না। কাজের কথা হোক।

চায়ের গ্লাস দোকানে রেখে বেরিয়ে এল সুজিত, —মাস খানেক তো আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে। বলতে বলতে গাল চুলকোচ্ছে, —পুরো টাকাটা যদি দিয়ে যেতেন কবে অর্ডার বাড়ি পৌঁছে যেত।

—মানে ! আদিত্য থমকাল, —আমি তো আপনাকে পুরো টাকাই পাঠিয়ে দিয়েছি।

—পুরো কোথায় ? হাজারের মধ্যে সাতশো। ওই টাকা কজনের মধ্যে ভাগ হয় জানেন ? আমি আছি, বড়বাবু আছে, সাহেবের পিওন আছে, টাইপিস্ট আছে... যে তিনশো বাকি আছে ওটাই তো সাহেবের পাওনা। ওই টাকা সাহেবের হাতে না দিয়ে সাহেবকে সই করতে বলব, আমার একটা প্রেস্টিজ নেই ?

আদিত্য বিমূঢ় চোখে রঘুবীরকে দেখছিল। হাজার টাকাই তো চেয়ে নিয়েছিল রঘুবীর, সাতশো দিয়েছে কেন ?

রঘুবীর গলা খাকারি দিল। সুজিতকে বলল, —আমি তো আপনাকে বলেইছি বাকি টাকা অর্ডার হাতে পেলে দিয়ে যাব। আপনি আমাকে এটুকু বিশ্বাস করতে পারলেন না ?

—দেখুন মশাই, তিনশো টাকাটা বড় কথা নয়। আপনাদের সঙ্গে নতুন কাজ করতে শুরু করছি, গোড়াতেই যদি এই ধারবাকি শুরু হয়ে যায়...। ছাব্বিশ হাজার টাকার একটা অর্ডার পেয়েছেন, তার

থেকে মাত্র হাজার টাকা বার করতে এত কিন্তু কিন্তু করলে পরে বড় কাজ আপনাদের দেব কোন ভরসায় ?

—বেশ, কাল পরশুই আপনাকে টাকা দিয়ে যাব ।

—এখন তো আর দিলেও হবে না । ভোটটা যাক ।

রঘুবীর চোরা চোখে আদিত্যকে দেখে নিল একবার । তারপর মরিয়া হয়ে বলল, —ব্যাক ডেটে অর্ডারি বার করে দিতে পারবেন না ?

—না, না ওসব দুনম্বরি আমি করি না । টাকাটা দিয়ে যান, ইলেকশনের পর এসে অর্ডার নিয়ে যাবেন ।

রঘুবীর আদিত্যকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, —মাত্র তো আর এক-দেড় মাসের অপেক্ষা রায়দা, কী বলেন ?

আদিত্য নিষ্প্রভ মুখে হাসল । অগত্যা । শেষ দুটো সিগারেট বার করে প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিল আদিত্য । সুজিতকে সিগারেট দিয়ে লাইটারের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েও সাবধান হয়ে গেল । পানের দোকানের গায়ের জলন্ত দড়ি থেকে ধরাল নিজের সিগারেট । লাইটারটা বেঁচে গেল ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ।

মানুষের বিপদ যে কোন দিক দিয়ে আসে। সুজিত সিগারেট ধরিয়ে গল্প জুড়েছে, —ইলেকশ্যানের হাল কী বুঝছেন ?

আদিত্য কাঁধ ঝাঁকাল, —আমরা আদার ব্যাপারি, আমাদের জাহাজের খবরে কী কাজ ?

—এ কী কথা ! নাগরিক হিসেবে আপনার একটা ভাবনাচিন্তা নেই ? আপনার কি মনে হয় এই কোরাপ্ট গভরমেন্ট থাকা উচিত ? দেশের নাম করে যারা কোটি কোটি টাকা ঘুষ খায়, তাদের কি টিঁকে থাকার কোনও অধিকার আছে ?

কী উত্তর দেবে আদিত্য ভেবে পেল না । মুখে একটা হাসি ধরে রাখল শুধু ।

হাসিটাই কাল হল । সুজিত ঝপ করে বলল, আমাদের ইলেকশান ফান্ডে কিছু টাকাপয়সা দিন ।

আদিত্য ঢোক গিলল, —কত ?

সুজিত রঘুবীরকে দেখল, —কত বলি বলুন তো ? পঞ্চাশ ? একশো ?

রঘুবীর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —না না, একশো অনেক বেশি হয়ে যাবে । পঞ্চাশ । রায়দা, পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিন না ।

ময়লা নোটের মতো মুখ করে টাকাটা বার করল আদিত্য ।

সুজিত দু আঙুলে ধরে আছে টাকাটা, —রসিদ লাগবে ? তাহলে আবার...

রঘুবীর আদিত্যর কাঁধে চাপ দিল, —এখন দিতে হবে না । আমি তো কাল পরশু টাকা দিতে আসব, তখন দিয়ে দেবেন ।

সুজিত মণ্ডল চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধন্দ মেরে দাঁড়িয়ে রইল আদিত্য । পকেটে মাত্র উনিশ টাকা পড়ে আছে । যাক, বাড়িটা ফিরতে পারবে । ওই টাকা কটা থাকলে কয়েকটা দিন চলে যেত, আবার কাল সকালে হাত পাততে হবে ইন্দ্রাণীর কাছে ।

রঘুবীর সন্তর্পণে হাত ধরল আদিত্যর, —আমার ওপর খুব রেগে গেলেন রায়দা ?

—নাহ । আদিত্য শ্বাস ফেলল, — রাগ করে কী করব ! আমার ভাগ্য ।

—বিশ্বাস করুন, মাসি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । ডাক্তার এক গাদা ক্যাপসুল-ট্যাপসুল লিখে দিল... পকেটেও সেদিন একদম কিছু ছিল না...

—আপনি তো আমাকে বলেননি কিছু ?

—রোজই বলব বলব করে ভুলে যাই । ওই লোকটা কটা মাত্র টাকার জন্য ওরকম হারামিপনা করবে, কী করে জানব ?

—তার পরেও আমার পঞ্চাশ টাকা খসিয়ে দিলেন ?

অপরাধী ভাব মুছে গিয়ে রঘুবীরের মুখে দেঁতো হাসি এরার, —ও টাকাটা না দিলে লোকটা হয়তো আর কাজটাই দিত না।

আদিত্য কঠিন হল, —কাজ কিন্তু এখনও দেয়নি রঘুবীরবাবু।

—দেবে। দেবে। ওই নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন ? আমি তো আছি।

কে যে আছে, আর কে নেই, আদিত্য যদি ঠিক ঠিক বুঝত ! রঘুবীর নির্বিবাদে তিনশো টাকা হজম করে বসে রইল, আদিত্য তার ওপর তবু ক্রোধে ফেটে পড়তে পারে না। এই প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েকবার টাকাকড়ি নিয়ে ছোটখাট গণ্ডগোল করেছে রঘুবীর। দশ-বিশ টাকা বেশি নিয়েছে, ভুলভাল হিসেব দিয়েছে, সবই মেনে নিয়েছে আদিত্য। মেনে নেওয়াটাই কি তার অপরাধ ? মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে না, সন্দিগ্ধ শকুনের মতো নজর রাখবে পরস্পরের ওপর, এই কি সম্পর্ক ? আদিত্য তো অপদার্থই। ঘোরতর অপদার্থ। কিন্তু অপদার্থ থেকে পদার্থ হয়ে ওঠার ধাপগুলো কী ? সংশয় ? অবিশ্বাস ? নীচতা ?

আদিত্য হঠাৎ কড়া সুরে বলে উঠল, —কাজটা আপনি কিন্তু ভাল করেননি রঘুবীরবাবু।

রঘুবীর দু-এক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, —আপনি আমাকে অ্যাকিয়ুজ করছেন ?

—ইয়েস। আপনার গলতির জন্য কাজটা পিছিয়ে গেল। আপনি আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছেন।

—আপনি এ কথা বলছেন রায়দা ? রঘুবীর আরও গোমড়া, —কার জন্য এত খেটে মরছি আমি ? আপনি তো একদিনও আমার বাড়ি গেলেন না। গেলে দেখতে পেতেন দু মুঠো অন্ন সংস্থান করার অবস্থা আমার আছে। আশপাশের পাঁচটা লোক বাবাঠাকুর বলে সম্মান করে আমাকে। আমার কাছ থেকে গ্রহরত্ন কেনে, বিপদে আপদে পরামর্শ নেয়, রাজভোগ না খাই, মাসি-বোনপো নুনভাত খেয়ে থাকি। আমার এই ব্যবসা ব্যবসা করে ছোটাছুটি সবই তো আপনার জন্য। একে ধরা, ওর পেছনে ছোটা, তাকে লাইন করা, এসবের জন্য কোনও মূল্য চেয়েছি' কোনওদিন ? আর আজ সামান্য তিনশো টাকার জন্য... সেও শুনলেন তো, কাল পরশু এসে দিয়ে যাব।

আদিত্য কখন যেন অন্যমনস্ক পায়ে হাঁটা শুরু করেছিল। ছোট্ট একটা ব্রিজ পার হয়ে, খানিকটা গঞ্জ মতো জায়গা অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে গেছে সহসা। সামনে বিশাল চওড়া গঙ্গা বাঁক খেয়ে ঘুরে গেছে। অনেকটা নীচে গেরুয়া জল ছলাৎ ছলাৎ আছাড় খাচ্ছে পাড়ে।

রঘুবীর কথা বলেই চলেছে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে, কখনও ইনিয়ে বিনিয়ে, কখনও গমগম স্বরে।

আদিত্য থামাতে চাইল রঘুবীরকে, —ওসব কথা থাক।

—থাকবে কেন ? আপনি যখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুললেন, আরও অনেক কথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার।

ওই নদীকে সামনে রেখে কি কথা স্পষ্ট করবে রঘুবীর ? খোলা আকাশের নীচে কী বা তার গোপন আছে ? যদি থাকে, সেটুকু তো আড়াল থাকাই ভাল। সত্যিই হয়তো বেচারার মাসিটা অসুস্থ হয়েছিল ! বেচারার মাসি ছাড়া আর কেই বা আছে এ সংসারে ! রঘুবীর যে মূলত অভাবী, দ'এ পড়া, তা কি এতদিনে বোঝেনি আদিত্য !

রঘুবীরের হাতে হাত রাখল আদিত্য, —আহ, থাক না ওসব কথা।

—আমি বড় কষ্ট পেয়েছি রায়দা।

—রাগের মাথায় কী বলি, কী ভাবি, তার কি ঠিক থাকে ?

—তা ঠিক। রাগ হল চণ্ডাল। রঘুবীর মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। বিড়ি বার করে ধরাল, —এই ব্রাহ্মণ সন্তানের ওপর আপনি ভরসা রাখুন রায়দা, আমার দ্বারা আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না।

আদিত্য নদীটাকে দেখছে। উলুবেড়িয়ার এই জায়গাটা তাকে খুব টানে। রঘুবীরের মুখেই শুনেছে এই সামনেই নাকি একটা জাহাজডুবি হয়েছিল। বেশ ক বছর আগে। এখানে দাঁড়ালে কল্পচোখে জাহাজটাকে দেখতে পায় আদিত্য। কাত হয়ে গেছে এক দিকে। ডুবছে ধীরে ধীরে। প্রকাণ্ড অবয়ব ক্রমে মিলিয়ে গেল। ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উদাসীন নদী।

আদিত্য হঠাৎ প্রশ্ন করল, —জাহাজডুবিতে কি কেউ মারা গেছিল ?

রঘুবীর একটু যেন ধাক্কা খেল। তারপর দাড়ি চুমরোতে চুমরোতে বলল, —একজনও না। কত নৌকো, কত লাইফবোট এসে গেল...

—জাহাজটা কি এখনও জলের তলাতেই আছে ?

—কে জানে ! টেনে উঠিয়েও নিয়ে যেতে পারে।

—ও জাহাজ কি আর জলে ভেসেছে কোনওদিন ?

—সে আমি কি করে বলব ! তবে অলুক্ষুণে জিনিস আর ভাসানো ঠিকও নয়।

—জাহাজ ডোবা দেখতে খুব ভিড় জমেছিল, না ?

—ভিড় মানে ! কাতারে কাতারে লোক। কাছের সব গ্রাম শহর ঝেঁটিয়ে... আমিই তো সেই দমদম থেকে ছুটে এসেছিলাম। অনেক সাহেব মেম এসেছিল, পটাপট ছবি তুলছিল।

—কেন ডুবল বলুন তো জাহাজটা ?

রঘুবীর অম্লানবদনে বলল, —ঠিক সময় দেখে যাত্রা শুরু করেনি তাই।

—নাকি জাহাজেরই দোষ ?

রঘুবীর আড়চোখে আদিত্যকে দেখল, —রোজই এক কথা জিজ্ঞেস করেন কেন বলুন তো ?

উত্তরটা আদিত্যই যদি জানত ! বাপ্পা জাহাজে চলে যাবে বলেই কি অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপে তার ? নাকি নদীর নীচে মাটি বালি কাঁকরের বিছানায় জাহাজটা এক আশ্চর্য দেশ হয়ে ঘুমিয়ে আছে, যার গোপন কন্দরে ডুবুরি হয়ে ঘুরে বেড়াতে সাধ হয় আদিত্যর ? কেন হয়। ওখানে কি আদিত্যর সেই গুপ্তধন আছে ? নাকি জাহাজটা সে নিজেই ? সংসারের সহস্র লোকের চোখের সামনে দিয়ে অসহায় ডুবে গেছে ?

আদিত্যর পিঠে রঘুবীর হাত রাখল, —চলেন রায়দা। এবার ফিরি।

—ফেরা ! কোথায় ! আদিত্য বড়সড় শ্বাস ফেলল, —আরেকটু বসি।

—আপনাদের ডাক্তারের আজ নার্সিংহোম ওপেন হচ্ছে না ?

—হুঁ।

—যাবেন না সেখানে ?

দূরে একটা নৌকো ভাসছে। পাল তোলা নৌকো। হাওয়ায় ফুলে আছে পাল। বাতাস কেটে নৌকো ছুটে চলেছে সরসর। নাকি বাতাস নিয়েই চলেছে ?

আদিত্য নৌকোটাকে দেখছিল। ডুবে যাওয়া জাহাজটাকে বুঝি মাড়িয়ে গেল নৌকোটা।

৩২

আদিত্য ট্রেনে ফিরছিল। একা। রঘুবীর চলে গেল কুলগাছিয়ায়। ওখানে কে এক আত্মীয় আছে, তার বাড়ি ঘুরে অনেক রাত্রে কলকাতা ফিরবে। আদিত্যকে যেতে ডাকেনি রঘুবীর, আদিত্যও উৎসাহ দেখায়নি। সন্ধের পর রঘুবীরের সঙ্গে না থাকাই ভাল। রঘুবীর তখন আর মানুষ থাকে নাকি ! নেশাড় ভাল্লুকের মতো ছটফট করে, নোংরা দিশি বারে নিয়ে গিয়ে বসায় আদিত্যকে। আদিত্য সতর্ক থাকতে চায়, তবু দু-এক চুমুক খাওয়া হয়ে যায় কোনও কোনও দিন। গত মাসে রঘুবীরের পেটে আবার একদিন বেদনা উঠেছিল। বারে বসেই। তার মুখচোখ দেখে আদিত্য বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল সেদিন। আদিত্যরও আবার ব্যথাটা ফেরত আসবে না তো !

ট্রেনে এখন বেশ ভিড়। যাত্রী আর হকারদের মিলিত কলরবে গমগম করছে কামরা। বসার সিট নেই, আদিত্য বসার চেষ্টাও করেনি। সে যে লোকেরই সিট তাক করে দাঁড়াবে, সে নির্ঘাত হাওড়ায় নামবে। আদিত্য জানে।

ই এম ইউ লোকালের জানলা দরজা দিয়ে হইহই করে হেমন্তের বাতাস ঢুকছে। বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, তবু মানুষের ভিড়ে ওই শীতলতা ভালই লাগছিল আদিত্যর। রড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঢুলছিল সে।

—আদিত্য। অ্যাই আদিত্য।

আদিত্য মাথা ঝাড়া দিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। রণেন। রোদ-মাখা জানলার ধারে বসে হাসছে।

আদিত্য খুশি হল না। রণেনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারটা তার মোটেই মধুর ছিল না। সামান্য কটা টাকার জন্য বাড়িতে এসে অপমান করে গিয়েছিল রণেন। নিজে না বলে বউকে দিয়ে ইন্দ্রাণীকে কথা শুনিয়েছিল। ইন্দ্রাণী কী ভয়ঙ্কর রেগে গিয়েছিল সেদিন! হাতের চুড়ি বেচে দুর্লভবাবুকে দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল রণেনের অফিসে।

আদিত্য ভারিক্কি মুখে বলল,—তুই কোত্থেকে ?

—খড়্গপুর। আমি তো এখন ওখানেই আছি। নিমপুরায় একটা কারখানায় জয়েন করেছি।

—বা, ভাল খবর। আদিত্য গলা নিস্পৃহই রাখল।

রণেন চেঁচাচ্ছে,—তোর প্রেসের কী খবর ? আছে, না উঠে গেছে ?

—উঠবে কেন ? ভালই চলছে।

—কে চালাচ্ছে ? তুই, না তোর বউ ? সুরজিৎ বলছিল তোর বউই নাকি সামলায় ?

চারপাশের লোকজন দেখছে আদিত্যকে। দু-চার জনের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাও যেন দেখতে পেল আদিত্য। হঠাৎই একটু পাল্টা আঘাত ছুঁড়তে ইচ্ছে হল তার। ঠাণ্ডা মাথায়।

হাসি হাসি মুখে আদিত্য বলল,—আমরা ডিউটি ভাগ করে নিয়েছি। ও প্রেসে বসে, আমি অর্ডার পেমেন্ট ডেলিভারিগুলো সামলাই। অর্ডার আসছেও বটে। ওভারটাইম দিয়েও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

—বাহ্, তুই তো বেশ দাঁড়িয়ে গেলি রে! আমার ধারণা ছিল...

আদিত্য কথা কেড়ে নিল, —আর দাঁড়ানো। কত ঝঞ্ঝাট। নতুন একটা অফসেট মেশিন বসাচ্ছি, ফোর কালার। বারো লাখ টাকা মতো পড়ে যাবে, বুঝলি। তার ওপর আবার এসি-ফেসি বসাতে হবে!

এতক্ষণে একটু যেন নিবেছে রণেনের মুখ। গলাও। চেঁচানো কমিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বলল,—ব্যাঙ্ক লোন নিচ্ছিস ?

—তা অল্প কিছু নিতে হবে। আদিত্য কায়দা করে ঘাড় ঘোরাল,—এই, শশা খাবি নাকি ?

—না নাহ্, শশা-টশা আমার ভাল লাগে না রে। কচকচ করে।

—খা না। আদিত্য ফিচেল হাসল, —কচি শশা। নুন লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে...

শশাঅলাকে ডেকে দুটো শশা কাটাল আদিত্য। এগিয়ে গিয়ে দিল রণেনকে। নিজেও খাচ্ছে। খেতে খেতেই বলল,—বুঝলি, আমি আবার এদিকে আরেকটা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি।

—কী রকম ? একটু যেন উৎসাহিত মনে হল রণেনকে।

—আরেক ব্যবসা ধরে ফেলেছি। রোড কন্ট্রাক্টারি। দু দিক সামলাতে একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছি রে। গভর্নমেন্টের কাজ, ঠিক সময়ে তুলতে হয়, সাইটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়...

—এক-একটা কাজে কী রকম থাকে ?

—কী রকম থাকে ? এই ধর গত মাসে উলুবেড়িয়ায় একটা আড়াই লাখ টাকার জব ওঠালাম, তাতে ধর গিয়ে...মনে মনে হিসেবের ভান করল আদিত্য,—যেখানে যা দেওয়ার দিয়ে থুয়ে হাজার

পঞ্চাশেক মতো থাকবে।

—একাই করছিস ? তুই এ সব কাজ জানলি কী করে ?

—একটা আই আই টি সিভিলের ছেলেকে পার্টনার নিয়েছি। চোখের সামনে রঘুবীরের চেহারাটা ভাসিয়ে নিল আদিত্য,—দারুণ স্মার্ট। কাজেকর্মে একেবারে চাম্পিয়ান। এ কি, তুই শশা খাচ্ছিস না যে ?

—কই, না।...খাচ্ছি তো।

—খা। মুখের ভেতরটা টসটসে থাকবে। জল তেষ্টা পাবে না। আদিত্য প্রায় রণেনের কানের কাছে ঝুঁকল, —এদিকে আবার যা হয়। গিন্নি নতুন বায়না শুরু করেছে।

—কী ? রণেনের গলা ফ্যাসফেসে।

—গাড়ি। যা যা ইন্দ্রাণীকে দিতে মন চেয়েছে, সবই আজ রণেনের সামনে দিয়ে দেবে আদিত্য। কল্পনার পোলাওতে একটুও ঘি কম দিতে রাজি নয় সে। হাসি মেখে বলল,—গিন্নির ইচ্ছে মারুতি, আমার অ্যাম্বাসাডার। তোর কী মনে হয় রে ? অ্যাম্বাসাডারই ভাল, তাই না ? হার্ডি গাড়ি।

—সবই ভাল। রণেন আচমকা একটু দূরের দিকে আঙুল দেখাল, —অ্যাই, ওদিকে একটা সিট খালি হচ্ছে, বসে যা না।

আদিত্য জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখল,—আর বসে কী হবে ! সাঁতরাগাছি তো পেরিয়ে গেল। তারপর তোর খবর বল ? নিমপুরা ভাল লাগছে ?

—ওই এক রকম।

—আয় না একদিন আমাদের বাড়ি। ইন্দ্রাণী খুব তোদের কথা বলে।

—যাব'খন। কলকাতায় আজকাল বেশি আসাই হয় না...

—তবু আসিস। আদিত্য চাবুকটা শূন্যে ঝেঁকে নিল,—হ্যাঁ ভাল কথা। তুই যে মেশিনটা দিয়েছিলি, ওটা আর কাজে লাগছে না। বেচে দেব ভাবছি। তেমন দর-টর না পেলে স্ক্র্যাপের দরেই বেচব। তোর হাতে কোনও পার্টি-টার্টি আছে ? তুই মাঝে থাকলে তোরও কিছু কমিশান এসে যেতে পারে।

রণেনের কি মনে পড়েছে আদিত্যকে মেশিন কেনানোর সময়ে লোকটার কাছ থেকে দু হাজার টাকা কমিশন নিয়েছিল রণেন ? নিশ্চয়ই পড়েছে। না হলে অমন পাঁশুটে মেরে গেল কেন ? তন্ময় হয়ে কী দেখছে বাইরে ? প্রকৃতির শোভা ? না কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া ?

হাওড়া স্টেশনে নেমে কোন দিকে যে গেল রণেন !

দুপুরের দুঃখ বিকেলে পৌঁছে খুশি হয়ে গেছে। আদিত্য এখন অনেক চিন্তাশূন্য। ভারহীন। বাড়ি না ফিরে আদিত্য সোজা মানিকতলায় চলে গেল। ইন্দ্রাণীর অসুখের পর থেকে এখন মাঝে মাঝে যায় ও বাড়িতে। ধীরাজের সে দিন ওভাবে হারিয়ে যাওয়া অনেক দিন পর হঠাৎ আবার ছুঁয়ে গেছে আদিত্যকে। রুনার মুখে খবর পেয়ে সে যখন সন্ধেবেলা মানিকতলা গিয়ে পৌঁছয়, তখন সবে ধীরাজকে নিয়ে ফিরেছে ইন্দ্রাণীরা। ধীরাজের ওই বিভ্রান্ত দশা, উমার বিহ্বল চাহনি দেখে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল আদিত্যর। নিঃসহায় বুড়ো-বুড়ির জন্য ইন্দ্রাণী আর কত ছোটাছুটি করবে ! তনুময় যখন নেই তখন ছেলের কর্তব্য তো অনেকটা আদিত্যর ওপরও বর্তায়।

শ্বশুরবাড়ি ঢুকে একটু চমকাল আদিত্য। ইন্দ্রাণীও এসেছে আজ। মা-বাবার সামনে বসে আছে থম হয়ে।

আদিত্যকে দেখে উমার মুখে হাসি ফুটল,—আজ কী কপাল ! মেয়ে জামাই দুজনেই এসেছে !

ধীরাজ বললেন,—ভালই হয়েছে তুমি এসে গেছ। দ্যাখো না কী সমস্যা চলছে আমাদের !

আদিত্য ব্যস্ত হল,—কেন, কী হয়েছে আবার ?

—আর বলো কেন, কালীপুজোর আগের দিন চোদ্দ শাক কিনতে বাজারে গেছিলাম। তা

আজকাল তো চাষিদের কাছে ছাড়া চোদ্দ শাক পাওয়াই যায় না। ও সব খাওয়ার রেওয়াজ তো এখন আস্তে আস্তে উঠেই যাচ্ছে। অথচ ছোটবেলায় শুনতাম ঘৃতে বৃদ্ধি বল আর শাকে বৃদ্ধি মল।

এতে সমস্যার কী আছে আদিত্য বুঝতে পারল না, প্রশ্নসূচক চোখে উমার দিকে তাকাল।

উমা আঙুলের ইশারায় নিজের মাথাটা দেখালেন। ঠোঁট নেড়ে বোঝালেন, ভীমরতি।

ধীরাজ কথা বলে চলেছেন,—তা আমার অবশ্য মানিকতলা বাজারে একটা চেনা শাকঅলা আছে। বিরাটির দিকে থাকে। ট্রেনে উল্টোডাঙায় নেমে...

ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে কালো ছায়া সরে গিয়ে অস্ফুট হাসি ফুটে উঠেছে। বলল,—বাবার কাছ থেকে তুমি যদি শুনতে চাও, তা হলে রাতটা এখানেই থেকে যেতে হবে। থাকবে?

—আহ্, ঠাট্টা করছ কেন? বয়স্ক মানুষ অত মেপেজুপে কথা বলতে পারে নাকি? আদিত্য লঘু ভর্ৎসনা করল ইন্দ্রাণীকে,—তুমিই বলো না।

—বাবা কালীপুজোর আগের দিন বাজার থেকে ফেরার পর বাড়িঅলা এসেছিল নীচে। পাম্প খারাপ হয়ে গেছে, ওরা এখন ক'দিন জল দিতে পারবে না।

এই কথা শাক দিয়ে শুরু হল! কী ধরতাই! আদিত্য শঙ্কিত চোখে একবার দেখে নিল শ্বশুরমশাইকে। তারপর হেসে ফেলল,—এতে সমস্যার কী আছে? ভারি দিয়ে জল নিলেই হয়।

এ বার উল্টো ধমক দিয়েছে ইন্দ্রাণী,—যা বোঝো না, তাই নিয়ে কথা বোলো না তো। এক ভার জলের দাম কত জানো?

—কত হবে? দশ পয়সা...না না, চার আনা।

—কোনও খবরই তো রাখলে না কোনওদিন। এক ভার জল দেড় টাকা, বুঝেছ?

উমা বললেন,—ওভাবে বলছিস কেন? পুরুষ মানুষরা এত সব খবর রাখে নাকি?

আদিত্য মনে মনে হিসেব করছিল। ধীরাজ উমার যদি দিনে ছ ভার জলও লাগে, মাসে প্রায় দু আড়াইশো টাকার ধাক্কা। সে তো বড় কম নয়! গম্ভীরভাবে বলল,—পাম্প সারাচ্ছে কবে?

ধীরাজ বললেন,—সারাচ্ছে না। ওদের এক চেনা মিস্ত্রি আছে, সে নাকি কালীপুজোর দিন দেশে গেছে। তার দেশ হল গিয়ে উড়িষ্যায়। বালেশ্বরে নেমে বাসে করে...

—বাবা। ইন্দ্রাণী থামাল ধীরাজকে। উমাকে বলল, —মা, টিভিটা চালিয়ে দাও না, বাবা বসে বসে দেখুক।

টিভি চলতেই ঘাড় ঘুরে গেছে ধীরাজের। ঘরেও সকলের স্বস্তি ফিরে এসেছে।

উমা বললেন,—ওদের চেনা মিস্ত্রি না এলে ওরা পাম্প সারাবে না। সে এক মাসও হতে পারে, ছ মাসও হতে পারে...

—বলেছে এ কথা?

—তা হলে আর বলছি কি বাবা!

—জল না দেওয়া তো ক্রিমিনাল অফেন্স। বাড়িঅলা যদি পাম্প না সারায় তো ভারির টাকাটা দিয়ে দিক।

—বয়ে গেছে ওদের। এই তো ইনু বলতে গেছিল, দিবাকরের বউ যা নয় চাট্টি কথা শুনিয়ে দিল।

মুহূর্তে পৌরুষ জেগে উঠেছে আদিত্যর। একটু আগে ইন্দ্রাণীর একজন অপমানকারীকে নিপুণভাবে বধ করে এসেছে সে, এ বার আরেক জনেরও খবর নেবে নাকি?

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল আদিত্য,—আমি যাব? কথা বলে আসব?

ইন্দ্রাণী খরখর করে উঠল,—তুমি কি যাবে? আমি গিয়েই কাজ হয়নি...

—না না, এ সব বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। ওয়ান শুড এগজার্ট ওয়ানস্ রাইট।

—ঠিক আছে, তুমি চুপ করে বোসো তো।

আদিত্য বসেও ছটফট করছে,—ওপরে না যাই, থানায় গিয়ে রিপোর্ট করতে পারি। পুলিশ এলে

পারমানেন্টলি টাইট হয়ে যাবে। যাব?

—থাক। দয়া করে বোসো এখন।

উমা হাসছেন,—তুমি কেন থানা পুলিশের ঝামেলায় যাবে বাবা? আরাম করে বোসো। মুখটা তো শুকিয়ে গেছে দেখছি।

—হ্যাঁ, সেই উলুবেড়িয়া থেকে ফিরছি।

—ওমা, সে তো অনেক দূর!

—কী এমন দূর! কাজেকর্মে আমায় প্রায়ই যেতে হয়।

আদিত্যর কথার ধরন দেখে ইন্দ্রাণী হেসে বাঁচে না,—তোমার জামাইকে কিছু খেতে দাও মা। বড় খেটে এসেছে।

উমা চোখ পাকালেন,—আবার ওভাবে কথা! খেটে আসুক আর নাই আসুক, দূর থেকে তো এসেছে। ক্ষিদে তো পেয়েছেই।

উমা উঠে গেছেন রান্নাঘরে। ধীরাজ টিভিতে বিভোর। আদিত্য চুপচাপ বসে লাইটারটাকে বাজাচ্ছিল। সুর দুলছে প্রজ্জ্বলকে। নীল শিখা স্থির।

আচমকা আদিত্য নিচু গলায় বলল,—তুমি আজ এখানে আসবে আমি ভাবিনি।

ইন্দ্রাণী ব্যাগ খুলে কি যেন খুঁজছিল। বিস্মিত চোখে তাকাল,—কেন?

আদিত্য ফস করে বলে ফেলল,—ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আজ ডাক্তারের নার্সিংহোমে যাবে।

ইন্দ্রাণীর চোখে আরও বিস্ময়,—কেন?

—কাল ডাক্তার অত করে বলে গেল তো। নিজে একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে, কম কথা!

ইন্দ্রাণী কি হাসল সামান্য? চোখে কি একটু আলোর জ্বলা-নেবা? না আদিত্যর মনের ভুল?

ক্ষণ পরে ইন্দ্রাণী বলল,—শুভাশিস তো তোমাকেও বলেছিল। তুমি গেলে না কেন?

দুজনের মাঝখানে শব্দহীন তরঙ্গ ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। লাইটার বিনাই নীল এক শিখা কাঁপল আপন মনে। অশ্রুত এক বাজনা বেজে বেজে থেমে গেল।

দুজনেই হাসছে। কেন হাসছে কেউই জানে না। হয়তো বা জানে, জানাটা লুকিয়ে রাখতেই আরও বেশি হেসে উঠছে দুজনে।

লুচি আলুর দম সহযোগে মোটামুটি একটা পরিতৃপ্ত জলযোগ সেরে দুজনে উঠে পড়ল। সদর থেকে আদিত্যকে একবার ডাকলেন উমা, —তোমার কি একবার সামনের সপ্তাহে সময় হবে বাবা?

—কেন মা?

—একটু বেলুড় মঠে যেতাম। দীক্ষা তো নেওয়া হল না, ওখানে গিয়ে চোখ বুজে বসে থাকলেও শান্তি লাগে।

—আফসোস করছেন কেন? দীক্ষা নিয়ে নিলেই পারেন।

—সে আর এ জীবনে নেওয়া হবে না।

—কেন, কী এমন কঠিন কাজ? শুনেছি স্বামীজিদের বললেই তাঁরা দীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

—মনটাকে যে কোথাও বাঁধা দিতে পারি না বাবা। ফাঁকা আছে, ফাঁকাই থাক। যদি কোনওদিন অঘটন ঘটে...! তনুটা ঠাকুরদেবতা একদম মানত না।

আদিত্যর চোখে জল এসে যাচ্ছিল। প্রতীক্ষা কি শুধুই দুঃখ! স্মৃতিতেও কি কোনও সুখ থাকে না মানুষের? গলার জমাট পিণ্ড গিলে নিয়ে আদিত্য বলল,—আপনি কিছু ভাববেন না মা। তনু ঠিক একদিন ফিরে আসবে।

—তুমি বলছ?

—বলছি। আদিত্য ঘুরল,—আমি সামনের শুক্রবার এসে আপনাকে নিয়ে যাব। সক্কালবেলা গিয়ে দুপুরে ফিরে আসব।

ফুটপাথে নেমে আদিত্য দেখল দিলুদের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে ইন্দ্রাণী। দিলুর সঙ্গে। হাত পা নেড়ে কি সব জানাচ্ছে। বোধহয় বাড়িঅলার কথা। দিলুর ওপর ইন্দ্রাণীর খুব ভরসা।

দিলীপ আদিত্যকে দেখে হাত নাড়ছে। আদিত্যও নাড়ল। এগোল না।

মোড়ে এসে আদিত্য বলল,—আমরা কি ট্যাক্সিতে ফিরব?

—ফিরতেই পারি। ইন্দ্রাণী মুহূর্তে রাজি,—তোমার কাছে তো টাকা আছে।

—থাক গে। মিনিবাসই ভাল। আটটা বাজে, এখন তো বাস-ট্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী হেসে ফেলল,—টাকা বুঝি উড়ে গেছে?

আদিত্য লাজুক হাসল।

—ঠিক আছে, ট্যাক্সি ধরো।

কলকাতার ট্যাক্সিঅলারা মানুষ চেনে, আদিত্য ডাকলে তারা কেউ দাঁড়ায় না। এত দুর্বলভাবে তাদের ডাকে আদিত্য যে, তাদের প্রত্যয়ই হয় না এই লোকটা সত্যি সত্যি ট্যাক্সিতে উঠতে চায়।

ইন্দ্রাণীই হাত তুলে থামাল একটা ট্যাক্সিকে।

যাচ্ছে দুজনে। দুজনেরই চোখ জানলার বাইরে। দু দিকে। শিয়ালদার বিশাল হোর্ডিংটা দেখতে দেখতে আদিত্য বলল,—জানো, আজ ট্রেনে রণেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—তাই? ইন্দ্রাণী ফিরল আদিত্যর দিকে।

—ব্যাটাকে খুব শিক্ষা দিয়েছি আজ। সোৎসাহে আদিত্য গল্প শুরু করেছে। রণেনের মুখ-চোখের ভাব বলতে গিয়ে একটু রঙ চড়িয়ে দিল গল্পে। রণেন নাকি হিংসেয় দু হাতে চুল খামচাচ্ছিল!

ইন্দ্রাণী কতটা বিশ্বাস করল কে জানে, তবে শুনল মন দিয়ে। ঠোঁট টিপে বলল,—খুব তো ভিজে বেড়াল সেজে থাকো, তুমিও তো সেয়ানা কম নও!

আদিত্য বিচারকের ঢঙে বলল,—এটা ওর প্রাপ্য ছিল।

জ্যামে ট্যাক্সি থেমে আছে মৌলালিতে, অল্প উসখুস করে সিটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল আদিত্য। বলল,—চাঁদু বলছিল আজ ডাক্তারের ওখানে যাবে।

—হ্যাঁ, আমাকেও বলছিল।

—ওখানে নাকি চাঁদুর এক পরিচিত মেয়ের চাকরি হয়েছে?

—বন্ধুর বউ। বন্ধু মারা গেছে।

—বিধবা! এ কথা তো চাঁদু বলেনি! চাঁদুটা সব কথাই অর্ধেক অর্ধেক বলে। ফিলম লাইনের লোকগুলোর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ব্যাটা দিন দিন প্যাঁচোয়া হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রাণী চোখ বুজে বসে আছে। চোখ বুজেই বলল,—আমার কিন্তু চাঁদুর চাকরি দেওয়াটা ভাল লাগেনি।

—কেন?

—আমাকে কিছু না জানিয়েই আগে শুভাশিসকে বলেছে। এটা ঠিক কাজ নয়। আমাকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতে পারত।

—হুঁ।

—হুঁ নয়, হ্যাঁ। তোমরা কিছু রিকোয়েস্ট করলে শুভাশিস না বলতে পারে না, তোমরা তার সুযোগ নাও। শুভাশিসের তো কোনও অসুবিধেও থাকতে পারে। আমাকে বললে আমি ক্লিয়ারলি কথা বলে নিতে পারতাম। মেয়েটার কোনও এক্সপিরিয়েন্স নেই, ওরা সবে নতুন একটা নার্সিংহোম খুলছে...

আদিত্য কথাগুলো খুব গায়ে মাখল না। কৌতূহলী হয়ে বলল, —মেয়েটার ওপর চাঁদুর কোনও উইকনেস্-টুইকনেস আছে নাকি?

—থাকাটা বিচিত্র নয়। খুব সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে। বোঝাই যায় না বিয়ে হয়েছিল, এক

বাচ্চার মা।

—চাঁদু তোমার কাছে কিছু ঝেড়ে কাশেনি ?

—না। তাইতেই তো সন্দেহ হয়। ও বোধহয় এ বার সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছে।

আদিত্য অবাক হল,—কেন ?

—কারণ আগে প্রেমে পড়লেই আমাকে এসে বলত। শুনেই বুঝে যেতাম ও প্রেমে পড়েনি। এ বার কিছু বলেনি বলেই সন্দেহ হয়।

কথার মারপ্যাঁচটা আদিত্য ঠিক ধরতে পারল না। তবু ঘাড় নাড়ল। অনেক দিন পর বউয়ের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পেরে খুব আনন্দ হচ্ছিল আদিত্যর। সঙ্গে সঙ্গে একটু মজাও লাগছিল যেন। একই বাড়িতে, একই ছাদের নীচে, একই সংসারে থেকেও প্রাণ খুলে কথা হচ্ছে কি না ট্যাক্সিতে!

আদিত্যর কি যেন মনে পড়ে গেল। কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, —আচ্ছা, তিতিরটাকে আজকাল এত গম্ভীর দেখি কেন বলো তো ?

ইন্দ্রাণী দু-এক সেকেন্ড চুপ,—তোমার মেয়ে, তুমিই জানো।

—আহা, মেয়ে কি আমার একলার ?

—তোমার মেয়ের হাবভাবে তো তাই মনে হয়। ইন্দ্রাণী হাসছে।

—না গো, তিতিরটার কেমন চেঞ্জ এসেছে। হঠাৎ যেন বড়দের মতো হাবভাব।

—এখনও কি খুকিপনা করবে নাকি ?

—তা নয়, এত গোমড়া থাকে কেন ? আজকাল কথাবার্তা কম বলছে, তুমি লক্ষ করেছ ?

—এই বয়সে সব মেয়েই ও রকম হয়।

ট্যাক্সি পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। চিনচিনে হাওয়ায় শীত করছে বেশ। আদিত্য সিগারেট বাইরে ফেলে হাত বাড়িয়ে দু দিকের কাচ তুলে দিল। ইন্দ্রাণীকে একটু ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। বলল,—তা ঠিক। তুমিও ওই রকমই ছিলে।

রাজহংসীর মতো ঘাড় হেলাল ইন্দ্রাণী,—আমাকে তুমি ওই বয়সে দেখলে কোথায় ?

—তখন দেখিনি। দু-চার বছর পরে দেখেছি।

—ওই সময়ে দু-চার বছরেই মেয়েরা অনেক বদলে যায়।

তারপর কি হাজার বছরেও মেয়েরা আর বদলায় না! শক্ত খোলসে পুরে রেখে দেয় নিজেদের!

ট্যাক্সি বাড়ি পৌঁছেছে। প্রশ্নগুলো মনেই রয়ে গেল আদিত্যর। তিতিরকে নিয়ে চিন্তাটাও গেল না।

জয়মোহন বড় ঘরে বসে আছেন। অন্ধ অথর্বের মতো। চেয়ারের বাইরে ঝুলে আছে দুটো হাত। গায়ে একটা পাতলা সুতির চাদর।

আদিত্য ইন্দ্রাণীকে এক সঙ্গে ফিরতে দেখে ঘোলাটে পর্দাটা পলকের জন্য সরে গেল চোখ থেকে,—তোরা দুটিতে কোত্থেকে ?

—মানিকতলা। ইন্দ্রাণীই জবাব দিল,—আপনি এখনও শোননি কেন বাবা ?

—এই শুই।

—দেরি করবেন না। সাড়ে নটা বাজে। আমি ওপর থেকে এসে আপনার মশারি টাঙিয়ে দিচ্ছি।

ইন্দ্রাণী চলে গেল।

আদিত্য বাবাকে দেখছিল। মাত্র ক মাসে হঠাৎ যেন বড্ড বুড়ো হয়ে গেল বাবা! ভাবতে গিয়ে বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। আদিত্যর একদিনের বিস্ফোরণেই বোধহয় জরাটা উল্কার গতিতে ধরে নিল বাবাকে!

আদিত্য পায়ে পায়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ জয়মোহনের ডাক শুনতে পেল,—খোকন।

আদিত্য চমকে তাকাল,—বাবা তুমি ডাকছ ?

—আমি ! কই না তো !

ভীষণ অবাক হল আদিত্য,—তুমি এক্ষুনি আমাকে ডাকলে না ?

—আমি ! নাহ্ ।

বাবাকে অবিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই, একইভাবে ঝিমোচ্ছে মানুষটা । মুখ বুকের কাছে ঝুলে আছে ।

আদিত্যর বুক সিরসির করে উঠল । কী করে হয় ! সে যে এইমাত্র স্পষ্ট শুনল ডাকটা । খোকন !

সেই ঘড়ঘড়ে স্বর ! অবিকল বাবার গলার আওয়াজ !

আদিত্যর শুনতে এত ভুল হল !

রাতভর চোখের সামনে এক জাহাজডুবি হতে দেখে আদিত্য । ডুবে যাওয়া জাহাজের কক্ষে, ডেকে, ইঞ্জিনঘরে ভেসে বেড়ায় অজস্র নেতানো টাকা । অজস্র । টাকারা মানুষের স্বরে কথা বলে । খোকন ! খোকন ! ও কি কথা ? না আর্তনাদ ?

আদিত্যর ঘুম আসে না । ছটফট করে বিছানায় । অস্থির পায়ে ছাদে ওঠে, নেমে আসে, ভূতের মতো ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ি । অলৌকিক ছায়া হয়ে ।

কেউ জেগে ওঠে না । ঘুমোয় । নিশ্চিন্তে ।

৩৩

নার্সিংহোম উদ্বোধনের দিন চারেক পর পার্টি দিল শুভাশিস । নিজের ফ্ল্যাটে । দিনটা রবিবার, তার ওপর উপলক্ষ নতুন নার্সিংহোম, অরূপ শালিনী শুভাশিস তিনজনেরই পরিচিত গণ্ডির মানুষ ঝেঁটিয়ে এল পার্টিতে । হইহুল্লোড় হাসিতামাশার বান বয়ে গেল । নিয়ম মাফিক চটুল ইংরিজি বাজনা বাজল, কোমর জড়িয়ে নাচ হল নিয়মমাফিক, বেহেড মাতলামির রীতি বজায় রাখল কেউ কেউ । দিশি বিদেশি সুরা আর হোটেলপক্ক সুখাদ্যে উপচে পড়ল শুভাশিসের ফ্ল্যাট ।

আসর ভাঙল মধ্যরাতে ।

অরূপ শালিনী গেল সবার শেষে । প্রায় সাড়ে বারোটায় । ফ্ল্যাট খালি হওয়ার পর ফুল স্পিডে ঘুরন্ত পাখার নীচে কয়েক মিনিট মাথা টিপে বসে রইল ছন্দা । ভিড়ে, নিশ্বাসে এতক্ষণ এক কৃত্রিম উত্তাপ ছেয়ে ছিল গোটা ফ্ল্যাটে, ধীরে ধীরে ফিরছে প্রাকৃতিক শীতলতা । এ সময়ে শরীর যেন আর চলে না, সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়তে চায় ।

শুভাশিস ব্যালকনিতে এসে পরিতৃপ্ত মুখে সিগারেট ধরাল একটা । উল্টো দিকের ফুটপাতের দেওয়ালে কয়েকটি ছেলে নির্বাচনী স্লোগান লিখছে, এক যুবকের নিখুঁত হাতের টানে ফুটে উঠল দলীয় প্রতীক, শুভাশিস তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল । অথবা দেখছিল না । চোখ দিয়ে আর কতটুকুই বা দেখে মানুষ, দেখে তো মন । শুভাশিসের সেই মন আজ নিজেরই গন্ধে মাতোয়ারা । আত্মমগ্ন । সাফল্যের ছবি ছাড়া এখন অন্য কিছু দেখার তার অবকাশ কোথায় !

ছন্দা ডাক দিল, —বাইরে দাঁড়িয়ে কী করছ ? ঘরে এসো ।

শুভাশিস আনমনে বলল, —হাওয়াটা বেশ লাগছে ।

—ও হাওয়া মোটেই ভাল নয় । হিম পড়ছে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে ।

ছন্দার স্বরে অকৃত্রিম উদ্বেগ, শুনতে ভাল লাগল শুভাশিসের । হঠাৎ হঠাৎ এই একটুখানি মায়া, একজনের জন্য অন্যজনের ছোট ছোট ভাবনা, ফোঁটা ফোঁটা অনুভূতি, এরাই বোধহয় এতকাল টিকিয়ে রেখেছে সম্পর্কটাকে । অনুভূতিগুলো যেন ঠিক অনুভূতিও নয়, যেন এক ধরনের অদৃশ্য

আঠালো রোঁয়া । অগণন । এক সঙ্গে থাকতে থাকতে কখন আপনি গজিয়ে যায় তারা, আপনিই টানতে থাকে পরস্পরকে । এই টান কখনও কখনও ইস্পাতের শিকলের চেয়েও মজবুত ।

শুভাশিস ব্যালকনি থেকে ফিরল । টোটোর ঘরের দরজা আধখোলা । একটু আগেও ঘুরে ঘুরে অভ্যাগতদের হাই হ্যালো করছিল টোটো, এবার বোধহয় ঘুমিয়েছে । ছেলেটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল ! কেমন সাবালকের মতো আজ দেখভাল করছিল অতিথিদের ! তবে শৈশবের কিছু কিছু অভ্যাস এখনও যায়নি, এখনও দরজা খোলা রেখেই ঘুমোয় টোটো ।

টানা কাচের দরজা বন্ধ করে লম্বা রডে পর্দা টেনে দিল শুভাশিস । ছন্দার পাশে বসে বলল, —কি, খুব কাহিল হয়ে পড়েছ তো ?

ছন্দা চোখ বুজে মাথা দোলাল—নাহ, ঠিক আছি ।

—মোটেই ঠিক নেই । চোখমুখ একেবারে কালো হয়ে গেছে । শুভাশিস ছন্দার পিঠে হাত রাখল । আলগা জড়িয়ে ধরে একটু কাছে টানল ছন্দাকে, —মিছিমিছি এই শরীরে জোর করে স্ট্রেইনটা নিলে । অরূপ শালিনীদের ওখানে করলেই হত, ওরা তো করতেও চেয়েছিল ।

শুভাশিসের পলকা বাঁধন থেকে ছন্দা ছাড়াল না নিজেকে । উদাস ভাবে বলল, —শালিনীদের বাড়িতে কথায় কথায় পার্টি হচ্ছে । এটা এখানে না হলে দৃষ্টিকটু লাগত ।

—তা ঠিক । তবু তুমি পুরোপুরি সুস্থ থাকলে একটা কথা ছিল । গ্যাদারিংটা তো ক্লাবেও করা যেত, তুমি এমন জেদ ধরলে...

—ক্লাবে ঠিক সুখ হয় না । মাঝখান থেকে গুচ্ছের খরচা...

—দ্যাখো কাণ্ড ! শুভাশিস হেসে ফেলল, —তুমিই কিনা আমাকে কিপটে বলো । আরে বাবা, একটু নয় বেশি খরচা হতই । তোমার মিডলক্লাস মেন্টালিটিটা এখনও গেল না ।

—আমরা তো মিডলক্লাসই ।

—নো । উই আর অন দা রাইজ । উঠছি । আরও উঠব ।

কত দিন পর যে ছন্দার সঙ্গে এত স্বাভাবিক স্বরে কথা বলছে শুভাশিস ! ছন্দা প্রায় গলে গেল, —কোথায় উঠবে ? সিলিং-এ ?

নো । স্কাই ইজ দা লিমিট । বলতে গিয়েও থেমে গেল শুভাশিস । আকাশ মানে তো এক অনন্ত মহাশূন্য । মাইল কয়েক ওঠার পর বাতাস প্রায় থাকেই না, নিশ্বাসের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয় তখন । সেখানে উঠে কী করবে শুভাশিস ! হাসিমুখে বলল, —দ্যাখো না কোথায় পৌঁছই । তোমাকে আর মাটিতে পা ফেলে হাঁটতে দেব না ।

ছন্দাও হাসছে, —হাতে হাঁটব নাকি ?

—উহুঁ । উড়বে । ডানা মেলে । কথাটা বলে নিজেই মনে মনে একটু উড়ে নিল শুভাশিস, —সিটি ব্যাংক থেকে আরেকটা গাড়ি কিনছি । মারুতি থাউজেন্ড । তোমার আর টোটোর জন্য । সমীরণ শিগগিরই একটা ভাল ড্রাইভার পাঠিয়ে দেবে বলেছে । বেড়াতে গেলেও এবার থেকে উটি সিমলা কোডাইকানাল নয়, যদি যাই তো অন্য কন্টিনেন্ট । কি, খুশি ?

বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে । ছন্দা উঠে পাখা দু পয়েন্ট কমিয়ে দিয়ে এল । বালুচরি শাড়ির আঁচল আলগা জড়াল গলায় । সোফার পিঠে মাথা রেখে বলল, —টোটো খুব খুশি হবে ।

—তুমি হবে না ।

—আমি তো খুশিই ।

ছন্দা কি মন থেকে বলল কথাটা ? তবে কেন অপারেশন করাবে না বলে গোঁ ধরে আছে ? ভয় ? ডাক্তারের বউ হয়েও ? না, হিমোগ্লোবিনের পারসেন্টেজ একটু বাড়িয়ে এবার হিসটেরেকটোমিটা করিয়েই নিতে হবে । দরকার হলে জোর করবে শুভাশিস ।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে দামি প্যাকেটটা বার করে আবার একটা সিগারেট ধরাল শুভাশিস । ক'দিন ধরে অসম্ভব পরিশ্রম যাচ্ছে । স্যাস-এ শুভাশিসের পেশেন্ট এখনও ভর্তি হয়নি, ষোলোটা

বেডের মধ্যে ছটাতে মাত্র রুগী এসেছে, ছটাই শালিনীর। তবু সকাল বিকেল হাজিরা তো সেখানে দিতেই হয় শুভাশিসকে। কত কি গোছানো বাকি। হিসেবপত্র বাকি। মৃদুলবাবু, ইন্দ্রাণীর সেই বন্ধুর বর, কাল অবধি ডাক্তারদের কেবিনগুলো সাজিয়ে উঠতে পারেনি, তার পিছনে লেগে থাকতে হচ্ছে সারাক্ষণ। রিসেপশান কাউন্টারে দুটো টেলিফোনের একটাতে খালি কানেকশান এসেছে, অন্য লাইনটার জন্য দুদিন তদ্বির করতে যেতে হল। দোতলার কিছুটা অংশ শেষ পর্যন্ত বসবাসের জন্য ছেড়েই দিতে হল, তাই নিয়েও কম দৌড়োদৌড়ি গেল না। এর সঙ্গে অন্যান্য নার্সিংহোম আর চেম্বার তো চলছেই। আজ বিকেলেও ভালই ধকল গেল।

তবু শুভাশিসের কথা বলতে ইচ্ছে করছে এখন। সিদ্ধি সমস্ত ক্লান্তিকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শুভাশিস বলল, —পার্টি কিন্তু আজ জমেছিল ভাল, কী বলো?

ছন্দা সামনে পড়ে থাকা সাইড টেবিলে পা ছড়াল, —হ্যাঁ, অন্তত তোমাদের ওপেনিং সেরিমোনির মতো ম্যাদামারা হয়নি।

—যাহ, কি এমন খারাপ হয়েছিল সেদিন? ভাল স্ন্যাকস ছিল, মিষ্টি ছিল, আইসক্রিম-কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল...

—খাওয়া দাওয়ার কথা বলছি না।

—তবে?

—কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা।

কথাটা ঠিক। উদ্বোধনের দিন অনেককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল অরূপ শুভাশিসরা, ডক্টরস সার্কেলের হাতে গোনা কয়েকজন এসেছিল। সমীরণ ভাস্কররা তো বিকেলে একবার করে বুড়ি ছুঁয়ে চলে গেল। সপ্তাহের মাঝখানে কে আর সন্ধেবেলা চেম্বার ছেড়ে এসে বসে থাকে! বেশ কয়েকটা ওষুধ কোম্পানির লোক অবশ্য এসেছিল। লোকাল কাউন্সিলার আর গোটা দু-চার সরকারি আমলাও। এছাড়া অরূপ শালিনীর কিছু বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন। আর শুভাশিসের পক্ষ থেকে ছন্দার বাবা মা দিদি জামাইবাবুরা। আর ইন্দ্রাণীর ছোট দেওর চাঁদু।

শিবসুন্দর যে আসবেন না, জানাই ছিল। তুফানও এল না! সেদিন মনে মনে বেশ রাগ হয়েছিল শুভাশিসের। এ যেন তাকে একঘরে করার চেষ্টা। তুফান অবশ্য পরদিনই এসেছিল, শুভাশিসের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। আগেই টোটোর মুখে ভাসা ভাসা শোনা ছিল শুভাশিসের, বাবার কি সব সমস্যা চলছে গ্রামে। তুফানও নাকি সে সবই কিছু বলে গেছে ছন্দাকে। শুভাশিস এর কী বিহিত করতে পারে? অনেকবার তো পইপই করে বাবাকে বলেছিল তার কাছে থাকতে, বাবা কর্ণপাতও করেনি। এখন বুঝুক। বাবা যদি আদ্যিকালের ধ্যানধারণা আঁকড়ে থেকে ছেলেকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারে, ছেলের কীসের দায় বাবার কথা ভাবার! শুভাশিসের এখন ভাবতে বসার সময়ই বা কোথায়!

আর একজনও যে সেদিন আসবে না শুভাশিস জানত, আশাও করেনি তাকে। তবু চাঁদু যখন এল, তার সঙ্গে কি মেয়েটাকে পাঠাতে পারত না? ইন্দ্রাণী খুব ভাল মতোই বোঝে মেয়ের জন্য কী নিঃসীম আকুতি আছে শুভাশিসের, চিরটাকাল তবু কী নির্মম আচরণ করে গেল! মেয়েকে কিছুটি দিতে দিল না কোনওদিন। একটা ফ্রক না। একটা পেন না। এক জোড়া জুতো পর্যন্ত না। ক্বচিৎ কখনও বই উপহার দিয়েছে, তাও বাপ্পার নাম করে। একটা অসতর্ক মুহূর্তের দায় একাই বহন করতে চায় ইন্দ্রাণী, এতটুকুও ভার দেবে না শুভাশিসকে। মেয়েটা যে শুভাশিসের, সেটাই কোনওদিন মুখ ফুটে স্বীকার করল না! নারী যদি সরবে অস্বীকার করে যায়, তবে সব বুঝেও পুরুষের পিতৃত্বের দাবি কেমন শূন্যগর্ভ হয়ে যায়। সংশয় আর প্রত্যয়ের দোলাচল কুকুরতাড়া করে ছুটিয়ে মারতে থাকে পুরুষকে।

এ সব কথা ভাবলেই মনটা ব্যথিয়ে ওঠে। ফুরফুরে ভাবটা প্যানসে মেরে যায়। বুকের মধ্যে ইন্দ্রাণী-তিতিরের জন্য যে আলাদা কুঠুরি আছে, তার দরজা সজোরে বন্ধ করল শুভাশিস। কয়েক

লহমাতেই একটা হাসি হাসি ভাব এসে গেল মুখে। প্রায় সত্যিকারের হাসির মতো। প্রায় সত্যিকারের কেন, সত্যি সত্যিই।

অ্যাশট্রেতে সিগারেট নিবিয়ে শুভাশিস বলল, —তোমার বাবাকে আজ কিন্তু পার্টিতে মিস করেছি।

ছন্দা নেকলেস খুলে অন্যমনস্কভাবে হাতে ঘোরাচ্ছিল। বলল, —বাবারও খুব থাকার ইচ্ছে ছিল। মা এমন বাড়ি বাড়ি করে ছটফট করতে শুরু করল!

—দুটো দিন আর থেকে যেতেই পারতেন। এত ড্রিঙ্ক করতে ভালবাসেন...বাড়িতে আজ ভ্যারাইটি স্টক ছিল...

—সেদিন রাত্তিরে তুমি কিন্তু উচিত কাজ করোনি। নিজে খাচ্ছ খাও, বাবাকে কেন বসাতে গেলে? একে অভ্যেস নেই... বুড়ো মানুষ...

—বুড়ো বলো আর যাই বলো। শুভাশিস ঈষৎ কটাক্ষ হানল, —তোমার বাবা কিন্তু মাইরি ভাল টানতে পারেন। আগে খুব খেতেন, না?

ছন্দা পলকে গম্ভীর। নেকলেসটা সোফার কোণে ছুঁড়ে দিল, —কী করা যাবে, সবাই তো আর তোমার বাবার মতো জিতেন্দ্রিয় নয়। বলেই পাল্টা পিন ফোটাল, —অবশ্য তোমার বাবার মতো অসামাজিকও নয়। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে। কথা বলতে পারে।

লঘু ঠাট্টাকে আর বেশি বিপজ্জনক খাতে গড়াতে দিল না শুভাশিস। মনোরম রাতকে কেন মিছিমিছি তেতো করা! ছোট্ট একটা টুসকি মারল ছন্দার কাঁধে, —চটছ কেন? ঠাট্টাও বোঝো না?

—তোমার বাবাকে নিয়ে তামাশা করলে তোমার কেমন লাগে?

—একটুও ভাল লাগে না।

—তাহলে?

—তাহলে আবার কি। আই অ্যাম সরি।

ছন্দার চোখে অভিমান, ঠোঁটে সমঝোতার হাসি, —তুমি খুব চালাক। স্লাই ফক্স।

শুভাশিস দ্রুত প্রসঙ্গ পালটে নিল, —এই, ভাল কথা। তোমাকে তখন ভাস্করের বউ কি বলছিল গো?

অন্যদিন ছন্দার মেজাজ বিগড়োলে আবার সমে ফিরতে অনেক সময় লাগে, আজ লাগল না। চোখ ঘুরিয়ে বলল, —সে অনেক কথা। ভাস্করদাও নাকি নার্সিংহোমের প্ল্যান করছে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে কোন এক ননবেঙ্গলি ভদ্রলোকের নাকি অনেকটা জমি আছে, সে পার্টনার হবে।

—তাই! মুহূর্তে শুভাশিসের ভুরুতে ব্যবসায়ী ভাঁজ।

—দীপা তো সেরকমই বলছিল। ভাস্করদার নাকি বিশাল পরিকল্পনা। প্যাথলজিকাল ল্যাব তো থাকবেই, সঙ্গে আলট্রাসোনো, এক্সরে, পারলে স্ক্যানিং-এরও মেশিন বসাবে। তিনটে ও টি থাকবে। ফার্টিলিটি ক্লিনিক হবে। প্রায় কোটি টাকার বাজেট।

—ছাড়ো তো। যত সব বুকনি।

—সত্যিও তো হতে পারে!

—হলে দেখা যাবে। শুভাশিস নিস্পৃহ থাকার চেষ্টা করেও পারল না, —ভাস্করের এগেনস্টে আমাদের অ্যাসোসিয়েশানে কত কমপ্লেন জমেছে জানো? একটা পেশেন্টের ফ্যামিলি তো বোধহয় কোর্টে যাচ্ছে। সিম্পল কোলেসেসেকটোমির কেস, হাসতা খেলতা জোয়ান পেশেন্ট, ও টি-তে মরে গেল! প্রেশার ছিল না, সুগার ছিল না, নো আদার কমপ্লিকেশান, ই সি জি রিপোর্টও পারফেক্টলি ও কে.... এখন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের দোহাই দিয়ে অ্যানেসথেসিস্ট-এর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে!

ছন্দা নিরীহ মুখে বলল, —তুমি বোধহয় একটু জেলাস হয়ে পড়ছ।

—আমি! ছোঃ। শুভাশিসের মুখমণ্ডলে ভাঙচুর হল, —আমি শুধু ওর ওই বড় বড় কথাগুলো স্ট্যান্ড করতে পারি না। নেহাত আমার ব্যাচমেট, নইলে ওকে থোড়াই ইনভাইট করতাম।

ছন্দার ঠোঁটে তবু হাসির রেখা, —তোমার এই চটে যাওয়াটাকে কী বলে জানো ?

—কী ?

—মিডলক্লাস মেন্টালিটি। যা নিয়ে তুমি আমায় খোঁটা দিচ্ছিলে।

বহুকাল পর বাড়িতে দরাজ গলায় হেসে উঠল শুভাশিস। আশ্চর্য ! মনের কোণ থেকে কেন যে ঈর্ষার ধুলোবালি যায় না ? নাকি ঈর্ষাই সাফল্যের প্রাণবীজ ?

শুভাশিসকে একটু কথা শোনাতে পেরে ছন্দা আবার উচ্ছল। ক্লান্তি ঝেড়ে উঠে পড়ে কোমরে আঁচল জড়াচ্ছে। বলল, —অনেক হয়েছে, এবার তুমি শুতে যাও তো দেখি। আমি ঝটপট এদিকের কাজগুলো সেরে ফেলি।

—রাতদুপুরে তুমি এখন ঘরদোর নিয়ে পড়বে নাকি ? ছেড়ে দাও। সকালে কোরো।

—এই অবস্থায় সব ফেলে রেখে দেব ?

শুভাশিস চারদিকে আলগা চোখ বোলাল। সত্যিই নিদারুণ দশা ড্রয়িং স্পেসটার ! সোফা ডিভান টেবিল বেতের চেয়ার কিছুই আর স্বস্থানে নেই। কার্পেটময় বিরিয়ানির ভাত, নানের টুকরো ফিশ ফ্রাই-এর কুচি। এঁটো ডিশ বাটি ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। কাচের গ্লাসেদেরও কী অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় অবস্থান ! কেউ সোফার তলায়, তো কেউ ক্যাবিনেটের টঙে। কেউ ঘরের কোণে, কেউ বা জানলায়। সোজা। উল্টো। শোওয়ানো। টোটোর রেজাল্টের পার্টির দিন তিনটে গ্লাস ব্যালকনির টবের পিছনে রাখা ছিল, দুদিন পর আবিষ্কার করেছিল ছন্দা। তাও তো সে পার্টিতে শিবাজি ছিল না ! অরূপদের বাড়িতে একবার টবে গ্লাস পুঁতে রেখে গিয়েছিল শিবাজি, আর একবার রেখেছিল ডানলোপিলোর তলায়। আজ শিবাজি কী কীর্তি করে গেছে কে জানে !

ছন্দা খুঁজেপেতে সব গ্লাস এক জায়গায় জড়ো করছে। অনেক গ্লাসেই পানীয় অসমাপ্ত, দু-একটা গ্লাস অর্ধেকেরও বেশি ভর্তি। একটা গ্লাস তুলে শুভাশিসকে দেখাল ছন্দা, —কতটা স্কচ ফেলে দিয়েছে দেখেছ ?

শুভাশিস অলস মেজাজে বলল,— আরে, যেতে দাও।

ছন্দা গজগজ করছে, —খাবি না যদি তো নিস কেন ?

—নিতে হয়। সবাই কি আর মাত্রা বোঝে ?

—কিন্তু এ তো অপচয় ! নিজের পয়সায় খেলে তো কেউ নষ্ট করে না !

শুভাশিস তরলভাবে বলল, —সেই মিডলক্লাস মেন্টালিটি।

—সে তুমি যাই বলো, নষ্ট করা ব্যাপারটা আমার একদম বরদাস্ত হয় না।

—তাহলে এক কাজ করো। যে গ্লাসে যা পড়ে আছে সব একটা বোতলে ঢেলে ফেলো। নেক্সট পার্টিতে ওটাই ককটেল বলে সার্ভ করা হবে।

ছন্দা নাক কুঁচকোল, —ছি ছি, যত সব ছ্যাঁচড়া বুদ্ধি।

শুভাশিস মুখ টিপে হাসছে, —তোমার কি মনে হয় কেউ টের পাবে ?

—না পাক। ওরকম কেউ করে নাকি ?

—করে। যারা রিয়েল বড়লোক তারা করে। হায়দ্রাবাদের নিজাম করত। সাহেবদের বিশাল বিশাল পার্টি দিত, পার্টি শেষ হলে সমস্ত গ্লাসের তলানি নিজের হাতে বোতলে ভরে রাখত।

—ত্যাৎ, যত সব বাজে কথা।

—না গো ম্যাডাম, বাজে কথা নয়। ফ্যাক্ট। নিজামের তখন নাকি গ্যারেজে ডজন ডজন রোলস রয়েস সাজানো। হোল ওয়ার্ল্ডে সে তখন এক নম্বর বড়লোক।

—তুমি কি নিজাম হতে চাও নাকি ?

—ভাবতে দোষ কী। দাঁড়াও। শুভাশিসের হঠাৎ কি হয়ে গেল। উঠে রান্নাঘরে চলে গেছে। একটা খালি বোতল নিয়ে ফিরে এল। ছন্দার সামনে রাখল বোতলটা, —কই, ঢালো।

—এই, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ? শুভাশিসের ভাবভঙ্গিতে ছন্দা হেসে উঠেছে

খিলখিল।

শুভাশিস আড়চোখে একবার দেখল ছন্দাকে। গম্ভীর মুখেই বলল, —হলটা কি ? ঢালো।

ছন্দার হাসি থামল। সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে শুভাশিসকে, —ক পেগ খেয়েছ আজ ?

—ওয়ান। জাস্ট ওয়ান ফর মাই সাকসেস।

ছন্দা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

ছন্দার অপেক্ষায় না থেকে শুভাশিস এবার নিজেই ঝুঁকেছে। একটা একটা করে গ্লাস উপুড় করল বোতলে। দেখতে দেখতে বোতল অনেকটা ভরে এল। প্রায় আধ বোতল। জল মেশানো তরল, জল না মেশানো তরল, সোনালি, কালচে লাল, বর্ণহীন, সব পানীয়ই মিলেমিশে একাকার। রঙটাও বেশ খোলতাই হয়েছে। কোনও পানীয়েরই প্রকৃত রঙ আর পৃথক পৃথক করে চেনা যায় না, তবু মিশ্রণের মধ্যে থেকে প্রতিটি রঙই যেন উঁকি দিচ্ছে। শুভাশিস চোখ রগড়াল। সত্যিই চেনা যাচ্ছে ? না দৃষ্টিভ্রম ?

কোনওদিন যা করেনি, তাই করে ফেলল শুভাশিস। ছন্দা বাধা দেওয়ার আগেই বোতলটা থেকে সরাসরি পানীয়ে চুমুক দিল। খানিকক্ষণ মুখে রেখে জিভ চালিয়ে অনুভব করল স্বাদটা। গিলে নিতেই ঝং করে ধাক্কা লাগল মাথায়।

শুভাশিস কার্পেটের ওপর থেবড়ে বসে পড়েছে। বসে আছে। বসেই আছে। মৃদু ঝিমঝিম ভাব চারিয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্কে। ঝিমঝিম, না রিমঝিম ?

ছন্দাকেও হাত ধরে টেনে বসাল শুভাশিস, —তুমিও একটু টেস্ট করো।

নিজের বাড়িতে পার্টি থাকলে ছন্দা বিশেষ পান করে না। পার্টি জমার আগেই আচমন করার মতো খানিকটা ছুঁইয়ে নেয় জিভে। এতেই শরীর তার চনমনে থাকে, সারাক্ষণ ছুটে বেড়াতে সুবিধে হয়। শুভাশিস জানে।

বোতলটা ছন্দার হাতে ধরিয়ে দিল শুভাশিস। বলল, —আমার কথা রাখো। টেস্ট করো। শরীরটা ফ্রেশ লাগবে।

ছন্দা সামান্য সরে গেল, —না।

—ঘেন্না লাগছে ?

—লাগারই তো কথা। রাতদুপুরে এই দেয়ালা মোটেই ভাল লাগছে না।

শুভাশিস সরু চোখে দেখছে ছন্দাকে,—আমি খেতে পারছি, তুমি পারো না ?

ছন্দা কয়েক সেকেন্ড বিস্মিত মুখে তাকিয়ে রইল শুভাশিসের দিকে। বুঝি বুঝতে চাইছে এই অচেনা শুভাশিসকে। একটুখানি বাঁকা হাসল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আজব সুরার মিশ্রণ খুব অল্প করে ঢালল গলায়, —হয়েছে তো ? শান্তি ?

—কেমন টেস্ট বলো ?

ছন্দা নিরুত্তর।

—আমার তো দারুণ লাগল। শুভাশিসের চোখে এক আজব ঘোর, —অন্যের তলানি এত টেস্টফুল হয়, আমার জানা ছিল না। এই জিনিস দোকানে মিলবে না। নিজামটা খুব চালু ছিল। একেই বলে রিচ ম্যানস ব্রেন।

—এঁটো মদ নিয়ে কত গবেষণা ! ছন্দা নাক কুঁচকেই আছে।

—মদ কখনও এঁটো হয় না ডিয়ার, ঠোঁট বদলায়। শুভাশিস ছিপি বন্ধ করে বোতলটা সরিয়ে রাখল। বেশ একটা স্ফূর্তির বিকাশ হচ্ছে প্রাণে। বেসুরে গান ধরল, —বলো বলো বলো সবে, শত বীণা বেণু রবে, শুভ আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে...

—তুমি কি এক চুমুকেই মাতাল হয়ে গেলে নাকি ? ছন্দা উঠে দাঁড়িয়েছে।

শুভাশিস হ্যা হ্যা হাসল, —আমি তো কখনও মাতাল হই না।

—তাহলে এসব বন্ধ করো। টোটো উঠে পড়বে।

—উঁহুক। আমার ছেলে জানে আই অ্যাম আর্নিং আ ফরচুন ফর হিম।

—যা ইচ্ছে করো।

ছন্দা হাল ছেড়ে কাজে নেমে পড়েছে। একটা একটা করে এঁটো প্লেট বাটি কুড়োচ্ছে, হনহন করে গিয়ে রেখে আসছে সিঙ্কে। ঠেলে ঠেলে ভারি সোফা সরাল। টেবিল টেনে রাখল যথাস্থানে। হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। ঘামছেও অল্প অল্প। হাতের পিঠে মুছে নিল কপাল।

শুভাশিস ধীরে ধীরে বোধে ফিরল। উঠে পড়ে বলল, —আমার ওপর রাগ করে আবার এসব নিয়ে পড়লে কেন ? চলো, শুতে যাই চলো।

ছন্দা কার্পেট থেকে ভুক্তাবশেষ কুড়োচ্ছে। কুড়োতেই থাকল।

শুভাশিস করুণ মুখে বলল, —আমার একটা খুশির দিনেও তুমি অসুস্থ শরীর নিয়ে খেটে যাবে ?

এতক্ষণে উত্তর শোনা গেল, —কে বলেছে আমি অসুস্থ ? তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, আমি পারি না ?

সেই এক কথা। এক জেদ। শুভাশিস সামান্য তপ্ত হল,— না, পারো না। ইউ আর মাই ওয়াইফ। আমি যেভাবে চলব, তোমাকেও সেভাবে চলতে হবে। এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে বাড়িতে এতগুলো কাজের লোক পুষেছি, যদি তোমার দরকার হয় আরও পুষব, তারা কাজ করবে। তুমি নয়।

ছন্দা যেন শুনতেই পেল না। শুভাশিসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। ডিভান কষ্ট করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেওয়ালের দিকে।

অকস্মাৎ রক্ত চড়ে গেল শুভাশিসের মাথায়। ছন্দার নির্লিপ্ত অবজ্ঞাই কি প্ররোচিত করল রাগকে ? নাকি আশ্চর্য সুরার প্রভাব নিজাম শুভাশিসের পৌরুষে আঘাত হানল ?

দুমদাম চেয়ারে লাথি চালাতে শুরু করেছে শুভাশিস। রাত্রিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে সশব্দে টেবিল টানছে। সাজানো চেয়ার টেবিল এলোমেলো করে দিল। খ্যাপা মোষের মতো সোফাগুলোকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

ছন্দা অদ্ভুত রকমের নীরব। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অচিরেই নিজের রাগে ক্লান্ত হয়ে পড়ল শুভাশিস। রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেল ঘরে। টানটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। শুয়ে শুয়েও আওয়াজ পাচ্ছিল শুভাশিস। আবার আসবাবপত্র টেনে টেনে সাজাচ্ছে ছন্দা। আবার বেসিন সিঙ্কে টুঙ-টাঙ শব্দ।

ছন্দার সঙ্গে সম্পর্কটা বোধহয় এ রকমই চলবে শুভাশিসের! একটুখানি জোড়াতালি, একবার সাজানো, একবার ভেঙে ফেলা। আবার ভাঙা টুকরো নিয়ে সাজাতে বসা।

ভাল। তাই চলুক।

শুভাশিস উঠে বাথরুমে গেল। ঘাড়ে গলায় জল ছিটোচ্ছে। ভিজে মুখ ঘষে ঘষে মুছছে তোয়ালেতে। নরম তোয়ালের স্পর্শে আরাম হল খানিকটা। আয়নায় নিজেকে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু মুখ দেখার জন্য আয়নার সামনে বড় একটা দাঁড়ানো হয় না। যা হয়, তা নেহাতই দৃষ্টিপাত।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শুভাশিসের। মুখ চোখ অনেক ভারী হয়ে গেছে। কেমন একটা ফোলা ফোলা ভাব। আগেও চেহারা তার তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, এখন যেন বড় বেশি ভোঁতা ভোঁতা। চামড়ার টান ভাব কমতে শুরু করেছে। শরীরের সেলগুলোর মৃত্যুহার বোধহয় বাড়া শুরু হল। আয়নার ওই মানুষটাকে কি আর ইন্দ্রাণীর প্রেমিক বলে চালানো যায়! নাকি ওটা টোটোর বাবার মুখ! অথবা তিতিরের জন্মদাতার! অথবা ছন্দার স্বামীর! কিংবা এদের কারুরই নয়, ওই লোকটা শুধুই একটা তলানি সুরা চাটা হাউই! এক ক্রূর ভোগী আত্মসর্বস্ব পুরুষ! ঘুরছে, ঘুরছে স্বরচিত কক্ষপথে!

দুর, সেই মিডলক্লাস মেন্টালিটি! সফল মানুষদের এসব ভাবতে নেই। আজব সুরার স্বাদ

এখনও লেগে আছে শুভাশিসের জিভে। মুখের ভেতর জিভ বোলাতে বোলাতে শুভাশিস পাঞ্জাবি ছাড়ল। শুঁকল পাঞ্জাবিটাকে। ফ্রেঞ্চ পারফিউম ছাপিয়ে ঘেমো গন্ধ ছিটকে আসছে। কোণের গামলায় এক রাশ জামাকাপড় কাচার জন্য জড়ো করা, স্তূপের ওপর পাঞ্জাবিটাকে ছুঁড়ে দিল শুভাশিস। বাথরুমের আলো নেবাল।

ঘরে এসে বাথরুমের দরজা টানতে গিয়ে সহসা শুভাশিসের চোখ বিঁধে গেছে আয়নায়। নিমেষে শিরদাঁড়া বেয়ে হিম স্রোত নেমে গেল।

আলো-আঁধারে আয়নায় ফুটে আছে মনোরমার মুখ! ফাঁকা চোখ তাঁর শুভাশিসের মুখে স্থির!

৩৪

নিজের ঘরে বসে কান খাড়া করে শুনছিলেন জয়মোহন। সন্ধ্যার মা আর মিনতিতে জোর কাজিয়া লেগেছে। প্রায়ই ল্যাগে আজকাল। দশটার পর থেকে ইন্দ্রাণী ফেরা পর্যন্ত এ বাড়ির কোনও শাসক থাকে না, দুজনেই প্রাণ খুলে গলা সেধে নিতে পারে এ সময়ে। রুনা থাকলে ঝগড়াটা তেমন জুতের হয় না, ওপর থেকে রুনা একবার হাঁক পাড়লেই মিনতিকে হেরে যেতে হয়। বাছা বাছা গালাগাল, অশ্লীলতম গ্রাম্য শব্দের চোখা চোখা প্রয়োগ, কিছুই আর শোনা হয় না জয়মোহনের। দিনটা বড় আলুনি আলুনি ঠেকে।

সুখের কথা, রুনা ইদানীং থাকেই না। পুজোর ছুটির পর থেকে ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে সে আর বাড়ি ফিরছে না। অ্যাটমের স্কুলের মায়েরা মিলে একটা ক্লাব গড়েছে। রুনা এখন সেই ক্লাবের পাণ্ডা। চাঁদা তুলে স্কুলের গায়েই একটা ঘর ভাড়া করেছে তারা। সেখানে বসে গয়না শাড়ির হালফিল বিবর্তন নিয়ে জোর গবেষণা চলে, কে কত রকম অভিনব রান্না জানে তা শোনানোর প্রতিযোগিতা হয়, সিনেমার নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভীষণ জরুরি মিটিং বসে, আরও কত কি যে হয়! ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, স্কুলের স্যার-আন্টিদের যথেচ্ছ অবিচার নিয়ে সমালোচনা, নির্ভেজাল শাশুড়ি নিন্দা, পতিনিন্দার ছলে স্বামীগরবে গরবিনী হওয়া, যে একদিনও অনুপস্থিত হয় তাকে নিয়ে রহস্যালাপে মুখর হয়ে ওঠা, সবই ক্লাবের কর্মসূচির অঙ্গ। গত রবিবার রুনার ক্লাব বারুইপুরে ফিস্টও করতে গিয়েছিল। জয়মোহনের জন্য বেশ বড় বড় পাকা পেয়ারা এনেছিল রুনা।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছেন জয়মোহন। আহা, খাসা চালাচ্ছে দুজনে। যুগলবন্দির দুই ওস্তাদ আলাপ জোড় সেরে এবার গতে পৌঁছে গেছে।

মিনতি তান ধরল, —একদম চোপা করবি না। কাল গোটা হেঁশেল যে মাছের আঁশে ছেতরাপ্যাতরা করে রেখে গেলি, কে ঝ্যাঁটাল সেটা? তোর নাঙ?

পাল্টা তানে জবাব দিল সন্ধ্যার মা, —নাঙ করা তো তোর স্বভাব রে মাগি। ভাতার ফেলে এসে পেরেসঘরে ঢলানি করিস...

—মিছে কথা বলবিনি। মুখ ছিঁড়ে নেব।

—ওরে আমার সত্যবানের সাবিত্তির রে, ওরে আমার লখিন্দরের বেউলে রে, ওরে মরে যাই রে...

বাহ বাহ। তুখোড় চাপান-উতোর চলছে। জয়মোহন সমঝদার শ্রোতার মতো ঘাড় দোলালেন। দেখা যাক মিনতি এবার কি জবাব দেয়।

মিনতি পুরাণ মঙ্গলকাব্যের ধার মাড়াল না। টিটকিরির উত্তরে খিস্তির ঝালা ধরেছে। সন্ধ্যার মা'রও চোপা খুব, তবে শেষ অবধি মিনতির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না সে। মিনিট দশেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালিয়ে রণে ক্ষান্ত দিল সন্ধ্যার মা। খুচখাচ গজগজ করছে, কিন্তু আর তেজ নেই।

জয়মোহন হতাশ। দুই রমণীর মধুর বাক্যালাপে সময়টা তাঁর কাটে ভাল, মরা বাড়িটাকে বেশ

জ্যান্ত জ্যান্ত লাগে। আজ যেন ঠিক জমল না। ক'দিন আগে প্রেসের এক ছোকরাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে ইন্দ্রাণী, তার বদলে এসেছে এক বদ্ধ কালা বুড়ো কম্পোজিটার। তারপর থেকেই মিনতিটা একটু বেশি খেপি হয়ে গেছে। ছুঁড়ি সত্যি সত্যি মজেছিল নাকি ? রোজই ভাবেন দুর্লভ এলে জেনে নেবেন ব্যাপারটা, মনে থাকে না। এত অন্য সব কথা বলে দুর্লভ ! কত রকম যে গল্প শোনায় ! কলকাতা এবার তিনশো বছরে পড়ল, তাই নিয়ে নাকি জব্বর হইহই চলছে শহরে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আলো জ্বলছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন ফোয়ারা বসেছে, ফোয়ারার জল নাকি বাজনার তালে নাচে। একসময়ে এক রসিক মন্ত্রী মনুমেন্টের মুণ্ডিটা লাল করে দিয়েছিলেন, রঙের লালিমা মুছে গিয়ে সেখানেও নাকি রোশনাই এখন। চৌরঙ্গি পাড়াও খুব রুজ লিপস্টিক মেখেছে। এসব তো আর জয়মোহনের চর্মচক্ষে দেখা হবে না, শুনে শুনেই যেটুকু তৃপ্তি হয়।

দেওয়াল ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। এগারোটা। ইজিচেয়ারের হাতলে রাখা খবরের কাগজটা টানলেন জয়মোহন। পড়বেন আবার। চোখের সামনে ধরার আগে গলা ঝাড়লেন। অঘ্রান শেষ না হতেই ভাল শীত পড়ে গেল। শ্লেষ্মায় গলা বুজে থাকছে সব সময়।

ঘড়ঘড়ে গলায় জয়মোহন ডাক দিলেন, —মিনতিইই....

দুপ দুপ করে ঘরে এল মিনতি। হাতে একটা সাঁড়াশি।

—আমার গরম জল বসিয়েছিস ?

—এবার বসাব। মিনতির মুখ এখনও থমথম করছে। ঝড় থামলেও মেঘ কাটেনি।

—এখনও বসাসনি ? তোর জন্য আমার রোজ চানে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—আমার হাতে কাজ থাকে।

—সে তো শুনছিলামই। তোর কাজের ঠেলায় পাড়ায় কাক চিল বসছিল না। কথাটা বলেই একটু আফসোস হল জয়মোহনের। এই বয়সের মেয়ে তেতে থাকলে গোখরো সাপ। এক্ষুনি না ফণা তুলে ছোবল মারে। ঘড়ঘড়ে গলা যথাসম্ভব মিহি করে ফেললেন জয়মোহন, —আমাকে ভাঁড়টা দে তো।

খাটের তলায় রাখা শ্লেষ্মা গয়েরে আধভর্তি বড় মিষ্টির ভাঁড়টা ঠক করে ইজিচেয়ারের হাতলে রাখল মিনতি। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। ঘেন্না। খকখক কেশে অনেকটা কফ তুললেন জয়মোহন। হা হা করে বড় বড় দুটো নিশ্বাস নিলেন। বুক অনেক হালকা।

মিনতি ভাঁড় রেখে চলে যাচ্ছিল, জয়মোহনের ডাকে ফিরল, —আবার কী চাই ?

জয়মোহন কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, —ভাঁড়টা ফেলে দে না। অন্য একটা দে।

—নেই।

—কেন, মিষ্টিমাষ্টা আর আসছে না ?

—এলে তো পেতেনই।

কে জানে বাবা, কত কিছুই তো আসে বাড়িতে, কতটুকুনেরই বা খবর পান জয়মোহন ! এই তো কবে যেন অ্যাটমের মুখে প্যাটিসের গুঁড়ো লেগে ছিল ! বাড়ির কেউ তাঁকে জানায়ওনি, এক কুচি ভেঙেও দেয়নি। নেহাত অ্যাটমটার এখনও বুদ্ধি পাকেনি তাই সরল মনে... ! দীপুর ঘরে মিষ্টি আসে না, একথা বিশ্বাস করতে হবে ! দীপুটা না মিষ্টি খাওয়ার যম ছিল। শোভনা কত লুকিয়ে রাখতেন, ঠিক চুরি করে খেয়ে নিত ছেলে। অবশ্য বলা যায় না, যা বউয়ের ভেড়ুয়া, বউয়ের হুকুমে ছেড়েও দিতে পারে। বউ তো এখন ক্যালোরি কমাচ্ছে ! নিজের। বরের। বুড়োটার যে ক্যালোরিই নেই, তার কি হবে !

নাহ, মেয়েই আপন, ছেলেরা পর। বরের কোলে ঝোল টানে ঠিকই, কিন্তু বাপকেও টানে খুব। এলেই মনে করে বাপের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে জয়ি। সে রসগোল্লাই হোক, কি সিঙাড়া নিমকিই হোক। গত হপ্তায় গরম গরম মাটন চপ এনেছিল। সঙ্গে কাসুন্দে। আহ, কী ঝাঁঝ ! এখনও যেন নাকে লেগে আছে ! এবার জয়ি এলে নলেন গুড়ের সন্দেশের কথা বলতে হবে।

জয়নগরের মোয়াও এখন ওঠার কথা, ভাঁড়ের নাম করে ভাল রসগোল্লাও যদি আনানো যায়... !

বাড়িতে খবরের কাগজ আসে দুখানা। বড় ছেলের ঘরে বাংলা, মেজর ঘরে ইংরিজি। কন্দর্প আদিত্য বাপ্পা তিতির হয়ে জয়মোহনের কাছে পৌঁছতে বাংলা কাগজের নটা বেজে যায়। সুদীপের ইংরিজি নামে আরও পরে, ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ঘরে ফেলে দিয়ে যায় রুনা। ছুটির দিনে নামেই না, মিনতিকে পাঠিয়ে কাগজ আনিয়ে নিতে হয়।

বাংলা কাগজ উল্টোচ্ছেন জয়মোহন। মৌজ আসছে না। নতুন কি এক খিচুড়ি গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে দিল্লিতে, কাগজ শুধু বক্তিমেতে বোঝাই। ইলেকশানের আগে বাংলা কাগজে অনেক জুস থাকে, পড়তে মজা লাগে। এখন দেখলেই বিরক্তি হয়। সব পার্টি মিলে একটা মা মরা ছেলেকে অভিমন্যুর মতো বধ করল, তাই নিয়ে এত উল্লাসের কী আছে ! তেরঙা পার্টির দিন কি ফুরোল ? কী বিশ্রী ব্যাপার। জয়মোহনের মনে আছে, এ রাজ্য লাল প্যার্টির দখলে চলে যাওয়ার পর এক রাত্রি তিনি অন্ন স্পর্শ করেননি। শোভনা কী হাসাহাসিই না করেছিলেন ! বাপ মরল সেধোর, কাছা নেয় মেধো ! উজিরের হাতি ডুবল, মাঝির বউ কেঁদে মরল ! নিজে না রাজনীতি করুন, যে পার্টিকে তাঁর পছন্দ তারা হেরে গেলে কি দুঃখও পেতে পারবেন না জয়মোহন ! শত টিটকিরিতেও সে রাতে রুটির থালায় বসেননি জয়মোহন, শুধু দুধটুকু খেয়েছিলেন।

ঠকাস ঠকাস আওয়াজ হচ্ছে কোথায় ! রান্নাঘরে না ! জয়মোহন কাগজ মুড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, —অ্যাই মিনতি, অ্যাই সন্ধ্যার মা, কি হচ্ছেটা কি ?

রান্নাঘর থেকেই জবাব ছুঁড়ল মিনতি, —পেরেক পুঁতছি।

—রান্নাঘরে পেরেক !

—মেজদা একটা বাসন রাখার খাঁচা কিনে এনেছে, দেওয়ালে লাগাতে বলেছে।

—তা বলে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবি নাকি ?

—ভাঙছি কোথায় ! পেরেক দেওয়ালে ঠুকতে হবে না ?

—ঠুকবি না।

—তা হলে লাগানো হবে কী করে ?

—লাগাবি না। বাড়ি ভেঙে ঘর সাজানোর দরকার নেই।

—বউদি কিন্তু পইপই করে লাগাতে বলে গেছে। ফিরে এসে আমার ওপর রাগ করবে।

—হুঁহ, রাগ করবে ! বলি বাড়িটা কার ? তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে হুঙ্কার ছাড়লেন জয়মোহন, —আমি বলছি লাগানো হবে না, হবে না।

আওয়াজ থেমেছে। জয়মোহন দাঁত কিড়মিড় করলেন। এ সংসারে কারুর একটু মায়ামমতা নেই বাড়িটার ওপর ? বাড়ি ভাঙতে পারেনি বলে চুনবালি খসিয়ে মজা পেতে চায় ? ওটি তো হবে না বাপধন।

বাংলা কাগজ ঠেলে সরিয়ে ইংরিজিটা খুললেন জয়মোহন। এটা তাও পদের। দেশবিদেশের অনেক খবর থাকে। ইরাক-ইরানের লড়াই, লেবাননের গৃহযুদ্ধ, লন্ডনের জাতিদাঙ্গা, শ্রীলঙ্কার তামিল বিদ্রোহ, কতরকম রক্ত গরম করা খবর। পড়তে পড়তে রাগ ক্ষোভ চলে যায়, নতুন উত্তেজনার রোমাঞ্চ জাগে প্রাণে। মাথায় থাকে না, একই খবর পড়েন বার বার। মনটা চনমনে হয়ে ওঠে। সকালের চিনি টোস্ট গুব গুব হজম হয়ে যায়।

বাথরুমে জল দিয়ে ডাকছে মিনতি। স্নানের পথে রান্নাঘরের দরজায় এলেন জয়মোহন। আঁজলা ভরা সর্ষের তেল সর্বাঙ্গে থুপে থুপে ডলছেন। বারোমেসে অভ্যাস। শীতে বড্ড ভাল লাগে।

জয়মোহন রান্নাঘরে চোখ চালালেন, —কী রান্না করলি আজ ?

—পেঁপের তরকারি। চারা মাছের ঝোল।

—আজও পেঁপে ! আর কিছু সবজি ওঠে না বাজারে ? কপি টপি আনতে পারিস না ? শীতকালে

কচি মুলোর ছেঁচকিও খাওয়াবি না ?

—কপি মুলো তো আপনার বারণ।

—একদিন খেলে কি হয় ? জয়মোহন বায়না ধরলেন, —পালংশাক তো আনতে পারিস।

—শাক খেলে আপনার পেট ছাড়ে। ডাক্তারবাবু শাক দিতে মানা করেছেন।

শুভাশিস একটা ডাক্তার জুটিয়ে দিয়েছে বটে ! হারামজাদা তাকে না খাইয়ে মারবে। শরীরের উন্নতির বেলায় ঠনঠন, ওদিকে নিষেধের বেলায় লিস্টি আঠেরো গণ্ডা।

জয়মোহন সামান্য খেঁকিয়ে উঠলেন, —কিচ্ছু হবে না। আনিস তো তুই।

—আমাকে বলছেন কেন ? বউদিকে বলবেন। বউদি যা বলে, তাই আনি।

আবার বউদি দেখাচ্ছে ছুঁড়ি। রুনাটাও চালাকি শুরু করেছে বটে। নিজে আজকাল দুপুরে বাড়িতে খায় না। মাদার্স ক্লাবে বসে স্যান্ডুইচ-ফ্যান্ডুইচ সাঁটায়। দু বেলাই ভাত না খেয়ে চর্বি কমাচ্ছে ! দেখাদেখি দীপুটাও হেভি ব্রেকফাস্ট করে অফিস যায়, টক দই আর শশা দিয়ে নাকি লাঞ্চ সারে। আর জয়মোহনের জন্য পেঁপে পেঁপে পেঁপে, অবিরল পেঁপে। পুজোর পর থেকে কম সে কম ছ ওয়াগন পেঁপে খাওয়া হয়ে গেল ! পেট ঠাণ্ডা হয়, না গুস্টির পিণ্ডি হয় !

সন্ধ্যার মা কাচাকাচি সেরে উঠোনে কাপড় মেলছে। বাথরুমে ঢোকার আগে সতৃষ্ণ চোখে তাকে ডাকলেন জয়মোহন, —তোদের আজ কী হল রে ?

গেঞ্জি পাজামায় ক্লিপ লাগাতে লাগাতে সন্ধ্যার মা গলা ওঠাল, —এ বেলা ফুলকপি। ওবেলা ডিমের ঝোল।

—মাছ কি ?

—চিংড়ি। ফুলকপি দিয়ে ঝোল করা হয়েছে।

—অ। জয়মোহনের বুক কাঁপিয়ে তুলতুলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। শোভনা এই রান্নাটা বড় ভাল করত। আলু কপি চিংড়ি দিয়ে গা-মাখা গা-মাখা একটা ঝোল বানাত, ঠিক যেন অমৃত।

শোভনাটা কী বেইমান ! সারা জীবন সুখ ভোগ করে বুড়ো মানুষটাকে একলা ফেলে রেখে চলে গেল ! একবার ভাবল না পর্যন্ত, বউ না থাকলে শেষ বয়সে পুরুষমানুষের কী বেহাল দশা হয় ! ওপারে গিয়ে কী মজা মারছে কে জানে !

চোখের কোল মুছে প্যায়ে পায়ে বাথরুমে ঢুকলেন জয়মোহন। সন্ধ্যার মা'র কাছে খাবার চেয়ে লাভ নেই, দেবে না। রুনার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর থেকে জয়মোহনকে কিছু দেওয়াতে ইন্দ্রাণীর কড়া বারণ। স্কুল থেকে ফেরার পথে প্রায়দিনই জয়মোহনের জন্য লেবু আপেল আঙুর আনে ইন্দ্রাণী, ঘরে এসে সাজিয়ে রেখে যায়। কিন্তু রান্না করা খাবার ! ভুলেও না। ভাল। আলাদা হয়েছিস, বুড়ো শ্বশুরের দুঃখ বোঝার তোর কী দায় ! একদিন বিরিয়ানি খেয়ে সামলাতে পারিনি, এখন দে, যত পারিস শাস্তি দে।

স্নান খাওয়া সেরে গোটা তিনেক ট্যাবলেট গিললেন জয়মোহন। দুপুরে রাতে খাওয়ার পরই একটা টান মতো ওঠে, বেশ খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকতে হয়। কী যে বিদঘুটে রোগে ধরল ! হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে গেছে ! হৃৎপিণ্ড, না হৃদয় ? রামদুলাল শচীনরা ঠাট্টা করে বলত জয়মোহনের নাকি হৃদয়টা বিশাল ! এই হোটেলে খাওয়াচ্ছে, দেদার টাকা ধার দিচ্ছে, দল বেঁধে বাগানবাড়িতে গিয়ে সবার ফুর্তির খরচ জোগাচ্ছে ! আশ্চর্য, বন্ধুদের প্রশংসাই অভিশাপ হয়ে করাল ব্যাধির আকার নেবে কে জানত !

হ্যাঁ, টাকা অনেক উড়িয়েছেন জয়মোহন, রোজগারও তো কম করেননি। খোকন শুধু তাঁর ফাটকা খেলে টাকা ওড়ানোটাই দেখল ! খোকন জানে না ফাটকা খেলেই যুদ্ধের বাজারে হাজার হাজার টাকা কামিয়েছিলেন তিনি। খোকন কেন, কেউই জানে না। শুধু শোভনা আবছা আবছা আন্দাজ করতেন কিছু। সেই টাকা দিয়েই তো তেল সাবানের কারখানা শুরু। রমরমিয়ে বিশ বছর চলেছিল ব্যবসাটা। সেই ছেচল্লিশ থেকে উনিশশো পঁয়ষট্টি। বেঙ্গল কেমিক্যালের মতো না হলেও

ডিভাইন সাবানের নাম ছিল বাজারে। ডিউ পাউডার, ডিউ পারফিউমের জন্য বম্বে হায়দরাবাদ কানপুর থেকেও অর্ডার আসত। হঠাৎ কী যে এক বিশ্বজোড়া মন্দা নামল! টাকাই কেমন শুকিয়ে আসতে লাগল ক্রমশ। কোনও বাজার থেকে পেমেন্ট পাওয়া যায় না, অর্ডার আসে না, শেষে শুরু হল ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাতা। তাতেও হচ্ছে না দেখেই তো মরিয়া হয়ে আবার ফাটকায় নেমেছিলেন জয়মোহন। ডোবার সময়ে কি মানুষের খেয়াল থাকে, সে সাপ ধরছে, না সুতো ধরছে! রেসের নেশাটা অবশ্য রামদুলাল ধরিয়েছিল। খুব লোভ দেখাত। একটা জ্যাকপট পেলেই নাকি সব মুশকিল আসান। দুর্বল মুহূর্তে মানুষের লোভও আসে বটে। মাঝখান থেকে সব গেল। শোভনার একরাশ গয়না গেল। কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের টাকা কিছুই বাঁচল না।

রইলটা কি? ছুটন্ত ঘোড়ার মুখ। রাশি রাশি লোকের চোখ ঠেলে আসা গর্জন। আর নিশ্বাস বন্ধ করে রাখা কয়েকটা মুহূর্ত।

এ সবই মনে পড়ে জয়মোহনের। স্পষ্ট নয়, আবছা। যেন ঘন কুয়াশার ওপারে সার সার ছবি। দুপুরবেলার এই সময়টাতে একা একা ছবিগুলোকে হাতড়ান জয়মোহন। হাতড়াতে হাতড়াতে চলে যান বহু দূর। শেষ যৌবন থেকে প্রথম যৌবন। সেখান থেকে কৈশোর। শৈশব। অদ্ভুত ব্যাপার, মাঝে এত কুয়াশা, অথচ ছেলেবেলাটা যেন ঝকঝকে নীল আকাশ! এই তো সেদিন বাবা চালতাবাগান থেকে বাড়ি করে উঠে এলেন ঢাকুরিয়ায়। কতই বা বয়স তখন জয়মোহনের! এই অ্যাটমের মতো, কি তার থেকে একটু বড়! কী শ্রী ছিল তখন এই ঢাকুরিয়ার! চারদিকে কত গাছপালা, বাগান, ঝিল। ফি রবিবার পাথুরেঘাটার বাবুরা পাখি শিকার করতে আসত সামনের প্রকাণ্ড বাগানটায়। বাগান থেকে টানা ঝিল চলে গেছে সেই রেললাইন পর্যন্ত, সারা বিকেল ঝিলের ধারে খেলে বেড়াতেন জয়মোহনরা। এ বাগান থেকে ও বাগানে ছুটতেন। আম চুরি। জাম চুরি। লিচু চুরি। হুম হাম হনুমানের পাল আর টিয়াপাখির ঝাঁক নামত ফলবাগানে। সান্যালদের ন্যাড়ার সঙ্গে আঠা মাখানো জাল ফেলে একবার তিনটে টিয়া ধরেছিলেন জয়মোহন। মা রাখতে দেয়নি, উড়িয়ে দিয়েছিল। একটা বেজিও ধরেছিলেন একবার। এখন যেখানে কালীমন্দির, সেখানে একটা শীতলা মন্দির ছিল। তারই পিছনের ঝোপে পাওয়া গিয়েছিল বেজিটাকে। সেটাও টেকেনি, একটা শঙ্খচূড়কে মারতে গিয়ে নিজেই ছোবল খেয়ে মরেছিল। চারদিকে তখন কত সাপ বেজি শেয়াল। প্রহরে প্রহরে হুক্কাহুয়া ডাক। রাত হলেই গা ছমছম। বাবার বন্ধু ফার্গুসন সাহেব রেললাইনের ওপারে কবরখানার দিকে দিনদুপুরে একটা শেয়াল মেরেছিলেন। দোনলা বন্দুক দিয়ে। বাগানের পিছনে মাইতিদের উঠোনে শেয়ালটার চামড়া ছাড়ানো হল। মাইতি? না না, জানা। মাইতি তো পাশের বাড়িটা। হরিহর মাইতি, দিগম্বর মাইতি...। ওদের বাড়ির এক ছেলে জয়মোহনের স্কুলে পড়ত। মেদিনীপুরের লোক ছিল ওরা। পাথুরেঘাটার জমিদারদের কাছ থেকে রায়তি স্বত্ব পেয়ে সব চাষবাস করত এখানে। বাবা ওদেরই কার কাছ থেকে যেন এ জমিটা কিনেছিলেন। কি এক বৈরাগি, না মাঝি! ওই সব রায়তরা ঘর জমি বেচে একে একে কোথায় যে চলে গেল! জয়মোহনরা যখন এখানে বাড়ি করে আসেন, তখনও রামলাল ডাকাতের কী প্রতাপ! সাত সুন্দরী বউ-এর নামে ঝিলের পুব পাড়ে শিবমন্দির বানিয়েছিল একটা, ফি চৈত্রে চড়কের মেলা বসত সেখানে। ম্যাজিক লণ্ঠন দেখানো হত, পুতুলনাচের তাঁবু পড়ত, লাঠিখেলা হত, আরও কত মজা।

আহা, ঠিক যেন শহরের কোলে এক সুন্দর গাঁ। ভোরে নগর সঙ্কীর্তন, ঘরে ঘরে বাস্তু পুজো, বারো ইয়ারি পুজোয় থিয়েটার যাত্রা, সবই যেন এই কালপরশুর কথা। এত উজ্জ্বল। এত স্পষ্ট।

একে একে সবই বদলে গেল। যে বছর জয়মোহন কলেজ পাশ করলেন, সেই বছরই বুজিয়ে দেওয়া হল ঝিলটা। ধীরে ধীরে সেই বোজা ঝিলের ওপর গড়ে উঠল ব্যাঙ্ক প্লট। জমিদার বাবুদের ফলবাগান কেটে বসতি শুরু হল। রেললাইনের ওপারেও ঝোপজঙ্গল কেটে, পুকুর বুজিয়ে মানুষের বসবাস বাড়তে থাকল ক্রমশ। কলুপাড়া, তেলিপাড়া, রায়পাড়া, দাসপাড়া, ব্যানার্জিপাড়া, মুখার্জিপাড়া, বেনের মাঠ, নাজিরদের বাগান, দেখতে দেখতে বাড়িঘরের জঙ্গল হয়ে গেল।

বড় রাস্তার ওপারে যোধপুর পার্কের ক্লাবটা তখনও চলছিল। সাহেব-মেমদের খুব ভিড় হত ক্লাবে। ততদিনে জয়মোহনের বিয়ে-থা হয়ে গেছে, খোকনও এসে গেছে। ছেলের হাত ধরে মাঝে মাঝেই ক্লাবের দিকে যেতেন জয়মোহন, হাঁ করে খোকন সাহেব-মেমদের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখত।

ক্লাবটাও উঠে গেল। স্বাধীনতার দু-চার বছর পরেই।

সবার শেষে বিদায় নিল শেয়ালদা বজবজ লাইনের লেভেল ক্রসিংটা। টুং টুং গেট। তার জায়গায় তৈরি হল এক বিশাল ব্রিজ। কলকাতা উড়ে এসে মিশে গেল ঢাকুরিয়ায়।

সেটা যেন কত সাল ? চৌষট্টি ? না না পয়ঁষট্টি। নাকি ছেষট্টি সাল ? খোকন কি তখন কলেজে পড়ত ? স্মৃতিটা এখান থেকেই কেমন অস্বচ্ছ হয়ে যায় জয়মোহনের। আর কিছু পরিষ্কার মনে পড়ে না।

দরজায় ছায়া। জয়মোহন ঝিম লাগা চোখ খুলে তাকালেন। চাঁদু না ?

কন্দর্প দরজা থেকেই জিজ্ঞাসা করল, —কী হল, ওভাবে ঘাড় ঝুলিয়ে বসে আছ কেন ? কষ্ট হচ্ছে ?

ঘাড় নেড়ে নেড়ে ছবিগুলো সরালেন জয়মোহন। হাসার চেষ্টা করলেন, —বউমা খেয়েদেয়ে একবার এ ঘরে এল না তো ?

—ফেরেনি বোধহয়।

—এতক্ষণ স্কুল করছে ?

—স্কুল কেন করবে ! স্কুল থেকেই হয়তো কোথাও গেছে। যায় তো।

—ও।

কন্দর্প দাঁড়িয়েই আছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর স্কুটারের চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, —বাবা, একটা জিনিস দেখবে ?

—কী ?

কন্দর্পর মুখে লাজুক হাসি, —আমি একটা সিনেমায় পার্ট করেছি। এলেবেলে নয়, বড় পার্ট। শিগগিরই বাজারে রিলিজ করছে। ছবির ভিডিও ক্যাসেট আমার কাছে আছে, চাও তো দেখাতে পারি।

—দেখালে দেখব।

—ঠিক আছে। সন্ধেবেলা ফিরে আসি, দেখাব। তিতিরও দেখবে।

জয়মোহন একটু খুশিই হলেন। চাঁদু তাঁকে নিজের সিনেমা দেখাতে চাইছে ! যাক, ছেলেটা ফিলম করেই যদি দাঁড়ায়। লাইনটাতে পয়সা আছে। শুধু চরিত্রটাই বিগড়ে যায়, এই যা।

জয়মোহন গদগদ মুখে বললেন, —আমি ওপরে উঠে কী করে দেখব ?

—ওপরে কেন, তোমার ঘরে দেখব। সাদাকালোতে কিছু খারাপ লাগবে না।

কন্দর্প চলে গেল। হালকা শিস দিচ্ছে যেতে যেতে।

জয়মোহন টুকটুক করে বড় ঘরে এলেন। হঠাৎ নড়াচড়াতে শীতটা কেমন জেঁকে ধরছে। বাইরের দরজার কাছে রোদ্দুরের মতো কি যেন একটা খেলা করছে, চেয়ার টেনে সেই জায়গাটিতে গিয়ে বসলেন জয়মোহন। আষ্টেপৃষ্ঠে গায়ে জড়িয়ে নিলেন জয়পুরি চাদর। চাদরটায় বেশ ওম, জয়ি এনে দিয়েছিল রাজস্থান থেকে।

জয়মোহন আবার ঢুলছেন বসে বসে। ঘুম আসে না, ঢুলুনিই সার। কিবা দিন, কিবা রাত, বুড়ো মানুষের ঘুম বড় বালাই। আসে, আর এসে এসে পালায়। দিনে তাও একরকম, রাতের বেলা বড় কষ্ট ! তন্দ্রার ঘোর বার বার ছিঁড়ে যায়, চোখ বুজে অপেক্ষা করতে হয় দিনের। ঘুমানো আর জেগে থাকার মাঝে যে একটা বড়সড় এলাকা আছে, সেটা তখনই টের পান জয়মোহন। না দুধ, না জল, সে এক ছানাকাটা দশা। অথচ এককালে জয়মোহনের ঘুমের কী দাপটই না ছিল ! শোভনা বলতেন পাশে বউ খুন হয়ে গেলেও জয়মোহনের নাকি চোখ খুলবে না। বউ খুন হয়নি বটে, কিন্তু ঘুমের

মধ্যে পাঁচ-পাঁচখানা ভূমিকম্প পার করেছেন জয়মোহন। একবার তো বাড়ির লোক জেগে উঠে শঙ্খধ্বনি শুরু করেছিল, ঝ্যাং ঝ্যাঝ্যাং কাঁসরঘণ্টাও নাকি বেজেছিল পাড়ায়, তাতেও জয়মোহনের নাসিকাগর্জন কমেনি। বাঁ পাশ থেকে ডান পাশ ফিরেছিলেন শুধু। এখন নাক ডাকলেও ডাকে ফুরুর ফুরুর। আর সারা রাতই মনে হয় খাট নড়ছে, ঘর দুলছে, এই বুঝি কড়িবরগা খসে পড়ল!

কী আর করা! যে বয়সের যা। এখন দিন কাটে রাতের প্রতীক্ষায়, রাত কাটে দিনের। দিন মানেও এমন কিছু মহৎ ব্যাপার নয়, দেওয়াল ঘড়ির কয়েকটা শব্দ। গড়িয়ে গড়িয়ে শুরু হবে, তারপর থেমেই থাকবে, থেমেই থাকবে, কখন যেন ফুরিয়ে যাবে ভুস করে। রাত নামের এক ভয়ঙ্কর সময় নেমে আসবে পৃথিবীতে। দিন মানে খিদে তেষ্টার লড়াই। দয়া আর করুণা পাওয়ার জন্য খামচাখামচি। রাত হল গিয়ে শ্বাস টিকিয়ে রাখার মহাসংগ্রাম। বার বার হাঁকপাঁক করে বাথরুমে ছোটো, আর ফিরে এসে বুক খামচে বসে থাকো। এই বুঝি বেরিয়ে গেল প্রাণবায়ু! কী জীবন!

তবু এই জীবনটাকেই আঁকড়ে থাকতে বড় সাধ যায় জয়মোহনের। কী এমন বয়স হয়েছে তাঁর? মাত্র চুয়াত্তর। এই বয়সের লোকেরা অলিম্পিকে দৌড়োয়, ময়দানে হাডুডু খেলে, এমনকী বিয়েতেও বসে। ভাবা যায় পৃথিবীতে সূর্য চন্দ্র আলো বাতাস সবই থাকবে, ফুল ফুটবে, পাখি গাইবে, আর তিনি কিনা ভোকাট্টা হয়ে যাবেন!

কে যেন এল ঘরে! বড় বউমা? খোকন? জয়মোহন চোখ খুললেন। কেউ কোত্থাও নেই। দুপুরটা যে সুনসান, সেই সুনসান। শুধু দুর্লভের মেশিন চলছে ঘটাং ঘট। আলো সরে গেছে আরও খানিক দূরে।

ঢুলছেন জয়মোহন। আবার। ঘুম আসে না, ঘুম নেই চোখে। চোখের পাতা বড় শুকনো হয়ে থাকে। বুড়োমানুষের ঘুম বড় বালাই। খোকনটা ক'দিন ধরে ঘুরঘুর করছে আশপাশে। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না, অথচ মনে হয় কি যেন বলতে চায়। সামনের চেয়ারে বসে আড়মোড়া ভাঙে, ইতিউতি তাকায়। হঠাৎ হঠাৎ উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তফাতে, চমকে ফিরে আসে। কেন রে খোকন?

আবার কুয়াশা। থকথকে। কুয়াশার ভেতরে এক অতল কুয়ো, গভীর খাদে জল নেই, কে যেন শব্দ বাজাচ্ছে ঝনঝন। জোর হচ্ছে শব্দ। আরও জোর। বাড়তে বাড়তে কানে তালা লেগে গেল।

—ও দাদু শুনছেন? দাদু, ও দাদু...? টেঁসে-ফেঁসে গেছে নাকি রে বাবা?

জয়মোহনের হাড়পাঁজরা কেঁপে উঠল। পড়াং করে খুলে গেছে চোখ। একটা কালো মুশকো জোয়ান দাঁড়িয়ে জয়মোহনের দরজায়।

কে রে বাপ! যমদূত নাকি!

বুকে খানিকটা বাতাস টানলেন জয়মোহন, —অ্যাই, কী চাই?

—ঘুম বটে একখানা! কড়া নাড়তে নাড়তে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল!

যমদূত কি মূর্খ? জানে না, বুড়ো মানুষের ঘুম বড় বালাই?

জয়মোহন গলা খাঁকারি দিলেন, —হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু ভরদুপুরে চাইটা কী?

—রেজিস্ট্রি চিঠি আছে। ডটপেন খুলে গোছা কাগজ উল্টোচ্ছে যমদূত।

চিত্রগুপ্ত কি আজকাল রেজিস্ট্রি চিঠিতে ডাক পাঠায়?

জয়মোহন মাড়ি বার করে হাসলেন, —আমার নামে?

—আপনি কি ইন্দ্রনীল রায়?

ইন্দ্রনীল যেন কার নাম? বাপ্পার না? হ্যাঁ, বাপ্পাই তো। জয়মোহনের ঘোর পুরোপুরি কাটল, —সে তো এখন বাড়ি নেই।

—এ বাড়িতেই থাকে তো? নিন, সই করে নিয়ে নিন।

—নেব ?

একটু দ্বিধা করে পেনের জন্য হাত বাড়ালেন জয়মোহন। বাপ্পাটা সেবার খুব মুখ শুনিয়েছিল। এবার চিঠিটা নিয়ে লুকিয়ে ফেললে কেমন হয়!

৩৫

তিতির স্কুল থেকে সাড়ে চারটে নাগাদ বাড়ি ফেরে। ছুটির পর স্কুল গেটে খানিক জটলা হয় বন্ধুদের। সম্রাট পাঞ্চালী কুলজিৎ ঝুলন কেউ না কেউ পালা করে খাওয়ায়। আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস, চিপস, ভেলপুরি। স্কুল থেকে বাস রাস্তায় আসার পথে নতুন একটা ভিডিও গেমসের দোকান হয়েছে, দল বেঁধে সেখানেও হানা দেয় সকলে। আঙুলের টুসকিতে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা উড়ে যায় এক একদিন। ঝুলন যে ঝুলন, সেও আজকাল ঝ্যাট ঝ্যাট পঞ্চাশ টাকা একশো টাকার নোট বার করে দেয়। তিতিরের খরচা করার দৌড় দশ থেকে বারো, তিতির ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন ? তার চেয়ে মানে মানে তার কেটে পড়াই ভাল।

কেটেই পড়ে তিতির, কিন্তু বিকেলে তার তেমন কিছু করারও থাকে না। পুজোর পর থেকে একটা টিউটোরিয়ালে ভর্তি হয়েছে, সপ্তাহে দু দিন ক্লাস, ওই দু দিন তাও যা হোক বিকেলটা পার হয়ে যায়, বাকি বিকেলগুলো বাড়ি ফিরে ভোঁ হয়ে বসে থাকে তিতির। এক আধ দিন মা না থাকলে প্রেসঘরে এসে মেশিনদাদুর সঙ্গে হাবিজাবি বকে, নয়তো ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচপ। কমলা রঙ সূর্য ক্রমশ লাল হয়ে যায়, সরতে সরতে কখন টুক করে হারিয়ে যায় বহুতল বাড়িটার পিছনে, অট্টালিকার ছায়া লম্বা হতে হতে এক সময়ে গ্রাস করে নেয় গোটা ঢাকুরিয়াকে। সন্ধ্যা নামে। কালচে, বিষণ্ণ সন্ধ্যা। অঘ্রানের বাতাস হিম হয়ে আসে, শিশিরে ভিজতে থাকে ছাদ। সোঁদাটে একটা গন্ধ ছড়ায় ছাদ। শুধু তিতিরেরই জন্য। তবে সেই ঘ্রাণও বুক ভরে নিতে পারে না তিতির, হিম পড়ার সময়ে ছাদে থাকলে মা খুব রাগারাগি করে। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে দোতলায় নেমে আসে সে। ডুবে যায় বইখাতায়, নয়তো টিভিতে।

আজ রুটিনটা একটু অন্য রকম হল। স্কুল থেকে ফিরে তিতির দেখল দাদু ঝিমোচ্ছে না, তাস খেলছে না, বড় ঘরে বসে আছে টান টান।

তিতিরকে দেখেই প্রশ্ন,— তুই আজ এত দেরি করলি ?

—কই না তো। আলগোছে ঘড়ি দেখল তিতির, —চারটে পঁয়ত্রিশ। এই সময়েই তো ফিরি।

—তাই কি ! আজ যেন একটু বেশি অন্ধকার হয়ে গেছে !

—আকাশে মেঘ আছে।

—অঘ্রান মাসে মেঘ করল ! কোনও মানে হয় !

—তোমার কি অসুবিধে হল ?

—চাষের ক্ষতি হবে না ? ফুলকপি বাঁধাকপির বারোটা বেজে যাবে।

—তাতেই বা তোমার কি ? তিতির হেসে ফেলল, —তোমার তো কপি খাওয়া বারণ।

—আমার জন্য নয় রে বুড়ি, তোদের কথা ভেবেই বলা। তোবড়ানো গাল কুঁচকে হাসছেন জয়মোহন, —তুই কি এখন কোথাও বেরোবি নাকি ?

—না। কেন বল তো ?

—চাঁদু সিনেমার ক্যাসেট আনবে। আমার ঘরে বসে দেখা হবে।

—সে তো সন্ধের পর !

—শীতের সন্ধে দেখতে দেখতে এসে যাবে। তুই যেন কোথাও বেরোস না।

—না রে বাবা না। আমি আছি।

হেলেদুলে প্রসন্ন মনে বড়ঘর পেরোল তিতির। ফিলমটার সুবাদে বেশ কয়েকবার ছোটকার নাম

বেরিয়েছে কাগজে, স্টিল ছবিও ছাপা হয়েছে। যে কাগজেই বেরোক, কাটিংগুলো যত্ন করে জমিয়ে রাখে ছোটকা, দেখায় সকলকে। এই ফিলমটার ওপর ছোটকার বড় আশা, ছোটকার হাবেভাবে স্পষ্ট বোঝা যায়। নাহ, মন দিয়ে দেখতে হবে ফিলমটাকে। দাদুর ঘরে ক্যাসেট দেখানোর প্ল্যানটা ভালই। অনেকদিন পর দাদুর মুখে নির্মল হাসি দেখা গেল, এ কি কম কথা !

ব্যাগ খুলে রান্নাঘরে টিফিনবক্স নামাতে নামাতে তিতির বলল, —কী খাবার করেছ গো মাসি ?

সন্ধ্যার মা আটা ঠেসছে। বলল, —পরোটা ভেজে দেব দুটো ?

—দাও। আলুভাজা দিও সঙ্গে। নরম নরম।

—চা খাবে ?

—খেতে পারি।

—ওপরে গিয়ে জামা বদলাও, আমি নিয়ে আসছি।

এক সেকেন্ড ভাবল তিতির, —নাহ, আমি নীচে এসে খাব।

দোতলায় এসে আবার চমক। বাবা আছে ঘরে। মশারি টাঙিয়ে ঘুমোচ্ছে। জ্বর হল নাকি ! কাল রাত্তিরে খুব কাশছিল বাবা।

মশারি তুলে তিতির আলগা হাত ছোঁওয়াল বাবার কপালে। উহুঁ, গা তো গরম নেই। ক'দিন ধরেই বাবা খুব একটা বেরোচ্ছে না, তা বলে এমন প্রমত্ত ঘুম ! এই শীতের বিকেলে ! আবার কি আলসেমির ভূত চেপে বসছে বাবার মাথায় ! নাকি বাবাও আজ ছোটকার সিনেমার ক্যান্ডিডেট ! দিবানিদ্রা দিয়ে তরতাজা করে নিচ্ছে নিজেকে !

ইউনিফর্ম ছেড়ে সালোয়ার-কামিজে নিজেকে বদলে নিল তিতির। শীতকালে বড় ধুলো জমে মুখে, বাথরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল দিল, মুছল ঘষে ঘষে। ঘরে ফিরে ক্রিম মাখল, গার্ডার খুলে ছড়িয়ে দিল চুল, হালকা চিরুনি চালাল।

অ্যাটম সাঁই করে ঘরে ঢুকেছে, —অ্যাই দিদিভাই, ব্যাডমিন্টন খেলবি ?

ওপরে ওঠার সময়েই কাকিমার ঘরের দরজা খোলা দেখেছে তিতির। পুজোর পর থেকে অ্যাটমের সাঁতার বন্ধ, কাকিমা এই সময়টা বাড়িতেই থাকছে এখন।

তিতির গায়ে একটা গুজরাটি কাজ করা সুতির চাদর জড়িয়ে নিল, —আমি এখন খাব। আমার পেট চুঁই চুঁই করছে।

—খেয়ে নিয়ে খেলবি ?

—না। তিতির ভুরু কুঁচকোল, —তুই একটু পরে আঁকার ক্লাসে বেরোবি না ?

অ্যাটম নির্ভয়ে বলল, —আজ আঁকার ক্লাস ডুব।

—কেন রে ?

—মা'র ঘাড়ে ফিক লেগেছে।

—সে কি ! কখন ! কী করে ?

—এই তো একটু আগে। স্কুল থেকে এসেই ফেদার ডাস্টার দিয়ে আমাকে মারছিল, তখন।

—কী করেছিলি তুই ?

—ইংলিশ ক্লাসটেস্টে আজ টোয়েন্টিফাইভে এইট্টিন পেয়েছি....

তিতিরের হাসি পেল। একটু দুঃখও হল যেন। বেচারা অ্যাটম। তিতিরের মা তিতিরকে কোনও দিন আহ্লাদ দেয়নি বটে, আবার তেমনই গায়েও হাত তোলেনি কখনও। তিতিরেরও না বাপ্পারও না। একবার শুধু চোখ পাকিয়ে তাকাত, তাতেই রক্ত জল। ক্লাস টেস্টে পঁচিশে আঠেরো পাওয়ার জন্যও মা কোনওদিন উদ্বিগ্ন হয়নি। তিতির বাপ্পা কি খুব খারাপ রেজাল্ট করেছে পরীক্ষায় ? মার খেলে অ্যাটম কি তার থেকেও ভাল রেজাল্ট করবে ?

ভাবনাটা গোপন করে চোখ ঘোরাল তিতির, —কাকিমারই লেগে গেল ? তোর কিছু হল না ?

তিতিরের কামিজ টেনে ঘাড় ওঠাল অ্যাটম। ফিসফিস করে বলল, —মা'রও তেমন লাগেনি।

সকালে ছোটকা ঘরে এসেছিল। মা'র সঙ্গে ছোটকার কথা হয়েছে। সন্ধেবেলা ছোটকা বাড়িতে সিনেমা দেখাবে। মা দেখবে। সেইজন্যই তো মা আঁকার ক্লাসে যাবে না।

তিতির শিহরিত। বিশ্বপাকা হয়ে উঠছে অ্যাটম। একে যে কাকিমা পরে কী করে সামলাবে!

হাওয়াই চটি পায়ে ফট ফট নামছে তিতির, অ্যাটম চেঁচিয়ে উঠল, —কি রে দিদিভাই, খেলবি না?

—খেয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখব।

খাবারের প্লেট নিয়ে বড়ঘরে বসেছে তিতির। জয়মোহন ইজিচেয়ারে বসে আপন মনে ঘাড় দোলাচ্ছেন। চোখ বুজে। একটা যেন গুনগুন শব্দও শোনা যাচ্ছে দাদুর গলায়।

তিতির কান পেতেছে। বিস্মিত স্বরে বলল, —তুমি গান গাইছ নাকি, দাদু?

—আমি? কই না তো। জয়মোহন চোখ খুলে সোজা হওয়ার চেষ্টা করলেন। লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তিতিরের প্লেটের দিকে।

তিতির বলল, —আমি যে স্পষ্ট শুনলাম তুমি গান করছ! ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে....।

—ভুল শুনেছিস। জয়মোহন চোখ ঘুরিয়ে নিলেন বাইরের দরজায়। যেন মাপছেন কখন কমবে আলো। মলিন বিকেল চলে যেতে গিয়েও থমকে আছে রাস্তায়।

তিতির ফিক করে হাসল, —তোমার আজ খুব আনন্দ, তাই না?

—কেন?

—বা রে, আজ তোমার ছোট ছেলের অ্যাক্টিং দেখবে....

—ছেলেটা বড় গুণের ছিল রে বুড়ি। জয়মোহন আবার চোখ বুজে হেলান দিয়েছেন, —লেখাপড়ায় মাথাটা সাফ ছিল... কী ভাল রেসিটেশান করত ছোটবেলায়! বলো বীর বলো উন্নত মম শির....। কত কবিতা মুখস্থ ছিল চাঁদুর। ওর গলায় দেবতার গ্রাস শুনেছিস?

—শুনিনি! এত বলি ব্রাহ্মণ ঝাঁপ দিল জলে বলেই খাট থেকে জোর একটা লাফ মারত ছোটকা। মা ছোটকাকে পাখার বাঁট নিয়ে তাড়া করত।

জয়মোহন যেন শুনতেই পেলেন না। নিজের মনে বিড়বিড় করে চলেছেন, —ছেলেটার দিকে সেভাবে নজরই দেওয়া হল না কোনওদিন। সবার শেষে এল, আড়ালে আবডালে মানুষ হয়ে গেল। নাটক করে বেড়াত বলে কত গালাগাল দিয়েছি এককালে, রা কাড়েনি মুখে। অথচ দ্যাখ, চুপচাপ লেগে থেকে থেকে ঠিক একটা জায়গায় পৌঁছে তো গেছে। যায়নি, তুই বল?

দাদুর স্বরে যতটা প্রশ্ন তার চেয়েও বেশি সংশয়! যতটা সংশয় তার চেয়েও বেশি যেন মায়া! কণ্ঠে মায়া এলে বুড়োমানুষের মুখও যে কত সুন্দর হয়ে ওঠে!

তিতির গলায় উচ্ছ্বাস আনল, —পৌঁছল মানে! ছোটকার হাতে এখন কত কনট্র্যাক্ট জানো? তিনটে ফিলম, বাংলা সিরিয়াল, হিন্দি সিরিয়াল....। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে লোক ঘুরে ঘুরে ছোটকাকে দেখে।

জয়মোহন মাথা দোলালেন, —হুঁ। শুধু আমার ওই অকালকুষ্মাণ্ডটাই....

সন্ধ্যার মা চা রেখে গেছে। কাপ ঠোঁটে ছোঁয়াতে গিয়েও চলকে গেল। মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল দোতলার ঘর। মশারি খাটিয়ে ভোঁস ভোঁস ঘুমোচ্ছে মানুষটা। নির্ভাবনায়। দাদুর কথা কি একবারও মনে আসে না বাবার! দাদুও যেন কী! বড়কা ছোটকা যাকে নিয়েই কথা হোক ঘুরেফিরে ঠিক বাবার প্রসঙ্গে চলে যাবে! ভাল লাগে না তিতিরের।

জয়মোহন ঝুপ করে প্রশ্ন করলেন, —সেই ব্রহ্মদত্যিটাকে ক'দিন দেখছি না কেন রে?

তিতির গোঁজ মুখে বলল, —আমি কী করে বলব? আসে, কি আসে না, তাই কি ছাই আমি জানি?

—নিঘঘাত তোর বাবার টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে।

—হুঁহ, বাবার হাতে যেন কত টাকা!

—বাবার টাকা না হলে, তোর মা'র টাকা। নিজে তো আর রোজগার করে না, তাই গায়ে লাগে না। তোর মা'র উচিত ঘেঁটি ধরে ব্যাটাকে প্রেসঘরে বসিয়ে দেওয়া। দুর্লভের সঙ্গে হাতে হাতে মেশিন চালাক।

রাগতে গিয়েও তিতিরের হাসি পেল। বাবা মেশিন চালালে আর দেখতে হবে না, পাকাপাকি তালা ঝুলে যাবে প্রেসে। হাসতে হাসতেই বলল, —মাকে পরামর্শটা দিয়ে দেখো।

—আমার দায় পড়েছে। যাদের সংসার, তারা বুঝবে। কাঠ খাবে, আংরা হাগবে। জয়মোহনের গলা ডুবে গেল হঠাৎ, —কোনও কর্মই বৃথা যায় না রে, ঠিক একদিন কর্মফল পেতে হয়।

তিতির পরিষ্কার বুঝল না কথাটা। বলল, —তুমি কী বলতে চাও বলো তো ?

—যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তারা কোনও দিন... জয়মোহন থেমে গেলেন, —থাক।

ঘরের হাওয়া পলকে যেন ভারী হয়ে গেল। প্রেসের শব্দ চলছে একটানা। গৃহমুখী পথচারীদের কোলাহল গুঞ্জনের মতো শোনায় এখন। আঁধার নামছিল।

বাইরে কে যেন মিহি সুরে ডাকছে তিতিরকে, —তিতির... অ্যাই তিতির... !

তিতির ছুটে দরজায় গেল। হিয়া।

—আরে, তুই হঠাৎ !

—এলাম। হিয়ার হাসি কেমন কেঁপে গেল, —কী করছিলি ?

—কিছু না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? ভেতরে আয়।

হিয়া ঢুকল না। বাঁ হাতে নখ খুঁটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, —একটু বাইরে যাবি আমার সঙ্গে ?

—কোথায় ?

—চল না একটু হেঁটে আসি। কথা ছিল।

তিতিরের অবাক লাগছিল। হিয়া আজকাল তিতিরের বাড়ির রাস্তা প্রায় মাড়ায়ই না। স্কুলে যখনই দেখা হয়, বেশির ভাগ সময়ে টোটো থাকে হিয়ার সঙ্গে। হাই হ্যালোর বেশি কথা হয় না। যদি কখনও বা একা থাকে, তখন হিয়া আরও অসহ্য। সর্বক্ষণ টোটো আর টোটো। রাজর্ষি এই বলল, রাজর্ষি ওই করল, রাজর্ষির খুব উইট, রাজর্ষির কী রাগ... ! ওই অভদ্র অহঙ্কারী ছেলেটার কথা কেন অত শুনবে তিতির ! তবু হিয়ার মুখে বার বার টোটোর নাম শুনলে কী যেন একটা হতে থাকে বুকের মাঝে ! অসহ্য এক চিনচিনে কষ্ট। কেন যে অমন হয় !

আজও কি হিয়া টোটোর গল্প শোনাতে এল ! কিন্তু মুখ এমন কালি হয়ে আছে কেন হিয়ার !

তিতির বলল, —দাঁড়া এক সেকেন্ড, চটিটা গলিয়ে আসি।

জয়মোহন পিটপিট করে দেখছিলেন দুই বান্ধবীকে। হাঁ হাঁ করে উঠলেন, —তুই এখন বেরোবি নাকি ?

—যাই। ডাকছে।

—চাঁদু কিন্তু এসে পড়বে।

—চলে আসব তাড়াতাড়ি।

কথাটা বলেই সামান্য দুর্ভাবনায় পড়ল তিতির। বিকেলে রাস্তায় বেরোনো মানেই সেই ছেলেটা ! তিতির এখন বেরোলেই ঠিক কোত্থেকে এসে হাজির হবে সামনে। মোটর সাইকেল নিয়ে। কথা বলবে না তিতির, তবু জোর করে একতরফা নিজের কথা শুনিয়ে যাবে। কত বড়লোকের বাড়ির একমাত্র ছেলে সে, নিজেদের দুখানা গাড়িও আছে, নিউ মার্কেট এলাকায় তার বাবার কত বড় রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যবসা ইত্যাদি ইত্যাদি। পাস কোর্সে বি কমটা উতরোলেই বাবার দোকান সুকান্তরই হয়ে যাবে, তখন আর তাকে পায় কে ! তিতিরের যদি মোটরসাইকেলে উঠতে লজ্জা থাকে তবে তার জন্য গাড়িও আনতে পারে সুকান্ত... ! তিতিরের পিত্তি জ্বলে যায় শুনে। একদিন ভুল করে মোটর সাইকেলে উঠে বসেছিল বলে তাকে এতই সস্তা মেয়ে ভাবে সুকান্ত ! গাড়ি বাড়ির লোভ দেখায় ! ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে করে ছেলেটাকে। একদিন যদি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করা

যেত। তাই বা কী করে হয়! তিতিরই তো যেচে ছেলেটার সঙ্গে... ছিহ।

আরও একটা ভয়। পাড়ার অনেকেই তিতিরের পাশে দেখেছে সুকান্তকে, যদি কোনওগতিকে মা'র কানে কথাটা উঠে যায়...!

ছেলেটা আজকেও যদি কোথাও ওত পেতে থাকে! যদি হিয়ার সামনেই ধরে তিতিরকে! না, টোটো যে শিভালরি দেখাতে এসেছিল, সেই সূত্রেই সুকান্তর সঙ্গে তিতিরের দৈবাৎ আলাপ, এ সব ঘটনা হিয়াকে কেন বলতে যাবে তিতির? কাউকেই জানাবে না কোনও দিন।

তিতির হিয়ার হাত ধরে বলল, —এক কাজ করলে হয়। ওপরে চল, ওখানে বসেই কথা বলা যাক।

হিয়া কাতর মুখে ফিসফিস করল, —তোর সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই রে তিতির।

—ছাদে চল না। ছাদ নিরিবিলি।

হিয়া তবু ইতস্তত করছিল, তিতির তাকে প্রায় টেনেই নিয়ে গেল ছাদে। সিমেন্টের ধাপিতে হিয়াকে বসিয়ে বলল, —বল কি বলবি।

হিয়া চুপ করে আছে। বোধহয় কীভাবে শুরু করবে ভাবছে। মেঘ মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, ঢোঁক গিলল।

হঠাৎ সিঁড়ি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে অ্যাটম। ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার দৃষ্টিপাত করল তিতিরের দিকে। ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটে কর্ক রেখে টুঙ টুঙ নাচাচ্ছে।

তিতির বলল, —অ্যাই, তুই এখন যা তো এখান থেকে।

অ্যাটম নির্বিকার, —আমি তো একা একা খেলছি।

—আর খেলতে হবে না, সন্ধে হয়ে গেছে।

—আমি কর্ক দেখতে পাচ্ছি।

ঝট করে গিয়ে কর্কটা কেড়ে নিল তিতির, —এবার দেখি তো তুই কী করে খেলিস!

অ্যাটম কর্ক চাইল না, তিতিরদের থেকে হাতখানেক তফাতে বসল ধাপিতে। উল্টোদিকে মুখ। পা দোলাচ্ছে।

তিতির কড়া গলায় বলল, —অ্যাটম নীচে যাও বলছি।

অ্যাটম উদাস। বধির।

—কি রে, কানে কথা যাচ্ছে না?

—আমি এখন এখানেই বসে থাকব।

—মারব এক ঝাপড়। যা বলছি।

—এঁএঁহ, ছাদ কি তোর একার? ছাদে আমাদেরও ভাগ আছে।

মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তিতিরের। কী বলে অ্যাটম! নিশ্চয়ই কাকিমার মুখে শুনেছে। কী শিক্ষাই না হচ্ছে!

শীতল স্বরে তিতির বলল, —তুই ধাপি থেকে উঠে যা বলছি অ্যাটম, আমরা এখানে বসে কথা বলব।

এবার যেন কাজ হল। উঠে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে অ্যাটম। দরজার কাছে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল এদিক ওদিক। এক পা-এক পা করে তিতিরের কাছে এসে খপ করে কেড়ে নিল কর্কটা। চলে গেল অনেকটা দূরে, কার্নিশের ধারে। প্রকৃতির শোভা দেখছে।

তিতির দাঁত কিড়মিড় করল। হিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল, —বল তুই। ও বাচ্চা আছে, কিছু বুঝবে না।

হিয়া নতমুখে বসে আছে। হঠাৎ চাপা গলায় বলল, —আমি মরে যাব রে তিতির।

হিয়ার স্বরে এমন কিছু ছিল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তিতিরের। শঙ্কিতভাবে বলল, —কেন? কী হয়েছে?

—আমি যে কীভাবে তোকে কথাটা বলি !

—কী হয়েছে আগে বলবি তো ?

—আমার বাবা আবার বিয়ে করেছে।

—কেন ? কবে ?

—অনেকদিন ধরেই ঘটনাটা ঘটবে ঘটবে করছিল। তুই যখন পুজোর পর আমাদের বাড়ি গিয়েছিলি, তোকে একটা কথা বলব বলেছিলাম, মনে আছে ?

—এই কথা ?

—হুঁ। পুজোর সময় থেকেই ব্যাপারটা প্যাঁচাচ্ছিল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাবার যে অ্যাফেয়ার চলছে, আগেই জানতাম। অষ্টমীর দিন বাবা হঠাৎ মহিলাকে বাড়িতে এনে হাজির করল। বাবারই কোলিগ। ঠাম্মা সেদিন বাড়ি ছিল না, বেলুড় মঠ থেকে আমার এক পিসতুতো দাদুর বাড়ি গিয়েছিল। সেই চান্সে মহিলা সারাদিন আমাদের বাড়িতে... ! দুজনে মিলে আমাকে কী কনভিন্স করার চেষ্টা ! সেদিন সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি রে তিতির। মা নেই, ভেবেছিলাম অ্যাট লিস্ট বাবা তো আছে... ! ঠাম্মা ফিরে এসে খুব রাগারাগি করেছিল বাবার ওপর। বলেছিল বুড়োবয়সে আর লোক হাসাস না। বাবা তখনকার মতো চুপ করল, কিন্তু শুনল না কথা। গত শুক্রবার সেই মহিলাকেই রেজিস্ট্রি করে বাড়িতে এনে তুলেছে। শি ইজ নাথিং বাট আ বিচ। আমার ঘেন্না করছে, ঘেন্না করছে।

হিয়ার চোখ লাল হয়ে গেছে, এত লাল যে এক্ষুনি রক্ত ঝরবে চোখ দিয়ে। তিতির হিয়ার কাঁধে হাত রাখল। কী সান্ত্বনা দেবে হিয়াকে ! তার বাবা-মা'রও এক রত্তি বনিবনা নেই, তা বলে মা'র পাশে অন্য একটা পুরুষ, বা বাবার পাশে অন্য কোনও নারী কি কল্পনা করতে পারে তিতির।

হিয়া ফোঁস ফোঁস করছে, —জানিস, এই মহিলা ইজ আ ম্যারেড উওম্যান ? হাজব্যান্ডকে ডিভোর্স করার বহু আগে থেকে বাবার সঙ্গে তার ডার্টি রিলেশন তৈরি হয়েছিল ? হাজব্যান্ডটাও একটা বোকার ডিম। ভোঁদাই। দিব্যি শিখণ্ডী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর বউ সুযোগ মতন কিক আউট করে দিল তাকে। এই হ্যালহেলে লোকগুলোকে যে আমার কি করতে ইচ্ছে করে... ! আমি বর হলে ওরকম নোংরা বউকে সহজে ছাড়ান দিতাম না, ভুগিয়ে মারতাম।

তিতির প্রশ্ন করল, —তুই এত কথা জানলি কোত্থেকে ?

—পানজেন্ট স্মেল কখনও চাপা থাকে না। এই নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঠাম্মার সঙ্গে কম দিন ধরে অশান্তি চলছে ? কিছু বলতে গেলে মা'র এগজাম্পল দেখায়। আমার মা... আমার মা...। কান্নায় গলা বুজে এল হিয়ার। নাক টানছে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, —মা'র বিয়ে, ডিভোর্স কিছুই আমি সাপোর্ট করি না। তোমাদের মধ্যে এতই যদি ইগো ক্ল্যাশ, ছেলেমেয়ে দুটোকে পৃথিবীতে আনার কী দরকার ছিল ? তোমরা সুখ করতে চাও করো, তার জন্য আমরা জন্মে সাফার করব কেন ? বল আমি কি ভুল বলছি ? বল ?

তিতির করুণ মুখে দু দিকে মাথা নাড়ল।

—তবু মা'র একটা ডিফেন্স ছিল। যে বয়সে মা'র ডিভোর্স হয়েছে, সে বয়সে মা'র পক্ষে একা থাকার অনেক প্রবলেম। আমার মামার বাড়ির কেউ মাকে জায়গা দেয়নি, মা কী করবে ? মা আমাকে সব বলেছে। রনিকে নিয়ে একা একাও থাকতে চেয়েছিল মা, কোত্থাও বাড়ি ভাড়া পায়নি। সেই সময়ে তরুণ আঙ্কল মাকে একটা শেল্টার তো দিয়েছিল। বাট দিস বিচ, অ্যাট দি এজ অফ ফরটি... কোন সাহসে আমার বাবাকে বিয়ে করল ? আমার মা কখনও বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতে অন্য লোকের সঙ্গে অ্যাফেয়ার চালায়নি। বাবা তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর...

—কী বলি তোকে বল তো ! তিতির ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল অ্যাটমকে। ভীষণ অন্যমনস্ক মুখে অ্যাটম ফিরে ফিরে দেখছে হিয়াকে। বন্ধুর কাঁধে চাপ দিয়ে গলা নামাল তিতির, —মন খারাপ করিস না। যা হয়েছে তাতে তো তোর কিছু করার নেই।

হিয়া ফুঁপিয়ে উঠল, —আমি ঠিক মরে যাব। কিছুতেই বাঁচব না।

তিতির বলে ফেলল, —তোর বাবা মা'র কৃতকর্মের জন্য তুই কেন মরতে যাবি রে বোকা? তোর লাইফটা তোর লাইফ। তোকে মেনে নিতে বলছি না, সহ্য করে নে।

—পারব না রে। মহিলা আবার নিজের ছেলেটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রনিরই মতন হবে, কি একটু ছোট। খালি বলছে, তোমার ভাই, তোমার ভাই। তুই বল, এই বুড়ো বয়সে একটা আশমান থেকে টপকানো ভাই আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে? রনির জায়গায়? কোনওদিন একা বাড়িতে পেলে আমি ওই ছেলেটাকে খুনই করে ফেলব।

শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হিয়ার ফাঁপানো চুল উড়ছে হাওয়ায়। তরল আঁধারে প্রেতিনীর মতো লাগছে হিয়াকে। শেষ চমকটা সইয়ে নিতে দু-এক সেকেন্ড সময় নিল তিতির। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, —পাগলামি করিস না। ঠাকুমা কী বলছেন?

—ঠাম্মা তো ও বাড়িতে থাকতেই চাইছে না। আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে বলছে। আবার নাকি সেলাই শুরু করবে। এ কি হয় নাকি? আমাকে মরতেই হবে, আর কোনও রাস্তা নেই।

—আহ হিয়া, ফের ওই কথা! ধমক দিতে গিয়ে নিজেরই স্বর ভিজে গেল তিতিরের, —নিজেকে এত একা ভাবছিস কেন? আমরা তোর সঙ্গে আছি।

—কেউ নেই রে। যার এমন হয়, শুধু সেই বোঝে।

—কষ্ট করে এক-দেড়টা বছর কাটিয়ে দে। তুই তো ডাক্তারি পড়বি, তখন হোস্টেলে থাকিস। দেখতে দেখতে ডাক্তার হয়ে যাবি, তখন ঠাকুমাকে নিয়ে তুই....

—দেখা যাক কি হয়। রাজর্ষি কী বলছিল জানিস?

রাজর্ষির নামেই বুক ছ্যাঁত করে উঠেছে তিতিরের। ম্লান গলায় বলল, —ওকেও তুই বলেছিস নাকি?

—হ্যাঁ, একমাত্র রাজর্ষিই জানে। আর তুই জানলি।

—কী বলল সে?

—বলছিল বাবার কাছ থেকে সেন্ট পারসেন্ট স্ন্যাচ করে নিবি। তোকে মানুষ করে দেওয়াটা তার কর্তব্য। ডিউটি। তোর বাবাকে কেউ দখল করে নেবে, আর তুই সেটা মেনে নিবি...নো, তুইও তোর বাবাকে দখল করে বসে থাক, এক সেন্টিমিটার ছাড়বি না। বাবাটাই বুঝুক টাগ অব ওয়ারে কোন দিকে যাবে।

তিতিরের গলা অবধি তেতো হয়ে গেল। যেমন ঝগড়ুটে ছেলে, তেমনই হিংসুটে পরামর্শ। আর এই ছেলেই এখন হিয়ার ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড! তিতিরের কাছে আসার দরকার কী ছিল হিয়ার? শুধু কাঁদতে?

তিতির মনে মনে বলল, উপদেশ তো পেয়েই গেছিস। তাই কর তবে।

নীচ থেকে ডাক পড়ছে অ্যাটমের। রুনার গলা। ছাদের কোণ থেকে জমাট অন্ধকার হয়ে থাকা অ্যাটম ছুটল তীরবেগে। সিঁড়ির দরজায় পৌঁছে থামল একটু। ঘুরেই চেঁচাল, —বাবা মা'রা ভাল হয় না। আমি জানি।

৩৬

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় ঘরে হট্টমেলা বসে গেছে। জয়মোহন আদিত্য রুনা বাপ্পা তিতির অ্যাটম কন্দর্প কে নেই! দুর্লভও রয়েছে। কথা বলছে জয়মোহনের সঙ্গে। বড় সোফার পিছনে মিনতিও দাঁড়িয়ে। চালচিত্রের মতো। আদিত্য আর কন্দর্প গল্পে মত্ত। রুনার সঙ্গে কথা

বলতে বলতে বাপ্পা তবলা বাজাচ্ছে অ্যাটমের মাথায়। তিতির ছোট সোফায়। আহা, এমন মিলনমেলা এই গৃহে বিরল।

দুর্লভ কথা থামিয়ে বলে উঠল, —ওই তো বউদি এসে গেছে। এবার শুরু করলেই হয়।

আদিত্য ইন্দ্রাণীকে দেখে দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল, —আজই এত দেরি করলে ! সবাই কখন থেকে তোমার জন্য বসে আছে।

ইন্দ্রাণীর কপালে ভাঁজ ছিল। চিন্তার। স্কুলের ঝঞ্ঝাটটা মিটেও মিটছে না। শিক্ষিকাদের মিলিত চাপে কর্তৃপক্ষ শো কজ নোটিস তুলে নিয়েছে, কিন্তু সার্ভিস বুক এখনও ঠিক করেনি। সেই ক মাসের গণ্ডগোল রয়েই গেল। ছুটির পর আজ কমলিকার বাড়ি গিয়েছিল ইন্দ্রাণী, সেখান থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে দুজনে মিলে শিক্ষক সমিতির অফিসে। তারা বলেছে, হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে এসে কথা বলবে, প্রয়োজন হলে ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গেও। তারপরেও কত দূর কি হবে তাই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, ইন্দ্রাণীর চাকরিতে জয়েন করার চিঠিটাই হারিয়ে ফেলেছে স্কুল, ইন্দ্রাণীর কাছেও কপিটা নেই। শেষে কি ডি আই অফিসে ছুটতে হবে ?

ভাঁজটুকু কপাল থেকে মুছে নিল ইন্দ্রাণী। এমন এক সুন্দর পারিবারিক দৃশ্যে উদ্বিগ্ন মুখ মানায় না। স্মিত মুখে বলল, —সবে তো সাতটা বেজেছে। আমি চট করে ওপর থেকে ঘুরে আসছি।

জয়মোহন বললেন, —না না না। আবার ওপরে গিয়ে কী হবে ? চাঁদু বলছে আড়াই ঘণ্টার ছবি, এর পর শুরু হলে আমি খাব কখন ?

—কিচ্ছু দেরি হবে না। চাঁদু ততক্ষণ আপনার ঘরে ভিসিপি-টিসিপি লাগাক, আমি যাচ্ছি আর আসছি।

জয়মোহন শিশুর মতো হাসলেন, —অ। চাঁদু তা হলে সকলকেই নেমন্তন্ন করে রেখেছিল ! আমিই লাস্ট।

রুনা বলল,—লাস্ট কেন হবেন ? আপনিই প্রধান। চাঁদু তো সকালেই ঠিক করে রেখেছে আপনার ঘরে দেখানো হবে।

কন্দর্প নার্ভাস মুখে হাসল, —ভেবেছিলাম বাবা যদি রাজি না হয় তাহলে...

অ্যাটম বলল, —দাদু কেন রাজি হবে না ? দাদুই তো আমাদের সবার পতি।

বাপ্পা একটা উড়নচাঁটি মারল অ্যাটমের চাঁদিতে, —সবার পতি কি রে। সভাপতি।

—জানি জানি, যার মানে হল গিয়ে প্রেসিডেন্ট। ও জেম্মা, তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো না।

দ্রুত কাপড় বদলে, বাথরুম ঘুরে, ইন্দ্রাণী নীচে নেমে দেখল গোটা জটলাটা সরে গেছে শ্বশুরমশাইয়ের ঘরে। ইজিচেয়ার আলো করে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন জয়মোহন, খাটের গ্যালারি দর্শকে পরিপূর্ণ, দুর্লভ একটা মোড়া টেনে বসেছে, মিনতি মাটিতে টিভির সামনে। দেওয়ালের ছবি থেকে হাসছেন শোভনাও।

ইন্দ্রাণী খুশি খুশি মুখে বলল, —দীপুও এসে গেলে ভাল হত না !

রুনা গলা ভার করল, —ওর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কত বার বলে দিলাম সন্ধে সন্ধে ফিরো আজ.... ! চাঁদু, তুমি স্টার্ট করে দাও।

ইন্দ্রাণী খাটে বসেছে।

সিনেমা শুরু হল। জয় পরাজয়।

টাইটেলে নায়ক নায়িকার পরেই কন্দর্পর নাম। বড় বড় হরফে। ঘরে মৃদু হর্ষধ্বনি। কন্দর্পর পিঠে আলগা কিল মারল রুনা। জয়মোহনও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ছেলেকে। গর্বিত চোখে।

আরম্ভটা পুরোপুরি ঋতুশ্রীর কবজায়। ডানপিটে মেয়ে ঋতুশ্রী লাফাচ্ছে, গান গাইছে, নাচছে, টাং টাং গাছে উঠে পড়ছে। কখনও সে জিনস শোভিত, কখনও সালোয়ার-কামিজ, কখনও মিনি স্কার্ট। টাইট সাদা টিশার্ট আর শর্টস পরে টেনিসও খেলল ঋতুশ্রী। অপোনেন্ট বাবা।

জয়মোহন বিরক্ত মুখে বললেন, —মেয়েটাকে বাপ মা একটা শাড়িও কিনে দিতে পারে না ?

রুনা বলল, —একেই বলে ফিগার। যা পরছে, তাই মানিয়ে যাচ্ছে।

আদিত্য বলল, —মুখটিও ভারি টলটলে। আমাদের তিতিরের ভাব আসে।

বাপ্পা নাক কুঁচকোল, —তোমাদের চোখে কী হয়েছে বলো তো ? এই ঢ্যাপসা মুটকিটাকে তোমরা সুন্দর বলছ ?

ইন্দ্রাণী বলল, —সবই তো হল, কিন্তু চাঁদু কোথায় ?

বলতে বলতেই রোমহর্ষক দৃশ্য। ঋতুশ্রী জলে পড়ে গেছে, সাঁতার জানে না, হাবুডুবু খাচ্ছে। পথ দিয়ে নায়কের পিছনে মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল কন্দর্প, চলন্ত দ্বিচক্রযান থেকে এক লাফে সে নেমে পড়েছে, উল্কার গতিতে ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। চুল ধরে নায়িকাকে টেনে আনল পাড়ে, কোলপাঁজা করে এনে ডাঙায় শোওয়াল। সিক্ত নায়িকার মুখে ফুঁ দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে, জল বার করছে পেট টিপে টিপে।

গোটা ঘর পিন পড়লে শোনা যায় এমন নিস্তব্ধ।

আদিত্য উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, —উপুড় কর চাঁদু, উপুড় কর। চিত করে জল বার করে না।

কন্দর্প মিচকি হাসল, —এখন আর উপায় নেই দাদা। শুটিং, এডিটিং সব কমপ্লিট। সেনসারও হয়ে গেছে।

—তোদের ডিরেক্টরটা কী রে, কিচ্ছু জানে না !

—ডিরেক্টরের দোষ নয়, ঋতুশ্রীর দোষ। কিছুতেই উপুড় হতে রাজি হল না। ওর নাকি পিঠে কোমরে হাত ছোঁওয়ালে কাতুকুতু লাগে। এদের জানো না দাদা, কাতুকুতু ব্যাপারে নায়িকাগুলো ভীষণ সেনসেটিভ।

জয়মোহন গোমড়া মুখে বললেন, —হুঁহ।

এমত সময়ে সুদীপ ঢুকেছে। হন্তদন্ত মুখে বলল, —শুরু হয়ে গেছে নাকি ?

রুনা বলে উঠল, —এমন কিছু মিস হয়নি। চাঁদু, তোমার সিনটা আরেক বার মেজদাকে দেখিয়ে দাও।

অ্যাটম লাফ দিয়ে সুদীপের কাছে চলে গেল, —ছোটকা যা একটা সুপারম্যানের মতো ডাইভ দিল না !

মিনতি মুগ্ধভাবে বলল, —ছোড়দা কী সুন্দর মেয়েটাকে দু হাতে তুলল। মেয়েটা ছোড়দার বউ হলে বেশ হয়।

আদিত্য হা হা হাসল, —এই মেয়েকে তোর পছন্দ হয় চাঁদু ? নাকি অন্য মেয়ে পছন্দ করা আছে ?

ইন্দ্রাণী কটমট করে তাকাল আদিত্যর দিকে। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করলে আদিত্যর আর সীমাজ্ঞান থাকে না। আলগা ধমকের সুরে বলল, —কথা না বলে চুপচাপ দেখো তো।

সুদীপও ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিয়েছে গ্যালারিতে। কন্দর্প পর্দায় এলেই সবাই চুপ, বাকি সময়ে কথা চলছে টুকটাক। ঠাট্টা তামাশা হচ্ছে। রুনার চটুল রসিকতায় পায়রা ওড়ানো হাসির লহর উঠল। বাপ্পার মন যত না সিনেমায়, তার চেয়ে বেশি ফুট কাটাতে। বাংলা ছায়াছবির গ্রাম্যতা নিয়ে মাঝে মাঝে ঝাঁঝালো মন্তব্য করছে বাপ্পা, কন্দর্প হাসিমুখে শুনছে। সুদীপ মিনতিকে চা করে আনতে বলল। মিনতি উসখুস করছে, উঠছে না। জয়মোহনের ঢুলুনি আসছে বার বার, কেঁপে কেঁপে তাকাচ্ছেন, প্রাণপণে সজাগ রাখতে চাইছেন স্নায়ু।

এই সমস্ত দৃশ্য দেখে, সকলকে দেখে, বুকটা ভরে যাচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। এ বাড়িতে আগে কখনও এমন সুন্দর জমায়েত হয়েছে কি ? ইন্দ্রাণীর তো মনে পড়ে না। শাশুড়ি বেঁচে থাকতেই তো ছোট ছোট অদৃশ্য পাঁচিলে ভরে যাচ্ছিল সংসার। ভায়ে ভায়ে পাঁচিল। বাপ ছেলেদের মধ্যে পাঁচিল।

দেওর বউদির পাঁচিল। জায়ে জায়ে পাঁচিল। সাংসারিক ছোট ছোট স্বার্থ কোত্থেকে যে কখন দেওয়াল তোলে! তবুও তো একসঙ্গে ছিল সবাই। বহুদিন। শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর ইন্দ্রাণীই কি পাঁচিলগুলোকে প্রকট করে দিল? কীই বা আর করার ছিল তা ছাড়া? ঘরের মানুষটি যার অমন আলাভোলা, নিজের মান বাঁচাতে, ছেলেমেয়ের কথা ভেবে, তাকে তো কিছু অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতেই হয়।

হঠাৎ তিতিরের দিকে চোখ পড়ল ইন্দ্রাণীর। মেয়েটা ওরকম এক কোণে চুপটি মেরে বসে আছে কেন? সবার থেকে আলাদা হয়ে? যেন এই পরিবারের কেউ নয় সে, এমন একটা ভাব তিতিরের মুখে।

ইন্দ্রাণীর গা ছমছম করে উঠল। খর চোখে তাকাল মেয়ের দিকে, —অ্যাই, কী হয়েছে রে তোর?

তিতির চমকেছে, —কিছু হয়নি তো। সিনেমা দেখছি।

—সবাই কত কথা বলছে, তুই চুপ কেন?

কন্দর্প কথা ছুঁড়ল, —ছোটকা কত ট্যাঁড়শ, তা মুগ্ধ হয়ে দেখছে। তাই না রে তিতির?

তিতির ঈষৎ চোয়াল ফাঁক করল, —হুম।

সুদীপ চোখ টিপল, —তিতুমিরকে এখন তোমরা কেউ ডিস্টার্ব কোরো না। ও মন দিয়ে হিরোইনকে কপি করছে।

ছোটবেলায় তিতিরকে আদর করে তিতুমির বলত সুদীপ। কত কাল পর আবার ওই নামে ডাকল!

ইন্দ্রাণী আবার সিনেমায় মন দিল। বেশ অভিনয় করছে চাঁদু। নায়িকার প্রতি একটা নীরব প্রেমের ভাব সুন্দর ফুটিয়ে তুলছে। আগে এই সব দৃশ্যে চাঁদুকে ভীষণ ক্যাবলা লাগত। মধুমিতার প্রেমে পড়েই কি চাঁদুর এই উন্নতি!

দোতলায় ফোন বাজছে। সুদীপ ত্বরিত পায়ে উঠে গেল। ওপর থেকে ডাকছে ইন্দ্রাণীকে,, —বউদি, তোমার ফোন।

ইন্দ্রাণী সিঁড়ির মুখে গেল, —কে?

—শুভাশিসদা।

এখনই ফোন করতে হল শুভাশিসকে?

ইন্দ্রাণী বলতে যাচ্ছিল পরে ফোন করতে বলো, কি ভেবে উঠে এল দোতলায়।

রিসিভার ইন্দ্রাণীর হাতে দিয়ে সুদীপ ঘরে চলে গেছে। ইন্দ্রাণী গলা ঝাড়ল, —কী হল?

—খুব ব্যস্ত আছ মনে হচ্ছে?

—তা একটু আছি। বলো, কী বলছ?

—কী এমন জরুরি কাজ? হাসছে শুভাশিস।

—আমার সংসারের।

শুভাশিস একটু বুঝি থেমে রইল। তারপর বলল, —না, তেমন কিছু দরকার ছিল না। বেকবাগানের চেম্বারটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেল, নার্সিংহোমে চলে এলাম...

—ও। ইন্দ্রাণীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, —আসছ কবে?

—দেখি। সময় পেলেই যাব। নার্সিংহোম স্টার্ট করেও যা টেনশান। বাই দা ওয়ে, তোমার বন্ধুর বরের পেমেন্ট কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছি।

—শেফালি বলেছে আমায়। আর কিছু?

শুভাশিস আবার একটু থেমে থেকে বলল, —বাড়ির খবর সব ভাল তো? তিতির....?

—ভাল। তোমার বউয়ের শরীর এখন কেমন?

—আগের মতোই। এখনও এক জেদ, অপারেশন করাবে না।

—দ্যাখো কি করবে। রাখছি।

নার্সিংহোম চালু হওয়ার পর থেকে শুভাশিস এ বাড়িতে আসা যাওয়া অনেক কমিয়ে দিয়েছে, টেলিফোনেই খোঁজখবর নেয়। নতুন নেশা পেঁচিয়ে ধরেছে শুভকে। ভাল লক্ষণ। জটিলতা যত কমে আসে, ততই মঙ্গল।

নীচে নামার আগে সুদীপের ঘরের সামনে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী, —কি, তুমি আর সিনেমা দেখবে না?

—যাচ্ছি পরে। একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।

আবার হইহল্লার মাঝে ফিরেছে ইন্দ্রাণী, কিন্তু কিছুতেই আর আগের মতো মনোযোগী হতে পারছে না। কোথায় যেন তাল কেটে গেল। যখনই এই পরিবারে ইন্দ্রাণী আপ্লুত হতে চায়, কেন যে তখনই টোকা দিয়ে যায় শুভ! ইন্দ্রাণীর এ কেমন নিয়তি!

সুদীপ আর নামল না। সিনেমা শেষ। গ্যালারি খালি হচ্ছে। সবার আগে ছুটল দুর্লভ। পিছন পিছন তিতিরও উঠে গেল। সেদিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল বাপ্পা। কন্দর্পকে বলল, —ব্যাড লাক ছোটকা। তোমার মেইন ফ্যান আজ কোনও ওপিনিয়ন দিল না।

কন্দর্প ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করছিল। বলল, —তাই তো দেখছি। প্রিন্সেসের আজ মুড অফ কেন বল তো?

—কত কি হতে পারে! স্কুলে ঝাড় ফাড় খেয়েছে হয়তো।

অ্যাটম দু পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দরজায়, —না গো। দিদিভাইয়ের আজ বন্ধু এসেছিল। দুজনে মিলে ছাদে কাঁদছিল।

আদিত্য বিচলিত হয়ে পড়ল, —কেন? কাঁদছিল কেন?

—ওই বন্ধুটার খুব দুঃখ, তাই।

বাপ্পা চোখ নাচাল, —কী দুঃখ?

অ্যাটম প্রাজ্ঞ মুখে তিতিরের গমনপথের দিক নেত্রপাত করল। ফিক করে হেসে বলল, —জানি না।

কন্দর্প বলল, —টিন এজ সিনড্রোম। এই বয়সে কান্না সর্দির মতো ছোঁয়াচে হয়।

ইন্দ্রাণী নিশ্চিন্ত বোধ করছিল। ছেলেকে বলল, —তুই ওপরে গিয়ে ওর পেছনে লাগবি না কিন্তু।

—হুঁহ, আমার যেন কোনও কাজ নেই! শিস দিতে দিতে দোতলায় যাচ্ছে বাপ্পা।

রুনা ফিরে এসেছে দরজায়, —বাবা, আপনার খাবার গরম করতে বলি?

জয়মোহন চোখ বুজে শুনছেন সকলের কথা। মিটিমিটি হাসছেন। বললেন, —হ্যাঁ, এবার তো খেতে হয়।

ইন্দ্রাণী চোখের ইশারা করল কন্দর্পকে। জয়মোহনের পাশটিতে এসে ঝুঁকল কন্দর্প, —বাবা?

—উঁ?

—তোমার কেমন লাগল, তা তো বললে না?

—আমার একার ভাল লাগলেই হবে! লোকজন টিকিট কেটে দেখবে, তাদের বিচারই আসল।

—তা হোক, তোমার কেমন লাগল বলবে না?

জয়মোহন প্রসন্ন মুখে বললেন, —বাপের চোখ তো, তোকে ছাড়া আর কাউকে তেমন চোখেই লাগল না। তবে সব চেয়ে কি ভাল লাগল জানিস? এই যে তোরা সবাই আবার এক সঙ্গে হলি...

আদিত্য মাথা ঝাঁকাল, —সে তো আমরা যখন খুশি হতে পারি। কোনও একটা অকেশান বার করলেই হয়। এই যেমন ধরো...। আদিত্য মাথা চুলকোচ্ছে, —মাঘ মাসে তোমার জন্মদিন না? এবার তো পঁচাত্তর হচ্ছে! ঘটা করে আমরা তোমার ডায়মন্ড জুবিলি করব। জয়িরাও আসবে...। কি, আইডিয়াটা ভাল না?

—লাভ কী ? খাবি তো তোরা।

রুনা ঠোঁট টিপে হাসছে, —ঠিক আছে, সেদিন নয় যা খুশি খাবেন।

—বলছ ? তাহলে ডাক্তারকেও নেমন্তন্ন কোরো সেদিন। সে থাকলে মনে বলভরসা পাব। জয়মোহন ফুটছেন খুশিতে। চোখ খুলে তাকাচ্ছেন ইতিউতি, —তোমার পুত্তুর কোথায় গেল বড় বউমা ?

কন্দর্পই উত্তর দিল, —সে কি আর থাকে। অনেক রিকোয়েস্ট করাতে বহু কষ্টে আজ একটা বাংলা বই গিলেছে। অমূল্য সময় নষ্ট করে।

—ডাক তো ওকে।

ইন্দ্রাণী অবাক হল। আজ কি সবই উল্টো রকম হবে নাকি ? শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বাপ্পার না অহিনকুল সম্পর্ক ! উৎফুল্ল মুখে প্রশ্ন করল, —কেন বাবা ?

—আহা, ডাকো না।

বাপ্পা এল হেলে দুলে। তাকে দেখে রহস্যময় হাসি ফুটেছে জয়মোহনের চোখে। শীর্ণ মুখে রক্তের আভা। হেঁয়ালি করার ঢঙে বললেন, —আমি যদি তোকে একটা জিনিস দিই, তুই আমাকে কী দিবি ?

বাপ্পা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে ঘরের প্রাণীদের দেখল। বলল, —কি জিনিস ?

—বল তো কী ?

—সরি। আমি গেস করতে পারি না।

জয়মোহন ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হাঁটছেন। ঝুঁকে তোশকের এক পাশ তুলে অনেকটা ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা লম্বা খাম বার করলেন, —আমাকে তুই খুব মুখ করিস, ভেবেছিলাম তোকে দেব না। মনটা খুব ভাল লাগছে বলে, যাহ দিয়েই দিলাম।

ছোঁ মেরে খাম কেড়ে নিয়েছে বাপ্পা। ওপরটা এক ঝলক দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, —এ তো ওশান লাইনার্সের চিঠি ! তুমি এটা এতক্ষণ আমাকে দাওনি ! কী লোক !

জয়মোহন ভ্রূকুটি করলেন, —কী আছে ওতে ?

—আছে আমার মাথা, আর তোমার মুণ্ডু। আহ্লাদে ঝকঝক করছে বাপ্পা। দ্রুত খাম ছিঁড়ে চিঠি খুলে পড়তে পড়তে আবার চেঁচাল, —আমি চাকরি পেয়েছি গো দাদু। জাহাজে। সেকেন্ড জানুয়ারি থেকে ম্যাড্রাসে ট্রেনিং শুরু হচ্ছে। তোমাদের কলকাতাকে এবার আমি কাঁচকলা দেখিয়ে চলে যাব। কত মাইনে পাব জানো ?

—জেনে কাজ নেই। জয়মোহন যেন চুপসেছেন একটু, —জাহাজের চাকরি ভাল নয়।

—কেন ?

—অল্পবয়সী ছেলেদের জাহাজে থাকতে থাকতে মাথা বিগড়ে যায়।

—হুঁহ। যত সব ব্যাকডেটেড আইডিয়া। চিঠি নিয়ে সগর্বে উড়তে উড়তে চলে গেল বাপ্পা।

আদিত্য কন্দর্প রুনা হতচকিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্রাণীর শরীর অবশ হয়ে আসছিল।

এসেই গেল চিঠিটা ! হা কপাল।

রাত্রে খেয়েদেয়ে উঠে বাপ্পার ঘরে এল ইন্দ্রাণী। টেবিলে পড়ে আছে খাম, খুলে চিঠিটা পড়ল। নিজে। পুরো পড়ে কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল ইন্দ্রাণীর। চোখে যেন আঁধার ঘনিয়ে এল। বাপ্পা য যা বলেছে সবই ঠিক, কিন্তু মূল কথাটা তো একবারও বলেনি !

আদিত্য খাটে আধশোওয়া। সিগারেট খাচ্ছে। কি যেন ভাবছেও শুয়ে শুয়ে। বাপ্পা পাশের ঘরে। টিভি দেখছে।

ইন্দ্রাণী বাপ্পার খাটে বসল, —তুমি চিঠিটা পড়েছ ?

—নাহ। আদিত্য আনমনা, —আমি পড়ে কী করব ?

—ট্রেনিং-এ কত খরচা জানো ?

—তাই বা আমি জেনে কী করব ? ফোঁস করে শ্বাস ফেলল আদিত্য, —কত ?

—এরা যা হিসেব দিয়েছে...সব মিলিয়ে তা প্রায় চল্লিশ হাজার।

আদিত্য ধড়মড় করে সোজা হল, —বলো কী ! চল্লিশ হাজার !

ইন্দ্রাণী থম মেরে বসে আছে। আকাশে মেঘ আছে। ছানাকাটা মেঘ। ঠাণ্ডা আজ কম। তা বলে এত গুমোট হবে ? নীচের ঘরে অত জন মানুষ বসে ছিল এক সঙ্গে, তখন তো এমনটা লাগেনি ?

ইন্দ্রাণী বিড়বিড় করে বলল, —আমাকে কেটে ফেললেও অত টাকা বেরোবে না।

আদিত্য নড়ে বসল। বলল, —তাহলে আর কি। এখনই ছেলেকে ডেকে বলে দাও।

ইন্দ্রাণী উত্তর দিল না।

আদিত্য নিজেই ডাকছে, —বাপ্পা...অ্যাই বাপ্পা...

বাপ্পা ঘরে এল। দেখল দুজনকে। বলল, —কী ?

—বোস, একটা কথা বলি।

ভুরু কুঁচকে মা'র পাশে বসল বাপ্পা।

আদিত্য একটু কেশে নিয়ে বলল, —আমি আর তোমার মা পরামর্শ করে দেখলাম, তোমার ট্রেনিং-এর অত টাকা আমাদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়।

বাপ্পা মুখ বেঁকাল, —তোমার কাছে কে টাকা চেয়েছে ?

আদিত্য দার্শনিকের মতো হাসল, —আমার কাছে চল্লিশ টাকা চাইলেও আমি দিতে পারতাম না রে।

—তাহলে চুপ করে থাকো।

ইন্দ্রাণীর এই মুহূর্তে মনে হল বাবাকে মান্য করতে না শিখিয়ে সে বাপ্পার উপকার করেনি। গম্ভীর গলায় বলল, —বাবা ঠিকই বলছে।

বাপ্পা নিমেষে খেপে গেল, —একি কথা ! এত কষ্ট করে আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম...বম্বে গিয়ে যখন ইন্টারভিউ দিয়ে এলাম, তখন তো কিছু বলোনি ?

—তখন কি বলেছিলি অত টাকা লাগবে !

—বলার কি আছে, এ তো জানা কথাই। ষোলো সতেরো হাজার টাকা মাইনে দেবে, তার জন্য কিছু গুড় ঢালতে হবে না ? আমি এত দিন ধরে ছোটাছুটি করে মরছি...এই কথা শোনার জন্যে ?

ইন্দ্রাণী মিনতির সুরে বলল, —একটু বোঝার চেষ্টা কর বাপ্পা। তুই তো আমাদের অবস্থা জানিস, হুট বলতে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা কোত্থেকে পাব ? আমার একটা গয়না পর্যন্ত নেই। দেখেছিস তো, বিয়েবাড়িতে আমি রুপোর ওপর সোনার জল করা গয়না পরে যাই।

—কী চাও তোমরা বলো তো ? আমার এত বড় চান্সটা ভবলেট হয়ে যাক ?

—তা কেন ! তুই লেখাপড়ায় ভাল, এখানেই কত সুযোগ আসবে। সিএ কর, ম্যানেজমেন্ট কর...

—আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। বাপ্পা বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠল, —আই মাস্ট গো। আমি যাব।

ইন্দ্রাণী মাথা ঠিক রাখতে পারল না। খিঁচিয়ে উঠল, —কিন্তু টাকা আমি পাব কোত্থেকে ?

—ধার করো, ভিক্ষে করো, চুরি করো, যেভাবে খুশি জোগাড় করো। আমার টাকা চাই।

—যদি না দিতে পারি ?

—কী হবে দেখতেই পাবে।

বাপ্পার স্বর হঠাৎই ভয়ঙ্কর শীতল হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল মুখে। দৃষ্টি ঘোলাটে। উন্মাদের দৃষ্টি।

৩৭

টিফিনের বেল পড়তেই ইন্দ্রাণী স্কুলের অফিসঘরে এল। তাদের অফিসটি একটি বড়সড় হলঘর, একধারে রেলের বুকিং অফিসের মতো ক্যাশ কাউন্টার, অন্যদিকে অফিস কর্মচারীদের বসার চেয়ার টেবিল। পিছনে ঢাউস ঢাউস আলমারি, ফাইল রাখার স্টিলের র‍্যাক। অফিসে কর্মচারীর সংখ্যা সাকুল্যে চার। হেড ক্লার্ক, অ্যাকাউনটেন্ট, ক্যাশিয়ার, আর একজন ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট। মনোহর বিশ্বাস অফিসের বড়বাবু, তাঁর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, তিনি বসেন ঘরের একদম কোণটিতে। তাঁর সামনের টেবিলটি অতিকায়, সেখানে সব সময়েই মোটা মোটা জাবেদা খাতা থাকে।

ইন্দ্রাণীকে দেখে মনোহরবাবুর সদাপ্রসন্ন মুখে এক ফালি বাঁকা হাসি, —কি দিদিমণি, আজ আবার কোনও চিঠি দিতে এলেন নাকি ?

—নাহ। ইন্দ্রাণী চেয়ার টেনে বসল, —আমি একটু অন্য দরকারে আপনার কাছে এসেছি।

—বলেন। বলে ফ্যালেন। আমরা তো আপনাদের সেবাতেই আছি।

কথাটা বিনয় নয়, শ্লেষ। ইন্দ্রাণীর অনেক সহশিক্ষিকা কারণে অকারণে অফিসঘরে এসে গল্পগাছা করে, কর্মচারীদের হাঁড়ির খবরাখবর নেয়, আহা উহু করে। মাইনের দিন ছাড়া দরকার না-পড়লে ইন্দ্রাণী এ ঘর মাড়ায়ই না। এ নিয়ে কর্মচারীদের হৃদয়ে সামান্য অভিমান আছে, তারা কেউ সোজাভাবে কথা বলে না ইন্দ্রাণীর সঙ্গে।

শ্লেষটা নীরবে হজম করল ইন্দ্রাণী। উপেক্ষাও করল বলা যায়। এমন অনেক কিছুই তাকে এখন উপেক্ষা করতে হবে, সে এখন গর্তে পড়েছে। শুকনো হেসে বলল, —আমার একটা পি এফ লোন দরকার মনোহরবাবু।

—হুম, তাই বলেন। মনোহরবাবু বাড়ি থেকে আনা জলের বোতল থেকে এক ঢোঁক ফুটোনো জল খেলেন, —কত চাই ?

—ম্যাক্সিমাম যতটা পাওয়া যায়।

—তাহলে তো আপনার অ্যাকাউন্টটা দেখতে হবে। আপনি রথীনের কাছে যান না।

রথীন স্কুলের অ্যাকাউন্টেন্ট, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, দিদিমণিদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের কৌতূহল আছে তার। কমলিকার বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে বলে একবার এক অলীক গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল স্কুলে, নিবেদিতার সম্পর্কেও কিসব আজে বাজে কথা বলেছিল। ইন্দ্রাণী রথীনকে এড়িয়ে চলে।

মিনতির সুরে ইন্দ্রাণী বলল, —আবার রথীনবাবু কেন ? আপনিই একটু দেখে দিন না।

—অফিসে কাজের তো একটা নিয়ম আছে, সব কিছু কি ইচ্ছে মতো হয় ?

ইন্দ্রাণী নিচু স্বরে বলল, —প্লিজ মনোহরবাবু...

মনোহরবাবু নাক-মুখ কুঁচকে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন ইন্দ্রাণীকে। গলা তুললেন, —রথীন, দিদিমণিদের পি এফের খাতাটা দিয়ে যাও তো।

রথীন ক্যালকুলেটার টিপে কি যেন হিসেব কষছে। বলল, —পাঁচ মিনিট বসতে হবে।

—বসেন তবে। হাতের কাজটা সেরে নিক।

ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল, —আমি তবে স্টাফরুম থেকে একটু ঘুরে আসি।

—আসেন।

স্টাফরুমে খাবার এসে গেছে। মসালা ধোসা। মুখে রুচছে না ইন্দ্রাণীর, খুঁটছে। গতকাল নিউ আলিপুরের কোথায় যেন একটা ডাকাতি হয়েছে, কোন ফ্ল্যাটবাড়িতে, কর্তা-গিন্নি দুজনকেই মেরে রেখে গেছে ডাকাতরা, স্টাফরুম আজ তাই নিয়ে সরগরম। ভাসা ভাসা শুনছিল ইন্দ্রাণী, মন দিচ্ছিল না। কাল রাত থেকে এক জোড়া চোখ তাড়া করে চলেছে ইন্দ্রাণীকে। এক রক্ত হিম করা দৃষ্টি। টাকা না পেলে বাপ্পা যদি কিছু করে বসে... !

খাবার অভুক্ত রেখে অফিসঘরে ফিরে ইন্দ্রাণী দেখল পি এফ-এর খাতা বড়বাবুর টেবিলে এসে গেছে।

ইন্দ্রাণী উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করল, —কত জমেছে আমার ?

—দশ হাজার তিনশো একত্রিশ।

ইন্দ্রাণী দমে গেল। বারো তেরো বছরের চাকরিতে মাত্র এই কটা টাকা জমেছে ! মিয়োনো গলায় বলল, —পাব কত ?

—সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট। এই ধরুন অ্যারাউন্ড সাড়ে সাত হাজার।

ইন্দ্রাণী পলকের জন্য ভাবল, —কবে নাগাদ পেতে পারি ?

—অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে যান, মাসখানেকের মধ্যে হয়ে যাবে।

—মাসখানেক ! ইন্দ্রাণী ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল, —আমার তো অদ্দিন দেরি করলে চলবে না।

—দেরি কোথায় ? মাঝে বড়দিনের ছুটি পড়ে যাচ্ছে... ম্যানেজিং কমিটির কাছে পাঠাতে হবে... চেক তৈরি করা, সই করানো...

ইন্দ্রাণী অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। বলল, —পি এফ লোন নীলিমাদি স্যাংশন করে দিতে পারেন না ?

রথীন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। কৌতূহলে লকলক করছে চোখ। বলল, —কী ব্যাপার দিদিমণি, হঠাৎ লোনের জন্য এত তাড়া পড়ল কেন ?

—আছে। খুব আরজেন্ট দরকার। ইন্দ্রাণী রথীনকে আমল দিতে চাইল না।

—মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন নাকি ?

ইন্দ্রাণী আরও গম্ভীর হল, —সাড়ে সাত হাজার টাকায় মেয়ের বিয়ে হয় ?

—না, তবু সবাই তোলে তো...। আপনার মেয়ে অবশ্য ছোট। ইলেভেনে পড়ে না আপনার মেয়ে ?

একে নিয়ে পারা যায় না। সব জানে, তবু পেজোমি করা চাই। ইন্দ্রাণী মনোহরবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, —কি বড়বাবু, নীলিমাদি পারেন না স্যাংশন করতে ?

অদম্য রথীন ফুট কেটেছে সঙ্গে সঙ্গে, —আপনার সঙ্গে ঝামেলাটা মিটে গেছে ?

—কোন ঝামেলা ? আমার সেই জয়েনিং রিপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার ? ও মিটে যাবে। তীক্ষ্ণ স্বরে কথাগুলো বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রাণী, —বড়বাবু, তাহলে কি অ্যাপ্লাই করে দেব ?

—দিন। বড়দিদিমণির সঙ্গেও একবার কথা বলে নেবেন।

—উনি তো আজ আসেননি। ইন্দ্রাণী অল্প ইতস্তত করল, —ওঁকে বলে লাভ হবে কিছু ? আপনার কী মনে হয় ?

রথীন নাক বাড়িয়ে উত্তর দিল, —লাভ হতেও পারে। সে বার রেবাদি তো সাত দিনে পেয়ে গেল। তেমনভাবে ধরাকরা করতে পারলে না হওয়ার কি আছে ?

বিশ্রী একটা মেজাজ নিয়ে স্টাফরুমে এসে দরখাস্ত লিখছিল ইন্দ্রাণী, টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেল। অগত্যা উঠতেই হয়, চক ডাস্টার নিয়ে ছুটতেই হয় ক্লাসে। এখনও তিনটে ক্লাস বাকি।

শেষের পিরিয়ডগুলো কিছুতেই মন দিয়ে নিতে পারল না ইন্দ্রাণী। পাঠ্যবই-এর পাতা খুললেই যদি বাপ্পার চোখ এসে ভর করে, মন কি বশে থাকে ! রাতভর দু চোখের পাতা এক হয়নি কাল। ছেলের জন্য এক অন্তর্নিহিত ত্রাস তো ছিলই, সঙ্গে ছিল ক্ষোভ, সঙ্গে ছিল এক সুতীব্র অভিমান। তিতিরের থেকে যাকে অনেক বেশি আদর দিয়েছে ইন্দ্রাণী, সেই কিনা ওই ভাষায় কথা বলে ! মাকে তুচ্ছ করে, পরিবার পরিজনকে ভুলে, শুধু নিজের কথাই ভাবছে বাপ্পা ! এত স্বার্থপরতার শিক্ষা বাপ্পা পেল কোত্থেকে ? ইন্দ্রাণীই দিয়েছে কি ? নাকি দিয়েছে সময়, এই লোভী সময় ? অথবা তাদের ভাঙা নৌকোর মতো পরিবার ? যাকে যখন আঁকড়ে ধরতে চায় ইন্দ্রাণী, সেই যে কেন পিছলে যায় !

যাক। ইন্দ্রাণী আর কিচ্ছুটি বলবে না। যেখান থেকে হোক টাকা জোগাড় করে ছেলের মুখে ছুঁড়ে মারবে ইন্দ্রাণী। সামান্য চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার তো ব্যাপার, তার জন্য তুই মাকে শাসাস, এত বড় তোর স্পর্ধা ? ইন্দ্রাণীর স্কুল রয়েছে, স্কুলের বন্ধুবান্ধব রয়েছে, প্রেস রয়েছে, চারদিক থেকে ব্যবস্থা করলে ওই টাকা কি উঠে যায় না ?

রাতে এরকমই ভেবেছিল ইন্দ্রাণী। রাতের আঁধারে ভাবা অনেক সহজ। আঁধারের একটা নিষ্ঠুর সম্মোহনী শক্তি আছে, রাত বড় অলীক ভাবনা ভাবায় মানুষকে। দিনের আলোয় ভাবনাকে কাজে পরিণত করা যে কী কঠিন ! দিন বড় কঠোর বাস্তব। স্কুলে কাউকে টাকার কথা বলতে পারল ইন্দ্রাণী ? কাকে বলবে ? কার সঙ্গেই বা তার তেমন সখিত্বের সম্পর্ক আছে ? কমলিকার কাছে চাইবে ? কমলিকা সদ্য ফ্ল্যাট কিনেছে, চারদিকে তার এখন প্রচুর দেনা, প্রায়শই তাই নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত থাকে কমলিকা। বড় জোর তার কাছ থেকে দু-এক হাজার চাওয়া যেতে পারে, তার বেশি কখনই নয়। এক শেফালিকে বললে পনেরো-বিশ হাজার টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে বলা কি উচিত হবে ? শেফালি যদি ভাবে নার্সিংহোমের কাজটা তার বরকে পাইয়ে দিয়ে সুযোগ নিচ্ছে ইন্দ্রাণী ? ছিঃ।

ছুটির পর ফাঁকা স্টাফরুমে দরখাস্ত লিখে ফেলল ইন্দ্রাণী। রুটিন বয়ান, তবু কেমন লিখতে অস্বস্তি হচ্ছিল। প্লিজ, কাইন্ডলি, গ্রেটফুল শব্দগুলো বসানোর সময় কেমন যেন বিরুদ্ধতা এসে যায় মনে। নীলিমাদিকে অনর্থক তেল দেওয়া হয়ে যাচ্ছে না তো ? আবার এগুলো না থাকলেও চিঠি ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে। কি আর করা যাবে ? যা ভাবার ভাবুক গে।

দরখাস্ত হাতে ইন্দ্রাণী আবার অফিসঘরে এল। ফাঁকা অফিসঘর। একা মনোহরবাবু কি ঘেন মেলাচ্ছেন বসে বসে। ভীষণ মন দিয়ে। ইন্দ্রাণীর ছায়ায় বুঝি বিঘ্ন ঘটল কাজে, মাথা তুললেন, —ও আপনি ! এনেছেন ?

মৃদু ঘাড় নাড়ল ইন্দ্রাণী। সংশয় নিয়ে বলল, —পাব তো এ মাসের মধ্যে ?

মনোহরবাবু ডটপেন বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিলেন। চশমা কপালে তুলে ঘষলেন চোখ দুটোকে। বললেন, —বসেন। আপনাকে কটা কথা বলি।

ইন্দ্রাণী বসে ঘড়ি দেখল। সাড়ে বারোটা। তখন টিফিনে কিছু খেতে পারল না, এখন পেট চুঁই চুঁই করছে। উদ্বেগ অশান্তি কোনও কিছুতেই কেন যে খিদে তেষ্টার বোধগুলো মরে যায় না !

মনোহরবাবু চশমা স্বস্থানে আনলেন,—হক কথা শোনেন। হপ্তা তিনেক তো লাগবেই। বড়দিদিমণি তিন দিনের ছুটি নিয়েছেন, কিন্তু সাত দিনের কমে আসবেন না। ওঁর এক পুষ্যি আছে, ভাইঝি। সে এসেছে আমেরিকা থেকে।

—তাহলে আমার কি হবে ?

—আমি কাল ওঁর বাড়িতে যাব একটা ফাইল সই করাতে, তখন এটা দিয়ে দিতে পারি। তবে কি জানেন তো দিদিমণি ? কিছু মনে করবেন না, মেয়েরা অনেক বেশি ভিন্ডিকটিভ টাইপের হয়। বিশেষ করে তার শত্রুপক্ষও যদি মেয়ে হয়।

ইন্দ্রাণী নিরক্ত মুখে হাসল, —শত্রুতার কী আছে ! যা হয়েছে তা তো অফিসিয়াল ব্যাপার।

—উনি তা মনে করেন না। আপনিও কি করেন দিদিমণি ?

ইন্দ্রাণী উত্তর দিল না।

—রথীন যাই বলুক, আমি বলি কি আপনি এ সবের মধ্যে যাবেন না। সামান্য তো কটা টাকা... ! আপনি তাঁকে রিকোয়েস্ট করবেন, তিনিও সুযোগ পেয়ে হয়তো চারটি কথা বলে নেবেন... আপনি একটা কজের জন্য লড়ছেন... বেআইনি কিছু বলছেন না... মনোহরবাবু বলতে বলতে হঠাৎ চুপ মেরে গেলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, —টাকাটা কী জন্য দরকার ?

—আছে। ইন্দ্রাণী বলব না বলব না করেও বলে ফেলল, —এই ছেলেমেয়ের লেখাপড়া সংক্রান্ত ব্যাপার আর কি।

—অ। ছেলেমেয়ে! মনোহরবাবু চোখ নামালেন কাগজে। দু দিকে মাথা নাড়ছেন, —সব পণ্ডশ্রম। সব পণ্ডশ্রম। যা ঢালবেন, দেখবেন সবই অপচয়।

ইন্দ্রাণী কিছু বলতে যাওয়ার আগে মনোহরবাবু আবার বলে উঠলেন, —কত জন তো কত ভাবে ছেলেমেয়ের পেছনে খরচা করে, কী লাভ হয়? বিষ ঢেলে দেয় ছেলেমেয়েরা। আমার ছেলের জন্য তিনটে টিউটর রেখেছিলাম, সাধ্যের অতিরিক্ত করে ভাল স্কুলে ভর্তি করেছিলাম...। কেন করেছিলাম বলুন? নিজের জোটেনি বলে, তাই তো? ভেবেছিলাম ছেলেকে যেন বাপের মতো কেরানির জীবন না কাটাতে হয়। হাতির খরচা জোগানোর জন্য সন্ধেয় পার্টটাইম, বিকেলে পার্টটাইম, কী করিনি? পরিণামে হলটা কী, সেই ছেলে এখন ড্রাগে বুঁদ হয়ে থাকে। বছরে দু বার তিন বার ড্রাগ ছাড়ানোর হোমে ঢুকিয়ে দিয়ে আসতে হয়। পার্টটাইমের টাকা এখন ডাক্তাররা গিলছে, ছেলে যে কে সেই।

মনোহরবাবুর ছেলের সম্পর্কে কিছু কিছু উড়ো কথা শুনেছিল ইন্দ্রাণী। দুশ্চিন্তা ভুলে সমবেদনার সুরে প্রশ্ন করল, —ছেলে এখন আছে কোথায়, বাড়িতে?

—হ্যাঁ, সেই জন্যই তো চিন্তা। মায়ের ওপর জুলুম করে টাকা নিয়ে যায়। না দিলে ঘড়ি-আংটি যা হাতের কাছে পায় বেচে দেয়। আমায় ভয় দেখায় ট্রেনলাইনে গলা দেবে। রোজই বাড়ি ফেরার সময়ে সিঁটিয়ে থাকি, কোনদিন গিয়ে দেখব এসপার-ওসপার কিছু একটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু একটা হয়ে গেলেও বোধহয় বাঁচি। ক'দিন শোকদুঃখ হবে ঠিকই, তবু এই রোজ রোজ দগ্ধে মরার হাত থেকে তো মুক্তি পাব। মানুষ যে কি সুখে সংসারধর্ম করে!

খিটখিটে প্রৌঢ় মানুষটা মূহ্যমান বোবা হয়ে বসে আছেন। স্থির। ইন্দ্রাণীও ভেবে পাচ্ছে না কী বলবে। কষ্ট করে ছেলের জন্য টাকা জোগাড় করলেও ছেলে যে এমন কিছু মহৎ প্রতিদান দেবে না, এ তো ইন্দ্রাণীর জানা কথা। তবু টাকা চাই। হয়তো দুঃখ পেতেই।

মনোহরবাবু বললেন —যাক গে, আমার কথা ছাড়ুন। আমার খারাপ হয়েছে বলে সকলেরই খারাপ হবে কেন। তা এত টাকা দরকার বলছেন, কিসে ভর্তি করবেন? কম্পিউটার ক্লাস?

ইন্দ্রাণী সত্যিটা ভাঙল না —হ্যাঁ, ওরকমই একটা কিছু। শুধু জেনারেল লাইনে পড়ে তো লাভ নেই।

—ভাল। রেখে যান অ্যাপ্লিকেশানটা।

ইন্দ্রাণী অন্য কথা ভাবছিল। যদি সত্যিই এক তারিখের মধ্যে না পাওয়া যায়, দরখাস্ত দিয়ে কী লাভ? পেলেও তো পাবে মাত্র সাড়ে সাত হাজার, তা দিয়ে ঘটির কোণও ভর্তি হবে না।

ভেবেচিন্তে দরখাস্তটা তুলে নিল ইন্দ্রাণী। থাক।

মনোহরবাবু আড়চোখে দেখলেন — কী হল, আপনার টাকা লাগবে না?

—দেখি, অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করে নেব।

—আমার কথায় ডিজহার্টেনড হয়ে পড়লেন না তো? আমি কিন্তু সেরকম ভেবে কিছু বলিনি। মনের দুঃখে অনেক কথা বেরিয়ে যায়।

—না না, তা নয়। আপনি কাজ করুন।

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে এল। স্কুলগেটে এসে পিছন ফিরে তাকাল একবার। গোটা বিল্ডিং খাঁ খাঁ করছে। বিশাল চাবির গোছা হাতে একটার পর একটা ঘর বন্ধ করছে ছবিলাল। সুনসান করিডোর ধরে একা একা হাঁটছে বুড়ো দারোয়ান। ভারী পায়ে। দুলে দুলে।

ঘরের পর ঘর যেন বন্ধ হয়ে চলেছে এক নিরাসক্ত ঈশ্বরের হাতে!

ছবিলালের হাঁটাটা কী নির্জন! কী নিঃসঙ্গ!

বাড়ি ঢুকেই ইন্দ্রাণী দেখল আদিত্য বেরোয়নি আজ। বড়ঘরের আলমারি খুলে কাপ-মেডেলগুলো বার করেছে, ছড়িয়ে বসেছে মেঝেতে।

বিরক্ত মুখে ইন্দ্রাণী বলল —কী করছ ওগুলো নিয়ে ?

—ধুলো ভর্তি হয়ে গেছে, মুছছিলাম।

নেই কাজ তো খই ভাজ। তাও যদি কাপ-মেডেলগুলোর একটাও নিজের হত। সবই তো সুদীপের পাওয়া, নয় কন্দর্পর। সুদীপ স্কুল কলেজে ভাল অ্যাথলিট ছিল, কন্দর্পর কাপ-মেডেল আবৃত্তি নাটকের। জয়শ্রীরও গানের মেডেল আছে দু-একটা। স্কুল থেকে পাওয়া। কী যে সুখ পায় আদিত্য এ সবে হাত বুলিয়ে !

ইন্দ্রাণী নাক কুঁচকে বলল, —এই তো ক'দিন আগে সব নামিয়েছিলে...

—সে পুজোর আগে। আগে তো মাসে মাসে করতাম। বলেই ইন্দ্রাণীর দিকে সরাসরি তাকাল আদিত্য, —বাপ্পা আজ নটার পর ঘুম থেকে উঠেছে।

—ভাল। বাবার অভ্যেস রপ্ত করছে। তা শুনে আমি কী করব ?

—না এমনিই। বলছিলাম আর কি। উঠেই গটগট করে বেরিয়ে গেল, চা জলখাবারটা পর্যন্ত খেল না...

পলকের জন্য ইন্দ্রাণীর বুকে যেন একটা তার নড়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল —দুপুরে এখনও খেতে আসেনি ?

—নাহ্। একটা রুপোলি ছোট্ট কাপ আলমারিতে ঢুকিয়ে ঢাকা বসিয়ে দিল আদিত্য।

ইন্দ্রাণীর আর কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। রাত থেকে চিন্তায় চিন্তায় তার পাগল পাগল দশা, অথচ এই লোকটাকে দ্যাখো, দিব্যি নির্বিকার মুখে আলমারিতে কাপ-মেডেল গোছাচ্ছে !

শীত পড়ছে। শুকনো হাওয়ায় টান ধরে চামড়ায়। দুপুরের দিকে শাওয়ারের জলে এখনও তেমন কনকনে ভাব আসেনি, তবু তার স্পর্শে ছ্যাঁক করে ওঠে শরীর, স্নানের পর গায়ে একটা চাদর জড়ালে আরাম লাগে বেশ।

স্নান খাওয়া সেরে ইন্দ্রাণী শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। চোখের পাতা ভারীর ভারী তস্য ভারী, একটা ঘুম ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে দেহকাণ্ডে, অথচ মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। করোটির ভেতর যেন ঢুকে পড়েছে এক ঘুরঘুরে পোকা, কিরকির করতে করতে নেমে আসছে কপালে, চক্রাকারে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আবার।

দু আঙুলে মাথা টিপে শুয়ে রইল ইন্দ্রাণী। ব্যথা কমছে না। উঠে ব্যাগ থেকে একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট বার করে খেল। ব্যথার ওপর এক অবশকারী প্রলেপ ছড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এই ভোঁতা বোধটুকুই কী আরাম !

জোর করে তন্দ্রা ভাব ঝেড়ে ফেলে আলমারি খুলল ইন্দ্রাণী। লকারে প্রেসের টাকা কিছু সরানো থাকে, বার করে এনে বসেছে বিছানায়। প্রেসের টাকা থেকে সংসারের জন্য প্রতি মাসে হাজারখানেক সরিয়ে রাখে, এ মাসে এখনও নেওয়া হয়নি, টাকাটা আলাদা করে রাখল। পড়ে রইল চার হাজার আটশো। ব্যাঙ্কে দুটো অ্যাকাউন্ট আছে। প্রেসের। নিজের। দুটো পাশ বইই উল্টেপাল্টে দেখল। একটাতে আছে চব্বিশশো সাঁইত্রিশ, অন্যটায় একত্রিশশো। সবই এত কম ! যেন সমুদ্র বাঁধার জন্য কাঠবেড়ালির মুখে বয়ে আনা নুড়িপাথর।

খুট করে একটা শব্দ হল বাইরে। বাপ্পা এল নাকি ! না, বাপ্পা এলে তো দুমদাম করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠত। দু-তিনটে ধাপ এক সঙ্গে টপকে।

কয়েক সেকেন্ড কান পেতে থেকে আবার কাজে মন দিল ইন্দ্রাণী। আলগা হিসেব কষছে মনে মনে। দুর্লভ পরশুদিন কাগজের কথা বলছিল, দু রিম কাগজ কিনতে হবে। বাইন্ডারও বিল দিয়ে গেছে। পুজোর আগে কয়েক কেজি টাইপ কেনার কথা ছিল, এখনও হয়ে ওঠেনি। কম্পোজিটারদের জন্যও দু-তিন সপ্তাহের মতো টাকা সরিয়ে রাখা দরকার। এর মধ্যে নতুন কোনও পেমেন্ট আসবে কি ? পুজো আর দেওয়ালিতে সবাই প্রায় বিল ক্লিয়ার করে দিয়েছে, কাজও এখন তেমন হচ্ছে না কিছু, শুধু বোধহয় শুভাশিসদের নার্সিংহোমের একটা বড় বিল পড়ে আছে। কথাটা

মনে হতেই ইন্দ্রাণীর শরীর শক্ত হয়ে গেল। ওই টাকার জন্য তাগাদা করা যাবে না, মরে গেলেও না।

এভাবে বিন্দু বিন্দু করে টাকা সংগ্রহ করেই বা কত দূর পৌঁছনো যায়! দুশ্চিন্তা উদ্বেগের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল ইন্দ্রাণীর। কথায় বলে রাই কুড়িয়ে বেল, সত্যি সত্যি কি কেউ কুড়িয়ে দেখেছে?

অন্যমনস্কভাবে মুখ তুলতেই ইন্দ্রাণী চমকে উঠল। দরজা খোলা। আদিত্য দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। জুলজুল চোখে দেখছে ইন্দ্রাণীকে।

গোমড়া গলায় ইন্দ্রাণী বলল —কী চাই?

আদিত্যকে অন্য দিনের মতো অপ্রতিভ মনে হল না। পায়ে পায়ে খাটে এসে বসেছে। ছড়ানো টাকার দিকে একবার তাকিয়ে নিল —কী এত হিসেব করছ!

টাকা গোছাতে গোছাতে ইন্দ্রাণী বলল, —আমার কপাল।

আদিত্য মুচকি হাসছে —ওর হিসেব হয় না। ওটা একদম বিধাতাপুরুষ দেগে দেয়।

লকারে টাকা তুলে চাবি লাগাল ইন্দ্রাণী। ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, —সে কি আর আমি জানি না!

—জানোই যদি, হিসেব করো কেন?

—না করে ব্যোমভোলা হয়ে থাকতে পারি না, তাই।

যার উদ্দেশে তীর ছোঁড়া সে অচঞ্চল। হাসছে, —আরে, ভাবনা কি আর আমিও ভাবি না?

—ভাবো? শুনেও সুখ।

—ভাবি গো ভাবি। আমার একটা পরামর্শ শুনবে?

ইন্দ্রাণী কেটে কেটে বলল, —আমি ছেলেকে না বলতে পারব না।

—আমি জানি। আদিত্য মিউজিকাল লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। উচ্ছল ভঙ্গিতে বলল, —যদি টাকাটা আমি জোগাড় করে দিই?

—তুমি! কীভাবে!

—ধরো যদি টাকাটা কারুর কাছ থেকে ধার করে এনে দিই? মাসে মাসে শোধ দিয়ে দেব।

—কে তোমাকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার দেবে?

—যারা সবাইকে দেয় তারাই দেবে। আমার দু-একটা কাবলিঅলা চেনা আছে...

—কাবলিঅলা! গলায় টেনিস বল আটকে গেল ইন্দ্রাণীর, —তুমি কি কাবলিঅলার কাছ থেকে টাকা ধার করেছ নাকি?

—না না, এখন করিনি। ক্যাটারিং-এর ব্যবসার সময়ে এক-আধবার নিয়েছিলাম, শোধ দিয়ে দিয়েছি।

—তাই বলো। ইন্দ্রাণী একটু নিশ্চিন্ত হল। ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বলল, —ওরা কত সুদ নেয় তা নিশ্চয়ই জানা আছে?

—কত আর, মাসে পাঁচ-ছ পারসেন্ট। টুসকি দিয়ে জানলার বাইরে ছাই ঝেড়ে এল আদিত্য, —অর্থাৎ মাসে দু-আড়াই হাজার টাকা। প্রথম দু-এক মাস তুমি দেবে টাকাটা, তারপর থেকে ওটা আমিই শোধ করতে পারব।

ইন্দ্রাণীর গা গুলিয়ে হাসি এল, —তুমি শোধ করবে টাকা!

—অফকোর্স। ইলেকশানের জন্য কাজ আটকে ছিল, নেক্সট উইকে পেয়ে যাচ্ছি। তারপর আর কিসের প্রবলেম?

—কত কোটি টাকার কাজ তোমার?

—আপাতত ছাব্বিশ হাজার।

—হুঁহ, তাতেই এত কায়দা! তোমার হাতে কত আসছে?

আদিত্য একটু যেন ফাঁপরে পড়ে গেল, —প্রথম কাজে কি বেশি লাভ হয়! বড় জোর হাজার

দু-আড়াই। তবে এর পর থেকে তো কাজ আসতেই থাকবে।

—বুঝলাম। তুমি আমাকে একটা দয়া করবে?

—বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? চাও তো কাবলিঅলার সঙ্গে তোমার আমি কথা বলিয়ে দিতে পারি। আগা সাহেব স্যুট প্যান্ট পরা, কাবলি বলে বুঝতেই পারবে না।

—আমার দরকার নেই। দয়া করে কাবলিঅলার চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও। নতুন বিপদে আর জড়িও না।

আদিত্য সিগারেট নিবিয়ে দিল, কিন্তু নিজে নিবল না। বিছানায় গুছিয়ে বসে বলল, —আরও একটা সোর্স আছে। তুমি অনুমতি দিলে নেড়েচেড়ে দেখতে পারি।

ইন্দ্রাণীর চোখ সরু হল।

—একবার শংকরকে বলে দেখব?

ননদাই-এর নাম শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ইন্দ্রাণী। খর গলায় বলল —যা বলেছ বলেছ, আর দ্বিতীয় বার ও নাম মুখে উচ্চারণ করবে না। আড়াল থেকে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাঁধানোর নকশা বানায়...

—তুমি ভুল করছ। শংকর অত কিছু ভেবে সেবার...

—একটা কথা নয়। ওটা একটা কুচক্কুরে বদমাইশ...

—ওরকম করলে তো কারুর কাছে টাকা নেওয়া যায় না। এ তো মহা ফ্যাচাং।

—কে তোমাকে জোগাড় করতে মাথার দিব্যি দিয়েছে? থাকো না যেমন আছ। খাও ঘুমোও ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে চরে বেড়াও। আমি তোমাকে বলেছি আমার ভাবনা শেয়ার করতে?

আদিত্যর মুখটা হঠাৎ প্যাংশু হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, —তুমি কি ডাক্তারের কাছে চাইবে ইন্দু?

ইন্দ্রাণী সেকেন্ডের জন্য থমকাল। তারপর দৃঢ় গলায় বলল, —না।

আদিত্য উঠে গেল ধীর পায়ে। এগোচ্ছে সিঁড়ির দিকে।

ইন্দ্রাণীকে সমস্ত সহজ রাস্তাগুলো দেখিয়ে দিয়ে আদিত্য কি বুঝিয়ে দিয়ে গেল, এর একটা পথেও তুমি যেতে পারবে না! বৃদ্ধ দারোয়ানটার মতো তালা ঝুলিয়ে দিল সর্বত্র! কেমন নির্বিকার নেমে যাচ্ছে। একা।

৩৮

ইন্দ্রাণী দুটো দিন টাকার চেষ্টা করল না। ঠুঁটো হয়ে বসে রইল। ঠিক ঠুঁটো হয়েও নয়, নিশ্বাস বন্ধ করে। মানুষ যেভাবে জলের তলায় নাক টিপে ডুবে বসে থাকে, অনেকটা ঠিক সেই রকম। জলতলের নীচে দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, মনে হয় সবই যেন এক শ্যাওলাটে আস্তরণে ঢাকা। ইন্দ্রাণীর পৃথিবীও যেন ঠিক তেমনই। সংসার স্কুল প্রেস সবই চোখের সামনে, অথচ যেন কিছুই নেই। শরীরে এক তীব্র দমচাপা ভাব ফুলিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রাণীর ফুসফুস, অসহ্য কষ্টে আঁকুপাকু করছে ইন্দ্রাণী। জল থেকে মাথা তোলারও উপায় নেই, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা এই বুঝি তার দিকে তাক করে থাকা অদৃশ্য আততায়ীর মেশিনগান গর্জে উঠল। এই বুঝি ঝাঁঝরা হয়ে গেল ইন্দ্রাণী!

তবু মনে ক্ষীণ আশা, অলৌকিক কিছুই কি ঘটে না পৃথিবীতে? এমন তো হতেই পারে বাপ্পার মতি ফিরল! বাপ্পা হাসিমুখে বলল, আই অ্যাম সরি মা! তোমাকে বিপদে ফেলে ওরকম বড়লোকি চাকরিতে যাওয়ার আমার দরকার নেই! টেনশান ঝেড়ে ফেলো, পড়াশুনো করে আমি এখানেই আমার ফিউচার তৈরি করব!

অসম্ভব কি কখনও সম্ভব হতে পারে না ইন্দ্রাণীর জীবনে?

বিয়ের পিঁড়িতে ওঠার দিনের কথা মনে পড়ে যায়। বিনিদ্র রাত কাটানো ইন্দ্রাণীকে ডাকা হল

কাকভোরে। দধিমঙ্গল। বেলা বাড়লে ছেলের বাড়ি থেকে হলুদ এসে পৌঁছল, সেই হলুদ গায়ে মেখে কলাতলায় স্নান করল ইন্দ্রাণী। বিকেল হওয়ার আগে থেকেই ইন্দ্রাণীকে ঘিরে বসেছে মামাতো পিসতুতো বোনেরা। সাজাচ্ছে। আঁকছে চন্দন, ঘষছে পাউডার, বাঁধছে বেণী। উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজের মাঝে বরের গাড়ি এসে পৌঁছল। সবই সেদিন বড় অলীক ঠেকেছিল ইন্দ্রাণীর। বড় অস্বচ্ছ, ঘোলাটে এক কাণ্ড ঘটছে যেন। যা দেখছে, যা শুনছে, যা বুঝছে, সবই যেন মায়া। প্রতি পলে মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বুঝি সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটবে। মাটি ফুঁড়ে, নয়তো আকাশ চিরে হাজির হবে শুভাশিস, এই বিশ্রী কল্পজগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে ইন্দ্রাণীকে। শুভদৃষ্টির সময়েও ইন্দ্রাণীর মনে হয়েছে, সামনের মানুষটা বোধহয় বদলে গেছে, চোখ খুললেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে দেখতে পাবে সে।

হল না। অসম্ভব সম্ভব হল না।

তনুময় নিরুদ্দেশ হওয়ার পরও তো এরকমই শ্বাস বন্ধ করে থেকেছে ইন্দ্রাণী। মানিকতলার বাড়িতে কড়া নাড়তে গিয়ে কতদিন ভেবেছে এই বুঝি তনুই এসে দরজা খুলল। শুভাশিস থানায় ছুটছে, লালবাজারে ছুটছে, আদিত্য ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তনুর বন্ধুদের বাড়ি যাচ্ছে, দিলুদা একবার কার মুখে উড়ো খবর পেয়ে ছুটল বর্ধমান, আর ইন্দ্রাণী প্রতিবারই চোখ বুজে ভাবছে, এবার নিশ্চয়ই খবর এল তনুর।

হল না। অসম্ভব সম্ভব হল না।

আরও কত কি তো আশা করেছে ইন্দ্রাণী, কিছু হয়নি। আদিত্যর বোধবুদ্ধি বাড়ল না। বাবার মাথার গণ্ডগোলটা ঠিক হল না। প্রেসের অবস্থা আর একটু ভাল হয়ে ইন্দ্রাণী সচ্ছলতার মুখ দেখল না কোনওদিন। ধোঁয়াটে ছায়া হয়েই শুভাশিস রয়ে গেল জীবনে। এমনকী তিতিরটাও মরল না পেটে।

তবুও যে কেন ইন্দ্রাণীর এখনও আশা করতে ইচ্ছে করে!

তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা হঠাৎই শুভাশিস এল। অনেক দিন পর। এসেই আগে আদিত্যর ঘরে ঢুকেছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে আদিত্যর সঙ্গে।

ইন্দ্রাণী কাঁটা হয়ে গেল। টাকার কথা শুভকে বলে ফেলবে না তো আদিত্য?

তিতির খাটে বসে পড়ছে। ইংরিজি। মেয়েকে ইংরিজিটা অল্পস্বল্প দেখিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী। আজও পড়াচ্ছিল। অভ্যাসের ঘোরে।

পড়ানো থামিয়ে ইন্দ্রাণী মেয়েকে বলল,—ডাক্তার আঙ্কলকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে আয় তো।

তিতির অন্তহীন আড়মোড়া ভাঙছে। কেন কে জানে!

ইন্দ্রাণী বকে উঠল,—কী রে, কানে কথা যাচ্ছে না?

গোমড়া মুখে তিতির বলল,—তুমি ও ঘরে গিয়ে কথা বলো না। আমি এখন এখানে পড়ব।

অগত্যা ইন্দ্রাণীই উঠেছে। পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দেখল নার্সিংহোম নিয়ে গল্প জুড়েছে শুভাশিস, নিবিষ্ট মনে শুনছে আদিত্য। প্রশ্নও করছে মাঝে মাঝে। নিজের নার্সিংহোমের কথা বলতে বলতে শুভাশিসের চোখে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে, লালচে আভা ফুটছে ফর্সা গালে।

কষ্ট ছাপিয়ে একটু যেন তৃপ্তি এল ইন্দ্রাণীর মনে। শুভ কি তা হলে শেষ পর্যন্ত সুখী হল? মনের দোদুল্যমানতা কেটে গেল চিরতরে? আসার নিয়মটা বজায় রাখতে এসেছে শুভ, হয়তো ভবিষ্যতেও আসবে, কিন্তু আর অযৌক্তিক আবদারে পীড়ন করবে না ইন্দ্রাণীকে!

তাই হোক। শুভ ভাল থাকুক। নিজের পৃথিবীতে।

ইন্দ্রাণী দরজা থেকেই প্রশ্ন করল,—তোমার আজ গড়িয়ার চেম্বার ছিল না?

চেয়ারে বসে আছে শুভাশিস। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ইন্দ্রাণীকে। একটু যেন বেশিক্ষণ ধরে। বলল,—ওখান থেকেই তো ফিরছিলাম। এখান দিয়ে যেতে যেতে মনে হল...। তোমার মুখচোখের এই অবস্থা কেন? শরীর খারাপ?

—না, আমি তো ঠিকই আছি। ইন্দ্রাণী আদিত্যর দিকে ফিরে বলল, —কি গো, আমার মুখ চোখ খারাপ লাগছে?

আদিত্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি তো ভালই আছ।

—বললেই হল! মুখটা অ্যানিমিক হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি! ঘুষঘুষে জ্বরটর হচ্ছে না তো?

—ডাক্তারদের চোখ শুধু অসুখ খুঁজে বেড়ায়। ইন্দ্রাণী জোর করে উচ্ছল হল,—চা খাবে?

—নাহ।

—বলো তো দুধ ছাড়া লিকার করে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে আমাদেরও খাওয়া হয়ে যাবে।

—তোমরা খেলে খাও। আমি নেই।

—সূর্য ডোবার পর অনেকে আজকাল চা খেতে চায় না। তুমি কি সেই ক্যাটিগরিতে নাম লেখালে নাকি?

—না রে বাবা। গড়িয়ার চেম্বারে এমন পানসে দু কাপ খেয়েছি...

—ও। তাই বলো। ইন্দ্রাণী বাপ্পার খাটে এসে বসল। হালকা গলায় বলল,—মধুমিতা কেমন কাজ করছে?

—ভালই। তবে ছটা বেজে গেলে আর এক মিনিটও থাকতে চায় না। আমরাও জোর করতে পারি না। সত্যি তো, বাড়িতে বাচ্চা রেখে আসে...

—অনর্থক দয়া দেখিয়ো না। তোমাদের অসুবিধে হলে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়ো।

—ও কিছু না, ঠিক আছে। ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার হিসেবের মাথা ভাল। ভাবছি ওকে আর রিসেপশানে বসাব না, পাকাপাকি অ্যাকাউন্টসে নিয়ে চলে আসব। একটা কম্পিউটার ট্রেনিং যদি নিয়ে নেয়, শি উইল বি আওয়ার অ্যাসেট।

আদিত্য নিজের বিছানায় বসে কথা শুনছিল দুজনের। আলটপকা প্রশ্ন করে বসল,—চাঁদু যায় নার্সিংহোমে?

শুভাশিস হাসল মুখ টিপে,—যায় কখনও সখনও।

—কখন যায়?

—এই ধরুন দুপুরের দিকে।

—থাকে কতক্ষণ?

—বেশিক্ষণ থাকে না।

পাকা গোয়েন্দার মতো জেরা চালাল আদিত্য,—বিকেলে যায় না? মেয়েটির যখন ছুটি হয়?

ধুরন্ধর ক্রিমিনালের মতো জবাব দিল শুভাশিস,—তা তো বলতে পারব না। আমি কি বিকেলে নার্সিংহোমে থাকি?

আদিত্য প্রশ্ন করার উদ্যম হারিয়ে ফেলল। শুভাশিসের বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট পড়ে আছে বিছানায়, একটা বার করে ধরাল। লাইটার জ্বালাচ্ছে। নেবাচ্ছে। জ্বালাচ্ছে। পুরোপুরি বাজতে দিচ্ছে না বাজনা।

কারণ ছাড়াই ঘর নিস্তব্ধ। ইন্দ্রাণীর অস্বস্তি হচ্ছিল। বাপ্পার কথাটা কি গোপন রাখা ঠিক হচ্ছে?

ইন্দ্রাণী একটা নিশ্বাস টেনে বলল,—তোমাকে একটা খবর দেওয়ার ছিল। বাপ্পার সেই জাহাজ কোম্পানি থেকে ডাক এসেছে।

শুভাশিস মুহূর্তে ফেটে পড়ল উচ্ছ্বাসে, —ইজ ইট? এ তো গ্র্যান্ড নিউজ। তোমরা এতক্ষণ আমাকে এ খবরটা দাওনি!

আদিত্য ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,—ভেবেছিলাম আপনাকে বলব। তারপর মনে হল থাক, ইন্দুই আপনাকে সারপ্রাইজটা দিক।

শুভাশিস চোখ ছোট করল,—তাই আপনার গিন্নির মুখ শুকনো হয়ে আছে ?

আদিত্য অপ্রতিভ মুখে হাসল,—ছেলে বলে কথা ! তার ওপর মাদার্স সান ।

শুভাশিস সশব্দে হেসে উঠল,—ওহে মুগ্ধ জননী, খুলে দাও, খুলে দাও বাহুডোর। তোমাদের মতো মায়েদের জন্য ছেলেদের কিছু হয় না। একবার ছেড়ে দিয়ে দেখো, বাপ্পা তোমার আইফেল টাওয়ার হয়ে ফিরে আসবে। নিজের ছেলেকেই তখন ঘাড় উঁচু করে দেখতে হবে।

ইন্দ্রাণী হাসল, কিন্তু উজ্জ্বল হল না। চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে। অস্ফুটে বলল,—আমি কি ছেলেকে আটকে রেখেছি !

—মুখ দেখে তো সেরকমই মনে হচ্ছে। আরে হাসো হাসো। শুভাশিস আদিত্যর দিকে ঘুরল,—বাপ্পা জয়েন করছে কবে ?

—সামনের মাসের দু তারিখ থেকে ট্রেনিং। ম্যাড্রাসে।

—ট্রেনিং পিরিয়ডে কত দেবে ?

আদিত্য থমকে বলল,—তা তো আমি ঠিক জানি না।

—কেন, চিঠিতে লেখা নেই ?

আদিত্য ইন্দ্রাণীর চোখে চোখ রাখল,—কিগো, আছে নাকি ?

ইন্দ্রাণী একটু রুক্ষভাবে বলল,—ট্রেনিং-এ আবার টাকা কিসের ! জাহাজে জয়েন করলে তবে তো স্যালারি।

—কত দিনের ট্রেনিং ?

—তিন মাস।

—ব্যস, মাত্র তিন মাস ! শুভাশিস উৎফুল্ল মুখে সিগারেট ধরাল। আপন মনে ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলল,—কই দেখি, চিঠিটা দেখি।

ইন্দ্রাণীর বুকটা ধক করে উঠল। যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। ছাই-রঙা মুখে কষ্ট করে হাসি ফোটাল,—চিঠিটা তো বাপ্পার কাছে।

—ও। সে ফিরবে কখন ? তাকে একবার কনগ্র্যাচুলেট করে যাওয়া উচিত।

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—দশটার আগে ফিরবে বলে মনে হয় না।

—সে বুঝি এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ছে ?

—হুঁ। বাপ্পার প্রসঙ্গ থেকে এবার সরতে চাইল ইন্দ্রাণী। ঝুপ করে বলে উঠল,—তুমি আজ একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার লক্ষ করেছ ?

শুভাশিস ভুরু কুঁচকোল।

—তুমি এতক্ষণ এসেছ, তিতির কিন্তু একবারও এ ঘরে উঠে এল না। কেন বলো তো ?

—দাদা চলে যাবে বলে সেও শয্যা নিয়েছে ?

—উঁহু, আদিত্যবাবুর মেয়ে আজকাল পড়াশুনোয় খুব সিরিয়াস হয়েছে। পরশু ইংলিশের ক্লাস টেস্ট, তাই নিয়ে সে এখন ভীষণ টেন্স।

—তা হলে তো তাকে একটু ডিসটার্ব করতেই হয়। শুভাশিস হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখছে। বলল—আমাকে আবার একবার নার্সিংহোম টাচ করে যেতে হবে।

শুভাশিস পাশের ঘরে এল। খুনসুটি করছে তিতিরের সঙ্গে। সরল ছেলেমানুষি খুনসুটি। তিতিরের টেক্সট বই ঘেঁটে একটা শেলির কবিতা বার করেছে শুভাশিস, চোখ বুজে আবৃত্তি করার চেষ্টা করছে, ভুলে গিয়ে আড়চোখে দেখে নিচ্ছে পাতা। অন্য দিন ডাক্তার আঙ্কলকে দেখলে ভারি খুশি হয় তিতির, আজ সে যেন কেমন উদাস উদাস। কবিতা পড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছে শুভাশিস, তিতির আলগাভাবে উত্তর দিচ্ছে।

খানিক পরে আদিত্যর সঙ্গে বেরিয়ে গেল শুভাশিস।

ইন্দ্রাণী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এর মধ্যে বাপ্পা এসে পড়লে না জানি কী বিকট পরিস্থিতি তৈরি হয়ে

যেত।

বাপ্পা অবশ্য এল সাড়ে দশটারও পরে। নীচে আদিত্য আর তিতিরকে খেতে দিচ্ছিল ইন্দ্রাণী, খাবার ঘরের টেবিলে এসে সোজা বসে পড়ল বাপ্পা।

ছেলেকে দেখে ইন্দ্রাণী কাঠ হয়ে গেছে। আদিত্যও। তিতির থমথমে চোখে দেখছে দাদাকে।

খাবার টেবিলে বাপ্পা গোগ্রাসে খায়। চোখের পাতা পড়ার আগে সাফ হয়ে যায় তার থালা। দেখলে মনে হয় যেন এক বুভুক্ষু রাক্ষস ঘাপটি মেরে আছে তার পেটে। আজ বাপ্পা কিছু খাচ্ছিল না। রুটি খুঁটছে। কপির তরকারির বাটিটা থালায় তুলেও নামিয়ে রাখল। স্যালাড করে রেখে গেছে সন্ধ্যার মা, এক টুকরো টোম্যাটো দাঁতে কাটল অনেকক্ষণ ধরে। সহসা ইন্দ্রাণীকে চমকে দিয়ে বলে উঠল,—মা, আই অ্যাম সরি।

তিতিরের খাওয়া থেমে গেছে। আদিত্যর চোখ বিস্ফারিত। ইন্দ্রাণী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এ কি অঘটন, না প্রহেলিকা?

বাপ্পা আবার বলল,—সরি মা, আমার সেদিন তোমাদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি।

ইন্দ্রাণী নাক টানল,—তোর রাগ বড় চণ্ডাল রে।

আদিত্য পরিবেশটা লঘু করতে চাইল। বলল,—ঠিক আমার মতো। তবে আমি বেশি রাগি না, তাই না রে তিতির?

বাপ্পা আদিত্যকে আমলই দিল না। বিড়বিড় করে বলল,—তোমরা আমার রাগটাই দেখলে মা, কষ্টটা দেখলে না। প্রত্যেকেরই তো কোনও একটা স্বপ্ন থাকে। এইম থাকে। সেটা থাকা কি খুব গর্হিত কাজ?

ইন্দ্রাণী নিচু গলায় বলল,—আমি কি তোকে তাই বলেছি?

—বলেছ তো বটেই। মাত্র তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকা পেলে ছেলে তার এইমটাকে ফুলফিল করার চান্স পায়, তুমি তাকে বলছ মন থেকে স্বপ্নটাকেই ঝেড়ে ফেলতে? ছেলের আশা অপূর্ণ রাখলে যদি তোমার সুখ হয়, তবে তাই হোক। কিন্তু মা, আমি যদি জীবনে কিছু করে উঠতে না পারি, আর যদি তখন তোমার দিকে আঙুল দেখাই, তুমি সহ্য করতে পারবে তো? পারবে তো নিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে?

কে কথা বলছে ইন্দ্রাণীর সামনে! এ কোন বাপ্পা! ইন্দ্রাণীর গলা বুজে এল। মেশিনগানের বদলে মুহুর্মুহু জলকামানের তোপ দাগে কেন ছেলে? ভেতর থেকে যে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রাণী!

বাপ্পা তাকাচ্ছে না কারুর দিকে। তার চোখ খাবার থালায় স্থির। আবার নিচু স্বরে বলল,—আমাকে তুমি এ কথা বোলো না মা, যে, তুমি টাকাটা জোগাড় করতে পারতে না! আমাদের ফ্যামিলির কাছাকাছি কি এমন কেউ নেই যার কাছে চাইলে তুমি টাকা পেতে না? আসল কথা বলো, তুমি আমাকে টাকাটা দিতে চাও না। মা যদি ছেলের ভাল না চায়, কী আর করা যাবে!

বাপ্পা খাবার ফেলে উঠে চলে গেল।

ইন্দ্রাণী অসাড়। বাপ্পার ইঙ্গিত পরিষ্কার। মিনতির সুরে চাপ দেওয়ার ছলনাটাও। কিন্তু উপায় নেই। নরম কথার সুতোয় তাকে বেঁধে ফেলেছে বাপ্পা। ক্রোধ উন্মত্ততার থেকেও এ সুতো যেন আরও বেশি নিষ্করুণ।

তিতির চলে গেছে। আদিত্য খাওয়া শেষ করে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। মাথা নিচু করে কি যেন ভাবল। এক সময়ে ইন্দ্রাণীকে একা রেখে চলে গেল সে'ও।

যন্ত্রমানবীর মতো বাসন-কোসন গুছোচ্ছে ইন্দ্রাণী। এখনও কন্দর্প ফেরেনি, বলে গেছে ফিরতে রাত হবে। দেওরের খাবার থালায় বাটিতে সাজিয়ে ভাল করে ঢাকা দিল ইন্দ্রাণী। তরকারি অনেকটাই রয়ে গেছে, ফ্রিজে তুলল। রান্নাঘরের নর্দমার মুখের শিকলগুলো ভাঙা, ছুঁচো ইঁদুর ঢোকে। সারা রাত ভীষণ উৎপাত করে, ঘরময় এঁটোকাঁটা ছড়ায়। ইট দিয়ে ভাল করে মুখটা বন্ধ করল।

জয়মোহন কাশছেন। কাশির দমক ক্ষণিকের জন্য থেমেই বেড়ে যাচ্ছে। শীতের শুরুতে শ্বশুরমশাই-এর কষ্টটা বড় বাড়ে, অনেক রাত অবধি বসে থাকেন বিছানায়।

রাতের জন্য জগ ভর্তি জল নিয়ে শ্বশুরমশাই-এর দরজায় এল ইন্দ্রাণী। রুটিন প্রশ্ন করল,—ওষুধ খেয়েছেন বাবা ?

ঘরে ম্লান রাতবাতি। যেন ঘর নয়, গুহা।

ইন্দ্রাণী ফের প্রশ্ন করল,—বাবা, ওষুধ খেয়েছেন তো ?

মশারির প্রকোষ্ঠ থেকে ঘড়ঘড়ে শব্দ হল,—খেয়েছি।

—একটু গরম জল করে দেব ? খাবেন ?

—মিনতি দিয়ে গেছে। ফ্লাস্কে আছে।

—বুকে তেল মালিশ করে দেব একটু ?

ছায়ামূর্তি শব্দহীন। অর্থাৎ মাখবেন।

রান্নাঘরে ফিরে নিজেদের শিশি থেকে বাটিতে খানিকটা তেল ঢালল ইন্দ্রাণী। এক কোয়া রসুন ফেলে গরম করল ভাল করে। জয়মোহনের ঘরে এসে মশারির একটা কোণা খুলে দিল। বসেছে খাটে।

—বালিশে হেলান দিয়ে একটু কাত হোন বাবা।

হাঁটু মাথা এক করে রাখা শরীর নড়েচড়ে উঠল।

গায়ের চাদরটা আলতো করে সরিয়ে নিল ইন্দ্রাণী। বালিশের স্তূপে পিঠ ঠেকালেন জয়মোহন।

কাশির দমক কমেছে। চাপড়ে চাপড়ে শ্বশুরমশাইয়ের বুকে গরম তেল লাগাল ইন্দ্রাণী। ঘষছে। পাঁজরা, না হারমোনিয়ামের রিড ! খাঁচা আর চামড়াই সার। শীর্ণ মানুষটা শীর্ণতর হচ্ছেন দিনদিন। বাবাও তো রোগাভোগা, তবু বাবা যেন ঠিক এমনটি নয়। মা অবশ্য ডানা মেলে ঘিরে থাকে বাবাকে। ভালবাসার উত্তাপ না পেয়েই কি এভাবে ক্ষয়ে গেলেন শ্বশুরমশাই ! রুনা কর্তব্য করে ঠিকই, ডাক্তার-ওষুধ-খাওয়াদাওয়া সবই যেমন যেমনটি হওয়া উচিত তেমন তেমনটিই হয়, কিন্তু রুনার সেবায় ভালবাসা নেই। কেন যে নেই ! শুকনো কর্তব্যে কি পরিতৃপ্ত হয় মানুষ ? যে মানুষটার আর জীবনে কোনও দিন হয়তো বাড়ির বাইরে পা দেওয়া হয়ে উঠবে না, জানলাটুকু দিয়ে যাকে আলো বাতাসের স্বাদ নিতে হয়, দোতলাতেও যাওয়া যার মানা, সেই মানুষটা যে ভালবাসার কাঙাল হবে এ কি কোনও আশ্চর্য কথা !

ইন্দ্রাণীর আঙুল কাঁপছিল। অজান্তেই বড়সড় শ্বাস পড়ল একটা। এখন তার যা ক্ষমতা আছে তাতে কায়ক্লেশে শ্বশুরমশাইকে নিজের সংসারে এনে রাখা যায়। কিন্তু আর কি তা সম্ভব ! এক ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে শ্বশুরমশাইকে ইন্দ্রাণীর সংসারে ফিরিয়ে দিতে রুনা সুদীপের কি মানে লাগবে না !

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ঝলসে উঠেছে ইন্দ্রাণীর মাথায়। উপায় তো আছে, অতি সহজ উপায়। এক ছাদের নীচে না থাকলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। শুধু জয়মোহন কেন, বাপ্পার সমস্যার সমাধানও হয়ে যায় অনায়াসে।

আশ্চর্য, কথাটা আগে মাথায় আসেনি কেন ?

জয়মোহন ঘুমোতেই ইন্দ্রাণী মশারির খুঁটটা টাঙিয়ে পা টিপে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি ভাঙছে। দুরু দুরু বুকে।

সুদীপের ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। টিভির মৃদু সুরও শোনা যায়।

পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী অনুচ্চ স্বরে ডাকল,—দীপু।

৩৯

সুদীপ একটা চিঠি লিখতে বসেছিল। বড় শালাকে। হঠাৎ ইন্দ্রাণীর ডাক শুনে তার কলম থেমে গেল।

বউদি ডাকছে কেন ! এত রাতে ! দাদা তো বাড়িতেই আছে আজ !

গলা খাঁকারি দিয়ে সুদীপ বলল, —কী হয়েছে বউদি ?

—তোমার সঙ্গে একটা জরুরি পরামর্শ ছিল।

উঠতে গিয়েও উঠল না সুদীপ। রুনার চাদরটা ভাল করে সাপটে নিল গায়ে। চেয়ার ঘুরিয়ে বাবু হয়ে বসে বলল, —বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে এসো।

পর্দা অল্প সরিয়ে ঢুকল ইন্দ্রাণী। একটু যেন কুণ্ঠিতভাবে।

ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড খাট। মশারির নীচে ঘুমোচ্ছে অ্যাটম। সেদিকে একবারটি দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণী অপ্রস্তুত মুখে বলল, —তোমাকে বোধহয় ডিসটার্ব করলাম।

—তেমন কিছু নয়। রুনার দাদাকে একটা চিঠি লিখছিলাম। অ্যাটমের ক্রিসমাসের ছুটি পড়ছে, যাই ক'দিন আসানসোল থেকে ঘুরে আসি।

ইন্দ্রাণী মোড়া টেনে নিয়ে বসল, —তাই অ্যাটম কাল খুব মামার বাড়ি মামার বাড়ি করছিল !

—হ্যাঁ, ওখানে গেলে ওর আর একটা লেজ বেরিয়ে যায়।

কথাটা বলে মনে মনে হাসল সুদীপ। লেজ কার না বেরোয় ! রুনার বড়দা আসানসোল থেকে মাইল সাতেক দূরে কোলিয়ারির ম্যানেজার, কোয়ার্টারটি তার বিশাল এক ব্রিটিশ প্যাটার্নের বাংলো, সামনে মনোরম ফুলবাগান, গেটে চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ি মজুত, রুনা তো সেখানে গেলে অ্যাটমের থেকেও বেশি শিশু হয়ে যায়। সারাদিন উড়ছে। এই বউদিকে নিয়ে ছুটল টাউনের দিকে,এই ভাইপো ভাইঝিদের সঙ্গে সদলবলে চলল কল্যাণেশ্বরী ম্যাসাঞ্জোর। রাজার হালে থাকা, সকাল থেকে রাত চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় চলছে, সন্ধে হলেই লনে গার্ডেন চেয়ার নিয়ে বসে ঢুকুঢুকু স্কচ, লেজ গজিয়ে সুদীপও কি মাত্রা ছাড়ায় না সেখানে ! গতবার তো একদিন আকণ্ঠ মাতাল হয়ে মাঝরাতে শ্যামাসঙ্গীত জুড়েছিল। পরদিনও সকালে অ্যাটমের গোল গোল চোখে কী বিস্ময় ! তুমি কাল কেন জেঠু হয়ে গিয়েছিলে বাবা !

সুদীপ একটা সিগারেট ধরাল। কোলের ওপর অ্যাশট্রে নিয়েছে। বলল, —কী বলতে চাইছিলে বলো।

ইন্দ্রাণীর গলা পেয়েই রুনা উঠে এসেছে এ ঘরে। পরনে কাফতান। গোলগাল শরীর তার খানিকটা বেঢপ লাগছে ঢলঢলে পোশাকে।

রুনার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী বলল, —তুমি বাপ্পার চিঠিটা দেখেছ ?

সুদীপ উদাসীন মুখে বলল, —না। কেউ দেখিয়েছ তোমরা ?

—বাপ্পা তোমাকে দেখায়নি ?

—তারই বা দেখা পাচ্ছি কোথায় ? সুদীপ অভিমানটা চেপে রেখে হাসার চেষ্টা করল, —যাক গে, বাড়িতে থাকার সূত্রে খবরটা জানা হয়ে গেছে। গুড নিউজ।

ইন্দ্রাণীর মুখে ছায়া পড়ল, —গুড কি ব্যাড জানি না। তবে একটা সমস্যা হয়েছে।

—কী সমস্যা ?

—ট্রেনিংয়ের খরচা জানো ? হাতির খোরাক। এক্ষুনি চল্লিশ হাজার টাকা লাগবে।

—এত টাকা !

—হুঁ। এত টাকা আমি পাই কোত্থেকে বলো তো দীপু ?

মগজের ভেতর কম্পিউটার চলতে শুরু করল সুদীপের। তার কাছে কি ধার চাইতে এসেছে বউদি ? ব্যাপারটা যেন ঠিক মিলছে না, যেন ঠিক মিলছে না ! বাজিয়েই দেখা যাক একটু।

সুদীপ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, —বাট ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ ইট। বাপ্পার একটা এত ভাল চান্স এসেছে...

—পারছি না যে ভাই।

রুনা ফস করে বলে উঠল, —সত্যি তো, তুমি এত টাকা কোত্থেকে পাবে ? হুট বলতে চল্লিশ হাজার ফেলে দেওয়া কি মুখের কথা ?

সুদীপ রুনার ওপর ভীষণ বিরক্ত হল। এরকম উপর পড়া হয়ে কথা বললে জন্মে কোনওদিন বউদির পেট থেকে কিছু বার করা যাবে ! হালকা ধমকের সুরে সুদীপ বলল, —ও কথা বললে হবে না। টাকার ব্যবস্থা যে করে হোক করতে হবে। বাপ্পা আমাদের বাড়ির বড় ছেলে, দরকার হলে আমরা সকলে মিলে জোগাড় করে ফেলব।

রুনা আবার বলে উঠল, —হ্যাঁ, চাঁদু তো এখন ভাল রোজগার করে। চাঁদু যতটা পারে দিক, বাকিটা নয় আমরা যেখান থেকে হোক ব্যবস্থা করে দেব।

সুদীপ চমৎকৃত হল। রুনা নিজে থেকে টাকা দেওয়ার কথা বলছে ! মন থেকে বলছে, নাকি কথার কথা ! হেসে ফেলে বলল, —ধুর, চাঁদু দেবে কোত্থেকে ?

—কেন, চাঁদু সিনেমায় অত বড় রোল পেল, সেখান থেকে মোটা টাকা পায়নি ?

—কত আর পেয়েছে ! দশ-পনেরো হাজার।

—ইঁহহ। মিনিমাম পঁচিশ হাজার পেয়েছে। দিদি, তোমাকে চাঁদু বলেনি কত টাকা পেয়েছে ?

ইন্দ্রাণীর দু হাত কোলের ওপর জড়ো। অস্পষ্ট স্বরে বলল, —না। আমি জিজ্ঞেস করিনি।

—সে যাই হোক, তুমি মুখ ফুটে চাইলে চাঁদু না করতে পারবে না। সেও তো বাপ্পার ছোটকাকা, তারও তো দায়িত্ব আছে, কী বলো ?

ইন্দ্রাণীর মুখ লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। শীতল স্বরে বলল, —চাঁদুর কথা উঠছে কেন ? আমি কি তোমাদের কাছেও টাকা চেয়েছি ?

সুদীপ দুর্যোগের আভাস পেল। ইন্দ্রাণীর এই স্বর তার পরিচিত। তিতিরকে প্রথম স্কুলে ভর্তি করার সময়ে থোক কিছু টাকা লেগেছিল। হাজার মতন। দাদা তখন সর্বস্ব ঢেলে ক্যাটারিংয়ের ব্যবসা শুরু করেছে, হাত পুরো ফাঁকা। টাকাটা যেচে দিতে চেয়েছিল সুদীপ, বউদি নেয়নি, নিজের হাতের একটা চুড়ি বেচে ব্যবস্থা করেছিল টাকার। সেদিনও ঠিক এই স্বর ছিল বউদির। তারপরেও কতবার কতভাবে টাকার প্রয়োজন হয়েছে, প্রেসের দেনা, দাদার চিকিৎসা, বাপ্পার টিউটর, প্রতিবারই বউদি নিজের গয়না বিক্রি করেছে, তবু কখনও হাত পাতেনি কারুর কাছে। সব জেনেও বউদিকে কেন খোঁচা দিচ্ছে রুনা ? বউদি এখন প্রায় রিক্ত বুঝেই কি তার অহঙ্কারে ঘা দিতে চায় ?

সুদীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, —রুনা বোধহয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছে না বউদি। ও বলতে চায় আমি, চাঁদু আমরা দুজনেই তো বাপ্পার কাকা, আমাদেরও একটা দায়িত্ব...

—আমি সে কথা জানি বলেই তো তোমার কাছে এসেছি। ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, —টাকা ছাড়াও তো অন্যভাবে সাহায্য করতে পারো তুমি।

—কীরকম ?

ইন্দ্রাণী সোজা হল, —তোমরা তো বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে চেয়েছিলে। প্রোমোটার ফ্ল্যাট বানালে সে তো সকলকেই ফ্ল্যাট ছাড়া কিছু কিছু করে ক্যাশ টাকা দেবে। দেবে না ?

ঘরে যেন টাইম বোমা পড়ল। সুদীপ রুনাকে দেখছে, রুনা সুদীপকে।

ইন্দ্রাণী দুজনের দিকেই তাকাল, —এত অবাক হচ্ছ কেন ? এটাই তো এখন টাকা পাওয়ার সব থেকে সহজ উপায়।

রুনা উত্তেজিত মুখে বলল, —তুমি চাইলেই বাড়ি ভাঙা হবে ?

—আমি কেন চাইব ? বাবা চাইবেন।

—বাবা ! অসম্ভব।

—সেটা আমার ওপর ছেড়ে দে।

—তুমি বাবাকে রাজি করাতে পারবে ?

ইন্দ্রাণী আর রুনার কথার উত্তর দিল না। নীরস গলায় সুদীপকে প্রশ্ন করল, —তোমার প্রোমোটার যেন কত করে দেবে বলছিল ?

কথা বলতে গিয়ে সুদীপের জিভ আটকে যাচ্ছিল, —আমার প্রোমোটার এখন কোথায় ? সে তো কবেই হাত ধুয়ে বসে আছে।

—তার সঙ্গে আর একবার নতুন করে কথা বলতে পারো না ?

সুদীপ বলতে পারত নিও বিল্ডার্সের সঙ্গে সে অনেকবার যোগাযোগ করেছে। ঠিক সুদীপ করেনি, নিও বিল্ডার্সের মাখন দস্তিদার নিজেই বহুবার এসেছে সুদীপের অফিসে। প্রত্যেকবারই কাঁচুমাচু মুখে লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে সুদীপ। শেষ দিন তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুদীপকে যা খুশি বলেছে লোকটা। ঘোড়েল, মেরুদণ্ডহীন, জিলিপি, কী নয় ! দস্তিদারের বদ্ধমূল ধারণা তাকে খুড়োর কল দেখিয়ে অযথা ছুটিয়েছে সুদীপ।

এ সব কথা রুনাকে সুদীপ বলেনি কোনওদিন। তাতা চাটুতে কে আর ডালডা ছিটোয় !

বউদিকেই বা এ কথা বলে আজ কী লাভ ? বউদি কি কখনও সুদীপের কথা ভেবেছে ?

একটা রাগ ফুঁসে উঠল সুদীপের ভেতরে। গোমড়া মুখে বলল, —আজ তুমি কত ইজিলি কথাটা বলছ, অথচ তুমিই একদিন আমাকে সব থেকে বেশি অপোজ করেছিলে।

—আমি ! অপোজ করেছিলাম ! কবে ?

—মুখে করনি, আচরণে করেছিলে। দাদা এসে শালা শুয়োরের বাচ্চা বলে গেল, তুমি চুপ করে রইলে। তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, উল্টে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিলে।

—তুমি অকারণে রাগ করছ দীপু। তুমিই তো কই একবারও বাড়ি ভাঙা নিয়ে আমাকে একটা কথাও জানাওনি।

রুনা পাশ থেকে বলল, —অথচ তুমি কিন্তু সব কথাই জানতে দিদি। চাঁদু তোমায় আগেই রিপোর্ট দিয়েছিল। দেয়নি ?

—আমাকে কেউই কোনও কথা খোলসা করে বলেনি ভাই। তোমরাও বলোনি, চাঁদুও না।

—তুমি তো এসে সোজাসুজি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতে।

ইন্দ্রাণী চুপ করে গেল।

বউদিকে দেখে মায়া হল সুদীপের। কতটা অসহায় অবস্থায় পড়লে বউদি এত রাতে ছুটে আসে এ ঘরে, তার সঙ্গে, রুনার সঙ্গে তুচ্ছ বাদবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, অনুমান করার চেষ্টা করছিল সুদীপ। এককালে এই বউদির সঙ্গেই কত সুন্দর সম্পর্ক ছিল তার। বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে ঘরের কোণে সিঁটিয়ে বসে থাকত বউদি, অকারণে ভয় পেত, হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠত, মা'র অতি সামান্য কথাতেও একা একা কাঁদত বসে, একমাত্র সুদীপকে দেখলেই বউদির চোখমুখ আলোর ছটায় ভরে যেত। বাপের বাড়ির অতি তুচ্ছ ঘটনাও গল্প করত তার কাছে, কলেজের কথা বলত, স্কুলের কথা বলত। বিয়ের পর দাদা যেদিন প্রথম মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল, বউদি আতঙ্কিত হয়ে ছুটে এসেছিল তার কাছেই। কবে থেকে যে বউদির সঙ্গে বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে গেল ? রুনা এ বাড়িতে আসার পর থেকেই কি ? অথবা বাপ্পা তিতির জন্মানোর পর বউদিই বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেল ? নাকি দাদাকে সহ্য করতে করতে নিজেকে খোলসে গুটিয়ে নিল বউদি ?

অথবা এর কোনওটাই নয়। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে যখনই একটা পৃথক পরিবার গড়ে ওঠে, তখনই এক বিচ্ছেদের বীজও বোনা হয়ে যায়। আমি তুমি আর আমাদের সন্তান—এর বাইরে গোটা পৃথিবীর সঙ্গেই এক সূক্ষ্ম বিচ্ছেদ। সময় তাকে লালন করে, স্বার্থ তাকে পরিপুষ্ট করে, চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢোকা অবিশ্বাস নোনা ধরিয়ে দেয় অন্যান্য সম্পর্কে। পরিবার শব্দটার অর্থই বোধহয় এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা। ভাই বোনের সঙ্গে ভাই বোনের। দেওরের সঙ্গে বউদির। ননদের সঙ্গে ভাজের।

সুদীপই বা এর ব্যত্যয় হবে কেন ? অথবা ইন্দ্রাণী ?

বিমর্ষ মুখে সুদীপ বলল, —বাড়ি ভাঙার কথা তোমাকে নিজে কেন বলতে পারিনি শুনবে ? আমার প্রোমোটার তখন তোমার প্রেসটা অ্যাবলিশনের জন্য কোনও কমপেনসেশান দিতে রাজি ছিল না। আর এ কথাটা আমার পক্ষে তোমাকে বলা যে কী কঠিন ! তুমি হয়তো ভেবে বসতে আমিই প্ল্যান করে...। প্রেসটা তৈরির সময়ে দাদার সঙ্গে তো আমার কম ঝঞ্ঝাট হয়নি !

—পুরনো কথা থাক না দীপু।

—থাক। সুদীপ অ্যাশট্রে টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। রাত বাড়ছে। বাড়ছে ঠাণ্ডাও। বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা আছে, বন্ধ করতে গিয়ে থামল সুদীপ। নীচে টিকটিক আওয়াজ হচ্ছে। কন্দর্পর স্কুটার ফিরল। শব্দটা থামা পর্যন্ত সুদীপ দাঁড়িয়ে রইল দরজায়, তারপর পাল্লা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

রুনা বাথরুমে গেছে। মশারির ভেতর অঘোরে ঘুমোচ্ছে অ্যাটম। ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরল। মোড়ায় বসে আছে ইন্দ্রাণী। আড়ষ্ট আঙুলে আনমনে আঁচলের খুঁট পাকাচ্ছে। সন্তর্পণে দেশলাইয়ে কাঠি ঠুকে সিগারেট জ্বালাল সুদীপ। পাশের ঘরে একা একা বেজে যাচ্ছে এক বোকা বাক্স। ও ঘরের ওই নির্জন শব্দ এ ঘরের নীরবতাকে আরও গাঢ় করে তুলছে প্রতি মুহূর্তে।

সুদীপ নিচু গলায় বলল, —একটা কথা বলব বউদি ? রাগ করবে না ?

—বলো।

—বাপ্পার চল্লিশ হাজার টাকা আমি তোমাকে কাল পরশুর মধ্যে তুলে দিচ্ছি। তুমি লোন হিসেবে নাও।

—অত টাকা আমি তোমার কাছ থেকে নিতে পারি না দীপু।

—কেন পারো না ? ইফ ইউ সো ডিজায়ার, ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টও দিয়ো।

ইন্দ্রাণী কি যেন ভাবছে।

সুদীপ তাড়াহুড়ো করে বলল, —তুমি এগ্রি করলেই আমি টাকাটা তুলে ফেলব। হারি আপ। ডিসিশান নাও।

সুদীপ যা ভয় পাচ্ছিল, তাই বলল ইন্দ্রাণী, —তুমি কথাটা রুনার কাছে গোপন রাখতে চাইছ ?

—সব কথা রুনার জানার কি দরকার ?

ইন্দ্রাণী ম্লান হাসল, —তুমি তা হলে তোমার প্রোমোটারকে অ্যাপ্রোচ করতে রাজি নও ?

—বিলিভ মি, দস্তিদার এখন আর আমাদের বাড়িতে ইন্টারেস্টেড নয়। সেলিমপুরে একটা বড় কাজ করছে, এখন বললেও ও ইমেডিয়েটলি আমাদের কাজে হাত দেবে না। প্রোমোটারদের তো জানই। যে কাজে ইমিডিয়েট গেইন নেই, সেখানে ওরা কিছুতেই ক্যাশ লাগায় না।

—আমরা অন্য কোনও প্রোমোটারের কাছে যেতে পারি।

—পারো। তবে পনেরো দিনের মধ্যে কেউ তোমাকে টাকা দেবে না। মাঝে প্রচুর ফরমালিটিজ আছে। বাবার সইসাবুদ, কোর্ট, এগ্রিমেন্ট...। বাথরুমের দরজায় শব্দ হল। রুনা ফিরছে। সুদীপ কথা অসমাপ্ত রেখে ফিসফিস করে উঠল, —তাড়াতাড়ি বলো কী করব ? তুলব টাকা ?

—তুমি তো রইলেই। অতি মৃদু স্বরে কথাটা বলেই ইন্দ্রাণী গলা তুলেছে, —আমি কি একবার চাঁদুর সঙ্গে কথা বলে দেখব ?

—তোমার বড় জেদ বউদি। সুদীপ দাঁতে দাঁত ঘষল, —দেখো চাঁদুর সঙ্গে কথা বলে। শুনেছি আমার দস্তিদার যদি বোয়াল মাছ হয়, মুস্তাফি কুমির। সেও তোমাকে চট বলতে টাকা দেবে না।

—দেখা যাক।

ইন্দ্রাণী উঠে পড়ল। অবসন্ন পায়ে দরজার দিকে যাচ্ছে। রুনার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে যাচ্ছিল, অন্যমনস্ক মুখে সরে দাঁড়াল।

রুনা বলল, —তিতির এখনও জেগে আছে যে দিদি ?

—পরশু পরীক্ষা। পড়ছে বোধ হয়।

—ও।

ইন্দ্রাণী চলে যাওয়ার পরও পর্দার ওপারে চোখ রেখেছে রুনা। ঝুঁকে দেখছে। ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকে যেতে দরজা বন্ধ করল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে শীতের ক্রিম ঘষছে মুখে। বাঁ হাতে চিরুনি তুলল। আয়নায় সুদীপকে দেখতে দেখতে বলল, —টাকা অফার করা হয়ে গেল ?

সুদীপ নড়ে গেল। অস্ফুটে বলল, —মানে ?

—আমি যখন ছিলাম না তখন তুমি বলোনি, বউদি তোমাকে আমি পুরো টাকাটাই তুলে দিচ্ছি ?

—আমি কেন বলতে যাব ? তুমিই তো টাকা দেওয়ার কথা প্রথমে তুললে ?

—কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ ভাই ? আমি বলে তোমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বাথরুমে চলে গেলাম ! রুনা মিটিমিটি হাসছে, —তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে গেল তো ? মটমট তেজ দেখিয়ে মুখের ওপর না বলে দিল ?

চটপট সিগারেট নিবিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়ল সুদীপ। এই মেয়েমানুষটার সামনে আর এক মুহূর্তও থাকা নিরাপদ নয়। নিজেকে এত অরক্ষিত মনে হয় মাঝে মাঝে ! শালা ভগবান যে কি দিয়ে মেয়েমানুষদের গড়েছিল ? সজারুর কাঁটার মতো চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও যে আত্মরক্ষায় ব্যবহার করে ! কখনও যে আক্রমণে !

রুনা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে থামল হঠাৎ। ভুরু কুঁচকে বলল, —টিভিটা বন্ধ করেও শুলে না ?

সুদীপ রাগ রাগ গলায় উত্তর দিল, —ওটা তুমি দেখছিলে, তোমার বন্ধ করার কথা।

—টিভি দেখা থেকে উঠে এসেছি বলে খুব রাগ, না ?

সুদীপ পায়ের কাছে জড়ো করে রাখা কম্বল গায়ে টানল।

রুনা গুটগুট করে টিভি বন্ধ করে এল। চিরুনি থেকে চুল ছাড়াচ্ছে। থুতু ছিটিয়ে গুছিটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলল। হাসল ফিক করে, —তোমাদের শুভাশিসদা টাকাটা দিচ্ছে না কেন ?

সুদীপ বলতে যাচ্ছিল, বউদির ইচ্ছে নয় তাই। বলল অন্য কথা, —শুভাশিসদা এখন কোত্থেকে দেবে ? নার্সিংহোম করতে কত খরচা গেল...

—ডাক্তারদের আবার টাকার অভাব ! হাসিও না তো। লাল নীল হলুদ কালো কত রকম যে ইনকাম ডাক্তারদের !

—যেমন তোমার বড়দার। সুদীপ পাশ ফিরে শুল, —কয়লা ঘেঁটে ঘেঁটে টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলল।

দুপদাপ বিছানায় এল রুনা,—কী বললে বড়দার নামে ?

—কিছু না। বলছিলাম কালো টাকা আজকাল সকলেরই থাকে। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার থেকে শুরু করে মাছিমারা কেরানির পর্যন্ত। ওদিকে চোখ দিতে নেই।

—চলো আসানসোলে, দাদাকে বলে দেব।

—বোলো। তোমার দাদা তোমার মতো হিউমারলেস নয়। সে জোক বুঝে হাসবে। সুদীপ কথা নিয়ে যেতে চাইল অন্য দিকে, —শোনো, চিঠি তো লিখছিই। তুমি কাল আর একবার ফোনে চেষ্টা কোরো। আমার মনে হয় তোমার দাদার লাইনটা ওখানে খারাপ আছে।

—করব'খন। বুক অবধি কম্বল টেনে ছেলেকে একবার জরিপ করল রুনা। আলো নিবিয়ে আবার ফিরল পূর্ব সংলাপে, —এই জানো, আমার মনে হয় শুভাশিসদার সঙ্গে তোমার বউদির ঝামেলা চলছে।

সুদীপ কৌতূহলের ফাঁদে পড়ল না। হাই তুলে চিত হয়ে শুল।

—আজকাল তোমাদের ডাক্তারদাদার আসা খুব কমে গেছে।

—হুঁ।

—আজ এসেছিল। বেশিক্ষণ বসল না, আধ ঘণ্টাটাক থেকেই চলে গেল।

—হুঁ।

—বয়স বাড়ছে তো, এবার বোধহয় মোহ কাটছে।

—হুঁ।

—কি হুঁ হুঁ করছ ? কেন ঝগড়া হতে পারে একটু আন্দাজ করো না।

—ঘুমোও তো। শুধু পি এন পি সি। তোমাদের ক্লাবে ছ' ঘণ্টা ধরে করেও সুখ হয় না, বিছানায় শুয়েও...

—এএহ সীতাভক্ত হনুমান ! রুনা পাশ ফিরে সুদীপের গাল টিপে দিল, —আমি একটা ভাল পরামর্শ দেব, শুনবে ?

—পরামর্শ, না হুকুম ?

—কথা কেটো না, যা বলি শোনো। রুনা গলা জড়িয়ে ধরল সুদীপের, —একবার টাকা অফার করেছ, ভাল করেছ। কিন্তু নিজে থেকে যখন বাড়ি ভাঙার কথাটা তুলেছে, আর বেশি ঘাঁটিও না। বাবার সঙ্গে ওকে কথা বলতে দাও। বাপ্পার ধাক্কায় যদি ফ্ল্যাটটা উঠে যায়, ক্ষতি কি ? মেজ ছেলে প্রোমোটার লাগিয়ে বাড়ি ভাঙাচ্ছে এ কথাও কেউ বলতে পারবে না।

সুদীপের মাথাতেও কথাটা এসেছে একবার। বউদি কি না পারে ? যেরকম শক্ত হাতে মরা প্রেসটাকে দাঁড় করাল ! বাবার সঙ্গে কি কথা হয়ে গেছে বউদির ? অসম্ভব নয়। বউদি হয়তো আটঘাট বেঁধেই নেমেছে। সুদীপকে হয়তো ভেঙে বলল না, বাজিয়ে দেখে চলে গেল। চাঁদুও হয়তো আছে বউদির সঙ্গে।

সুদীপের হঠাৎ খুব শীত করছিল। সন্দেহের বাষ্পটা কেমন চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ল চিন্তায়। ঘন আঁধারে ক্রমশ যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে সুদীপ। গুটিয়ে যাচ্ছে। গুটোতে গুটোতে একটা গিরগিটি হয়ে গেল। সেখান থেকে কেন্নো। আরও ছোট হচ্ছে। এক্কেবারে ছোট্ট মাছি হয়ে গেল।

ভয়ার্ত সুদীপ আশ্রয় খুঁজছে রুনার শরীরে। আপন দেহে রুনা ধারণ করে নিল মাছি সুদীপকে। আহ, শান্তি শান্তি।

৪০

এসপ্ল্যানেডের মোড় পেরিয়ে ট্যাক্সি বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পড়তে গায়ে শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল ইন্দ্রাণী। বাঁ দিকে একটা সিনেমা হল, বিশাল উঁচু হোর্ডিংয়ে নৃত্যরতা নায়িকার ছবি। নায়িকার পরনে ঠিক ততটুকুই পোশাক, যতটুকু থাকলে সিনেমা হলের প্রথম সারি থেকে সিটির বন্যা বয়ে যায়। কাঁচুলির আবরণ ফুঁড়ে বুক দুটো তার বড্ড উঁচু হয়ে আছে, মাঝের খাঁজটিও অতিশয় প্রকট।

ইন্দ্রাণী চোখ সরিয়ে নিল, —কিগো, আর কদ্দূর ?

কন্দর্প সিটে হেলান দিয়ে বসেছিল। সিধে হল, —এই তো এসে গেছি। বলতে বলতেই ট্যাক্সিঅলার দিকে ঝুঁকেছে, —এই, বাঁ দিকে রাখুন, বাঁ দিকে রাখুন।

ইন্দ্রাণী ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল, কন্দর্প চটপট ভাড়া মিটিয়ে দিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে চুল ঠিক করল আলগোছে। চারপাশের লোকজনকে দেখছে আড়চোখে, বুঝতে চাইছে তাকে কেউ দেখছে কি না। পাশের চারতলা বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, —এসো, এই বাড়ি।

ইস, কী ছিরি বাড়িটার ! পুরনো তো বটেই, যেন ক্লাইভের আমলে তৈরি। বাইরের চেহারাটাও ভারি খোলতাই ! জরাজীর্ণ কাঠামোতে বোধহয় বছর দু'তিন আগে রঙ পড়েছিল, তাতেই আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে বাড়িটাকে। প্রাচীনত্বের মর্যাদাটুকুও নেই। যেখানে সেখানে নানান মাপের সাইনবোর্ড ঝুলছে, দেওয়াল চিরে বেরিয়ে আসা অশ্বত্থের শিকড়ের পাশে একটা এসি মেশিন দেখা যাচ্ছে। নীচে হরেক কিসিমের দোকান। চা মিষ্টি জুতো জেরক্স ঘড়ি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। এখানেই মুস্তাফির অধিষ্ঠান !

বাড়ির সামনের দিকে কোনও সিঁড়ি নেই। বাঁ প্রান্তে প্রকাণ্ড এক লোহার ফটক। খানিকটা ভেতরে গিয়ে ডান দিকে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। ক্ষয়াটে উঁচু উঁচু ধাপ, নড়বড়ে রেলিঙ। প্রথম পৌষের শীত বিকেল ফুরনোর আগেই আস্তানা গেড়েছে সেখানে।

স্যাঁতসেতে আলোছায়া ভেঙে উঠছিল ইন্দ্রাণী। কন্দর্পর পিছন পিছন। দোতলায় সম্ভবত কোনও চীনা পরিবারের বাস, এক পাল মঙ্গোলয়েড দেবশিশু হাঁস-মুরগির মতো কিচমিচ করছে লম্বাটে বারান্দায়। মুখময় ছেঁড়াখোঁড়া তারজাল আঁকা এক চীনা বৃদ্ধা ভাবলেশহীন মুখে উল বুনছেন। যান্ত্রিকভাবে আঙুল নাড়তে নাড়তে চোখ জোড়া উঠল একবার, আবার নেমে গেছে উলকাঁটায়।

ইন্দ্রাণীর গা ছমছম করে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়েছে। অস্ফুটে বলল, —চাঁদু, কাজটা হবে তো?

কন্দর্প তেতলা ওঠার সিঁড়ি ধরেছিল। ঘুরে তাকাল, —দেখা যাক।

—মিস্টার মুস্তাফি তোমাকে ঠিক কী বলেছিল?

—কতবার তো বললাম!

—বিরক্ত হচ্ছ?

—এত টেনশান করছ কেন বলো তো? এসো না, কথা বলে দেখোই না।

—তুমি সব ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বলেছিলে তো?

—আমার ওপর এটুকুও বিশ্বাস নেই? কন্দর্প হেসে ফেলল, —যদি সিচুয়েশানটার গ্রেভনেস নাই বোঝাতে পারতাম, তা হলে কি পরদিন বিকেলেই তোমাকে আসতে বলত?

তা অবশ্য ঠিক। তবু যে কেন ইন্দ্রাণীর মন থেকে সংশয় যায় না? দিন এগিয়ে আসছে, এখনও বাপ্পাকে তেমন করে কোনও আশ্বাস দিতে পারল না। বাপ্পাটা একদম গুম মেরে গেছে, বাড়ির থেকে আর বেরোচ্ছেই না। দিনরাত মুখ কালো করে শুয়ে আছে ঘরে। কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। কাল সন্ধেবেলা টিভিতে ফুটবল খেলা দেখাচ্ছিল, বাপ্পার প্রিয় প্রোগ্রাম। তিতির ডাকতে গেল দাদাকে, সটান উঠে ছাদে চলে গেল বাপ্পা। নামল সেই রাত সাড়ে দশটায়। খাবার সময়ে। কী যে মনে মনে ভাঁজছে ছেলেটা!

চারতলায় অশোক মুস্তাফির অফিস। বাইরে পিতলের প্লেটে পর পর কোম্পানির নাম। সব কটাতেই মুস্তাফি আছে। এ কে মুস্তাফি অ্যান্ড কোম্পানি। মুস্তাফি কনস্ট্রাকশান। অশোক মুস্তাফি ফিলমস। মুস্তাফি অ্যান্ড মুস্তাফি। ...এ যে বহু রূপে ঈশ্বর!

চমকের পর চমক। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ইন্দ্রাণীর চোখ বড় হয়ে গেল। জীর্ণ বহিরঙ্গের অন্দরে এত জৌলুস! নরম ঠাণ্ডা বিশাল এক হল, দেওয়াল জুড়ে কাঠের প্যানেলিং, পায়ের নীচে কোমল কার্পেটে টলমল করে ওঠে শরীর। কাঠের পার্টিশান করা কয়েকটি ঘরও আছে, ভারি সুন্দর। খোলা হলে জনাকয়েক কর্মচারী ঝকঝকে চেয়ার টেবিলে বসে রয়েছে, এক কোণে দুজন মহিলা ঝড় তুলছে টাইপ মেশিনে।

কাচঘেরা রিসেপশন কাউন্টারের ফোকর দিয়ে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এল কন্দর্প। ইন্দ্রাণীকে বলল, —বোসো। অশোকদা নেই, একটু অপেক্ষা করতে হবে।

ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল। চাপা স্বরে বলল, —সাড়ে চারটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না?

—সো হোয়াট? একটু দেরি হতে পারে না? অশোকদা রেলের অফিসে গেছে।

রিসেপশানের উল্টো দিকে ছোট্ট ড্রয়িংরুমের মতো করে সোফা সেন্টার টেবিল সাজানো। ফুলদানিতে ফুলও আছে। দু-তিন রঙের অ্যাসটর।

ইন্দ্রাণী লম্বা সোফাটায় বসল। পাশে কন্দর্প। এক দিকের সোফায় এক মোটাসোটা ধুতি-শার্ট পরা লোক বসে আছে, অন্য দিকের মাঝারি সোফায় দুটি সুবেশা তরুণী। দুজনেই মোটামুটি রূপসী। নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কথা বলছে তারা। হঠাৎ কন্দর্পর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়েটি আড়ষ্টভাবে হাসল সামান্য।

ইন্দ্রাণী চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, —কে গো ? তোমার চেনা ?

কন্দর্প একটু যেন এড়িয়ে গেল, —হ্যাঁ। ওই আর কি।

ইন্দ্রাণীর সন্দেহ হচ্ছিল কেমন। মুস্তাফির সম্পর্কে সুদীপ পরশু যেন কি একটা মন্তব্য করেছিল ! একটু জেরা করার ঢংয়েই প্রশ্ন করল, —এরা কি তোমার ফিলম লাইনের ?

—স্টুডিও পাড়ায় ঘোরে। দেখেছি তখন।

—এখানে এসে বসে আছে কেন ?

কন্দর্পের ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল, —ফিলমে রোলের জন্য অশোকদাকে ধরতে এসেছে বোধহয়।

কন্দর্পর হাসিটা ইন্দ্রাণীর ভাল লাগল না। অশোক মুস্তাফির সঙ্গে এভাবে দেখা করতে এসে কি ভুল করল সে ? দুৎ, চাঁদুই তো সঙ্গে রয়েছে, ভয় কিসের !

কন্দর্প সিগারেট ধরিয়েছে। ইন্দ্রাণী জোরে নিশ্বাস নিল একটা। হালকা সুগন্ধ স্প্রে করা আছে বাতাসে, বুক ভরে যায়। কোথা থেকে যেন একরাশ অবসাদ ছুটে আসছে চোখে, আপনা-আপনি বুজে আসে আঁখিপল্লব।

আচমকা এক গমগমে স্বরে ঘোর ছিঁড়ে গেল, —একি কন্দর্প, তুমি এখানে বসে আছ ?

কন্দর্প ঝটিতি সিগারেট নিবিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, —আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

বেঁটেখাটো থলথলে চেহারার লোকটা কাছে এগিয়ে এসেছে। ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল, —সরি বউদি, আপনাকে আমি ওয়েট করালাম। বলেই হালকা চাপড় দিল কন্দর্পর কাঁধে, —তোমার এখনও কোনও কাণ্ডজ্ঞান হল না কন্দর্প ? বউদিকে নিয়ে হাটের মাঝে বসে আছ ? চেম্বারে বসানো উচিত ছিল।

ইন্দ্রাণী শালটা খোঁপার ওপর একটু তুলে দিল। ঘোমটার মতো করে। আলতো হেসে বলল, —না না ঠিক আছে। এখানেই ঠিক ছিলাম।

—আসুন আসুন। প্লিজ কাম।

স্যুট-প্যান্ট-টাই পরা লোকটা হেঁটে নিজের চেম্বারে ঢুকছে। দুলে দুলে। গোটা অফিস জুড়ে তটস্থ ভাব। বসে থাকা মেয়ে দুটোকে ভ্রূক্ষেপও করল না লোকটা। কামরায় ঢুকে অপেক্ষা করল ইন্দ্রাণীদের জন্য। ইন্দ্রাণী বসার পরে বসল রিভলভিং চেয়ারে।

—কী খাবেন ? কোল্ড ড্রিঙ্কস, না চা কফি ?

—ধন্যবাদ। এখন কিছু খাব না।

—তা বললে কি হয় ? আপনি হচ্ছেন কন্দর্পর বউদি, মানে আমারও বউদি। প্রথম দিন আপনাকে তো আমি শুকনো মুখে ফিরতে দেব না।

—চা বলুন তা হলে।

অশোক মুস্তাফি বেল বাজিয়ে চায়ের অর্ডার দিল। ঝাপুর ঝুপুর পা নাচাচ্ছে। এপারে বসেও স্পন্দন টের পাওয়া যায়। হঠাৎ নাচন থামিয়ে বলল, —এবার বলুন বউদি, হাউ ক্যান আই সার্ভ ইউ ?

কন্দর্প বলে উঠল, —ওই আপনার সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছিল...

—তুমি থামো। আমাকে বউদির সঙ্গে কথা বলতে দাও।

ইন্দ্রাণী লোকটাকে ঠিক পড়তে পারছিল না। মনে যেন কোথায় একটা বিরূপতার মেঘ জমেছিল, কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। দু-এক সেকেন্ড সময় নিয়ে বলল, —আপনি তো আমাদের বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে ইন্টারেস্টেড ছিলেন, যে-কোনও কারণে হোক ব্যাপারটা মেটিরিয়ালাইজ করছিল না...

মুস্তাফি স্থির চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখছিল। কথার মাঝে বাধা দিয়ে বলল, —যে কোনও কারণে নয় বউদি, ইউ মাস্ট বি স্পেসিফিক। আপনার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরমশাই সেন্টিমেন্টাল গ্রাউন্ডে ব্যাপারটাতে

রাজি হচ্ছিলেন না।

ইন্দ্রাণী সম্মোহিতের মতো ঘাড় নাড়ল, —হ্যাঁ, অনেকটাই তাই।

—কোয়াইট ন্যাচারাল। মুস্তাফি মাথা দোলাচ্ছে, —আমার পিতৃদেবের সঙ্গে আপনার শ্বশুরমশাইয়ের খুব মিল আছে। আমাদের হাওড়ার সাবেকি বাড়ি ঝুরঝুর হয়ে পড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই আমাকে দাঁত ফোটাতে দিচ্ছেন না। অথচ জমি যা আছে, ওখানে আমি একটা প্যালেস বানাতে পারি।

ইন্দ্রাণী মৃদুস্বরে বলল, —বুড়ো মানুষের স্মৃতিই তো সম্পদ।

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল মুস্তাফি, —সম্পদ নয়, বলুন চুয়িংগাম। কচর কচর চিবিয়েই যাচ্ছে। চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল, তবুও চিবোচ্ছে। স্বাদ পায় না, তবুও চিবোচ্ছে।

ইন্দ্রাণী জোর করে প্রতিবাদ করল না। যে যেভাবে জীবনকে দেখে। তা ছাড়া মুস্তাফির কথাটা তো পুরোপুরি ভুলও নয়। সত্যিই কি স্মৃতি হাতড়ে খুব সুখে আছেন শ্বশুরমশাই? স্মৃতি যে সতত সুখের নয়, এ কথাই বা ইন্দ্রাণীর থেকে বেশি আর কে জানে!

চা এসেছে। সঙ্গে এক প্লেট বিস্কুট। মুস্তাফি উঠে দাঁড়িয়ে চা এগিয়ে দিল ইন্দ্রাণীকে, —আসুন বউদি, আগে চা-টা খেয়ে নিন।

চায়ে চুমুক দিয়ে মুস্তাফির কামরায় আলগা চোখ বোলাল ইন্দ্রাণী। কয়েকটা চেয়ার টেবিল ছাড়া ঘরটা অদ্ভুত রকমের আসবাবহীন। আলমারি সেলফ র‍্যাক কিচ্ছুটি নেই। প্লাস্টিক পেন্ট করা দেওয়ালে একটা মাত্র ছবি। শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মা কালী। মুস্তাফির পাশে, পিছনে, আরও দুটো কাঠের দরজা। ভেতরে ঘর আছে নাকি?

চা শেষ করে ধীরেসুস্থে ড্রয়ার থেকে পানমশলার পাউচ বার করল মুস্তাফি। ইন্দ্রাণীর দিকে বাড়াল, —চলবে নাকি বউদি?

ইন্দ্রাণী খানিকটা পানমশলা ঢেলে নিল হাতে। কন্দর্পকেও দিতে গেল, কন্দর্প নিল না।

হঠাৎ ঘরের বাইরে তুমুল হট্টগোল। কে একজন সরু গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কয়েকজন লোক মিলে বোধহয় থামাতে চাইছে তাকে। পানমশলা মুখে দিতে গিয়েও থমকে গেছে মুস্তাফি, ফিলমের ফ্রিজ শটের মতো। মুখের বিনীতভাব পলকে নিশ্চিহ্ন। গরগরে গলায় কন্দর্পকে বলল, —হারামজাদাটা এসে গেছে।

বলতে বলতে এক ছোকরা কর্মচারী ঢুকেছে ঘরে, —স্যার, ছোটবাবু।

মুস্তাফি খিঁচিয়ে উঠল, —তা আমি কী করব? নাচব? তোমরা অতগুলো লোক মিলে সামলাতে পারছ না?

—পারছি না স্যার।

—ভরবিকেলেই! উফ কী জ্বালা। কন্দর্প যাও একটু দেখো তো।

কন্দর্প দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু যেন স্তিমিত হচ্ছে স্বর।

কন্দর্প আবার ঢুকেছে ঘরে।

মুস্তাফি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, —আজ কত চায় শুয়োরের বাচ্চা?

কন্দর্প হাঁপাচ্ছে। কোনওক্রমে বলল, —হাজার।

মানিব্যাগ থেকে একরাশ টাকা বার করে কন্দর্পর দিকে বাড়িয়ে দিল মুস্তাফি। কন্দর্প চলে গেল। মুস্তাফি আবার চেয়ারে বসেছে। ঘুরে ঘুরে মা কালীর ছবিটাকে দেখছে।

বাইরের শব্দ মিলিয়ে গেল।

গোটা ঘটনাটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না ইন্দ্রাণী। এত দ্রুত ঘটে গেল, যেন ফিলমের সিন। সিনটা কমেডি না থ্রিলার সেটাও ঠিক মগজে ঢুকছিল না। ফিলমের লোকজনের অফিসে সবই কি সিনেমার কায়দায় হয়!

আবার কীভাবে কথা শুরু করা যায়, ইন্দ্রাণী ভেবে পাচ্ছিল না। মুস্তাফি নিজেই বলল, —হ্যাঁ,

তারপর যা বলছিলাম আমরা। বুড়ো মানুষ, স্মৃতি, চুয়িংগাম... অল ভ্যালুলেস। জীবন ওই ব্রহ্মময়ীতে বিলীন হয়ে যায়।

ইন্দ্রাণী ঢোঁক গিলে বলল, —কন্দর্প কোথায় গেল ?

—আসছে। আমার সুপুত্তুরটিকে বিদেয় করেই আসবে।

ইন্দ্রাণীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, —যে চেঁচাচ্ছিল, সে আপনার ছেলে ?

—ইয়েস। ওয়ান অ্যান্ড ওনলি সান। মুস্তাফি চেয়ারে হেলান দিল, —একমাত্র আপনার ওই দেওরটিকেই যা মানে। কন্দর্পই ওর পালসটা বোঝে।

—কত বয়স ছেলের ?

—এই চব্বিশ হল। দিনদুপুরে টঙ হয়ে ঘুরছে। লেখাপড়া তো গোল্লায় গেছে, কাজকর্মেও আসতে চায় না। প্রচুর ইয়ারদোস্ত জুটেছে...। এই জুলুম করে টাকা নিয়ে গেল, এক্ষুনি বারে বসে ফুঁকে দেবে।

জেনেও আপনি টাকাটা দিলেন ? কথাটা বলতে গিয়েও কণ্ঠ রোধ হল ইন্দ্রাণীর। সন্তানের চাপের মুখে অসহায় মা হয়ে যে আজ ছুটে এসেছে মুস্তাফির অফিসে, তার মুখে ওই প্রশ্ন সাজে না। টাকা পেলে বাপ্পা ভবিষ্যতে কী হবে বাপ্পাই জানে। তবে না পেলে সে যে ওইরকম হয়ে যাবে না, তা কি জোর দিয়ে বলা যায় ! চোখের সামনে আদর্শ হয়ে বাবা তো আছেই।

মুস্তাফি সোজা হয়ে বসেছে, —যাক গে, আমরা পয়েন্টে ফিরি আসুন।

ইন্দ্রাণী সচকিত হয়ে বলল, —হ্যাঁ, বলুন।

—কীসের বেসিসে আপনি সিওর হচ্ছেন আপনার শ্বশুরমশাই বাড়ি ভাঙার অনুমতি দেবেন ?

—আমি তাঁকে বোঝাব।

মুস্তাফি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। পেপারওয়েট লাট্টুর মতো ঘোরাচ্ছে টেবিলে। সহসা একটা আঙুলে চেপে থামাল। টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল, —আপনার ইমেডিয়েটলি চল্লিশ হাজার দরকার, তাই তো ?

ইন্দ্রাণীর শরীরটা একটু শক্ত হয়ে গেল।

—টাকাটা ক্যাশে দিলে আপনার কোনও প্রবলেম হবে ?

ইন্দ্রাণীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কান বুজে যাচ্ছে। ঘাড় নাড়ল কি না নিজেই বুঝতে পারল না।

মুস্তাফি চেয়ার ছেড়ে ঝট করে পিছনের দরজা খুলে ঢুকে গেছে ভেতরে। আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের অনেকটাই দেখা যায়। রীতিমতো সুসজ্জিত প্রমোদকক্ষ। পিছনের দেওয়াল জুড়ে এক বিশাল আয়না, সামনে ডিভান, সোফা। আয়নাতে ও কীসের প্রতিবিম্ব ? বিছানার ?

সমস্ত স্নায়ু অসাড় হয়ে গেল ইন্দ্রাণীর। চাঁদু এখনও আসছে না কেন ? এ কোথায় চাঁদু নিয়ে এল তাকে ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুস্তাফি ফিরেছে। ইন্দ্রাণীর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল। বাঁ হাতে পাঁচটা একশো টাকার বাণ্ডিল।

ইন্দ্রাণী ঘামছিল।

ড্রয়ার থেকে বড় খাম বার করে টাকাটা ভরল মুস্তাফি। টেবিলে রেখে বলল, —পঞ্চাশ হাজার দিয়ে রাখলাম বউদি। যদি আর দরকার হয়, বলবেন।

ইন্দ্রাণীর গলা কেঁপে গেল, —আমাকে কোথায় সই করতে হবে ?

—কীসের সই ?

—টাকাটা নেব...একটা ডকুমেন্ট...

মুস্তাফি হাসল। হাসিটা ঠিক হাসি নয়, গাম্ভীর্যের এক ছদ্মবেশ। বলল, —বউদি, আমরা খুব সাধুসন্ন্যাসী নই, চুরিডাকাতি করেই খাই। কিন্তু আমাদের লাখ লাখ টাকার ব্যবসাও অনেক সময়ে

শুধু মুখের কথাতেই চলে। ও সব কালির আঁচড়ের থেকেও আমি বেশি বিশ্বাস করি মানুষটাকে।

—আমি যদি পরে অস্বীকার করি ?

—করবেন। যদি করতে পারেন, তার জন্যও আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজি রইল।

—যদি আমি শ্বশুরমশাইকে রাজি না করাতে পারি ?

—বুঝব একটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে। বিজনেসে এরকম কতই তো হয়।

ইন্দ্রাণীর ভীষণ গরম লাগছিল। যেন সামনে পড়ে থাকা পেটমোটা খামটা জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসছে বুকে।

মুস্তাফি আকর্ণ হাসল, —আপনি মিছিমিছি ঘাবড়াচ্ছেন। কন্দর্পকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন ও আমাকে আপনাদের বাড়ির কন্ট্র্যাক্টটা না পাইয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ওকে কিন্তু আমি কাজ থেকে সরাইনি। কারণটা কি জানেন ? আমি জানতাম কন্দর্প চিট নয়। মুস্তাফি টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকল সামান্য। ভুরু কুঁচকে বলল, —আশা করি আপনিও তা নন।

কথাটা সূঁচের মতো ফুটল ইন্দ্রাণীকে। মুহূর্তের জন্য মনে হল টাকাটা না নিয়েই উঠে যাবে, দরকার নেই ঝামেলার। পারল না। এত দূর এগিয়ে এসে পিছিয়েই বা যায় কী করে ? বড় মুখ করে কাল রাতেই দীপুকে বলেছে চাঁদুর প্রোমোটারের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, এখন কী বলবে ? দীপুকে আর টাকার কথা বলা যায় না। শেষ রাস্তা আছে। শুভর কাছে যাওয়া। ওটা রাস্তা নয়, খাদ। নিজের কাছে নিজেই অতলে নেমে যাবে ইন্দ্রাণী। সূক্ষ্ম একটা অহংবোধ চাড়া দিল মাথায়। পারবে না শ্বশুরমশাইকে রাজি করাতে ?

কন্দর্প ফিরে এল। শীতের সন্ধেতেও তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মুস্তাফি প্রশ্ন করল, —আমার লাডলাকে কোথায় ছেড়ে এলে ?

—পার্ক স্ট্রিটে গেল।

—সঙ্গে সাগরেদরা ছিল ?

—ছিল দুজন। তরুণ আর জাকির। আপনাদের কথাবার্তা হয়ে গেল ?

—কথাবার্তার আবার কী আছে ? তোমার বউদি মানে আমারও ফ্যামিলি মেম্বার। টাকাটা তুলে রাখো, অনর্থক বউদির টেনশান বাড়িও না।

কন্দর্প খামের দিকে হাত বাড়িয়েও থেমে গেল, —কী রকম এগ্রিমেন্ট হবে সেটা আপনি বউদিকে ক্লিয়ার করে বলেছেন ?

—ওহো, সেটাই তো বলা হয়নি। অ্যারাউন্ড সাড়ে সাতশো-আটশো স্কোয়্যার ফিটের এক একটা ফ্ল্যাট হবে। মোট ষোলোখানা। গ্রাউন্ড ফাঁকা থাকবে, পার্কিং স্পেসও হতে পারে, এক আধটা দোকানঘরও থাকতে পারে। দ্যাট উইল বি মাই ডিসক্রিশান। আউট অফ সিক্সটিন আমি আপনাদের চারটে ফ্ল্যাট দেব। আপনার শ্বশুরমশাই চারটে ফ্ল্যাটই নিজের নামে রাখতে পারেন। অথবা আপনাদেরও দিতে পারেন। সেটা তাঁর ইচ্ছে। মোট চার লাখ ক্যাশ দেব। এটাও আপনার শ্বশুরমশাইয়েরই নামে। আর এই পঞ্চাশ হাজার আপনার চালু প্রেসটার জন্য কমপেনসেশান। আমি কি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি বউদি ?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল ইন্দ্রাণী। রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল প্রেসটা, থাকবে না আর। ওই আদ্যিকালের মেশিন তুলে নিয়ে কাছেপিঠে কোথাও কি বসানো যাবে ? অনেক টাকা অ্যাডভান্স সেলামি নিয়ে নেবে, পড়তায় পোষাবে না। কী আর করা ! গড়ে তুলতেই তো কষ্ট, ভেঙে দিতে কতটাই বা সময় !

মুস্তাফি বলল, —আমার কাছে এগ্রিমেন্টের কিছু প্রোফর্মা আছে। দেখবেন ?

ইন্দ্রাণী দু দিকে ঘাড় নাড়ল, —আপনি কাগজ রেডি করে পাঠিয়ে দেবেন।

—আমার কিন্তু তিনটে দিন সময় লাগবে বউদি। লইয়ারকে দিয়ে ড্রাফট করানো, টাইপ করা... ভাবছি একবার আর্কিটেক্ট-এর সঙ্গেও কথা বলে নেব, অ্যাকিউরেট মাপ কতটা কি হবে...

—আপনি সময় নিয়েই করুন।

মুস্তাফির ঘর থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রাণী দেখল মেয়ে দুটো এখনও বসে আছে। অফিস প্রায় ফাঁকা, একজন-দুজন কর্মচারী আছে শুধু।

শীতের রাত্রি আসছে পায়ে পায়ে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের জনঅরণ্যেও তার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। আকাশ মেঘহীন। হিমরেণু নামছে শহরে।

ট্যাক্সিতে চোখ বন্ধ করে বসেছিল ইন্দ্রাণী। বোজা চোখেই প্রশ্ন করল, —মুস্তাফি লোকটা কেমন চাঁদু ?

কন্দর্প চমকে তাকাল, —কেন, কিছু বলেছে তোমাকে ?

—নাআ।

—তা হলে ?

—এমনি। জিজ্ঞেস করছি। বলো না লোকটা কেমন ?

—অতি ধুরন্ধর। জাত ব্যবসায়ী।

—শুধু ধুরন্ধর ?

কন্দর্প সোয়েটারের নীচে বুশশার্টের গলার বোতামটা আটকাল, —তুমি তো এতক্ষণ কথা বললে, তোমার কী মনে হল ?

—হেঁয়ালি কোরো না। ইন্দ্রাণী ঈষৎ রুক্ষ, —যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

কন্দর্প সিগারেট বার করে ঠোঁটে রেখেছে, ধরায়নি। সিগারেটটা মুখ থেকে নামাল, —প্রচুর ভাইস আছে। নারীদোষ নেই তা বলব না, তবে মেয়েদের ব্যাপারে কিছু সেলফ রেস্ট্রিকশান ইম্পোজ করে রেখেছে। মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করে না, তবে আপনা-আপনি হাতে এসে গেলে...

—হুঁ। আর ?

—প্রয়োজনে ঠাণ্ডা মাথায় খুনখারাপি করতে পারে। দেদার ঘুষ ছড়ায় চতুর্দিকে। ভাল পলিটিকাল কানেকশান আছে। পুলিশের ওপর মহলের সঙ্গে যথেষ্ট র‍্যাপো। ভক্তির ভড়ং আছে খুব।

—হুঁ। আর ?

—পিপে পিপে মাল টানতে পারে, বেহেড হয় না। পারসোনাল লাইফে হ্যাপি নয়। কারণটাও বুঝতে পারছ ? ছেলে। বউয়েরও নানান রোগব্যাধি আছে...। বাই দা বাই, একটা গুণও আছে। লোকটা মিন নয়।

এত শুনেও লোকটাকে যেন ঠিক চেনা যাচ্ছে না। আরও কি যেন আছে লোকটার মধ্যে ! কী সেটা !

কন্দর্প আলগোছে প্রশ্ন করল, —তুমি কি আজই বাবার সঙ্গে কথা বলবে ?

—না না আজ নয়। আগে এগ্রিমেন্টটা হাতে আসুক। ইন্দ্রাণী চোখ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটের বড়দিনের আলো ধাঁধিয়ে দিয়েছে নয়ন। উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—তুমিও আজ বাড়িতে কাউকে কিছু বোলো না।

—এত লুকোছাপা করার কি আছে ? আজ বাদে কাল সবাই তো জানবেই।

ইন্দ্রাণী কিছু বলল না। তার চোখের সামনে এখন এক বিশাল প্রান্তর। অন্ধকার। কুয়াশায় ঢাকা।

৪১

কলকাতায় রুটিনমাফিক ঠাণ্ডা পড়ে গেল। গাছগাছালি কমে যাওয়া এ শহরে শীত আজকাল এক বিরল ঋতু। ক্রিসমাসের মুখে মুখে সাইবেরিয়ান হাঁসেদের ডানায় চেপে দু দণ্ড জিরোয় এই কংক্রিটের জঙ্গলে, তারপর নতুন বছর পড়তে না পড়তেই কখন চুপিসাড়ে উধাও হয়ে যায়। থার্মোমিটারের পারা নামুক ছাই না নামুক, হিমের গন্ধ পেয়েই শহরের বাবুবিবিরা মহা খুশি। স্বল্পকালীন শৈত্য তারিয়ে তারিয়ে চাখতে ট্রাঙ্ক স্যুটকেস আলমারি খুলে তারা গরম জামাকাপড়ের পাহাড় বার করে ফেলে, বছরভর ডায়িং ক্লিনিংএ রেখে দেওয়া শাল পুলওভার কার্ডিগানরাও সূর্যের আলোর মুখ দেখতে পায়। রঙিন শীতপোশাকের বাহারে শহরটাই এখন এক মরসুমি ফুলের বাগান।

আলমারি ঘেঁটে নীল-সাদা পুলওভারটা বার করল আদিত্য। সোয়েটারটা জয়শ্রীর বোনা, বছর তিনেক আগে। এত জমকালো সোয়েটার আর পরার অভ্যেস নেই আদিত্যর। তবু বোন ভালবেসে বুনে দিয়েছে, উলটাও খুব নরম, গাঁ-গঞ্জের দিকেও যাবে আজ, এই সোয়েটারটাই পরা ভাল। গরম টুপি নেবে একটা? থাক গে। নীচের তাক থেকে ফোলিও ব্যাগটা বার করল আদিত্য। ত্রিমূর্তি এন্টারপ্রাইজের কয়েকটা কাগজ ভরল ব্যাগে, বিল চালান গুছোল, ভাল দেখে ডটপেনও নিল একটা। চুল আঁচড়াল। কবজিতে ঘড়ি বাঁধল। দেরি হয়ে গেছে। সাড়ে আটটা বাজে, নটার সময়ে এসপ্ল্যানেডের বাস গুমটিতে অপেক্ষা করবে রঘুবীর। এত তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সারল আজ, তবু যে কী করে দেরি হয়ে যায়!

ঝটিতি আলমারি বন্ধ করেও আবার খুলল আদিত্য। পার্সে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আছে, আরও কিছু টাকা সঙ্গে রাখা দরকার। রঘুবীর নামেই পার্টনার, কোথাও একটি পয়সাও উপুড়হস্ত করবে না। ইন্দ্রাণী যেখানে টাকা রেখে যায় সেখানটা একবার হাতড়াল আদিত্য। নেই। কী হবে তাহলে?

কপালে ভাঁজ ফেলে আদিত্য পাশের ঘরে এল। তিতির স্কুলের ব্যাগ গোছাচ্ছে, এবার স্নানে যাবে।

আদিত্য বলল,—তোর মা'র আলমারির চাবিটা কোথায় রে?

—তোশকের নীচে। কেন?

—শ খানেক টাকা নেব।

—হঠাৎ?

মেয়ে এ প্রশ্ন করতেই পারে। নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইন্দ্রাণীর আলমারিতে আদিত্য হাত দেয় না। মেয়ে জানে।

আদিত্য সামান্য হেসে বলল,— দরকার আছে। বিজনেস। মা এলে বলে দিস।

আলমারির লকারে হাত ঢোকাতে গিয়ে থমকে গেল আদিত্য। মোটা একটা খামে ভর্তি হয়ে আছে খুপরিটা। আদিত্য খামটা বার করে পাশের তাকে রাখল। লকার থেকে দুটো পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে পুরল মানিব্যাগে। খাম আবার স্বস্থানে রাখতে গিয়ে কি ভেবে ফাঁক করল মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেছে শিরদাঁড়ায়।

টাকা! বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা!

কোত্থেকে এল!

মেয়েকে আড়াল করে আদিত্য আরেকটু ফাঁক করল খামটা। একশো টাকার নোটের পাঁচখানা আনকোরা বাণ্ডিল। মানে পঞ্চাশ হাজার! এত টাকা তো কস্মিনকালেও প্রেসের হতে পারে না!

কয়েক মুহূর্তের জন্য আদিত্যর স্নায়ু অসাড়। টাকা তবে জোগাড় হয়ে গেল! তাই বাপ্পার এত খুশি খুশি মেজাজ! সকালে বাথরুমে হেঁড়ে গলায় গান গাইছিল! ইন্দ্রাণী তো কই তাকে কিছু

বলেনি ! আদিত্যও অবশ্য জিজ্ঞাসা করেনি। একবার ধার করার কথা বলতে গিয়ে মুখঝামটা খেয়েছে, আর কেন যেচে প্রশ্ন করতে যাবে ? অকর্মণ্য মানুষের কি আত্মসম্মানও থাকতে নেই ?

দুর্বল হাতে খাম লকারে ঢুকিয়ে আলমারি বন্ধ করল আদিত্য। চাবির গোছা বিছানার তলায় রাখতে রাখতে প্রশ্ন করে ফেলল,— তিতির, তোর ডাক্তার আঙ্কল এর মধ্যে কবে এসেছিল রে ?

তিতির এক পলক ভাবল,— পরশু। না না, তার আগের দিন।

—যেদিন আমি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলাম ?

—হ্যাঁ, ওই দিনই তো।

—অনেকক্ষণ ছিল ?

—তা ছিল। ঘন্টাখানেক মতন। কেন বলো তো ?

—এমনিই !

—এমনিই ? তিতির যেন বেশ অবাক।

আদিত্য ফ্যাকাশে হাসল,— তোর ডাক্তার আঙ্কল আজকাল তেমন আসতে পারে না তো, তাই.......

তিতির কি বিশ্বাস করল তার কৈফিয়ত ? মেয়ের কাছে ছোট হয়ে গেল না তো আদিত্য ?

সিঁড়ি ভেঙে নামার সময়ে আদিত্য বুকে একটা ভার অনুভব করছিল। ভার, না শূন্যতা ? তার হৃদয়ে কোনও বিদ্বেষ নেই, ঈর্ষাও জাগে না, তবু যে কেন এক কুশবনে ছেয়ে যায় বুক ? ধারালো কুশের ডগা ছুঁয়ে যায় পাঁজর, রক্ত ঝরে টপটপ। শীতল রক্ত। টাকাটা যদি শুভাশিসের কাছ থেকেই নেবে তবে সেদিন কেন ভনিতা করল ইন্দ্রাণী ? চক্ষুলজ্জা ! কিন্তু তার কী প্রয়োজন ছিল ? নিজেকে অযোগ্য জেনে কোনওদিনই তো সে ইন্দ্রাণী আর শুভাশিসের মাঝখানে একটা কঞ্চির বেড়া হয়েও দাঁড়াতে চায়নি, তাও তাকে নিয়ে এই খেলা কেন ? এ কি শুধুই অবজ্ঞা ? নাকি পরিহাস ?

বড়ঘরের বাইরের সরু বারান্দায় এক ফালি রোদ টেরচাভাবে গড়িয়ে আছে। রোদটুকুতে পিঠ ঠেকিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন জয়মোহন। খসখসে চামড়ায় ভিটামিন পুরছেন। আদিত্যকে দেখে ন্যুব্জ দেহ সোজা হল,— কোথায় চললে ?

আদিত্য অন্যমনস্ক মুখে দাঁড়াল,— কাজ আছে।

—কী কাজ ?

আদিত্য সবিস্তারে বলতে পারত উদয়নারায়ণপুরের কালভার্ট সারাই-এর অর্ডারটা তাদের হাতে এসে গেছে, আজ রঘুবীর আর সে সরেজমিন করতে যাচ্ছে জায়গা। যে ঠিকাদার তাদের হয়ে কাজ তুলবে তার সঙ্গেও মোলাকাত হবে আজ। নতুন লাইনে আজ থেকেই গড়গড় করে যাত্রা শুরু তার। এরপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটাবে, চিমনিঅলা পিচ গলানোর গাড়ি কিনবে, হয়তো এক সময়ে আস্ত একটা রোডরোলারও....

কথাই বলতে ইচ্ছে করছে না আদিত্যর। মৃদু স্বরে শুধু বলল,— আছে একটা কাজ। নতুন বিজনেসের।

—হুঁহ, বিজনেস ! মানে ওই ষণ্ডাটার ল্যাঙবোট হয়ে ঘোরা !

—ধরো তাই।

—অনেক তো হল। এবার অন্তত সংসারের কোনও একটা উপকারে লাগো।

আদিত্য উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, জয়মোহন গলা ওঠালেন, —শোনো। যেখানে চরতে যাচ্ছ যাও, তবে তার ফাঁকে বউমার একটা উপকার করে দাও।

নিজের অজান্তে ভুরু কুঁচকে গেল আদিত্যর।

চেয়ারের পাশে রাখা গোটা কয়েক ছোট ছোট খাম বাড়িয়ে দিলেন জয়মোহন। বললেন,— প্রেসের কয়েকটা বিল আছে। পার্টিদের দিয়ে আসতে হবে।

—তোমার কাছে প্রেসের বিল !

—দুর্লভ দিয়ে গেল। কাল রাত্তিরে মেসে খবর এসেছে দেশে ছোট জামাইয়ের কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ঘাটাল হাসপাতালে আছে। ফিরতে ওর দু-তিন দিন সময় লাগবে। তেমন কিছু হলে হয়তো আরও কয়েক দিন।

—তা আমি কী করব ? তোমার বউমার বিল বউমাকেই দিয়ো।

—সে তো দেবই। কিন্তু সব জায়গায় কেন বউমাকেই ছুটতে হবে ? কেন তুমি যাবে না ?

—বললাম তো আমার কাজ আছে। আদিত্য তেড়ে উঠল।

—পাজির পাঝাড়া। কাজ দেখাচ্ছিস তুই নিকম্মার গোঁসাই ?

—অ্যাই চোপ। খবরদার। আদিত্যও হঠাৎ গর্জে উঠেছে।

—কীসের চোপ রে হারামজাদা ? গোবরগণেশটি হয়ে বউয়ের অন্ন ধ্বংস করছিস, আর কাজ করতে বললেই মেজাজ ?

—তাতে তোমার কী অ্যাঁ ? আদিত্যর অবাধ্য স্নায়ু পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারাল এবার। হাউমাউ করে তেড়ে গেল বাবার দিকে,— অত যদি বউমার জন্য দরদ, যাও না ঘুরে ঘুরে পার্টিদের দিয়ে এসো।

—ক্ষমতা থাকলে তাই যেতাম রে হারামজাদা। তোর মতো একটা কেন্নোর বেহদ্দকে সাধতাম না।

—মুরোদই যখন নেই, তখন অত কথা কিসের ! বাবার একদম কাছে মুখ নিয়ে গেল আদিত্য। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,— মরতে পারো না তুমি ? মরলেও তো আমার হাড় জুড়োয়।

ভাঙাচোরা মুখটা চুপসে গেল মুহূর্তে। কসাইয়ের চোখে বাবার সেই মুখ কয়েক সেকেন্ড দেখল আদিত্য। তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

পৌষের আকাশ ঝকঝকে। নির্মেঘ। নীলাভ কড়াই থেকে সূর্য সোনার গুড়ো ছড়িয়ে দিচ্ছে বাতাসে। স্বর্ণরেণু মেখে শীতল বাতাসও এখন ভারি মনোরম। বাসরাস্তা, স্টেশনের দিকে হাসিখুশি মুখে ছুটছে অফিসযাত্রীরা। কৃষ্ণচূড়ার ডালে কোত্থেকে এক টুনটুনি উড়ে এসে বসল। অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়া আকাশে বড় নিশ্চিন্তে উড়ছে দুটো চিল। পৃথিবীতে কোথাও এতটুকু ক্লেদ নেই আজ।

শুধু আদিত্যরই দিনটা বড় পাঁশুটে হয়ে গেল।

এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে মেজাজটা আরও বিগড়ে গেল আদিত্যর। বাস গুমটিতে বিজবিজে ভিড়। প্রতিটি টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ সর্পিল লাইন। উৎকট কোলাহল আর পেচ্ছাপের গন্ধে নরক হয়ে আছে ঘুপচি মতন জায়গাটা।

রঘুবীর কোত্থেকে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে দৌড়ে এসেছে,— এত্ত দেরি করলেন ? সাড়ে নটার বাস যে বেরিয়ে গেল !

আদিত্য নাকে রুমাল চাপল,— নেক্সট বাস কটায় ?

—সেই বারোটায়। পৌঁছতে পৌঁছতে দুটো বেজে যাবে।

আদিত্য নির্বিকার,— তাহলে আর কি। ফিরে যাই।

শেষ টান দিয়ে জ্বলন্ত বিড়ি টোকা মেরে উড়িয়ে দিল রঘুবীর,— তা বললে কি হয় ? তিলক সাউ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে......। চলুন, হাওড়া থেকে মিনিবাস ধরব।

হাওড়ার শহরতলি পার হয়ে ছুটছে মিনিবাস। ছুটছে কম, থামছেই বেশি। বোঁচকা বোঁচকা মাল উঠছে। আদিত্যর সিটের নীচে ইয়া বড় বড় সাবানের পেটি ঢোকাল এক ছোকরা। খচখচ পায়ে এসে ঠেকছে বাক্সগুলো। আদিত্য পা দিয়ে ঠেলতে চেষ্টা করল। যাচ্ছে না। রঘুবীর দিব্যি গল্প জুড়েছে কন্ডাকটারের সঙ্গে। হাত বাড়িয়ে খানিকটা খৈনি ম্যানেজ করল। চেটোয় রেখে চেপে চেপে বুড়ো আঙুলে ডলছে। ফটাফট চাপড় মেরে ঠোঁট আর মাড়ির ফাঁকে গুঁজে দিল দলাটা। আদিত্যর মুখ টপকে জানলা দিয়ে পিক ফেলল।

—বাইরে কী দেখেন রায়দা ? প্রকৃতি ?

আদিত্য কিছুই দেখছিল না। বিস্বাদ মুখে তাকিয়ে ছিল শুধু। স্বচ্ছ রোদ্দুরেও ছুটন্ত গাছগাছালি বাড়িঘরদোর সবই যেন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে। ধান কাটা হয়ে গেছে, ক্লান্ত শরীরে শুয়ে আছে নিঃসঙ্গ প্রান্তর, পথের ধারে নয়ানজুলিতে কাঁপছে সূর্যবিম্ব—এ সব কিছুই চোখে পড়ছে না আদিত্যর। তার সামনে এখন শুধুই এক অতিকায় বাদামি গুহা, যেখানে পাথরের চাঙড়ের মতো পাঁচটা একশো টাকার বাণ্ডিল সাজানো আছে থাকে থাকে।

আদিত্যর কাঁধে টোকা দিচ্ছে রঘুবীর,— হলটা কী আপনার ? কী ভাবেন ?

আদিত্য মাথা ঝাঁকাল,— কিছু না।

—কিছু তো একটা ভাবছেন বটেই। রঘুবীর অদিত্যর চোখে সার্চলাইট ফেলল,—টেনশান হচ্ছে ?

—কীসের টেনশান ?

—নতুন কাজ.....নতুন মানুষ......

—নাআআ। আদিত্য উদাস,— আপনি তো সঙ্গে আছেন।

—এটাই হল সার কথা। রঘুবীর চাটুজ্যে আপনার সঙ্গে আছে। যা ভাববার সে ভাববে। এ কথাটা মনে রাখলে আপনার সব দুশ্চিন্তা কমে যাবে। পায়ের চাপে দুটো সাবানের পেটি ভেতর ঢুকিয়ে দিল রঘুবীর। গাম্ভীর্য এনেছে মুখে,— ওখানে গিয়ে তিলক সাউয়ের সঙ্গে আপনার বেশি কথা বলার দরকার নেই।

—কেন ?

—কেন আবার কি। গাঁ-গঞ্জের লোক, শহরের মানী লোকেদের সঙ্গে ওরা কথা বলতে জানে ! যা বলার আমিই বলব।

উদয়নারায়ণপুর পৌঁছতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। জায়গাটা মাঝারি গঞ্জ মতন। রাস্তার দু ধারে বেশ কয়েকটি পাকা বাড়ি। বাস থেকে নেমে একটু এগোলে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা বড়সড় কোঅপারেটিভ, উল্টোদিকে পেট্রল পাম্প। দোকানপাটেও কমতি নেই। কনকনে হিমেল হাওয়ায় ভরদুপুরেও জায়গাটা কেমন নিস্তেজ।

আকাশছোঁয়া এক শিশুগোছের কোল বেয়ে সরু পিচ ঢাকা পথ। মিনিট খানেক হাঁটলে তিলক সাউয়ের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি। তিনতলা।

তিলক সাউ বাড়িতেই ছিল। আদিত্যদের দেখে বলল,—এসে গেছেন ?

আদিত্য অপ্রতিভ মুখে বলল,—একটু দেরি হয়ে গেল।

সোফাসেট ছড়ানো এক বড়সড় ঘরে আদিত্যদের ডেকে নিয়ে বসাল তিলক। সরাসরি কাজের কথায় এল,—দিন, অর্ডারটা দিন।

আদিত্য ফোলিও ব্যাগে হাত দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই রঘুবীর একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল।

—এ তো জেরক্স কপি। অরিজিনালটা কোথায় ?

রঘুবীর আয়েশ করে গা ছড়িয়ে দিয়েছে সোফায়। হাত পায়ের খিল ছাড়াতে ছাড়াতে বলল,—এটাই রাখো। বিল সাবমিট করার আগে অরিজিনাল দিয়ে যাব।

—দয়া করে ঝোলাবেন না। সেবার তো আপনি...

—পুরনো কথা ছাড়ো তিলক। তুমিও সেবার আমাকে টাকার জন্য কম ঘোরাওনি।

বছর পঁয়ত্রিশের তিলকের লম্বাটে চোয়াড়ে মুখটায় রাগের ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল যেন। ভার গলায় বলল,—টাকা আপনি আজই নিয়ে যাবেন।

—কুড়ি পারসেন্ট তো ?

—ফের সেই বদ অভ্যেস রঘুদা ? পনেরো পারসেন্টে কথা পাকা হল না !

আদিত্য কিছু বুঝতে পারছিল না। যেন দুটো মানুষ তার সামনে বসে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথা

চালাচালি করছে। তিলকের গালে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে, চোখ দুটোও বড় হিংস্র ধরনের, তার দিকে তাকাতে কেমন ভয় ভয় করছিল আদিত্যর। ঠিক যেন ভালমানুষ বলে মনে হয় না। গলার স্বরটিও বেশ কর্কশ।

অস্বস্তি কাটানোর জন্য আদিত্য কথা বলে উঠল,—একবার সাইটটায় ঘুরে এলে হয় না ?

তিলকের কঠিন মুখ হাসিতে ভরে গেল,—সাইটে গিয়ে আপনি কী করবেন ? কাজ তো করব আমি।

—তবু একবার যাব না !

—যেতে পারেন, তবে তার দরকারটা কী ? আমার এখানে এসেছেন, এদিক ওদিক ঘুরুন, আরাম-টারাম করুন। তিনতলার গেস্টরুমটা খুলে দিচ্ছি, আজ রাত্রে থেকে যান। জমিয়ে আসর বসানো যাবে।

—না না, তা কী করে হয় ? আমি বাড়িতে বলে আসিনি।

তিলক গম্ভীর মুখে রঘুবীরের দিকে তাকাল,—রঘুদা, আপনি এঁকে বলেননি, আমার এখানে এলে আমি অতিথিদের ছাড়ি না ?

রঘুবীর আলগা ধমক দিল আদিত্যকে,—কলকাতায় কী এমন আপনার রাজকার্য পড়ে আছে ? থাকুন না রাতটা।

আদিত্যর বুকের ভেতরটা সিরসির করে উঠল। সত্যিই তো, কী হবে ফিরে ? কে আর এমন অপেক্ষা করে থাকে তার ! ঘরে কেউ প্রতীক্ষায় না থাকলে ঘরের টানও বুঝি কমে যায়।

আদিত্য উদাসীনভাবে বলল,—রাতের এখনও দেরি আছে। দেখা যাবে'খন। তার আগে চলুন তো, প্রথম কাজের জায়গাটা অন্তত একবার দেখে আসি।

তিলক সিগারেট ধরিয়েছে। আদিত্যর দিকেও বাড়িয়ে দিল একটা। ধোঁয়া ছেড়ে নীরস মুখে বলল,—দেখুন আদিত্যবাবু, গোড়াতেই একটা কথা আপনার সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে যাওয়া দরকার। আপনি বারবার সাইট দেখতে চাইছেন, ভাল কথা। আমি লোক দিয়ে দিচ্ছি, সে আপনাকে এখনই কালভার্টগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তবে আমার কাজে আপনারা কিন্তু কোনও সময়েই গিয়ে নাক গলাতে পারবেন না। ওটা আমি পছন্দ করি না।

আদিত্য হাসার চেষ্টা করল,—বাহ্, কাজ কেমন করছেন দেখব না ! খারাপ হলে তো গভর্নমেন্ট অফিসে আমাদেরই বদনাম হবে।

রঘুবীর কটমট করে তাকাল,—আহ্ রায়দা।

রাগ ঝেড়ে ফেলে হা হা হেসে উঠল তিলক,—রঘুদা, আপনার পার্টনারের দেখছি এখনও অন্নপ্রাশনও হয়নি ! আরে দুর মশাই, কাজ নিয়ে আপনাকে কে ভাবতে বলেছে ? কাজ তো আপনি পেয়েছেন আমার বকলমে। তিলক সাউ বিল দিলে ওই অফিসে কারুর হাত ছোঁওয়ানোর ক্ষমতা আছে ? সবার মুঠো ভর্তি করে রেখে দেওয়া আছে মশাই। আপনার এই সামান্য কালভার্টের কাজটাও কি আমার নামে বেরোতে পারত না ? পারত। কেন কাজটা ধরিনি বলুন তো ?

আদিত্য বোকার মতো তাকাল,—কেন ?

—সব কাজ এক কন্ট্রাকটার করলে অনেকের চোখ টাটায়। গরমেন্টেও ঝামেলা আছে। অডিট ফ্যাচাং করে, উল্টোপাল্টা নোট দেয়। তখন আবার এই লিডারকে ধরো, সেই লিডারকে ধরো। তার চেয়ে এই ভাল। আপনারাও কিছু করে খেলেন...আমরাও...হে হে হে বুঝলেন তো ? বসুন, আপনাদের পেমেন্টটা অ্যাডভান্স দেব বলেছিলাম, এখনই দিয়ে দিই।

ভেতর থেকে নোটের তাড়া নিয়ে ফিরে এসেছে তিলক,—গুনে নিন। ফিফটিন পারসেন্ট হিসেবে উনচল্লিশশো আছে। টাকা নিয়ে অরিজিনাল অর্ডারটা আমায় দিয়ে দিন।

জেরক্স অরিজিনালের বচসা বেমালুম ভুলে নোট গুনছে রঘুবীর। খুঁটে খুঁটে। উপোসি কাকের মতো।

একটা নোটের তাড়া বার বার পাঁচটা বাণ্ডিল হয়ে যাচ্ছে। একশো টাকার পাঁচটা বাণ্ডিল। আদিত্য চোখ রগড়াল। কেন এমন হচ্ছে !

বেলা পড়ে এল। শীত যেন পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। চতুর বেড়ালের মতো। উত্তরের জানলা দুটো দিয়ে চোরা বাতাস আসছে একটানা। অন্ধকার নামার আগেই হিমঋতু দখল নিচ্ছে ঘরের।

সব কটা জানলাই টেনে টেনে বন্ধ করল ইন্দ্রাণী। এত করে তিতিরকে বলে যায় স্কুল থেকে ফিরেই জানলাগুলো বন্ধ করে দিস, কেন যে মেয়েটা মাথায় রাখে না ! কী যে এত তাড়া থাকে টিউটোরিয়ালের। পড়তে যাওয়ার তাড়া, না আড্ডার ? ইলেভেনে উঠেই মেয়ের পা অনেক লম্বা হয়ে গেছে। পরশু ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে একটা মোটরসাইকেলঅলা ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল, ইন্দ্রাণীকে দেখে চমকে গেল। জিজ্ঞাসা করতে বলল, স্কুলের বন্ধু, সত্যিই স্কুলের বন্ধু কি ?

শাড়ি বদলে গায়ে ভাল করে একটা শাল জড়াল ইন্দ্রাণী। নীচে নেমে সন্ধ্যার মাকে এক কাপ চায়ের কথা বলবে ভাবছিল, তার আগে কন্দর্প উঠে এসেছে।

—যাক ফিরেছ তাহলে। আমি তিনবার এসে ঘুরে গেছি।

—তাই ?

—গেছিলে কোথায় ? মানিকতলায় ?

—না। দুর্লভবাবু হঠাৎ দেশে চলে গেছেন, স্কুল থেকে ফিরে পার্টিদের বিল ধরাতে গিয়েছিলাম। বাবা তোমার দাদাকে কাজটা একটু করে দিতে বলেছিলেন, সে নাকি খুব মেজাজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেছে।

কন্দর্প যেন ইন্দ্রাণীর উত্তরে ঠিক কান দিল না। পাঞ্জাবির পকেট থেকে হালকা সবুজ এক কাগজের তাড়া বার করে ধরিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রাণীর হাতে,—অশোকদা এটা পাঠিয়ে দিল।

চমকানোর কথা নয়, তবু ইন্দ্রাণী ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছে। এগ্রিমেন্টের কাগজ যে আসবে এ তো জানা কথা, তবু কিছুতেই শিহরনটাকে সে আটকাতে পারল না। বড় আলো জ্বেলে শিথিল পায়ে খাটে এসে বসেছে। পড়ছে। চোখের সামনে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে অক্ষরগুলো।

কন্দর্প পাশে এসে বসল,—অশোকদার কাজে কোনও ফাঁক নেই। তোমার সঙ্গে সেদিন যা কথা হয়নি সেগুলোও জুড়ে দিয়েছে।

ইন্দ্রাণী সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—কী রকম ?

—যদি সত্যি বাড়ি ভাঙা হয়, তাহলে নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হওয়া অবধি আমরা থাকব কোথায় ?

ইন্দ্রাণী ফ্যাল ফ্যাল তাকাল,—কোথায় থাকব ?

—সেই পয়েন্টটাই তো অশোকদা অ্যাড করে দিয়েছে। যদ্দিন না নতুন ফ্ল্যাটের পজেশান পাব, তদ্দিন আমরা যে ভাড়াবাড়িতে থাকব তার রেন্ট উইল বি পেইড বাই মুস্তাফি কন্সট্রাকশান।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল ইন্দ্রাণীর। অস্ফুটে বলল,—দীপুরা যদি আলাদা ভাড়া থাকতে চায় ?

—থাকবে। ক্লজটা ভাল করে পড়ে দেখো না। পরিষ্কার বলে দিয়েছে এক সঙ্গেও থাকতে পারি, আলাদাও থাকতে পারি, তবে রিজনেবল রেটে রিজনেবল স্পেসে থাকতে হবে। মেজ গিন্নি যদি প্রাসাদে থাকতে চায় তাহলে আলাদা কথা। বলতে বলতে হাসছে কন্দর্প,—সে অবশ্য চাইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ফ্ল্যাট হচ্ছে সেই পুলকেই...। বাই দা বাই, তোমার প্রিন্স খুশি তো ? তার তো আজকাল বাড়িতে টিকি দেখা যাচ্ছে না !

ইন্দ্রাণীর চোখে বাষ্প জমছিল। ছোট্ট নিশ্বাস টেনে বলল,—কাল কি সব ড্রাফট ফাফট তৈরি করবে।

—কবে রওনা দিচ্ছে ? নিউ ইয়ারস ডে-তে ?

—না। তিরিশ তারিখের টিকিট কেটে এনেছে। করমণ্ডলের। একটু আগে আগেই যেতে

চায়।

কন্দর্প নির্বাক বসে রইল কয়েক মিনিট। একটু যেন চিন্তামগ্ন। হঠাৎ বলল,—তুমি কি আজই বাবাকে বলবে বউদি ?

—ভাবছি।

—দেরি কোরো না। শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কালহরণং। বাবার মুড বুঝে কথাটা বলেই ফেলো। এসপার ওসপার একটা হয়ে যাক।

ইন্দ্রাণীর হঠাৎ যেন খুব শীত করে উঠল। বন্ধ জানলা ভেদ করে বুঝি ছুটে এসেছে হিমালয়। ঝনঝন কেঁপে উঠল হাড় পাঁজরা। দুর্বল হয়ে যাচ্ছে শরীরের গ্রন্থি।

আচম্বিতে কন্দর্পর হাত চেপে ধরেছে ইন্দ্রাণী,—আমার ভীষণ ভয় করছে চাঁদু। বাবাকে আমি রাজি করাতে পারব তো ?

তিলক সাউয়ের ছাদ থেকে পৃথিবীকে দেখছিল আদিত্য। কী বিশাল এক আবছায়া বৃত্তাকার ব্যাপ্ত হয়ে আসে চরাচরে। খানিক আগে সোনালি খড়্গের মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে। নীচের মাঠে ঘাটে তারই নীলাভ কিরণ। এ সব মুহূর্তে মনটা কেমন বিবশ হয়ে যায়। মায়া জাগে। বড় মায়া।

পাশের পুকুরের স্থির জলে নিথর হয়ে আছে চাঁদ। আদিত্যর বুকটা হু-হু করে উঠল। ছাদ থেকে ছোট্ট একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল চাঁদের দিকে। সরে যাক এই মায়া। সরে যাক।

চাঁদ ভেঙে গেছে। খণ্ড খণ্ড চাঁদ ছটফট করছে জলে। আদিত্য তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। চূর্ণ-বিচূর্ণ চাঁদ আবার জোড়া লাগছে ক্রমশ। দেখতে দেখতে আবার পূর্ণ মায়া।

আবার ঢিল ছুঁড়ল আদিত্য। আবার ভেঙে গেছে চাঁদ। জল শান্ত হল। আবার সেই পূর্ণ মায়া। কেন যে বার বার ফিরে আসছে চাঁদটা ! তবে কি এই মায়া থেকে মুক্তি নেই আদিত্যর।

রঘুবীর গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে,—কী হল রায়দা ? কখন জলখাবার দিয়ে গেছে, খাবেন না ?

আদিত্য কার্নিশ থেকে ঝুঁকল—ভাল লাগছে না। বাড়িই ফিরি।

—সেকি ! কেন ? এখনও মন খারাপ করে আছেন ?

—আমার কি আর মন আছে রে ভাই, যে মন খারাপ হবে ?

—ছেলেমানুষের মতো অভিমান করছেন রায়দা। কতবার তো বললাম ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এ রকম সাত-আটটা কাজ পার হয়ে গেলে আমাদেরই দু-তিন লাখ টাকার ক্রেডেনশিয়াল তৈরি হয়ে যাবে। তখন দরকার হলে আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে কাজ করব। তিলক সাউ কি গোটা পৃথিবী কিনে রেখেছে নাকি ? ধরুন যদি আমরা বাগনানের দিকে গিয়ে কাজ করি...

—আমার আর ওই এক কথা ভাল লাগছে না ভাই। কত কিছু ভেবে ফেলেছিলাম। এত দৌড়োদৌড়ি করলাম, খরচাপাতি করলাম...

—অর্ডারটার জন্য আপনাকে তো কোনও কন্ট্রাকটার ধরতেই হত দাদা। তিলক সাউ না হলে কোনও পুলক সাউ...

—তবু...

—তবুও কি আছে ? যা টাকা আসার কথা ছিল তা তো এসেই গেছে। আমাদের আম খাওয়া দরকার, গাছ গুনে কাজ কী ?

—তাও পেলাম কত ? কী রইল ?

—আপনার আঠেরোশো, আমার আঠেরোশো। আর ওই শালা ঘুমন্ত পার্টনারের শ তিনেক।

—কত খরচ হয়েছে তার হিসেব আছে ?

—তাই বলুন রায়দা, আপনি লাভ-ক্ষতির হিসেব কষছেন।

আদিত্য মলিন জ্যোৎস্নার মতোই ম্রিয়মাণ। লাভ-ক্ষতির হিসেব জানলে তার জীবনটা কি এই খাতে বইত ?

রঘুবীর পিঠে হাত রাখল,—সব লস পুষিয়ে যাবে রায়দা। আরও দু-চারটে অর্ডার আসতে দিন।

—কী হবে ? লাভের গুড় তো সরকারি পিঁপড়েগুলো খেয়ে যাবে।

—আরে নাহ্। কানেকশানগুলো খালি তৈরি হতে দিন। তারপর দেখুন কেমন লাল করে দিই আপনাকে। রঘুবীর টানল আদিত্যকে,—চলুন, আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। শীতে জমে যাবেন।

—ঘরে যাব না ভাই। বাড়িই যাই। মনটা কেমন আনচান করছে। এখন গেলে বাস পাব না ?

রঘুবীর অম্লানবদনে মিথ্যে বলে দিল,—কলকাতার লাস্ট বাস কখন চলে গেছে। এখন যেতে হলে তিন-চারবার বাস বদল করতে হবে। অতগুলো টাকা সঙ্গে রয়েছে, কোথায় কি ঘটে... !

—তিলক সাউকে আমার ভাল লাগছে না চাটুজ্যেমশাই। ঠিকাদার, না খুনে ডাকাত ? বিকেলে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরোল, স্বচক্ষে দেখেছি কোমরে রিভলভার গোঁজা।

—সঙ্গে কাঁচা পয়সা থাকলে আর্মস রাখবে না ? ও খুন-খারাপির লোক নয়, এককালে একটু মাথা গরম ছিল, এখন নিপাট গেরস্থ। ছেলেমেয়েকে দেরাদুনের কনভেন্টে পড়ায়। ডি এম, জেলা সভাধিপতি এখানে এলে একবার এ বাড়ি ঘুরে যাবেই।

—আপনি তো ওর হয়ে বলবেনই। পুরনো লেনদেনের লোক, পুরনো দোস্ত...

—ভুল ভাবছেন রায়দা। রঘুবীর গোমড়া,—আমার কুলগাছিয়ার খুড়তুতো ভাই এক সময়ে নেমেছিল এই লাইনে, তখনই তিলকের সঙ্গে আমার ভাবসাব।

আদিত্যর ঠোঁট বেঁকে গেল,—সে এই লাইন ছাড়ল কেন ?

—তার ধৈর্য কম। লোভ বেশি। সে এখন ব্যাংক লোন নিয়ে মুরগি পালছে। ধারে কাছে জনমনিষ্যি নেই, তবু গলা নামাল রঘুবীর,—এই তো এক্ষুনি এসে পড়বে তিলক, দেখবেন কেমন দিলদরিয়া মেজাজ। রাত একেবারে মাতিয়ে দেবে। খাঁটি বিলিতি খায়, এক্কেবারে ফরেন। সঙ্গীসাথী কমে গেছে তো, লোক পেলে তাই ছাড়তে চায় না।

আদিত্যর দৃষ্টি আবার পুকুরের চাঁদের দিকে। মৃদু হাওয়ায় থির থির কাঁপছে চাঁদ।

আমতা আমতা করে আদিত্য বলল,—বাড়িতে কিন্তু খুব ভাববে।

—দোতলায় ফোন আছে, দেখুন না কলকাতায় টেলিফোন করা যায় কিনা।

পুকুরের চাঁদ এখন থির বিজুরি। ওই নির্দয় মায়া কার মুখ ভাসায় ? তিতিরের ? ইন্দ্রাণীর ? বাপ্পার ?

বাপ্পার টাকাটা শেষ পর্যন্ত শুভাশিসের কাছ থেকেই নিল ইন্দ্রাণী ! আদিত্যকে একবার মুখ ফুটে জানাল না পর্যন্ত !

কবেই বা কোন কথা জানিয়েছে ? শুভাশিস বলে যে অত কাছের একটা বন্ধু আছে ইন্দ্রাণীর, তাও কি বিয়ের চার বছরে একবারও ভুলে উচ্চারণ করেছিল ? নিজেই চেষ্টাচরিত্র করে স্কুলে চাকরি জোগাড় করল, মা'র মুখে কাজের খবরটা জানতে পারল আদিত্য ! একের পর এক গয়না বেচেছে, বেচার আগে বলেছে কোনওদিন ?

কেন এত উপেক্ষা ? আদিত্য অক্ষম, তাই ? আদিত্য ইন্দ্রাণীর উপযুক্ত নয়, তাই ? নাকি আদিত্য শুভাশিস নয়, তাই ?

আদিত্য একবার শুভাশিসের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল বলে মানে লেগেছিল ইন্দ্রাণীর।

থাক। কোন বাড়িতে টেলিফোন করবে আদিত্য ! যে বাড়িতে প্রতি পলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় সে একটা পাজির পাঝাড়া। নিষ্কম্মার গোঁসাই। একটা আস্ত হারামজাদা। কেন্নোর

বেহদ্দ ? দুৎ, ওই বাড়িতে কেউ ফোন করে।

হিমে আদিত্যর শরীর অবশ। আর একটা ঢেলা কুঁড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চাঁদের দিকে ছুঁড়ল আদিত্য। ভাঙাচোরা চাঁদ হাসছে খলখল।

৪২

রাত নটা নাগাদ কম্পিত পায়ে জয়মোহনের ঘরে এল ইন্দ্রাণী। একটু আগে জয়মোহনের খাওয়া শেষ হয়েছে, এক পর্ব বাথরুমের পালাও সারা, এখন তাঁর ওষুধ খাওয়ার সময়। অনেক রকমের ওষুধ। প্রেশারের। হার্টের। অম্বলের। সব শেষে খাবেন ইশবগুল, এতেই তাঁর কোষ্ঠ সাফ হয় ভাল। অন্য দিন ইন্দ্রাণীকে দেখলে তাঁর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা দেয়, আজ হাড় হিম করা ঠাণ্ডাতেও তাঁর মুখে ভাদ্রের গুমোট। ইন্দ্রাণীর উপস্থিতি টের পেয়ে বললেন,—এসো বউমা, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

ইন্দ্রাণীর স্বর দুলে গেল,—কী বাবা ?

আষ্টেপৃষ্ঠে শীতবস্ত্রে নিজেকে মুড়ে রেখেছেন জয়মোহন। বন্ধ ঘরেও বাঁদুরে টুপি তাঁর মুখে সাঁটা। কোটরগত চোখ আর তীক্ষ্ণ নাকে তাঁর মুখটি যেন ধনেশ পাখির আকার নিয়েছে। শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় বললেন,— বোসো।

ইন্দ্রাণী বসল না। সঙ্কুচিত পায়ে শ্বশুরমশাইয়ের খাটের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ইজিচেয়ারের হাতলে হাত দুটি রাখলেন জয়মোহন,— তুমি কাল একবার চিত্তোষকে খবর পাঠাতে পারবে বউমা ?

ইন্দ্রাণীর বুকটা ধক করে উঠল। চিত্ততোষ জয়মোহনের লেকের বন্ধু। অ্যাডভোকেট। এখনও নিয়মিত হাইকোর্টে যান। তাঁকে হঠাৎ কি দরকার পড়ল জয়মোহনের ?

ইন্দ্রাণীকে চুপ দেখে জয়মোহন আবার বললেন,— শুনেছ, কী বলছি ?

—শুনেছি বাবা।

—চিত্ততোষের সামনে আমি একটা উইল করতে চাই। ডাক্তারকেও ডেকো। সেও একজন সাক্ষী হবে। ভাগ-বাঁটোয়ারা আমি সেরে ফেলব। ওই হারামজাদাকে আমি কানাকড়িও দেব না।

ও। বড়ছেলের ওপর রুটিন ক্রোধ ! এই নিয়ে কত বার যে আদিত্যকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন জয়মোহন ! উকিলটাই এবার যা নতুনত্ব।

মুখে হাসি টেনে ইন্দ্রাণী বলল,— যার ওপর রাগ করছেন, সে কি আপনার রাগের মর্ম বুঝেছে কোনওদিন ?

—এই বার বুঝিয়ে ছাড়ব। এত বড় আস্পর্ধা আমাকে মুখের ওপর ... জয়মোহন সহসা কোঁৎ করে কথাটা গিলে নিলেন। বুকের হাপর বার দুই টেনে বললেন,— ভাবছে আমি মরলে ও মোচ্ছব করবে ? ওটি হতে দেব না। মেজ মেজর জায়গায় থাকবে, ছোট ছোটর জায়গায়। বাকি সব অংশ আমি তোমার নামে লিখে দেব।

ইন্দ্রাণী শুকনো হাসল,— আমাকে দেওয়া মানে তো তাকেই দেওয়া বাবা।

—তা হোক। আমি চাই চিরকাল ও তোমার হাততোলা হয়ে থাক। বেশ খানিকটা ঝাল উগরে কিছুটা স্থিত হয়েছেন জয়মোহন। একটু হাসিও যেন খেলে গেল তাঁর জীর্ণ মুখে,— উইলের দিনও আমি স্থির করে ফেলেছি।

—কবে ?

—তোমরা আমার পঁচাত্তর বছরের জন্মদিন করবে বললে, সেই দিন। সবার সামনে আমি ওকে বেইজ্জত করতে চাই। আমাকে ভেবেছেটা কী, অ্যাঁ ? নখ দাঁত পড়ে গেছে বলে আমার কোনও মুরোদ নেই !

—বেশ তো, তাই করবেন। ইন্দ্রাণী যেন অ্যাটমকে ভোলাচ্ছে,— জন্মদিনের তো এখনও দেরি আছে।

—দেরি কোথায় ? আর তো এক মাস ছ'দিন।

—হ্যাঁ, তাও তো বটে !

—জন্মদিনটা তোমরা ঘটা করে করবে তো ? জয়মোহন পলকে রাগ ভুলেছেন। শিশুর হাসিতে ভরে গেছে মুখ। বার্ধক্যেও কোথায় যে লুকিয়ে থাকে এই শৈশব !

ইন্দ্রাণী বলল,— নিশ্চয়ই করব। পঁচাত্তরটা মোমবাতি জ্বালাব।

—দীপু বলছিল নাহুমের কেক আনবে। ওখান থেকেই আনা ভাল, কী বলো ? কতদিনকার পুরনো দোকান ! জানো বউমা, কলেজে পড়ার সময়ে মেট্রোতে এম জি এমের সিনেমা দেখে আমরা দল বেঁধে হগসাহেবের মার্কেটে ঢুকতাম। শুধু ওই দোকানের কেক খাওয়ার জন্য। আহ্, কতকাল যে খাইনি !

উইল-টুইলের চিন্তা বেবাক হাপিশ। ইন্দ্রাণী শ্বশুরমশাইয়ের মেজাজটাকে আর একটু ভাল করতে চাইল,— আমি সেদিন আপনাকে একটা গরদের পাঞ্জাবি কিনে দেব। পরবেন।

—গরদ নয়, আদ্দি দিও। জয়মোহন হাসছেন টিপ টিপ,— তা মাঘের শীতে কি আর শুধু পাঞ্জাবি গায়ে দিতে পারব ?

—চাঁদু আপনাকে শাল কিনে দেবে।

—খোকন কিছু দিলে আমি কিন্তু নেব না।

জয়মোহন চোখ বুজলেন। ক্ষণে ক্ষণে মুখভাব বদলে যাচ্ছে তাঁর। কখনও বা অপার্থিব হাসি ফুটছে মুখে, কখনও বা কুঁচকে যাচ্ছে কপাল।

একটা কষ্ট জমাট বাঁধছিল ইন্দ্রাণীর গলায়। প্রথম যেদিন এই মানুষটাকে দেখেছিল, তার সঙ্গে আজকের এই জয়মোহনের কত তফাত ! তার বিয়ের দিন কী দাপটের সঙ্গে হাঁকডাক করে বেড়াচ্ছিলেন ! কুণ্ঠিত বাবার সঙ্গে একবার মণ্ডপের এ মাথায় দৌড়োচ্ছেন, একবার ও মাথায়। বরযাত্রীদের মধ্যে তিন-চারটে ছেলে, সম্ভবত আদিত্যদের কোনও দূর সম্পর্কের ভাই, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অসভ্যতা শুরু করেছিল, পাতে বারবার রসগোল্লা নিয়ে নাকি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল বাইরে, জয়মোহন তাদের ঘাড় ধরে খাওয়া থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। কী ব্যক্তিত্ব ছিল মানুষটার ! যেদিন ইন্দ্রাণীকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিনও কী চোখা কথাবার্তা ! দেনাপাওনার কথা তুলবেন না ধীরাজবাবু, রায় বাড়িতে ছেলে বিক্রির প্রথা নেই। দাপুটে প্রৌঢ়ের দেহে তখনও কী যৌবনের গরিমা ! কাল সেই মানুষটার রঙ চুন বালি পলেস্তারা সব খসিয়ে দিল ! এখন পড়ে আছে শুধু নোনা ইট। সংসারের আঘাতে জর্জরিত এক ধ্বংসস্তূপ।

এই কাঙালটাকে কী করে এখন আঘাত করে ইন্দ্রাণী ! উপায় নেই। উপায় নেই। ইন্দ্রাণীও যে শিকলে বাঁধা পড়ে গেছে।

চাপা গলায় ইন্দ্রাণী ডাকল,— বাবা ...

—উঁ ?

—একটা কথা বলব ? আপনি একটু শান্ত হয়ে শুনবেন ?

—বলো। শুনছি তো।

—বাপ্পা মাদ্রাজ চলে যাচ্ছে জানেন তো ?

—ট্রেনিং কি শুরু হয়ে গেল ?

—না। সামনের মাস থেকে হবে। ইন্দ্রাণী ঢোঁক গিলল,— আমি একটা বিপদে পড়েছি বাবা। আপনাকে বাঁচাতে হবে।

জয়মোহনের চোখ খুলে গেল। চঞ্চল চোখে দেখছেন পুত্রবধূকে।

ইন্দ্রাণী মাথা নামিয়ে নিল,— চাকরিটা ভাল। কিন্তু ট্রেনিং-এ অনেক খরচ বাবা।

—কত ?

—এখন তো হাজার চল্লিশেক লাগবে। পরে আরও কত লাগে কে জানে !

—অত টাকা ! পাঠাচ্ছ কেন তবে ?

—উপায় নেই বাবা। ছেলের বড় জেদ। আমিও কথা দিয়ে ফেলেছি।

—কথা তো আর ফেলা থুতু নয় যে ফেরত নেওয়া যাবে না ! কথা ফিরিয়ে নাও।

—তা হয় না বাবা। শালের নীচে ধরে থাকা এগ্রিমেন্টের কাগজটাকে চাপল ইন্দ্রাণী,— বাপ্পাকে নিয়ে আমার বড় ভয়। তার ইচ্ছে পূরণ করতে না পারলে সেও যদি আপনার বড় ছেলের মতন ...

জয়মোহন নির্বাক। নিষ্পন্দ।

ঘরটা চকিতে থমথমে হয়ে এল। টিউব লাইটের আলোও হঠাৎ বড় মলিন।

ক্ষণিকের এই নৈঃশব্দ্যও সহ্য হচ্ছিল না ইন্দ্রাণীর। দেওয়ালঘড়ির কাঁটার আওয়াজ কট কট কানে বাজছে। কাকুতির স্বরে ইন্দ্রাণী বলল,— আমি ভীষণ বিপাকে পড়ে গেছি বাবা। এখন আপনিই আমার ভরসা।

জয়মোহন অসহায় চোখে তাকালেন,— তুমি তো আমার অবস্থা জানো বউমা। আমার আর কিছুই নেই।

বাইরের রাস্তায় আচমকা একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাচ্ছে লোকজন। বোধহয় কোনও রিকশাঅলার সঙ্গে ঝামেলা লেগেছে পথচারীদের, প্রায়ই লাগে। অন্য সময়ে ওই কোলাহলে বিরক্ত হয় ইন্দ্রাণী, এই মুহূর্তে যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। ঝগড়া একটু নিচুগ্রামে নামতেই ঝপ করে বলে ফেলল,— আপনি চাইলেই উপায় আছে বাবা। প্রোমোটাররা তো ঘোরাঘুরি করছেই, বাড়িটা যদি আপনি ওদের হাতে ছেড়ে দেন ...

—কী বললে তুমি ! জয়মোহন চিৎকার করে উঠেছেন। শীর্ণ দেহযষ্টি কাঁপছে থরথর,— তুমি এ কথা উচ্চারণ করতে পারলে বউমা ? তুমিও ... !

পাশার দান পড়ে গেছে। চাল ফেরতের রাস্তা নেই। ইন্দ্রাণী মরিয়াভাবে বলল,— না বলতে পারার কি আছে বাবা ? এ তো শুধু আমি একা চাইছি না, আপনার ছেলেরাও চায়। আপনিই ভেবে দেখুন, আপনি উইল করুন আর যাই করুন, আপনি না থাকলে ছেলেরা কি বাড়িতে এক সঙ্গে থাকবে ? তা ছাড়া প্রস্তাবও তো খুব খারাপ দেয়নি প্রোমোটার। চারটে ফ্ল্যাট দেবে, চারটেই আপনার নামে থাকবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের সঙ্গে আরও এক লাখ টাকা করে ক্যাশ। সেও আপনি পাবেন। এই শেষ বয়সে আপনার হাতে কিছু টাকা থাকলে আপনারও কত জোর থাকে। আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারেন। দীপুর সঙ্গে থাকতে পারেন। যার সঙ্গে খুশি। আমি অবশ্য ঠিক করেছি এবার আপনাকে আমার কাছেই রাখব। আমি জানি আপনার অবহেলা সহ্য হয় না। একবার ভাগাভাগির সময়ে আপনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে যে দোষ করেছি, সে অন্যায় আর হতে দেব না বাবা। দীপু চাঁদুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে ...

হঠাৎই ইন্দ্রাণীর মনে হল, বড় বেশি কথা বলে ফেলেছে সে। যেন তার কথা শুনছেনও না জয়মোহন। যেন ফাঁকা এক ঘরে অর্থহীন প্রলাপ বকে চলেছে ইন্দ্রাণী।

একদম থেমে গেল ইন্দ্রাণী। বেশ খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। জয়মোহনের চোখে মরা মাছের দৃষ্টি। ইন্দ্রাণী চোখ সরিয়ে নিল। নিজেকে শোনাচ্ছে এমন নিচু স্বরে বিড়বিড় করে বলল,— প্রোমোটারের কাছ থেকে টাকা আমি নিয়ে ফেলেছি বাবা। জীবনে আমি কখনও আপনার কাছে কিছু চাইনি, শুধু এই একটি বার ...

—থামো। জয়মোহন স্পষ্ট স্বরে বললেন,— আমাকে এখন কী করতে হবে ?

দ্বিধা ঝেড়ে শালের তলা থেকে এগ্রিমেন্টের কাগজটা বার করল ইন্দ্রাণী,— আপনাকে আমি জোর করব না বাবা। এটা আপনি পড়ে দেখুন। উচিত মনে হলে সই করবেন।

—তার দরকার নেই। তুমি কলম নিয়ে এসো।

এ রকমই হবে ভেবেছিল কি ইন্দ্রাণী ? না হলে কেন কলম এনেছিল সঙ্গে ?

স্তম্ভিত ইন্দ্রাণী দেখছিল সই করতে একটুও হাত কাঁপছে না শ্বশুরমশাইয়ের। প্রতিটি পাতায় যেন অভ্যস্ত হাতে কলম চালাচ্ছেন।

সই শেষ করে পেনের নিবটা ভেঙে দিলেন জয়মোহন।

বাইরে কোথাও ঝিঁঝি ডাকছিল। বাইরে, না ভেতরে ? বন্ধ ঘরেও এত জোরে শব্দ আসে কোন পথ দিয়ে ? আধো তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে কান খাড়া করল আদিত্য। আরও কি একটা শব্দ হচ্ছে না ? বাতাস কাটছে জানলায় ? নাহ, এ যেন অন্যরকম।

কম্বল সরিয়ে ধড়মড় উঠে বসল আদিত্য। অন্ধকার এত নিকষ যে কিছুই দেখা যায় না। কলকাতার বাড়িতে কোত্থেকে যেন আলো এসে অন্ধকারকে মিহি করে রাখে, এত আঁধারে কি ছাই অভ্যেস আছে আদিত্যর ! এমনিতেই নতুন জায়গায় তার ঘুম আসে না, যাও বা একটু চোখ লাগল তাও এই অচেনা ফিসফাস !

বাইরে কেউ কথা বলছে কি ? এত রাতে এ কি রহস্য রে বাবা !

কম্বলটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বিছানা থেকে নামল আদিত্য। সঙ্গে সঙ্গে টাল খেয়ে গেছে মাথা। পা কেঁপে গেল। খাটে হাত চেপে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল আদিত্য। বেহিসেবি হয়ে হুইস্কির সঙ্গে অনেকটা রামও খেয়ে ফেলেছে আজ। দুই সুরা খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে মাথায়। কথা বলতে গিয়ে গলাটাও জড়িয়ে গেল।

—কে ? কে রেহ ?

কারুর সাড়া নেই। আদিত্য কান পেতে রইল। শব্দটা রয়েছে। রয়েছেই। রঘুবীর কোথায় গেল ? শালা মাল টেনে পুরো আউট আজ। আদিত্যর আগেই। অসুরটা লুটিয়ে পড়ল, আর ওই শালা তিলক সাউ বোতলকে বোতল সাফ করেও দু ঠ্যাঙে খাড়া। বাহাদুর বটে ! ওই খচ্চরটাই কি শব্দ করে ভয় দেখাচ্ছে !

—দাঁড়া শালা, আদিত্য রায় উঠছে।

হ্যাঁচকা মেরে শরীরটাকে টেনে তুলল আদিত্য। স্খলিত পায়ে সাঁতরাচ্ছে অন্ধকার। সাঁতরে সাঁতরে সুইচ বোর্ড ছুঁল। টিপিস টিপিস জ্বলে উঠেছে টিউবলাইট। চোখ কুঁচকে ঘরটাকে কয়েক সেকেন্ড জরিপ করল আদিত্য। সুবিশাল মাটন রোলের মতো জানলার ধারের খাটটায় কম্বল মুড়ে ঘুমোচ্ছে রঘুবীর। ওই ব্যাটারই নাক ডাকার আওয়াজ হচ্ছে না তো ? নাহ, তাও তো নয়। তবে ?

ঝিঁঝির ডাক থেমে গেল অকস্মাৎ। ফিসফিসানিটাও থমকেছে যেন। খটাং করে দরজা খুলে আদিত্য বাইরে উঁকি দিল। কেউ কোত্থাও নেই।

টলমল পায়ে সুনসান ছাদে এসে দাঁড়াল আদিত্য। ঠিক মধ্যিখানে। শীতের কুয়াশা মেখে রাত বড় আধিভৌতিক এখন। প্রাণহীন, অশরীরী, তবু যেন কেমন জীবন্ত। ক্ষীণ জ্যোৎস্না মাখা পৃথিবীকে ওড়না ঢাকা প্রেতিনীর মতো লাগে। বাড়ির গা ঘেঁষে খাড়া দাঁড়িয়ে এক নারকেল গাছ। তার ছায়া পড়েছে ছাদের এক কোণে। কী গাঢ় কালো ছায়া !

আদিত্যর গা ছমছম করে উঠল। এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সে ? বাড়ি ছেড়ে ? সংসার ছেড়ে ? এ কী দুর্মতি হল তার ? বাড়িতে সবাই নিশ্চয়ই খুব ভাবছে। তিতির ! ইন্দ্রাণী ! হয়তো বাবাও !

ওফ, আবার সেই শব্দ !

—কে ? কে তুমি ?

আদিত্য কার্নিশের ধারে চলে এল। ঝুঁকেছে অনেকটা। নীচের জলে চাঁদটা নেই, সেখান থেকেই ফিরে এল শব্দটা। ফিসফিস করছে, তবু স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট।

খোকন। খোকন।

সকালবেলা জয়মোহনকে চা দিতে গিয়ে মিনতি চমকে উঠল। ইজিচেয়ারেই ঘুমোচ্ছেন জয়মোহন ! গায়ের শাল লুটোচ্ছে মাটিতে, হাতলের বাইরে ঝুলছে দুই হাত, পা দুখানাও কেমন অদ্ভুতভাবে ছড়ানো। বাঁদুরে টুপি পরা রয়েছে এখনও। গলা-বন্ধ সোয়েটারটাও। মিনতির এক ঝলক মনে হল, খুব ভোরে বোধহয় উঠেছিলেন জয়মোহন। তারপর ইজিচেয়ারে বসেই ...

মিনতি ডাকল,— আপনার চা।

জয়মোহন জাগলেন না।

মিনতির কেমন সন্দেহ হল। কাছে গিয়ে শরীরে হাত ছুঁইয়েই শিউরে উঠেছে। গা যে বরফের মতো ঠাণ্ডা ! শক্ত, যেন কাঠ।

মাঝরাতে কখন নিঃশব্দে চলে গেছেন জয়মোহন।

৪৩

কী হল দত্তমশাই, একেবারে শয্যা নিলেন কেন ?

—বড় ব্যথা ডাক্তারবাবু। কোমরটা বোধহয় অচলই হয়ে গেল।

—ব্যায়াম যেগুলো করতে বলেছিলাম, করছেন ?

—দেহ যে নড়ে না ডাক্তারবাবু।

—বয়স তো এখনও ষাটও ছোঁয়নি, এর মধ্যে অথর্ব হয়ে পড়লে চলবে ? খাটের ধারে চে টেনে বসলেন শিবসুন্দর,—একবার উপুড় হন তো দেখি।

—পারব ?

—খুব পারবেন। তুফান, দত্তমশাইকে একটু হেল্প করো।

তুফানকে হাত লাগাতে হল না, নিজের চেষ্টাতেই অতিকায় বালাপোশের মতো শরীরটা নড়িয়ে মদন দত্ত, আহ উফ শব্দ করছে মুখে। শিবসুন্দর ভাল করে টিপেটুপে দেখলেন মাজাটাকে। পরতে পরতে চর্বি, হাড়ের অস্তিত্ব টের পাওয়া কঠিন। এমন হাল হবে না'ই বা কেন, সারাক্ষণ তো থেবড়ে বসে আছে রামনগর বাজারে। হয় নিজের সারের গদিতে, নয় হার্ডওয়ারের দোকানে। অলকার সবজিবাগানের সুবাদে দত্তর সারের দোকানে তুফানের নিত্য আসা যাওয়া, সে স্বচক্ষে দেখেছে দুপুরবেলা দু টিফিন কেরিয়ার বোঝাই খাবার যায় দত্তর বাড়ি থেকে। যে লোক গাণ্ডেপিণ্ডে গিলে শুধু শরীর ফোলায় আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ভঙ্গিমায় গেদে বসে থাকে, তার কোমরের পেশি তো দরকচা মেরে যেতে বাধ্য।

দত্তকে আবার চিত করিয়ে প্রেশার মাপলেন শিবসুন্দর। ঠিকই আছে মোটামুটি। লোকটার সুগারও নেই, অন্তত পুজোর আগে শেষ যখন তাঁর কাছে গিয়েছিল, তখনও পর্যন্ত ছিল না। ব্লাড টেস্টও করিয়ে ছিলেন, ইউরিক অ্যাসিড-ফ্যাসিড সব স্বাভাবিক। এক্স রে-তেও হাড়ে কিছু পাওয়া যায়নি। কেস হিস্ট্রি মাথায় রেখে ব্যাগ থেকে ছোট্ট হাতুড়িটা বার করলেন শিবসুন্দর, ঠুকে ঠুকে শরীরের কয়েকটা গাঁট পরীক্ষা করলেন। সঙ্গে একটি ধাতব পাত থাকে, সেটি ঘষলেন পায়ের তলায়।

মদন দত্ত মিনমিন করছে,—কী বুঝছেন ডাক্তারবাবু ?

—আপনার কিস্যু হয়নি। সকাল বিকেল মিলিয়ে রোজ পাঁচ মাইল করে হাঁটুন। ভাত ছেড়ে রুটি খাওয়া শুরু করুন। কোমরের ব্যায়ামগুলো যা বলেছিলাম, নিয়মিত করে যান। ওজন কমান। নো মিষ্টি। তবে সবার আগে আপনার বসার পসচারটা বদলাতে হবে। দোকানে টেবিল চেয়ারের বন্দোবস্ত করতে পারেন না ?

—আর ওষুধ ?

—কোনও ওষুধ দেব না। আগেও তো বলেছিলাম ভারী শরীর নিয়ে একভাবে বসে থেকে

থেকে আপনার ব্যাক সাইডের মাসলগুলো স্টিফ হয়ে গেছে। ওগুলোকে আগে ছাড়ানো দরকার। ওই জন্যই যত ব্যথা।

মদন দত্ত চেষ্টা করে বিছানায় আধশোয়া হল। ভেতর-দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তার স্ত্রী, খাটের ওপারে বড় ছেলে। ভারী মুখখানা ঝুলিয়ে তাদের এক ঝলক দেখে নিল মদন দত্ত। বলল,—তমাল ডাক্তার যে অন্য কথা বলে গেল!

শিবসুন্দর থমকালেন। তমাল ছেলেটি অতি সম্প্রতি চেম্বার খুলেছে রামনগরে। সপ্তাহে দু দিন করে বসে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। তারকেশ্বরে বাড়ি। ডাক্তারি পাস করে এসে তারকেশ্বরেই চেম্বার খুলেছিল, পশার জমে ওঠার পর এখন চারদিকে চেম্বার ছড়াচ্ছে। তারকেশ্বর শেওড়াফুলি আর কোথায় কোথায় যেন নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত আছে ছেলেটা। একদিন এসেছিল শিবসুন্দরের বাড়িতে, আলাপ পরিচয় করে মন্দ লাগেনি ছেলেটাকে। বেশ ভদ্র। বিনয়ী। শিবসুন্দরের বেশ আত্মবিশ্বাসীও মনে হয়েছে তাকে। আত্মবিশ্বাসই তো ডাক্তারের মহা গুণ। তা তাকেই যখন দেখানো শুরু করেছে, তখন আবার শিবসুন্দরকে ডাকা কেন?

শিবসুন্দর গম্ভীর মুখে বললেন,—কী বলল তমাল?

—উনি বলছিলেন কলকাতায় গিয়ে আমাকে একটা বোন স্ক্যান করাতে হবে। ব্লাড এক্স রে-ও সব করতে হবে আবার।

—আপনি আগের রিপোর্টগুলো দেখাননি?

—দেখিয়েছিলাম। উনি বললেন ওসব পুরনো হয়ে গেছে। তারকেশ্বরে ওঁর চেনা ল্যাবরেটরি আছে, সেখান থেকে সব করিয়ে আনতে হবে।

—বেশ তো। তা হলে আর আমাকে ডাকার কি প্রয়োজন ছিল?

মদন দত্ত যেন সামান্য অপ্রস্তুত,—তমাল ডাক্তারের থেকে আপনার ওপর আমার অনেক বেশি আস্থা ডাক্তারবাবু। ছেলে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম...এই তো দু মাস ধরে তার ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি, অবনতি বই উন্নতি বুঝলাম না।

মদন দত্তর বড় ছেলেটি মুখচোরা ধরনের। সে অপ্রতিভ মুখে বলে উঠল,—তা নয় ডাক্তারবাবু, পঞ্চায়েত অফিসে একদিন তমাল ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বাবার ওই ব্যথাটার কথা শুনে উনি বললেন একদিন চেম্বারে নিয়ে যেতে...আমরাও ভাবলাম একটা সেকেন্ড মতামত নিয়ে নিই...

শিবসুন্দর মনে মনে স্থির করে ফেললেন এই রুগীটিকে নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না। এমনিতেই এসব ধনী লোকেদের ঘরে চিকিৎসা করতে আসতে তাঁর ভাল লাগে না। শরীরে যেটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে তিনি কেবল মাত্র গ্রামগঞ্জের দীনদরিদ্র অচিকিৎসিত মানুষদেরই চিকিৎসা করতে চান। মাধবপুরে এসে প্রথম দিকে কিছুকাল এই নীতি কঠোরভাবে মেনে চলেছিলেন তিনি। কিন্তু এই মদন দত্তরা গিয়ে পড়লে তাদের তিনি এড়ানই বা কী করে! কোথায় যেন একটা বাধে। চিকিৎসকের নীতিবোধ? মানবিকতা? সংস্কার?

মদন দত্তর বাড়ির বাইরে এসেই গজগজ করছে তুফান,—হুঁহ, সেকেন্ড ওপিনিয়ান নিতে চায়! আসল কথা বল না, বেশি টাকা না খসলে তোরা চিকিৎসা পুরো হল বলে মনে করিস না। যা, স্ক্যান করতে গিয়ে এখন আট-দশ হাজার টাকা গলিয়ে আয়।

—তাতে তোর কী? চল ফিরি। শিবসুন্দর তুফানের পিঠ চাপড়ালেন, —তোদের তো আবার এখন যাত্রা দেখতে যাওয়া আছে।

হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা চলছে। রোদ্দুর পড়ে এলেই শীত যেন হা-হা করে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ে। তুফানের মন্থরগতি মোপেডের পিছনে বসেও ঠকঠক কাঁপছিলেন শিবসুন্দর। নীচে একটা গরম গেঞ্জি পরেছেন, তার ওপরে গলাবন্ধ ফুলহাতা সোয়েটার, মাথাও মাফলারে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া, তবু যেন হিমসূঁচ বিঁধে যাচ্ছে শরীরে। হাত মুখ অবশ ক্রমশ। নাকের ডগা চিনচিন করছে।

প্রবল শীতেও তুফানের কোনও হিলদোল নেই। বকবক শুরু করল, —দেখলে তো তোমার

তমাল ডাক্তারের কাণ্ড ? আমি আগেই বলেছিলাম লোকটা ভাল নয়।

—কেন, খারাপ কী করেছে ?

—অত সব টেস্ট কেন করতে বলেছে বুঝলে না ? কমিশন খাবে, কমিশন। আমার তো মনে হয় ওর কলকাতার প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর সঙ্গেও জানাশুনো আছে। ওখান থেকেও টু পাইস ঝাড়বে।

—তোর অভ্যেসটাই খারাপ হয়ে গেছে তুফান। শুধু লোকের মন্দটা দেখিস।

—ভাল কিছু যে দেখতে পাই না বাবা। মাটির রাস্তায় সন্তর্পণে একটা গর্ত এড়াল তুফান,—দত্তর পো'র মুখে শুনলে তো পঞ্চায়েত অফিসে দেখা হয়েছিল। ডাক্তার কেন পঞ্চায়েত অফিসে যায় ?

—হয়তো কোনও কাজ ছিল। হয়তো পঞ্চায়েত অফিস কোনও ক্লিনিক-টিনিক খুলবে।

—আমি সাত গাঁ চরে বেড়াচ্ছি, ক্লিনিক খোলার কথা চললে আমি জানতে পারতাম না ? নাকি তোমাকে শোনাত না ? হেলথ সেন্টারে সাত মাস ডাক্তার নেই, তাই নিয়ে তাপ-উত্তাপ দেখি না... আসল কথা কি জানো বাবা, তুমি আছ বলে রামনগরে ওর পশার জমছে না। কজন লোকের ক্ষমতা আছে তিরিশ টাকা ফি দিয়ে ওর কাছে যাওয়ার ? আর তুমি থাকতে যাবেই বা কেন ! কলে গেলে আবার সাহেবের ডবল ভিজিট ! হুঁহ। দায়ে ঠেকেই এখন পার্টির লোকেদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি শুরু করেছে।

—তোর আবার উদ্ভট চিন্তা। কল্পনা করতে শুরু করলে গল্পের গরুকে ডানা লাগিয়ে দিস।

—মিলিয়ে নিয়ো। ইলেকশানে তুমি কোনও পার্টির কোনও কম্মে লাগলে না। সবাই তোমার ওপর এমনিতেই চটে আছে। আগেরবার সুবিধে হয়নি, এবার কোনও না কোনও ছুতোয় একটা বড় ঝামেলা পাকাবে। কেউ না কেউ। তমাল বাগচি হল কাঁটা তোলার কাঁটা।

—অত সোজা ! এটা আমার দেশগাঁ, এখানকার লোক আমাকে ভালবাসে, পছন্দ করে। আমি জানি।

—মানুষের ভালবাসাতে বিশ্বাস কোরো না বাবা। মানুষ বড় স্বার্থপর জীব। আপনি কোপনি নিজের ঘরগেরস্থালি সামলে-সুমলে, গুছিয়ে-টুছিয়ে, যতটুকু ভালবাসা দেখানো যায়, ততটুকুই দেখায়। তার বেশি ভালবাসার সাধ্য নেই মানুষের।

তুফান যে খুব একটা ভুল বলছে না, বোঝেন শিবসুন্দর। বিপদ দেখলে ছেলেমেয়েরাই বাবা-মাকে ছেড়ে পিঠটান দেয়, আর এ তো সামান্য গাঁয়ের লোক। মানুষ যেন কেন্নোর স্তরে নেমে যাচ্ছে দিন দিন। বুকের দুঃখটা চেপে হাসলেন শিবসুন্দর,—এই ঠাণ্ডাতেও তোর তো বেশ গরম গরম লেকচার বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে !

—ঠাণ্ডাতেই তো বেরোবে।

—হুঁ। দেখে চালা।

মদন দত্তদের বেলপুকুর থেকে মাধবপুর বেশ খানিকটা পথ। মাঝে একটা আমবাগান পড়ে। জায়গাটা নিরাপদ নয়। ইলেকশানের পর পরই দু-দুটো লাশ পড়েছিল বাগানে। একজন রিভলভারের গুলিতে মরেছিল, অন্য জনের গলার নলি চপারে কেটে দিয়েছিল শত্রুপক্ষ। নির্বাচনী মহাসংগ্রামের জের।

ঝাঁকড়া বৃক্ষরাজির মাঝ বরাবর বয়ে চলা সরু অন্ধকার রাস্তাটা হেডলাইটের আলোয় দ্রুত পার হয়ে গেল তুফান। শিবসুন্দর অন্যমনস্ক। একটা চাপা বিষণ্ণতা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে। গ্রামীণ কূটকচালির কথা ভাবছেন না তিনি, তমাল ছেলেটার কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসছে। ছেলেটাকে দেখে অন্য এক ধরনের ধারণা জন্মেছিল মনে, ভেঙে যাচ্ছে। কোন ধারণাই বা জীবনভর অটল থাকে ? নিজের ছেলেও যে ডাক্তারিকে ব্যবসা হিসেবে নেবে তাই কি তাঁর ধারণায় ছিল ? ধারণা, না প্রত্যাশা ? মানুষ পরের প্রজন্মকে নিজের ছাঁদেই গড়ে তুলতে চায়। ভুল। হয় না তা। সময় মানুষকে ভেঙে চলেছে অবিরাম। আজ যে মূল্যবোধটা সত্যি ছিল, কালই হয়তো তার

আর কোনও দাম নেই। আজ যে বিশ্বাসকে ধ্রুব মনে হয়, কাল সেটা ভুয়ো হয়ে যায়। তবে কি শিবসুন্দরের নীতিবোধও শুধুই এক মনগড়া ভ্রান্ত অহঙ্কার ? আপন সময়ের মায়াকাজল পরে শুভাশিস তমালদের ঠাহর করতে পারছেন না তিনি ? হায় রে সময় !

মোপেড বাড়ির সামনে পৌঁছতেই অলকা বারান্দায় বেরিয়ে এল। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—আপনাদের এত দেরি হল বাবা ?

পুলওভারের হাতা গুটিয়ে ঘড়ি দেখলেন শিবসুন্দর,—দেরি কোথায় ? সবে তো সাড়ে সাতটা ! তোমাদের শো কটায় ?

—সে দেরি আছে। নটায়। অলকা যেন সামান্য লজ্জা পেল,— ভাবছিলাম আপনারা খেয়ে নেবেন...মা'র খাবারটাও রেডি করে দিয়ে যাব...

শিবসুন্দর মুচকি হাসলেন। অলকার খুব যাত্রা সিনেমা দেখার নেশা। গত রবিবার বেতিয়ায় গিয়েছিল, আজ যাবে রামনগর। অলকার টিভি দেখার নেশাও খুব, তবে জ্যান্ত এন্টারটেনমেন্টের বোধহয় মজা আলাদা। গ্রামদেশে এই শীতকালটায় কিছু যাত্রাপার্টি আসেও বটে। রোজ কোথাও না-কোথাও চলছে। চাষির ঘরে ধান বিক্রির টাকা উঠলেই অধিকারী বাবুদের যেন হাত শুলোয়। দুটো পয়সা জমানোর উপায় নেই, নাচ গান হাসি কান্না দেখিয়ে চেঁছে নিয়ে চলে যায় সব। তা যাক। শিবসুন্দরের আপত্তি শুধু টুকিকে নিয়ে। এই শীতের রাতে ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে... ! আজও সকালে মেয়েটা খকখক কাশছিল।

শিবসুন্দর মেজাজটাকে খারাপ হতে দিলেন না। হাসিমুখেই বললেন,—আজ তোমাদের কি পালা ?

টুকি মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে। টক করে জবাব দিল,—পালা নয় গো দাদু, যাত্রা।

—ওই হল। শিবসুন্দর এগিয়ে টুকির গাল টিপে দিলেন,—যাত্রার নাম কি ?

টুকি ঘুরে তুফানের দিকে তাকাল,—কী নাম গো বাবা ?

—বাবা বলবে কেন ? তুমিই বলো।

টুকি চোখ পিট পিট করল,—বাগি শাশুড়ি নাগি বউ ?

তুফান শব্দ করে হেসে উঠল,—বাগি নয় রে বোকা, বাঘিনী। বাঘিনী শাশুড়ি নাগিনী বউ। খাসা নাম হয় আজকাল যাত্রাগুলোর। গেল রোববার যাত্রটার নাম আরও মজাদার ছিল। বউ এম এল এ স্বামী জেলে।

—বাহ, বেশ জেল্লাদার নাম তো !

—এখন যে জেল্লারই যুগ বাবা।

—ভাল ভাল। দেখ গিয়ে। শিবসুন্দর টুকির চুল ঘেঁটে দিলেন,— ভাল করে মেয়েটার মাথাটাথা ঢেকে নিয়ে যাস। আর অলকা, কাল কিন্তু আমি খুব সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, মাথায় আছে তো ?

অলকা ঘট করে মাথা নাড়ল।

—তুফানকে আবার কারুর সঙ্গে আড্ডায় জমে যেতে দিয়ো না। আমি কিন্তু তোমরা না ফেরা অবধি জেগে থাকব।

—শো ভাঙলেই চলে আসব বাবা।

শিবসুন্দর টুকিকে কোলে নিয়ে ভেতর বারান্দায় এলেন,—কাল কলকাতায় যাচ্ছি রে বেটি। তোর দাদার বাড়ি। তোর জন্য কী আনব ?

বিচিত্র মুখভঙ্গি করে ভাবল টুকি,—দাদা আমাকে একটা এরোপ্লেন দেবে বলেছিল। সাঁ সাঁ করে উড়ে যায়।

—এখন থেকেই ওড়ার শখ ! ভাল।

বাইরে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে গেলেন শিবসুন্দর। তাঁর আহার পরিমিত, বাহুল্যবর্জিত। আলু

কপি কড়াইশুঁটি টোম্যাটো দিয়ে একটা হালকা তরকারি, পেঁপের ডালনা, গোটা তিনেক রুটি, আর আধবাটি দুধ।

অলকা রুটি সেঁকছিল। শিবসুন্দর ঠাণ্ডা রুটি খেতে পারেন না, এইটুকুই যা তাঁর বিলাসিতা। শিবসুন্দরের পাতে গরম গরম রুটি সাজিয়ে দিতে দিতে অলকা বলল,—দুটো ভাল দেখে ফুলকপি তুলে রেখেছি বাবা। আপনার ব্যাগে ভরে দিচ্ছি।

—কী দরকার ছিল ? কলকাতাতে কি কপি পাওয়া যায় না ?

—সে তো বাজারের কপি। এ হল ক্ষেতের।

—কপি বাজারে ফলে না অলকা, ক্ষেতেই ফলে।

—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছেন বাবা ? এ হল নিজেদের ঘরের জিনিস।

নিজেদের ঘর ! শুভ কি তাই মনে করে ? মাধবপুরে বাবার বাড়িতে অতিথির মতো আসে ছেলে। কলকাতায় ছেলের বাড়িতে অতিথি হয়ে যায় বাবা। এর মাঝে নিজেদের শব্দটা কি বড় হাস্যকর শোনায় না ?

অলকা আবার বলে উঠল,—টোটো কপির রোস্ট খুব ভালবাসে বাবা। দিদি নাকি খুব ভাল বানায়। কপি বড় বড় টুকরো করে কেটে...

—তুমি রাঁধতে জানো না ?

—জানি। একটা পত্রিকা পড়ে শিখেছি। টিভিতেও দুপুরে দেখাচ্ছিল একদিন।

—রাঁধো না কেন ?

তুফান খাওয়ার মাঝে বলে উঠল,—ও অনেক ঘি-মশলার রান্না, ও তুমি খাও না।

—বাবা তো ঠিকই করেন। এই বয়সে রিচ রান্না খাওয়া ভাল নয়।

—তুমি আর ক'দিন দেখছ বাবাকে ! বাবা চিরকালই এরকম খান। পাতলা পাতলা ঝোল, মশলা ছাড়া তরকারি...

কথাটা যেন চিমটি কাটল বুকে। মনোরমার হাতের রান্না ক'দিনই বা জুটেছে শিবসুন্দরের, স্বাদও তার ভুলে গেছেন, জীবনটা তো কাটল কাজের লোকের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে। তাদের রান্নায় বেশি তেল-মশলা পড়লে কি এতদিন সুস্থ থাকতেন শিবসুন্দর !

আত্মগতভাবে শিবসুন্দর বললেন,—আমার ট্যালটেলে রান্নাই ভাল। শরীরের জন্য আহার, না আহারের জন্য শরীর, অ্যাঁ ?

খাওয়া সেরে দোতলায় এলেন শিবসুন্দর। ঘরে গেলেন না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালেন একটা। নীচের ঘরে তালা মেরে বেরোচ্ছে তুফানরা। শিবসুন্দর তুফানদের চলে যাওয়া দেখছিলেন। বড় মায়াবী এক চাঁদ উঠেছে আকাশে, পরশু বা তার আগের দিন বোধহয় পূর্ণিমা ছিল, মোমজ্যোৎস্নায় বহু দূর স্পষ্ট দেখা যায়। চাঁদের আলোয় ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে তুফানের মোপেড। যান্ত্রিক গর্জন কমতে কমতে মুছে গেল, তবু কান পেতে রইলেন শিবসুন্দর।

সহসা বুকটা কেমন ধড়াস করে উঠল শিবসুন্দরের। গর্জন তুলে সপরিবারে তুফানের ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এই জনহীন শীতার্ত রাত, এই আলোছায়ার ভৌতিক খেলা হঠাৎ কেমন যেন নিঃসঙ্গ করে দিল শিবসুন্দরকে। নিজেকে কী ভীষণ একা লাগছে !

ক্ষণ পরেই একা একাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন শিবসুন্দর। কী অর্থহীন চিন্তা ! মানুষ তো চিরকালই নিঃসঙ্গ। কি ভিড়ে, কি নির্জনে। নিজের চারদিকে প্রিয়জনের বলয় সৃষ্টি করে বৃথাই সেই নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে চায় মানুষ। হায় রে মানুষ !

ঘরে ঢুকে শিবসুন্দর দেখলেন মনোরমা জেগে আছেন। দৃষ্টি কড়িকাঠে স্থির, যেমন থাকে। বিকেলে বোধহয় অলকা একটু সাজিয়ে দিয়েছিল, দুই ভুরুর মাঝে জ্বলজ্বল করছে ছোট্ট লাল টিপ, সাদা চুলের মাঝে চওড়া সিঁথিতে সিঁদুররেখা। গলা অবধি লেপে ঢাকা, চিবুক ওঠানো, মাথা বালিশের পিছনে সামান্য ঝুলে আছে। পাশ থেকে হঠাৎ দেখলে শুভর মুখ মনে পড়ে যায়।

মনোরমা তাঁর মুখের অনেকটাই দিয়ে দিয়েছেন ছেলেকে।

শিবসুন্দর স্ত্রীর ললাটে হাত রাখলেন,—মনো ওঠো, খেতে হবে এবার।

জামবাটিতে খই-দুধ রেখে গেছে অলকা। স্ত্রীর ঘাড়ে আলগা হাত রেখে তাঁকে বসালেন শিবসুন্দর। চামচ দিয়ে একটু একটু করে খাওয়াচ্ছেন।

খাচ্ছেন মনোরমা। রোবটের মতো।

শিবসুন্দর কথা শুরু করলেন,—কাল আমি শুভর কাছে যাচ্ছি মনো।

মনোরমার কণ্ঠনালি বেয়ে খানিকটা খই-দুধ নেমে গেল।

—তোমার ছেলেটা কেমন হয়ে গেল মনো! কী যে এক মরীচিকার পেছনে ছুটছে! বউটার দিকেও তাকানোর সময় পায় না। আমি কিন্তু কাল গিয়ে ওকে খুব বকব, তুমি রাগ করতে পারবে না।

মনোরমা কি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন? নাকি ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে গেল বন্ধ জানলা?

—তুফান বলছিল ছন্দা নাকি খুব ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখের নীচে কালি জমেছে। ইউটেরাসে ফাইব্রয়েড পুষে রেখেছে, মেনোরেজিয়া হচ্ছে নির্ঘাত। নইলে কি চেহারা অমন অ্যানিমিক হয়ে যায়! কি স্টেজে সব আছে কে জানে! এই তো সেদিন রামনগরের বউটার কি হল? হিস্টেরেকটোমির জন্য পেট ওপেন করেও অপারেশন থামিয়ে দিতে হল। কলকাতার অত বড় গাইনি, অত বড় হাসপাতালও কারসিনোমা সারভিক্সের স্টেজ দেখে আর এগোনোর ভরসা পেল না। বেচারা বউটাকে এখন রেখে এসেছে কলকাতায় ভাইয়ের বাড়িতে। রেগুলার রে চলছে। অথচ আমি ওর বরটাকে এক বছর আগে অপারেশানের কথা বলেছিলাম। ভেবে দ্যাখো, ছন্দার যদি ওইরকম কিছু একটা...কমলেশবাবু তো আমারই ভরসায় মেয়েটাকে দিয়েছিলেন একদিন! টোটোও নাকি সারা দিন হাঁড়িমুখ করে থাকে। ওদের সংসারটা কেন অমন হল মনো?

বুকের সব উদ্বেগ উগরে এক সময়ে থামলেন শিবসুন্দর। মনোরমার শোওয়ার বন্দোবস্ত করে উঠে টেবিলচেয়ারে গিয়ে বসলেন। ড্রয়ার খুলে ডায়েরি বার করেছেন।

দিনপঞ্জি লিখছেন শিবসুন্দর। দিনপঞ্জি, না জীবনপঞ্জি?

ছুটির দিন, তায় শীতের সকাল, তারকেশ্বর লোকাল আজ প্রায় ফাঁকা। বেশির ভাগ জানলার শার্সি নামানো, তবু যাত্রীরা সব গুটিসুটি মেরে বসে আছে। তাদের আরও ভয় দেখাতে চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজা দিয়ে হানা দিচ্ছে কনকনে বাতাস। একটা লোক মাথা মুড়ি দিয়ে বেঞ্চে শুয়ে পড়ল।

শিবসুন্দর চোখ বুজলেন। মনোরমাকে ফেলে কলকাতাতে তিনি যান না বড় একটা। কোথায়ই বা যান! টোটোর পরীক্ষার আগে সেই একবার কলকাতা গিয়েছিলেন, তাও প্রায় বছর ঘুরতে চলল। শহরটা কি এর মধ্যে আরও গভীর জঙ্গল হয়ে গেছে!

ট্রেনের দুলুনিতে ঘোর নামছিল চোখে, হঠাৎ চিৎকারে চটকা ভেঙে গেল শিবসুন্দরের। এক তাগড়াই জোয়ান গাঁক গাঁক চেঁচাচ্ছে,—দেখুন বাবুরা, খেলা দেখুন। সার্কাসের খেলা দেখুন।

ছেলেটার বয়স বছর তিরিশেক হবে। এই শীতেও পরনে একটা হাফপ্যান্ট আর মোটা গেঞ্জি। চেনা চেনা লাগে যেন!

আচমকা দু হাত তুলে ট্রেনের প্যাসেজের দুটো হ্যান্ডেল চেপে ধরল ছেলেটা। হাতের চাড়ে উঠে যাচ্ছে শরীরটা। ঝুলন্ত শরীর দোল খাচ্ছে, দোল খাচ্ছে..., থেমে গেল হঠাৎ। এবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শূন্যে ঘুরছে বনবন। দক্ষ ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের মতো এক জোড়া হাতল থেকে অন্য জোড়ায় উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। সিটের কোনায় জোর ঠোক্কর লেগে মুখ বিকৃত হয়ে গেল, তাও পরোয়া নেই।

শিবসুন্দরের চোখ বিস্ফারিত। কামরার আর সব যাত্রীও টানটান।

শূন্যে বেশ খানিকক্ষণ কসরত দেখিয়ে কয়েক সেকেন্ড জিরোল লোকটা। ঘামছে। প্যাসেজে নিজেরই রাখা একটা থান ইট তুলে নিল। ভাঙল কপালে ঠুকে। একটা পাথরের টুকরো উরুতে রেখে হাতের আঘাতে দু টুকরো করল। উরু ফেটে রক্ত ঝরছে চিনচিন, ছেলেটা নির্বিকার।

খেলা শেষ। কামরায় ঘুরে ঘুরে পয়সা চাইছে যাত্রীদের কাছ থেকে। দু-চারজন সিকি আধুলি দিল, বেশির ভাগই উদাস।

ছেলেটা সামনে এসে হাত পাততেই একটা দু টাকার নোট বার করে দিলেন শিবসুন্দর। তখনই ছেলেটাকে চিনতে পারলেন। তাঁর চেম্বারে এসেছিল একদিন। বেতিয়া থেকে। মাথার একটা পুরনো কাটা সেপ্টিক হয়ে গিয়েছিল।

শিবসুন্দরের শিউরোনো গলা থেকে শব্দ ছিটকে এল,—উফ কী জীবন!

ছেলেটা হাসল,—কিছু বললেন ডাক্তারবাবু?

—ও রকম বিপজ্জনক খেলা কেন দেখাও?

—বেঁচে তো থাকতে হবে।

—আর কিছু করতে পারো না? অন্য কোনও কাজ?

—জোটেনি যে।

—এই কাটাছেঁড়া ঘা রক্তপাত...পা-টাও তো যাচ্ছে! এটা কি একটা বেঁচে থাকার উপায়?

—মন্দ কী ডাক্তারবাবু? ধরাকরা করতে হয় না, ভিক্ষেও চাইছি না...

—কোনও দিন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে, তখন বুঝবে। ভাল লাগে এভাবে বাঁচতে?

—লাগাতেই হয়। ছেলেটা ঝকঝকে দাঁত ছড়িয়ে হাসল,—কোনওভাবে একটা তো বাঁচতেই হয়। বেঁচে থাকাটাই সুখ। বেঁচে থাকাটাই আনন্দ।

কথাটা শিবসুন্দরের মনে রয়ে গেল।

৪৪

অথর্বপ্রায় বৃদ্ধ মারা গেলে শ্রাদ্ধের দিন বাড়িতে আর তেমন শোকের ছায়া থাকে না। কাল অবধি বাড়িটায় একটা চাপা থমথমে ভাব ছিল, তা যেন হঠাৎ কেটে গেছে, আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীর ভিড়ে আমূল বদলে গেছে চেহারা। ছাদে সাদা ম্যারাপ বেঁধে খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, দোতলা একতলা সব ঘরেই অতিথিদের বসার আয়োজন। বড় ঘরের সামনে ফালি জমিটাও সাদা কাপড়ে ঢাকা, সেখানে বিমর্ষ মুখে চেয়ারে বসে আছেন জনাকয়েক বৃদ্ধ। জয়মোহনের বন্ধু। হঠাৎ হঠাৎ কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে তাঁদের, বুঝি বা মনে মনে হিসেব কষছেন তাঁদের মধ্যে আর কজন পড়ে রইলেন এ পারে।

শুভাশিস গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। অনেকক্ষণ এসেছে, এ বাড়িতে ভিড়ও বাড়ছে ক্রমশ, এবার মানে মানে কেটে পড়লেই হয়।

ভেতরবাড়ি থেকে একটা হট্টগোল শোনা গেল। কে যেন চেঁচিয়ে ডাকছে কাকে। ভারী শরীর নিয়ে থপ থপ করে বড় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল জয়শ্রী। তাকাচ্ছে এদিক সেদিক,—শুভাশিসদা, তিতিরকে দেখেছেন?

শুভাশিস দু পা এগোল,—এই তো একটু আগে প্রেসঘরে গেল।

—দেখুন তো কী কাণ্ড! কখন ওদের ভুজ্যি দেওয়া হয়ে গেছে, অ্যাটমকে কখন খাইয়ে দিলাম, আর মেয়েটাকে কোথাও ধরতে পারছি না!

শুভাশিস বলল,—দুজন বন্ধু এসেছে দেখলাম, তাদের সঙ্গে গল্প করছে বোধহয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রেসঘরের দিকে যাচ্ছে জয়শ্রী। দামি গরদের শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছে

মেঝেতে। গা ভর্তি গয়না। এই সেদিন শ্মশানে বাবার জন্য কী আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদছিল, আজ বাবার মৃত্যু শুধুই এক পারিবারিক অনুষ্ঠান! মৃত্যুশোক ব্যাপারটাই বোধহয় এরকম। কালবৈশাখীর মতো আসে, কয়েক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে চলেও যায় তাড়াতাড়ি। অথবা এই সব আচার অনুষ্ঠানগুলোই শোককে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ দেয় না।

জয়শ্রী ফিরছে। একাই।

শুভাশিস জিজ্ঞাসা করল,—তিতির এল না?

—আর বলবেন না। বাবা যতক্ষণ খাবে না, মেয়েও উপোস থাকবে। কোনও মানে হয়! দাদা কখন কাজ থেকে উঠবে তার ঠিক আছে?

শুভাশিসের বুকের ভেতর দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল। নিচু গলায় বলল,—জোর করলে না কেন? শরীর খারাপ হবে যে।

—সে কথা কে বোঝায়! বাপ-অন্ত প্রাণ। দেখুন না, আপনি যদি ধমকে ধামকে পাঠাতে পারেন।

জয়শ্রী চলে গেল। প্রেসঘরের দিকে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল শুভাশিস। সে বললেই কি তিতির শুনবে? থাক, যেচে আঘাত পেতে আর ভাল লাগে না।

সিগারেট নিবিয়ে পায়ে পায়ে আবার জয়মোহনের ঘরের দরজায় এল শুভাশিস। শ্রাদ্ধের কাজ চলছে এখনও। সুদীপ কন্দর্প ইন্দ্রাণী রুনার কাজ অনেকক্ষণ শেষ, মাঝে একবার অল্প সময়ের জন্য উঠেছিল আদিত্য, এখন আবার একভাবে চোখ বুজে মন্ত্র পড়ে চলেছে। পাশে এখনও ইন্দ্রাণী, তার চোখ জলচৌকিতে রাখা জয়মোহনের বাঁধানো ছবিতে স্থির। পুরোহিতের পিছনে ক্যালেন্ডারের বিবেকানন্দর পোজে দাঁড়িয়ে আছে শংকর, তার হাবভাব দেখে মনে হয় সেই যেন আজ গোটা অনুষ্ঠানটার পরিচালক। জয়মোহনের খাট খুলে সরিয়ে রাখা হয়েছে, আসবাবপত্র সব দেওয়ালের দিকে সরানো, ইজিচেয়ারটা নেই। ফাঁকা ফাঁকা ঘর, ঘরের মধ্যিখানে শ্রাদ্ধের উপকরণ, ফুল আর ধূপের উগ্র সুরভি, জলচৌকিতে মালায় মালায় ঢাকা জয়মোহন, মুণ্ডিতমস্তক আদিত্য, তার পাশে নতুন লালপাড় সাদা শাড়িতে সহধর্মিণীর বেশে বিষাদপ্রতিমা ইন্দ্রাণী—গোটা দৃশ্যটাই যেন অচেনা ছবি।

ঝান্টু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল,—বাবা, মেজমামা জিজ্ঞেস করছে এখন কি ব্যাচ বসানো যাবে?

শংকর চোখ ঘোরাল,—বাজে কটা?

—একটা বাজতে দশ।

—সে কি রে, এত বেলা হয়ে গেল? বলেই নিচু হয়ে কি যেন ফিসফিস করল পুরুতমশাইয়ের কানে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—আর মিনিট কুড়ি ওয়েট কর।

—ক্যাটারাররা ঝামেলা করছে। রাধাবল্লভি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—পার ব্যাচ কজন বসবে?

—ছাদে চল্লিশজনের বেশি হবে না।

—দোতলার প্যাসেজে জনাদশেক বসানো যায় না?

—আমি বলেছিলাম। মেজমামা বলছে লোকজনের হাঁটাচলার অসুবিধে হবে। ক্যাটারাররাও ওপর নীচ করবে না।

—যত সব ক্যালাস আইডিয়া। সেই পাঁচটা ব্যাচ হয়ে যাবে। যা, বসিয়ে দে। শংকর শুভাশিসের দিকে তাকাল,—আজকাল আর সব নিয়ম কানুন মানতে গেলে চলে না, তাই না ডাক্তারবাবু?

শুভাশিস ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না। আলগোছে ঘাড় নেড়ে দরজা থেকে সরে এল। আশপাশে এত অপরিচিত মুখ! যেসব আত্মীয় জ্ঞাতিদের সঙ্গে সাতজন্মে সম্পর্ক নেই, তাদেরও এ সব অনুষ্ঠানে ডেকে আনতে হয়! কী বিচিত্র সামাজিক নিয়ম!

বড় ঘরে এসে ক্ষণকাল দাঁড়াল শুভাশিস। সোফা টেবিল সরিয়ে এ ঘরে ঢালাও শতরঞ্চি পাতা হয়েছে, এক দিকে কিছু মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে, অন্য প্রান্তে এক পাল বাচ্চা ক্যালরব্যালর করে ছোটাছুটি করছে। রুনার বড়দির মেয়েটাকে আলটপকা একটা ধাক্কা দিল অ্যাটম, মেয়েটা চিলচিৎকার জুড়েছে।

শংকর এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। আড়মোড়া ভেঙে বলল,—ভালয় ভালয় কাজটা চুকলে বাঁচি। রাত্রে যা একটা টেনে ঘুম মারব না!

শুভাশিস চোয়াল ফাঁক করল,—হুঁ, আপনার খুব ধকল যাচ্ছে।

—জামাইকে তো ডিউটি করতেই হবে। বলেই গলা নামাল শংকর,—এ বাড়ির ছেলেগুলো একটাও কম্মের না। ছোটটা ময়ূর ছাড়া কার্তিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিনেমার দোহাই দিয়ে শালা মাথাটা পর্যন্ত নেড়া করল না। মেজ শ্বশুরবাড়ির লোক সামলাতেই ব্যস্ত। আর বড়টা তো বাপের শোকে গবা পাগলা। কাল ঘাটকামানের দিন কী করেছে জানেন? বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সোজা গঙ্গায় নেমে যাচ্ছিল। আমি না থাকলে কাল থেকে আরেক সেট অশৌচ শুরু হয়ে যেত।

শোক নিয়ে সত্যিই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে আদিত্য। এই দেওয়ালে মাথা ঠুকছে, এই কপাল চাপড়াচ্ছে! আজও কাজে বসে হেঁড়ে গলায় ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। এই দরদটা আগে এলে বাবাটাকে এত তাড়াতাড়ি মরতে হত না। মনে মনে ভাবলেও কথাগুলো অবশ্য শংকরকে বলল না শুভাশিস। জামাই মোটেই সুবিধের নয়। ছোট্ট কথাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কিভাবে রাষ্ট্র করবে তার ঠিক কি! প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল,—আপনার ছেলেটাও তো দেখছি খুব খাটছে।

—ঘিলু তো নেই, ওইটিই পারে।

—ওভাবে বলছেন কেন? আপনার ছেলে তো বেশ সাদাসিধে।

—তা ঠিক। ছেলের আমার মনটা পরিষ্কার। খেলাধুলো করে তো, ময়লা জমার সুযোগ পায় না। শংকর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল,—ছেলের আমার বড় আফসোস রয়ে গেল। শ্বশুরমশাই এতদিন লড়লেন, আর বছর দুই যদি টেনে দিতে পারতেন...

শুভাশিস জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

—ছেলেটার বড় শখ ছিল বড় টিমে খেলবে, দাদু টিভিতে ওর খেলা দেখবে...

কত রকম যে আফসোস থাকে মানুষের! শুভাশিস হাসি চাপল।

শংকর পাঞ্জাবির পকেট থেকে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট বার করেছে। একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে প্যাকেট বাড়িয়ে দিল শুভাশিসের দিকে,—চলবে?

হাত বাড়াতে গিয়েও থামল শুভাশিস। এ ঘরে সে সিগারেট ধরায়নি কোনওদিন। একটা মানুষ চলে যেতেই ঝটিতি নিয়মটা ভেঙে ফেলা কি খুব জরুরি? শুভাশিসের মনে কোনও সংস্কার নেই, ইন্দ্রাণীর শ্বশুরমশাইয়ের জন্য বিশেষ কোনও আবেগও নেই, তবু যেন বাধছে কোথায়। শুভাশিস বলল, —ভেতরটা বড় স্টাফি। বাইরে যাই চলুন।

গেটের বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়েছে দুজনে। পৌষের দুপুর মিঠেকড়া রোদের প্রলেপ মাখাচ্ছে গায়ে। ধুলো উড়ছে অল্প অল্প। এক ভিখারিণী কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে। খাবারের গন্ধ পেয়ে দু-চারটে রাস্তার কুকুরও।

শুভাশিসের গাড়ির পিছনে একটা মারুতি ভ্যান এসে দাঁড়াল। প্রায় নিঃশব্দে। দরজা খুলে একটা লোক নামছে। কলো গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। ঘিয়ে রঙ সিল্কের পাজামা পাঞ্জাবির ওপর দামি উলেন জ্যাকেট। হাতে শালপাতায় মোড়া প্রকাণ্ড মালা।

লোকটাকে দেখেই শংকর এগিয়ে গেছে,—আসুন দাদা।

লোকটা আলতো হাসল,—কাজকর্ম সব চুকে গেছে?

—প্রায়। পিণ্ডদান চলছে। দাঁড়ান, চাঁদুকে ডাকি। বলেই বাড়ির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে শংকর। মিনিট খানেকের মধ্যে কন্দর্পকে নিয়ে বেরিয়ে এল। কন্দর্পও খুব আপ্যায়ন করে

লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে। নির্ঘাত ফিলম কোম্পানির কোনও কেউকেটা হবে।

শংকর পাশে এসে মিটিমিটি হাসল,—আজ বোধহয় চাঁদুর নিমন্ত্রিতই সব থেকে বেশি। দুটো ক্যামেরাম্যান এল, কো-আর্টিস্টরা আসছে...কিছুক্ষণ আগে তো নায়িকাও এল। দেখেছেন মেয়েটাকে ? দারুণ সুন্দরী। কী ফিগার ! কে বলবে এক বাচ্চার মা !

শুভাশিস হেসে বলল,—না, আমি দেখিনি।

—আরে দেখেননি, আপনার সামনে দিয়ে তো ওপরে নিয়ে গেল চাঁদু ! সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল !

ওহ, মধুমিতার কথা বলছে শংকর। কন্দর্প ইন্দ্রাণীর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে মেয়েটাকে। শুভাশিস একবার ও ঘরে গিয়েছিল, ধীরাজ উমার সঙ্গে দেখা করার জন্য, তাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল মধুমিতা।

সবজান্তা শংকরের অজ্ঞতায় মজা পেল শুভাশিস, কিন্তু প্রসঙ্গটাও এড়িয়ে গেল। কি শুনে কি কুৎসা গাইবে লোকটা তার ঠিক আছে !

শুভাশিস সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল,—তা এই ভদ্রলোকটি কে ?

—একে চেনেন না ! গ্রেট অশোক মুস্তাফি। এইই তো এখন এ বাড়ির কিম্যান। মিস্টার আলাদিন।

শুভাশিসের ভুরু জড়ো হল।

—অশৌচের ক'দিন বাড়িতে যে ফল মিষ্টির পাহাড় জমছিল, পাঠিয়েছে কে ? কুটুমবাড়ি থেকে নতুন জামাকাপড় আসার আগে মুস্তাফির ধুতি-শাড়ি পৌঁছে গেল।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু লোকটা কে ? চাঁদুর কোনও প্রোডিউসার বুঝি ?

এবার শুভাশিসের অজ্ঞতায় যেন মজা পেল শংকর,—প্রোডিউসার তো বটেই, তবে এ বাড়িতে ওটা সেকেন্ডারি পরিচয়।

—মানে ?

—কেন, বড়বউদি এর মধ্যে আপনাকে কিছু বলেনি ?

শুভাশিস একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। ইন্দ্রাণী পছন্দ করে না শংকরকে, ছোট জিনিসকে বড় করে দেখানো শংকরের স্বভাব, একে কি আর বেশি প্রশ্ন করা উচিত ? তবু কৌতূহলটাও চাপতে পারল না। বলল,—না। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার তেমন কোনও কথা হয়নি। মেসোমশাইয়ের মৃত্যুতে এমন আপসেট হয়ে আছে...

—আপসেট নয় মশাই, এ বাড়ির সবাই এখন নিশ্বাস চেপে ধরে আছে। শংকর গলা নামাল,—আপনি ঘরের লোকের মতো, আপনাকে বলাই যায়। না বললেও আপনি আজ নয় কাল তো জানতেই পারবেন। গলা আরও নিচু করল শংকর,—মুস্তাফি এখন আর শুধু চাঁদুর প্রোডিউসার নয়, উনি এখন বড়বৌদির লোক।

কথাটা বুলেটের মতো বিঁধল শুভাশিসকে।

শংকর কি লক্ষ করল প্রতিক্রিয়া ? ধূর্ত হাসি হাসছে,— বাপ্পাবাবু যে দাদুর অশৌচের মধ্যেই ড্যাং ড্যাং করে জাহাজ কোম্পানির ট্রেনিং নিতে চলে গেলেন, তার খরচটা দিল কে ?

—খরচা মানে ?

—যাচ্চলে, আপনি কিছুই জানেন না ? মৌজ করে আর একটা সিগারেট ধরাল শংকর। ঠিক মাথার ওপর একটা কাক বসেছে গাছে, সরে গেল খানিকটা। হুশ হুশ করে তাড়াল কাকটাকে। তুরীয় মেজাজে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—আমার গিন্নি বলছিল ট্রেনিং-এর খরচ নাকি চল্লিশ হাজার। আমার বিশ্বাস হয় না। অত মাইনের চাকরি, মিনিমাম লাখ খানেক লেগেছে। সেই টাকা বড়বউদি নিয়েছে ওই মুস্তাফির কাছ থেকে।

আর একটা বুলেট বিঁধল শুভাশিসকে। টকটকে লাল হয়ে গেল মুখ।

শংকর ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে বলল,—নিশ্চয়ই আপনার মনে প্রশ্ন জাগছে মুস্তাফি কেন দিল টাকাটা ? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। বিকজ অফ দা ম্যাটার হল গিয়ে বউদি বাড়িটার বিলিবন্দোবস্ত সেরে ফেলেছে। ওই মুস্তাফি বাড়ি ভাঙবে, ফ্ল্যাট বানাবে। মুস্তাফিকে কাজটা পাইয়ে দিয়ে বাপ্পার আখেরটা গুছিয়ে নিল বড়বউদি।

বুলেটবিদ্ধ শুভাশিস যন্ত্রণাটাকে সহ্য করতে দাঁতে দাঁত চাপল।

—আমি তো ভাবছি নিয়মভঙ্গের পর বউদিকে একটা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করব। তিন ভাই যা নিয়ে লাঠালাঠি করল, আমার গিন্নি যে কথা পাড়তে গিয়ে বাপের কাছে জুতো পেটা খেল, সেই কাজই বউদি কী মাখন করে সমাধা করে ফেলল! শংকর চক্রান্তকারীর মতো ফিস ফিস করে বলল,—শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার আগের রাতেই তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে বড়বউদি। মুস্তাফির এগ্রিমেন্টে। এ কথা এখন এ বাড়ির লোক পাঁচ কান করছে না মশাই। কাজকম্ম চুকুক, তখন ঝোলা থেকে বেড়াল বেরোবে।

শুভাশিসের ফুসফুসে খুব জোর, তবু এই মুহূর্তে শ্বাস নিতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল তার। পৌষের বাতাসেও যেন চামড়া ঝলসে যাচ্ছে, আগুনের হলকা বইছে কান দিয়ে। শংকর কি সত্যি কথা বলছে ? মিথ্যে বলেই বা শংকরের কী লাভ ?

আধখাওয়া সিগারেট টোকা মেরে অপেক্ষমাণ কুকুরদের গায়ে ছুঁড়ে দিল শংকর, কুকুরগুলো সভয়ে সরে গেল। ফিচেল হেসে শংকর বলল,—আসলি ননীটা কে খেয়ে গেল বলুন তো ? ওই অশোক মুস্তাফি। দালাল লাগিয়ে বাড়িটা ধরতে গেলে সে ব্যাটা মিনিমাম পাঁচ-দশ পারসেন্ট খেয়ে নিত, সেই টাকাটা বাঁচিয়ে ফেলল। আমার গিন্নির কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা দাদন দিয়ে এ রকম একটা ঘ্যামা পজিশানে এতটা ল্যান্ড মুঠোয় ভরে ফেলা...না মশাই, মুস্তাফি লোকটার হেডে ব্রেন আছে।

শংকরের সঙ্গ অসহ্য লাগছে, আবার চুম্বকের মতো টানছেও শুভাশিসকে। অনেক চেষ্টা করে স্বর ফোটাল গলায়,—এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে।

—সময়ই বলবে কি হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমি আমার গিন্নিকে বলে দিয়েছি এগ্রিমেন্টে কি আছে আমাদের জানার দরকার নেই, তুমি বেশি কৌতূহল দেখাবে না, তোমার দাদা-ভাইদের কাছে তুমি কিছু আশা করবে না। তারা যদি হক মনে করে কিছু দেয় তো ভাল। আমার মশাই শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ওপর কোনও মোহ নেই। শ্বশুরমশাই আমাকে হোল লাইফ হ্যাক-থু হ্যাক-থু করে গেছেন, তবু তাঁর মরার পরে তাঁর সেবায় লাগতে পেরেছি...

কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে শংকর। পিছনে ভূতগ্রস্তের মতো হাঁটছিল শুভাশিস। চকিত আঘাতে সমস্ত স্নায়ু অসাড়। বড় ঘরে অনেকে কথা বলছে, একটি বর্ণও শুনতে পাচ্ছিল না শুভাশিস।

কে যেন ডাকছে,—শুভাশিসদা...ও শুভাশিসদা...

শুভাশিস চমকে তাকাল। সামনে রুনা। কেমন ভাবে যেন দেখছে শুভাশিসকে,—আপনি এত ঘামছেন কেন শুভাশিসদা ? শরীর খারাপ লাগছে ?

—কই, না তো। নাহ। শুভাশিস ফ্যাকাসে হাসল।

—কখন থেকে ডাকছি আপনাকে, শুনতেই পাচ্ছেন না!

—ডাকছিলে বুঝি ?

—আপনার একটা ফোন আছে।

—ও।

শ্লথ পায়ে সিঁড়ি ভাঙছিল শুভাশিস। এখানে কে ফোন করল ? ছন্দা ? কী দরকার ? নার্সিংহোম থেকে কল এল ? কোথাওই তো তেমন কোনও সিরিয়াস পেশেন্ট নেই! কন্দর্প দু হাতে খানপাঁচেক কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর বোতল নিয়ে নামছে, শুভাশিসকে দেখে হাসল। হাসিটা ফেরত দিতে ভুলে গেল

শুভাশিস। দোতলায় সুদীপের ঘর রুনার বাপের বাড়ির লোকজনে ঠাসা, গুঞ্জন ভেসে আসছে। কৌতূহলহীন মুখে দরজাটা পার হয়ে শুভাশিসের চোখ গেল প্যাসেজের কোণে। আদিত্যর ঘরের দরজায় বসে মধুমিতার মেয়ে আপন মনে খেলা করছে। একা, কিন্তু নিশ্চিন্ত।

শুভাশিস ফোন তুলল। ছন্দাই।

—ওদিকের কাজ মিটেছে ?

—কেন ?

—বাবা এসেছেন।

—কে ?

—বাবা। তোমার বাবা। ....হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ ? তোমার বাবা এসেছেন। ....

—আমি আসছি।

ফোন রেখে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল শুভাশিস। এক্ষুনি ফিরবে। ছাদে সুদীপের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, তাকে একবার বলে যাবে কি ? কেন বলবে, শুভাশিস এ বাড়ির কে ? হনহন করে নীচের বড় ঘর পার হয়ে গেল শুভাশিস। সামনের ঘেরাটোপে তিতির একটা বিশালকায় দাড়িঅলা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটা হাত রাখল তিতিরের মাথায়। ওই কি রঘুবীর ? মুস্তাফি মাকে জপিয়েছে, মেয়েকে জপাচ্ছে বাবার স্যাঙাৎ ! ভাল। সুন্দর দৃশ্য। এই পরিবারে এটাই মানায়।

গাড়ি চালাতে চালাতে ছটফট করছিল শুভাশিস। অপমানটা তীব্র বিবমিষা হয়ে তোলপাড় করছে শরীর। ইন্দ্রাণী কী নিষ্করুণ হাতে একের পর এক সুতো ছিঁড়ে চলেছে, কত সহ্য করবে শুভাশিস ? পলকের জন্য মনে পড়ল বাপ্পার যাওয়ার আগের সন্ধেটাকে। মলিন মুখে বসে ছিল বাপ্পা, দাদুর শ্রাদ্ধের আগে চলে যেতে কুণ্ঠা বোধ করছিল সে। শুভাশিস অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছিল তাকে। এনরোলমেন্টের দিন না পৌঁছলে হয়তো বাপ্পার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আর এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলাই শ্রেয়। ইন্দ্রাণী যেন সেদিন পছন্দ করছিল না শুভাশিসের বোঝানোটাকে। বারবার সন্ত্রস্ত চোখে বাপ্পার দিকে তাকাচ্ছিল। কিসের ত্রাস ? গোপন কীর্তি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয় ? তার কাছ থেকে টাকা নয় নাই নিল, কিন্তু বিশ্বসুদ্ধ লোক, এমনকী হয়তো ওই রঘুবীরটাও যা জানে সেটাও জানার তার অধিকার নেই ? কেন এই ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা ? তিতিরটাকেও এমন তৈরি করেছে, সেও আজকাল কেমন দূরে দূরে সরে থাকে !

কী চায় ইন্দ্রাণী ? শুভাশিস আর না আসুক ? মুখের ওপর বলতে পারছে না তাই ঠারেঠোরে ইঙ্গিত দিচ্ছে তার ?

ক্ষোভে বিদীর্ণ এক শুভাশিস বাড়ি ফিরে দেখল শিবসুন্দর টোটোর বিছানায় আধশোওয়া হয়ে গল্প করছেন নাতির সঙ্গে। বাবার মুখে সেই চিরকালীন সহজ সরল নিরুত্তাপ ভাব। শুভাশিসেরই এক সেট পাজামা পাঞ্জাবি পরেছেন তিনি, একটু যেন ঢোল্লা লাগছে গায়ে। শরীর কি একটু ভেঙেছে মানুষটার !

শুভাশিস দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, —কখন এলে বাবা ?

—তা ধরো এগারোটা নাগাদ।

—সে তো অনেকক্ষণ। তুমি আগে খবর পাঠাওনি কেন বাবা ?

—ছন্দা বলল তুমি নাকি কোন শ্রাদ্ধবাড়িতে গেছ। কোনও পরিবারের অনুষ্ঠানে গেলে কাউকে বিব্রত করাটা সঙ্গত নয়।

বাবার গলায় সেই পরিচিত ঋজুতা। এই স্বর কতবার শান্তির প্রলেপ লাগিয়েছে শুভাশিসের বুকে। শৈশবে। কৈশোরে। যৌবনে। রাজনীতি ছেড়ে, ইন্দ্রাণীকে হারিয়ে দিগভ্রান্ত শুভাশিস এই শহর ছেড়ে বাবার কাছেই ছুটেছিল একসময়ে। দিনরাত মনমরা হয়ে বসে থাকত, লেখাপড়াও শিকেয় উঠেছে, তখন এই স্বরই শান্ত করেছিল শুভাশিসকে। ইন্দ্রাণীর কথা না জেনেই একটা বড় ভাল কথা বলেছিলেন শিবসুন্দর। আবেগ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না শুভ, তবে আবেগ জিনিসটা

মানুষের দৃষ্টিকে বড় ঘোলাটেও করে দেয়। এখনই কেন মনে পড়ল কথাটা ?

শুভাশিসের ভেতরের জ্বালা মরে আসছিল। মৃদু স্বরে বলল, —বিব্রত হওয়ার কি আছে বাবা ? তুমি এতদিন পরে এলে...

—তুমি তো এসেই গেছ। যাও, জামাকাপড় বদলাবে তো বদলে এসো।

শুভাশিস তবু দাঁড়িয়ে রইল একটু। বাবা শব্দটা বারবার উচ্চারণ করতে বেশ তৃপ্তি হচ্ছিল তার। মন আরও জুড়িয়ে এল। শুধু তৃপ্তি কেন, এক প্রশান্ত নির্ভরতাও বুঝি লুকিয়ে আছে ওই ডাকে। এই নিষ্ঠুর শহর থেকে বহু যোজন দূরে থেকেও ওই মানুষটা যেন শুভাশিসের এক উদ্বেগহীন আশ্রয়।

নিজের ঘরে এসে শুভাশিসের হঠাৎ মনে হল মা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা হল না তো ! কেন যে মা'র কথাটা মনে থাকে না ! ছিহ্, বাবা কি মনে করল !

খুটখাট শব্দ হচ্ছে অ্যান্টিরুমে। উঁকি দিয়ে শুভাশিস দেখল ছন্দা তার ঠাকুরের জায়গাটা পরিষ্কার করছে। পুজো পুজো বাতিক ছন্দার বেড়েই চলেছে।

শুভাশিস চাপা গলায় বলল, —বাবা ও ঘরে বসে আছে, আর তুমি....

মুখ না তুলেই ছন্দা বলল, —এতক্ষণ তো ও ঘরেই ছিলাম। উনি বিশ্রাম করছেন... ঠাকুরের বাসনগুলো এখন গুছিয়ে না রাখলে... আমি বাবাকে বলেই এসেছি।

—তোমার খাওয়া হয়েছে ?

—অনেকক্ষণ। বাবা এসেই খেয়েদেয়ে টোটোর সঙ্গে তোমার নার্সিংহোম দেখতে গিয়েছিলেন, তখন আমিও...

—বাবা নার্সিংহোম দেখতে গেল ? হঠাৎ ?

—আমি জোরজার করে পাঠালাম। আমার শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে এমন জেরা শুরু করেছিলেন.... আমার খুব লজ্জা লাগছিল।

—হুম। তুফান কিছু বলেছে বোধহয়।

—সম্ভবত।

শুভাশিস ইতস্তত করে বলল, —মা'র কথা কিছু বলল বাবা ?

—নতুন খবর কিছু নেই। আগের মতোই।

—যাক, তাও ভাল। শুভাশিস নিশ্চিন্ত মনে অ্যান্টিরুমে ঢুকে ছন্দার পাশে উবু হয়ে বসল। রাগ ঝিমিয়ে আসায় পাকস্থলী ডাক পাড়তে শুরু করেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, —একটা কথা বলব ?

—কী ?

—আমাকে কিছু খেতে দেবে গো ?

ভ্রূকুটি হেনে কয়েক সেকেন্ড শুভাশিসের দিকে তাকিয়ে রইল ছন্দা।

—কী খাবে ? রুটি, না ভাত ?

—যা জুটবে। শোনো, ডাইনিং টেবিলে দিয়ো না, রান্নাঘরে দাও।

—কেন ?

—আমাকে এখন খেতে দেখলে বাবা খুব অস্বস্তিতে পড়বে। ভাববে বাবার জন্য আমি না খেয়েই চলে এসেছি।

আবার ভ্রূকুটি হানল ছন্দা। শ্লেষমাখা চোখে দেখছে শুভাশিসকে, —বাবাকে বলে দিতে পারো শ্রাদ্ধবাড়িতে তুমি খাও না। অনেকেই তো খায় না।

—মিথ্যে বলব ? বাবাকে ?

ছন্দা উদাসীন স্বরে বলল, —পৃথিবীর আর সবাইকে মিথ্যে বলা যায়, তাই না ?

বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল শুভাশিসের। কেন যে উঠল নিজেই জানে না। একটু আগের

ক্রোধ আর তারপর এক শান্তির যাদুপ্রলেপ দুয়ে মিলেমিশে বিচিত্র এক ক্রিয়া শুরু করছে অন্তরে।

ছন্দা উঠে যাচ্ছিল, শুভাশিস পিছন থেকে ডাকল, —শোনো, এই মুহূর্তে তোমাকেও আমি একটা সত্যি কথা বলতে পারি।

ছন্দা ঘুরে দাঁড়াল।

পৌষের দুপুরমাখা গলায় শুভাশিস বলল, —আমি তোমাকে ভালবাসি ছন্দা।

৪৫

টোটোর পড়ার টেবিলে বইয়ের স্তূপ। মনোযোগী চোখে একের পর এক বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছেন শিবসুন্দর। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথেম্যাটিকস বায়োলজি। চোখ তুলে বললেন,—তোদের কোর্স তো অনেক অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে রে!

গোপনে আহারপর্ব সেরে ছেলের ঘরে এসে বসেছিল শুভাশিস। সিগারেট ধরিয়ে ভারিক্কি চালে বলল,— বায়োলজি বইখানা দ্যাখো। আমাদের প্রিমেডিকেল কোর্সের কত কিছু ওদের সিলেবাসে ঢুকিয়ে দিয়েছে!

—ভাল তো। মেডিকেল সায়েন্স যেভাবে এগোচ্ছে, ওদের আরও বেশি জ্ঞান নিয়ে ডাক্তারি পড়তে ঢোকা উচিত।

টোটো শর্টস আর পাঞ্জাবি পরে বাবু হয়ে বসে আছে চেয়ারে। একটু আগেও ছন্দার একটা শাল জড়িয়েছিল গায়ে, এখন সেটা পুঁটলি করে খাটের ওপর জড়ো। ঘন কালচে ঘাস ভরা গালে সে হাসল ফিকফিক,—তা হলে তোমরা অনেক কম জেনে ডাক্তারিতে ভর্তি হতে?

—অস্বীকার কী করে করি বল? মাথার পিছনে দু হাত রেখে আধশোওয়া হলেন শিবসুন্দর,—তুই জয়েন্টে বসবি তো?

—দেখি। সে তো সামনের বছরের চিন্তা।

শুভাশিস যেন চেনা রুগীর অচেনা উপসর্গে বিস্মিত হল,—সে কী রে! তোর মা যে তোর জয়েন্টের প্রিপারেশানের জন্য টিউটর খুঁজছিল!

—বসব না তো বলিনি। বললাম পরীক্ষা নিয়ে এখনও ভাবিনি।

বাবার সামনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল শুভাশিস। টোটো আজকাল তার সঙ্গে এরকমই কাঠ কাঠ কথা বলে। ক'দিন আগেও ভারি মিষ্টি একটা ছেলেমানুষি স্কুলবয় ভাব ছিল, সেটা যেন হঠাৎ হারিয়ে গেছে। বাবা নিশ্চয়ই ভাবল ছেলের সম্পর্কে শুভ খবর রাখে না!

অভিভাবকের স্বরে শুভাশিস বলল,—এ তো ভাল কথা নয় টোটো। ফিউচার সম্পর্কে এত ক্যাজুয়াল, এত আনপ্ল্যানড হওয়াটা কি ঠিক?

টোটো ঝটপট উত্তর দিল,—টোটালি আনপ্ল্যানড নই বাবা। তবে এটুকু ঠিক করেছি ডাক্তারি আমি পড়ব না।

—সে কি! কেন?

ছন্দা ঘরে ঢুকেছে। জানলার কাছে গিয়ে কি যেন দেখছে বাইরে। এক ঝলক মাকে দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল টোটো,—ইচ্ছে।

—সব ইচ্ছেরই তো একটা কারণ থাকে। শুভাশিস আরও গম্ভীর হল।

—কারণের কি আছে? আমার নিজেকে ডাক্তার ভাবতে ভাল লাগে না।

—এ কথা তো আগে কোনওদিন বলিসনি?

—তুমি তো আগে কোনওদিন জিজ্ঞেস করোনি।

রূঢ় সত্যিটা হজম করতে অসুবিধে হল শুভাশিসের। ছেলের সামনে সে এক জাজ্বল্যমান সাফল্যের উদাহরণ, ফ্ল্যাট গাড়ি অপরিমিত ঐশ্বর্য সবই তো শৈশব থেকে গড়ে উঠতে দেখেছে ছেলে,

তার পরেও কি ছেলে ভবিষ্যতে কি হতে চায় তা জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রয়োজন ছিল ? আদর্শ না হোক, ছেলের জীবনের লক্ষ্যও কি স্থির করে দিতে পারেনি সে ?

শুভাশিসের মনে হল ছন্দারও যেন ছেলের সিদ্ধান্তটা নিয়ে কোনও হিলদোল নেই, যেন টোটোর সঙ্গে আগেই এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে গেছে তার। শুধু শুভাশিসই জানে না কিছু।

যুদ্ধহীন পরাজয়টা মেনে নিতে পারল না শুভাশিস। খানিকটা মরিয়াভাবে বলল,—আমার কিন্তু ইচ্ছে তুমি ডাক্তারিই পড়ো। কেন তুমি বাপ-ঠাকুরদার প্রফেশানে যাবে না ?

শিবসুন্দর হেসে উঠলেন,—এ তো বড় অন্যায় কথা শুভ। টোটো কী হতে চায় সেটা তো টোটোরই স্থির করা উচিত। আমি কি তোমাকে ডাক্তারি পড়ার জন্য কখনও জোর করেছিলাম ? টাকা রোজগারই যদি জীবনের মোক্ষ হয়, সে তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েও হতে পারে, অন্য কোনও সার্ভিসে গিয়েও হতে পারে।

শুভাশিস যুক্তিতর্কের জাল বুনতে যাচ্ছিল, শিবসুন্দর থামালেন,—আমি একটু চোখটা বুজে নিই শুভ। রোদ থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়তে হবে।

জানলার ধারে ছবি হয়ে থাকা ছন্দা নড়েচড়ে উঠেছে এতক্ষণে,—হ্যাঁ বাবা, আপনি জিরিয়ে নিন। সময় হলে ডাকবেন, আমি চা করে দেব। টোটো, টুকির খেলনাটা তুই দাদুর ব্যাগে ভাল করে প্যাক করে দিয়ে দিস।

শুভাশিসের ভারি বিচ্ছিন্ন লাগছিল নিজেকে। শিবসুন্দর টোটো ছন্দা সবার মাঝেই বুঝি এক গোপন বোঝাপড়া আছে, সেই শুধু এখানে বহিরাগত।

শুভাশিস বেরিয়ে আসছিল, শিবসুন্দর ডাকলেন,— তোমার কি বিকেলে কোনও কাজ আছে শুভ ?

—কেন ?

—তোমার গাড়িতে আমাকে একটু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে ?

বাবা গাড়ি চড়তে চায় ! বাবার কি আজ শরীর খারাপ ! পলকের জন্য শিবসুন্দরকে পেশাদারি চোখে জরিপ করল ডাক্তার শুভাশিস। উঁহু, মুখে তো কোনও অস্বস্তির চিহ্ন নেই !

মুখে হালকা আহত ভাব এনে বলল,—এটা একটা প্রশ্ন হল বাবা ? তবে তেমন বুঝলে আজ রাতটা থেকেও যেতে পারো।

—তুই কি ভাবছিস আমি অসুস্থ ? শরীর গড়বড় করলে এসেই কি টোটোকে নিয়ে বেরোতাম ?

শুভাশিস একবার ভাবল বাবাকে নার্সিংহোমের কথা জিজ্ঞাসা করবে কিনা। মনে মনে অভিমানও হচ্ছিল। বাবা ঘুরে এল, অথচ এখনও একবারও নার্সিংহোম নিয়ে কিছু বলল না তাকে। থাক গে, সেই বা কেন যেচে কথা তুলবে ?

ম্লান স্বরে শুভাশিস বলল,—তোমাকে অসুস্থ ভাবিনি। মনে হল এতকাল পর এলে ... একবার একটা রাত থেকে গেলে ক্ষতি কি ?

—তা হয় না।

—কেন হয় না শুনি ? এখন তো আর তুফান ওখানে একাটি নেই। অলকাও মা'র সেবাশুশ্রূষার কাজ ভালমতোই শিখে নিয়েছে।

—না রে বাবা। তুফান আমার জন্য তারকেশ্বর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। জানিসই তো কেমন আঁকুপাঁকু করা ছেলে, আমি না ফিরলে স্টেশনেই হয়তো একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসবে।

কথাটাতে কি শুভাশিসের সঙ্গে কোনও সূক্ষ্ম তুলনা আছে তুফানের ? শুভাশিস ঠিক বুঝতে পারল না। একটু উদ্বেগের সুরে বলল,—তুমি শীতের রাত্তিরে অতটা পথ মোপেডে ফিরবে ?

—দুৎ, তারকেশ্বর আর কতটুকুনি পথ ? ওর থেকে কত বেশি সময় আমাকে মোপেডে করে ঘুরতে হয়।

শুভাশিসের বলতে ইচ্ছে হল, কেন ঘোরো বাবা ? না বলে ড্রয়িং স্পেসে এসে সোফায় হাত-পা

ছড়িয়ে দিল। এতাল-বেতাল কত চিন্তা ঢুকে পড়ছে মাথায়। ভালবাসার কথা শুনে কী অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল ছন্দা! মুখটা কি ছন্দার কোমল হয়েছিল তখন? বোধহয় না। এ কথা তো শুভাশিসের মুখ থেকে কখনও শোনেনি ছন্দা, তাই হয়তো প্রতিক্রিয়াটাও ...। মনসতীনের শ্বশুরের শ্রাদ্ধ থেকে ফিরে ভরদুপুরে কোনও স্বামী যদি ভালবাসার কথা শোনায়, সেটা পরিপাক করা কি খুব সহজ কাজ?

শুভাশিস কথাটা বললই বা কেন? একটা সম্পর্কের শুকনো শিকড় আজই মন থেকে পাকাপাকিভাবে উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল, তাই? ইন্দ্রাণীর দর্পিত আচরণে নাক-কান কাটা গিয়ে সে কি এতদিন পরে ছন্দার কাছে আশ্রয় খুঁজছে? যাই হোক না কেন, মুখের কথাটাকেই এবার সত্যি করে তুলতে হবে। অনেককাল ভেসে ভেসে কেটে গেল শুভ, এবার তোমার ঘরে ফেরার পালা। উফ, তবু কেন ওই মেয়েমানুষটা বারবার হানা দেয় বুকে? চলতে পারে না, চলতে পারে না, এ চলতে পারে না। সতীসাধ্বী স্ত্রী সেজে আদিত্য রায়ের পাশেই বসে থাক ইন্দ্রাণী। তার জন্য আর একটি পলও অপচয় নয়। আদিত্য রায়ের মেয়ে হয়ে থাকাই যখন তিতিরের নিয়তি, শুভাশিসেরই বা এত হ্যাংলামি কিসের? উঁ উঁহ, বাপের জন্য উপোস! তাই কর।

মনটাকে সুখী সুখী করার জন্য আপন মনে গুনগুন গান ধরল শুভাশিস। পুরনো গান, কবে যেন কোন ট্রেনের কামরায় এক ভিখিরি বেসুরে গাইছিল। নয়ন মেলে দ্যাখ দেখি মন, কে তোর প্রিয়, কে তোর আপন। একই কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে শুভাশিস। বেখাপ্পা সুরে। ঢালাও আবেগ দিয়ে। উদারা-মুদারা ছাড়িয়ে বুকের ভেতরেই সুর তারায় পৌঁছে গেল। আর একটা গানও সুড়সুড় করছে গলায়। মন চলো নিজ নিকেতনে। গাইবে? না, এই গানটাই ভাল। নয়ন মেলে দ্যাখ দেখি মন, কে তোর প্রিয়, কে তোর আপন ...। শুভ রে, আর একা হয়ে থাকতে ভাল লাগে না রে। প্রিয় খোঁজ। আপন খোঁজ।

শিবসুন্দর বেরোলেন সাড়ে চারটে নাগাদ। শুভাশিস আগেই তৈরি হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসেছিল, সিটে বসে শিবসুন্দর বললেন,—তোমার নতুন গাড়ি কবে ডেলিভারি পাচ্ছ?

এ খবরও কানে পৌঁছে গেছে!

শুভাশিস গাড়ির ইগনিশান সুইচ অন করল,—এ মাসের শেষাশেষি তো এসে যাবে বলছে। কথাটা বলেই রত হল আত্মরক্ষায়,—ছন্দা বাজারহাট যায়, দিদি জামাইবাবুর বাড়ি যায় ... টোটোর কেমিস্ট্রি স্যারের বাড়ি সেই বেহালা চৌরাস্তায় ... গিয়ে পড়ে আসতে হয় ... আমি সব সময়ে গাড়ি স্পেয়ার করতে পারি না ... আরেকটা গাড়ির খুব প্রয়োজন ছিল।

—হুম। মিটিমিটি হাসছেন শিবসুন্দর,— মানুষের প্রয়োজনের যে কোথায় সীমা! তোমার গাড়ির সিটটা বেশ কমফর্টেবল হয়েছে। নতুন করালে?

—এই তো পুজোর পর করালাম। আগেরটা ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল।

শুভাশিস ক্লাচ চেপে গিয়ার বদলাল। অ্যাক্সিলেটারে আলতো চাপ দিতেই মসৃণ গতি। ছুটির বিকেল বলে পথঘাটে ভিড়ের কমতি নেই, শীতকালে এই সময়টায় সবাই বোধহয় সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে। চারদিকে অজস্র রঙের সমারোহে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

ঝোলা ব্যাগ থেকে মাফলার বার করে গলায় জড়িয়ে নিলেন শিবসুন্দর,— শুনেছ বোধহয়, তোমাদের নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম আজ? তোমার পার্টনার ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হল।

—অরূপ ছিল তখন?

—একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছিল। তোমাদের নার্সিংহোমে পুলিস আসে কেন শুভ?

—বোধহয় ওর কোনও বন্ধুবান্ধব হবে। শুভাশিস এড়াতে চাইল।

—বন্ধুবান্ধব! কথাবার্তা কেমন ফর্মাল মনে হচ্ছিল!

চোখ বটে। শুভাশিস প্রমাদ গুনল। একটা নার্সিংহোম চালাতে গেলে কত রকম দেবতাকে যে

তুষ্ট রাখতে হয় তার ফিরিস্তি শুনলে বাবা হয়তো গাড়ি থেকে নেমে চোঁ-চোঁ দৌড় দেবে। পাড়ার পুজো, পাড়ার মস্তান, পলিটিকাল দাদারা তো আছেই, এর সঙ্গে খেপে খেপে সরকারের হাজারও ডিপার্টমেন্ট হাত্তা মারছে। আজ লেবার কমিশনারের অফিস থেকে ইন্সপেকশনে এল, তো কাল এল রেজিস্ট্রেশান, পরশু করপোরেশান, তার পরের দিন ইনকাম ট্যাক্স, চলছে তো চলছেই। সকলেরই কী ক্ষিধে! কেউ বাটি পেতে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বাক্স বাজাচ্ছে, কেউ ঠক ঠক হাতুড়ি ঠুকছে বুকে। এদের মধ্যে তাও বেচারা পুলিশ কাজেকর্মে লাগে, মস্তানদের বেয়াড়া হুজ্জোত সামলায়। তারা তাদের সার্ভিসের বিনিময়ে মাঝে মাঝে নার্সিংহোমে পা রাখবে না, তা কি হয়! অফিসের লোকজনই এসব সামলায় বেশির ভাগ, তবু তার মধ্যে ছুটকো-ছুটকো দু-চারটে ঝামেলা শুভাশিসদের ঘাড়েও এসে পড়ে বইকি। অরূপের পাবলিক রিলেশান ভাল, অকারণে অনেকক্ষণ চোয়াল ফাঁক করে রাখতে জানে। রঙ্গরসিকতার ছলে টিটকিরি বিদ্রূপ ছুঁড়লেও আমুদে স্বভাবের জন্য থানার ওসি-টোসিরা ওকে পছন্দ করে বেশি। নার্সিংহোমের সামনে দিয়ে গেলেই ব্যাটারা একবার করে উঁকি মেরে যায়, অরূপ আছে কিনা দেখে। এসব নৈবেদ্য দেওয়ার ব্যাপারে শালিনী আবার শুভাশিসের থেকেও অগা। বাড়িতে যতই সে ছটফটে মিশুকে হোক না কেন, কাজে বেরোলেই কোত্থেকে যেন এক কাটখোট্টা ডাক্তার-দিদিমণির মুখোশ এঁটে নেয় মুখে। স্টাফেরা তাকে যমের মতো ভয় পায়। অন্যরাও। একবার এক মহিলা ইন্সপেক্টরের সামনে এমন পাথরের মতো মুখ করে বসেছিল যে মহিলা মুখ ফুটে তার অভিপ্রায় জানাতেই পারেনি। কাঁচুমাচু মুখে বীরেশবাবুকে গিয়ে বলেছিল, আপনারা আমার ট্যাক্সি ভাড়াটাও দেবেন না? দু পিঠের না হোক, এক পিঠের?

শিবসুন্দরের গলা কানে এল শুভাশিসের,—দেখে চালাও শুভ। তুমি বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ।

শুভাশিস তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—না। হঠাৎ পুলিশ এল কেন তাই ভাবছিলাম।

—তুমি কি আমাকে ত্রেতা যুগের লোক ভাব শুভ? আমি কি কাগজ-টাগজ পড়ি না, নাকি দেশের খবর রাখি না? সব জানি। এখন গাঁ-গঞ্জও এমন কিছু সাধুসন্তে ভরা নয়। গাঁয়ের দোকানদাররাও বোঝে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে চারদিকে ফুল ছেটাতে হয়। শিবসুন্দর ধূর্তের মতো হাসছেন,—তোমাদের ওখানে গোটা তিনেক নার্স তো বাচ্চা হে, ওরা কি রেজিস্টার্ড?

—অত রেজিস্টার্ড নার্স কি পাওয়া যায় নাকি? শুভাশিস রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটা এক উদোমাদা লোককে কাটিয়ে গেল সন্তর্পণে। রেয়ার ভিউ মিরারে চোখ রেখে দেখে নিল উদাসীন পথচারীকে। বলল,—আমাদের দুজন মেট্রনই খুব এক্সপিরিয়েন্সড, তারাই দরকার হলে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়।

—দু-চারটে আইন-কানুন তা হলে তোমাদেরও ভাঙতে হচ্ছে?

—আইন তো মানুষেরই জন্য বাবা। মেয়েগুলো খুব গরিব। কাজও করে খুব সিনসিয়ারলি।

—অন্যায় করার আগে সব মানুষই মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে নেয় শুভ। সমস্ত অন্যায়েরই খারাপ দিক থাকে, আবার ভাল দিকও থাকে কিছু। ভালটার জন্য কিন্তু অন্যায়টা ন্যায় হয়ে যায় না।

—ন্যায়-অন্যায় ব্যাপারটাও খুব রিলেটিভ বাবা। চোখ মন পরিস্থিতি আউটলুক এরাই নিত্যনতুন ন্যায়-অন্যায়ের ডেফিনেশন ঠিক করে। এক সময়ে তো সমুদ্র পার হওয়াটাও অধর্ম ছিল, এখন কি তা আছে?

শিবসুন্দর একটা শ্বাস ফেললেন।

রবীন্দ্রসদনের সামনে পৌঁছে থমকে আছে গাড়ি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশের মাঠ জুড়ে বিশাল বর্ণাঢ্য মেলা। একটা নয়, দু-দুটো। দঙ্গল দঙ্গল মানুষ ছানাপোনা সমেত হুড়োহুড়ি করে পার হচ্ছে চওড়া রাস্তা।

ভিড় দেখতে দেখতে এক সময়ে শিবসুন্দর মৃদু স্বরে বললেন,—তর্কে সব সমস্যার সমাধান হয় না শুভ। তুমি যদি তর্কে হেরেও যাও, তোমার পথ কি বদলাবে? নাকি আমি হেরে গেলে আমার

জীবনের ছাঁচটাকে বদলে ফেলতে পারব ? কোনওটাই হবে না। তবে কি জানো, এত সব ঝক্কিঝামেলায় না গেলেই পারতে। নিত্যদিন ক্ষুদ্রতা নীচতার সঙ্গে আপোস করতে করতে মানুষের মনটা ছোট হয়ে যায়। আর ছোট হয়ে যাওয়া মানুষ তার চারপাশের কাউকেই বড় কিছু দিতে পারে না। বাট দ্যাটস ইওর প্রবলেম, নট মাইন। আমার তোমার সম্পর্কে অভিযোগ অন্য জায়গায়। এত চাপের মাঝে পড়ে তুমি কোনও দিকে তাকাচ্ছ না, তোমার সংসারটা নেগলেক্টেড হচ্ছে। ...

—নেগলেক্ট ? সংসারকে ? আমি ?

—হু এলস ? কেন বিয়ের এত বছর পর ছন্দাকে হঠাৎ ঠাকুরঘরে রেফিউজ খুঁজতে হচ্ছে ? তোমার ছেলের সঙ্গে আমি দু ঘণ্টা একসঙ্গে ছিলাম, গোটা সময়টা সে একবারও তোমার প্রসঙ্গে কোনও কথা তুলল না। কেন শুভ ?

—তা আমি কি করে বলব ? শুভাশিস পাংশু মুখে গাড়ি স্টার্ট দিল,— আমি যা করি সবই তো ওদের জন্যে। হ্যাঁ, অঢেল সময় আমি ওদের জন্য কোনওদিনই স্পেয়ার করতে পারি না। করা সম্ভবও নয়। আমার রুগী আছে, চেম্বার আছে, নার্সিংহোম আছে ...। অ্যান্ড দিজ থিংস আর নট নিউ।

—কিন্তু ব্যাপারটা আমার চোখে এখন এত বেশি করে লাগছে কেন ? কেন মনে হচ্ছে ছন্দা টোটোর মধ্যে অনেক গ্রিভান্স জমেছে ?

চটজলদি জবাব দিতে পারল না শুভাশিস। আজই জীবনের ধারাটা বদলাবে স্থির করল, আজই কি এসব কথা না উঠলে চলছিল না ?

ময়দানে শেষ বিকেলের নরম হলুদ আভা। পথের দু ধারে সার সার কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া গুলমোহর, তাদের বিরল পাতাগুলোকে এখন সোনার কুচি বলে ভ্রম হয়। গঙ্গার দিকে আকাশে অজস্র রঙের ছটা। রেড রোডের গা ঘেঁষে ট্র্যাকস্যুট পরে দৌড়চ্ছে একটি মেয়ে। দু পাশের মাঠে ক্রিকেটের আসর ভাঙার সময় হয়ে এল।

শিবসুন্দর হঠাৎ বলে উঠলেন,— তুমি ছন্দার অপারেশন করাচ্ছ কবে ?

শুভাশিস ঈষৎ অভিমানের সুরে বলল,— কবে থেকেই তো করাতে বলছি, ছন্দা কথা শুনছে না। জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তাও আলট্রাসোনোটা করালাম ...

—হুঁ, রিপোর্টটা দেখলাম। মালটিপল ফাইব্রোমা। ব্লাড রিপোর্টও তো অ্যালার্মিং। হিমোগ্লোবিন এইট পয়েন্ট সেভেন। তোমার কি মনে হয় না ব্যাপারটা সিরিয়াসের দিকে যাচ্ছে ?

ডাক্তার শিবসুন্দর নন, পিতা শিবসুন্দর কথা বলছেন। শুভাশিস বুঝতে পারছিল। স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে তর্ক জোড়া যায় না। বলা যায় না অনেকেই এই অবস্থায় দীর্ঘদিন অপারেশন না করিয়ে থাকতে পারে। বাবাও কি তা জানে না ? উদ্বেগে ভুলে গেছে।

শুভাশিস কোমল স্বরে বলল,— শালিনী, মানে যার সঙ্গে তোমার আলাপ হল সেই অরূপের বউ, সেই ছন্দাকে দেখছে। খুব কড়া ডক্টর। তেমন বুঝলে ঘেঁটি ধরে নিয়ে গিয়ে ছন্দাকে ও-টিতে শুইয়ে দেবে।

—যদি দেরি হয়ে যায় ?

—রিসকের কোনও চান্স নেই বাবা। শালিনীর ওপর আমার ফুল কনফিডেন্স আছে।

শিবসুন্দর আবার একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন, —সবই সত্যি। সবই ঠিক। তবু আমার বড় ভয় হয় শুভ।

বিস্মিত চোখে বাবাকে দেখে নিল শুভাশিস, —কিসের ভয় ?

—সে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। তবু একটা কথা বলি। পুরনো ঘটনা। তুমি বোধহয় জানো তোমার মা'র দুর্ঘটনাটার সময়ে আমি মেদিনীপুরে ছিলাম। ক'দিন ধরেই বাতাসে জোর গুজব ছিল ষোলোই অগাস্ট কলকাতাতে একটা বড়সড় গণ্ডগোল হতে পারে। আমার তখনই উচিত ছিল সোজা কলকাতায় তোমার মা'র কাছে চলে আসা। কিন্তু ওই...। মনে হল চিন্তার কি আছে !

তোমার মা তার বাপের বাড়িতে আছে, দেখাশোনা করার লোকেরও অভাব নেই, শি ইজ সেফ, শি ইজ সিকিওরড। রায়ট বাধার তিন দিন আগে চলে গেলাম লালগড়। বর্ষার শেষ, ওখানে তখন কয়েকটা গ্রামে খুব কলেরা হচ্ছিল। দিন সাতেক পরে মেদিনীপুরে ফিরে মেসেজটা পেলাম। বাট ইট ওয়াজ টুউ লেট। ...সেই ভয়ঙ্কর রাতে আমি যদি তোমার মা'র কাছে থাকতাম... হয়তো তাতেও আমি ঘটনাটা প্রিভেন্ট করতে পারতাম না... তবু বিপদ যে কোন দিক থেকে আসে, কখন আসে, আমরা কি জানি শুভ ? স্টিল আমাদের যদি কোথাও গাফিলতি থেকে যায়, যেমন আমার ছিল, তা শোধরানোর আর কি কোনও চারা থাকে ? আমার কেবলই মনে হয় আমার জীবনের ডিজাস্টারটা, যেটাকে আমি মনে মনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে ক্যামোফ্লেজ করে রেখেছি,...তোমার জীবনে আমি তার পুনরাবৃত্তি চাই না।

শুভাশিসের বুকটা ভারী হয়ে আসছিল। ডালহাউসি পাড়ার বিশাল বিশাল অট্টালিকা অতিকায় সব ছায়া ফেলেছে রাজপথে। ছুটির দিনে অফিসপাড়া অদ্ভুত রকমের নির্জন, যেন এক পরিত্যক্ত সভ্যতার মধ্যে দিয়ে ছুটছে শুভাশিসের যন্ত্রযান। এত কথা এক সঙ্গে কখনও বলেন না শিবসুন্দর। আজ শূন্যনগরীতে কথাগুলোকে কেমন স্বীকারোক্তির মতো শোনাচ্ছিল। শিবসুন্দর বললেন, —এই কথাগুলোই তোমাকে একটু একান্তে বলার দরকার ছিল। তাই এই গাড়িতে আসা।

ভারী বুকে একটা কষ্ট ঘুরপাক খাচ্ছিল শুভাশিসের। বাবার জন্য মায়া হচ্ছিল বড়। শক্তপোক্ত মানুষটার মধ্যে কত কান্না জমে আছে!

অস্ফুটে বলল, —গ্রামে নাকি পার্টির লোকেরা তোমাকে খুব ডিস্টার্ব করছে ? এখন কী অবস্থা বাবা ?

—ও তেমন কিছু না। এক সঙ্গে থাকতে গেলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মতান্তর মনান্তর হবেই।

—তবু সাবধানে থেকো। দিনকাল ভাল নয়।

হাওড়া স্টেশনের জনারণ্যে বাবাকে মিশিয়ে দিয়ে ফিরছিল শুভাশিস। শীতার্ত ঘাসের বিষণ্ণতা নিয়ে। ফেরার পথে রুটিনমাফিক নিজেদের নার্সিংহোমে এল। ভিজিটিং আওয়ারস চলছে, নার্সিংহোমে বেশ ভিড়। সচরাচর রবিবার বিকেলে অরূপ নার্সিংহোম মাড়ায় না, আজ চেম্বারে আছে, কি যেন লেখালিখি করছে বসে।

পর্দা সরিয়ে শুভাশিস তার ঘরে ঢুকল। ভারী বুকে হালকা গলায় বলল, —তুই কি আজ নার্সিংহোমেই বডি ফেলে দিয়েছিস ?

—আরে দ্যাখ না, দুপুরে গিয়েও আবার ফিরে আসতে হল। বাড়িতে ভিড়, গ্যাঞ্জাম। পুনা থেকে সব ইন-লরা এসেছে। ওখানে বসে কি কাজ করা যায় ?

—কী এমন কাজ ? টেরচাভাবে চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল শুভাশিস।

—বারে, নিউজ পেপারে কলাম লেখা শুরু করেছি না ! কাল সকালে লেখাটা নিতে আসবে।

—এবার কী টপিক ?

—ব্রেস্ট ফিডিং। মাতৃদুগ্ধের কোনও বিকল্প নাই।

—কেন বেবিফুড কোম্পানিগুলোকে বামবু দিচ্ছিস রে ? ওদেরও তো করেকম্মে খেতে হবে।

—খাক না। হু অবজেক্টস ? অরূপ চোখ তুলল, —আমি আমার সোশাল ডিউটি করে যাব।

—সঙ্গে নিজের পাবলিসিটিটাও। শুভাশিস চোখ টিপল, —প্রতি উইকে কাগজে নাম বেরোচ্ছে... বেড়ে আছিস। পেশেন্ট-টেশেন্ট বাড়ছে ?

অরূপ সরু চোখে তাকাল, —তুই যে শালা লাস্ট উইকে টিভিতে গলব্লাডার অপারেশান নিয়ে লেকচার মেরে এলি, তোর পেশেন্ট বেড়েছে ?

—বেড়েছে বইকি। মিডিয়ার তো একটা বড় এফেক্ট আছেই। শব্দময় হাসিতে বুক অনেক হালকা করে নিল শুভাশিস। মুখের ফ্রেমে হাসিটুকু ধরে রেখে বলল, —জানিস তো, প্রোগ্রামটা শুটিং-এর দিন ভাস্করের সঙ্গে স্টুডিওতে দেখা। আমাকে দেখে ব্যাটা হেভি বমকে গেল। ওর

আইডিয়া ছিল ও একা টিভি ক্যাপচার করে রেখেছে। আমাদের নার্সিংহোম স্টার্ট হওয়ার পর থেকে শালা আরও জ্বলছে। শুনেছিস তো ওর নার্সিংহোমের সেই ফিনানশিয়ার ফেরায় ফেঁসে গেছে ?

—হ্যাঁ, কে যেন একটা বলছিল। শুভাশিস-ভাস্করের পেশাগত ঈর্ষায় অনুপ্রবেশ করল না অরূপ। কলম বন্ধ করে বলল, —সকালে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সত্যি রে, আ রিয়েল সেন্টলি ম্যান।

—কী বলল তোকে ?

—ডিজিজ মেডিসিন নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হল। ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। খুব খুশি। ওই সময়ে আবার ব্যাটা মিত্তির দারোগাটাও এসেছিল। পুরনো আমলের মানুষ তো, আন্দাজ করতে পারেননি ব্যাটা গুঁড়োর লোভে এসেছে। ওর সঙ্গেও খুব গপ্পো জুড়েছিলেন। দেশের হালচাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের অবস্থা, পুলিশদের ওপর পলিটিকাল দাদাদের ছড়ি ঘোরানো... মিত্তিরটাও তো খুব বকতে পারে, বড় বড় কথা শুনিয়ে মেসোমশাইকে একেবারে অ্যামেজড করে দিচ্ছিল।

শুভাশিসের হাসি পেল। বাবাকে মুগ্ধ করা এতই সোজা ! পলকের জন্য হাওড়া স্টেশনের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল। হাজার লোকের ভিড়েও কেমন আলাদা হয়ে হাঁটছিল বাবা।

অন্যমনস্ক মুখে শুভাশিস বলল, —শালিনীর সঙ্গে একটু দরকার ছিল। এখন বাড়ি গেলে কথা বলা যাবে ?

—যেতে পারিস, তবে বললাম যে বাড়িতে আজ হেভি গ্যাঞ্জাম। আমিই উদ্বাস্তু হয়ে গেছি।

—থাক। পরে দেখা যাবে। পারলে রাত্রের দিকে একটা রিঙ করব।

—কোনও এমারজেন্সি ?

—নাহ, ওই ছন্দার ব্যাপারেই... অপারেশানটা এবার জোর করেই করাতে হবে।

—কথাটা তো কবে থেকে বলছি তোকে।

সে কে না বলছে ! শুভাশিস প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়ছে। দুপুরে ভালবাসার কথা শুনে নির্বিকার সরে গেল ছন্দা। নতুন করে বুনতে হবে সংসারটাকে। ছেঁড়াফাটা জায়গাগুলো ঠিকঠাক রিপু করা দরকার। যেন একদম নতুন দেখায়।

দুপুরের গানের কলিটা মনে মনে ভাঁজার চেষ্টা করল শুভাশিস। মনে পড়ল না লাইনগুলো।

৪৬

টেবিলে একটা ইনল্যান্ড লেটার পড়ে রয়েছে। খোলা। কাঁধ থেকে স্কুলব্যাগ নামিয়ে ভুরু কোঁচকাল তিতির। দাদার চিঠি !

ডিয়ার মা, পৌঁছেই একটা চিঠি দিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই পেয়েছ। এখানে এভরিথিং ইজ ফাইন। আমার ট্রেনিং মানে প্রি সি কোর্স ফুল সুইয়িং-এ চলছে। হেভি খাটুনি। ইন্দ্রনীল রায় তাতে অবশ্য ঘাবড়ায় না। সানরাইজের আগে সে ঘুম থেকে ওঠে, একপ্রস্থ পিটি করে, ব্রেকফাস্ট সারে, তারপর হোল ডে ক্লাস আপ টু বিকেল। মাঝে অবশ্য লানচ ব্রেক আছে। এত খাটাচ্ছে কেন জানো ? তিন মাসে শিপিং-এর আটটা কোর্স কমপ্লিট করে সার্টিফিকেট পেতে হবে। ফায়ার ফাইটিং, সারভাইভাল অ্যাট সি, ওশিওনোগ্রাফি এইসব। আমি খাটুনিটা খুব এনজয় করছি। এ নিউ লাইফ। শুধু এখানকার রান্নাবান্নাগুলো যদি একটু ভাল হত ! মাছ মাংস নিরামিষ সব এক টেস্ট। টক দই কমপালসারি। যাচ্ছেতাই। এই খেয়েই আমি ওয়েট গ্যাদার করছি মা। ফ্যাট নয়, সলিড হেলথ। আগের চিঠিতে যে ওড়িয়া রুমমেটের কথা বলেছিলাম, সে আর একটা ওড়িয়া ছেলের রুমে শিফট করে গেছে। আমার প্রেজেন্ট রুমমেট একজন তামিল। তার পুরো নাম কুম্ভকনম শ্রীনিবাসরাঘবন সৌম্য নারায়ণ। তিতিরকে নামটা মুখস্থ করতে বোলো, আমি গিয়ে ধরব। আমরা অবশ্য ওকে

ন্যারি বলে ডাকি। ন্যারি খুব নার্ভাস টাইপের ছেলে। অর্থোডক্স ভেজ। আমাকে ভীষণ মানে।

আর কী ? ক্লাস থেকে ফিরে সুইমিং-এ যাবার আগে হারিডলি চিঠি লিখছি। এখানে ঠাণ্ডা বেশ কম, ভোরের দিকেই যা একটু শীত করে। আশা করি দাদুর কাজকর্ম সব ভালয় ভালয় চুকে গেছে। তোমরা বড়রা আমার প্রণাম নিয়ো, ছোটদের ভালবাসা দিয়ো। ইতি। বাপ্পা।

এন বিঃ কাল আমাদের একটা রিয়েল শিপে ট্রেনিং হবে। দারুণ এক্সসাইটমেন্ট হচ্ছে। রাতে ঘুম হবে না।

হুঁহ, শুধু নিজের কথা আর নিজের কথা। দাদাটা কেন যে এমন স্বার্থপর হল ! আগেও আমি আমি ভাবটা ছিল। আমার জামা। আমার জুতো। আমার টেপ। আমার ক্যাসেট। দূরে চলে গিয়ে এখন যেন নিয়মরক্ষার সম্পর্ক রাখছে। একবারের জন্যও কারুর খোঁজখবর করল না ! তিতির নয় ছিচকাঁদুনি ঝগড়ুটি, মা কেমন আছে তাও জানার ইচ্ছে নেই ! আশ্চর্য ! অথচ এই দাদার জন্য ছোটকার বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে আনল মা !

ফোঁস ফোঁস কয়েকটা শ্বাস ফেলল তিতির। ভরাবিকেলেও কেমন সেঁতিয়ে আছে বাড়িটা। আগেও যে এ বাড়ি অহোরাত্র মুখর থাকত তা নয়, তবু যেন এমন পাষাণপুরী ছিল না। অশৌচের ক'দিন বাড়িতে তাও একটা অন্য ধরনের প্রাণ ছিল। লোকজন আসছে, কথা বলছে, বাবা হঠাৎ হঠাৎ ডুকরে উঠছে, এই কথা, সেই কথা... ক্রিয়াকর্ম মিটতেই সব কেমন ধু-ধু। খকখক কাশির শব্দটা নেই, অ্যাটমের হুড়দ্দুম নেই, কাকিমাও আজকাল ফিসফিসিয়ে বকাবকি করে অ্যাটমকে, মিনতি সন্ধ্যার মা'ও কথা চালাচালি করে নিচু পর্দায়। এমন নিঝুম বাড়িতে দু দণ্ড তিষ্ঠোনো যায় ? সপ্তাহে সাত দিনই যে কেন তিতিরের টিউটোরিয়াল থাকে না !

জলখাবার খেতে নীচে যাওয়ার আগে বাবার ঘরে ঢুকল তিতির। ঘর সুনসান, শয্যা নিভাঁজ, বাবা নেই। কি যেন সন্দেহ হওয়াতে পায়ে পায়ে ছাদে এল। যা ভেবেছে তাই। কালকের মতোই ছাদের মধ্যিখানে বেদিতে বসে আছে বাবা। পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে মাথায়। মলিন রোদমাখা দেহটাকে আরও যেন শীর্ণ দেখায়।

তিতির পিছন থেকে ডাকল, —বাবা।

আদিত্য সাড়া দিল না। কী যেন ভাবছে অথচ ভাবছে না।

তিতির কাছে এল। সদ্য চুল গজানো কদম্ব ফুলের মতো মাথায় গভীর মমতায় হাত রাখল, —রোদ মুখে বসে আছে কেন বাবা ?

আদিত্য বিড়বিড় করল, —রোদ্দুর ! কই, লাগে না তো !

—কাল যে বললে আজ থেকে বেরোবে, তার কী হল ?

—ইচ্ছে করল না।

—রঘুবীরবাবু আজ আসেননি ?

—সে তো রোজই আসে।

—বেরোলে না কেন ?

—ওই যে বললাম, ইচ্ছে হল না।

—ইচ্ছে না হলে চলবে ? কাজকর্ম করতে হবে না ?

—কী হবে ? জীবন তো দেখলাম। আজ সকালে ছিল, কাল সকালে নেই। বসে বসে এই বিকেল দেখাই ভাল।

বুকে বাতাস চেপে তিতির বলল, —তুমি কাজে না বেরোলে দাদুর আত্মা শান্তি পাবে না বাবা।

—বলছিস ? সুতির র‍্যাপারখানা গায়ে জড়িয়ে তিনঠেঙে হয়ে বসল আদিত্য, —তবে বেরোব।

তিতির বলল, —দু সপ্তাহ ধরে এক কথা শুনছি। তুমি আর বেরিয়েছ !

—মা'র মতো অত কেজো হোস না রে তিতির। একটু শান্তিতে থাকতে দে।

এত শোক ভাল লাগে না তিতিরের। দাদুর মৃত্যুতে সেও কম কষ্ট পায়নি। বাবার মতো না

হলেও দাদুও তো তার কম আপন ছিল না। এ বাড়িতে তিতির ছাড়া কার সঙ্গেই বা মনের প্রাণের কথা বলত দাদু ? ঠাকুমার চলে যাওয়াটা ভাল মনে নেই তিতিরের, সেভাবে ভাবতে গেলে এটাই তার জীবনের প্রথম মৃত্যুশোক। প্রথম প্রথম ক'দিন বুকটা ফেটে যেত তিতিরের, চোখ ভেঙে জল আসত, তারপর তো এক সময়ে থিতিয়েও এল কষ্ট। বন্ধুদের সঙ্গে হাসিগল্প করার সময়ে এখনও হঠাৎ হঠাৎ দাদুর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পায় তিতির। তোবড়ানো গাল, পিটপিট চোখ, ঘুগনি খাওয়ার জন্য ছটফট করছে ! মনটা ভার হয়ে আসে তিতিরের, অজান্তে ভিজে যায় চোখ। তা বলে কি দিবারাত্র দুঃখ আঁকড়ে থাকলে চলে ? কাকিমা ঠিকই বলে, রোগব্যাধির জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে এক দিক থেকে বেঁচে গেছে দাদু।

বাবা বোঝে না। বাবাটা বড্ড ইমোশনাল।

বাবা এত ভেঙে পড়ল কেন ? দাদুর মৃত্যুর রাতে বাড়ি ফেরেনি, তাই ? থাকলেও তো মৃত্যুটা টের পেত না।

এত ডিপ্রেশানের কোনও মানে হয় ?

তিতির সিঁড়িতে গিয়েও ফিরে এল, —দাদার আজ চিঠি এসেছে।

—তাই ?

—দাদা খুব মজায় আছে।

—হুঁ।

—কত কি ট্রেনিং নিচ্ছে, নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে। এনে দেব চিঠিটা, পড়বে ?

আদিত্য রা কাড়ল না। আবার সেই নীরব অবসন্নতার খোলে ঢুকে যাচ্ছে। নীচে ফোন বেজে উঠল। কাকিমা নেই, দ্রুত নেমে এসে ফোন ধরল তিতির।

ঝুলনের গলা। ভীষণ উত্তেজিত ঝুলন। প্রায় চেঁচাচ্ছে, —এই জানিস, দারুণ এক্‌সাইটিং নিউজ। এইমাত্র দেবস্মিতা আমাদের বাড়ি এসেছিল।

বন্ধুর গলা পেয়ে তিতিরও মুহূর্তে চনমনে, —এতদিন পর হঠাৎ ? লেডি ব্রেবোর্নের গল্প শুনিয়ে ফাট মারতে এসেছিল বুঝি ?

—আরে না। ওর দিদিটার বিয়ে। ফেব্রুয়ারির টেনথ। এখান থেকে হিয়ার বাড়ি গেল। কাল বোধহয় তোকে কার্ড দিতে যাবে। যাক, এতদিনে দেবস্মিতাটার হাড়ে বাতাস লাগবে।

—সুস্মিতাদি কোন একটা কলেজে পার্টটাইম করছিল না ?

—ওই কলেজেরই ফুলটাইমারকে বিয়ে করছে।

—মানে লটঘট কেস ? সুস্মিতাদি প্রেমে পড়ল ! এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা !

—পৃথিবীতে এখনও অনেক কিছু দেখা তোমার বাকি আছে খুকুমণি। শুধু প্রেমেই পড়েনি, দেবস্মিতা বলছিল সুস্মিতাদি হবু বরের সামনে নাকি একেবারে চুচুর মুচুর হয়ে থাকে। তার নাকি সুস্মিতাদির থেকেও বেশি ফান্ডা।

—ঠিক হয়েছে। সারা জীবন জাঁতায় থাকবে।

—তাই যেন হয়। ...এখন রাখি রে। কাল স্কুলে গিয়ে হিয়ার সঙ্গে কথা বলে কি গিফট দেওয়া যায় ফাইনাল করে নেব, কেমন ?

—ছটফট করছিস কেন ? বেরোচ্ছিস কোথাও ? অর্ণবের সঙ্গে অ্যাপো ?

কয়েক সেকেন্ড থেমে রইল ঝুলন, —তোকে কথাটা বলার চান্স পাইনি। অর্ণবের সঙ্গে আমার কাট অফ হয়ে গেছে।

—সে কি ! কবে ? কেন ?

—অর্ণবের ফ্যামিলিটা ভাল নয় রে।

—ওর বাবা গভর্নমেন্ট অফিসার না ?

—হতে পারে। তবে টেস্টটা খুব লো। বাড়িতে লুঙ্গি পরে বসে থাকে।

তিতির প্রায় বিষম খেল, —সে তো আমার বাবাও মাঝে মাঝে লুঙ্গি পরে। দাদুও পরত।

—তোদের কথা আলাদা। তোর বাবা তো কোনওদিন আমার শ্বশুর হতে যাচ্ছে না। লুঙ্গি আমি একদম স্ট্যান্ড করতে পারি না রে। একটা লুঙ্গি পরা লোক খালি গায়ে বসে বসে বগল চুলকোবে, সে হবে আমার শ্বশুর ? ইমপসিবল।

তিতির হাঁ হয়ে গেল, —তা হলে তোদের এতদিনের রিলেশান... !

—রিলেশান আবার কি। একটা ফ্রেন্ডশিপ ছিল, সাত-দশ দিন এক সঙ্গে ঘুরেছি, ও আমাকে দুটো চুমু খেয়েছে, আমি ওকে দুটো চুমু ফেরত দিয়েছি ব্যস। রিলেশান ইজ ওভার।

তিতিরের গা সিরসির করে উঠল। এত সহজে সম্পর্ক গড়ে ওঠে ? এত তুচ্ছ কারণে ভেঙেও যায় ? চুমু খাওয়া কি কোল্ড ড্রিঙ্কস কুলপি খাওয়ার মতো নিছকই একটা নগণ্য আইটেম ? সেখানে মনের কোনও ভূমিকা নেই ?

একতলাটাও খাঁ খাঁ করছে। স্মরজিৎ লাহিড়ির ছবির কাজ শুরু হয়েছে, পরশুদিন মুর্শিদাবাদে শুটিং-এ গেছে কন্দর্প। তার দরজায় ইয়া বড় তালা। মিনতিও নেই। রান্নাঘরে একা মনে রুটি বেলছে সন্ধ্যার মা।

তিতির তার পাশে গিয়ে উবু হয়ে বসল, —মা কখন বেরিয়েছে গো ?

—এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। পেরেসের বুড়োবাবুকে নিয়ে বেরোল।

—কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে ?

—বউদি কি এখন কারুর সঙ্গে কথা বলে ? সারাক্ষণ হাঁড়িমুখ। শ্বশুর মরলে কাউকে এমন পেঁচোয় পায়, এ আমি জন্মে দেখিনি। আপন মনে গজগজ করছে সন্ধ্যার মা। হঠাৎ চোখ ঘোরাল, —হ্যাঁ গো দিদিমণি, তোমাদের পেরেস নাকি উঠে যাচ্ছে ?

—প্রেস ! উঠে যাচ্ছে ! যাহ্‌। তোমায় কে বলল ?

—মিনতিই বলছিল। পেরেসের ট্যারাটার সঙ্গে নাকি বুড়োবাবুর কথা হচ্ছিল। মিনতি সকন্নে শুনেছে।

—ভুল শুনেছে। তিতির উড়িয়ে দিল কথাটাকে, —গরম গরম দুটো রুটি দাও তো। চা'ও করো একটু। বাবা ছাদে আছে, দিয়ে এসো এক কাপ।

জলখাবারের থালা এগিয়ে দিয়ে গ্যাসে কেটলি বসাল সন্ধ্যার মা। ফেলে আসা কথাটাকে আবার ধরে নিল, —না গো দিদিমণি, মিনতিকে তোমরা যত হাবাকালা ভাবো, ততটা কিন্তু নয়। মাগীর কান খুব স্যায়না। কাল নাকি বুড়োবাবু ট্যারাকে বলছিল, ধীরেসুস্থে একটা কাজকম্মো দেখে নাও ভাই। এ পেরেসের আউস্কাল শেষ। বউদিও নাকি আর নতুন কাজ নিচ্ছে না হাতে।

তিতির তর্কে গেল না। কথাটা অবিশ্বাসও করা যায় না পুরোপুরি। মা কি ধার শোধ করার জন্য প্রেস বেচে দিতে চায় ? হতেও পারে। মা'র কার্যধারার তল পাওয়া ভার। দাদু মারা যাওয়ার পর থেকেই এ বাড়ির বাতাসে কী একটা কথা যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। পিসি আর কাকিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী একটা সেদিন বলাবলি করছিল, তিতির যেতেই চুপ করে গেল। নিয়মভঙ্গের দিন ঝান্টুদা বলছিল, আর কি ! রায়বাড়ি তো এবার ভাঙল ! দাদু মারা যাওয়ার পর বাড়ি যে ভাঙা পড়বে, এ আর এমন নতুন কথা কি ! ঘটনাটা কি খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে চলেছে ? পিসি কাকিমা কি তাই নিয়েই আলোচনা করছিল ? তিতিরকে দেখে চেপে গেল কেন ? উহুঁ, অন্য কি একটা ব্যাপারও আছে।

তিতিরের পোস্তদানা মনটা অনেককাল ধরে থম মেরে আছে। সেই দাদার জাহাজ কোম্পানির চিঠি আসার পর থেকেই।

তিতির তাকেই শুধোল, —কি গো, তুমি কিছু বলছ না যে ?

—কী বলব ?

—বুড়ো মানুষটা হুট করে মরে গেল, দাদা জেদ করে চলে গেল ম্যাড্রাস, প্রেস নাকি উঠে যাচ্ছে,

বাড়িও ভাঙা পড়বে, তবু তোমার কিচ্ছু বলার নেই ?

মন পিনপিন করে উঠেও নীরব হয়ে গেল।

তিতির অধৈর্যভাবে বলল, —কী হল ? বলো কিছু।

টুঁ শব্দটি নেই। নো মেসেজ।

ধ্যাততেরি, ভাল্লাগে না। ছটফট করতে করতে বড়ঘরে এল তিতির। ঢুকেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছে। ছায়ামাখা ঘরে দাদু বসে আছে না সোফায় ! টেবিলে তাস ছড়িয়ে পেশেন্স খেলছে ! দুর, কোথায় কে ! ঘর যেমন শূন্য, তেমনই শূন্য। সোফা টেবিল কার্পেট আলমারি সব যে যার জায়গায় বসে আছে ঘাপটি মেরে। বদলের মধ্যে বদল দাদুর বাবার পাশে আর একটা ছবি এসে গেছে। বড় জ্যান্ত ছবিটা। ছোটকার এক বন্ধু তুলেছিল গত বছর।

নাহ, এ ঘরে একা দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। দৌড়ে ওপরে উঠে গেল তিতির। ছোট পার্সটা নিয়ে চটি পরে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে বাড়ি থেকে। এক্ষুনি।

বাড়ির ভেতর আলো-আঁধার ছিল, বাইরে তার চিহ্নমাত্র নেই। অপরূপ এক মায়াবী বিকেল খেলা করছে রাস্তায়। ঝাপুর-ঝুপুর ছোটাছুটি করছে রিকশা সাইকেল, শব্দ করে হাসছে গাড়িঘোড়া। যত্রতত্র ঝিকমিক পড়ন্ত সূর্যের আলো। মাঝগগনে চাঁদের আভাস স্পষ্ট ক্রমশ।

বড় রাস্তায় এসে পুরনো স্কুলের দিকে হাঁটছিল তিতির। এ পথ দিয়ে এখন সে টিউটোরিয়ালে যায়। এমনি এমনি হাঁটতে বেরোলেও এই পথটাই তার বেশি পছন্দ। শৈশব থেকে গড়ে ওঠা অভ্যাসে এ পথেই ভারি নিশ্চিন্ত বোধ করে সে। স্কুলের কাছে এলে গতি থেমে যায় তার, গেটের এপাশ থেকে তৃষ্ণার্ত চোখে সবুজ মখমলের মতো মাঠটাকে দেখে। পুরো দেখা যায় না, আধভেজানো গেটের ফাঁক দিয়ে যতটুকু দৃষ্টি যায়, ততটুকুই নয়নের সুখ। বৈজু দারোয়ান দেখতে পেয়ে বেশ কয়েকবার ডেকেছে তিতিরকে, তবু সে ভেতরে ঢোকেনি। কী হবে গিয়ে ? সবই তো অন্য মুখ, তিতিররা কেউই নেই সেখানে। ফেলে আসা জায়গায় আর কি সেভাবে ফিরতে পারে কেউ ?

আজ স্কুলের সামনে গিয়ে তিতির দেখল গেট পুরো বন্ধ হয়ে গেছে। বৈজু দারোয়ানও ধারেকাছে নেই।

—হাই, কী খুঁজছ ?

তিতির চমকে উঠল। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সুকান্ত। পরনে ফুল হাতা স্টোনওয়াশ জ্যাকেট, ব্যাগি ট্রাউজার। মাঝে তো কোথায় উড়ে গিয়েছিল, আবার মহাপুরুষের আবির্ভাব হল যে হঠাৎ ?

ঝটিতি ভুরুতে কাঠিন্য এনে ফেলল তিতির, —তোমার কী দরকার ?

—খেপছ কেন ? আমি কখন থেকে তোমার পাশে পাশে হাঁটছি, তুমি একবারও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছ না !

—রাস্তার রোমিওদের দেখা আমার স্বভাব নয়। এদিক ওদিক চোখ চালাল তিতির।

—টু হুইলারটা নেই। গ্যারেজে গেছে।

দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না, তিতির হাঁটা শুরু করল।

সুকান্তও হাঁটছে পাশে পাশে, —কেন গ্যারেজে গেছে জিজ্ঞেস করলে না ?

—প্রয়োজন নেই।

—জোর ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম। মিনিবাসের সঙ্গে। এক চুলের জন্য জানে বেঁচে গেছি।

তিতির আকাশ দেখল।

—ঘাড়ে হেব্বি চোট লেগেছিল। কনুইতে তিনটে স্টিচ, মাথায় চারটে...। ফস করে জ্যাকেটের হাতা গোটাল সুকান্ত, —দ্যাখো দ্যাখো, ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়ানো আছে।

একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল তিতির।

—পুরো একুশ দিন বিছানায় লেটে ছিলাম। শুয়ে শুয়ে তোমার জন্য খুব মন কেমন করত,

বুঝলে ?

চলমান তিতির ঠোঁট বেঁকাল।

—বাবা ফতোয়া জারি করে দিয়েছে, আমাকে আর টু হুইলার চড়তে দেবে না। গ্যারেজ থেকেই ডিজপোজ করে দেবে। ভালই হল, কি বলো ? তুমি আমার ওই গাড়িটাকে সহ্য করতে পারতে না।

—আমি তোমাকেও সহ্য করতে পারি না।

—সে কি আমি বুঝি না ? মগর কিঁউ ? আমাকে কি তোমার বাজে ছেলে মনে হয় ?

—ভাল তো কিছু দেখি না।

—আমার কিন্তু তোমার সব কিছুই ভাল লাগে। সেই যে সিনেমা দেখতে গিয়ে তোমায় দেখলাম... ! ফ্রাঙ্কলি বলছি, প্রথমে তোমার ওই ঝুলন বলে বন্ধুটাই টারগেট ছিল। হেভি ড্যাশি। কিন্তু তোমায় দেখেই সব কেমন গুবলেট হয়ে গেল। আর কাউকে চোখেই লাগে না।

কী অকপট স্বীকারোক্তি ! তিতির যেন একটু একটু গলছিল। কেন গলছিল নিজেই জানে না।

সুকান্ত বলল, —তোমার মতো এত সুন্দর মেয়ে আমি আর লাইফে দেখিনি। হাসলে কোথায় লাগে জুহি মাধুরী ! আর রেগে গেলে...তুমি শ্রীদেবীর চালবাজ দেখেছ ?

স্তুতিটুকু ওড়নায় মেখে নিল তিতির, তবে মুখের রামগরুড় ভাবটা কমাল না। বলল, —এখন তোমার চালবাজি দেখছি। বেশি মসকা মেরো না, সুবিধে হবে না। আমার মনমেজাজ ভাল নেই।

—সেই দাদু মরেছে বলে এখনও শোক ?

—ওভাবে বলবে না। দাদু আমার কতখানি ছিল তুমি বুঝতে পারবে না। তিতির ফস করে বলে ফেলল কথাটা।

সুকান্ত দাঁড়িয়ে গেল। তিতির একটু এগোতেই বড় বড় পা ফেলে ধরে ফেলল তাকে। গলা যথাসম্ভব মিহি করে বলল, —সরি।

—শুড বি।

—আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। আমার মা যখন মরে গেল আমার তো মনে হয়েছিল আমি আর বাঁচবই না। তার পরেও তো দেখো দিব্যি হেসেখেলে আছি। এক এক দিন রাত্তিরে মা'র কথা খুব মনে পড়ে, তখন হেভি মোচড় মারে বুকটা। একা একা কাঁদি। ...মাইরি কাঁদি। তুমি হাসছ না তো ?

ছেলেটা কি পাগল ? না বেশি সরল ?

তিতির ফিরে তাকাল, —তোমার মা নেই আগে বলোনি তো ?

—নেই কে বলল ? দুটো আছে। একটাকে বাবা নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট দিয়ে রেখেছে, আর একটা কারনানি ম্যানসনে থাকে।

এবার তিতিরের দাঁড়িয়ে যাওয়ার পালা। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে সুকান্তকে। বিষাদ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই, কী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে উন্মোচিত করছে নিজের বাবাকে !

সুকান্তর মুখে সাদা হাসি, —সে যাই হোক, আমি কিন্তু আমার বাবার চোখের মণি। আমার জন্য বাবা জান দিয়ে দিতে পারে।

তিতির প্রায় বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল, —কবে মারা গেছেন তোমার মা ?

—অনেক দিন। তখন আমি দশ বছরের। স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা নেই। দুপুরবেলা নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল মা। আমার মামা মাসিরা অবশ্য অন্য কথা বলে। বাবাই নাকি একা বাড়িতে...

তিতির শিউরে উঠল। অজান্তে কখন কবজি চেপে ধরেছে সুকান্তর, —ব্যস, চুপ করো তুমি। অন্য কথা বলো।

বিনতা স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, —বাড়ির খবর সব ভাল তো ?

কন্দর্প চেয়ারে সোজা হয়ে বসল, —ওই। চলছে একরকম।

বিনতা অন্যমনস্কভাবে বললেন, —হ্যাঁ। চলে তো যায়ই। এ পৃথিবীতে কার জন্য কী থেমে থাকে ! কত বয়স হয়েছিল বাবার ?

—এই তো ক'দিন পরেই পঁচাত্তর হত।

—তবে আর এমন কী !

—হ্যাঁ। বয়স খুব সাংঘাতিক হয়নি। তবে বাবা ভুগছিলেন খুব। প্রায় সাত-আট বছর। শ্বাসকষ্ট, হার্টের প্রবলেম... ইদানীং তো একরকম অথর্বই হয়ে পড়েছিলেন।

—তা হোক। তবু ছিলেন তো। বাবা হল গিয়ে বাবা। সংসারের বটগাছ। সংসারের ছায়া।

ঠিক। ঠিকই তো। বাবার অস্তিত্ব নিয়ে কোনওদিন তেমন করে মাথাই ঘামায়নি কন্দর্প। মানুষটা যেন ছিলেন বাড়ির এক জীর্ণ আসবাবের মতো। ব্যবহার করতে অস্বস্তি, আবার ফেলেও দেওয়া যায় না। অথচ তাকে পোড়াতে গিয়ে শ্মশানে মনে হচ্ছিল মাথার ওপর থেকে আকাশটাই বুঝি সরে গেল। ইলেকট্রিক চুল্লির গনগনে আগুনে ঢুকে গেল বাবা, থরথর করে হাঁটু কাঁপতে লাগল কন্দর্পর। এ'রকমই হয়। খুব আপন জিনিস না হারানো পর্যন্ত মানুষ তার মূল্য বুঝতে পারে না।

কন্দর্প একটা বড় শ্বাস ফেলল।

বিনতা বললেন, —বোসো বাবা। চা খাবে তো ?

—খাই। তবে শুধু চা। কন্দর্প আলগা ঘাড় নাড়ল। ছোট্ট ঢোঁক গিলে বলল, —মউদের কি ফিরতে দেরি হবে মাসিমা ?

—না, না, অনেকক্ষণ গেছে। ফেরার সময় হয়ে এল।... মেয়েটা তো সারা সপ্তাহ মাকে পায় না, রোববারটা তাই দিনভর আঁকড়ে থাকে।

বিনতার স্বরে অনুযোগ নেই। কন্দর্পকে দেখে আজকাল আর তেমন অসন্তুষ্টও হন না বিনতা। খুব খুশিও যে হন, তাও নয়। কন্দর্প বোঝে এ হল গিয়ে নিরাপত্তার সঙ্গে সংশয়ের মিশেল। মহিলার মনে সদাই দোলাচল। এর পর কী ? ভাল, না খারাপ ? মেয়ে যদি নতুন করে ঘরসংসার পায় তাতে তো মা'র অসুখী হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু কন্দর্প যদি শুধুই ফস্টিনস্টি করে কেটে পড়ে, তখন মেয়ের কী হবে ! ওপর ওপর যতই সাধু তপস্বীর ভাব থাক, কন্দর্প তো আদতে অভিনেতাই ! আর দুনিয়ায় কে না জানে সিনেমা থিয়েটারের লোকদের চরিত্রের কোনও বালাই নেই !

মনে মনে মৃদু হাসল কন্দর্প। সত্যিই কি মধুমিতাকে নিয়ে কোনও জাল বুনেছে সে ! স্বপ্নের ! কিংবা মাকড়সার !

ভাবতেই বুক সিরসির করে উঠল কন্দর্পর।

চেয়ার ছেড়ে উঠল, উঁকি মেরে দেখল রান্নাঘরটা। বিনতা গ্যাস জ্বালাচ্ছেন। জানলার ধারে সরে এসে সিগারেট ধরাল কন্দর্প। সূর্য প্রায় ডুবে এল। পুবের আকাশ বর্ণহীন। মাথার ওপর পাতলা একটা মেঘ সরের মতো ছড়িয়ে আছে। বাতাস উঠছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। হঠাৎ হঠাৎ। মুর্শিদাবাদের মতো অত কনকনে নয়, তবু হিমের ছোঁয়াটুকু এখনও দিব্যি টের পাওয়া যায়। উফ, কিছু ঠাণ্ডা ছিল বটে। ঋতুশ্রী তো গিয়েই হেঁচেকেশে একসা। পুরো দু'দিন লেটে রইল বিছানায়। শুটিং বনধ। নায়িকার কাছে ঘেঁষার উপায় নেই, বুলডগের মতো পাহারা দিচ্ছে দিদি। ডায়ালগ কী ! বোনের যদি ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া হয়ে যায়, কমপেনসেশান দেবেন ! স্মরজিতের মাথায়

হ্যত। বসে বসে টাকা গুনতে হচ্ছে টেকনিশিয়ানদের, মুস্তাফি সাহেব না চেঁচামেচি করে! প্রোডিউসার বলে কথা! হয়তো বলে দিল প্যাকআপ! মুর্শিদাবাদের শুটিং মধ্যমগ্রামে সেরে নাও। ভাঙাচোরা বাগানবাড়িকে সিরাজউদ্দৌলার প্যালেস বানিয়ে ফেলো! শেষমেশ অশোকদা কলকাতা থেকে অভয়বাণী পাঠানোর পর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল স্মরজিতের। ঋতুশ্রীও অবশ্য পরে খেটেখুটে পুষিয়ে দিল অনেকটা।

বিনতা চা এনেছেন। তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে কন্দর্প ফিরল চেয়ারে।

ঠিক তখনই ফিরেছে মধুমিতারাও।

কন্দর্পকে দেখে মধুমিতা ঝলমল করে উঠল, —আপনি! কবে ফিরলেন?

—কাল।

কাল নয়, আজই ফিরেছে কন্দর্প। বেলার দিকে। এসেই বিকেলে এখানে চলে এসেছে জানলে কিছু যদি ভেবে বসে মধুমিতা!

মধুমিতা চেয়ার টেনে বসল। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। মেয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে নাকের ডগায় ঘামও জমেছে বিন্দু বিন্দু। আঁচলে মুখ মুছে বলল, —শুটিং শেষ?

—আমার কাজ শেষ। মানে আপাতত। ইউনিট ফিরবে আরও দিন সাতেক পরে।

মউ কন্দর্পর হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে। ভাসা ভাসা চোখ দুটো তুলে বলল, —শুটিং কী গো কাকু?

কন্দর্প কোলে তুলে নিল মউকে,— তুমি এখনও শুটিং মানে জানো না? শুটিং মানে ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা।

—তার মানে গুলি চালানো?

—ঠিক তাই। একটা লোক 'অ্যাকশন' বলে হুকুম দেয়, আর আমরা ঢ্যা ঢ্যা গুলি ছুঁড়ি।

মউয়ের যেন বিশ্বাস হল না কথাটা। একবার মাকে দেখছে, একবার কন্দর্পকে।

মধুমিতা মুখ টিপে হাসল, —তোমার কাকু ঠিকই বলেছে। তোমার কাকু একটা ওস্তাদ বন্দুকবাজ।

কথাটা কী খুব সরল অর্থে বলল মধুমিতা! কন্দর্প ঠিক বুঝতে পারল না। বোকা বোকা মুখে মউকে একটা চকোলেট বার করে দিল পকেট থেকে। সেকেন্ডে মোড়ক খুলে মুখে চকোলেট পুরে দিয়েছে মউ।

মধুমিতা হাঁ হাঁ করে উঠল— আজও ওকে চকোলেট দিলেন?

—কি হয়েছে?

—বাচ্চাদের বেশি টফি চকোলেট খাওয়া ভাল নয়। দাঁত নষ্ট হয়ে যায়।

—হাসিও না তো। ছোটবেলায় আমরা চকোলেট কিছু কম খাইনি, আমাদের কি দাঁত নষ্ট হয়ে গেছে? এখনও চিবিয়ে পাঁঠার মাংসর হাড় ভাঙতে পারি। এই তো এবার ঋতুশ্রীর সঙ্গে বাজি রেখে দাঁত দিয়ে পটাপট সোডার বোতল খুলে দিলাম।

মধুমিতা যেন পলকে নিবে গেল, —ঋতুশ্রী মানে আপনাদের হিরোইন?

—হুঁ। দারুণ ড্যাশি মেয়ে। যাকে বলে একেবারে মিস চমকো।

—ও। মধুমিতা খানিক অন্যমনস্ক,— শুটিং তা হলে আপনার খুব মজায় কাটল?

— হুঁহ। মজা! সকাল নটার মধ্যে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়া, রঙচঙ মেখে সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি...। সন্ধেবেলা যখন ট্যুরিস্ট লজে ফিরতাম, তখন একেবারে আখের ছিবড়ের দশা। অবশ্য এবারে একটু আরামও ছিল। আগে টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে হত, এবার একেবারে আলাদা রুম, হিরো হিরোইনদের সঙ্গে লাঞ্চ ডিনার...। কন্দর্প গলা তরল করল, —বাজারে আমার খাতির অনেক বেড়েছে, বুঝলে? আমি আর এখন হেলাফেলার বস্তু নেই।

—সে তো বটেই। স্বয়ং নায়িকা আপনাকে দিয়ে সোডার বোতল খোলায়!

ঈর্ষা! না বিদ্রূপ! কন্দর্প কথা না বলে চায়ে চুমুক দিল।

মউকে কন্দর্পর কোল থেকে নামিয়ে নিল মধুমিতা। চাপা স্বরে বলল, —ঋতুশ্রী খুব সুন্দরী, তাই না?

কন্দর্প মনে মনে বলল, সুন্দরী তো বটেই। তবে তোমার তুলনায় নেহাতই অশোকবনের চেড়ি। মুখে বলল,—ওই একরকম। তেল কাজলে রূপসী। ফটোজেনিক ফেস, পর্দায় মন্দ লাগে না। রঙ-ঢংটাও বড্ড বেশি। এক এক সময়ে সহ্য করা কঠিন।

—তার মানে এক এক সময়ে ভালও লাগে?

বাপ। এ যে অশোকদার চেয়েও জটিল জেরা করে! কী করে বোঝায় ঋতুশ্রীর জন্য তিলমাত্র দুর্বলতা থাকলে লালবাগে ভাগীরথীর তীরে বসে আরেক জনের জন্য বুক হু হু করত না কন্দর্পর! বহরমপুরেই বা সারা রাত দু চোখের পাতায় জুড়ে থাকত কে! লালগোলা প্যাসেঞ্জারে সারাক্ষণ কার মুখ দেখতে দেখতে এসেছে কন্দর্প!

মধুমিতার কথার জবাব দিল না কন্দর্প। ভারিক্কি মুখে বলল, —তোমার কম্পিউটার ট্রেনিং নেওয়ার কী হল?

মধুমিতাও মুহূর্তে গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। গলা তুলে বলল, —স্যাররা দুজনেই খুব বলছেন ট্রেনিংটা নিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু কখন নিই বলুন তো?

—রোববার নাও। এদিকে কাছেপিঠে কোথাও কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের ইনস্টিটিউট নেই?

—আছে। কিন্তু শুধু এক দিন করলেই কি হবে! তা ছাড়া ছুটির দিনে তো জানেনই আমার একা কোথাও বেরোনোর জো নেই। মেয়ে ছিঁড়ে ফেলবে।

—তা বলে সারা জীবন রিসেপশনিস্টের কাজই করে যাবে? স্কোপ যখন আসছে...

—ম্যাডাম বলছিলেন নার্সিংহোমেই একটা কম্পিউটার কিনবেন। সেখানে কেউ না কেউ তো কম্পিউটার অপারেট করবেই, তার কাছ থেকে শিখে নিতে পারব না?

—দ্যাখো। তোমাদের নার্সিংহোমের কাছেও তো একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে। দরকার হলে সেখানেও ছোটখাট কোর্স...

মউ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে আছে। আর পারল না। দুম করে বলে উঠল, —কম্পিউটার কি আমি জানি। বুম্বার বাবার আছে। একতলায়।

কন্দর্প অমলিন হাসল, —বুম্বা বুঝি তোমার খুব বন্ধু?

—হ্যাঁ। বুম্বা আমার বন্ধু। বুম্বার বাবা মা'র বন্ধু।

কন্দর্প হাসতে হাসতে বলল, —আর বুম্বার মা বুঝি তোমার দিদার বন্ধু?

—ও মা, তুমি জানো না! বুম্বার তো মা নেই। ওর মা তো ওর বাবাকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

মধুমিতা ধমকে উঠল, —ও আবার কি কথা! কে বলেছে তোমাকে এসব?

মউ থতমত মুখে বলল,— বারে, বুম্বাই তো বলে।

মধুমিতা কটমট করে তাকাল, —দেখেছেন? দেখেছেন এই টুকু টুকু বাচ্চাদের অবস্থা!

—ওদের আর কী দোষ। যা দেখে, যা শোনে, তাই বলে। ওদের সামনেই সকলে সব আলোচনা করছে...

—আমি এসব একদম পছন্দ করি না। মউকে কোল থেকে নামিয়ে দিল মধুমিতা, —যাও, দিদার কাছে যাও। হাঁ করে বড়দের কথা শুনতে হবে না।

—আমি যাবই না। আমি কাকুর কাছে থাকব।

—না। তুমি যাবে। নইলে কিন্তু আমি রাগ করব। মধুমিতার চোয়াল কঠোর, —তুমি ও ঘরে না গেলে আমি কিন্তু আর অফিস থেকে ফিরব না মউ।

মউয়ের মুখ ছোট্ট হয়ে গেল। ছলছল চোখে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। কেমন থমথমে হয়ে

গেল ঘরটা।

কন্দর্প বিড়বিড় করে বলল, —তুমি কিন্তু খুব নিষ্ঠুরের মতো কথা বললে মধুমিতা।

মধুমিতা নীরব। আঙুল দিয়ে নখ খুঁটছে।

কন্দর্প আবার বলল, —তুমি কি ওকে এইভাবেই ভয় দেখাও ? জানো, এসব কথায় বাচ্চাদের মনে কি রিঅ্যাকশান হতে পারে ? শি ইজ সো লাভিং... শি ইজ সো টেন্ডার... এর মধ্যে ওর মনে যদি আতঙ্ক ঢুকে যায়...

—আমার কথা কেউ বোঝে না। আমার যেন কোনও প্রাইভেসি থাকতে নেই ! মধুমিতা নাক টানল, —সামনে বসে আমাদের সব কথা গিলবে, আর বাইরে গিয়ে উগরে দেবে। আর আমি শাসন করলেই দোষ !

কন্দর্পর বলতে ইচ্ছে হল, আমরা কি তেমন কথা কিছু বলি কখনও !

কিছু না বলে বসে রইল নিস্পন্দ। তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। একটু বুঝি আড়াল খুঁজছে। বাইরে আঁধার নামছে দ্রুত। সেই আঁধারই ছায়া ফেলছে কন্দর্পর বুকে।

ফস করে কন্দর্প বলল, —বুম্বার বাবার সঙ্গে তোমার যদি পরিচয় থাকে, তার কাছেই কম্পিউটার শিখে নিতে পারো।

মধুমিতা কি একটু থমকাল ! তার সিক্ত আঁখিপল্লবে একঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন ! রহস্যময় স্বরে বলল, —পারিই তো। বললেই কল্যাণবাবু খুব মন দিয়ে শেখাবেন।

—ভাল করে শিখলে তোমারই আখেরে লাভ। কন্দর্প জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট হাতড়ে বার করল, কিন্তু ধরাল না। ভীষণ সহজভাবে বলার চেষ্টা করল, —কম্পিউটার নিয়ে কী করেন ভদ্রলোক ?

—কনসালটেন্সি। অ্যাকাউন্টস-এর জব।

—বাহ, তা হলে তো তোমার সুবিধেই। আসল কাজটা শিখে নিতে পারো। কন্দর্পর স্বর ঠিক ঠিক ফুটছিল না।

সহসা খিলখিল হেসে উঠল মধুমিতা। হাসির আওয়াজ যাতে চৌকাঠ না ডিঙোতে পারে তার জন্য মুখে আঁচল চেপে ধরেছে। হাসির দমকে মুখ গোলাপি হয়ে গেল। হঠাৎ হঠাৎ ঘাড় ঝাঁকাচ্ছে, আবার লুটিয়ে পড়ছে হাসিতে।

কন্দর্প ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। গোমড়া মুখে বলল, — হাসছ কেন ? এত হাসির কি হল ?

অনেক কষ্টে হাসির ফোয়ারার মুখ বন্ধ করেছে মধুমিতা। ভীষণ চিন্তিত এক মুখ বানিয়ে বলল, —কিন্তু আমার যে একটা প্রবলেম হয়েছে।

—কী ?

—কল্যাণবাবুর কাছে আমার কম্পিউটার শিখতে ইচ্ছেই করে না।

ছদ্ম কৌতুক বুঝেও ভারী মুখে জানলা থেকে ফিরল কন্দর্প। গ্রাম্ভারি ভাবটা বজায় রেখে বলল, —আমি কিন্তু তোমার ভালর জন্যই বলেছিলাম।

—আপনি বুঝি আমার ভাল চান ? মধুমিতার মুখভাবে বিকার নেই।

—চাই না ? নিজের কাছেই কথাটা কেমন অসহায় শোনাল কন্দর্পর।

আবার হাসিতে ভেঙে পড়েছে মধুমিতা। কানের লতি দুলছে। গলার কাছে একটা নীল শিরা কাঁপছে তিরতির। কোথা থেকে এক বিদ্যুৎতরঙ্গ ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়। শরীরের রোমকূপ শিহরিত হচ্ছে বারবার। ওই নারীকে কি একটু ছুঁয়ে দেখবে কন্দর্প ? থাক। দৃশ্যটা ভেঙে যাবে।

কন্দর্প উঠে দাঁড়াল, —তুমি হাসতেই থাকো। আমি চলি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসি উধাও, —এ কি ! এখনই কোথায় ! বসুন। মউয়ের সঙ্গে তো আপনার গল্পই হল না। ওকে ডাকি।

—আজ নয়। আরেক দিন হবে। আজ একটু দিদির বাড়ি যাব।

—ও তাই বলুন। দিদির বাড়ি এসেছেন বলেই এখানে একটু দেখা দিয়ে গেলেন!

কন্দর্প ম্লান হাসল।

মধুমিতা স্থির তাকিয়ে রইল কন্দর্পর দিকে। চোখ সরাচ্ছে না। অদ্ভুত এক স্খলিত মুহূর্ত।

ক্ষণ পরেই মুহূর্তটাকে ভেঙে দিল মধুমিতা। চোখ সরিয়ে চঞ্চল হল, —ইশ, দেখুন তো আমি কী! এতক্ষণ এসেছেন, একবারও আপনার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলাম না! দাদা-বউদি কেমন আছেন? মেজদারা?

—আছে একরকম। দাদা-বউদি এখনও ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি। বাবা ওদের দুজনকে খুব ভালবাসত তো!

—বাবা বুঝি আপনাকে ভালবাসতেন না?

—আমি যখন জন্মেছি, তদ্দিনে বাবার সব ভালবাসা খরচ হয়ে গেছে। কন্দর্পও হালকা হতে চাইল, —আমার জন্য তখন পড়েছিল শুধু চ্যালাকাঠ। দেখবে, এখনও কাঁধে দাগ আছে!

—থাক। ছোটবেলায় কোথায় কি মারপিট করেছেন, এখন সেটা বাবার নাম করে চালাতে চাইছেন।

—বিলিভ মি। আমি কোনওদিন মারকুট্টে ছিলাম না। আমিও না। মেজদাও না। মারপিট করত আমার বড়দা। কোথায় কে একটা কি বলল, ব্যস ওমনি ডাণ্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ইনফ্যাক্ট দাদাকে চটানোর জন্য আমাকেও চাঁটি মেরে যেত অনেকে।

দু-চারটে লঘু গল্পগাছা করে বেরিয়ে এল কন্দর্প। দরজায় দাঁড়িয়ে মউকে বলল, —তোমার মাকে আমি খুব বকে দিয়েছি। আর যদি তোমাকে কিছু বলে...

মউ বড় অল্পেই খুশি। ছোট্ট একটা অলৌকিক হাসি উপহার দিল কন্দর্পকে। মায়ায় ভরে গেল কন্দর্পর বুক। বাচ্চাটার জন্যও কি বেঁচে থাকতে পারত না দীপঙ্কর!

একতলায় নেমে দু পাশের দুটো ফ্ল্যাটের দিকে তাকাল কন্দর্প। দু দিকেরই দরজা বন্ধ। কোনও দরজাতেই নেমপ্লেট নেই। কোন ফ্ল্যাটে থাকে কল্যাণ!

কটমট করে দরজা দুটো দেখছে কন্দর্প। এক প্রৌঢ় সিঁড়িতে এসে থমকে গেল, —কাউকে খুঁজছেন আপনি?

—না তো। কন্দর্প একটু নার্ভাস হয়ে গেল, —আমি ওপর থেকে নামছি।

—ও।

সন্দিগ্ধ চোখে কন্দর্পকে দেখতে দেখতে উঠে যাচ্ছে ভদ্রলোক। আরও বিরক্ত মুখে মাথায় হেলমেট চড়াল কন্দর্প। স্টার্ট দিল স্কুটারে। ভুল করে ওপরের দিকে তাকিয়ে ফেলল একবার। সেদিনের সেই কাশফুল নিথর দাঁড়িয়ে আছে জানলায়।

একা।

জয়শ্রী ছুরিতে আলু কাটতে কাটতে টিভি দেখছিল, ভাইকে দেখে বেশ অবাক—তুই হঠাৎ! এই সন্ধেবেলা!

অনেকক্ষণ পর কন্দর্প গা এলিয়ে বসল, —দিদির বাড়ি এলে আবার কৈফিয়ত দিতে হয় নাকি! নে, চা-ফা চড়া। কিছু খাবারদাবার খাওয়া। বাই দা বাই, ঝান্টুটা নেই তো?

—না। কেন রে?

—এমনি। সন্ধেটা মাটি করতে চাই না, তাই। কন্দর্প আরাম করে সিগারেট ধরাল, —তোর হের্ বর কোথায়? রোববারও পাম্পে পাম্পে টুঁ মারছে নাকি! শংকরদা মাইরি একদিনও ইনকাম বাদ দেবে না!

বলার সঙ্গে সঙ্গেই শংকরের আবির্ভাব। সঙ্গে একটা মিস্ত্রি মতন লোক। কন্দর্পকে না দেখেই সোজা ঢুকে গেল ভেতরে। শোওয়ার ঘরের আলমারি খুলল ঘটাং করে। বন্ধ করল। আবার হনহন করে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, —শালাবাবু যে! কতক্ষণ?

—এই এল্যাম। আপনি খুব ব্যস্ত বুঝি?

—লিটল বিট। আঙুল টিপে মাপটা বোঝাল শংকর, —যেয়ো না। দেখা হয়ে ভালই হল। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কন্দর্প শংকরকে আমল দিল না, —আমাকে কদ্দূর যেতে হবে। আপনি কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই...

—আহ, বহেজ কোরো না। বোসো। বলছি যখন কথা আছে, তখন কথা আছে। ফাঁকা কথা নয়, তোমারও ইন্টারেস্টের সওয়াল।

শংকর দুদ্দাড়িয়ে চলে গেল।

৪৮

কন্দর্প একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। চটি মতন। খেলার পত্রিকা। পাতায় পাতায় ছবি। রঙিন, সাদাকালো। ফুটবল ক্রিকেট ভলিবল টেনিস হকি। ময়দানের প্রচুর চুটকি খবরও রয়েছে।

কিছুই দেখছিল না কন্দর্প। পড়ছিলও না। শংকর এসে কি বলবে তা নিয়ে সে খুব ভাবিতও নয়। হবে কোনও সাংসারিক জটিল কূটকৌশল। কন্দর্পর কানে এখনও আছড়ে পড়ছে এক হাসির প্রপাত। খিলখিল রিনরিন।

কেন হাসে নারী!

কন্দর্পদের বাড়ির পাশেই, যেখানে এখন ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে, সেখানে ভারি সুন্দর গোল বারান্দাঅলা বাড়ি ছিল একটা। দোতলা।

ডলিদি মিলিদিদের। দু বোন পালা করে চুল আঁচড়াত বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আর টেরিকাটা, আদ্দির পাঞ্জাবি পরা নন্টুদা তখন অবিরাম পাক খেত সামনের রাস্তায়। হঠাৎ হঠাৎ স্টিল ফ্রেমের গগলস চড়াত চোখে, ফাঁপানো চুলে কায়দা করে আঙুল চালাত। হাঁটাটাও ভারি মজাদার ছিল নন্টুদার। হাঁসের মতো দুলে দুলে হাঁটত। নন্টুদাকে দেখলেই ডলিদি ডাকত মিলিদিকে। মিলিদি ডাকত ডলিদিকে। তারপর দু বোন লুটোপুটি খেত হাসিতে। ডলিদির বিয়ে হয়েছে এক এন আর আই পাত্রর সঙ্গে। মিলিদির বর আই এ এস। আর নন্টুদা এখন মোড়ের চায়ের দোকানে বসে থাকে দিনরাত। সাট্টার পেনসিলার। চা খেয়ে খেয়েই লিভার পচিয়ে ফেলেছে। বিয়েটাও হয়ে ওঠেনি বেচারার।

কন্দর্পকেও কি ওরকম বোকা প্রেমিক ঠাউরেছে মধুমিতা!

হতেও পারে। জীবনে যখন একটু সাফল্যের মুখ দেখছে কন্দর্প, তখন তো সঙ্গে একটু দুঃখও পেতে হবে। না হলে যে সাফল্যের পেয়ালা ভরে না।

জয়শ্রী খাবার থালা নিয়ে ঘরে এসেছে, —নে, তোর জন্য কটা গরম গরম কচুরিই ভেজে আনলাম।

পলকে খুশির চাদর জড়িয়ে নিল কন্দর্প, —বাস! ফ্লেবার কী! শংকরদা কারুর ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি ঝেঁপে এনেছে নাকি রে?

জয়শ্রী গাল ফোলাল, —সব সময়ে ওকে নিয়ে ফাজলামি করিস কেন বল তো?

—ফাজলামি! শংকরদাকে নিয়ে! শংকরদারই গুহায় বসে! আমার ঘাড়ে একটাই মাথা আছে

বাপ !

—দেব এক কানচাপাটি।

—দিদি প্লিজ, পতিনিন্দা সহ্য করতে শেখ। ফুট করে সতী হয়ে যাস না। কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তোর লাশ কাঁধে নিয়ে ঘুরতে শংকরদার তো কালঘাম ছুটবেই, মাঝখান থেকে ব্যাটা ঝান্টু...

—অ্যাই চোপ। আলুর দমটা খা। বল কেমন হয়েছে ?

থালাটা নাকের কাছে এনে শুঁকল কন্দর্প, —ফাইন।

—না খেয়েই বললি ?

—ভাল জিনিস খাওয়ার দরকার হয় না। গন্ধে মালুম হয়।

—তিব্বতি আলুর দম। টিভি দেখে শিখেছি।

—তিব্বতিরা আলুর দম খায় ! জন্মে শুনিনি তো ! ওই বরফের দেশে ঘাস গজায় না, আলু হয় !

—চালান-টালান যায় বোধ হয়। ওরা হয়তো পালেপাব্বনে খায়। কাশ্মীরি কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসল জয়শ্রী। ভারী শরীরটাকে একটু ছ্যাতাপ্যাতা করে নিল। শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলল, —বাবাকে একদিন এই আলুর দমটা বেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলাম। কী তোলা তোলা করে খেয়েছিল বাবা !

—বাবা তো...। থেমে গেল কন্দর্প। একটু যেন বিষণ্ণ ভাব এল গলায়। বলল, —মন খারাপ করে আর কী করবি ? ভবিতব্য ছিল, ঘটে গেল।

আঁচলটা একবার চোখে বুলিয়ে নিল জয়শ্রী। বলল, —না রে চাঁদু, আমি এখনও ঠিক মানতে পারি না। আপন জনের কাছ থেকে অত বড় আঘাত না পেলে...

—দাদার কথা বলছিস ? কন্দর্পর হাত থেমে গেল, —দাদার সঙ্গে তো বাবার নিত্যদিনের ঝগড়া। ও আর বাবা গায়ে মাখত নাকি ? তা ছাড়া দাদাও তো কম শাস্তি পায়নি। এখন কেমন পাগলের দশা হয়েছে বল ?

—কেন আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস চাঁদু ?

—কী কথা ?

—আগের রাতে বউদি যদি বাবাকে দিয়ে জোর করে সইটা না করিয়ে নিত...

—তোকে কে বলল বউদি জোর করেছে ?

—এসব কথা বলতে হয় না ভাই। বোঝা যায়।

—কী করে ?

—আমি বললাম, মেজদা বলল, তুই বললি, দাদাও বোধহয় একবার কথাটা তুলেছিল... বাবা নিজের ছেলেমেয়েদের কথায় রাজি হল না, আর একটা পরের মেয়ের কথায় নাচতে নাচতে সই করে দিল ! এত আনন্দে সই করল যে রাত পোয়াতেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল ! আমাকে তুই অত মুখ্যু ভাবিস না চাঁদু।

কন্দর্প বড়সড় ঝাঁকুনি খেল। শ্রাদ্ধের দিনই খানিকটা কানাঘুষো চলছিল বটে, কিন্তু সেটা যে পল্লবিত হয়ে এই আকার ধারণ করেছে এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। সংসার বড় গভীর গাড্ডা। কোন দিকের জল যে কোন দিকে গড়িয়ে যায় ! ভীষণ খারাপও লাগছিল কন্দর্পর। বউদি তো দ্বিধাতেই ছিল, সে যদি সেদিন কাগজটা এগিয়ে দিয়ে কানের কাছে শাস্ত্রবাণী না আওড়াত তা হলে হয়তো আরও একটু ভাবত বউদি। হয়তো পরদিন বলত। কি তার পরদিন। পরক্ষণে নিজেকে শক্ত করল কন্দর্প। মৃত্যু তো এক অমোঘ নিয়তি। বউদির সঙ্গে কথা না হলেই কি সেদিন পরোয়ানা ফিরে যেত !

তবে এ কথা যখন একবার ছড়িয়েই গেছে, এখন আর লোকজনের মুখ বন্ধ করা মুশকিল। এক জায়গায় মুখ আটকাতে গেলে দশ জায়গা দিয়ে গাঁজলা হয়ে ফেটে বেরোবে। বেচারা

বউদি।

কন্দর্প ভার গলায় বলল, —তুই ভুল করছিস রে দিদি। বাবা সই করার জন্যই মারা যায়নি। সই যদি বাবা করেও থাকে বউদির মুখ চেয়েই করেছে।

—বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

—বাবা যে বউদিকে খুব ভালবাসত, এ কথা তো মানবি? ছেলেমেয়েদের থেকেও বউদি অনেক বেশি প্রিয় ছিল বাবার।

—অসম্ভব। তোর এ কথাও আমি মানতে পারলাম না। হ্যাঁ, এটা ঠিক বাবার একটা দুর্বলতা ছিল বউদির ওপর। সেটাকে তুই এক ধরনের অপরাধ বোধও বলতে পারিস। অবশ্য আমার মতে তারও কোনও মানে হয় না। জয়শ্রী উঠে টেবিল থেকে পানজর্দার কৌটো নিয়ে এল। এক মুখ সুপুরি কচকচ চিবোচ্ছে। আবার থেবড়ে বসল কার্পেটে। ঝুঁকে বলল, —একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বল দেখি চাঁদু। আমাদের দাদা ওই বউকে বিয়ে করার আগে কী এতটা বাউন্ডুলে ছিল? দাদার এই আজকের অবস্থার জন্য বউদির কোনও দায় নেই বলতে চাস? কী পেয়েছে ওই বউয়ের কাছ থেকে? বিয়ের পর থেকেই? হেল্যাফেলা আর লাথি ঝ্যাঁটা ছাড়া?

—বউদিই বা কী এমন সুখে আছে রে?

—মেয়ে মানুষকে সুখ পেতে গেলে অনেক কপাল করে আসতে হয়। আমি বিয়ে করার সময়ে আমার বরের কী হাল ছিল? আর এখন...! তোর শংকরদাকে তালেবরটি করার জন্য কম লেগে থাকতে হয়েছে আমাকে! দাদার জন্য বউদি অসুখী হয়েছে, না বউদির জন্য দাদা, সেটা এখন ভেবে দেখা দরকার।

ইঙ্গিতটা আস্তে আস্তে বিপজ্জনক দিকে যাচ্ছে। কন্দর্প টের পাচ্ছিল। সব পথই ঘুরে ফিরে রোমের দিকে যায়!

মাথা নিচু করে একটা কচুরি শেষ করল কন্দর্প। জল খেল এক ঢোঁক। একটু মিনতির সুরে বলল, —বউদির কথাটাও একবার ভাব দিদি। কত হেলপলেস অবস্থায় পড়লে তবে বউদি বাবার কাছে গিয়ে...

—বাপ্পার টাকার কথা বলছিল? হুঁহ, মাত্র তো পঞ্চাশ হাজার টাকা! তোর শংকরদাকে বললে এক দিনে অ্যারেঞ্জ করে দিত। সে নয় দেমাক, চাইবে না। নিজের প্রেসটা তো বেচে দিতে পারত।

—ওই লঝঝড় মার্কা প্রেস বেচে ক টাকা পেত? কোন মহাজন সাত দিনে প্রেস কিনে পঞ্চাশ হাজার টাকার থলি উপুড় করে যেত রে?

—আমার মুখ ছোটাস না চাঁদু। তুইও জানিস, আমিও জানি, বউদির টাকা পাওয়ার আরও অনেক রাস্তা ছিল।

শুভাশিসের দিকে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভাসিয়ে দিল জয়শ্রী। ভাইয়ের প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ করল সরু চোখে। কন্দর্পর থমথমে মুখ দেখে কোমল হল সামান্য। গলা নামিয়ে বলল, —মেজদাই তো টাকাটা দিতে চেয়েছিল।

কন্দর্প জোর বিষম খেল।

কাশতে কাশতে কচুরির টুকরো ছিটকে আসছে মুখ থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিল একটু। এ বৃত্তান্ত তার ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না।

জয়শ্রী পানের পিক গিলে বলল, —মেজবউদি আমাকে সব বলেছে।

—লাই। আমি বিশ্বাস করি না। মেজদা টাকা দিতে চেয়েছে? মেজগিন্নি জানত সে কথা? অ্যাবসার্ড। মেজবউদি গল্প বানাচ্ছে।

—উঁউহু, বড়বউদির কথা বেদবাক্য, আর মেজবউদি মিথ্যেবাদী! ঠিক আছে চল, আমি সামনা-সামনি ভজিয়ে দেব।

কন্দর্প প্রমাদ গুনল। লেজে আগুন নিয়ে গিয়ে আর একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে নাকি দিদি! মধুমিতার বাড়ি থেকেই কেটে পড়া উচিত ছিল।

ঝটিতি কচুরি শেষ করে হাত ধুয়ে এল কন্দর্প। সোফার কাঁধে ফেলে রাখা উইন্ডচিটারটা পরে নিল।

জয়শ্রী হাঁকপাক করে উঠেছে, —এ কি, তুই যাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়া, চায়ের জল বসাচ্ছি।

—তোর ওই তিব্বতি আলুর দমের পর আর চা চলে না। বাই।

—ও যে তোকে বসতে বলে গেল!

—জরুরি দরকার থাকলে ফোন করতে বলবি। আমি কাল সারা সকাল বাড়ি আছি।

—তুই কিন্তু আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছিস চাঁদু!

কন্দর্প আলগা টোকা মারল দিদির গালে, —না রে দিদি। দুপুরে মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরলাম। বড্ড টায়ার্ড। বাড়ি গিয়ে একটা প্রমত্ত ঘুম লাগাতে হবে।

নিশ্চিন্তে বেরোনো হল না। স্কুটারে স্টার্ট দিতে না দিতেই শংকর। কালিঝুলি মাখা ভগ্নদূতের মতো চেহারা।

—চলে যাচ্ছ! বললাম না তোমার সঙ্গে কথা ছিল!

—আপনিই তো নিপাত্তা। কতক্ষণ অপেক্ষা করব?

—আর বোলো না। আমার গাড়িটা রাস্তায় গিয়ার বক্স ভেঙে পড়ে ছিল। ড্রাইভারকে নিয়ে ঠেলেঠুলে গ্যারেজে ঢুকিয়ে এলাম। রোববারের বাজার, তায় শীতকাল, কত কষ্টে যে গ্যারেজটা খোলালাম! শংকর নিজের পোশাকটা দেখাল, —নিজে নিজেই কলকবজা খোলার চেষ্টা করছিলাম, দ্যাখো কি হাল হয়েছে! কবে এসব কাজ ছেড়েছি, আর কি পোষায়! এসো এসো। দশ মিনিট আরও বসে যাও।

—আজ আর বসব না শংকরদা। কন্দর্প ঘড়ি দেখল,— বলুন না কী বলবেন?

—একটু সময় লাগবে হে।

—লাগুক। বলুন। কন্দর্প একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

একখানা দলামোচড়া কালো ন্যাকড়া পকেট থেকে বার করল শংকর। চেপে চেপে হাত মুছে সিগারেট ধরাল। ঘন ঘন দু-তিনটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল গলগল। প্রায় স্টিম ইঞ্জিনের মতো। তারপর দুম করে বলল, —বড়বউদির সব পরিশ্রম তো ভস্মে গেল হে।

—কেন?

—তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ, কেন! ইউ! অশোক মুস্তাফি তো তোমার প্রোমোটার। তুমি তো তারই বইয়ের শুটিং করে বেড়াচ্ছ! তুমি তার কাছের লোক, খবরটা তো তোমারই আগে জানা উচিত!

—হেঁয়ালি ছেড়ে স্পষ্ট করে বলুন। কন্দর্প সামান্য রুক্ষ হল, —আমার ভাল লাগছে না।

—চটো কেন শালাবাবু? ঠাট্টা বোঝো না? সেদিন তোমার মুস্তাফিবাবু আমাকে বললেন...

কন্দর্প বাধা দিল, —মুস্তাফিবাবুর সঙ্গে আপনার কোথায় দেখা হল?

—কোথায় দেখা হল সেটা বড় কথা নয়। কী কথা হল সেটাই আসল। ধরো আমাদের চিনেবাজারের ফুটপাতে দেখা হয়েছিল। উনি কাচের বয়াম কিনছিলেন, আমি বেতের ঝুড়ি। হা হা।...মুস্তাফিবাবু বললেন, এত প্ল্যান প্রোগ্রাম ছকলাম, পুরো এগ্রিমেন্টটাই বেকার হয়ে গেল! কী দুর্দৈব! আমি বললাম, কেন? উনি বললেন যাঁর সঙ্গে লেখাপড়া, কাজ শুরু হওয়ার আগেই তো তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। এখন আমাকে আবার নতুন করে এগ্রিমেন্ট করতে হবে। সব কজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে। দুঃখ করছিলেন, মাঝখান থেকে ওঁর হাজার পঞ্চাশেক টাকা নাকি গলে গেল। তা আমি বললাম, হাহুতাশ করছেন কেন? চাঁদু আছে, আমরা আছি, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই।

শংকর থামল। কন্দর্প তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল শংকরের দিকে,—থামলেন কেন? বলুন। বলে

যান।

—হ্যাঁ, বলতে তো হবেই। ওঁর কথা শুনে মনে হল ওঁর মনোগত বাসনা তোমরা চার ভাইবোন একদিন একসঙ্গে বসো। এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করো। যদি কারুর কোনও আপত্তি না থাকে, তবে ওই বয়ানই সাজিয়ে গুছিয়ে উনি পাঠিয়ে দেবেন, তোমরা চারজন সই মেরে দাও। জ্বলন্ত সিগারেট প্যাশের বনতুলসীর ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিল শংকর। অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে ঝোপ থেকে, ক্রমশ নিবে যাচ্ছে আগুন। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে শংকর বলল,— আমি অবশ্য এগ্রিমেন্টের বয়ান জানি না, তুমি জানতে পারো। তা পঞ্চাশ হাজার টাকাটা বড়বউদি কোন অ্যাকাউন্টে পেল ?

কন্দর্পের মুখ বিদ্রূপে বেঁকে গেল,— অশোকদা এত কথা বলল, এটা আপনাকে বলেনি ?

—বলব বলব করছিল, আমি সেরকম গা করলাম না। আফটার অল এটা আমার শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি ম্যাটার, বাইরের লোকের কাছ থেকে আমি সব কথা শুনব কেন ? বলো, ঠিক করিনি ?

কন্দর্প হাসল। আকাশের দিকে তাকাল একবার। মেঘের সর ছিঁড়ে মলিন আলো বিছিয়ে গেছে চতুর্দিকে। ঠাণ্ডা ভাবটা বাড়ছে, বাড়ছে। স্কুটারে আলগাভাবে চেপে বসে কন্দর্প হাসিটা ধরে রাখল মুখে। বলল— শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলি ম্যাটার, আপনারই বা জেনে কী হবে শংকরদা ?

—আমার কিছু নয়। অপমান গায়ে মাখল না শংকর। বলল,—তোমার দিদি এর মধ্যে আছে বলেই বলা।

স্কুটারে স্টার্ট দিল কন্দর্প। হেলমেটের কাচ নামাতে নামাতে ক্ষীণ শুনতে পেল,— তোমরা তা হলে বসছ কবে ?

কন্দর্প চেঁচাল,—সে দিদিকে জানিয়ে দেব।

পরদিন দুপুরেই অশোক মুস্তাফির অফিসে গেল কন্দর্প। গিয়েই শোনে যা ভেবেছে তাই, শংকর নিজেই অশোকদার অফিসে এই ঠাণ্ডায় তিন বোতল কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছে, আটটা সিগারেট ধসিয়েছে, এবং জ্বালিয়েছে বহুক্ষণ। হেন প্রশ্ন তেন প্রশ্ন, প্রশ্নের আর তার শেষ নেই। শংকরের মতো এমন স্যাম্পেল-আত্মীয় কোত্থেকে জোটাল কন্দর্প !

মুখ লাল করে কন্দর্প হজম করল সব কথা। শুটিং নিয়ে দুটো-চারটে দরকারি কথা বলে বাড়ি ফিরে এল। ইন্দ্রাণী প্রেসে ছিল, ডেকে নিয়ে এল নিজের ঘরে। গম্ভীর মুখে বলল, —এবার তো আমাদের সবাইকে একদিন একসঙ্গে বসতে হয় বউদি।

ইন্দ্রাণী ফ্যাল ফ্যাল তাকাল,— কীসের বসা ?

—বাবা তো আর নেই, ভাইবোনেদের মধ্যে এখন খোলাখুলি কথা হওয়া প্রয়োজন।

—তাড়া কিসের ? হবে।

—তাড়া আছে। মেজদা যে সাকসেশান সার্টিফিকেট বার করার কথা বলছিল, তার কী হল ?

—তোমার দাদার যা অবস্থা....দীপু বলছিল....আর কটা দিন....

—নো মোর আর কটা দিন। তুমি মেজদাকে শিগগিরই মিটিং ডাকতে বলো।

—এত উতলা হয়ে পড়েছ কেন চাঁদু ?

—কারণ আছে। আই ক্যান স্মেল আ ফিউম। বাতাসে বারুদের গন্ধ পাচ্ছি বউদি।

ইন্দ্রাণী শ্লথ পায়ে চলে গেল।

শুয়ে আছে কন্দর্প। শুয়েই আছে।

৪৯

সরু গলির ভেতর বাইন্ডিংখানা। ভরা দুপুরেও আলো জ্বলছে ঘরটায়। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বসে শুকনো চেহারার তিনটি মেয়ে ছাপা কাগজের ফর্মা ভাঁজ করে চলেছে। যন্ত্রের মতো। ঘরে

আছে আর একজন মধ্যবয়সী লোক, পাশে তার লেই-এর টিন।

ইন্দ্রাণী দরজায় এসে দাঁড়াল। চোখ চালাচ্ছে ভেতরে, —বিপদবাবু নেই ?

বিপদ, অর্থাৎ বিপদভঞ্জন বাইন্ডিংখানার মালিক। পিছনের শ্যাওলা ধরা কলতলায় টিফিনকৌটো ধুচ্ছে। উঁচু গলায় সাড়া দিল, —বসুন দিদি। আসছি। এই বিশু, দিদিকে একটা টুল দে।

ইন্দ্রাণীকে দেখেই মেয়ে তিনটির চোখে খুশির ঝিলিক। একটি মেয়ে কি যেন ইশারা করল দ্বিতীয়জনকে। দ্বিতীয়জন তৃতীয়কে। তৃতীয় মধ্যবয়সীকে বলল, —ও বিশুদা, টুলটা এগিয়ে দিন না। দিদি যে দাঁড়িয়ে আছেন। বলেই ইন্দ্রাণীর দিকে ফিরে চোখ টিপল। মজা করছে বিশুর সঙ্গে !

বিশু বিরস মুখে বলল, —তুই দে না। আমার হাতে আঠা।

দ্বিতীয় মেয়েটি খিলখিল হেসে উঠল, —বাবু তো আমাকে বলেনি, আপনাকে বলেছে।

—বললেই হল ! এখন ওঠা যায় ! তোরা এমন দিক করিস না। বিশু রীতিমতো বিরক্ত। মেয়েরা সমস্বরে কিচমিচ করে উঠল, —আহ, একটু উঠলে কি হয় !

—আমাদের ফর্মা গোলমাল হয়ে যাবে না !

—ইশ। দিদি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন ! ও বিশুদা, বিশুদা গো...

এ সব রঙ্গরস রোজই চলে। একঘেয়ে কাজের মাঝে একটু বিনোদন। অন্য দিন মুচকি মুচকি হাসে ইন্দ্রাণী, আজ তার বিরক্ত লাগছিল। নিজের মন ঠিক না থাকলে সামনের লোকজনের হাসি মশকরা অসহ্য লাগে।

কথা না বলে সন্তর্পণে কাগজের স্তূপ টপকে কাটিং মেশিনের পাশের টুলে গিয়ে বসল ইন্দ্রাণী। রোদ্দুর থেকে নোনাধরা ঘরে ঢুকে শীত শীত করছে, পাতলা চাদরটা সাপটে নিল গায়ে। ক'দিন ধরেই চাপা একটা নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস টানল। কোথায় অক্সিজেন ? ছাপা কাগজের আনকোরা গন্ধের সঙ্গে একটা চোরা দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না।

বিপদ ঘরে এল। সে প্রায় দুর্লভেরই সমবয়সী, দুর্লভের পাশের গ্রামে থাকে, দুর্লভের সূত্রেই তার এই বাইন্ডিংখানার সঙ্গে ইন্দ্রাণীর জানাশোনা। কাজেকর্মে সস্তা না হলেও নগদানগদি টাকা গুনতে হয় না, এটুকুই ইন্দ্রাণীর লাভ।

তা সে লাভের দিনও তো ইন্দ্রাণীর ফুরিয়ে এল !

ইন্দ্রাণী কেজো গলায় বলল, —আমার হিসেবটা করে রেখেছেন ?

লুঙ্গিপরা বিপদ পরিষ্কার গামছায় টিফিন কৌটো মুছছে। দেওয়ালের তাকে কৌটো রেখে বলল, —আপনি সত্যি সত্যি সব মিটিয়ে দেবেন ?

—দুর্লভবাবু আপনাকে বলে যাননি ?

—হ্যাঁ বলেছিল। তবে...। বিপদ কোণের টেবিল থেকে একটা আধছেঁড়া ডায়েরি বার করে পাতা ওলটাল, —আপনার আর খুব বেশি নেই। সাতশো পনেরো।

ইন্দ্রাণী ব্যাগ খুলে টাকা বার করছে। বিপদ আবার বলল, —পুরোই দিয়ে দেবেন ?

—হুঁ।

—প্রেস তা হলে আপনি রাখবেন না দিদি ?

—না। ইন্দ্রাণী টাকা এগিয়ে দিল, —গুনে নিন ভাই।

তিনটি মেয়েরই হাত থেমে গেছে। কেমন করে যেন দেখছে ইন্দ্রাণীকে।

বিপদ টাকাটা ড্রয়ারে রেখে দিল, গুনল না। ভুরু কুঁচকে বলল, —প্রেসের খদ্দের পেয়ে গেছেন ?

—আসছে দু-একজন। মেশিন দেখে যাচ্ছে। ...আপনার হাতে কেউ আছে নাকি ?

—বউবাজারের একজন বলছিল। আপনার তো হাফ ডিমাই মেশিন, তাই না ?

—হুঁ, হাইডেলবার্গ। দেখেছেন তো, এখনও কি ভাল ছাপা হয় !

বিপদ কথাটাকে খুব আমল দিল না। ব্যবসায়ী স্বরে বলল, —কত হলে দেবেন ? পার্টিকে একটা দর বলতে হবে তো।

—হাজার তিরিশেক। ইন্দ্রাণী অনেকটা বাড়িয়েই বলল।

—উরেব্বাস, অত কে দেবে ! সেদিন একটা মার্সেডিজ আঠেরো হাজারে বিক্রি হল। সেও হাফ ডিমাই। বলেই কি যেন ভাবল বিপদ। হুট প্রেসে কিছু বই ঢোকানো আছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখল একটুক্ষণ, —আপনার টাইপ কত আছে ?

—বাংলা ইংরিজি মিলিয়ে দুশো কেজি মতো হবে।

—কেজি যদি তিরিশ টাকাও হয়, তো ধরুন ছ হাজার। হিসেব কষছে বিপদ, —তাহলেও তো আপনার মেশিনের দাম অনেক পড়ে যাচ্ছে !

—আপনি টাইপসুদ্ধু ধরছেন নাকি ? টাইপ আমি আলাদা বেচব। ইন্দ্রাণী তড়িঘড়ি বলে উঠল, —টাইপের দাম আপনি তিরিশ ধরছেন কেন ? জুলাই মাসে আমি আশি টাকা করে কিনেছি... এখনও চল্লিশ কেজি টাইপ প্রায় নতুন আছে।

—সবই আপনার সিসের দরে যাবে। মেশিনও আপনি মেরে কেটে ওই আঠেরো বিশই পাবেন। আজকাল কত লোক ওসব মেশিন লোহালক্কড়ের দামে বেচে দিচ্ছে। পুরনো জিনিসের কি আর কদর আছে দিদি ! বিপদ লাইটার জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাল, —বেশ তো চলছিল দিদি, কেন বেচতে চাইছেন ?

ইন্দ্রাণী উত্তর দিল না। দুর্লভ কতটা কি বলে গেছে কে জানে ! ইন্দ্রাণী মরিয়া হয়ে প্রেস বেচতে চলেছে, এ কথা শুনলে দর আরও কমে যাবে। সত্যিই তো আঠেরো বিশের বেশি উঠতেই চাইছে না।

ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠেছে বিপদ, —এ কী দিদি, যাচ্ছেন কোথায় ! চা খেয়ে যান।

—আজ থাক বিপদবাবু, শরীরটা ভাল লাগছে না।

—একটু চায়ে কিছু ক্ষতি হবে না। ....সম্পর্ক মিটিয়ে দিলেন, এর পর কি আর আপনার পায়ের ধুলো পড়বে দিদি !

—তা কেন, আসব মাঝে মাঝে। কাছেই তো আমার বাপের বাড়ি। মানিকতলায়।

—অমন সবাই বলে, কেউ আসে না। একটা হলদেটে কেটলি বিশুর দিকে বাড়িয়ে দিল বিপদ, —একটা স্পেশাল চা নিয়ে আয় তো। বেশি দুধ দিয়ে।

অগত্যা বসতেই হয়। ইন্দ্রাণী ব্যাগ কোলে নামাল।

মেয়েরা এখনও কাজে হাত লাগায়নি, হাঁ করে কথা শুনছে। মুখে বিস্ময়, কিছুটা বিষণ্ণতাও। ইন্দ্রাণী মুখ ঘুরিয়ে নিল। মেয়ে তিনটের একটু আগের রঙতামাশা ভুলে যাচ্ছিল ইন্দ্রাণী। এই যে ছায়া মেয়েটা, বর নেয় না, দুর্গানগরে মায়ে-ঝিয়ে থাকে, মা-টা অসুখে ভোগে বারো মাস, ওই তুলসী আর শিবানী ক্যান্টনমেন্ট থেকে নটা চোদ্দর লোকালে আসে রোজ, ফেরে সেই সাঁঝবেলা পার করে, রূপ আর টাকার অভাবে বিয়ে হয়নি —সামান্য হলেও ওদের সঙ্গে তো আলাপ পরিচয় হয়েছিল ইন্দ্রাণীর। নিজেদের দুঃখসুখের গল্প করত মাঝে মাঝে, ঘর পরিজনের কথা বলত, ইন্দ্রাণীকেও কত রকম সরল প্রশ্ন করত মেয়েগুলো। কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। হয়তো ইন্দ্রাণীও খেটে খাওয়া মেয়ে বলেই। পুজোর আগে ইন্দ্রাণী ওদের পঞ্চাশটা করে টাকা দিয়েছিল, কী উজ্জ্বল যে হয়ে গিয়েছিল ওদের মুখচোখ ! প্রেসটা কি নিছক ব্যবসা ছিল ? না। ছিল এক ধরনের মুক্তি। সংসার, চাকরি সব কিছুই তো একটা গণ্ডিতে আবদ্ধ, একমাত্র প্রেসের কাজেই একটু যা ডানা মেলতে পারত ইন্দ্রাণী। সেই ডানা ইন্দ্রাণী নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলছে, এ কষ্ট কে বোঝে !

বিশু চা এনেছে। বিপদ মেঝেয় থেবড়ে বসে বকবক করে চলেছে আপন মনে। এ পাড়ায়

কোন প্রেসের কি হাল, এই সব। ইন্দ্রাণী শুনছিল না, চুমুক দিচ্ছে ভাঁড়ে। শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন আর মায়া বাড়িয়ে কী লাভ! আদিত্য তো বলেইছিল ব্যবসা টিকবে না। অফসেটের সঙ্গে পাঞ্জা লড়া সত্যিই খুব কঠিন হয়ে পড়ছিল দিন দিন। দরে, ছাপায়, লোকজনের রুচিতে পিছিয়ে পড়ছিল প্রেস। দু বছর পরে হোক, তিন বছর পরে হোক, এ ব্যবসা মরতই।

শ্বশুরমশাই-এর মৃত্যুটাও যদি এই চোখে দেখতে পারত ইন্দ্রাণী!

উমা বলল, —কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি রে ইনু।

মা'র পাশে শুয়ে আছে ইন্দ্রাণী। ক্লান্ত লাগছে, তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছে দু চোখ। হালকা ঘোরের মধ্যে বলল, —কী স্বপ্ন?

উমা ফিসফিস করে বললেন, —তনুর স্বপ্ন।

ইন্দ্রাণী উল্টোদিকে ফিরল, —নতুন আর কী! রোজই তো দ্যাখো।

ঘরে শেষ বিকেলের আলোছায়া। আলো কম, ছায়াই বেশি। বাড়িঅলা পাম্প চালিয়েছে, একঘেয়ে শব্দ চলছে একটানা।

উমা উঠে বসলেন, —না রে, এ সেরকম স্বপ্ন নয়। একদম স্পষ্ট স্বপ্ন। ভোররাতে দেখেছি।

ইন্দ্রাণী তেমন আগ্রহ দেখাল না। দুপুরবেলা প্রায় রোজই মানিকতলায় চলে আসে আজকাল, ঢাকুরিয়ার বাড়িতে থাকতে পারে না। নির্জন ও বাড়িটাকে ওই সময়ে যেন ভূতে পায়। ছমছমে বাতাস ঘোরে, ফিসফিস শব্দ হয়, প্রেসঘরে বসেও শান্তি নেই, হঠাৎ-হঠাৎ খকখক কাশির শব্দ ভেসে আছে। চেনা শব্দ। বুকের ভেতর গেঁথে যাওয়া শব্দ। মানুষটার শরীরই শুধু চলে গেছে, মানুষটা আছেন। বেশিরকমভাবে আছেন। বাড়ির প্রতিটি আনাচে-কানাচে। মানিকতলায় এলে অনেকটাই শান্তি। দু দণ্ড জিরোনোও হয়, আবার ভূতটাও ঘাড়ে চেপে থাকে না।

উমা টানলেন মেয়েকে, —কি রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

—না।

—এত বেলায় ঘুমোস না, শরীর খারাপ হবে।

ইন্দ্রাণী চোখ খুলেও বুজে ফেলল। পেনের নিবটা ভেঙে দিলেন জয়মোহন।

উমা ঠেললেন মেয়েকে, —এই ইনু।

ইন্দ্রাণী কেঁপে উঠল, —উঁ?

—জিজ্ঞেস করলি না কী স্বপ্ন?

অন্য ভাবনা ক্ষণিকের জন্য তোলপাড় করছিল ইন্দ্রাণীকে। শ্বশুরমশাইয়ের হাতটা কি চেপে ধরা উচিত ছিল তখন! এগ্রিমেন্টের কাগজটা তক্ষুনি কুটি কুটি করে ফেললে কি বেঁচে যেতেন মানুষটা! তবে কেন লোকে বলে, নিয়তি কে ন বাধ্যতে! নাকি মানুষের লোভ কামনা আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমেই চুপিসাড়ে নিজের কাজ সেরে যান নিয়তিদেবী!

উমা আবার ডাকলেন, —এই ইনু, শোন না। তোর বাবাকে তো বলতে পারি না, তাই তোকেই বলি।

—হুঁ, বলো। ইন্দ্রাণী ঘুরে চোখ রগড়াল, —কী দেখেছ? তনু স্কুলব্যাগ নিয়ে দৌড়চ্ছে? তনু টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ছে? জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে?

—না রে, সেরকম নয়। উমার চোখ জ্বলে উঠেও প্রভাহীন হয়ে গেল, —কাল তনুকে আর ছোট্টটি দেখিনি। সে বেশ একটা দস্তুরমতো লোক।

—হুঁ? ইন্দ্রাণী আধশোওয়া হল।

—হ্যাঁ রে, তবে আর বলছি কি! উমা মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলেন ধীরাজ কাছেপিঠে আছেন কি না। বিছানায় টানটান বসে বললেন, —তনু বেশ তাগড়াই হয়ে গেছে রে! কী হাট্টাকাট্টা চেহারা! ইয়া চওড়া কাঁধ! মুখভর্তি দাড়ি! পুলিশের মতো কি একটা ইউনিফর্ম পরে আছে!

—তনু ! পুলিশের ইউনিফর্ম ! বিষণ্ণ ইন্দ্রাণীও হেসে ফেলল।

—হাসছিস কেন ? হতে পারে না ! ওই গড়পারের টুকু, তনুদের সঙ্গে খুব ওঠাবসা ছিল, ও তো এখন পুলিশে চাকরি করে। একদিন আমার সঙ্গে শনি মন্দিরের কাছে দেখা হয়েছিল। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে কথা বলল। তনুর কথা জিজ্ঞেস করছিল। তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। সে তো দিব্যি ইউনিফর্ম পরে গটগট হাঁটছে। তবে তনু কেন পরতে পারবে না ?

—পারবে না, কারণ তনু পিউরিটান।

—সেটা কি জিনিস ? নকশালদের এখন কি যেন বললি, ওই পিউরিটান, ওই বলে নাকি ?

ইন্দ্রাণী মনে মনে বলল, নকশালদের এখন কি বলে তা নকশালরাই জানে। তবে যে ভাই দিদির মুহূর্তের স্খলনকে ক্ষমা করতে পারে না, সে কি তার চামড়ার রঙ বদলাতে পারবে কোনওদিন ?

মুখে বলল, —ও তোমার জেনে কাজ নেই। তুমি টুকুর সঙ্গে তনুকে গুলিয়ে ফেলেছ। ...তা মা, তোমার ইউনিফর্ম পরা তনু স্বপ্নে কী করছিল ?

—একটা পাহাড়ি রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে আসছিল। আমাকে দেখে এক গাল হেসে বলল, আমার জন্য চিন্তা কোরো না মা। আমি তোফা আছি। আমি হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম, ঘুমটা ভেঙে গেল।

ইন্দ্রাণী বলল, —এই তোমার স্পষ্ট স্বপ্ন !

—হ্যাঁ রে, বিশ্বাস কর। যতটুকু দেখেছি, ততটুকু একেবারে স্পষ্ট। গায়ের রঙটা কেমন পুড়ে গেছে তনুর ! ....ভোরের স্বপ্ন মিছে হয় না ইনু।

মা মেয়ে বসে আছে নিস্পন্দ। ঘরের আলোটুকু যেন মরে গেছে সহসা। এক তাল আঁধারের পিণ্ড গলে গলে মিশে যাচ্ছে চারদিকে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ঘর। দ্রুত, অতি দ্রুত।

দম বন্ধ হয়ে আসছিল ইন্দ্রাণীর। উঠে আলো জ্বালাল। ফ্যাকাসে মুখে ফিরল বিছানায়, —কতদিন আর স্বপ্ন দেখে কাটাবে মা ?

উমা চোখের কোণ মুছলেন, —দেখতে কি চাই রে ! এসে যায়।

—তুমিও যদি বাবার মতো হয়ে যাও... ! ইন্দ্রাণী রূঢ় হতে গিয়েও থেমে গেল। নিচু গলায় বলল, —তুমি দুর্বল হয়ে পড়লে বাবার কী হবে মা ?

উমা চুপ। একটু পরে উঠে গেলেন রান্নাঘরে। চা করছেন। টুঙ টাঙ শব্দ হচ্ছে কাপডিশের।

ইন্দ্রাণী পাশের ঘরে এল। ধীরাজের কাছে। টিভিতে একটা কার্টুন ছবি হচ্ছে, চোখ গোল গোল করে দেখছেন ধীরাজ। প্রায় শিশুর উত্তেজনায়। কখনও হাসিতে ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, কখনও ভাঁজ পড়ছে কপালে। ইন্দ্রাণীকে দেখেও হুঁশ নেই।

ইন্দ্রাণী বলে উঠল, —সব সময়ে এত টিভি দ্যাখো কেন বাবা ?

—অ্যাঁ ? ধীরাজ ঘাড় ঘোরাতে গিয়েও ঘোরালেন না, —কিছু বলছিস ?

—বলছিই তো। শুনছ কোথায় ?

—শুনছি তো। বল না।

—অত টিভি দ্যাখো কেন ?

—আর কী করব ?

—বই পড়তে পারো। আগে তো তোমার খুব পড়ার নেশা ছিল।

—দুর, পড়ে কী হবে ! টিভিতেই কত গল্প দেখা যায়।

ঠিক যেন অ্যাটমের মতো কথা। ইন্দ্রাণী কৌতুকের স্বরে বলল, —গল্প দেখো ভাল কথা, তা বলে কখনও বই পড়বে না ?

—মাথায় থাকে না রে। তিন পাতা পড়ি, তো গোড়াটা ভুলে যাই। হাসির বইটই হলে তবু...

—তাই পড়ো। শুধু শুধু টিভি দেখে চোখের আরও বারোটা বাজছে।

—হাসির বই পাব কোথায় ?

ইন্দ্রাণী বলতে যাচ্ছিল, দিলুদাকে বোলো লাইব্রেরি থেকে এনে দেবে। বলল না। দিলুদা আর কত করবে ! কেনই বা করবে !

ইন্দ্রাণী বলল, —আমার স্কুলের লাইব্রেরি থেকে এনে দেব। পোড়ো।

কার্টুন শেষ। শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে নৃত্যনাট্য শুরু হয়েছে। এও এক ধরনের কার্টুন, তবে ধীরাজের এতে উৎসাহ নেই। মেয়ের দিকে ফিরলেন, —তোর সঙ্গে কি যেন একটা জরুরি কথা ছিল। কী বল তো ?

—বা রে, আমি কী করে বলব !

—তুই জানিস না, না ? মাথা চুলকোচ্ছেন ধীরাজ। গলা ওঠালেন, —ওগো শুনছ ?

ট্রে-তে তিন পেয়ালা চা সাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন উমা, —চেঁচাচ্ছ কেন ?

—কি একটা কথা যেন ইনুকে বলতে বলছিলে ? সেই যে গো কাল, তুমি তখন রুটি দিচ্ছিলে ! রুটিটা শক্ত মতো হয়েছিল ! র‍্যাশনে গম খুব খারাপ দিল ! এত বড় বড় ইটের টুকরো...

—আহ থামো। উমা বেতের সোফায় বসলেন, —তোর বাবাকে নিয়ে সামনের মাসে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। ওই যে ফি বছর দুবার বেঁচে থাকার সার্টিফিকেট দিতে হয়....

—ও। লাইফ সার্টিফিকেট ? সে যাব'খন।

ধীরাজ বললেন, —আমি বার বার বললাম ওটা নিজেই করতে পারব। প্রতি মাসেই তো যাচ্ছি। সশরীরে যাওয়া মানেই তো বেঁচে আছি প্রমাণ করা।

—তোমাকে নিয়ে ওইখানেই তো ভয়। উমার গলায় সামান্য ঝাঁঝ। একটু আগের বিষাদ কোথায় উবে গেছে, —আগেরবার ভেতরে ঢুকে একটা সই করতে গিয়ে এমন সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করেছিলে ! ঘাবড়ে মাবড়ে গিয়ে, হাত পা কেঁপে...

—এঁহ্। তোমাকে কে বলল ?

—আমার চর সর্বত্র ছড়ানো আছে। সেনবাড়ির পিনু সেদিন টাকা তুলছিল, বাড়ি এসে বলে গেছে।

ধীরাজ লজ্জা লজ্জা মুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন।

উমা বললেন, —আর একটা কথা যে বলার ছিল, বলেছ ? যেটা বলার জন্য রাত থেকে ছটফট করছ ! তোমার ওপর ভরসা করাই বৃথা, আমারই বলা উচিত ছিল।

ধীরাজ আরও লজ্জা পেলেন, —তুমিই বলো।

—কেন, তুমিই বলো না। তুমি তো বেশি লাফাচ্ছিলে।

ইন্দ্রাণী ঈষৎ অধৈর্য হল, —একজন কেউ বলেই ফেলো না।

উমা আলগা হাসলেন, —তোকে বলতে ভুলে গেছি। কাল অনেকদিন পর তোর বেলা মাসি এসেছিল। ওরা সব দল বেঁধে কাশী যাচ্ছে। সামনের মাসে। আমাদেরও যেতে বলছিল। দিন পনেরোর জন্য।

—যাও না। ভালই তো। বলেই ইন্দ্রাণীর খেয়াল হল, দলের সঙ্গে হোক আর যাই হোক, বাবা মা-র জন্য সব সময়ই একজন পাহারাদার দরকার। আদিত্যকে সঙ্গে পাঠালে কেমন হয় ! মনটাও একটু স্থিত হবে তার। ভালয় ভালয় সইসাবুদটা চুকে গেলে তার যেতে বাধাই বা কোথায় !

ইন্দ্রাণী প্রস্তাবটা পাড়ল। উমা মহা খুশি। ধীরাজও।

উমা বললেন, —সে যা খেয়ালি মানুষ, শেষ পর্যন্ত যাবে তো ?

—বলে দেখি। সে তো তোমার শিবের অবতার। যেতেই পারে।

ধীরাজ বায়না জুড়লেন, —তুইও চল না ইনু।

—আমি ! পাগল নাকি ! সামনের মাসে আমার স্কুলের পরীক্ষা। তিতিরের অ্যানুয়াল।

উমা জিজ্ঞেস করলেন, —তোদের বাড়ির ব্যাপারটা কী হল ?

পলকে একটা হাত ভেসে উঠল চোখের সামনে। মৃত্যুদণ্ডে সই করে নিব ভেঙে দিচ্ছে।

আনন্দের মুহূর্তে ছায়া পড়তে দিল না ইন্দ্রাণী। সামলে নিল। বলল, —কথাবার্তা চলছে। দেখি কবে কি হয়।

উমা বললেন, —তোরা ক তলায় ফ্ল্যাট পাবি রে ?

—এখনই কি বলা যায় ?

—যে তলাতেই হোক, দক্ষিণমুখো নিস। তোদের এখনকার ঘরটায় আলো বাতাস বেশ কম।

—আজকাল চারপাশে এত বাড়ি, সব দিকেই আলো বাতাস কম মা।

ধীরাজ ফস করে প্রশ্ন করলেন, —বাপ্পা ঠিক ঠিক চিঠিপত্তর দিচ্ছে তো ?

—দিচ্ছে। খুব চাপে আছে। ফাঁক পেলে লেখে।

—দেখিস ও আবার যেন হারিয়ে...

—চুপ করো। অলুক্ষুণে কথা বোলো না। উমা ধমকে উঠলেন।

আঁধার কখন নেমে গেছে। মাথার ওপর মাঘ শেষের নির্মল আকাশ। ধুলোবালির শহর থেকে ওই মেঘহীন আকাশকেও বড় ঘোলাটে লাগে, গ্রহ তারারাও বড় অস্পষ্ট। বাতাসও উষ্ণ হচ্ছে ক্রমশ, শীতের গোপন কামড়টা আর যেন নেই।

পথে বেরিয়ে বাপ্পার কথা মনে পড়ছিল ইন্দ্রাণীর। বাবা কি ভুল বলেছে কিছু ? সত্যিই তো বাপ্পা হারিয়ে গেল। আরও শত সহস্রবার আসবে যাবে, আসবে যাবে, কিন্তু আর কি ছেলেকে সেভাবে কাছে পাবে ইন্দ্রাণী ! প্রতিবারই হয়তো একটু একটু করে অপরিচিত হয়ে যাবে বাপ্পা। তা হোক। বাপ্পা মনের সুখে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ুক। দুঃখ করে ইন্দ্রাণী কারই বা জীবনের গতিপথ বদলাতে পেরেছে !

—ইন্দির, অ্যাই ইন্দির !

ইন্দ্রাণী চমকে দাঁড়িয়ে গেল। দিলুদা বসে আছে সেনবাড়ির রোয়াকে। ডাকছে তাকে। সেই কৈশোরের নাম ধরে।

৫০

মন খারাপের মুহূর্তে হঠাৎ যদি কেউ হারিয়ে যাওয়া নাম ধরে ডেকে ওঠে, মনটা যেন লহমায় ভাল হয়ে যায়। সংসারের মালিন্য, বেঁচে থাকার জটিলতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হাহুতাশ কিছুই যেন আর স্মরণে থাকে না। বুকের ভেতর ঘুমিয়ে আছে এক টাইম মেশিন, সোঁ সোঁ করে ছুটতে থাকে সে, হু হু করে কমে যায় বয়স।

ইন্দ্রাণী হাসিমুখে দিলীপের সামনে এল,—কি গো, অন্ধকারে, একা একা এমন দেবদাস হয়ে বসে আছ কেন ?

দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল। পরনে জিনস, টিশার্ট, চাদর টাদরের বালাই নেই। ইন্দ্রাণী মনেও করতে পারে না কোনওদিন দিলুদাকে গায়ে শাল চাদর জড়াতে দেখেছে কিনা।

দিলীপের অ্যাথলেটিক চেহারায় বয়স এখনও দাঁত ফোটাতে পারেনি। বনবন হাত ঘোরাচ্ছে সে। পেস বোলারদের মতো কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল,— আমাকে দেখে তোর দেবদাস মনে হয় ?

ইন্দ্রাণী ঠোঁট টিপল,— হয়ই তো। তবে ভিজে দেবদাস নয়, ড্রাই দেবদাস।

চোয়াল এঁটো করে হাসল দিলীপ,— কী আর করা যাবে ! তোরা সব পাড়া অন্ধকার করে কেটে পড়লি...

—হুঁহ, খুব যে কায়দার কথা ! চোখ চালিয়ে চারপাশটা দেখে নিল ইন্দ্রাণী,—তোমার সব সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায় ?

—আর সাঙ্গোপাঙ্গ ! সব যে যার ম্যাও সামলাচ্ছে। অফিস থেকে ফিরে টুক করে নিজের ডেরায়

সেঁধিয়ে যায়।

—সে তো তোমার বন্ধুরা। তার পরের ব্যাচ, তার পরের ব্যাচের সঙ্গেও তো তোমার আড্ডা জমেছিল, তারা সব কই ?

—তারাও কি আর কচি আছে রে ইন্দির ! তারাও সব হ্যাপিলি ম্যারেড হাউস হাজব্যান্ডস। আর তার পরের ব্যাচগুলো তো রকের ধারই মাড়ায় না। সবাই এখন রক শুনতে ভালবাসে, রকে কেউ বসে না। কী স্যাড বল দিকিনি ! রক কালচারটাই উঠে গেল !

—আহা, ভারি স্যাড। তোমাদের উত্তর কলকাতার এত বড় কৃষ্টিটা নষ্ট হয়ে গেল !

—তুই বুঝি খুব সাউথ ক্যালকাটার মেয়ে বনে গেছিস ? থাকিস তো অজ গাঁয়ে। লম্বা চেহারাটা ইন্দ্রাণীর দিকে ঝুঁকল,—তোদের ওখানে এখনও রাত্তিরে শেয়াল বেরোয় ইন্দির ?

দিলুদার মুখে বার বার ইন্দির সম্বোধনটা ভারি মধুর লাগছে ইন্দ্রাণীর। ছোটবেলায় পাড়ার যত বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে পাকা বুড়ির মতো কথা বলত সে, তখনই তার নাম হয়ে যায় ইন্দির ঠাকরুন। সেখান থেকে ইন্দির। তখন শুনলে ভারি চটে যেত ইন্দ্রাণী, এখন যেন একদম অন্য অনুভূতি। যেন ওই ডাকেই লুকিয়ে আছে সেই বালিকা। সেই জোড়া বিনুনি, সেই টরটরে কিশোরী।

ইন্দ্রাণী বালিকার মতোই হাসল,— রিসেন্টলি ঢাকুরিয়ায় গেছ তুমি ? সুপার মার্কেট হয়েছে। মাল্টিস্টোরেডে ছেয়ে গেছে ঢাকুরিয়া।

—তোদের বাড়ি ভেঙেও নাকি মাল্টিস্টোরেড হচ্ছে ?

—কথা চলছে।

—অমন খানদানি বাড়িটাকে ভেঙে ফেলবি ? তোদের বুঝি এক সঙ্গে থাকতে প্রবলেম হচ্ছে ?

যে আলোচনায় যেতে চায় না, সেটাই যে কেন ফিরে ফিরে আসে ! বালিকা হওয়ার সাধ হলেই কি আর বালিকা হওয়া যায় ! সংসার বড় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে চারদিকে। সময় জিনিসটাও বড় নিষ্করুণ। সঙ্গেই ছুটছে, কিন্তু পিছন ফিরে তাকাতে জানে না। ভাল লাগার তাজা মুহূর্তও নিমেষে বাসি হয়ে যায়।

বিষাদটুকু ঝেড়ে ফেলতে চাইল ইন্দ্রাণী। উদাসভাবে বলল,— বোঝোই তো আজকালকার ব্যাপার।... তারপর তোমার কোচিং কেমন চলছে ? ফুটবল ? ক্রিকেট ?

—দুর দুর, ওসব ছেড়ে দিয়েছি।

—সে কি ! কেন ?

—ফুটবল তো আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেলেগুলো কেউ সিনসিয়ারলি প্র্যাকটিস করতে চায় না, মাঠে দুটো চক্কর দিয়েই বলে পাঁচ পাক হয়ে গেল, বকাবকি করলে পেছনে আওয়াজ মারে, সকলের খালি ফাঁকি দিয়ে বাজি মাত করার ধান্দা। আরে, খেলাধুলো হল তপস্যা, সাধনা। আমি অত খেটে দাঁড়াতে পারলাম না, এরা বলে একটা লাথি মেরেই ডিভিশানে খেলতে চায়। কথা বলতে বলতে দিলীপ যেন মনমরা হয়ে পড়ছে,— আর ক্রিকেট কোচিংটা এবারেই... ছেলে হয় না রে ইন্দির। আমি তো আর স্টেট জোন কিছু খেলিনি, আমার কোচিং-এ কেউ আসবে কেন ? নামী কোচের কাছে পাঠাতে বাপ-মাদের স্ট্যাটাসে লাগে।

—তোমার তবে এখন সময় কাটে কী করে ?

—অফিস করে, আর হরিমটর ভেজে।

—আর এর ওর তার বেগার খেটে ?

—চাপে পড়ে তো খাটি না, মন চায় বলে করি।

ইন্দ্রাণী দুম করে বলে ফেলল,— তুমি এবার একটা বিয়ে করে ফ্যালো দিলুদা।

—বিয়ে ! এই বয়সে ? অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দিলীপ।

—কী এমন বয়স হয়েছে তোমার ? চুয়াল্লিশ ? পয়তাল্লিশ ? এই বয়সে কেউ বিয়ে করে না ?

এই তো আমাদের পাড়াতেই একজন ব্যাচেলার তিপ্পান্ন বছর বয়সে বিয়ে করল।

—সে যে করে, সে করে। সবাই কি এক ধাঁচের হয় রে ইন্দির ?

—বা রে, বুড়ো বয়সে তোমায় দেখবে কে ? তোমার দাদা বউদি ? ভাইপো ভাইঝি ?

—বিয়ে করলেই যে বউ দেখবে, তার কোনও গ্যারান্টি আছে ? সে তো আমার আগেই ফুটে যেতে পারে। আর ছেলেপিলে ? এই তো বিলটুরা তিন ভাই মিলে বাবাকে চ্যাংদোলা করে ওল্ডহোমে পৌঁছে দিয়ে এল। ওখান থেকে হয়তো মুদ্দোফরাসে শ্মশানে টেনে নিয়ে যাবে। দিলীপ গলা নামাল,—এই সেনবাড়ির মাসিমার কী দশা হয়েছে ? হেগে মুতে পড়ে থাকে, কেউ ফিরেও তাকায় না।

জয়মোহনের ছবিটা আলগা ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রাণীকে। অত খারাপ দশা না হলেও শেষের দিকটা তো বেশ অনাদরেই কেটেছে শ্বশুরমশাইয়ের। ফ্যাকাসে হেসে ইন্দ্রাণী বলল,—তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না দিলুদা। তোমার কপালে এই ভূতের মতো একা একা বসে থাকাই আছে।

দিলীপ হো হো হেসে উঠল,—কপালের লিখন কে খণ্ডাবে বল ? যার ভাগ্যে একা থাকাই লেখা আছে, দোকা তার জুটবে কোত্থেকে ?

ক্ষণিকের জন্য বুকটা দুলে গেল ইন্দ্রাণীর। পুতুলদি টুলটুলরা ঠাট্টা করে বলত, দিলুদার নাকি ইন্দ্রাণীকে খুব পছন্দ ছিল। সত্যি কি তার প্রেমে পড়েছিল দিলুদা ? মনে হয় না। আবার হতেও পারে। এখন নয় খুব ডেকে ডেকে কথা বলে, আগে মেয়েদের সম্পর্কে কী লাজুক ছিল দিলুদা ! একবার সরস্বতী পুজোর পর পাড়ায় শেষরক্ষা নাটক হল, ছেলেরা মেয়েরা সেই প্রথম এক সঙ্গে পার্ট করল সেবার। দিবাকরদা চন্দ্রকান্ত, টুলটুল ক্ষান্তমণি, বাচ্চুদা গদাই, রত্না ইন্দুমতী, দিলুদা বিনোদ, ইন্দ্রাণী কমলমুখী। প্রতিদিন রিহার্সালের সময় 'আপনি ! তুমি ! কমল ! আমাকে মাপ করলে…' ডায়ালগটা বলতে গিয়ে তুতলে মুতলে একসা হত দিলুদা। কাঁধ ছোঁয়া দূরে থাক, হাতটুকু ধরতে গিয়েও ঘামছে ! রোমান্টিক সিনে কী বোকা বোকা যে লাগত দিলুদাকে !

ইন্দ্রাণীই বা বিয়ের কথা তুলে দিলীপকে খোঁচাল কেন হঠাৎ ? এতদিন পর যাচাই করার বাসনা ? ইন্দ্রাণীর মনেও কি তবে সূক্ষ্ম ধারণা আছে, তার জন্যই বিবাগী হয়ে আছে দিলুদা ? না হলে লোকটাকে এত একা দেখেও অকৃত্রিম দুঃখ হচ্ছে না কেন ?

ধুস, যত সব বাজে চিন্তা। দিলুদা তাদের পরিবারের উপকারী বন্ধু, তার সম্পর্কে একটু তো খোঁজখবর করতেই পারে ইন্দ্রাণী। তার একাকিত্বে দুঃখিতই বা হবে কেন ইন্দ্রাণী, সত্যিই তো দিলুদা তার এমন কিছু ঘনিষ্ঠ জন নয় !

ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল। ছটা চল্লিশ। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আটটা বেজে যাবে। স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই, কোয়েশ্চেন পেপার তৈরি করে জমা দেওয়ার নোটিস এসে গেছে, বাড়ি গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে।

ইন্দ্রাণী বলল,—চলি দিলুদা।

—আয়। এলে একটু দেখাসাক্ষাৎ করিস, তোদের সঙ্গে গল্প করলে মেজাজটা শরিফ হয়ে যায়। দিলীপ হাঁটছে সঙ্গে সঙ্গে,—হ্যাঁ রে, তোর মেয়েটা অনেক দিন এ পাড়ায় আসছে না যে ?

—ও এখন খুউব ব্যস্ত। ইলেভেন-টুয়েলভের পড়ার চাপ, টিউটোরিয়াল স্কুল… বন্ধুবান্ধবও প্রচুর হয়েছে। এই তো আজ সন্ধেবেলাই সব দল বেঁধে কোন বন্ধুর দিদির বিয়েতে ছুটবে।

—মেয়েটা কিন্তু হয়েছে খুব সুইট। কী রঙ, একেবারে দুধে আলতা। বাস স্টপে এসে দাঁড়াল দিলীপ,— তোরা কেউই ওর গায়ের রঙের ধারে কাছে আসতে পারিস না। তুই, তোর বর, তোর ছেলে, কেউ না।

পলকের জন্য নিশ্বাসের কষ্টটা ফিরে এল ইন্দ্রাণীর। রক্তহীন মুখে হাসল সামান্য। ভাগ্যিস শুধু শুভর গায়ের রঙটাই পেয়েছে মেয়ে !

বাস এসে গেছে। ইন্দ্রাণী দুদ্দাড়িয়ে উঠে পড়ল। মানিকতলাতেও বাস বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল,

ভিড় বাড়ছে ক্রমশ । ড্রাইভারের ঠিক পিছনের সিটে জানলায় বসে আছে ইন্দ্রাণী । অবশ বুকে । ফাঁকা চোখে । শুভাশিসের জন্য হঠাৎই বড় মন কেমন করছে । কত দিন আসে না শুভ ! সেই শ্বশুরমশাইয়ের কাজের দিন শেষ এসেছিল, তাও তো প্রায় এক মাসের ওপর হয়ে গেল ! ফোনও করে না, আশ্চর্য ! এত ব্যস্ত হয়ে গেল শুভ ! ইন্দ্রাণীর ওপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে চলেছে, এ সময়ে শুভ একটু পাশে থাকলেও তো ইন্দ্রাণীর ভাল লাগত । কাজ কাজ কাজ । পুরুষের কি মাঝামাঝি কোনও রূপ নেই ? হয় উদভ্রান্তের মতো কাজে ডুবে থাকবে, নয়তো ঘরের মানুষটার মতো চূড়ান্ত কর্মহীন ? এর মধ্যে বার দু-তিন নার্সিংহোমে ফোন করেছে ইন্দ্রাণী, পায়নি শুভাশিসকে । বেশি রাতে পাওয়া যেতে পারে ভেবে একদিন তো রাত দশটার পর নার্সিংহোমে ফোন করল । নেই, বেরিয়ে গেছেন ডাক্তারবাবু । কী হল শুভর, শরীর-টরীর ভাল আছে তো ? ছন্দার কিছু হয়নি ?

পার্কসার্কাস ছাড়িয়ে বেকবাগানের দিকে যাচ্ছে বাস । ইন্দ্রাণীর বুকটা ছলাত করে উঠল । আজ শুভর বেকবাগান চেম্বার না ? নামবে নাকি ? চমকে দেবে শুভকে ?

ইন্দ্রাণী উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না । কে যেন আঁচল টেনে হিঁচড়ে বসিয়ে দিল তাকে । কেন ভিখিরির মতো শুভর কাছে যাবে ইন্দ্রাণী !

বিয়ে বাড়ি একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল । বর আসতেই সব চাঙ্গা । সানাই আবার জোর সুর তুলেছে, শাঁখ আর উলুধ্বনিতে ঝালাপালা হয়ে গেল কান, ছুটোছুটি শুরু হয়েছে চারদিকে, সকলে হুড়মুড়িয়ে বর দেখতে চলেছে । বরের পিছন পিছন বরযাত্রীদের বাসও এসে গেল । বিয়ের জন্য ভাড়া করা বাড়ি এখন ভিড় আর কলরবে টইটুম্বুর ।

বর বসেছে একতলায় । কালচে লাল ভেলভেটের তাকিয়ায় ভর দিয়ে । দু পাশে তার ফুলদানিতে রজনীগন্ধা, মাথার পিছনে টাটকা গোলাপের জালি । এই মাঘেও অল্প অল্প ঘামছে বেচারা, সম্ভবত ধুতি পরার অস্বাচ্ছন্দ্যে । অথবা মোটা মালার । টোপরটি তার পাশে খুলে রাখা, পুচকে এক নিতবর সেটাকে মূল্যবান ধনরত্নের মতো আগলে বসে আছে ।

তিতিররা দরজায় উঁকি দিচ্ছিল । হাসছিল, গা টেপাটিপি করছিল, আবার হাসছিল । কোত্থেকে যেন উড়ে এল দেবস্মিতা । ভারী বেনারসি সামলাতে সামলাতে বলল,—কি রে, তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? আয়, ইমনদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ।

তিতির বিদীপ্তাকে ঠেলল, বিদীপ্তা অনিতাকে । আবার কুলকুল হাসি ।

ঝুলন সিরিয়াস মুখে বলল,—আলাপ তো করতেই পারি । কিন্তু তিতিরকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না ।

—কেন ? কেন ?

ঝুলন ফিসফিস করে বলল,—তিতিরকে একবার দেখলেই কেলো । সুস্মিতাদির হোল টাইমার তিতিরের পার্ট টাইমার হয়ে যাবে ।

আবার রিনরিন হাসি । ঝিরঝির হাসি । কুলকুল হাসি ।

দেবস্মিতা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিতিরের দিকে তাকাল,— রিয়েলি মঞ্জিমা রায় আজ হ্যাভক করে দিয়েছে । কত জন যে আজ বিয়ে বাড়িতে বিনদাস হয়ে যাবে !

—যাবে কি রে, গেছে । বরযাত্রীদের একজন তো তিতিরকে দেখতে গিয়ে তিন বার গেটে হোঁচট খেল ।

—কে রে ? কোন লোকটা ? বরের বাবা ?

তিতির লজ্জায় লাল হয়ে গেল,— যাহ, আমি কী এমন সেজেছি ?

সাজগোজ সত্যিই আজ তিতির বেশি করেনি । ঢালা জরিপাড় টিয়ারঙ কাঞ্জিভরম পরেছে একটা । কাকিমার । গলায় রুপোর ওপর সোনার জল করা মা'র নেকলেস, কানে ছোট্ট ঝোলা দুল, হাতে কয়েক গাছা সরু সরু চুড়ি, কপালে কুমকুমের টিপ, চোখে আলগা আইলাইনার, ঠোঁটে হালকা

লিপস্টিক। চুলে প্রথমে বিনুনিই করেছিল, কাকিমা জোর করে ধরে সুইশ রোল করে দিল। খোঁপাতে জুঁই ফুলের মালা। এইটুকুনিতেই সে যেন আজ রূপকথার রাজকন্যা, পথ ভুলে ঢুকে পড়েছে এক আলোময় বাড়িতে।

ঝুলন দেবস্মিতার তোয়াক্কা না করে ঢুকে গেছে ভেতরে। বরের সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল,— আমি ঝুলন। আপনার হবো হবো শালীর বন্ধু। গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

নতুন বর থতমত মুখে তাকাল,— তুমিই ঝুলন ? দেবস্মিতার মুখে তোমার নাম শুনেছি।

—খুব নিন্দে করেছে বুঝি ? বলেনি ঝুলন একটা টমবয় ? ছেলে হতে হতে মেয়ে হয়ে গেছে ?

নতুন বর জিভ কাটল,— যাহ্‌, তা বলবে কেন ? তুমি তো খুব···

—খুব কী ? ঝুলন ভুরু নাচাল।

নতুন বর অপ্রতিভ মুখে দেবস্মিতার দিকে তাকাচ্ছে। দেবস্মিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,— ইমনদা বলতে চাইছে তুই খুব সাহসী মেয়ে। যাকে বলে বীরাঙ্গনা।

ঝুলন মিটিমিটি হাসল। নরম চোখে তাকাল বরের দিকে,—আপনাকে কিন্তু ইমন নামটা একদম মানায় না।

—কেন ?

—ইমন নামটা কেমন যেন লাইট। আপনি সুস্মিতাদির ওয়ার্সহাফ, আপনার আরেকটু গ্র্যাঞ্জারাস নাম হওয়া উচিত ছিল।

বরের পাশে বরের দুই বন্ধু। একজন স্যুট প্যান্ট টাই, অন্যজন চোস্ত পাঞ্জাবি। স্যুট প্যান্ট টাই তিতিরের দিকে টেরিয়ে তাকাতে তাকাতে প্রশ্ন করল,— যেমন ? একটা এগজাম্পল ?

—এই ধরুন··· যেমন হল গিয়ে···অ্যাই তিতির, বল না একটা ভারী নাম।

তিতির পুট করে বলে উঠল,— দরবারি কানাড়া।

আবার হাসি। রিনরিন। ঝিরঝির। কুলকুল। সঙ্গে হাহা। হোহো।

বিয়েবাড়িতে মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন। চাঁদোয়ায় ঢাকা। কোনার দিকে চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসেছে বন্ধুরা। জোর গুলতানি চলছে। ফিলম ফ্যাশান টিভি সিরিয়াল। নতুন স্কুল কলেজের বন্ধুবান্ধবরাও এসে যাচ্ছে আলোচনায়। এক যুবক তিন বার শরবত যেচে গেল তিতিরদের, তিতিররা উদাসীন ভঙ্গিতে প্রত্যাখ্যান করল। দেবস্মিতা বসছে কিছুক্ষণ, ব্যস্তভাবে উঠে যাচ্ছে। আবার এসে বসেছে,—দেখলি তো, হিয়াটা শেষ পর্যন্ত এল না।

ঝুলনের ভুরুতে ভাঁজ,— রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ ! এক কথায় কন্ট্রিবিউশান দিয়ে দিল, কি গিফট কেনা হবে তাই নিয়ে সাজেশান দিল ! ইনফ্যাক্ট স্যান্ডুইচ টোস্টারটা ওরই সাজেশান। এত কিছু করে লাস্টলি ডুব !

—আমার সেদিনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

—কবে ?

—যেদিন নেমন্তন্ন করতে গেলাম। কিরকম যেন ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলছিল। তোর দিদির বিয়ে··· যেতে তো হবে··· দেখি···। হিয়াটা কেমন চেঞ্জ হয়ে গেছে।

—বাড়িতে ওরকম একটা ক্যাডাভ্যারাস ঘটনা ঘটে গেল···

অনিতা দুঃখী মুখে বলল,— হিয়াটা খুব বেচারা। সেই কবেএএ থেকে সাফার করছে।

ঝুলন প্রশ্ন করল,— বাড়িতে সেই ছেলেটা ছিল ? ওর বাবার সেই স্টেপ সান ?

—ছিল না আবার ! সেই তো দরজা খুলল। কী ক্যাড একটা ড্রেস পরে ছিল ! বারমুডার ওপর পাঞ্জাবি ! ভাল করে গোঁফের রেখাও ওঠেনি, এখনই কী পাকা পাকা হাবভাব ! হিয়াকে দিদি-ফিদি কিস্যু বলে না, কায়দা করে আবার ইংরিজিতে ডাক ! হিয়া, সামবডিজ কলিং ইউ !

—ঠাস করে একটা চড় মারলি না কেন ? ঝুলন ঝেঁঝে উঠল।

—তাই উচিত ছিল। তবে ভেবে দেখলাম, বেচারা হিয়াটার শত্রুপুরীতে বাস··· !

বিদীপ্তা প্রশ্ন করল,—ছেলেটার মা'র সঙ্গে আলাপ হল ?

—হত না। নিজেই যেচে এসে আলাপ করল। মা'টার কথাবার্তা অবশ্য খারাপ নয়। মিষ্টি খেয়ে যেতে বলছিল। হিয়াই চোখের ইশারায় আমাকে না করে দিল।

—কেন ?

—হু নোজ !… অবশ্য আমি এমনিও খেতাম না। যে মহিলা আমার বন্ধুর জীবনটা স্পয়েল করে দিয়েছে, তার হাত থেকে আমি মিষ্টি খাব ? নেভার।

—হিয়ার বাবাকেও বলিহারি ! কী করে যে এই বয়সে বিয়ে করার শখ হয় !

—তাও আবার ওই মহিলাকে ! শুঁটকি ! চিমসে ! দেখে আন্টি না বলে আঙ্কল বলতে ইচ্ছে করে।

একটানা এই কাদা ছোঁড়া ভাল লাগছিল না তিতিরের। সে বলে উঠল, —হিয়ার ঠাকুমা কেমন আছেন রে ?

—ঠাকুমাকে তো দেখতে পেলাম না।

—তুই জিজ্ঞেস করিসনি ?

—না তো। এত তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম।

তিতির একটু চিন্তায় পড়ল। অনেককাল হিয়ার বাড়ি যাওয়া হয় না। স্কুলে অবশ্য দেখা হয় হিয়ার সঙ্গে, কথা হয় না তেমন। হিয়া হিয়ার বন্ধুদের সঙ্গে থাকে, তিতির তিতিরের। ঠাকুমা কি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল ? হিয়া দাদুর শ্রাদ্ধের দিন এসেছিল, কই সেদিন তো কিছু বলল না ! হিয়াকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

শাঁখ উলু শুরু হয়েছে। তিতিররা ছুটল পড়িমড়ি করে। বর দাঁড়িয়ে আছে ছাদনাতলায়, পিঁড়িতে চেপে তাকে পাকে পাকে বাঁধছে সুস্মিতাদি।

ঝুলন চুকচুক শব্দ করল,—সুস্মিতাদির লাকটা ভাল।

তিতিররা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

—বরটাকে যেমন এক্সপেক্ট করেছিলাম তেমন নয়। জোশ নেই। সুস্মিতাদিই দাপাবে।

—সুস্মিতাদি আর দরবারি কানাড়া কেউই চশমা খোলেনি কেন রে ? চশমা পরে কি শুভদৃষ্টি হয় ?

—চশমা খুললে কেউ কাউকে দেখতেই পাবে না। হয়তো নাপিতটার সঙ্গেই সুস্মিতাদির শুভদৃষ্টি হয়ে যাবে।

—সুস্মিতাদির দিকে খোলা চোখে না তাকানোই ভাল। চশমাটা বরং ঢালের কাজ করছে।

বেশিক্ষণ হাহা হিহি টীকাটিপ্পনীর সুযোগ পেল না তিতিররা। ডাক পড়েছে খাওয়ার। সেই পরিচিত আইটেম যা গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিটি বিয়েবাড়িতে খেয়ে আসছে তিতির। রাধাবল্লভি, আলুর দম, চিলি ফিশ, পোলাও, মুরগি আর শেষ পাতে আইসক্রিম।

আইসক্রিম খেতে খেতে আবার হিয়ার কথা উঠল।

অনিতা বলল,— এই, হিয়ার কি কোনও বয়ফ্রেন্ড হয়েছে নাকি রে ?

ঝুলন বলল,—হতেই পারে। আমাদের স্কুলের বেশির ভাগ ফ্রেন্ডই তো বয়।

—সেরকম নয়, সামওয়ান স্পেশাল। চামচ চাটতে চাটতে চোখ ঘোরাল অনিতা,—মৌসুমি বলছিল হিয়াকে নাকি দু দিন গঙ্গার ধারের আইসক্রিম পার্লারে দেখেছে। একটা ফর্সা মতন ছেলের সঙ্গে। মৌসুমিকে দেখে হাত নেড়েছে কিন্তু ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি। রাজা বা রাজু ওরকম ধরনের নাম ছেলেটার।

তিতিরের গায়ে কাঁটা দিল। রাজর্ষি নয় তো !

বিদীপ্তা বলল,— হ্যাঁ রে, আমিও একটা ওরকম কথা শুনেছি। পৃথা বলছিল। আমার অবশ্য বিশ্বাস হয়নি। পৃথা নাকি হিয়াকে একটা ছেলের সঙ্গে সিনেমা হলে দেখেছে। ওর সামনের সিটেই

দুটো ছেলেমেয়ে খুব ইনটিমেটলি বসেছিল, মানে এমনভাবে যে, ছেলেটার মাথা বার বার অবস্ট্রাক্ট করছিল পৃথাকে। ইন্টারভ্যালে দেখে মেয়েটা হিয়া। ভেবেছিলাম পৃথা ঢপ দিয়েছে···

—বুঝেছি। তোরা রাজর্ষির কথা বলছিস। ঝুলন নিজের কাপ শেষ করে তিতিরের কাপে চামচ ডোবাল,—হিয়া-রাজর্ষিকে তো এখন সর্বত্রই এক সঙ্গে দেখা যায়। রাজর্ষির বাবা ঘ্যামচ্যাক ডাক্তার। হিয়া ডাক্তারি পড়বে তো, তাই এখন থেকে লাইন করছে।

তিতিরের জিভ কটু স্বাদে ভরে গেল। রাজর্ষিই! এ যা শুনছে এ তো নিছক বন্ধুত্ব নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। কেন এমন হবে? অজান্তেই নাকের পাটা ফুলে উঠল তিতিরের। কেন টোটোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে হিয়ার? কোন রাইটে টোটোর সঙ্গে একা একা সিনেমা দেখে হিয়া? ইনটিমেটলি বসে?

খাওয়া দাওয়ার পর তিতির তিলমাত্র দাঁড়াল না। ঢাকুরিয়া বাস স্ট্যান্ডে নেমে সাঁ সাঁ করে পার হল রাস্তা। পূর্ণ গতিতে ছুটে আসা মারুতির পরোয়া না করে। যুক্তি বুদ্ধি কোনও কিছুই মাথায় কাজ করছে না তিতিরের, সাংঘাতিক অস্থির অস্থির লাগছে। কেন লাগছে? হিংসে? টোটো তো তার এমন কিছু বন্ধু নয়! টোটোকে কি আদৌ বন্ধু বলা যায়? জানে না তিতির, শুধু হাঁটছে হনহন। ওষুধের দোকান থেকে বেরোচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়াদি, তিতিরকে দেখে হাত নাড়ল, প্রত্যুত্তর দিল না তিতির। হাঁটছে। ওফ, বাড়ি এত দূরে কেন!

বাড়ির গেটে এসে ক্ষণিক থমকাল তিতির। বড় বড় দম নিল। সদ্য পুষ্ট হয়ে ওঠা বুক উত্তেজনায় হাপরের মতো উঠছে নামছে। বড়ঘর অন্ধকার। অন্য দিন ঘরটা পেরোতে গেলে বুক ছমছম করে ওঠে তিতিরের, মনে হয় দাদু যেন ছবি থেকে তাকিয়ে আছে। আজ দৃকপাত না করে পার হয়ে গেল অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে টান মেরে খুলল জুঁইফুলের মালা, পিষছে আঙুলে।

—তিতির এলি?

তিতির প্যাসেজে নিশ্চল। চেতনায় ফিরল। মা। বড় কাকার ঘরে মা এখন কী করছে!

ইন্দ্রাণী সুদীপের ঘর থেকেই গলা তুলল,— টিভিটা চলছে ও ঘরে, বন্ধ করে দিস তো।

টিভি বন্ধ করে খাটে গিয়ে বসল তিতির। বসেই রইল কয়েক মিনিট। সহসা যেন ছেড়ে যাচ্ছে শরীর। অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করছে না। উফ, চোখ মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে কেন?

শাড়ি খুলে নাইটি পরে নিল তিতির। শাড়িটা পাট করতে করতে একটু স্থিত হল। টলমল পায়ে বাথরুমে গেল, ছটাস ছটাস জল ছেটাচ্ছে মুখে। জল এখনও বেশ ঠাণ্ডা, ধীরে ধীরে শীতল হচ্ছে প্রাণ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটু দাঁড়াল তিতির। কী কথা হচ্ছে মা আর বড় কাকার? মা'র স্বর এমন করুণ শোনাচ্ছে কেন?

বড় কাকা বলল,— তোমাকেই দায়িত্বটা নিতে হবে বউদি।

—আমি কেন দীপু? তোমার দাদা কি আমার কথা শোনে? এতকাল দেখেও তোমার দাদাকে চিনলে না?

—তবু যেটুকু শোনে, তোমার কথাই শোনে। এত দূর এগিয়ে আর পিছোনো যায় না বউদি।

—বাড়িটা নয় নাই ভাঙা হল দীপু।

—মুস্তাফিকে তুমি টাকা ফেরত দেবে কী করে?··· হুট করে তুমি তার কাছ থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নিলে, বাবাকে দিয়ে সই করানোর পর স্যাড ঘটনাটা ঘটে গেল।··· আমি মানি, সেদিনই বাবার মৃত্যুটা একটা মিয়ার কোইন্সিডেন্স, যাকে বলে কাকতালীয়, কিন্তু স্টিল তার পরে কি আর তুমি ফিরতে পারো? কাম টু রিজন বউদি। মেক দাদা ফিইল, বাড়ি ভাঙাটা সকলের ভালর জন্যই হচ্ছে। চাঁদু মুস্তাফিকে যে সার্টিফিকেটই দিক, তুমি নিশ্চয়ই বুঝে গেছ, মুস্তাফি খুব সরল লোক নয়? দেখছ না, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই কেমন একটা মেন্টাল চাপ তৈরি করছে?

মা চুপ।

কাকিমা কি যেন বলছে নিচু গলায়, শোনা যাচ্ছে না। তিতিরের খুব শীত করছিল।

৫১

রাত নিশুত। নীচের ঘরে এখনও সেতার বাজাচ্ছে কন্দর্প। ওস্তাদ-ফোস্তাদ তো কবেই ছেড়েছে, নিয়মিত রেওয়াজও করে না, তবু হাতটা এখনও ভারি মিঠে। হঠাৎ হঠাৎ এক এক রাতে কী যে সুরের নেশায় পায় কন্দর্পকে! বাজিয়েই চলে, বাজিয়েই চলে, সময়ের জ্ঞান থাকে না।

ইন্দ্রাণী খোলা চোখে সুর শুনছিল। চেনা রাগ। ললিত। এই গভীর রাতে মালকোষ না বাজিয়ে ললিত বাজায় কেন? ললিতই কি বাজায়? প্রায় নিঝুম পৃথিবীতে চেনা রাগও বড় অচেনা লাগে এ সময়ে। বুকের ভেতর কোথায় যেন বৃথাই পাক খেয়ে চলে তার ধ্বনি। কলজেটাকে নিয়ে দুমড়োয়, মুচড়োয়। বড় কষ্ট।

তিতির ঘুমোচ্ছে। অঘোরে। বিয়েবাড়িতে হইচই করে খুব ক্লান্ত মনে হয়, এসেই শুয়ে পড়ল। মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে। কী নিশ্চিন্ত জীবন। হাসি খেলা বন্ধুবান্ধব। বেশ আছে মেয়ে, বেশ আছে। তা থাকুক, শুধু ইন্দ্রাণী যদি একটু ঘুমোতে পারত!

পাতলা কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে নামল ইন্দ্রাণী। মাঘ ফুরিয়ে এল, বাতাসে ফাল্গুনের আভাস, নরম শীতের রাত ভারি মায়াবী এখন। অথচ কী নিষ্করুণ, ইন্দ্রাণীকে ঘুমোতে দেয় না। গায়ে চাদর জড়িয়ে ইন্দ্রাণী বেরোল ঘর থেকে। মাজরীর পায়ে পাশের ঘর। কাঁপছে পা, বুকে এক বিচিত্র চাপা অস্বস্তি। কত যুগ পর যে নিশীথরাতে এ ঘরে এল!

নীলচে অন্ধকারে ডুবে আছে ঘর। মশারির মধ্যে মানুষটাকে ঠিক ঠিক ঠাহর হয় না। একটুক্ষণ কান পেতে শোনার চেষ্টা করল ইন্দ্রাণী। নাহ্, নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। জেগে আছে কি? মানুষটার ঘুম একদম কমে গেছে আজকাল। রাতে ঘন ঘন ওঠে, বাথরুম যায়, সিগারেট খায়, এটা সেটা কি যেন নাড়াচাড়া করে, পাশের ঘর থেকে টের পায় ইন্দ্রাণী। কিছু খোঁজে কি? কী খোঁজে?

এ ঘরে এখন একটা রাতবাতি আছে। বাপ্পার লাগানো। ট্রেনিং-এর চিঠিটা আসার পর সারা সন্ধে মৃদু আলো জ্বেলে বন্ধ ঘরে গোঁসা করে শুয়ে থাকত ছেলে। ইন্দ্রাণী পায়ে পায়ে গিয়ে বাতিটা জ্বালাল। টিমটিমে সবজে আলোয় ছেয়ে গেছে ঘর, অন্ধকার আরও রহস্যময় যেন।

বাপ্পার ফাঁকা খাটে বসল ইন্দ্রাণী। স্তিমিত স্বরে ডাকল,—শুনছ?

নড়ল না আদিত্য। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে।

ইন্দ্রাণী আবার চাপা স্বরে ডাকল,—শুনছ? এই?

আদিত্য যেন সামান্য কেঁপে উঠল।

ইন্দ্রাণী মশারির গায়ে এসে দাঁড়াল। আলতো ঠেলল,—ঘুমোচ্ছ? এই?

এবার চমকে উঠে বসেছে আদিত্য,—কে? কেএএ?

—আমি।

—তুমি! তুউমি!

—হুঁ, একটু কথা ছিল।

আদিত্য ফ্যালফ্যাল তাকাল। চোখ থেকে এখনও বিস্ময় কাটেনি তার। ইন্দ্রাণী খোলা দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। সুদীপদের ঘর অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে, কেউই এখন এদিকে আসবে না, তবু ভেজিয়ে দিয়ে এল দরজাটা। মশারি তুলে আদিত্যর বিছানায় এল। বসেছে মুখোমুখি।

আদিত্যর মুখে অদ্ভুত সন্ত্রস্ত ভাব। হাঁ করে দেখছে ইন্দ্রাণীকে।

ইন্দ্রাণী নরম করে হাসার চেষ্টা করল,—কী দেখছ?

আদিত্য বোবা। বোধহয় বুঝতে পারছে না, এ স্বপ্ন না সত্যি। আরও গুটিয়ে-মুটিয়ে বসেছে। তাকিয়ে আছে অপলক।

এ কি শুধুই এক অবসাদগ্রস্ত রুগীর চোখ ? ঘোরে আচ্ছন্ন ? নাকি ওই দৃষ্টি আরও কিছু বলতে চায় ?

কথা বলতে গিয়ে ইন্দ্রাণীর গলা দুলে গেল,—কী হয়েছে তোমার বলো তো ?

আদিত্য নীরব।

ইন্দ্রাণী আলগাভাবে আদিত্যর হাঁটু ছুঁল,—এত ভেঙে পড়েছ কেন ? বাবা কি কারুর চিরকাল থাকে ?

এইটুকু কথা কি আরও আগে আশা করেছিল আদিত্য ? নইলে তার ভুরু কাঁপে কেন ? কেনই বা ওই গলার শিরায় দপদপানি ?

মমতা মাখা স্বরে ইন্দ্রাণী বলল,—শোক নিয়ে বসে থাকলে কি মানুষের চলে ? বেশ কাজকর্ম শুরু করেছিলে, সব তো লাটে উঠল !

আদিত্য অস্ফুটে বলল,—কী করব ? মন বসে না যে।

—জোর করে বসাও।

—আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না।

—কেন হবে না ? এই তো উদয়নারায়ণপুর না কোথায় যেন কন্ট্র্যাক্ট পেয়েছিলে।

আদিত্য মাথা নাড়ছে দু দিকে।

—কী না ? কাজ পাওনি ?

—পাওয়ার থেকেও খারাপ। দু হাজার টাকা গচ্চা দিয়ে চোদ্দশো ফিরল। তোমার কাছে দেনা বাড়ল আরও।

—আমি কি টাকা ফেরত চেয়েছি ?

—না চাইলেই বা ! তোমার কষ্টের রোজগার...। আদিত্য বড় মলিন হাসল,—আমি কারুরই কোনও কাজে আসি না। প্যারাসাইটের জীবন আমার। কীটপতঙ্গের জীবন। জোঁকের জীবন। অন্যের রক্ত চুষে বেঁচে আছি। ...বুড়ো মানুষটাকেও শান্তিতে বাঁচতে দিলাম না।

আদিত্যর হাত কোলের ওপর পড়ে আছে। বিচ্ছিন্ন দুটো শুকনো ডালের মতো। ইন্দ্রাণী একটা ডাল হাতে তুলে নিল,—ভেবে দ্যাখো, বাবা অসুখ বিসুখে কত কষ্ট পাচ্ছিলেন...। বলতে বলতে ঢোঁক গিলল,—এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে। ঘুমের মধ্যে, বিনা যন্ত্রণায়...

—জানলে কী করে বাবা বিনা যন্ত্রণায় মারা গেছে ? আদিত্য চোখ পিটপিট করল।

—তেমন হলে তো ডাকতেন কাউকে ! চাঁদু পাশের ঘরে ছিল...

—হয়তো ডেকেছে। কেউ শুনতে পায়নি। আমরা কে কার ডাক শুনতে পাই !

আদিত্যর স্বরে জান্তব গোঙানি। ইন্দ্রাণীর ভয় করছিল।

আদিত্য আবার বলল,—আমি জানি বাবা আমাকে খুঁজেছিল। অথচ আমি বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেও তাকে...

—বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়া তো নতুন নয় ! ওই ঝগড়ার সঙ্গে মৃত্যুটাকে মেলাচ্ছ কেন ?

—কারণ আমি সেদিন বাবাকে মরতে বলেছিলাম।

ইন্দ্রাণীর মাথা ঝনঝন করে উঠল। এতদিনে মানুষটার অবসাদের কারণ যেন স্পষ্ট হচ্ছে। আহা রে, কী ভারটাই না বইছে বেচারা !

আশ্চর্য, নিজের নিশ্বাসের কষ্টটাও যেন কমে গেল আচমকা ! অপরাধবোধ ভাগাভাগি হয়ে গেল বলেই কি ?

ইন্দ্রাণী সান্ত্বনার সুরে বলল,—মৃত্যু কি কারুর বলার অপেক্ষায় বসে থাকে ? তুমি বললে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাবার মৃত্যু এসে গেল ?

—বাবাকে আমি সে কথা কী করে বোঝাব ?

—তোমার কি ধারণা বাবা তোমার কথা ধরে বসেছিলেন ? কবেই বা তোমার কোন কথা বাবা মনে পুষে রাখতেন ! সেদিনও রাখেননি। সন্ধেবেলাও আমার সঙ্গে কত কথা হল, বেশ হাসিখুশি ছিলেন, নিজের জন্মদিনের কথা বলছিলেন...। ইন্দ্রাণী ঝুপ করে থেমে গেল। বুঝি বা নিজেই নিজের কণ্ঠরোধ করল। মিথ্যে আর সত্যির মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম ! অথচ এত গভীর !

আদিত্য অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে,—তোমরা জানো না, কিচ্ছু জানো না। আমি যেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরলাম, সেদিন থেকেই বাবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। তবু আমি নিজেকে শোধরাতে পারলাম না। আমি কি একটা মানুষ !

—বাবার মৃত্যুর দায় একা নিজের ঘাড়ে নিচ্ছ কেন ? দায়ী তো আমরা সবাই। তুমি আমি দীপু রুনা চাঁদু বাপ্পা...আমরা সকলেই তো বাবাকে অবহেলা করেছি।

কথাটা বলে তৃপ্তি হচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। যেন আদিত্যকে নয়, নিজেকেই ভোলাচ্ছে।

আদিত্য চুপ করে কি যেন ভাবছে। অন্ধকার অনেকটা স্বচ্ছ এখন। অন্ধকারের আদিত্যও। মায়া হচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। বয়সের ছাপ পড়ে গেল লোকটার মুখে, কণ্ঠার হাড় ঠেলে এসেছে, ঢুকে গেছে গাল। এত শীর্ণ কি ছিল আদিত্য !

ইন্দ্রাণী অল্প চাপ দিল আদিত্যর হাতে,—আমার একটা কথা শুনবে ?

—উঁ ?

—ক'দিন একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো। মনটা থিতু হবে।

—কোথায় যাব ?

—বাবা মা বেলামাসিদের সঙ্গে কাশী যাচ্ছে, তুমিও ঘুরে এসো না। তুমি থাকলে ওরাও ভরসা পাবে, তুমিও ওদের চোখে চোখে রাখতে পারবে !

—দেখি।

—দেখি নয়। বাবা মা খুব আশা করে আছে।

হঠাৎ ইন্দ্রাণীর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাল আদিত্য,—তুমি কি এই কথা বলতেই এসেছ এখন ?

—না। অন্য কথা আছে। ইন্দ্রাণী আড়ষ্ট হয়ে গেল,—কথাটা ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।

—বলা যদি খুব কঠিন হয়, থাক।

—না। ইন্দ্রাণী আদিত্যর হাত ছেড়ে দিল। মুখ গুঁজল হাঁটুতে। কন্দর্প সেতারে তান তুলছে, শুনল কয়েক সেকেন্ড। অমনোযোগী শ্রোতার মতো। আদিত্যর চাদরের এক জায়গায় সুতো উঠে গেছে, সুতোটাকে পাকাল একটু। তারপর বলল,—তোমাদের ভাইবোনদের তো এবার একদিন এক সঙ্গে বসতে হয়।

—মানে ?

—বাহ, বাবা মারা গেলেন, এ বার সম্পত্তি ভাগ হবে না ?

আদিত্য শ্বাস ফেলল,—বাবার তো ব্যাঙ্কে ফুটো কড়িও নেই।

—বাড়ি আছে।

—সে তো কবেই ভাগাভাগি হয়ে গেছে।

—তোমার বোন নেই ? জয়িকে বাড়ির ভাগ দেবে না ?

আদিত্য এক সেকেন্ড ভাবল,—জয়ি বাবার ঘরটা নিক। বড় ঘরটা কমন থাকুক।

—চাঁদু বিয়ে থা করবে না ? ওর ওই একটা ঘরেই হবে ?

—তাও তো বটে। তা হলে চাঁদু নয় বড় ঘরটাও...আদিত্য মাথা চুলকোল,—এই সব ভাগাভাগির জন্য ভাইবোনেদের বসতে হবে ?

ইন্দ্রাণী সামান্য অসহায় বোধ করল। আদিত্য কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছে না! এত দিন ধরে বাড়িতে এত ফিসফাস চলছে, শংকর তো প্রায় প্রকাশ্যেই শ্রাদ্ধের দিন বাড়ি ভাঙা নিয়ে আলোচনা করছিল, মুস্তাফি লোকটা অত বার এল গেল, তবু মানুষটার কিছুই মাথায় ঢোকেনি! ফ্ল্যাট, প্রোমোটার কিছুই কি লোকটার মগজে নেই! কথাটা বোধহয় এখন পাড়তে আসাই ভুল হল। দীপু চাঁদুরা যা আশঙ্কা করছে যদি তাই ঘটে! কথাটা শুনেই যদি রাতদুপুরে হাউমাউ শুরু করে দেয়! ছি ছি, সে বিশ্রী কেলেঙ্কারি হবে।

একটুক্ষণ শামুকের খোলে ঢুকে রইল ইন্দ্রাণী। তারপর মনঃস্থির করে ফেলল। হয় এসপার, নয় ওসপার, এখনই বলবে। বঁড়শি যখন গলায় গেঁথেই গেছে, তখন আর পিছিয়ে গিয়ে লাভ নেই। বরং দিনের চেয়ে রাতই ভাল। দিন বড় উলঙ্গ, এই তরল অন্ধকারকে পর্দা করে অনেক কিছুই বলে ফেলা যায়।

ইন্দ্রাণী হাঁটু থেকে মুখ তুলল। পাকদণ্ডী ধরে এগোল,—বাপ্পার দুটো চিঠি এসেছে, দেখেছ?

—তিতির বলছিল। আদিত্য মুখ ঘুরিয়ে নিল। সিগারেট হাতড়াচ্ছে বালিশের নীচে। পেল না। তবু হাতড়াচ্ছে।

—বাপ্পা তো ওখানে ভীষণ হ্যাপি।

—স্বাভাবিক।

—একবারও তো খোঁজ নিলে না, বাপ্পাকে পাঠানোর টাকাটা এল কোত্থেকে?

—অক্ষম বাপের বেশি কৌতূহল থাকা ভাল নয়।

—এ তো অভিমানের কথা। ইন্দ্রাণী আদিত্যর কাঁধে হাত রাখল,—টাকা তো বলতে গেলে তুমিই জোগাড় করেছ।

—আমি! আদিত্যর চোখ বিস্ফারিত।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি। সরাসরি নয়, তবে বলতে গেলে তোমার জন্যই টাকাটা পাওয়া।

আদিত্য চঞ্চল হয়ে উঠল,—বুঝলাম না। স্পষ্ট করে বলো।

ইন্দ্রাণী একটু তোতলাল,—বা রে, একবার বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হওয়ার কথা উঠেছিল না, সেটাই তো হতে চলেছে। বাড়িটা যদি ভাঙা হয়, তা হলে তো তোমার প্রেসটাও চলে যাবে। তার জন্যই প্রোমোটার ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আগাম দিয়েছে তোমাকে।...প্রোমোটারকে তো তুমি চেনো, চাঁদুর ওই মুস্তাফিবাবু। যদি তুমি এক সময়ে প্রেসটা না করতে, তা হলে কি টাকাটা পেতাম! তাই বলছিলাম...

আদিত্য হতবাক। আদিত্য নিস্পন্দ। আদিত্য নিষ্পলক।

ইন্দ্রাণীর কেমন শীত শীত করে উঠল। চাদরটা জড়িয়ে নিল গায়ে। দম নিল খানিক,—হাঁ করে দেখছ কী? বাবার কথা ভাবছ? বাবা নিজে রাজি হয়েছিলেন। এগ্রিমেন্টে সইও করেছিলেন। কবে সই করেছিলেন সে কথা কি আদিত্যকে বলার দরকার আছে? থাক, পরে জানলে জানবে। আলোছায়ার বর্ম পরে কথার পর কথা সাজিয়ে চলল ইন্দ্রাণী,—কোনওভাবে টাকাটা জোগাড় হল না, মরিয়া হয়ে বাবাকে গিয়েই বাপ্পার কথা বললাম। চাঁদুও মুস্তাফিবাবুর প্রস্তাবটা নিয়ে এসেছিল, বাবাও তাই...। ইন্দ্রাণী সত্যি-মিথ্যে একাকার করে দিল,— তবে এখন তো মুশকিল হয়ে গেছে। বাবা নেই, ওই এগ্রিমেন্টেরও আর কোনও ভ্যালু নেই। আমারও টাকাটা বাপ্পাকে দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোমরা নতুন করে বসে আলোচনা না করলে...ওখানে ফ্ল্যাট হলে কে কী পাবে, কত টাকা নগদ হলে সেটা যুক্তিযুক্ত হবে, এই সব আর কি।

আদিত্য কি শুনছে না ইন্দ্রাণীর কথা! অমন তীব্র চোখে তবে তাকিয়ে থাকে কেন! জ্বলছে মণি, কাঁপছে ঠোঁট, হল কী আদিত্যর!

ইন্দ্রাণী ঢোঁক গিলল,—আগেই তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। তুমি তোমার কন্ট্রাক্টরির কাজ নিয়ে তখন এমন ব্যস্ত ছিলে...সে দিন রাতে ফিরলে না,...তারপর তো...

আদিত্য সজোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছে দু দিকে।

—রাগ করলে ? বিশ্বাস করো, বলার সুযোগই পাইনি। এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা হয়ে গেল ! দীপু চাঁদুকে জিজ্ঞেস করে দেখো...

ইন্দ্রাণীর কথা শেষ হল না। ঘরে যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল। সহসা। ইন্দ্রাণী কিছু বোঝার আগেই তাকে জড়িয়ে ধরেছে আদিত্য। উন্মাদের মতো মুখ ঘষে চলেছে ইন্দ্রাণীর কাঁধে গালে কপালে চোখে।

প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল ইন্দ্রাণী। পারছে না, ছটফট করছে। আদিত্যর দু হাত সাঁড়াশির মতো পিষছে তাকে। এই বুঝি গুঁড়িয়ে গেল হাড়পাঁজর।

নিজের ওপর বিতৃষ্ণা জাগছিল ইন্দ্রাণীর। বমি পাচ্ছিল। জীবনে একটার পর একটা ভুল করবে, মাঝরাতে ছুটে আসবে আদিত্যর কাছে, আর এভাবেই তার শরীর থেকে সমস্ত অপরাধের গ্লানি শুষে নেবে আদিত্য—এই কি তবে তার ভবিতব্য ! ক্ষীণভাবে একবার ঈশ্বরকে ডাকল ইন্দ্রাণী। এই বিনিময় বিনা কি তার মুক্তি নেই !

ইন্দ্রাণীর শরীর ক্রমে শিথিল হয়ে এল। সবুজ আলোয় ঘাস হয়ে যাচ্ছে। অথবা পুতুল। ঠিক তখনই কেন যে আদিত্য ফুঁপিয়ে উঠল ! মুখ গুঁজে দিয়েছে ইন্দ্রাণীর বুকে। বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছে। কি যেন বিড়বিড় করে চলেছে।

ঠিক কাম নয়, এ যেন অন্য কিছু ! ইন্দ্রাণীর বুক সিরিসির করে উঠল। যেন ইন্দ্রাণী নয়, একটা গাছকে এবার আঁকড়ে ধরেছে আদিত্য। তার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে ইন্দ্রাণীর। কেন কাঁদে আদিত্য ? বাড়িটা আর টিকবে না, এই দুঃখে ? কাঁদুক তবে। বাড়ি ভাঙার দুঃখে যদি বাবার শোক ভোলে, ভুলুক না। ইন্দ্রাণী বাচ্চা ভোলানোর মতো করে আদিত্যর মাথায় হাত বোলাল। পাগল, একেবারে পাগল।

কন্দর্পর বাজনা থামল। আদিত্যও ঝিমিয়ে এসেছে। ইন্দ্রাণীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। হেঁচকি উঠছে মাঝে মাঝে। তার মাথায় হাত রেখে ইন্দ্রাণী নিথর।

সামনের রাস্তা মাড়িয়ে একটা ভারী ট্রাক চলে গেল। বিকট শব্দ করে। কোত্থেকে যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল হঠাৎ। রাত্রিকে ফালা ফালা করে ডাকছে।

থামতেই গাঢ় নৈঃশব্দ্য। বাইরে। ঘরেও।

দুজনের মধ্যে এক গোপন বোঝাপড়া চলছে এখন। নাকি এক গহীন লুকোচুরি !

৫২

রাতে ডাইনিং টেবিলে ছন্দা বলল,—তোমার সেই জমির দালালটা আজ এসেছিল।

শুভাশিস প্লেট থেকে চোখ তুলেছে,—কে ? রবি ?

—রবি নয়, আরেকটা যে আসে। লম্বা মতন। বুড়োটে।

—ও, বিশ্বনাথ ! শুভাশিস চামচ করে কাস্টার্ড তুলল মুখে,—কি বলে ? খবর আছে ?

—ওর হাতে তো প্রচুর জমি। নিউ বালিগঞ্জে একটা সাত কাঠা প্লট আছে, গলফ ক্লাবে সাড়ে পাঁচ কাঠা, যোধপুর পার্কেও একটা আছে বলছিল, কাঠা চারেক।

—দামও নিশ্চয়ই বড় বড় হেঁকে গেছে ?

—ভাল জায়গায় দাম তো একটু বেশি পড়বেই ! বিশ্বনাথবাবু বলছিল, এখন কিনে না ফেললে আর সোনার দামেও জমি পাওয়া যাবে না। ওর কাছে নাকি অনেক পার্টি আসছে। নেহাত তুমি ডাক্তার মানুষ, পাড়ার লোক...। জানো, গত সপ্তাহেই ওর এক পার্টি নাকি গলফ গার্ডেনে সাড়ে চার কাঠা জমি কিনেছে। নয় বলেছিল, বলে কয়ে ও নাকি সাড়ে সাত লাখে নামিয়েছে।

—দুর, যত সব বারফাট্টাই ! ওর হাত দিয়ে সাড়ে সাত লাখ টাকার জমি কেনাবেচা হলে ও কত

কমিশন পেত জানো ? কম করে এক পারসেন্ট। মাসে ও রকম একটা-দুটো জমি বেচতে পারলে ওকে আর ও রকম ভিখিরি-নিকিরির দশায় ঘুরতে হত না।

—ও টাকা কি ও একা পায় ! লোকাল দালালেরও তো ভাগ থাকে।

—ওর কিস্যু হয় না। ও একটি অপদার্থ। সাব-দালালের সাব-দালাল। আমাদের নার্সিংহোমের জন্য বাড়ি দেখতে বলেছিলাম, যত সব এঁদো পচা বাড়ি দেখাত। গলির গলি তস্য গলি। ও লোকটাকে একদম এন্টারটেইন করবে না।

—আমি কেন এন্টারটেন করব ? তোমার লোক, তোমাকেই খবর দিতে আসে। খাওয়া শেষ করে খাবারের পাত্রগুলো একটা একটা করে ঢাকছে ছন্দা,—বলছে যখন, একবার দেখতে দোষ কী !

—ওর কাছে খবর তো শুধু আট-দশ কাঠার। অত জমি নিয়ে আমরা কী করব ? আমাদের তো দরকার কাঠা তিনেক।

—সে রকম খবরও আছে। নিউ আলিপুরে। লাখ আস্টেক পড়বে।

কথা না বাড়িয়ে শুভাশিস উঠে পড়ল। অনেকটা সময় নিয়ে কুলকুচি করল বেসিনে। জমি একটা কিনে ফেলতে পারলে ভালই হয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সাত-আট লাখ টাকা বার করাটা মুশকিল। কিছু না হোক অর্ধেক টাকা তো সাদাতে দেখাতেই হবে। নতুন মারুতিটা কিনল, সে টাকা তো লুকোছাপা করার উপায় নেই। নার্সিংহোমের পিছনেও সাদা-কালো মিলিয়ে থোক একটা বেরিয়ে গেছে, এস্টিমেটের চেয়ে অনেক বেশি, এখন আর অত টাকাই বা কোথায় !

ড্রয়িং স্পেসে এসে সোফায় হেলান দিল শুভাশিস। আয়েশ করে পাইপ ধরাল। রাতের দিকে আজকাল সিগারেটে তেমন আর মৌজ আসে না, পাইপের দামি তামাকের সুগন্ধটা তাও মন্দ নয়।

মনোরম এক বাতাস আসছে ঘরে। ব্যালকনির দিক থেকে। ফাল্গুন কি পড়ে গেল ? সিজন চেঞ্জের সময়, আবার কিছু অসুখবিসুখ বাড়বে। শুভাশিস খবরের কাগজটা টানল অলসভাবে। উল্টোচ্ছে। এখন দশটার মধ্যেই বাড়ি ফিরছে রোজ। স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। ছন্দার সঙ্গে টুকিটাকি কথা হয়, ইদানীং অনেক রাত অবধি পড়ে টোটো, তার ঘরে ঢুকে গল্প জোড়ে, বেশ লাগে। তবু কেন যে বুকটা হঠাৎ হঠাৎ চিনচিন করে ওঠে।

একটা খবরে চোখ আটকে গেল শুভাশিসের। চাইবাসার কাছে পুলিশ-উগ্রপন্থী সংঘর্ষ, তিন জন নিহত, আহত বারো। তথাগত ও দিকেই কোথাও আছে না ? সিংভূম, না কোথায় যেন ? চাইবাসা কি সিংভূম ডিস্ট্রিক্টে পড়ে ? দুৎ, তথাগত সংঘর্ষে পড়তে যাবে কেন ? সে তো এখন আর তেমন রাগী নয় ! শিক্ষা দিচ্ছে ! চেতনা বিলোচ্ছে ! কী চেতনা যে আসছে গ্রামে কে জানে !

পুরনো ছবিগুলো মনে পড়ছিল শুভাশিসের। মাস দেড় দুই গ্রাম-বাসের স্মৃতি। তেমন দগদগে নেই আর, আবছা হয়ে এসেছে। কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। স্বপ্নই তো ছিল, টিকল না। স্বপ্ন আর বাস্তবে এত ফারাক ! গ্রাম বলতে যে মুগ্ধতা ছিল প্রথম দিকে, ক'দিনেই তা উবে গেল। কাজে নেমে ধ্যানধারণা ভেঙে চুরচুর। পার্টির ক্লাসে যা শুনেছে তেমন তো নয় ! দয়ালগঞ্জ, নকিবপুর, সিড়িন্দার ভূমিহীন কৃষকমাত্রই এমন কিছু মহান প্রোলেতারিয়েত নয়, তাদের অনেকেই শঠতা ছলনায় কলকাতার ঝানু ঠগদের হার মানাতে পারে। কী যে চায় তারা নিজেই জানে না, অথচ অনেক কিছু চায়। যাদের কিচ্ছুটি নেই তারা হয় ভয়ে কাঁপে, নয়তো বোঝে খুনখারাপি। দু-চার বিঘে জমি যাদের আছে তারা সেটুকু সামলাতে পারলেই খুশি। যাদের জমি আরও বেশি তারা নিজেরাই জোতদার বনতে চায়। তার জন্য দরকার হলে দু-চারটে জোতদার খুন করিয়ে আন্দোলনে মদত দিতে পিছপা নয় তারা। মণ্ডলবাড়ির ছেলেটা মানিক বিশ্বাসকে খুন করাতে চায়নি ? অথচ ওই ছেলেটা আর মানিক বিশ্বাস দুজনেই মকবুল শেখ, পরান দাস, রজব আলিদের কুকুর বেড়ালের চেয়েও হীন চোখে দেখত। এমন অবস্থায় কেই বা হতে পারে বিপ্লবের বন্ধু ? কাকেই বা আঙুল দেখানো যাবে শ্রেণীশত্রু বলে ? যাদের জন্য বিপ্লবের আলো জ্বালাতে চেয়েছিল শুভাশিসরা, শহর ছেড়েছিল, তারাই বা কজন সহজ চোখে দেখেছিল শুভাশিসদের।

কেন এ সব কথা ভাবছে শুভাশিস ! স্মৃতি রোমন্থন ! জাবর কাটা ! হাহ। সে কি বুড়োচ্ছে নাকি ! দুর দুর, লাইফ বিগিনিস অ্যাট ফরটি। সে তো সবে তেতাল্লিশ প্লাস। সবে ডিঙি মেরে মেরে হাঁটছে। এখন কি তার পিছন ফিরে তাকানোর সময় !

কাগজ রেখে শুভাশিস টিভি চালাল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলছে। দক্ষিণী। পুরনো লোকটার বদলে নতুন একটা কাজের মেয়ে এসেছে, তাকে কী যেন বলছে ছন্দা। টোটোর সামনেই অ্যানুয়াল, শুভাশিস ফেরার আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়ছে নিজের ঘরে।

ছন্দা কথা শেষ করে সোফায় এল,—কি গো, দেখে আসব জমিটা ?

শুভাশিস পাইপটা হাতে নিল,—দেখো। তাড়া কিসের ?

—আছে তাড়া। আমার আর এই ফ্ল্যাটে থাকতে ভাল লাগছে না। হাঁপ ধরে যায়।

—ফ্ল্যাট কিন্তু তুমিই কিনিয়েছিলে। আমি কিন্তু বলেছিলাম দু-চার বছর ওয়েট করো, একেবারে বাড়ি করে উঠে যাব। তোমার তর সইল না।

—যখন বলেছিলাম, তখন বলেছিলাম। ভাড়া বাড়ির চেয়ে তো ফ্ল্যাট বেটার।

ফ্ল্যাটের চেয়ে আপনা মকান। শুভাশিস দাঁতে পাইপ চেপে ধোঁয়া ছাড়ল। পাইপ দাঁতে চেপে কথা বলার অভ্যাসটা রপ্ত করছে। এতে খানিকটা ব্যক্তিত্ব বাড়ে। চিবিয়ে চিবিয়ে হাসল,—দুধের চেয়ে ক্ষীর ভাল, ক্ষীরের চেয়ে মালাই।

—ক্ষমতা থাকলে মালাই খাব না কেন ?

—খাও না যত খুশি, কে বারণ করছে ! বাট হোয়াটস রঙ উইথ দিস ফ্ল্যাট ম্যাডাম ? এত স্পেসাস, তিনজন মাত্র লোক আমরা...

রান্নাঘরের সামনে মাদুর বিছোচ্ছে কাজের মেয়েটা। শোওয়ার তোড়জোড়। ভুরু কুঁচকে সেদিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল ছন্দা। শুভাশিসের দিকে ফিরে বলল,—ফ্ল্যাটে একটুও সবুজ থাকে না। একটু বাগান না হলে মানুষের ভাল লাগে ?

—টবের বাগানে খুশি নও ?

—ইশ, ও তো লাইফলেস ! ফুলগুলোকে কেমন প্লাস্টিকের ফুল প্লাস্টিকের ফুল মনে হয় !

—হুঁউম। ছন্দার স্বপ্নটাকে উসকে দিতে চাইল শুভাশিস,—কী রকম বাগান হলে গিন্নিমা খুশি হবেন ?

—ধরো গেটে একটা মাধবীলতার ঝাড় থাকবে।

—গেটটা বাগান নয়।

—ধরো একটা মেক্সিকান ঘাসের লন থাকবে। এলোমেলো, ফাঁপা ফাঁপা, ঢেউ খেলানো।

—লনটাও বাগান নয়।

—আহা, বাগানে ফুল তো থাকবেই। ছন্দা হেসে ফেলল,—মালি রেখে বাগান করব। বাগানের এক পাশে একটা গন্ধরাজ থাকবে, আরেক পাশে কাঁঠালি চাঁপা। মাঝখানে বেল গোলাপ মল্লিকার বেড। শীতকালে সিজন ফ্লাওয়ার। একেক বছর একেক ফুল। এ বছর ডালিয়া, তো সামনের বছর চন্দ্রমল্লিকা। কোনও বার ভ্যারাইটিজ অফ গাঁদা।

ছন্দাকে দেখে শুভাশিস বিস্মিত হচ্ছিল। কটা মাত্র দিন সঙ্গ পেয়েই মনমরা ভাব অনেকটা কেটে গেছে ছন্দার। কত অল্পেই উচ্ছল ! রোগব্যাধি যেন মুখ লুকিয়েছে। চিত্ত প্রফুল্ল থাকলে কি হিমোগ্লোবিন বেড়ে যায় ! ছেলের অ্যানুয়াল হয়ে গেলে অপারেশনটা করাবে বলেছে, মনে হয় আর মত বদলাবে না।

টিউব নেবানো, জ্বলছে স্ট্যান্ডল্যাম্প। কারুকাজ করা কাঠের স্ট্যান্ডের মাথায় বাহারি ঘোমটা। নরম আলোয় ভারি স্নিগ্ধ হয়ে আছে ঘর।

মধুর পরিবেশকে আর একটু তরল করতে চাইল শুভাশিস। বলল,—শুধু ফুলগাছে বাহার পুরো খুলবে না। তুমি অন্য গাছও লাগাতে পারো।

—যেমন ?

—একটা কাঁঠাল গাছ লাগাতে পারো। গুঁড়ি থেকে, ডাল থেকে, ইয়া ইয়া এঁচোড় ঝুলবে।...তুফান শীতে কপি বেগুন পালংশাক নিয়ে আসে, আমরা গ্রীষ্মে ওর হাতে এঁচোড় ধরিয়ে দেব। তারপর ধরো লেবুগাছ, পেয়ারাগাছ...

—আম জামই বা বাকি থাকে কেন ? কিনবে তো তিন কাঠা জমি...

ফোন বাজছে। শুভাশিস উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

—হ্যালো, কে শুভাশিসদা ? আমি দীপু বলছি। ঢাকুরিয়া থেকে।

শুভাশিসের কয়েক সেকেন্ড বাক্যস্ফূর্তি হল না। পাইপটা পড়ে যাচ্ছিল ঠোঁট থেকে, হাত দিয়ে ধরে নিল।

—শুয়ে পড়েছিলেন নাকি ? সরি টু ডিসটার্ব ইউ।

—না না, ঠিক আছে। ডাক্তারদের কি আর ঘড়ি ধরে শুতে যাওয়ার উপায় আছে রে ভাই ?...এই একটু জার্নাল উল্টোচ্ছিলাম।...তারপর হঠাৎ ! এত রাত্রে ! সব ভাল তো ?

—চলছে একরকম। আপনি অনেক দিন আসছেন না...

শুভাশিসের কৌতূহল হচ্ছিল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। শুধু যায় না বলেই মাঝরাতে খবর নিচ্ছে সুদীপ, এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুদীপের হিসেবি স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। দু-এক পলক ভাবনার মধ্যেই উত্তরটা এসে গেল। ওপার থেকেই।

—শুভাশিসদা, আপনাকে একটু দরকার ছিল।

—বলো। শুভাশিসের স্বর সামান্য সতর্ক।

—আপনি কাল একবার আসতে পারবেন ? বিকেলের দিকে ?

—হঠাৎ ?

—কাল তো রোববার, ছুটির দিন, কাল বিকেলে আমরা ভাইবোনেরা সব একসঙ্গে বসছি। আমাদের বাড়িটা একটা প্রোমোটারের হাতে দেওয়ার কথা চলছে, এগ্রিমেন্টটা ভাবছি কালই ফাইনাল করে ফেলব। আপনি যদি একটু প্রেজেন্ট থাকতে পারেন তো খুব ভাল হয়।...বউদি বলছিল।...আপনি অবশ্য খুব ব্যস্ত মানুষ...

শুভাশিসের কণ্ঠনালী শুকিয়ে এল। মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছে দোতলার প্যাসেজে রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সুদীপ, তিন-চার পা দূরে নিজের ঘরের দরজার সামনে ইন্দ্রাণী। সুদীপের কথা শুনতে শুনতে ভুরুতে অল্প ভাঁজ পড়ছে তার, পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে, টেপা ঠোঁট ফাঁক হচ্ছে সামান্য, ধীর লয়ে নিশ্বাস ফেলছে, চোখ ভেসে আছে দূরে।

আচমকা এক তীব্র অভিমানে স্নায়ু বিকল হয়ে গেল শুভাশিসের। ফোনটা কি ইন্দ্রাণী নিজেই করতে পারত না ! এই যে এক মাসের ওপর যাচ্ছে না শুভাশিস, কই এক বারও তো তার খোঁজ নিল না ইন্দ্রাণী ! হয়তো উটকো আপদ ঘাড় থেকে নেমে গেছে বলে সে ভারি নিশ্চিন্ত এখন। যদি তাই হয় তবে ডাকা কেন ?

জোরে শ্বাস টেনে ফুসফুসে বাতাস ভরল শুভাশিস। জিভ বুলিয়ে টাগরা ভিজিয়ে নিল। নিচু স্বরে বলল,— কাল ? কাল তো হবে না ভাই। আমি তো কাল থাকছি না।

—দেশে যাচ্ছেন ?

—না, মানে ওইরকমই।...একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

—একটু তাড়াতাড়ি ফেরা যায় না ? আমরা পাঁচটা-ছটায় বসব। আপনাকে আমরা খুব এক্সপেক্ট করছি।

হু ইজ আমরা ! ও বাড়ির কোনও 'আমরা'কে শুভাশিস সেনগুপ্ত চেনে না। যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, তাদের কাছে সে এখন পরিত্যক্ত মানুষ।

শুভাশিস অপাঙ্গে ছন্দাকে দেখল। চলন্ত টিভির দিকে চোখ নেই ছন্দার, এখনও তার সুখী চোখ

স্বপ্নের জাল বুনছে।

শুভাশিস বলল,—পারব কি ? মনে হয় না।

—দেখুন না চেষ্টা করে। উই উইল রিয়েলি মিস ইউ শুভাশিসদা।

—দেখি। না'ই ধরে রাখো।

রিসিভার ক্রেডলে রেখেও আবার কানে তুলল শুভাশিস। একটানা যান্ত্রিক শব্দ। মুছে গেছে ও বাড়ি। ফোনটা পাকাপাকি রেখে সোফায় ফিরল।

ছন্দা জিজ্ঞাসা করল,—নার্সিংহোম ?

—ওই আর কি। শুভাশিস নিবে যাওয়া পাইপটা ধরাল।

—সিরিয়াস কিছু ?

—নাআ।

—আচ্ছা, যদি গোলাপ মল্লিকা বেল হেন-তেনর বেড না করে শুধুই গোলাপ লাগাই বাগানে ? ছন্দা সোফায় হেলান দিল,—আমাদের বাড়ির চারদিকে শুধু গোলাপ ফুটে থাকবে। লাল হলুদ সাদা গোলাপি, ব্ল্যাক প্রিন্স...

—হুঁ, ভালই হয়। কিছুই শুনছিল না শুভাশিস, অন্যমনস্কভাবে বলল,—আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কি, নারকোল গাছ লাগাবে কি না ?

—আমাদের নতুন গাড়িটা তো এখনও পরখ করা হয়নি। যাবে নাকি কাল একটা লঙ ড্রাইভে ?

—তুমি যাবে বেড়াতে।

—হোয়াই নট ? তাজা বাতাস কার না ভাল লাগে! শুভাশিস সোজা হয়ে বসল,—কোথায় যাওয়া যায় বলো তো ?

—সত্যি যাবে ? ছন্দার চোখের তারা জ্বলে উঠল,—টোটো, অ্যাই টোটো।

বার কয়েক ডাকার পর অলস পায়ে এসেছে টোটো,—কী হল, চেঁচামিচি করছ কেন ?

—তোর বাবা কাল আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাবে বলছে। প্লেসটা তুই চুজ কর।

বারমুডা টিশার্ট পরা টোটো তেমন উৎসাহ দেখাল না,—যাও, মাধবপুর ঘুরে এসো।

—মাধবপুর !

—মন্দ কি। বহুদিন যাওনি।

—মাধবপুর কি একটা বেড়ানোর জায়গা ? অন্য কোথাও চল।

—আমি কোথায় যাব ? এগজাম দরজায় নক করছে, এখন আমার বেড়ানোর সময় !

—এক দিনে তোমার প্রিপারেশানের কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। আমি বলছি, তুমি যাবে।

—আমার কাল অসুবিধে আছে মা। তোমরা দুজন ঘুরে এসো।

—থাক, আমরাও তা হলে যাব না। প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দাও।

শুভাশিস সামান্য চঞ্চল হল। কাল বাড়ি থেকে না বেরিয়ে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকলেও ইন্দ্রাণীরা কেউ খোঁজ করবে না, তবু যেন চোরকাঁটা ফুটছে কোথাও। কারণ ছাড়াই। কাকুতির সুরে ছেলেকে বলল,—চল না বাবা। ও রকম করছিস কেন ? কতদিন আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে যাইনি !

টোটো একবার মাকে দেখল, একবার বাবাকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল,—কোনও মানে হয় ! কাল আমার কত কাজ ছিল !

—কিছু ক্ষতি হবে না। লেটস ফিক্স আওয়ার ডেসটিনেশান।

—কোলাঘাট যাওয়া যায়। টোটো আড়মোড়া ভাঙল,—নদীর ধারে বেড়ানো যাবে।

ছন্দা বলল—কোলাঘাটে কিছু নেই। আমরা মায়াপুর ঘুরে আসতে পারি।

—সেই ঘুরে ফিরে তোমার গোপাল ঠাকুর ! একটা ভাল নিরিবিলি জায়গার কথা ভাবতে পারছ

না ? অ্যাই টোটো, বকখালি গেলে কেমন হয় রে ? একটা মিনি সমুদ্র, ঝাউবন...ফার ফ্রম দা ম্যাডিং ক্রাউড !

টোটো বিশেষ উচ্চবাচ্য করছে না, বসে আছে বেজার মুখে। ছোটখাট বাকবিতণ্ডার পর বকখালিই স্থির হল। বেরোবে সাতটায়, নতুন গাড়ির সঙ্গে এক ড্রাইভারও বহাল হয়েছে, তাকে রবিবার পাওয়া যাবে না, শুভাশিসই গাড়ি চালাবে।

রাতদুপুরেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল ছন্দার। গুছোচ্ছে।

পরদিন সময় মতো বেরোনো হল না, বেরোতে বেরোতে সেই আটটা। টোটো এত দেরি করে উঠল ! মুখটাকে প্যাঁচার মতো করে রেখেছে, যেন বাবা মা দ্বীপান্তরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

ছুটির দিন, রাস্তা বেশ ফাঁকাই, তবু ডায়মন্ডহারবার পৌঁছতেই দশটা বেজে গেল। শেষের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল শুভাশিস। মাত্র গোটা ষাটেক কিলোমিটার পথ, নতুন গাড়ি বালিহাঁসের মতো উড়ছে, তবু কেন যে এত ক্লান্তি !

ডায়মন্ডহারবারে খানিকক্ষণ জিরোল সবাই। ছন্দা ফ্রিজ থেকে যা পেয়েছে বার করে নিয়েছে। বড় একটা চিজের কৌটো, বেশ খানিকটা হ্যাম, মার্মালেডের ছোট শিশি, এক দলা আচারও। সকালে উঠে ডিমও সেদ্ধ করে নিয়েছে গোটা আস্টেক, কলা নিয়েছে, রাস্তায় কিনেছে পর্বতপ্রমাণ পাঁউরুটি। গঙ্গার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খাওয়া হল এক প্রস্থ।

টোটোর আহারেও রুচি নেই। একটা ডিম-সেদ্ধ খেল কি খেল না, কলা দু কামড় দিয়ে ফেলে দিল, হ্যাম চিজ ছুঁয়েও দেখল না।

ছন্দা বলল,—ব্যাপার কী তোর ? খাচ্ছিস না কেন ?

টোটো গাড়ি থেকে নেমে হাত পায়ের খিল ছাড়াচ্ছে। উদাস চোখে দেখছে বিস্তৃত গঙ্গাকে। দু-চারটে নৌকো ঘুরছে, গেরুয়া জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে একটা লঞ্চ। দূরে তাকালে হলদিয়ার আভাস দেখা যায়। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টোটো বলল,—আমার খেতে ইচ্ছে না করলে কী করব !

—এখনও রাগ ? এই আমাদের সঙ্গে আসতে হল বলে ? আমাদের সঙ্গে বেড়াতে তোর আর ভাল লাগে না, তাই না রে ?

—আমি কি তাই বলেছি ! টোটো আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

শুভাশিস ছেলেকে দেখছিল। ছেলে বড় দ্রুত বদলাচ্ছে, ক্রমশ ঝরে যাচ্ছে কোমলতা। বাপ-মার গণ্ডিতে যে সহজ ঘোরাফেরা ছিল, তা যেন আর নেই। টিন এজ সিনড্রোম। ওই বয়সে কেমন ছিল শুভাশিস ? মা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না, বাবার সঙ্গেও কি নৈকট্য ছিল ? বাড়িতে কথা বলার লোক তখন তো শুধু তুফান। তাও সে বয়সে ছোট, অনেকটা ভক্ত অনুচরের মতো, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার প্রশ্নই আসে না। বাবার বদলির চাকরি, কোথাও শিকড় গজাতে পারেনি, স্কুলজীবনেই বা তেমন সঙ্গী পেল কই ! নিখিল প্রতুল দু-একটা নাম ভাসা ভাসা মনে পড়ে। শুভাশিস একা, চিরকালই একা। তুলনায় টোটো তো অনেক বেশি মনোযোগ পায় বাড়িতে, তবু কেন এই দূরত্ব ? লোকে বলে অভাবী বাপ মা'র সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অনেক নিবিড় হয়। এই দূরত্ব কি অভাবহীনতার পরিণাম !

শুভাশিস গাড়ি থেকে নেমে ছেলের কাঁধে হাত রাখল,—ওদিকে গঙ্গার ধারে একটা পুরনো ভাঙা কেল্লা আছে, দেখতে যাবি ?

—এখন ! বকখালি পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে না ?

—হোক না, আমাদের কিসের তাড়া ? চল একটু হেঁটে আসি। কেল্লা না দেখিস, লাইটহাউস দেখবি চল।

—সব আমার দেখা বাবা। মনে নেই, ক্রিসমাসের সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে আমি এখানে পিকনিক করতে এসেছিলাম ?

—সে তো হইহল্লা। এবার নয় আমার সঙ্গে ঘুরলি। ধর তুইই আমাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিস।

—তুমি বলছিলে তুমি টায়ার্ড...এই চড়া রোদ্দুর...আবার এতটা পথ ড্রাইভ করবে...

শুভাশিস বুঝতে পারছিল, টোটো ঈষৎ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ছেলের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল।

—চলো, আর কি।

—চলো, তুমিই তো সময় নষ্ট করছ।

—নষ্ট কোথায়, একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম।

—খবর পাঠিয়ে রামদেওকে ডেকে নিলেই হত। ...শরীরে না কুলোলে বরং ছেড়ে দাও, এখানেই দিনটা স্পেন্ট করি।

শুভাশিস করুণ হেসে গাড়ি স্টার্ট দিল। তাকে এখন কলকাতা থেকে আরও দূরে যেতে হবে, অনেক দূর।

ফাল্গুনের রোদ চড়চড় বাড়ছে। বাতাসে চোরা উষ্ণতা। নোনতা হাওয়া ঝাপটা মারছে মুখে। সাঁ সাঁ ছুটছে নতুন বাদামি মারুতি থাউজেন্ড, পার হচ্ছে জনপদের পর জনপদ।

টোটো যেন একটু স্বাভাবিক। টুকটাক কথা বলছে ছন্দার সঙ্গে। একটা জায়গার নাম দেখে মা-ছেলে খুব হাসাহাসি করল। কি, না উকিলের হাট! নামখানায় এসে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল শুভাশিসদের। জোড়া নৌকোয় সন্তর্পণে গাড়িসুদ্ধু পার হল এক সরু নদী। এ দিকটায় টোটো-ছন্দা আগে আসেনি। নদীর নামটাও ভারি মিঠে লাগল তাদের। হাতানিয়া দোয়ানিয়া।

নদী পার হয়েই ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে টোটোর। পাঁউরুটি হ্যামে হবে না, এক্ষুনি তার মাংস-ভাত চাই।

ছোট্ট জনপদ। খুঁজে খুঁজে একটা মোটামুটি পরিষ্কার হোটেল বার করল শুভাশিস। চেয়ার-টেয়ারের বালাই নেই, বেঞ্চি টেবিলে খাওয়া, তাইই সই। হোটেলে ঢুকেই নাক কুঁচকোচ্ছে ছন্দা, তার ধারণা এখানে খেলে নির্ঘাত কলেরা হবে।

শুভাশিস হাসছে,—কি রে টোটো, তোরও কি ঘেন্না করছে?

টোটো জিনসের জ্যাকেট খুলে রেখেছে গাড়িতে। শুধু শার্টেও ঘামছে অল্প অল্প। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—চলতা হ্যায়। ক্ষিদের সময়ে অত বাছবিচার করলে চলে না।

—রাইট। আমি যখন গ্রামে ছিলাম, ইন দা ইয়ার নাইন্টিন সিক্সটিনাইন, তখন যে আমি কী পরিবেশে থেকেছি, কী পরিবেশে খেয়েছি...।

—সেই গ্রামের হোটেল কি আরও খারাপ ছিল বাবা?

—সিড়িন্দায় হোটেল! হা হা। আমি তো খেতাম মকবুল শেখের বাড়িতে। ইয়া মোটা মোটা চাল আর শাকপাতা দিয়ে একটা চচ্চড়ি।

—তুমি তা হলে গ্রামে গিয়ে খুব কষ্ট করেছিলে?

—হ্যাড টু। ফর আ নোবল কজ। উইথ আ নোবল আইডিয়া।

—যদি সত্যি সত্যি তোমাদের বিপ্লব সফল হত, তা হলে কি তুমি গ্রামেই থেকে যেতে বাবা?

—হয়তো। কিন্তু পৃথিবীর তাতে একটা লস হয়ে যেত।

—কি লস?

—তোমার মা'র সঙ্গে তা হলে আমার বিয়েই হত না। অ্যান্ড আওয়ার প্ল্যানেট উড হ্যাভ মিসড রাজর্ষি।

টোটো আজকাল বাবা-মা'র সামনে জোরে হাসে না। লাজুক মুখে তাকাল একটু। খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ করেই আবার যাত্রা শুরু। বকখালি পৌঁছতে প্রায় একটা। ট্যুরিস্টের ভিড় নেই এখন, গভর্নমেন্টের লজ প্রায় ফাঁকা, একটা ভাল দেখে ঘর ভাড়া নিয়ে নিল শুভাশিস। হাত মুখে জল ছিটিয়ে তিনজনেই মিনিট পনেরো শুয়ে রইল টান টান। তারপর গাড়ি রেখে বেরিয়ে

পড়েছে।

এখানে সমুদ্র বড় শান্ত। জলে নীল আভার চিহ্নমাত্র নেই, বড় জোর একটা সবজেটে ভাব। নিরীহ বাধ্য ঢেউরা মাথা নিচু করে খেলা করছে কিনারে, জল আসছে, ফিরে যাচ্ছে, বালি আর কাদার মিশেলে গড়ে ওঠা তটে ছাপ রেখে যাচ্ছে ক্ষণিকের। এদিক ওদিকে টুকুস করে মাথা তুলছে কাঁকড়া। জোলো বাতাসে আঁশটে গন্ধ।

পাড় ধরে হাঁটছে শুভাশিসরা। ডান দিকে মিহি ঝাউবন, বাঁয়ে শব্দমাখা জলরাশি। এক দিকে বাতাসের সোঁ সোঁ ধ্বনি, অন্য দিকে একঘেয়ে চাপা গুঞ্জন। সব আওয়াজ ছাপিয়ে একটা দূরাগত শব্দ শুনতে পাচ্ছিল শুভাশিস। ছটফট করছিল, বিচলিত বোধ করছিল।

টোটো ছন্দা খানিকটা এগিয়ে গেছে। একটা খালি গা কালো মতো তাগড়াই লোকের সঙ্গে কথা বলছে। হাত নেড়ে বাবাকে ডাকছে টোটো। শুভাশিস কাছে যেতেই টোটো বলল,—বাবা, আমরা নৌকো চড়ব ?

—এই সমুদ্রে নৌকো ! শুভাশিস যেন শিউরে উঠল।

—এটা আবার একটা সমুদ্র নাকি ! ট্যালট্যাল করছে জল, ঢেউ নেই, কিছু নেই, চলো না বাবা।

তাগড়াই লোকটা নৌকোর মাঝি। ঝকঝকে সাদা দাঁত ছড়িয়ে হাসল লোকটা,—চলেন বাবু, ছই দেওয়া লৌকো, মোটে তাপ টের পাবেননি।

—নৌকো চড়ে যাবটা কোথায় ?

ছন্দা খুশিতে ঘাড় দোলাচ্ছে,—কেন, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে দ্বীপটা, ওখান থেকে ঘুরে আসতে পারি।

—দুর, ওটা দ্বীপ নাকি ?

—হ্যাঁগো, ওটার নাম জম্বু দ্বীপ। ওখানে নাকি বনবিবির থান আছে, চিংড়ির আড়ত আছে...চলো না গো, আমি কখনও দ্বীপ দেখিনি।

শহরের লোককে কি দ্বীপ খুঁজতে হয় ! সে নিজেই তো একটা আস্ত দ্বীপ। তলিয়ে যায়, ভাসে, তলিয়ে যায়।

বিষণ্ণতা লুকিয়ে শুভাশিস জিজ্ঞাসা করল,—যেতে আসতে কতক্ষণ লাগবে ?

মাঝি মাথা চুলকোল,—তা ধরেন ঘণ্টা দুই-আড়াই। হাওয়া যদি ঠিকঠাক বয়, পাল খাটিয়ে আরও আগেও ফিরতে পারি। ফাল্গুন মাস, বাতাসের তো এখন ঠিক ঠিকানা নাই !

ঠেলে ঠেলে নৌকো জলে ভাসাল মাঝি। আরও দূরে চলেছে শুভাশিস। মৃদু মৃদু দোলে নৌকো, শুভাশিসও দোলে। একবার কি ও-বাড়ি যাওয়া উচিত ছিল আজ ? দীপু কি আর নিজে ডেকেছে, ইন্দ্রাণীরই আহ্বান তো দীপু পৌঁছে দিয়েছিল টেলিফোনে ! প্রবল হাওয়ায় পতপত কাঁপছে পাল, ফুলে উঠছে। কত দিন তিতিরকে দেখেনি শুভাশিস ! মাঝদরিয়ায় ভাসছে নৌকো। বকখালি রেখা হয়ে এল। টোটো বকবক করে চলেছে মাঝির সঙ্গে। অজানা দ্বীপের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ছন্দা। এগোচ্ছে নৌকো। চড়া রোদে ঝলসাচ্ছে পাটাতন। ঠিকরে ওঠা জলকণা শুকিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে।

দ্বীপ কাছে এসে গেল। মাঝি পাল নামাচ্ছে।

পিছনের মূল ভূখণ্ডের দিকে চিত্রার্পিতের মতো চেয়েছিল শুভাশিস, সামনে ফিরেছে। সঙ্গে সঙ্গে চমকেছে ভীষণ। এ কী অপার্থিব দৃশ্য ! দ্বীপ থেকে জলে নেমে এসেছে অসংখ্য গাছ, জল-অরণ্যের ফাঁক দিয়ে দিয়ে পথ করে চলেছে নৌকো। আদিম আলোছায়া নেচে বেড়াচ্ছে জলে। বিশাল আকাশ ভেঙে খানখান।

শুভাশিসের শরীর হিম। এ কোন পথে চলেছে সে ? জলের মধ্যে একা হয়ে পরপর দাঁড়িয়ে আছে এরা কারা ? গাছ, না রাশি রাশি অভিশপ্ত মানুষ ? এদের মাঝে সে কেন ?

শুভাশিস স্থান কাল গুলিয়ে ফেলছিল। আর্তনাদ করে উঠেছে হঠাৎ,—মাঝি, আর এগিয়ো না।

মাঝি, নৌকো ঘোরাও।

ছন্দা অবাক,—সে কি! কেন? আমরা তো এসে গেছি।

—কোথায়? শুভাশিসের চোখে ঘোর।

—দ্বীপে! উফ, কী সুন্দর জায়গা!

—হোক সুন্দর। আর যাব না।

—তোমার ভয় করছে নাকি বাবা? টোটো হাসছে,—আমার কিন্তু ফ্যান্টাস্টিক লাগছে। না এলে রিয়েলি খুব মিস করতাম। একটা দ্বীপে পা রাখছি...আমি ভাবতেই পারছি না!

কী যেন কানাকানি করছে জলডুবি গাছেরা! শুভাশিস শুনতে পাচ্ছিল। অবসন্ন মুখে হেলান দিল ছইতে। আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল। ফিরলেই হত। এখনও ফেরা যায়।

দেড়শো কিলোমিটার দূরে ঢাকুরিয়ার রায়বাড়ির রঙ্গমঞ্চে তখন অন্য নাটক। কুশীলবরা হাজির হয়েছে একে একে। শংকর-জয়শ্রী নিজেদের গাড়িতে চড়ে এসে গেছে দুপুর দুপুর। বিকেলের মুখে এল অশোক মুস্তাফি। রঘুবীর তো সকাল থেকেই এ বাড়িতে। দুপুরে চাট্টি খেল, আদিত্যর সঙ্গে গুজগুজ করে গেল সমানে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আলোচনা-সভা বসল। বড় ঘরে।

আদিত্য এখন অনেক স্বাভাবিক। ভাইবোনদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলল, মন দিয়ে প্রতিটি অক্ষর শুনল এগ্রিমেন্টের, বিনা প্রতিবাদে সইও করল। পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের প্রসঙ্গে ক্ষণিকের জন্য থমথম করে উঠেছিল ঘর, কয়েক লহমাতেই সে ভাবটা মিলিয়ে গেল। সই সাবুদের পালা শেষ।

ইন্দ্রাণীর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আদিত্য তাকে ডোবায়নি, কথা রেখেছে। শংকর-জয়শ্রীও ঝামেলা করল না বিশেষ, বন্দোবস্তে তারা প্রসন্ন বলেই মনে হয়।

রুনা রান্নাঘরে মিনতির সঙ্গে সকলের চা জলখাবারের আয়োজন করছে। পায়ে পায়ে দোতলায় এল ইন্দ্রাণী। ঘরে ঢুকেই থমকে গেছে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে তিতির।

কাছে গিয়ে মেয়ের পিঠে হাত রাখল ইন্দ্রাণী,—কাঁদছিস কেন রে? কী হল?

তিতির ঝট করে মুখ তুলল। ফর্সা মুখ টুকটুকে লাল, গাল ভিজে গেছে জলে।

ইন্দ্রাণী হাসার চেষ্টা করল,—বাড়ি ভাঙা হচ্ছে বলে মন খারাপ?

তিতির উত্তর দিল না। ছিটকে সরে গেছে খাটের ও প্রান্তে। তার সজল চোখ মা'র চোখে স্থির।

মেয়ের ওই দৃষ্টি ঠিক পড়তে পারছিল না ইন্দ্রাণী।

৫৩

ফাল্গুনের শেষাশেষি পর পর ক'দিন বৃষ্টি হয়ে গেল মাধবপুরে। তেমন ঝমঝমিয়ে দশ দিক কাঁপিয়ে নয়, ধুলো মারা বৃষ্টি। সারাদিন ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘে ছেয়ে থাকে আকাশ, কখনও-সখনও টিপটিপ ঝরে। ঠাণ্ডার একটা রেশও ছিল বাতাসে। দু দিন হল আকাশ বেশ নীল হয়ে গেছে, তাপও বাড়ছে ক্রমশ।

বিকেলে একটু বেরোনোর তোড়জোড় করছিলেন শিবসুন্দর। আজ কোনও কল আসেনি এখনও, খালপাড় থেকে খানিক ঘুরে আসবেন। আলো থাকতে থাকতে। ছুটিছাটা আজকাল প্রায় জোটেই না, রুগীর ভিড়ে সকালের চেম্বারই একটা-দেড়টা অবধি গড়িয়ে যায়। বিকেলের দিকে দু দিন করে চেম্বার রাখতে বলছে তুফান, শিবসুন্দর রাজি নন। এখন এক-দু মাস রোগব্যাধির প্রকোপ একটু বাড়বেই, তা বলে কি এতদিনের নিয়ম বদলালে চলে!

আলমারি খুলে শিবসুন্দর একটা ঘিয়ে রঙের বুশশার্ট বার করলেন। ছন্দা পুজোয় পাঠিয়েছিল, এখনও একদিনও পরা হয়নি। দেখতে সাদামাটা হলেও শার্টটা বেশ দামি বোঝা যায়, কি এক বিদেশি কোম্পানির লেবেলও রয়েছে। নির্ঘাত পাঁচ-ছশো হবে। এত দামি শার্ট পরা ধাতে নেই শিবসুন্দরের, তা ছাড়া শীতকালটা তো ফুলহাতা পোশাকেই কেটে গেল।

মনোরমা ঘুমোচ্ছেন। এই অবেলাতেও। ঘুমটা ইদানীং খুব বেড়ে গেছে মনোরমার, সদাই আচ্ছন্ন ভাব। মাঝে প্রেশার খুব নেমে গিয়েছিল, প্রোটিন ডায়েট বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন মোটামুটি স্বাভাবিক। শুধু আচ্ছন্ন ভাবটাই যাচ্ছে না। ওষুধপত্র আর তেমন বদলাচ্ছেন না শিবসুন্দর। পুরনো বন্ধু হরনাথের এখনও কলকাতায় রমরমা পশার, কলকাতা যাওয়ার সময়ে ভেবেছিলেন একবার হরনাথের সঙ্গে দেখা করে মনোরমাকে নিয়ে আলোচনা করে আসবেন, তা সে আর হল কই! যাক গে যাক, হাইপো গ্লাইসিমিয়ার অ্যাটাকটা না হলেই হল।

ক'দিন হল বেশ মশা বেড়েছে। জানলাগুলো টেনে টেনে বন্ধ করলেন শিবসুন্দর। বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরালেন না। ঘুম ভাঙার পর থেকেই বুকটা কেমন চাপ হয়ে আছে। চা খাওয়ার পর বেড়ে গেল চাপটা, হয়তো হাঁটলে কাটবে।

নীচে অলকার গলা শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে আর একটি নারীকণ্ঠ। বিকেলের দিকে রোজই কেউ না কেউ আসে অলকার কাছে। চারপাশে শিবসুন্দরের অনেক জ্ঞাতিগুষ্টি, তাদের বাড়ি কালেভদ্রে যান শিবসুন্দর। সময় পান না, ভালও লাগে না। কী কথা বলবেন তাদের সঙ্গে! সমবয়সী যাঁরা, তাঁরাও তাস দাবা গ্রাম্য রাজনীতি নিয়ে আছেন, শিবসুন্দরের সঙ্গে একটু সমীহ ভরা দূরত্বই পছন্দ করেন তাঁরাও। তুফানেরও এদের সঙ্গে বিশেষ ভাবসাব নেই। শুধু অলকাই দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে। টিভি সিরিয়াল নিয়ে গল্প, সিনেমা নিয়ে আলোচনা, শাড়ি, গয়না, রান্না। মেয়েরা দিব্যি সহজে বৃত্ত রচনা করে নিতে পারে। ছন্দা যে ছন্দা, রীতিমতো শহুরে গিন্নি, সেও তো এলেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি ছোটে। ন মাসে ছ মাসে হলেও।

একতলায় নেমে থমকালেন শিবসুন্দর। রামনগর হেলথ সেন্টারের নার্স মেয়েটি না! মায়া, না ছায়া কি যেন নাম! এখানে কী করছে!

শিবসুন্দরকে দেখেই অলকাদের গল্প থেমে গেছে। মেয়েটি আড়ষ্ট মুখে হাসল।

হাসলেন শিবসুন্দরও। মেপে ভদ্রতা করে বললেন,—তোমাদের হেলথ সেন্টার তো আবার বিজি হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ। নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন।

—খুব ইয়াং না?

—হুঁ। মেয়েটি ঘাড় নাড়ল,—ফার্স্ট পোস্টিং।

—থাকবে ক'দিন? কী মনে হয়?

মেয়েটি উত্তর দিল না। অলকার দিকে তাকাচ্ছে। অলকাও কি যেন চোখে চোখে ইশারা করল। দ্রুত ঘাড় নাড়ল মেয়েটি।

শিবসুন্দর ভুরু কুঁচকোলেন। এ সব ইশারা-ইঙ্গিত ঠারেঠোরে কথা তাঁর পছন্দ নয়। গম্ভীরভাবে বললেন,—কী ব্যাপার বল তো?

অলকা বলে উঠল,—মায়া আপনাকে কি বলবে। তার জন্যই এসেছে। ...কি হল, বাবাকে কি বলবে বলছিলে বলো।

মেয়েটি তবু ইতস্তত করছে। নীল ছাপা শাড়ি পরেছে, আঁচলের খুঁট পাকাচ্ছে আঙুলে। শেষে বলেই ফেলল,—স্যার, আপনি যদি আমার একটা উপকার করেন...

—আমি? উপকার? তোমার?

—আমি এই চাকরিটা ছাড়তে চাই স্যার।

—তো?

—না মানে...আমি...স্যার...অলকাবউদিও বলছিল...না মানে বউদিও ঠিক বলেনি, আমি শুনেছি...

—অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন ! স্পষ্ট করে বলো ।

মেয়েটি কয়েক পল থেমে থেকে বলল,—কলকাতায় আপনাদের নার্সিংহোমে যদি আমার একটা চাকরি হয়ে যায়... । আমার স্যার খুব উপকার হয় ।

এ রকম একটা আবেদনের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না শিবসুন্দর। থতমত খেয়ে গেলেন,—কলকাতায় আমাদের আবার নার্সিংহোম কোথায় ? তুমি কি আমার ছেলের নার্সিংহোমের কথা বলছ ?

—হ্যাঁ স্যার ।

—গ্রামের চাকরি ছেড়ে কলকাতা যেতে চাও ?

—আমার খুব সুবিধে হয় স্যার । ...ডানকুনিতে মা আর বোন থাকে, ওখানেই আমাদের বাড়ি । কলকাতায় একটা ভাল কাজ পেলে বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারি । বোনটা কলেজে পড়ছে, মা অসুস্থ, বাড়িতে কোনও গার্জেন নেই...

শিবসুন্দর সোজা চোখে দেখছিলেন মায়াকে। বছর আঠাশ-উনত্রিশ বয়স, তেমন সুন্দরী না হলেও মুখে বেশ লাবণ্য আছে মেয়েটির। শরীরের বাঁধুনিও সুন্দর। সিঁথি সাদা। কানে পাথর বসানো ছোট্ট ছোট্ট ঝোলা দুল। মুখে হালকা প্রসাধনের ছাপ। অর্থাৎ যথেষ্ট শখ শৌখিনতাও আছে। মা বোনের অজুহাত দেখিয়ে শহরে যেতে চায় ।

শিবসুন্দর ভারিক্কি স্বরে বললেন,—সরকারি চাকরি যখন নিয়েছিলে, তখন তো জানতেই, এ সব জায়গায় এসে থাকতে হবে। জানতে না ?

মেয়েটি চুপ ।

—ক'বছর চাকরি হল ?

—সাত বছর স্যার। আমার ও.টি. ট্রেনিংও আছে।

শিবসুন্দর দ্বিতীয় বাক্যটি যেন শুনলেন না। বললেন,—সাত বছরেই হাঁপিয়ে গেলে ?

মেয়েটি আবার চুপ ।

—এর আগে ছিলে কোথায় ?

—এগরায়। মেদিনীপুরে।

—এখানে তো বেশিদিন আসোনি ?

—না স্যার। মে মাসে এক বছর হবে।

—সরকারি চাকরি করছ, মাইনে ভাল পাও, কোয়ার্টার আছে... জানো তো, নার্সিংহোম টার্সিংহোম ভাল মাইনে দেয় না !

—আমার বেশি মাইনে লাগবে না স্যার। আমি শুধু বাড়ির সঙ্গে থাকতে চাই।

মেয়েটির অলকার দিকে তাকাল একবার। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অলকা কিছু বলার আগেই শিবসুন্দর গলা ঝাড়লেন,—শোনো, আমি আমার ছেলের নার্সিংহোমের কোনও ব্যাপারে কখনও ইন্টারফিয়ার করি না। আমাকে দিয়ে তোমার কোনও কাজই হবে না।

মেয়েটির দিকে আর দৃকপাত না করে বেরিয়ে পড়লেন শিবসুন্দর। হাঁটছেন হনহন করে। সামান্য উত্তেজিত ভঙ্গিতে। মায়া মেয়েটিকে সাহায্য করতে পারলে ভালই লাগত, কিন্তু কোথায় যে বাধল ! ছেলেকে অনুরোধ করতে দ্বিধা ? তুফান তো কলকাতায় যায়ই, তাকে দিয়েই শুভকে বলাতে পারত অলকা, শিবসুন্দরকে জড়ানো কেন ? অবশ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে তুফান শুভকে কোনও অনুরোধ করবেই না। আশ্চর্য, অলকাও তো একটা চিঠি লিখে মায়াকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে পারে, সেটাই বা করে না কেন ?

নিজের ওপর হঠাৎ একটা ক্রোধ এল শিবসুন্দরের। তুফান অলকা এরা তাঁর অনুমতি বিনা যে কিছু করতে পারে না, এর জন্য কি তিনিই দায়ী নন ? তাঁরই ব্যক্তিত্বের চাপে পিষ্ট হচ্ছে দুজনে, তাঁরই

ইচ্ছে অনিচ্ছের তর্জনী হেলনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দুটো স্বাধীন জীবন, এ কি কোনও ভাল কথা ! কেন এ রকম হবে ? এ কি শুধুই তাঁর প্রতি তুফান অলকার শ্রদ্ধা ? নাকি এ ভীতি ? ভয় থেকে কি কখনও প্রকৃত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে ? শুভ তো কবেই দূরের হয়ে গেছে, এরা এত কাছে থেকেও দূর দূর কেন ? তুফানের মনে কি হীনম্মন্যতা বোধ রয়ে গেছে, সেটাই চারিয়ে গেছে অলকায় ? কেন ? কেন ? সেই ছোট্টটি থেকে মানুষ করার সময়ে শুভ আর তুফানে কি কোনও পার্থক্য রেখেছেন শিবসুন্দর ? কখনও না । প্যান্ট জামা জুতো বই খাতা সব তো সমান দিয়েছেন দুজনকে । তুফানের মাথা থাকলে তুফানও ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে পারত । শিবসুন্দর মোটেই বাধা দিতেন না । তা হলে ?

মনের মধ্যে কোনও কথাই একটানা বেশিক্ষণ চলে না, একটু পরেই কোত্থেকে যেন আর একটা কণ্ঠ উঁকি দেয় । নিজেরই । সেই কণ্ঠ বলে উঠল, এতে তোমার কী করার আছে শিবসুন্দর ? ভেবে দ্যাখো, তুমি যদি উদ্ধার না করতে, তা হলে কোথায় থাকত তুফান ? সেই তুফানগঞ্জের হেলথ সেন্টারের দাওয়ায় পড়ে থাকা শীর্ণ অনাথ ছেলেটা হয়তো এতকাল বেঁচেই থাকত না ! থাকলেও তার হত এক কুকুর-বেড়ালের জীবন । চাকর-বাকরের জীবন । অথবা কোনও অসামাজিক জীবন । তাকে এমন একটা সুস্থ সুন্দর জীবন দেওয়ার জন্য সে যে কৃতজ্ঞতায় ক্রীতদাস হয়ে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক । আর গরিব কেরানির মেয়ে অলকাও কি ভেবেছিল এ রকম একটা সচ্ছল ঘর বর সংসার পাবে ? তা হলে ?

শিবসুন্দরের গলা দিয়ে গর্জন বেরিয়ে এল, চোপ । তোমার মনেও ওই ভাবনা রয়ে গেছে ! ছিহ্ । ওই ভাবনা রয়ে গেছে বলেই কি নিঃসঙ্গ শিবসুন্দর ?

শিবসুন্দর স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন । এ কোথায় এসে পড়েছেন তিনি ! সাঁকো পেরিয়ে শ্মশানের দিকে হাঁটতে চাওয়া মন তাঁকে ছুটিয়ে এনেছে পোড়ো রাজবাড়িটার সামনে । একদম সামনে । ঝোপজঙ্গল ইটপাথর হাঁ হাঁ করছে । এখানে কেন তিনি ?

সহসা বুকে এক প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করলেন শিবসুন্দর । একশোটা নেকড়ে এক সঙ্গে আঁচড় টানছে হৃৎপিণ্ডে । ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে ভেতরটা । মাথার ওপর নীল আকাশ পলকে ধূসর, পলকে পাঁশুটে, পলকে কালো । কে যেন হাতের মুঠোয় চেপে নিবিয়ে দিচ্ছে শেষবেলার সূর্যকে ।

শিবসুন্দর নিস্পন্দ হয়ে গেলেন । ঘামছেন । সশব্দে ছোটাছুটি করছে নিশ্বাস । শরীরে আর শক্তি নেই, ধপ করে বসে পড়লেন মাটিতে । কান বুজে গেছে সম্পূর্ণ, তার মধ্যেই একটা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন । বহু দূর থেকে বেল বাজছে, তৈরি হও শিবসুন্দর, আমি এসে গেছি ।

হার্ট অ্যাটাকের সমস্ত উপসর্গ শিবসুন্দরের মুখস্থ, কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক এই এ তো কোনও বইতে লেখা নেই ! মৃত্যু কি এরকমই চরম অন্ধকার !

শিবসুন্দর মাটি খামচে ধরলেন । এক দলা ঘাস উঠে এল মুঠোয় । একটু যেন হালকা হল বুকটা । হা হা করে নিশ্বাস নিচ্ছেন । নেকড়ের আঁচড়ও কমে এল ক্রমশ । একটু একটু করে আলো ফুটছে ।

এক দল ছেলে আসছে আলপথ বেয়ে । মাটিতে ওভাবে শিবসুন্দরকে বসে থাকতে দেখে দৌড়ে কাছে এল,—কী হয়েছে ডাক্তারবাবু ? কী হয়েছে ডাক্তারবাবু ?

শিবসুন্দর ছেলেগুলোকে চিনতে পারলেন । মুসলমানপাড়ার ছেলে । ইয়াসিন, খালেক, মইদুল...

—শরীর খারাপ লাগছে ডাক্তারবাবু ?

—বাড়ির কাউকে ডাকব ?

—কাকে আবার ডাকবি ? ধর ধর, ডাক্তারবাবুকে তোল ।

—এই ইয়াসিন, একটু পানি নিয়ে আয় না ।

শিবসুন্দর হাত তুলে থামালেন ছেলেগুলোকে । কষ্ট করে হাসির মতো কিছু একটা ফোটালেন ঠোঁটে,—আমি ঠিক আছি । একটু বসে আছি ।

ছেলেগুলোর চোখ থেকে তবু যেন সংশয় যায় না। কেমনভাবে যেন দেখছে শিবসুন্দরকে।

শিবসুন্দরের অস্বস্তি হচ্ছিল। কথাটা যদি এখন তুফান অলকার কানে ওঠে, ওরা কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে। সত্যি তো এই মুহূর্তে আর তত কষ্ট নেই, তবে কেন শুধু শুধু মানুষকে বিব্রত করা ?

মোচড়ানো ফুসফুসে অনেকটা বাতাস ভরে নিলেন শিবসুন্দর। বললেন,—আরে বাবা, কিচ্ছু হয়নি আমার। এমনিই মাটিতে বসে ছিলাম। ডাক্তার বলে কি আমার একটু ঘাসের ওপর বসতে ইচ্ছে করে না ?...তা তোমরা দল বেঁধে চলেছ কোথায় ?

ইয়াসিনরা হইহই করে উঠল,—কাল কলকাতায় মিটিং আছে, দিল্লিতে বন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে তার প্রতিবাদে...

—সে তো কাল। শিবসুন্দর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। পা দুটো কাঁপছে, ভারী পাতা দিয়ে চেপে আছেন মাটি,—কী কাণ্ড ! এখন থেকেই তোমরা রওনা হবে নাকি ?

—আমরা এখন সোমেনদার কাছে যাচ্ছি। সন্ধেবেলা রামনগরে পার্টি অফিসে মিটিং আছে। কাল কখন বেরোনো হবে, কোথায় জড়ো হবে সবাই...

—ও।

শিবসুন্দর বাড়ির পথে এগোলেন। হাঁটছেন। ধীরে, পা টিপে টিপে। যুবকের দল কথা বলতে বলতে মিলিয়ে যাচ্ছে, শিবসুন্দর বারেক তাকালেন সেদিকে। একটু আগের সর্বনাশা অনুভূতি থেকে ফেরাতে চাইলেন মনটা। কত কিছু ঘটে চলেছে পৃথিবীতে। কোথাও বন্ধু সরকার, কোথাও শত্রু সরকার, কোথাও বিক্ষোভ, কোথাও মিলন। গোটা দুনিয়ার রাজনীতিতেই কত ছবি উল্টেপাল্টে গেল। পূর্ব ইউরোপে একের পর এক কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে পড়ছে, আমেরিকান মিলিটারি আক্রমণ করল পানামা, রাশিয়ান সেনা চেকোস্লোভাকিয়া থেকে দেশের পথে রওনা হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মুক্তি পেল নেলসন ম্যান্ডেলা, ঝুরঝুর খসে পড়ছে বার্লিনের দেওয়াল, পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানি এক হতে চলেছে—সব খবরই রাখেন শিবসুন্দর, অথচ কোনও ঘটনাই সে ভাবে স্পর্শ করে না তাঁকে। এই বিচ্ছিন্নতাও কি এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা নয় !

সাঁকো পেরোলেন শিবসুন্দর। বাড়ি এত দূর !

গেটের সামনে লোক দাঁড়িয়ে। দুধগঞ্জের হারান। শিবসুন্দর শ্রান্ত চোখে তাকালেন,—কী ?

হারান হাত কচলাল,—মেয়ের খবরটা দিতে এসছিলাম ডাক্তারবাবু। জ্বর আর নাই। বেদনা কমে গেছে।

—জলবসন্ত আর ক'দিন থাকে !...মামড়ি ওঠা শুরু হয়েছে ?

—হয়েছে ডাক্তারবাবু। শুকাচ্ছে।

—এই সময়টা সাবধান। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। মেয়েকে সারাক্ষণ মশারির মধ্যে রেখো। পায়ে পায়ে দাওয়ায় উঠলেন শিবসুন্দর। জোরে জোরে দম নিলেন,—নখ দিয়ে যেন না চুলকোয়, নিমডাল বুলোতে বোলো।

—খাবে কী ডাক্তারবাবু ?...মেয়ের তো খুব ক্ষিধে।

প্রোটিন ডায়েট। বলতে গিয়ে থেমে গেলেন শিবসুন্দর। বইয়ের কথা গ্রামদেশে চলে না, অন্তত হারানদের মতো গরিব চাষিদের ঘরে তো না-ই। বললেন,—যা মেয়ের ভাল লাগে তাই দিয়ো। পারলে একটু মুসুর ডাল সেদ্ধ, চারা মাছ...

—মাছ দেব ? লোকে যে বলে...

—হ্যাঁ দেবে। আমি তো বলছি। কুসংস্কারকেই যেন ধমকে উঠলেন শিবসুন্দর। আড়চোখে তুফানদের ঘরের দিকে তাকালেন একবার। আলগাভাবে আগল টানা। অলকা কাছেপিঠে কোথাও গেছে বোধহয়।

শিথিল পায়ে দোতলায় উঠছেন শিবসুন্দর। রেলিঙ ধরে ধরে সিঁড়ি ভাঙছেন। ঘরে পৌঁছে পায়ের জোর নিঃশেষ। মশারি তুলে শুয়ে পড়লেন মনোরমার পাশে। আলগা হাতে ছুঁলেন

স্ত্রীকে। নাহ, এখনই মরা চলবে না। মনোরমা যদি... !

শিবসুন্দরের চোখ বুজে এল। একবার শুধু মনে হল, পাখাটা চললে বেশ হত। কখন যেন একটা আলগা স্বপ্ন নেমে এল চোখে। কাঁসাই-এর ধারে হাঁটছেন দুজনে। হাওয়ায় উড়ছে যুবতী মনোরমার কেশরাশি, আঁচল পতপত নাচছে, গুনগুন গান গাইছেন মনোরমা। হঠাৎ এক কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল চতুর্দিক, আঁধারে ছেয়ে গেল পৃথিবী।

শিবসুন্দর স্বপ্নের মধ্যেও চিনতে পারলেন মেঘটাকে। মৃত্যু।

ঘুম ভেঙে গেছে। নিঃসাড়ে শুয়ে আছেন শিবসুন্দর। ভাবছেন। পরজন্মেও কি মনোরমা তাঁর স্ত্রী হবে ? ইশ, কেন যে পরজন্মে বিশ্বাস নেই শিবসুন্দরের !

তুফানের ডাকে সংবিৎ ফিরল,—অসময়ে শুয়ে আছ কেন ? নিশ্চয়ই শরীর খারাপ ?

শিবসুন্দর উঠে বসে চোখ রগড়ালেন,—গাটা একটু ম্যাজ ম্যাজ করছিল রে। শুলাম, চোখটা কখন জড়িয়ে এল।

—কেন লুকোচ্ছ বাবা ? তোমার চোখ মুখ ভাল লাগছে না। তুফানের চোখ মশারির জালে সাঁটা,—বাইরে এসো তো, প্রেশারটা মাপি।

—পাকামি করিস না। বাজে কটা ? রাতের খাওয়া-দাওয়া হবে না ?

—অলকা তো কখন থেকে বাবা বাবা করে ডাকছে। সাড়া না পেয়ে আমিই উঠে এলাম।

—যা। আমি আসছি।

তুফান তবু দাঁড়িয়ে। চোখ সরু, সন্দিগ্ধ।

শিবসুন্দর চোখ সরিয়ে নিলেন,—এক কাজ কর, অলকাকে তোর মা'র খাবারটা দিয়ে যেতে বল। তোর মাকে খাইয়ে আমি আসছি।

মনোরমাকে খাওয়ানোর পালা সাঙ্গ করে একটুক্ষণ ভাবলেন শিবসুন্দর। বুকের চিনচিন ভাবটা আর নেই, আবার সিঁড়ি ভাঙাটা কি খুব বিপজ্জনক হয়ে যাবে ? মনে হয় না। নিশ্বাসের কষ্টটাও তো চলে গেছে। হয়তো সত্যিই তেমন কিছু হয়নি। দুপুরে চিংড়িমাছ রেঁধেছিল অলকা, হয়তো তাই খেয়ে বায়ু ধাক্কা মেরেছে হৃৎপিণ্ডে। বরং নীচে না নামলে তুফানের সন্দেহ বাড়বে আরও। ঘাবড়ে গিয়ে শুভকে খবর পাঠিয়ে দেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

সাবধানী পায়ে নামলেন শিবসুন্দর। খাচ্ছেন। দুধ রুটি।

তখনই অলকা কথাটা তুলল,—বাবা, মায়ার জন্য সত্যিই কি কিছু করা যায় না ?

—কী করব ?

—মেয়েটা যা বলছিল...যদি দাদার ওখানে কিছু করে দেওয়া যায়। ও তো কাজকর্ম জানে না, তা নয়। ট্রেনিং আছে, অভিজ্ঞতা আছে...

—এক কথা আমাকে কেন বারবার বলছ ? জানোই তো নার্সিংহোমের ব্যাপারে শুভকে আমি রিকোয়েস্ট করতে পারব না। একটা দুটো রুগী পাঠাই, শুভও তাদের কাছ থেকে পুরো টাকা নিতে পারে না, তাতেই আমার কী খারাপ লাগে।

তুফান খাওয়া থামিয়ে কঠোর চোখে তাকিয়ে আছে অলকার দিকে। অলকা তেমন গ্রাহ্য করল না। বলল,—মেয়েটা সত্যিই কিন্তু খুব বিপদে পড়েছে বাবা। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পর কাঁদছিল।

শিবসুন্দর বিস্মিত হলেন,—কী বিপদ ?

—কয়েকটা ছেলে ওকে খুব উত্যক্ত করছে। রামনগরের। হেলাবটতলায় স্টেশনারি দোকানটা আছে, তার সামনে আড্ডা মারে ছেলেগুলো। ওদের মধ্যে একজন তো কোয়ার্টারেও হানা দিয়েছিল। রাত্তিরবেলায়...মদ খেয়ে...বেচারা একা কোয়ার্টারে একটা বুড়িকে নিয়ে থাকে, সে আবার রাতের বেলা কেমন জবুথবু মেরে যায়...

তুফানের চোখ ঝলসে উঠল,—তুমি তো আমাকে আগে এ কথা বলোনি ? কোন ছেলেটা ? মায়া

নাম বলেছে ?

—তুমি জেনে কী করবে ? মাথা-গরম মানুষ !

—কেটে রেখে দেব। পুঁতে ফেলব। মেয়েছেলের পেছনে লাগা ! বিদেশ বিভুঁইয়ে একা থাকে...। ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে তুফান,—আমি কালই সোমেনকে বলছি। এ সব কী ইল্লুতেপনা হচ্ছে !

—দেখেছেন তো বাবা কেন একে বলি না ?

শিবসুন্দর প্রমাদ গুনলেন। হাত তুলে বললেন,—ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়। তুমি বরং মেয়েটাকে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা করতে বলো।

—কিচ্ছু করতে হবে না বাবা। মায়া এখানেই চাকরি করবে। আমরা কি সব মরে গেছি !

শিবসুন্দরের বুকটা আবার একটু চিনচিন করে উঠল। তুফানগঞ্জে শুনেছিলেন তুফানের বাবা নাকি জমি নিয়ে কার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে গিয়ে মারা যায়। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তুফানের মা'ও জখম হয়েছিল জোর। তুফানগঞ্জের হেলথ সেন্টারে সেও...। বাবার গরম রক্ত কি ছেলের মধ্যে বইছে এখনও ! এত কাল পরেও !

শিবসুন্দর তুফানকে শান্ত করতে চাইলেন। আলগা হেসে বললেন,—তোর তো দেখি খুব তেজ বেড়েছে রে ! আমার ছেলে হয়েও এত রগচটা হলি কী করে বল তো ? বয়স বাড়ছে, না কমছে ?

তুফান মিইয়ে গেল। অপ্রস্তুত মুখে হাসছে।

টুকি খিলখিল হেসে উঠল,—আরও বকো বাবাকে। আরও বকো।

শিবসুন্দরও হাসছেন,—কেন রে বেটি ?

—বাবা বিকেলে হাটে গেল, আমাকে নিয়ে গেল না।

হাসিঠাট্টায় প্রসঙ্গটা তখনকার মতো চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চিন্তাটা রয়েই গেল শিবসুন্দরের। অত রাগী চোখ ভাল নয়।

৫৪

সূর্য সবে জেগেছে। এরই মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশ প্রাণচঞ্চল। কাঠের ছাতার নীচে বসে গায়ে তেল ডলছে ইয়া গুম্ফধারী দুই উত্তরপ্রদেশি। একটি রাজস্থানি পরিবার নেমে গেল জলে, কর্তা-গিন্নি বালবাচ্চা সমেত। তিন বাঙালি বিধবা গামছা কাঁধে বসে আছে ধাপিতে। এক মাদ্রাজি বৃদ্ধ স্নান সেরে নিবিষ্ট মনে কপালে ফোঁটা কাটছে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তোত্র পাঠ করছে কয়েকজন। খানিক দূরে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ এক কৌপিনধারী সন্ন্যাসী। একজন মাথা পায়ে ঢুকিয়ে বসেছে হটযোগে। তিন-চারটে সাধু একটা নোংরা বোঁচকা খুলে কি যেন ঘাঁটছে। উত্তরবাহিনী গঙ্গার মধ্যিখান দিয়ে দুলতে দুলতে এগোচ্ছে এক বজরা, গেরুয়া জল সোনালি হয়ে কাঁপছে তিরতির। বজরার চালে বসে জনাকয়েক বিদেশি বিদেশিনী ছবি তুলছে মুভিতে। নিষেধ জেনেও।

আদিত্য পাতলা চাদরটা গায়ে সাপটে উঠে দাঁড়াল। কাশীতে শীত এখন প্রায় নেইই, তবু ভোরবেলা গঙ্গার ধারে গা বেশ সিরসির করে, চাদর জড়ালে ভারি মিঠে আমেজ আসে একটা। উঠতে ইচ্ছে করে না আদিত্যর, কিন্তু উঠতেই হয়। তার হাতে এখন অনেক কাজ। গরম গরম মালাই-চা খেয়ে জিলিপির পাহাড় নিয়ে ফিরতে হবে হলিডে হোমে। ইরাদি মীরাদিরা এতক্ষণে জলখাবারের আয়োজন শুরু করে দিয়েছে। স্টোভ জ্বেলে, ময়দা মেখে, আলু কুটে রেডি। বাথরুম আর জলখাবারের পাট চুকিয়েই থলি হাতে বেরিয়ে পড়বে আদিত্য। হলিডে হোমের বাচ্চা চাকরটাকে দিয়েই বাজার সেরে ফেলা যায়, কিন্তু জামাই না করলে উমার মন ওঠে না। আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে বাজার না এসে পড়লে আদিত্যর শাশুড়ি আর মাসিশাশুড়ি উতলা হয়ে পড়েন খুব। রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি শেষ না হলে কোথাও বেরোনোর প্রোগ্রামও করা যায় না।

শাশুড়িদের এই কাজটুকু করে দিতে পারলে আদিত্য অনেকটা ঝাড়া হাত-পা।

ঘাটের লাগোয়া চা-দোকান। উনুনে আঁচ পড়ে গেছে বহুক্ষণ, অতিকায় এক কড়াইয়ে দুধ জ্বাল চলছে। শব্দ উঠছে বগবগ।

আদিত্য বাইরের বেঞ্চিতে বসে হাঁক পাড়ল,—চা লাগাও ভাই।

সাত দিনেই আদিত্যকে চিনে গেছে দোকানদার। হেসে বলল,—মালাইঅলা চা তো?

—হাঁ। জাদা মালাইদার।

—সামোসা লিবেন? ইয়া নমকিন?

—না না, তুমহারা নিমকি বহুত ঠাণ্ডা হ্যায়। বাসি। কাল খেয়ে অম্বল হয়ে গেছিল।

—তো সামোসাই লিন। বিলকুল গরম আছে।

প্যালোয়ান চেহারার দোকান-মালিক হুকুম ছুঁড়ছে বালক কর্মচারীকে। আদিত্য উদাস চোখে গঙ্গার দিকে তাকাল। রামনগর রাজবাড়ি এখনও আবছা। আলো পড়ে জল থেকে একটা ভাপ উঠছে। কলকাতার গঙ্গাতেও কি এ রকম ওঠে? দেখা হয়নি কোনওদিন। কাশীতে এসে ভোরে ওঠার অভ্যেস হয়েছে। কলকাতা ফিরেও অভ্যেসটা বজায় রাখতে হবে। ভোরবেলা একদিন ঘুরে আসবে বাবুঘাট থেকে। নিশ্চয়ই মন্দ লাগবে না।

চা-সিঙাড়া এসে গেছে। গ্লাসে চুমুক দিল আদিত্য। আহ্ সুখ! গায়ের কাছেই গেরুয়া পরা এক শ্মশ্রুগুম্ফধারী লোক, কেমন চোখে যেন দেখছে আদিত্যকে। নির্ঘাত হাত পাতবে।

আদিত্য বিরক্ত মুখে বলল,—কেয়া মাংতা ভাই?

দাড়িঅলা মুখ হাসিতে ভরে গেল,—তুই আদিত্য না?...আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি পরিতোষ।

আদিত্য হাঁ করে তাকিয়ে।

—সেই যে রে, রামচন্দ্র স্কুলে পড়তাম...মনে পড়ছে না? তুই আমি আর শোভন রোজ টিফিনে...

হাত থেকে চা চলকে গেল আদিত্যর। তাদের ক্লাসের সব চেয়ে বখাটে ছেলেকে এই চেহারায় দেখবে, এ কি ভাবা যায়! টিফিনে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখার পাণ্ডা, বন্ধুদের বিড়ি সিগারেটের দীক্ষাগুরু কিনা গেরুয়া পরে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে!

আদিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,—তুই সাধু হলি কবে?

এ দিক ও দিক তাকিয়ে বেঞ্চিতে বসল পরিতোষ,—ধুস, সাধু হব কেন? আমি তো এখানে চাকরি করি। রেলে।...রোববার রোববার সকালে এসে বসি এখানে। রামচরিত মানস পড়ি। দু চারটে ভক্ত আসে, শোনে, প্রণামীটনামি দেয়।

—তাই বল। তুই তা হলে বদলাসনি! আদিত্য চোখ টিপল।

—মানুষ কি আর বদলায় রে! সময় খোলসটাকে নিয়েই যা একটু...তা তুই এখানে উঠেছিস কোথায়?

—কাছেই একটা চা কোম্পানির হলিডে হোমে। ওই হরসুন্দরী ধর্মশালার পাশে।

—উইথ ফ্যামিলি?

—ওই এক রকম। বউ আর ছেলেমেয়ে ছাড়া। পরিতোষকে কথার চালে একটু অবাক করে দিয়ে মজা পেল আদিত্য। হাসতে হাসতে বলল,—শ্বশুর শাশুড়ি মাসিশাশুড়ি, দুই বয়স্কা শালী...

পরিতোষ ঘাটের দিকে তাকিয়ে উসখুস করছে। উঠে দাঁড়াল,—আমার লোকজন আসতে শুরু করেছে রে। চলি।...বিকেলে কি করছিস? চলে আয় না আমার বাড়ি। সোনেপুরায়।

আদিত্য নাক কুঁচকোল,—আজ বোধহয় হবে না রে। আজ একবার সকলকে নিয়ে সারনাথ যাওয়ার কথা আছে।

—কাল আয়। অফিস থেকে ফেরার পথে আমি পাঁড়ে ধর্মশালার সামনে ওয়েট করব। চিনিস তো?

—হ্যাঁ। চিনি। কটায় ?

—ছটা-স্যাড়ে ছটায়। দু পা এগিয়ে দাঁড়াল পরিতোষ,—আসিস কিন্তু। কত কথা যে জমে আছে। বন্ধুবান্ধব সব কোথায় বিছড়ে গেল...

পরিতোষ খাড়া হেঁটে একটা ছাতার তলায় গিয়ে বসল। পাঁচ-ছজন মহিলা পুরুষ প্রণাম করছে, পরিতোষ অস্বস্তিভরা চোখে আদিত্যর দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটিমিটি। আদিত্যও দেখছিল পরিতোষকে। এ জীবনটা মন্দ না। বেশ কেমন বন্ধনহীন বন্ধনহীন ভাব। পরিতোষ কি বিয়ে করেছে ? মনে হয় না। সংসারী মানুষ কি এভাবে হুট করে এসে গঙ্গার ধারে রামায়ণ খুলে বসে পড়তে পারে ? আদিত্য পারবে ? পারলে বোধহয় ভালই হত। তাও দু-চার পয়সা বাঁধা রোজগার থাকত।

বেলা বাড়ছে। ঘাটেও ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। আদিত্য জিলিপির ঠোঙা নিয়ে উঠে পড়ল। হলিডে হোমে ফিরে দেখল ছোটখাট এক বিভ্রাট ঘটে গেছে। ইন্দ্রাণীর বেলামাসি ঘুমচোখে বাথরুমে যেতে গিয়ে পা মুচকে বসে আছেন, তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন উমা-ধীরাজ। আজকের মতো সারনাথ যাওয়ার দফা রফা।

আদিত্যর আফসোস হচ্ছিল। আগে জানলে আজ বিকেলেই পরিতোষের সঙ্গে চরকি মারা যেত ! কোনও মানে হয় ! এখন এদিক ওদিক ঘুরেফিরেই কাটাতে হবে বিকেলটা। একা একা একটু নৌকো চড়ে এলে কেমন হয় ! শ্বশুরমশাইয়ের জলে বড় ভয়, রামনগরের রাজবাড়ির দিকে এখনও যাওয়া হয়নি। দেখা যাক। দেখা যাক।

হলিডে হোমে দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে। এক ঘরে উমা ধীরাজ আর আদিত্য, অন্য ঘরে বেলামাসি ইরাদি মীরাদি। বেলা উমার আপন বোন নন, জ্যাঠতুতো দিদি। বিধবা। ইরা মীরা তাঁরই ভাসুরের মেয়ে। দুজনেরই পঞ্চাশের ওপর বয়স, দেখতে একটু বেশি লম্বা চওড়া বলে দুই বোনের কারুরই বিয়ে হয়নি। ইরা এক প্রাইমারি স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, মীরা রাইটার্সের সেকশান অফিসার। দুজনের চোখেই পৃথিবীর তাবৎ পুরুষমানুষ অপদার্থ। নেহাত ইনুর বর বলে আদিত্যকে খানিকটা ক্ষমাঘেন্না করে চলে তারা।

ধীরাজ স্থানীয় একটা ইংরিজি কাগজ উল্টোচ্ছেন। আদিত্য বাথরুম সেরে খাটে ফিরতেই জলখাবার হাতে ইরা হাজির,—কি গো, তুমি শুয়ে পড়ছ কেন ? বাজার যাবে না ?

আদিত্য আড়মোড়া ভাঙল,—তাড়া কিসের দিদি ? আজ তো আর বেরোনো নেই।

—কেন ? আমরা তো বেরোতে পারি। কাকিমারা বাড়ি থাক, তুমি আমি আর মীরা সারনাথ ঘুরে আসতে পারি।

আদিত্যর আলস্য কেটে গেল। এই আশঙ্কার কথাটা তার মাথায় আসেনি। অথচ আসা উচিত ছিল। বুধবার চুনার যাওয়া হল, বেশি হাঁটাহাঁটি করতে হবে বলে ধীরাজ উমা আর বেলা থেকে গেলেন ডেরায়, এই দুই মহিলাকে নিয়ে ছুটতে হয়েছিল আদিত্যকে। বাপস, সে কী যন্ত্রণা ! অত সুন্দর একটা দুর্গ, তিন দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা, সেদিকে দু বোনের নজর নেই, অবিরাম শুধু প্রশ্নবাণ আর প্রশ্নবাণ। বলো তো এই ফোর্ট প্রথম কে তৈরি করেছিল ! তারপর কার হাতে আসে ! তারপর কার হাতে আসে ! আরে বাবা আদিত্য যদি অতই জানত, তাহলে কি আর বাপ্পা তিতিরের ইতিহাস ভূগোলের টিউটর লাগত ! সারনাথ নিয়ে গিয়ে আদিত্যকে বোধহয় গেঁথেই ফেলবে দুই প্রৌঢ়া শ্যালিকা। আচ্ছা, সারনাথ কি বুদ্ধের জন্মস্থান ? উঁহু, অন্য কি একটা কাজে যেন এসেছিলেন বুদ্ধ। কী কাজ ? কী কাজ ? দুর ছাই।

আদিত্য কাতর মুখে বলল,—বেলামাসিকে ছেড়ে যাব ? ওঁর সারনাথ দেখার এত শখ !

—কাকিমাদের নিয়ে নয় আর এক দিন যাবে। বেড়াতে এসে চুপচাপ বসে থাকার কোনও মানেই হয় না।

বসে আছে, না ঘেঁচু ! ফাঁক পেলেই দিনে সাত বার করে বিশ্বনাথের মন্দিরে ছুটছে !

আদিত্য হাসি হাসি মুখে বলল,—আজ আর কাল দুটো দিন নয় দেখি। পরশুও যদি বেলামাসি সুস্থ না হন...

ধীরাজ ফস করে বলে উঠলেন,—অত ছুটোছুটি করারই বা কী আছে ? দুটো দিন জিরোও না। আমারও আজ গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

আদিত্য টুক করে বলে উঠল,—আপনারা আজ বরং বিড়লা মন্দিরটা ঘুরে আসুন। রাজুকে বলে দিচ্ছি, ও বিকেলে আপনাদের রিকশা ডেকে দেবে।

ইরা কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। শ্বশুরমশাইকে মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে লুচি ছিঁড়ল আদিত্য। প্রশ্ন করার জন্যই প্রশ্ন করল,—আপনার জন্য আজ কী আনব বাবা ?

—যা ভাল বোঝো এনো। তুমি হলে গিয়ে এখন আমাদের গার্জেন।

—তবু আপনার কী খেতে সাধ যায় ?

—বেগুন আনতে পার। কাশীর বেগুন খুব ভাল।

—সে তো আনবই। মাছ কী খাবেন ?

—ছোট ছোট পুঁটি কি পাওয়া যাবে এখানে ?

আদিত্য একটু বিপাকে পড়ল। জন্মে কোনওদিন বাজারে যায়নি সে, রুই কাতলা ইলিশ চিংড়ির বাইরে অন্য কোনও কাঁচা মাছ সে চেনেই না। তবু ভারিক্কি চালটা বজায় রাখল,—দেখি, পেলে আনব।

ধীরাজ কাগজ মুড়ে পাশে রাখলেন,—আচ্ছা বাবা, তোমাকে ক'দিন ধরেই একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি, রোজই ভুলে যাই।

—কী বলুন তো ?

—তোমাদের বাড়ি তো ভাঙা পড়ছে, যদ্দিন না নতুন বাড়ি হয় তদ্দিন তোমরা থাকবে কোথায় ?

উমা থলি হাতে ঘরে ঢুকলেন। প্রশ্নের শেষ অংশ তাঁর কানে গেছে। বললেন,—মাঠে থাকবে। গাছতলায়। হল তো ?

—যাহ্, এক বছর ধরে গাছতলায় থাকবে ? অত মালপত্র নিয়ে ? ওদের বাড়ির ওদিকে তো তেমন মাঠও দেখিনি !

আদিত্য হেসে ফেলল,—না বাবা। মা আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। আমরা তদ্দিন বাড়ি ভাড়া করে থাকব।

—তাই বলো। ধীরাজ নিশ্চিন্ত। জানলার ওপারে খানিকটা ফাঁকা জমি। ঘেরা। ব্যায়ামের আখড়া। দশ-বারো জন ডন বৈঠক করছে সেখানে। ঝুরোমাটিতে কুস্তি লড়ছে দুই পালোয়ান। কয়েক জন মুগুর ভাঁজছে। সে দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন ধীরাজ।

উমার সঙ্গে অন্য ঘরে উঠে এল আদিত্য। বেলামাসি আধশোয়া হয়ে কোঁকাচ্ছেন। মীরা কোমরের ব্যথায় ভোগে, হটওয়াটার ব্যাগ রাখে সঙ্গে। গরম জল ভরছে সেই ব্যাগে।

আদিত্য বলল,—আপনার জন্য একটা মলম আনব মাসি ?

—কি মলম ?

—আয়ুর্বেদিক। দু-তিনবার লাগালেই যন্ত্রণা একদম কমে যাবে।

—এনো। বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে অচল হয়ে পড়লে যে কী বিশ্রী লাগে !

সাধ্য মতো পরিপাটি বাজার সেরে দশটা নাগাদ ফিরল আদিত্য। আজ মেয়েদের কারও গঙ্গাস্নানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই, আদিত্য নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। ইন্দ্রাণীকে পৌঁছনো সংবাদ লেখা চিঠিটা ক'দিন ধরেই পকেটে পকেটে ঘুরছে, মনে করে পোস্টবক্সে ফেলল। তারপর আর কাজ নেই। প্রাণের সুখে টোটো করে বেড়াও। এ শহর তার সম্পূর্ণ অচেনা নয়, কলেজে পড়ার সময়ে চার বন্ধু হরিদ্বার দেরাদুন মুসৌরি বেড়াতে গিয়েছিল, ফেরার পথে ব্রেক জার্নি করে নেমেছিল এখানে। ছিল দিন তিনেক। ধর্মশালায়। তখন সে ছিল মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীন, অথচ

তেমনভাবে তখন ঘোরা হয়নি শহরটা। তাদের দলপতি হিতেশ ছিল মহা তাস্যাড়ু। সারাদিন ধর্মশালার ঘরে বসে তাস খেলত। আদিত্যরও নেশা ধরেছিল খুব, সেও মহানন্দে স্বেচ্ছাবন্দি সারাদিন। এবার বুড়োবুড়িদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েও আদিত্য অনেক খোলামেলা রয়েছে। কী খাওয়া হবে, কোথায় যাওয়া হবে, সব কিছু নিয়েই ধীরাজ উমা তার সঙ্গে পরামর্শ করেন, তাকে মান্য করেন, তার ওপর নির্ভর করেন, এতেই বুকটা ভারি হালকা লাগে আদিত্যর। কেউ নির্ভর করছে ভাবলে কি মুক্তির স্বাদ বাড়ে ? জীবনে একটি বারের জন্য যদি বুঝতে পারত ইন্দ্রাণী তার ওপর নির্ভর করতে চায়, তা হলে কি তার জীবনের চেহারাটা এমন হত !

আদিত্য ভেবে পায় না। ভাবতে ভালও লাগে না তার। ইন্দ্রাণীর ওপর অভিমান, বাবার মৃত্যুর আঘাত, কটা দিন তাকে নিশ্চেতন করে রেখেছিল। সে দশা কেটে গেছে অনেকটাই। ইন্দ্রাণীর স্পর্শেই এত জাদু ! হঠাৎ সে রাতে ইন্দ্রাণী যেন গহীন এক খাদ থেকে আলোয় উঠিয়ে নিয়ে এল আদিত্যকে।

এটা কি স্থায়ী হতে পারে না !

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাদা ছড়াচ্ছে বাবা বিশ্বনাথের ষাঁড়। নিস্পৃহ চোখে দেখছে আদিত্য। দুটো দেহাতি লোক কি নিয়ে যেন হাতাহাতি করছে রাস্তায়। নিরুত্তাপ চোখে দেখছে আদিত্য। হাঁটছে। দেখছে। হাঁটছে। এলোমেলো রাস্তা বেয়ে ঢুকে পড়ছে অন্ধকার গলিতে। কোনও এক নির্জন ঘাটে গিয়ে বসে আছে চুপচাপ।

সকাল গড়িয়ে দুপুর। মাথার ওপর ঠাঠা সূর্য।

ফেরা। ক্লান্ত ফেরা। অবসন্ন ফেরা।

বিকেলে একটা ছোট্ট নাটক ঘটে গেল। নাটক, না দুর্ঘটনা তাও ঠিক বুঝতে পারল না আদিত্য।

বিকেলে উমা ধীরাজকে নিয়ে বেরিয়েছিল। এমনিই হাঁটা। কেদার ঘাটে গিয়ে বসে ছিল তিনজনে। ঘাটটা নিরিবিলি। পুণ্যার্থী ভ্রমণার্থীর ভিড় বিশেষ নেই। ঘাটের ধারে বাঁধা এক নৌকো, মাঝিবিহীন। এক সন্ন্যাসী পিছন ফিরে স্নান করছে নদীতে, উঠছেই না। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল।

তিনজনে কথা বলছিল টুকটাক। অসংলগ্ন কথা। অদরকারি কথা। সংসারের কথা। ছেলেমেয়ের কথা। আদিত্য মাঝেমাঝেই অন্যমনস্ক। নাকি দূরমনস্ক ?

আলো কমে আসছিল।

হঠাৎই উমার বাগরোধ হয়ে গেল। আচম্বিতে দৃষ্টি স্থির। পরক্ষণেই বিস্ফারিত চোখে চিৎকার করে উঠেছেন,—ও কে ? ও কে আদিত্য ?

আদিত্য ঘুরে দেখল সাধুটি জল থেকে উঠে গা মুছছে। খানিকটা নীচে দাঁড়িয়ে। অবাক মুখে বলল,—কার কথা বলছেন ?

—ওই যে ও ! ও তো তনু। আমার তনু। বলেই উঠে দাঁড়ালেন উমা। কম্পিত স্বরে ডাকলেন,—তনুউ...অ্যাই তনু ?

ধীরাজও চমকে তাকিয়েছেন সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসীর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ঝোলা থেকে শুকনো কাপড় বার করছে।

আদিত্যকে হতচকিত করে দিয়ে উমা দ্রুত ছুটে গেলেন তার দিকে। টলমল পায়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তার দুই বাহু চেপে ধরলেন,—আমায় চিনতে পারছিস না তনু ? আমি তোর মা।

সন্ন্যাসী প্রাণপণে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। পারছে না।

আদিত্য তরতরিয়ে নেমে এল। ভাল করে দেখল সাধুটিকে। একেবারে বাচ্চা। বড় জোর বাপ্পার বয়সী হবে। মুখে একটা তনুর আদল আছে বটে। অনেকটা সেরকমই লম্বাটে মুখ, চওড়া

কপাল, গালভরা দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাদামি চুল।

আদিত্য টেনে সরাতে চাইল উমাকে,—আপনি ভুল করছেন মা। এ তনু হতে যাবে কেন?

—আমার ছেলেকে আমি চিনতে ভুল করব? তনু লক্ষ্মী বাবা, ঘরে ফিরে চল। আমি, তোর বাবা, কত দিন ধরে তোর পথ চেয়ে আছি। ওই যে তোর বাবা, ওই দাঁড়িয়ে। দ্যাখ তোর শোকে কেমন হয়ে গেছে!

ছোকরা সন্ন্যাসী নির্ঘাত অবাঙালি। এক বর্ণ ভাষা বুঝছে না উমার। ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে।

উমা আবার তার হাত আঁকড়ে ধরলেন,—আর আমাদের কষ্ট দিস না তনু। একবার দ্যাখ ভাল করে।

এক বয়স্কা মহিলা তরুণ সাধুর হাত ধরে টানাটানি করছে, সাধু জোর করে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে নিজেকে, এমন দৃশ্যে মাটি ফুঁড়ে ভিড় জমে যায়। গেছেও। কৌতূহলী চোখে দেখছে সকলে। ধীরাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

আদিত্য বিচলিত বোধ করছিল। নিজে অজস্র সিন ক্রিয়েট করেছে জীবনে, কিন্তু এমন দৃশ্য তার পছন্দ নয়। মরিয়া হয়ে ধমক লাগাল,—কী হচ্ছে কি মা! আপনি একটু শান্ত হন। বুঝছেন না, এ তনু হতে পারে না। তনু যদি আজ বেঁচেও থাকে, সে কি আর এমন খোকাটি আছে? তারও তো অ্যাদ্দিনে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে। ছেড়ে দিন ওকে।

ধমকে কাজ হল। সন্ন্যাসীকে ছেড়ে দিয়ে ধাপিতে বসে পড়লেন উমা। দু হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। শরীর কাঁপছে থরথর।

ছোকরা সন্ন্যাসী ছাড়া পেয়েই বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে দৌড় লাগিয়েছে। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে গেল। এক পা এক পা করে নামছেন ধীরাজ। উমার পাশে গিয়ে বসে পড়লেন। আলগা হাত রাখলেন স্ত্রীর মাথায়। মৃদু স্বরে বললেন,—তবে যে বলো তুমি উতলা হও না! তুমি ওকে ভুলে গেছ!

সন্তানহারা বাবা-মা বসে আছেন পাশাপাশি। সূর্য ডুবে এল। ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে ঘাট। গঙ্গার জলে একটা শব্দ হচ্ছিল চাপা। গোঙানির মতো।

হলিডে হোমে ফিরেই উমার ধুম জ্বর। কুটোটি কাটলেন না দাঁতে, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। বেলামাসি ইরাদি মীরাদিরাও শশব্যস্ত। আদিত্যরও চোখে ঘুম নেই সারা রাত। জলপট্টির পর জলপট্টি পাল্টাচ্ছে। পাশে আর এক জন মানুষও নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে শুধু এক উদ্বিগ্ন স্বর শোনা যায়,—কেমন বুঝছ আদিত্য?

সকালে ডাক্তার ডাকতেই হল। ওষুধ ইঞ্জেকশান পড়তে দুপুর নাগাদ নেমে এল জ্বরটা। ঘুমিয়ে পড়লেন উমা।

সন্ধেবেলা পরিতোষের সঙ্গে দেখা করার কথা মনেই রইল না আদিত্যর। ইরা মীরা সেবা করছে বয়স্ক মানুষদের, আদিত্য একা বেরিয়ে পড়ল পথে। ভার বুকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা কখন মণিকর্ণিকার ঘাট।

শ্মশানে আজ শবদেহের লাট লেগে গেছে। স্যার সার জ্বলছে চিতা। লালচে আগুন দুলছে হাওয়ায়। পুটপুট আওয়াজ উঠছে। হঠাৎ হঠাৎ ঠিকরে যাচ্ছে আগুনের ফুলকি। মানুষপোড়া গন্ধে ম ম করছে জায়গাটা।

কেন এখানেই এসে বসল আদিত্য? এই সার সার জ্বলন্ত চিতার মাঝে? আদিত্য জানে না। অসাড় মনে বসে আছে শুধু। তনুময় কি সত্যিই বেঁচে আছে? বেঁচেই যদি থাকে, এই আঠেরো বছরে একটাও কি খবর পাঠাত না? কেন চলে গিয়েছিল তনুময়? শুধুই রাজনৈতিক ব্যর্থতার যন্ত্রণা! এ কেমন ধরনের স্বার্থপরতা! বাবা-মা'র কথাও একবারও মনে পড়ে না!

তনুময়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিল আদিত্য। আশ্চর্য, তনুময়ের মুখ ভাবতে গেলে বাপ্পার মুখ চোখে ভাসে কেন! ওটা কি বাপ্পারই মুখ, নাকি ওটা আদিত্য নিজেই! গুলিয়ে যাচ্ছে, সব

গুলিয়ে যাচ্ছে।

পাশেই ছোট্ট জটলা। এক সাধু কলকে ফাটাচ্ছে, তাকে ঘিরে গুটিকতক চ্যালাচামুণ্ডা। আদিত্য ঝট করে উঠে তাদের পাশে গিয়ে বসল। হাতে হাতে নিঃশব্দে ঘোরা কলকেতে টান লাগিয়েছে জোর। গাঢ় ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে চরকি মারছে মাথায়। কোত্থেকে যেন একটা রাগ কুণ্ডলী পাকাচ্ছে বুকে। তনুময়ের ওপর রাগ। বাপ্পার ওপর রাগ। নিজের ওপর রাগ।

পরপর কয়েকটা টানে মাথা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। গনগনে আগুন সামনে রেখে আদিত্য নিস্পলক বসে আছে। লাল চোখে। রাত বাড়ছিল।

৫৫

সকাল থেকে বেশ গরম পড়েছে আজ। চিড়বিড়ে, শুকনো গরম। তেমন একটা ঘাম হয় না, শুধু তাপেই শরীর ঝলসে যায়। ফাল্গুনের শেষাশেষি ক'দিন খুব মেঘ করেছিল, বৃষ্টিও হয়েছিল দু-তিন দিন। মুষলধারে নয়, আবার একেবারে টিপটিপও নয়। সেই যে মেঘের পাল ঝরে মরে চলে গেল, দু হপ্তা ধরে আকাশও ফুটন্ত কড়াই। সন্ধেবেলা এ শহরে এখন একটা মনোরম বাতাস বওয়ার কথা, সেই দখিনা বাতাসও যে এবার কোথায় গেছে! ছোট ছোট ধুলোর ঘূর্ণি ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, কিন্তু তাতে তাপ কমে কই!

গড়িয়ার চেম্বারে বসে রুগী দেখছিল শুভাশিস। চেম্বার মানে আট বাই আট পার্টিশান করা খুপরি। প্রতিটি খুপরিতে ডাক্তার আর রুগীর জন্য গোটা তিনেক চেয়ার, মাঝারি সাইজের একটা টেবিল। পিছন দিকের রুগী পরীক্ষা করার বেঞ্চি-মতন টেবিল লম্বায় এত ছোট যে হঠাৎ কোনও জবরদস্ত পাঠান এলে প্লাইউডের পার্টিশান সরাতে হবে। ডান দিকের পার্টিশানের ওপারে আজ এক ডারমাটোলজিস্টের বসার দিন, সে রুগী দেখে চলে গেছে বিকেলে। বাঁয়ে জেনারেল ফিজিশিয়ান রতিকান্ত পাইন, তার চেম্বার রুগীতে থিক থিক করছে।

শুভাশিসের আজ পেশেন্টের সংখ্যা মাত্র চার। এই চেম্বারটায় ইদানীং তেমন আর পেশেন্ট হচ্ছে না শুভাশিসের। কোনওদিন তিন, কোনওদিন দুই। সে তুলনায় নর্থের চেম্বার এখনও বেশ পয়মন্ত, ছ' সাতজন তো হয়ই। কিছুদিন ধরেই এই চেম্বারটা উঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছে শুভাশিস। তাতেও সমস্যা। রাতারাতি উঠিয়ে দিলে পশারের ক্ষতি হতে পারে। এক সময়ে দুদিন করে বসত এখানে, বছর খানেক হল কমিয়ে সপ্তাহে একদিন করেছে। এবার পনেরো দিনে একদিন করতে হবে। তারপর মাসে একদিন। তারপর ধীরে ধীরে...

দু নম্বর পেশেন্টের এক্সরে প্লেট ভিউবক্সে মেলে ধরল শুভাশিস। রাজপুরের ডাক্তার অরবিন্দ গুহর পাঠানো কেস। ক্রনিক কোলেসিসটাইটিস। পিত্তাশয়ের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছেন মহিলা। শুভাশিস একবার অপাঙ্গে দেখল মহিলাকে। প্রৌঢ়া বিধবা। নির্ঘাত মাসে আঠাশটা উপোস করার অভ্যেস। কেন যে করা!

ভিউবক্সের বাতি নিবিয়ে মহিলার সঙ্গী যুবকটির মুখোমুখি হল শুভাশিস,— আপনার মা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু।

—বাবা কদ্দিন মারা গেছেন?

—এই জুনে চার বছর হবে।

অর্থাৎ চার বছর হল মাছ মাংস ছেড়েছেন মহিলা। নিশ্চয়ই আমিষ খেতে খুব ভালবাসতেন এক সময়ে। কী যে সংস্কার! অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেওয়া। অস্থিমজ্জায় মিশে যাওয়া অভ্যেস হঠাৎ পালটাতে গেলে শরীর তো তার বদলা নেবেই। কোনও না কোনওভাবে। শুধু শরীর কেন, মনই কি ছাড়ে! তিন মাস ধরে যে অনভ্যস্ত অভ্যাসে রপ্ত হতে চাইছে শুভাশিস, মন কি তার জন্য ছেড়ে কথা বলছে!

শুভাশিস আলট্রাসোনোর ফিলমে চোখ রাখল,— খাওয়ার টাইমের খুব অনিয়ম করেন নিশ্চয়ই ?

মহিলার মুখে অপ্রতিভ হাসি,— সংসারে কাজকর্ম তো থাকেই। ছেলে, ছেলের বউ দুজনে অফিস বেরিয়ে যায়, নাতিটা স্কুল থেকে ফেরে সেই দুটোয়, তারপর তাকে নাইয়ে খাইয়ে...

—তোমাকে কে অতক্ষণ বসে থাকতে বলে মা ? আগে খেয়ে নিলেই পারো।

—আহা, ওইটুকু শিশুর আগে আমি খেয়ে নেব ?

—যত সব ফালতু অজুহাত। কথা না শুনে এখন যে রোগটা বাধিয়ে বসে আছ, তার কী হবে! অপারেশানের ধাক্কা সামলাও এখন।

কঠোর মুখে যুবকটিকে দেখল শুভাশিস। চেম্বারের মধ্যে এই সব কথার চাপান উতোর তার একদম পছন্দ নয়। অপারেশানের ধাক্কা বলতে কী বোঝাতে চায় ছোকরা ? মা'র শরীর নিয়ে ভাবছে, না টাকা ?

ভারী মুখে শুভাশিস প্রশ্ন করল,— ডক্টর গুহ যে ওষুধগুলো দিয়েছিলেন তাতে পেন কমেছে ?

মহিলা সোজা হয়ে বসেছেন,— ব্যথা এখন অনেক কমে গেছে ডাক্তারবাবু। শুধু খাওয়া দাওয়ার পরই যা একটু...

ঝুপ করে আলো নিবে গেল। লোডশেডিং। গরম পড়ার পর থেকেই ঘন ঘন কারেন্ট যাওয়া শুরু হয়েছে। শহরটার আর কোনও উন্নতি হল না, জঙ্গলই রয়ে গেল। মার্চ না ফুরোতেই যদি এই দশা হয়, মে-জুনে কী হবে ?

মৃদু হট্টগোল হচ্ছে বাইরে। রতিকান্তর রুগীদের বৃন্দরব। হঠাৎ আঁধারে নিজেকে কেমন অন্ধ মনে হচ্ছিল শুভাশিসের। হাঁক পাড়ল,— কার্তিক, অ্যাই কার্তিক... ?

কার্তিক এই খুপরিঅলা চেম্বারগুলোর পাহারাদার। সময়মতো খোলে, বন্ধ করে, ঝাড়পোঁছ করে, ছোটখাট ফাইফরমাশও খাটে ডাক্তারদের। সে বাইরে থেকে সাড়া দিল,—আসছি স্যার।

—এসে কী হবে ? জেনারেটার কী হল ?

—স্টার্টিং-এ প্রবলেম হচ্ছে স্যার। দেখছি।

কোনও মানে হয়! গরমে পচে মরো। শুভাশিসের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। পাশের খুপরিতে টুকুস করে আলো জ্বলে উঠেছে। রতিকান্তর এমার্জেন্সি লাইট। নিজস্ব। বেকবাগান ল্যান্সডাউন চেম্বারের মতো এখানেও শুভাশিসের একটা আলো রাখা উচিত ছিল। কেন যে রাখেনি!

রতিকান্ত পাইন গাঁক গাঁক করে কথা বলছে রুগীর সঙ্গে, রাতে কবার পেচ্ছাপ হয় ? ... দুবার ? মাত্র ? ... স্টুলের কালারটা দেখেছেন ? ... হলদেও নয়, ব্ল্যাকও নয়! তার মানে বাদামি। ... ইয়্যাঁ, কালচে বাদামি! ... কব্যার যান দিনে ? ... আম পড়ে ?...

শুভাশিসের মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। পাইনটা চাষাড়েই রয়ে গেল। রুগীর চিকিৎসা করছিস, না পাড়াপ্রতিবেশীর খবর নিচ্ছিস! নাহ, চেম্বারটা ছাড়তেই হবে। অধৈর্যভাবে নিজের টর্চটা বার কয়েক জ্বালাল নেবাল শুভাশিস। ঘড়ঘড়ে গলায় চেঁচাল,—মোমবাতি আনছিস ? নাকি তাও জুটবে না ?

ঘরে মোমবাতি জ্বলার পর স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে আনল শুভাশিস। ছোকরাটি স্যাস ক্লিনিকেই মায়ের অপারেশন করাতে চায়, সাত দিন পরে সেখানে নিয়ে আসতে বলল পেশেন্টকে। জরুরি নির্দেশও দিয়ে দিল কয়েকটা। কিছু রুটিন ব্লাড টেস্ট, ই সি জি, চেস্ট এক্সরে, এই সব। টেটভ্যাকও নিয়ে নিতে বলল। পরের রুগীটি পোস্ট অপারেটিভ চেকআপে এসেছে, পাঁচ মিনিটে ছেড়ে দিল তাকে। শেষজনের রেকারেন্ট অ্যাপেনডিসাইটিস। অল্পবয়সী ছেলে, মাঝে মাঝেই পেটের ডান দিকে সাব অ্যাকিউট পেন হচ্ছে, ছেলেটাকে বেরিয়াম মিল এক্সরে করে আনতে বলল, ওষুধও লিখে দিল কয়েকটা।

রুগীদের বিদায় করে একটা সিগারেট ধরাল শুভাশিস। এবার উঠবে। এখন নার্সিংহোম ছুঁয়ে

বাড়ি ফেরা। তার আগে চার পেশেন্টেরই নামঠিকানা স্লিপ থেকে তুলে নিচ্ছে ডায়রিতে। অভ্যেস।

খুপরিতে ছায়া পড়ল। সুইংডোর ঠেলে ঢুকেছে কে যেন। চোখ তুলতেই শুভাশিসের হৃৎপিণ্ড চলকে উঠল। তুমি!

সাদা খোলের ওপর ছোট ছোট বুটিঅলা তাঁতের শাড়ি পরেছে ইন্দ্রাণী। সম্ভবত নীল বুটি, আঁধারে কালচে লাগে। ঘাড়ের কাছে ভাঙা খোঁপা, কপালে চাকা টিপ। মোমবাতির কাঁপা আলোয় কেমন যেন অলৌকিক লাগছে ইন্দ্রাণীকে। জীবনে এই প্রথম শুভাশিসের কোনও চেম্বারে এল ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীকে বসতে বলতেও ভুলে গেছে শুভাশিস। ইন্দ্রাণী নিজেই চেয়ার টেনে বসল,— চমকে গেছ তো?

এই মুহূর্তে চমকে যাওয়া শব্দটা কি খুব অকিঞ্চিৎকর নয়? যে প্রমত্ত গতিতে রক্তকণিকারা ছুটে বেড়াচ্ছে শুভাশিসের শরীরে, তাকে ঠিক কী বলে এখন?

—তুমি আসছ না কেন? কী হয়েছে তোমার?

—কিছু না তো। শুভাশিস সামলে উঠছে ধীরে ধীরে। চোয়ালে চোয়াল চেপে হাসল,— সময় পাচ্ছি না। ... এত কাজের চাপ। ... এই তো লাস্ট উইকের আগের উইকে ক'দিনের জন্য চণ্ডীগড় যেতে হল। কনফারেন্সে। মাঝে অরূপ-শালিনী ছিল না, একা নার্সিংহোম সামলাতে হচ্ছিল...

—এত ব্যস্ত, একটা ফোন করারও সময় পাচ্ছ না?

হাস্যকর অজুহাত বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখা যায় না। ইন্দ্রাণীকে না জানিয়ে কবে কোন কাজটা করেছে শুভাশিস! এই সতেরো বছরে! এক দিনের জন্য মাধবপুর গেলেও ফোন করে জানাতে ভুল হয়নি।

শুভাশিস চোখ নামিয়ে নিল। গলার স্বর অস্বাভাবিক নেমে গেছে হঠাৎ,— তুমিও তো ফোন করে একটা খোঁজ নাওনি।

—নিইনি? তুমি শিওর?

শুভাশিস একটু ধাঁধায় পড়ে গেল। হোঁচট খেয়ে বলল, দীপু অবশ্য একদিন ফোন করেছিল। ... বিলিভ মি, পরদিন আমি খুব বিজি ছিলাম। একটা জরুরি কাজে কলকাতার বাইরে...। পলকের জন্য নদীতে নেমে আসা গাছগুলো মনে ভেসে উঠল শুভাশিসের। বাতাসের একটা সর সর ধ্বনিও শুনতে পেল যেন। ছবিটা বুক থেকে মুছতে চেয়ে হাসল একটু,— তোমাদের বাড়ি ভাঙার ব্যাপারে আমি থেকেই বা কী হত? ওটা তোমাদের ফ্যামিলি ম্যাটার। সেখানে কি অ্যাম আই দ্যাট ইম্পর্টেন্ট?

—ইম্পর্টেন্ট নও?

—হু দা হেল আই অ্যাম? বলব না বলব না করেও কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল শুভাশিসের,— তোমাদের ফ্যামিলিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তোমার ছেলে কী ভাবে ট্রেনিংএ গেল, তার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তুমি তোমাদের বাড়ি স্টেক করলে কি না করলে, এ সবে আমার ইনট্রুড করার সত্যিই কি কোনও অধিকার আছে?

ইন্দ্রাণী নিষ্পলক দেখছে শুভাশিসকে। বেশ কয়েক সেকেন্ড স্থির তাকিয়ে থেকে বলল,— তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ শুভ?

শুভাশিস মনে মনে বলল, তোমার ওপর রাগ করে কী লাভ রানি? তুমি তো একটা পাথর। ইট কাঠ পাথরের ওপর রাগ করলে রাগটা আঘাত হয়ে নিজের কাছেই ফিরে আসে। মুখে বলল,— কীসের রাগ? তোমার ওপর রাগ করার আমি কে?

ইন্দ্রাণী চুপ। মোমের আলো তার চিবুক ছুঁয়ে আছে, পাণ্ডুর বিভায় ছেয়ে গেছে মুখমণ্ডল। বড্ড শুকনো, বড্ড রোগা দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীকে।

কেন এখনও টানে ওই নারী ? কেন ?

সম্মোহিত শুভাশিস মুখ ঘুরিয়ে নিল,— তোমার কি আর কোনওভাবেই প্রয়োজন আছে আমাকে ? আমি তো তোমার কাছে সিম্পলি একটা আউটসাইডার।

—এভাবে বলছ কেন ?

—বলছি। বলার মতন কারণ ঘটেছে, তাই। তোমার ছেলের জন্য টাকা দরকার সেটুকু আমাকে জানাতেও তোমার ইগোতে লাগে। অথচ ইউ ক্যান অ্যাপ্রোচ অ্যা টম ডিক হ্যারি।

—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি শুভ।

—ঝগড়া নয়, লেট মি সে সাম হার্ড ফ্যাক্টস। তুমি শ্বশুরবাড়িতে স্বামী দেওর ছেলেপুলে নিয়ে পবিত্র গণ্ডির মধ্যে বসে আছে, আর আমি ব্যাটা রাবণ কেন ভণ্ড সন্ন্যাসী সেজে অনন্তকাল সেখানে হানা দিয়ে যাব ?

—শুভ প্লিজ, তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে আর কাউকে টানছ কেন ? একটু বোঝার চেষ্টা করো। তোমাকে আমি কিছুই দিতে প্যারি না, আমি কী করে বার বার তোমার কাছে হাত পাতি ?

ভালবাসার মধ্যেও কি বিনিময় প্রথা আছে ? শুভাশিস ভেবে পাচ্ছিল না। নিজেকে খুঁড়ে বুঝতে চাইছিল কোথায় লুকিয়ে আছে এই ধারণার বীজ ? প্রত্যাশাহীন আত্মসমর্পণ কি ভালবাসার শর্ত নয় ? কিন্তু নিজেও কি সে তা মানে ? তার নিজের মধ্যেও তো এক চতুর হিসেবি মানুষ অবিরাম নিক্তি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পাল্লা কোনও দিকে এতটুকু হেলবার উপায় নেই। এই অহংবোধই তাকে মানুষ করেছে। এখানেই সে পশুদের থেকে আলাদা। তাই যদি হয় তবে ইন্দ্রাণীর অহংবোধকে অস্বীকার করার তার উপায় কোথায় ?

রতিকান্ত বাজখাঁই গলায় দাবড়াচ্ছে কোনও রুগীকে। অন্ধকার যেন খানখান হয়ে যাচ্ছে চিৎকারে। কেঁপে কেঁপে উঠছে পার্টিশান। বাইরে জেনারেটারটা একবার ঢ ঢ শব্দ করেই বন্ধ হয়ে গেল। মোমবাতি গলে গলে প্রায় শেষ।

ইন্দ্রাণীর স্বর আরও খাদে নেমে গেছে,— কটা দিনে তুমি অনেক বদলে গেছ শুভ। এতক্ষণ এসেছি, একবারও তো কই তোমার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে না ?

শুভাশিস দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। চোখের সামনে আবার সেই নদী। নদী, না সমুদ্র ? জলে তার অর্ধেক ডুবে থাকা গাছ। সর সর বাতাস। ঘন কালো ছায়া। ছায়া, না গুহা ? কোথায় চলেছে নৌকো ?

চোখে কেন জল আসে শুভাশিসের ? কেন যে এক ডুবডুব ভয়ে হৃৎপিণ্ড থরথর ?

মুখ থেকে হাত সরাতেই অযুত ভোল্টের শক খেয়েছে শুভাশিস। সামনের চেয়ার ফাঁকা ! সুইংডোর কি দুলছে ? কই না তো ! ইন্দ্রাণী গেল কোথায় !

শুভাশিস উদভ্রান্তের মতো রাস্তায় বেরিয়ে এল। চতুর্দিকে অসংখ্য দোকানপাট, পথের মাঝখানেও পসার সাজিয়ে বসেছে সার সার হকার। এলোপাথাড়ি মানুষের ভিড় আর দোকানপাটের ফাঁদে আটকে পড়ে বুনো জন্তুর মতো ছটফট করছে গাড়িঘোড়া। পোড়া ডিজেলের কটু গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। এই ভয়াবহ জনস্রোত আর যানস্রোতের মাঝে ইন্দ্রাণীকে কোথায় খুঁজে পাবে শুভাশিস ? পাগলের মতো তাও ভিড় ঠেলে ঠেলে এদিক ওদিক খুঁজল কিছুক্ষণ, বাসস্টপের দিকে ছুটল, দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে উল্টো দিকে চোখ চালাল খানিক। নাহ, কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ইন্দ্রাণী যেন উবে গেছে পলকে।

শরীরটা ক্রমশ ছেড়ে আসছে। সব কেমন ঝাপসা। শ্লথ পায়ে ফিরল শুভাশিস। আধো অন্ধকার বারান্দার এক ধারে রতিকান্তর রুগীদের জটলা, অন্য প্রান্তে কার্তিক জেনারেটারের সামনে উবু হয়ে বসে খুটখাট করছে।

খুপরিতে ঢুকতে গিয়ে থামল শুভাশিস,— কার্তিক ?

—হ্যাঁ স্যার।

—এই মাত্র এক ভদ্রমহিলা আমার চেম্বার থেকে বেরোলেন, কোন দিকে গেলেন রে ?

—দেখিনি তো স্যার।

—দেখিসনি ! শুভাশিসের গলাটা আর্তনাদের মতো শোনাল।

চেয়ারে ফিরে দু-চার সেকেন্ড থম শুভাশিস। চোখ রগড়াচ্ছে। নাক টানছে। যদি ইন্দ্রাণীর কোনও অস্তিত্ব থেকে থাকে বাতাসে। নেই। প্রায় নিবে আসা মোমবাতির আলোয় আধিভৌতিক লাগছে ঘরটাকে। যেন পাশে রতিকান্তর হুমহাম চিৎকার নেই, রুগীদের কোলাহল নেই, যেন এক নিবিড় নৈঃশব্দ্যে ডুবে গেছে চারদিক। ইন্দ্রাণী কি সত্যিই এসেছিল ? নাকি এতক্ষণ হ্যালুসিনেশান দেখছিল শুভাশিস ? এক অলীক মায়ার সঙ্গে কথা বলছিল একা একা ? এতকাল পর ইন্দ্রাণী যেচে এসে তাকে তিতিরের বাবা বলে স্বীকার করে যাবে, এও কি সম্ভব !

যন্ত্রের মতো ব্রিফকেস গুছিয়ে শুভাশিস উঠে পড়ল। এলোমেলো গাড়ি চালাচ্ছে। এ রাস্তা, ও রাস্তা। গঙ্গার ধারে গিয়ে ঠায় বসে রইল বহুক্ষণ। অনন্তকাল ধরে স্রোত বয়ে চলেছে গঙ্গায়। অবিরাম। এই মাত্র যে স্রোতটা চলে গেল শুভাশিসের সামনে দিয়ে, সে কি আর ফিরবে কোনওদিন ? ফেরে কি ? ফেরে ফেরে। ভাঁটার টানে যে ঢেউ চলে যায় মোহনার দিকে, জোয়ারে সেই তো আবার...।

কত কাল পর ইন্দ্রাণী এল। শুভাশিস ফিরিয়ে দিল তাকে ! এই আশঙ্কা কি ইন্দ্রাণীর মনে ছিল ? তাই কি তার চোখে তিতিরের বাবা হয়ে উঠতে পারেনি শুভাশিস ? আর সে কথাই কি আজ চোখে কাঁটা বিঁধিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল ইন্দ্রাণী ?

ছটফট করছে শুভাশিস। ঢাকুরিয়াতে এক্ষুনি যাবে একবার ? আবার ছুটছে শুভাশিস। গাড়ি কখন আনমনে পৌঁছে গেছে চেতলার সেই পুরনো বাড়িটার সামনে। পুরনো বাড়ি জীর্ণ হয়েছে আরও। একতলার সব দরজা-জানলা বন্ধ, চুঁইয়েও একটু আলো আসছে না বাইরে। বন্ধ বাড়িটার সামনে তবু অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল শুভাশিস। মনে মনে বিড়বিড় করছে, ক্ষমা করো রানি, ক্ষমা করো।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল শুভাশিসের। ছন্দা টিভি দেখছিল, শুভাশিসকে দেখে উঠে এল,—কি হল, এনেছ ?

শুভাশিসের কানে অস্পষ্ট ভাবে পৌঁছল কথাটা। ঘোরের মধ্যে বলল,— কি আনব ?

—বারে, সকালে অত কথা হল ! তুমি বললে তোমাকে আজ লোকটা এনে দেবে !

—কী বলো তো ?

—এই না হলে বাবা ! ভুলে মেরে দিয়েছ ?

কথা বলতে ভাল লাগছিল না শুভাশিসের। বিরক্ত মুখে বলল,— অত হেঁয়ালি ভালো লাগে না। সাত কাজে থাকি, সব কথা মনে থাকে না।

মুহূর্তের জন্য থমকাল ছন্দা। তারপর বলল, —তোমার আজ টোটোর জন্য ক্যামেরা আনার কথা ছিল।

সেই মাধ্যমিকের পর থেকেই টোটোকে একটা বিদেশি ক্যামেরা কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে শুভাশিস, বছর ঘুরতে চলল এখনও কেনা হয়ে ওঠেনি। ক'দিন ধরেই চেঁচামেচি করছে ছন্দা, এবার জন্মদিনে যেন অন্তত টোটোর হাতে পৌঁছয়। কাল ফ্যান্সি মার্কেটে খবর পাঠিয়েছিল শুভাশিস, আজ ইয়াসিন সন্ধেবেলা নার্সিংহোমে দিয়ে যাবে বলেছিল।

শুভাশিস নীরস গলায় বলল, পরশু তো ফার্স্ট এপ্রিল। কাল এসে যাবে।

—দেখো, ভুলো না। টোটো কিন্তু খুব হার্ট হবে। ছন্দা ডাইনিং স্পেসের দিকে যেতে গিয়েও দাঁড়াল,— কী বিচ্ছিরি ব্যাপার বলো তো, টোটো এবার কোনও বন্ধুবান্ধবকে ডাকতে চাইছে না।

—কেন, পরীক্ষা তো কাল শেষ হয়ে যাচ্ছে !

—কি জানি বাবা, তোমার ছেলের থই পাই না আজকাল। গত বছর অত হইচই হল, এবার

দিনটা পুরো মরা মরা কাটবে। কোনও মানে হয় ? আমি অবশ্য দিদি জামাইবাবুকে নেমন্তন্ন করেছি।

—বেশ তো।

—কী করি বলো তো ? বাইরে থেকে খাবার আনাব ?

—যা তোমার ইচ্ছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? বাইরের ধরাচুড়ো ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবিতে নিজেকে বদলাচ্ছে শুভাশিস। লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল দিয়ে এল।

ছন্দা এখনও নড়েনি। তাকে দেখে খেঁকিয়ে উঠল শুভাশিস,— হল কী ? আরও কিছু বলার আছে নাকি ?

ছন্দা ঘাড় ঝাঁকাল,— না তো ! খাবে চলো।

—খাব না। খিদে নেই।

—সেকি ! আমি তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছি !

—আছ কেন ? কে বলেছে থাকতে ? এমনিই রোগের ডিপো, আরও রোগ বাধানো !

ছন্দার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল —কী হয়েছে বলো তো ? প্রবলেম হয়েছে কোনও ? কাল সানশাইনে কোনও পেশেন্টের কন্ডিশান সিরিয়াস বলছিলে...

—হোয়াই কান্ট ইউ লিভ মি অ্যালোন ? সব সময়ে ফেউএর মতো লেগে আছ, একটু একা থাকার উপায় নেই ?

ছন্দার মুখ থমথমে হয়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাতে বরাবরই ঘুম গাঢ় হয় শুভাশিসের। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিছানায় পড়লেই দু মিনিটে কাদা। আজ তেমনটি হল না। ভেঙে যাচ্ছে বার বার। ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন আসছে খালি। উৎকট। অর্থহীন। কখনও একটা সাদা হাঁস লোমশ ভাল্লুক হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা গুম গুম ধস নামছে পাহাড়ে। মেডিকেল কলেজে শুভাশিসদের হোস্টেলের সামনে একটা কাঁঠালি চাঁপার গাছ ছিল, সেটাকেও যেন আবছাভাবে দেখল এক-আধবার। কলেজ স্ট্রিটও এল স্বপ্নে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দুমদাম বোমা পড়ছে, তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে ইন্দ্রাণী, সপ্লিনটার বিঁধে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে আসছে ফ্রক পরা তিতির, কোত্থেকে এক সি আর পি এসে চুলের মুঠি চেপে ধরল তিতিরের। আরও কত কী যে দেখল !

পরদিন সারাক্ষণ একটা চাপ চাপ ভার লেগে রইল বুকে। যান্ত্রিক হাতে অপারেশন সারল গোটা তিনেক। সন্ধেবেলা ল্যান্সডাউনের চেম্বার সেরেই নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো ছুটল ঢাকুরিয়ায়।

নীচের সদর দরজাটা আগে খোলাই থাকত, আজ বন্ধ। বেল শুনে দরজা খুলেছে মিনতি। বড়ঘরে পা দিয়ে শুভাশিস পলকের জন্য স্থবির। নিত্যদিন সোফায় বসে থাকা মানুষটা উঠে গেছেন দেওয়ালে। হা হা করছে ঘরটা। বাড়িটাও যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ।

পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভাঙছে শুভাশিস। নিজের পদশব্দে নিজেরই অস্বস্তি লাগছে। অথচ এক চোরা আনন্দও কুলকুল বইছে ধমনীতে। ঠিক যেন ঘরে ফেরার অনুভূতি।

তিতির খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়ছে। খাতার গোছা নিয়ে টেবিলে ইন্দ্রাণী। দরজায় দাঁড়াতেই শুভাশিসের বুক মুহূর্তে পেঁজা তুলোর মতো হালকা। জুতো খুলতে খুলতে পুরনো অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বলে উঠল,— তিতিরের কি পরীক্ষা শেষ ?

তিতির ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চোখে বিস্ময়,— ওমা ডাক্তার আঙ্কল ! তুমি অ্যাদ্দিন ছিলে কোথায় ?

—আর বলিস না, এক হাজার ঝামেলা। ওদিকে তোর আন্টির শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। মাঝে কলকাতার বাইরেও চলে গেলাম...। শুভাশিস আড়চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখে নিল একবার। ইন্দ্রাণীর চোখ কি উদ্ভাসিত একটু ? বোঝা গেল না। কাল সন্ধের ইন্দ্রাণী আজ আবার মুখোশ এঁটে নিয়েছে

মুখে। কোনও বিকার নেই। যেন জানতই শুভাশিস আজ আসবে।

শুভাশিস খাটে বসে লঘু স্বরে বলল,— ওসব খাতা-টাতা রাখো। এত দিন পর এলাম, একটু চা-ফা খাওয়াও। নাকি তিতির চা খাওয়াবে ?

কয়েক মিনিটেই পরিবেশ সহজ হয়ে গেল। ঘরোয়া কথাবার্তা চলছে। টুকিটাকি খবর নিচ্ছে শুভাশিস।

—দীপুদের ঘর বন্ধ দেখলাম, সব গেল কোথায় ?

—কাকিমা বাপের বাড়ি গেছে। অ্যাটমের বড়মামা এসেছে, খুব হইচই চলছে সেখানে।

—বড়মামা মানে কোন জন ? যে এয়ার ইন্ডিয়ায় আছে ? বোম্বেতে পোস্টেড ?

—না না, সে তো মেজমামা। বড়মামা তো কোলিয়ারির ম্যানেজার।

—ও হ্যাঁ। দীপু একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

কথার মাঝে তিতির হঠাৎ ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল,— জানো আঙ্কল, আমাদের প্রেসটা বিক্রি হয়ে গেছে।

—সেকি ! কবে ? কেন ?

প্যাসেজ থেকে চা তৈরি করে ঘরে এসেছে ইন্দ্রাণী। কাপটা শুভাশিসের হাতে ধরিয়ে বলল,— ওটা আর রেখে কী হবে ? নতুন ফ্ল্যাটবাড়িতে প্রেসের জায়গা হবে না।

—একেবারে বেচে দিলে ? অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে পারতে।

—দুৎ, বাড়িতে চলছিল সে একরকম। অন্য জায়গায় কে ছোটাছুটি করবে ? তিতিরের বাবা তো আর ভুলেও দেখবে না। তার চেয়ে যে কটা টাকা আসে... ভাবছি তিতিরের জন্য কটা গয়না গড়িয়ে রাখব।

শুভাশিসের বুকে দ্রিম করে বাজল কথাটা। তিতির আজ আবার আদিত্যর মেয়ে হয়ে গেছে। একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল,— তিতিরের বাবা কোথায় ? ব্যবসার কাজে বেরিয়েছে ?

—বাবা তো এখানে নেই। কাশীতে।

—কাশীবাসী ! শুভাশিস হেসে ফেলল,— তোর বাবা সন্ন্যাসী হয়ে গেল ?

—হিহি তা কেন ? দাদু-দিদার সঙ্গে বেড়াতে গেছে। পরশু ফেরার কথা ছিল। ওখানে দিদার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, আরও কয়েক'দিন দেরি হবে।

—তাই বল। তা সেই ভদ্রলোকের খবর কি ? রঘুবীরবাবু ? তিনিও সঙ্গে গেছেন ?

—না। তবে বাবাকে খুব মিস করছেন। উইকে চোদ্দবার করে খবর নিয়ে যাচ্ছেন বাবা কবে ফিরবে। বাবার বিরহে খুব কাতর। তিতির খাটের বাজুতে হেলান দিল,— আমারও ভাল লাগছে না। বাবা না থাকলে সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—হুঁহ, তোর বাবা যেন কত বাড়িতে থাকে ! ইন্দ্রাণী শুভাশিসের পাশে এসে বসল,— আমিই জোর করে পাঠালাম। এমন ডিপ্রেশানে ভুগছিল।

—ভালই করেছ। বেড়ালে মন ফ্রেশ হয়ে যাবে।

তিন মাস পর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরছিল শুভাশিস। ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে সহসা সিঁটিয়ে গেল। আজও ক্যামেরার কথা ভুলে গেছে। ইয়াসিনটাও দুপুরে এল না। কী কৈফিয়ত দেবে ছন্দাকে ?

আশ্চর্য, ছন্দা কিছুই জিজ্ঞাসা করল না।

পরদিন আর ভুল করল না শুভাশিস। নিজেই সময় করে ফ্যান্সি মার্কেটে ছুটল, দরদস্তুর করে ক্যামেরা কিনল, সন্ধেবেলা নার্সিংহোম ছুঁয়েই সোজা বাড়ি।

টোটো ক্যামেরা পেয়ে দারুণ খুশি। বিদেশি এস এল আর ক্যামেরা, উল্টেপাল্টে দেখে আশ মেটে না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিটারেচার পড়ছে, পারলে রাতেই ফিল্ম কিনতে ছোটে।

শুধু ছন্দারই কোনও তাপ-উত্তাপ নেই।

ছন্দার দিদি-জামাইবাবু রাত্রে খেয়ে চলে যাওয়ার পর ছন্দাকে একা পেল শুভাশিস। হালকা ভাবে বলল,— ছেলের জন্মদিনে এমন মিইয়ে আছ কেন ?

—কই না তো।

—শরীরে কোনও প্রবলেম হচ্ছে ?

—না।

—শালিনীর সঙ্গে কিন্তু কথা হয়ে গেছে। আর কোনও এক্সকিউজ নয়, পয়লা বৈশাখের পরেই তুমি অপ্যারেশান করাচ্ছ।

—দেখা যাবে।

—আয়রন ক্যাপসুলগুলো খাচ্ছ নিয়মিত ?

ছন্দা উত্তর দিল না।

—তোমার এই উইকে একটা হিমোগ্লোবিন করার কথা ছিল না ? কাল ক্লিনিক থেকে লোক পাঠিয়ে দেব ?

ছন্দা উল্টো দিকে পাশ ফিরে শুল।

ঠিক চারদিন পর হঠাৎ ধুম জ্বর এল ছন্দার। সঙ্গে অসহ্য পেটের যন্ত্রণা। ঝাঁ ঝাঁ চৈত্রের দুপুরে স্যাস ক্লিনিকে নিয়ে আসতে হল ছন্দাকে। বৈশাখ অবধি আর অপেক্ষা করা গেল না।

৫৬

বাপ্পা পাশের ঘর থেকে চেঁচাচ্ছে,— তিতির, অ্যাই তিতির, আমার টেপের জ্যাকটা কোথায় ?

তিতির ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাজগোজ করছিল। বেরোবে। দাঁতে চাপা হেয়ার ক্লিপ হাতে নিয়ে গলা ওঠাল,— তোর টেবিলের ড্রয়ারে রাখা আছে।

—হুঁহ, রাখা আছে !... আমার রবার্ট মাইলস-এর ক্যাসেটটা কোথায় গেল ? বন জোভিগুলোও দেখছি না !

—আমি কি ওসব ক্যাসেট শুনি ? দ্যাখ না এদিক ওদিক। ওখানেই আছে।

—শিট। কে যে এসবে হাত দেয় ! এদিকে আয়, বের করে দিয়ে যা।

উফ, আর পারা যায় না। তিতির আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচাল। ট্রেনিং শেষ করে পরশু ফিরেছে দাদা, তার পর থেকেই সবার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। অনর্গল কমেন্ট্রি চলছে শিক্ষানবিশির। এই বন্ধুর গল্প হচ্ছে, ওই বন্ধুর গল্প হচ্ছে, কে কীভাবে হিন্দি বলে, কে কীভাবে ইংরিজি বলে ক্যারিকেচার করে দেখাচ্ছে সেসব। এক কেরালাইট বন্ধু কী করে সম্বর খায় তার নকল দেখে অ্যাটম তো হেসে খুন। বাড়ির বাইরে ক'দিন থেকে অনেক বদলে গেছে দাদা। তা যাক। একটা রামগরুড় যদি তিন মাস ম্যাড্রাস ঘুরে এলে হাসিখুশি হুল্লোড়বাজ হয়ে যায়, মন্দ কি ! তবে হুকুমের পর্বটিও বেড়েছে খুব। শুনতে শুনতে কানের পোকা বেরিয়ে গেল তিতিরের। আগেও জল গড়িয়ে খেত না, এখন শুলেও পাশ ফিরিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। হোস্টেলে তো অনেক কাজই নিজেকে করতে হয়েছে, তবু এই নবাবিয়ানা কেন যে ঘুচল না !

ছোটকা একটা ভাল আইলাইনার এনে দিয়েছে। সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে চোখের পাতায় সরু আঁচড় টানল তিতির। সন্তর্পণে শিশির মুখ বন্ধ করে উঠে গেল ওঘরে। বাপ্পার ক্যাসেটের বাক্সতে আঙুল চালাচ্ছে দ্রুত। গোটা তিন-চার ক্যাসেট বার করে ছুঁড়ে দিল,— এগুলো কী ?

বাপ্পার কোনও হিলদোল নেই। ঝকঝকে কামানো গাল হাসিতে ভরে গেছে।

—তার মানে তুই রেখেছিলি !

—মোটেই না। তোর বাক্সেই ছিল।

—তা হবে। বাপ্পা ফুঁ দিয়ে টেপ রেকর্ডারের ধুলো ওড়াচ্ছে। তিতিরকে একবার আপাদমস্তক

দেখে নিয়ে টেপে ক্যাসেট ঢোকাল,— এত সেজেগুজে চললি কোথায় রে ? টিউটোরিয়াল ?... তোদের টিউটোরিয়ালে আজকাল সাজগোজের কম্পিটিশান হয় নাকি ?

কী কথার স্টাইল ! নিজে যেন বয়োবৃদ্ধ জ্যাঠামশাই ! তিতির রাগ রাগ মুখে বলল,— প্রথমত বলি, আমি মোটেই তেমন সাজগোজ করিনি। দ্বিতীয়ত, আমি টিউটোরিয়ালে যাচ্ছি না। তৃতীয়ত, তোদের কলেজেই অনেক মেয়ে আমার থেকে অনেক বেশি ড্রেস মেরে যায়।

—বাহ্, আমার অ্যাবসেন্সে তোর অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি ! একেবারে জিওমেট্রির মতো কথা বলছিস ! বাজনার সুইচ টিপে অল্প অল্প দুলছে বাপ্পা,— ওখানে মার্চেন্ট নেভির এক অফিসারের বাড়িতে গিয়েছিলাম বুঝলি। ন্যারির খুব ক্লোজ। তার মেয়েটাও তোর মতো পয়েন্ট সাজিয়ে সাজিয়ে কথা বলছিল...

—তোরা তার নাম দিয়েছিলি হাইপোথিসিস। কথা কেড়ে নিয়ে তিতির ফিক করে হাসল,— গল্পটা ঠোঙা হয়ে গেছে রে দাদা। এই নিয়ে ফোর্থ টাইম বলছিস।

—বলেছি বুঝি ? হা হা।

পিঠে ছড়ানো খোলা চুল আলগা ঝাঁকাল তিতির,— এসে অব্দি তোর কী হয়েছে রে দাদা ? বিকেলে ঘরে বসে আছিস, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে গেলি না ! বিষ্ণুপ্রিয়াদি এই ক'মাসে কত বার তোর খোঁজ করেছে...

—করেছিল বুঝি ? কবার ?

—অনেক বার। যখনই দেখা হয় শুধু তোর কথা।

—ঠিকানা চায়নি ? বাপ্পার দুলুনি থেমেছে।

—চেয়েছিল। আমার তখন ঠিক মুখস্থ ছিল না বলে বলতে পারিনি।

—হুঁউউ। বুঝিলাম।

—কী বুঝলি ?

—তা জেনে তোর কী হবে রে ? বাপ্পা টেপ থামিয়ে খাটে উঠে বসল। ঝট করে তিনটে আঙুল বাড়িয়ে দিল তিতিরের দিকে,— অ্যাই, একটা আঙুল ধর তো।

—কী হবে ?

—ধর না।

আঙুল তিনটে এক সেকেন্ড দেখে নিয়ে অনামিকাটা ধরল তিতির। বাপ্পা বলল,— ধুস। সব কেঁচে গেল।

তিতির ফ্যালফ্যাল তাকাল,— তোর কোনও ক্ষতি হয়ে গেল নাকি ?

—হলই তো। ফোরফিঙ্গারটা ছিল লঙ বিচ, মাঝেরটা ইয়োকোহামা, আর রিঙ ফিঙ্গারটা সিডনি। তুই শেষ পর্যন্ত সিডনি চুজ করলি ! কোথায় আমি ভাবছি স্টেটস বা জাপান থেকে প্রথম সেইল শুরু করব !

তিতিরের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এবার দাদা সত্যি সত্যি ভেসে বেড়াবে ! দূরে দূরে। সাগরে। মহাসাগরে। শুকনো মুখে বলল,— তোর কবে জয়েনিং রে দাদা ?

—এনি ডে। দু-তিন মাসের মধ্যে যে কোনও দিন। আমার কোর্স কমপ্লিশান সার্টিফিকেট কোম্পানিতে চলে গেছে, এখন তারা যবে কল দেয়। একেবারে প্লেনের টিকিট সমেত ডাক পাঠাবে। তারপর সাঁইইই। যেখান থেকে বলবে সেখান থেকে আমায় জাহাজে উঠতে হবে।

তিতির মনে মনে বলল, বেশ আছিস রে দাদা। এই বাড়ি ভাঙা, বাড়ি বদল, কিছুর মধ্যেই তোকে থাকতে হবে না।

বাপ্পা বুঝি তিতিরের মনের কথাটা টের পেয়েছে। বলল,—কবে ভাড়া বাড়িতে উঠে যাওয়া হচ্ছে রে ?

—জানি না। মা বলতে পারবে।

—এত দিনে এ বাড়ির লোকরা একটা গুড ডিসিশান নিয়েছে। স্ক্র্যাপ দা ওল্ড, বিল্ড দা নিউ।

তিতির ম্লান হেসে বলল,— তোর এই জিনসের প্যান্টগুলোর মতো, তাই না ?

—অফকোর্স। এখন আমাকে কতগুলো প্যান্ট বানাতে হবে জানিস ? শার্ট ভাবছি রেডিমেডই কিনে নেব। মাকে বলেছি। মা বলেছে...

টেলিফোন বাজছে প্যাসেজে। রুনা দিবানিদ্রার আমেজ মেখে ফোন তুলেছে। অলস গলায় ডাকল,—তিতির, তোর ফোন।

তিতির তড়িঘড়ি টেলিফোনের দিকে ছুটল। নির্ঘাত সুকান্ত। দু'দিন তিতিরের দর্শন না পেলেই তৃতীয় দিন দূরভাষে হামলা চালায়। কথাবার্তায় মস্তানের মতো হাবভাব, কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ।

রিসিভার কানে চেপে তিতির এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল। যা ভেবেছে তাই। সুকান্তই। কী মরতে যে টেলিফোন নাম্বারটা দিয়েছিল তিতির !

গলা নামিয়ে তিতির বলল,—হল কী ? ফোন কেন ?

—হল কি তুমি তো বলবে। স্কুলে যাচ্ছ না, টিউটোরিয়ালে বেরোচ্ছ না...

—একটু ব্যস্ত আছি।

—এখন কিসে বিজি ? পরীক্ষা তো নামিয়ে দিয়েছ।

—আমার দাদা এসেছে।

—দাদা মানে জাহাজি দাদা ?

—ওকি ভাষা ! আমার দাদা এখন ডেক ক্যাডেট। তিতির একটু জ্ঞান জাহির করল।

—ওই হল। সুকান্ত একটু চুপ থেকে বলল,— বেরোও না। কতদিন দেখিনি তোমায়।

—লায়ার। তোমার সঙ্গে আমার লাস্ট উইকেই দেখা হয়েছে। বলেই গলায় একটু ঝাঁঝ আনল তিতির,—রোজ রোজ তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবই বা কেন ?

সুকান্ত চুপ। উত্তর ভাঁজছে বোধহয়।

তিতির কড়া গলায় বলল,—তোমারই বা এত রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা কিসের ? বই নিয়ে বসতে পারো না ? তোমার না সামনের মাসে পরীক্ষা ?

—ইল্লি রে, বই নিয়ে বসি আর ফিউচার ডুম হয়ে যাক। বি.কমটা পাশ করে গেলে বাপ আমায় ছাড়বে ? দোকানে জুতে দেবে না ?

—ভাল তো। বসবে দোকানে।

—ধ্যাৎতেরি, আমার ভাল লাগে না। বাবা শকুনের মতো পাহারা দেবে, ইচ্ছেমতন কাটা যাবে না...

পলকের জন্য আদিত্যর মুখটা মনে পড়ল তিতিরের। শুধু কাজ না করে করেই তো কুঁড়ে হয়ে গেল বাবা। আর তার থেকেই বাড়িতে এত ঝামেলা। কাশী থেকে ফিরে বাবা অবশ্য আবার গা-ঝাড়া দিয়েছে। রঘুবীরবাবুর সঙ্গে বেরোচ্ছে রোজ। সেদিন পাড়ার অনিলকাকুর সঙ্গে বড় ঘরে বসে কিসব এজেন্সি খোলার পরামর্শ করছিল। ক'দিন উৎসাহ থাকবে কে জানে !

সুকান্ত অধৈর্য,—বোম মেরে গেলে কেন ? বেরোবে ?

—না। টুক করে মিথ্যে বলে বেশ মজা পেল তিতির। গলায় একটা অভিভাবকের ভাব এনে বলল,— তুমি যদি পড়াশুনো না করো, পরীক্ষায় না বসো, তাহলে আর কোনওদিনই দেখা হবে না। বলেই নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

বেরোবার আগে একবারটি দাদার দরজায় এল তিতির। শুয়ে আছে দাদা, মাথার নীচে হাত, কি যেন ভাবছে। বোধহয় লঙ বিচের কথা কিম্বা ইয়োকোহামা। পুরনো কড়ি বরগার নীচে, ঢক ঢক করে ঘুরতে থাকা পাখার তলায়, বিবর্ণ দেওয়ালের খাঁচায়, শেষ বিকেলের আলো-ছোঁয়া বিছানায় কেমন যেন দূরের মানুষ দূরের মানুষ লাগছে দাদাকে। আগের তেতে থাকা দাদাটাই যেন ভাল ছিল

অনেক, আপন ছিল।

তিতির গলা ঝাড়ল,— পাশের ঘর খোলা রইল রে, আমি বেরোচ্ছি।

বাপ্পা আলগা ঘাড় ঘোরাল,— যাচ্ছিস কোথায় বললি না ?

—সম্রাটদের বাড়ি একটা গেট-টুগেদার আছে।

—কোথাকার সম্রাট ?

—এলগিন রোডের। আমার ক্লাসমেট।

—হুঁ। তোর খুব হাইফাই বন্ধু হয়েছে দেখছি !

এইসব টিজিং কমেন্ট করবে বলেই দাদাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না তিতিরের। নতুন স্কুলের বন্ধুদের কার বাড়িতে ক'বার গেছে তিতির ! অ্যানুয়াল পরীক্ষার শেষের দিন সবাই এমন করে ধরল, কেমন করে না বলে। সত্যি কথা বলতে কি, এরা তার তেমন বন্ধুও নয়, যেমনটি হিয়া ঝুলন দেবস্মিতারা। এক সঙ্গে ক্লাস করে, আড্ডা মারে, মাঝে মাঝে একটু-আধটু ঘোরে এদিক সেদিক ব্যস। তাতেই কি বন্ধুত্ব হয়ে যায় ? বন্ধুত্ব জিনিসটা অনেক ভেতরকার ব্যাপার, প্রকৃত বন্ধুর জন্য একটা আলাদা ধরনের টান থাকে।

প্রেসঘরে বসে মা কিসব হিসেব নিকেশ করছে মেশিনদাদুর সঙ্গে। প্রেস বিক্রি হয়ে গেছে, তবে মেশিন এখনও নিয়ে যায়নি নতুন মালিক, বোধহয় সামনের মাসের গোড়ায়...। কম্পোজিটার দুটো চলে গেছে, কিন্তু মেশিনদাদু এখনও আসে রোজ। এর পর মেশিনদাদুও...। স্বপ্ন বেচার ফেরিঅলার দিন ফুরিয়ে এল। সেদিন বলছিল ছোট মেয়ে-জামাই নাকি দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব জোরাজুরি করছে। জামাই বুঝি ঘাটাল না কোথায় যেন চাকরি পাচ্ছে, তার ইচ্ছে শ্বশুর এসে এবার জমিজিরেত দেখুক।

সূর্য অস্তগামী। এখনও রোদের কী তেজ ! পথঘাট যেন ঝলসে খাক। মোটা মোটা দেওয়ালঅলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গরমটা যেন আরও বেশি লাগছিল তিতিরের। এক বিন্দু হাওয়া নেই, বিশ্রী থমথমে গুমোট। বাড়ি থেকে বাসস্টপ আর কতটুকুনি, তাতেই তিতির একেবারে ঘামে ভিজে সপসপ।

সম্রাটদের বাড়ি প্রায় নেতাজির বাড়ির কাছাকাছি। পাঁচিলঘেরা ব্রিটিশ প্যাটার্নের দোতলা বাড়ি, দেখলে পুরনো কলকাতার ছবি মনে পড়ে। সামনে ছোট্ট বৃত্তাকার লন, মধ্যিখানে একটা পাথরের ভাঙা পরী। গেটের গায়ে মালি চাকরদের থাকার জায়গা, বাড়িটা ঘিরে বেশ খানিকটা বাগান-বাগান জমি। সম্রাটের বাপ-ঠাকুরদাদের তিন পুরুষের আইনের ব্যবসা। দাদুর বাবা ছিলেন হাইকোর্টের জাস্টিস, তাঁর আমলেই নাকি তৈরি হয়েছিল বাড়িটা। সম্রাটের বাবাও নামজাদা ক্রিমিনাল লইয়ার, হাইকোর্টেরই।

গাড়ি বারান্দায় এসে তিতির অস্ফুটে ডাকল, —সম্রাট, এই সম্রাট...

বিশাল বাদামি দরজা খুলে মিতেশ বেরিয়ে এল,— হাই মঞ্জিমা ! তুই এত দেরি করলি ?

আড়ষ্ট তিতির সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল,—সবাই এসে গেছে ?

—কখন ! ঝুলন তো এসে চলে গেল।

—কেন ?

—কে সব আসবে ওর বাড়িতে। সাম রিলেটিভস।

কথা বলতে বলতে ভেতরে যাচ্ছে দুজনে। সামনেই এক বড়সড় প্যাসেজ, অনেকটা ড্রয়িংরুম ধাঁচের। ইয়া ইয়া সোফা পাতা, মাঝখানে পায়ায় কারুকাজ করা গোল শ্বেতপাথরের টেবিল, কোনায় কালো পাথরের নারীমূর্তি। ব্ল্যাক ভেনাস ? হতেও পারে। দুই দেওয়ালে বড় বড় পেন্টিং। প্যাসেজ থেকেই দু'দিক দিয়ে দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়, পালিশ করা কাঠের রেলিঙও মোম চকচক। মেঝেও একেবারে তেল চুকচুক, মনে হয় এখনই পা পিছলে যাবে। ডুমো ডুমো আলো জ্বলছে চতুর্দিকে। ঠিক যেন সিনেমার সিন। দরজা-জানলার মাথায় লাল সবুজ কাচের বাহারটুকুই

যা তিতিরদের বাড়ির সঙ্গে মেলে একটু একটু।

কোথায় যেন বাজনা বাজছে মৃদু। স্বপ্নের মতো। তিতির মন্ত্রমুগ্ধের মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মিতেশ হাত ধরে টানল,—এদিকে আয়।

প্যাসেজের ডানপাশে ভেজানো দরজা। ঠেলতেই উচ্চকিত বাজনা ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে। বিরাট হলঘরে মিটমিটে বাতি জ্বলছে। নাচছে বন্ধুরা। সম্রাটের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ওকি পাঞ্চালীর হাতেও!

তিতির সিঁটিয়ে গেল। আরও কী একটা গন্ধ যেন ঘরে! সেই গন্ধ যা বাবার মুখ থেকে পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে নাক!

কুলজিৎ নাচছে না। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ক্লাসের আরও পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়েকে উত্তেজিতভাবে কি যেন বোঝাচ্ছে। ভীষণ সরল ছেলে, যখনই কথা বলে ওভাবেই হাত-পা ছোঁড়ে।

তিতির কুলজিতের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করল,—কিসের একটা স্মেল পাচ্ছি রে কুলজিৎ?

কুলজিৎ জোরে জোরে নাক টানল,—কই, আমি তো কিছু পাচ্ছি না।

—আমি পাচ্ছি। হুঁউউ।

কুলজিৎ কাঁধ ঝাঁকাল,—ড্রিঙ্কসের গন্ধ হবে। দুটো বিয়ার আর একটা হুইস্কি আনা হয়েছিল, সকলে ভাগ করে খেয়েছে। ঘরটা স্টাফি হয়ে গেছে তো, তুই বাইরে থেকে এলি...

সম্রাট নাচ থামিয়ে কথা শুনছিল। ধোঁয়া না গিলে দু-তিনটে টান দিল সিগারেটে। কায়দা করতে গিয়ে খকখক কাশল একটু। বোধহয় গলায় চলে গেছে ধোঁয়া। কাশি সামলে বলল,—একটু আছে, খাবি? খেয়ে নে, গন্ধটা আর নাকে লাগবে না।

তিতির সভয়ে বলল,— তোদের বাড়িতে কেউ নেই এখন?

—বাবা কলকাতায় নেই, একটা কেসের ব্যাপারে দিল্লি গেছে। লেজ ধরে ধরে মাও। আমিই এখন লিটেরালি বাড়ির সম্রাট।

—সেই সুযোগে তোরা বাড়িতে মদ এনে খাচ্ছিস?

সম্রাট মিতেশ কুলজিৎ পাঞ্চালী টিনা বুলবুল সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। রঙ্গন বলল,—মদ খাওয়া কি ক্রাইম নাকি?

পাঞ্চালী তিতিরের মুখের কাছে এসে ধোঁয়া ছাড়ল,— স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং ছাড়া কি গেটটুগেদার জমে? এই তো দ্যাখ না, আমি কীরকম সব টেস্ট করছি।

—আমাদের বাড়িতে পার্টি হলে তো ড্রিঙ্কসের ফোয়ারা বয়ে যায়। বাবা ট্যাক্সি থেকে ক্রেট ক্রেট বোতল নামায়।

—মিতেশ যে মিতেশ, অর্থোডক্স ঘাসপাতা খাওয়া ভেজ, সে পর্যন্ত সিপ দিল...

—দেব না কেন? লিকার তো আর মাটন চিকেন দিয়ে তৈরি হয় না। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লিকার তো ভেজ আইটেমই।

তিতিরের বুকটা কেমন মুচড়ে উঠছিল। এই দুনিয়ায় তার বাবাটাই শুধু মোদো-মাতাল, আর সকলে অভিজাত গেরস্থ! কেন? বাবা তেমন সফল মানুষ নয় বলে? ব্যর্থ মানুষের সবই দোষ। বাবাটারও অবশ্য মাত্রাজ্ঞান বড় কম।

পাঞ্চালী গ্লাসে খানিকটা সোনালি পানীয় ঢেলে এনেছে,—নে, চোখ বুজে চুমুক দে।

তিতির ঠেলে গ্লাস সরিয়ে দিল,— না, আমি খাব না।

—এত ট্যাবু কেন? আমরা তো মাতাল হচ্ছি না। এই তো ঝুলন দিব্যি চুমুক মেরে চলে গেল।

তিতির ঈষৎ ক্ষিপ্তভাবে বলল,—বলছি তো খাব না। কেন জোর করছিস?

সম্রাট হাহা হাসল,— তুই দেখি আমাদের ডাম্পির মতো করছিস। ডাম্পি মানে আমাদের স্পিৎজসটা। ওকে যেদিন মা প্রথম জিন খাওয়াতে গেল, সেদিন কী অবস্থা! এদিকে পালায়, ওদিকে পালায়। এখন মা'র হাতে গ্লাস দেখলেই সুড়সুড় করে লেজ নাড়তে নাড়তে এসে বসে। আজ মা নেই, সারাদিন হাই তুলছে। দে দে, একবার চুমুক দে মঞ্জিমা, তোরও ঠিক ওই অবস্থা হবে। নেক্সট কোনও গেটটুগেদার হলেই মনে হবে ড্রিঙ্কসের অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই কেন!

তিতিরের গা গুলিয়ে উঠছিল। মদ শুনলেই কী যে এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শরীরে! ফ্যাকাসে মুখে বলল,—আমার শরীরটা ভাল লাগছে না রে, আমি আজ যাই।

—ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। তোকে ছুঁতে হবে না।

—দেখালি বটে। তুই মঞ্জিমা, না বড়পিসিমা!

—ও কী রে, ওর যদি ইচ্ছে না হয়...

—ইচ্ছে না হতেই পারে।

—তোর অ্যাটিচিউডটা কিন্তু খুব ইনসাল্টিং মঞ্জিমা।

বন্ধুদের মধ্যে একটা বাকবিতণ্ডা শুরু হতে যাচ্ছিল, সম্রাট থামাল। তিতিরকে বলল,—এই মঞ্জিমা, চলে যাস না প্লিজ। পার্কস্ট্রিট থেকে চাইনিজ আনিয়েছি, খেয়ে যা।

তিতির কাতর মুখে বলল,— আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছে না রে। বিলিভ মি, শরীরটা আজ সত্যিই খারাপ। আসবই না ভাবছিলাম, নেহাত তোর বাড়ি বলে...

—প্লিজ মঞ্জিমা, একটু কিছু টেস্ট কর। সম্রাট তিতিরের হাত চেপে ধরল,— নইলে সবাই খুব হার্ট হবে। প্লিজ।

তিতির ছোট্ট শ্বাস ফেলল। উপায় নেই। এসে পড়েছে যখন, এখন আর সিনক্রিয়েট করে যাওয়া যায় না।

কোণে একটা টেবিলে খাবার রাখা আছে। একটা প্লেটে অল্প চিলি প্রন আর সামান্য মিক্সড চাউমিন তুলে নিল তিতির। খাচ্ছে।

মাঝে একটু তাল কেটেছিল, আবার শুরু হয়েছে পাশ্চাত্য গান। নাচছে বন্ধুরা। দাদার ঘরে শুনেছে টিউনটা। ফিল কলিন্স কি? না এলটন জন?

টিনা এসে টানল তিতিরকে,— কাম অন। নাচ অ্যাট লিস্ট।

প্লেট হাতে একটু একটু দুলল তিতির। নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগছিল। এই সব বন্ধুরা তার তেমন খারাপ নয়, সম্রাট আর কুলজিৎ ছাড়া কেউ তেমন বড়লোকও নয়, শুধু শখগুলো সকলের কেমন উদ্ভট রকমের রঙিন। ইশ, দাদু যদি তাকে এই পরিবেশে দেখত!

একটু পরে তিতির সম্রাটকে বলল,—চলি রে।

—যাবি? শরীর খারাপ বলছিলি? ড্রাইভারকে বলব তোকে ছেড়ে আসতে?

—নো থ্যাঙ্কস। আমি এখন ঠিক আছি। খাবারটা খুব ভাল ছিল রে। তিতির সকলের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল,— বাই ফোকস।

সমস্বরে সবাই বলে উঠল,—বাই মঞ্জিমা। নো হার্ড ফিলিংস।

তিতিরের মনটা যেন ভরে গেল। এতক্ষণে ঘরের সকলকে একটু একটু বন্ধু মনে হচ্ছে তার। একটু রাগ, একটু বিবাদ, একটু হাসি, একটু ভালবাসা, এর মধ্যে দিয়েই তো গড়ে ওঠে সম্পর্ক। আরেকটু থাকলে হত। মাকে তো বলাই আছে ফিরতে দেরি হবে।

আমোদিত কলরব ফেলে রাস্তায় এল তিতির। হাঁটছে। রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, অন্ধকার অন্ধকার। হু হু করে পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। মন্দ লাগে না হাঁটতে।

সহসা বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গুমোট ছিঁড়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল যেন। রাস্তার শুকনো পাতা, ছেঁড়া কাগজের টুকরো ধুলোয় নেচে উঠল ঝমঝম। চোখে মুখে ঢুকে যাচ্ছে ধূলিকণা। এলগিন রোডের মোড় বেশ খানিকটা দূর, সেখানে পৌঁছনোর আগেই প্রমত্ত ঝড় উঠে

গেল। ঘোড়ার খুরের মতো দাপিয়ে আসছে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। কালবৈশাখী।

তিতির জোরে পা চালাল। ওড়না দিয়ে আড়াল করছে মুখ। একটা গাছের নীচে দাঁড়াল একটু। এগোবে, না অপেক্ষা করবে? ভাবতে ভাবতেই ঝড়ের মাথায় চেপে জোর বৃষ্টি এসে গেছে। আরও দু-একটা লোক গাছের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। অন্ধের মতো দৌড়চ্ছে কেউ কেউ। এক মহিলার ছাতা উল্টে গেল।

ছুটন্ত এক মারুতি ঝপ করে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা এগিয়ে। সোঁ করে ব্যাক করে এল। জানলার কাচ নামিয়ে ডাকছে ব্যস্ত স্বর,—উঠে এসো। উঠে এসো।

তিতিরের হাঁটু কেঁপে গেল। টোটো।

৫৭

গাড়ির ড্যাশবোর্ডে হিন্দি গান বাজছে। এসি মেশিনের নিঃশব্দ ক্রিয়ায় হিম হয়ে আছে ভেতরটা। সামনের কাচে পাশাপাশি দুটো ওয়াইপার জল কাটছে ছপছপ। নিমেষে আলোকিত হচ্ছে পথঘাট, নিমেষে ঝাপসা।

পিছনের সিটে কাঠ হয়ে বসেছিল তিতির। ভেবে পাচ্ছিল না কেন কেবলুসের মতো উঠে পড়ল গাড়িতে। মুখের ওপর না বলে দিলে উচিত শিক্ষা হত টোটোর। কী করবে, তিতিরের মাথাটাই যে কাজ করল না তখন। আশপাশের লোকগুলোও বড্ড ড্যাবড্যাব করে দেখছিল যে! আশ্চর্য, তিতিরকে এত অপছন্দ তবু তাকে টোটো ডাকল কেন!

পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে টোটো। পাশেই বাঁ হাত মালিকি কেতায় সিটের মাথায় ছড়ানো। চকিত বৃষ্টিতে মোড়ে একটা যানজট হয়েছে, উদাস মুখে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

তিতির গলা ঝাড়ল, —আমাকে তুমি যে কোনও একটা বাস স্টপে নামিয়ে দিতে পারো।

টোটো যেন শুনতেই পেল না। গম্ভীর গলায় ড্রাইভারকে বলল,—রামদেও, টেপটা অফ করে দাও।

বাজনা থামতে অস্বস্তিটা যেন বেড়ে গেল দ্বিগুণ। অধৈর্য মুখে তিতির বলল, —থ্যাঙ্কস ফর দা লিফট। এখানে নামিয়ে দিলেও আমি বাড়ি চলে যেতে পারব।

ঘুরল টোটো। চোখ কুঁচকে দেখল তিতিরকে, —তুমি ভিজে গেছ।

—না না, তেমন কিছু ভিজিনি। আমি তো গাছের নীচে ছিলাম। বলতে বলতে আর একটু জবুথবু হল তিতির। গাড়িটা কি ডাক্তার আঙ্কল নতুন কিনেছে? নিশ্চয়ই নতুন। সিটের প্লাস্টিক এখনও ছেঁড়া হয়নি। আচমকা বৃষ্টির ছাটে সত্যিই তিতিরের সালোয়ার-কামিজ ভিজে গেছে অল্প অল্প, এত দামি গাড়ির নতুন সিটটা...!

টোটো তিতিরের আড়ষ্টতা লক্ষ করছিল। বলল, —কুঁকড়ে আছ কেন? রিল্যাক্স।

তিতির আরও গুটিয়ে গেল, —না না, আমি ঠিক আছি।

—কিচ্ছু ঠিক নেই। তুমি কাঁপছ।... রামদেও এসিটা অফ করে দাও।

টোটোর হাবভাব, কথা বলার ধরন-ধারণ, হুবহু বড়দের মতো। কী দাপটে হুকুম চালায় রে বাবা! মাঝবয়সী ড্রাইভারকে অবলীলায় নাম ধরে ডাকছে! মিনতি সন্ধ্যার মাকে তিতির কখনও দিদি মাসি ছাড়া ডাকতে পারবে? ডাক্তার আঙ্কলকে প্রাণপণে নকল করার চেষ্টা করছে টোটো, কিন্তু কোথায় যেন বাবা ছেলের মধ্যে একটা তফাত রয়ে গেছে। বোধ হয় এই ধরনের আচার আচরণেই। টোটোটা বেশ পাকা আছে।

যানজট বেয়ে শামুকের গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি। একটা বাস খারাপ হয়েছে সামনে, লোকজন জোগাড় করে তাকে ঠেলে সরাচ্ছে কন্ডাকটাররা, ইয়া ছাতি হাতে এক ট্রাফিক পুলিশ পর্যবেক্ষণ করছে দৃশ্যটা। বৃষ্টির ছাট কমে এল।

তিতির একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করল, —আমি কিন্তু সত্যিই চলে যেতে পারতাম। অসুবিধে হত না।

—পৌঁছে দিলে আপত্তি আছে ?

—তা নয়। তুমি কেন মিছিমিছি অতটা ঘুরবে ! কোথায় সাদার্ন মার্কেট, কোথায় ঢাকুরিয়া !

টোটো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। নরম গদিতে শরীর ছেড়ে দিয়েছে। গার্জেন সুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, —এদিকে এসেছিলে কোথায় ?

—কাছেই। বন্ধুর বাড়ি।

—তোমার সেই বয়ফ্রেন্ড ? মোটরসাইকেলঅলা ?

পলকে তিতিরের মুখ ভার। তাকে কি টিজ করার জন্যই গাড়িতে তুলেছে টোটো !

টোটোর মুখে হঠাৎ এক গাল হাসি, —চটে গেলে ?

বন্ধ জানলার কাচে মুখ ঘুরিয়ে নিল তিতির।

—খুব রেগে আছ মনে হচ্ছে ? আমি কিন্তু তোমাকে কখনও ইচ্ছে করে ইনসাল্ট করিনি।

—সে তো ব্যবহারেই বোঝা যায়। তিতিরের নিস্পৃহ উত্তর।

দু-এক সেকেন্ড চুপ করে রইল টোটো। আবার হেসে উঠেছে জোরে, —যদি কিছু বলেও থাকি সে তো কাটাকুটি হয়ে গেছে। উই ক্যান বি ফ্রেন্ডস নাউ।

তিতিরের রাগটা পড়ে আসছিল। তবু যে কেন বুকে এক ড্রাম বেজে চলে অবিরাম ! নিজেকে স্বাভাবিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করল তিতির, —এখানে আমার এক ক্লাসের বন্ধু থাকে, সম্রাট। চেনো তুমি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সম্রাটকে চিনব না ? ক্লাস সিকস অবধি এক সেকশানেই পড়েছি আমরা। আগে কতবার গেছি ওদের বাড়ি। ...বাড়ি বটে একখানা ! কী অ্যান্টিক কালেকশান ! ...ওদের বাড়ি এসেছিলে ?

—আমাদের আজ গেট টুগেদার ছিল।

—সম্রাটদের দেওয়ালের সব পেন্টিংগুলো দেখেছ ? ব্যাটল অফ ওয়াটারলু ? লাস্ট সাপারের কপি ? ওদের দোতলায় একটা স্কালপচার আছে, ওটা নাকি প্যারিস থেকে আনা।

কথায় কথায় পরিবেশ খানিকটা সহজ। তিতির ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করল, —তুমি কোত্থেকে আসছ ?

—স্যারের বাড়ি। মাঝে ক'দিন পড়তে আসা হয়নি...

তিতিরের আচমকা মনে পড়ে গেল ক'দিন আগে অপারেশন হয়েছে ছন্দা আন্টির। বাড়ি ফেরার পরও নাকি আন্টির শরীর ভাল যাচ্ছে না। ছি ছি, কথাটা আগেই তোলা উচিত ছিল।

তিতিরের স্বর উদ্বিগ্ন হল, —ছন্দা আন্টি এখন হাঁটচলা করছেন ?

টোটো একটু থমকাল যেন। হাসিতে পর্দা টেনে নিল। সামান্য সময় নিয়ে বলল, —করছে অল্পস্বল্প। আমরা বিছানা থেকে বেশি উঠতে দিচ্ছি না। স্টিচটা পাকিয়ে ফেলেছিল...

—তোমাদের খুব টেনশন গেল ক'দিন।

—তা গেল। এখন একটু সামলানো গেছে। দেশ থেকে কাকিমা এসে গেছে...

এ কথাটাও জানে তিতির। সোমবার ডাক্তার আঙ্কল এসেছিল বাড়িতে, মা'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিতির শুনেছে তখন। ছন্দা আন্টির অপারেশনের দিন ডাক্তার আঙ্কলের বাবাও এসেছিলেন কলকাতায়। টোটোর কাকাও কলকাতা-মাধবপুর করেছেন ক'দিন। ডাক্তার আঙ্কলের তো নাস্তানাবুদ অবস্থা। এক দিকে ছন্দা আন্টি, এক দিকে নিজের রুগী, অপারেশান, চেম্বার...। ও টিতেও নাকি ছন্দা আন্টির কিসব প্রবলেম হয়েছিল। জ্ঞান ফিরতে দেরি হচ্ছিল, আঙুল-টাঙুল নীল হয়ে গিয়েছিল...।

ছন্দা আন্টির মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিল তিতির। ডাক্তার আঙ্কলের কাছে ছবিতে দেখা মুখ

নয়, সেই ছোটবেলায় দেখা মুখটা। আবছা আবছা মনে পড়ে। কেমন সুন্দর করে ঠোঁট টিপে হাসত আন্টি! টোটো একবার তিতিরের হাত থেকে চকোলেট কেড়ে নিয়েছিল, একবারই, ছন্দা আন্টি খুব বকেছিল টোটোকে। ভারি মিষ্টি একটা গন্ধও বেরোত ছন্দা আন্টির গা থেকে। ঠিক ফুলেরও নয়, তেলেরও নয়। চেনা চেনা, আবার অচেনাও।

তিতির আনমনে বলে উঠল, —কতদিন আন্টিকে দেখিনি!

টোটো ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। তিতিরকে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল ভাঁজ। বলল, —যাবে মাকে দেখতে?

—আজ! এখন!

—হোয়াটস হার্ম? চলো না।

তিতির নার্ভাসভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল, —আজ যে অনেক দেরি হয়ে গেছে!

—সবে তো আটটা। ইচ্ছে হলে যেতে পারো।

তিতিরকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে টোটো! এতবার করে! নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না তিতিরের। টোটোর ঔদাসীন্যে বুকের গভীরে জমে ওঠা অভিমান, হিয়ার সঙ্গে টোটোর ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনায় গজিয়ে ওঠা গোপন ঈর্ষার অরণ্য কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। দুর্দম এক ইচ্ছেয় ছটফট করছে মন। বুকের ভেতর আর ড্রাম নয়, এক ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং ঢং। নিষেধের। যেয়ো না তিতির। কেন যাবে তিতির? যাবে না'ই বা কেন? মাকে ভয়? মা ছন্দা আন্টিকে পছন্দ করে না, তার সঙ্গে কবে কোনকালে কি মন কষাকষি হয়েছিল মা'র, কিন্তু সেসব তো মা'র ব্যাপার, তার সঙ্গে তিতিরের কী? ডাক্তার আঙ্কল তো দিব্যি নিউট্রাল, তিতিরই বা তা হবে না কেন? ছন্দা আন্টি ফোনে যথেষ্ট মিষ্টি করেই কথা বলে তিতিরের সঙ্গে। মা'র সবেতেই বাড়াবাড়ি। কাকিমা পিসি কবে কি বলল, তাও বছরের পর বছর পুষে রেখে দেয় মনে। দিদা মারা যাওয়ার পর পিসি বুঝি একবার দিদার গয়নার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, এখনও সুযোগ পেলেই মা তাই নিয়ে কথা শোনায় বাবাকে। কাকিমার তো সব কথাতেই দোষ। তিতিরকে সামান্য একটা দোপাট্টা কিনে দিলেও বাঁকা চোখে দেখে মা। তিতির ছন্দা আন্টির কাছে গেলে মা'র খারাপ লাগবে? মা যেন কত তিতিরের ভাল লাগা মন্দ লাগার মূল্য দেয়! দাদার টাকার জন্য হুট করে প্রোমোটারের হাতে বাড়িটা তুলে দিল মা, তখন কার খারাপ লাগার পরোয়া করেছে? দাদু কি যেচে বাড়ি ভাঙার কাগজে সই করেছিল? কক্ষনও না। বাড়ি ছিল দাদুর প্রাণ। দাদু তো সেই দুঃখেই...। সব জানে তিতির, সব জানে।

টোটো আবার প্রশ্ন করল, —রামদেওকে তাহলে সোজা বাড়ি যেতে বলি?

তিতির দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল। ছন্দা আন্টি অসুস্থ, তাকে দেখতে যাওয়া মোটেই গর্হিত অপরাধ নয়। তাও যেচে যাচ্ছে না তিতির, যাচ্ছে টোটোর উপরোধে।

তিতির অস্ফুটে বলল, —চলো, তবে বেশিক্ষণ কিন্তু বসব না।

বৃষ্টি ধরে গেছে। কালবৈশাখীর ঝমাঝম দশ মিনিটেই শেষ। ওয়াইপার থেমে গেল। সামনের স্বচ্ছ কাচের ওপারে স্পষ্ট হয়েছে পৃথিবী, আলোর বিচ্ছুরণ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ।

অল্প অল্প গরম লাগছিল তিতিরের। টোটোর দিকে ফিরে বলল, —কাচটা নামিয়ে দেওয়া যায় না?

—ও শিওর। হোয়াই নট? একদম বাবার মতো করে কাঁধ ঝাঁকাল টোটো। দু পাশের দুটো জানলাই খুলে দিল সটাসট। গাড়ির বাইরে আলগা হাত চালিয়ে বলল, —গরমটা অনেক কমে গেল।

—হ্যাঁ, বৃষ্টিটার দরকার ছিল খুব। গরমকাল আমার একটুও ভাল লাগে না।

—আমারও। উইন্টার ছাড়া সব সিজনই বোগাস। শীতে বেড়িয়ে আরাম, অনেক এনার্জি নিয়ে পড়াশোনা করা যায়...

—তুমি খুব পড়ো, তাই না?

টোটো আবার কাঁধ ঝাঁকাল,—পড়তে তো হয়ই।

—তুমি এবার হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করে যাবে।

—হ্যাহ। অত সহজ ?

—তুমি কত ভাল ছেলে। মাধ্যমিকেও তোমার র‍্যাংক ছিল। ফরটি্ট সেকেন্ড না ফরটি্ট থার্ড কি হয়েছিলে যেন ?

—ওরকমই কিছু একটা হবে। সেভাবে দেখতে গেলে তো সবারই র‍্যাংক আছে। যে কজন পাস করে প্রত্যেকেরই।... তুমি হিউম্যানিটিজে গেলে কেন ? ম্যাথস ভাল লাগে না ?

কথা বলতে বলতে তিতির অনেক স্বচ্ছন্দ এখন। শৈশবের পর থেকে বহুকাল সম্পর্ক ছিল না, সঙ্কোচের পলি জমেছিল মনে, কেটে যাচ্ছে। এলোমেলো কথার ফাঁকে কখনও স্কুলের কথা উঠে পড়ে, কখনও বা ছোটখাট ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা, কখনও বা বন্ধু-বান্ধবদের কথা। শুধু হিয়ার প্রসঙ্গটাই সন্তর্পণে এড়িয়ে যাচ্ছিল তিতির। দেখছিল টোটো নিজে থেকে তোলে কি না। তুলল না। টোটো ডাক্তার হতে চায় না শুনে তিতির ভারি অবাক। টোটোর নাকি সিভিল সারভিসে জয়েন করার শখ। ভাল ভাল। যা হুকুমদারি মেজাজ, ওটাই মানাবে। তিতির কি বলবে সে কী হতে চায় ! সাদা পোশাক পরা সন্ন্যাসিনী ! সিস্টার ভেরোনিকা সিস্টার সুজানের মতো ! বলল না। যদি হাসে টোটো।

রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়েছে বাদামি মারুতি। হাওয়া বইছে ফুরফুর। মেট্রো স্টেশনের সামনে এক বিরাট হোর্ডিং। সিনেমার।

জয়-পরাজয়। আরে, ছোটকার সেই ফিলমটা না !

বিশাল টিনের পাতে রঙচঙে নায়ক-নায়িকা পিঠে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রায় পদতলে, একেবারে কোনা ঘেঁষে ফুটে আছে এক টেরিকাটা মুখ, চেনা লোকরাই শুধু কন্দর্প বলে আন্দাজ করতে পারবে তাকে। নায়ক-নায়িকার নামের নীচে নামও আছে কন্দর্পর, অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে।

আশ্চর্য, বইটা রিলিজ হচ্ছে অথচ তিতির খবর পায়নি ! ভেতরে একটা খুশি গুনগুনিয়ে উঠল তিতিরের। বারবার দেখছে ছবিটা। কী ত্যাড়াবেঁকা করে এঁকেছে ছোটকাকে। তা হোক, তবু এঁকেছে তো !

টোটো তিতিরের দৃষ্টি অনুসরণ করার চেষ্টা করল,—কী দেখছ ?

উদ্গত উচ্ছ্বাসটাকে দমিয়ে ফেলল তিতির। টোটো যা হাইফাই ছেলে, হয়তো তিতিরের ছোটকা বাংলা ফিলমে অ্যাক্টিং করে শুনলে মুখ বেঁকাবে। দরকার কি বাবা, তিতিরের ছোটকা তিতিরেরই থাক।

তিতির হেসে বলল, —কিছু না।..... তোমাদের বাড়ি আর কদ্দূর ?

—এই তো এসে গেছি। আমাদের এই ফ্ল্যাটটায় তুমি আগে আসোনি, তাই না ?

টোটো হওয়ার পরই চেতলার বাড়ি ছেড়েছিল শুভাশিস, উঠে এসেছিল মনোহরপুকুর রোডে। বাড়িটা বড়ই ছিল, খোলামেলা। কিন্তু পাশে ছোটখাট বস্তিও ছিল একটা। সাদার্ন মার্কেটের এই ফ্ল্যাট বছর পাঁচেক আগে কেনা। তার কত আগে থেকেই তো আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তিতিরদের।

ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার সামনে মুগ্ধ চোখে ডাক্তার আঙ্কলের নেমপ্লেটটা দেখছিল তিতির। চকচকে বাদামি কাঠের গায়ে সোনালি অক্ষরে জ্বল জ্বল করছে আঙ্কলের নাম। তিতিরদের বাড়ি যে আঙ্কল যায়, সেই আঙ্কল কি এই আঙ্কল ! কেমন যেন অচেনা অচেনা লাগছে। সিরসির করছে তিতিরের বুক। ডাক্তার আঙ্কল কি বাড়িতে আছে এখন ? থাকার অবশ্য কথা নয়। যদি থাকে, তিতিরকে দেখে ভীষণ চমকে যাবে।

টোটোর কাকিমা দরজা খুলেছে। সাদামাটা চেহারা, কপালে একটা বড় সিঁদুরের টিপ। পিছনে

তার এক ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে।

টোটোকে দেখে মেয়েটা কলকল করে উঠল, —তোমার সঙ্গে আড়ি। তোমার সঙ্গে আড়ি।

মেয়েটাকে শূন্যে ছুঁড়ে লুফে নিল টোটো, —কেন রে ?

—তুমি এত দেরি করলে কেন ?

—বিশ্রী একটা নরওয়েস্টার এল না ! তাতেই তো ...

তিতির অবাক চোখে দেখছিল ফ্ল্যাটখানা। কী সুন্দর করে সাজানো গোছানো ! দামি দামি ফার্নিচার, প্লাস্টিক পেন্ট করা দেওয়াল, মেঝেতে নরম গালচে, অপরূপ সব শেডঅলা আলো চারদিকে। ডাক্তার আঙ্কল যে বড়লোক তিতির জানত, এত বড়লোক ! নিত্যদিন যে সাদাসাপটা হাসিখুশি মানুষটাকে দেখে তিতির, সে এমন একটা বাড়িতে বাস করে !

কাকিমার সঙ্গে তিতিরের পরিচয় করিয়ে দিল টোটো। ঝুপ করে একটা প্রণাম করল তিতির। টোটো বাচ্চাটাকে দেখিয়ে বলল, —আর এই হল আমার বোন। মাই ওনলি সিস্টার। মাদাম টুকি।

—উঁহু, মাদমোয়াজেল। তিতির টুকির গাল টিপে দিল, —ভারি সুইট তো।

টোটোর কাকিমা বলল, —তুমিই বা কম কি ! আহা, কী সুন্দর মুখখানা ! টোটোর সঙ্গে পড়ো বুঝি ?

তিতির টুক টুক ঘাড় নাড়ল।

টোটো সোজা ডান দিকের ঘরটায় ঢুকে গেছে। ডাকছে তিতিরকে, — এসো। মা এখানে।

রাজার বাড়ির বিছানায় যেন দুখিনী রানির মতো শুয়ে আছে ছন্দা আন্টি। দেওয়ালের দিকে মুখ, পাতলা একটা চাদরে গলা অবধি ঢাকা। কাটগ্লাসের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে, হালকা একটা দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বেডসাইড টেবিলে অজস্র ওষুধ। জলের জগ। একটা দুটো ম্যাগাজিনও রাখা আছে।

টোটো বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, —মা, দ্যাখো কে এসেছে।

ছন্দা আন্টি ঘুরল কষ্ট করে। দেখছে তিতিরকে, চিনতে পারছে না।

টোটো টিউবলাইট জ্বেলে দিল। বালিশে ভর দিয়ে সামান্য ওঠার চেষ্টা করল ছন্দা আন্টি। ঝট করে একবার তাকাল দরজার দিকে, যেন আরও কাউকে খুঁজছে। তারপর কেমন অদ্ভুত চোখে তাকাল ছেলের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, —তিতির না !

এতদিন পরেও তাকে দেখে চিনতে পেরেছে আন্টি ! কী করে চিনল ! তিতির হাসল আলগা,—শরীর এখন কেমন ?

আন্টি যেন শুনেও শুনল না। টোটোর দিকেই চোখ, —তুই ওকে কোত্থেকে পেলি !

—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল, ধরে আনলাম। ..... সারপ্রাইজ প্যাকেজ, কী বলো ?

পলকের জন্য দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠল আন্টির। ভয়ানক তীব্র। এত তীব্র যে তিতিরের গা ছমছম করে উঠেছে। শীর্ণ মুখের ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুকে গেঁথে যাচ্ছে যেন। আন্টি কি তিতিরকে দেখে খুশি হয়নি ! নাকি কোনও কষ্ট হচ্ছে শরীরে !

ক্ষণপরেই ছন্দার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটেছে। এক বিচিত্র নির্লিপ্তি সেই হাসিতে। চোখ বুজে ফেলল। বলল,—ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলি কেন ? যা, তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা।

টোটো বলল, — ও তোমাকেই দেখতে এসেছে।

—তাই ! .... আমি খুব ভাল আছি তিতির। তোমাদের খবর ভাল তো ?

—ওই এক রকম। তুমি শুয়ে পড়ো আন্টি।

—শুয়েই তো আছি সারা দিন। তা তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে ?

—চলছে।

—রুগীর ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। যাও, টোটোর ঘরে গল্প করো গিয়ে। ... টোটো,

তোর কাকিমাকে বলেছিস তিতির এসেছে ? ওকে একটু মিষ্টিটিষ্টি দিতে বল।

আন্টি কি একটু পাশে বসতে বলতে পারত না তিতিরকে ! একবার নয় তিতিরের গায়ে হাত রাখত ! আন্টির কথাগুলোও কেমন দায়সারা গোছের। তিতিরের মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

ছন্দার ঘর থেকে বেরিয়ে তিতির বলল, —এবার আমি যাই।

টোটো হাসছে বিচ্ছুর মতো, —কাকিমা তোমায় না খাইয়ে ছাড়বেই না।

—আমার কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। ... সম্রাটদের বাড়ি অনেক খেয়েছি, এখন আর কিছু খাব না প্লিজ।

—একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস অন্তত খেয়ে যাও। বলতে বলতে গলা ওঠাল টোটো, —কাকিমা, তিতির কিছু খাবে না বলছে। ফ্রিজে ঠাণ্ডা কিছু আছে কিনা দ্যাখো না।

—আছে। অলকা রান্নাঘর থেকে উত্তর দিল, —কিন্তু ওর ছিপি আমি খুলতে পারি না।

—ও কে। নো প্রবলেম। তিতিরকে হাতের ইশারায় উল্টো দিকের ঘরটা দেখাল টোটো,—তুমি এক সেকেন্ড আমার ঘরে বোসো। আমি আসছি।

বিরস মুখে টোটোর ঘরে ঢুকল তিতির। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছে। টোটোর ঘরের দেওয়ালে এ কিসের ছবি ! গোলাপ ক্ষেতের মাঝখানে ছোট্ট এক দোতলা কাঠের বাড়ি। আশ্চর্য, এই ছবি তো তিতির নিজের দেওয়ালে টাঙাতে চায়, এ ছবি এখানে এল কী করে !

বহু যুগ পর হঠাৎই তিতিরের পোস্তদানা মনটা পিনপিন করে উঠল, —তিতির পালা। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

তিতির ঘাড় বেঁকাল, —কেন ? এটা আমার ডাক্তার আঙ্কলের বাড়ি।

—মোটেই না। এটা টোটোর বাড়ি।

—সো হোয়াট ? তা বলে পালাব কেন ?

—তর্ক করিস না। যা বলছি শোন। শিগগিরই তোর সঙ্গে টোটোর ঝগড়া হবে।

—মোটেই না। টোটো এখন আমার বন্ধু।

টোটো দু হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে ঘরে এল। ব্যস, পোস্তদানা মন চুপ।

তিতির গ্লাসে চুমুক দিল,—এই পোস্টারটা কে লাগিয়েছে ?

—আমার ঘরে আবার কে লাগাবে ! আমিই।

—তুমি বুঝি নেচার খুব ভালবাস ?

—ভীষ্ঈষণ। নতুন একটা ক্যামেরা পেয়েছি, তা দিয়ে এখন তো শুধু নেচারেরই ছবি তুলছি। বাড়িতে একটা ক্রাইসিস হয়ে গেল, নইলে একদিন বোটানিক্সে যাব ভাবছিলাম। প্রকাণ্ড বটগাছটার ছবি তুলে রাখা দরকার। নানান অ্যাঙ্গেল থেকে। শয়ে শয়ে ঝুরি নেমেছে গাছ থেকে, মেন ট্রাঙ্কটা তো আর এগজিস্টই করে না। দারুণ ফ্যাসিনেটিং, তাই না ?

কথায় কথায় খানিকটা সময় গড়িয়ে গেল। নটা বেজে গেছে।

টোটো বলল, — চলো, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

—তুমি আবার কেন বেরোবে !

—তা বললে হয় নাকি ! আমি তোমার দেরি করিয়ে দিলাম। রামদেও দশটা অবধি থাকে, চলো তোমারও একটু ঘুরে আসা হবে।

পোস্তদানা মনের সাবধানবাণী বেবাক ভুলে গেল তিতির, —চলো।

সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরে জেট প্লেনের মতো ছুটছে গাড়ি। শনশন হাওয়ায় উড়ছে তিতিরের চুল। বাতাসে ভারি নরম এক সোঁদা গন্ধ। আলোছায়ায় মাখামাখি গোটা পথ।

টোটো হঠাৎ বলল, —তোমার সেই বয়ফ্রেন্ডটাকে একদিন দেখলাম।

তিতির অন্যমনস্ক ছিল। বলল, —কে বয়ফ্রন্ড ?

—সেই মোটরসাইকেলঅলা। আনোয়ার শাহ রোডে আমাদের আগের গাড়িটার ক্লাচ অ্যাডজাস্ট

করতে গিয়েছিলাম, দেখি গ্যারেজের কয়েকটা মেকানিকের সঙ্গে বসে হেভি গুলতানি করছে। ওরা বুঝি সব তোমার বয়ফ্রেন্ডের দোস্ত ?

কথাটা ফুটল তিতিরের গায়ে। আবার একটু মজাও পেল যেন। টোটো কি সুকান্তকে হিংসে করে ! নইলে সামান্য সুযোগ পেলেই সুকান্তর কথা তোলে কেন !

তিতির বলল, —হতেই পারে। এক এক জনের কত লেভেলের বন্ধু থাকে।

—ওর লেভেলটা ভাল না।

—হতে পারে। তিতির উলটো ঘা দিতে চাইল টোটোকে। ঝুপ করে হিয়ার প্রসঙ্গ টানল, —তোমার হিয়ার খবর কী? অ্যানুয়াল কেমন দিল ?

টোটো নড়ে চড়ে বসল, —আমার হিয়া কেন হবে, হিয়া তো তোমার বন্ধু।

—ছিল। এখন নেই। স্কুলে তো সবাই বলে হিয়া রাজর্ষি আইসোটোপ বনে গেছে।

—হ্যাঁ। আই ফিল ফর হিয়া। এত স্যাড লাইফ হিয়াটার !

হঠাৎই হিয়াকে যেন জাতশত্রু মনে হল তিতিরের। গোমড়া গলায় বলল,—মোটেই স্যাড লাইফ না। বহুকাল আগে বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে গেছে, তারপর দিব্যি জলি ছিল, এখন আবার বেশি প্যানপ্যানানি শুরু করেছে।

—জানো, হিয়ার বাবা আবার বিয়ে করেছে ?

— তো কি ? ওর মা তো আরও আগে বিয়ে করেছে। ওর ভাই সেখানে অ্যাডজাস্ট করে থাকে না ? বাবা-মা'র লাইফ হল বাবা-মা'র লাইফ। তাই নিয়ে ছেলেমেয়েদের কাঁদতে বসার কী আছে ! হিয়ার বাবা হিয়াকে যথেষ্ট ভালবাসে। মোটেই নেগলেক্ট করে না।

টোটো একটু চুপ থেকে বলল, —হিয়ার ঠাকুমা বাড়ি থেকে চলে গেছেন, জানো ?

তিতির জোর একটা ঝাঁকুনি খেল। যা ভাবে না, যা বিশ্বাস করে না, প্রিয় বান্ধবীর সম্পর্কে তাই বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছিল সে। কিন্তু এই ধাক্কা যে তার চেয়েও বেশি।

তিতির থম মুখে বলল, — কোথায় গেছেন ঠাকুমা ?

—আপাতত হিয়ার কোনও এক দূরসম্পর্কের পিসির বাড়ি। ওখান থেকে ওল্ডহোম, আশ্রম কোথাও একটা জায়গা খুঁজছেন। পেলেই চলে যাবেন।

তিতিরের চোখে জল এসে গেল। নাক টানছে। হিয়ার ওপর কেন এত নিষ্ঠুর হয়ে পড়ছে সে ! তিতিরের মনটা কি খুব ছোট হয়ে গেল !

ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে নেমে তিতিরদের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে গাড়ি। তিতির বাড়ির রাস্তাটা চিনিয়ে দিচ্ছিল ড্রাইভারকে। আর বিশ-তিরিশ গজ বাকি। হঠাৎই টোটো চিৎকার করে উঠল, —রামদেও, থামো। গাড়ি ঘোরাও।

তিতির বলতে যাচ্ছিল, কী হল ? তার আগে টোটোই হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিয়েছে তিতিরকে, — নেমে যাও।

—এখানে কেন ? বাড়ি অবধি আসবে না ?

—না। তোমরা যে ক্লাসের মেয়ে, তারা কোনওদিনই হিয়ার কষ্ট বুঝতে পারবে না। টোটোর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে দপ দপ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, — নাউ গেট ডাউন।

তিতির নামতেই সোঁ করে পাক খেল গাড়িটা। দ্রুতগামী সরীসৃপের মতো চলে গেল পিছলে।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিতির। টোটোর ওই আকস্মিক রূঢ় ব্যবহারের কার্যকারণ খুঁজে পাচ্ছে না কোনও। হিয়াকে নিয়ে একটু কঠিন কঠিন কথা বলেছে বলে এত রাগ ! টোটোর এখন এত প্রেম হিয়ার ওপর !

তিতির অন্ধের মতো হাঁটছিল। দু-তিন পা হেঁটেই পাথর হয়ে গেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে

ডাক্তার আঙ্কলের সাদা মারুতিটা দাঁড়িয়ে আছে।

একটা কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল তিতিরের মন থেকে। সে এত বোকা ছিল এতদিন!

৫৮

দুলালের সামনে আজ ইয়া ইয়া অন্ধ্রের কাতলা। কন্দর্প নাক কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, —আর কিছু নেই রে?

দুলাল একটা মাছের পেট থেকে তেল বার করছিল। কন্দর্পর দিকে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। অর্থাৎ উত্তরের প্রয়োজন নেই।

—চেতল-ফেতল রাখছিস না?

—নেবেন? পেটি দেড়শো, গাদা একশো। কাল এনে রাখব।

—কাল কি আর আসা হবে? আজ যদি হত .....

—আজ অন্য একটা রাজা মাছ আছে। চন্দন, নীচের ঝুড়ি থেকে বার কর তো।

প্যান্ট শার্ট পরা কেতাদুরস্ত চন্দন লাফিয়ে নামল দোকানের ঝাঁপি থেকে। তলার খাঁজ থেকে টেনে বার করে আনল এক রুপোলি ইলিশ। বরফে বরফে কাঠের মতো হয়ে আছে মাছটা, —নেবেন? পদ্মার মাল। তেলে কড়া ভেসে যাবে।

কন্দর্প ঈষৎ বিপদের গন্ধ গেল। লঘু সুরে বলল, —কত করে যাচ্ছে?

—চন্দন, মাছটা ঢুকিয়ে রাখ। দুলাল কাটা কাতল্যার আঁশ ছাড়াচ্ছে।

ফ্যাকাসে হাসল কন্দর্প, — দাম শোনাও কি বারণ?

—শুনে কী করবেন দাদা? আমার বঁটি আমারই গলায় মারবেন।

—তবু শুনি।

দুলাল গলা নামাল, —একশো ষাট।

আঁতকে এক পা পিছিয়ে গেল কন্দর্প, —ওই দামে কেউ কিনবে?

—কিনবে মানে? মালা পরিয়ে নিয়ে যাবে। দেখুন না একটু দাঁড়িয়ে। এ মাছের খদ্দেররা এসে দরদাম করে না। শুধু বলে পিস ছোট কোরো না দুলাল। ছোট পিস খেলে মানুষের মন ছোট হয়ে যায়।

শালা, লোকজনের হাতে কাঁচা পয়সাও আসছে বটে! টাকা যেন উড়ছে! অশোকদাকে দেখেই চোখ টাটায়, আর এখন যেন সবাই অশোকদা। ঘুষের টাকা বাঁই বাঁই নাচছে। সরকারি ঘুষ, বেসরকারি ঘুষ, ব্যবসায়িক ঘুষ, হাপ্তা, কমিশন, দালালি ....। একেই কি শাস্ত্রে কলিকাল বলেছিল!

বেজার মুখে চারশো কাটা পোনা নিয়ে সরে এল কন্দর্প। সবজির বাজারেও এ সময়ে ঘুরে সুখ নেই। শুধু পটল আর ঝিঙে, ঝিঙে আর পটল। সঙ্গে দড়কচা মারা বেগুন, নয় পানসে কুমড়ো। তবু খানিক্ষণ বাজারটা চরকি মারল কন্দর্প। দেড়েমুশে বাজারখানা চষতে তার মন্দ লাগে না। ডিমওলি শাকওলির সঙ্গে রঙ্গরসিকতা জোড়ে, সবজিঅলার সঙ্গে অকারণ দরদস্তুর চালায়, ফলঅলার দোকানে গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আম-কলা। সবটাই যে কেনার অনুষঙ্গ তা নয়, লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে কন্দর্পর বেশ লাগে। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ বাচনভঙ্গি আছে, নিজস্ব মুদ্রাদোষ আছে, এ সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কন্দর্প। সাত টাকার বেগুনকে পাঁচ টাকা বললে কেউ বেজায় চটে যায়, কেউ বা হা-হা করে হাসে, কেউ কেউ সন্ন্যাসীর মতো উপেক্ষা করে কন্দর্পকে। সবই ভারি মজার, সবই ভারি শিক্ষার। মনের নোটবুকে কন্দর্প টপাটপ নোট নিয়ে চলে, ডায়ালগ ডেলিভারির কায়দাগুলো তুলে নেয় মস্তিষ্কে।

এবার আমের ফলন ভাল। বৈশাখের গোড়াতেই হিমসাগরে ছেয়ে গেছে বাজার, একটা দুটো

ল্যাংড়াও উঁকি মারছে। কারবাইড মারা বোধ হয়, তবু কেজি খানেক ল্যাংড়াই নিল কন্দর্প। বাপ্পাটা এসেছে, কবে চলে যায়, মাছ খেয়ে সুখ না হোক, একটু আম খেয়েই তৃপ্তি পাক।

বাজার থেকে বেরিয়ে একটা বাংলা কাগজ কিনল কন্দর্প। এই কাগজে আজ সিনেমা টিভির পাতা আছে, একটু চোখ বোলাতে হবে। আরও কয়েকটা টুকিটাকি সওদা করল বাইরের দোকান থেকে। নিজের পয়সায়। একটা গায়ে মাখার সাবান, শ্যাম্পুর শ্যাশে, শেভিং ক্রিম। গোটা কয়েক নুডলসের প্যাকেটও কিনল, তিতিরটা খেতে ভালবাসে।

কেনাকাটা শেষ করে তৃপ্ত মুখে একটা সিগারেট ধরাল কন্দর্প। ঠিক তখনই বাপ্পাকে দেখতে পেল। হনহন করে বাপ্পা হেঁটে আসছে স্টেশনের দিকে। কন্দর্পকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল,—তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও ছোটকা। দুজন ভদ্রলোক তোমার জন্য ওয়েট করছে।

—কে ? নাম কী ?

—একজন কি সাম কুণ্ডু। প্রোডিউসার-ফোডিউসার মনে হয়।

—রতন কুণ্ডু ?

—হতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না। যাও যাও, অনেকক্ষণ বসে আছে।

কন্দর্প একটু টাল খেয়ে গেল। রতন কুণ্ডু নামী প্রোডিউসার, সে হঠাৎ তার বাড়িতে কেন ! আর এলও যদি, তো এই সময়ে ! দাড়ি-টাড়ি কামানো নেই, দু-হাতে দুই বাজারের থলি .... কী ইম্প্রেশানটা হবে কন্দর্পর সম্পর্কে ! থলি দুটোরও যা চিটচিটে দশা ! দোষটা অবশ্য নিজের। বউদি রোজই বদলাতে বলে, কন্দর্পরই মনে থাকে না। এখনই কিনে ফেলবে নাকি দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ !

কন্দর্প চোখ সরু করে তাকাল, —কোন ঘরে বসেছে রে ?

—কোথায় আবার। বড়ঘরে। বাপ্পা হনহনিয়ে চলে গেল।

প্রশ্নটারই কোনও মানে হয় না। বড়ঘরে বসবে না তো কি রান্নাঘরে যাবে ! কন্দর্প পা চালাতে চালাতে একটা হিসেব ছকে নিল। ব্যাগ দুটোকে এক হাতে নিয়ে পাঞ্জাবির আড়ালে ধরে সুড়ুৎ করে বড়ঘর পার হয়ে যাবে। ভেতরে ঢুকে ব্যাগ নামিয়েই ফিরে আসবে ঝ্যাট করে। যেন ঢোকার সময়ে খেয়ালই করেনি, এমন ভাবে বলবে, আপনারা !

ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার পথে এক মহিলা ঘুরে ঘুরে দেখছে কন্দর্পকে। মাথা ঝাঁকিয়ে একগুচ্ছি চুল কপালে এনে নিল কন্দর্প। সকালের দিকে যেমন তেমনভাবে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, কিন্তু এটা বোধ হয় ঠিক নয়। নিজের পাড়ায় চেনা বামুনের পৈতে লাগে না ঠিকই, তবু কন্দর্প রায় এখন একটা ফিগার, লোকজন এখন চিনতে পারে তাকে, এভাবে ফেকলুর মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শোভা পায় না তার।

বাড়ি ঢুকতে গিয়েই কন্দর্প ধরা পড়ে গেল। রতন কুণ্ডু বারান্দায় পায়চারি করছে। বছর ষাটেকের সৌম্য চেহারা, পরনে ভাঁজভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় সরু সোনার চেন।

কন্দর্পকে দেখে একগাল হাসল রতন কুণ্ডু, —অ্যাই যে। এসে গ্যাচো ? তোমার প্রিতিক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আচি।

—আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। কন্দর্প শশব্যস্ত, —আজ একটু বাজার যাওয়ার শখ হয়েছিল ..... আপনাদের চা-টা দিয়েছে ?

—সে হবে'খন। তুমি এসো চটপট।

ঘরে ঢুকে অন্য প্রাণীটিকেও দেখতে পেল কন্দর্প। জীবন ভটচাজ। বছর চারেক আগে একটা ফিচার ফিলম ডাইরেক্ট করেছিল, চলেনি, এখন টিভির লাইনে ঘুর ঘুর করছে। রতন কুণ্ডু কি সিরিয়াল ধরছে ! স্টুডিওপাড়ায় খবর নেই তো !

রান্নাঘরে বাজার নামিয়ে সন্ধ্যার মাকে চা করতে বলল কন্দর্প। মিষ্টি আনানোর জন্য ব্যাগ থেকে দশ টাকা বার করেও রেখে দিল। বড় মানুষদের কথায় কথায় খাওয়াতে নেই। ওতে লোকে খেলো ভাবে। তাছাড়া আজকাল মাঝে মাঝেই ডিরেক্টর প্রোডিউসার আসছে বাড়িতে, বেশির ভাগই

টিভির খুচরো রোলের জন্য, এদের বেশি আমল দিতে নেই। তবে রতন কুণ্ডু অবশ্য উঁচু জাতের মাল, ওকে একটা ওমলেট খাওয়ানো যায়।

কন্দর্প সন্ধ্যার মাকে বলল,—ফ্রিজে ডিম আছে ? থাকলে চায়ের সঙ্গে ভেজে দিয়ো। আর কটা কুচো নোনতা বিস্কুট ...

সিগারেট দেশলাই হাতে বড়ঘরে এসে বসল কন্দর্প। প্যাকেটটা হালকাভাবে ছুঁড়ে দিল টেবিলে, —বলুন রতনদা, হঠাৎ আপনার দর্শন ?

রতন কুণ্ডু ডিবে থেকে নস্যি নিল শব্দ করে। রুমাল বার করে নাক মুছল, — আমি একটা ফিচার শুরু করচি, বুইলে। গ্রাম-শহর মেশানো। জীবনবাবুই স্টোরিটা লিকেচেন।

জীবন ভটচাজ বলল, —একটু মিউজিক বেসড গপ্প। হিরো গ্রামে যাত্রাদলে গান গাইত, শহরে এসে নাম করল। গ্রামে তার প্রেমিকা আছে, আবার শহরেও একটা মেয়ে তার প্রেমে পড়ে গেল ....

কন্দর্প সিগারেট ধরাল, —তা আমার কি রোল ?

রতন বলল, —রোল মানে ! তুমি হিরো।

কোঁৎ করে খানিকটা ধোঁয়া গিলে ফেলল কন্দর্প। কঠিন আয়াসে সামলাল চমকটা। কার মুখ দেখে উঠেছিল আজ ! দরজা খোলার সময়ে মিনতি বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছিল না ! ওকে একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে।

কন্দর্প উঠে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল জীবনকে। জীবন বলল, —নো থ্যাঙ্কস। আমার চলে না।

—রতনদা আপনি ?

—আমার তো দিনে দুটো। একটা ভোরবেলা বাথরুম করতে লাগে, আর একটা রাতে খাওয়াদাওয়ার পর।

কন্দর্প সোফায় হেলান দিয়ে বসল, —আপনাদের কবে থেকে শুটিং শুরু হচ্ছে ?

—রথের দিন মহরত হবে। এখন থেকেই সব সইসাবুদগুলো করিয়ে নিতে চাই।

কন্দর্প উসখুস করতে করতে প্রশ্ন করে ফেলল, —হিরোইন কে কে ?

—দুটো মেয়েই নতুন নেব ভাবচি। একটা অবশ্য একদম নতুন নয়, তুমি তার সঙ্গে কাজ করেচ। মণিকা। রতন গলা নামাল, —আমার একটু লো বাজেট, বুইলে ?

— তাতে কি ? মণিকা তো অভিনয় ভালই করে। ও কি গ্রামেরটা করছে ?

—না না, ও শহরের। গ্রামের জন একদম নিউ ফেস। মেয়ে দেকা চলচে, এখনও ফাইনাল হয়নি।

—ও। তা স্ক্রিপট-টিপট শোনাবেন না ?

—নিশ্চয়ই। জীবন তোমাকে কপি দিয়ে দেবে।

কেমন যেন একটু আশঙ্কা হল কন্দর্পর। সত্যি সত্যিই তাকে হিরো করতে চাইছে রতন কুণ্ডু ! তার কি বক্স আছে কোনও ! গাঁয়েগঞ্জে তো একটা মানুষও তাকে তেমন করে চেনে না ! অবশ্য জয় পরাজয় রিলিজ করলে অবস্থা একটু বদলে যাবে, কিন্তু তাও কত ভাল।

কন্দর্প পলকা কৌতূহল ছুঁড়ল, —মেল আর কে লিডে আছে ?

—আমার ছবিতে দুটো-তিনটে হিরোর কারবার নেই। তুমি একাই হিরো। ফার্স্ট টু লাস্ট তুমিই ছবি টানবে।

ধুস, স্বপ্ন। কন্দর্প নির্ঘাত জেগে নেই। নাকি লোক দুটো পাগল ! ঠিক যেরকমটি নায়কের ব্রেক সে আশা করে এসেছে এতদিন, সেরকমটিই ঘটছে, এও কি সম্ভব !

বাইরে একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। সুদীপের অফিস আজকাল গাড়ি দিচ্ছে সুদীপকে। ব্রিফকেস নিয়ে হন্তদন্ত মুখে বেরিয়ে গেল সুদীপ। রুনা অ্যাটমও বেরোচ্ছে পিছন পিছন। সন্ধ্যার মা চা ডিমভাজা রেখে গেল।

কন্দর্প বিগলিত মুখে বলল,— খেয়ে নিন আগে।

জীবন ভটচাজ গম্ভীর মুখে প্লেট টানল, গম্ভীর মুখে খাচ্ছে। রতন কুণ্ডু অন্যমনস্ক মুখে প্লেট টানল, অন্যমনস্ক মুখে খাচ্ছে। টুকটাক কথা চলছে তিন জনের। কোন কোন টেকনিশিয়ান কাজ করবে ছবিতে, কবে থেকে আউটডোর শুরু হবে, কোথায় আউটডোরের প্ল্যান, ইনডোরেই বা ক'দিনের কাজ এই সব।

এক সময়ে আসল কথাটা উঠল।

জীবন ভটচাজ চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল,— রতনদা, টাকা-পয়সার কথাটা সেরে নিন।

—হ্যাঁ বলি। সোফায় সোজা হয়ে বসল রতন,— দ্যাকো কন্দর্প, বড় বড় নায়কদের কাছে আমি যেতে পারচি না। প্রথমেই বলেচি টাকা বেশি নেই।

জীবন বলল,— কিন্তু গল্পটা খুব সিরিয়াস। তুমি আমার গোলাপকুঁড়ি নিশ্চয়ই দেখেছিলে। বুঝেছ তো আমি একটু অফ বিট্ ভঙ্গিতে কাজ করি। এ রোল তোমাকে লাইম লাইটে এনে দেবে।

কন্দর্পর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। অশোকদা একবার বলেছিল ছোটামোটা রোল করেই নাকি জীবন কাটবে কন্দর্পর! এখনই চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। তা অশোকদা যাই বলুক, তার কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই কন্দর্পর। জয় পরাজয়ে চান্স না পেলে কে কন্দর্পর দরজায় আসত!

রতন বলল,— তুমি বলো তুমি কীরকম আশা করচ?

কন্দর্প ডান হাতটা চুলকোল। যা হয় একটা কিছু বলে দেবে নাকি! শুনেই যদি ভেগে যায়!

ঢোঁক গিলে কন্দর্প বলল,— এ আমি কী বলব? আপনি পুরনো মানুষ ...

রতন কুণ্ডু জীবনের দিকে তাকাল। চোখে চোখে কি যেন কথা হল দুজনের। জীবন বলল,— আমরা মোটামুটি হিরোর জন্য তিরিশ ধরেছি।

একটা ছবিতে তিরিশ হাজার! কন্দর্পর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। তবে ভাবটা ফুটতে দিল না মুখে। মাথা চুলকে বলল,— আর দশ বাড়ানো যায় না?

জীবন কি একটা বলতে যাচ্ছিল। রতন ইশারায় থামাল,—ঠিক আচে, আর পাঁচ বাড়ালাম। আজই হাজার এক টাকা সাইনিং অ্যামাউন্ট দিয়ে যাচ্ছি। মহরতের আগে আরও দশ। বাকিটা শুটিং-এর মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তুমি আর না বোলো না। এটা চেকেই দিচ্ছি, বাকিটা চেক-ক্যাশ ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি করে দেব। ঠিক আচে?

ঘোর ঘোর স্বপ্নের মধ্যে গোটা সকালটা ঘরে শুয়ে রইল কন্দর্প। বারোটা নাগাদ উঠল বিছানা ছেড়ে। দাড়ি কামিয়ে স্নানখাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল। স্কুটার নিল না সঙ্গে, স্টুডিওপাড়ায় যাবে না আজ। সোজা একটা ট্যাক্সি ধরে নামল স্যাস ক্লিনিকের সামনে।

বাইরে প্রখর উত্তাপ, নার্সিংহোমের ভেতরে পাহাড়ি ঠাণ্ডা। আহা, শুভাশিসদা খাসা বানিয়েছে জায়গাটা!

মধুমিতার রিসেপশান কাউন্টারেই থাকার কথা, নেই। এদিক ওদিক চোখ চালিয়ে খুঁজল কন্দর্প। পাশের অফিসঘরে গেল। কী সব ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাটি করছে মধুমিতা। কন্দর্পকে দেখে বেরিয়ে এল বাইরে। অবাক মুখে বলল,— আজ হঠাৎ! কাল যে বললেন আসবেন না!

কীভাবে ভীষণ খুশির খবর দিতে হয় ভেবে পাচ্ছিল না কন্দর্প। ধেই ধেই করে নেচে দেবে! হৃদয় আমার নাচে রে বলে গান জুড়বে!

কিছুই করতে হল না। মধুমিতাই বলে উঠল,—ভাল খবর আছে মনে হচ্ছে?

কন্দর্পর কথা জড়িয়ে গেল,—আমি বাজি মেরে দিয়েছি।

—কীসের বাজি?

—একটা হিরোর রোল পেয়ে গেছি। আজ সকালে কনট্র্যাক্ট হল। হাফ হিরো কোয়ার্টার হিরো নয়, পুরোদস্তুর নায়ক।

মধুমিতাকে তেমন একটা ছুঁল না খবরটা,—তাই বলুন। আমি ভাবলাম কি না কি!

কেমন সুখবর আশা করে মধুমিতা কন্দর্পর কাছ থেকে ! কন্দর্প সামান্য আহত হল,—তুমি এটাকে গ্র্যান্ড নিউজ বলো না ?

—আপনি শাইন করছেন। ভালই তো। ... খাওয়াচ্ছেন কবে ?

ব্যস, এইটুকুই শুধু বলার আছে মধুমিতার ! কপালে একটা ছোট্ট নীল টিপ পরেছে মধুমিতা, সেদিকে তাকিয়ে কন্দর্প দীর্ঘশ্বাস লুকোল,—যেদিন বলবে। যদি বলো আজই।

—আজ হবে না। সন্ধেবেলা মা বেরোবে, একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে।

কন্দর্প চুপ করে গেল। কত কথার বুদবুদ ঠেলে উঠছে বুকে, কিছুই বলতে ইচ্ছে করল না। টাকা হাতে এলে স্কুটার বেচে দিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কেনার মতলব ঘুরছে মাথায়। মধুমিতার সঙ্গে একটু আলোচনা করবে ভেবেছিল। থাক। তার খুশিতে জগৎসংসার উল্লসিত হয়ে উঠবে এটা ভাবাও তো মূর্খামি।

ঘরের ভেতর থেকে ডাক এল,—মিসেস সিন্‌হা, সাত নম্বরের বিলটা রেডি হয়েছে ?

—আসি বীরেশদা, এই এক মিনিট। মেডিকেল টেস্টের ভাউচারগুলো যে কোথায় গেল !

—ফাইলে নেই ?

—দেখছি না তো।

—কোথায় মিসপ্লেসড হল ? ওরা কিন্তু চারটের সময়ে পেশেন্ট নিতে আসবে।

—দেখছি। কোথাও ঢুকে আছে নিশ্চয়ই।

মধুমিতা যেতেও পারছে না, আবার যেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও অস্বস্তি। কন্দর্পই মুক্তি দিল তাকে,—চলি।

—কাল আসছেন তো ?

—দেখি।

পথের ঝাঁঝালো রোদ্দুর গায়ে লাগছিল না কন্দর্পর। অন্যমনস্ক মনে হাঁটছিল। কোনও এক চিন্তাতে স্থিত হতে পারছে না মাথা, পরের পর পিছলে যাচ্ছে চিন্তারা। একা একা বেশিক্ষণ খুশিও থাকা যায় না, আনন্দ কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়। এই যে আকাশ থেকে একটা সুযোগ ঝরে পড়েছে কন্দর্পর ঝুলিতে, এ খবরে কেন মন ভরে না মধুমিতার ! একটা একটা করে নিশ্চিন্ততার সোপান তৈরি হবে, তার পরেই না কন্দর্প ... !

খানিক এদিক-সেদিক ঘুরে অশোক মুস্তাফির অফিসে এল কন্দর্প। খুশি হোক আর না হোক, খবরটা অশোকদাকে দেওয়া তার কর্তব্য। অন্য কারুর মুখ থেকে শুনলে সেটা খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে।

মুস্তাফির ঘরে আরও দুটো যণ্ডামার্কা লোক বসে আছে। কন্দর্পকে দেখে খিক খিক হাসল মুস্তাফি,—লাক খুলছে, অ্যাঁ ?

এবার কন্দর্পর চমকানোর পালা। অপ্রস্তুত মুখে বলল,— কীসের লাক ?

—কুণ্ডুদা তোমায় হিরো বানিয়ে ফেলল !

—আপনি জানলেন কী করে ?

—ইনটিউশান। মুস্তাফি শরীর কাঁপিয়ে হাসছে, পরশু কুণ্ডুদা রূপেনের কাছে তোমার অ্যাড্রেস খুঁজছিল। কাল জীবন আমায় তোমার জয়-পরাজয়ের কাজ নিয়ে জিজ্ঞেস করছিল। আজ তুমি যে তুমি, যে দশ বারো দিন ধরে আমার অফিস মাড়াচ্ছ না, হঠাৎ খারপোশের মতো মুখ করে আমার চেম্বারে ঢুকে পড়লে ... এরপর জানতে কি বাকি থাকে !

—সবই আপনার আশীর্বাদ অশোকদা।

—মারব এক রদ্দা। এতটুকু সেলফ কনফিডেন্স নেই ! কতয় সই করলে ?

কন্দর্প যণ্ডা লোক দুটোকে এক ঝলক দেখে নিল। পঁয়ত্রিশ বলতে গিয়ে কি ভেবে বাড়িয়ে নিল একটু। বলল,—চল্লিশ।

মুস্তাফি প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে,—মাত্র চল্লিশ ! তুমি একটা গাড়ল। তুমি একটা পাঁঠা। তোমার টেংরি খুলে নেওয়া উচিত। কিন্তু লাভ নেই, বাজারে বিক্রি হবে না। জানো, কুণ্ডু কী চিজ ! দুটো ফ্লাওয়ার মিল আছে ব্যাটার। সাল্কেরটা তো রমরমিয়ে চলে। মিনিমাম এক লাখ নেওয়া উচিত ছিল।

—এক লাখ কে আমায় দেবে অশোকদা ?

—তোমার কলজের জোর থাকলে ওই কুণ্ডুটাই দিত। তোমার নজরটা এখনও নিচুই রয়ে গেল কন্দর্প।

এখানেও আনন্দটা ঠিক বাঁটা গেল না। কন্দর্প আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ল। মুস্তাফি ভাবলেশহীন মুখে ষণ্ডা লোক দুটোকে কার যেন ঠিকানা দিচ্ছে। কোন এক কাস্টমার মুস্তাফির ফিনান্স কোম্পানি থেকে গাড়ি কেনার জন্য লোন করেছিল, ক'মাস ধরে নাকি গঙ্গায় ডুব দিয়ে বসে আছে, তাকে একটু চমকাতে মাসল্‌ম্যান দুটোকে পাঠাচ্ছে মুস্তাফি। লোক দুটো নির্দেশ নিয়ে উঠে গেল। শেষ মুহূর্তে মুস্তাফি তাদের আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল লোকটার যেন ফিজিকাল ইনজুরি না হয়।

চেম্বার ফাঁকা হতেই মুস্তাফি বলল,— তারপর বউদির খবর কী বলো ? দাদা কাশী থেকে ফিরেছেন তো ?

—ফিরেছে।

—মেজদা কী করছে ? বাড়িটাড়ি দেখা শুরু করেছে ?

—দেখছে বোধহয়। রোববার তো একটা দালালের সঙ্গে বেরোল।

—দেখো, আমার কিন্তু প্ল্যান জমা পড়ে গেছে, দু-দশ দিনের মধ্যে বেরিয়েও যাবে। বাই জুন আমি বাড়ি ভাঙা শুরু করব।

—এত তাড়াতাড়ি ?

—তাড়াতাড়ি কোথায় ! চার-পাঁচ মাস তো হয়েই গেল। পুজোর আগে কাজটা না শুরু করতে পারলে আমার অনেক টাকা ব্লক হয়ে যাবে। ...বাই দ্য বাই, তুমি তোমার বড় বউদির সঙ্গেই থাকছ তো ?

—হুঁ। তাই তো কথা হয়েছে।

—দ্যাটস গুড। তোমার মতো ধম্মের ষাঁড়ের বউদির মতো একজনের ছত্রছায়ায় থাকাই ভাল। নইলে কোথায় কি করে বেড়াবে ! এখন তোমার ডানা গজাচ্ছে... একটা বিধবা মেয়েছেলের পেছনে লাইন লাগাচ্ছ, ফি রোববার বাগুইহাটিতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকছ...।

কন্দর্পর গলা শুকিয়ে গেল। অশোকদা কি অন্তর্যামী ! ভগবানের মতো সহস্র চক্ষু আছে লোকটার।

আরও যেন কাদের অজস্র চোখ থাকে ! কন্দর্প ঠিক মনে করতে পারল না।

৫৯

সওয়া পাঁচটায় শো ভাঙল। হল থেকে সদলবলে বেরিয়ে এল বাপ্পা। বাইরে এখনও ঝাঁ-ঝ রোদ্দুর। ঘণ্টা দুয়েক ঠাণ্ডা ঘরে কাটিয়ে চড়া তাপে ঝলসে যাচ্ছে গা।

ধীমান কায়দা করে সিগারেট ধরাল,—একটা চ্যাপ্টার তো হল, এবার নেক্সট চ্যাপ্টারটা কোথায় শুরু হবে ?

শেখর বলে উঠল,—আগে তোমরা মেন্যুটা ঠিক করো। চাইনিজ, না মোগলাই, না কন্টিনেন্টাল ?

ভাবনা বলল,— আই প্রেফার চাইনিজ।

এণাক্ষী নাক সিঁটকোল,—দুর দুর, চাইনিজ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। তার চেয়ে

পার্ক স্ট্রিট চল, আজ আমরা স্টেক খাব। বাই দা বাই, ইন্দ্রনীল তোর বাজেট কত ?

বাপ্পা ভেতরে ভেতরে একটু বিপন্ন বোধ করছিল। মা আজ দু হাজার টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে সওদাও করতে হবে অনেক কিছু। দুটো ভাল টিশার্ট তো লাগবেই, একটা রেডিমেড ফুল স্লিভও কেনা দরকার। নিউ মার্কেটের একটা দোকানে দারুণ দারুণ জিনস এসেছে, কী অপূর্ব নীল রঙ, সমুদ্রের সঙ্গে নিখুঁত ম্যাচ করে যাবে, ওই একটা কেনারও খুব ইচ্ছে ছিল। একটা ভাল ব্লেজার হলেও মন্দ হয় না। ন্যারি ডিক্রুজ পিল্লাইরা সব কী সুন্দর সুন্দর ব্লেজার পরত, বাপ্পাই কেমন অড ম্যান আউট হয়ে ঘুরে বেড়াত এদিক ওদিক। এত সব কি দু হাজারে সামাল দেওয়া যাবে ? তার ওপর এই রাবণের গুষ্টিকে গেলানো ?

তবে বাপ্পাও কিছু ‘ধুর পাবলিক নয়। এ সব সিনে চোটপাট করে কাজ হয় না, বাপ্পা জানে। ধূর্তের মতো হেসে বলল,—বাজেট তো যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু কোয়েশ্চেন একটাই। আমি তোদের খাওয়াব কেন ?

—সে কি রে ! এত বড় চাকরি পেলি, তার পরও বলছিস খাওয়াবি কেন ? এণাক্ষীর চোখ বড় বড়।

—উঁহু, চাকরি পাইনি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি। হ্যাভ আই জয়েনড দা জব ? ধর যদি এখন চাকরিটা না নিই ...। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের অনারে তোদের একটা সিনেমা দেখিয়ে দিলাম, সেটাই কি কাফি নয় ?

শেখর ধীমান খানিকটা বিমূঢ় হয়ে গেল। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া নীরবে হাঁটছিল। সে কথা বলে উঠল হঠাৎ,—ইন্দ্রনীল তো ঠিকই বলেছে। আমাদের ওকে ওভারট্যাক্স করা উচিত নয়। ওকে আগে ওর স্যালারিটা পেতে দে।

—তখন আমরা ওকে পাব কোথায় ? ও তো উড়ে যাবে।

—উড়ে যাবে না, বল ভেসে যাবে।

—ওই হল। যাহাই ওড়া, তাহাই ভাসা।

বাপ্পা অর্কেস্ট্রা পরিচালনার ভঙ্গিতে দু হাত দোলাল,—ওকে ওকে, আজ আমি তোমাদের একটা টোকেন ফিস্ট দিচ্ছি। রোল আর কোল্ড ড্রিঙ্কস। ডোন্ট আসক ফর মোর। গ্র্যান্ড ফিস্ট হবে আমার ফার্স্ট ভয়েজ থেকে ফিরে আসার পর। তখন মেন্যু উইল বি ইওরস্। এগ্রিড ?

ভাবনা চোখ টিপল,—নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আই এগ্রি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাত তুলল,—আমি তো আগেই এগ্রি করেছি।

ধীমান কাঁধ ঝাঁকাল,—অগত্যা।

শেখর বেশ মুষড়ে পড়েছে। হতাশ ভাবে বলল,— যাহ্ শালা। পাঁচ মিনিটও তোরা ইউনিটি রাখতে পারলি না ! এইসব হেংলুরা কোনওদিন কোথাও প্রাপ্য আদায় করতে পারবে না। নেশানটা একদম ফিনিশ হয়ে গেছে।

বাপ্পা বলল,— বেশ তো, একজন অন্তত প্রোটেস্ট করুক। তুই না হয় অন প্রোটেস্ট কিছু খাস না।

—ইল্লি রে, আমি বরং দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কস খাব। একটা আমার জেনুইন প্রাপ্য হিসেবে, আর একটা তুই খাওয়াবি আমার প্রোটেস্টকে অনার দিতে।

ধীমান চটাং চাঁটি কষাল শেখরের মাথায়,—তুমি বস পুরো ট্রেড ইউনিয়ান লিডারদের মতো কথা বলছ। মালিকেরও খাম খাবে, আবার ...

বাপ্পার মজা লাগছিল বেশ। গত সপ্তাহে ওশান লাইনার্স থেকে চিঠি এসে গেছে। তারপর থেকে একটা গা-শিউরোনো ভাব আঠার মতো লেগে রয়েছে শরীরে, হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করে চলেছে অবিরাম। স্বপ্ন এতটা খাপে খাপে মিলে যায় ! অস্ট্রেলিয়ার সিডনি নয়, বাপ্পা জাহাজ ধরবে জাপানের ইয়োকোহামায়। প্লেনের টিকিটও যথারীতি পাঠিয়ে দিয়েছে কোম্পানি, এই শুক্রবারই উড়োজাহাজে

চেপে ইয়োকোহামা পাড়ি দেবে বাপ্পা। জাহাজে রিপোর্ট করার আগে পর্যন্ত মনে স্বস্তি নেই। এখনও সব কেমন অলীক অলীক ঠেকছে। জীবনে এই প্রথম প্লেনে চড়বে বাপ্পা, বিদেশযাত্রাও তার এই প্রথম, সবই একেবারে একা একা ... ! তবে ঠিক এই মুহূর্তে অস্বস্তির অনুভূতিটা নেই। উচ্ছলতার মধ্যেও বন্ধুদের চোখেমুখে হঠাৎ হঠাৎ চোরা ঈর্ষার ঝলক ফুটে উঠছে, বান্ধবীদের চোখে ঝরে পড়ছে স্তুতি, এতেই যেন মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে মন। আহা বেচারারা ! সারা জীবন এই শহরের বদ্ধ কূপেই পচতে হবে এদের। যখন একটা ছোটমোট চাকরির খোঁজে জুতোর সুকতলা ক্ষয়াবে এরা, তখন হয়তো মার্সেই-এর পথে হেঁটে বেড়াবে বাপ্পা। পুওর সোলস !

সিনেমা হলের সামনে নিউ মার্কেটের গা ঘেঁষে রোলের দোকান। খাবারের অর্ডার দিয়ে বাপ্পা হালকা স্বরে বলল,— দেখলি তো, অনীকটা কেমন ইনস্যাল্ট করল আমায়। কত বার করে সাধলাম, কিছুতেই এল না।

—নিজেই ঠকল। বিষ্ণুপ্রিয়া চটজলদি বলে উঠল,—তুই পারিসনি, ইন্দ্রনীল পেরেছে, এতে এত হিংসে করার কি আছে ! যা, বাড়িতে গিয়ে এখন এক থালা বেশি ভাত খা।

ভাবনা এক চোখে বাপ্পাকে দেখল একবার, এক চোখে বিষ্ণুপ্রিয়া আর এণাক্ষীকে,—আর ইন্দ্রনীলের বিরহে কে কে তিন দিন উপোস করবে ?

এণাক্ষীর মুখটা করুণ হয়ে গেল,—ইন্দ্রনীল যে সত্যি সত্যি চলে যাবে, আমি ভাবতেই পারছি না। এই ইন্দ্রনীল, তুই আমাকে জাহাজ থেকে চিঠি লিখবি তো ?

—লিখব লিখব। তোর ঠিকানাটা যেন কি ?

—কেন, তোর কাছে নেই ?

—ডায়েরিতে আছে বোধহয়। দেখতে হবে। কত নম্বর ফার্ন রোড যেন ?

বিষ্ণুপ্রিয়া চশমার ব্রিজ ঠেলল আঙুল দিয়ে। ভারি মুখে বলল,— ইন্দ্রনীল যদি তোকে একটাও চিঠি লেখে আমি তোকে একশো টাকা দেব। ট্রেনিং-এ গিয়েই কাউকে ভুলে এক লাইন লিখল না ... ফিরেও কত দিন বাড়িতে ডুব মেরে বসে রইল !

এণাক্ষী আর বিষ্ণুপ্রিয়ার পুরনো রেষারেষিটা শুরু হয়ে গেছে। এ সময়ে নিজেকে বেশ নায়ক নায়ক ল্যাগে বাপ্পার। তিতির বলছিল বিষ্ণুপ্রিয়া নাকি তার ঠিকানা জানতে চেয়েছিল অনেকবার, বিষ্ণুপ্রিয়া অবশ্য মুখে সে কথা স্বীকার করে না। একি শুধুই বিষ্ণুপ্রিয়ার খেয়ালিপনা, নাকি আরও কিছু !

হাতে হাতে রোল পৌঁছে গেছে। ধীমান কাগজ ছিঁড়ে রোলে কামড় বসাল,—হ্যাঁ রে ইন্দ্রনীল, তোদের জাহাজ ইন্ডিয়ার কোন কোন পোর্টে আসবে ?

—ইন্ডিয়ায় ! দুর, ইন্ডিয়ায় আসবে কেন ?

—আসবে না ?

—নো স্যার। ইটস্ আ কার কেরিয়ার। জাহাজের খোলে জাপান থেকে মোটরগাড়ি ভরে আমেরিকা ইউরোপে ডেলিভারি দিতে ছুটবে। জাপানেরই তিন-চারটে পোর্ট থেকে বোধহয় গাড়ি উঠবে। কোবে, নাগোয়া, টোকিও, ওসাকা ...

—জাহাজে মোটরগাড়ি ! শেখরের চোখ গোল গোল, জাহাজে কটা গাড়ি ধরবে ?

ধন্দটা বাপ্পার মনেও রয়েছে। জাহাজ কোম্পানির কলকাতা অফিসে এর মধ্যে গিয়েছিল বারকয়েক, সেখানেও মুখ ফুটে প্রশ্নটা করতে পারেনি। তবে এখন তাকে হারলে চলবে না, আন্দাজ মতো একটা উত্তর দিয়ে দিল,— দু-পাঁচশো তো ধরবেই।

—তোদের রুটটা কী হবে ?

এটাও সঠিক জানা নেই বাপ্পার। আবার আন্দাজ ভাসিয়ে দিল,—মোটামুটি ধর আমরা গোড়াতে প্যাসিফিক দিয়েই মুভ করব। আমেরিকার ওয়েস্টার্ন কোস্ট হয়ে এসে পড়ব ইস্টার্ন সাইডে।

—থ্রু পানামা ক্যানাল, তাই তো ? বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায় কথা কেড়ে নিল,—তারপর ক্যারিবিয়ান সি

হয়ে অ্যাটলান্টিক। সেই মহাসাগরের এপার থেকে ওপার গেলেই ইউরোপ।

—তুই জানলি কী করে রে? এণাক্ষী খোঁচা মারল,—এটাও কি কুইজ করতে করতে জেনেছিস?

—আমাদের রিসোর্স স্টাডিজের ক্লাসে কি একটুও ভূগোল পড়ায় না? তুই অবশ্য টি. এম-এর ক্লাসে ক্যান্টিনে বসে থাকিস ...

—সত্যি, ভূগোল পড়লে কত কি জানা যায়। এণাক্ষী বিদ্রূপ ছুঁড়ল,—অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের এক পারে ইউরোপ, এক পারে আমেরিকা! কী হাই ফাণ্ডা!

—আর মাঝখানে হাজার হাজার মাইল নীল জল! ভাবনা খিলখিল হেসে উঠল,—সে জল আবার নোনতা। কান্নার মতো।

দূরে পুট পুট কী সব শব্দ হচ্ছে। বাজি ফাটার মতো। বাপ্পা রোল শেষ করে কাগজটা গোল্লা করে পাকাল, ছুঁড়ল খানিক দূরে। একটু যেন অন্যমনস্ক হওয়ারও চেষ্টা করছিল বাপ্পা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে এই শ্লেষ, এই আক্রমণ খারাপ লাগছে তার। কেন লাগছে!

খাবারের দাম চুকিয়ে বাপ্পা খুচরো ফেরত নিল, তখনই চোখাচোখি হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। অজান্তেই জ্বালা জ্বালা করে উঠল চোখটা। এ কি, চোখে জল এসে যাচ্ছে কেন! আবেগ! ছি বাপ্পা।

পরমুহূর্তে ভুল ভাঙল বাপ্পার। চারদিক কেমন ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। নীলচে ধোঁয়ায় জ্বলে যাচ্ছে চোখ। চাপা একটা কোলাহল ভেসে এল চৌরঙ্গির দিক থেকে। পলকে বদলে গেছে গোটা তল্লাটের ছবি। হই হই করে লোক ছুটে আসছে এদিকে। দুমদাম ইটপাটকেল পড়ছে যত্রতত্র। একটা দোকানের কাচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন। সার সার শরবতের দোকান থেকে আম মুসম্বি লুট হয়ে যাচ্ছে, ঘটাং ঘটাং শাটার পড়ে যাচ্ছে দোকানের।

মেয়েরা সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে। চোখে ওড়না চাপছে ঘন ঘন। এণাক্ষী সভয়ে বলল,— আমরা এখন কী করব?

শেখর বলল,— দাঁড়া না, দেখি আগে কেসটা কী! বলেই একটা ছুটন্ত লোককে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল,— কী হয়েছে দাদা? কেস কী?

—এসপ্ল্যানেডে জোর গণ্ডগোল। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে।

ভাবনা ত্বরিত পায়ে নিউ মার্কেটের দিকে এগোল,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না, চলে আয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বিশাল জনতা ঢুকে পড়েছে রাস্তাটায়। উদভ্রান্তের মতো যে যেদিকে পারে দৌড়চ্ছে। পিছন পিছন ধেয়ে এল পুলিশ। এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে লাঠি, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। সোঁ সোঁ লাঠি চালাচ্ছে চারদিকে।

চকিত জনস্রোতের ধাক্কায় বাপ্পাও টালমাটাল। বুকে আছড়ে পড়ছে নেহাই। এখন যদি তার কিছু ঘটে যায় তাহলে জাহাজ ভবিষ্যৎ মহাসমুদ্র ... !

কোনওদিকে দৃকপাত না করে বাপ্পা ছুটতে শুরু করল। চোখ খোলা যাচ্ছে না, জ্বলছে অসম্ভব, অন্ধের মতো ছুটছে বাপ্পা। দুই সিনেমা হলের মাঝখানে খানিক ফাঁকা গলি, সেই পথে খানিকটা ছুটে সাঁ করে বাঁয়ে বেঁকল। সামনে এক মদের দোকান, কোলাপসিবল্ গেট বন্ধ। বাপ্পা গেট ধরে ঝাঁকাল,—খুলুন না, খুলুন না।

উত্তর নেই। ছটফট করছে বাপ্পা। গলি দিয়ে বিক্ষিপ্ত লোক ছুটছে। পুলিশ কি গলিতেও ঢুকে পড়ল! আচমকা কে যেন টানল বাপ্পার জামা ধরে, বাপ্পা কষ্ট করে তাকাল। বিষ্ণুপ্রিয়া। চোখে পাতলা ওড়না জড়ানো। পাশে এক বইয়ের দোকান, একটু দরজা ফাঁক হয়ে আছে তার, বাপ্পাকে হেঁচকা টেনে দোকানটায় ঢুকে পড়ল বিষ্ণুপ্রিয়া। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, ঘামছে দরদর।

বাপ্পা কম্পিত স্বরে বলল,— ওরা কোথায়?

—ধীমান আর ভাবনা তো মার্কেটের দিকে দৌড়ল। শেখরও বোধহয় ওই দিকে ...

—আর এণাক্ষী ?

—এণাক্ষী ! চশমা খুলে ওড়নায় চোখ ঘষছে বিষ্ণুপ্রিয়া,—আমি কি বেরিয়ে খুঁজে আনব ওকে ?

—তা নয়, এক সঙ্গে এসেছিলাম তো ...

—একা তবে দৌড়ে পালিয়ে এলি কেন ? কাওয়ার্ড কোথাকার।

উঁহু, খুব সাহস ! বাপ্পা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। কবে যে এই শহর থেকে মুক্তি পাবে ! ওফ্, আরও তিন দিন। হট্টমেলায় ফালতু সাহস দেখাতে বাপ্পার ভারি বয়ে গেছে। যেখানে সাহস দেখানোর সেখানে বাপ্পা ঠিকই দেখাবে।

দোকানের ঘেরাটোপের নিরাপত্তায় এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত বাপ্পা। আরও দু-তিনজন লোক ঢুকে পড়েছে দোকানে, উত্তেজিত মুখে গণ্ডগোল নিয়ে আলোচনা করছে, উদ্বিগ্ন মুখে তাদের কথা শুনছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

—পুলিশ ফালতু আগে লাঠি চালাল।

—মোটেই না। পুলিশ অনেক পরে লাঠি চালিয়েছে। মিছিল থেকে পুলিশের ওপর বোম ফেলল, তারপরই তো টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ল পুলিশ।

—উফ, চোখটা জ্বলে যাচ্ছে। ... দাদা, ও দাদা, একটু জল হবে ?

—ওই তো কোণে জগ রাখা আছে, নিন না।

—দাদা কি স্পটে ছিলেন ?

—স্পটে মানে ! একদম সামনে।

—মিছিলটা কাদের ছিল ?

—হবে কারুর একটা। অত খবর রাখি না।

—রোজই তো একটা না একটা মিছিল বেরোচ্ছে।

—কোনও মানে হয় ! ডালহৌসি পাড়ায় একটা ইম্পর্ট্যান্ট কাজ ছিল। এখন ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে বসে থাকো।

—আছেন কেন ? বেরিয়ে পড়ুন না।

ফোলিও ব্যাগ হাতে বছর চল্লিশের লোকটা চোখ কুঁচকে তাকাল,— ভয় পাই না মশাই। ইয়াং বয়সে এসব অনেক দেখেছি। পুলিশ ইউনিভার্সিটির সামনে টিয়ার গ্যাসের শেল্ ছুঁড়ছে, আমরা সেই শেলের মুখ তুলে ঘুরিয়ে দিচ্ছি, পুলিশগুলো কাঁদতে কাঁদতে পালানোর রাস্তা পাচ্ছে না। ... সেই সেভেনটিজের কথা ভাবুন, কী সময় গেছে ... !

যত সব বাকতাল্লা। বাপ্পা দোকানের এক কোণে সরে জলের ছিটে দিল চোখে। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকল,— এই, ওড়না ভিজিয়ে চোখ একটু চেপে চেপে ঘষে নে।

বিষ্ণুপ্রিয়া নার্ভাসভাবে বলল,— আমরা বাড়ি ফিরব কী করে ?

বয়স্ক দোকানদার প্রাজ্ঞের মতো বলল,— ঘাবড়ানোর কিচ্ছু হয়নি। কলকাতা কোনও ঘটনাই বেশিক্ষণ মনে রাখে না। পনেরো-বিশ মিনিট পরে দেখবে সব নরমাল হয়ে গেছে।

লোকটার কথায় একটু যেন আশ্বস্ত হল বিষ্ণুপ্রিয়া। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বই দেখছে। প্রায়ান্ধকার দোকানে আলো ছড়াচ্ছে অজস্র রঙিন মলাট।

র‍্যাক থেকে একটা বই টানল বিষ্ণুপ্রিয়া। উল্টেপাল্টে দেখে প্রশ্ন করল,— সুলিভানের এই বইটার দাম কত ?

টকটক ক্যালকুলেটার টিপে হিসেব করল দোকানদার। ডলার থেকে টাকায় বদলাচ্ছে দাম। অধীরভাবে দরজায় উঁকি মেরে এল বাপ্পা।

—কী বই ওটা ?

—নাইট স্কাই।

—ফিকশ্যান ?

বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দিল না। কাউন্টারে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল,— কত হল ?

—ওয়ান নাইনটিফাইভ।

দু-এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল বিষ্ণুপ্রিয়া। কাঁধঝোলা ব্যাগের মুখ খুলল,—দিয়ে দিন।

বাপ্পা বইটা হাতে নিয়ে দেখল একটু,—এ তো বই ভর্তি তারার ছবি। এই বই নিয়ে তুই কী করবি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁধ ঝাঁকাল সামান্য।

—তুই দুশো টাকা দিয়ে বইটা কিনে ফেললি ?

—কিনলাম।

—কুইজ ? জি কে-র স্টক বাড়াচ্ছিস ?

—আমার আর কুইজে ইন্টারেস্ট নেই। ওসব ছেড়ে দিয়েছি। বিষ্ণুপ্রিয়া চশমা নাকের ওপর ঠেলল,— তোর কি আজ কেনার আছে বলছিলি না ?

—আর কেনা ! আগে বেরোই তো !

বেরোতে অবশ্য কোনও সমস্যা হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাইরেটা শান্ত হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে চতুর্দিক আবার আগের মতো স্বচ্ছ, স্বাভাবিক। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ফুচকা ভেলপুরি খেতে শুরু করেছে মেয়েরা, নিউ মার্কেটের সামনে কর্কশ স্বরে হর্ন বাজাচ্ছে গাড়ি। টিয়ার গ্যাসের যেটুকু ঝাঁঝ এসেছিল মিলিয়ে গেছে পুরোপুরি, পোড়া পেট্রল ডিজেলের কটু গন্ধে আবার ভরে গেছে বাতাস। পথে এখন এক মরা হলুদ আলো। বিকেল ফুরিয়ে এল।

বাপ্পা আর নিউ মার্কেটে ঢুকল না। খুশির মেজাজ ছানা কেটে গেছে। থাক, কেনাকাটা কাল হবে। সকালের দিকে একবার এসে একা একা.... । সব কিছুই তো একা একা করছে বাপ্পা, মিছিমিছি এই গণ্ডগোলের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

ঝাঁ করে একটা ট্যাক্সি ধরে নিল বাপ্পা। সিটে হেলান দিয়ে হুকুম ছুঁড়ল,—ঢাকুরিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া আপত্তি জানানোর সময় পেল না। উঠে এল পিছন পিছন। মৃদু অনুযোগের সুরে বলল,— আবার ট্যাক্সি ধরতে গেলি কেন ? গুচ্ছের টাকা খরচা !

—তোদের এই শহরকে আমার বিশ্বাস নেই। কোথায় আবার কি বেধে যাবে...

—কবে রোজ রোজ তুই গণ্ডগোলে পড়িস রে ? একদিন একটা ঝামেলা হয়ে গেছে...

—থাক, এখন আর কপচাস না। মুখ তো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। বরং অফিস ফেরতা গরু-ছাগলদের সঙ্গে গুঁতোগুতি করতে হল না, এর জন্য আমাকে ধন্যবাদ দে।

বিষ্ণুপ্রিয়া চুপ করে গেল। একে একে আলো জ্বলছে পথে। উজ্জ্বল এক সন্ধ্যা ফুটে উঠছে শহরে। চারদিকে আলো আর শব্দের হেঁয়ালি। পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে থেমেছে গাড়ি, এক ধুলোমাখা ভিখিরি মেয়ে কোলে রিকেটি শিশু নিয়ে হাত গলিয়ে দিল জানলা দিয়ে। ওপাশের জানলায় ফুলঅলা এসে দাঁড়িয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে ফুলের গোছা এগিয়ে দিয়ে চেঁচাচ্ছে,— গোলাপ নেবেন ? টাটকা গোলাপ ?

বাপ্পা গজগজ করে উঠল,— হরিবল্। একটা নিউক্লিয়ার বোমা মেরে যদি এই শহরটাকে উড়িয়ে দেওয়া যেত !

বিষ্ণুপ্রিয়া চুকচুক শব্দ করল মুখে,— তোর ব্যাড লাক। তার কোনও সম্ভাবনা নেই।

—কী করে যে তোরা এই শহরে থাকবি ! এই মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা, মিটিং মিছিল, রাস্তা ভর্তি ভিখিরি.... ! আবার এই শহরে ফিরতে হবে ভাবলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে চোখে আর ভয়ার্ত ভাবের চিহ্ন নেই। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে জোরে নিশ্বাস টানল,— আমার তো বাবা কলকাতা ছেড়ে কোথাও থাকতে হবে ভাবলেই গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এখানে সব কিছু কত জ্যান্ত। এই যে কেঅস্‌টা হয়ে গেল, এটাও কী দারুণ ফিলিং !

—প্লিজ বিষ্ণুপ্রিয়া....

—বিলিভ মি, আমি আজকের কথা ভুলতেই পারব না। .... তুই জানিস না ইন্দ্রনীল, সেবার তিন সপ্তাহের জন্য সাউথ ইন্ডিয়া ট্যুরে গেলাম, দশ দিন পর থেকে মন কেমন করতে শুরু করল। শেষমেশ ট্রেন যখন হাওড়া স্টেশনে ইন্ করল, নেমে আমরা ব্রিজটা পার হচ্ছি.... ভোর বেলা.... এমন একটা ফিলিং হল না....

—হুঁহ্ ফিলিং ! আমার তো মনে হয় একটা ল্যাভেটরিতে ঢুকছি।

একটু থমকে থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল,— এই শহরের কোনও কিছুই কি তোকে টানে না ?

—বললাম তো আমি এই শহরটার ধ্বংস চাই।

—যখন জাহাজে থাকবি তখনও এই শহরের কোনও স্মৃতি তোর মনে পড়বে না ?

—হয়তো পড়বে। দুঃস্বপ্নের মতো।

কোলের ওপর বইটা নাড়াচাড়া করছে বিষ্ণুপ্রিয়া। লঘুভাবে বলল,— প্রিয়জনদের কথা ভেবেও মন খারাপ লাগবে না ?

—আমার কথা ভেবে কে মন খারাপ করে রে ? তুই করবি ?

—আমি কেন করব, তোর এণাক্ষী করবে। বিষ্ণুপ্রিয়া জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বরে চাপা অসূয়া। বাপ্পা খেপাতে চাইল বিষ্ণুপ্রিয়াকে,—হুঁ, এণাক্ষীর অবশ্য মন খারাপ হবে। আমার চিঠির জন্য চাতকপাখির মতো বসে থাকবে।

তীব্র এক দৃষ্টি হেনে মুখ ঘুরিয়ে নিল বিষ্ণুপ্রিয়া। খোলা জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছে হু হু, উড়ছে বিষ্ণুপ্রিয়ার চুল। সেদিকে চোখ রেখে বাপ্পা বলল,— সত্যি, বেচারা যে আজ কোথায় গেল ! হয়তো এখনও নিউ মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো রাস্তায় রাস্তায় খুঁজছে আমাদের।

বিষ্ণুপ্রিয়া ফিরল বাপ্পার দিকে,— ট্যাক্সি ঘোরাতে বলব ?

বাপ্পার গা সিরসির করে উঠল। বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখ হঠাৎ বদলে গেছে। হিংসে নয়, কি যেন এক রহস্যের ছায়া পড়েছে চোখে। বাপ্পা অস্ফুটে বলল,— তুই একটা পাগলি।

ট্যাক্সিতে বিচিত্র নৈঃশব্দ্য। ইথার কণা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। বাপ্পার মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে তার আরও কিছু বলা উচিত বিষ্ণুপ্রিয়াকে। কিন্তু কী বলবে ?

ট্যাক্সি ঢাকুরিয়ায় পৌঁছল। নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে বাপ্পা। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলল,— তোকে এগিয়ে দিয়ে আসব বাড়ি অবধি ?

—থাক। বিষ্ণুপ্রিয়া একটু গিয়েও থামল,— কাল কী করছিস ? একবার আসবি আমাদে বাড়ি ?

—কাল তো হবে না রে। মানিকতলায় যেতে হবে। দিদা খেতে বলেছে। কখন ফিরি ...

—পরশু ?

—দেখি।...টুকিটাকি গোছগাছ আছে, একবার কোম্পানির সিটি অফিসে যেতে হবে। পারে আসব।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া। হঠাৎ পায়ে পায়ে কাছে এল। হাতের বইটা বাড়িয়ে দি বলল,— এটা রাখ।

বাপ্পা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। বলল,— এ বই দিয়ে আমি কী করব ?

—রাখ না। বইটা আমি তোকে প্রেজেন্ট করলাম। জাহাজে নিয়ে যাস।

—তা নয় নিয়ে গেলাম, কিন্তু কেন ? তুই তো জানিস আমার বইটই পড়ার অভ্যেস নেই !

—তবু নিয়ে যাস।

—আমার নলেজ বাড়াতে চাইছিস ?

—দ্যাখ কি বাড়ে। মনে কর তোকে একটা কুইজের আনসার বার করতে দিলাম। চলি।

বাপ্পা ঘরে ঢুকছিল, ইন্দ্রাণীর ডাক শুনে দাঁড়াল,—আমাকে কিছু বলছ মা ?

ইন্দ্রাণীর সামনে খাতার স্তূপ। চোখে রিডিং গ্লাস, সদ্য নিয়েছে। ঘরের কোণটা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বেশি উজ্জ্বল। লো ভলিউমে টিভি চালিয়ে একটা হিন্দি সিরিয়াল দেখছে তিতির।

ইন্দ্রাণী চোখ থেকে চশমা নামাল,— তোর কেনাকাটা হল ?

—কাল করব।

—অত হাড়ে আদা দিয়ে টাকা নিয়ে গেলি, আজ কিনলি না ?

—বললাম তো কাল কিনব। এসপ্ল্যানেডে গণ্ডগোলের কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল বাপ্পা। বলল,— কলেজে গেছিলাম, বন্ধুবান্ধবরা জোর করে সিনেমা নিয়ে গেল ...

ইন্দ্রাণী খাতা মুড়ে রাখল,— যাক গে, তাড়াতাড়ি ফিরেছিস ভালই হয়েছে। নীচে ছোটকা রয়েছে, ওর সঙ্গে একবার বেরো।

—কোথায় ?

—এক্ষুনি দালাল আসবে, সেলিমপুরের দিকে দু-একটা বাড়ি দেখতে যাবে চাঁদু, তুই একটু সঙ্গে যা।

—আমি বাড়ি দেখে কী করব ? তোমরা থাকবে, তোমরাই ভাল করে দেখে নাও।

ইন্দ্রাণী যেন একটু বিরক্ত হল। চাপা গলায় বলল,— হ্যাঁ, তোমাদের কারুরই তো দায় নেই। তোমার বাবার টিকি দেখা যাচ্ছে না, তুমি উড়ছ, চাঁদুই একা চুরির দায়ে ধরা পড়েছে।

বাপ্পা হেসে ফেলল,— তোমার মেয়েটা কী করছে ? সে তো ছোটকার ল্যাঙবোট, সে যাক না।

তিতির গম্ভীর মুখে ঘাড় ঘুরিয়ে দাদাকে দেখে নিল একবার, আবার চোখ ফেরাল পর্দায়।

ইন্দ্রাণী গোমড়া মুখে বলল,— থাক, তোমাদের কাউকেই কিছু করতে হবে না। পারলে আমিই চাঁদুর সঙ্গে বেরোব।

—সব সময়ে আজকাল তেতে থাকো কেন মা ? কোনও মানে হয়। বাপ্পা টেবিলের কাছে এসে মা'র কাঁধে হাত রাখল,— খাতা দেখে দেখে তোমার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। এই জঞ্জাল কবে শেষ হবে ?

ইন্দ্রাণী কড়া গলায় বলল,— এই জঞ্জালের মধ্যে একসময়ে তোমার খাতাও ছিল বাপ্পা। এগুলো মাধ্যমিকের খাতা।

—মাধ্যমিকের খাতা তুমি নিয়েছ কেন ? সেবার বললে আর এসব ঝামেলা ঘাড়ে নেবে না ...

বছর চারেক আগে মাধ্যমিকের খাতা নিয়ে ভারি বিপদে পড়ে গিয়েছিল ইন্দ্রাণী। দেখতে দেখতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল খুব, তাগাদার পর তাগাদা আসছিল বোর্ড থেকে, অনেক অনুরোধ উপরোধ করে লাস্ট ডেটের তিন দিন পরে খাতা জমা দিতে পেরেছিল, তখনই ঘোষণা করেছিল এই শেষ।

সে কথা মনে করেই ছোট্ট নিশ্বাস পড়ল ইন্দ্রাণীর,—না দেখে উপায় কি ! প্রেসটা বন্ধ হয়ে গেল ...সংসারের খরচ তো আর কমেনি !

বাপ্পা ঠোঁট বেঁকাল,—ওই প্রেস থেকে তোমার ক'টাকা আসত ?

—তাও তো আসত। দু টাকা হোক, পাঁচ টাকা হোক ...

—সে তো তোমার প্রেস বেচেও কিছু এসেছে। বাপ্পা ফস করে বলে ফেলল।

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকাল ইন্দ্রাণী। চোখে রিডিং গ্লাস লাগিয়ে আবার মন দিচ্ছে খাতায়।

বাপ্পা আড়চোখে তিতিরকে দেখে নিয়ে জড়িয়ে ধরল মাকে,— তুমি এত দুশ্চিন্তা করছ কেন বলো তো ? এই আদ্যিকালের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে বলে তুমি তো কিছু জলে পড়ছ না। প্রোমোটার যে লাখ টাকা দেবে, সেটা ফিক্সড ডিপোজিটে রেখে দাও, একটা ইন্টারেস্ট আসবে। এখন মার্কেট খুব চড়া, ভাল দালাল ধরে শেয়ারেও লাগিয়ে দিতে পারো। প্রেস বেচার টাকাটা তো এক্সট্রা, যেভাবে ইচ্ছে ইউজ করো। তারপর ধরো আমি আছি, আমি তো তোমায় টাকা পাঠাবই। বলো তো পুরো

অ্যামাউন্টটাই পাঠিয়ে দিতে পারি।

—থাক। ইন্দ্রাণী সরিয়ে দিল বাপ্পার হাতটা,— তুমি তোমার ফিউচার গড়ো।

—এ তোমার অভিমানের কথা মা। আমার ফিউচার তো ফ্যামিলিরই ফিউচার। আমি তো তোমার পাশে আছিই।

—হয়তো আছ। আমি কারুর ওপর ভরসা করি না।

বাপ্পা আহত মুখে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কেন যে মা তাকে বিশ্বাস করে না, অকৃতজ্ঞ ভাবে ? এই শহরটাকে সে ঘৃণা করে বটে, এ বাড়ির প্রতিও তার তেমন প্রীতি ভালবাসা নেই, কিন্তু যেটুকুনি কর্তব্য তা তো সে করবেই। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সে প্রায় সতেরো হাজার টাকা মাইনের চাকরি পেতে চলেছে, যা এই পরিবারের কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। তবু বাড়িতে কোনও খুশির জোয়ার নেই। মা বাবা তিতির সকলে যেন বাপ্পাকে একঘরে করে দিয়েছে ! অথচ জন্মসূত্রে এরাই বাপ্পার প্রিয়জন !

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাটা মনে পড়ল বাপ্পার। ... কোনও প্রিয়জনের জন্য তোর মন খারাপ হবে না ইন্দ্রনীল ! ... কথাটা যেন এক নির্ভেজাল ঠাট্টা।

বিষণ্ণ বাপ্পা খাটে পড়ে থাকা বইটা হাতে নিল। পাতায় পাতায় আর্ট প্লেটে রঙিন ছবি। রাতের তারারা ফুটে আছে আকাশে। রাশি রাশি তারা।

৬০

বাপ্পা চলে যাওয়ার জন্যই এসেছিল। চলেও গেল। ইন্দ্রাণীর জন্য রেখে গেল এক নতুন শূন্যতা। এক অবিমিশ্র হাহাকার। বাপ্পার ট্রেনিং-এ চলে যাওয়াটা সেভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি ইন্দ্রাণী। জয়মোহনের মৃত্যুর শোক তো ছিলই, সঙ্গে ছিল এক সুপ্ত অপরাধবোধের নিরন্তর দংশন। বাড়িতে লোকজনের তখন আসা-যাওয়াও খুব, আদিত্যও শিশুর মতো আচরণ করছিল, সেগুলোকেও কারণ বলা যায়। বাড়ি যখন খালি হল তখনও এক আশ্চর্য ঘোরে আচ্ছন্ন রয়েছে ইন্দ্রাণী, ছেলেমেয়ের জন্য পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসার তার সময় ছিল কই !

সেই সময় এখন অঢেল। অফুরান। স্কুলে গরমের ছুটি চলছে, মাধ্যমিকের খাতা জমা দিয়ে এল ক'দিন আগে, পরশুদিন বউবাজারের ধরবাবু এসে মেশিনপত্র নিয়ে গ্যারেজটা খালি করে দিয়ে চলে গেল। সময়ের পাহাড় এখন জমে থাকে ইন্দ্রাণীর বুকে। জগদ্দল পাথরের মতো। আদিত্যও এখন পুরো স্বাভাবিক, অল্পস্বল্প মদ্যপানও শুরু হয়েছে তার। শুভাশিসও নিয়মিত আসে এখন, তার জন্যও গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয় না ইন্দ্রাণীকে। তাই বুঝি বাপ্পার চলে যাওয়াটা বড় বেশি ভাবায়। বাজে। শুকনো কুয়োর মতো হা-হা করে বুকটা। ছেলে বড় হলে দূরে সরে যাবে, নিজের বৃত্ত রচনা করে নেবে, এ তো জানা কথাই। কিন্তু জানা আর অনুভব করায় এত তফাত ! তিতিরের সঙ্গে কথা বলে যে দু'দণ্ড কাটাবে সে উপায়ও নেই, মেয়ে আজকাল মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। কী যে হয়েছে ! সেই বাড়ি ভাঙার সিদ্ধান্তটা শোনার পর থেকে ! মাঝে একদিন শুভর ছেলের সঙ্গে তাদের ফ্ল্যাট থেকে ঘুরে এল, কথাটা এসে বলল না পর্যন্ত মাকে ! বারবার খোঁচাখুঁচিতে হ্যাঁ-হুঁ করল শুধু। তাও কেমন কাঠ কাঠ ভাবে। নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো। আজকাল তিন হাত ব্যবধানে শুয়ে থাকে মা-মেয়ে। নিঃশব্দে। ইন্দ্রাণীর ফাঁকা বুকে সোঁ-সোঁ বাতাস বয়, মেয়ে আঁচও পায় না সেই বাতাসের।

বাতাস কি শুধু বাপ্পার কথাই বলে ? উহুঁ। বাতাস আরও বলে মা-মেয়ের সম্পর্ক কিছু স্বতঃসিদ্ধ নয় ইন্দ্রাণী, একে গড়তে হয়, বুনতে হয়। মমতার ফোঁড়ে সম্পর্কের জমিতে নকশা ফুটে ওঠে। মৃত্যুকামনায় যে সম্পর্কের শুরু তার জমিন তো ধূসর হয়ে আছে চিরকাল। ইন্দ্রাণী ভেতরে ভেতরে মানে সে কথা। তাতেই বুকের শুকনো কুয়োটা আরও গভীর হয়ে যায়। মনে হয় তিতিরের ওই

বয়সে উমা অনেক বেশি বন্ধু ছিল ইন্দ্রাণীর।

কাঁহাতক আর ইন্দ্রাণী মানিকতলা-ঢাকুরিয়া করে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়!

গরমটা আজ খুব বেশি পড়েছে। দুপুরবেলার তেজি সূর্য ঢুকে পড়ছে দেওয়াল ফুঁড়ে। দরজা-জানলা বন্ধ করেও উগ্র তাপের হাত থেকে রেহাই নেই।

বিছানায় খানিকক্ষণ উসখুস করে ইন্দ্রাণী উঠে বসল। পাশের ঘরে তিতির আর অ্যাটম কথা বলছে। অ্যাটমের গলাই শোনা যাচ্ছে বেশি। কান পেতে একটুক্ষণ শোনার চেষ্টা করল ইন্দ্রাণী, বুঝতে পারল না। খাট থেকে নেমে টেবিলে রাখা জগ তুলে ঢক ঢক জল খেল খানিকটা। বাথরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল ছেটাল, যদি তাতে শরীর একটু জুড়োয়। ঘরে ফিরতে গিয়েও কি ভেবে নেমে এল একতলায়।

নীচের তলা নিস্তব্ধ। সুনসান। মিনতি বড় ঘরের মেঝেয় চিৎপাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। ইন্দ্রাণী পায়ে পায়ে জয়মোহনের ঘরে ঢুকল। কতদিন হাত পড়েনি ঘরখানায়! দেওয়ালে ঝুল ভর্তি হয়ে গেছে, এক কোণে বড় খাটখানা খুলে রাখা আছে, তাতেও ধুলোর আস্তরণ। মাথার ওপরের টানা তাকে কাগজপত্রের ডাঁই। মাকড়সার জালে ঢেকে গেছে তাকটা।

ইন্দ্রাণী হাঁক দিল,— মিনতি, এই মিনতি...

মিনতির সাড়া নেই। এক ডাকে উঠবে এমন ঘুম মিনতি ঘুমোয় না।

বার কয়েক ডাকাডাকির পর মিনতি চোখ মুছতে মুছতে ঘরে এল,— কী হল বউদি?

—এ ঘরের চেহারাটা দেখেছিস? একটু ঝাড়পোঁছও করতে পারিস না?

—আমি তো মেঝে মুছি। ওগুলো সন্ধ্যার মা করলে পারে।

ইন্দ্রাণী ঈষৎ ধাক্কা খেল। জয়মোহন যতদিন ছিলেন ততদিন দীপুদের কাজের লোক হিসেবে এ ঘরের পুরো দায়িত্বই মিনতির ছিল। শ্বশুরমশাইয়ের অবর্তমানে এ ঘর এখন এজমালি সম্পত্তি। রুনা-দীপুর কাজের লোক এ ঘর একা সাফসুরত করবে কেন?

ইন্দ্রাণী কথা বাড়াল না, নিজেই গাছকোমর বেঁধে নেমে পড়ল কাজে। মিনতিকে বলল,— আমাকে একটা ঝাঁটা এনে দে তো। আর একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া।

এনে দিল মিনতি, কিন্তু হাত লাগাল না। হাই তুলে বলল,— কেন মিছিমিছি খাটছ বউদি?

মুখে আঁচল পেঁচিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলল ইন্দ্রাণী।

—না, মানে বলছিলাম ক'দিন বাদে তোমরা তো উঠেই যাবে। এই ছিস্টির ময়লা ঘাঁটার কি দরকার?

—আছে দরকার। তুমি বুঝবে না। তুমি ঘুমোও গিয়ে।

মিনতি বিনা বাক্যব্যয়ে চলে গেল। প্রেস উঠে যাওয়ার পর দুপুরে ঘুমোনোর বহর খুব বেড়েছে মিনতির। রুনা নেমে এসে না তুললে গতরই নাড়ায় না।

পরিপাটি করে খাটের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মুছল ইন্দ্রাণী। ইজিচেয়ারটা ঝাড়ল ভাল করে, কোণের কুঁজোয় কত দিনের বাসি জল পড়ে আছে, উঠোনে ঢেলে এল জলটা। একটু অবাকও হল, কাজের দিনেও কি কুঁজোটা সরানো হয়নি! বড়ঘর থেকে চেয়ার এনে ইন্দ্রাণী ঝাঁটা চালাল দেওয়ালে, টানা তাকের ধুলো পিটিয়ে পিটিয়ে ওড়াল। তাক জুড়ে গোছা গোছা কাগজ। পাড়ল টেনে টেনে। মাটিতে বসে ঘাঁটতে শুরু করল কাগজগুলো। কত কী রয়েছে! কবেকার ইলেকট্রিকের বিল, টেলিফোনের বিল, জয়মোহনের কোম্পানির বিল-চালান। কয়েকটা বইও রয়েছে সঙ্গে। কিরোর হস্তবিচার, রোগেভোগে হোমিওপ্যাথি, পুরনো গোটাকতক পাঁজি। ডেল কারনেগির হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপলের বঙ্গানুবাদ, সম্ভবত আদিত্যর। দুধের ডিপো করার সময়ে গ্রাহকদের জন্য কার্ড ছাপিয়েছিল আদিত্য। তাও আছে এক তাড়া। এত অদরকারি কাগজ! সন্ধ্যার মাকে দিয়ে দিলেই হয়। বেচারা বাড়িতে একটু জ্বালানি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁকুপাঁকু করে।

কাগজের সঙ্গে একটা ছোট ভাঙা চামড়ার সুটকেসও নেমে এসেছে, ইন্দ্রাণী খুলল ডালাটা।

খুলেই চমকেছে। বাক্স বোঝাই পুরনো রেসের বই ! আদিত্য কি রেস খেলত একসময়ে ! উঁহু, অনেকগুলো বইয়ের ওপর জয়মোহনের হস্তাক্ষর রয়েছে। আশ্চর্য, শ্বশুরমশাইয়ের রেসের নেশা ছিল ! সুটকেসের একদম তলায় একরাশ চিঠি। কোনওটা শ্বশুরমশাইয়ের, কোনওটা শাশুড়ি ঠাকরুনের। চিঠিগুলো খুলে দেখার লোভ সামলাতে পারল না ইন্দ্রাণী। কালি প্রায় আবছা হয়ে এসেছে, উঠে আলোটা জ্বালল। শোভনার চিঠি সবই প্রায় নিয়মরক্ষার, বাপের বাড়ি বেলডাঙা থেকে লেখা। জয়মোহনের চিঠিতেই আবেগের আধিক্য বেশি। কত নামে যে সম্বোধন করেছেন স্ত্রীকে ! কখনও শোভা, কখনও শোভু, কখনও সোনামণি, কখনও আকাশমণি... ! ইন্দ্রাণী চিঠিগুলো পড়তে গিয়েও পড়ল না, কাজটা শোভন নয়। ছোট ছোট চিরকুটও চোখে পড়ল গোটাকতক। ...রামদুলাল জোর করে ধরে নিয়ে গেল। বিশ্বাস করো, আমি ওসব ছাইপাঁশ খেতে চাইনি। শোভু, আমাকে ক্ষমা করে দাও। ...আমার সঙ্গে আর কতদিন তুমি কথা বন্ধ রাখবে ? তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আর কোনওদিন মাতাল হয়ে ফিরব না। শচীনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। ...ইন্দ্রাণী ফিক করে হেসে ফেলল। পরমুহূর্তেই বিজন দুপুর ভারী করে দিল বুক। এ ঘরটায় উত্তাপ কম, কেমন যেন শীত শীত করে উঠল। চিরকুটগুলোতে জয়মোহন যেন বড় বেশি আদিত্যর বাবা। বাপ-ছেলেতে এত সংঘাত ছিল, তা কি এক ধারার মানুষ বলেই ! বাপ্পার ভেতরেও কি আদিত্যর ছায়া পড়বে ! তিতির কি কি গুণ পাবে শুভর !

অজানা ধাঁধা কিলবিল করতে থাকে ইন্দ্রাণীর মস্তিষ্কে। অন্যমনস্ক হাতে কুটিকুটি করে চিরকুটগুলো, চিঠির গোছা ভরে রাখে পুরনো প্লাস্টিকের মোড়কে। রেসের বই সব চালান করে দেয় বাজে কাগজের গাদায়। চিন্তার এক সরু স্রোত মাথায় বইতে থাকে। বইতে থাকে, বইতেই থাকে।

সুতোটা ছিঁড়ল অ্যাটমের ডাকে।

—জেম্মা, ও জেম্মা, কী করছ ?

ইন্দ্রাণী সুটকেস বন্ধ করে তাকে তুলে দিল,— এই একটু ঘরদোর গোছাচ্ছি বাবা।

—তোমরা কি আমাদেরও আগে চলে যাবে জেম্মা ?

ইন্দ্রাণী নরম করে হাসল,— আগে কিনা জানি না, তবে যেতে তো হবেই।

—আমরা তো ঘর পেয়ে গেছি। অ্যাটম ইন্দ্রাণীর সামনে এসে দাঁড়াল,— কাল রাত্তিরে বাবা মাকে বলছিল, এবার তো সব গোছগাছ শুরু করতে হয়। জানো জেম্মা, আমরা যেখানে যাব তার সামনে একটা পার্ক আছে।

দীপু তো কিছু বলেনি ইন্দ্রাণীকে ! কাল অবশ্য মানিকতলা থেকে ফিরতে ইন্দ্রাণীর বেশ রাত হয়েছিল, কিন্তু রুনা তো আজ সকালে ঘরে এসেছিল, জানাল না তো !

কে জানে, এখনও হয়তো পাকাপাকি কথা হয়নি। এখন তো আর উঠে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও লুকোচুরি নেই। চাঁদুও তো হন্যে হয়ে বাড়ি খুঁজছে। দু-তিনটে বাড়ি হতে হতেও হল না। বছরখানেকের জন্য ভাড়া নেবে তাতেও বাড়িঅলাদের কত বায়নাক্কা। মহারাজ ঠাকুর রোডের একটা ফ্ল্যাট তো পাকাই হয়ে গিয়েছিল, বাড়িঅলা শেষ মুহূর্তে বলে বসল অ্যাডভান্সের টাকাটা সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে রাখতে হবে, মাসে মাসে কাটানো চলবে না। অর্থাৎ ওই টাকাটারও সুদ তিনি খাবেন ! আবদার ! আজ সকালে দালাল আর একটা বাড়ি দেখিয়েছে চাঁদুকে, একবার দেখে আসার জন্য ইন্দ্রাণীকে খুব পীড়াপীড়ি করছিল। ইন্দ্রাণীর দেখার কী দরকার ! ক'দিনের জন্য মাথা গোঁজা বই তো নয়।

অ্যাটম দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘুরছে ঘরে,—তোমরা তো আমাদের সঙ্গে যাবে না, তাই না জেম্মা ?

ইন্দ্রাণী মৃদু ঘাড় নাড়ল,— হুঁ।

—তা হলে দিদিভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে কী করে ?

—আমরা তোমাদের বাড়ি যাব। তোমরা আমাদের বাড়ি আসবে।

—তবে যে দিদিভাই বলল আমাদের বাড়ি যাবে না ?

—বলেছে বুঝি ? তোকে খ্যাপানোর জন্য বলেছে। আমি ওকে কান ধরে নিয়ে যাব।

অ্যাটম যেন একটু সান্ত্বনা পেল। হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ায় চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল,— আচ্ছ জেম্মা, দাদাভাইয়ের কী হবে ?

ইন্দ্রাণী প্রশ্নটা বুঝতে পারল না,— কিসের কী হবে ?

—তোমরাও এখানে থাকবে না, আমরাও এখানে থাকব না, তা হলে দাদাভাই জাহাজ থেকে এলে আমাদের কী করে খুঁজে পাবে ?

—বাহ্, আমরা তো আগেই দাদাভাইকে আমাদের ঠিকানা জানিয়ে দেব।

—কী করে জানাবে ? দাদাভাই তো জাহাজে থাকবে।

কোম্পানিতে চিঠি পাঠালে জাহাজের গন্তব্যস্থল বুঝে বন্দরে বন্দরে চিঠি পাঠিয়ে দেয় কোম্পানি। কিসব কুরিয়ার-ফুরিয়ারের সিস্টেম আছে। ইন্দ্রাণী অবশ্য অত জটিল প্রসঙ্গে গেল না। বলল,— ও ঠিক চিঠি পেয়ে যাবে। জাহাজে যারা থাকে তারা কি বাড়ির খবর পায় না ? দেখবি তোর দাদাভাই সমুদ্র থেকে চিঠিও লিখবে।

অ্যাটমকে আরও চিন্তিত দেখাল,— সমুদ্রে কি পোস্ট অফিস থাকে ?

ইন্দ্রাণী হেসে উঠল,— উফ, আমি আর তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। সর, ধুলোগুলো সব ঝেঁটিয়ে নিই।

অ্যাটম তবু দাঁড়িয়ে আছে,— আচ্ছা জেম্মা, আমরা তো আবার এই বাড়িতে ফিরে আসব, তাই না ?

ইন্দ্রাণী মেঝেতে ঝাঁটা চালাল,— ঠিক এই বাড়ি নয়, নতুন বাড়ি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ নতুন বাড়ি। ফ্ল্যাট। আমি জানি। সে বাড়িতে তো আমরা আবার একসঙ্গে থাকব, কি বলো ?

—হ্যাঁ, একসঙ্গেই তো। পাশাপাশি। বড়জোর ওপর-নীচে।

—তবে যে দিদিভাই বলল আমরা আর এক হব না ?

—বলল ?

—বলল তো। বলল ভাঙা জিনিস আর কখনও জোড়া লাগে না।

তিতিরটার কি একটুও জ্ঞানগম্যি নেই! এইসব কথা বলছে অ্যাটমকে! নাহ্, মেয়েটাকে একটু বকাঝকা করা দরকার, তবে যদি সিধে হয়।

কিন্তু কথাটা তো নিষ্ঠুর সত্যি। ইন্দ্রাণীই বা কি স্তোকবাক্য শোনাতে পারে অ্যাটমকে! ইন্দ্রাণীর বুকটা ভারী হয়ে আসছিল আবার।

সেলিমপুরের বাড়িটাই ঠিক করে এসেছে কন্দর্প। তিনটে ঘর আছে, রান্নাঘর বাথরুম পায়খানা নিয়ে মোটামুটি কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাট। ছোট মতন একটা খাবার জায়গাও আছে। সবচেয়ে বড় সুবিধে চব্বিশ ঘণ্টা জল। বাস স্ট্যান্ড স্টেশন সবই প্রায় পায়ে হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া দু হাজার। আগাম-টাগামেরও বালাই নেই, মাত্র এক মাসের ভাড়া সিকিউরিটি ডিপোজিট রাখতে হবে। এখন বাড়িটায় ভাড়াটে আছে, তারা উঠবে সামনের মাসের সাত তারিখে। তারপর চুনকাম-টুনকাম করবে বাড়িঅলা। ইন্দ্রাণীদের যেতে যেতে সেই সামনের মাসের মাঝামাঝি।

এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল রবিবার দুপুরে। খাওয়াদাওয়ার পর। আদিত্যর ঘরে বসে।

কথায় কথায় ইন্দ্রাণী বলল,— সামনের মাসের পনেরো তারিখ হয়ে গেলে মুস্তাফিবাবু আবার কিছু মনে করবে না তো চাঁদু ?

আদিত্য খাটে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল। ফট করে উঠে বসল,— তার আবার মনে করার কি আছে ?

আমাদের বাড়ি আমরা কবে ছাড়ব সেটাও কি সে ঠিক করে দেবে ?

—থামো তো। যা জানো না তাই নিয়ে কথা বোলো না। এক-দু তারিখ থেকে মুস্তাফিবাবুর এ বাড়িতে হাত দেওয়ার কথা, তাঁর একটা সুবিধে-অসুবিধে নেই ?

—ও ঠিক আছে। আমি ম্যানেজ করে নেব। কন্দর্প অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল,— আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কী কথা ?

—সেলিমপুরের বাড়িটার ঘরগুলো তেমন বড় নয়। বড় নয় বলি কেন, ছোট। বেশ ছোট। আজকাল কি সব সাইজ হয়েছে না, দশ ফুট বাই দশ ফুট, ওই সাইজ।

—এ বাড়ির মতো বড় বড় ঘর তুই কোথায় পাবি চাঁদু ? ইয়া মোটা দেওয়াল, এত উঁচু সিলিং, তোর ঘরটা তো গরমকালে পুরো এয়ার কন্ডিশন্ড হয়ে থাকে। তবে কি হ্যাঁ, চাপা ছোট ঘরে থাকলে মানুষের মনটাও ছোট হয়ে যায়। যাক গে, ক'দিনের তো ব্যাপার।

কন্দর্প তবু খুঁত-খুঁত করছিল। আদিত্য আবার বলল,— অত যদি হেজিটেশন, তা হলে ফাইনাল করে এলি কেন ? আরও কয়েকটা বাড়ি দেখে.... নয় ক'দিন পরে...

—অ্যাই, তুমি বেশি ল্যাজ নেড়ো না তো। চাঁদু যা ঠিক করেছে সেটাই সব থেকে ভাল। নিজে একদিন একটা বাড়ি দেখতে বেরোলে না...

ইন্দ্রাণীর ধমক খেয়ে দু গাল ছড়িয়ে হাসল আদিত্য,— আমি বেরোইনি তোমায় কে বলল ?

—বেরিয়েছিলে ! ফল তো কিছু দেখলাম না।

—দেখবে কী করে। শালা যে বাড়িতেই যাই বলে, ওমা আপনি বাঙালি ! আমি তো মাদ্রাজি ছাড়া ভাড়া দেব না ! আমি তো মারোয়াড়ি ছাড়া ভাড়া দেব না ! আমি তো পাঞ্জাবি ছাড়া ভাড়া দেব না ! শালা কলকাতা শহরে বাঙালি হয়ে দাগী ক্রিমিনাল হয়ে গেলাম ! কথা বলতে বলতে চাঁদুর দিকে ঘুরল আদিত্য,— বুঝলি চাঁদু, এক বাড়িতে বলে আমি তো কোনও লোককে ভাড়া দেব না, কোম্পানি লিজ দিতে পারি। তা আমিও একটা প্যাঁচ কষলাম। বললাম, হ্যাঁ কোম্পানি আমার আছে। ত্রিমূর্তি এন্টারপ্রাইজ। বললে আমার কোম্পানিই লিজ নিতে পারে। শুনে লোকটার কী হাসি ! আমি অবশ্য ওই বাড়ি এমনিতেই নিতাম না।

—কেন ? কন্দর্প টেরচা চোখে ইন্দ্রাণীকে দেখে নিল একবার।

—দুর, ও বাড়ির দরজা পশ্চিমমুখো। রঘুবীরবাবু দেখেই বলেছিল, ও বাড়ি নেবেন না রায়দা। পশ্চিমের দরজাঅলা বাড়িতে শনির অধিষ্ঠান।

এই মানুষকে কী বলা যায় ভেবে পাচ্ছিল না ইন্দ্রাণী। সেই সময়েই সুদীপ রুনা ঘরে ঢুকল।

রুনা বলল,— দিদি, তোমরা নাকি কাছেই বাড়ি পেয়ে গেছ ?

ইন্দ্রাণীর আগে কন্দর্পই উত্তর দিল,— হ্যাঁ, সেলিমপুরে। লাইনটা পার হয়েই একটু পরে যে কবরখানাটা আছে, ঠিক তার আগেই।

সুদীপ ঘাড় চুলকোল,— আমরাও পেয়ে গেছি। একটু অবশ্য দূর হয়ে গেল। কেয়াতলায়।

রুনা তড়িঘড়ি বলে উঠল,— আমার দিদি-জামাইবাবুই দেখে দিল। ওদের বাড়ির থেকে দু-তিনটে বাড়ি পরে।

ইন্দ্রাণী যে আগেই অ্যাটমের মুখে শুনেছে কথাটা, সেটা ভাঙল না। আলগা মন্তব্য করল,— ভালই হল। তোদের যাওয়া কবে ?

—তিরিশ তারিখ শনিবার আছে, ওই দিনই যাব ভাবছি। পরদিন রোববার, গোছগাছের সুবিধে হবে। তোমার দেওর তো ছুটির দিন ছাড়া ঘরের কুটোটি নাড়বে না, অফিসে ছুটিও নেবে না।

—ওসব ফালতু কথা ছাড়ো। সুদীপ চেয়ার টেনে বসল। কন্দর্পর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল,— যে কথা বলতে এসেছিলাম, ...এখানে দাদাও আছে, ...ভালই হয়েছে চাঁদুও আছে, সবার সঙ্গেই কথাটা হয়ে যাক।

আদিত্য নড়েচড়ে বসল,— কী কথা রে ?

—বলছিলাম কি, এ বাড়িতে তো প্রচুর মালপত্র, সেগুলোর কী হবে ?

আদিত্য বলল,— কি আর হবে ! যার যার মাল সে নিয়ে যাবে।

—সেসব তো নিজেদের ঘরের জিনিস। যাবেই। বাকি যা আছে ? ধরো, বাবার ঘরে যা আছে, তারপর বড়ঘরের ওই বিশাল বিশাল সোফা, কাঠের আলমারি, অত বড় একটা শোকেস.... তারপর সিন্দুকের ওই সব গাদা গাদা বাসন.... কিরে চাঁদু, তোদের বাড়িতে এসব ঢুকবে ? আমার ফ্ল্যাটে তো ঢুকবে না। ছোট্ট টু রুম পেয়েছি, তাই আঠেরো শো পড়ে গেল। তাও চেনাজানার মধ্যে বলে। তোর মুস্তাফি তো হাজারের বেশি ঠেকাবে না।

কন্দর্প উদাসভাবে বলল,— তুমি তো অফিস থেকে হাউস রেন্ট পাবে মেজদা।

সুদীপ মুহূর্তের জন্য থমকাল। যেন সে বলতে চাইছিল আদিত্য কন্দর্প এক সঙ্গে থাকার সুবাদে মুস্তাফির কাছ থেকে অনেক বেশি সুবিধে পাচ্ছে। অবশ্য অভিযোগটা টিকল না বলেও খুব একটা হিলদোল হল না। যেন কথাটা শুনিয়ে রাখার জন্যই শুনিয়ে রাখা। হাসি মুখেই বলল,— যাক গে, লেটস কাম টু দা পয়েন্ট। ওই মালপত্তরগুলোর কি হবে ?

কন্দর্প একটু চিন্তা করল,— বড় বড় সোফাগুলো অবশ্য আমাদের ফ্ল্যাটে ঢুকবে না। বাবার খাটটা নিয়েই বা আমরা কী করব ?

আদিত্য অধৈর্যভাবে বলল,— শোকেস তো আমরা নিয়ে যেতে পারি। কত কাপ মেডেল আছে, আমাদের বাড়ির সব ঐতিহ্য...

—সে নাও গিয়ে। কিন্তু ওই ঢাউস আলমারি ? বাবার ঘরেরটা ? বড়ঘরের দুটো ? ওগুলোর ওয়েট দেখেছ ? বার করতে গেলে চিড়িয়াখানা থেকে হাতি ভাড়া করে আনতে হবে।

কন্দর্প চোখ কুঁচকে তাকাল,— তুমি কি বেচার কথা ভাবছ মেজদা ?

—সে ডিসিশান সকলে মিলে নাও।

আদিত্য বলল,— আমি একটা প্রস্তাব দেব ? শঙ্করের বাড়িতে তো অনেক জায়গা, ওকে বললে ও এসব মাল নিয়ে রাখতে পারবে না ? তারপর ফ্ল্যাট হলে আমরা ভাগাভাগি করে রেখে দেব।

—কী সরল প্রস্তাব ! সুদীপ শব্দ করে হেসে উঠল,— তোমার ওই গন্ধমাদন শঙ্কর টেনে নিয়ে যাবে ? নো চান্স। যদি বাসনকোসনগুলো চার ভাগ করে এক ভাগ ওর হাতে দিয়ে দাও, ও গ্ল্যাডলি নিয়ে আলমারিতে পুরবে। শুধু রাখার জন্য ও কোনও জিনিস নেওয়ার বান্দা নয়।

—তা হলে আর কী। সেল দেম। কন্দর্প কাঁধ ঝাঁকাল,— তোমার হাতে কোনও কাস্টমার আছে ?

—নেইও বটে। আবার আছেও বটে। সুদীপ গোটা ঘরটাকে দেখে নিল। যেন মেপে নিতে চাইছে পরিবেশটাকে। বলল,— অকশনে পাঠিয়ে দিতে পারি। রাসেল স্ট্রিটে আমার চেনা দোকান আছে, ওরা এসব অ্যান্টিক জিনিস লুফে নেবে। বললে নিজেরাই এসে তুলে নিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

আদিত্য কেমন মিইয়ে গেছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,— জয়িকে একবার খবর দিলে হত না ?

—সব ব্যাপারে ওদের অত খবর দেওয়ার কী আছে ? ঘরের আলপিন বেচতে গেলেও ওদের পারমিশান নিতে হবে নাকি ?

—না না, ওদের জানাও। রুনা অনেকক্ষণ পর কথা বলল,— পরে কখন আবার কি কথা ওঠে। দাদাও বলছেন....

—বলছ যখন জানাব। সুদীপ একটু বিরক্ত যেন,— আমি তো আর বাসন বেচতে বলিনি, সেগুলো নয় ভাগজোখ করা যাবে। কাচের আলমারি যখন দাদা রাখতে চাইছে.... অ্যান্টিক ফার্নিচারের কিন্তু ভাল দাম পাওয়া যায়। তাই না রে চাঁদু ?

—হুঁ, তা সব মিলিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার তো হবেই। ইফ নট মোর। বাবার খাটটা তো

মেহগিনি কাঠের। বড় আলমারিটাও। ল্যাজারাসের মাল। ও জিনিস এখন কলকাতাতে কোথায় ?

আরও কত কথা হচ্ছে। দরকারি। অদরকারি। স্বার্থমাখা। নিঃস্বার্থ। কেউ উচ্ছল। কেউ ম্রিয়মাণ। শব্দের ফুলকি অদৃশ্য সেতু রচনা করছে ঘরের লোকদের মাঝে।

গোটা দৃশ্যটাই ইন্দ্রাণীর চোখে যেন বিমূর্ত ছবি। জয়মোহন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছেন, খণ্ড খণ্ড হচ্ছেন কালীমোহন-হেমলতা, খণ্ড খণ্ড হচ্ছেন শোভনা। এবার তাঁদের মিলিয়ে যাওয়ার পালা।

৬১

আজকাল দিবারাত্র টোটোর চোখের পাতায় লেগে থাকে গাড়িটা। বাবার সাদা মারুতি। দাঁড়িয়ে আছে তিতিরদের বাড়ির দরজায়। এক বুনো রাগ দপদপ করে ওঠে টোটোর পাঁজরে। গোটা দুনিয়াটা তেতো লাগে। বাবাকে নিয়ে মা'র যে সন্দেহ, তাহলে সত্যি।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই মাকে কখনও সুখী দেখেনি টোটো। সে অর্থে বাবাকেও নয়। বাবা-মা'র মাঝে সর্বদাই যেন এক ধোঁয়ার আবরণ। কখনও কখনও দুজনে যে হাসিখুশি উচ্ছল হয় না তা নয়, কিন্তু সে যেন বড় কৃত্রিম। দুজনেই যেন পাল্লা দিচ্ছে অভিনয়ের। কারণটা যে এ বাড়ির হাওয়ায় ভেসে বেড়াত, টুকরো-টাকরা কথা চালাচালি থেকে অনুমান করত টোটো। কখনও মনে হত মা বড় বেশি সন্দেহপ্রবণ, হিস্টেরিক। কখনও ভাবত বাবাই বড্ড বেশি উপেক্ষা করে মাকে। মনে হত অবাস্তব এক সমস্যাকে ঘিরে অকারণ যুদ্ধের মহড়া চালায় দুজনে, এ যেন এক খেলা। যেন অসুখী হওয়ার জন্যই সুখী না হওয়ার পণ করেছে দুজনে। রাগ হত সেই অদৃশ্য মহিলার ওপর, যে আড়াল থেকে অবিরাম তীর ছুঁড়ে চলেছে তাদের সংসারে। তবে সে রাগটা ছিল অনেক ফাঁপা। তিতির নামের মেয়েটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেই মিটে যেত সে ক্ষোভ। পরে আবার খারাপও লাগত। মনে হত নিজের মনটাই বড় ছোট হয়ে গেছে টোটোর।

কিন্তু সেদিন কী দেখল টোটো! কেন মা'র অত শরীর খারাপের সময়েও বাবার গাড়ি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তিতিরদের বাড়ির সামনে!

ভাবলেই টোটোর ব্রহ্মতালু জ্বলে ওঠে। অনুমান সত্য প্রতিপন্ন হওয়ার পরও এক সংশয় কুরে কুরে খায় টোটোকে। তার বাবা কি তবে সত্যিই চরিত্রহীন মানুষ ? মাই বা কি ? যে স্নেহার্দ্র চেহারাটা টোটোর সামনে তুলে ধরে মা, তার আড়ালে কি লুকিয়ে আছে এক আত্মসুখী মহিলা ? যে সামান্য জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে আত্মসম্মান বিকিয়ে আঁকড়ে আছে সংসার ? নাকি শুধুই এক বিতৃষ্ণার শিকলে আটকা পড়ে আছে বাবা-মা ?

হ্যাঁ, টোটোর এসব ভাবনা আসে আজকাল। সতেরো বছর বয়সে এত সব ভাবনা আসার কথা নয়, তবুও আসে। বনবন চরকি খায় মাথায়। তাদের বাতাসহীন ফ্ল্যাট তাকে যেন খুব তাড়াতাড়ি বড় করে দিচ্ছে।

রবিবারের সকাল। আকাশে আজ অল্প অল্প মেঘ জমেছে। একটু আগে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে গেছে শুভাশিস, তার ফিরতে ফিরতে দুপুর হবে। রাঁধুনি মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকল অলকা। ছন্দার এখনও বেশি তেলমশলা খাওয়া বারণ, তার রান্নাটা অলকা নিজের হাতেই করে। ড্রয়িং স্পেসে টিভিতে কার্টুন ফিলম চলছে, চোখ বড় বড় করে দেখছে টুকি, নিজের মনেই হঠাৎ হঠাৎ হাততালি দিচ্ছে, হেসে উঠছে খলখল। ছন্দা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে, তার শরীর এখনও পুরোপুরি সারেনি। শালিনী তাকে বহুদিন আগেই হাঁটাচলা করতে বলেছে, কিন্তু সে পারতপক্ষে বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না। শুধু এই সকালটুকু ছাড়া।

টোটো অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বইটা উল্টোচ্ছিল। অ্যালডিহাইড কিটোনের ওপর কয়েকটা প্রশ্ন দিয়েছেন স্যার, পাঠ্যবই আর নোট মিশিয়ে উত্তর তৈরি করতে হবে। মন বসছে না, বারবার সহজ

কেমিক্যাল ইকুয়েশানগুলো ভুল হয়ে যাচ্ছে। কী যে হয়েছে আজকাল! কালি-কলম-অক্ষরের দুনিয়ায় আর তেমন করে মন বসে না কিছুতেই। ধ্যাৎতেরি বলে উঠে পড়ল টোটো। জিনস টিশার্ট চড়াল গায়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে গলা ওঠাল,— কাকিমা... ও কাকিমা, আমি একটু বেরোচ্ছি।

অলকা খুব একটা অবাক হয়নি। টোটো আজকাল হুটহাট বাড়ির থেকে বেরিয়ে যায়, দেখেছে অলকা। বলল,— ফিরছ কখন ?

টোটো গম্ভীর মুখে বলল,— দেখি। তবে বাবা আসার আগেই।

—দেরি কোরো না। তুমি না ফিরলে দিদি খেতে চায় না।

টোটো উত্তর দিল না, হাসল সামান্য। এই কাকিমা মহিলাটিকেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না টোটো। এমনিতে কালেভদ্রে কলকাতায় আসে, এলেও ফেরার জন্য ছটফটানি। বাবা ওখানে একা আছেন, কি হবে! বাবা ওখানে একা আছেন, কি হবে! এবার নয় নয় করে এক মাস পার হয়ে গেল, অথচ ফেরার কথা মনেই নেই! দিনরাত সেবা করে চলেছে মা'র, এখানে কারুর যেন একটুও অসুবিধে না হয় সেদিকে কী সজাগ দৃষ্টি, অথচ মাধবপুরে যে একটা সংসার পড়ে আছে তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই! স্ট্রেঞ্জ! মাধবপুরের বাড়িতে কাকিমার কোনও এক নার্স বান্ধবী নাকি এসে মাঝে মাঝে রান্নাবান্না করে দিয়ে যায়। রাত হয়ে গেলে কাকা নাকি তাকে আবার মোপেডে করে কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে আসে। এই নিয়ে মা কাকিমার কথা হচ্ছিল ক'দিন আগে।

মা বলছিল,— মেয়েটার বয়স কীরকম রে অলকা ?

কাকিমা বলল,— কত আর। আঠাশ-তিরিশ হবে।

—ওই বয়সের মেয়ে, তার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এলি ?

—সব আর কী দিদি। ঘরদোর তো টুকির বাবাই সামলাচ্ছে।

—তা নয়, তবু ওই বয়সের মেয়ে, তুফানের সঙ্গে যখন-তখন মোপেড করে আসে যায়.... মাধবপুর তো কলকাতা হয়ে যায়নি, এই নিয়ে কথা তো উঠতে পারে।

—তোমার দেওরকে তো তুমি চেনো দিদি। ও কি এসব কেয়ার করে ? বাবাও করেন না, ছেলেও না।

—তা নয় হল, কিন্তু...। মা গলা নামিয়েছিল হঠাৎ,— তোর মন খচখচ করে না ?

—আমার! কেন ?

—বাহ্, তুফান পুরুষমানুষ না! সে একটু আলাভোলা ঠিকই, কিন্তু.... পুরুষমানুষের মতি বিগড়োতে কতক্ষণ!

কাকিমা হেসে উঠেছিল,— স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে কি পাহারাদারি চলে দিদি ? খোলা-ছাড়া থাকলেই বরং মানুষের বন্ধন বেড়ে যায় গো। তেমন যদি কিছু তোমার দেওরের মনে থাকে, আমি কি মাধবপুরে থেকেও তাকে আটকে রাখতে পারব ? বাবা বলেন, বিশ্বাস.... বিশ্বাসই হল সংসারের ভিত। ...কথাটা আমি খুব মানি দিদি।

কাকিমা হাসতে হাসতে কথা বলে যাচ্ছে, আর মা'র মুখ কালো হয়ে উঠছে ক্রমশ। টোটোরও বুক ভারী হয়ে গিয়েছিল সেদিন। তার বাবা-মা'র সম্পর্কও তো এমনটা হতে পারত। কোত্থেকে এত মনের জোর এসেছে কাকিমার ? অথচ মা'র তুলনায় কাকিমা তো নেহাতই এক গেঁয়ো মহিলা, কলকাতার রাস্তায় ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতেও ঘাবড়ে একশা হয়! স্ট্রেঞ্জ!

টুকির মাথায় আলগা চাঁটি দিয়ে ক্যাবিনেটের ড্রয়ার খুলে বাদামি মারুতির চাবি বার করল টোটো। দেখেই অলকা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসেছে,— ওকি! তুমি একা একা গাড়ি বার করবে নাকি! আজ তো রামদেও আসেনি!

টোটো ঠোঁটে আঙুল চেপে ইশারা করল,—চুপ। মা শুনতে পাবে।

অলকা একবার ব্যালকনিতে দাঁড়ানো ছন্দাকে দেখে নিল,—এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না টোটো। গত রোববারও দাদা কিন্তু খুব রাগ করেছিলেন।

টোটো ফিসফিস করে বলল,—কাম অন কাকিমা, গাড়ি চালানো এখন আমার জলভাত হয়ে গেছে। তুমি রামদেওকে জিজ্ঞেস করে দেখো। গাড়ি বেরোলে ও আর এখন কতক্ষণ চালায়! চালাই তো আমিই।

—জানি না বাবা। কাজটা তুমি ভাল করছ না।

—তোমায় জানতে হবে না। রিস্ক ইজ মাইন। তুমি কাইন্ডলি মাকে একটু ব্যালকনি থেকে সরিয়ে নাও। এমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

ঝড়ের গতিতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল টোটো। আঠেরো বছর না হলে সে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে না, এখনও তার আঠেরো বছর হতে দশ-এগারো মাস বাকি, তার জন্য কোনও পরোয়া নেই টোটোর। রামদেওর কাছে তালিম তার মন্দ হয়নি, মাসখানেকের শিক্ষাতেই সে বেশ দক্ষ হয়ে গেছে, মাত্র দশ মিনিটেই সাত-আট কিলোমিটার পথ উজিয়ে পৌঁছে গেল সন্তোষপুর।

হিয়ার ঠাকুমা দরজা খুলেছেন। টোটো বেশ অবাক হল,— আপনি! কবে ফিরলেন?

হিয়ার ঠাকুমাকে খুবই শীর্ণ দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল চোখ জ্যোতিহীন। ম্লান হেসে বললেন,— পরশু।

—আপনার মুখচোখ এত খারাপ লাগছে কেন ঠাকুমা? শরীর খারাপ?

—আর শরীর। .... তুমি ভাল তো? যাও না, হিয়া ঘরেই আছে।

হিয়ার ঠাকুমা দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন। যেন পালিয়ে বাঁচলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিয়া ছুটে এসেছে দরজায়। অন্য দিন টোটোকে দেখলে চোখ জ্বলে ওঠে হিয়ার, আজ যেন তেমনটি ঘটল না। ফ্যাকাসে হেসে বলল,— ও তুই! আয়।

গাড়ির চাবি আঙুলে ঘোরাচ্ছে টোটো,— উঁহু, তুই আয়।

হিয়া একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নখ খুঁটছে আঙুলের। একবার দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখছে টোটোর গাড়িখানা। ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল,— তুই বোস গাড়িতে, আমি আসছি।

চলছে গাড়ি। আগের মতো ঝোড়ো গতিতে না হলেও বেশ জোরেই। শহরের পূর্ব দিকে যে নতুন রাস্তা গড়ে উঠেছে, সেদিকে। হিয়া বসে আছে নির্বাক। তার খোলা চুল ভাসছে হাওয়ায়। মেঘলা আকাশে চাপা বিষণ্ণতা।

ছোট্ট একটা ব্রিজ পেরিয়ে টোটো বলল, —তোর ঠাকুমা ফিরে এসছেন তুই বলিসনি তো?

হিয়া অন্যমনস্কভাবে বলল,— হয়নি বলা।

—উঁহু, সামথিং রঙ মনে হচ্ছে! ....ঠাকুমা হঠাৎ ফিরে এলেন কেন?

বাঁ হাতে খোলা চুল চাপল হিয়া,— রঙ আবার কী। পিসির বাড়িতে ঠাম্মার খুব অসুবিধে হচ্ছিল, বাবা গিয়ে নিয়ে এল।

টোটো ঝট করে হিয়াকে দেখে নিল,— এটা হাফ ট্রুথ। শুধু এটুকুনি যদি ঘটত তা হলে তোর মুখটা এরকম পেঁচার মতো হয়ে থাকত না।

হিয়া চুপ।

—তুই আমার কাছে কথা লুকোচ্ছিস হিয়া? মনে আছে আমরা কি প্রমিস করেছিলাম?

—আমি কোনও প্রমিস করিনি।

—অফকোর্স করেছিলি। আমরা হাতে হাত রেখে বলেছিলাম কেউ কারুর কাছে কিছু লুকোব না। বলতে গিয়ে গলা একটু কেঁপে গেল টোটোর। নিজের ফ্যামিলির কথা সে কতটুকু বলেছে হিয়াকে? বাবা-মা'র কথা ভাবতে গিয়ে তার যে বুকের ভেতর ব্লিডিং হয় অবিরাম, এ কথা কি হিয়াকে বলা উচিত ছিল না? কিন্তু সে বলেনি। বলতে পারেনি। মুখে বেধে গেছে।

টোটো সহজভাবে বলল,— ঠিক আছে না হয় নাই বললি। একটু ইজি হ। একটু রিল্যাক্সড হ।

হিয়া নাক টানল,— তুই রাগ করছিস ?

—না, রাগের কি আছে।

—কী বলি বল তো। যে পিসির বাড়ি গিয়েছিল ঠাম্মা, সেখানে খুব বিচ্ছিরিভাবে হিউমিলিয়েটেড হয়েছে। প্রায় পথে বসার দশা হয়েছিল। যে আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তারা মোটা টাকা ডোনেশান চায়। ঠাম্মা কোত্থেকে দেবে ? বাবা শুনে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে নিয়ে এল, অমনি বাড়িতে অশান্তি। কাল যখন বাবা বাড়ি ছিল না তখন ওই মহিলা, দ্যাট বিচ, ঠাম্মাকে বলেছে, অত তেজ দেখিয়ে কি হল ! সেই তো ছেলের কাছে ফিরতে হল ! শুনেই ঠাম্মা আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল বাড়ি থেকে, অনেক কষ্টে আটকেছি। রাতে ওই মহিলার সঙ্গে বাবার ফাটাফাটি হয়ে গেল। সক্কালবেলা তিনি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। এক ঘরে বাবা গুম হয়ে বসে আছে, এক ঘরে ঠাম্মা। ঠাম্মা বলছে, আমায় তুই ছেড়ে দে। বাবা বলছে, তুমি গেলে আমি আত্মহত্যা করব। এর মধ্যে কোনও মানুষ হাসি মুখে থাকতে পারে ?

হিয়া ফোঁপাচ্ছিল। টোটো পরিবেশটা হালকা করতে চাইল,— এ তো গুড নিউজ। এতে এত মন খারাপ করার কি আছে ? ভদ্রমহিলা যদি আর না ফেরে তো সব প্রবলেম সলভড্।

—তাই কি হয় ! বাবার বিয়ে করা বউ, সে তার রাইট অত সহজে ছেড়ে দেবে ? আমি তো ডিসাইড করেছিলাম মা'র কাছে পারমানেন্টলি চলে যাব। মা'র সঙ্গে কথাও হয়েছিল। কিন্তু এখন ঠাম্মাকে ছেড়ে আমি যাই কি করে ?

—ও ভেবে লাভ নেই। মা'র কাছে গিয়েও তুই শান্তি পেতিস না।

—কেন নয় ?

—বিকজ তোমার মা'রও একটা গণ্ডি হয়ে গেছে। তোর স্টেপ ফাদারকে তুই কি বাবা বলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবি ?

—রনি তো পেরেছে।

—রনি গেছে অনেক ছোটবেলায়। ইউ আর নট দ্যাট চাইল্ড নাউ। টোটো নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মতো বোঝানোর চেষ্টা করল,— তোর এক ধরনের লাইকিংস ডিজলাইকিংস হ্যাবিটস গ্রো করে গেছে। অচেনা এনভায়রনমেন্টে তুই সেটলই করতে পারবি না।

—বাট ওই ভদ্রমহিলার থেকে দ্যাট ম্যান ইজ ফার বেটার। অনেক অ্যাফেকশনেট। রনিকে তো একদম নিজের ছেলে করে নিয়েছে।

—মে বি। কিন্তু তোকে আমি চিনি, তুই ওখানে মোটেই থাকতে পারবি না।

—পারার তো আর প্রশ্নও ওঠে না। আমি এখন সবসময় ঠাম্মার সঙ্গে থাকব। জানিস ঠাম্মা কাল কী বলছিল আমাকে ? বলছিল আমার চোখ দুটো ভাল থাকলে শত উপরোধেও ফিরতাম না। আবার সেলাই করে....। ঠাম্মার কী পারসোনালিটি ছিল, ক'দিনে কী হয়ে গেছে ঠাম্মা। আ রুইন। ভাবাই যায় না এই ঠাম্মাই একদিন একা কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করেছে !

হিয়ার সান্নিধ্যে এলে টোটোর বুকের ভেতরের বুনো রাগটা পোষা কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে শুয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে গাঝাড়া দিয়ে উঠল কুকুরটা, ঝপ করে অ্যাক্সিলেটারে পা চাপল টোটো, সাঁই করে পার হয়ে গেল এক জগদ্দল লরি। সামনের আয়নায় চোখ রেখে বলল,— আমাদের বাবা-মা'র জেনারেশানটাই বড় বিটকেল। সব সেলফিশ। নিজেদেরটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু বোঝে না। আই জাস্ট হেট দেম।

টোটো আচমকা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সামনে সামনে একটা অ্যাম্বাসাডার যাচ্ছে, রাস্তার মাঝখান দিয়ে, জোরে জোরে হর্ন কয়েকবার বাজাল। গাড়িটা তবু পথ ছাড়ছে না। সবেগে, প্রায় গাড়িটার গায়ে গা লাগিয়ে, সামনে এগিয়ে গেল টোটো। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অ্যাম্বাসাডারের ড্রাইভার অশ্রাব্য গালাগাল দিল একটা।

হিয়া সভয়ে জানলা থেকে হাত সরিয়ে নিল। এক দৃষ্টে দেখছে টোটোকে।

টোটো নির্বিকার মুখে গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে। দু পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। জায়গায় জায়গায় নতুন শহরতলির পত্তন হয়েছে। মাঝের কালো রাস্তা ছুটছে খরস্রোতা নদীর মতো। চার চাকার খেলনা চিরছে নদীর বুক।

ঝাঁ করে অনেকটা পথ চলে গিয়ে ঘাড় ঘোরাল টোটো,— কী দেখছিস ?

—তোর হঠাৎ কী হল রে রাজর্ষি ?

—কিছু না। ফান। টোটো হঠাৎ গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দিল,— এই হল লাইফ। কারুর তোয়াক্কা কোরো না। দু হাত ছেড়ে বাঁচো।

—রাজর্ষি প্লিজ, ওরকম করিস না। আমার বুক কাঁপছে।

—ইজ ইট ? ফিল করে দেখব ?

—অসভ্যতা করিস না। ঠিকভাবে চালা।

—ঠিকভাবেই তো চালাচ্ছি।

—আমি আর তোর সঙ্গে কোনওদিন গাড়িতে উঠছি না।

—তুই তো তোর নেকু বন্ধুটার মতো কথা বলছিস রে !

—কোন বন্ধু ?

—ওই যে বোকা সেজে থাকে। বেসিকালি ন্যাকার ডিম।

—কার কথা বলছিস ?

—তোর বেস্ট ফ্রেন্ড। তিতির। অত সরল সেজে থাকা ঘোড়েল মেয়ে আমি আর দুটো দেখিনি। আবার স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরেছে টোটো। আবার দৃশ্যটা ভাসছে চোখের সামনে। বাবার সাদা মারুতি। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে তিতিরদের দরজায়। গোপন পাপের মতো। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে সাঁটা রগরগে কুৎসিত বিজ্ঞাপনের মতো।

হিয়া সোজা হয়ে বসেছে,— তিতিরের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল ? কবে ?

—হয়েছিল একদিন। সম্রাটদের বাড়ি ফুর্তি মারতে গিয়েছিল, ফেরার পথে অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছিল বৃষ্টিতে। তোর বন্ধু বলে গাড়িতে একটা লিফট দিলাম। বুক ভরে তাজা বাতাস টানল টোটো। অদৃশ্য ওই মহিলার কথা ভাবতে গেলেই কেন যে সব রাগ গিয়ে তিতিরের ওপর পড়ে ! তিতির কি বোঝে না কিছু ? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করে ? গলার স্বর আরও রুক্ষ করে টোটো বলল,— তুই তো খুব বন্ধু বন্ধু করিস, তোর সম্পর্কে কী আজে-বাজে কথা বলছিল জানিস ?

—তিতির আমার নামে বাজে কথা বলছিল ! হতেই পারে না।

—আমি মিথ্যে বলছি ? দেখা হলে জিজ্ঞেস করে দেখিস। ওই মেয়েটা তোকে সহ্যই করতে পারে না।

হিয়ার পলক পড়ছে ঘন ঘন। যেন বিশ্বাস-অবিশ্বাস একই সঙ্গে খেলা করে চলেছে। ভুরু কুঁচকে বলল,— কী বাজে কথা বলেছে তিতির ?

—সে আর শুনে কী করবি ? মিছিমিছি মন খারাপ হবে।

—তবু বল শুনি।

—বাদ দে, ও একটা স্ক্যান্ডাল মঙ্গার। টোটো চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে,— আফটার অল ওর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো ভাল নয়। বাপটা ড্রাঙ্কার্ড, মা'রও ক্যারেকটারে গণ্ডগোল আছে... ওই জন্যই তো ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না।

হিয়া নিথর। একটু পরে নিচু গলায় বলল,— কিন্তু ও তো বলে তোর বাবা ওদের বাড়িতে যান !

টোটো দাঁতে দাঁত ঘষল। হঠাৎ গাড়ির গতি বাড়িয়েই কমিয়ে দিল পরমুহূর্তে। আবার বাড়াল, আবার কমাল। যেন খেলা করছে গাড়িটাকে নিয়ে। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে বলল,— ছাড় তো তোর তিতিরের কথা। ওর সঙ্গে তোর আর বেশি মেশামিশি করার দরকার নেই।

হিয়া তবু কী যেন ভাবছে।

এই ক মাসেই হিয়ার ওপর যেন অধিকার জন্মে গেছে টোটোর। সে গম্ভীর মুখে বলল,— কথাটা কানে ঢুকল ? শুনছিস কী বললাম ?

—শুনছি তো।

—শোনা নয়, টেক ইট ইন্টু হার্ট। যে তোর সম্পর্কে আড়ালে খারাপ-খারাপ কথা বলে তার সঙ্গে তোর সম্পর্ক রাখা আর চলবে না। মনে থাকবে ?

হিয়া নিঃশব্দে দুদিকে মাথা নাড়ল।

বিকৃত আনন্দে পলকের জন্য উদ্ভাসিত হল টোটোর মুখ, পরক্ষণেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। তিতির কি খুব আঘাত পেয়েছিল সেদিন ! টোটো তো তিতিরের বন্ধুই হতে চেয়েছিল, কেন যে সেদিনই সাদা মারুতিটা.... !

একটা ম্যাটাডোর ভ্যান সামনে এসে গেছে। ঢকর-ঢকর করে চলছে রাস্তা জুড়ে। অস্থির আঙুলে হর্ন বাজাল টোটো। সরছে না গাড়ি। বারবার টোটোর রাস্তায় কেন যে এত প্রতিবন্ধকতা !

ক্ষিপ্র গতিতে টোটো পিছনে ফেলতে চাইল ম্যাটাডোরকে। গাড়িটাও গতি বাড়িয়েছে অকস্মাৎ। পাল্লা দিচ্ছে। একটু আগের অ্যাম্বাসাডারের ড্রাইভারটার গালাগাল মনে পড়ল টোটোর। সঙ্গে সঙ্গে আরও তেতে গেছে মাথা। আরও জোরে অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিল টোটো।

হিয়া চিৎকার করে উঠল,— এই রাজর্ষি, কি করছিস কী ? আস্তে। আস্তে।

টোটো ধমকে উঠল,— চুপ করে বোস তো। সোয়াইনটার এত বড় সাহস, রাজর্ষি সেনগুপ্তর সঙ্গে কম্পিটিশান দেয় ! দেখাচ্ছি মজা।

স্পিডোমিটারের কাঁটা ঝলকে নব্বই ছাড়িয়েছে। বিদ্যুদ্‌বেগে ম্যাটাডোরটাকে পার হয়ে গেল টোটো।

আর ঠিক তখনই টোটো বুঝতে পারল গাড়ি আর তার বশে নেই। ব্রেকে পা আনতেও ভুলে গেল টোটো।

অন্ধকার। চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার।

৬২

নার্সিংহোমে খবরটা পেল শুভাশিস। স্যাস ক্লিনিকের চেম্বারে শেষ রুগীটিকে দেখে সে যখন ওঠার তোড়জোড় করছে, তখনই বাড়ি থেকে ফোন এল। অলকার।

মুহূর্তের জন্য হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েছিল শুভাশিসের। শরীর অবশ, হিম। মাথা যেন একলহমায় সম্পূর্ণ ফাঁকা। এখন কী করবে সে ? এক্ষুনি তার কি করা উচিত ? চিন্তা যুক্তি বুদ্ধি সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। কোনওক্রমে ভাঙা গলায় ডাকল,— অরূপ...এই অরূপ... ।

রবিবার অরূপের নার্সিংহোমে চেম্বার থাকে না, তবু আসে। রাউন্ড দেয়, টুকিটাকি লেখাপত্রের কাজ সারে, চারদিক দেখাশুনো করে, দরকারি কোনও ফাইল থাকলে বসে সেসব নিয়ে। আজ অফিসঘরে একটা চিঠি টাইপ করাচ্ছিল। শুভাশিসের আর্ত ডাক শুনে ছুটে এল সে,— কী হয়েছে ?

শুভাশিসের আর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। বিবর্ণ মুখে ফোনের দিকে আঙুল দেখাল।

অরূপ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,— হল কী তোর ? ফিলিং সিক ?

শুভাশিস জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। মুঠো শক্ত করে শ্বাস টেনে বাতাস ভরল বুকে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,— টোটো অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।

—সে কী ! কোথায় ? কখন ? কী অ্যাক্সিডেন্ট ?

—খানিক আগে। বাইপাসে। নতুন গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল...। পুলিশ তুলে হসপিটালে নিয়ে গেছে।

—কোন হসপিটাল ?

—এন আর এস। ...কী হবে অরূপ?

শুভাশিস কাঁপছে ঠক ঠক। অরূপ এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রাখল,— কুল্ কুল্। তুই নার্ভাস হয়ে গেলে চলবে কেন? ওঠ দেখি, চল।

শুভাশিস পায়ে জোর পাচ্ছিল না। টলতে টলতে উঠেছে।

অরূপ বলল,— এক সেকেন্ড দাঁড়া। এন আর এস-এ একটা ফোন করে নিই। যদি লাহিড়িকে পেয়ে যাই...। ফোনের বোতাম টিপতে গিয়েও অরূপ হাত সরিয়ে নিল,— ধুস, আজ তো রোববার। কোনও শালা সিনিয়ারকে পাওয়া যাবে না। চল চল বেরিয়ে পড়ি। কুইক।

শুভাশিসকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে অরূপ স্টিয়ারিং-এ বসল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বড় মলিন হয়ে গেছে দিনটা। ছুটির বেলা, রাস্তাঘাটে লোকজনও বেশ কম। গাড়ি চালাতে চালাতে অরূপ নিচু গলায় প্রশ্ন করল,— ইনজুরির নেচার নিয়ে কিছু বলল?

শুভাশিসের মাথা এখনও ঠিকঠাক কাজ করছে না। বিড়বিড় করে বলল,— টোটোর যদি আজ কিছু হয়ে যায়...

—আগেই খারাপটা ধরে নিচ্ছিস কেন? হয়তো দেখবি তেমন কিছুই হয়নি।

—তা হলে পুলিশ হসপিটালে নিয়ে গেল কেন?

—সে তো মাইনর ইনজুরিতেও নিয়ে যেতে হয়।... স্টেডি শুভ। ইউ আর এ ডক্টর।

শুভাশিস তবু ঠিক সান্ত্বনা পাচ্ছিল না। টোটো তার কাছে কতখানি এ কথা অরূপ কী করে বুঝবে! আর ডাক্তার বলে সে তো আর অতিমানব কিছু হয়ে যায়নি। বরং এই মুহূর্তে তার পেশাদারি নিস্পৃহতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তীব্র এক পিপাসায় শুকিয়ে আসছে কণ্ঠনালী। বাবা শুভাশিস ছাপিয়ে গেছে ডাক্তার শুভাশিসকে।

অরূপ আবার প্রশ্ন করল,— ফোনটা কে করেছিল? পুলিশ? হসপিটাল?

—না, বাড়ি থেকে এসেছিল। পুলিশ বাড়িতে জানিয়েছে।

—তার মানে তোকে ছন্দা খবরটা দিল?

—নাহ। অলকা। তুফানের বউ। শুভাশিস সিগারেট ধরাতে গিয়ে দু-তিনটে কাঠি নষ্ট করল। ধোঁয়াটা না ছেড়ে জমিয়ে রাখল বুকে। এক আত্মগ্রাসী উদ্বেগের চাপে এতক্ষণ ছন্দার কথা মনেই হয়নি। মনে পড়তেই ডুব-ডুব শঙ্কা। এমনিই তো অপারেশানের পর থেকে কেমন মূহ্যমান হয়ে থাকে ছন্দা, খবরটা পেয়ে কী করছে এখন! উথাল-পাতাল! আছাড়ি-পিছাড়ি! পাথর! অলকাকে নিয়ে জোর করে চলে আসবে না তো হাসপাতালে!

শুভাশিস অধৈর্যভাবে বলে উঠল,— কতবার ছেলেটাকে বলেছি তোর এখন গাড়ি চালানোর বয়স হয়নি, গাড়িতে হাত দিবি না...গাড়িতে হাত দিবি না!... ওফ, ওই গাড়িটা কেনাই আমার ভুল হয়ে গেছে।

—এখন ওসব ভেবে লাভ আছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। হাত বাড়িয়ে শুভাশিসের সিগারেটটা নিয়ে নিল অরূপ,— ওই বয়সের ছেলে হাতে গাড়ি পেলে চালাতে চাইবেই।

—আমি কালই ওই রামদেওটাকে তাড়াব। বায়না ধরছে বলেই ড্রাইভিং শেখাতে হবে! যদি আমার ছেলের কিছু হয়ে যায় ওকে আমি ছাড়ব না। পুলিশে দেব। ঘানি টানাব।

শুভাশিস অর্থহীন গজগজ করে চলেছে। যেন ওভাবেই ভুলিয়ে রাখা যায় নিজেকে। যেন দুর্বলতর কাউকে শাস্তি দিলেই প্রশমিত হবে উদ্বেগ। হায় রে, তা কি হয়।

হাসপাতালে পৌঁছে তীরবেগে এমারজেন্সির দিকে ছুটল শুভাশিস। এমারজেন্সি টেবিলেই শুয়ে আছে টোটো। মাথা জোড়া ব্যান্ডেজ, নাকে স্টিকিং প্লাস্টার, বাঁ চোখের নীচে বড় একটা কালশিটে, থুতনিতে ছোপ ছোপ মারকিউরোক্রোম। ডান হাতের কনুই কেতরে ভাঁজ হয়ে আছে বুকে, হাতেও বেশ চোট লেগেছে বোঝা যায়। টোটোর পাশে ভীষণ শুকনো মুখে বসে আছে একটি মেয়ে, তার হাতে-মুখেও ছোট ছোট আঘাতের চিহ্ন।

শুভাশিস খানিকটা আকুল স্বরে বলল,— এ কী করলি রে তুই টোটো !

টোটো তাকাল।

কথাটা নিজের কানেই যাত্রার ডায়ালগের মতো শোনাল শুভাশিসের। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করে হাসল একটু।

টোটোর ঠোঁটের কোণেও এক ফালি হাসি ফুটে উঠেছে। হাসিটা যেন ঠিক হাসি নয়, তবু হাসিই। বাবাকে দেখে কি আশ্বাস পেল ছেলে ? নাকি দুষ্টুমি ধরা পড়া অপ্রস্তুত হাসি ওটা ? শুভাশিস ঠিক বুঝতে পারল না। তবে স্বস্তি পেল। যাক, ফাঁড়াটা অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।

শুভাশিস ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করল,— কটা স্টিচ হল ?

—বোধহয় পাঁচটা। টোটো সামান্য মুখ ফাঁক করল,— তেমন কিছু হয়নি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বমি-টমি হয়েছিল ?

—না।

—বাবার কথা না শোনার ফল দেখছিস তো ?

—পুরো দেখা হল কই। টোটো আবার হাসল। অদ্ভুত এক মর্ষকামী হাসি।

এ কেমন হাসি ছেলের ! বুকের খাঁচাটা কেঁপে উঠল শুভাশিসের। গোমড়া মুখে বলল,— অ্যাক্সিডেন্টটা হল কী ভাবে ?

—পরে শুনো।... এই আমার বন্ধু হিয়া। আমার ক্লাসমেট। ও আমার সঙ্গে ছিল। ওর বাড়ি ফেরার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দাও।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাচ্ছে টোটো। শুভাশিস ব্যস্ত হয়ে পড়ল,— তোর রিব-টিবে চোট লাগেনি তো ?

—আহ বাবা, তুমি আগে হিয়াকে দেখো। ওর বাড়িতে ফোন নেই, খবর দেওয়া যায়নি।

শুভাশিসের যেন হুঁশ ফিরল এতক্ষণে। ভাল করে দেখল মেয়েটিকে। মাথা নিচু করে বসে আছে। বোধহয় ভয় পেয়ে কাঁদছিল খুব, গাল থেকে জলের রেখা এখনও শুকোয়নি। দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো হিয়ার চোট-আঘাতের খবর নিল শুভাশিস, বাড়ির ঠিকানা জেনে বসিয়ে এল অরূপের গাড়িতে। নিজেদের পরিচয় দিয়ে অরূপ এক তরুণ হাউস স্টাফের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিচ্ছে। হাউস স্টাফ ছেলেটি বেশ সসম্ভ্রমে কথা বলছে অরূপের সঙ্গে, বুঝিয়ে দিচ্ছে আঘাতের পরিমাণ। আজ রবিবার, এক্সরে করা যায়নি, যেন বাড়ি গিয়ে কনুইয়ের এক্সরে করে নেওয়া হয় টোটোর, হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার হলেও হয়ে থাকতে পারে।

অরূপের কাঁধ ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরোচ্ছে টোটো, শুভাশিস পাশে পাশে হাঁটছিল। দিঘির ধারে দাঁড়িয়ে আছে অরূপের লাল ক্রস মারা গাড়ি, সেদিকে এগোচ্ছে, মাটি ফুঁড়ে এক কনস্টেবল এসে হাজির। টোটোকে দেখিয়ে বলল,— এ কার গাড়ি চালাচ্ছিল ?

শুভাশিস কপাল কুঁচকোল,— আমার গাড়ি। হি ইজ মাই সান।

—অ। কিন্তু গাড়ির তো পুলিশ কেস হয়ে গেছে। আপনাদের একবার থানায় যেতে হবে।

—এক্ষুনি ?

—নইলে আপনি ছেলেকে নিয়ে যাবেন কী করে ? ওকে তো আপনাদের বেল বন্ডে ছাড়াতে হবে। বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালাচ্ছে, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে... এলেন আর ওমনি নিয়ে চলে গেলেন ?

—কাউকে চাপা দিয়েছে নাকি ?

—দিতেই প্যারত। যা র‍্যাশ চালাচ্ছিল ! দেয়নি, রাস্তার লোকের কপাল।... আপনি একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে যান।

অরূপ টোটোকে গাড়িতে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে এসেছে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল কনস্টেবলের দিকে,—ফালতু ঝামেলা করছেন কেন বলুন তো ? আমরা কি পালিয়ে যাব ? হি ইজ আ ডক্টর।... অ্যাই শুভ, তোর একটা কার্ড দিয়ে দে না।

শুভাশিসের কার্ডে আলগা চোখ বোলাল ছোকরা কনস্টেবল। সিগারেট আর কার্ড এক সঙ্গে পকেটে রেখে দিল। একটু নরম সুরে বলল,— আপনাকে একবার থানায় যেতেই হবে ডাক্তারবাবু। সইসাবুদ করতে হবে...

—করব, সব করব। বিকেলে যাব থানায়। বাই দা বাই, আমার গাড়িটা কোথায় ?

—গাড়ি বোধহয় এতক্ষণে থানায় এসে গেছে।

—কী অবস্থা গাড়ির ?

—সে গেলেই দেখতে পাবেন। অত জোরে ধাক্কা মেরেছে...। কপাল ভাল, ছেলে আপনার হেঁটে চলে যাচ্ছে।

—বিকেলে গ্যারেজ থেকে মিস্ত্রি নিয়ে যাব ? গাড়ি আনা যাবে ?

—অ-আজ ! কনস্টেবল দাঁত বার করে হাসল, কবে গাড়ি ছাড়া পাবে তার ঠিক আছে ! মেকানিকাল হবে... আপনারা তো বলতেও পারেন গাড়ির ব্রেক ফেল ছিল। তারপর ধরুন...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা হবার হবে। বলেই অরূপ কাঁধে হাত দিয়ে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেল কনস্টেবলকে। মিনিটখানেক পরে ফিরে এল দুজনে। ফিরেই কনস্টেবলের অন্য মূর্তি। হাসিমুখে বলল,— আচ্ছা স্যার, নিয়ে যান ছেলেকে। বিকেলে কিন্তু আসবেন স্যার, নইলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে। বলতে বলতে ঘোলাটে আকাশের দিকে তাকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল বড় করে,— আসলে স্যার এখানে আমার একটা অন্য কেস আছে। পরশু রাতে আমাদের লকআপে এক শালা ড্রাগ কেস গলায় ব্লেড চালিয়েছিল। এখন এখানে ভর্তি আছে। ওর ডিউটি আমার ওপর। তার সঙ্গে বড়বাবু আপনার ছেলেকে ট্যাগ করে দিল। আমি কিন্তু আপনাদের নিজের রিসকে ছেড়ে দিলাম। কথাটা মনে রাখবেন স্যার।

—মনে তো রেখেছি। রাখিনি ? পকেটে তো এখনও নোটের লেজটা দেখা যাচ্ছে। অরূপ ঝেঁঝে উঠল সামান্য।

কনস্টেবলটা মানে মানে সরে পড়ল।

পিছনের সিটে বসে আছে টোটো আর হিয়া। টোটো শরীর ছেড়ে দিয়েছে পিছনপানে, চোখ দুটি বোজা। হিয়া ঈষৎ জড়সড়।

সামনের দরজা খুলে শুভাশিস অরূপকে জিজ্ঞাসা করল,— ব্যাটা কত নিল রে ?

—ওর আর কত নেওয়ার দৌড় ! ভিখিরির ভিখিরি। বিশ টাকা ধরিয়ে দিয়েছি।

শুভাশিস সঙ্গে সঙ্গে পার্স থেকে টাকা বার করছিল, অরূপ বাধা দিল,— রিল্যাক্স ম্যান। তোর এখন অনেক গুনাগার যাবে। বউনিটা জাস্ট আমার হাত দিয়ে হল। টোটো-মাস্টার জম্পেশ একটা কাণ্ড বাধিয়েছে। হা হা।

—হুঁ। শুভাশিস মাথা নাড়ল,— ইনসিওরেন্সের টাকাটাও বোধহয় পাওয়া যাবে না। রিপেয়ারিং-এও ভালই গচ্চা যাবে।

পিছন থেকে টোটোর বিস্বাদ স্বর শোনা গেল,— সরি ফর দা লস বাবা।

শুভাশিস ঘুরে বসল,— টাকার লস নিয়ে আমি ভাবি না টোটো। আই ক্যান অ্যাফোর্ড ইট। কিন্তু আজ কত বড় একটা বিপদ হতে পারত, সে তুমি বুঝেছ ? আমার প্রফেশনাল টেনশান আছে, তোমার মাকে নিয়ে অ্যাংজাইটি আছে...

—প্লিজ বাবা...

—উঁহু, তোমার শোনা উচিত। তুমি এখন আর শিশু নও।

—জানি আমি শিশু নই। তাই তো বলছি স্টপ ইট।

টোটোর স্বরের তীব্রতায় একটু হকচকিয়ে গেল শুভাশিস।

অরূপ বলল,— কী বাপ ছেলেতে তর্ক শুরু করলি ! পাশে একটা মেয়ে বসে আছে, ওর কথাটাও ভাব। বেচারার মুখটা একেবারে পেল হয়ে গেছে।

শুভাশিস ক্ষুব্ধ স্বরে বলল,— হ্যাঁ, নিজে নয় বেরিয়েছ নিজের দায়িত্বে, ওই মেয়েটার আজ কোনও ক্ষতি হয়ে গেলে ওর বাবা-মার কাছে মুখ দেখানো যেত ?

অনেকক্ষণ পর হিয়া নড়ে উঠল,— আমি ঠিক আছি মেসোমশাই।

শুভাশিস শান্ত করে নিল নিজেকে। টোটোর বন্ধুর সামনে সিন ক্রিয়েট করা কোনও কাজের কথা নয়। ছেলে তাতে আরও বেশি উত্তেজিত হবে। দুটো বাজে, মেয়েটাকেও আগে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া দরকার। ওদিকে ছন্দাও নির্ঘাত ছটফট করছে, এতক্ষণে না জানি কী হচ্ছে বাড়িতে ? ভাগ্যিস তাও অলকা আছে এখন ! ঠাণ্ডা মাথায় আশু কর্তব্য স্থির করে নিল শুভাশিস। অরূপ বাড়ি নিয়ে যাক টোটোকে, শুভাশিস বরং মেয়েটাকে পৌঁছনোর জন্য ট্যাক্সি ধরে নিক একটা। বন্ধুর বাবা হিসেবে হিয়ার বাড়ি যাওয়া এখন তার কর্তব্যও বটে।

ট্যাক্সিতে উঠে হিয়াকে ভাল করে লক্ষ করছিল শুভাশিস। মায়া-কাড়া মিষ্টি মুখ, বেশ একটা বুদ্ধির ছাপও আছে চোখে মুখে। তবে এই মুহূর্তে বড় শঙ্কাতুর হয়ে আছে মুখটা। চুপটি করে কি যেন ভাবছে।

কথায় কথায় মেয়েটাকে স্বাভাবিক করতে চাইল শুভাশিস। অপারেশান করার আগে যেভাবে কথা বলে অন্যমনস্ক করে থাকে রুগীদের। সিগারেট ধরিয়ে বলল,— সন্তোষপুরের কোন দিকটায় থাকো ?

ভাসা ভাসা চোখ তুলল হিয়া,— মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে। আপনি চেনেন সন্তোষপুর ?

—এক সময়ে খুব যেতাম ওদিকে। ওখানে একটা দিঘি মতন আছে না... একটা ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক...ওখানে।

—লেকটার কথা বলছেন ?

—তোমরা ওটাকে লেক বলো বুঝি ? হা হা। অবশ্য বিশ বছরে ওদিকটা অনেক বদলে গেছে শুনেছি। তখন তো ছিল রেফিউজি এরিয়া। এক দিকে গড়ফা, এক দিকে সন্তোষপুর...। তোমাদের ওই লেকের ধারে তখন একটা-দুটো বড় বাড়ি উঠেছে কি ওঠেনি... ধরো সেই লেট সিক্সটিজের কথা। তখন ডাক্তারি পড়ছি।

—ওদিকে আপনার বন্ধু ছিল বুঝি ?

—উঁউঁউঁ, বন্ধু নয়। কমরেড। একসঙ্গে সব পার্টি করতাম।

—আপনি পার্টি করতেন মেসোমশাই !

প্রিয় প্রসঙ্গটা তুলতে পেরে আত্মপ্রসাদ বোধ করছিল শুভাশিস। হাসি হাসি মুখে কাঁধ ঝাঁকাল,— করতাম বইকি। আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে আমাদের একটা ওয়াইড ভিসান ছিল। সোশাল ডিসপেয়ারিটিগুলো আমাদের খুব হন্ট করত। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই মানসিকতা আর দেখাই যায় না। এই যে নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পেল, তাই নিয়ে তোমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে কোনও আলোড়ন হল ? আমাদের সময় হলে শহর উত্তাল হয়ে যেত।

হিয়ার মুখে হাসি ফুটেছে। কথা বলছে টরটর। চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে মেয়েটির, শুভাশিসের ভাল লাগছিল। হঠাৎ ফাঁক বুঝে জিজ্ঞাসা করল,— হাউ ডিড ইট হ্যাপেন হিয়া ?

—কী ?

—এই অ্যাক্সিডেন্ট ?

হিয়া চুপ।

—কত স্পিড তুলেছিল টোটো ? আই মিন রাজর্ষি ? নব্বই ? একশো ?

হিয়া মাথা নিচু করে আছে।

—তোমাকে তো বেশ ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে বলে মনে হয়, তুমি ওকে বারণ করতে পারোনি ?

—রাজর্ষি ভীষণ ইর‍্যাটিক মেসোমশাই। হঠাৎ হঠাৎ রেগে যায়, হাসতে হাসতে স্পিড বাড়িয়ে

দেয়, কখন যে কী মুডে থাকে বোঝাই যায় না।

—ইজ ইট ?

—হ্যাঁ মেসোমশাই। কেউ ওকে ওভারটেক করলে ও সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে যখন ওর মুড অফ থাকে।

—আজ মুড অফ ছিল ?

—না, মানে...

শুভাশিস একটু আড়ষ্ট বোধ করল। টোটোর সঙ্গে মেয়েটির বিশেষ কোনও ঘনিষ্ঠতা আছে কি ? এই বয়সে তা অসম্ভবও নয়। শুভাশিস কি বেশি টিকটিকিপনা দেখাচ্ছে ? সিগারেট বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল,— তোমার অসুবিধে থাকলে বোলো না। আমরা অন্য কিছু নিয়েও কথা বলতে পারি।

হিয়া হেসে ফেলল,— আপনি যা ভাবছেন তা নয় মেসোমশাই। উই আর গুড ফ্রেন্ডস। রাজর্ষি আমাকে খুব পছন্দ করে, আমিও রাজর্ষিকে। আমাদের কমন পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে, উই শেয়ার আওয়ার ভিউজ সরোজ অ্যান্ড হ্যাপিনেস।

শুভাশিসের খুব মিষ্টি ল্যাগল কথাটা। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক কত সুন্দর ! কত স্বাভাবিক ! হয়তো এদের জীবনে জটিলতাও কম হবে। তাদের সময়ে জীবন অনেক প্যানপেনে ছিল। অকারণ আবেগে জ্যাবজেবে হয়ে থাকত।

মুখে হাসি মাখিয়ে শুভাশিস বলল,— তা হলে শোনাই যাক তোমার বন্ধুর মুড অফ ছিল কেন।

—আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি মেসোমশাই। আসলে...আসলে...। হিয়া ইতস্তত করছে। একটু দম নিয়ে বলল,— আমার এক বন্ধু আছে। তিতির। আপনি বোধহয় তাকে চেনেন। ঢাকুরিয়ায় থাকে। কী জানি কেন রাজর্ষি ওকে স্ট্যান্ড করতে পারে না। ওর কথা যেই উঠল ওমনি...

আবার মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল শুভাশিসের। কোন দিক থেকে যেন হাওয়া ছুটে আসছে বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে এক গোপন গুহায় পা বাড়িয়ে ফেলেছে, যার সামনে অন্ধকার না খাদ কিছুই তার জানা নেই। টোটো তিতিরকে তাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল, তার চেয়েও এ যেন গভীর ধন্দ। ছন্দা কি ছেলের মধ্যে বিষটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ?

গোটা পথ আর সহজ হতে পারল না শুভাশিস। কথা বলল,— ছাড়া ছাড়া। অসংলগ্ন। ঠোঁটে এক ফোঁটা হাসি ফুটিয়ে রাখাও যে কখনও কখনও এত কঠিন ! ভদ্রতা করে হিয়ার বাড়িতে নামতে চাইল শুভাশিস, হিয়া একবার দরকার নেই বলতেই কী নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরতেই অলকা ছুটে এসেছে,— টোটোর মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে দাদা।

শুভাশিস খুব একটা অবাক হল না। বলল,— ঘরে কোনও পেন কিলার নেই ?

—আছে। আপনাকে না জিজ্ঞেস করে দিইনি।

—ঠিক আছে, আমি দেখছি। বিকেল থেকে একটা অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স চালু করে দিতে হবে।... খেয়েছে কিছু ?

—অরূপবাবু হরলিকস দিতে বলেছিলেন, ওইটুকুই যা খেল। বলল গা গুলোচ্ছে।

—হুঁ। কালকে একটা স্ক্যান করিয়ে নিতে হবে। শুভাশিস বিড়বিড় করল,— তোমার দিদি কোথায় ? টোটোর ঘরে ?

—না। ঠাকুরঘরে।

—খুব কান্নাকাটি করেছে ?

—ফোনটা আসার পর প্রথমে কেমন থম মেরে গিয়েছিল। অলকা হঠাৎ গলা নামাল,— দিদি একদম কাঁদেনি। চুপচাপ শুয়েছিল। টোটো ফেরার পর একবার শুধু টোটোর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর থেকে তো ওই ঠাকুরঘরে বসে আছে।

—আশ্চর্য ! খাওয়াদাওয়া করেছে ?

—খেয়েছে। না খাওয়ারই মতো। কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কথাই বলছে না। এমন কি টোটোর কোথায় লেগেছে তাও ভাল করে জিজ্ঞেস করল না। দিদিকে দেখে আমার গা ছমছম করছে দাদা।

চারপাশের পৃথিবীতে এ কী সব জটিল ক্রিয়াকল্পাপ চলছে! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না শুভাশিস। ছেলেঅন্ত প্রাণ ছন্দা টোটোর জন্য ছটফট করছে না! মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়েও ছেলের তিলমাত্র অনুশোচনা নেই! তিতিরকে সহ্য করতে পারে না, অথচ তিতিরকে নিয়ে আসে টোটো!

কেন?

মাথার ওপর পাখা ঘুরছে শুভাশিসের, স্যাঁতসেঁতে দিনে গরমও আজ কম, তবু দরদর ঘামছে শুভাশিস। পুট পুট বোতাম খুলে দিল বুশশার্টের। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, জল চাইবে অলকার কাছে? ইচ্ছে করছে না। টোটোকে উঠে দেখে আসবে একবার? ইচ্ছে করছে না। ছন্দার কাছে যাবে? ইচ্ছে করছে না। ইন্দ্রাণীকে ফোন করে জানাবে টোটোর দুর্ঘটনার কথা? ইচ্ছে করছে না।

অলকা ডাইনিং টেবিল থেকে ডাকল,— দাদা, খাবার দিয়েছি। আসুন।

শুভাশিস চোখ বুজল,— ইচ্ছে করছে না।

৬৩

এক শনিবার সকালে লরি বোঝাই লটবহর নিয়ে সুদীপরা উঠে গেল। কেয়াতলায়। বাড়ি বদলের হ্যাপা কম নয়, প্রায় দক্ষযজ্ঞের মতো ব্যাপার। এ বাড়ির কেউই এ কাজে তেমন পারদর্শী নয়, তবু সকলেই হাত লাগিয়েছিল। আদিত্য কন্দর্প ইন্দ্রাণী তিতির। এমনকী সন্ধ্যার মাও। তবে আদিত্যর উত্তেজনাই সব থেকে বেশি। সে যত না কাজ করে, শোরগোল তোলে একশো গুণ। এই কুলিদের হুকুম করছে, এই লরিঅলাদের ধমকাচ্ছে, তার নির্দেশমতো আলমারি নামাতে গিয়ে বেচারা কুলিরা আয়নায় ফাটল ধরিয়ে ফেলল। রুনার বিয়ের আলমারি, মুখ ভার করতে গিয়েও সামলে নিল রুনা। রান্নাঘরের জিনিসপত্র গোছানোর সময়েও সে এক কাণ্ড। পারলে আদিত্য নিজেদের বাসনকোসনও বেঁধে দেয় সুদীপদের। শোভনার আমলের ঢাউস মিটসেফটা তো প্রায় লরিতে তুলেই ফেলেছিল, সুদীপ করুণ মিনতি করে জানাল ওই জিনিস তার ভাড়া বাড়ির রান্নাঘরে ঢুকবে না। মাত্র বছর খানেকের জন্য বিচ্ছেদ, তাও শেষ মুহূর্তে সকলেরই চোখে ছলছল ভাব। প্রথম কেঁদে ফেলল তিতির, দেখাদেখি অ্যাটমও। আবেগ সামলাতে সুদীপ বারবার ঠোঁট কামড়াচ্ছে, কন্দর্প ইন্দ্রাণী গম্ভীর, রুনা আঁচল চাপছে চোখে। সেই সজল বাতাবরণও টিকল না, অত্যুৎসাহী আদিত্য দ্যাখ-না-দ্যাখ সুদীপকে ফেলেই লরি নিয়ে ধাঁ। ফিরে এল ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে। সুদীপদের নতুন বাড়ির ঠিকানাটা তার জানা নেই।

সেই বাড়ি থেকে ঘুরে এসে অবশ্য আদিত্যর চেহারা অন্যরকম। ঝুম হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল সারা সন্ধে, কারুর সঙ্গে বাক্যটি নেই।

কী করবে আদিত্য! সে যে এরকমই। সুদীপদের ফাঁকা ঘর দুটোর দিকে সে তাকাতে পারে না, বুক ফেটে যায়। দক্ষিণের বারান্দার ছিটকিনি প্রায় খোলাই হয় না, আলো ঢোকে না ঘর দুটোতে, এ পার থেকে অন্ধকার দুটো গহ্বর মনে হয় তাদের। আদিত্য মাঝে মাঝেই শূন্য ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। একা। কালো জোব্বা পরে স্মৃতিরা হেঁটে বেড়ায় চারদিকে। মায়া, বড় মায়া। হাফপ্যান্ট পরা দীপু কাটা ঘুড়ির পিছনে দৌড়চ্ছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাঁটু ছড়ে গেছে, থুতনি বেয়ে রক্ত ঝরছে। কাঁদতে কাঁদতে আদিত্যর হাত ধরে চলেছে ডাক্তারখানায়। তনুপুকুরের মাঠে ফুটবল খেলে কাদা থসথস হয়ে ফিরছে দীপু। বাবার বকুনির ভয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে সদরে। আদিত্যকে ঢাল করে সুড়ুৎ বড়ঘর পার হয়ে গেল। নতুন বউ নিয়ে দীপু জোড়ে প্রণাম করছে দাদাকে। কে যেন বলল,— আশীর্বাদ কর খোকন। মাথায় হাত রাখ ওদের। বিয়েবাড়ির ক্যাটারিং সেরে এসে গাদা

ফিশফ্রাই রুনার হাতে তুলে দিল আদিত্য, রাতদুপুরে ছুটে ছুটে বিলি করছে নতুন বউ। আরও কত কুয়াশার মতো স্মৃতি। অফিসফেরতা সুদীপ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরেই, গ্যারেজটা কি তা হলে দাদার একার মা ? আদিত্য লাথি মারছে সুদীপদের দরজায়। ঘেন্না ঘেন্না মুখে বেরিয়ে এল রুনা। অ্যাটম কাঁদছে। নিজের হুঙ্কার নিজেরই কানের পর্দা ফাটাচ্ছে আদিত্যর।

আমাকে ঠকানো চলবে না !...

কে কাকে ঠকায় ! হাসপাতালে আদিত্যর বেডের সামনে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকা দীপু ! নাকি অ্যাটমের হামজ্বরে বারবার মাঝরাতে দীপুর দরজায় ছুটে যাওয়া আদিত্য ! স্মৃতিতাড়িত আদিত্য ঘুরে ঘুরে হাত বোলায় দীপুর ফেলে যাওয়া দেওয়ালে। শৈশব যে মসলিন বুনে দেয়, বড় হয়ে তাকেই কী নিষ্ঠুরভাবে ছেঁড়ে মানুষ ! কেন ছেঁড়ে ? ছিঁড়ে কী পায় ? কথায় বলে, স্মৃতি সতত সুখের। কথাটা যে কী ভয়ঙ্কর মিথ্যে !

তিতির পরশু মানিকতলায় গেছে, দাদু দিদার কাছে থাকতে চায় কটা দিন। কন্দর্প কখন আসে, কখন যায়, ঠিক নেই। ইন্দ্রাণী তো নিজের মনেই আছে। চার দিনের মাথায় পুরোপুরি হাঁপিয়ে উঠল আদিত্য।

ইন্দ্রাণীর টেবিলে বাপ্পার চিঠি পড়ে আছে। কাল এসেছে। ওসাকা থেকে। খেয়ে উঠে শার্ট গলাতে গলাতে চিঠিটা আরেকবার পড়ল আদিত্য। ইয়োকোহামা কোবে নাগোয়া টোকিও ওসাকা থেকে পাঁচ হাজারখানা গাড়ি জাহাজের খোলে ভরেছে বাপ্পারা। তাদের জাহাজ মার্মেড এখন চলবে লস এঞ্জেলেসের পথে। সেখান থেকে গাড়ি নামাতে যাবে সানফ্রানসিসকোতে। তারপর হাউস্টন বোস্টন। তারপর পাড়ি জমাবে ইউরোপ। ছোট্ট একটা শ্বাস পড়ল আদিত্যর। কত দূরে চলে গেল ছেলেটা ! কোন অথৈ সাগরে ভাসছে এখন ! হয়তো এই মুহূর্তে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের পাশ দিয়ে চলেছে বাপ্পার মার্মেড। সেখানে কি এখন দিন, না রাত ? বাপ্পা কি জেগে আছে এখন ? বাপ্পা লিখেছে জাহাজে খুব সুন্দর একটা কেবিন পেয়েছে বাপ্পা, সবার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয়ে গেছে ভাল। জাহাজের চিফ অফিসার মানুষটি বাঙালি। নাম সুজিত পোদ্দার। বাড়ি বেহালায়। সস্ত্রীক আছেন জাহাজে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাপ্পাকে আপন করে নিয়েছেন। বাকি সব অফিসাররাও নাকি খুব ভাল। ওদের হেড ক্রু-কে ওরা বোসান বলে। ওদের জাহাজের বোসান মালয়েশিয়ান। নাম লিয়েম। তার কাছে আকাশের তারা চিনে নেভিগেশান শিখছে বাপ্পা। লিয়েম নাকি কম্পিউটারাইজড নেভিগেশানকেও হার মানায়। ...বাপ্পা ভাল আছে, খুউব ভাল আছে।

আবার একটা নিশ্বাস পড়ল আদিত্যর। বড়সড়। চিঠিটা মাকে লিখেছে বাপ্পা। তলায় ছোট করে লেখা, তোমরা ভাল থেকো। এই 'তোমরা' কারা ? এই 'তোমরার' মধ্যে আদিত্য আছে কি ?

ইন্দ্রাণী স্নান সেরে ঘরে এল। তোয়ালেতে চুল মুছছে। শ্যাম্পুর সুগন্ধ ভুরভুর করছে শরীরে। ভেজা চুল একটু ঝাঁকিয়ে বলল,— তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে ? বেরোচ্ছ কোথায় ?

আদিত্য চিঠিটা মুড়ে রাখল,— দেখি। অকম্মার মতো বাড়িতে বসে থাকতে ভাল্লাগে না।

—কাজে বেরোচ্ছ ?

—ভাবছি।

—ক'দিন ধরে তোমার রঘুবীরবাবু তো আসছে না ?

—ব্যস্ত বোধহয়।

—হ্যাঁ, তিনি তো তোমার থেকেও বিজি। ইন্দ্রাণী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি টানছে, দেখা হলে একবার চাঁদুর সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

—কেন ?

—গত বেস্পতিবার চাঁদুর কাছ থেকে দেড়শো টাকা নিয়ে গেছে।

—সে কি ! আদিত্য থতমত খেয়ে গেল,— কেন ?

আয়না দিয়ে টেরচা চোখে তাকাল ইন্দ্রাণী,— তুমি জানো না ?

—মাইরি না। আপ অন গড।

—চাঁদুকে কিসব স্টোন-টোন দেবে বলেছে। তার অ্যাডভান্স।

—কী স্টোন ?

—তা আমি কী করে বলব !

—চাঁদু এসব বিশ্বাস করে ?

ইন্দ্রাণী ঘুরে তাকাল,— তুমি করো না ?

—আমার কথা ছাড়ো। মৃদু হাসার চেষ্টা করল আদিত্য,— আমার কপাল গ্র্যানাইট পাথরে চাপা। ওসব ছোটখাট পাথর...হুঁহ। চাঁদুর তো আর তা নয়। ওর এখন কপাল ফিরেছে, মাসে এখন ছত্রিশ দিন শুটিং, ওর এখন আর স্টোন ধারণ করার কী দরকার ?

ইন্দ্রাণী যেন উদাস হল সামান্য,— মানুষ কখন পাথর দৈব এসবে নির্ভর করে জানো ? হয় অসময় কাটাতে, নয় সুসময় ধরে রাখতে। যখন হাত থেকে সব পিছলে যায় তখন। যখন দু হাত উপচে পড়ে তখন।

হুঁ। বুঝদারের মতো ঘাড় নাড়ল আদিত্য। ঠিক কথা। মনের দুর্বলতাই মানুষকে কোনও অজানা শক্তির ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। কিন্তু অলৌকিক তো সেও চায়, চায় অফুরন্ত টাকার বিস্ফোরণ, চায় এক পরম নির্ভরতা, তবে কেন সে কোনও অপ্রাকৃত অবলম্বন খোঁজে না ! তবে কি তার পিপাসা নেই ! শুধু আছে স্বপ্ন দেখার এক অচিন সুখ ! নাকি সে ব্যর্থ, চরম ব্যর্থ, এই পরিণতি সে মনে মনে মেনে নিয়েছে !

পলকের জন্য কন্দর্পর মুখখানা মনে পড়ে আদিত্যর। ঝলমলে টগবগে ছেলেটাকে ইদানীং কেমন ম্রিয়মাণ দেখায়। এই সুসময়েও। ফিলম লাইন বড় গোলমেলে জায়গা, সেখানে কি পা কাটে চাঁদুর ! মধুমিতা নামের মেয়েটাকে নাকি ভালবাসে চাঁদু, সেখানেই কি কোনও কাঁটা বিঁধে আছে !

ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করতে স্পৃহা হল না আদিত্যর, মন্থর পায়ে দরজার দিকে এগোল।

ইন্দ্রাণী আবার বলল,—মনে করে বোলো রঘুবীরবাবুকে।

—বলব।

—তুমি কি রঘুবীরবাবুর কাছেই যাচ্ছ ?

—না। অনিলের কাছে যাওয়ার একটু ইচ্ছে আছে। তার আগে এখন একবার দীপুদের ওখানে যাব ভাবছি।

—এই ভরদুপুরে দীপুদের বাড়ি !

—ওরা একা একা সংসার পাতল, কেমন আছে গিয়ে তো দেখে আসা উচিত।

—দীপু তো গতকালই এসেছিল। ইন্দ্রাণী আলতো সিঁদুর ছোঁয়াল সিঁথিতে,— রুনা এখন গোছগাছ করছে, খাটাখাটুনি যাচ্ছে, হয়তো দুপুরবেলা একটু জিরোবে। এই সময়ে তোমার না গেলেই নয় ?

ইন্দ্রাণী কি চায় না আদিত্য বেরোক ? ইন্দ্রাণীও কি তার মতো হাঁপিয়ে উঠেছে ? সঙ্গী খুঁজছে কথা বলার ? মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল আদিত্যর মাথায়। এই নিঝুম বাড়িতে এখন শুধু তারাই দুটো প্রাণী !

ইন্দ্রাণীর পরের কথায় ভুল ভেঙে গেল,— হাতে যদি সময় থাকে, একটা কাজের কাজ করে এসো না।

এক ফোঁটা সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে ইন্দ্রাণীর সিঁথিতে। সেদিকে একপলক তাকিয়ে রইল আদিত্য। ঢোঁক গিলে বলল,— কী কাজ ?

—ফার্নিচার আর বাসনকোসন বিক্রির টাকাটা তো পড়ে আছে, জয়িদের ভাগটা দিয়ে এসো।

—কোথায় দিয়ে আসব ? শংকরের অফিসে ?

—মোটেই না। ওদের বাড়িতে গিয়ে দেবে। জয়ির হাতে দেবে।

—আজ হবে না। কাল যাব। আদিত্য বায়নার সুরে বলল,— আজ একটু অ্যাটমটাকে দেখে আসি। ছেলেটার জন্য বড্ড মনকেমন করছে।

ইন্দ্রাণীকেও যেন ছুঁল কথাটা। এক দৃষ্টে প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,— সত্যি, ছেলেটা নেই, বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করে। সারাক্ষণ চেঁচাত হাসত লাফাত কাঁদত...

—তুমি তো তিতিরকেও পাঠিয়ে দিলে। আদিত্যর গলা বিষণ্ণ শোনাল।

—আমি পাঠালাম ! মেয়ে তো নিজেই গেল।

সবাই নিজে যায়। সবাই নিজে যায়। হোক সে ওই চিঠির তরুণ, কি এই ঘরের ফুলপরী। ইন্দ্রাণী কিচ্ছুটি জানে না !

আদিত্য আর বৃথা অনুযোগ জানাল না। উল্টে বলল,— তুমি বা ভূতের মতো বাড়িতে বসে থেকে কী করবে ? আজ নয় অনিলের কাছে নাই গেলাম, দুজনে দীপুদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি চলো। না হয় বেলা পড়লেই বেরোব।

—তা হয় না। বাড়ি খালি থাকবে। সন্ধ্যার মা রুটি করতে আসবে, বাসন পড়ে আছে, চাঁদুও ফিরতে পারে...। তুমি বরং তাড়াতাড়ি ফিরো।

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আজ আর কোথাও যাবই না। আদিত্য ঝটপট বলে উঠল,— তুমি একা আছ, আমি দেরি করবই না।

—কোরো না। তুমি বিকেল বিকেল ফিরলে আমি বেরোব।

আদিত্য মিইয়ে গেল সামান্য,— কোথায় যাবে ?

—ভাবছি মানিকতলা গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে আসি। তুমি যেরকম ছটফট করছ।

আদিত্যর ঠোঁটে হাসি ফুটল। তিতিরের জন্য ইন্দ্রাণীরও তবে প্রাণ কাঁদছে ! মুখে বলল,— তাড়া কিসের ? থাক না এক-দু দিন। ওখানে বাবা-মাও একা একা থাকেন... এখানে থাকলে মেয়েটাও গাল ফুলিয়ে বসে থাকে...

ইন্দ্রাণী কথা বলল না। কি যেন ভাবছে। অন্যমনস্ক মুখে বন্ধ করছে জানালাগুলো। প্রখর দুপুরের তাত রুখছে। আপন মনে বলল,— না, নিয়েই আসি। সৃষ্টির বাঁধাছাঁদা পড়ে আছে, একা হাতে কি সব হয় ! আমাদেরও তো যাওয়ার সময় হল, না কি ? আর যেন ক'দিন ?

—এই রোববারের পরের রোববার। ...তা হলে ধরো গিয়ে হল দশ দিন।

—মাত্র দশ দিন ? ইন্দ্রাণী যেন ঈষৎ ভাবিত,— না, না, তিতিরকে আজই নিয়ে আসব। শনিবার তো ওর আবার জন্মদিন।

—তাই তো ! মাথাতেই ছিল না। ভালই হল, এ বাড়িতে ওর শেষ জন্মদিনটা একটু ঘটা করে করা যাক। আমি দীপুদের আসতে বলে দিচ্ছি, কাল জয়িদের বাড়ি গেলে ওদেরও বলে দেব, তুমি ডাক্তারকেও নেমন্তন্ন করে দিয়ো।

—অত কিছুর দরকার নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এল ইন্দ্রাণী। একতলায় নামছে।

আদিত্য পিছু পিছু এগোল,— করো না একবার। কোনওবারই তো কিছু হয় না। বড়ঘরটা বেশ বেলুন দিয়ে সাজাব, কেক কিনে আনব, মোমবাতি জ্বালব। কটা মোমবাতি লাগবে বলো তো ? ষোলোটা ?... না না সতেরোটা।

—একটাও না। আমার ওসব পছন্দ হয় না। আদিত্যর উৎসাহে জল ঢেলে দিল ইন্দ্রাণী,— ধাড়ি মেয়ের আবার জন্মদিন কি ? শুধু পায়েস হবে। বড় জোর একটু অ্যাটমকে নিয়ে আসতে পারো ব্যস।

নিবে যাওয়া দেশলাই কাঠির মতো বড়ঘরে এসে দাঁড়াল আদিত্য। আসবাব বোঝাই ঘর এখন ফাঁকা ময়দান। পড়ে আছে শুধু মলিন কাচের আলমারি। আর ইজিচেয়ারটা বুড়ো পাহারাদারের মতো ঝিমোচ্ছে কোনায়। বাবার অত সাধের জন্মদিন তো এবার হলই না, না হয় তিতিরেরটাই

হত। মেয়েকে ঘিরে একটা আনন্দের অনুষ্ঠান হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! সবাই একত্র হওয়া যেত, একটু হইহুল্লোড় হত বাড়িতে! সেটাই হত এ বাড়ির শেষ অনুষ্ঠান। ইন্দ্রাণীটা যেন কী!

জৈষ্ঠ্যের রাগী সূর্য ঝলসাচ্ছে রাস্তায়। পিচ গলে গেছে। গরম একটা ভাপ উঠছে পথ থেকে। কৃষ্ণচূড়া গাছ রক্তচোখে দেখছে সূর্যকে। বিরল পথচারী ছায়া খুঁজে হাঁটছে। ফাঁকা চায়ের দোকানের বেঞ্চির নীচে শুয়ে আছে নেড়ি কুকুর, ওপরে দোকানদার। হাওয়া বইছে। শুকনো, গনগনে।

গলা পিচে চটি সামলে হাঁটছিল আদিত্য। বাস স্টপের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল। রঙিন ছাতা মাথায় এক স্থূলাঙ্গী থপথপ এগিয়ে আসছে। চোখে সানগ্লাস, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। ইন্দ্রাণীর বান্ধবী শেফালি না!

ভাবতে ভাবতেই রাগী রাগী মুখ শেফালি এসে গেছে সামনে। তলোয়ার খোলার মতো করে সানগ্লাস খুলল,— ইন্দ্রাণী আছে বাড়িতে?

আদিত্য প্রমাদ গুনল। এই মহিলা একবার গল্প করতে বসলে ছ ঘণ্টার আগে ওঠে না। তার মানে তিতিরকে আনতে যাওয়ার দফারফা। আদিত্য জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে দিল,— না তো। নেই তো।

—নেই! সরু চোখে তাকাল শেফালি,— এই রোদ্দুরে বেরোল কোথায়?

আদিত্য পটাপট উত্তর দিয়ে যাচ্ছে,— আমার ভাইয়ের বাড়ি। ওরা উঠে গেল তো, ওদের গোছগাছ করে দিতে গেছে।

—কোনও মানে হয়! কত দরকারি কথা ছিল। ফিরবে কখন? স্ত্রীর বান্ধবীর সঙ্গে সামান্য রসিকতা করার চেষ্টা করল আদিত্য,— আপনি কি ততক্ষণ দরজায় বসে থাকবেন?

—তা হলে একটু ঘুরে আসি। বেনের মাঠে আমার বোন থাকে...। শেফালি রিকশার দিকে এগোচ্ছে,— ফেরার পথে না-হয় ঢুঁ মেরে যাব।

আদিত্য মরিয়া হল,— লাভ নেই। ওর আসতে আসতে সেই রাত। খেয়েদেয়ে ফিরবে।

—তা হলে বলবেন আমি এসেছিলাম। আবার সানগ্লাস চড়িয়ে নিল শেফালি। রিকশায় বসে হুড টানছে, নামছে না। রিকশা মোড় ঘুরে গেল।

আদিত্যর মন ঈষৎ ফুরফুরে হয়ে গেল। দশ মিনিটে পৌঁছে গেল কেয়াতলায়। গ্রিল দরজায় বেল বাজাতেই বেরিয়ে এসেছে অ্যাটম। পিছনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে রুনা,— ওমা, দাদা আপনি!

—এলাম। অ্যাটমের চুল ঘেঁটে দিল আদিত্য,— কিরে, নতুন বাড়িতে কেমন লাগছে?

—বিচ্ছিরি। ছাদ নেই, খেলার জায়গা নেই, ছোটার জায়গা নেই...

—ও কী কথা অ্যাটম! রুনা মৃদু ধমক দিল,— কালকেই তো তুমি পার্কে গেলে।

—পার্ক আর বাড়ি এক হল?

আদিত্য হাসতে হাসতে একচিলতে ড্রয়িংরুমটাকে দেখে নিয়ে বলল,— তোদের জন্য ছাদ-টাদ আর থাকবে না রে। একটা পার্ক পেয়েছিস এই না কত।

—বলুন দাদা বলুন। কটা পাড়া এমন খোলামেলা! ওই তো হাত বাড়ালেই লেক। ...কে বোঝে! ...এসে অবধি তো আপনার ভায়েরও মুখ ভার। ...নিজেদের একটা ছাদ থাকলে অবশ্য মন্দ হত না। কাপড় মেলা নিয়ে যা সমস্যা হচ্ছে! কী করা যাবে, সব কি আর পাওয়া যায়! এমন মোজাইক ফ্ল্যাট, রান্নাঘরে টাইলস, বাথরুমে টাইলস...। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন দাদা? বসুন না।

কথার স্রোত থেকে শুধু সুদীপের কথাটুকুই ছেঁকে নিল আদিত্য। বেতের সোফায় বসে কলার তুলে ঘাম ঝাড়ল। ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে তবু ঘরটা কী গরম! দীপু মোটে গরম সইতে পারে

না। রায়বাড়ির দোতলাও কত ঠাণ্ডা থাকে।

আদিত্য গলা ঝেড়ে নিল,— তারপর ? তোমার গোছানোর কাজ শেষ ?

—কই আর। খেলনা শো-পিস সব এখনও প্যাকিং বাক্সে পড়ে। বাড়িঅলা পেরেক পুঁততে দিচ্ছে না, বাবা-মা'র ছবি, ক্যালেন্ডার কিছুই টাঙাতে পারছি না।

—হুঁউ, পরের বাড়িতে বাস। আদিত্য একটা নিশ্বাস চাপল। বড়ঘরের অয়েল পেন্টিংগুলো নতুন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কী করে যে টাঙাবে ইন্দ্রাণী !

রুনা বুঝি পড়ে ফেলল ভাবনাটা। বলল,— কি আর করা। একটা বছরের তো ব্যাপার, কোনও রকমে চোখ কান বুজে কাটিয়ে দিই।

—ফ্ল্যাটে গেলে সব সমস্যা মিটে যাবে বলছ ?

—কিছুটা তো যাবেই।

—তা বটে। আদিত্য এদিক ওদিক তাকাল,— মিনতি বাড়ি নেই ?

—আর বলবেন না, দেশে গেছে।

—ফিরবে কবে ?

—রোববারের মধ্যে তো ফিরবে বলেছে, দেখি কি করে। এদিকে আমি একা হাতে...। আপনি খুব ঘামছেন দাদা। শরবত করে দেব ?

—না না, লাগবে না। তুমি বোসো।

—না দাদা, আজ আপনি প্রথম এলেন...

—কেন, শনিবারই তো এসেছিলাম।

—ওটা কি আসা ! হুড়ুদ্দুম করে মাল নামানো। ...আমার দিদি কত করে সেদিন আপনাকে খেয়ে যেতে বলল... ঠিক আছে, শরবত না খান, চা করে দিই। আপনি তো চা খেতে ভালবাসেন।

—আরে না, এখন চা খাব না। তুমি বরং আমায় এক গ্লাস জল দাও।

—সঙ্গে একটা পেসট্রি দিই দাদা ? ঘরেই আছে।

রুনার আপ্যায়নে আদিত্য বিচলিত। নিজেকে কেমন অতিথি অতিথি লাগছে। কই, আগে তো কখনও এভাবে যত্ন করেনি রুনা !

আদিত্য অপ্রস্তুত মুখে বলল,— এই তো একটু আগে খেয়ে উঠলাম, এখন আবার পেসট্রি-ফেসট্রি কেন ?

—ও বললে চলবে না। কিছু অন্তত মুখে দিতেই হবে। বলেই রুনা ফ্রিজ থেকে দুটো ঠাণ্ডা সন্দেশ বার করে এনেছে,— এটা খান দাদা, আমি আপনার জন্য শরবত করে আনছি।

অ্যাটম ঘুরঘুর করছে সামনে। লাজুক লাজুক হেসে দেখছে জেঠুকে। আদিত্য তাকে কোলে টানল,— কি অ্যাটমবাবু, চলবে নাকি ?

মা'র গমনপথের দিকে টুক করে তাকিয়ে নিয়ে একটা সন্দেশ মুখে চালান করল অ্যাটম। গপ গপ গিলে নিয়ে পকেট টিপছে আদিত্যর,— তুমি আমার জন্য কী এনেছ ?

—ওই যাহ, কিছু তো আনা হয়নি।

—লোকের বাড়ি এলে বাচ্চাদের জন্য হাতে করে কিছু আনতে হয় জানো না ? পরশুদিন বাবার বন্ধু স্বদেশকাকু এল, আমার জন্য জায়েন্ট চকোলেট এনেছিল।

কথাটা সূঁচ হয়ে ফুটল আদিত্যকে। মিকসির ঘরঘর শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে। ভায়ের বাড়িতে সত্যিই আদিত্য পর হয়ে গেল ! ও বাড়িতে দীপুদের সঙ্গে কত লাঠালাঠি মারামারি, কত মান অভিমান, হাঁড়ি ভিন্ন হয়েছে, তবু এই রুনা অ্যাটম যেন অনেক কাছের ছিল। আজ এই শশব্যস্ত আয়োজনে দূরত্ব বেড়ে গেল বহু যোজন। অ্যাটমের আর দোষ কী, যা দেখছে, যা শুনছে...

আদিত্য ম্লান মুখে বলল,— ভুল হয়ে গেছে বাবা। এরপর ঠিক আনব।

পাকা আমের শরবত নিয়ে ঢুকল রুনা। টুকটাক দু-চারটে কথা বলে আদিত্য উঠল। আগের

দিন বাড়িটাকে ভাল করে দেখা হয়নি, আজ একটু ঘুরে-ফিরে দেখবে ভেবেছিল, ইচ্ছে হল না।

দরজায় এসে রুনা বলল,— আজ আপনি তিতিরকে নিয়ে আসতে পারতেন দাদা, ওর তো এ বাড়ি দেখাই হয়নি।

—আসবে।

—দিদি চাঁদু সবাইকে আসতে বলবেন।

—বলব।

রাস্তায় নেমে বারেক পিছন ফিরল আদিত্য। দোতলা বাড়ির একতলার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে রুনা। পাশে অ্যাটম। রুনা হাত নাড়ল। পশ্চিম আকাশের সূর্য রুনার মিষ্টি মুখখানায় আলো ফেলছে, ভারি পরিপূর্ণ দেখাচ্ছে রুনাকে। রায়বাড়িতে এতদিন একটা মহীরুহের ডাল হয়েই ছিল রুনা, এখন সে একটা আলাদা গাছ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে কথাটা মনে পড়ল আদিত্যর। অ্যাটমকে শনিবার পাঠানোর কথা বলা হল না।

ইন্দ্রাণী শাড়ি পরে তৈরি ছিল। বেরোনোর সময়ে পই পই করে বলে গেল যেন বাড়ি খালি রেখে কোথাও না বেরিয়ে পড়ে আদিত্য। ফ্লাসকে চা করে রেখে দেবে সন্ধ্যার মা, চায়ের দোকানে যাওয়ারও দরকার নেই।

সন্ধ্যার মা আটা মাখছে। আদিত্য ওপর গিয়ে প্যান্ট-শার্ট বদলাল। দীপুদের ঘর দিয়ে বারান্দায় যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। টেলিফোন বাজছে।

আদিত্য রিসিভার তুলল,— হ্যালো।

সাড়া নেই।

দু-একবার হ্যালো হ্যালো করার পর কেটে গেল লাইনটা। বারান্দায় না গিয়ে আদিত্য ছাদে উঠল। আবার ফোন বাজছে। আবার নেমে এসে ফোন ধরল। কেটে গেল লাইন। সিগারেট ধরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েও আদিত্য ফিরে এল। নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। যত সব উটকো ঝামেলা।

আরও খানিক পর আদিত্য নেমে এল একতলায়। বড়ঘরে ঢুকে পায়চারি করছে। কোণের ইজিচেয়ারে বসল। আলমারির কাচে অস্পষ্ট ছায়া। লম্বা, কুঁজোটে। যেন জয়মোহন।

আলো কমছিল।

৬৫

এক ভরা বর্ষার সকালে তুফান কলকাতায় এল। শুভাশিসের সংসারে সে আসে একঝলক টাটকা বাতাসের মতো। দামাল মানুষটা দাদার কাছে এলে ভারি প্রগলভ হয়ে ওঠে। তার হাঁকডাকে ফ্ল্যাটের গুমোট ভাবটা যেন ঝুপ করে উবে যায়। কত যে হাবিজাবি গল্প তার ঝুলিতে! মাধবপুরের কোন লোক কী নতুন ধান্দা শুরু করল, বেতিয়ায় কার বউ ফলিডল খেয়েছে, রামনগরে কার সঙ্গে শিবসুন্দরের খটাখটি বাধল, সবই তার সবিস্তারে বর্ণনা করা চাই। যেন ওখানকার প্রতিটি খুঁটিনাটি দাদাকে জানানো তার কর্তব্য। যেন বাবা-মা'র সঙ্গে সঙ্গে গোটা অঞ্চলটার দায়ও তার ওপর চাপিয়ে রেখেছে শুভাশিস।

বড় সোফায় ফ্রেঞ্চ টোস্ট নিয়ে জমিয়ে বসেছে তুফান। টোটো টুকি ছন্দা অলকা ডাইনিং টেবিলে। সামনে সেঁকা রুটির পাহাড়, চিজ মাখন জ্যামের শিশি, সেদ্ধ ডিম, কলার ছড়া। ব্রেকফাস্ট সারছে সকলে, শুনছে তুফানের গল্প। মাধবপুরে ডায়েরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে হঠাৎ। সমিতি অফিসে বীজধান বিলি নিয়ে ছোটখাট সংঘর্ষ হয়ে গেল। বেলপুকুরে মদন দত্তর বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, মুখোশ পরা ছ-সাত জন ডাকাত, প্রত্যেকের হাত চাইনিজ রিভলবার, বাড়ির

হাঁড়ি-কলসি পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে। দারোগা এসে মদন দত্তর তিরিশ বছরের পুরনো রাতকানা চাকরটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কেস দিল। মাধবপুরে এবার সাপেদের মোচ্ছব চলছে, পরশুই সবজি বাগানে একটা দাঁড়াশ মেরেছে তুফান।

শুভাশিস দাড়ি কামাতে কামাতে তুফানের কথা শুনছিল। ঠিক শুনছিল না, কানে আসছিল। এ সময়ে তার বেজায় তাড়া থাকে, কোনও কথাই ঠিকঠাক মাথায় ঢোকে না। তবু তার মধ্যে সাপ শব্দটা কানে বাজল তার। একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলল,—বাড়িতে সাপটাপ ঢুকছে, এ তো ভাল কথা নয় রে।

অলকা বলল,— সাপ তো প্রতি বর্ষাতেই বেরোয় দাদা। পুকুরধারে ঘোরাফেরা করে, সবজি বাগানে চলে আসে, তবে বসতবাড়িতে ঢোকে না।

—ঢুকতে কতক্ষণ! তোমাদের দাওয়ায় তো আর সাপেদের জন্য নো এন্ট্রি বোর্ড ঝোলানো নেই! না না, সাপ বড় মারাত্মক জিনিস।

—কিচ্ছু মারাত্মক না। সাপ হল সব থেকে ভিতু প্রাণী। ফণা তো তোলে ভয়ে।

—একবার ছোবলটা মেরে দিলে সামলাবে কে?

—তার জন্য তো অ্যান্টি ভেনাম আছে। আর আছে আমার হেঁতালের মন্ত্রপূত লাঠি। গত বছরের আগের বছর আমাকে এক সাধু দিয়ে গিয়েছিল।

টোটো ঘুরে বসেছে,— মাধবপুরে কী কী সাপ আছে কাকা?

—কেউটে আছে, কালাচ আছে, চন্দ্রবোড়া আছে... রাজবাড়ির দিকটায় তো শঙ্খচূড়ও আছে। এ ছাড়া লাউডগা হেলে চিতি জলঢোড়া এ সব সারাক্ষণ ঘুরছেই।

শুভাশিস প্রায় আঁতকে উঠল,—তোর হেঁতালের লাঠিফাটি ছাড়, কার্বলিক অ্যাসিড ছড়াচ্ছিস তো?

—না ছড়ালেও চলত, তবে ছড়াই। বাবার হুকুম। রাতবিরেতে রুগী আসে, যখন তখন বাবাকে বেরোতে হয়...

—এই বর্ষাতেও বাবা রাতে বেরোচ্ছে?

—কম। এসে হাউমাউ কান্না জুড়ে দিলে যায়। ডাক্তার মানুষ, উপায় কি? তুফানের মুখে হঠাৎই একটা হালকা ছায়া পড়ল। কী যেন ভাবল দু-এক সেকেন্ড, তোমাকে একটা কথা বলব কি না ভাবছিলাম দাদা।

—কথা বলতে গিয়ে তুই ভাবিস নাকি?

তুফান হাসল না। বলল,— বাবার শরীরটা ক'দিন ধরে ভাল যাচ্ছে না দাদা। মুখ ফুটে তো কিছু বলবে না, তবু বোঝা যায়। অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মাথা গরম হয়ে যায়, এত দিনের নেশাটা দুম করে ছেড়ে দিল...

শিবসুন্দরের সিগারেট ছাড়ার কথাটা আগেই শুনেছিল শুভাশিস। মনে হয়েছিল যাক, বাবা তবে তার সতর্কবাণী শুনেছে। আজ তুফানের কথায় একটু অন্যরকম মনে হল। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলল,— বাবার প্রেশারটা রেগুলার চেক করছিস?

—করতে দেয় না। নিজেই নাকি করে।

—সে কি কথা!

অলকা টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছে। চোখে মুখে উদ্বেগ,— হঠাৎ তুমি বাবার শরীরের কথা বললে কেন?

প্রাণবন্ত তুফান অনেকটাই নিবে গেল। সামান্য ইতস্তত করে বলল,— বাড়ির পেছনটায় ঝোপ হয়ে গিয়েছিল। বাবা-মা'র জানলার ঠিক নীচে। গেল রোববার সাফ করছিলাম, তখন কতগুলো ওষুধের ছেঁড়া ফয়েল পেলাম। হার্টের ওষুধ। সরবিট্রেট অ্যানজিনেক্স, নিকার্ডিয়া...। এ সব ওষুধ তো আর মা'র লাগে না, লাগলেও আমি জানতাম।

—তুই বাবাকে ধরিসনি ?

—ধরেছিলাম। বাবা হেসে উড়িয়ে দিল। বাবার ড্রয়ারে নাকি অনেক দিন ধরে খালি ফয়েলগুলো পড়ে ছিল, ফেলে দিয়েছে।

—স্ট্রেঞ্জ !

টোটো প্রশ্ন করল,— দাদু ওসব ওষুধ কেনে কোত্থেকে ?

—মাঝে মাঝে তো একা একাই তারকেশ্বরে চলে যায়। তখনই হয়তো...

—তুই একা ছাড়িস কেন ?

তুফান মাথা নামাল,— তুমি তো বাবাকে চেনো দাদা। বাবা কি নজরদারি মেনে নেওয়ার লোক ?

অলকা আচমকা বিচলিত হয়ে পড়েছে,— এ সব আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমি আজই বাবার কাছে ফিরে যাব।

—তা কী করে হয় ! বউদির শরীর এখনও ভাল করে সারেনি। তুফান অপ্রস্তুত মুখে ছন্দার দিকে তাকাল।

—না না, দিদি তো এখন অনেকটাই ভাল। অলকাও ঘুরেছে ছন্দার দিকে,— কিগো দিদি, আমি চলে গেলে তোমার খুব অসুবিধে হবে ?

ছন্দা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। হবে না।

—কি দাদা, তুমি কী বলো ? তুফান সোজা হয়ে বসল,— বাবা অবশ্য সত্যিই খুব একা হয়ে গেছে।

অলকা তড়িঘড়ি বলল,— দাদা দিদির কিচ্ছুটি অসুবিধে হবে না। আমি কাজের লোকেদের সব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

—দ্যাখো যা ভাল বোঝো। শুভাশিস স্নানে ঢুকে গেল।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে। স্নান সেরে বেরোনোর জন্য চটপট তৈরি হয়ে নিল শুভাশিস। টোটো অলকা তুফান কথা বলছে, কলকল করছে টুকিও, বাবাকে দেখলে ভারি খুশি হয় মেয়েটা। ব্রিফকেস গোছানোর সময়ে পলকের জন্য নিজের বাবার মুখটা মনে পড়ল শুভাশিসের। ছন্দার অপারেশানের খবর শুনে নার্সিংহোমে এসেছিল বাবা, তখন কি মুখে কোনও অসুস্থতার ছাপ ছিল ? শুভাশিস লক্ষ করেনি ভাল করে। নিজেই সে তখন এত তটস্থ। টেনশানে সেদিন ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল শুভাশিস, তাই নিয়েও কি যেন ঠাট্টা করেছিল বাবা। কি যেন বলেছিল ? মনে পড়ছে না। বাবাকে কি একবার মাধবপুরে গিয়ে দেখে আসা উচিত ?

বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে শুভাশিস একটু দাঁড়াল ড্রয়িং স্পেসে,— আমাকে কি একবার মাধবপুরে যেতে হবে রে ?

—গেলে তো ভালই হয়। অনেক দিন যাওনি। তবে বউদিকে একা ফেলে যাবেই বা কী করে ?

—হুম। দেখি যদি পারি তবু এর মধ্যে...। তুই বাবাকে একটু ওয়াচে রাখিস।

দুশ্চিন্তার এক অস্পষ্ট সিগনাল মাথায় নিয়ে নীচে এল শুভাশিস। গাড়ি স্টার্ট করতে গিয়ে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। সেলফ নিচ্ছে না। কাল বিকেল থেকে এই এক বখেড়া শুরু হয়েছে। দারোয়ানকে দিয়ে হাত পনেরো গাড়িটাকে ঠেলাল শুভাশিস। প্রাণ এল যন্ত্রযানে।

বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। পুরোপুরি বর্ষা এবার শহরে একটু দেরিতে এল। মেঘলা আকাশ, টিপটিপ বৃষ্টি, ছিরছির বৃষ্টির কাল শেষ। আকাশ আজকাল সারা দিন গাঢ় স্লেটবর্ণ হয়ে থাকে, ঝমঝমিয়ে ভেঙে পড়ে যখন-তখন, বল্লমের ফলা হয়ে জলকণারা ছিন্নভিন্ন করে শহরটাকে। রাস্তাঘাট এখন ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত, যেখানে সেখানে জল থই থই, শহরের নিকাশি ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে।

ব্লু হেভেনে আজ এগারোটায় পর পর দুটো অপারেশান। যাওয়ার পথে একবার কোম্পানির গ্যারেজে ঢুকল শুভাশিস। রামদেও গ্যারেজে বসে আছে, ধোঁয়া উড়িয়ে গল্প করছে এক মেকানিকের সঙ্গে। এই গ্যারেজেই মেরামতি চলছে নতুন মারুতিটার, রামদেওর এখন এখানেই ডিউটি।

শুভাশিসকে দেখে সিগারেট নিবিয়ে দৌড়ে এল রামদেও,— কী হয়েছে স্যার ?

—হরবিন্দার কোথায় ? আমার সেলফটা একটু চেক করে দিতে বলো।

—ডাকছি স্যার। রামদেও ছুটে প্রকাণ্ড গ্যারেজটার একদম ভেতরে চলে গেল।

নতুন মারুতিটা পড়ে আছে এক ধারে। বনেটখানা ভালই তুবড়ে গিয়েছিল, পিটিয়ে পিটিয়ে দুরস্ত করেছে মিস্ত্রিরা। সামনে কাচ চুরচুর হয়ে গিয়েছিল, বদলেছে। ড্যাশবোর্ডও লাগাতে হল নতুন করে। পুটিং-টুটিং লাগানো, প্রাইমার মারা হয়ে গেছে, এবার রঙ করলেই কাজ সম্পূর্ণ হয়।

শুভাশিস রাগ রাগ চোখে গাড়িটাকে দেখছিল। উফ, গাড়ি না শনি ! থানা থেকে ছাড়াতে তিন হাজার খসল, মেকানিকাল রিপোর্ট ম্যানেজ করতে গেল আরও দেড়। আরে বাবা, সামান্য একটু ব্রেক ফেল লিখে দিবি তার জন্য এত ! মুহূর্তের জন্য ব্রেক ফেল করতেও তো পারে। টেম্পোরারি হার্ট ব্লকের কেসে পালস বিট অফ হয়ে যায় না ! এখন এই গ্যারেজের বিল কত হয় কে জানে ! সার্ভেয়ারের পিছনেও তো কিছু ঢালা হল, তাতেও সে ব্যাটা এগারো হাজারের বেশি এস্টিমেট মানল না। ইনসিওরেন্স কোম্পানির গর্ভ থেকে টাকা প্রসব করানো যে কী কঠিন !

হরবিন্দার সাদা মারুতির কাজ শুরু করে দিয়েছে। শুভাশিস জিজ্ঞাসা করল, —রঙ মারতে দেরি হচ্ছে কেন হরবিন্দার ? আর কত দিন আটকে রাখবে ?

—মউসমের হাল দেখছেন না স্যার ? এতে রঙের কাজ হয় ? গাড়ি আপনার ফুলে ফুলে থাকবে স্যার। টিউমারের মাফিক।

—কী জানি বাবা। তোমরা যা বোঝাবে তাই বুঝব।

—তবিয়তের বেপারে আপনারা যা বোলেন, আমরা তা মেনে নিই স্যার।

শুভাশিস আলগা হাসল। হরবিন্দার একটু ঠোঁটকাটা আছে। মিনিট পনেরো থুম দাঁড়িয়ে রইল শুভাশিস। বারকয়েক ঘড়ি দেখল। দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা হোক, আগে সেলফটার একটা ফয়সালা করা দরকার। শহরজোড়া নদীতে কোথাও ফেঁসে বসে থাকলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। রামদেওকে আজ নিয়ে নেবে নাকি ? ব্যাটা বসে বসে মাইনে খাচ্ছে !

কাজ শেষ। ব্লু হেভেনে পৌঁছে ছুরি-কাঁচির জগতে ডুবে গেল শুভাশিস। ব্লু হেভেন থেকে সান শাইন। সেখান থেকে স্যাস ক্লিনিক। দিনভর শরীর কাটাছেঁড়ার যান্ত্রিক রুটিন। এত কিছুর মাঝে বাবার কথা তেমন আর মনে পড়ল না। ছোট্ট একটা সিগনালের মতো শুধু বিব বিব করল দু-একবার, ব্যস।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি অসম্ভব বেড়ে গেল। কোটি কোটি ঘোড়সওয়ার শহরকে মথিত করছে। তাদের ক্রুদ্ধ গর্জনে শিউরে উঠছে দশ দিক। রাস্তায় প্রচুর জল জমেছে, বেকবাগানের চেম্বারে যেতে আর ভরসা পেল না শুভাশিস, সন্ধে সন্ধে বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি বড় নিঝুম আজ। অলকা টুকি চলে গেছে বলেই কি ! গেল কখন ! দুপুরবেলা ! এই দুর্যোগে আজ না গেলেও পারত। ফ্ল্যাটের চারদিকে একটু উঁকিঝুঁকি মারল শুভাশিস। রাতদিনের কাজের মেয়েটি রান্নাঘরে, কী যেন বসিয়েছে কড়ায়। ব্যালকনির কাচের দরজা বন্ধ, এ পারে একটা মোড়া টেনে বসে আছে ছন্দা। টোটো নেই।

সোফায় বসে জুতো-মোজা ছাড়ছিল শুভাশিস। কাজের মেয়েটা সামনে এল,— আপনাকে চা কফি কিছু দেব দাদাবাবু ?

শুভাশিস অন্যমনস্কভাবে বলল,— দেবে ? দাও। না থাক।

—ভেজিটেবিল স্যুপ খাবেন ? গরম করে দেব ?

—থাক, একেবারে রাতেই... । তুমি বরং একটু জল দিয়ে যাও ।

—ঠাণ্ডা দেব, না গরম ?

—ঠাণ্ডাই দাও । না না, এমনি দাও । না না, দুটো মিশিয়ে দাও ।

সোফায় হেলান দিয়ে বসে শুভাশিস এক দৃষ্টে দেখছিল ছন্দাকে । ছন্দা মূর্তির মতো স্থাণু । স্বচ্ছ কাচে জমেছে বারিবিন্দু, ওপারে বৃষ্টিমাখা পৃথিবীর আলো ঝাপসা, আঁধারে প্রায় বিলীয়মান । ওই অস্পষ্টতায় কি খোঁজে ছন্দা ? শুভাশিস যে ফিরেছে তাও কি একবার তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই ?

শুভাশিস ছন্দার পাশে উঠে এল,— তোমার ছেলে গেল কোথায় ?

ছন্দার দৃষ্টি নড়ল না,— তুফানদের সঙ্গে মাধবপুর গেছে ।

—সে কি ! হঠাৎ ! শুভাশিস আকাশ থেকে পড়ল ।

—গেল । ইচ্ছে ।

শুভাশিসের চোখের সামনে অসংখ্য সাপ হিলহিল করে উঠল । চন্দ্রবোড়া, কেউটে, শঙ্খচূড়... । রাগত স্বরে বলল,— ইচ্ছে হল, ওমনি চলে গেল ! একি কথা ? এই ঝড়বাদলে অজ গাঁয়ে ছুটল... তুমি মানা করলে না ?

ছন্দা উত্তর দিল না ।

শুভাশিসের নিজেকে কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল । গোমড়া মুখে প্রশ্ন করল,— ফিরবে কবে ?

—বলেনি ।

—আজ বাদে কাল স্কুল খুলে যাবে... । আশ্চর্য, তোমরাও কেউ আমাকে একবার জানানোর প্রয়োজন বোধ করলে না !

প্রশ্নটা শুধু শুধুই ঘুরতে লাগল ।

অসহায় মুখে ঘরে ফিরে প্যান্ট-শার্ট বদলাল শুভাশিস । কার ওপর রাগ করবে, কার ওপর বিরক্ত হবে, ঠিক ঠাহর করতে পারছে না । আবছাভাবে সকালটাকে মনে পড়ল । তুফান অত কথা বলছিল, বাবার শরীর খারাপের কথা উঠল, অলকা চলে যেতে চাইল, তখনও কী আশ্চর্য রকম নীরব ছিল ছন্দা ! এত কেন নির্লিপ্তি ! নাকি ছন্দাও তার মতোই আহত ! তারই মতো বিভ্রান্ত ! তার থেকেও বেশি অসহায় !

শুভাশিস ড্রয়িং স্পেসে ফিরল । কথা বলতে চাইল ছন্দার সঙ্গে,— ছেলে চলে গেছে বলে মন খারাপ ?

উত্তর নেই ।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো ? এদিকে এসো । আমার পাশে এসে বসো ।

ছন্দা উদাসীন মুখে সোফায় এসে বসল । বড় শীর্ণ, কালচে দেখাচ্ছে ছন্দাকে । কপালে সব সময়ে একটা ছোট টিপ পরে ছন্দা, সেটাও নেই । আরও বেশি শুকনো শুকনো লাগছে মুখটা । রুগ্‌ণ । অথচ এত দিনে ছন্দার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার কথা । অলকা দেখছিল বলে ছন্দাকে নিয়ে সেভাবে ভাবা হয়নি, এবার ভাবতে হবে ।

ভয়ঙ্কর শব্দে বাজ পড়ল কোথাও । ভেজা কাচের দরজায় ঝলসে উঠেছে মেঘজ্যোতি । বৃষ্টির দমক আচমকা বেড়ে গেল । শব্দের দাপটে কানে তালা লাগার জোগাড় ।

শুভাশিস ক্যাবিনেট থেকে গ্লাস বোতল বার করল,— আজ মনে হয় পৃথিবীটা ভেসেই যাবে ।

ছন্দা স্তিমিত স্বরে বলল,— হুঁ, ক্রমশ বাড়ছে ।

—মনে আছে সেই সেবার আটাত্তরে কি হয়েছিল ? আমাদের গোয়া বেড়াতে যাওয়ার টিকিট-ফিকিট সব কাটা, বৃষ্টিতে ট্রেন ক্যানসেল হয়ে গেল... । তিন দিন ধরে মনোহরপুকুরের বাড়িতে বসে আমরা শুধু খিচুড়ি খাচ্ছি... । বৃষ্টি থামার সাত দিন পরে তুফান হাঁচোড়পাচোড় করে খবর নিতে এল... ।

ছন্দা উদাসভাবে বলল,— তুমি মাধবপুরে খবর নিতে যাওনি।

শুভাশিসের উচ্ছ্বাসটা হোঁচট খেয়ে গেল। কলকাতার থেকেও মাধবপুরের অবস্থা অনেক অনেক খারাপ হয়েছিল সেবার। বাড়ি প্রায় ভেসে যায় যায়, একতলা ডুবে গেছে, বাবা মা তুফান তিনজনই জলবন্দি। বাবা-মা'র জন্য শুভাশিসের সে সময়ে দুশ্চিন্তা হয়নি তা নয়, কিন্তু চিন্তা আর উতলা হওয়ার মধ্যে তো ফারাক থাকেই। বাবা-মা'র জন্য কেন যে তেমন করে উদ্বিগ্ন হতে পারে না শুভাশিস!

ঢোঁক গিলে শুভাশিস প্রশ্ন করল,— তোমার কি মনে হয় বাবার কন্ডিশান সত্যিই খুব সিরিয়াস?

ছন্দা শুভাশিসের দিকে তাকাল না, —হতে পারে। নাও হতে পারে।

—অলকার এভাবে হুট করে চলে যাওয়াটা ঠিক হল না।

—দু মাস তো হল, আর কত দিন থাকবে!

—রোববার গেলে আমি পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

পলকের জন্য চোখ তুলল ছন্দা। আবার নামিয়ে নিয়েছে।

শুভাশিস গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢালল। বিরক্তিমাখা গলায় বলল,— বাবার শরীর খারাপটা অজুহাত। তুফানকে ছেড়ে অলকার আর এখানে মন টিকছিল না।

—হতে পারে।

কী নীরস, কী নিরুত্তাপ স্বর! সাধে কি অলকা চলে গেছে! এ বাড়ির গুমোট আবহাওয়া থেকে বাঁচার জন্য পালিয়েছে।

হুইস্কিতে লম্বা চুমুক দিল শুভাশিস,— তোমাকে এক পেগ তৈরি করে দেব?

—না।

—অমৃতে অরুচি হঠাৎ! এক সময়ে তো পেলেই টানতে।

—আর ভাল লাগে না।

—কেন লাগে না? শুভাশিস অল্প অধৈর্য হল,— তোমার ঠাকুরদেবতারা বুঝি বারণ করে দিয়েছে?

ছন্দা উঠে দাঁড়াল। ঘরের দিকে যেতে গিয়ে থামল,— আমি একটু শুচ্ছি। যখন খাবে, ডেকো। আর হ্যাঁ, বিকেলে তোমার বন্ধু বিজন এসেছিল। সিভিল রাইটস নিয়ে নতুন অরগানাইজেশান করেছে, তার জন্য তোমাকে ডোনেশান দিতে বলছিল।

—সিভিল রাইটস, না গুষ্টির পিণ্ডি। আমি তো এখন বুর্জোয়া। রেনিগেড। আমার কাছে টাকা চাইতে আসে কেন?

ছন্দা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

গ্লাস হাতে ব্যালকনির দরজায় এল শুভাশিস। কাচের পাল্লা ফাঁক করল সামান্য। বৃষ্টির তোড় কিছুটা কমেছে। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা ছুঁল শুভাশিস। গায়ে একটুক্ষণ জল মাখল। জল নয়, জলের ভাপ। ভাল লাগছে। মাথায় ভোঁ ভোঁ ভাব, তবু জুড়িয়ে আসছে শরীর।

আরও খানিকটা পানীয় গলায় ঢেলে ঘরে এল শুভাশিস। চোখ বুজে শুয়ে আছে ছন্দা, গায়ে পাতলা চাদর। তিন পয়েন্টে পাখা ঘুরছে, ঘরে বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভাব, অল্প অল্প শীত করে যেন।

শুভাশিস নিচু গলায় ডাকল,— ছন্দা...

—উঁ?

সাড়া পেয়ে খাটের কোণে বসল শুভাশিস। বলল,— তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। পরশু দালাল লেক গার্ডেন্সে একটা জমি দেখাল। সুন্দর প্লট। তিন কাঠার কিছু কম, কিন্তু একদম স্কোয়্যার। পজিশানটাও বেশ ভাল।

—ও।

—তুমি কি একবার দেখে নেবে ?

—আমি ! ছন্দার স্বরে অসীম শ্রান্তি।

—হ্যাঁ তুমি। তুমি তো কত কিছু প্ল্যান করছিলে। বাগান, লন, এই গাছ, সেই গাছ, তুমি না দেখলে হবে !

বুঝি একটা নিশ্বাস পড়ল ছন্দার। বাতাস আরও স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল। ক্ষীণ স্বরে বলল,— যদি চাও যাব। আমার ইচ্ছে নেই।

কেন ইচ্ছে নেই ছন্দা ? প্রশ্নটা করতে পারল না শুভাশিস। কথাটা বুকের ভেতর গুমরোতে লাগল। তার নিজের আজকাল কিছু ইচ্ছে করে না, ছন্দার কিছু ইচ্ছে করে না, ছেলে বেঁচে থাকে এক বিচিত্র ইচ্ছে অনিচ্ছের খেলায়—এ কোন সংসারে বাস তার ! কোন কীটের দংশনে মরে যাচ্ছে ইচ্ছের কুঁড়ি ! এই দিনের আশাতেই কি সংসার টিকিয়ে রাখা ! প্রাণপাত পরিশ্রম !

রাতে ঘুম আসছিল না শুভাশিসের। তন্দ্রা আসে, কেটে যায়। গভীর রাতে বৃষ্টি থামার পর, পৃথিবী যখন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ, ছন্দাকে ছুঁল শুভাশিস। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছন্দা, জাগল না। শুভাশিসের ভারি আশ্চর্য লাগছিল। তার একটুখানি ছোঁয়া পেলেই আলোর মালা হয়ে জেগে ওঠে ছন্দা, আজ তার কী হল ! অবসাদ ! এত অবসাদ !

পরদিনও সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এল শুভাশিস। তার পরদিনও। একই নিষ্প্রাণ ফ্যাকাসে মুখ, একই অভিব্যক্তিহীন চোখ, একই শীতল শরীর। অলকা চলে গিয়ে, টোটো না থেকে ভারি মুশকিল হয়ে গেছে। এখন আর তাদের মাঝে কোনও আড়াল নেই। এ যেন আরও অস্বস্তির।

শুভাশিসের জেদ চেপে যাচ্ছিল। যাকে সে চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছে, তার উপেক্ষা সহ্য করা বড় কঠিন।

শনিবার রাতে অরূপদের বাড়ি গেল শুভাশিস। অরূপ চেম্বার থেকে ফেরেনি, শালিনী সবে ঢুকেছে। শুভাশিসকে দেখে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে বলল,— ওয়েলকাম। ওয়েলকাম। সূরজ কি আজ পশ্চিম দিকে উঠেছে ?

শুভাশিস সামান্য হাসল,— আকাশ কি দ্যাখো না ম্যাডাম ? সূরজ আজ সাত দিন ধরে উঠছেই না।

—তাই কি তোমার পায়ের ধুলো পড়ল ? সচ বাত, নার্সিংহোম হয়ে তুমি এ বাড়ির রাস্তাই ভুলে গেছ।

কথাটা মিথ্যে নয়। নার্সিংহোমে অরূপ শালিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলে আলাদা করে এ বাড়িতে আর আসাই হয় না। শেষ এসেছিল ছন্দার অপারেশানের আগে, পিপির জন্মদিনে।

হাসিটা ধরে রেখে শুভাশিস বলল,— তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি শালিনী। পারসোনাল দরকার। ভেরি পারসোনাল।

শালিনী কিছু একটা আঁচ করল। বলল,— এক মিনিট। পিপিকে দেখে আসছি।

এক মিনিটেরও কম সময়ে ফিরে এল শালিনী। ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বসল,— হোয়াটস রঙ ?

শুভাশিস বড় শ্বাস ফেলল,— আমি তো তোমাকে সে কথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। হোয়াটস রঙ ? হোয়াটস রঙ উইথ ছন্দা ?

—তার আবার নতুন কী হল ? লাস্ট উইকে আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ! শী টোলড মী শী ইজ ফাইন !

—ছাই ফাইন ! শী ইজ অলওয়েজ সো ডিপ্রেসড ! কথা বলে না, হাসে না, হাঁটাচলা করতে চায় না, সারা দিন শুধু শুয়ে থাকে...

—ছেলের সঙ্গেও কথা বলে না ?

টোটোর মাধবপুরে যাওয়ার কথাটা তুলল না শুভাশিস। বলল,— সেটাই তো স্ট্রেঞ্জ। ছেলের সঙ্গেও কথা বলে না। আরও সারপ্রাইজিং কি জানো ? সারপ্রাইজিং বলব না, বলব অ্যালার্মিং।

তোমাদের আমি বলিনি, টোটোর অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনেও শী ওয়াজ সো ড্যাম কুল। অ্যাজ ইফ আমার কোনও পেশেন্টের কিছু হয়েছে। ছেলে বাড়ি ফেরার পরও...

—হুঁ। অরূপ একটু একটু বলছিল বটে। শালিনীকে চিন্তান্বিত দেখাল,— টোটোর সঙ্গে কি ছন্দার কোনও ফাইটিং হয়েছিল ? আই মিন টু সে, টোটোর অ্যাক্সিডেন্টের আগে...

—মনে হয় না। অন্তত আমার নলেজে নেই।

—দেন হোয়াট ? শালিনী থুতনি টিপছে। খানিকটা সময় নিয়ে বলল,— ছেলের কোনও কাজে শকড হয়ে থাকতে পারে। আদারওয়াইজ...। শালিনী আবার ভাবল,— তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম তোমাকে নিয়ে ছন্দার একটা মেন্টাল কমপ্লেক্স আছে। আই ডোন্ট নো হোয়াই। তুমি হয়তো রিজনটা বলতে পারবে। এনি ওয়ে, এটা তোমাদের ব্যাপার। ওর যে সাডেন রেড ডিজেনারেশানটা হল, তার কারণও কিন্তু ওই মেন্টাল প্রবলেম। অ্যাজ ফার মাই মেডিকেল নলেজ গোজ, ওর ওরকম এমারজেন্সি হওয়ার মতো ফিজিকাল কন্ডিশান ছিল না। তা ছাড়া তুমি তো জানোই, হিস্টেরেকটোমির পর অনেক পেশেন্টই ডিপ্রেশানে ভোগে। ওনলি টাইম ক্যান হিল ইট। অফকোর্স তুমি যদি ওকে প্রপার কম্পানি দিতে পারো।

—বিলিভ মি, আমি ওকে সঙ্গ দিতে চাই। কিন্তু ও আমাকে পছন্দ করছে না। শুধু আমি কেন, কোনও ব্যাপারেই ওর উৎসাহ নেই।

—আমার একটা সাজেশান নেবে ? ওকে নিয়ে চেঞ্জে চলে যাও।

—এখন ! কাজকর্ম শিকেয় তুলে ?

শিকেয় তোলা কথাটা দু-তিন বার উচ্চারণ করে বোধহয় মস্তিষ্কে ভরে নিল শালিনী। হাসতে হাসতে বলল,— কিসের জন্য তোমার কাজ ভাই ? ফ্যামিলি লাইফের পিলারগুলোই যদি ক্র্যাক করে যায়, তবে পয়সা কামিয়ে কী হবে ! সো... কাম কো গোলি মারো। একটা সলিটারি জায়গা দেখে বউকে নিয়ে ভেগে যাও। ছেলেকেও সাথ নেবে না, এনজয় ইওর সেকেন্ড হানিমুন। যদি গ্রিন সিগনাল দাও, আমি প্লেসও অ্যারেঞ্জ করে দেব। রাউরকেল্লা থেকে অ্যারাউন্ড বিশ মাইল দূর একটা আয়রন মাইন আছে। আমার বড় দাদা ওখানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। বিলকুল পাহাড়ি এলাকা। ফাইন একটা বাংলো আছে, তোমাদের জন্য সেটা বুক করে দিতে পারি।

—দেখি কটা দিন। বলব তোমাকে। ভাবছি ওকে অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগ দিয়ে দেখি। দেব ?

—দিতে পারো। বাট লাভ ইজ দা বেস্ট স্টিমিউলেটার।

ভালবাসাই মনের শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক ! রাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবছিল শুভাশিস। মেঘ কিছুটা কেটেছে, মাথার ওপর এক পাণ্ডুর চাঁদ। ছন্দাকে বেড়াতে নিয়ে গেলে যদি উন্নতি হয়, তবে তো শুভাশিসের যাওয়াই উচিত। যাবে ?

হাওয়া নেই। গুমোট। ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল শুভাশিসের। শুধু ছন্দাকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে শুভাশিস, এ কথা ইন্দ্রাণীকে সে বলবে কী করে !

চাঁদ আবার মেঘে ঢেকে গেল। আকাশ লাল। রক্তের মতো লাল।

৬৬

মণিকার সঙ্গে টানা দেড় মিনিটের একটা ঘনিষ্ঠ দৃশ্য একবারেই ও.-কে. করে ফেলল কন্দর্প। ঘনিষ্ঠ দৃশ্য মানে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যই। ছুঁয়ো না শ্যাম, ওহে নাগর, এই ছুঁয়ে দিলাম ওগো নাগরী গোছের সিন নয়, এ একেবারে যাকে বলে রগরগে বেড সিন। তপ্ত নিশ্বাস, আসঙ্গ লিপ্সা সব একদম মাপে মাপে পড়েছে। কাট বলার পরই জীবন ভটচাজের মতো খুঁতখুঁতে পরিচালকও চেঁচিয়ে উঠল,— এক্সেলেন্ট ! সুপার্ব !

প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় কন্দর্পর কাছে এখন জলভাত। পর পর দুটো ছবিতে ঋতুশ্রী তার

অনেকটাই আড় ভেঙে দিয়েছে, অশোকদার চিমটি কাটা মন্তব্য বাড়িয়ে দিয়েছে তার জেদ। কিন্তু মোদ্দা কারণটা হল সাফল্য। আষাঢ়ের গোড়ায় রিলিজ করেছে জয়পরাজয়, শ্রাবণ শেষ হতে চলল এখনও গ্রামেগঞ্জে রমরমিয়ে চলছে ছবিখানা। স্মরজিৎ লাহিড়ির অনুভবও সেনসারের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে, সম্ভবত সামনের বছর জানুয়ারির ফিল্মোৎসবে মাদ্রাজে দেখানো হবে। এই সব খবরই কন্দর্পর মাথায় টনিকের মতো কাজ করে। সফলতা মানুষকে অনেক সপ্রতিভ করে দেয়।

মণিকার শট চলছে। একার। কন্দর্প সেটের বাইরে এল। আকাশে পাঁশুটে ডেলা ডেলা মেঘ। ফাঁকে ফাঁকে যে আকাশটুকু দেখা যায় তার রঙ চড়া নীল। সেই আকাশ ছিঁড়ে ঝলসাচ্ছে সূর্য, জ্বলন্ত চাটু হয়ে।

—তোমার এখন কাজ নেই কন্দর্পভাই ?

কন্দর্প নতুন কেনা বিদেশি সানগ্লাসটা চোখে চড়িয়ে ঘুরে তাকাল। রূপেন। ইদানীং ক্যাংলা রূপেন কন্দর্পর সঙ্গে বেশ সমীহ করে কথা বলে।

ঠোঁটের কোণে একটা ঢেউয়ের মতো হাসি ফোটাল কন্দর্প। নদীর ঢেউ নয়, চোরা হাওয়ায় চলকে ওঠা পুকুরের ঢেউ। বলল,— চলছে। একটু রিল্যাক্স করছি।

—তোমার তো এখন দারুণ কাজের চাপ।

—কই আর। ওই একটু-আধটু। ভোলাদার ছবিটা এখনও শুরু হল না... জলিবাবু অবশ্য সামনের মাস থেকে টানা ডেট চাইছেন...

—জলিবাবুর ছবিতেও তুমি হিরো ?

—কাইন্ড অব। আমিই পিভট। কন্দর্প একটু চালবাজি করে নিল। উত্তমকুমারের স্টাইলে সিগারেটের প্যাকেট আলগা বাড়িয়ে দিল,— চলবে ?

আগে হলে দুটো নিত, এখন দেঁতো হেসে একটাই সিগারেট তুলল রূপেন। লম্বা ঠ্যাং-এ দু' পা এগিয়ে থেমে গেল,— অশোকদার সঙ্গে তোমার এর মধ্যে দেখা হয়েছিল ?

—কেন বলুন তো ?

—পরশু না তার আগের দিন কবে যেন অশোকদা তোমায় খুঁজছিল। এবার এক পা এগিয়ে থামল রূপেন। চোখ চালিয়ে চতুর্দিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল,— তোমার কাছে কটা টাকা হবে ভাই ?

—কত ?

—এই ধরো শতখানেক মতো। মেয়েটার ধুম জ্বর, টাইফয়েড কিনা বোঝা যাচ্ছে না, ডাক্তার একগাদা টেস্ট-মেস্ট করতে বলেছে...

—গত মাসে আপনার মেয়ের ম্যালেরিয়া হয়েছিল না ?

—সেটা বড় মেয়ের। এবার ছোটটা...। গোটা পঞ্চাশ হলেও চলবে।

চড়াবে তো পাঁইট, তার কত বাহানা। কেন যে মেয়ের অসুখ বানায়! কন্দর্প কথা না বাড়িয়ে একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে দিল। লোকটা তার জন্য জয়পরাজয়ে একটা রোল তৈরি করে দিয়েছিল, সেই সূত্রেই এই লাইনের চোরাবালিতে একটু মাটি খুঁজে পেয়েছে কন্দর্প, বিনিময়ে মাঝে মাঝে বিশ-পঞ্চাশ টাকা মাশুল কি আর এমন বেশি!

বকের মতো পা ফেলে ফেলে স্টুডিও গেটের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে রূপেন, তাকে ভুলে মুস্তাফির কথা ভাবছিল কন্দর্প। অশোকদা খুঁজছে তাকে ? সৃষ্টিছাড়া বর্ষার দাপটে ঠিক সময়ে বাড়ি ভাঙার কাজটা শুরু করতে পারেনি অশোকদা, সবে এই দিন পনেরো হল হাত লাগিয়েছে। সেখানেই কি কোনও সমস্যা হল ? তেমন কিছু হওয়ার তো কথা নয়। পার্টি ফান্ড, ওপাড়ার বিলা, রোবে সকলকেই তো প্রণামী দেওয়া সারা। নতুন করে যদি কিছু ঝঞ্ঝাট বাধেও, সেখানে কন্দর্প কি করবে ? মেজদার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুরনো কড়িবরগা, দরজা-জানলা বিকিকিনি করে, কথায় কথায় একদিন তার কথা বলেছিল কন্দর্প, তাই নিয়েই কি কিছু আলোচনা করতে চায় অশোকদা ? হতে

পারে। আবার অন্য কিছুও হতে পারে। হয়তো দিল্লির টিভি সিরিয়ালটা এতদিনে সবুজ আলো দেখতে পেয়েছে! দিল্লিতে অশোকদার তো লোক ফিট করাই আছে, হয়তো সে টেলিফোনে... ! উঁহু, রূপেন তা হলে একটু কেশে যেত।

কোনও ভাবনারই গভীরে ঢুকল না কন্দর্প। ঢোকা মানে উত্তেজনা, ঢোকা মানেই টেনশান, ঢোকা মানেই মনঃসংযোগ নষ্ট। পরশু পর্যন্ত রোজ দেড় শিফট করে কাজ। সারাক্ষণ এখন চরিত্রটাতেই ডুবে থাকার সময়, যম এত্তেলা পাঠালেও মন চঞ্চল করার উপায় নেই। মধুমিতার সঙ্গেই যে কতকাল দেখা হয় না! পাঁচআচ দিন। ফাইভ লঙ লঙ ডেজ। যাক গে, কি আর করা। অশোকদার সঙ্গে বরং রাতের দিকে টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাবে।

সেদিনও হল না, পরের দু দিনও না। সেই সাতসকালে বেরিয়ে গভীর রাতে ফেরা, বাড়িতেও এখন টেলিফোন নেই, রাতদুপুরে কার আর বুথে ছোটা পোষায়।

চতুর্থ দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়ল কন্দর্প। সোজা লেক। অশোক মুস্তাফি এখনও আসেনি। একা একাই কৃত্রিম হ্রদখানাকে বারকয়েক চক্কর দিল কন্দর্প। ক'দিন খুব ধকল গেল, খুব নিঙড়েছে জীবন ভটচাজ, ভাল করে হাত-পায়ের খিল ছাড়ানো দরকার। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার লেকে আসাটা কমে গেছে, ভাড়াবাড়িতে উঠে যাওয়ার পর তো আর এমুখোই হয়নি। একে লেক একটু দূর হয়ে গেছে, তায় বৃষ্টির কাল, খুপরি ঘরেই সে আজকাল ফ্রি হ্যান্ড সারে। বড়জোর ঝিল রোড ধরে একটু হেঁটে আসে ভোরবেলায়।

আজ ভোরে লেকের হাওয়াটা বড় মনোরম লাগছিল কন্দর্পর। খানিকক্ষণ বেঞ্চে হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইল। সূর্য পুবের হাইরাইজগুলোর দোতলা পার হয়ে গেছে, তবু অশোক মুস্তাফির দেখা নেই। অশোকদা কি লেকে আসে না আজকাল? বাড়ি যাবে অশোকদার? সারা সপ্তাহের বাজার ফ্রিজে রাখা আছে, আজ একটু হাত খালি ছিল, টাটকা মাছ মাংস নিয়ে গেলে হত... ।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মুস্তাফির বাড়ির দিকেই গেল কন্দর্প। অশোকদার এই পারিবারিক ফ্ল্যাটে বড় একটা আসা হয় না। বড়জোর বার পাঁচ-ছয় এসেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অশোকদার গুণধর ছেলেটিকে ঘরে পৌঁছে দিতে।

আজ সেই দরজা খুলল। গাল ভর্তি জংলা দাড়ি, খালি গা, পরনে শুধু এক জাঙ্গিয়ার মতো ছোট্ট প্যান্ট।

ছেলেটিকে দেখলে কন্দর্প একটু ভেতর থেকে কেঁপে যায়। তলপেট চিনচিন করে। এ ছেলের দর্শন পাওয়া কদাচ শুভ নয়। তবু মুখে একটা ইলাস্টিকের মতো হাসি টানল,— কি খবর বাবুরাম? ভাল আছ তো?

—আমি তো ভালই থাকি।

কন্দর্প মনে মনে বলল,— তা বটে। শুধু তোমার বাবা-মা'রই পিলেটা মাঝে মাঝে চমকে যায়। গত মাসেও ছোকরা বাড়িতে কিছু না বলে হাপিশ হয়ে গিয়েছিল। চিন্তায় চিন্তায় অশোকদার শয্যা নেওয়ার দশা। সাতদিন পর খোকাবাবু প্রত্যাবর্তন করলেন। সমুদ্র দর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। দিঘায়। চেলাচামুণ্ডা সমভিব্যাহারে।

প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে হাল ফ্যাশানের বড় বড় সোফাসেট। গোল কাচের সেন্টার টেবিল। একধারে প্রকাণ্ড অ্যাকোয়ারিয়াম, সবজেটে জলে রঙিন মাছেরা ঘুরছে। পিতলের হরিণ বিশ্রাম নিচ্ছে কাশ্মীরি কার্পেটে। দেওয়ালে এক ফোলা ফোলা রমণীর বিশালকায় পেন্টিং। মাথার ওপর সাবেকি ঝাড়লণ্ঠন, অজস্র বালব লাগানো।

বাবুরাম এক ফালি খবরের কাগজ নিয়ে সোফায় আধশোওয়া হয়েছে। কন্দর্প অন্য ফালিটা হাতে নিয়ে বসল,— অশোকদা কই?

—পিতাশ্রী পুজোয় বসেছে। বাবুরাম চোখের কোণ দিয়ে কন্দর্পকে দেখল,— সকালে তুমি হঠাৎ পিতাশ্রীর দরজায়?

—এলাম। অনেকদিন দেখা হয় না। কন্দর্প সোফায় হেলান দিল,— তা বাবুরামের আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া-টাওয়া হচ্ছে না ?

—কোথায় যাই বলো তো ?

—এবার পাহাড়ে যেতে পারো।

—পাহাড়মে কেয়া রাখখা হ্যায় ! ইয়া ইয়া ঢিপি, আর কনকনে শীত। কাগজ কার্পেটে ফেলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল বাবুরাম,— অবশ্য সিকিম ভুটান মেরে এলে হয়। সিকিমে বসে সিকিমিজ রাম, ভুটানেরও কি একটা যেন আছে না ? রকসি তো ভুটানেরই, তাই না ?

কন্দর্প প্রমাদ গুনল। বাবুরামের সঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। এ ছোকরা যদি সত্যি সত্যি পাহাড়ে ছোটে, আর অশোকদা যদি জানতে পারে পাগলকে সেই সাঁকো নাড়াতে বলেছে, তবে তাকেই হয়তো ঘাড় ধরে ছোকরাকে ফিরিয়ে আনতে পাঠিয়ে দেবে।

কন্দর্প ঝটিতি প্রসঙ্গ ঘোরাল,— ওড়াউড়ি তো অনেক হল, এবার একটু বাবার কাজকর্ম দ্যাখো।

—কী কাজ করব ?

—বাবার অফিসে বসো। অশোকদা একা আর কত দিক সামলাবে ?

—ধুস, ওগুলো আবার কাজ নাকি ? শুধু পিতাশ্রীর প্যান্ট পরে চেয়ারে বসে থাকা। তাও যদি বাবা ফিলমের দিকটা আমার ওপর ছাড়ত। কথা বলতে বলতে জিভ চাটছে ছোকরা, তোমরা মাইরি মস্তিতে আছ। ডেলি নিউ নিউ হিরোইন...। পিতাশ্রী একাই মধু চাটছে, আমাকে ও লাইনে ভিড়তে দিচ্ছে না।

কী ভাষা ! পিতা সম্পর্কে কী মহৎ ধারণা ! এ ছেলে ফিলম লাইনে গেলে বাপকেও টেক্কা মারবে। কাপ্তানি করে ছ মাসে সব ফুঁকে দেবে। শেষে একটিই সম্পদ থাকবে ছোকরার। এইডস।

অশোকদার স্ত্রী চা নিয়ে ঘরে এসেছে। পৃথুলা, গ্রাম্য ধরনের মহিলা, কন্দর্পর সামনে এখনও মাথায় ঘোমটা টেনে রাখে। ব্যক্তিত্ব বলে কিছুই নেই, পতি ধর্ম, পতিই দেবতা, এই বিশ্বাসে স্বামীর পদতলে লুটিয়ে আছে। স্বামীকে ভয় পায়। ছেলেকে ভয় পায়। ছেলের বিগড়োনোর মূলে এর লাইও কম নেই। গা ভরা গয়না পরে থাকে সব সময়ে, সিঁথিতে জ্যাবজেবে সিঁদুর, নাকে হিরের নাকছাবি।

চায়ের কাপ নামিয়ে ভদ্রমহিলা মাথার আঁচলটাকে টানল আর একটু,— আপনি ভাই ওকে একটু বোঝান তো। বাপ ছেলেতে ক'দিন ধরে শুধু যুদ্ধ চলছে।

বাবুরাম পলকে খেপে গেল,— ব্যাজব্যাজ কোরো না তো। কোনও কাজেকম্মে নেই... যাও তো এখান থেকে। নিজের চরকায় তেল দাও।

মহিলা তবু দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করে বলল,— আপনি ওর বাবাকেও একটু বলুন না ভাই। ছেলে নিজে একটা ব্যবসা খুলতে চাইছে, তাই নয় করতে দিল। মাথাটাও ওর ঠাণ্ডা হয় তবে।

—মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে। যাও, আমার ব্রেকফাস্ট রেডি করো। বেরোতে হবে।

কন্দর্প দুজনকেই দেখে নিল একঝলক। ইলাস্টিক হাসিটাকে আর একটু টেনে বাড়াল। বলল,— কি ব্যবসা করতে চাইছে বাবুরাম ? জ্যান্ত হাতি কিনে মেরে মেরে বেচবে ? নাকি খাল কেটে কুমির এনে পুষবে ? কুমিরের চামড়ার কিন্তু হেভি দাম।

—সে বাবুরামকেই জিজ্ঞেস করুন। মহিলা দ্রুত অন্দরে ঢুকে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে বেজে উঠেছে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার। আরাধনা শেষে মা মা শব্দে ফ্ল্যাট ফাটাচ্ছে অশোক মুস্তাফি। সঙ্গে মিউজিক দিচ্ছে পিতলের ঘণ্টি। বাজনা থামল। আবার পর পর আর্ত ডাক। মমা... মমাআ....মমাআআ....

বাবুরাম তড়াক করে উঠে দাঁড়াল,— তোমার প্রভু আসছে। আমি কাটি।

রক্তলাল বসনে আবির্ভূত হল মুস্তাফি। কপালে ইয়া সিঁদুরের টিপ। বিঘূর্ণিত হচ্ছে অক্ষিগোলক, সেই আঁখিতে জল। চোখ মুছে বলল,— শুয়োরের বাচ্চাটা কী গুজগুজ করছিল এতক্ষণ?

কন্দর্প কাগজ ভাঁজ করে টান টান,— কি একটা ব্যবসা করবে বলছিল... আপনি নাকি তাতে আপত্তি করছেন...

—ব্যবসা, না আমার শ্রাদ্ধ! হারামজাদা ফরেন লিকার শপ খুলতে চায়।

—মন্দ কি। করুক না। দুটো ব্যবসায় এখন মার নেই। মদ আর ওষুধ।

—থামো তো। নির্বোধের মতো কথা বোলো না। লিকারের ব্যবসা করা কি সহজ কথা! সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ হতে হয়। ওই হারামজাদা তো নিজেই দোকানে বোতল হয়ে গড়াবে।

কন্দর্প আরও যুক্তিজাল বিস্তার করতে পারত। বলতে পারত মদের দোকান না খুলেই কি আপনার ছেলে বারে-হোটেলে গড়াগড়ি কম খাচ্ছে! বরং নিজে একটা স্বাধীন ব্যবসা পেলে অন্যরকম হলেও হতে পারে। টাকার এক প্রবল মাদকশক্তি আছে, এ নেশায় পেলে মদের নেশাও কত সময়ে তুচ্ছ হয়ে যায়। বলল না। যদি অশোকদা আরও চটে যায়! কন্দর্পকে এখন অশোকদার বাঁয়া হয়ে না থাকলেও চলে। তার সঙ্গে অশোকদার লেনাদেনা কাটাকুটি হয়ে গেছে, দুজনেরই পাল্লা লাভের দিকে। তবু কেন যেন কন্দর্প এখনও অশোকদাকে বেশ ভয় পায়। ভয়, না এ এক আবিল মোহ?

মুস্তাফি অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে গিয়ে মাছ দেখছে। আলগা টোকা দিচ্ছে কাচের গায়ে। সরে সরে যাচ্ছে মাছেরা।

কন্দর্প কাজের কথায় এল,— আপনি আমাকে খুঁজছেন অশোকদা?

—তোমাকে! কেন বলো তো?

—রূপেনদা বলল...

—ও হ্যাঁ, সে এক কীর্তি হয়েছে। মুস্তাফি হাসতে হাসতে সোফায় এল,— আচ্ছা, তোমার বড়দার মাথায় কি ছিট-ফিট আছে?

—কেন দাদা?

—আমার মিস্ত্রিরা বলছিল। তোমার দাদা নাকি রোজ বাড়ি ভাঙার সময়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে রাবিশের মধ্যে উবু হয়ে বসে কিসব ঘাঁটাঘাঁটি করে, আর গজাল পেরেক যা পায় তুলে পকেটে পোরে। দুমদাম আধভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়, মিস্ত্রিরা ডাকাডাকি করেও নামাতে পারে না, ডেঞ্জারাসলি এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে। কবে যেন একদিন ইয়াকুবের সঙ্গে খুব ঝগড়াও বেধে গেছিল। তোমার দাদা নাকি খুব দাবড়েছে ইয়াকুবকে। এভাবে হাতুড়ি মারছেন কেন? ওভাবে গাঁইতি চালাচ্ছেন কেন?

কন্দর্প একটু-আধটু শুনেছে বটে। তিতির বলছিল। দাদার নাকি আজকাল দুপুরে খাওয়াদাওয়ারও ঠিক থাকে না। বুকটা অল্প চিনচিন করে উঠল কন্দর্পর। দাদাটার একদম বাস্তব বোধ নেই, বড্ড বেশি আবেগে চলে। দিন দু-তিন আগে রাত্তিরবেলা হঠাৎ তার ঘরে ঢুকেছিল দাদা। মুখ দিয়ে ভকভক বাংলা মদের গন্ধ। থুম হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল তার বিছানায়। কিছু বলবে দাদা? উত্তর না দিয়ে দাদা উঠে চলে গেল। এসব করছে দাদা? বাড়ি বদল করার পরও বেশ কটা দিন তো ঠিকঠাকই ছিল। নাহ, দাদার কাজের পারম্পর্য পাওয়া কঠিন।

মুস্তাফি সোফায় বাবু হয়ে বসেছে। হাঁটু কাঁপাচ্ছে ঘন ঘন,— তুমি একটু বউদির সঙ্গে কথা বলো তো। আর কিছু না, বড় বড় চাঁইটাই পড়ছে, কখন কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়।

বউদিকে এসব কথা কী বলবে কন্দর্প! বউদি নিজেই সারাক্ষণ এমন মনমরা হয়ে থাকে।

মেজাজটা কষটে হয়ে গেল কন্দর্পর। ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বসে আছে।

মুস্তাফি বলল,— তা হ্যাঁ হে কন্দর্প, অনেক তো টাকাকড়ি পেলে, লাখ টাকা নিয়ে করলে কি?

—আছে। ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছি।

—ব্যাঙ্কে ! ছোঃ। তুমি একেবারে পাঁঠাই রয়ে গেলে। আমার ফিনান্স কোম্পানিতে রাখলে মাসে মাসে দু পার্সেন্ট সুদ পেতে।

—আগে তো বলেননি অশোকদা ?

—সব কথা কি বলা যায় ! আগে বললে ভাবতে টাকাটা তোমায় দিয়ে আবার নিজের গর্তে ঢুকিয়ে ফেলতে চাইছি। নিদেনপক্ষে টাকাটা তো শেয়ার মার্কেটেও রাখতে পারতে। এখন চড়চড় বাজার উঠছে, টাকা তোমার ছ মাসে ডবল হয়ে যেত।

—শেয়ার মার্কেটের আমি কী বুঝি দাদা ?

—তুমি কিসুই বোঝো না। তাই না কুণ্ডু তোমায় বেগার খাটাচ্ছে। মুস্তাফি হাঁটুর নাচন থামাল,— তোমার কথা আলাদা। তুমি এখন হিরো হয়ে কোটিপতি হচ্ছ। তবে বউদির কথা তোমার ভাবা উচিত ছিল। আমার ওপর বিশ্বাস করে টাকাটা ছেড়ে দিলে তোমাদের লাভ বই ক্ষতি হত না।

কন্দর্প খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। আলগা বলল,— বলব বউদিকে।

—হ্যাঁ বোলো। তার সঙ্গে এও বোলো, বাজার এরকম বেশিদিন থাকবে না। দেশে প্রোডাকশন বাড়ছে না, অথচ চড়চড় করে শেয়ারের দাম চড়ছে, এ বড় অমঙ্গলের লক্ষণ। তবে এই সময়েই বুদ্ধি করে একটু ঘর গুছিয়ে ফেলতে পারলে.... তোমার শঙ্করদা তো আমার ওখানে টাকা রেখে গেছে, সে খবর রাখো ?

কন্দর্প সামান্য অবাক হল। তবে সামান্যই। শঙ্করদার চোখে সব টাকাই উপরির মতো। মাইনেটাও। আর এই পড়ে পাওয়া টাকা শঙ্করদার গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি ? তাকে বা বউদিকে পাইপয়সা হিসেব করে চলতে হয়। ঝুঁকি নিতে গেলে ভাবতে হয় দশবার। মুস্তাফির চিট ফান্ড, থুড়ি, ফিনান্স কোম্পানিতে টাকা রাখবে সে ? নৈব নৈব চ।

কন্দর্প ঘড়ি দেখল,— আজ তবে চলি দাদা। দুপুরে একটা ডাবিং-এর কাজ আছে... আপনিও বেরোবেন...

—রোসো রোসো। শুনলাম তুমি নাকি স্মরজিতের লজঝড়ে ফিয়াটটা কেনার কথা ভাবছ ?

এ সংবাদও পাওয়া হয়ে গেছে ! কন্দর্প ঘাড় চুলকোল,— স্মরজিৎদা বেচে দেবে বলছিল...

—তাহলে সব টাকা তুমি ফিক্সডে রাখোনি ?

সরাসরি জবাব না দিয়ে কন্দর্প বলল,— ফাইনাল কিছু হয়নি দাদা। সস্তায় দিচ্ছে শুনে...ভাবছিলাম...

—কত চাইছে ?

—বাইশ।

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মুস্তাফি,— ওই আদ্যিকালের ইটালিয়ান মডেলটা তুমি বাইশে কিনছ ! ও ব্যাটা নিজে কতয় কিনেছিল জানো ? আঠেরো। ক'দিন ধরে বেচার ধান্দা করছিল, অ্যাদ্দিনে তোমায় মুরগি পেয়েছে।

কন্দর্প নিরীহ মুখে বলল,— তা হলে নেব না বলছেন ?

—নাও। আর একটু দরদস্তুর করে নাও। তোমার এখন বাজার হচ্ছে, ওই টিকটিকির পিঠে চড়ে দোরে দোরে ঘুরলে মান থাকবে না। মুস্তাফি একটু ভারিক্কি হল,— গাড়ি চড়ার শখ যখন হয়েছে, আমার ওখান থেকে একটা নতুন নিয়ে নাও। ধীরে ধীরে শোধ কোরো।

পলকের জন্য অশোকদার অফিসে বসে থাকা ষণ্ডামার্কা লোক দুটোর চেহারা মনে পড়ল কন্দর্পর। দেনদারদের চমকানোর জন্য পুষেছে অশোকদা। ঢোঁক গিলে বলল,— থাক দাদা। ক'দিন পুরনোই চড়ি।

—যা ভাল বোঝো করো।

কন্দর্প আর গড়িমসি না করে উঠে পড়ল। মুস্তাফি দরজা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। ঘাড়

ফিরিয়ে একবার দেখে নিল ফ্ল্যাটের ভেতরটা। গলা একটু নামিয়ে বলল,— একটা কথা ভারছিলাম, বুঝলে। শুয়োরটাকে একটা ফরেন লিকারের দোকান করে দেওয়া যায়। গড়িয়াহাটের কাছে যে মাল্টি স্টোরেডটা তুলছি তার গ্রাউন্ডে আমার কিছুটা স্পেস ধরে রাখা আছে। ভাবছিলাম একটা ইলেকট্রনিক গুডসের দোকান দেব। তা নয় মালের দোকানই দিলাম। লাইসেন্স-ফাইসেন্সের পেছনে বড় খরচা আছে, তাও নয় হোক। বাট অন ওয়ান কন্ডিশান। মুস্তাফি কন্দর্পর কাঁধে হাত রাখল,— ইউ উইল বি বাবুরামস ওয়ার্কিং পার্টনার।

কন্দর্প ছিটকে সরে গেল,— তা কী করে হয়! আমার শুটিং আছে, দেখছেনই তো আমার অল্প অল্প রোল আসছে, মাসে কটা দিনই বা ফ্রি থাকি!

—তুমি তোমার কাজ করো না। রোজ একবার দুবার যাবে, ওয়াচ-টোয়াচ রাখবে...। ছেলেটা তোমায় লাইক করে...। মুস্তাফি আবার হাত ঘাড়ে তুলে দিল, প্রায় থাবার মতো। মুখ বেঁকিয়ে হাসছে,— আরে ভাই, তুমি তো আর অমিতাভ বচ্চন রাজেশ খান্না হচ্ছ না, দোকান থাকলে তোমারও একটা স্টেডি ইনকাম হয়। ...তোমাকে ভালবাসি বলেই বলছি। নইলে আমার কি লোকের অভাব!

কন্দর্পর গা রি রি করে উঠল। লোকটা কী ভাবে তাকে? তার নিষ্ঠা সাধনা স্বপ্ন কোনও কিছুরই এতটুকু মূল্য নেই লোকটার কাছে? নিজের সুবিধে, স্বার্থের জন্য ইচ্ছেমতো ঘুঁটি সাজাবে, আর কন্দর্প হবে তার দাবার বোড়ে? তার আগে এই সাততলা থেকে ঝাঁপ দেবে কন্দর্প।

একটা কথাও না বলে কন্দর্প নেমে এল। ফেরার পথে তাদের পুরনো বাড়িটার সামনে গিয়ে দাদাকে খুঁজল ইতিউতি, দেখতে পেল না। মিস্ত্রি-মজুররা এখনও কাজে হাত লাগায়নি, চারদিকের কোলাহলের মাঝে কেমন একঘরে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খাঁচাটা। পিছনের দিকের অনেকটাই ভাঙা হয়ে গেছে, ইট বালি দরজা জানলা স্তূপ হয়ে আছে যেখানে সেখানে।

সামনেটা এখনও অটুট, মূর্তিমান ব্যঙ্গের মতো।

এখানে কী দেখে দাদা! দেখার কী আছে!

বিকেলে ডাবিং-এর পর স্যাস ক্লিনিকে এল কন্দর্প।

সম্প্রতি মধুমিতার চাকরিতে পদোন্নতি হয়েছে। রিসেপশানে সে কমই বসে, অফিসঘরে কম্পিউটার নিয়েই বেশি কাজ থাকে তার। মাইনে বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বও। রুগীদের বিলপত্র করে, রেকর্ড রাখে। বাইরের দু-চার জন ডাক্তার আজকাল স্যাস ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার ব্যবহার করছে, তাদেরও হিসেবপত্রের ভার এখন মধুমিতার ওপর। অরূপ শালিনীর সে এখন বেশ স্নেহের পাত্রী। নার্সিংহোমের আর-এম-ও মেট্রনরাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

স্কুটার বাইরে রেখে কন্দর্প সোজা অফিসঘরে ঢুকল। মধুমিতা নেই। রিসেপশানে আর একটি নতুন মেয়ে বসে আজকাল। অল্পবয়সী মেয়ে, আনাগোনার সূত্রে কন্দর্পের সঙ্গে মুখ চেনা হয়ে গেছে। কন্দর্পকে দেখে মেয়েটি মুচকি হাসল,— মিতাদি আসেনি।

কন্দর্প মেয়েটির সামনে এল,— ছুটি নিয়েছে?

—পরশু জ্বর নিয়ে বাড়ি গেল। আজ সকালে ফোন করেছিল। কাল, নয়তো সোমবার জয়েন করবে।

নিরানন্দ মুখে কন্দর্প নার্সিংহোমের পোর্টিকোর নীচে এসে দাঁড়াল। কি করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না। কালকের দিনটা দেখে রোববার মধুমিতার বাড়ি যাবে? গত দেড় বছরে মধুমিতাকে কখনও অসুস্থ হতে দেখেনি কন্দর্প, আজ কী করে সে নিশ্চিন্ত থাকে?

বেলা পড়ে এসেছে। পৃথিবী জুড়ে সোনাঝুরি আলো। আসন্ন শরতের ছোঁয়ায় সে আলো আজ ভারি মায়াময়।

কন্দর্পর একটুও ভাল লাগছিল না, চোখ বুজে ফেলল। স্পষ্ট দেখতে পেল মধুমিতার ফর্সা মুখ

এখন অস্বাভাবিক লাল, চোখ বসে গেছে, গোলাপি ঠোঁট শুকনো, সাদাটে। বিস্রস্ত চুল লুটোপুটি খাচ্ছে শয্যায়। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে মধুমিতা, ছটফট করছে বিছানায়। একা কাশফুল মলিন, বিবর্ণ।

পলকে বাতাস ভরে গেল এক তীব্র সুগন্ধে। কন্দর্পর বুকে পারফিউম ছিটিয়ে দিল মধুমিতা। রিন রিন হাসিতে বধির হয়ে যাচ্ছে কন্দর্পর কান।

কন্দর্প স্কুটারে স্টার্ট দিল। বেরোনোর মুখে দেখল শুভাশিসের গাড়ি ঢুকছে নার্সিংহোমে। দূর থেকে হাত নাড়ল কন্দর্প,—দাঁড়াল না।

৬৭

—বাড়ি আজ ফাঁকা যে! স্মার্ট হতে গিয়েও কন্দর্পর স্বর দুলে গেল,— মাসিমা মউ সব কোথায়?

—আপনি বুঝি আমার মা মেয়ের খোঁজ নিতে এসেছেন?

—তা নয়, ভরসন্ধেবেলা ভূতের মতো বসে আছ....

—ভূত নয়, পেত্নি। শাঁকচুন্নিও বলতে পারেন।

কন্দর্প হাসল। এ যদি পেত্নি হয় তবে রানি কে! কপালে আজ একটা লম্বাটে টিপ পরেছে মধুমিতা, খয়ের রঙের। পিঠ বেয়ে নেমেছে মোটা বেণী। চোখেও বুঝি হালকা কাজলের ছোঁয়া। মুখেচোখে কোনও শুকনো ভাবই নেই। বরং যেন অল্প ফোলা ফোলা, দুপুরে ঘুমোলে যেমনটি হয়। পরনে মেঘবরণ শাড়ি, অঙ্গে স্থির বিদ্যুৎ। এ যদি শাঁকচুন্নি হয় তবে পরী কে!

চোখ নামিয়ে বেতের চেয়ারে বসল কন্দর্প,— এক গ্লাস জল খাওয়াবে?

মধুমিতা জল নিয়ে এল। অনেকটা পথ স্কুটারটাকে প্রায় উড়িয়ে এনেছে কন্দর্প, তৃষ্ণার্ত কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, এক চুমুকে জল শেষ।

মধুমিতা হাত থেকে গ্লাস নিল,— আর দেব?

—না থাক।

মধুমিতা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল,— মা মউকে নিয়ে দাদার বাড়ি গেছে। দাদার ছোট ছেলের আজ জন্মদিন।

—তুমি গেলে না?

—উঁহু। ফিরে এসে মোড়া টেনে সামনে বসল মধুমিতা। ঠোঁটে কুয়াশা মাখা হাসি,— ভাবলাম একজন যদি দূর থেকে এসে ফিরে যায়!

কথাটা টুং করে বাজল। জলতরঙ্গের মতো। একটু প্রগলভ হওয়ার চেষ্টা করল কন্দর্প,— দূর থেকে এসে একজন ফিরে যাবে কেন? তার তো কাছেই দিদির বাড়ি, সেখানে গিয়েই সন্ধেটা কাটাত।

—তা হলে সে সেখানেই যাক। এখনও হাতে সময় আছে, আমি দাদার বাড়ি রওনা হয়ে যাই।

কন্দর্পর বুকে একটা কুবো পাখি ডেকে উঠল। অনেককাল ধরেই নিজের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে পাখিটা, আজ স্পষ্ট শুনতে পেল তার ডাক। কুব কুব ধ্বনি চারিয়ে যাচ্ছে শিরা-উপশিরায়। অস্ফুটে প্রশ্ন করল,— তুমি জানতে আমি আসব?

—না জানার কি আছে! কাল আপনার শুটিং শেষ হওয়ার কথা, আজ আপনি নিশ্চয়ই নার্সিংহোমে...

মধুমিতা কথা সম্পূর্ণ করল না। অসম্পূর্ণ কথা নির্বাক তরঙ্গ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন। ক্যালেন্ডারের পাতা ফরফর উড়ছে, জানলা দিয়ে একঝলক বাতাস ঢুকল, শেষ শ্রাবণের বাতাস, বাষ্পের ছোঁয়াচ মাখা।

কন্দর্প সোজা চোখে মধুমিতার দিকে তাকাল,— তোমার জ্বর এখন কেমন?

—মুখ দেখে কী মনে হয় ?

—মুখ দেখে কি জ্বর বোঝা যায় ?

ফস করে হাত বাড়িয়ে দিল মধুমিতা,— তা হলে পালস দেখুন।

কন্দর্প মোহগ্রস্তের মতো ধরল হাতটা। কবজির নীল শিরা দপদপ করছে, কিন্তু কী শীতল! সত্যিই শীতল, নাকি তার নিজেরই তাপ বেড়ে গেছে আচমকা!

হাতখানা ছেড়ে দিল কন্দর্প,— এখন তো মনে হচ্ছে জ্বরটা নেই।

—নেইই তো। পরশু খুব ছিল। যখন বাড়ি ফিরলাম, মাথা একেবারে ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছিল। কাল বিকেল থেকে কমে গেছে।

—তা হলে আজ ডুব মারলে যে ?

—ইচ্ছে হল। পরখ করে দেখছিলাম একজন আমার খবর নেয় কিনা।

পরখ, না খেলা! পরখ, না সংশয়! পরখ, না বিশ্বাস!

কন্দর্প মৃদু স্বরে বলল,— কী বুঝলে ?

—যা বোঝার তাই বুঝলাম। মধুমিতা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। মোড়া ছেড়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আধফেরানো মুখে কি যেন দেখছে বাইরে। তীব্র অথচ চাপা স্বরে বলল,— আমার ওপর আপনার অসীম করুণা।

—ছি ছি, এ কী বলছ! তোমার অসুখ হয়েছে, আমি দেখতে আসব না ? এ তো আমার কর্তব্য।

—বুঝলাম আপনি একজন কর্তব্যপরায়ণ মানুষ।

মধুমিতার স্বরে কি বিদ্রূপ ? কন্দর্প কি বলবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না। চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। মুখস্থ করা সংলাপ বলতে তার সমস্যা হয় না। ডিরেক্টর তালিম দিয়ে নেয়, স্পট বয়রা কিউ ধরিয়ে দেয়, একবার ভুল হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার সুযোগ আসে, তৃতীয়বার সুযোগ আসে। কিন্তু বাস্তব বড় গোলমেলে জায়গা। একটা ভুলেই সব শেষ।

তবু উঠল কন্দর্প। পায়ে পায়ে মধুমিতার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে,— তুমি আজ এভাবে কথা বলছ কেন ?

—ঠিকই তো বলছি। মধুমিতা মুখ ফেরাল না,— আপনার দয়ার প্রাণ। অন্যের দুঃখে আপনার হৃদয় বিগলিত হয়। অন্যের উপকার করতে আপনি জীবন উৎসর্গ করেন।

কন্দর্প মনে মনে আর্তনাদ করে উঠল,— তুমি তো অন্য কেউ নও মধুমিতা।

মধুমিতা ঝট করে মুখ ঘোরাল,— একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

—কি ?

—আমার উপকার করা তো আপনার হয়ে গেছে, চাকরিও মোটামুটি আমার টিকেই গেল, সংসারটাও গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে। এখনও কিসের জন্য আমার কাছে আসেন ? বন্ধুর বিধবা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায় বজায় রাখতে ?

কন্দর্প নিশ্চুপ। কথাটা এত বড় মিথ্যে যে কোনও প্রতিবাদই চলে না।

মধুমিতার চোখ জ্বলছে। ঠোঁট কাঁপছে। নাকের পাটা ফুলছে ঘন ঘন। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলে বলল,— জবাব দিন। কিছু অন্তত বলুন।

কত কথাই তো বলতে পারে কন্দর্প। কিন্তু কীভাবে বলবে ? কতটা বলবে ? পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ অর্বুদবার যে কথা বলেছে, সে কথা তো সহজেই উচ্চারণ করা যায়। মাত্র তো তিনটে শব্দ। আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু কথাটা বললেই সব ফুরিয়ে যায় না। অনেক কথা বাকি থেকে যায়, অনেক কথা। দীপঙ্করের বউ মধুমিতাকে কি প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিল কন্দর্প ? না। দীপঙ্করকে ঈর্ষা হয়েছিল তার, তবে সেই ঈর্ষার হেতু মধুমিতার প্রতি কোনও দুর্বলতা নয়। মধুমিতাকে শোকার্ত বিহ্বল দেখেই কি তার ভালবাসা জেগেছিল ? কক্ষনও না। তখন ছিল নিছক সহানুভূতি, হয়তো বা করুণাও। তারই বশে অসহায় মেয়েটাকে একটা স্থিতি

দিতে চেয়েছিল। সঙ্গে একটা চোরা লালসাও ছিল হয়তো, ছিল সঙ্গসুখ ভোগ করার এক গোপন আনন্দ। কিন্তু কি থেকে কী ঘটে গেল! কখন যেন মধুমিতার কষ্টগুলো আসন গাড়ল কন্দর্পর বুকে। একজনের ব্যথা যখন আর একজনকে ছেয়ে ফেলে, তখন তার ভেতরে আর কোনও সহানুভূতি থাকে না, করুণা থাকে না। লালসা কামনাও কেমন অন্য ধরনের চেহারা পেয়ে যায়। জন্ম নেয় এক মুক্তোদানা। যার নাম প্রেম।

কিন্তু মধুমিতা কি এসব কথা বিশ্বাস করবে? মধুমিতার জায়গায় কন্দর্প থাকলে করত? ভাবত না ত্রাতার ছদ্মবেশে কন্দর্প এক বাসনাতাড়িত পুরুষ? উপকার করে প্রতিদান চাইছে? দেনাপাওনার কারবার ফাঁদছে? দীপঙ্কর নাকি মধুমিতাকে বলত বিপদে পড়লে কন্দর্পকে ডেকো। কন্দর্পর ওপর নাকি আস্থা রাখা যায়। উফ, আস্থা শব্দটার কী ভয়ঙ্কর ওজন! আস্ত পাহাড় হয়ে হঠাৎ হঠাৎ বুকে চেপে বসে শব্দটা। যেন মনে করিয়ে দেয় বাড়ি ফাঁকা পেয়ে সিঁধ কেটে ঢুকেছে কন্দর্প। নিজেকে কেমন চোর চোর লাগে, পাপী মনে হয়।

এত কথা যে কী করে সাজায় কন্দর্প!

কন্দর্প ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,— তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে মধুমিতা। শান্ত হও।

মধুমিতার চোখের মণি আরও কালো দেখাল। বলল,— আমি শান্তই আছি। আপনি আমার কথার জবাব দিন। কেন আসেন আপনি?

সংলাপ ভুলে যাওয়া অভিনেতার মতো কন্দর্প বলে উঠল,— তুমি আর দীপঙ্করকে ভালবাস না মধুমিতা?

—এটা জবাব নয়, প্রশ্ন।

কন্দর্প মনে মনে বলল,— এই প্রশ্নের মধ্যেই আমার জবাব লুকিয়ে আছে মধুমিতা।

মধুমিতা আবার জানলার দিকে ফিরল। আপনমনে বলল,— মরা মানুষকে ভালবাসা যায় না কন্দর্পদা। তার ছবির দিকে তাকিয়ে কাঁদা যায়, তার মৃত্যুর দিনে কয়েকটা ফিকে হয়ে আসা স্মৃতি নিয়ে আকুল হওয়া যায়। সে তো ছেলেবেলার কথা ভাবলেও হয়, পুরনো অ্যালবাম উলটোলেও হয়। ভালবাসার জন্য একটা অন্য কিছু লাগে। এমন কিছু যাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়, যার ওপর রাগ অভিমান ফলানো যায়। দীপঙ্কর আমার মৃত স্বামী। মৃত। মৃতই। একটা হারিয়ে যাওয়া বসন্তকাল। একটা স্মৃতি। স্মৃতিকে ভালবাসা আর টাটকা বসন্তকালের জন্য উতল হওয়া এক নয় কন্দর্পদা।

মধুমিতার কথায় কোনও লুকোচুরি নেই। তবু যে কেন মন অসাড় হয়ে আসে কন্দর্পর! যাকে ভীষণভাবে আকাঙ্ক্ষা করে মানুষ, সে হঠাৎ আপনা থেকে ধরা দিলে কি এমনটাই হয়! অনুভবে তো এরকমই একটা সিন ছিল ঋতুশ্রীর সঙ্গে, সেখানে তো এই অনুভূতি আসেনি!

আলোর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে মধুমিতা। তার ঘাড়ে, পিঠের একটুখানি অংশে পিছলে যাচ্ছে বৈদ্যুতিক বিভা। বেণীর পাশেই, কাঁধের কাছে, রক্তদানার মতো একটা তিল ফুটে আছে। কন্দর্প ভূতগ্রস্তের মতো তিলটা ছুঁতে যাচ্ছিল, তার আগেই এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল মধুমিতা। আচমকা ঘুরে দু হাতে খামচে ধরেছে কন্দর্পকে। দুম দুম কিল ঘুষি মারছে বুকে। দপদপ করছে মধুমিতার স্বর,— আপনি একটা কাওয়ার্ড। আপনি একটা ভণ্ড। বাজে লোক, বাজে লোক...

কন্দর্প পুরোপুরি বোকা হয়ে গেল। এখন ঠিক কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু এটুকু বুঝল এ সময়ের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সংলাপ থাকে না, নির্দেশ থাকে না। তবে কি ওই তিনটে শব্দই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে... !

অন্ধের মতো মধুমিতাকে জড়িয়ে ধরল কন্দর্প। ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে মধুমিতা। অথবা হচ্ছে না, আরও উত্তাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। সাপিনীর মতো বেষ্টন করছে কন্দর্পকে। সাপিনী, না রোহিণী? কন্দর্প দু হাতে তুলে ধরল মধুমিতার মুখ। টিপ ঝরে গেছে ছোট্ট কপাল থেকে, সাদা সিঁথির দু পাশে ঝুরো চুল এলোমেলো, কান্নায় ভেসে যাচ্ছে মধুমিতা। কান্নাই কি শ্রেষ্ঠ সমর্পণ?

সারা জীবনে কয়েক সহস্র ইংরিজি ছবি দেখেছে কন্দর্প, কত রোমান্টিক সিন, কত আবেগ থর থর দৃশ্য, সব আজ বেমালুম ভুলে গেল কন্দর্প। বেহেড আনাড়ির মতো ঠোঁট রাখল মধুমিতার ঠোঁটে, ওষ্ঠ দিয়ে শুষে নিচ্ছে সমস্ত অশ্রু। এত নুন থাকে মেয়েদের চোখে ! মৃদু এক সুরভিতে ভরে গেছে ঘর। চেনা চেনা। কন্দর্পর দেওয়া সেই পারফিউম কি আজ মেখেছিল মধুমিতা ! ঘরে ঢুকেই কেন গন্ধটা পায়নি কন্দর্প ! গন্ধটা আজ এত বুনো বুনো লাগে কেন !

মুহূর্ত কাটছে। একটা একটা করে মুহূর্ত কাটছে। বড় দ্রুত।

কন্দর্পর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মধুমিতা। নিজেকে বিন্যস্ত করল। আঁচলে মুখ মুছছে, গুছিয়ে নিচ্ছে চুল। শ্লথ পায়ে মোড়ায় বসল আবার। মাথা নিচু। অপলক চোখে ভাবছে কি যেন। ফর্সা মুখে টকটকে রক্তাভা।

কন্দর্পর কেমন বিবশ লাগছিল নিজেকে। জানলাতেই দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে তার পা দুখানা। এক্ষুনি যে ঘটনা ঘটে গেল, সেটা ঘটা কি উচিত হল ? মধুমিতার কি অনুশোচনা হচ্ছে ? অমন বিমর্ষ মুখে তবে বসে আছে কেন ?

মুহূর্ত কাটছে। একটা একটা করে মুহূর্ত কাটছে। বড় দীর্ঘ হয়ে। অশরীরী ছায়া হয়ে।

মধুমিতাই কথা বলল। প্রথম কথা। স্তিমিত স্বরে প্রশ্ন করল,— চা করব ?

কন্দর্প চমকে তাকাল। শূন্য মস্তিষ্ক ধাক্কা খেয়ে সজাগ হল যেন,— থাক না, আবার চা কেন ?

—একটু করি। আমিও খাব।

উত্তরের অপেক্ষা না করে রান্নাঘরে চলে গেল মধুমিতা। জল বসিয়েছে, টুং টাং শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কাপ-ডিশের। বিজন ফ্ল্যাটে ওই শব্দটুকুই কী মুখর এখন !

শরীরটাকে টেনে এনে বেতের চেয়ারে বসাল কন্দর্প। সিগারেট ধরাল। আঙুল এখনও টিপ টিপ কাঁপছে। ছোট্ট কাঠের টেবিলে আজকের কাগজ রাখা আছে। পড়া কাগজ, তবু টানল কন্দর্প। বাংলা অক্ষর যেন দুর্বোধ্য খরোষ্ঠি লিপি।

চা হাতে ফিরেছে মধুমিতা। মোড়াটা একটু দূরে সরিয়ে বসল। শুকনো চোখ অন্য দিকে, মলিন দেওয়ালে।

নীরবে চা শেষ করে কন্দর্প বলল,— আমি আজ উঠি।

এবার মধুমিতা চমকে তাকিয়েছে,— এখনই যাবেন ?

—যাই।

—মউয়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না ?

—আজ থাক।

দরজায় পৌঁছে তবু দাঁড়াল কন্দর্প। বুঝতে পারছে যাওয়ার আগে কিছু একটা বলা উচিত মধুমিতাকে। ওই তিনটে শব্দ ছাড়া অন্য কিছু। কি বলবে ? এমন একটা মুহূর্তে বলার মতন কি কথা থাকে ?

মধুমিতাই আবার কথা বলল,— সোমবার আসছেন তো নার্সিংহোমে ?

এতক্ষণ পর মধুমিতার চোখে চোখ রাখতে পারল কন্দর্প,— আসব ?

কান্নার মতো একটুকরো হাসি ফুটল মধুমিতার মুখে,— ইচ্ছে হলে আসবেন। আমি কাউকে জোর করব না।

কন্দর্প ফিরছিল। স্কুটার শম্বুক গতিতে চলছে। যেন কেউ চালাচ্ছে না, আপনিই চলছে দ্বিচক্রযান। কখন যেন ভি আই পি ছেড়ে বাইপাসে এসে গেল। মুখোমুখি একটা বাতাস ঝাপটা মারছে। একদম মুখোমুখি নয়, একটু টেরচাভাবে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া শার্ট ফুঁড়ে ঢুকে যাচ্ছে কন্দর্পর বুকে। মসৃণ পথ, উজ্জ্বল আলো, রাত বড় মোহিনী এখন।

বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছিল কন্দর্পর। এই মুহূর্তে সেই বোধহয় পৃথিবীর সব থেকে সুখী মানুষ, অথচ ঠিক তেমনটি তো বোধ হচ্ছে না ! কোথা থেকে এক অচেনা যন্ত্রণা এসে ভার করে দিচ্ছে

মন। কেন যন্ত্রণা তাও ঠিক বোঝা যায় না। তবু যেন অস্পষ্ট চিনচিন ব্যথা... ! কন্দর্পর জীবনে মধুমিতাই প্রথম নারী নয়, আগেও এসেছে কয়েকজন। তবে তারা ছিল যৌবনের খেলা। দায়হীন, ভারহীন, লঘু বাতাসের মতো এসেছে, উড়েও গেছে। কৃষ্ণকলির সঙ্গে সম্পর্কটাই যা একটু বেশি গড়িয়েছিল। একসঙ্গে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে গিয়েছিল দুজনে, সারা দুপুর গঙ্গার পাড়ে ফস্টিনস্টিও হয়েছিল অনেক। তবে তাতে যতটা শরীর ছিল, ততটা আবেগ ছিল না। সেই কৃষ্ণকলি এখন দিব্যি এক ডব্লু বি সি এস-কে বিয়ে করে সুখী গৃহিণী হয়েছে। বছর দুয়েক আগে গড়িয়াহাটে বরকে নিয়ে পুজোর বাজার করছিল কৃষ্ণকলি, কন্দর্পকে দেখে কী উচ্ছল ! বরকে বলল, এই দ্যাখো দ্যাখো এই হল কন্দর্প, যার জন্য একসময়ে আমি ফিদা ছিলাম। হিহি হিহি। এই কন্দর্প, চলো না আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করি আজ। কৃষ্ণকলির বিয়ের দিন যেটুকু বা কষ্ট হয়েছিল কন্দর্পর, সেদিন সেটুকুও হয়নি। কৃষ্ণকলির বরের সঙ্গে গল্প করতে করতে ভরপেট চাইনিজ খেয়েছিল, মৌরি চিবোতে চিবোতে উঠেছিল স্কুটারে।

মধুমিতা কৃষ্ণকলি নয়, মধুমিতা যে কোনও এক নারী নয়, মধুমিতা সবার থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা। মধুমিতা একটা একা কাশফুল, মধুমিতা কন্দর্পর বুকের জমাট বাতাস।

তবে কি খুব বেশি সুখের আর এক নাম কষ্ট !

নাকি কোনও গোপন অপরাধ বোধে পীড়িত হচ্ছে কন্দর্প ! কীসের অপরাধ বোধ ? দীপঙ্কর তো মরে ভূত হয়ে গেছে। যে মরে গেছে সে তো মরেই গেছে, যারা বেঁচে আছে তাদের বাঁচার অধিকার থাকবে না কেন ?

সামনে খানিকটা পথ অন্ধকার। রাস্তা এবড়ো-খেবড়ো, দোল খাচ্ছে স্কুটার। পথের ধারে তিন-চারটে লোক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। উল্টোদিক থেকে রাতের টহলদার পুলিশি জিপ তীব্র আলো ফেলে চলে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল কন্দর্পর। একটু হলেই টাল খেয়ে যাচ্ছিল স্কুটার, সামলে নিল কোনওক্রমে।

বাকি পথ সজাগ স্নায়ু নিয়ে ফিরল কন্দর্প। তিতির গ্রিলের দরজা খুলে দিয়ে চলে গেল ঘরে। প্রিটেস্ট চলছে, পড়ছে বোধহয়, মুখখানা ভারি অন্যমনস্ক। টেনে টেনে ছোট্ট ঘেরা বারান্দায় স্কুটার তুলল কন্দর্প। স্কুটারেই বোঝাই হয়ে যায় বারান্দাটা।

ঘরে ঢোকার আগে চিলতে খাওয়ার জায়গাটার দিকে কন্দর্পর চোখ পড়ল। টেবিলটা মোটেই খুব বড় নয়, তবু তাতেই জায়গাটুকু জবরজঙ। কন্দর্প দেখল প্লাস্টিকের ঢাকা দিয়ে চাপা রয়েছে তার রাতের খাবার। দশটাও তো বাজেনি, এর মধ্যে খেয়ে নিল বউদিরা !

কন্দর্পর ঘরখানা এ বাড়িতে সব থেকে ছোট। কন্দর্প বলে কুঠরি, সত্যিই কুঠরি। খাট আলমারি চেয়ার টেবিল আর সেতারেই নড়াচড়ার রাস্তা বন্ধ। ভাগ্যিস তাক আছে দেওয়ালে, না হলে ভিসিপি, বই সবই খাটের তলায় ঢোকাতে হত।

জামাকাপড় না বদলেই কন্দর্প শুয়ে পড়ল। কোত্থেকে একটা গান ভেসে আসছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত। রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব। এসব গান তো এখন আর টিভিতে বিশেষ হয় না, কেউ বোধহয় টেপ-ফেপ চালাচ্ছে।

গানের কলিগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিল কন্দর্পকে। চোখে জল এসে গেল। ভেজা চোখে মধুমিতাকে মনে করার চেষ্টা করল কন্দর্প। ছোট্ট কপাল থেকে টিপ সরে গেছে, পাতলা ঠোঁট প্রাণপণে টিপে আছে মধুমিতা, বোজা চোখের পাতা বেয়ে বৃষ্টির মতো কান্না ঝরছে। রিনরিনে মেয়েলি স্বর কেঁপে কেঁপে ঢুকল ঘরে। জানবে না কেউ কোন তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে...। ভেতরটা কেউ নিংড়ে নিচ্ছে কন্দর্পর। মধুমিতার দু চোখের জল শুষে নিল কন্দর্প। ...চাঁদের মতো অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব...। কী পরম নির্ভরতায় কন্দর্পকে আঁকড়ে ধরল মধুমিতা। ঘুম আসছে কন্দর্পর, ঘুম আসছে। কন্দর্প ফিসফিস করে বলল,— ঢেউ তোলাব... ঢেউ তোলাব...

ইন্দ্রাণীর ঠেলায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কন্দর্প,— কি হল, তুমি খেলে না ?

কন্দর্প চোখ রগড়াল,— কটা বাজে ?

—পৌনে বারোটা।

—এত রাত হয়ে গেছে ! কন্দর্প বিছানা থেকে নামল,— ডাকোনি কেন ?

—দুবার এসে ফিরে গেছি। তুমি অকাতরে ঘুমোচ্ছিলে। ভাবলাম হয়তো...। খাবে, না ফ্রিজে তুলে দেব ?

—না না, খাব। পেটে ছুঁচো ডন মারছে। কন্দর্প শার্ট খুলে আলমারির দিকে এগোল।

ইন্দ্রাণীর গলা হঠাৎ থমথমে,— তোমার দাদা এখনও ফেরেনি চাঁদু।

কন্দর্প ঘুরে তাকাল,— গেছে কোথায় ?

—কি জানি। বলে তো যায় না।

—রঘুবীরবাবুর সঙ্গে সাইট-ফাইটে চলে যায়নি তো ?

—ওসব তো কবেই শিকেয় উঠেছে।

এ তো মহা ঝামেলা হল। পলকের জন্য মুস্তাফির কথাটা মনে পড়ল কন্দর্পর। বলি বলি করেও বলল না ইন্দ্রাণীকে। ভুরু কুঁচকে আবার শার্ট গায়ে গলাল,— যাই, একটু দেখে আসি।

—কোথায় খুঁজবে ? ওর আড্ডা-ফাড্ডা চেনো ?

কন্দর্প উত্তর দিল না। পথে বেরিয়ে সিগারেট ধরাল। দুটো টান দিতেই তেতো হয়ে গেল জিভ। খালি পেটে মোচড় দিচ্ছে ধোঁয়া। রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে, মোড়ের পান-বিড়ির দোকানটায় তালা লাগাচ্ছে বিরজু। একপাল কুকুর রাগী রাগী চোখে চষে বেড়াচ্ছে পাড়া। রিকশা স্ট্যান্ডও একেবারে ফাঁকা।

স্টেশনের কাছে এসে কন্দর্প একটু দাঁড়াল। শেষ ট্রেন বোধহয় যায়নি এখনও, বেশ কিছু ব্যাপারি ঘোরাফেরা করছে প্ল্যাটফর্মে। এক মুখ দাড়ি, টেরা পাগলটা শালপাতা থেকে কি যেন খাচ্ছে চেটে চেটে। প্ল্যাটফর্মবাসীদের শয্যাতেও রাত্রি নেমেছে। সার সার শুয়ে আছে মানুষ, হাঁড়ি কড়া, কুকুর। সংখ্যায় এরা বাড়ছে রোজ।

স্টেশনের ওপারে একটা চুল্লুর ঠেক আছে, সেদিকে গেল কন্দর্প। নেই আদিত্য। লাইন ধরে খানিক এগোলে ছোট বস্তি পড়ে একটা, সেখানেও দিশি মদের কারবার চলে, কন্দর্প একবার সেদিকেও দেখে এল। নেই। ব্রিজের নীচেও একটা বড় আড্ডা আছে, সেদিকে এগোচ্ছিল, কি ভেবে তাদের আধভাঙা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ির ফাঁকা জমিতে ইট গেঁথে একটা কাঁচা ঘর বানানো হয়েছে, রাতে পাহারাদার থাকে, আলো জ্বলছে ঘরখানায়।

কন্দর্প ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল,— অ্যাই শুনছ ? কে আছে ?

লুঙ্গি গেঞ্জি পরা এক ঢ্যাঙা মতন লোক বেরিয়ে এল,— কী চাই ?

—আমি মুস্তাফিবাবুর লোক। কথাটা বলে একটু অপেক্ষা করল কন্দর্প।

একটু যেন প্রতিক্রিয়া হল লোকটার,— হ্যাঁ বলুন, কী ব্যাপার ?

—আমি একজনকে খুঁজছি। মানে এ বাড়ির যিনি মালিক ছিলেন। যিনি আসেন, রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন।

—ও পাগলাবাবু ! তিনি তো বিকেলে এসেছিলেন।

—কখন গেছেন ?

—খেয়াল করিনি।

—ও।

ফেরার আগে আর একবার ভাঙা বাড়িটার দিকে তাকাল কন্দর্প। অন্ধকারে আরও যেন ছন্নছাড়া লাগছে বাড়িটাকে। শুধু রায়বাড়ি কেন, রায়বাড়ির মানুষগুলোরও যেন একই দশা।

বাস স্ট্যান্ডের দিক থেকে টলতে টলতে আসছে এক মাতাল। ছায়ামূর্তির মতো। দাদা কি ? কন্দর্প মাঝরাস্তা ধরে দু পা এগোল। নাহ, অন্য লোক।

কন্দর্পর চিন্তা হচ্ছিল। যত মাতালই হোক, যেখানেই থাকুক দাদা ঠিক বাড়ি ফিরে আসে। একদিনই ফেরেনি শুধু।

কোথায় গেল দাদা!

৬৮

ইন্দ্রাণীদের স্টাফরুমের টয়লেটটা ভারি অপরিচ্ছন্ন। বুড়ি জমাদারনির রোজই পরিষ্কার করার কথা, নিয়ম মাফিক ঝাড়ু বুলিয়েও যায়, কিন্তু বড় আলগা আলগা। জম্মে ফিনাইল পড়ে না, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয় না, শ্যাওলা আর দুর্গন্ধ ভরা ঘরটায় ঢুকলেই অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। ইন্দ্রাণীরা ঠাট্টা করে বলে ও ঘরে তাদের বিশ্বরূপ দর্শন হয়।

আজ ইন্দ্রাণীর কোনও অনুভূতিই নেই। হলদেটে ছোপ ধরা বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে জোর জোর জলের ঝাপটা দিচ্ছে মুখে। কখনও যা হয়নি আজ ক্লাসে তাই ঘটে গেল, আগের পিরিয়ডে চেয়ারে বসে ঢুলছিল ইন্দ্রাণী। মেয়েরা নিশ্চয়ই হাসাহাসি করছে নিজেদের মধ্যে! ছি ছি, কী বিশ্রী! ঢুলুনির আর দোষ কি, কাল সারা রাত দু চোখের পাতা এক হল কই! যতবার একটু তন্দ্রা নামে, সামান্যতম শব্দে ঘোর ছিঁড়ে যায়। মানুষটা ফিরল কি! তিতিরও রাতে কতবার যে বিছানা ছেড়ে উঠল। বারবার বাথরুমে যায়, বারান্দায় গিয়ে দেখে আসে, শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করে। এই টেনশানের মাঝে কী পরীক্ষা যে দেবে! আদিত্যর কি কোনও কালে আক্কেল বুদ্ধি বিবেচনা হবে না! মাতাল হোক, বেভুল হোক, খোঁয়াড়ে তো ফিরে আসেই, হঠাৎ কোন খেয়ালে নিপাত্তা হল সারা রাত!

সেলিমপুরে আসার পর থেকেই আদিত্যর আচার-আচরণ সুবিধের ঠেকছে না ইন্দ্রাণীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না, যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, যে টুকুনি সময় বাড়িতে থাকে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নেই, মদ আবার নিত্যসঙ্গী হয়েছে, এবার পেটে ব্যথাটা উঠলেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়। তাও ইন্দ্রাণী এসবে অভ্যস্ত, অনেক কাল আগেই কপালের লিখন হিসেবে মেনে নিয়েছে সব কিছু। কিন্তু কাল রাতের ব্যাপারটা...! ফিরলই না!

কেন এমন করছে লোকটা! বাবার শোকে? বাড়ি ভাঙার দুঃখে? ওসব শোক দুঃখ তো দিব্যি সামলে নিয়েছিল, আবার নতুন করে উথলে উঠল কেন? ভাবে কী আদিত্য? চার পাশের মানুষরা সবাই অপার সুখের সাগরে ভাসছে, শুধু সে একাই ভাজা ভাজা হচ্ছে দুঃখে? বয়স তো অনেক হল, এখনও এই খোকামো কেন? স্বার্থপর, ভীষণ স্বার্থপর, নিজেরটুকু ছাড়া দুনিয়াতে আর কারুর কথাই ভাবতে শেখেনি লোকটা।

তোয়ালে রুমালে মুখ মুছে ইন্দ্রাণী একটু সময় আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। মলিন দর্পণে বিম্বিত হয়েছে এক বিষণ্ণ মুখ। চোখের নীচে কালির আভাস, সিঁথির কাছে উঁকি দিচ্ছে একটা দুটো রুপোলি চুল। জীবনের অনেকটা পথ তো পার হয়ে এল ইন্দ্রাণী, প্রায় চল্লিশটা বছর। তার অর্ধেকটাই তো কাটল ওই বাউণ্ডুলে মানুষটার সঙ্গে। কেন কাটল? বহু কাল আগেই তো আদিত্যর সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলতে পারত ইন্দ্রাণী। কেন ছেঁড়েনি? সংস্কার? তার তো তেমন কোনও প্রথাগত সংস্কার নেই! পুজো প্যান্ডেলে সুন্দর প্রতিমা দেখে হাত জোড় করা ছাড়া আর তো কখনও কোনও ঈশ্বরের কাছে মাথা নোয়ায়নি ইন্দ্রাণী! তার কোনও অন্ধ ভক্তি নেই, সমাজের নীতি নিয়ম তাকে শিকল পরাতে পারে না। চলে গেলেই হত। তিতির হওয়ার পরেও তো তার চলে যাওয়ার কোনও বাধা ছিল না। ছেলেমেয়ে নিয়ে একাই নয় কাটাত জীবনটা। কেন গেল না? তিতির হওয়ার পর তার তো চাকরিও জুটে গিয়েছিল, তবু পড়ে রইল কেন? শুভর ওপর অভিমানে, ক্ষোভে? শুভকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল? শুভকে যন্ত্রণা দিতে চেয়েছিল? শাস্তি দিতে চেয়েছিল? কীসের শাস্তি? দুর্বল ভীরু শুভকে সে তো অনেক আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিল, নিজেই নতুন করে

ধরা দিয়েছিল শুভর কাছে, তাহলে ? তবে কি অপরাধবোধ ? শুধু আদিত্যকে কেন, তাদের গোটা পরিবারকেই প্রতারণা করেছিল ইন্দ্রাণী, সেটাকেই চোখে আঙুল বিঁধিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তনুময়, তাই কি ইন্দ্রাণী আর নড়তে পারল না ? বাজে কথা। এর উল্টোটাই ছিল স্বাভাবিক। তাতে প্রতারণার মাত্রাটা কিছু কম হত। নাকি ইন্দ্রাণী ভয় পেয়েছিল ? আদিত্যকে ছেড়ে চলে যেতে গেলে স্বপক্ষে কিছু যুক্তি সাজাতে হয়। বলতে হয় আদিত্য অকর্মণ্য অপদার্থ, তার সঙ্গে আর বনল না। কিন্তু তনু ফিরে এলে ওই যুক্তিও ফাঁপা হয়ে যেত না কি ?

দুর, এ ভাবনারও কোনও অর্থ হয় না। তনু তার মরাল গার্জেন নয়। তার কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও দায় নেই ইন্দ্রাণীর। কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখেও একা জীবন কাটানোর মতো মনের জোর ইন্দ্রাণীর আছে।

তা হলে সে রয়ে গেল কেন ? কিসের মায়ায় ? কার ওপর টানে ?

পৃথিবীর কোথাও কোনও এক গোপন কোণে পড়ে আছে এক তেজস্ক্রিয় কণা। তার আশ্চর্য বিকিরণে নিঃসাড়ে দগ্ধ হচ্ছে মানুষ। যে দগ্ধ হচ্ছে সে কি নিজেও টের পায় !

আজ শনিবার। টিফিনেই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। স্টাফরুমে ফিরে ইন্দ্রাণী দেখল ঘর প্রায় ফাঁকা। শুধু এক কোণে বসে নিবেদিতা আর শেফালি নিচু গলায় কথা বলছে।

ব্যাগ কাঁধে তুলেও ইন্দ্রাণী চেয়ারে বসল। সকালে কি একবার থানাতেই যাওয়া উচিত ছিল ? কিংবা হাসপাতালে ? যদি কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে থাকে ! মাতাল-দাঁতালরা অবশ্য সহজে গাড়ি চাপা পড়ে না, অন্তত ইন্দ্রাণী শোনেনি। কালকেও কি আকণ্ঠ গিলেছিল লোকটা ? চাঁদু একবার রাতে থানার কথা তুলেছিল বটে, ইন্দ্রাণী বিশেষ গা্য করেনি। কি দরকার, নতুন পাড়ায় দু' দিনের জন্য থাকতে এসে যদি একটা লোকহাসানো কাণ্ড ঘটে যায় ! শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার রাতেও তো...। এখন মনে হচ্ছে চাঁদুকে খোঁজ নিতে বললেই হত। দুম করে স্কুলে বেরিয়ে পড়াটাও আজ বোধহয় ঠিক হয়নি।

কমলিকা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল,— একি, তুমি এখানে ! মাইনে নেবে না ?

—এই যাই।

—তাড়াতাড়ি যাও। শনিবারের ব্যাপার, দেরি করলে কথা শোনাবে।

ইন্দ্রাণী অফিসঘরের দিকে এগোল। ক'মাস ধরে ঠিক দিনে মাইনে হচ্ছে না, প্রতিবারই কোনও না কোনও ফ্যাকড়া বাঁধছে। কখনও ডি আই অফিস থেকে টাকা আসে না, কখনও বা বিলে অবজেকশান পড়ে। এবারও ঘষটে ঘষটে মাসের বারো তারিখ করে দিল। মাঝে এক-দু' বছর বেশ নিয়মিত হচ্ছিল মাইনেটা, আবার যে কী শুরু হল ! মাইনে না পেলে যে ইন্দ্রাণীর হাঁড়ি চড়বে না তা নয়, মাস গেলে হাজার টাকার ওপর সুদ আসে, চাঁদুও আজকাল মোটামুটি ভালই টাকা দেয়, ভাড়ার টাকাও মুস্তাফির কাছ থেকে এসে যায়, তবু নিজের মাইনের টাকা কটা হাতে না আসা পর্যন্ত কেমন নিঃসম্বল লাগে নিজেকে।

অফিস ঘরে এখনও দিব্যি জটলা চলছে। অণিমা আর রেবা রথীনের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। রথীন কি সব বলছে হাত নেড়ে, সবাই মন দিয়ে শুনছে। মনোহরবাবুর হাঁড়িমুখ ভাবটা নেই আজ, বরং বেশ প্রসন্নই। মাইনের দিন বুঝি এমনটাই হয় !

ইন্দ্রাণীকে দেখে রথীন গাল ছড়িয়ে হাসল,—একটু দাঁড়াতে হবে যে দিদিমণি।

ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল,— কতক্ষণ ?

—যতক্ষণ না এই কাজটা সারতে পারি। তারপর এই দিদিমণিরা রয়েছেন।

গল্প করাটাও কাজ ! ইন্দ্রাণী বিরক্তি সামলে মনোহরবাবুর টেবিলে এসে বসল। গলা নামিয়ে বলল,— আপনার ছেলের একটা ভাল খবর শুনছিলাম...

—ভাল মানে মন্দের ভাল। পড়াশুনো তো আর হবে না, ভায়রাভাইকে ধরে সেলস লাইনে ঢুকিয়ে দিলাম। মাইনেপত্র বেশি না, ছোট চাকরি। তাও কোনও একটা কাজে তো এনগেজড

থাকুক।

—তাহলে আপনার বড় চিন্তাটা ঘুচল ?

—মনে তো হয়। দেখি। আবার মতি বিগড়োতে কতক্ষণ! ক'দিন অবশ্য খুব ব্রিফকেস নিয়ে বেরোচ্ছে, ফিরছে সেই রাতে। মুখ চোখও এখন অনেক ঝকঝকে। দেখা যাক, যদি এ-ভাবেই কেরিয়ার করে নিতে পারে। এখন তো বেচনেঅলাদেরই যুগ।

অন্যের একটা ভাল খবর শুনলে মন যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায়। মনোহরবাবুকে দেখছিল ইন্দ্রাণী। রামগরুড় লোকটা কী অদ্ভুত বদলে গেছে। এই তৃপ্তিটুকুর আশাতেই বুঝি মানুষ সংসার গড়ে। হাসি মুখে ইন্দ্রাণী বলল,— তাহলে একদিন মিষ্টি খাওয়ান।

—নিশ্চয়ই খাওয়াব। কবে খাবেন বলেন।

রথীন টাকা গোনা থামিয়ে টিপ্পনী ছুঁড়ল,— বড়বাবুরটা পরে হবে দিদিমণি। আপনি কবে আমাদের মাংসভাত খাওয়াচ্ছেন ?

অণিমা প্রায় নেচে উঠল,— ঠিকই তো, ঠিকই তো। তোরই আগে খাওয়ানো উচিত। ছেলে বিদেশ থেকে ডলার পাঠাচ্ছে...

—শুধু কি ছেলের ডলার! রেবা চোখ ঘোরাল,— প্রোমোটার ফ্ল্যাট বানিয়ে দিচ্ছে না ? তারপর ধরো ইন্দ্রাণীদির দেওর তো এখন উত্তমকুমার।

—সত্যি ইন্দ্রাণী, তোর এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি।

ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হাসল। বৃহস্পতি, কি শনি, বাইরের লোক কি বুঝবে! তবে শনিও চড়চড়িয়ে সমৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয়, বাপ্পার ডলার তো এখনই টাকা হয়ে বাপ্পার অ্যাকাউন্টে জমতে শুরু করেছে। শেষ চিঠিতেও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ফর্ম পাঠাতে বলেছে বাপ্পা। যাতে দরকার মতো ইন্দ্রাণী টাকা তুলতে পারে। ছেলের চিঠির উত্তর দিয়েছে ইন্দ্রাণী, ফর্ম পাঠায়নি। বাপ্পার যে উগ্র আত্মসর্বস্ব রূপ দেখেছে, মনে হয়েছে তার টাকাতে হাত না দেওয়াই ভাল। হয়তো হাত পুড়ে যাবে। এই যে চিন্তা ঘোরে মাথায়, এ কার মহিমায় ? বৃহস্পতি, না শনির ?

ইন্দ্রাণী স্মিত মুখে বলল,— খাওয়াব তো বটেই। কিন্তু এখন না।

—কবে ? কবে ?

—নতুন ফ্ল্যাটে আগে যাই, তারপর।

—সে তো ঢের দেরি। এক দু-বছর লেগে যাবে।

—তোমার ছেলে এর মধ্যে আসবে না ? সে এলে খাওয়াও।

ইন্দ্রাণী মনে মনে হিসেব করল। আট মাসের আগে জাহাজ থেকে ছুটি পাবে না বাপ্পা, তার মানে সেই জানুয়ারির শেষ। আলগাভাবে বলল,— তাই হবে। ফিরুক তো ছেলে।

—দেখো, ফাঁকি দেওয়ার মতলব কোরো না যেন।

রাস্তায় ঝাঁঝাঁ রোদ। বড় বড় সাইজের সাদা মেঘ হেলে দুলে হাঁটছে আকাশে। হাওয়া নেই, চিটচিটে গরম। দু' পা চললেই ঘামে শরীর জবজবে হয়ে যায়। সেলিমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে বাড়ি এখন অনেকটাই পথ, অন্য দিন হেঁটে ফেরে ইন্দ্রাণী, আজ রিকশা নিয়ে নিল। বেল বাজানোর আগে সন্দিগ্ধ বুকে আঁচ করার চেষ্টা করল, ফিরেছে কি লোকটা!

সন্ধ্যার মা দরজা খুলেছে। এ বাড়ি থেকে তার গোবিন্দপুর বস্তি বেশ দূর, দুপুরে তাই আর বাড়ি ফেরে না, রুটিটুটি সেরে একেবারে সন্ধেবেলা চলে যায়। একদিক থেকে ভালই হয়েছে, বাড়িটা পাহারায় থাকে।

ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করার আগেই সন্ধ্যার মা বলে উঠল,— বড়দা এসে গেছে।

খবরটাতে ইন্দ্রাণীর স্বস্তি পাওয়ার কথা। পেলও। মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে অসংখ্য প্রশ্ন

বিজবিজ করে উঠেছে মাথায়। আদিত্য রাতে ফেরেনি এ কথা সন্ধ্যার মা কার কাছে শুনল ? ইন্দ্রাণী যখন স্কুলে বেরোয় তখনও তো সন্ধ্যার মা আসেনি ! তিতির, চাঁদু কি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ? সন্ধ্যার মা'র সামনে একটু সতর্ক থাকা উচিত। রাজ্যের কাজের মেয়েদের সঙ্গে সন্ধ্যার-মা'র ভাব। কাকে কি বলবে, পাড়ায় কি রটে যাবে তার ঠিক আছে !

গ্রিলের গেট পেরিয়ে বারান্দায় উঠল ইন্দ্রাণী। আলগোছে প্রশ্ন করল,— কটায় ফিরল ?

—এই ধরো গিয়ে আটটায়। ছোড়দা তখন চা খাচ্ছিল।

—কোথায় এখন ? আবার খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেছে ?

—না না, এসে ইস্তকই তো শোওয়া। দিদিমণি বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তো ঘুমোচ্ছেন।

তিতিরের আজ পরীক্ষা নেই। কোন বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কথা, একসঙ্গে ক'জন মিলে পড়াশুনো করবে। সেখানেই খাবেদাবে, ফিরবে বিকেলে। পরীক্ষার মাঝে এ-সব যে কী ঢঙ-এর পড়া ! ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল,— দিদিমণি কটায় বেরোল ?

—এই তো খানিক আগে। সন্ধ্যার মা গলা নামিয়েছে, মেয়ের সঙ্গে বাপের আজ জোর ঝগড়া হয়েছে। রাগ করে দিদিমণি খেয়ে বেরোয়নি।

ইন্দ্রাণী কথা বাড়াল না। সোজা আদিত্যর ঘরে ঢুকেছে। চিত হয়ে শুয়ে গাঁক গাঁক নাক ডাকাচ্ছে লোকটা। পরনে এখনও কালকের পোশাক। গোড়ালিতে কাদার দাগ, শুকনো।

পিত্তি জ্বলে গেল ইন্দ্রাণীর। দুহাতে ঠেলল আদিত্যকে,— এই যে, ওঠো ওঠো।

আদিত্য একটা হাই তুলে পাশ ফিরল, হাঁটু নেড়ে নেড়ে পাশবালিশ খুঁজছে।

—কী হল কি, উঠতে বলছি না !

আদিত্য জড়ানো গলায় কি যেন শব্দ করল। আবার নাক ডাকছে। বিরক্ত মুখে হাল ছেড়ে দিল ইন্দ্রাণী। ঘরে ফিরে খানিকক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল পাখার তলায়, তারপর শাড়ি বদলে বাথরুম।

এ বাড়িতে স্নানের ঘরটা বড্ড ছোট, হাত ছড়ালে দেওয়ালে হাত ঠেকে যায়। শাওয়ার একটা লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িঅলা, কিন্তু সেটা চালালে রড়ে ঝোলানো তোয়ালে শাড়ি জামা ভিজে সপসপে হয়ে যায়। কলের তলায় বালতি বসিয়ে হড়াস হড়াস গায়ে জল ঢালল ইন্দ্রাণী। শরীর জুড়োল না। কলের তলায় মাথা রেখে জল থুপল মাথায়, তবু আগুন নেভে না। চেপে চেপে গা হাত পা মুছল, তবু যেন দেহ শুকোয় না।

একাই খেতে বসেছে ইন্দ্রাণী, কন্দর্প ফিরল। হাত ধুয়ে বসে গেছে ইন্দ্রাণীর পাশে,— বস কি এখনও ঘুমের সিন দিচ্ছে ?

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যার মাকে একবার দেখে নিল ইন্দ্রাণী। চাপা কঠিন স্বরে বলল,— তোমার মজা লাগছে মনে হচ্ছে !

কন্দর্পর উচ্ছ্বাস যেন ঈষৎ কমল। তবু লঘু ভাবেই বলল,— যাই বলো, বড় সাহেবের কিন্তু গাটস আছে। সারা রাত আমাদের ঘুম চটকে দিয়ে কেমন নাক বাজিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। তোমার মতো কেউ ঘরে থাকলে আমি তো বাপু এসেই খাটের তলায় ঢুকে বসে থাকতাম।

ইন্দ্রাণী শীতল চোখে তাকাল,— বাবু রাত্তিরে ছিলেন কোথায় ?

—রঘুবীর চাটুজ্যের প্রাসাদে। সেখানে খুব টানুস-টুনুস হয়েছে।

—বলল ?

—বলে কি আর। তিতির টেনে পেট থেকে বার করল। দেখেও বোঝা যাচ্ছিল। চোখ একেবারে জবাকুসুমসঙ্কাশ...

—তুমি কিছু বলনি ?

—বাপ্‌স, তোমার মেয়ে একাই যা ঝাড় দিল ! তিতির আমাদের আর মুখচোরাটি নেই, বেশ প্যাটর প্যাটর শোনাতে পারে।

—বাপও শুনলাম খুব ঝগড়া করছিল ?

—ঝগড়া ঠিক নয়। ডিফেন্স নিচ্ছিল।

—কী ডিফেন্স?

—আমার ভাল লাগে না।... যেখানে খুশি যাব।... তোরা বসে থাকিস কেন?

ইন্দ্রাণীর হাত অন্যমনস্ক, ভাতে ঝোল মাখছে। সন্ধ্যার মাকে ডেকে কন্দর্প আর একটু আলুভাজা নিল। খেতে খেতে বলল,— আমার কি মনে হয় জানো বউদি, বড়সাহেবের অ্যান্টেনাটা বোধহয় আবার লুজ হয়ে গেছে।

—কচু হয়েছে। মাঝে কটা মাস বেশ ছেড়েছুড়ে ছিল, ভাল ছিল। এখন আবার নেশাড়ু হওয়ার বাহানা খুঁজছে।

—না বউদি, এবার কেসটা ঠিক জলবৎ নয়। কন্দর্প হঠাৎ সিরিয়াস, —জানো, দাদা আজকাল কি সব কাণ্ডকারখানা করছে! আমাদের বাড়িটা ভাঙা চলছে, ওখানে গিয়ে সারাদিন...

কন্দর্প সবই খুলে বলল। ইন্দ্রাণী শুনল মন দিয়ে। একটু যেন ছায়াও ঘনাল মুখে। কাল সকলকেই বদলায়, লোকটাই চিরকাল এক রয়ে গেল। নিজেই নিজের মধ্যে দুঃখ রচনা করে, শোক পালে পোষে, নিজেরই সৃষ্টি করা বৃত্তে অবিরল ঘুরপাক খায়। অন্য কারুর মনে কী চলছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

কন্দর্প দু-এক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল,— দাদাকে কি একবার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবে?

—হবেটা কী? এ সব কি আর নতুন? ইন্দ্রাণী উঠে বেসিনে গেল,— মা চলে গেলেন, অন্ন জল ত্যাগ করল। বাবা মারা গেলেন, দেওয়ালে মাথা ঠুকল। অথচ তাঁরা বেঁচে থাকতে তাঁদের দগ্ধে দগ্ধে মেরেছে। ওসব যখন সামলেছে, এটাও সামলে যাবে। সবেতেই ওভার রিঅ্যাক্ট করা ওর স্বভাব।

—তবু একবার দেখিয়ে নিলে পারতে।

ইন্দ্রাণী উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে এল। অতই যদি দাদাকে নিয়ে ভাবনা, নিজেরা একটু দায় ঘাড়ে নাও না! ডাক্তার দেখালে যদি কিছু উপকার হয়, ইন্দ্রাণী তো বেঁচে যায়। তবে ইন্দ্রাণী আর যেচে ওই মানুষের বোঝা ঘাড়ে নেবে না। অনেক হয়েছে, অনেক শিক্ষা হয়েছে। ওই লোকের মুখ চেয়ে চাকরি সংসার সামলে প্রেসের জোয়ালটা পর্যন্ত কাঁধে তুলেছিল, তাতেই বা কী লাভ হয়েছে! নিজের শোক কেটে যাওয়ার পর ওই লোকই প্রেস বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। বাড়ি ভাঙা নিয়েও যথেষ্ট বুঝিয়েছে ইন্দ্রাণী, তার পরও উনি যদি ঘোরে ডুবে যান, ইন্দ্রাণীর কি করণীয় আছে! আর নয়, আর নয়। এবার ওই মানুষটা মরুক পচুক গলুক হেজে যাক, ইন্দ্রাণী আর ফিরেই তাকাবে না।

কন্দর্প পর্দার ওপাশ থেকে ডাকছে,— শুয়ে পড়লে?

—না। এসো।

—তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

—বলো।

কন্দর্প ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইল। একবার খাটে গিয়ে বসল; আবার উঠে পড়ল।

ইন্দ্রাণী অধৈর্যভাবে বলল,— কী বলবে বলো।

কন্দর্প চুলে হাত বোলাল,— আমি একটা গাড়ি কিনছি বউদি। নতুন না, সেকেন্ড হ্যান্ড।

—ভাল। তোমার কাজকর্মে সুবিধে হবে।

—শুধু ভাল বলছ কেন? উইক এন্ডে আমরা বেড়াতে যেতে পারি।

—হুঁ। ইন্দ্রাণী হাই তুলল। আলগোছে একটা বালিশ ফেলল বিছানায়।

কন্দর্প তাও দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে কি যেন।

ইন্দ্রাণী বলল,— আর কিছু বলবে?

—না থাক, পরে বলব। দরজায় গিয়ে তিলেক দাঁড়াল কন্দর্প।

—হেঁয়ালি করছ কেন ? কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো। আমি এবার শোব। ঘুম পাচ্ছে।

কন্দর্পর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি,— থাক গে। তোমার আজ মনমেজাজ ভাল নেই। পরেই শুনো। ... আমি বেরোচ্ছি।

কন্দর্প চলে গেল। তার আচরণের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না ইন্দ্রাণী। কি বলতে চাইছিল ? গাড়ি কেনার কথাটা তো ভূমিকা, অন্য কী কথা ছিল ? মরুক গে যাক।

এতাল বেতাল ভাবতে ভাবতে কখন চোখ জড়িয়ে এসেছিল, ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার মা'র ডাকে,— চা খাবে না বউদি ?

চোখ কচলে উঠে বসল ইন্দ্রাণী। হাত বাড়িয়ে কাপ নিল। কান পেতে এক সেকেন্ড শোনার চেষ্টা করল পাশের ঘরে এখনও নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে কিনা। বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল,— বড়দা উঠেছিল ? খেয়েছে ?

—ওমা, কখন। উনি তো চ্যান করে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

চড়াং করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ইন্দ্রাণীর,— তুমি আমায় ডাকলে না কেন ?

সন্ধ্যার মা অবাক চোখে তাকাল। যেন এমন অদ্ভুত কথা সে সাতজন্মে শোনেনি। তোতলা স্বরে বলল,— বড়দা বেরোচ্ছে বলে তোমায় ডাকব ?

ইন্দ্রাণী দাঁতে দাঁত ঘষে রাগটা সামলাল। ভেবেছে কি লোকটা ? এটা চিড়িয়াখানা, না হোটেল ? এ যেন সব সীমা পার হয়ে যেতে চায়। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, প্রায় অপমান করে বেরিয়ে গেল লোকটা ! এত স্পর্ধা !

ডিশে চা ঢেলে তিন চুমুকে কাপ নিঃশেষ করল ইন্দ্রাণী। ক্রূর চোখে পাখাটার দিকে তাকাল। ঘুরছে পাখা, হাওয়া লাগছে না। উঠে গ্রিল বারান্দায় মোড়া নিয়ে বসেছে। অর্থহীন চোখে দেখছে বাইরের পৃথিবী। রাস্তা দিয়ে অবিরাম রিকশা চলেছে, হর্নের শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। বুনো রাগে সেই শব্দও দূরাগত ধ্বনির মতো লাগছিল ইন্দ্রাণীর। উল্টো দিকেই একটা ল্যাম্পপোস্ট, তার নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তিনটে ছেলে। তাদেরকেও যেন বিন্দুর মতো লাগে। যেন বায়নোকুলার উল্টে দেখছে ইন্দ্রাণী। পোকা মাকড়ের মতো হাঁটছে মানুষ। চলমান ফুটকিতে ভরে আছে রেখার মতো রাস্তা। আকাশে ক্লান্তির ছাপ, দিন বুঝি ফুরিয়ে এল।

সংবিৎ ফিরল তিতিরকে দেখে। গ্রিল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে। খোলা চুল উমনো ঝুমনো, মুখে কালচিটে ভাব, কুঁচকে আছে ভুরু।

—কী হল, দরজাটা খোলো না। বাথরুম পেয়েছে।

ইন্দ্রাণী উঠে দরজা খুলতেই সাঁ করে তিতির অন্দরে ঢুকে গেছে। দু মিনিটে বেরিয়ে এল। আরও দ্রুত পায়ে,— বাবা নেই ?

ইন্দ্রাণী ঘুরে তাকাল। মেয়ের চোখে যত না বিস্ময়, তার থেকে বেশি ঝাঁঝ। তীক্ষ্ণ স্বরে ইন্দ্রাণী বলল,— আছে কিনা দেখতে পাচ্ছিস না ?

—বেরিয়ে গেল ? তিতির যেন কৈফিয়ত চাইছে, বারণ করতে পারলে না ? আটকালে না ?

—তোর বাবা কি শিশু, যে বেঁধে রাখব !

—জানো বাবার কী শরীর খারাপ ? মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমার কাছ থেকে ট্যাবলেট নিয়ে খেল ?

এর সঙ্গে নাকি ঝগড়া হয়েছে ! যত সব ন্যাকামো কথা ! ইন্দ্রাণী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,— নিকুচি করেছে অমন শরীর খারাপের।

—সে তো তুমি বলবেই। আমি কি তোমাকে চিনি না !

—কী বললি তুই ? কী বললি ?

—ঠিকই বলেছি। তুমি চাও বাবা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরুক। বাবা বাড়ি ফিরবে কেন ? কী আছে এই বাড়িতে ?

—ফেরার দরকার নেই। নর্দমায় পড়ে থাক। মুদ্দোফরাশে টেনে নিয়ে যাক।

—বটেই তো। তবেই না তোমার...

সহসা তিতির থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন চারপাশের সব আওয়াজও ঝুপ করে থেমে গেছে। অনন্ত এক নৈঃশব্দ্যের পাথর পিষে ফেলছে সমস্ত কোলাহল। রাস্তার আলোরা জ্বলে উঠছে দ্যুতিহীন। এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে গেল!

৬৯

রামনগরে আজ রই রই কাণ্ড। কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হয়েছে ফুটবল মাঠে। মাঠের ঠিক মধ্যিখানে বানানো হয়েছে এক বিশাল মঞ্চ, চতুর্দিক মাইকে মাইকে ছয়লাপ। গোটা মঞ্চ মোড়া হয়েছে গেরুয়া সবুজ কাপড়ে, পাশেই জ্বল জ্বল করছে প্রকাণ্ড এক পদ্মফুল। পিচবোর্ডের। এমন সভা এ-অঞ্চলের মানুষ আগে কখনও দেখেনি। দিল্লি কলকাতা থেকে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে বসে আছেন দু-তিনটি সাধু। গেরুয়া বসন পরা এক মুণ্ডিত মস্তক মহিলা হিন্দিতে বক্তৃতা করছেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়টিও ভারী অভিনব। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যায় সাড়ে চারশো বছরেরও আগে হানা দিয়েছিল এক মুসলমান বাদশা, ঠিক যে জায়গাটিতে রামচন্দ্র জন্মেছিলেন সেইখানে নাকি এক মসজিদ বানিয়ে ছিলেন তিনি, সেই বিধর্মীর মসজিদ ধ্বংস করে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠাই সন্ন্যাসিনীর অভিলাষ। জনসমুদ্র মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা। দু-চার জন বয়স্ক মানুষ কানাকানি করছেন, সতেরো বছর আগে একবার দেশের প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন তারকেশ্বরে, তার পরে হুগলি জেলার আর কোনও মিটিংয়েই এত জনসমাগম দেখা যায়নি। একই মঞ্চে দেশনেতা আর সাধুদের দেখার অভিজ্ঞতাও এ অঞ্চলে এই প্রথম।

তুফানও গেঁথে আছে মিটিংএ। শেষ দুপুরে মনোরমার জন্য একটা হটওয়াটার ব্যাগ কিনতে এসেছিল রামনগরে, ফিরতে পারেনি, কৌতূহলে থেকে গেছে। রাজনৈতিক দলের মিটিং-এ সে বড় একটা যায় না, ভোটের মিটিং-এও না। আজ তারও নট নড়ন চড়ন দশা।

শিবসুন্দর বাড়িতে বসে ছটফট করছিলেন। ঘড়ি দেখছিলেন ঘন ঘন। বিকেল বিকেল দুধগঞ্জ থেকে ঘুরে আসতে পারলে হত। পরশু হরি গুছাইতের বাড়ি কলে গিয়েছিলেন, হরির ছেলেটার জ্বর ছাড়ছে না কিছুতেই। রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিল, ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি। কাঁপুনি-টাপুনিও দিচ্ছে না বিশেষ। তবু শিবসুন্দরের সন্দেহ যায়নি। তাঁর ধারণা ওটা ম্যালেরিয়াই, রক্তে নিশ্চয়ই ফ্যালসিপেরাম আছে, খুব হাই টেম্পারেচারে রক্ত পরীক্ষা না করালে রোগ ধরা যাবে না। তেমনভাবে কি রক্ত পরীক্ষা করা যায় এই গ্রামদেশে! তারকেশ্বরেও কি হয়! এই ম্যালেরিয়াটার প্রাদুর্ভাব কম, তবে ইদানীং দু-চারটে কেসের কথা পড়ছেন কাগজে। রোগটা প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল। মনে পড়ে এই রুগী তিনি শেষ পেয়েছিলেন মালদা জেলায়, হবিবপুরে। অসুখটা একেবারে শক্তি নিঃশেষ করে দেয়, ব্রেন অ্যাটাক করে, চিকিৎসার সামান্য দেরি হলে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। ব্লাড রিপোর্ট অগ্রাহ্য করেই হরির ছেলেকে পরিমাণ মতো কুইনিন দিয়েছেন শিবসুন্দর। আজও যদি জ্বর না ধরে তবে জলদি জলদি বাচ্চাটাকে কলকাতা পাঠাতে হবে।

দাওয়ায় সাইকেল রাখা আছে। চেন দিয়ে আটকানো। উঠোনে খেলা করছে টুকি, অপরাজিতার লতা থেকে ফুল ছিঁড়ে ছড়াচ্ছে। শিবসুন্দর ডাকলেন,— টুকি, অ্যাই টুকি...

টুকি দৌড়ে এল,— কি দাদু?

—তোর মা কোথায় গেল?

—মা তো পুকুরপাড়ে। হাঁসেদের ঘর ধুচ্ছে। ডাকব?

এক পলক থমকালেন শিবসুন্দর। মাত্র তিন দিনের মড়কে সব কটা হাঁস মরে গেছে, অলকার ক'দিন ধরে তাই খুব মন খারাপ। আজ আবার খাঁচা পরিষ্কার করতে বসল কেন ? আবার পুষবে হাঁস ! উঁহু, শিবসুন্দর তা আর হতে দেবেন না। এক সময়ে ভাবতেন মৃত্যু দেখে দেখে বুঝি তাঁর হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। চোখের সামনে অবলা জীবগুলোর ওই অসহায় মৃত্যু প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি ভুল। এখনও মৃত্যু তাঁকে আহত করে।

শিবসুন্দর বললেন,— ডাকতে হবে না। মাকে জিজ্ঞেস করে আয় সাইকেলের চাবিটা কোথায়।

টুকির পিছু পিছু অলকা এসেছে,— সাইকেল দিয়ে আপনার কী হবে বাবা ?

—তুফান তো এখনও ফিরল না, ভাবছি একবার দুধগঞ্জ থেকে ঘুরে আসি।

—অতটা পথ আপনি সাইকেলে যাবেন ! একা ! আপনার ছেলে আপনাকে একা সাইকেল নিয়ে বেরোতে বারণ করেছে না !

—তুফান বারণ করেছে, না তুমি তুফানকে উসকেছ ?

অলকার দুঃখ-মাখা মুখখানায় হাসি ফুটল,— ধরুন তাই। টুকির বাবা ফিরুক না।

—এ কিন্তু খুব অন্যায়। অন্য দিকে এখন কল এসে গেলে আমার আর দুধগঞ্জ যাওয়া হবে ?

—ওমা, কল নেই ! তবু যাবেন ! কেন ?

—প্রয়োজন আছে। শিবসুন্দর ঈষৎ গম্ভীর।

—থাকুক। সন্ধে নামছে, এখন আমি আপনাকে একা একা বেরোতে দেবই না।

—এই করে করে তোমরা কিন্তু আমাকে অথর্ব করে দিচ্ছ।

—অমন করছেন কেন বাবা ? ও এক্ষুনি এসে যাবে।

শিবসুন্দর ক্ষুব্ধ হতে গিয়েও হেসে ফেললেন। অলকা তুফান আজকাল বড় বেশি নিষেধের বেড়াজাল তৈরি করেছে। সকালে সাড়ে এগারোটা বাজলেই চেম্বারের দরজায় অলকার গলা খাঁকারি শুরু হয়, বিকেলে কিছুতেই তুফান দুটোর বেশি কলে যেতে দেয় না, সকাল বিকেল হাঁটতে বেরোলেও এঁটুলির মতো লেগে থাকে তুফান, তারকেশ্বরে ছুটছাট যাওয়াটাও এদের চেঁচামিচিতে বন্ধ হয়ে গেল। সব সময়ে ভাল লাগে না, আবার হঠাৎ হঠাৎ কেন কে জানে চলকেও ওঠে মনটা। এই নিষেধগুলোর জন্যই বুঝি এতদিন পিপাসিত ছিল হৃদয়। কতকাল যে তাঁকে শাসন করার কেউ নেই !

এক পা এক পা করে শিবসুন্দর গেটের বাইরে এলেন। হাঁটছেন ধীর পায়ে। আমগাছের ওপারে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। অপূর্ব এক রঙিন আলো ঠিকরোচ্ছে দিগন্তে। দূরের সাঁকো কমলা আলো মেখে কাঁপছে তিরতির। পুবের আকাশ প্রায় বর্ণহীন। এক শীতল চাঁদ ছায়ার মতো লেপটে আছে তার গায়ে। পৃথিবীতে শব্দ উঠছে খুব। মধুর শব্দ। পাখিরা নীড়ে ফিরছে।

খানিকটা পথ এগিয়ে শিবসুন্দর ফিরে তাকালেন। বাড়ির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শিহরন খেলে গেছে শরীরে, ধমনীতে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। আলো-ছায়া মাখা দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন মনোরমা। মনোরমা, না খড়ের প্রতিমা ! বিশুষ্ক ওই শীর্ণ মুখের আভাস, স্থির অবয়ব, কৌণিক আলো-পড়া ছায়া-মাখা ওই বারান্দা, গারদের মতো সার সার রেলিং-এর শিক—যেন এক অলৌকিক স্থির চিত্র। প্রকৃতির রূপ দেখে কি এই মুহূর্তে কোনও বোধ জাগছে মনোরমার ? মস্তিষ্কের কোনও কোষ কি চঞ্চল হল ?

অসম্ভব। ছোট্ট শ্বাস ফেললেন শিবসুন্দর। এমনটি ঘটে না। তাও তো অনেকটাই উন্নতি হয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টা আর শুইয়ে রাখতে হচ্ছে না। সকাল বিকেল নিয়ম করে বারান্দায় এনে বসানো হয়, বসেও থাকে মনো। একদিন অলকা হাঁটানোর চেষ্টাও করেছিল, খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি। বছর দুয়েক আগেও দিব্যি হাঁটালে হাঁটত, দোতলা ওঠার আগের কমাস তো ধরে ধরে বাইরেও নিয়ে গেছেন শিবসুন্দর। আর কি পারবে ? সব পেশিই তো শিথিল এখন। যতদিন বাঁচে, এই দশাটুকুই বা মন্দ কি ! মনোরমা না পৃথিবী দেখুক, পৃথিবী অন্তত দেখুক মনোকে।

মনোরমার বাঁচা মরা নিয়ে আর ভাবতে ইচ্ছে করে না শিবসুন্দরের, তবু ভাবনাটা এসেই যায়। আরেকটা ভাবনাও ইদানীং টোকা দিচ্ছে শিবসুন্দরকে। টোটো এসে এবার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে চিন্তাটা।

ছেলেটা বলছিল,— দাদু, তুমি তো ঠাকুমার এত যত্ন করো, তুমি না থাকলে ঠাকুমার কী হবে?

শিবসুন্দর প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি। বলেছিলেন,— সে তো আমি কত সময় থাকিই না। তোর কাকা কাকিমা সামলায়।

—*ঠিক* তেমন নয়। টাচ উড, ধরো তোমার যদি কিছু একটা হয়ে যায়?

শিবসুন্দর হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়েছিলেন,— হুম, এটা একটা প্রবলেম বটে। তোর বাবা মা কাকা কাকিমা কেউ দেখবে না বলছিস?

—হু ক্যান অ্যাশিওর? আর তোমার মতন করে কেনই বা দেখবে? সকলেরই তো ইনডিভিজুয়াল লাইফ আছে।

কথাটা এখনও শিবসুন্দরের কানে বাজে। মানুষের ইনডিভিজুয়াল লাইফের গণ্ডি কতটুকুনি, যার মধ্যে চিররুগণ মা'ও পড়ে না! ছেলেরা তাঁর অবর্তমানে মনোরমাকে দেখবে কিনা এ নিয়ে টোটোর সংশয়ই বা এল কোত্থেকে! এ কি আত্মকেন্দ্রিক সংসারে বাস করার পরিণাম! তা হলে বৃদ্ধ বয়সে শুভ ছন্দার কি হবে! অলকা তুফানও কি একই গোত্রে পড়ে! এমনও তো হতে পারে ওরা তেমন নয়, তবু যদি কখনও কোনও মুহূর্তে মনে হয় তারা কলুর বলদের মতো অন্যের ঘানি পিষছে! অধিকার না থাকলে প্রিয়জনের কাজও তো বেগার খাটা মনে হতে পারে!

যদি হয়! যদি হয়!

ক'দিন ধরেই মনে কথাটা নাড়াচাড়া করছিলেন শিবসুন্দর। দিন পনেরো আগে শুভ এল। একাই। একবেলার জন্য। সেদিন দুপুরে খেতে বসে শিবসুন্দর হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন,— শুভ, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। একটা উইল করে ফেললে কেমন হয়?

শুভ অবাক হয়ে তাকিয়েছিল,— কেন বাবা?

—এমনিই। ভাবছিলাম তোর তো অনেক আছে, এই বাড়িটা বরং তুফানের নামে লিখে দিই।

তুফান হাঁ হাঁ করে উঠেছিল,— কক্ষনও না, কক্ষনও না। দাদা থাকতে আমার নামে কেন করবে?

—তুই চুপ কর। থাকবি তো তোরা, তোর দাদা তো আর থাকতে আসবে না।

—তা হলে তুমি মা'র নামে উইল করে দিয়ে যাও। নয়তো উইল ফুইল করতে হবে না, আমি আর দাদা বুঝে নেব।

শুভর মুখ যেন পলকের জন্য পাংশু। তারপর হেসে বলেছিল,— গাধার মতো কথা বলিস না। বাবা ঠিক কথাই বলেছে। যে বসবাস করে, বাড়িঘর তার নামেই থাকা উচিত। তোর নামে জমি বাড়ি থাকলে আমরা বেড়াতে এলে তুই কি আমাদের ঢুকতে দিবি না?

কথাটা কি শুভ খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছিল! শুভর কথাটা কি শিবসুন্দরকেও বিঁধেছিল একটু! ছেলে সত্যিই উত্তরাধিকার চায় না! তাঁর কিছুই চায় না ছেলে!

টিকটিক শব্দ হচ্ছে মোপেডের, ফিরছে তুফান। পিছনের সিটে বিপুল, নতুন পাড়ায় থাকে। মোড়ের সদ্য-বসানো টিউবওয়েলটার কাছে নেমে গেল।

শিবসুন্দর গোমড়া মুখে গেটে ফিরে এলেন,— আড্ডা শেষ হল?

—আড্ডা কোথায়, আমি মিটিং শুনছিলাম। কী জগঝম্প ব্যাপার গো বাবা।

—থাম। হরির বাড়ি যেতে হবে সে খেয়াল আছে?

—হরিদার ছেলে ভাল আছে। তোমার কুইনিন খেয়ে কোঁ কোঁ করছে, কিন্তু কাল রাত থেকে আর জ্বরটা নেই। তুফান মোপেডটাকে সামনের উঠোনে দাঁড় করাল। স্ট্যান্ডে তুলছে, মিটিং শুনতে হরিদাও এসেছিল।

—তবু আমার একবার তো যাওয়া উচিত।

—যেয়ো। কাল বিকেলে নিয়ে যাব। তুফান হাত ঝাড়ছে,— খুব মিস করলে বাবা।

—জীবনে তো অনেক কিছুই মিস করলাম। তোদের যাত্রা থিয়েটার সিনেমা টিভি। না হয় একটা মিটিংও মিস হল।

—ঠাট্টা করছ ? আজ গেলে অনেক খাঁটি কথা শুনতে পেতে। এমন কথা এত স্পষ্টভাবে আর কোনও পলিটিকাল পার্টি বলে না।

—পলিটিকাল পার্টিরা তো স্পষ্ট কথাই বলে রে। শুধু কাজগুলোই ধোঁয়াটে হয়, এই যা। সিঁড়িতে বসলেন শিবসুন্দর,— তা কী বলল তোর স্পষ্টবক্তারা ?

—সে অনেক কথা। বলছি। বলেই গলা চড়াল তুফান,— অলকা, অলকা, একটু চা দিয়ে যাও না। বাবা, তুমি চা খাবে ?

সিগারেট ছাড়ার পর থেকে চা খাওয়ার তৃষ্ণা বেড়েছে শিবসুন্দরের। বিকেলের দিকে জিভ বড় শুলোয়, মাথা ভার হয়ে থাকে। বললেন,— একটু আগে খেয়েছি এক কাপ। আবার হলে মন্দ হয় না।

—বাবাকেও দিয়ো। হুকুম ছুঁড়ে জমিয়ে বসল তুফান, ওই যে রামের জন্মস্থানে হিন্দুদের মন্দির ভেঙে বাবর একটা মসজিদ বানিয়েছিল না, তাই নিয়েই বলছিল। এক সন্ন্যাসিনী এসেছিলেন, কি যেন নাম...

—দাঁড়া দাঁড়া। ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। মন্দির ভেঙে মসজিদ বানানো হয়েছে কে বলল ?

—সবাই জানে। বাচ্চা কাচ্চারাও জানে। উনিও তো বলছিলেন।

—সবাই বললেই কি সত্যি হয়ে যায়। এক সময়ে তো লোকে বলত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, কথাটা কি সত্যি ? তুই আমার কাছে মানুষ হয়েও এই কথা বলছিস !

তুফান কপাল কুঁচকোল,— তুমি বলতে চাও মুসলমানরা হিন্দুদের মন্দির ভাঙেনি ?

—এ কথা তো আমি বলিনি। ভাঙতেও পারে। যারা যখন রাজা হয় তারা অনেক সময়েই অন্যের ধর্মস্থান ভেঙে দেয়। হিন্দুরা বৌদ্ধদের ভেঙেছে, বৌদ্ধরা হিন্দুদের ভেঙেছে, ক্রিশ্চানরা মুসলমানদের ভেঙেছে, মুসলমানরা ক্রিশ্চানদের ভেঙেছে...। এখন তো শুনি তিরুপতি জগন্নাথ মন্দিরও নাকি বৌদ্ধদের ধর্মস্থান ছিল। অতীতে কে কি ন্যায় অন্যায় করেছিল, কি করেনি, তার ওপরে এখনকার পৃথিবী চলবে ? তা ছাড়া অযোধ্যা তো ছিল বৌদ্ধদের পুণ্যভূমি, সেখানে এখন শুনি শয়ে শয়ে মন্দির, সেগুলো গজালো কোত্থেকে ? তারপর ধর, ওই অযোধ্যাতে তুলসীদাস থাকতেন, যিনি রামচরিতমানস লিখেছেন, তিনিও তো ওই সিক্সটিনথ সেনচুরির লোক ? কই, তিনি তো কোথাও মন্দির ভেঙে মসজিদ হয়েছে এই গপ্পো ফাঁদেননি !

তুফান একটু যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। শিবসুন্দর তর্ক করেন কম, কিন্তু করলে তাঁর যুক্তির কাছে তুফান প্রায়শই অসহায় হয়ে যায়। হাঁকপাঁক করে বলে উঠল,— উনি শুধু মন্দির মসজিদের কথাই বলছিলেন না। আরও অনেক কথা বলছিলেন।

—যেমন ?

—যেমন ধরো, মুসলমানরা এ দেশটাকে নিজের দেশ ভাবে না। এখানেই খাবে দাবে, ওদিকে পাকিস্তানের গুণ গাইবে।

শিবসুন্দর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন,— তুই বলতে চাইছিস ইয়াসিন মঈদুলরা দিনরাত পাকিস্তানের নাম করে করতাল বাজায় ?

সোমেন সাইকেলে যাচ্ছিল, গেটের সামনে নেমে পড়েছে,— এত হাসির কি হল ডাক্তারবাবু ?

—এই তো দ্যাখো না তুফান কী বলে ! তোমার পার্টির ইয়াসিন মঈদুলরা নাকি দেশকে ভালবাসে না, পাকিস্তান বলতে পাগল।

সোমেন এক ঝলক দেখল তুফানকে। বলল,— আপনি মিটিং-এ গিয়েছিলেন বুঝি ?

—তাইতেই তো এসব বদহজম হয়েছে।

সোমেনও হাসল, তবে তেমন উচ্ছ্বসিতভাবে নয়। বলল,— হওয়ারই কথা। মহিলা জব্বর বক্তৃতা দেন। আমি তো পঞ্চায়েত অফিসে ছিলাম, মাইকের আওয়াজ কানে আসছিল...। তবে বেশির ভাগই অসত্য ভাষণ, বোঝেনই তো লোক জড়ো করার মতলব।

—সে কথাই তো তুফানকে বোঝাতে চাইছি। গরম বক্তৃতা শুনেই নাচিস না।

তরল আঁধার নেমে গেছে। বাইরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে অলকা, চা'ও দিয়ে গেছে। টুকি কোমরে হাত দিয়ে বিজ্ঞের মতো দাঁড়িয়ে আছে সামনে, চোখ গোল গোল করে কথা গিলছে।

দাওয়ার কোণে পা ঝুলিয়ে বসল সোমেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,— তবে কি জানেন ডাক্তারবাবু, এক আধটা কথা সত্যিও বটে। পার্টি অফিসে বলতে পারব না, আপনাকেই বলছি... এই যে ধরুন মুসলমানরা চারটে করে বিয়ে করে, কথায় কথায় তালাক দেয়, খোরপোশ দেয় না...

—এই কথা তুমি বলছ সোমেন! তুমি! শিবসুন্দর এক লহমা হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন, —তোমাদের না কি সব ইজম আছে ? তোমরা না ধর্মই মানো না ? হিন্দু মুসলমান তোমাদের চোখে আলাদা হয় কী করে ?

—হওয়া উচিত নয়। কিন্তু কথাগুলো তো এক দিক দিয়ে সত্যি।

—মোটেই সত্যি নয়। সত্যির রাংতা পরানো মিথ্যে। একটা মুসলমান ছেলে যদি চারটে করে বিয়ে করে তাহলে ওদের সমাজে পুরুষের চার গুণ মেয়ে থাকতে হয়। হয় কি না ? তুমি তো মুসলমান পাড়ায় গিয়ে কাজ করো, তোমার কি মনে হয় ও পাড়ায় একটা পুরুষ পিছু চারটে মেয়ে আছে ? কটা মুসলমান ছেলের একটার বেশি বউ দেখেছ ? আর কটা হিন্দুর তুমি একটার বেশি বউ দেখতে চাও ? আর তালাক ! খোরপোশ ! আমাকে হাসিও না সোমেন। ওই যে তোমাদের হেলথ সেন্টারের নার্স মেয়েটি, মায়া, আমাদের বাড়িতে আসে, ও বলছিল কত যে হিন্দু-বউ ওদের হেলথ সেন্টারে আসে যাদের বর লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে ! তারা তো তালাক শব্দটাও উচ্চারণ করে না, খোরপোশের কথা বলতে গেলে বাঁশপেটা করে, রাস্তার মাঝখানে নিজের বউয়ের কাপড় খুলে নেয়। আসল কথাটা তো বোঝো। পভার্টি। অশিক্ষা। তা কিবা হিন্দুর, কিবা মুসলমানের। আর তার ফায়দা লোটে পলিটিকাল পার্টিরা। ফর এ মাইনর গেইন। ভোট। তার এফেক্টটা কী হয় ? মানুষে মানুষে ঘেন্না বাড়ে। আরও খারাপ কী লাগে জানো ? তোমার মতো শিক্ষিত লোকও ওই সব ধারণা মনে পুষে রাখে। তুমি না ছাত্র পড়াও সোমেন ?

সোমেন যেন সামান্য বিরক্ত হল। তেতো হেসে বলল,— আপনি কোনওদিন সাফার করেননি, আপনি বুঝবেন না। আমার মামার বাড়ির সব আত্মীয়স্বজনকে রাতারাতি ওপার থেকে চলে আসতে হয়েছিল। এক বস্ত্রে। যারা ভুক্তভোগী তারা জানে।

অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেলেন শিবসুন্দর। চোখের সামনে ভেসে উঠছে বহুকাল আগের স্মৃতি। সোমেনের গলায় আবার সেই সুর, যার পরিণাম আজকের মনোরমা। আবার কি ঘরে ঘরে মনোরমা তৈরি হবে ! অথবা আমিনা ! মেহেরুন্নিসা !

শিবসুন্দর হিমেল কণ্ঠে বললেন,— তুমি আমার কতটুকু জানো সোমেন ? ওই যে দোতলায় আমার স্ত্রী চুয়াল্লিশ বছর ধরে সেন্সলেস ভেজিটেবল্ হয়ে পড়ে আছে, তার কারণ তুমি জানো ? ছেচল্লিশের দাঙ্গা। আমার স্ত্রীর দাদা খুন হয়েছে, সারা রাত মৃত্যু ভয়ে কেঁপেছে আমার স্ত্রী, পরদিন সকাল থেকে তার এই দশা। কিন্তু তবু আমি জানি যারা দাঙ্গা করে তারা কোনও ধর্মে বিলঙ্ করে না। আমার বন্ধু নাজিমের বাবাকে পৈতে-কাটা-মারে ছিন্নভিন্ন করা হয়েছিল। তারাও রাতারাতি পালাতে বাধ্য হয়েছিল কলকাতা ছেড়ে। আমি তো ভেবে পাই না, ধর্মের কাজ নাকি ধারণ করা, সেই ধর্ম কেন মারণাস্ত্রের মতো ব্যবহার করা হবে ? মানুষের মধ্যে যে অ্যানিমাল ইনস্টিংক্ট আছে তাকে ধর্মের নামে তাতিয়ে দেওয়া বড় সহজ সোমেন। এই ধর্ম যুক্তি বুদ্ধিকে হত্যা করে। সব জেনেও তোমরা এই ফাঁদে কেন পা দাও ?

—আপনি আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন কেন ? আমি এসবের বিরুদ্ধে। আমার পার্টিও এ সবের বিরুদ্ধে।

—কী জানি কে কার বিরুদ্ধে ! তোমাদের মতো পলিটিকাল পার্টিরাই তো দেখি মানুষকে এক্সাইট করে তাদের দিয়ে খুনোখুনি করায়। তখন তোমরা সব রিজন ভুলে ক্রিশ্চান মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ বনে যাও। শিবসুন্দর শুকনো হাসলেন,— অথচ দুর্বলদের টর্চার করার ব্যাপারে তোমরা কেউই কম না। যে যখন পাওয়ারে থাকে, সেই সিংহ। আর যে পাওয়ারে থাকে না, সে ক্ষমতায় আসার জন্য ভেড়ার পাল জড়ো করে। তোমরা একে বলো গণতন্ত্র, আমি বলি উচ্ছিষ্টতন্ত্র। ক্ষমতায় এলে আমার খাওয়া মাংসের হাড়গোড় তোমায় দেব এই লোভ দেখিয়ে একটা বাক্সকে বাজে কাগজ দিয়ে ভর্তি করো। যে-দেশের মানুষ হাজার বছর পাশাপাশি থেকেও কেউ কাউকে চেনে না, বিশ্বাস করে না, সুযোগ পেলে এ ওকে ছুরি মেরে দেয়, সে দেশের আর কী হবে ! একটা সেকশান থাকবে, যারা চিরকাল লুটেপুটে খাবে। আর তাদের হাত ধরে থাকবে তোমার মতো নেতারা, যারা মুখে এক, কাজে এক, মনে আর এক।

—আপনি কিন্তু আমাকে অপমান করছেন ডাক্তারবাবু। সোমেনের স্বরও চড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়ছে।

শিবসুন্দর গ্রাহ্যই করলেন না। ধমকের সুরে বললেন,— বোসো।

সোমেন বসল না। গোঁয়ারের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

শিবসুন্দর বললেন,— তোমাকে অপমান করার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই। কিন্তু কথাগুলো আমায় বলতেই হচ্ছে। দাঙ্গায় আমার অত বড় একটা ক্ষতি হওয়ার পরও আমি ভেঙে পড়িনি। কারণ, আমার মানুষের ওপর বিশ্বাস ছিল। তোমরা, ইউ পিপল্, আমার সেই বিশ্বাসটুকুও নষ্ট করে দিচ্ছ।

—আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে না ডাক্তারবাবু। আপনি লিমিট ক্রস করে যাচ্ছেন।

—আমি আমার লিমিট জানি সোমেন। কিন্তু তুমি তোমার সীমা জানো না। তুমি কি আমাকে বলতে পারবে ওই যে মায়া বলে মেয়েটা, ওকে যারা ওই রামনগরের হেলাবটতলায় উত্ত্যক্ত করে, তাদের তুমি চেনো না ?

—ওরা আমাদের পার্টির ছেলে নয়।

—বাহ্, এই তো জননেতার মতো কথা। ... তোমাকে তো এই অঞ্চলের লোক মান্যিগন্যি করে, একটা মেয়ে এখানে কাজ করতে এসে অসুবিধেয় পড়ছে, তুমি ইন্টারফিয়ার করবে না কেন ?

এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল তুফান। অল্প অল্প ঘাড় নাড়ল,— আপনাকে কিন্তু অনেক দিন ধরে আমি ছেলেগুলোর কথা বলছি।

—ও মেয়েটাও ভাল না। সোমেন টপ করে বলে উঠল,— হেলথ সেন্টারের নতুন ডাক্তারের সঙ্গে ওর একটা খারাপ সম্পর্ক আছে।

—তুমি যে দেখছি জনসভায় সন্ন্যাসিনী যা বলে গেছেন তার থেকেও সরেস মিথ্যে কথা বলতে পারো হে ! একটা মেয়ের বদনাম করাটা সব থেকে সহজ রাস্তা, তাই না ?

সোমেনের মুখ লাল হয়ে গেল,— আপনাদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভাল, আপনারা তো ওর গুণ গাইবেনই। তাও তো তুফানভাই আর মায়াকে জড়িয়ে যে-কথা উঠেছিল, সে সবে আমরা কান দিইনি।

তুফান স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠল,— কে বলছে এ কথা ? আমি তার জিভ ছিঁড়ে নেব।

শিবসুন্দর হাত তুলে থামালেন তুফানকে। বললেন,— আসল কথাটা তো অন্য সোমেন। মেয়েটাকে কেন তোমরা প্রোটেকশান দিতে চাও না, আমি জানি। পলাশ নামের নতুন ডাক্তার ছেলেটিকেও আমি চিনি। জেম অফ আ বয়। তোমাদের হেলথ সেন্টারে সামান্য খুঁদকুড়ো ওষুধ

আসে, সেটাও চলে যায় রামনগরের মানিকের দোকানে। অন্তত এতকাল যেত। মায়া আর পলাশ এ ব্যাপারটা অনেকটা আটকেছে। মানিক কোন পার্টি করে সোমেন? দিবাকরের ছেলেরা তো গুণ্ডাই, তোমার লোকেরা কি ধোওয়া তুলসী পাতা?

সোমেন দাঁতে ঠোঁট চাপল,— আপনার অভিযোগের সত্যতা আমাকে যাচাই করে দেখতে হবে।

—দেখো। মানিকের দোকানে যখন সন্ধেবেলা আড্ডা মারো, তখন আলোচনা করে দেখো।

সোমেন আর কোনও কথা বলল না। সোজা গিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখেছে,— আপনার কথাগুলো আমার মনে থাকবে ডাক্তারবাবু। আপনি সাতে পাঁচে থাকতে চান না, অন্তত মুখে তাই বলেন। অথচ কাজে দেখা যাচ্ছে আপনি সব ব্যাপারেই বেশি ইন্টারফিয়ার করছেন।

সোমেন কি সতর্কবাণী শুনিয়ে গেল! শিবসুন্দর পায়ে পায়ে দোতলায় উঠছেন। মায়া তাঁকে বিশ্বাস করে যেসব গোপন কথা শুনিয়ে গেছিল, তা উগরে দেওয়া কি ঠিক হল? মেয়েটা এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিল, শুভকে একবার বললেই বন্দোবস্ত হয়ে যেত, কিন্তু তিনি তা হতে দেননি। কেন হতে দেননি সে-কথা মায়াও বুঝেছে। এখন মায়াকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায় না কি? মাস দুয়েক আগে কালিয়ার বিলে এক স্কুল মিস্ট্রেসের লাশ ভেসে উঠেছিল। ধর্ষিত। ক্ষতবিক্ষত। কত সামান্য কারণে যে আজকাল প্রাণ চলে যায়! থানায় কি একটা খবর দিয়ে রাখবেন? লাভ কি! সোমেন দিবাকরদের হাত অনেক অনেক লম্বা। তবে কি শুভরই দ্বারস্থ হবেন? নীতি ভেঙে মায়াকে পাঠিয়ে দেবেন শুভর কাছে?

শিবসুন্দর গভীর শ্বাস ফেললেন। যদি তাই পারতেন! যদি তাই পারতেন!

৭০

তিতির দু হাতে থুতনি চেপে ক্লাসে বসে আছে। সামনে প্রিটেস্টের মার্কশিট, আগের পিরিয়ডে ধৃতিকণা ম্যাডাম দিয়ে গেছেন। পরীক্ষা তিতিরের ভাল হয়নি ঠিকই, তা বলে এত খারাপ! এ সব কী নম্বর পেয়েছে সে! ফিলজফিতে তেতাল্লিশ, পল সায়েন্সে সাঁইত্রিশ, ইতিহাসে উনপঞ্চাশ! ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে ভাল বলে তিতিরের মনে মনে গর্ব ছিল, মাধ্যমিকে লেটার পেয়েছিল ইংরিজিতে, সেই ইংরিজিতে চুয়ান্ন, বাংলায় সাতচল্লিশ। প্রিটেস্টের কোয়েশ্চেন খুব কঠিন হয়েছিল, অনেকটা কোর্স নিয়ে একটা করে পেপার পরীক্ষা হয়েছে, তিন-চার জন ছাড়া তাদের সেকশানের কেউই তেমন সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু এগুলো কি কোনও যুক্তি হল? অত সোজা যে সাবজেক্ট ইকনমিক জিওগ্রাফি, শুধু মার্কস তোলার জন্যই যেটাকে ফোর্থ সাবজেক্ট নিয়েছে তিতির, তাতেও সাকুল্যে চুয়াল্লিশ! নাহ্ তিতির, তোর একেবারে বারোটা বেজে গেছে।

ফিলজফির ক্লাস চলছে। সিলেবাস প্রায় শেষ, পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে একটা সাধারণ আলোচনা করছেন ত্রিদিব স্যার। প্রকাণ্ড এক ডায়াগ্রাম এঁকেছেন ব্ল্যাকবোর্ডে, লেবনিৎজ দেকার্তে স্পিনোজা কানট হেগেল নামগুলো ঝুলছে ডায়াগ্রামে। ত্রিদিব স্যারের পড়ানোর ঢঙটি ভারি সুন্দর, কণ্ঠস্বরটিও ভরাট, গমগম করছে গোটা ক্লাস, খসখস নোট নিচ্ছে অনেকে, সবাই প্রায় টানটান, শেষ পিরিয়ডেও।

ঝুলন পেনের খোঁচা দিল তিতিরকে,— এই, ভেবলুর মতো বসে আছিস কেন? লেখ।

তিতিরের সংবিৎ ফিরল। ভার ভার গলায় বলল,— কী লিখব! সবই তো পুরনো পড়া।

—তোর এখনও রেজাল্টের হ্যাঙওভার কাটেনি? গুলি মার।

—কাকে?

—প্রিটেস্টকে। মার্কশিটটাকে। বাড়িতে বলবি প্রিটেস্টে একটু কম কম নম্বর দেয়।

মনে মনে হাসল তিতির। বাড়িতে কাকে বলবে? কী বলবে? কে শুনবে? ঝুলন জানে না তিতির এখন এক নির্জন দ্বীপে বাস করে। দ্বীপে মাঝে মাঝে এসে নৌকো ছোঁয়ায় বাবা, আবার

চলে যায় । বাড়িতে আর একদণ্ড থাকতে চায় না বাবা । তিতির বোঝালে বোঝে, বাধ্য ছেলের মতো মাথাও নাড়ে, তারপর সব শপথ বেমালুম ভুলে যায়, কী এক চৌম্বক টানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে । মেয়ে কী পড়ে, আদৌ পড়ে কি না তা নিয়ে তার কণামাত্র ভাবনা নেই । কবেই বা ছিল ! যার ছিল সে তো এখন উদাসিনী চিরদুখিনী সেজে বসে আছে । দিনান্তে তিতিরের সঙ্গে একটাও কথা বলে কি না সন্দেহ । যেচে রেজাল্ট দেখালে সে হয়তো দেখবে একবার, ভুরুতে মোটা ভাঁজ ফেলে তিতিরের দিকে তাকালেও তাকাতে পারে, কোনও মন্তব্য করবে বলে মনে হয় না ।

কথাটা মনে হতেই তিতিরের চোখে বাষ্প জমল অকারণ । কেন মন্তব্য করবে মা, তিতির মা'র কে ? কবেই বা মা তিতিরের সঙ্গে মিষ্টিমুখে দুটো কথা বলেছে ? আজীবন তিতিরের জন্য শুধু বকুনি, আর দাদার জন্য আদর । এক দিন তিতির রুখে দাঁড়াতেই ওমনি দোষ হয়ে গেল ? কত যন্ত্রণায় যে কথাটা বলে ফেলেছিল তিতির, একবারও কি অনুভব করার চেষ্টা করেছে মা ? বদলেছে জীবনযাপন ? মেয়েকে কোন কাঁটা বিঁধছে তা ভেবে কি একটুও সচেতন হল মা ? সেই ডাক্তার আঙ্কল আসছে, বসে থাকছে, দুঃখের খোলস পরে গুজগুজ চলছে দুজনের, অথচ ওই দুজনের জন্যই কী ভীষণভাবে মাথা হেঁট হয়ে গেছে তিতিরের ।

মা তিতিরের কথাও ভাবে না । বাবার কথাও ভাবে না ।

তিতিরের এবার পরীক্ষা কেন খারাপ হল, তা কি একটুও তলিয়ে দেখবে মা ? বড়জোর মনগড়া একটা ধারণা করে নেবে, বাবা অমন তাথৈ তাথৈ কাণ্ড করছিল বলে মেয়েটার পড়াশুনোয় বিঘ্ন ঘটেছে । তিতিরের যে আজকাল বই উল্টোতে গেলেই কান্না পায়, তার খোঁজ কে রাখে !

ঝুলন আবার চাপা স্বরে ডাকছে,— এই তিতির, কাঁদছিস কেন ?

তিতির সচকিত হয়ে নাক টানল,— কই, না তো ।

—এত সেন্টিমেন্টাল কেন, অ্যাঁ ? এটা কি জীবনের শেষ পরীক্ষা ?...খাতা দেখাতেও পারশিয়ালিটি আছে । এই স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্যার-ম্যাডামরা ঢেলে নম্বর দেয় । ভেবে দ্যাখ, তুই আমি পাঞ্চালী আর দেবোপম এক সঙ্গে বসে এক নোট পড়লাম, ওরা পেল ছয়ের ঘরে, আমাদের পঞ্চাশও দিল না । পল সায়েন্স আমি যা লিখেছিলাম মিনিমাম সেভেনটি পাওয়ার কথা । পেয়েছি কত ? টুয়েলভে ওঠার পরীক্ষাতেও তো...

ঝুলন ফিসফিস করে কথা বলছে, তবু গুনগুন ধ্বনি ভাসছে বাতাসে । সম্রাট আর মিতেশ ফিরে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে । ত্রিদিব স্যার বারকয়েক দেখলেন আড়চোখে । তিতির ঠোঁট নাড়ল,— চুপ ।

থিয়োরি অফ নলেজ, থিয়োরি অফ রিয়ালিটি বোঝাচ্ছেন ত্রিদিব স্যার, আলোচনা করছেন কজালিটি নিয়ে । জ্ঞান আর বাস্তবতার তত্ত্বে তিতিরের উৎসাহ নেই, কার্যকারণের তত্ত্বও তাকে একটুও টানছে না, সে নোট নেওয়ার ভান করে কাগজে আঁকিবুকি কাটছে । ডটপেনের আঁচড়ে কখন যেন একটা মুখ তৈরি হয়ে গেল । ঠিক মুখও নয়, মুখের মতন একটা কিছু । চেনা চেনা লাগছে ! টোটো কি ? টোটোর মুখ কেন আঁকবে তিতির ? উঁহু, এ টোটো নয়, টোটোর মুখ আর একটু লম্বাটে । তবু যেন মিল আছে । খুচ খুচ করে মুখটাতে তিতির একটু দাড়ি লাগিয়ে দিল । ইশ, এ যে আরও টোটো হয়ে গেল ! সামার ভেকেশানে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল টোটো । হিয়ার সঙ্গে জয় রাইডে বেরিয়ে নাক-মুখ ফাটিয়ে সোজা হাসপাতাল । হাতও নাকি ভাঙতে ভাঙতে বেঁচে গেছে । ঠিক হয়েছে । ডেঁপো ছেলের উচিত শিক্ষা । হুঁহু, ড্রাইভারকে নাম ধরে ডাকে ! হিয়াটাও কী বজ্জাত মেয়ে, এর মধ্যে কতবার স্কুলে দেখা হল, ভুলেও অ্যাক্সিডেন্টের কথা উচ্চারণ করল না ! হিয়া যেন এড়িয়ে চলতে চায় তিতিরকে ! কেন চায় ? তিতির কি তোদের জাবপাত্রে কুকুর হতে যাবে ? ফোঃ, তিতিরকে এখনও চিনিস না হিয়া ।

তিতির জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল । স্কুলের গায়েই এক অতিকায় স্কাই স্ক্র্যাপার, সামনের ব্যালকনিতে রঙিন শাড়ি মেলছে এক বুড়ি । ভেজা শাড়ি হাওয়ায় লতপত । চোখ নামিয়ে তিতির

দাঁতে ডটপেন চাপল। কলম নামল খাতায়, ফুটে উঠছে হিয়ার আদল। টোটোর পাশে হিয়ার মুখখানাকে ক্ষণেক দেখল তিতির, ভুরু কুঁচকোল, ঠোঁট বেঁকাল। সর সর কলম চালিয়ে টোপা টোপা করে দিল হিয়ার দু গাল, চোখ সামান্য টেরা করে দিল। থেবড়ে দেবে হিয়ার নাকটা ? দিলে হয়। বুঁচি বুঁচি, তুই একটা বুঁচি।

বেল পড়ে গেছে। ফরফর করে কাগজটাকে ছিঁড়ে দলা পাকাল তিতির, জানলার কাছে গিয়ে মুঠো খুলল, কুচিগুলোকে আলাদা আলাদা করে ভাসিয়ে দিল শূন্যে। উড়ছে। উড়ুক। যুগলে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ুক মহাশূন্যে।

ক্লাস শেষে নীচের সিমেন্টের চাতালে এসে জড়ো হয়েছে বন্ধুরা, জোর গজল্লা চলছে। রেজাল্ট নিয়ে কথা তেমন জমল না। প্রিটেস্ট এমন কিছু হাতি-ঘোড়া পরীক্ষা নয়, তবু সহজে কেউ নিজের নম্বর জানাতে চায় না। যেন তার নম্বর অন্য কেউ জানতে পারলেই সে ঘোড়দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়বে। অথচ মজা হল, প্রত্যেকের নম্বরই প্রত্যেকের জানা।

কথায় কথায় অনুশার কথা উঠে পড়ল। তিতিরদের সেকশানের অনুশা প্রিটেস্টে বসেনি, এ বছর মিস ক্যালকাটা প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে সে, ক্লাসেও অনুশা আসছে না বেশ কিছুদিন। দেহচর্চা, ত্বক পরিচর্যার তালিম চলছে তার, বাচনভঙ্গি মাজা-ঘষা করার একটা ক্র্যাশ ট্রেনিং কোর্স করছে. হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে তার আপাতত কোনও আগ্রহ নেই। বন্ধুদের যে কোনও আসরেই অনুশা এখন হট টপিক।

পাঞ্চালী বলল,— ঝুলন, তুই রিসেন্টলি অনুশাকে দেখেছিস ? মুখের পিমপল-টিমপলগুলো একদম মিলিয়ে গেছে। স্কিন কী হয়েছে রে ! একেবারে ওয়াক্স পালিশ।

টিনা বলল,— ও কিন্তু মুখে শশা, ডিম আর বেসন ছাড়া আর কিছু লাগায় না।

ঝুলন অনুশাকে একটুও পছন্দ করে না। বলল,— মাখে কেন ? খেলেই পারে।

—ডিম বেসন কী করে কাঁচা খাবে রে ?

—বেসনের কথা জানি না, ডিম তো কাঁচা খাওয়াই যায়। মহম্মদ আলি তিরিশটা করে কাঁচা ডিম খেত।

কুলজিৎ হা হা হাসল,— অনুশা কি বক্সার হতে যাচ্ছে নাকি ? ওকে হতে হবে সফট, টেন্ডার।

—আমার তো সেখানেই আপত্তি। ঝুলন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,— একপাল লোক চুল আর চামড়া দেখে মেয়েদের সৌন্দর্য বিচার করবে, আইডিয়াটাই ভীষণ ডেরোগেটরি। ভাবলেই কেমন গা ঘিনঘিন করে, না রে তিতির ?

তিতির অন্যমনস্ক মুখে শুনছিল। যেমনভাবে দূরের রাস্তা থেকে বাস-ট্রামের হর্নের শব্দ ভেসে আসে, তেমনভাবে টুকরো-টাকরা সংলাপ উড়ে আসছিল কানে। তর্কে না গিয়ে চটপট ঘাড় নেড়ে দিল,— বটেই তো। কী বিশ্রী।

সম্রাট যেন ভীষণ অবাক,— বিশ্রীর কি আছে ? সুন্দর হওয়াটাই সব নয়, সৌন্দর্যকে বিশেষভাবে প্রোজেক্ট করতে পারাও একটা আর্ট।

ঝুলন ঝামরে উঠল,— মেয়েদের মধ্যে সব সময়ে তোরা সৌন্দর্যই খুঁজিস কেন বল তো ? সৌন্দর্য ছাড়া কি মেয়েদের আর কিছু নেই ?

—কেন, পারসোনালিটি টেস্টও তো নেওয়া হয়।

—হয়। কয়েকটা থিক লোক সাজানো-গোছানো প্রশ্ন করে, মেয়েরাও ঠোঁট চেপে সাজানো-গোছানো মিথ্যে কথা বলে। ঝুলনের ঠোঁটের ডগায় যেন উত্তর ঝুলছে। ভুরু নাচিয়ে বলল,— ছেলেদের জন্য এ রকম কনটেস্ট হয় না কেন ?

—কে বলেছে হয় না ? হয় তো।

—হয়। ছেলেদের বেলায় দেখা হয় মাসল আর পাওয়ার। আর মেয়েদের হতে হয় কচি লবঙ্গলতাটি। কেন রে ?

—ইশ, ছেলেরা যেন মডেল হয় না! বুলবুল তর্কে নামল,— ছেলেদেরও তো স্যুট-বুট পরে ফিগার দেখাতে হয়।

—যাই বলিস, চেহারা নিয়ে ওই সব ফ্যাশান কায়দা আমার ভাল লাগে না। আই হেট ইট।

—তুই এত কনজারভেটিভ কেন রে?

কনজারভেটিভ শব্দটা শুনলেই ভীষণ রেগে যায় ঝুলন। রক্ষণশীল কথাটা যেন তাকে গালাগালির মতো ফোটে। কটমট করে তাকাল সে,— আমি মানুষের চেহারা বিচার করি না, ব্রেনকে রেসপেক্ট করি, তার কাজকে রেসপেক্ট করি। আমার চোখে মাদার টেরিজাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।

—তোর ভীষণ পিসিমা পিসিমা ভাব। বুলবুল খিলখিল হেসে উঠল,— প্রেজেন্ট ট্রেন্ড-এর সঙ্গে চলার চেষ্টা কর। আমি তো বাবা ঠিকই করে ফেলেছি, এই ফিগারে তো মডেল হওয়া হল না, আমি ফ্যাশান ডিজাইনার হব। ঠিকমতো মার্কেট ধরতে পারলে টাকার ফ্লাড হয়ে যাবে।

—তার মানে ডিগনিফায়েড দর্জি হবি?

—যে যা ভাবে। বুলবুল চুল দোলাল,— দর্জি হওয়া কি খারাপ?

—একটুও না। আমাদের এক বন্ধুর ঠাকুমা তো জামাকাপড় সেলাই করেই ছেলেকে মানুষ করেছেন। তিতিরের দিকে ঘুরল ঝুলন,— হিয়ার কথা বলছি রে। ওর ঠাকুমা ট্রেনিং না নিয়েও কোন ফ্যাশান ডিজাইনারের থেকে কম ছিলেন? কী সুন্দর সুন্দর ড্রেস পরত হিয়া বল। বাট সেটা ছিল তাঁর স্ট্রাগল। আমি তার জন্য তাঁকে অ্যাডমায়ার করি। আর বুলবুলেরটা হল শখ। আমি এটাকে বলি ন্যাকামো।

পলকের জন্য তিতির উদাস। কত কাল হিয়ার বাড়ি যাওয়া হয় না। হিয়ার ওপর রাগ করে হিয়ার ঠাকুমাকে একটি বারের জন্য না দেখতে যাওয়া কি উচিত হয়েছে তিতিরের? তিনি নাকি বড় মনোকষ্টে আছেন, ঝুলন বলছিল।

বন্ধুদের মধ্যে রীতিমতো কাজিয়া বেধে গেছে। ফ্যাশান ডিজাইনিং শখ না প্রফেশান, স্ট্রাগল কাকে বলে, আধুনিকতা কী তাই নিয়ে গলার শির ফোলাচ্ছে সকলে।

তিতিরের বিরক্ত লাগছিল। অনেক ঝগড়াঝাঁটি দেখা হল এ জীবনে, আর ভাল লাগে না। বন্ধুদের হাত নেড়ে বলল,— আমি চলি রে।

—এক সেকেন্ড। আমিও যাব।

বলেই ঝুলন আর একটা চোখা মন্তব্য ছুঁড়ল বুলবুলের দিকে। বুলবুল তেড়ে ওঠার আগেই তিতিরের সঙ্গে হাঁটা শুরু করেছে। বিজয়ীর মতো বীর দর্পে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোচ্ছে। খানিকটা গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বন্ধুদের দেখল একঝলক। তারপর একগাল হাসল,— বুলবুলটাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল। বড্ড বেশি অনুশাকে নিয়ে আহ্লাদীপনা করে। অনুশার চেহারায় আছেটা কি? ওই পাতিলেবুর মতো বুক, হাড় জিরজিরে কণ্ঠা...

—এই ঝুলন, হচ্ছেটা কি? তিতির চাপা ধমক দিল।

কাছেই গড়িয়াহাটের মোড়, বিকেলের ভিড়ে থিকথিক করছে রাস্তা। ফুটপাথ হকারদের দখলে, বিকিকিনির হাট ঠেলে এখন দু পা চলা দায়। জেনারেটারের কালো ধোঁয়া আর যানবাহনের উৎকট আওয়াজে শরীর খারাপ লাগে।

তার মধ্যে তিতিরের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে ঝুলন,— তুই এত পিউরিটান কেন রে? বুক কি খারাপ কথা? হাত পা মুখ চোখ পিঠ পেট বললে তো দোষ নেই? পাতিলেবু শব্দটাই বা কি এমন অশ্লীল? উপমা হিসেবে এখানে পাতিলেবুটাই তো...

—আহ ঝুলন, চুপ করবি?

—এমা, তুই ব্লাশ করছিস! হি হি। তোর কানটাও তো লাল হয়ে গেছে রে! সুড়ুৎ সুড়ুৎ ভিড় কাটাচ্ছে ঝুলন,— তোকে দেখে মাঝে মাঝে আমার নাল পড়ে, জানিস! আমি যদি ছেলে হতাম,

চকাম করে তোকে খেয়ে ফেলতাম।

তিতির আরও রক্তিম হয়ে গেল। এই মুহূর্তে ঝুলনকে আর কিছু বলে লাভ নেই, ক্ষীণতম প্রতিবাদ করলেই বেশি বেশি অসভ্য কথা বলবে।

চার মাথার মোড়ে এসে ঝুলন দাঁড়াল,— এই জানিস, একটা গ্র্যান্ড নিউজ আছে।

তিতির অনুচ্চ স্বরে বলল,— আবার প্রেমে পড়েছিস ?

—ফুঃ, ওটা একটা খবর নাকি ! ঝুলন ঠোঁট ওল্টাল,— পুজোর ছুটিতে আমি শুশুনিয়া যাচ্ছি।

—কি নিয়া ?

—শুশুনিয়া। বাঁকুড়ায়। পাহাড়। টু উইকসের একটা রক ক্লাইম্বিং-এর ট্রেনিং হবে, আমি তাতে নাম এনরোল করেছি।

—চেনা গ্রুপ ?

—গিয়ে চেনা হয়ে যাবে। সাতটা ছেলে আছে টিমে, আমি একাই মেয়ে। তুই যাবি ? এখনও নাম দেওয়াও যায়। বলেই তিতিরকে যেন দ্রুত মেপে নিল ঝুলন,— ওহো, তোকে বলে লাভ নেই, তুই তো মিস পুতুপুতু। পাহাড়ে চড়ার মতো রাগেড ব্যাপারে তো তোর ইন্টারেস্ট নেই। তুই তো সন্ন্যাসিনী হবি।

তিতির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপল। এক সময়ে সন্ন্যাসিনী হওয়ার শখ ছিল, এখন মনে হয় সেটাই জীবনের ভবিতব্য। কত দুঃখে যে এ কথা মনে হয় ঝুলন তার কি বুঝবে ! বন্ধুরাও যেন আলাদা আলাদা দ্বীপে বাস করে। দ্বীপে, না নিজের নিজের স্বপ্নের ঘোরে !

শ্লেষ গায়ে না মেখে তিতির নিস্পৃহ স্বরে প্রশ্ন করল,— একা মেয়ে যাবি, বাড়ি থেকে তোকে ছাড়বে ?

—না ছাড়ার কি আছে ! আমি তো আর শশা বেসন মেখে গা দেখাতে যাচ্ছি না ! খানিক আগে স্কুলে ফেলে আসা বুলবুলকে যেন এখান থেকেই বিষমাখা তীর ছুঁড়ল ঝুলন, আমি বা আমার বাবা-মা কেউই কনজারভেটিভ নই। আমরা কেউই ভাবি না সাতটা ছেলের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টে বেরোলে একটা মেয়ের ক্যারেক্টার নষ্ট হয়ে যায়। নিজেকে শুধু শরীরসর্বস্ব মেয়েছেলে না ভেবে গোটা একটা মানুষ ভাবতে পারলে ওসব ছুঁতমার্গ আসেও না।

ঝুলন চলে গেল। টালিগঞ্জে পিসেমশাই অসুস্থ, দেখতে যাবে। কোনাকুনি পার হচ্ছে চওড়া রাস্তা। তিতির অপস্রিয়মাণ ঝুলনকে দেখছিল। চুল ঝাঁকিয়ে ঝুলনের ওই দ্রুত হেঁটে যাওয়া, জনস্রোতের মাঝে ঘাড় উঁচু করা অকুতোভয় ভঙ্গিমা, সব কিছুর মধ্যেই কী দৃপ্ত ভাব ! অথচ এই মেয়েই যে কি করে একজন মানুষকে শুধু লুঙ্গি পরে বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, গড়ে ওঠা সম্পর্ক ভেঙে দেয় হেলায় ? মেলে না, কিছুই মেলে না। মা'র শীতল ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই কি ডাক্তার আঙ্কলের গোপন সম্পর্কটাকে মেলানো যায় ? তিতির তো বাবার প্রাণ, তবু কী নির্মম উপেক্ষায় তিতিরের কথা ঠেলে ফেলে দেয় বাবা, স্বেচ্ছাচারী জীবন কাটায় ! ডাক্তার আঙ্কল স্নেহ মমতা কর্তব্যের মূর্ত প্রতীক, কিন্তু কী অদ্ভুত ঔদাসীন্যে ছন্দা আন্টিকে অবহেলা করে বান্ধবীর কাছে চলে আসে ডাক্তার আঙ্কল !

এ সব কথা মনে করতে চায় না তিতির, তবু মনে এসে যায়। বুকটা টনটন করে ওঠে। জ্বরো রুগীর মতো তাপ এসে যায় গায়ে। সোনালি বিকেলও বড় মলিন, বড় নিষ্প্রভ লাগে। মনের মধ্যে এক ঘুরঘুরে পোকা বাসা বেঁধেছে তিতিরের, পোকা কুরে কুরে খায় হাড় পাঁজর। খুব কান্না পায় তিতিরের। আবার কি এক জটিল প্রক্রিয়ায় কান্না জমে বরফ হয়ে যায়। বরফ, না হিমবাহ ! চিরতুষার !

কাছেই এক পরিচিত স্বর। নাড়া খেল তিতির, ঘুরে তাকাল। একটু তফাতে ভিড়ে দাঁড়িয়ে কাচের বাসনের দর করছে কাকিমা, একা। দর কষাকষিতে এত নিবিষ্ট যে তিতিরকে দেখতে পায়নি। অ্যাটম গেল কোথায় ? তাকে ছাড়া তো কাকিমা বড় একটা বেরোয় না ? অ্যাটমের টিটি

ক্লাস, নাকি ড্রয়িং ? গিয়ে কথা বলবে কাকিমার সঙ্গে ? কী বলবে ? আসো না কেন, আসিস না কেন, যাব, সময় পেলেই যাব রে—এই তো কয়েকটা বাঁধাধরা গৎ এখন। দিন তিন-চার আগে সন্ধেবেলা বড়কাকা এসেছিল, বাবার কথা ভাসাভাসা শুনে গেছে, যদি কথায় কথায় বাবার কথা ওঠে !

ছুট্টে একটা ভিড়-ভিড় মিনিবাসে উঠে পড়ল তিতির। মন-মেজাজ তিতকুটে হয়ে আছে। রেজাল্টটাও যদি একটু ভাল হত ! বাড়ি গিয়ে এখন চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবে।

ভাবলেই কি হয় ! তিতিরের কপালে শান্তি নেই। সেলিমপুর বাস স্ট্যান্ডে সুকান্ত যথারীতি দণ্ডায়মান। বত্রিশটা দাঁত বার করে এগিয়ে এল,— স্কুল থেকে ফিরছ ?

অন্য দিন এ সময়ে সুকান্তর সঙ্গে দেখা হল দু-চারটে কথা বলে তিতির। টিউটোরিয়ালে গেলে ফেরার সময়ে এক-আধ ঘণ্টা গল্পও হয় দুজনের। গল্প মানে সুকান্তরই একটানা বকবক করে যাওয়া। সিনেমা, জামাকাপড়, নিজের বাড়ির কিসসা, আরও শতসহস্র হাবিজাবি। হুঁ হাঁ করতে করতে শোনে তিতির, তাও যা হোক কাটে বিকেলটা।

আজ তিতির খিঁচিয়ে উঠল,— তোমার কি মনে হয় স্কুল ইউনিফর্ম পরে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম ?

সুকান্ত সামান্য থতমত,— না, মানে তোমার আজ দেরি হল তো, তাই ভাবছিলাম...

—আমার দেরি হল, কি না হল, তাতে তোমার কি ? কে তোমায় ভাবতে বলেছে ?

—যাহ শালা, এত তেতে আছ কেন ? স্কুলে ঝাড় খেয়েছ ?

—ফের মুখ খারাপ করছ ?

—যাহ শালা। শালা কথাটা খারাপ হল ? বউয়ের ভাই তো শালা হয়। যেমন তোমার দাদা আমার শালা হবে।

তিতির আগুন হয়ে গেল,— তোমার সাহস তো কম নয় ! যা খুশি তাই বলে যাচ্ছ ! তোমার জিভ একদিন যদি আমি ছিঁড়ে না নিই...

—একদিন কেন, আজই নাও। সুকান্তর চোখমুখে কোনও লজ্জার ছাপ নেই। জিভ ঝুলিয়ে দিয়েছে তিতিরের সামনে,— এই নাও, ছিঁড়ে টিফিন বক্সে রেখে দাও। কাল টিফিনে বাটার টোস্টের সঙ্গে খেয়ো। অবশ্য আমার জিভ তেমন স্বাদের হবে না। ষাঁড়ের জিভ হলে তাও...

তিতির হনহনিয়ে হাঁটছে। লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে তাকে ধরে ফেলল সুকান্ত,— এত খেপে যাচ্ছ কেন ?

—তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

—আমি তো তোমার সঙ্গে জোক করছিলাম।

—ও সব ডার্টি জোক আমি ঘেন্না করি। সরো, সরে যাও।

ঘাড় ঝুলিয়ে আবার পথ আটকাল সুকান্ত,— ভুল করে বলে ফেলেছি।

—এমন ভুল হয় কী করে ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলি বলে খুব বাড় বেড়ে গেছ, না ?

—সরি। আর বলব না। ক্ষমা করে দাও।

—আমার দাদা তোমার চোদ্দ পুরুষের কেউ হবে না, এ কথাটা যেন মাথায় থাকে।

সুকান্ত নিশ্চুপ। নিবে যাওয়া মুখে পা চালাচ্ছে। একটা উচ্চণ্ড সাইকেল রিকশা গায়ের ওপর এসে পড়ছিল, কোমর বেঁকিয়ে বাঁচাল নিজেকে। ঘুরে রিকশাঅলাকে তেড়ে উঠতে গিয়েও উঠল না। মিইয়ে আছে।

তিতিরের রাগ পুরোপুরি পড়েনি। একটু তেরিয়া গলায় বলল,— আমার জন্য রোজ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার দরকারটাই বা কী ? ভাল লাগে না।

সুকান্ত মিনমিনে গলায় বলল,— তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে যে।

—বাড়াবাড়ি।

—বাড়াবাড়ি নয়, আপ অন গড। তিতিরের হাত ছুঁতে গিয়েও সরিয়ে নিল সুকান্ত,— আগে দেখা না হলেও ফোন করা যেত। এ বাড়িতে এখনও তোমাদের ফোনই এল না।

—ভাগ্যিস আসেনি। এলেই তো তোমার জ্বালাতন শুরু হবে।

—জ্বালাতন আর করতে পারি কোথায়? অনেকক্ষণ পর সুকান্ত আবার দাঁত ছড়িয়ে হাসছে, দশবার ফোন করলে আটবারই তো তোমার বাবা ধরত। তোমার বাবা ফোনের কাছে ঘাপটি মেরে থাকে নাকি?

—মোটেই না। আমার বাবা বাড়ি থাকার সময়ে ইন্সিডেন্টালি তুমি ফোন করেছিলে।

—এক দিন নয়, তিন-চার দিন এ রকম হয়েছে।

—সৎ সাহস থাকলে বাবাকে বলতে। বাবা আমায় ডেকে দিত।

—উরে বাবা রে, আমার ভয় করে।

গোমড়ামুখ তিতিরকে যেন কাতুকুতু দিল কেউ। যেমনটি দিত তার বাবা, সেই সে ছোট্টটি থাকার সময়ে। দাদার গাঁট্টা খেয়ে থুম হয়ে বসে থাকত তিতির, আর বাবা তখন মজার মজার কথা বলে হাসাতে চাইত তিতিরকে, রাগ ভুলে বিছানায় লুটোপুটি খেত তিতির।

তবে তিতির এখন হাসল না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল,— আমার মা-কাকিমাকে ভয় করে না, আমার বাবাকে ভয় করে?

—আপ অন গড়। দুনিয়ার সব বাবাকেই আমার ভয় করে। তোমার বাবাকেও।

নিমেষে তিতির শরতের আকাশ হয়ে গেল। যাক, পৃথিবীতে তাও একজনও আছে যে তার বাবাকে ভয় পায়। মুখে শেষ বিকেলের আলো ফুটিয়ে তিতির বলল,— আমার বাবা কিন্তু সত্যিই খুব রাগী।

—সে আমি টেলিফোনে গলা শুনেই বুঝেছি।

মনে মনে বাবার এক দীপ্ত বলশালী রূপ বানাল তিতির। সর্বাঙ্গ থেকে যেন তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাবার, ব্যক্তিত্ব ফেটে পড়ছে। নেতিয়ে পড়া বাবার রোগাসোগা মুখটাকে মুছে ফেলল চোখ থেকে। ভুরু নাচিয়ে বলল,— আমার বাবাকে তো চেনো না, আমার সঙ্গে তোমায় কোনও দিন দেখলে তোমাকে একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। ওই যে বাংলা সিনেমায় একজন কমল মিত্র আছেন না, ঠিক তাঁর মতো। আমাদের বাড়িতে সবাই বাবার ভয়ে কাঁপে।

—তুমিও কাঁপো? সুকান্ত যেন দমেছে একটু।

—আমি ছাড়া। তিতির ঠোঁট টিপল।

—তুমি বাবাকে ভালবাসো?

—পৃথিবীতে সব থেকে বেশি।

—আমার বাবাকে আমি ভালবাসি না। তবে ভয় পাই।

তিতির গোয়েন্দার চোখে তাকাল,— তবে যে খুব মস্তানের মতো বলো, বাবাকে এই করব, বাবাকে সেই করব...!

—ওটা তো রাগে বলি। দুঃখে বলি। ঘেন্নায় বলি। সুকান্তর মুখ আবার ম্লান হয়ে গেছে,— তোমার বাবা খুব সাচ্চা মানুষ, তাই না?

সাচ্চা কাকে বলে তিতির ঠিক বোঝে না। অস্পষ্টভাবে ঘাড় নাড়ল—বাবার বাইরেটা দেখে লোকে...বাবার ভেতরটা খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়া।

—আমার বাপ ঠিক উল্টো। বাইরেটা শালা আটচল্লিশ ক্যারেট, ভেতরে ভর্তি সালফিউরিক অ্যাসিড।

—ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই।

—কেন বলব না? আমার বাবার ক্যারেক্টার কী তুমি তো জানো।

—তবু তিনি তো তোমাকে ভালবাসেন। বাসেন না? যা চাও তাই দেন। টাকা চাইলে টাকা,

গাড়ি চাইলে গাড়ি, কী না পাও !

—সে কি সাধে দেয় ? বংশে বাতি দেব, সেই আশায় দেয়। মরার সময়ে আমি মুখে গঙ্গাজল না দিলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, সেই দুর্ভাবনায় দেয়। মুখে শালা ছেলে ছেলে, এ দিকে মাকে শ্মশানে পাঠিয়ে দু দুটো মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তিতে আছে। আরও কোথায় কী করে বেড়ায় কে জানে !

—অত যদি জানো, তা হলে বাবাকে ভয় পাও কেন ?

সুকান্ত চুপ হয়ে গেল। সামনে লেভেল ক্রসিং, রিকশা সাইকেল ট্যাক্সি গাড়ির লাট লেগে গেছে রাস্তায়। যান্ত্রিক সংকেতধ্বনি বাজছে রেল গেটে, করুণ সুরে। শরতের বিকেল মরে এল।

ঝমঝমিয়ে ট্রেন চলে গেল একটা। শহর ছেড়ে শহরতলির দিকে ছুটছে। পিছনে ভাঁটার মতো এক লাল চোখ, সেও মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

সুকান্ত আচমকা বলে উঠল,— তুমি খুব লাকি তিতির।

লেভেল ক্রসিং-এর গেট উঠছে। তিতির এগোচ্ছিল,— ঘুরে দাঁড়াল, কেন ?

সুকান্ত উত্তর দিল না। কেমনভাবে যেন তাকিয়ে আছে। কিসের যেন এক আর্তি চোখে। আর্তি, না তৃষ্ণা ? চোখ নামিয়ে নিল। ফিরে যাচ্ছে।

তিতিরের মায়া হচ্ছিল ছেলেটাকে দেখে। হাসিও পাচ্ছিল। কী বোকা, কী বোকা। তিতিরকেও ল্যাকি বলে !

৭১

—বাড়ি কি আজ আপনার দূরে সরে গেল রঘুবীরবাবু ? পথ যে আর ফুরোয় না !

—পথের আর দোষ কী রায়দা। যা টিকিটিকি হাঁটছেন।

—কী করি। পা যে চলে না।

—তবু এই বিদঘুটে পথ ধরে হাঁটা চাই ! বলিহারি খেয়াল বটে। দিব্যি সুন্দর গড়গড়ে রাস্তা রয়েছে নীচে, কোথায় সেখান দিয়ে ঝটাক্‌সে বাড়ি পৌঁছে যাব তা নয়...রোজ এই লাইন ধরে হাঁটো !

—আপনার বুঝি ভয় লাগে ?

—লাগারই তো কথা। চারদিক লাইনে লাইনে ছয়লাপ, সামনে পেছনে জনমনিষ্যি নেই, ভাঙা পাথরে টাল খেয়ে খেয়ে আমরা দুই পাষণ্ড হাঁটছি, কান ঘেঁষে হুমহাম ট্রেন ছুটে যাচ্ছে...এতেও মানুষের গা ছমছম করবে না ? রঘুবীর চোখ চালিয়ে নিকট ব্রহ্মাণ্ডটুকু দেখে নিল, —তায় আবার আঁধার নামছে। চলেন, নীচে নেমে যাই।

—ওই হট্টমেলার পথ আমার ভাল লাগে না। এই তো বেশ ফুরফুর হাওয়া দিচ্ছে, লাইন থেকে শব্দ উঠছে ঝিনঝিন, কোনও চেল্লামিল্লি নেই, ঝুটঝামেলা নেই... বেশ লাগছে।

—তাহলে আর কি। হাঁটুন মনের সুখে।

—হাঁটছি তো। শুধু আপনার বাড়িটা যদি একটু কাছে এসে যেত।

—সব সুখ এক সঙ্গে হয় না রায়দা। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চান, অথচ যাবেন ঘুরপথে...

—এ পথ যে আমায় টানে রঘুবীরবাবু। এই যে ডাউন লাইন দিয়ে গুমগুম করে ট্রেনটা চলে গেল, অনেকটা মৃত্যুদূতের মতো...একটু এদিক ওদিক হলে আমি তো ট্রেনটায় কাটা পড়তেও পারতাম। কিন্তু পড়লাম না। এই যে মৃত্যুর পাশে পাশে হাঁটা, এক চুলের জন্য বেঁচে থাকা, এটা ভারি মজার না ?

—আপনি ভাবুক মানুষ, আপনার কত কি মনে আসে।

—আগে এমনটা হত না। আজকাল মনে হয়।

—আপনার মধ্যে কি মৃত্যু-ইচ্ছে জাগল রায়দা ?

—না তো। সেভাবে তো ভাবিনি কোনওদিন।

—তবে এই মৃত্যুর পাশ দিয়ে হাঁটা, বেঁচে থাকা, এ সব চিন্তা আসে কেন ? আপনাকে তো কখনও কোনও ঝুঁকি নিয়ে জীবন কাটাতে হয়নি। টুপ করে রইস ফ্যামিলিতে জন্মেছেন, অন্নকষ্ট টের পাননি... ভাতের থালার সামনে বাবুটি হয়ে বসেছেন ওমনি চোর্ব্যচোষ্য এসে গেছে...ভাল জামাকাপড়টি পরেছেন, আতরটি মেখেছেন, টেরি কেটেছেন...রোদে পোড়েননি, জলে ভেজেননি...আপনি তো মশাই সুখী মানুষ... বাঁচা-মরার আপনি জানেন কী ? জানি আমি। আমার মাসি। আমরা।

তা বটে। রঘুবীরের মতো বর্ণময় জীবন আদিত্যর নয়। বর্ণময়, না বিবর্ণ ? কোন শৈশবে পিতৃহীন হয়েছে রঘুবীর। পুরুত বাপ যজমানবাড়ি থেকে ফেরার পথে সর্পাঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল বেঘোরে। তখন রঘুবীর কতটুকু ? বড়জোর সাত, কি আট। কুলগাছিয়ায় মনিহারি দোকান ছিল কাকার, পিসি পিসের তো রমরমা অবস্থা। সত্তর বিঘে জমি, কোঠা বাড়ি, মাছ ভর্তি পুকুর, গোয়ালে গরু। তা কাকা পিসি কেউ ঠাঁই দিল না, পেটের জ্বালায় মায়ে-পোয়ে চলে এল মাসির দরজায়। এই মধুগড়ে। মেসোর তখন নাকি জ্যোতিষে খুব পশার। দমদম বেলঘরিয়া ব্যারাকপুর বারাসত কোত্থেকে না লোক আসে মেসোর কাছে। বিশ পঞ্চাশ মাইল দূরের লোকরাও নাকি এক ডাকে চিনত রমেশ ঠাকুরকে। সেই মেসোই আশ্রয় দিল। এক দুটো বছর পেটে কোনও টান পড়েনি, মেসো স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে রঘুবীরকে, মাস্টাররা বলে রঘুবীরের নাকি অঙ্কে খুব মাথা, বড় সুখে কাটছিল দিন। বছর দুয়েকের মাথায় হঠাৎ একদিন রঘুবীরের মাকে নিয়ে নিপাত্তা হয়ে গেল রমেশ ঠাকুর। আশ্চর্য, মাসি কপাল চাপড়াল না, রঘুবীরকে গালমন্দ করল না, উল্টে দশ বছরের ছেলেটাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরল। হয়তো মহিলার ছেলেপুলে ছিল না বলেই অমনটা হয়েছিল। হয়তো বোনের ওপর শোধ নিতেই বেশি বেশি করে দখল করার চেষ্টা করেছিল রঘুবীরকে। কিন্তু মাসি বোনপোর তখন চলে কিসে ? ঘরের টাকা সবই তো চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে রমেশ ঠাকুর। প্রাণের দায়ে পনেরো-বিশ টাকা ভাড়ায় তখনই নাকি রিফিউজিদের এনে ঘরে ঘরে বসিয়েছিল মাসি। তা ওই পাঁচঘর ভাড়াটে থেকে আর কটা পয়সা আসে ? একশো টাকাও হয় কি হয় না। ঘরে বসে বড়ি আচার বানাতে শুরু করল মাসি। তার হাতের বড়ি আচার এখনও লোকে কিনে নিয়ে যায়, আদিত্যও দেখেছে। রঘুবীরও বসে থাকেনি। স্কুলের বই নর্দমায় ফেলে দিয়ে সেই দশ বছর বয়স থেকে নেমে পড়েছে রোজগারের ধান্দায়। পুওর সোল ! দুটো পয়সার জন্য কী না করেছে ! মাটি কেটেছে, রাস্তা কুপিয়েছে, বড়লোকদের বাড়িতে গিয়ে ফাইফরমাশ খেটেছে। একবার নাকি কোন এক বাবুর বোতল থেকে মাল চুরি করে খেয়েছিল, ধরা পড়ে পিটুনিও খেয়েছিল খুব। তারপর খানিক বড় হয়ে ড্রাইভিং শেখার সাধ জাগল। মাসি খেয়ে না-খেয়ে পয়সা দিল, ট্যাক্সি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে লাইসেন্স খোয়াল রঘুবীর। আবার বেনামে লাইসেন্স করাল, ট্রাক চালাবে। বেলডাঙার কাছে রঘুবীরের ট্রাক লুঠ হল, লোহার ডাণ্ডা দিয়ে শিরদাঁড়ায় মেরেছিল ডাকাতরা, আট মাস হাসপাতালে পড়ে রইল রঘুবীর। আবার সিধে হল। আবার স্টিয়ারিং ধরল। পারল না, থকে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা—শিরদাঁড়া বেগড়বাঁই শুরু করল। লাভের মধ্যে লাভ, মদের নেশায় আরও চোস্ত হয়ে উঠল রঘুবীর, পেটের ব্যথাটাও মোটামুটি সঙ্গী হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই হাসপাতালে যায়, সুস্থ হয়ে ওঠে, আবার ফিরে নেশা শুরু হয়। এদিকে মাসিরও আর শরীর চলে না, ওই বকাসুরকে সেই বা আর কতদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়। একদিন রমেশ ঠাকুরের পুঁথিপত্রের ধুলো ঝেড়ে, তিলক কেটে রঘুবীর বসে পড়ল জ্যোতিষচর্চায়। যা দু-চার পয়সা আসে। ভাত না জুটুক, মাল তো জুটবে।

এ সব কষ্টের কথাও হালকা চালে বলে রঘুবীর। রসিয়ে রসিয়ে। যেন নিজের নয়, অন্য কারুর জীবনকাহিনী শোনাচ্ছে।

একদিন আদিত্য চেপে ধরেছিল,— তবে যে আপনি বলতেন, আপনার জ্যোতিষ তন্ত্রমন্ত্র সব

আপনার বাবার কাছে শেখা ?

রঘুবীর খ্যাঁক খ্যাঁক হেসেছিল,— এই লাইনে ওসব বলতে হয়, নইলে বাজার ধরা যায় না।

—আমি আপনার বাজার ? আপনি আমায় মিথ্যে বলেছিলেন ?

—হাসপাতালে যখন আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, তখন তো আপনি আমার বাজারই ছিলেন রায়দা। তা ছাড়া মিছে কথা তো বলিনি। মায়ের নাগর বাপ ছাড়া আর কি ? তার দেখানো রাস্তাতেই পেট পালছি, মহাগুরুই বা সে আমার নয় কেন ?

সত্যি মিথ্যে যাই বলুক, লোকটা কথার জাদু জানে বটে। ভাগ্য গণনা করে কত প্রভাবশালী মানুষকেও জপিয়ে ফেলে। টেকনিকও কী বিচিত্র ! কমবয়সী ছেলেমেয়ে এলে সমস্যা দুটো। প্রেম আর পরীক্ষা পাস। বড়জোর চাকরি চাই। মাঝবয়সী মেয়ে হলে বিপথগামী স্বামী, সন্তানহীনতা। মাঝবয়সী পুরুষ মানে চাকরিতে প্রোমোশান, বদলি, কখনও সখনও জমিবাড়ি মামলা বিবাদ। প্রৌঢ়ের সমস্যা মেয়ের বিয়ে, ছেলের দুর্মতি। আর অবাঙালি খদ্দের যদি আসে, এই মারোয়াড়ি কি গুজরাটি, তাদের জগতে তিনটি প্রবলেম, শেয়ার, ব্যবসা, নাফা। কোন গ্রহ কিসের কারক, একাদশপতি, লগ্নাধিপতি, অষ্টম স্থান, পঞ্চম স্থান, শনির সাড়ে সাতি, কোন গ্রহকে ঠাণ্ডা করতে কোন পাথর ধারণ জরুরি, সব বেশ ভালই আয়ত্ত করে রেখেছে রঘুবীর। নিজের ঘরে বসেই টুকটাক ব্যবসা চালিয়ে যায়। সোনার দোকান বাঁধা আছে, খদ্দের পাঠালে কমিশানও বাঁধা। তবে তার মধুগড়ের আস্তানায় তেমন শাঁসালো পার্টি আর আসে কটা ! আর্জেন্টিনার কাট পান্না বা বৈদূর্যমণিই বা কজন ধারণ করতে পারে ! কিংবা বসরাই মুক্তো !

এ সব কথাও বলে ফেলতে রঘুবীরের এতটুকু সংকোচ নেই। উঞ্ছবৃত্তির ওপরেও পর্দা নেই কোনও। এক মাস ধরে তার ঘরে আদিত্যর নিত্য আসাযাওয়া, এখন আর তেমন ঢাকঢাক গুড়গুড়ও নেই। শুধু একটা কথা উঠলেই রঘুবীরের মুখ ভারী ছোট হয়ে যায়, ভাঁটার মতো চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে। রঘুবীরের মা রমেশ ঠাকুরের সঙ্গে পালিয়ে মোটেই সুখী হয়নি। দেওঘর না দুমকা কোথায় গিয়ে যেন বাসা বেঁধেছিল দুজনে, সেখানেও নাকি রমেশ ঠাকুর এক বিহারি মেয়ের প্রেমে পড়ে। মনের দুঃখে আত্মহত্যা করে রঘুবীরের মা। খবরটা এনে দিয়েছিল মাসিরই কোন এক দেওর পো।

লোকটা কি দুঃখী ? আদিত্যর চেয়েও ? হাত তিন-চার সামনে হাঁটতে থাকা পাহাড়ের মতো রঘুবীরকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ দেখল আদিত্য। লোকটা তার মতো করে দুঃখী, আদিত্য নিজের মতো করে। প্রতিটি মানুষেরই কষ্টের কুয়ো আলাদা আলাদা। আদিত্যর সামনে দিয়ে, পিছন দিয়ে, দু ধার দিয়ে এখন যে সারসার রেলের লাইন, যারা কেউ কোনওদিন পরস্পরের সঙ্গে মেলে না, কখনও বা একটু ছুঁয়েই যে যার পথ ধরে, এদের দেখে কি বুক মোচড়ায় রঘুবীরের ? চিনতে পারে এরা সব আদিত্যরই পরিজন ? এদের মাড়িয়ে ওই যে রেলগাড়ি আসছে, যাচ্ছে, তারা তো শুধু গাড়ি নয়, জীবনের এক একটা করাল মুহূর্ত। এমন মুহূর্ত যাতে হঠাৎ বিলীন হয়ে যেতে পারে যে কেউ। যে কোনও সময়ে। মা বাবা বউ ছেলে মেয়ে ভাই বোন বন্ধু, এমনকী বেড়ে ওঠার আশ্রয়ও। এই সম্ভাবনার গা ঘেঁষে হাঁটাকে মৃত্যু-ইচ্ছে বলে না। এ হল এক ধরনের শিহরন। জীবনেরই।

আবার শব্দ বাজিয়ে দুটো ট্রেন যাচ্ছে। সমান্তরাল পথে দুজন দু মুখে চলে গেল। আঁধার এখনও জেঁকে বসেনি, আলো অন্ধকারের এক সন্ধিক্ষণ এখন। তবে এর মধ্যেই কামরাগুলোতে বাতি জ্বলে গেছে। আলোর ঝলক মিলিয়ে যেতেই আবার নিম অন্ধকারে খাঁ খাঁ দশ দিক। একটা দিগভ্রান্ত কাক খুব নিচু দিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল।

রঘুবীর দাঁড়িয়ে পড়েছে। টকাটক লাইন টপকে ঢালের কিনারে চলে গেল। ডাকছে আদিত্যকে,— আসুন, আপনার পথ শেষ হয়েছে। এবার নামতে হবে।

আদিত্য ধীর পায়ে রেললাইন পার হল। অথবা পরিজনদের। একটু দম নিয়ে বলল,— এসে গেলাম ? রোজ এই জায়গা দিয়েই নামি ?

—নাহ্ রায়দা, সত্যিই আপনাকে ভূতে ধরেছে। ওই তো দ্যাখেন না, পাতাল রেলের শেড তৈরি হচ্ছে, চিনতে পারছেন ?...দেখবেন, নামতে গিয়ে আজ যেন আবার আছাড় খাবেন না।

আনমনে হাঁটুতে হাত ছোঁয়াল আদিত্য। পরশু অনেকটা ছড়ে গিয়েছিল। বোতল থেকে খানিকটা সুরা ঢেলে দিয়েছিল রঘুবীর, শুকিয়ে এসেছে ক্ষতটা। ভাগ্যিস তিতিরের নজরে পড়েনি।

তিতিরের কথা মনে পড়তেই বুকটা ঈষৎ খচখচ করে উঠল আদিত্যর। সন্তর্পণে নামতে নামতে বলল,— আজ কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাব রঘুবীরবাবু।

—যাবেন। আমি কি আপনাকে আটকাই ? আপনিই তো...

—না না, আজ আপনি আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দেবেন।

ফার্লং মতো সরু পায়ে চলা পথ। দু পাশে ঘন বসতি, ভাঙাচোরা। কবেকার রিফিউজি কলোনি, এখনও প্রায় নরক। ছোট্ট ডোবা জল থইথই, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তোলা উনুনে আঁচ পড়েছে সন্ধের, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় থমকে আছে বাতাস। ঘেয়ো বাদামি কুকুরটা আজও হাঁটছে আদিত্যদের সঙ্গে সঙ্গে। একদিন ভাঙা কেকের টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছিল আদিত্য, তার পর থেকে কুকুরটা চিনে গেছে তাকে।

রঘুবীর একটা ঢিল কুড়িয়ে হেঁকে উঠল,— হ্যাট হ্যাট।

হাত তুলে নিরস্ত করল আদিত্য,— আহা থাক না, আসছে আসুক।

পথটুকু পেরিয়ে ডান দিকে আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটলে রঘুবীরের একতলা বাড়ি। জীর্ণ, শ্রীহীন। পাঁচঘর ভাড়াটের কোলাহলে সদা মুখর।

বাড়ির পিছনে পানে মাসি বোনপোর ঘর। আগল খোলা। লাল মেঝেতে কালো স্কার্টিং দেখে মনে হয় এক কালে আভিজাত্য ছিল ঘরখানার। চুন বালি খসা দেওয়ালে অসংখ্য দেবতার ছবি। গোটা চারেক এক পাতার ক্যালেন্ডার, সেও ঠাকুর-দেবতার। দেওয়ালের তাকে বাসন-কোসন, ছোট টাইমপিস, হাত আয়না, চিরুনি, মান্ধাতার আমলের রেডিও সহাবস্থান করছে। কাঠের একটা আলমারিও আছে, চটলা ওঠা। দরজার পাশে জলচৌকির ওপর ট্রাঙ্কের পাহাড়, কালো সবুজ হলুদ। ঘরের প্রায় আধখানা জুড়ে এক মলিন পালঙ্ক, বিছানা বালিশ চাদরের হালও বেশ জরাজীর্ণ। কারুকাজ করা পালঙ্কের বিড ভারী দেখনদার ছিল এক সময়ে, এখন সেটাই এ ঘরের আলনা।

আদিত্য কোনওদিনই পালঙ্কতে ওঠে না। মেঝেতে থেবড়ে বসেছে। সিগারেট ধরিয়ে ইতিউতি তাকাল,— ও রঘুবীরবাবু, গেলেন কোথায় ?

—এই আসি। বলতে বলতে দু হাতে দুটো দিশি মদের বোতল নিয়ে ঢুকল রঘুবীর। মেঝেতে নামিয়ে রেখে গ্লাস নিয়ে এল,— চাট চলবে ?

—আবার মাসিকে খাটাবেন ?

—সে আপনাকে দেখতে হবে না।...মাসিইই, ও মাসি...

ক্ষয়াটে চেহারার ছোটখাট বৃদ্ধা মন্থর পায়ে ঘরে এসেছেন। পরনে সাদা থান, স্বামীর মৃত্যুসংবাদ না পেয়েও পরছেন বহুকাল। এক সময়ে খুব ফর্সা ছিলেন বোঝা যায়, এখন রঙ তামাটে। চুল উঠে কপাল চওড়া হয়ে গেছে।

অনুজ্জ্বল চোখে তাকাচ্ছেন বিমলা,— এসেই দুটিতে বসে পড়লি ?

ছিপি খুলে গ্লাসে গ্লাসে কোয়ার্টারটাক ঢালল রঘুবীর, দু হাত বালবের দিকে তুলে দেখল মাপ সমান হয়েছে কি না। উল্টো প্রশ্ন করল,— ছিলে কোথায় ? ঘর খোলা ?

—ঝিনিদের ঘরে গেছলাম। ঝিনির বাপটার মাইনের দিন কারখানা লকআউট হয়ে গেল, কাল থেকে মিলের গেটে বসে আছে। কী আতান্তর।

—হুম। রঘুবীর দাঁতে বিড়ি চাপল, ক খানা পেঁয়াজি ভেজে ফ্যালো দিকিনি। বেশি করে কুচি কুচি লঙ্কা দেবে। ছাঁকা তেলে ভাজবে, যাতে মুচমুচে হয়।

—উউহ্, জিভের খুব স্বোয়াদ। অত তেল নেই।

—কিনে আনো।

—টাকা নেই।

—কাল পঞ্চাশ টাকা দিলাম সব ফুড়ুৎ ? নাকি ওই ঝিনিদের ঘরে ঢেলে এসেছ ?

—সকালে ইলিশ মাছটা কে খেল ?

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। পোড়া তেলেই ভাজো। রঘুবীর শার্ট খুলে পালঙ্কে ছুঁড়ে দিল। পৈতে দিয়ে ঘষঘষ চুলকোচ্ছে লোমশ ঘাড় পিঠ। বলল,— জল দিয়ে যাও তো আগে। গোড়াতেই নিট ঠিক জুত হয় না। লিভার শুলোয়।

—মর মর। এবার তোর লিভারের পচন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও আটকাতে পারবে না।

—পচার হলে কবে পচত। ফুঃ। দেখলে তো কতবার। ওষুধ পড়লেই বাবু আবার চাঙ্গা হয়ে যায়।

বারান্দার ঘেরাটোপে রান্নাঘর, সেখান থেকে জল আনলেন বিমলা,—নিজে মর ক্ষতি নেই, ভালমানুষের ছেলেটাকে মারছিস কেন ?

—হাহ্, কে কাকে মারে! রায়দা এ লাইনে আমার থেকে অনেক সিনিয়ার। তাই না রায়দা ?

আদিত্য আলগা হাসল। গ্লাস মুখের কাছে এনেও নামিয়ে রাখল কি ভেবে। সেই কোন দশটায় খেয়ে বেরিয়েছে, পেট একদম খালি, শুধু শুধু গলায় মদ ঢালাটা তার পক্ষেও শুভ নয়। দমদম স্টেশনে নেমে কিছু খেয়ে নিলে হত। ভাল লাগে না। জিভও যেন অসাড় হয়ে আছে।

বিমলা চলে গেছেন। পা বাড়িয়ে দরজাটা একটু ঠেলে দিল রঘুবীর। গ্লাসে পেল্লাই চুমুক দিল,— তা হলে কী ভাবলেন রায়দা ?

—কীসের কি ?

—বা রে, সারাটা দিন ধরে কি বোঝালাম ? এবার বড় কাজ বেরোচ্ছে। আধ মাইলটাক রাস্তা চওড়া হবে। তিলকেরই সরাসরি পাওয়ার কথা, আমি ভেতর থেকে কলকাঠি নেড়ে দিয়ে এসেছি। সুজিত মণ্ডল আরও পাঁচ পারসেন্ট বেশি নেবে, অর্ডার বেরোবে আমাদের নামে। তিলকটার খুব মেজাজ, কথায় কথায় এম এল এ-এম পি দেখায়, অফিসসুদ্ধু লোক ওর ওপর চটে আছে।

—শুনলাম তো অনেকবার। এক কথা কেন বার বার বলছেন ?

রঘুবীর ভুরু কুঁচকোল। বুঝি পড়ে নিতে চাইল আদিত্যর গলায় বিরক্তি বেশি, না ঔদাসীন্য। মাথার ওপর আদ্যিকালের চার ব্লেডের পাখা ঘুরছে, তবু ঘরে মশা উড়ছে এলপাথাড়ি। চটাস করে এক চাপড়ে পায়ের ডগায় বসা একটা মশাকে মারল রঘুবীর। রক্তটা আঙুলে ঘষে নিল,— শোনালেই কি সব শেষ হয় ? কী ঠিক করলেন সেটা তো বলবেন।

—ঠিক করাকরির আছেটা কী। আদিত্য এড়ানোর ভঙ্গিতে বলল,— কাজ করা মানে আবার তো আপনার তিলকের গর্তে গিয়ে পড়া।

—আপনি কাজটা করবেন না ?

—নাহ্। ও কাজ আপনিই করুন।

—আমি ? আমার ক্যাপিটাল কোথায় ? হাতে টাকা থাকলে রঘুবীর চাটুজ্যে আপনাকে থোড়াই সাধত।

—আমারই বা ক্যাপিটাল কোথায় ?

—হাসালেন রায়দা। ওই দেখুন, আপনার কথা শুনে ক্যালেন্ডারের সিদ্ধিদাতাও হাসছেন। রঘুবীর গ্লাসে একটু জল ঢালল। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল,— আপনার লাখ টাকা তো ব্যাঙ্কে খেলা করছে রায়দা। মাগুরগুলোকে পুষে না রেখে কাজে লাগান, ডিম পেড়ে ঘর ভরিয়ে দেবে। দু-চার পয়সা যদি শর্টও পড়ে, আমার খুড়তুতো ভায়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, তারক টাকা হাওলাত দেবে।

—আগেই তো বলেছি রঘুবীরবাবু, ও টাকায় হাত দেওয়া যাবে না। ও আমার গিন্নির টাকা।

—কী করে ? ওটা তো সেন্ট পারসেন্ট আপনারই টাকা। মুস্তাফির পো টাকাটা আপনাকে দিয়েছে, না বউদিকে দিয়েছে ?

—যাকেই দিক, ও আমার গিন্নির সঞ্চয়। আদিত্য দু দিকে মাথা নাড়ছে,— মেয়ে বড় হচ্ছে, তার বিয়ে দিতে হবে...

—আপনাদের এখন টাকার অভাব ! মাসে মাসে হু হু করে ডলার আসছে, ছেলেই তো আপনাদের কোটিপতি করে দেবে। তার ওপর নিজের টাকা ঢেলে যদি কন্ট্রাকটারিটা করেন...দেখেছেন তো তিলক কেমন মুখের ওপর ফিফটিন পারসেন্ট ছুঁড়ে দেয়...তার মানে লাভ কত আন্দাজ করুন। টাকা তো আপনাকে শেষে সুইস ব্যাঙ্কে রাখতে হবে মশাই। আপনার খুকির জন্য গলায় গামছা দিয়ে কি যেন বলে, আর এন আই না এন আর আই, সেই পাত্র ধরে আনবেন। নতুন ফ্ল্যাট হচ্ছে, ছোট ভাই গাড়ি কিনল, এমন সুখের সময়ে ওই ল্যাখ টাকা কি বউদি যখের ধনের মতো সামলাবে ? মোটেই না। আপনি চাইলেই বউদি দেবে।

আদিত্য বিষণ্ণ হাসল। সুখ যে কী অদ্ভুত চিজ ! বুক শূন্য করে দিয়ে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল একটা বাড়ি, ওমনি সংসারে সুখ ছেয়ে গেল ! নিজের হাড়পাঁজরা চিরে বাপ্পার কেরিয়ার তৈরি করে দিল বাড়িটা। আক্ষরিক অর্থেই আদিত্য এখন লাখপতি, ওই বাড়িরই মেদ মাংস মজ্জা চুষে। ওই বাড়ির পেট ফুঁড়ে আলাদিনের পোষা দৈত্যের মতো অট্টালিকা বানাবে মুস্তাফি, নতুন ঝকঝকে স্বাধীন নীড় পাবে দীপু চাঁদুরা। আদিত্যরাও। একটা মাত্র বাড়ির বিনিময়ে এত সুখ এসে গেল !

এক অস্তিত্বহীন ইট কাঠ চুন বালি সুরকির কাঠামো আকুল করতে থাকে আদিত্যকে। সব কথা ভুলে গিয়ে শূন্য হয়ে যায় মস্তিষ্ক। হাত পা শিথিল হয়ে আসে। চোখ বুজে যায়। বোবায় ধরা মানুষের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করে আদিত্য, অতি কষ্টে জিভ বোলায় টাগরায়। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাস তোলে মুখের কাছে, লম্বা চুমুক দেয়, অনেকটা যেন রোবটের মতো। আরও ফাঁকা হয়ে যায় মাথা। ঝাপসা চোখে আদিত্য দেখে রায়বাড়িটা একটা গাছ হয়ে গেল। বটগাছ। অতিকায়। আদিম। গাছ বেয়ে হু হু করে ঝুরি নামছে। যেখানেই মাটিতে ঢুকছে ঝুরি, সেখানেই ফিনকি দিয়ে উঠছে রক্ত। ওই রক্তের ফোয়ারাই কি সুখ ?

—ও রায়দা, হল কি ? এর মধ্যেই নেশা চড়ে গেল ? আদিত্যর হাঁটুতে চাপড় দিল রঘুবীর,— নিন, পেঁয়াজি এসে গেছে।

আদিত্য ঘোর কাটাতে সোজা হয়ে বসল, কামড় বসাল পেঁয়াজিতে। খুনে ঝাল, এক কামড়েই ঘিলু চলকে যায়, তবে কষটে মুখে ভালও লাগছে বেশ। আচ্ছন্ন ভাব অনেকটা কেটে গেল।

রঘুবীর ঝুঁকে পড়েছে,— জয় গঙ্গা বলে নেমে পড়ুন রায়দা। আর এই খুঁটে খাওয়া জীবন ভাল লাগে না।

—তাতেও তো জীবন দিব্যি কেটে যায়। যায় না ?

—বুঝেছি। রঘুবীর সরু চোখে তাকাল,— আপনাদের পাড়ার ওই চামচিকেটা আপনার মগজ ধোলাই করে দিয়েছে। অনিলবাবুর সঙ্গে বিজনেসে আপনার ক টাকা হবে ? কন্ট্রাকটারির চেয়েও বেশি ?

এতক্ষণে অনাবিল হাসল আদিত্য,— আপনি কি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, আমি আর কারুর সঙ্গেই বিজনেস করছি না ? হ্যাঁ, অনিল আমায় অনেক বুঝিয়েছে। আট-দশটা মেয়ে আছে ওর হাতে, তাদের নিয়ে সেলস টিম করে ফেলবে। কোম্পানির সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে কমিশনে ডোর-টু-ডোর মাল বেচবে। সাবান শ্যাম্পু পাউডার কসমেটিক্স। লাভ খুব বেশি না হলেও ভালই। কিন্তু আমি তাকে সোজা না বলে দিয়েছি। আমার আর কোনও ব্যবসাতেই কোনও স্পৃহা নেই রঘুবীরবাবু।

—তা হলে আপনি করবেনটা কী ? মুস্তাফির বাড়ি যত দিন না ওঠে, ইট বালি পাহারা দিয়ে

যাবেন ? তাও নয় দিলেন, কিন্তু তার পর ?

আদিত্য দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল। শূন্য গ্লাস দু হাতের তালুতে ঘোরাচ্ছে,— ভাবছি কাশী চলে যাব।

—কাশী ? বোতল উপুড় করতে গিয়ে রঘুবীরের হাত থেকে খানিকটা তরল ছিটকে গেল। হাঁ হয়ে বলল,— কাশী তো বিধবারা যায় ! বউদি বেঁচে থাকতে আপনি কাশী যাবেন কেন ?

—ওখানে আমার এক পুরনো বন্ধু অছে। স্কুলের। পরিতোষ। রেলে চাকরি করে।

—ও হ্যাঁ, তার কথা তো আপনি বলেছেন। বিয়ে-থা করেনি, ঘাটে বসে মেয়েছেলেদের রামলীলা শোনায়।

—হুঁ, সেই পরিতোষ। ও একটা আশ্রম খুলছে। ফেরার আগের দিন সোনেপুরায় ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখনই আভাস দিয়েছিল। আমার তো ধর্মেকর্মে তেমন মতি নেই, আমল দিইনি। কাল ওর একটা চিঠি পেলাম। পুরনো ঠিকানায় পাঠিয়েছিল, মুস্তাফির দারোয়ানটা দিল। কিছু টাকা ডোনেশান পাঠাতে বলেছে। ভাবছি সব ছেড়েছুড়ে ওর আশ্রমের কাজে ভিড়ে গেলে কেমন হয় ?

—আপনি জটা ঝুলিয়ে সাধু হবেন ?

—মন্দ কি। সংসারের চেয়ে আশ্রম ঢের ভাল জায়গা। অনেক শান্তি।

—আজ্ঞে না দাদা, আশ্রমেরও বহুত হ্যাপা আছে। আশ্রম হল একটা প্রতিষ্ঠান, চালাতে হয়। লোকজন এলে তাদের তত্ত্বতদারক করতে হয়, ভক্ত জোগাড় করতে হয়, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে ঘুরতে হয়,...বেদবেদান্ত পাঠ করে তার মানে বলতে হয়।

—সে কি আমি পারব না ? দরকার হলে পড়াশুনো করে নেব। আপনি পুঁথি পড়ে জ্যোতিষী হয়ে গেলেন, আর আমি সাধু হতে পারব না ?

—এ দিকে বউদির কী হবে ? খুকির কী হবে ?

—আমি থাকতেই বা তাদের কী হয়েছে ? তাদের কাছে আমি একটা আপদ বই তো নই।

—এ হল অভিমানের কথা। রঘুবীর ঘাড় দুলিয়েই চলেছে,— ব্যাটাছেলে সংসারের মাথায় না থাকলে চলে ?

আদিত্য মনে মনে বলল, খুব চলে। রমরমিয়ে চলে।

পোড়া বিড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে। দিশি মদের গন্ধ ম ম করছে ঘরে। রঘুবীর মেঝেতে আধশোওয়া হল, খুকির কথাটা ভেবেছেন ? সে বেচারা তো কেঁদে কেঁদে কানা হয়ে যাবে।

আদিত্য আবার মনে মনে বলল, ওই একটাই তো মায়া। একটাই তো বন্ধন। তা মায়া বন্ধন কাটাতে না পারলে মানুষ কি আর সাধুসন্ন্যাসী হতে পারে ? মেয়েরও ঠিক সয়ে যাবে। বাপকে নিয়ে যন্ত্রণার হাত থেকে তো মুক্তি পাবে মেয়ে !

রঘুবীর আরও কিম্ভূত যুক্তি দেখাচ্ছে,— ধরুন খুকির একটা ভাল সম্বন্ধ এল, ছেলের বাড়ি থেকে যদি মেয়ের বাপের খোঁজ করে, তখন বউদি কি জবাব দেবে ? বর গেরুয়া লটকে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে শুনলে বউদির নিন্দে হবে না ? স্বামী যার মনের দুঃখে বিবাগী হয়, তাকে কি লোকে সতী বলবে ?

আদিত্যর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কেন এসব কথা তোলে রঘুবীর ? কেন অন্ধকার গুহায় হাত ঢোকায় ? কেন আদিত্যর যাতনা বাড়ায় ?

আদিত্য প্রাণপণে অন্য চিন্তায় ডুবতে চাইল। কত টাকা পাঠানো যায় পরিতোষকে ? দুশো ? পাঁচশো ? হাজার ? আদিত্য যদি ওখানেই ডেরা বাঁধে, হাজারের কমে মান থাকে না। কিন্তু সেও তো ইন্দ্রাণীর কাছে চাইতে হবে। ওফ্, আবার সেই ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী। এক ঢোঁকে অনেকটা তরল আগুন গিলে নিল আদিত্য। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হেঁচকি উঠছে। ঘামছে কুলকুল। চাঁদুর কাছে টাকাটা চাইলে কেমন হয় ? সে তো এখন শাহেনশা মানুষ, দাদাকে হাজারটা টাকা দিতে পারবে না ? দীপুও দিতে পারে। দীপু নয় পাঁচশো দিল, চাঁদু পাঁচশো। একবারই তো দেবে ভাইরা। শেষবার।

রঘুবীর আবার পাত্র পূর্ণ করছে। আদিত্য চোখ বুজে হাত বাড়াল। আরও নেশা চাই, আরও। নেশাতেই সুখ, নেশাতেই এখন বিস্মৃতি।

কাচের চুড়ির রিনরিন আওয়াজ হচ্ছে। মদের গন্ধ ছাপিয়ে সস্তা উগ্র সেন্টের গন্ধ ঝাঁপিয়ে এল ঘরে। কেয়া ফুলের মেকি সৌরভ।

—ও মা রঘুদা, তুমি যে একেবারে লেটে গেছ গো ? রায়দা, আপনিও আউট ?

আদিত্য তড়িৎ বেগে ঘাড় ঘোরাল। দরজায় বিজলি। মুখে আঁচল চেপে হাসছে খিলখিল।

৭২

মেয়েটাকে দেখলে শরীর টনকো হয়ে ওঠে, রক্তস্রোত চঞ্চল হয়। অল্প চ্যাপ্টা নাক, মোটা মোটা চোখ, ভরাট লম্বাটে গাল, দাঁতের কাছটা সামান্য উঁচু। বয়স বড়জোর তিরিশ, মাজা অঙ্গে মসৃণ ঔজ্জ্বল্য, বয়সেরই, দেখে মনে হয় মাছি বসলেও পিছলে যাবে। হাসলে পরে দেহখানা এঁকেবেঁকে দোলে, ঠোঁট খুললে লাল পাথরের নাকছাবি নেচে ওঠে ঝিকমিক, ভ্রূকুটিতে আঁধার নামে। উদ্ধত বুক, নিটোল উরু, ভারী নিতম্ব, বিজলিরানির মাংসল শরীর জুড়ে যৌবনই যৌবন। প্রাচীন কালে এমন মেয়েরা মহারানির প্রধানা সহচরী হত। কপালদোষে সুবল মিস্ত্রির ঘরে জন্মেছে বিজলি। এমন মেয়েকেও বর নেয় না, সেও কপালের দোষ ছাড়া আর কি !

রঘুবীর পরনের লুঙ্গিখানা পায়ের বুড়ো আঙুল অবধি টেনে দিল,— আয় বোস। এই ফিরলি বুঝি ?

বিজলি দুই মাতালকে টপকে খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল,— বা রে, আজ বোনাসের ডেট ছিল না ! ছুটির পর বসেই আছি, বসেই আছি, মালিকটা শালা এলই না।

আদিত্য চোরা চোখে দেখে নিল বিজলিকে। মেয়েদের মুখে শালা শুনতে তার ভাল লাগে না। বারকয়েক বলেওছে মেয়েটাকে। শোনে না। বলে ওটা নাকি তার কথার মাত্রা।

রঘুবীর দ্বিতীয় বোতলের ছিপি খুলল। নাকের কাছে এনে বোতলটা শুঁকল একটু। গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল,— তোর মালিককে এখনও তুই চিনলি না রে বিজলি ! একের নম্বরের ফোর টোয়েন্টি। বিষ্টু দাস তোদের বোনাস দেবে ! ফুঃ !

বিজলির দুলুনি থেমে গেল,— দেবে না মানে ? ইল্লি রে। গতর খাটিয়ে কাজ করি, পাওনা টাকা না দিলে ওর বাড়ি গিয়ে দা-এর কোপ মেরে আসব না ! শালা কত প্রফিট মারে জানো ? কাডবোর্ডের ব্যবসায় দশ টাকায় দশ টাকা লাভ। এখন কত বড় বড় কোম্পানির অর্ডার ধরেছে ! ওই যে গো লাইট বালব বানায়, রেডিও টিভি বানায়, বিদেশে ফ্যাক্টরি আছে, তাদের এখন একচেটিয়া বাসকো দিচ্ছে। তিন তিনটে ওষুধ কারখানাতেও মাল দেয়। বলতে বলতে টেরচা চোখে আদিত্যর দিকে তাকাল। আবার দুলতে শুরু করেছে,— ও রায়দা, একটা কথা বলি শুনবেন ?

আদিত্য বিরস স্বরে বলল,— কী কথা ?

—অনেক কারবার তো করেছেন শুনি। সব্বোত্রই তো ঝাড় খেয়েছেন। এবার একখানা কাডবোর্ডের কারখানা খুলুন দিকিনি। রঘুদা হবে ম্যানেজার, আমি মেয়ে খাটাব, আর আপনি সাঁ করে গাড়ি চড়ে ঢুকবেন, সাঁ করে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে যাবেন।... বলেন তো শেট দেখি, মেশিং দেখি।

আদিত্য হাত তুলল,— থাক।

—থাকবে কেন। খুলুন না, ও রায়দা। লালে লাল হয়ে যাবেন। শুধু হুইস্কি আর রাম খাবেন। মাইরি বলছি, দাসীর কথা বাসি হবে না।

—আহ বিজলি, ফ্যাচর ফ্যাচর বন্ধ কর। রায়দার আজ মনমেজাজ খারাপ।

—আহা, কী হয়েছে গো ?

—সংসার থেকে রায়দার মন উঠে যাচ্ছে। সন্নিসি হবে ভাবছে। রঘুবীর বিড়ি ধরাতে গিয়ে গোটা দু-তিন কাঠি নষ্ট করল,— রায়দা এবার কাশীবাসী হবে।

—বাল্লাই ষাট, কাশী যাবে কি মরতে ? বিন্দাবন নবদ্বীপ গেলে নয় তাও কথা ছিল। সাধনসঙ্গিনী জুটত... যাবেন নাকি গো নবদ্বীপ ? তা হলে আমিও বোষ্টুমি হতে পারি। হিহি হিহি।

—বিজলি, তুই বড় বেশি ফাজিল হয়েছিস। এই সেদিনের মেয়ে, বড় বড় দাদাদের নিয়ে ইয়ার্কি মারিস ? দাঁড়া, তোর বাপকে গিয়ে বলছি।

আদিত্য জানে এটা নেহাত কথার কথা। মেয়েকে সুবল মিস্ত্রির কিছু বলার ক্ষমতাই নেই। এক সময়ে নাকি ইলেকট্রিক লাইনের নামী মিস্ত্রি ছিল, হাই ভোল্টের শক খেয়ে এখন তার আধা পঙ্গু দশা। টেনে টেনে টলে টলে হাঁটে, এলাকার ছোকরা মিস্ত্রিরা দয়া করে কালেভদ্রে হেল্পারের কাজে নিয়ে যায় সুবলকে। যে মেয়ের রোজগারে পেট চলে, তার ওপর কী দাপট দেখাবে বাবা !

বিমলা ঘরে এসেছেন,— অ্যাই বিজ্‌লি, অনেক হয়েছে, তুই এবার এখান থেকে যা তো। আমি এখন এদের খেতে দেব।

বিজলির নড়ার লক্ষণ নেই,— দাও না, আমি কি মুখ থেকে কেড়ে নেব !

—না, তুই যা। লোকের ঘরে খাওয়ার সময়ে থাকতে নেই।

গা মুচড়োতে মুচড়োতে হাই তুলল বিজলি। মোটা বিনুনি ঝট করে টেনে ফেলে দিল পাহাড়ি উপত্যকায়। দরজায় দাঁড়িয়ে বেণী নাচাতে নাচাতে বলল,— কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবেন গো রায়দা। হয় কাডবোর্ড, নয় নবদ্বীপ।

সস্তা কেয়া ফুলের গন্ধ মিলিয়ে গেল।

আশপাশের কোনও ঘরে তুলকালাম ঝগড়া বেধেছে। তারস্বরে চেল্লাচ্ছে এক মহিলা, তার ওপরে গলা তুলছে এক পুরুষ। রঘুবীরের আস্তানার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, আজ তাও একটু কম আছে। চিৎকারে আদিত্যর নেশা কেটে যাচ্ছিল। হাঁড়িকড়ার আওয়াজ হচ্ছে বারান্দায়, শুনতে পেল আদিত্য।

আদিত্যর হুঁশ ফিরল। উঠে দাঁড়িয়েছে।

রঘুবীর হাঁ হাঁ করে উঠল,— চললেন কোথায় ? মাসি ভাত বাড়ছে।

আদিত্য জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল,— ফিরতেই হবে। মেয়েকে কথা দেওয়া আছে।

—যাবেন। খেয়ে যান। মাসির হাতের ভাপা ইলিশ আছে আজ।... কী স্বোয়াদ !

—না না, দেরি হয়ে যাবে। আদিত্য ঘড়ি দেখল,— ট্রেন পাব তো এখন ?

—পাবেন না কেন ! সবে তো সাড়ে নটা। ... এই, বসুন না।

বিমূঢ় বিমলাকে পিছনে ফেলে বেরিয়ে এল আদিত্য। হাঁটছে। সরু রাস্তার বাঁকে এসে থমকে দাঁড়াল। সেই কুকুরটা বসে আছে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, চলেছে সঙ্গে সঙ্গে।

স্টেশনে এসে টিকিট কেটে ডাউন প্ল্যাটফর্মের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল আদিত্য। ঝিমঝিম করছে মাথাটা, চারদিকের আলো কেমন ঘোলাটে, নিস্তেজ। পেটেও একটা চিনচিনে ব্যথা, অচেনা দুঃখের মতো। একটা ট্রেন এল, চলে গেল, উঠতে ইচ্ছে করল না আদিত্যর। ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না। ঘরে ফিরতে মন লাগে না, বাইরে থাকলেও আনন্দ নেই। রঘুবীরের ডেরায় বিবমিষা জাগে, বেরিয়ে এলে মনে হয় বেশ তো ভোঁ হয়ে ছিলি, উঠলি কেন !

দূরের টি স্টলে রেডিও বাজছে। চেনা গান। কোই হমদম না রহা, কোই সাহারা না রহা...। কতকালের পুরনো গান, শুনলে এখনও বুকটা মুচড়ে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। এখনই কেন বাজল গানটা ! কার হমদম আছে দুনিয়ায় ! এ জগতে কে কার সাহারা ! আদিত্য দু হাতে কান চেপে ধরল, শুনবে না গান। হাত যখন সরাল, গান তখন থেমে গেছে। আবার অতৃপ্তি। আবার বিষাদ। কেন গানটা থেমে গেল !

আর একটা ট্রেন ঢুকছে। আলোর ঘরগুলো মন্থর হতে হতে নিশ্চল। সামনেই যে কামরাটা

দাঁড়াল, তাতেই টলমল পায়ে উঠে পড়ল আদিত্য।

ফাঁকা কামরা। গুটিকতক লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। আদিত্য জানলার ধারে বসল, ছুটন্ত বাতাসে মৌতাত জমে। ট্রেন ছাড়তেই একটা গাঁট্টাগোট্টা ছেলে তড়াং করে লাফিয়ে উঠল কামরায়। দাড়ি মুখ, হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি। জুলজুল চোখে দেখছে যাত্রীদের। যেন হিসেব কষছে কিছু। লোকজন নার্ভাস, অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছে, আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে ছেলেটার দিকে।

আদিত্য ঈষৎ মজা পেল, যা সে এখন কদাচ পায়। ছেলেটা কি চোর, ছিনতাইবাজ! হলে মন্দ কী, তাও তো একটু রোমাঞ্চ আসবে জীবনে। কিন্তু যার নিজেরই প্যান্টজামা নেই, সে কি তেমন রোমহর্ষক কিছু ঘটাবে!

হঠাৎ ছেলেটা হেঁকে উঠল,— খেলা দেখুন বাবু, খেলা দেখুন। সার্কাস দেখুন। এ সার্কাস কোনও তাঁবুতে মিলবে না।

বলেই ছেলেটা ঝুলন্ত হ্যান্ডেল ধরে দুলতে শুরু করল। মাঝের প্যাসেজটুকুতে কতটাই বা জায়গা, সেখানে শরীর ঝুলিয়ে দুলছে সাঁই সাঁই। দক্ষ ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের মতো এ হ্যান্ডেল থেকে ও হ্যান্ডেলে উড়ে যাচ্ছে। থামল হঠাৎ। হ্যান্ডেলে চাড় দিয়ে ওঠাচ্ছে শরীর। উঠতে উঠতে কোমর হ্যান্ডেলের লেভেলে চলে এল। একবার গুটোল শরীরটা, ডিগবাজি খাচ্ছে শূন্যে, পুঁটলি হয়ে বনবন ঘুরছে একটা মানুষ।

আদিত্যর গায়ে কাঁটা দিল। পাগল নাকি!

যাত্রীরা নিশ্চিন্ত, মজাসে খেল দেখছে। চক্রাকারে প্যাক খেতে খেতে দড়ামসে কামরার পাটাতনে পড়ল ছেলেটা, ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বড় বড় শ্বাস ফেলছে। ঘাম মুছছে। একটু জিরিয়ে শীর্ষাসন করল, দু হাতে ভর দিয়ে চলন্ত কামরায় হাঁটছে। একটা উল্টো মানুষ গুট গুট ঘুরছে কামরায়। সিগনালে ট্রেন থেমেছে, হঠাৎ চলতেই ঝাঁকুনিতে ঠোক্কর খেল সিটে, তবু পড়ল না। ঝপ ঝপ দুটো ভল্ট দিয়ে দাঁড়িয়েছে সটান।

খেল খতম। কামরায় ঘুরে ঘুরে পয়সা চাইছে ছেলেটা। উল্টোডাঙায় নামার আগে একজন দু টাকার নোট দিয়ে গেল। বাকিরা কেউ দিচ্ছে, কেউ উদাসীন।

আদিত্য পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ডাকল,— এই যে ভাই, শোনো।

ছেলেটা সামনে এল।

খুঁজেপেতে ছেলেটার হাতে আদিত্য কয়েন দিল একটা,— তুমি তো বড় আজব চিজ হে ভাই! রাতদুপুরে সার্কাস দেখাও!

ছেলেটা বিমর্ষ মুখে বলল,— করব কী? আজ যে ভাল কামাই হয়নি।

—হুম। তা থাকা হয় কোথায়?

—নিবাস হুগলি জেলা। তারকেশ্বরের ওদিকে।

—অদ্দুর থেকে এদিকে কেন?

—ও লাইনে খেলা পুরনো হয়ে গেছে। আর তেমন পয়সা ওঠে না।

—এ লাইনে ওঠে?

—উঠছে... উঠছে না। ক'দিন পরে আর এক লাইনে চলে যাব।

আদিত্যর কথা বলতে ভাল লাগছিল। ঢুলু ঢুলু চোখে বলল,— এত রাতে তো আর বাড়ি ফেরা হবে না, থাকবে কোথায়?

—ইস্টিশনে থেকে যাব। ঘরও তো একটা ইস্টিশন, কী বলেন?

—বেশ বলেছ তো! আদিত্য মাথা দোলাল,— ঘর হল ইস্টিশন। তা তোমার বাড়িঘরের টান নেই?

—আছে। তবে আগে পেট, না আগে ঘর?

—এ খেলা দেখিয়ে পেট চলে ?

—বেঁচে তো আছি। ছেলেটা খুচরো পয়সা গুনছে, বেঁচে থাকাটাই লাভ।

—তুমি তো বেশ ফিলজফার আছ হে ! বলছ, বেঁচে থাকাই লাভ ? কেন, মরে গিয়ে লাভ নেই ?

—মরে কি লাভ বলুন। মরা মানুষের সুখ আছে ? আনন্দ আছে ?

—সে তো ভাই দুঃখও নেই। আছে ? বলো।

—মরে যাওয়াটাই তো দুঃখ। মরে গেলে মানুষ বেঁচে থাকবে না, এটাই তো দুঃখ।

ভারি অদ্ভুত কথা ! কথাটায় যেন কেমন নেশা আছে, মোহ আছে। বেঁচে থাকাই যদি সুখ হয়, তবে কষ্টেসিষ্টে না মরে বেঁচে থাকলেই তো চলে। কার জন্য বাঁচা, কী ভাবে বাঁচা, কী উদ্দেশ্যে বাঁচা, সব ভাবনাই তো তবে অর্থহীন।

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে ছেলেটা অন্য দিকে চলে গেল। সাউথ সেকশান খানিকটা পথ, মাঝে অনেকটা খোলা চাতাল। আলোয় আলোয় দিন হয়ে আছে জায়গাটা। এদিক-সেদিক মেয়েরা চরে বেড়াচ্ছে, সস্তা শাড়ি, ঠোঁটে রঙ। তিতিরেরই সমবয়সী প্রায়, একটা হাড় জিরজিরে মেয়ে সামনে এসে আঁচল ফেলে দিল,— বেশি নয়। কুড়ি টাকা।

আদিত্য চোখ সরিয়ে নিল। এও বেঁচে থাকা ! আহা রে মেয়ে !

খোলা আকাশের নীচে সার সার শুয়ে আছে মানুষ। এও বেঁচে থাকা ! সাউথ সেকশানে একটা ট্রেন ভোঁ দিল, দুদ্দাড়িয়ে ছুটছে তিনটে লোক। এও বেঁচে থাকা ! এক অন্ধ ভিখিরি বাটির জলে শুকনো রুটি চটকাচ্ছে। এও বেঁচে থাকা !

শেষ ক্যানিং লোকাল ছাড়েনি এখনও। ধীরেসুস্থে উঠে বসল আদিত্য। নেশা আজ চড়েনি তেমন, বেঁচে থাকাটা জানান দিচ্ছে।

চলছে ট্রেন। খোলা জানলা দিয়ে হু হু হাওয়া আসছে, শরতের মিঠে বাতাস। পার্ক সার্কাস কবরখানায় টিমটিমে বাতি জ্বলছে কয়েকটা, ফিকে অন্ধকারে শুয়ে আছে মৃত মানুষ। ওরা কি দুঃখী ? চিন্তা আর চোখ একসঙ্গে জড়িয়ে এল আদিত্যর। মৃতেরা দুঃখী, জীবিতরা নয়। আদিত্য কাশীতে আছে, না মধুগড়ে, সেলিমপুরে আছে, না ট্রেনের কামরায়, কি আসে যায় !

আদিত্য ঘুমিয়ে পড়ল। ঢাকুরিয়া পার হয়ে গেল ট্রেন।

আদিত্যর ঘরে এখন অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে। তিতির পড়ে এ ঘরে বসে। পড়াটা বাহানা, মা'র কাছে শুতে এখন তার ভারী অস্বস্তি। একটু পর পরই বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালায় মা, চমকে চোখ বন্ধ করতে হয় তিতিরকে। বাবা না ফিরলে তিতিরের যে ঘুম আসে না, তিতির করবেটা কী !

তার চেয়ে এই ভাল। পড়াশুনোর নাম করে বই ছড়িয়ে বসে থাকা। আদিত্যর পায়ের আওয়াজ পেলেই ছুট্টে গিয়ে দরজা খুলে দেয় তিতির, শব্দ না করে। খেতে দেয় বাবাকে, মশারি টাঙিয়ে দেয়, তারপর বেড়াল-পায়ে মা'র বিছানায়। বাবা না ফিরলে এ ঘরেই কাটিয়ে দেয় রাত। এ বন্দোবস্ত বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে।

আজ তিতিরের সামনে ইতিহাস বই। জালিয়ানওয়ালা বাগে গুলি চালিয়েছে ব্রিটিশ, পড়ে পড়ে তার খুঁটিনাটি নিয়ে নোট বানাচ্ছে। তুচ্ছ শব্দে ভেঙে যাচ্ছে নিবিষ্টতা, খাড়া হয়ে উঠছে কান।

খুট করে একটা শব্দ হল। কন্দর্প বাথরুমে যাচ্ছে, তিতির দেখল। খানিকক্ষণ আগে সেতার নিয়ে বসেছিল ছোটকা, ভৈরবী বাজাচ্ছিল। কী যে ভুলভাল সময়ে উল্টোপাল্টা রাগ বাজায় ! তবু ধ্বনিটা যেন ঝঙ্কৃত করছিল বাড়িটাকে, কাঁপছিল বাতাস।

বাথরুম থেকে ঘরে না ফিরে তিতিরের দরজায় এল কন্দর্প,— তুই এখনও শুসনি ? কটা বাজে খেয়াল আছে ?

আদিত্যর ঘরে ঘড়ি নেই। এ ঘরে সময় বড় মূল্যহীন। তিতির ছোট্ট একটা হাই তুলল,— কটা

বাজে গো ?

—বারোটা চল্লিশ। ... তুই এত লক্ষ্মী মেয়ে হলি কবে থেকে রে ? এত রাত অবদি পড়ছিস রোজ ?

—কী করব ! রেজাল্ট খারাপ হয়েছে যে।

—হয়েছে তো হয়েছে। রাত জাগতে হবে না। শো গিয়ে। কন্দর্প একটু থামল,— আমি এখনও কিছুক্ষণ জেগে আছি।

বই খাতা কলম টেবিলে গুছিয়ে রাখল তিতির। ভাবল একটুক্ষণ। বাবার খাবার কি ফ্রিজে তুলে দেবে, না আর একটু দেখবে ? পরশু রাত একটায় ফিরেছিল বাবা।

তিতির ঘুরে তাকাল,— লাস্ট ট্রেন কি চলে গেছে ছোটকা ?

কন্দর্প মৃদু হাসল,— যেতে পারে। অনেকক্ষণ তো আওয়াজ শুনছি না। তবে ট্যাক্সি সারা রাত চলে। আর জানিস তো, মাতালদের ট্যাক্সি রিফিউজ করে না।

কথাটা যেন সুতীক্ষ্ণ সূঁচ হয়ে বিঁধল তিতিরকে, মুখ পলকে কালো হয়ে গেল। একটি কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খাবারদাবারগুলো ফ্রিজে তুলছে।

কন্দর্পও বাইরে এল। অপ্রস্তুত স্বরে বলল,— চটে গেলি ?

—না, ঠিকই তো বলেছ। গলায় আটকে থাকা একটা শক্ত ডেলা গিলে নিল তিতির,— মাতালকে তো মাতালই বলে।

—দূর পাগলি। কত দুঃখে যে বলি। তোর বাবা আমার দাদা হয় না ? কন্দর্প আলগা চাপড় মারল তিতিরের মাথায়। একটু ভারী স্বরে বলল,— খারাপ লাগে কি জানিস ? ...গোড়াতেই বউদিকে বলেছিলাম ওই ফেরেববাজটার পাল্লায় পড়তে দিয়ো না। না বউদি শুনল, না তুই কিছু বললি দাদাকে।

—তুমি মাকে বলেছিলে ?

—বলিনি ! নিশ্চয়ই বলেছিলাম।

—মা কেয়ার করেনি, তাই তো ? তিতিরের গলায় শ্লেষ,— কিন্তু তুমি কি করেছ ছোটকা ? লোকটা ফেরেববাজ জেনেও তো তার দেওয়া আংটি পরে ঘুরছ !

কন্দর্প আবার অপ্রতিভ হল,— তুই এই স্টার রুবিটার কথা বলছিস ? খুব বেশি জক দিতে পারেনি রে। ওনলি পাঁচশো টাকা। ব্যাটা আমায় একটা আসলি রুবি ধরাতে চেয়েছিল। পাঁচ হাজারের।

—পাঁচ হাজারই হোক, পাঁচশোই হোক, তুমিও পাল্লায় পড়েছ তো ?

কন্দর্প জোর করে হেসে উঠল,— তুই দিনে দিনে একদম তোর মা'র কার্বন কপি হয়ে যাচ্ছিস। টোনটা পর্যন্ত...

—তুমি কথা ঘোরাচ্ছ ছোটকা।

কন্দর্প ঢোঁক গিলল। অল্পক্ষণ চুপ থেকে বলল,— ঠিকই বলেছিস। আমাদের সকলেরই অ্যালার্ট হওয়া উচিত ছিল।

তিতির আর কোনও কথা বলল না। নিঃশব্দে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে।

কন্দর্প হঠাৎ বলে উঠল,— একটা কাজ করলে হয় না ? চল না, তুই আর আমি মিলে সংসারটাকে একটু রিপেয়ার করার চেষ্টা করি।

তিতির তির্যক চোখে তাকাল,— কী ভাবে ?

—ধর, বাড়িতে যদি একটু খুশি খুশি অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করা যায়। যেমন ধর, আমি একদিন বাজনা বাজালাম, কয়েক জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলাম...তুই মধুমিতাকে তো দেখেছিস, ধর ও-ও বাচ্চা নিয়ে এল...তুই দাদাকে জোর করে আটকে রাখবি... বউদিও থাকবে... একটা বাচ্চা বাড়িতে সারা দিন হই হই করলে বাড়ির মুডটাও বদলাবে। কি, প্ল্যানটা খারাপ ? তুইও ইচ্ছে হলে তোর

বন্ধুদের ডাকতে পারিস।

তিতির হাঁ করে কন্দর্পর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোটকার পরিকল্পনার যেন কিছু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে, বোঝা যাচ্ছে না! উদ্দেশ্য না থাকলে কেউ এরকম হাস্যকর পরিকল্পনা করে! বাড়ির ভেতরকার দম-চাপা ভাবের কারণটাকে দূর না করে বাইরে থেকে খুশি আমদানি করতে চায় ছোটকা! সাফল্য কি ছোটকাকে ভোঁতা করে দিচ্ছে!

কন্দর্প যেন তিতিরের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন তিতির ঘাড় নাড়লেই কাল থেকে...। তিতির উচ্চবাচ্য করছে না দেখে একটু যেন নিরাশ হল।

তবু নিবল না। আবার বলল,— আরও একটা কাজ করা যায়। চল, আমরা একদিন গাড়িটা নিয়ে, দাদা বউদিকে নিয়ে হোলডে আউটিং-এ বেরিয়ে পড়ি। কোলাঘাটের দিকে যেতে পারি, ডায়মন্ডহারবার যেতে পারি, মায়াপুর যেতে পারি, বলিস তো দিঘা-টিঘাও...। আমরা কখনও এক সঙ্গে কোথাও বেরোই না তো, বদ্ধ লাইফে থেকে থেকে সবার মনে জং পড়ে গেছে।

তিতির উদাসভাবে বলল,— মাকে তোমার প্ল্যানটা বলে দেখো। বলেই সোজা বাথরুমে চলে গেছে। বেরিয়ে দেখল কন্দর্প ঘরে যায়নি, বসে আছে খাওয়ার চেয়ারে। কী ভাবছে ছোটকা? সব মুশকিল আসানের আরও কোনও নয়া টোটকা?

বাবার খাটে মশারি টাঙিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল তিতির। চোখ বুজে শুনতে পেল ঘর থেকে বেরিয়েছে মা, চাপা তীব্র স্বরে কথা বলছে ছোটকার সঙ্গে। উৎকর্ণ হল তিতির, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। মিন মিন করে কি বলল ছোটকা, জবাবে মা'ও কি বলছে।

ছোটকার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আবার গাঢ় নৈঃশব্দ্য। ছমছমে নীরবতা।

সহসা পেট কাঁপিয়ে হাসি ছিটকে এল তিতিরের। মা'র কুকুরের কান, নির্ঘাত সব শুনেছে, জোর ঝাড় দিল ছোটকাকে। বেচারা ছোটকা! ক্রনিক ডিজিজে কি সহজ টোটকা-টুটকি চলে! রোগটার মূল কোথায় জানতে হবে না! অনেক দিনের পুরনো টিবি রোগে কি কুইনাইন চলে!

হাসতে-হাসতে কেঁদে ফেলল তিতির।

৭৩

ধীরাজ বললেন,— এত দামি পাঞ্জাবি কেন কিনতে গেলি রে ইনু?

—দামি-অদামি দেখতে হবে না। তোমার পছন্দ কি না বলো।

—খুব ভাল। ভীষণ ভাল। কত পড়ল রে?

—ফের দামের কথা? গায়ে দিয়ে দ্যাখো ফিট করে কি না। বড় হলে আবার সাইজ চেঞ্জ করতে হবে।

—নয় একটু ঢোলাই হল। তবে এসব সিলক গরদ কি আর আমি পরি রে? ধীরাজের খুঁতখুঁত ভাব যাচ্ছিল না,— মিছিমিছি টাকা অপচয় করলি।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ রুক্ষ হল,— পরতে হয় পরো, না পরতে হয় ফেলে দিয়ো। বছরকার দিনে বাবা-মাকে একটা জিনিস দেব, তাতে অপচয়ের কথা আসে কোত্থেকে?

উমা বিছানায় বসে মেয়ের আনা শাড়িটা দেখছিলেন, চওড়া নকশা পাড় তসরের শাড়ি। মেয়ের আকস্মিক রূঢ়তায় ঘুরে তাকালেন। বুঝিবা মেয়েকে সন্তুষ্ট করতেই লঘু স্বরে ঝামরে উঠলেন স্বামীকে,— তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি। মেয়ে ভালবেসে এনেছে, চুপচাপ পরে নেবে, তা নয়...। এখন ওর হাতে টাকা আছে, তাই এনেছে।

—টাকা আছে মানে? ইন্দ্রাণীর বিরক্তি বেড়ে গেল,— আমি কি তোমাদের ভাল জিনিস দিই না?

—ওমা, আমি কি তাই বললাম ! তুইই তো দিস। উমা আরও নরম করলেন গলা,— তবে এখন তো তোর বেশি আনন্দের সময়, তুই আরও দিবি। নতুন বাড়ি হচ্ছে, হাতে মোটা টাকা এসেছে, ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেল...

—তাতে আমার কি মা ? টাকা বাড়ি সবই তোমার জামাইয়ের। আর ছেলের টাকা ? তার নামে অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে, সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি... তার টাকা এখন তার নামেই জমা পড়ছে। ওসব টাকায় আমি হাতও দিই না।

—ও কি কথার ছিরি ! ওদের টাকা কি তোর টাকা নয় ?

—নয়ই তো। একটা কথা পরিষ্কার জেনে রাখো মা, তোমার মেয়ে অন্যের টাকায় মা-বাবাকে দামি উপহার দেয় না। ইন্দ্রাণীর গলা চড়ে গেল, আমি দিই আমার রোজগারের টাকায়।

—আচ্ছা বাবা তাই। অত রেগে যাচ্ছিস কেন ?

—রাগাচ্ছ বলেই রাগছি। আজেবাজে কথা বলছ বলে রাগছি।

—এমন কিছু তোমায় বলা হয়নি ইনু। উমা অপ্রসন্ন মুখে শাড়িটা ভাঁজ করলেন,— তোর আজকাল কথায় কথায় গায়ে বড় ফোসকা পড়ে। তুই তো এমন ছিলি না ইনু !

কথাটা শুনেই আরও পিত্তি জ্বলে গেল ইন্দ্রাণীর। কেমন ছিল ইন্দ্রাণী ? হাস্যময়ী, লাস্যময়ী, বিভঙ্গময়ী ? কথায় কথায় গলে গলে ঢলে ঢলে পড়ত ? বিয়ের পর থেকে কবে মেয়েকে তরল খুশি প্রাণবন্ত দেখেছে মা ? এখনই বা ইন্দ্রাণী কিসে পরিণত হয়েছে ? প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ? খিটখিটে, ঝগড়ুটে, মুখরা ? কেন মেয়ে হাসতে ভুলে গেছে, কেন সর্বক্ষণ তার মাথা জ্বলে, কখনও কি মা ভাবার চেষ্টা করে ? ভাববেই বা কেন ? মা-বাবা তো সংসার গড়ে দিয়েই খালাস, মেয়ের জীবন তো তার কপাল, তাতে তাদের কিসের দায় !

ইন্দ্রাণী গোঁজ হয়ে বসে আছে। তার রাগ যে অক্ষমের আস্ফালন, এ কথা তার থেকে বেশি আর কে জানে ! না হলে যে কথা বলতে গিয়েও সেদিন থেমে গেল তিতির, যে ইঙ্গিত দিল, তার পর কি ওই মেয়ের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া উচিত ছিল না ! কোন সাহসে মেয়ে ও কথা বলে ? সারা জীবনে কখনও কি মাকে অসংযত, বেসহবত দেখেছে ? যে-মেয়ের জন্য চিত্ত মেঘলা হয়ে রইল চিরকাল, সেই কি না মার দিকে আঙুল তোলার স্পর্ধা পায় ? অথচ তাকে কিছুই বলতে পারল না ইন্দ্রাণী। কতবার শুভকে কথাটা বলার চেষ্টা করল, জিভ যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরল কেউ। শুভর সঙ্গেও এখন মেয়ে কী ব্যবহারটাই না করছে ! ডাকলে সাড়া দেয় না, দেখলে ছিটকে অন্য ঘরে চলে যায়, সামনাসামনি পড়ে গেলে উচ্ছে খাওয়া মুখে বাঁকা বাঁকা জবাব দেয়। কার সঙ্গে তুই অমন করিস মেয়ে ? যে লোকটা ঘরের সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে, কাজকর্ম ফেলে, শুধু তোকে দেখার জন্য ছুটে ছুটে আসে, তার সঙ্গে ?

সব বেমালুম হজম করতে হবে ইন্দ্রাণীকে ! তাকে রাগলে চলবে না ! তাকে হতে হবে আকাশের মতো উদার, বসুন্ধরার মতো সর্বংসহা, নদীর মতো সদা বেগবতী। অপরাধ ? তার জীবনে কাঁটা বিঁধে আছে। একজনকে ভালবাসার কাঁটা। একজনকে না ভালবাসার কাঁটা। আরও অপরাধ, একটা সাজানো সংসারে সে বিন্দুমাত্র ক্লেদ লাগতে দেয়নি। আরও আরও অপরাধ, আর একটা মেয়ের সংসার চুরমার করে দেয়নি ইন্দ্রাণী।

সাজা তো ইন্দ্রাণীকে পেতেই হবে ! তাকে তো রাগলে চলবে না !

ধীরাজ টিভি চালিয়েছেন। রাগবি খেলা চলছে পর্দায়। একটা লোক বল আঁকড়ে দৌড়চ্ছে, একঝাঁক প্রতিপক্ষ ছেঁকে ধরেছে তাকে, বুনো জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর। লোকটা কাদায় মাখামাখি, বারবার আছাড় খাচ্ছে, তবু বল ছাড়ছে না।

ইন্দ্রাণী টিভি থেকে চোখ সরিয়ে নিল। অনুচ্চ স্বরে ডাকল,— মা...

উমা অন্দরে। উত্তর দিলেন,— ডাকছিস ইনু ?

—তুমি কি চা করছ ?

—বসাচ্ছি। ঘুগনিটা গরম করে নিই...। পুজোর বাজার কি তুই আজই করলি?

উমার স্বর অনেক প্রশান্ত এখন, ইন্দ্রাণী স্বস্তি পেল। নিজের যন্ত্রণা নিজেরই থাক, এ দুটো জীবন্মৃত মানুষকে পীড়ন করার কোনও অর্থ হয় না।

ইন্দ্রাণী রান্নাঘরে উঠে গেল,— না গো, বাজার করাই ছিল। কালই আসব ভাবছিলাম, রুনারা এসে গেল।

—তাই! কেমন আছে তারা?

—দিব্যি আছে। খারাপ থাকার তো কথা নয়।

—ওদের বাড়ি একদিনও গিয়েছিলি?

—সময় পাইনি।

—ওরা মাঝে মাঝে আসে?

—দীপু আসে। রুনাও আসে, দরকার পড়লে।

—যাই বলিস, মেয়েটাকে আমার বেশ লাগে। কী মিষ্টি কথাবার্তা। তোর শ্বশুরমশাইয়ের কাজের দিন আমাদের খুব আদরযত্ন করেছিল।

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কে যে কী, ইন্দ্রাণীই জানে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। রান্নাঘরে কাচের শার্সি, আধখোলা। পশ্চিমমুখো আলোর ফালি টেরচাভাবে ঢুকছে ভেতরে। মধ্য আশ্বিনের আলো বিকেল নামতেই কাঁচা সোনা। পিছনের গলির ক্রোটন গাছের পাতারা আঁকাবাঁকা ছায়া ফেলেছে জানলায়। বাতাসে কাঁপছে ছায়ারা। মৃদু মৃদু।

উমা স্টিলের বাটিতে খানিকটা ঘুগনি তুললেন,— এ বছর তোর জায়ের ছেলের জন্য জামাকাপড় কিনেছিস তো?

ইন্দ্রাণী রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল,— কিনব না কেন? ওরাও বদলে তিতিরকে সালোয়ার-কামিজ দিয়ে গেছে।

—এ বছর জা-কেও একটা শাড়ি দিতে পারতিস। বাপ্পার একটা অত ভাল চাকরি...উমা মাঝপথে কথাটা গিলে নিলেন,— না মানে, বলছিলাম...

—কিছু বলছিলে না। ইন্দ্রাণী ঘুগনি শেষ করে বাটি নামিয়ে রাখল,— শাড়ি দেওয়া-নেওয়ার সিস্টেমটা যখন উঠেই গেছে, ওটাকে আর নতুন করে চালু করতে চাই না।

—এটা আবার তোর বাড়াবাড়ি। উমা চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিলেন,— তুই না বড়? মন না চাইলেও বড়দের অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

অনেকক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল ইন্দ্রাণী, আর পারল না। তপ্ত স্বরে বলল,— ডিউটি কি শুধু বড়দেরই থাকে মা? ছোটদের নেই? তাদের কোনও জ্ঞানগম্যি থাকতে নেই? বলব না বলব না করেও ইন্দ্রাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,— জানো, রুনা কী করেছে? তোমার জামাই দীপুর কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল, দীপু ছিল না উনি দয়ার প্রাণ হয়ে ভাসুরকে পাঁচশোটি টাকা দাতব্য করেছেন।

—অন্যায় কী করেছে?

—অন্যায় নয়? সে জানে না তার ভাসুরঠাকুরটি কেমন? ইন্দ্রাণীর আঁচে ব্যঙ্গ ঝরল,— কাল আবার আহ্লাদ করে শোনাতে এসেছিল! রাগ কোরো না দিদি, দাদা এত করে চাইলেন! তোমার দেওর শুনে আমায় খুব বকেছে!

—আহা, জামাইয়ের নিশ্চয়ই খুব দরকার ছিল। বলতে বলতে মেয়ের মুখভাব দেখে কিছু বুঝি অনুভব করলেন উমা। ত্রস্ত স্বরে বললেন,— অবশ্য ওদের কাছে গিয়ে চাওয়াটাও ঠিক নয়। তোর কাছে চাইলেই তো পেয়ে যেত।

ইন্দ্রাণী কথা না বলে মনে মনে ফুঁসতে লাগল। যথেষ্ট অপমান করে গেছে কাল রুনা। টাকা

যদি দিয়েই থাকিস, আমাকে এসে শোনানো কেন ? মজা দেখার জন্য ? তোর ভাসুরঠাকুর টাকা নিয়ে কী করে তুই জানিস না ? আবার কৌতূহল কত ! কী এত টাকার দরকার পড়ল গো দাদার ! মুস্তাফিবাবুর টাকাটা কি দাদার নামে নেই ! মাত্র পাঁচশো টাকার জন্য রুনার কাছে এত কথা শুনতে হল ! একবার মানুষটাকে ধরতে পারুক ইন্দ্রাণী... ! রাত্তিরে তো কাল বাবু ফিরলেন ওই অবস্থায় ! উর্ধ্ব-অধ জ্ঞান নেই, কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছেন ! তারপর সকালে ভোঁস ভোঁস নাক ডাকা, দুপুরে ভ্যানিশ ! ইন্দ্রাণীকে ছোট করে কী সুখ পায় লোকটা !

বাইরে একটা কোলাহল হচ্ছে, বোধহয় প্যান্ডেলে ঠাকুর এল। দেবীমূর্তি নামানোর তোড়জোড় চলছে, তরুণদের নিনাদে কেঁপে উঠছে পাড়া।

উমা ছুটে বাইরের ঘরের জানলায় গেছেন। ইন্দ্রাণী পাশে এসে দাঁড়াল। খানিক দূরে, রাস্তার উল্টো পারে, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দিলু। ভারী গম্ভীর, ভারী ব্যস্তসমস্ত ভাব। 'অপারেশন প্রতিমা নামানোর' তদারকি করছে। একটা ছেলেকে হাত-পা নেড়ে কি সব নির্দেশ দিল দিলু। বোধহয় মৈত্র বাড়ির ছেলে। দিলুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সিগারেট ধরাল ছেলেটা। দিলু কটমট তাকাচ্ছে, সরে গেল ওদিকে। ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে একটা ভাঙা হাসি ফুটল। ক্লাবের ছেলেরা পোছে না বলে দিলুদার খুব অভিমান, তবু নাক গলানোর অভ্যেসটা ছাড়তে পারল না। পুজোর ক'দিন প্যান্ডেলে চেয়ার নিয়ে বসেও থাকবে।

এও এক বন্ধন। বৃত্তে গেঁথে থাকা। চরকি খাওয়া। নিজেকে অপ্রয়োজনীয় জেনেও সরিয়ে নিতে না পারা।

ধীরাজ আচমকা বলে উঠলেন,— এই শুরু হল। এখন সাত দিন ধরে কান ঝালাপালা হবে।

ইন্দ্রাণী জানলা থেকে সরে এল,— হ্যাঁ, মাইকটাও লাগিয়েছে একেবারে এ-বাড়ির দিকে মুখ করে।

উমা বললেন,— ছেলেপুলেরা ক'দিন আনন্দ করছে, করুক না।

—এর পর আবার ঢাক শুরু হবে। ধীরাজ তবু গজ গজ করছেন,— গত বছর কার্তিক মাসে পুজো পড়ল, পাঁজিরও কোনও ছিরিছাঁদ নেই, দুটো সপ্তমী, দুটো অষ্টমী...

উমা ধীরাজকে থামালেন,— বুঝেছি। একদিন-দুদিন নয় বেশিই ঢাক বেজেছে, তাতে কি এমন তুমি বদ্ধ কালা হলে !

—আমার ভাল লাগে না।

—আমারও ভাল লাগে না। ইন্দ্রাণী ব্যাগ কাঁধে তুলল,— এত আনন্দ লোকের আসে কোত্থেকে ! চারদিকে এত ডামাডোল ! দিল্লি উত্তরপ্রদেশে ছেলেগুলো সব গায়ে আগুন লাগাচ্ছে, এখানে দাঙ্গা, সেখানে দাঙ্গা...

—কলকাতায় তো কিছু হয়নি।

—আজ হয়নি, কাল হবে। কলকাতা তো ভারতবর্ষের বাইরে নয় মা।

—কিচ্ছু হবে না। কেন হবে ? এখানে যখন গণ্ডগোল হয়েছিল, তখন কোন দিল্লি বম্বেতে তার আঁচ পড়েছিল ? হুঁহ, ভারতবর্ষ ! শুধু আমাদের ছেলেগুলোই....

উমা আনমনা। ইন্দ্রাণীও ম্লান। মা ভুল বলেনি। কোন জাতের ছেলে ক পারসেন্ট চাকরি পাবে তাই নিয়ে উত্তর ভারত আজ উত্তাল, দিল্লি পাঞ্জাব কাশ্মীরে যত্রতত্র বোমা ফাটে, যখন তখন গরু-ছাগলের মতো মানুষ মরে, বম্বেতে মাফিয়ারা প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুক পিস্তল চালায়, অথচ ঘুণ-ধরা সমাজকে বদলানোর স্বপ্ন দেখতে গিয়ে, শয়ে শয়ে তাজা প্রাণ খুইয়ে, এই শহরটা বদনামী হয়ে গেল !

মনের কথাটা অবশ্য মুখে উচ্চারণ করল না ইন্দ্রাণী, পাছে ঘরের হাওয়া আরও ভারী হয়ে যায়। টিভির ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়ে ধীরাজকে বলল,— তোমারই বা বাইরে কান দেওয়ার দরকার কি ? খেলা দ্যাখো।

উমা বললেন,— চললি ?

—যাই। রাস্তাঘাটে এখন যা ভিড়, কখন পৌঁছব কে জানে !

—তোদের স্কুল কাল বন্ধ হচ্ছে না ?

—হুঁ। কাল হয়ে।

—আর তিতিরের ?

—ওদের হয়ে গেছে। মহালয়ার দিন থেকে। খুলবে অবশ্য আমাদেরই সঙ্গে। ভাইফোঁটার পর।

আরও দু-চারটে টুকিটাকি কথা বলে ইন্দ্রাণী রওনা দিল। আঁধার নেমে গেছে, উৎসবের সাজে শহর আলোয় আলোময়। দোকানে দোকানে জোর কেনাবেচা চলছে, লোকজন উপচে পড়ছে রাস্তায়। 'মুমূর্ষু নগরী' আজ বুঝি সত্যিই তিলোত্তমা। শুধু ইন্দ্রাণীর হৃদয়েই যে কেন বাতি জ্বলে না !

আদিত্য ডাইনিং টেবিলে। দুধে পাঁউরুটি ডুবিয়ে খাচ্ছে।

ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখছে। কী নিশ্চিন্ত নিমগ্ন ভঙ্গি। জগৎসংসার রসাতলে গেলেও লোকটার যেন কিছু যায় আসে না ! শুধু সামনের থালা-বাটিটুকুই একমাত্র পৃথিবী !

ব্যাগ বিছানায় ছুঁড়ে ঘুরে এল ইন্দ্রাণী। হিম স্বরে জিজ্ঞাসা করল,— ফিরলে কখন ?

আদিত্য মুখ তুলল না। পাঁউরুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল,— ঘড়ি তো দেখিনি।

—আবার কখন বেরোনো হবে ?

আদিত্যর জবাব নেই।

—কি হল ? আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

—শুনছি তো।

—জিজ্ঞেস করছি, আবার বেরোবে কখন ?

আবার জবাব নেই। দুধে কি পড়েছে, চামচে দিয়ে তুলে নিরীক্ষণ করছে।

ইন্দ্রাণী স্নায়ু নিয়ন্ত্রণে রাখল। আড়চোখে দেখে নিল আদিত্যর ঘর, তিতির নেই। সন্ধ্যার মা-ও চলে গেছে। ক মাস ধরে লোকটার অনাচারের ডাঙশ অনেক হজম করছে ইন্দ্রাণী, আজ একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার।

কড়া গলায় ইন্দ্রাণী বলল,— ভেবেছটা কী ? তুমি কি মরার সময়েও শুধরোবে না ?

—কী করলাম ?

—আবার জিজ্ঞেস করছ, কী করলাম ? ইন্দ্রাণী বহুকাল পর ধৈর্য হারাল,— দু হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে নেচে বেড়াচ্ছ, ইচ্ছে হলে ফিরছ.. ফিরছ না... এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, না তোমার ভাটিখানা ?

—আমি তো বাড়িতে মদ খাই না।

—তা হলে আর কি ! আমি তরে গেলাম। ইন্দ্রাণী প্রায় ভেংচে উঠল,— শোকের দোহাই পেড়ে এসব বেলেল্লাপনা আর কত দিন চলবে ?

—আমার ভাল লাগে না। চামচ প্লেটে রাখল আদিত্য।

—কী ভাল লাগে না ?

আদিত্য আবার চুপ।

—কী হল ? উত্তর দাও।

—কিচ্ছু ভাল লাগে না। এই বাড়ি না। এই সংসার না। এই শহর না।

আদিত্যর স্বরে গভীর বিষাদ। কিন্তু এক বিষণ্ণ মানুষের স্বর আর এক বিষণ্ণ মানুষের কাছে পৌঁছয় না। সে আরও তেতে ওঠে,— ঝলসায়।

ইন্দ্রাণী দাঁত কিড়মিড় করল,— শুধু ভাল লাগে লোকের কাছে টাকা ভিক্ষে করে মদ গিলতে,

তাই তো ?

—আমি কারুর কাছে ভিক্ষে করে মদ খাই না। লোকে আমায় খাওয়ায়।

—বাহ চমৎকার! গুছিয়ে মিথ্যেও বলতে শুরু করেছ! ইন্দ্রাণী চোখ কুঁচকোল,— রুনার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ কোন আক্কেলে ?

—রুনার টাকা না তো! দীপুর টাকা।

—যারই হোক, তুমি ওখানে হাত পাততে গিয়েছিলে কেন ?

—অন্য দরকার ছিল।

—কী দরকার ?

আদিত্য খাওয়া ফেলে ঘরে উঠে গেল। একটা পোস্টকার্ড এনে ধরিয়ে দিল ইন্দ্রাণীকে।

অবাক হয়ে আদিত্যর মুখের দিকে তাকাল ইন্দ্রাণী। পড়ছে চিঠিটা। আবার তাকাল। আবার পড়ছে। তার পড়া শেষ হতেই আদিত্য ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে পকেটে রেখে দিল।

ইন্দ্রাণী হাঁ হয়ে বলল,— এই পরিতোষ না কে, তাকে তুমি টাকা পাঠাচ্ছ ?

—পাঠানো হয়ে গেছে। হাজার। বাকি পাঁচশো চাঁদু দিয়েছে।

—তুমি চাঁদুর কাছ থেকেও টাকা নিয়েছ! ইন্দ্রাণীর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না,— একজন কে না কে চাইল, ওমনি হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলে! তুমি কী!

ছোট্ট শ্বাস ফেলল আদিত্য,— তোমাদের শান্তি দেওয়ার জন্যই পাঠিয়েছি।

আদিত্য উঠে আর একখানা পোস্টকার্ড নিয়ে এল। ধরিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রাণীকে।

পাঁচ-সাত লাইনের চিঠি। ভাই পরিতোষ, আশা করি আমার পাঠানো হাজার টাকা পেয়ে গেছিস। তোর আশ্রমের কথা শুনে আমার বড় ভাল লাগল। কাশী জায়গাটিও আমার ভারী সুন্দর লাগে। তোর আশ্রমেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব মনস্থ করেছি। আপত্তি না থাকলে জানাস...

ইন্দ্রাণীর হাত থেকে চিঠিটা খসে পড়ল। ঠোঁট ফ্যাকাসে,— তুমি আশ্রমে চলে যেতে চাও ?

আদিত্য নত মুখে ঘাড় নাড়ল।

—এতকাল পর হঠাৎ এই নতুন মতলব ?

—পরিতোষের চিঠি পেয়ে কেন যেন...ভেবে দেখলাম এতেই সকলের মঙ্গল।

আদিত্যর স্বর অত্যন্ত মৃদু। প্রায় স্বগতোক্তির মতো। ঘাড় হেঁট করেই বলল,— আমি তো কারুর কোনও কাজে লাগি না ইন্দু। আমার থাকাই বা কি, না থাকাই বা কি!

ইন্দ্রাণীর চোখে পলক পড়ছিল না। কাছেই চড়া সুরে মাইকে হিন্দি গান বাজছে, কান ঝিমঝিম। তার মধ্যেই ভাসছে আদিত্যর স্বর—আমার অনেক দোষ। আমি একটা সেন্টিমেন্টাল হ্যাজার্ড। তোমাদের মতো সব কিছু মানিয়ে নিতে পারি না, মেনেও নিতে পারি না। আমার সংযম নেই, উদ্যম নেই....শুধু জ্বালাই, আর কষ্ট দিই...আমার মতো লোকের সংসার করাটাই বিড়ম্বনা। নিজেরও, অন্যেরও। তুমি বিশ্বাস করবে না জানি, তবু বলি...আগে যদি নিজেকে চিনতে পারতাম, কক্ষনও বিয়ে-থা, ঘরসংসার, কোনও কিছুর মধ্যেই নিজেকে... বিশ্বাস করো, কক্ষনও না...

ইন্দ্রাণী বিড় বিড় করে বলল,— তিতিরকে বলেছ ?

আদিত্য এক মুহূর্ত থেমে থেকে বলল,— বলিনি। বলব।

—ও।

—সত্যি বলছি ইন্দু, মনের মধ্যে এই টানাপোড়েন আমি আর সইতে পারি না। দেখো...আমি চলে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণীর ভেতরটা অসাড় হয়ে আসছিল। কী যেন একটা কন কন করছে বুকে। কান্না পাচ্ছে কি ? আনন্দ হচ্ছে ? ক্রুদ্ধ হচ্ছে ইন্দ্রাণী ? স্বস্তি পাচ্ছে ? অথবা ক্ষোভ...অভিমান...? প্রথম দিন থেকে মনে মনে ওই লোকটার হাত থেকে মুক্তি চেয়েছে, কিন্তু ঠিক এইভাবে কি ? এত দিন পর ?

ইন্দ্রাণী নিজের ভাবনাটাকেও চিনতে পারছিল না।

৭৪

সম্বলপুর এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন ছাড়ে রাত নটায়। আজ বেশ দেরি করে ছাড়ল, প্রায় পৌনে দশটায়। রেল কোম্পানির টাইমটেবিল, স্টেশনের সুদৃশ্য আলোকিত বোর্ড, যন্ত্রগণকে ছাপা ট্রেনের টিকিট, সর্বত্রই ঘটা করে একটা সময় লেখা থাকে বটে, তবে বাস্তবের সঙ্গে ইদানীং তার কদাচ মিল। এখন আবার পুজোর মরসুম, রোজ গাদা গাদা পুজো স্পেশ্যাল রওনা দিচ্ছে দিকে দিকে, এই ব্যস্ততার সময়ে রেলের নিয়মানুবর্তিতার কথা উচ্চারণ করাও গর্হিত অপরাধ! দূরপাল্লার গাড়ি আপন মর্জিতে চলবে এটাই তো স্বীকৃত রীতি!

শুভাশিসের মেজাজ খাট্টা হয়ে গিয়েছিল। গতিময় যুগে এই ছোট্ট ছোট্ট বিশৃঙ্খলা তার একদম বরদাস্ত হয় না। আজ বিজয়া দশমী, প্রতিমা নিরঞ্জনের ঝঞ্ঝাটে পথে ট্রাফিক জ্যাম হতে পারে ভেবে সাততাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, অথচ রাস্তাঘাট আজ আশ্চর্য রকমের ফাঁকা, মাত্র আধ ঘণ্টায় হাওড়া পৌঁছে গেল। তারপর এই শবরীর প্রতীক্ষা, কখন ট্রেনের বাঁশি বাজবে। ঘড়ি ধরে, ঘড়ির কাঁটা মেপে যার দিন চলে, তার কি এত সময়ের অপচয় সহ্য হয়! এই দু-আড়াই ঘণ্টায় শুভাশিসের অন্তত দশটা রুগী দেখা হয়ে যেত, অথবা একটা মেজর অপারেশন। কেন যে মানুষ সময়কে টাকার মূল্যে দেখে না!

শহরতলি পেরিয়ে ট্রেন অনেকটা গতি বাড়িয়েছে। চলার তালে দুলছে মৃদু মৃদু, ঝমর ঝম শব্দ তুলছে। মেজাজ জুড়িয়ে আসছিল শুভাশিসের, স্বস্তি বোধ করছিল। যাব যাব করে এতদিন পর তবে বেরোনো হল! ছন্দার শরীর-মন কতটা কি সারবে কে জানে, শুভাশিসের নিজের জন্য কিন্তু এই বেড়ানোটার প্রয়োজন ছিল খুব। সংসার মন আর কাজের সাঁড়াশি আক্রমণ ঝাঁঝরা করে দিয়েছে শুভাশিসকে, এই শহর থেকে কটা দিন সত্যিই পালিয়ে থাকা দরকার।

কাল সন্ধেবেলা ইন্দ্রাণীর কাছে গিয়েছিল শুভাশিস। একাই ছিল ইন্দ্রাণী, বসে ছিল বারান্দায়। যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। মলিন ফিরোজা রঙ শাড়ি পরেছিল ইন্দ্রাণী, কপালে টিপ ছিল না, ভারি শুকনো দেখাচ্ছিল ইন্দ্রাণীকে। শহর জোড়া আলোর রোশনাইয়ের মাঝে যেন এক ক্ষয়াটে চন্দ্রমা।

শুভাশিস রসিকতা করে বলেছিল,— গাঁক গাঁক মাইকের মাঝে অমায়িক হয়ে বসে আছ কী করে?

ইন্দ্রাণী উত্তর না দিয়ে হাসল। ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল শুভাশিসকে। রান্নাঘর থেকে চা করে নিয়ে এল। কথা বলছিল কম, শুনছিল বেশি। কি এক পলকা চিন্তায় আনমনা বারবার।

শুভাশিসের বুকের ভেতর মেঘ ডাকছিল। যে-কথা বলার জন্য আসা, সে-কথা আটকে যাচ্ছে গলায়। অথচ কথাটা ইন্দ্রাণীর একদম অজানা তো নয়!

হাবিজাবি কথা শুরু করল শুভাশিস,— তোমাদের ফ্ল্যাটের তো ভিত কমপ্লিট শুনলাম।

—কে বলল?

—চাঁদু বলছিল। ষষ্ঠীর দিন নার্সিংহোমে চাঁদুর সঙ্গে দেখা, তখনই কথায় কথায়...চাঁদুর সঙ্গে কি মধুমিতার সিরিয়াস অ্যাফেয়ার চলছে?

—বোধহয়।

—উঁহু, বোধহয় নয়, আমি ডেড শিওর। চাঁদুকে দেখলেই মধুমিতার মুখচোখ যা গ্লো করে ওঠে।... মধুমিতা আজকাল সাজগোজও করে খুব।

—তাই বুঝি?

—ইয়েস। চাঁদু আর মধুমিতা দারুণ পেয়ার হবে। যদি অবশ্য সব স্মুথলি রান করে।...আমার কি ভয় লাগে জানো? মেয়েটার একটা স্যাড পাস্ট আছে তো, নতুন করে আবার ধাক্কা না খায়। আশা করি চাঁদু মেয়েটার সঙ্গে ফ্লার্ট করছে না।

—কে ফ্লার্ট করে, কে করে না, বোঝা খুব মুশকিল।

—আমি অন্তত করিনি। শুভাশিস হাসতে চাইল,— আই ওয়াজ নট এ ফ্লার্ট। আই ওয়াজ কনফিউজড।

ইন্দ্রাণী তাকাল না। শাড়ি পাট করছে। অপ্রয়োজনীয় কাজ সারছে।

শুভাশিসের পেট থেকে ঠেলে উঠছে কথার বুদবুদ। অর্থহীন ফেনা হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে, চাঁদু কিন্তু গাড়িটা কিনেছে বেশ। মডেল পুরনো, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত আছে। তবে কালারটা বড্ড ডাল। মাটি মাটি রঙ যে ও কী করে স্ট্যান্ড করছে !...ওকে রঙটা বদলে নিতে বলছ না কেন ?

ইন্দ্রাণী আলমারি খুলল। আলমারি বন্ধ করল। খালি চায়ের কাপ তুলে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

শুভাশিস অসহায় বোধ করছিল। নিজের কথা নিজের কানেই প্রলাপের মতো ঠেকছে। দুর, এই ছেলেমানুষির কোনও অর্থ হয় না। পুজোর পর বেড়াতে যাবে এ-ইঙ্গিত তো দেওয়াই ছিল ইন্দ্রাণীকে, তবু কেন এত দ্বিধা ! দিন পনেরো আগে ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে টিকিট কাটিয়েছে, তার পরও বার তিন-চার এসেছে এখানে, কিন্তু কিছুতেই কথাটা বলে উঠতে পারেনি। বলেনি বলে কি ইন্দ্রাণী আহত হবে ? নাকি ইন্দ্রাণী আহত হবে ভেবে বলাটা হয়ে ওঠেনি ?

দুটো আপাতবিরোধী চিন্তার টানাপোড়েন চলছিল শুভাশিসের মাথায়। মরিয়া হয়ে শেষে বলেই ফেলল,— আমরা কাল বেরোচ্ছি রানি।

ইন্দ্রাণী যেন ভুলেই গেছে কথাটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,— কোথায় ?

—ওই যে বলেছিলাম শালিনী সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিচ্ছে। বলতে বলতে অকারণে একটা মিথ্যে যোগ করল শুভাশিস,— অরূপ জোর করে পরশু দিন টিকিট ধরিয়ে দিয়ে গেল। যেতেই হবে।

সেকেন্ডের জন্য ইন্দ্রাণী নিষ্পলক। পরক্ষণে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। ফিরে এসে বলল,— যাও ঘুরে এসো। ফিরছ কবে ?

—আমার তো বেশি দিন চেম্বার বন্ধ রাখার উপায় নেই। দেখি, দেওয়ালির আগেই ফিরব।

—এতদিনের জন্য যাচ্ছ, টোটোর পড়ার ক্ষতি হবে না ? সামনে ফাইনাল...

—টোটো যাচ্ছে না। শুভাশিস মাথা নামিয়ে আবার একটা অর্ধ সত্য বলল,— বোঝোই তো, আজকালকার ছেলে...বড় হয়েছে...বাবা-মা'র সঙ্গে আর বেরোতে চায় না।

—ও। কি যেন নাম বলেছিল জায়গাটার ?

—টেনশা। রাউরকেল্লার কাছে।

—বাহ্, ভাল। খুব ভাল।

ইন্দ্রাণীর স্বর এতটুকু প্রকম্পিত হল না। যেন ছন্দার সঙ্গে বেড়াতে যাবে শুভাশিস, এটাই সত্য, এটাই স্বাভাবিক। ইন্দ্রাণীর এই অচঞ্চল ভাবটা কি নিখাদ ! মনে হলেই শিরায় শিরায়, কোষে কোষে দাবানল জ্বলে ওঠে শুভাশিসের। সংসারে তো ইন্দ্রাণী সংপৃক্ত ছিলই, তবু তার মধ্যেও শুভাশিস ছিল। আজ কেন সে এত তুচ্ছ হয়ে গেল !

গুম গুম শব্দে কোলাঘাট ব্রিজ পার হচ্ছে ট্রেন। পাশের সেতুর আলো প্রতিফলিত হচ্ছে রূপনারায়ণে, আঁধার মাখা জলে কাঁপছে আলোর জাফরি। বড় বিমর্ষ, বড় ক্লান্ত দেখায় এখন নদীকে। নদী কি মানুষের মন বোঝে !

শুভাশিস চোখ সরিয়ে নিল। ভারী স্যুটকেসটা পায়ের কাছেই পড়ে আছে, ঠেলে ঠেলে সিটের তলায় ঢোকাল। ছন্দা এখনও ব্যাক সিটে মাথা ঠেকিয়ে বসে, আঁখি দুটি বোজা। দুজনের মাঝখানে ঢাউস ট্রাভেল ব্যাগ। প্রাচীরের মতো। সামান্য নাড়াচাড়া করে ব্যাগটাকে মাঝেই রেখে দিল শুভাশিস। ট্রেনে দেওয়া বেড রোল খুলে দুই যুবক সহযাত্রী ঘুমের তোড়জোড় করছে। হাওড়া স্টেশনে ছেলে দুটোর সঙ্গে অল্প আলাপ হয়েছিল শুভাশিসের। দুজনেরই বয়স বছর পঁচিশ, চোখা

চেহারা, সি-এ পড়ছে, অডিট করতে যাচ্ছে রাউরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্টে। ট্রেনে ওঠা ইস্তক কাজের গল্প করছিল ছেলে দুটো। খেলা নয়, সিনেমা নয়, রাজনীতি নয়, সারাক্ষণ শুধু সিংগল এনট্রি, ডবল এনট্রি, ক্রস এনট্রি, ব্যাংক রিকনসিলিয়েশান। একটু আগে কাগজের মোড়ক বগলে পালা করে বাথরুম থেকে ঘুরে এল দুজনে। সেও প্রায় রুটিনের মতো। পা টলছে না, গলা দুলছে না, শুধু একটা হালকা হুইস্কির গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে কুপে। টোটোও কি এরকম হবে ? বাজে কথা না বলা নিষ্প্রাণ রোবট।

সিগারেট ধরিয়ে শুভাশিস ছন্দার দিকে ফিরল,— শুনছ ?

চোখ খুলল ছন্দা, মুখ ফেরাল না। বলল,— উঁ ?

—এদিকে এসে বসবে, জানলার ধারে ?

—না, এখানেই ঠিক আছি।

—এসো না, ভাল লাগবে। হাওয়া পাবে।

ছন্দা চুপচাপ এসে বসল। প্রাচীরটা ওপরের বার্থে উঠে গেছে।

দরজায় গিয়ে শুভাশিস করিডোরে উঁকি দিয়ে এল। সুনসান। উজ্জ্বল বাতি নিবে রাতআলো জ্বলছে। আলোআঁধারে একা একা ছুটছে বাতাস, পাক খাচ্ছে। আশ্বিন চলছে, বাতাস এখনও তেমন ধারালো নয়। পাশের বন্ধ কুপ ফুঁড়ে একটা মেয়েলি হাসি ঝটপট করে উড়ে এল। কান পেতে দু-চার সেকেন্ড আওয়াজটা শুনল শুভাশিস। তারপর ছন্দার পাশে এসে বসেছে।

—ভাবছ কী তখন থেকে ? মন খারাপ ?

—না তো।

—গুল মেরো না। টোটোর জন্য তোমার মন কেমন করছে না ?

—মন কেমনের কি আছে ? টোটো আসবে না, এ তো জানাই ছিল।

জানা আর জানা জিনিসটা ঘটে যাওয়া দুটো কি এক ! শুভাশিস অবাক মুখে বলল,— টোটোর জন্য তোমার উদ্বেগ হচ্ছে না ? এই পনেরোটা দিন টোটো কীভাবে থাকবে, কী খাবে, কোনও ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তা নেই ?

—দুশ্চিন্তা করে কিছু লাভ আছে ?

কথাটা কেমন যেন ভাসতে ভাসতে এল, ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে। বাতাসের ছোঁয়াচ লেগে আরও যেন হিমেল শোনাল। হিমেল, না বিষণ্ণ ? বিষণ্ণ, না হতাশ ? হতাশ, না অভিমানী ? অপারেশানের পর থেকে ছেলের ওপর একটা সূক্ষ্ম অভিমান জন্মেছে ছন্দার, টের পায় শুভাশিস, রহস্যটা বোঝে না। ছেলে আর ছন্দার শক্ত খোলায় আদ্যন্ত ঢাকা পড়ে নেই, এটাই কি কারণ ! নাকি ছেলে বড় হলে মার সঙ্গে আপনা-আপনি দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়, মা-রা ঠিক মেনে নিতে পারে না ! ইন্দ্রাণী বাপ্পার মধ্যেও তো এমনই এক মান-অভিমানের খেলা চলে এখন। এই বয়সের ছেলের কাছে মা'র যে ঠিক কী ধরনের প্রত্যাশা থাকে ?

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বুকে একটুক্ষণ ধোঁয়া জমিয়ে রাখল শুভাশিস। চাপ বাড়ছে ক্রমশ। ফার্স্ট ইয়ার মেডিকেলের শুভাশিস গরমের ছুটিতে বালুরঘাট ফিরছে, রাত জেগে ট্রেনে বাসে জার্নি করে হতশ্রান্ত দশা। কোয়ার্টারের সবুজ লনে চোখ চেয়ে বসে আছেন মনোরমা, ইজিচেয়ারে। বাড়ি ঢোকার আগে মা'র সামনে দাঁড়াল শুভাশিস। সঙ্গে সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ চিৎকার। সরু, এক অপ্রাকৃত স্বর। সাইরেনের মতো।

অজান্তেই দু কান চাপল শুভাশিস। একটু একটু করে ধোঁয়া ছাড়ল। বুক হালকা করে বলল,— টোটোকে নিয়ে তোমার তা হলে চিন্তা নেই বলছ ?

ছন্দা জানলার কাচ নামিয়ে দিয়েছে, তার অপলক দৃষ্টি বন্ধ কাচে স্থির। বাইরের আলোয়, বাইরের অন্ধকারে। নিচু গলায় বলল,— আমার কাউকে নিয়েই চিন্তা নেই।

মুহূর্তে শুভাশিসের মুখ পাংশু। জোর করে হাসল, এতদিনে তবে তোমার বোধোদয় হল।

টোটোর জন্য সত্যিই ভাবনা করার কিছু নেই। তোমার কাজের মেয়েটি আজকাল ভালই রান্না করে, তোমার ছেলের খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না।....

—জানি।

—তারপর ধরো তোমার দিদি জামাইবাবু রোজ খোঁজ নিয়ে যাবে।... অরূপরা আছে...তুমিও টেনশা থেকে ফোন করে খবর নিতে পারো।

—জানি।

—কিচ্ছু জানো না। ছেলেকে নিয়ে আদত ভয় তো একটাই। ওই গাড়ি। ছন্দার মুখে কোনও রেখা ফোটে কিনা বোঝার চেষ্টা করল শুভাশিস। একটু চুপ থেকে বলল,— কাল আমি টোটোকে দিয়ে প্রমিস করিয়ে নিয়েছি, আমাদের অ্যাবসেন্সে ও স্টিয়ারিং-এ হাত ছোঁয়াবে না।

—শুনেছি।

—কোত্থেকে শুনলে ?

—টোটোই একটু আগে স্টেশনে বলছিল।

—ও, তুমিও তা হলে ছেলের কাছ থেকে কথা আদায় করেছ ?

—না। টোটো বলল,— শুনলাম।

—ও।

শুভাশিস আবার ম্রিয়মাণ। ছন্দার নিস্তেজ অভিব্যক্তিগুলো শিথিল করে দিচ্ছে শরীর। কী যে আবার হল ছন্দার ! অ্যান্টি ডিপ্রেশান ড্রাগে মাঝে তো ভাল উন্নতি হয়েছিল। বেশ হাসত, কথা বলত, রান্নাঘরেও ঢুকছিল, পুজোর আগে পর পর ক'দিন মার্কেটিং-এও বেরোল, ক'দিন ধরে হঠাৎ আবার... ! তবে কি ছেলে ফেলে বেড়াতে যাওয়া ছন্দাকে যতটা নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে তার অনেকটাই অভিনয় ! এই পাথরপ্রতিমা নিয়ে কি করে পনেরোটা দিন কাটাবে শুভাশিস ?

সামনে বোধহয় সিগনাল হয়নি, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। হুইসিল বাজাচ্ছে জোর জোর। যেন রাতকে আঁচড়ে কামড়ে অসহায় আর্তনাদ করছে। কানে লাগে বড়।

ডাক্তার শুভাশিস ছন্দার স্থৈর্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর চেষ্টা করল। টোটোর কথাই তুলল আবার। বলল,— তোমার ছেলে হঠাৎ ফিজিক্স টিচারের কাছে যাওয়া বন্ধ করল কেন ?

—স্যারের পড়ানো ভাল লাগছিল না।

—হঠাৎ ? অনেক দিন তো ওই স্যারের কাছে পড়ছিল !

—আমি কী করে বলব ?

—তুমি জিজ্ঞেস করোনি ?

—করেছিলাম। তাতেই তো ওই উত্তর দিল।

—এখন কী হবে ? এই ক'মাসের জন্য ভাল টিচার পাওয়া যাবে ?

—তোমারও তো দেখছি ছেলেকে নিয়ে ভাবনা কম নয় ! ছন্দার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটল। অগভীর রেখা, কিন্তু হাসিই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল শুভাশিস। তরলভাবে বলল,— আই নো টোটো ইজ এ মাদার্স সান, স্টিল আমারও তো···

—ছেলের কথা ছাড়ো। ছন্দা থামিয়ে দিল শুভাশিসকে,— খাবে কিছু ?

শুভাশিসের অল্প অল্প খিধে পাচ্ছিল। কোন সন্ধেয় ডিনার সেরেছে, এখন রাত সাড়ে এগারোটা। ছোট্ট একটা হাই তুলে বলল,— কী আছে ?

—চিকেন স্যান্ডুইচ খাবে ?

—উঁহু, হেভি হয়ে যাবে। লাইট কিছু নেই ?

ছন্দা কথা না বলে ট্রাভেল ব্যাগটা পাড়ল। তার ভাঁড়ার কখনও শূন্য থাকে না, একে একে প্যাকেট বেরোচ্ছে। লাড্ডু, সন্দেশ, কাজুবাদাম, ক্রিম বিস্কুট, চানাচুর।

শুভাশিস দুটো বিস্কুট তুলে নিল হাতে, সঙ্গে একটা সন্দেশ। বিস্কুটে কামড় দিয়ে বলল,— তুমি কিছু খাবে না ?

—না। আমি এবার শোব। অনেক রাত হয়েছে।

ছন্দা উঠে দাঁড়াল, বাথরুমে যাচ্ছে।

দুই সহযাত্রী যুবকের ঘুম এখন মাঝরাতে। শুভাশিস একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরাল না, করিডোরে বেরিয়ে এল। ধাতব ঝঙ্কার তুলে উদ্দাম ছুটছে ট্রেন। ফার্স্ট ক্লাস কামরার সুখী মানুষরা সবাই এখন যে-যার প্রকোষ্ঠে। একটা খোপের দরজা আধখোলা, আলগা কৌতূহল নিয়ে সামনে দিয়ে একবার হেঁটে এল শুভাশিস। তিন মধ্য বয়সী লোক তাস খেলছে, পাশে বোতল গ্লাস। একজন ভাবলেশহীন চোখে শুভাশিসের দিকে তাকাল, আবার ডুবে গেছে খেলায়।

সরে এল শুভাশিস, কুপে ফিরে দ্রুত বড় স্যুটকেস খুলল। ট্রেনে সচরাচর সে মদ্য পান করে না, আজ যেন তৃষ্ণা জাগছে। বোতল বার করে বেশ খানিকটা হুইস্কি সরাসরি চালান করে দিল মুখে। তরল আগুন নামছে গলা দিয়ে, তপ্ত হয়ে উঠছে জিভ। ভাল লাগছে, পলকা আমেজ আসছে একটা। আলোকদ্যুতি যেন কমে এল সহসা, স্বপ্ন স্বপ্ন ঘোর নামছে চোখে।

ছন্দা ফিরল,— ম্যাগো, বাথরুমটা কী নোংরা।

—কন্ডাকটারকে ডেকে দেখিয়েছ ?

—কোথায় কন্ডাকটার ! সে হয়তো কোথাও ভোঁস ভোঁস ঘুমোচ্ছে। এত টাকা খরচ করে লোকে ফার্স্ট ক্লাসে যাবে, সেখানেও যদি বাথরুমে এত দুর্গন্ধ হয়···

এরকম গজগজ না করলে কি ছন্দাকে মানায় ! নিজের বাড়ি ছাড়া সর্বত্রই বাথরুমে যাওয়ার ব্যাপারে ছন্দা ভীষণ খুঁতখুঁতে। ইদানীং রীতিমতো বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্য সময়ে শুভাশিস বিরক্ত হয়, আজ মজা লাগছিল। নাহ্, ছন্দার সেরে ওঠা ঠেকায় কে !

শুভাশিস চটুলভাবে বলল,— দেখুন ছন্দা দেবী, ফার্স্ট ক্লাসই হোক, আর সেকেন্ড ক্লাসই হোক, ট্রেনের বাথরুম গন্ধ ছড়াবেই। এ তো আর স্যাস ক্লিনিকের টয়লেট নয়, ঘন ঘন ফিনাইল পড়ছে, ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হচ্ছে···

—হুঁ। ছন্দা সব পেয়েছি ঢাউস ব্যাগ থেকে চাদর বার করল। বার্থে বিছোচ্ছে। বলল,— তোমাদের নার্সিংহোম আমার দেখা আছে।

—তবে ? মেঝেতে মুখ দেখা যায় কিনা বলো ? জানো তো, একটা নতুন সিস্টার সেদিন পেশেন্টের নোংরা জামাকাপড় দরজার কোণে একটু রেখেছিল, কী ঝাড় যে দিল শালিনী !

—ঠিক করেছে। দেওয়াই উচিত। ছন্দার হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল,— হ্যাঁ গো, শালিনী বলছিল তোমাদের নার্সিংহোম নাকি ভাল চলছে না ?

—ভাল চলছে না ! শালিনী বলেছে এ কথা ?

—বলল তো। বলছিল তোমাদের নাকি তেমন প্রফিট হচ্ছে না, আরও বেটার রিটার্ন নাকি আশা করেছিলে···

কথাটা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারল না শুভাশিস। দিন পনেরো আগে স্যাস ক্লিনিকের হিসেবপত্র নিয়ে বসেছিল তিন জনে, চুলচেরা পাই-পয়সার হিসেব নয়, মোটামুটি একটা লাভ-ক্ষতি নিরূপণের চেষ্টা। দারুণ আশাপ্রদ কিছু মনে হয়নি। টাকা থাকলে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ফেলা যায়, কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখা, চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, ধীরে ধীরে আরও উঁচুতে ঠেলে তোলা রীতিমতো শক্ত কাজ। এতে অনেক সূক্ষ্ম কৌশল লাগে, বহু ছোটখাট চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। অরূপের মতে স্যাস ক্লিনিকের বেড চার্জ অনেক বেশি, কয়েকটা ঘর কেটে ছোট ছোট কিউবিকল্ করে দিলে চার্জও কমে, রুগীর অভাবটাও সামলানো যায়। শুভাশিস মন খুলে প্রস্তাবটায় সায় দিতে পারেনি। সানশাইনের পাঁচ বাই আট অস্বাস্থ্যকর খোপগুলো দেখে কতবার সে নাক কুঁচকেছে, আজ যদি তাদের নিজেদেরই নার্সিংহোমে··· ! তবু হয়তো মেনে নিতে হবে। একেই বুঝি বাবার ভাষায়

আপোস করা বলে। হাঃ, বাবারা যেন আপোস করেনি! আজ সব হাসপাতালগুলো যে নরকের দরজায় পরিণত হয়েছে, তার মূলটা কোথায়? বাবাদেরই তো গা-ছাড়া মনোভাব। একটু একটু করে ক্লেদ জমতে দেখেও বাবারা কি চোখ বুজে থাকেনি! সংঘর্ষ দূরস্থান, সেভাবে প্রতিবাদও তো করেনি কেউ।

শুভাশিস ভারিক্কি ভঙ্গিতে বলল,— এটা একটা টেম্পোরারি ফেজ। যে কোনও বিজনেস জমে উঠতে একটু তো সময় লাগবেই। আমাদের এখনও কিছু খামতি রয়ে গেছে।

ছন্দার চোখে প্রশ্ন।

শুভাশিস সোজা হয়ে বসল,— যেমন ধরো, একটা মাত্র ওটিতে কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। আমাদের ওখানে এখন অনেক ডক্টর আসছে, কেউই ঝট ঝট ওটির ডেট পাচ্ছে না। এই তো লাস্ট উইকে আমাদের ওটিতে বুকিং না পেয়ে ভাস্কর সাদার্ন পয়েন্টে পেশেন্ট পাঠিয়ে দিল।

—ভাস্করদা স্যাস ক্লিনিকে আসছে! ছন্দা হাওয়া-বালিশ ফোলানো থামাল,— তুমি না ভাস্করদাকে নার্সিংহোমে এন্ট্রি দেবে না বলেছিলে!

—তুৎ, তা পারা যায় নাকি! চামার হোক, কি কসাই হোক, আমরা বার্ডস অফ দা সেম ফেদার তো বটে। বেওসা করতে গেলে ছোটামোটা ইগো প্রবলেম ঝেড়ে ফেলতে হয় ভাই। এবার ও শালা নার্সিংহোম খুললে আমায় কন্ট্যাক্ট করবে।

ব্যাগ থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করল ছন্দা, টক টক মুখে ফেলে জল গিলল,— আর তোমাদের আই সি ইউ খোলার কী হল?

—হবে। দেওয়ালিটা যাক। দোতলার একটা পোরশান নিয়ে প্ল্যান ছকা আছে, ফিরে এস্টিমেটে বসব। স্টার্টিং-এ চারটের বেশি বেড রাখব না।

—মাত্র চারটে?

—অনেক টাকার ধাক্কা ম্যাডাম। কত ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে জানো? এবার বোধহয় ব্যাঙ্ক লোন নিতেই হবে। বলতে বলতে ছন্দার দিকে একটু ঝুঁকল শুভাশিস,— অরূপ শালিনী আর একটা সাজেশানও দিচ্ছে।

—কী?

খুব সাবধানে কথাটা পাড়ল শুভাশিস। আলতো হাত তুলে দিল ছন্দার কাঁধে,— ওরা বলছিল টোটো তো বড়ই হয়ে গেছে, ওকে নিয়ে তোমার এখন তেমন হানটান ছোটাছুটি নেই, সুতরাং তুমি তো স্বচ্ছন্দে একটু-আধটু নার্সিংহোমে আসতে পারো।

—কেন?

—কাজ করবে। আই মিন আমাদের হেলপ্ করবে। শুভাশিস ছন্দার কাঁধে মৃদু চাপ দিল। মনে মনে বলল ট্রিটমেন্ট বাই কমপ্যানিয়নশিপ। মুখে বলল,— যেমন ধরো প্যানট্রির দেখভাল করলে, পেশেন্টদের ডায়েটে একটু হোমলি টাচ পড়বে... তারপর ধরো রুম সব প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে কিনা ওয়াচ রাখলে... মানে ওভারঅল সুপারভিশান আর কি। তোমারও হু হু সময় কাটবে... শুভাশিস ঠোঁট টিপে হাসল,— মাগনায় খাটাব না গো। ভাল রেমিউনারেশান পাবে।

ছন্দা হুঁ না কিছুই করল না। একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। নাকি উদাসীন? থাক, এক দিনে আর বেশি ডোজ না দেওয়াই ভাল।

খড়্গাপুরে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। সাত-আট মিনিটের স্টপেজ। অন্য কামরা থেকে দু-চার জন যাত্রী নেমেছে প্ল্যাটফর্মে, এত রাতেও খাবার কিনছে। পুরি সবজি ডিম সেদ্ধ। অবসন্ন সুরে কলসি কাঁধে হেঁকে বেড়াচ্ছে চাওলা। লটবহর নিয়ে হন্তদন্ত কিছু মানুষ কামরা খুঁজছে, ভেতর থেকেও তাদের পদধ্বনি শোনা যায়। স্বামী-স্ত্রী বাচ্চার একটা ছোট ফ্যামিলি শুভাশিসদের কামরায় উঠল, তরুণী মা'র কোলে ঘুমোচ্ছে বাচ্চাটা।

জীবনের এই চলমান ছবিগুলো দেখতে ভাল লাগে শুভাশিসের, কিন্তু সময় কই! শুধু কাজ কাজ

আর কাজ। কেন কাজ, কার জন্য কাজ সেসবও ভাবার সময় নেই, যন্ত্রমানবের মতো শুধু ঘাড় গুঁজে খেটে যাওয়া। সুখহীন। আনন্দহীন। তৃপ্তিহীন। কোন ছোটবেলায় স্কুলে পড়া একটা কবিতার লাইন গুনগুনিয়ে উঠল শুভাশিসের মাথায়।

নো টাইম টু স্ট্যান্ড বিনিথ দা বাউজ।
অ্যান্ড স্টেয়ার অ্যাজ লঙ অ্যাজ শিপ অর কাউজ
নো টাইম টু সি হোয়েন উডস্ উই পাস
হোয়্যার দা স্কুইরিলস্ হাইড দেয়ার নাটস্ ইন গ্রাস···

কেন যে মনে পড়ছে! সত্যিই কি সে গরু-ভেড়ার জীবন চায়! আবার যে-জীবন সে যাপন করছে তার সঙ্গে গরু-ভেড়ার পার্থক্যই বা কতটুকু!

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গুটিসুটি মেরে নীচের বার্থে শুয়ে পড়েছে ছন্দা।

বাথরুম থেকে প্যান্টশার্ট বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এসে ওপরের বার্থে উঠে পড়ল শুভাশিস। ···এ পুওর লাইফ দিস ইফ ফুল অফ কেয়ার··· লাইনগুলো ঘুরেই চলেছে। সম্পূর্ণ ভাবনাচিন্তাবিহীন হয়ে কাটাতে হবে কটা দিন।

ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল শুভাশিস, শেষরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় যেন থেমে আছে ট্রেন। মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল, ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। মনে হয় কোনও মাঠেঘাটে দাঁড়িয়েছে।

গলা শুকিয়ে গেছে, জল খাওয়ার জন্য নীচে নামল শুভাশিস। অন্যমনস্ক চোখ ছন্দার দিকে পড়তেই চমকে উঠেছে।

—এ কি, তুমি ঘুমোওনি!

—ঘুম আসছে না।··· আমাকেও একটু জল দাও তো।

জলের জায়গাটা ছন্দার হাতে দিল শুভাশিস,— তুমি আজ ঘুমের ট্যাবলেট খাওনি?

—খেয়েছি। তবু···। একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী কথা?

—এই প্রথম আমরা দুজনে শুধু কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি, তাই না? বিয়ের আঠেরো বছর পর!

বিকট হুইসিল বাজিয়ে পাশ দিয়ে একটা ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। উল্টো মুখে। কান বধির করা শব্দ আর ছুটন্ত আলো দেখিয়ে নিমেষে মিলিয়ে গেল।

আবার নৈঃশব্দ্য। আবার অন্ধকার। আরও গাঢ়, আরও ঘন।

শুভাশিসের গা ছমছম করে উঠল।

৭৫

ভাড়াবাড়িতে এসে সুদীপের দিনছন্দ অনেকটাই বদলে গেছে। সে চিরকালই একটু ধূসর ধরনের মানুষ, তেমন মিশুকে নয়, ভাল আড্ডা জমাতে পারে না, স্কুলে কলেজে অফিসে কোথাও তার কারুর সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। অল্প দু-চারজন সঙ্গীসাথী আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ বন্ধু নয়, তাদের কাছে নিজেকে উন্মোচিত করা যায় না। হয়তো ন মাসে ছ মাসে কারুর বাড়ি গেল, কি কোথাও দেখা হয়ে একটু হইচই করল, ব্যস ওইটুকুনিই। অফিসের কাজ আর বাড়ির নিভৃত কোণটুকুই সুদীপের বেশি পছন্দ। চার ভাইবোনের মধ্যে সে ছিল লেখাপড়ায় সব থেকে চৌখস, মাত্র সাত নম্বরের জন্য এম. কম.-এ ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, তাড়াতাড়ি চাকরিতে ঢুকেছে, অফিস বদলে বদলে সে এখন এক মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার। অফিস তার দিনের বেশির ভাগ সময়টাই গিলে নেয়, বাড়ি ফিরে বাকি সময়টুকু নিশ্চিন্তে জিরোনো তার অভ্যাস। একটু হয়তো টিভি দেখল, কিংবা একটু ম্যাগাজিন উল্টোল, কখনও বা অলস শুয়ে টেপ

শুনল, খুব শ্রান্ত লাগলে এক-আধদিন মেডিকেল ডোজে মদ্যপান করল, আর আহার নিদ্রা মৈথুন—এই নিয়েই রায়বাড়িতে বেশ সুখে ছিল সে। চরম ভোঁতা জীবনেও উত্তেজনার কিছু খোরাক ছিল ওই বাড়িতে। আদিত্য তো ছিলই, ছিল তার সহস্র ট্যানট্রাম, রুনাও প্রায়দিনই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অগ্নিগর্ভ হয়ে থাকত, এ ছাড়াও ছিল অসংখ্য সূক্ষ্ম সুতো টানাটানির খেলা। ছিল চোরা বিবাদ, গোপন নির্ভরতা। ছিল অদৃশ্য মায়াতন্তুতে জড়িয়ে থাকা এক পরিবার। বেশ ছিল সুদীপ।

কিন্তু এখন দৃশ্যপট অন্যরকম। রুনা এখন সর্বদাই খুশিতে ফুটছে। সুদীপ অফিস থেকে ফিরলেই এখন আর অভিযোগের ঝাঁপি খুলে বসে না, ছেলের দুধ আসতে দেরি হল বলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে না, কারণে অকারণে বেধড়ক পেটায় না ছেলেকে, সুদীপকেও যখন তখন ব্যঙ্গবিদ্রূপে জর্জরিত করে না। মাঝে মাঝে সুদীপের সন্দেহ হয়, এই রুনাই কি সেই রুনা যে একদিন রাগ করে বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল! রান্নার বই দেখে আজকাল নিত্যনতুন রান্না করে রুনা, মিনতিকে না পাঠিয়ে নিজেই বাজার ঘুরে সেরা ফলটা, সেরা মাছটা নিয়ে আসে, কোনও পরিশ্রমেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয় না। বাড়িতে এখন আর কোনও চাপা টেনশান নেই, অশান্তি নেই, চেঁচামিচি নেই। এ সবই তো সুখ।

এত সুখেও তবু যেন একটা কাঁটা বিঁধে গেছে সুদীপের। নতুন কাঁটা। তার নিরালা গৃহকোণটুকু হারিয়ে গেছে। ফি-সন্ধেয় রুনার দিদি জামাইবাবুর পদধূলি পড়ছে এ বাড়িতে, নটা-দশটা অবধি আসর চলছে জোর। আসর বলতে রুনার জামাইবাবুর অসহ্য হামবড়া বকবকানি, আর বোকা বোকা জোকস্। সুদীপ সেখানে শুধুই অসহায় শ্রোতা। নিয়মিত মদ্যপানে অভ্যস্ত নয় সুদীপ, কিন্তু অনিরুদ্ধর আহ্বানে রোজই তাকে বোতল গ্লাস সাজিয়ে বসতে হয়। হাজার হোক ভায়রাভাই বলে কথা, তাকে প্রত্যাখ্যান করলে রুনার যে অসম্মান হবে! রুনাও আজকাল টুকুস-টুকুস চুমুক দিতে শিখে গেছে। দিদির দেখাদেখি। সঙ্গদোষ, না সঙ্গগুণ? কথায় কথায় মীনা উচ্চকিত স্বরে হাসছে, সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে রুনাও। সুদীপের বিশ্রামের তো দফা রফাই, অ্যাটমের পড়াশুনোও ডকে উঠতে চলেছে। আসরের কোণে এসে অ্যাটম বসে থাকে চুপটি করে। ও বাড়িতে সন্ধেবেলা বাপ্পা জোরে একদিন টেপ বাজালে রুনা রেগে কাঁই হয়ে যেত, ছেলের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে গজগজ করত! কি আর করা! একা থাকার, আলাদা থাকার সুখ কুড়োতে এই উপদ্রবটুকু সুদীপকে মেনে নিতেই হয়।

সুখ কুড়োয় সুদীপ, না স্বস্তি কুড়োয়!

সুদীপ জানে না। সুদীপ বুঝে উঠতে পারে না। ঢাকুরিয়ার নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেলে গৃহের চেহারাটা হয়তো বদলাবে, এই আশায় আশায় থাকে সে।

লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন বাড়ি ফিরে সুদীপ দেখল অনিরুদ্ধ পাজামা-পাঞ্জাবি শোভিত হয়ে বসে আছে ড্রয়িংরুমে, রুনা আর মীনা রান্নাঘরে চিকেন পকোড়া ভাজছে, রান্নাঘর আর ড্রয়িংরুমের মাঝে শাট্‌ল কর্কের মতো ছুটছে অ্যাটম।

হাতমুখ ধোওয়ার অবকাশ পেল না সুদীপ, তার আগেই রুনা উড়ে এল,— এই শোনো শোনো, জামাইবাবু কী দারুণ একটা প্ল্যান করেছে!

—কীসের প্ল্যান?

—বেড়ানোর। মিরিক দার্জিলিং গ্যাংটক ছাংগু··· চলো না গো।

সুদীপ সিঁটিয়ে গেল। বছর চারেক আগে অনিরুদ্ধদের সঙ্গে একবার দিঘা গিয়েছিল, অভিজ্ঞতা খুব সুখের হয়নি। অনিরুদ্ধর বড় বেশি নবাবি চাল। দামি হোটেল চাই, ঘরে শীতল আমেজ চাই, ঘুরতে ফিরতে ইয়া ইয়া বাগদা চিংড়ি ভাজা, ড্রিঙ্কসের সঙ্গে মুঠো মুঠো কাজুবাদাম···। চাকরি তো করে গভর্নমেন্টের সেরিকালচার, না পিসিকালচার কোন ডিপার্টমেন্টে, সেখানেও এত দু-হাত্তা লোটা যায়! তাও যদি ডিরেক্টর-টিরেক্টর গোছের কিছু হত। ভায়রাভায়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে তিন দিনের ট্যুরেই সুদীপের লেজেগোবরে দশা।

আবার তাদের সঙ্গে !

চোয়ালে একটুকরো হাসি ঝুলিয়ে অনিরুদ্ধর পাশে এসে বসল সুদীপ,— কি অনিদা, শালীকে আবার কী তাতালেন ?

—আমি তাতাচ্ছি ! হাহ্। তোমার গিন্নিই আমার হাঁটু আঁকড়ে ধরেছে। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই অনিরুদ্ধ চোখ টিপে হাসল,— বলছে আমাকে ছেড়ে ও নাকি থাকতে পারবে না।

—ধ্যাৎ, কী অসভ্য রে বাবা। আমি কখন তাই বললাম ?

—মনে মনে বলেছিলে। শালীর মনের কথা পড়তে না পারলে আমি জামাইবাবু হয়েছি কি জন্যে ! তোমরা হলে রেশমের গুটি, তোমাদের সেদ্ধ করে সুতো ছাড়ানোই আমাদের কাজ। হা হা হা হা।

ওফ, ওই মুখে যদি একটা টেনিস বল পুরে দেওয়া যেত ! সুদীপ কান চুলকোল,— কিন্তু আমরা যাব কী করে অনিদা ? অ্যাটমের স্কুল খুলে যাবে…

—ওর স্কুল তো ভাইফোঁটার পর খুলবে। রুনা কথা কেড়ে নিল,— আমাদের তো দশ-বারো দিনের ট্যুর, তাই না জামাইবাবু ?

গরম পকোড়ার প্লেট হাতে মীনা ঘরে এসেছে। মাথা দুলিয়ে বলল,— হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনের সোমবার স্টার্ট করব, প্রতিপদ কি ভাইফোঁটার দিন ব্যাক। একটু হেকটিক হয়ে যাবে, তা হোক।

সুদীপ রুনার দিকে ফিরল,— আর স্কুল খুললেই যে অ্যাটমের পরীক্ষা তার কী হবে ?

রুনা গাল ফোলাল,— কেন ? ওখানে পড়বে। আমি বইখাতা নিয়ে যাব।

—বেড়াতে গিয়ে পড়া হয় ? তুমি ওকে বসাতে পারবে ?

—অ্যাই সুদীপ, তুমি অত পড়া পড়া কোরো না তো। অনিরুদ্ধ কেশর ফোলাল,— সন্তান মানুষ আমরাও করি, আর তারা ইন্সিডেন্টালি তোমার ছেলের থেকে হায়ার ক্লাসে পড়ে। এবং ফর ইওর ইনফরমেশান, তাদেরও স্কুল খুললে পরীক্ষা। এবং তারাও যাচ্ছে।

সুদীপ মনে মনে বলল, কিন্তু তারা তো এই সময়টায় পড়াশুনো করছে। তোমরা যখন কর্তা-গিন্নিতে মোচ্ছব করতে বেরোও, তখন যে তোমাদের বাড়িতে টিউটর আসে সে খবর কি আমি রাখি না !

হতাশভাবে বলল,— রুনা যদি মনে করে ঠিক আছে, তো ঠিক আছে। …অফিসটা যে কীভাবে ম্যানেজ করি ! বলা-কওয়া নেই…

—সব ম্যানেজ করতে পারবে। তুমি লাফড়া কোরো না। দুটো চিকেন পকোড়ায় এক সঙ্গে টোম্যাটো সস্ মাখাল অনিরুদ্ধ। সসটা আগে চুষে চুষে খেল। পকোড়ার কোণ কামড়াচ্ছে। দু আঙুলের মুদ্রায় প্রশংসা উপহার দিল রুনাকে। খাওয়া থামিয়ে হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখল সুদীপকে,— শোনো ম্যান, ট্রাভেল এজেন্টকে বলে দিয়েছি, পরশু অফিস খুললেই টিকিট আমার টেবিলে পৌঁছে যাবে। সোমবার যদি নাও পাই, মঙ্গলবার শিওর বুকিং পেয়ে যাচ্ছি। হোটেলের রেসপন্সিবিলিটি আমার। তুমি শুধু নিতবরটি সেজে তৈরি থেকো।

—হোটেল কেন, দার্জিলিঙ-এ আপনাদের হলিডে হোম আছে না ?

—মনটা ছোট কোরো না সুদীপ। ওতে বেড়ানোর আনন্দ মাটি হয়ে যায়। হোটেল সম্রাট আমাকে মিনিমাম টুয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে। তার মানে আটশোর রুম সিক্স ফিফটিতে হয়ে যাচ্ছে। ইউ ক্যান নট এক্সপেক্ট এনিথিং চিপার। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে নেব, এই ধরো জিপ বা ল্যান্ডরোভার, দার্জিলিঙ-এ তিন দিন, গ্যাংটকে চার দিন। মিরিক ছাংগু ওর মধ্যেই…। বাই দা বাই, তুমি ছাংগু কি জানো তো ?… ইটস্ আ লেক। অ্যারাউন্ড পনেরো হাজার ফিট অলটিচিউড।… নাথুলা পাস্, যেখানে ইন্ডিয়া চায়না ওয়ার হয়েছিল… ওফ, হোয়াট এ সাইট !… সেবার চোগিয়ালের ইনভিটেশানে যখন একটা গাভমেন্ট টিম গেল, আমিও তো…।

অনিরুদ্ধর কথা কানে ঢুকছিল না সুদীপের। দ্রুত মস্তিষ্কের কম্পিউটার চালিয়ে হিসেব কষছিল

খরচের। দশ দিনে মিনিমাম ষোলো-সতেরো হাজার ধসে যাবে। সঙ্গে এই অভব্য সংসর্গ। হে ঈশ্বর, কেন এই পাড়াতে আসতে রাজি হয়েছিল সুদীপ ! দাদাদেরই মতন ওদিকে কোথাও··· ! এই সময়ে একটা ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া গোছের কিছু হলেও বাঁচা যেত। ডেংগু এনকেফেলাইটিস হওয়াও বোধহয় এই ভ্রমণের থেকে খারাপ কিছু নয়।

টিং টিং কলিংবেল বাজছে।

সুদীপ ঘড়ি দেখল। আটটা দশ। পাড়ার ইস্ত্রিঅলা ছেলেটা এল নাকি !

মীনা উঠতে যাচ্ছিল, তার আগে রুনাই উঠে দরজা খুলেছে,— ওমা, শংকরদা আপনি !

ঘরে ঢুকে শংকর শ্যেন দৃষ্টিতে দেখছে চারদিক। মীনা অনিরুদ্ধকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল,— আপনারা তো আমায় আসতে বলবেন না, এই গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলোও দেবেন না, তাই অগত্যা···

কোলাকুলির পালা সাঙ্গ হল। আড্ডার সুর কেটে গেছে। টুকটাক কথা বলছে অনিরুদ্ধ, কিন্তু কেমন যেন অসহজ ভাব। রুনা ছুট্টে কটা পকোড়া ভেজে এনে দিল শংকরকে, ফ্রিজ থেকে সন্দেশ। শংকর খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে, ধীরেসুস্থে। দেখেই বোঝা যায় এখনই নড়ার ইচ্ছে নেই।

একটু পরে মীনা অনিরুদ্ধ উঠে পড়ল। দরজায় গিয়ে হাত তুলল অনিরুদ্ধ,— তা হলে ওই কথাই রইল সুদীপ। তুমি অফিস থেকে ছুটিটা অ্যারেঞ্জ করে ফ্যালো। আমি কাল আসছি না। জানোই তো লক্ষ্মীপুজোর দিন আমাদের শ্যামবাজারের বাড়িতে একটা ফ্যামিলি গ্যাদারিং হয়··· তা হলে পরশু, অ্যাঁ ?

সুদীপ কোনওকালেই শংকরকে দেখতে পারে না, কিন্তু এই মুহূর্তে শংকরকে অনেক সহনীয় ঠেকছিল তার। আরাম করে সিগারেট ধরিয়ে বলল,— ক'দিন ধরে জয়ির কথা খুব মনে পড়ছিল। এলেই যখন, ওদের নিয়ে এলে না কেন ? ঝান্টুটার সঙ্গেও কতকাল দেখা হয় না।

—বোন ভাগ্নের কথা তোমার মনে পড়ে দীপু ?

—সে কি কথা ! নিজের বোন, মনে পড়বে না ! কাজেকম্মে থাকি, যাওয়া হয় না···

কথাটায় তেমন জোর ফুটল না। শংকরও হাসছে,— হুম্, তোমরা তো খুব ব্যস্ত মানুষ।··· আমি এসে পড়ে তোমাদের কোনও অসুবিধে করলাম না তো ?

—না না, তা কেন ! রুনা প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠল,— বেশ করেছেন এসেছেন। রাত্তিরে এখানে খেয়ে যান।

—আজ আর পেটে জায়গা নেই বউদি, ও-বাড়িতে বড়বউদি প্রচুর খাইয়েছে। লুচি আলুর দম মিষ্টি, তারপর আপনাদের বাড়ির এই চিকেন···। ডিউ রইল বউদি, শিগগিরই এসে খেয়ে যাব।

—তা হলে একটু কফি করে আনি !

—আপনি করবেন ? ওই মেয়েটা নেই, মিনতি ?

—ওমা, জানেন না ? সে তো সেই কবেই দেশে যাচ্ছি বলে পালিয়েছে, আর ফেরেনি। কে জানে বরের সঙ্গে বোধহয় আবার ভাব হয়ে গেছে। ওদের ব্যাপার তো, ঝগড়া হতেও যতক্ষণ, মিলমিশ হতেও ততক্ষণ।

—তা যা বলেছেন। ওদের মধ্যে কোনও রাখঢাক গুড়গুড় নেই। যা হয় সরাসরি। যত সব পরকীয়া, লুকোচুরি আমাদের এই মিডল ক্লাসের মধ্যে।

সুদীপ ভুরু কুঁচকে তাকাল। রুনার প্রিয় প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ছে শংকর। তড়িঘড়ি বলে উঠল,— যাও না, কফিটা করে আনো না। আমার জন্যও কোরো। একটু কড়া করে।

রুনা যাওয়ার পর সুদীপের প্যাকেট থেকে সিগারেট ধরাল শংকর। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে ঘরখানা। বলল,— বাহ্, বউদির রুচির তারিফ করতে হয়। বেড়ে সাজিয়েছে।

সুদীপ আলগোছে দেখল শংকরকে,— হ্যাঁ, এসব দিকে ওর খুব ন্যাক। অ্যাটমটা এতদিন ছোট ছিল, ওর অত্যাচারে তেমন সাজাতে গোছাতে পারত না। ছেলে এখন বড় হচ্ছে···

—শুধু ছেলের দোষ দিচ্ছ কেন ভায়া ? ও-বাড়িতে সাজানোর মতো তো পরিবেশও ছিল না।

আবার কর্ড লাইনে চলে যাচ্ছে শংকর। প্রাণপণে স্টিয়ারিং ঘোরাতে চাইল সুদীপ, তার আগে শংকরই চলে গেছে অন্য কথায়,— তোমার ভায়রা ভদ্রলোক কিসব ছুটি-ফুটি নেওয়ার কথা বলছিল, তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

অ্যাটম সোফায় ঘাপটি মেরে বসে কথা গিলছিল। পুট করে বলে উঠল,— আমরা তো দার্জিলিং যাচ্ছি পিসেমশাই। মেসো নিয়ে যাচ্ছে।

কী শিক্ষা যে হচ্ছে অ্যাটমের ! টাকা খসাবে সুদীপ রায়, গার্জেন সাজবে মেসো !

সুদীপ ছেলেকে হালকা ধমক দিল,— অনেক আড্ডা হয়েছে অ্যাটম, এবার ও-ঘরে গিয়ে হোম টাসক্ শুরু করো।

—যাচ্ছি। অ্যাটম গা মোচড়াচ্ছে।

—যাচ্ছি না। যাও।

দুঃখী মুখে উঠে গেল অ্যাটম। আবার সামান্য ছুতোয় ফিরে আসবে, সুদীপ জানে।

শংকর পিটির পিটির হাসছে,— কপাল জোরে শ্বশুরবাড়ি পেয়েছিলে ভায়া। আমাদের তো কেউ কোনওদিন স্যুটকেস বইবার জন্যও নিয়ে গেল না।

সুদীপের কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল,— যে যেমন ভাগ্য নিয়ে আসে।

—তা বটে, তা বটে। তোমাদের তিন ভায়ের মধ্যে তোমার ভাগ্যই সব থেকে সরেস। চাঁদুরও অবশ্য এখন চড়চড় করে কপাল খুলছে। শুধু তোমার দাদাই··· বলতে বলতে শংকর কি যেন একটু চিন্তা করল। তারপর বলল,— একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভায়া ? ওই দুঃখী মানুষটাকে শেষে তোমরা দু ভাই মিলে চিরতরে কাশী পাঠিয়ে দিচ্ছ ?

দাদা··· ! চিরতরে··· ! কাশী··· ! সুদীপ ফ্যালফ্যাল তাকাল। বিড়বিড় করে বলল,— বুঝলাম না। দাদা আবার কাশী যাচ্ছে ?

—সবই তো জানো ভায়া। আমাকে বাইরের লোক ভেবে কেন লুকোছাপা করছ ?

—আরে ! সত্যিই আমি কিছু জানি না। কই, পরশু ও-বাড়ি গেলাম, বউদিও তো কিছু বলল না !

—তিনি মানী মানুষ, হয়তো অভিমানে কিছু বলেননি।

সুদীপের স্থৈর্য খানখান হয়ে গেল,— সত্যিই কিছু জানি না। কি হয়েছে খুলে বলো তো।

—আমার মুখ দিয়েই বলাবে ? দাদা সেদিন আমাদের বাড়িতে বলে এল কোন বন্ধুর আশ্রমে চলে যাচ্ছে, তুমি আর চাঁদু টাকা দিয়েছ···

সুদীপের কাছে একটু একটু করে যেন পরিষ্কার হচ্ছিল ব্যাপারটা। স্বর গম্ভীর করে বলল,— দাদা তোমাদের ওখানে কবে গেছিল ?

—প্রায়ই তো যায়। চুর হয়ে পড়ে থাকে, কত মনের দুঃখের কথা বলে ···নবমীর দিন তো ঠেলে ঠেলেও বাড়ি পাঠাতে পারলাম না। তোমার বোনও বলল, আহা অভাগা মানুষটা আছে থাক···। জয়ি তোমাদের ওপর খুব রেগে আছে ভায়া, এত করে বললাম তবু আজ বিজয়া করতে এল না।

সুদীপ গুম মেরে গেল।

শংকর চোখ ছোট করে দেখল সুদীপকে। গলা নামিয়ে বলল,— তোমাদের বউদি নয় অন্য ধাতুর মানুষ, ভাঙবেন তবু চমকাবেন না। কিংবা কে জানে তিনি হয়তো দাদাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচেন। কিন্তু তোমরা তো ভাই, মামাতো, পিসতুতো, জাঠতুতো নয়, এক মায়ের পেটের ভাই, তোমরা কী করে দাদাকে না আটকে উসকে দিলে ? আমি তো এক নম্বরের পাষণ্ড, আমারও ভাবলে কান্না পায়।

রুনা কফি এনেছে। শংকর নীরব হয়ে গেল। সুদীপও নিথর। ভাবছে। অঙ্ক মেলাচ্ছে।

শংকর চলে যেতেই রুনাকে ধরল সুদীপ,— দাদা সেদিন পাঁচশো টাকা চাইল, কেন দরকার কিছু বলেছিল ?

—না তো। শুধু বলছিল টাকাটা খুব দরকার, দীপু যদি দেয়…

—তুমি দিলে কেন ? আমার জন্য কেন অপেক্ষা করলে না ?

—আবার সে কথা উঠছে কেন ? রুনা সামান্য ঝেঁঝে উঠল,— কতবার করে বলব, ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে !

সুদীপ অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাল। গটগট করে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কী করে রুনাকে বোঝাবে এক-একটা ভুল আজীবন কপালে কালো দাগ এঁকে দেয়। ক্ষত হয়ে দংশায় সে দাগ, আগুন হয়ে পোড়ায়, পুঁজ রক্ত হয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায় জীবনভর। আজ যদি সত্যিই দাদা গৃহত্যাগ করে, সুদীপ কি তার নিমিত্ত হয়ে থাকবে না ! যেমনভাবে বাবার মৃত্যুর নিমিত্ত হয়ে গেল বউদি ! পরশু বউদি বড় আড়ষ্ট ছিল, রুক্ষ ছিল, সে কি এই জন্যই ! দাদা যে আবার চূড়ান্ত মদ খাওয়া শুরু করেছে, মাঝে মাঝেই বাড়ি ফেরে না, এসব কথা বউদি বা তিতির কেউই ভুলেও বলে না সুদীপকে। চাঁদুর কাছে একদিন শুনেছিল, হালকাভাবে গল্প করছিল চাঁদু। পরশুও তিতিরের সঙ্গে দেখা হল, দাদার ওই আশ্রমবাসের অভিলাষের কথাটাও সুদীপকে বলল না তিতির, শুধু একটা প্রণাম ঠুকে সরে গেল। অথচ ওই তিতিরই একদিন সুদীপের কাছে…।

আজ কেন এই দূরত্ব ? কে এতখানি দূরত্ব গড়ে দিল ? সুদীপ ? রুনা ? আদিত্য ? ইন্দ্রাণী ? তিতির ? জয়মোহন ? কে ? সম্পর্কের মাঝের এই পরিখা কি কোনও ভাবেই আর পার হওয়া যায় না ? দাদার দুঃখের উৎস কি খুঁজতে পারে না সুদীপ ? বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে পারে না দাদার খ্যাপামো ? বউদির মনে যদি কোনও চোরকাঁটা বিঁধে থাকে, তা কি উপড়ে ফেলতে পারে না সুদীপ ? তিতিরের মাথায় আগের মতো হাত বোলাতে পারে না ?

কিচ্ছু পারে না সুদীপ, কিচ্ছু পারে না। দূরে চলে যেতে শুরু করলে কাছে ফেরা বড় কঠিন, সুদীপ অনুভব করতে পারছিল।

পাড়ার পুজোর প্যান্ডেলের কাঠামোটা এখনও রয়ে গেছে। হাড়পাঁজরা বার করা বাঁশের খাঁচায় ঝুলছে ছেঁড়া দড়িদড়া। উৎসবের মলিন স্মৃতির মতো। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে পথে, সে আলোও যেন প্রভাহীন। যেন আলোগুলোর গায়ে রোঁয়া গজিয়েছে অসংখ্য, তারাই ঢেকে দিচ্ছে দীপ্তি।

উদ্দেশ্যহীন হাঁটছিল সুদীপ। দশটা বাজে, রাস্তাঘাটে এখনও বেশ লোকজন চলাফেরা করছে। তবু শহরটাকে বড় নির্জন ঠেকছিল সুদীপের।

নির্জন, না নিঃসঙ্গ !

৭৬

সন্ধ্যার মা ডাকল,— খেতে এসো দিদিমণি।

তিতির শুয়ে শুয়ে একটা ইংরিজি ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছিল। সিনেমার। কন্দর্পর ঘরে পড়ে ছিল, নিয়ে এসেছে। চটুল অর্ধসত্যে ভরা পত্রিকা, মন না দিয়েও তরতর চোখ বোলানো যায়। এসব পত্রিকা আগে টানত না তিতিরকে, গল্পের বই-ই তার প্রাণ ছিল। এখন গল্পের বই পড়তে বেশিক্ষণ ভাল লাগে না, সহস্র বুক-ভার-করা চিন্তা সেঁধিয়ে যায় গল্প উপন্যাসের পাতায়, শব্দ বাক্য সবই অর্থহীন অক্ষরের সমষ্টি বলে মনে হয়। তার চেয়ে এই ভাল। এই চিন্তাশূন্য, ভোঁতা এক রঙিন কাল্পনিক জগৎ।

সন্ধ্যার মা আবার ডাকল,—কই এসো, ভাত বেড়ে যে বসে আছি।

—যাই।

—যাই নয়, এসো। আমি আজ তাড়াতাড়ি যাব, বাড়িতে পুজো আছে।

বিরক্ত মুখে পত্রিকাটা রেখে উঠল তিতির। পাখার হাওয়ায় ফরফর উড়ছে রঙিন পাতা। রূপসী নায়িকার ভাঁজ করা নির্লজ্জ পোস্টার খুলে ছড়িয়ে গেল। খোলা কাঁধ, খোলা পিঠ, খোলা উরু। নাচছে হাওয়ায়। ছবিটাকে ভাঁজ করে আব্রু টানার চেষ্টা করল না তিতির, পাখা বন্ধ করে খাওয়ার টেবিলে এল।

এসেই আড়ষ্ট। বাবা। খাচ্ছে।

নিঃশব্দে চেয়ার টেনে আদিত্যর পাশে বসল তিতির। ভাত মাখছে মাথা নিচু করে। মুসুর ডালের কাঁচা লঙ্কাটা তিতিরের পাতেই পড়েছে, কচকচ চিবোল সেটাকে। জ্বলে যাচ্ছে জিভ, তবু মুখ থেকে লঙ্কা ফেলল না। আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিপল আলুপোস্তর আলু, ডাল-মাখা ভাতে পুরো তরকারিটা চটকে নিল। চটকাচ্ছে, চটকেই চলেছে।

আদিত্যর বুঝি নজরে পড়েছে দৃশ্যটা। খাওয়া থামিয়ে বলল,— হল কী তোর! খাচ্ছিস না কেন!

গপ গপ করে দু গাল ভাত মুখে ঠেসে দিল তিতির।

—ওকি করিস! গলায় আটকে যাবে যে!

কোঁত করে ভাতটা গিলে নিল তিতির। সবটা পারল না, জল দিয়ে বাকিটা চালান করতে হল পাকস্থলীতে। ঠকাং করে গ্লাস নামিয়ে রাখল।

আদিত্যর ঠোঁটে হাসি ফুটেছে,— এখনও আমার ওপর রেগে আছিস?

—রাগ কিসের। আমি কারুর ওপর রাগ করি না।

—বললেই হল! তাকা, আমার দিকে তাকা।

তিতির চোখ তুলল না। স্বর যথাসম্ভব শান্ত রেখে বলল,— কেন আমি মিছিমিছি রাগ করব বাবা? আমি রাগ করলে কারুর কি কিচ্ছু বদল হবে?

—এও তো রাগেরই কথা। আদিত্য তিতিরের কাঁধে হাত রাখল,— দূর পাগলি, আমি কি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি? গেলেও...তোকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? ঠিক ফাঁক বুঝে মাঝে মাঝে চলে আসব।

গেলে বুঝি কেউ আর ফেরে! এই পরিবার থেকে একে একে সবাই সরে যাচ্ছে। দাদা চলে গেল, কাকা কাকিমারা চলে গেল, দাদু তো...এবার বাবাও কেটে পড়ার মতলব ভাঁজছে। বাবাকে ছাড়া কী করে এ বাড়িতে নিশ্বাস নেবে তিতির!

তিতিরের চোখ ভিজে আসছিল। মেঘলা গলায় বলল,— যাও না, আমি কি তোমাকে বাধা দিয়েছি? দু মাস পরে কেন, আজই চলে যাও।

আদিত্য হাত সরিয়ে নিল তিতিরের কাঁধ থেকে। মলিন গলায় বলল,— তুইও আমাকে বুঝবি না তিতির? চাস না তোর বাবা একটু শান্তি পাক?

তিতির চুপ।

—এখন তোর মনে হচ্ছে তোর বাবাটা খুব নিষ্ঠুর। কারুর কথা ভাবে না, শুধু নিজের কথা ভাবে। আমি চলে গেলে দেখবি তোর ধারণাটা কত ভুল। এই দুনিয়ায় কিছু কিছু মানুষ থাকে জ্যান্ত উপদ্রবের মতো, তারা যেখানে হাত ছোঁয়ায় সেখানে অশান্তি, যেদিকে তাকায় সেদিকেই দুঃখের ফোয়ারা খুলে যায়। তারা সংসারের কূটতর্ক বোঝে না, সুখ খুঁজে আনার গোপন রহস্যও তাদের জানা নেই। তারা...

—থাক, তোমার ওই তত্ত্বকথা তোমার রঘুবীরবাবুকে শুনিয়ো। রোজ এক লেকচার শুনতে আমার ভাল লাগে না।

নীরস স্বরে আদিত্যকে থামিয়ে দিল তিতির। সন্ধ্যার মা বাটিতে ডিমের ঝোল রেখে গেছে, পাতে ঢেলে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। এ জগতে কে না নিজের কাজের সাফাই গায়! চোর ডাকাত খুনে বদমাশ, তাদেরও নিজেদের কাজের পিছনে মনোমতো যুক্তি খাড়া করা থাকে। আর

বাবা তো সাধুসন্তর জীবন যাপন করতে চাইছে ! তবে হাজারটা খরগোশ জোড়া দিয়ে যেমন একটা ঘোড়া বানানো যায় না, তেমন হাজারটা যুক্তি দিয়েও আপনজনের দুঃখের ভার লাঘব করা যায় না। বাবার অনস্তিত্বে এ সংসারে সুখের প্লাবন বইবে, এমন উদ্ভট ধারণাই বা বাবার এল কোত্থেকে !

যাক গে, যে যার সুখ খুঁজুক, যে যার আনন্দ নিয়ে থাকুক, তিতির কাউকে আর কিছু বলবে না। তিতির আর শিশুটি নেই, সে নিজেকে শক্ত করে নিতে জানে।

খাওয়া শেষ করে তিতির উঠছিল, আদিত্য ডাকল তাকে,— তুই কি এখন বাড়িতেই আছিস ?

তিতির ভারী মুখে ঘুরে দাঁড়াল,— আমার তো তোমার মতো একশোখানা যাওয়ার জায়গা নেই বাবা।

—তুই একদম মা'র মতো করে কথা বলছিস কেন ?

—সে তো বলিই। আমি তো মা'রই মেয়ে।

আদিত্যর মুখটা যেন কালো হয়ে গেল।

পলকের জন্য নরম হল তিতির,— কী বলবে বলো। আমি এখন বাড়িতেই আছি।

—আমার সঙ্গে চল না। আদিত্য সঙ্কুচিতভাবে বলল।

—কোথায় ?

—মানিকতলায়। ...তোর মা অত করে বলে গেল।

মানিকতলার বাড়িতে দিদা আজ সত্যনারায়ণ পুজো করছে। দশটা বাজতে না বাজতেই মা চলে গেছে সেখানে। তার আগে বাবার সঙ্গে মা'র মৃদু বিতণ্ডা চলছিল, শুনেছে তিতির। বাবাকে সঙ্গে যেতে বলছিল মা, বাবা যেতেই রাজি নয়। মা বলছিল, যাবে কি যাবে না সেটা তোমার ব্যাপার। বাবা মা তোমাদের বারবার যেতে বলেছেন, এটা জানিয়ে দিলাম। তোমার মেয়েকেও পায়ে ধরে সাধব না, তোমাকেও না।

তিতির ভুরু কুঁচকে তাকাল,— তুমি যাচ্ছ ?

—যাই। তোর দাদু-দিদা মনে কষ্ট পাবেন।

—অন্যের কষ্ট তা হলে তোমার মনে লাগে ?

—আবার সেই মা'র মতো কথা। যাবি কিনা বল।

তিতির দুদণ্ড চিন্তা করল। দাদু-দিদাকে এখনও বিজয়ার প্রণাম করতে যাওয়া হয়নি, পুজো দেখা আর প্রণাম এক ঢিলে দু পাখি মেরে আসা যায়। দাদু-দিদাকে দেখতেও ইচ্ছে করছে খুব। প্রতিবার পুজোতে ছোটকার সঙ্গে একবার মানিকতলায় ঢুঁ মেরে আসে, এবার পুজোয় একদিনও ছোটকার টিকি দেখা গেল না। সক্কাল হলেই গাড়ি নিয়ে আউট, দুপুরে ফিরে ভোঁস ভোঁস ঘুম, আর সন্ধে না হতেই গোঁফ ছেঁটে, চুল ফাঁপিয়ে আবার গাড়ি চালিয়ে ভ্যানিশ। নবমীর দিন সকালে তিতিরকে অবশ্য একবার বেরোতে সেধেছিল ছোটকা, তিতির রাজি হয়নি। কে জানে কেন বেড়ানোর মুডই ছিল না সেদিন। আজ গেলে বাবার সঙ্গেও একটু বেড়ানো হয়। কতকাল যে বাবার সঙ্গে বেরোয়নি তিতির।

কিন্তু না। যা যা ইচ্ছে করছে তার একটাও করবে না তিতির। ছোট ছোট ইচ্ছের মধ্যে যে-টুকুনি শরতের বাতাস লুকিয়ে আছে, সে-টুকুনিও টিপে টিপে নিংড়ে বার করে দেবে ফুসফুস থেকে। মৃত ইচ্ছেগুলো যত বেশি আকুল করবে তিতিরকে, তত বেশি উচ্ছল হবে তিতির।

মুখ ফিরিয়ে তিতির বলল,— তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও। আমাকে টানাটানি কোরো না।

সন্ধ্যার মা বাসন-কোসন মেজে চলে গেছে। আদিত্যও বেরিয়ে গেল। গ্রিল-দরজায় তালা দিয়ে একটুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল তিতির। সূর্য পশ্চিমে হেলছে, শেষ আশ্বিনের রোদ্দুর এখনও ভারী তেজি। ফেনা ফেনা মেঘ ভাসছে আকাশে। একটা চিল উড়তে উড়তে মেঘেদের ছুঁয়ে ফেলল। পাক খেয়ে খেয়ে নামছে আবার, ছোট হচ্ছে বৃত্ত। রোদ্দুর মাড়িয়ে একঝলক বাতাস ছুটে এল তিতিরের দিকে, নির্জন দুপুর ভারী কোমল হয়ে গেল।

এই ভাল লাগাটাও ভাল নয়। সরে এল তিতির।

বিছানায় ফিরে তিতির আবার বিশ্রী ম্যাগাজিনটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। দুই নায়কের অকপট মিথ্যে ভাষণ পার হতে-না-হতেই চোখ আটকে গেছে সামনের দেওয়ালে। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে এক টুকরো আলো এসে দেওয়ালে একটা মায়াবী পর্দা তৈরি করেছে। পর্দায় জাফরি কেটেছে জানলার গ্রিল। জাফরির পিছনে ভাসছে ওপাশের শিউলি গাছের ছায়া। দুলছে গাছ, ছায়াও দুলছে। একটা ছোট্ট টুনটুনি ডালে বসেই ফুড়ুৎ উড়ে গেল। আবার বসল এসে, এবার একটা নয়, দুটো। তিরতির কাঁপছে পাতারা, কাঁপছে ছায়ার মায়া।

তিতির মুগ্ধ চোখে ছবি দেখছিল, ছবির বদল দেখছিল, ছবির নির্মিতি দেখছিল। অভিমানী বুকে কুল কুল করছে সুখ, যা কিনা শুধু তিতিরের বয়সেই আসে। এই সুখ আর দুঃখের মাঝে একচুল ব্যবধান। ডালে ডালে পিড়িং পিড়িং নাচছে জোড়া টুনটুনি, অপরূপ এক বিভ্রমে উপচে যাচ্ছে তিতির। দুলন্ত পাতার ছায়া এত শিহরন তোলে মনে!

তখনই তিতিরের পোস্তদানা মনটা কুনকুন করে উঠল। বহুদিন পর।

—তোর জন্য এককণা সুখও ভাল নয় রে তিতির।

—সে কি আমি জানি না! খুব জানি।

—মিছিমিছি তবে কেন ভাল লাগা খুঁজিস?

—খুঁজি না তো। চোখে পড়ে যায়। মনে এসে যায়।

—এর জন্যই তোর অনেক শাস্তি পাওনা হচ্ছে।

—আরও শাস্তি?

—হুঁ হুঁ। সামলা, নিজেকে সামলা।

—হঠাৎ এ কথা কেন?

পোস্তদানা মন ডেলফির দৈববাণীর মতো নীরব হয়ে গেল। অমোঘ সত্যের আশঙ্কায় খানিকটা দোনামোনায় পড়ে গেল তিতির। জানলাটা বন্ধ করে দেবে? টেনে দেবে পর্দা?

কলিংবেল বাজছে। ঘরের মধ্যেকার সুনসান দুপুরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অলস পায়ে বারান্দায় গিয়ে ভারী অবাক হল তিতির,— ওমা, মেশিনদাদু তুমি!

দুর্লভ আগের মতোই জাদু-মাখা হাসি হাসছে,— বুড়োটাকে বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি দিদিভাই? দরজা খুলবে না?

—এমা ছি ছি, এসো এসো। দুর্লভকে আদিত্যর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল তিতির। পাখা চালিয়ে দিল,— আমাদের এ বাড়ি তুমি চিনলে কী করে?

—ম্যাজিক। হাত উল্টে বিচিত্র ভঙ্গি করল দুর্লভ।

জিয়ন কাঠির ছোঁয়ায় পলকে শৈশব জেগে উঠেছে তিতিরের। জেগে উঠেছে সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, রঙিন প্রজাপতি, সুরভিত ফুল, সুদূর নীহারিকা। জেগে উঠেছে এক অলীক স্বপ্নপুরী।

মায়া রাজ্যের স্থপতি ধুতির খোঁটায় ঘাম মুছছে। হাসল,— তোমার বড়কাকার সঙ্গে মাঝে মাঝে অফিসপাড়ায় দেখা হয় গো দিদি। কতদিন ধরে ভাবি আসব আসব, হয়েই ওঠে না। এর মধ্যে আবার পুজোর ছুটিতে দেশে গেলাম...

—তুমি আবার কাজ করছ? কোথায়?

—আমি যে একই যন্ত্রে বাঁধা দিদি। সেই ঘটাংঘট। বউবাজারের এক গাছে এখন কোমরের দড়ি বেঁধেছি।

দ্রুত অন্দরে গিয়ে এক গ্লাস শরবত করে নিয়ে এল তিতির, সঙ্গে এক প্লেট মিষ্টি। সন্ধ্যার মা দশমীর দিন কিছু কুচো নিমকি ভেজেছিল, তাও খুঁজেপেতে বার করে সাজিয়ে দিল। কত যুগ পর এক আপনজন এসেছে ঘরে।

—নাও, খেয়ে নাও। ... তা হলে আর তোমার দেশে ফেরা হল না মেশিনদাদু ?

—কপাল দিদি। তোমাদের এই শহরটা যে অজগরের মতো পাকে পাকে বেঁধে ফেলেছে। দেশে গিয়ে মন টেকে না, হাওড়ার পুল দেখার জন্য চোখ হেদিয়ে মরে...। ওদিকে ছোট জামাইটা সেই যে সাইকেল থেকে পড়ে মাজা ভেঙে হাসপাতালে গেল, এখনও পুরোপুরি সেরে উঠল না। তার পেছনে কি কম খরচপাতি গো! ওষুধটা-বিষুধটা...সপ্তাহে দু দিন ভ্যানরিকশা করে মহকুমা হাসপাতালে থেরাপি করতে ছোটা...তোমার মেশিনদাদুর কাজ না করে উপায় কি !

মেশিনদাদুর মুখে এসব দুঃখের কাহিনী মানায় না। স্বপ্নের ফেরিঅলা রূঢ় বাস্তবের কথা বলবে এ কেমন কথা !

তিতির ফস করে জিজ্ঞাসা করল,— নতুন প্রেস লাগছে কেমন ? ওখানেও কি তোমার পুরনো খেলা চলছে ?

—সময় পাই না গো দিদি, মালিক বড্ড খাটায়। কাজে ভুল হলে হপ্তা দিতে চায় না...। দুনিয়া বড় কঠিন হয়ে গেছে গো দিদিভাই, কচি কচি ছানারাও আর এখন স্বপ্ন দেখতে চায় না। আমারও আর ওসব আসে না দিদি।

এর পরে আর গল্প জমে! তিতিরকে দু-চারটে কুশল প্রশ্ন করল দুর্লভ, আদিত্য ইন্দ্রাণী কন্দর্প বাপ্পার খবর নিল। গা বাঁচিয়ে ভাসা ভাসা উত্তর দিল তিতির। এ বাড়িতে আসার পথে তিতিরদের পুরনো বাড়িটা দেখে এসেছে দুর্লভ, কেমন ভোজবাজিতে মিলিয়ে গেছে বাড়িটা, নতুন করে বিশাল বিশাল পিলার গাঁথা হচ্ছে, সে গল্পও করল খানিক। ইনিয়ে বিনিয়ে জানতে চাইল ফ্ল্যাটবাড়িতে ইন্দ্রাণীর আবার প্রেস করার ইচ্ছে আছে কিনা, যদি হয় আবার ফিরে আসতে চায় দুর্লভ, দু-দশ টাকা কম পেলেও।

কিছু শুনছিল তিতির, কিছু শুনছিল না। নির্জন দুপুরের বিষণ্ণতা আবার চারিয়ে যাচ্ছে বুকে। এতদিনে মেশিনদাদু বুড়িয়ে গেল। চোখ অনেক নিষ্প্রভ, স্বর উচ্ছ্বাসহীন, মুখের বলিরেখা হঠাৎই প্রকট। তরতরে তাজা ভাবের চিহ্নমাত্র নেই। স্বপ্ন ফুরিয়ে গেলে কি মানুষের এই দশাই হয় !

এক সময়ে উঠল দুর্লভ। খেঁটো ধুতি পরা ছোটখাট কুঁজোটে মানুষটা জীর্ণ ক্যাম্বিসের ব্যাগ কাঁধে তুলে নিল। পথে নেমে আকাশের দিকে চোখ তুলল একবার, ছাতার আড়ালে মিলিয়ে গেল মাথা। তিতিরের হঠাৎ মনে পড়ল ফি বছরই পুজোয় মেশিনদাদুকে ধুতি শার্ট দিত মা, এ বছরও কি সেই আশায় এসেছিল গরিব মানুষটা ? বাবা তো কালেভদ্রে ধুতি পরে, অনেক নতুন ধুতি জমে আছে, দৌড়ে ডেকে এনে দিয়ে দেবে একটা ? থাক গে। মেশিনদাদু গরিব কিন্তু হাতপাতা স্বভাবের নয়, যদি কিছু মনে করে !

ঘরে ফিরে তিতির মায়ামাখা ছবিটাকে খুঁজল। নেই। সূর্য আরও ঢলে গেছে, এক ক্লান্ত ছায়া ছড়িয়ে আছে ঘরে।

আবার বিছানায় শুয়ে চোখ বুজল তিতির। ভাল লাগছে না। বাড়িঅলা পাম্প চালিয়েছে, উগ্র ঝিঁঝির ডাকের মতো একটা শব্দ বেজে চলেছে একটানা। মাথার ওপর একা একা পাখা ঘুরছে, তারও একটা নিজস্ব ধ্বনি বিন বিন করছে কানে। শরতের এই আলোআঁধার মাখা বিকেলে ওইসব শব্দরাজি আরও আরও যেন উদাস করে দেয় মন। এক্ষুনি কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলেও বুঝি ভাল লাগত।

মাস চারেক কন্দর্পর তদ্বির-তদারকির পর অবশেষে টেলিফোন ফিরেছে তিতিরদের। এই সবে পুজোর মুখে মুখে লাইন দিয়েছে। ঠিকানা বদল করতেই এত দিন সময়, নতুন যারা দরখাস্ত করেছে তাদের যে কী হাল! তিতিরের বন্ধু দেবোপমরা সাত বছর আগে অ্যাপ্লিকেশন করেছে, এখনও খোঁজ নিতে গেলে নাকি শোনে, রহু ধৈর্যং, ইলেকট্রনিক এক্সচেঞ্জ হল বলে, তখন আর কারুর টেলিফোন নিয়ে সমস্যা থাকবে না !

টেলিফোনের সামনে এসে তিতির চিন্তায় পড়ল। কাকে ফোন করবে ? ঝুলন ? সে তো

শুশুনিয়ায়। দেবস্মিতাকেও করা যায়, অনেক দিন দেবস্মিতার কোনও খোঁজখবর নেই। এই স্কুলের বন্ধুদের ফোন করবে ? এবার পুজোয় দিল্লি গেছে কুলজিৎ, গাড়ি নিয়ে এবার আর দল বেঁধে ঠাকুর দেখতে বেরোনো হয়নি, জিজ্ঞেস করা যায় কার পুজো কেমন কাটল।

সহসা তিতিরের মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। টোটো তো এখন একা আছে, তাকে রিঙ্ করলে কেমন হয় ? কী ভীষণ চমকে যাবে টোটো। আজেবাজে কথা বলে দেবে কি ? যদি বলে ? অপমান করে তিতিরকে ?

একটা মন বাধা দিচ্ছে, অন্য মন টকটক টিপছে নাম্বার। বেশ খানিকক্ষণ ফোন বাজার পর টোটোই ধরেছে। ঘুম ঘুম গলা,— হ্যালো ?

কটাস করে লাইন কেটে দিল তিতির।

মিনিট খানেক পর আবার তিতির বোতাম টিপেছে। আবার হ্যালো। আবার ফোন রেখে দিল তিতির।

আবার।

আবার।

বারপাঁচেকের মাথায় খেপে গেছে টোটো। চিৎকার করছে,— ইউ বাস্টার্ড। স্টপ দিস জোক ইউ সোয়াইন।

তিতিরের কান লাল হয়ে গেল। একটু মজাও লাগল যেন। প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটে টোটোর অস্থির হাত-পা ছোঁড়া কল্পনা করতে পারছে। কথা না বলে সে ভালই করেছে। কীই বা বলত ! তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি আমার সঙ্গে আর ঝগড়া কোরো না প্লিজ ! যাহ্, তিতির কি টোটোর কাছে নিজেকে অত খেলো করতে পারে কখনও ! তার চেয়ে এই মজার খেলাটাই বেশ।

মেঘ সরে আলো আসছে মনে। প্রফুল্ল চিত্তে এক কাপ চা করে ফেলল তিতির। কাপ হাতে কন্দর্পর ঘরে এল। গতকালই তিন দিনের আউটডোরে বোলপুর গেছে ছোটকা, ঘরটা সামান্য অগোছালো হয়ে আছে। ইদানীং ঘর টিপটপ রাখার ব্যাপারে ছোটকা বেশ অমনোযোগী। কেন কে জানে ! হয়তো বিখ্যাত হওয়ার আনন্দে ছোট ঘর, ছোট আসবাবে আর মন ওঠে না।

আলগোছে ঘরটাকে একটু ঝাড়পোঁচ করল তিতির। খাটে দুখানা মোটা মোটা বই পড়ে আছে, টেবিলে গুছিয়ে রাখল। খোলা ভিডিও ক্যাসেট খাপে ভরল, ভিসিপিটাকে মুছল যত্ন করে। সেতারে আঙুল টেনে টুং টুং করল, কান পেতে শুনল ধ্বনিটাকে। ছোটকার কাছে এই বাজনাটা শিখলে হত, এও বেশ সঙ্গী হতে পারত তিতিরের।

টেলিফোনের ঝংকারে সচকিত হল তিতির। হরিণ পায়ে ছুয়ে এসে রিসিভার তুলল।

—কী ব্যাপার ? তখন থেকে ফোন করে যাচ্ছি শুধু এনগেজড বাজছে ! কার সঙ্গে এত কথা বলছিলে, অ্যাঁ ?

সুকান্তর কথার মালগাড়ি ছুটছে। তিতির হাসি চাপল,— আমার কি বন্ধুর অভাব আছে ! কজনের নাম বলব ?

—আমারই শুধু কোনও বন্ধু নেই।

—আহা, তোমার গ্যারেজ পার্টি কী হল ?

—ওরা বন্ধু কেন হবে ! ইয়ার দোস্ত্।

—ও, বন্ধুর ডেফিনেশানটা তবে কি ?

—এই ধরো, যাকে দেখতে না পেলে চোখে আঞ্জনি হয়। যার সঙ্গে দশ পা না হাঁটলে হাঁটুতে ব্যথা হয়। যার বকুনি না খেলে রাতে ঘুম আসে না ...

—থাক থাক, হয়েছে। ফোন কেন ? আমার তো আজ বাড়ি থাকার কথা নয়।

—আছ কেন ?

—নিশ্চয়ই তোমার ফোন ধরার জন্য নয়। আমার অন্য কাজ আছে।

দূরভাষ একটুক্ষণের জন্য নীরব। তারপর গলা বাজছে,— আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, একটুও বেরোবে না ?

—বেরিয়ে ?

—এমনিই। তোমার সঙ্গে একটু এদিক ওদিক ঘুরব।

তিতির এক সেকেন্ড চিন্তা করল। ফাঁকা বাড়িতে এখন একা থাকা মানেই আবার সেই দুঃখী দুঃখী মুহূর্তগুলোর খপ্পরে পড়া। সুকান্তর সঙ্গে বেরোনোও যে খুব সুখের তা নয়, বড্ড আলতু-ফালতু কথা বলে ছেলেটা। তা হোক, সঙ্গী তো বটে। পাশে হাঁটলে শহরের নির্জনতা কেটে যায়।

স্বর নির্লিপ্ত রেখে তিতির বলল,— ঠিক আছে, বেরোচ্ছি। তুমি বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করো। অষ্টমীর দিনের মতো অতক্ষণ কিন্তু বাইরে থাকব না।

ফোন রেখে তিতির অল্প সাজগোজ সারল। বাতাস শুকনো হয়ে আসছে, একটু ময়েশ্চারাইজার লাগাল মুখে, ঠোঁটে চিলতে লিপস্টিক। সালোয়ার-কামিজ পরতে গিয়েও কি ভেবে রেখে দিল, কন্দর্প এবার একটা দামি সিল্কের শাড়ি দিয়েছে পুজোয়, অতি যত্নে পরল শাড়িটা। দরজা-জানলায় ভাল করে ছিটকিনি তুলল, কোনও খুঁত পেলেই মা ফিরে এসে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে।

পিত্তি জ্বালানো তুঁতে রঙ অ্যাম্বাসাডার নিয়ে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে সুকান্ত। তিতিরকে দেখেই লাফিয়ে উঠল,— আইব্বাস, কী দিয়েছ! এক্কেবারে কোজাগরী হয়ে বেরিয়েছ যে!

তিতির তেরিয়া চোখে গাড়িটার দিকে তাকাল,— এটা কী ? তোমাকে না কত দিন গাড়ি নিয়ে আসতে বারণ করেছি!

—উপায় ছিল না। মাসির বাড়ি থেকে তোমাকে ফোন করছিলাম, সঙ্গে গাড়িটা ছিল। গাড়ি রেখে আসতে গেলে লেট্ হয়ে যেত।

—লাই।

—মাইরি না। আপ অন গড। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি।

—থাক।

সামনের সিটের দরজা খুলে বসল তিতির। জানলার কাচ নামিয়ে দিল। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সুকান্ত বলল,— কোন দিকে যাবেন মেমসাহেব ?

—যে চুলোয় খুশি।

—কয়ামতসে কয়ামত তক-এর ক্যাসেট আছে, চালাই ?

—না।

সুকান্ত গাড়ি স্টার্ট দিল,— গঙ্গার ধারে যাবে ?

তিতির উত্তর দিল না। ছুটন্ত গাড়ি থেকে পড়ন্ত বিকেল দেখছে, ফিরোজা রঙ আকাশ দেখছে। দুর্গাপুজোর জাঁকজমক আর নেই, তবু রেশ রয়ে গেছে তার। দায়সারা লক্ষ্মীপুজো চলছে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, মলিন মুখে বসে আছেন অনাথ প্রতিমা। লক্ষ্মীঠাকুর নাকি বাদ্যি শুনলে পালান, তবু কোথাও কোথাও মাইকে হিন্দি গান বাজছে জোর।

রবীন্দ্রসদন পেরিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়েছে সুকান্ত, সাঁ সাঁ টপকে যাচ্ছে অন্যান্য যান। ক্ষণেকের জন্য তিতিরের মনে পড়ল এমনই এক উদ্দেশ্যহীন জয় রাইডে হিয়াকে নিয়ে বেরিয়েছিল টোটো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছে সুকান্তর দিকে,— কী হচ্ছে কি, আস্তে চালাতে পারো না!

—রাস্তা তো ফাঁকা। এমন সুন্দর বিকেলে...

—খবরদার। আমি তা হলে নেমে যাব।

—যো হুকুম মেমসাব। এই নাও চল্লিশে নেমে গেলাম।

গঙ্গার ধারে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে সূর্য ডুবে গেছে। শেষ শরতের সান্ধ্য আঁধার তরল কুয়াশা

মেখে ভাসছে নদীর গায়ে। টিপটিপ আলো জ্বলে উঠছে, এপারে, ওপারেও। নদীর পাড়ে সার সার গাছেরা অদ্ভুত শব্দময়, পাখিরা কুলায় ফিরছে। জোড়ায় জোড়ায় মানুষ-মানুষী নদী দেখছে, নিবিষ্ট মনে বলছে নিজেদের কথা। গরম কলসি কাঁধে ঘুরছে চাঅলা, ফুচকাঅলা ভেলপুরিঅলাদের সামনে থোকা থোকা ভিড়। মোটা গোঁফ হাতেলাঠি কনস্টেবল সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে এদিক ওদিক। জলরেণু মাখা বাতাস উঠছে নদী থেকে, তার সোঁদা আঁশটে গন্ধও এখন ভারি মনোরম। জল কেটে অবিরাম ভেসে যায় তরণী, পাড়ে তার ঢেউ বাজে ছলাৎ-ছল।

গাড়ি রেখে হাঁটছে দুজনে। কথা না বলে। ধীর পায়ে।

একটা পরিত্যক্ত গম্বুজের সামনে এসে দাঁড়াল সুকান্ত,— চুপচাপ কেন ? ভাল লাগছে না ?

—হুঁ। তিতির আবিষ্ট চোখে তাকাচ্ছে চতুর্দিকে। বলল,— কতকাল পর সন্ধেবেলা গঙ্গার ধারে এলাম। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে প্রায়ই...ওই মোটা মোটা থামঅলা ঘাটটায় বসে থাকতাম দুজনে...কী ভাল যে লাগত !

—যাবে ওখানটায় ? বসবে ?

—নাহ্। তিতির ছোট্ট শ্বাস ফেলল,— চলো হাঁটি।

কয়েক পা হাঁটতেই সামনে ঝকঝকে স্ন্যাক বার, নদীতীরের নাগরিক বিলাসঘর। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের জটলা, ভেতরে অজস্র রঙের সমারোহ।

আঙুলে গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে সুকান্ত বলল,— আইসক্রিম খাবে ?

—উঁহু।

—খাও না। তোমার তো একটা খাওয়া পাওনা আছে।

—কিসের খাওয়া ?

—বাহ্, বি কম পাশ করলাম না ! তুমি না গুঁতো দিলে আমার পরীক্ষায় বসা হত।

—পাশ করলে কোথায় ! তুমি তো ব্যাক পেয়েছ।

—এক সাবজেক্টে ব্যাককে পাশই বলে।

তিতির হেসে ফেলল,— তোমার মতো শেমলেস ছেলে আমি লাইফে দেখিনি।

—এত লড়লাম তাও কথা শোনাচ্ছ ? অন্য পেপারগুলো যে টপকে গেলাম, তার বুঝি ক্রেডিট নেই ?

কথা বলতে বলতে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছে সুকান্ত। অগত্যা তিতিরও। ভিড় ঠেলে কাউন্টার থেকে দু হাতে দুখানা দামি আইসক্রিম নিল সুকান্ত, ডাকল তিতিরকে,— ওপরে যাই চলো।

দোতলার টেবিলে দুজনে বসেছে পাশাপাশি। জিভে তালুতে বিদঘুটে শব্দ করে আইসক্রিম খাচ্ছে সুকান্ত। তিতিরের চোখ কাচে, অন্ধকারে, নদীতে। পাড়ে বাঁধা নৌকোর ছই-এ টিমটিম আলো, অস্পষ্ট নড়াচড়া করে মানুষ। কোজাগরী চাঁদ এইমাত্র ফুটেছে আকাশে, তার বিভায় নদী এখন রুপোর স্রোত। রুপো মাখা জলের মাথায় আছে সদ্য সমাপ্ত সেতু, দু পাড়ে প্রলম্বিত শরীর আলোআঁধারে ধনুকের মতো লাগে। অতিকায়। আদিম। অপ্রাকৃত।

সহসা মুগ্ধতা ভেঙে খানখান। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে পরিচিত স্বর। টোটো আর হিয়া !

তিতিরের সমস্ত স্নায়ু অসাড় হয়ে গেল। আজই টোটো হিয়াকে এখানে আসতে হল। এ কি কাকতালীয় ! নাকি দৈবনির্দিষ্ট ! নাকি নিয়তির খেলা !

ওপরের এই জায়গাটা বড় স্বল্পপরিসর, কোথায় এখন লুকোয় তিতির। হিয়া কি এসে ন্যাকা ন্যাকা করে কথা বলবে তিতিরের সঙ্গে ! টোটো মুখ বেঁকাবে !

হিয়া টোটো এদিকেই তাকাচ্ছে। তিতির ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সজোরে আঁকড়ে ধরেছে সুকান্তর হাত। সুতীক্ষ্ণ চাপা স্বরে বলল,— শিগগিরই আমার কাঁধে হাত রাখো, শিগগিরই।

সুকান্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, দেখছে এদিক ওদিক। বুঝি বা হিয়া টোটোকেও দেখল, চিনতে পারল না।

তিতির কড়া গলায় বলল,— আহ্, বলছি কোনও দিকে তাকাবে না। আমার চোখে চোখ রাখো। একদম সরাবে না বলে দিলাম। একদম না।

বিহ্বল সুকান্তর হাত তিতিরের কাঁধ ছুঁয়ে আছে। দুই পিপাসিত চোখ তিতিরের চোখের মণিতে স্থির, অথবা আরও গহীনে। অস্ফুটে কি যেন বলছে বাচাল সুকান্ত। কী বলে ! ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি !

কাকে বলে !

তিতির এখন নিশ্চেতন। অন্ধ। বধির।

৭৭

দেখতে দেখতে টেনশায় দশ দিন কেটে গেল, শুভাশিসের কাছে এখনও পুরনো হল না জায়গাটা। শালিনী যেমনটি বলেছিল টেনশা তার থেকে ঢের বেশি সুন্দর। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা অধিত্যকা শহর। যেদিকে চোখ যায় ছোট বড় অগুন্তি টিলা, আঁকাবাঁকা পথে রহস্যময় চড়াই উতরাই, এদিক সেদিকে জংলা ঝোপ, ছড়ানো ছেটানো শাল, সেগুন, আমলকী ইউক্যালিপটাস, প্রায় সব কোয়ার্টারের সামনে অপরূপ গোলাপ বাগান, সব ছাপিয়ে এক দুষ্প্রাপ্য নির্জনতা—এমন জায়গায় বড় একটা আসা হয় না শুভাশিসের। তারা ছোটে নামী জায়গায়, উটি সিমলা মানালি মুসৌরি কোডাইকানাল গোয়া, দেখে বেড়ায় নানান দর্শনীয় স্থান, তবু যেন ঠিক তৃপ্তি হয় না। প্রতিবার ফিরে কারুর না কারুর কাছে শুনতে হয় দেখার তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে একটা জলপ্রপাত কিংবা কোনও গুম্ফা, অথবা আপেল বাগান। আর অমনি ছন্দার ভুরু কঠিন, টোটো বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাতে পারে না, শুভাশিসকেও ছোটখাট মন্তব্য হজম করতে হয়। টেনশায় এ সমস্যা নেই, কারণ এখানে তেমন কোনও দর্শনীয় জায়গাই নেই। যেখানে খুশি যাও, যেদিকে ইচ্ছে হাঁটো, যেভাবে প্রাণ চায় তাকাও, চারদিকে শুধু নয়নাভিরাম নিসর্গ।

চারপাশের পাহাড়গুলো অবশ্য নিছকই নিসর্গচিত্র নয়, তারাই এই ছোট্ট জনপদটার প্রাণভোমরা। প্রায় প্রতিটি পাহাড়ই এক একটি লোহার আকর। প্রতিদিন ওই পাহাড় কেটে চাঁই চাঁই হিমাটাইট এসে পৌঁছচ্ছে বারশুয়ার কারখানায়, টেনশা থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে। সেখান থেকে আকরিক লোহা চলে যায় দূর-দূরান্তের ইস্পাত কারখানায়। বোকারো, রাউরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুরে। ওই খনির সুবাদেই, খনিকে কেন্দ্র করে, গড়ে উঠেছে এই টেনশা শহর।

এখানে বাড়িঘর বলতে অফিসবাবুদের কোয়ার্টার, মজুরদের ব্যারাক, অফিসারদের বাংলো। কারখানার ভোঁ এই জনপদের বায়োক্লক, কারখানার চিমনি এই শহরের ফুসফুস।

এত কিছু থাকা সত্ত্বেও অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য বিরাজ করে টেনশায়। দিনভর।

এখানকার সবচেয়ে মনোরম স্থানটিতে উঠেছে শুভাশিস, কোম্পানির গেস্ট হাউসে। সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, খোলামেলা ঘরদোর আর অফুরান আলো বাতাস। পুবের জানলা দিয়ে ভোরের সূর্য ডেকে তোলে শুভাশিসকে, বাংলোর হাতায় নাচে অজস্র বাহারি ফুল, দূরে নীচের উন্মুক্ত সমভূমির ঘন সবুজ বনানী শান্তির প্রলেপ মাখায় চোখে, আঁধার নামার আগে উল্টো দিকের পাহাড় পড়ন্ত সূর্যের গাঢ় লাল রঙ ছড়িয়ে বুকে আলোড়ন তোলে। আদর যত্নেও কোনও ত্রুটি নেই শুভাশিসের, আরদালি কুক মালি সর্বসময়ে সেবার জন্য হাজির। সকাল বিকেল খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে শালিনীর দাদা মোহন রানাডে, বোনের বন্ধুদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সুখসুবিধের দিকে তারও খর নজর। ইট কাঠ ছুরি কাঁচির জগৎ ভুলে বেশ আছে শুভাশিস।

ছন্দার শরীর মনও অনেক তাজা এখন। বয়স যেন অনেক কমে গেছে তার, মন থেকে সব

মালিন্য উধাও । ঘুরছে, ছুটছে, চঞ্চলা কিশোরীর মতো লাফালাফি করছে । প্রায়ই ভোরে লম্বা পিচ রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে চলে যায় বহু দূর, এক আশ্চর্য ঝরনার পাশে গিয়ে থামে, স্বচ্ছ জলে পা ভিজিয়ে খুশিতে চনমন করে ওঠে । শুঁড়িপথ বেয়ে নেমে যায় একা একা, ছিঁড়ে আনে বুনো ফুল, খোঁপায় গুজে গেস্ট হাউসের আয়নায় নিজেকে দেখে বারবার ।

শুভাশিসকে ডেকে ডেকে বলে, —অ্যাই, এই ফুলটার নাম কী গো ?

ভুরুতে ছদ্ম ভাঁজ ফেলে শুভাশিস গভীর মনোযোগে দেখে ফুলটাকে । তারপর অলস মেজাজে হাই তুলে বলে,— এটা হল গিয়ে কুর্চি ফুল ।

—ধ্যাৎ, মোটেই এটা কুর্চি নয় । আমি কুর্চি ফুল চিনি ।

—তবে ওটা বনজুঁই ।

—কচু । জুঁই ফুলের এমন চেহারা হয় নাকি ?

—তাহলে বোধহয় বুনো তেউড়ি । কিংবা দুধিয়া ।

শৈশবে বিভূতিভূষণের আরণ্যকে পড়া নামগুলো আন্দাজে আন্দাজে আউড়ে যেতে থাকে শুভাশিস । হেসে কুটিপাটি হয় ছন্দা । হঠাৎ হঠাৎ প্রবল ভালবাসায় মথিত হয়, নির্লজ্জর মতো শুভাশিসকে ডাকে বিছানায় । শুভাশিসের ইচ্ছে-অনিচ্ছের পরোয়া করে না, রমণে রমণে ক্লান্ত করে দেয় শুভাশিসকে । ছন্দার এখন চব্বিশ ঘণ্টাই মধুযামিনী ।

টেনশায় এসে শুভাশিসের প্রথম যে অনুভূতিটা হয়েছিল তা হল অপরিসীম শ্রান্তি । গত কয়েকটা বছর শ্রম উদ্বেগ আর অশান্তি তার শরীরকে যেন নিংড়ে নিয়েছে । কাজ ছাড়া সে আর কিছুই করেনি কবছর । বেড়ানোও ছিল তার এক ধরনের কাজ, বউ ছেলেকে তাদের পাওনা সঙ্গ দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের বঞ্চিত না ভাবে । কিন্তু প্রকৃত বিশ্রাম তার কখনও হয়নি । এখানে এসে প্রথম দু-তিন দিন সে খুব ঘুমোল, সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘুম, দুপুরে লাঞ্চের পর দিবানিদ্রা, রাতেও কোনওক্রমে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়া । ক'দিনেই শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে গেল । মন চিন্তাশূন্য, হৃদয় উদ্বেগহীন, মেজাজ ফুরফুরে, এ এক তুরীয় দশা ।

তবে চিন্তা ছাড়া শুভাশিস ক'দিনই বা থাকতে পারে ! একটু একটু করে ভাবনারা ফিরতে শুরু করল । ছন্দাই ফেরাল । কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধেয় বাংলোর বারান্দায় বসে স্কচ খাচ্ছিল শুভাশিস । মোহন সেদিন আসেনি, কি এক জরুরি কাজে রাউরকেল্লা গেছে ।

ছন্দাও পাশে গ্লাস নিয়ে বসেছে । বহুদিন পর । হঠাৎ বলে উঠল, —অ্যাই, আমরা একটা কাজ করতে পারি না ? যদি এরকম একটা পাহাড়ি জায়গায় বাড়ি বানাই কেমন হয় ?

—বানিয়ে ?

—মাঝে মাঝে গিয়ে থাকব । ...ধরো, তুমি আমি তো একসময়ে বুড়ো হব, তখন আমরা সেখানে গিয়ে পাকাপাকি...

—তোমার ছেলে এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এসে থাকবে ?

—থাকলে থাকবে, না থাকলে থাকবে না । এমনিই বা সে আর ক'দিন আমাদের কাছে আছে !

শুভাশিস কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পারল না ।

ছন্দা মুচকি হাসল, —বাহ্, ছেলে জয়েন্ট দিচ্ছে না ! ও তো এবার হস্টেলেই চলে যাবে ।

—জয়েন্ট দিচ্ছে ! আমাকে যে বলল...

—সে তো মেডিকেল পড়বে না বলেছে । ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় । তারপর জি আর ই দিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার প্ল্যান । আর একবার বিদেশে গেলে তোমার ছেলে আর ফিরবে বলে মনে হয় না ।

শুনেই কেমন যেন অভিমান হল শুভাশিসের । ছন্দা ছেলের সম্পর্কে এত উদাসীন আজকাল, তবু তার কাছে ছেলের মনের গোপন কথাটি অজানা নেই । শুধু শুভাশিসই পড়ে আছে অন্ধকারে । ছেলে ফিরবে না... দূরে চলে যাবে... কেন ? শুভাশিস তার বাবাকে ছেড়ে পৃথক জীবন গড়ে

তুলেছে, তাই বোধহয় আজ আর এই নিয়ে প্রশ্ন করার তার অধিকার নেই। সুদূর হিউস্টন সিয়াটল কি আরিজোনায় নিজস্ব দ্বীপ গড়ে বাস করবে রাজর্ষি সেনগুপ্ত, তার বংশধর হয়তো থাকবে প্যারিস কি ইস্তাম্বুলে, এই বোধহয় পরিবারের নিয়তি এখন। পরিবারের, না পরিবার প্রথার ? নাকি পরিবার প্রথার জীর্ণ দশার ?

শীতল চাঁদের আলো ঢুকে পড়ছিল শুভাশিসের বুকের ভেতর। তবে কার জন্য শুভাশিসের এত পরিশ্রম ? এত রোজগার করার বাসনা ? কার জন্য সঞ্চয় ? কে ভোগ করবে সম্পদ ?

এই সময়েই শুভাশিসের মস্তিষ্কের কোষে ঢুকে পড়ে তিতির। মেয়ে তো তাকে বাবা বলে জানলই না। ওই মেয়ের জন্য শুভাশিস যদি কখনও কিছু রেখে যেতে চায়, সে কি নেবে ? কেন নেবে ? ইন্দ্রাণী তাকে নিতেই দেবে না। নিজের দম্ভে ইন্দ্রাণী নিজেকে মহীয়সী করে রাখবে চিরকাল।

ছন্দাও কি যেন ভাবছিল চুপচাপ। একটু চাপা গলায় বলল, —চিন্তা করছ কী ?

—কিছু না।

—কিছু তো একটা ভাবছই। ...কলকাতা ছেড়ে নড়তে পারবে না, তাই তো ? ছন্দার ঠোঁটের কোণে সুরার ঝিলিক।

—আহ্ ছন্দা, আমরা বেড়াতে এসেছি।

—চটো কেন ? আমি তো ঠাট্টা করছি গো। ছন্দা খিলখিল হেসে উঠল।

সন্ধের পরে টেনশায় বিদ্যুতের ভোল্টেজ অনেক কমে যায়। ক্ষীণ আলো আরও ক্ষীণ লাগছিল শুভাশিসের। জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল,— আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কি শুনি ?

—যদি উত্তর দিতে আপত্তি থাকে তো দিয়ো না।

—বলোই না।

—তুমি কেন ছেলের সম্পর্কে এত নিস্পৃহ হয়ে গেলে ছন্দা ? টোটো আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে, এ কথা বলতে তোমার ঠোঁট কাঁপল না ?

—না, কাঁপল না।

—কিন্তু কেন ? হোয়াই ?

—কারণ আমি জীবনের সার বুঝে গেছি। ছেলে বড় হয়ে গেলে সে আমারও না, তোমারও না, সে তার নিজের। ছন্দা গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিল,— আর একটা কথাও বুঝে গেছি। প্রতিটি মানুষই নিজের জন্য বাঁচে। তুমিও। আমিও। টোটোও। যদি রাগ না-করো তো বলি, তোমার ইন্দ্রাণীও। কেউ অন্যের জন্য বেঁচে আছে, এ ভাবা ভীষণ মূর্খামি।

শুভাশিস থম হয়ে গিয়েছিল। তবে এই যে এখানে এসে ছন্দার এত উদ্দাম হয়ে ওঠা, তা কি শুধু নিজেরই বাঁচার রসদ খোঁজা ? শুভাশিস অনুষঙ্গ মাত্র ? প্রায় রাতেই যে এখান থেকে টেলিফোনে টোটোর খবর নেয় শুভাশিস আর ছন্দা, সেও কি নিজেদের তৃপ্তির জন্য ? অবসাদ কাটিয়ে ওঠার পর এত নির্লিপ্তি এল ছন্দার মধ্যে ? নাকি এই নির্লিপ্তিই অবসাদের প্রতিষেধক ?

সে রাতে শুভাশিসের ঘুম এল না। একটার পর একটা চিন্তা আসে মাথায়, অথচ কোনওটাই স্থায়ী হয় না। যদি বা একটু তন্দ্রা নামে, কুৎসিত স্বপ্নে ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় ঘোর। এক পাল শকুন ঠুকরোচ্ছে মরা গরুর কঙ্কাল। কাঠের সাঁকো পার হচ্ছে শুভাশিস, ভেঙে পড়ছে সাঁকো। রাশি রাশি চোখ খুবলোনো মাছেরা তাকিয়ে আছে শুভাশিসের দিকে। একসময়ে অতিষ্ঠ হয়ে বারান্দায় উঠে এল শুভাশিস। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে এখানে, কম্বল মুড়ি দিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে ঢুলতে থাকল। তখনই মনে পড়ে গেল মেডিকেল হোস্টেলের এক বন্ধুর কথা। অনুতোষ। নকশাল করত অনুতোষ, গোপীবল্লভপুরে পুলিশের গুলিতে মরেছিল। দিব্যকান্তি ছেলে, মুখে সব সময়ে একটা প্রশান্ত ভাব লেগে থাকত অনুতোষের। চরম উদ্বেগের মুহূর্তেও মন সংযত রাখার উপায় কি,

একদিন অনুতোষ বলেছিল শুভাশিসকে। যে কোনও বিষয়ের একটা বিশেষ বিন্দুতে সংহত করো মন। এমনভাবে করো যাতে বিশ্বসংসার সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। শুধু ওই বিন্দুটাই প্রদীপশিখার মতো জ্বলতে থাকবে মনে। অথবা মনকে সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দাও, একদম ফাঁকা, ধু ধু ফাঁকা। দুটো পদ্ধতিই রাতভর পালা করে চেষ্টা করল শুভাশিস। কোনও জটিল অস্ত্রোপচারে কেন্দ্রীভূত করতে চাইল মন, পারল না। আর মন তো শূন্য হয়ই না, এত পলি পড়ে আছে মনে!

তবু খেলাটা ভাল লেগে গেল। রোজই চেষ্টাটা চালায়। কখনও বাহারি ফুলের দিকে তাকিয়ে, কখনও সবুজ অরণ্যকে দেখে। কিংবা চোখ বুজে, অন্ধকারে। আকাশকে সামনে রেখে।

টেনশায় এও এক ভাল লাগা শুভাশিসের।

আজও শুভাশিস খেলছিল খেলাটা। শেষ বিকেলে। বাংলোর লনে গার্ডেন চেয়ার পেতে বসে। একা একা। কারিয়া মুণ্ডা নামের মালিটা অত্যাশ্চর্য গোলাপ ফুটিয়েছে বাগানে, তারই একটাকে লক্ষ্যবস্তু করে। টেনিস বল সাইজের রক্তগোলাপ, তার পাপড়িতে জড়ো হচ্ছিল স্নায়ু।

মোহন রানাডের জিপ ঢুকছে বাংলোয়, শুভাশিসের মনসংযোগের চেষ্টা ছিঁড়ে গেল। লাফিয়ে জিপ থেকে নামল মোহন। শুভাশিসেরই সমবয়সী প্রায়, খুব জোর এক আধ বছরের বড় হবে। মাজা রঙ, তীক্ষ্ণ নাক, লম্বা দোহারা চেহারা। মাথায় টুপি, পরনে হাফ সোয়েটার, হাফশার্ট, জিনসের ট্রাউজার। মুখে চোস্ত ইংরিজি বুলি, একসময়ে খড়্গপুর আই আই টির ছাত্র ছিল।

—গুড ইভনিং ডক্টর। একা বসে কেন? ম্যাডাম কোথায়?

শুভাশিস উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাল। একটু আগেও তো ছন্দা বাগানে ঘুরছিল, গেল কোথায়!

হাত নেড়ে কারিয়াকে ডাকল শুভাশিস, —কাঁহা হ্যায় মেমসাব?

কারিয়া হিন্দি বাংলা সবই বোঝে, তবু শুভাশিস তার সঙ্গে হিন্দিতেই কথা বলে। তার ধারণা যে কোনও গরিব অবাঙালির সঙ্গে হিন্দিতেই কথা বলা যায়, হোক না সে ওড়িশার আদিবাসী।

মোহন স্থানীয় ভাষায় কারিয়াকে কী যেন প্রশ্ন করল, দূরে আঙুল দেখাল কারিয়া। মোহন এগিয়ে গেল সামনে, নীচের দিকে দেখছে। হাত নাড়ল। খানিকটা বিস্মিত মুখে এসে বসল চেয়ারে,— টিনুর সঙ্গে ম্যাডামের আলাপ হল কী করে?

—কে টিনু?

—ওই যে ম্যাডাম যার সঙ্গে নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

শুভাশিস পায়ে পায়ে লনের একদম প্রান্তে এসে দাঁড়াল। অনেকটা নীচে দেখা যাচ্ছে ছন্দাকে। কোমরে আঁচল জড়িয়ে খাকি প্যান্ট শার্ট পরা দাড়িঅলা লোকটার সঙ্গে কথা বলছে ছন্দা। মাঝে মাঝেই লোকটা বাংলোর দিকে আসে, পাশ দিয়ে একটা বুনো পথ নেমে গেছে, ওই পথ দিয়েই লোকটার আনাগোনা। টিলার গায়ে ছোট একটা গ্রাম আছে আদিবাসীদের, বোধহয় সেখানেই থাকে।

শুভাশিস চেয়ারে এসে বসল,— লোকটা হার্মফুল নয় তো? ছন্দার আবার গায়ে গয়নাগাটি আছে!

—আরে না না, টিনু একজন সেন্টলি ম্যান। মহুয়া পর্যন্ত খায় না, ভাবতে পারেন?

—ট্রাইবাল? গায়ের রঙ দেখে তো মনে হয় না!

—ট্রাইবাল নয়, তবে ট্রাইবালই হয়ে গেছে। বহুদিন আছে এখানে। বলে আগে নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে থাকত।

বিজয় বেহেরা বাংলোর কুক। চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দেখেই তার টি-পট রেডি। সঙ্গে মুচমুচে পকোড়া।

কাপে কাপে চা ঢেলে দিল বিজয়।

মোহন চুমুক দিল,— তাহলে ডক্টর চলুন, কাল আমাদের বারশুয়ার ফ্যাক্টরিটা আপনাদের দেখিয়ে

আনি।

—আমি কী বুঝি ফ্যাক্টরির ! শুভাশিস আলগা আড়মোড়া ভাঙল।

—আপনি আগে কখনও মাইন দেখেছেন ?

—না। মাইন—ফাইনে আমার খুব ইন্টারেস্ট নেই। খনি গর্ত...

—ডেথ ফিয়ার ? আরে, এটা ওপেনকাস্ট মাইন।

—হোক গে। কারখানায় ঢুকলে আমার মিসেসের চাকা চাকা র‍্যাশ বেরিয়ে যাবে।

হা হা হেসে উঠল মোহন। গমগমে স্বর। হাসির ছন্দে কোথায় যেন শালিনীর সঙ্গে মিল আছে। হাসতে হাসতেই বলল,— আমার বোন জানিয়েছিল আপনি নাকি খুব স্ট্রং, টারবুলেন্ট। ম্যান অব অ্যাক্টিভ হ্যাবিটস। আমি কিন্তু স্কচ পান করা ছাড়া আপনার কোনও হ্যাবিট দেখলাম না। এত সুন্দর জায়গা, আপনি বাংলো থেকে পর্যন্ত বেরোন না ! নাহ্, বোনটা আমায় মিসগাইড করেছে।

—আপনার বোনের কাজই মিসগাইড করা। দিব্যি বলে দিল টেনশা নাকি রাউরকেল্লা থেকে বিশ মাইল দূর, জিপ ভাড়া করতে গিয়ে শুনি প্রায় শ' কিলোমিটারের ধাক্কা। ওফ, আসার সময়ে কোমর ব্যথা হয়ে গিয়েছিল।

—স্বর্গে পৌঁছতে গেলে একটু তো কষ্ট করতেই হয় ডক্টর।

ছন্দা ফিরে এসেছে। অনেকটা চড়াই উঠে হাঁপাচ্ছে, লাল হয়ে গেছে মুখ। কোঁচড় ভর্তি এক রাশ তেজপাতা।

মোহন সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করল,— ম্যাডাম কি এগুলো ক্যালকাটায় নিয়ে যাবেন ?

—নিশ্চয়ই। এত কষ্ট করে কুড়োলাম।

বারান্দায় পাতাগুলো উপুড় করে দিয়ে এল ছন্দা, বসল চেয়ার টেনে। বিজয়ের কাছে চা চাইল।

শুভাশিস জিজ্ঞাসা করল,— কি কথা বলছিলে লোকটার সঙ্গে ?

—ওমা, আমি আবার কী বলব ! ওই তো আমাকে ডেকে ডেকে কথা বলে।

—তাই ! কী বলে ?

—এই আমরা কোত্থেকে এসেছি, তোমার নাম কি, আমরা থাকি কোথায়.... বেশ ভাল বাংলা বলে লোকটা।

—স্ট্রেঞ্জ ! রোজ এক প্রশ্ন করে ?

—তা কেন। কলকাতার কথা জানতে চায়। ওদিকে বোধহয় গেছিল কোনও সময়ে, অনেক জায়গার নামও জানে।

মোহন বলে উঠল,— টিনু ওরকমই। খ্যাপাটে ধরনের। ওর কথার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। তবে কাজ করে খুব মন দিয়ে। মেশিনপত্র সম্পর্কেও টিনুর নলেজ আছে, ছোটখাট রিপেয়ারিং-এর কাজও করে দিতে পারে।

—কি পোস্টে চাকরি করে ? টেকনিকাল ?

—আরে না না, স্রেফ লেবার। ওটাও ওর খ্যাপামি। কতবার ওকে ওভারশিয়ার করে দিতে চেয়েছি, ব্যাটা মজুরদের সর্দার পর্যন্ত হতে চায় না। অথচ নয় নয় করেও তেরো চোদ্দ বছর এখানে চাকরি হয়ে গেল। সংসার টংসার নেই তো...। তবে এখানকার লেবারদের কাছে ও কিন্তু খুব পপুলার, সব ইউনিয়ন ওকে সমঝে চলে।

কথায় কথায় সন্ধে নেমে গেছে। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে নীচের জঙ্গল। হিম পড়ছে।

ছন্দা ভেতর থেকে একটা শাল জড়িয়ে এল,— চলুন মিস্টার রানাডে, আর তো চার দিন আছি, ফেরার আগে একটা হোল ডে আউটিং করে আসি।

—চলুন না, আমি তো রোজ ডক্টর সাহেবকে বলছি। কোথায় যাবেন ? রাউরকেল্লার দিকে একটা চমৎকার পয়েন্ট আছে। শঙ্খ আর কোয়েল নদী মিশে যেখানে ব্রাহ্মণী স্টার্ট করছে... ভেরি

নাইস পিকনিক স্পট। কোয়েলে ডেঞ্জারাস চোরাবালি আছে, তাও দেখাব।

—ওরে বাবা, চোরাবালিতে আমি নেই। শুভাশিস ছদ্ম ত্রাসে হাত জোড় করল।

—তাহলে কেওনঝাড় ফরেস্ট চলুন। সামনের রাস্তাটা সোজা কেওনঝাড় হয়ে ময়ূরভঞ্জের দিকে চলে গেছে। জিপ নিয়ে যাব, সারাদিন হইহল্লা করব, অ্যান্ড বাই ইভনিং উই উইল বি হোম। আপনি আপনার স্কচ নিয়ে বসে যেতে পারবেন।

মোহন তার বোনের মতোই মদ্য পান থেকে শত হস্ত দূরে, মাঝেমাঝেই তাই শুভাশিসকে হালকা কটাক্ষ করতে ছাড়ে না। তবে তার বলার ভঙ্গি এত সরল যে আহত হওয়ার সুযোগ নেই।

শুভাশিস ঠোঁটে সিগারেট চাপল। মোহনের দিকে বাড়িয়ে দিল প্যাকেট। মোহন কালেভদ্রে খায়, নিল না।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল শুভাশিস, জঙ্গল তো অনেক দেখেছি। আবার ওসব হাঙ্গামা কেন ? এই তো বেশ আছি। খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি...

—অমন করো কেন গো ? চলো না। ছন্দা ঠোঁট ফোলাল।

—ও কে। চলো তবে। ...আপনার মিসেসকেও কিন্তু সঙ্গে নেবেন মিস্টার রানাডে। আর আপনার বাংলোতে সেদিন ডিনারে যে কাবাবটা খাইয়েছিলেন, ওটা অবশ্যই করে নিয়ে যেতে বলবেন। ...কবে যাবেন ? কাল ?

—সরি। কাল হবে না। কাল আমাদের পেমেন্ট ডে। পরশু ভোরে আমরা স্টার্ট করতে পারি। ...ছটার মধ্যে জিপ চলে আসবে, আপনি কিন্তু তখনও ঘুমোবেন না ডক্টর, প্লিজ। যাওয়ার পথে আমাদের হসপিটালটাও আপনাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।

—এখানেও হসপিটাল ! আমি মরে যাব মিস্টার রানাডে।

—আরে না, ভেতরে ঢুকতে হবে না। সামনের মাঠটা দেখবেন। মাঠটায় আগে টিন টিন গ্রিজ রাখা থাকত।

—পেশেন্টদের জন্য গ্রিজ !

—হা হা, ওটাই তো ক্যাচ। মোহন গোপন তথ্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে গলা নামাল,—পেশেন্টদের জন্য নয় ডক্টর, গ্রিজ লাগত লোকাল জঙ্গলের হাতিদের সামলাতে। আগে আগে দল বেঁধে সব হামলা করতে আসত, বাড়িঘর তছনছ করে দিত। ওই গ্রিজ খেতে পেলেই একদম সুবোধ বালক। ঠিক যেন আমার ছেলে আকাশ কাপ থেকে আইসক্রিম খাচ্ছে। এখন অবশ্য লোকজন বাড়াতে ওদের উপদ্রব অনেক কমে গেছে। ওই টিনুর সঙ্গে কথা বলে দেখবেন, ওই লোকটা হাতির অনেক মজার মজার গল্প বলবে।

—দারুণ ইন্টারেস্টিং তো ! সত্যিই, কত জন্তুর যে কত বিচিত্র টেস্ট !

—মানুষেরই বা কম কি। মোহন হাসতে হাসতে উঠে পড়ল, —আমরা কি না খাই ? ঘাস পাতা পোকামাকড় থেকে তিমি মাছ, সব। ওই যে আপনি তরলটা খান, ওটাই কি খুব সুস্বাদু ? হোস্টেলে একবার জিভ ঠেকিয়ে দু রাত্তির আমার ঘুম হয়নি।

মোহন চলে গেল। ধোঁয়া ছেড়ে। শব্দ তুলে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে লনে পায়চারি করছিল শুভাশিস। কারিয়া কোত্থেকে কটা পাতা তুলে এনে দেখাচ্ছে। পাতাগুলো ভারী অদ্ভুত, চিপলেই রক্তের মতো লাল রঙ বেরোয়।

খিলখিল হেসে দু হাতে লাল রঙ মাখছে ছন্দা। দেখতে ভাল লাগছিল না শুভাশিসের। পায়ে পায়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে বুনো পথ ধরে নামছে। ফার্লংটাক গিয়ে এক ঝাঁকড়া গাছের নীচে দাঁড়াল। এটা নাকি মহুয়া গাছ, বিজয় বলছিল। একটা পাতা ছিঁড়ে শুঁকল শুভাশিস, তেমন কোনও মাদক গন্ধ পেল না। আলগোছে দাঁতে কাটল, কেমন যেন কষ কষ। এই পাতা সেদ্ধ করে কি মহুয়া তৈরি হয় ? নাকি এর ফল থেকে ? নাকি ফুল ?

মাথা তুলে গাছটাকে দেখছিল শুভাশিস। হঠাৎ আঁকাবাঁকা পথে চোখ পড়ে গেল। সেই টিনু

লোকটা আসছে। খাঁকি প্যান্টের ওপর খাকি শার্ট আলগাভাবে ফেলা, গলায় রঙিন মাফলার। লোকটার পায়ে কি কোনও ডিফেক্ট আছে! কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

হঠাৎ শুভাশিসের গা সিরসির করে উঠল। তার দিকেই দৃষ্টি রেখে এগিয়ে আসছে লোকটা। মন্থর পায়ে। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে যে টুকুনি মুখ দেখা যায়, তা যেন কেমন চেনা চেনা! ওই চোখ আগে কোথাও দেখেছে শুভাশিস! কোথায়?

লোকটা শুভাশিসকে পার হয়ে গেল, তাকাচ্ছে না ফিরে। শুভাশিসের কি যেন মনে হল। অনুচ্চ স্বরে ডাকল,— শোনো।

ঘুরল লোকটা। দাঁড়িয়ে আছে।

শুভাশিস আবার বলল,— হ্যাঁ তোমাকেই বলছি। শোনো এদিকে।

আবার শুভাশিসের চোখে চোখ রেখে ফিরছে লোকটা। মন্থর পায়ে। সামনে একটা পাথরের টুকরো, আচমকা হোঁচট খেল জোর। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠেছে, আহ্।

উল্কা বেগে শব্দটা আঘাত করল শুভাশিসের মস্তিষ্কে। পলকে আঠেরো বছর আগের একটা মুখ মনে পড়ে গেছে।

শুভাশিস আঙুল তুলল,— তুমি তনুময় না!

৭৮

লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। একদম স্থির। তনুময়ের প্রায় বিস্মৃত মুখখানা আর একটু যেন স্পষ্ট মনে পড়ল শুভাশিসের। সে মুখে ঘন কালো দাড়ি ছিল, এ লোকটার শ্মশ্রু-গুম্ফে বাদামি আভাস, একটা দুটো রুপোলি রেখাও যেন দেখা যায়। শরীর তনুময়ের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত, পেটানো। মুখে তনুময়সদৃশ কমনীয়তার লেশমাত্র নেই। গায়ের রঙ তামাটে, তনুময় যেন অনেক বেশি ফর্সা ছিল। আহত তনুময়ের চোখ ঘোলাটে থাকত সব সময়ে, সামনের লোকটার চোখের মণি অসম্ভব উজ্জ্বল। এত উজ্জ্বল যে বেশিক্ষণ চোখে চোখ রাখতে অস্বস্তি হয়।

শুভাশিস সামান্য ইতস্তত করে বলল,— তুমি ইন্দ্রাণীর ভাই না?

—আমি টিনু। বারশুয়া কারখানার শ্রমিক। ঠোঁট চেপে বলল লোকটা।

আর কোনও সংশয় নেই। এ তনুময়। তনুময়ই। কথা বলার ওই ঠোঁট-টেপা ভঙ্গি অতি পরিচিত এক মুখ মনে পড়িয়ে দেয়। নাম চেহারা পরিবেশ সবই আমূল বদলে ফেলতে পারে মানুষ, কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভঙ্গি তবু রয়েই যায়।

নরম গলায় শুভাশিস বলল,— আমাকে চিনতে পারছ না তনুময়? আমি শুভাশিস সেনগুপ্ত। ডাক্তার। সেই যে তোমার কাঁধে আর থাইতে তিনটে গুলি লেগেছিল... আমি তোমার অপারেশান করলাম...বাড়িতে...তুমি আমার বাড়িতে ছিলে...

—আমি তনুময় নই। আমি টিনু। ভারী স্বর ঈষৎ কর্কশ।

শুভাশিস দু' পা এগোল,— ডাক্তারের চোখ ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয় তনুময়। তুমি ধরা পড়ে গেছ।...তোমার পায়ের চোট কি এখনও পুরো সারেনি?

—আমি পুরনো কথা ভুলে গেছি ডাক্তারবাবু।

তনুময়ের বাংলায় বেশ ওড়িয়া টান এসে গেছে। রুক্ষ পোড়খাওয়া মুখে একটু যেন হাসি ফুটল, তির্যক। ঘুরে নিজের পথে এগোতে শুরু করেছে।

শুভাশিস পিছন থেকে বলে উঠল,— ভুলে গেছি বললে তো চলবে না তনুময়। তুমি জানো, তোমার বাবা মা দিদির আজ কী অবস্থা! শুধু তোমার জন্য। শুধু তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে...ইওর ফাদার ইজ অলমোস্ট আ লুনাটিক ম্যান নাউ।

চলন্ত তনুময়ের গতি মুহূর্তের জন্য মন্থর যেন। আবার হাঁটতে শুরু করেছে। জোরে জোরে।

বাঁ পা বেশ টেনে টেনে।

—তনুময়, যেয়ো না। শোনো।

—সময় নেই ডাক্তারবাবু। এক্ষুনি কারখানার ভোঁ বাজবে।

পায়ে চলা পথ ধরে ওপরে উঠে গেল তনুময়। গেস্টহাউস পেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত এক ছটফটানি নিয়ে ফিরল শুভাশিস। বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা আছে, বসল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরাল। তনুময়কে কি তার জোর করে আটকানো উচিত ছিল ? কেন পারল না ? ইন্দ্রাণীর মধ্যে যে চোরা অপরাধবোধ রয়েছে, সেই মনস্তাপই কি শুভাশিসকে স্থাণু করে দিল ? মনে মনে যতই ইন্দ্রাণীকে উপহাস করুক, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে শুভাশিসও কি একই অপরাধবোধের অংশীদার নয় ?

একটা ক্রোধও ক্ষীণ ভাবে গজরাচ্ছিল শুভাশিসের ভেতরে। এই ছেলেটার জন্যই তার জীবনের গতিপথ সোজা হতে গিয়েও বেঁকেচুরে গেছে। সে যে আজ এক আদ্যন্ত অসুখী মানুষ, তার পরোক্ষ কারণও কি ওই তনুময় নয় ? তনুময় আজ তার ওপর ফেটে পড়তে পারত, বোঝাপড়া চাইতে পারত, তা না করে শুধু উপেক্ষা দেখিয়ে চলে গেল কেন ?

কেনই বা তনুময়ের এই স্বেচ্ছানির্বাসন !

বাবা-মা'র কথাতেও তনুময়ের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হল না ! কেন ?

না, তনুময়কে ছেড়ে দিলে চলবে না। খোঁজ নিতেই হবে। কিন্তু কী ভাবে ? বারশুয়া কারখানায় চলে যাবে দুপুরে ? মোহনকে খবর দিলেই এক্ষুনি গাড়ি এসে যায়। তা হলে তো ছন্দাও নিশ্চয়ই সঙ্গে যাবে। সেখানে কি তনুময়কে ডেকে... ?

ছন্দা গভীর অভিনিবেশে কারিয়ার সঙ্গে লনে কথা বলছে। বাংলা হিন্দি ওড়িয়া মেশানো এক নিজস্ব মিশ্র ভাষায়। মাঝে মাঝে হাত পা নেড়েও ভাব বিনিময় চলছে। বোধহয় ফুলগাছ নিয়ে আলোচনা। কাল রাতে ছন্দা বলছিল এখান থেকে গোলাপের কলম নিয়ে যাবে।

কি ভেবে উঠে পড়ল শুভাশিস, গেস্ট হাউসের কিচেনে গেল। মশলা বাটছে বিজয়, রান্না চড়াবে। শুভাশিস কদাচ এদিকে আসে না, তাকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে বিজয়,— স্যার আপনি ! চা দিব ?

—না। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—বলুন স্যার।

—তুমি টিনু বলে লোকটাকে চেনো ?

—খুব চিনি স্যার। এখানে আসে তো মাঝে মাঝে। ডিউটি থেকে ফেরার পথে এসে গল্প করে, গান শোনায়। এই ক'দিনই যা...

—টিনু থাকে কোথায় ?

—কাছেই স্যার। এই তো নীচে। মজুরদের লাইনে।

মোহনের কথাটা মনে রেখেই শুভাশিস জিজ্ঞাসা করল,— টিনু লোক কেমন ?

—খুব ভাল স্যার। বলতে বলতে হঠাৎই যেন সন্ত্রস্ত হল বিজয়,— কেন স্যার, টিনুভাই কি কোনও অপরাধ করিল ?

—না না, এমনিই জানতে চাইছি। শুভাশিস আলগা হাসল,— লোকটা শুনছিলাম বাঙালি ?

—বঙালিই তো। তবে এখন স্যার বারশুয়ার লোকই হয়ে গেছে। টিনুভাইকে নিয়ে অনেক গল্প আছে স্যার।

—কীরকম ? শুভাশিস রান্নাঘরের দরজায় ভর দিয়ে দাঁড়াল।

—অনেক বছর আগে নাকি টিনুভাই ঝাড়সুগুদা স্টেশনে এসে মরে পড়ে ছিল। কেউ বলে টিনুভাই নাকি ট্রেনে যাচ্ছিল, পথে দস্যুরা তার টাকাপয়সা সব কেড়ে নিয়ে, মারধর করে স্টেশনে ফেলে দিয়েছিল। কেউ বলে টিনুভাই নাকি খুব ধনীঘরের ছেলে ছিল, সম্পত্তির লোভে আত্মীয়রা

তাকে খুন করে ট্রেনের কামরায় তুলে দেয় । কেউ বলে ট্রেনে নাকি ডাকাত উঠেছিল, পুলিশ ভুল করে টিনুভাইকেই গুলি করে । আমাদের কারখানার বংশী বাইগার দাদা ভীম আর তার মা তখন ঝাড়সুগুদায় থাকত । ওরা ছত্তিশগড়ের লোক, অনেক ঝাড়ফুঁক জানে, শিকড়বাকড় জানে, মরা মানুষকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারে । ভীমদাদার মা'ই লতাপাতার ওষুধ খাইয়ে টিনুভাইকে নবজীবন দিল ।

—এ যে একদম সিনেমার গপ্প হে ! শুভাশিসের একটু মজা লাগল,— মরা মানুষ বেঁচে উঠল ?

—মরা মানুষও তো বাঁচে স্যার । সাবিত্রী মরা সত্যবানের প্রাণ ফেরায়নি ?

সরল লোকটার চোখে অন্ধ বিশ্বাস, আর তর্ক বাড়াল না শুভাশিস । মনে মনে অবস্থাটা আন্দাজ করে নিল । অসুস্থ তনুময় ট্রেনে করে চলে যাচ্ছিল, পথে হাল খুব বেশি খারাপ হয়, যাত্রীরা আপদ ভেবে নামিয়ে দেয় কামরা থেকে । তারপর ওই জংলি লতাপাতার গুণেই... ।

শুভাশিস আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,— তা নয় ধরে নিলাম তোমাদের ভীম বাইগার মা মরা মানুষই বাঁচিয়েছিল । কিন্তু তোমরা কখনও টিনুভাইকে জিজ্ঞেস করোনি, সে কোত্থেকে এল, তার তিন কুলে কেউ আছে কিনা...

—কত করেছি । জবাব দেয় না, হাসে । বলে পুনর্জন্ম পেয়েছি, আগের জন্মের কথা মনে থাকবে কি করে ! তবে টিনুভায়ের হৃদয়টা বিশাল স্যার । সকলের জন্য খুব দরদ । ঘরে ঘরে গিয়ে সবার খোঁজ করে । আশপাশের গ্রামে খোঁজ নিন, শুনবেন বিপদে-আপদে টিনুভাই ঠিক তাদের পাশে আছে । কার অসুখ করল, কার ঘরের চালা ভাঙল, কোথায় ভায়ে ভায়ে মারামারি লাগল, কে কোথায় দরখাস্ত লিখবে, কাকে চিঠি লিখে দিতে হবে, সবার সব কাজে টিনুভাই হাজির । এখানকার কত জন যে টিনুভায়ের কাছে সাহায্য পায় স্যার । বুদ্ধি পায় । উপকার পায় ।

বাহ্ ! বিপ্লবী ট্রান্সফর্মড টু সমাজসেবী ! এ কি আত্মকণ্ডূয়ন, নাকি নিছকই পলায়নী মনোবৃত্তি ? মোহন যা বলছিল তাতে তো মনে হয় তনুময় ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন করে না, তবে কি শ্রেণীসংগ্রাম ছেড়ে এখন মহামানব বনার চেষ্টা করছে তনুময় ? তার জন্য মজুর সেজে টেনশায় পড়ে থাকা কেন, কলকাতাই তো এদের আদত ঠাঁই । প্রকৃতি পরিবেশ, নারী নিপীড়ন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অথবা অনাথ শিশু, কোনও একটা লাইন ধরে নিতে পারত, গড়ে তুলত একটা সংগঠন, ঝটপট ঠিকরে পড়ত নাম ।

নাকি ইন্দ্রাণীর অনুমানই সত্যি ? স্রেফ ঘৃণায় অভিমানে শহর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে তনুময় ?

বিজয় বিনীত ভাবে বলল,— টিনুভাইকে এখানে আসতে বলব স্যার ? কথা বলবেন ?

—থাক গে । যদি পথে দেখা হয় তো আমি নিজেই তোমাদের টিনুভায়ের সঙ্গে...শুভাশিস রান্নাঘর থেকে সরে এল ।

দুপুরে খেয়ে উঠে বিছানায় গড়াচ্ছিল শুভাশিস । বাইরে রোদ এখন বেশ চড়া, তবে চোরা একটা ঠাণ্ডা বাতাসও বইছে । অলস আমেজে চোখ জড়িয়ে আসে । ঘুমোলে রক্ষে নেই, সারা বিকেল গা ম্যাজম্যাজ করবে, অথচ চোখ খুলে রাখাও ভারী কঠিন এখন । ঘুম তাড়াতে শুভাশিস উঠে বারান্দায় এল । মনের ভেতর একটা সূক্ষ্ম আলোড়ন চলছে তার । চলছেই । তনুময়ের সন্ধান যখন একবার পাওয়া গেছে, তখন যে করে হোক তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে । জীবনে একটি বারের জন্য ইন্দ্রাণীকে যদি অকৃত্রিম আনন্দ দিতে পারে, সে কি শুভাশিসের কম সৌভাগ্য ! ইন্দ্রাণী সত্যিই খুশি হবে তো ? যে বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের একটা নিঃশব্দ বোঝাপড়া হয়ে যায়, নির্মিত হয় এক নতুন ভারসাম্য, তাকে বিঘ্নিত করাও কি এক ধরনের ঝুঁকি নেওয়া নয় ? খবরটা শুনে ইন্দ্রাণীর বাবা-মা'র স্ট্রোক-ফোক না হয়ে যায় !

ছন্দা ঘরে শুয়েছিল, উঠে এসেছে । পাশে দাঁড়িয়ে বলল,— কী ভাবছ ?

—কই, কিছু না তো ।

—না বললেই হল ! সকাল থেকে দেখছি তোমার মুখ-চোখ কেমন হয়ে গেছে ! অত সুন্দর মুরগিটা রেঁধেছিল, খুঁটে খুঁটে খেলে... !

—এমনি। বোর লাগছে।

—টোটোর কথা ভাবছ ?

শুভাশিস হেসে ফেলল। ছন্দাকে ট্রেনে সে যে প্রশ্ন করেছিল, ছন্দা সেটাই ফিরিয়ে দিচ্ছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটু সচেতনও হল। অনর্থক ছন্দাকে বেশি কৌতূহলী হতে দেওয়াও ঠিক নয়। তনুময়ের প্রসঙ্গ ছন্দার অজানাই থাকুক, না হলে নতুন নির্মিত শুভাশিস ছন্দার ভারসাম্যটা টলমল হওয়ার আশঙ্কা আছে।

হেসে বলল,— কালকের ট্যুরটার কথা ভাবছিলাম। পরশু ফেরা, কাল অতটা জার্নি হবে, তোমার আবার শরীর-ফরির না খারাপ হয়।

—কিচ্ছু হবে না। আমি এখন দুশো পারসেন্ট ফিট। ছন্দা খুশিতে কলকল করে উঠল,— এই শোনো, আমাদের কিন্তু খুব অন্যায় হচ্ছে জানো। মিস্টার রানাডে আমাদের জন্য এত করছেন, আমরা কিছুই রিটার্ন দিতে পারলাম না।

—বাহ্, আমি তো ওদের কলকাতায় ইনভাইট করেইছি। তখন যত খুশি হসপিটালিটি দেখিও।

—সে তো তখনকার কথা। শালিনীর কাছে আমাদের কিন্তু খুব নিন্দে হবে।

—তো কি করতে হবে শুনি ?

—কাল মিসেস রানাডে একা খাবার করে নিয়ে যাবেন কেন, আমরাও কিছু নিয়ে যেতে পারি। বেশি কিছু নয়, এই ধরো কলা, ডিমসেদ্ধ, শশা টোম্যাটো দিয়ে ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ...এখানে টোম্যাটো সস পাওয়া যাবে না ?

ছন্দাকে একটু ঈর্ষা হল শুভাশিসের। কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মগ্ন থাকতে পারে ছন্দা। মুচকি হেসে শুভাশিস বলল,— তার মানে বিকেলে আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে, তাই তো ?

—প্লিইইজ।

মাথা নাড়ল শুভাশিস। যাবে। বিকেলে এই মুক্তিটুকু তার বড় জরুরি ছিল।

লেবার লাইন খুঁজে পেতে খুব অসুবিধে হল না। ছোট্ট টিলার পায়ের কাছে বারশুয়া কারখানার মজুরদের বসতি। বসতি বলতে লম্বা টানা অ্যাসবেসটসের চালঅলা সার সার ব্যারাক। মুখোমুখি ঘর, পিঠোপিঠি ঘর, মাঝে সরু সরু উঠোন। অনন্ত দীর্ঘ বারান্দায় শাল বল্লার খুঁটি, ছোট ছোট দরমার পার্টিশান। নোংরা উঠোনে একপাল বাচ্চা কিচমিচ করছে, দুর্গন্ধময় নালার ধারে নির্ভাবনায় ঘুরছে মুরগির ছানা, এদিক সেদিকে শুয়োর কুকুর বেড়াল। খানিক আগে সকালের শিফট শেষ হয়েছে, দলে দলে পুরুষ ফিরছে পাড়ায়। তাদের হাঁকডাক আর মেয়ে শিশু জন্তুদের কলরবে মুখর হয়ে আছে গোটা এলাকাটা। ঘরে ঘরে বিকেলের আঁচ পড়েছে উনুনে, চিমনি থেকে বেরোনো গলগল ধোঁয়ায় দিনশেষের গোলাপি আকাশও বড় মলিন দেখায় এখন।

এই হতশ্রী পরিবেশে বাস করে তনুময় ! ইন্দ্রাণীর ভাই !

সামনের এক ছোকরাকে ধরল শুভাশিস,— এখানে টিনুর ঘরটা কোথায় ?

অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে শুভাশিসকে। ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এমন সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ বোধহয় এদিকে আসে না বড় একটা।

ছেলেটিও জরিপ করছে শুভাশিসকে।

শুভাশিস আবার বলল,— টিনু। তোমাদের আয়রন মাইনসে কাজ করে।

ওড়িয়া ভাষায় ছেলেটি উত্তর দিল,— ওই দিকে। চার নম্বর লাইনের একদম শেষে।

পায়ে পায়ে ব্যারাকের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়াল শুভাশিস। তনুময়ের ঘরের দরজা খোলা, কম পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে ঘরে।

বাইরে থেকে শুভাশিস গলা ওঠাল,— তনুময়...তনুময়...

ঘর থেকে কেউ বেরোল না। ভেতর থেকে উত্তর ভেসে এল,— আসুন ডাক্তারবাবু। আমি

আপনার অপেক্ষাতেই আছি।

ব্ল্যাক জাপান মারা সস্তা কাঠের দরজাটা বেশ নিচু। শুভাশিস তেমন লম্বা নয়, তবু তাকেও মাথা নামিয়ে ঢুকতে হল। পলকের জন্য শুভাশিসের মনে এল কোথায় যেন পড়েছিল মালিকরা নাকি ইচ্ছে করেই মজুরদের জন্য ছোট ছোট দরজা বানায়। যাতে সকাল বিকেল মাথা হেঁট করে নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মাথা নত করাটাই তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। বেশির ভাগ এমনটাই ঘটে, তবে এর বিপরীতও যে হয় না তা নয়। এই বেঁটে দরজাই অনেক উন্নতশির মজুরের মনে প্রথম বিদ্রোহের বীজ বপন করে।

অনুজ্জ্বল আলোয় তনুময়ের ঘরটাকে দেখছিল শুভাশিস। নিতান্ত নিরাভরণ ঘর, একটা দড়ির চারপাই, কেরোসিন স্টোভ, আর অল্প কয়েকটা বাসনপত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। ঘরের মধ্যিখান দিয়ে টাঙানো দড়িতে ঝুলছে তনুময়ের খাকি প্যান্ট শার্ট, গেঞ্জি, গামছা। চারপাইতে এলোমেলো পড়ে বালিশ কম্বল চাদর, তনুময়ের একখানা জোব্বা সোয়েটারও।

সোয়েটারটা দড়িতে ঝুলিয়ে দিল তনুময়। খানিক ছড়িয়ে দিল কম্বলখানা। বলল,— বসুন ডাক্তারবাবু।

ডিম কলা শশার ব্যাগ দরজার পাশে নামিয়ে রাখল শুভাশিস,— তুমি জানতে আমি আসব?

তনুময় উত্তর দিল না। মৃদু হেসে বলল,— চা খাবেন?

—কে করবে? তুমি?

—খেয়ে দেখুন না। চা আমি মন্দ করি না।

—করো। শুভাশিস ভেতর পানে উঁকিঝুঁকি মারছে। ছোট্ট রান্নাঘর, পাশেই স্নান পায়খানার জায়গা, সব মিলিয়ে খুবই ছোট ইউনিট। রান্নাঘরে কিছু ছেঁড়া কাগজের ডাঁই, বাথরুমে ছোট একটা বালতি আর মগ, ব্যস। লঘু স্বরে শুভাশিস বলল,— এই তবে তোমার প্রেজেন্ট শেল্টার?

—শেল্টার কেন, এই আমার বাসস্থান। তনুময়ের ঠোঁটে আলগা হাসি,— দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসবেন না?

সন্তর্পণে খাটিয়ায় বসল শুভাশিস। সিগারেট ধরিয়ে বলল,— চলবে?

—না। নেশা নেই।

—শুনেছি আগে নাকি খুব সিগারেট খেতে?

তনুময় যেন কথাটা শুনতে পেল না। নিচু হয়ে বসে পাম্প দিচ্ছে স্টোভে। নীলচে আগুনে জলের বাটি বসাল। ছোট্ট ঠোঙা থেকে গুঁড়ো দুধ বার করে দিচ্ছে কাপে। চোখ না তুলেই বলল,— আপনার কি এখনও দিদির সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

প্রশ্নটা আসবে জানাই ছিল, তবে ঠিক শুরুতেই সেটা আশা করেনি শুভাশিস। একটু চুপ থেকে বলল,— তুমি কিন্তু আমার একটা প্রশ্নেরও জবাব দিচ্ছ না তনুময়।

—আপনি তো তেমন কোনও প্রশ্ন করেননি ডাক্তারবাবু।

—আমার উপস্থিতিটাই তো প্রশ্ন। তোমার এখানে থাকাটাই তো প্রশ্ন। কেন তুমি চলে এলে? কেন ফিরলে না? কেন বছরের পর বছর লুকিয়ে আছ? তোমার কি কিছুই বলার নেই?

তনুময় ভাবলেশহীন মুখে ফুটন্ত বাটিতে চা-পাতা ফেলল। অভ্যস্ত হাতে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে দোলাচ্ছে অল্প অল্প। স্টোভের পাম্প খুলে দিল। কাপে চা ঢেলে নাড়ছে চামচ দিয়ে। শুভাশিসের দিকে কাপ বাড়িয়ে দিল,— দেখুন তো, চিনি ঠিক হয়েছে কিনা।

—ঠিক আছে। চুমুক না দিয়েই বলল শুভাশিস। সামান্য ঝেঁঝে উঠল,— তুমি কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ তনুময়।

তনুময় এতক্ষণে সোজাসুজি তাকিয়েছে,— আপনার কি ধারণা আমি এমন কিছু করেছি যার জন্য আপনাকে এড়িয়ে যাব?

তনুময়ের স্বর শান্ত, কিন্তু তীক্ষ্ণ। যেন শুভাশিসের কাছেই কৈফিয়ত চাইছে তনুময়। শুভাশিস

রাগ রাগ গলায় বলল,— তোমার বাবা-মাকে যে দগ্ধে দগ্ধে মেরেছ, তার জন্যও তোমার অনুশোচনা নেই ?

—কলকাতা ছাড়ার অনেক আগে থেকেই তো বাবা-মা'র চোখে আমি মৃত ছিলাম ডাক্তারবাবু। যেদিন থেকে পার্টির কাজে নেমেছিলাম, সেদিন থেকেই তো...

—বাবা-মা'র চোখে মৃত থাকা, আর সত্যি সত্যি মরে যাওয়া, দুটো এক নয় তনুময়। তুমি যে বেঁচে আছ, এ খবরটুকু তাদের দিতে কি অসুবিধে ছিল ?

—তা হলে তো আমায় ফিরতে হত।

—না হয় নাই ফিরতে। ঠিকানা না হয় নাই জানাতে।

—সেও তো এক ধরনের ফেরাই ডাক্তারবাবু। পিছুটান মানেই দোটানা।

—নাটুকে কথা ছাড়ো। সত্যি বলো তো, বাবা মা দিদি কারুর জন্য তোমার কখনও মন কেমন করেনি ?

ছোট ছোট চুমুক দিয়ে চা শেষ করল তনুময়। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে পা ছড়িয়ে। বাঁ হাঁটু সামান্য উঁচু হয়ে আছে। শূন্য কাপ দু হাতে ধরা, একেবারে গ্রামীণ ভঙ্গি।

হাতের কাপ অল্প ঘোরাতে ঘোরাতে তনুময় বলল,— সত্যিটা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না ডাক্তারবাবু। সত্যিই আমার কারুর জন্য মন কেমন করে না। প্রথম প্রথম হয়তো করত, কিন্তু এখন আর...। বিশ্বাস করুন, সেই জীবনটা এখন আমার সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হয়। আমি, আমার পরিপার্শ্ব, আমার বাবা মা বন্ধুবান্ধব...

—আশ্চর্য !

—অবাক হওয়ার কিছু নেই ডাক্তারবাবু। একবার সেই সময়টার কথা ভাবুন তো। তনুময় ডান পা'টা গুটিয়ে বসল। চোখ কুঁচকে বলল,— একাত্তরের শেষের দিক থেকে আমাদের পার্টি ছত্রখান হতে শুরু করেছে। আমরা তখন অণু-পরমাণুর মতো ভেঙে যাচ্ছি। রোজ নতুন নতুন মত আসছে, রোজ শ্রেণীশত্রুর সংজ্ঞা বদলাচ্ছে, আজ ট্রাফিক পুলিশ আমাদের শ্রেণীশত্রু, কাল কাবুলিঅলা, পরশু হয়তো পাথরের স্ট্যাচু। সজল দীপেনরা তিন দিন আগে আমাদের সঙ্গে ছিল, কাল তারা ভিন্ন গোষ্ঠীর। আজ রবিন সুরজিৎরা প্রখর বিপ্লবী, পরের দিন তারাই প্রতিবিপ্লবী। আমরা কে কার সঙ্গে আছি, একসঙ্গে আছি কি নেই, তাও বোধহয় ভাল করে জানি না। আমরা তখন শুধুই এক-একটা কোড। প্রত্যেকে চিৎকার করছি, দেশের জনগণের চারটেই শত্রু। সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, ফিউডালিজম, আর আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দির পুঁজিবাদ। অথচ অতি প্রাথমিক কথাও তখন আমরা ভুলে গেছি। জলের মধ্যে যেভাবে মাছ মিশে থাকে, সেইভাবে জনগণের মধ্যে মিশে থাকে বিপ্লবী, ঘাসের মধ্যে পিঁপড়ের মতো সমাজে লুকিয়ে থাকে জনযোদ্ধা—এই সহজ কথাগুলো আমাদের আর মনেই নেই। দেড়শোটা জোতদার মেরে থাকলে পঁচাত্তরটা ট্রাফিক কনস্টেবল মেরেছি। একটা ছাপোষা কনস্টেবল, যার সাকুল্যে মাইনে তখন একশো বারো টাকা, সে যদি শুধুমাত্র রাষ্ট্রশক্তির অংশ বলেই শ্রেণীশত্রু বনে যায়, তবে তো কারখানার মজুররাও শ্রেণীশত্রু। কারণ তারাই তো পুঁজিবাদী সিস্টেমটাকে টিকিয়ে রেখেছে, মুনাফা করতে সাহায্য করছে, তাই না ডাক্তারবাবু ?

—হুম। পার্টির ডিসিশানে তখন কিছু মারাত্মক ভুল ছিল। তবে তোমার মজুরদের উপমাটা বোধহয় ঠিক হল না তনুময়। মুনাফা আর মজদুরদের সংঘর্ষই বিপ্লব। মজুররা মুনাফার অংশ নয়।

—যারা মরেছিল তারাও সবাই রাষ্ট্রশক্তির অংশ ছিল না ডাক্তারবাবু। যাক গে, যে কথা বলছিলাম...। গ্রামে পুলিশি অ্যাকশনের ধাক্কায় আমাদের বিপ্লব তখন শহরে ঘাঁটি গেড়েছে। গাড়বে না ? শহরে অ্যাকশন করা কত সহজ। নলিতে চপার টেনে দিয়ে গলিতে লুকিয়ে পড়, কে তোমায় খুঁজে পাবে ! আর আর্মস তো তখন শহরে থই থই করছে। মনে আছে একটা ছিটকিনি

পাইপগান আমি কিনেছিলাম সতেরো টাকায়। এক-একটা দানা, মানে গুলি পাওয়া যেত তিন টাকা চার টাকায়। ছিনিয়ে নিতে হয় না, কষ্ট করে জোগাড় করতে হয় না, বোমা পাইপগান থ্রি নট থ্রি যা চাও পয়সা ফেলে কেনো, আর বিপ্লব করো।

তনুময় সহসা চুপ হয়ে গেল। ভাবছে কি যেন। হলদেটে নিষ্প্রভ আলো তার ছায়া ফেলেছে মেঝেতে, ছায়াও যেন আলোর মতোই মলিন।

ছায়াটার দিকে কয়েক সেকেন্ড স্থির তাকিয়ে রইল তনুময়। তারপর আবার কথা শুরু করেছে, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমাকে কী অবস্থায় আপনার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ?

শুভাশিসও সেই পুরনো সময়টাকে দেখছিল। অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, তুমি প্রফিউসলি ব্লিড করছিলে।

—কারা আমাকে মেরেছিল জানেন ?

—তাও জানি। দা লুম্পেনস। যারা পার্টিতে ইনফিলট্রেট করেছিল।

—আজ আঠেরো বছর দূরে বসে তাদের লুম্পেনস বলা খুব সহজ ডাক্তারবাবু। কিন্তু সেদিন আমরা লুম্পেনস আর কমরেডদের তফাত পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। কেন পারিনি ? কেন অনুমান করতে পারিনি আমাদের মধ্যেই রাষ্ট্রশক্তির চর ঢুকে পড়েছে ? কারণ আ মক রেভলিউশন টার্নড আস ব্লাইন্ড। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্য আমাদের তো প্রস্তুতিই ছিল না, আমাদের মধ্যে কে বিপ্লবী, কে খুনি, কে ছ্যাঁচোড় বোঝার সুযোগ কোথায় ! দোষটা আমাদের, ওই লুম্পেনদের নয়। একটা আইডিয়ার জন্য লড়াই করতে গিয়ে চারদিকে এত অবিশ্বাস, এত সন্দেহ, এত পাগলা কুকুরের মতো দশা...। না ডাক্তারবাবু, রাষ্ট্রশক্তি যে ক্যানসারের জীবাণুর থেকেও মারাত্মক হয়ে আমাদের ভেতর থেকে ধ্বংস করে দিতে পারে, সে বোধটুকু আমাদের ছিলই না। অতএব শেষ হয়ে যাওয়াই ছিল আমাদের নিয়তি। যে কোনও ফর্মে শেষ হয়ে যাওয়া। এই অনুভূতিটা আমাদের কাছে, মানে আমরা যারা আদর্শটাকে জানপ্রাণ দিয়ে মানতাম তাদের কাছে কী যন্ত্রণাদায়ক তা আপনি বুঝতে পারবেন না ডাক্তারবাবু। তনুময়ের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। আহত বাঘের মতো গর্জাচ্ছে, রোজ খতমের লিস্ট বানানো হচ্ছে ! কে বানাচ্ছে, তাও জানি না। কেন বানানো হচ্ছে, তাও জানি না। শুধু খতম দেখে শিহরিত হচ্ছি, বদলা নেওয়ার জন্য রক্ত টগবগ করে ফুটছে। এ সময়ে দলে তো লুম্পেন ঢুকবেই। তারা তখন আমাদের থেকেও চড়া বিপ্লবী। যখন আমরা চুরচুর, তখন তাদের আসল দাঁত বেরিয়ে গেল। রাতের পর রাত যে দেবদাসের সঙ্গে আমি এক বিছানায় কাটিয়েছি, সেই দেবদাসই পুলিশের খোঁচড় হয়ে...। টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই ওই দেবদাস...। এর পর কি আর বাঁচার ইচ্ছে থাকে ? মনে হয় না নিজের সমাজকে, বাবা-মাকে খুব নিষ্ঠুরভাবে ঠকিয়েছি ? আর ফিরতে ইচ্ছে করে সেখানে ?

এতক্ষণে শুভাশিস ভেতরে ভেতরে মজা পাচ্ছিল একটু। তনুময়ের মধ্যে নিজেরই যেন এক না-গড়ে ওঠা প্রতিরূপ দেখছিল। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বলল,— তুমি যেসব যুক্তি দিচ্ছ, তার অনেকটা কাছাকাছি যুক্তি দিয়ে আমিও পার্টি ছেড়েছি। তফাত একটাই। তোমার বছর তিনেক আগে। কোন দিকে ব্যাপারটা যাচ্ছে আমি অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলাম। তোমার দিদি তার জন্য এখনও আমাকে রেনিগেড বলে।

—তা হলে আমার অনুমানটা ঠিক ? তনুময় ঘাড় হেলিয়ে শুভাশিসকে দেখল, আপনি এখনও দিদির সঙ্গে...

—আমি তোমার দিদিকে খুব ভালবাসি তনুময়।

কথাটা উচ্চারণ করে অসম্ভব তৃপ্তি হল শুভাশিসের। ইন্দ্রাণী ছাড়া এই বিশ্বসংসারে কথাটা আর কাউকে বলেনি, আজই বলল প্রথম। এই মলিন ঘরে। বড় নিষ্প্রভ আলোর নীচে বসে। পলকে বুকটা যেন তুলোর মতো হালকা হয়ে গেল। তনুময়, তনুময়কে ঘিরে শতেক প্রশ্ন, যুক্তি, প্রতিযুক্তি, সবই মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল শুভাশিস।

নিচু গলায় শুভাশিস আবার বলল,— তোমার দিদিকে আমি ভালবাসি তনুময়। তার বিয়ের আগে থেকেই। পার্টির কাজে নিজেকে ডেডিকেট করতে চেয়েছিলাম, ইন দা মিন টাইম তোমার দিদির বিয়েটা হয়ে গেল। তারপর তো...বিপ্লবও হল না...তোমার দিদিও...। তোমার দিদিকে কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছিলে তনুময়। শি ইজ পিওর, ইনোসেন্ট। যা ঘটেছিল তা ভালবাসার টানেই...

—আপনি কি আমাকে কোনও পুরনো ঘটনা মনে করিয়ে দিতে চাইছেন ডাক্তারবাবু ?

শুভাশিস চুপ। তনুময়ের প্রতিক্রিয়া দেখছে।

আবার পা ছড়িয়ে দিল তনুময়। উদাস মুখে বলল,— হ্যাঁ, আপনাদের দেখে আমি খুব আহত হয়েছিলাম বটে। আপনার বাড়ি থেকে সেই রাত্রে বেরিয়ে পড়ার কারণও একটা ওটাই। পরে ভেবে দেখেছি কাজটা ছেলেমানুষি হয়েছিল। ভীষণ ছেলেমানুষি। মুখে যতই যা বলি, আসলে তখনও আমার ভেতরে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধগুলো তো ষোলো আনা রয়েই গেছে। আবার এমনও হতে পারে, আমার মধ্যে পালানোর ইচ্ছেটা ছিলই, মধ্যবিত্ত মনটা একটা বোকা বোকা বাহানা খুঁজে নিল। ওই মধ্যবিত্ত মানসিকতা না থাকলে আপনার সঙ্গে দিদির সম্পর্কটা বৈধ, না অবৈধ, তা ভেবে আমি মাথা খারাপ করব কেন ?

শুভাশিস মিনমিন করে বলল,— হয়তো তোমার নীতিবোধে লেগেছিল।

—সেই নীতিবোধটাই তো ভণ্ডামি! মধ্যবিত্ত চেতনা থেকে উঠে আসা বুড়বুড়ি। ওই মধ্যবিত্ত আবেগই আমাকে বিপ্লবের পথে ঠেলেছিল। ওই মধ্যবিত্ত আবেগই আমাদের লড়াইয়ের সর্বনাশ করেছে। তনুময় সোজা হয়ে বসল,— আপনি বাবা-মা'র জন্য আমার মন কেমন করার কথা বলছিলেন না ? জানেন কি, ওই সব কিছু বদলানোর ইচ্ছেটা আমার জেগেছিল বাবাকে দেখেই ? বাবা আমাকে ইন্সপায়ার করেনি, বাবাকে দেখে আমার ঘেন্না হত। একটা মানুষ সব সময়ে ভয়ে কাঁপছে। অফিসে কর্তাদের ভয়ে থরথর, বাজারে দোকানদাররা চোখ রাঙালে কুঁকড়ে যায়, ডাক্তারে ভয়, উকিলে ভয়, পুলিশে আতঙ্ক...আবার তারই মধ্যে ইচ্ছে ঘাপটি মেরে আছে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হলে দুনিয়াকে দেখিয়ে দেবে ধীরাজবাবু কম বড় কেউকেটা নয়। এই যে কেন্নোসুলভ মানসিকতা, এটাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। মনে হত যে-সমাজ এই ধরনের মানুষ তৈরি করে, সেই সমাজটা ছারখার হয়ে যাওয়াই ভাল।

—এও তো তোমার মধ্যবিত্তসুলভ ভাবনা। খ্যাপামি।

—বটেই তো। এই ভাবনা থেকে নৈরাজ্যবাদ আসতে পারে, সন্ত্রাসবাদ আসতে পারে, কিন্তু বিপ্লব ? ঘৃণা থেকে কি কিছু আমূল বদলানো যায় ডাক্তারবাবু ? পুঁথির বিদ্যে থেকে মনের জড় কতটা কাটে ?

আচমকা শিবসুন্দরের কথা মনে পড়ল শুভাশিসের। এরকমই সব কথা বলত না বাবা ? শুধু রাগ আর ঘৃণা দিয়ে বিপ্লব হয় নারে শুভ, আমূল পরিবর্তনের জন্য দরকার ভালবাসা। ভালবাসা ছাড়া নতুন সমাজ গড়বি কী করে ? যাদের জন্য তোরা সমাজ পাল্টাতে চাস, তাদেরকে সত্যি সত্যি তোরা কতটা ভালবাসতে পেরেছিস ? শহর থেকে বিদ্যে বোঝাই মাথা নিয়ে তোরা তাদের গুরুঠাকুর সাজতে পারিস, কিন্তু তোরা তো তারা নোস! তোরা ঠিক করে ফেললি ভূমিহীন চাষার ঘরে গিয়ে থাকবি, তাদের সঙ্গে গেঁড়ি-গুগলি শাকপাতা খাবি, তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটবি, ওরা উপোস তো তোরাও উপোস—এ কি তোদের পক্ষে সম্ভব! পার্টি আবেদন জানাল শ্রমিক চাষিদের সঙ্গে একাত্ম হও, একাত্ম হও, ওমনি তোরা একাত্ম হয়ে গেলি ? বাইরে থেকে একটা মানুষকে অনুভব করা এক জিনিস, আর নিজে সেই মানুষটা হয়ে যাওয়া আর এক জিনিস। দ্বিতীয়টা খুব খুব কঠিন কাজ রে শুভ। ফতোয়া জারি করে সেটা হয় না। এর জন্য অনেক প্রস্তুতির প্রয়োজন।

প্রস্তুতি যে ছিল না, যা ছিল সবটাই মনের কাছে চোখ ঠারা, এ কথা শুভাশিসের থেকে বেশি আর কে জানে!

বিড়বিড় করে শুভাশিস বলল,— এতই যখন বুঝেছ, তখন বাড়ি ফিরলে না কেন ?

—ফিরে ?

—নরমাল লাইফ লিড করতে। চাকরি-বাকরি করতে, অনেকেই যেমন করছে। বুড়ো বাবা-মা'র দেখাশুনো করতে।

—ও জীবন তো অনেক আগেই আমি বাতিল করে দিয়েছি ডাক্তারবাবু।

—এই জীবনই কি তুমি চেয়েছিলে ?

তনুময় হাসল,— এখানে আমি খারাপ আছি ভাবছেন কেন ?

—বালির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা জীবনই তবে তোমার পছন্দ ? হোয়াই ডোন্ট ইউ ফেস দা ওয়ার্ল্ড তনুময় ?

—যেমন আপনারা করছেন ?

শুভাশিস সপাং করে একটা চাবুক খেল যেন। তবে জ্বালাটা গায়ে বসতে দিল না। মুখে হাসি বজায় রেখে বলল,— আমি কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখি না তনুময়। আমি যা, আমি তাই। উইথ অল মাই ভাইসেস অ্যান্ড ভারচুজ।

—আমিও তো নিজেকে লুকোই না ডাক্তারবাবু। আমি তো পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগেই ঠিক করে ফেলেছিলাম জীবনে কী চাই। এবং কেন চাই। হতে পারে আমাদের বিপ্লবটা মিথ্যে হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের স্বপ্নটা তো মিথ্যে ছিল না। শয়ে শয়ে যে ছেলেগুলোকে মেরে ফেলা হল, দিনের পর দিন যারা জেলে পচল, যারা কানা খোঁড়া নুলো হয়ে বেরোল, তাদের ভেতরও তো সেই স্বপ্নটারই উদ্দীপনা কাজ করেছিল। পথে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য ? সমাজটা পচে গলে গেছে এ কথা আগেও মানতাম, এখন আরও বেশি করে মানি। আর মানি বলেই এই জীবনই আমি বেছে নিয়েছি। বিপ্লবের স্মৃতি রোমন্থন আর শুকনো তত্ত্বের জগতে বিচরণ এতে আর আমার স্পৃহা নেই। আমি আমার পথে চলছি, আমার মতো করে ভাবছি। তনুময় উঠে দাঁড়িয়ে একটা আলোয়ান জড়াল গায়ে,— একটা কথা সার বুঝে গেছি ডাক্তারবাবু। মধ্যবিত্ত মানসিকতা দিয়ে সমাজ পাল্টানোর স্বপ্ন দেখা যায়। হল্লা খুনোখুনিতে মাতা যায়, গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে মানুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু যাদের জন্য বিপ্লব চাই তাদের জন্য কিছুই করা যায় না।

শুভাশিসেরও বেশ শীত শীত করছিল। বিকেলে বেরোনোর সময়ে শাল চাদর কিছুই সঙ্গে নেওয়া হয়নি। চারপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল,— তার মানে তুমি এখান থেকেই বিপ্লব করছ, তাই তো ?

—আমার অত শক্তি কোথায় ডাক্তারবাবু ? আমি শুধু নিজেকে তৈরি করতে চাইছি। আপনি তো জানেন না আমি কীভাবে এখানে এসে পৌঁছেছি...

—কিছু কিছু জানি। তুমি তো এখানকার লোকাল মিথ। মরে গেছিলে, ভীম বাইগার মা তোমায় নতুন প্রাণ দিয়েছে...

—ঠাট্টা করছেন ?

—না। যা শুনেছি তাই বলছি।

—আমারও তাই বিশ্বাস। নতুন জীবনটা পেয়ে আমার শুধু একটাই চিন্তা ছিল। খুব ভাবতাম, কোথায় ভুল ছিল আমাদের। ওই মধ্যবিত্ত আবেগগুলোর কথা মনে আসত, যেগুলোর কথা এতক্ষণ বলছিলাম আর কি। তখনই ঠিক করি নিজের শ্রেণী আগে বদলাতে হবে। সেই চেষ্টাই করছি, করে যাচ্ছি। মজুরদের সঙ্গে খাটি, তাদের সঙ্গেই ওঠা-বসা, তাদের সুখে আছি, দুঃখে আছি...। আমাদের বারশুয়া কারখানায় অনেক আদিবাসী আছে, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, সাঁওতাল। আছে নানা প্রদেশের লোক, ওড়িয়া বিহারি মধ্যপ্রদেশি তেলেঙ্গি। এই খনিতেই আমি ছোটখাট এক ভারতবর্ষকে দেখতে পাই ডাক্তারবাবু।

শুভাশিস চোখ ছোট করে শুনছিল কথাগুলো। কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া আইডিয়ার মতো লাগছে। তনুময় পাগল-টাগল হয়ে যায়নি তো ! তত্ত্ব শ্রেণীসংগ্রাম যুদ্ধ ছেড়ে নিজেকেই মজদুর

বানানো আবার কেমন ধরনের চিন্তা ! তথাগতর কাজের ধারাটা তবু বোঝা যায়। নিরক্ষর মানুষদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে, গরিব চাষিদের সংগঠিত করছে, জোতদারদের শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস শোনাচ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে—কিছু একটা নিয়ে আছে তথাগত। কিন্তু তনুময় ?

দুৎ, কথার কচকচি আর ভাল লাগছে না। শুভাশিস সরাসরি প্রশ্ন করল,— এত বছর তো এখানে রইলে, নিজেকে পুরোপুরি ডিক্লাসড করতে পেরেছ তো ?

তনুময় যেন একটু থমকাল। তাকিয়ে আছে শুভাশিসের দিকে। বড় একটা শ্বাস ফেলল। খানিকটা সময় নিয়ে বলল,— ভেবেছিলাম পেরেছি। এখন বুঝতে পারছি পারিনি। যদি পারতাম, তা হলে কি আপনাকে দেখে দুর্বল হয়ে পড়তাম ? নাকি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যেচে আলাপ করে আপনার খোঁজখবর নিতাম ? নিজের ওপর বড় রাগ হচ্ছে এখন।

একমুখ জংলাদাড়ি ছেলেটা আনমনা হয়ে গেছে। ভাসা ভাসা দু' চোখে ছলছল করছে চাপা বিষাদ। কেমন কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তনুময় ! কুঁজো হয়ে, না ভারী হয়ে !

লাইমলাইটের বুড়ো ক্লাউনটার কথা মনে পড়ল শুভাশিসের। বিষণ্ণ ক্লাউন বলেছিল, আই হেট ব্লাড, বাট ইটস ইন মাই ভেইনস।

তনুময় কি পরাজিত ? নাকি লড়ছে ?

আপাত শান্তির মোড়কে আলোড়িত হচ্ছে ছেলেটা ?

শুভাশিসের বুকটা টনটন করে উঠল। কাছে গিয়ে হাত রাখল তনুময়ের কাঁধে। নরম গলায় বলল,— তোমার বাবা কিন্তু আর বেশি দিন বাঁচবেন না তনুময়।

—উঁ ? হুঁ।

—যাবে না তাঁদের কাছে ?

সরে গেল তনুময়। দরজার পাশ থেকে শুভাশিসের প্লাস্টিক ব্যাগটা তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। মৃদু স্বরে ডাকল,— রাত হয়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু।

শুভাশিস এবার আর সাবধান হতে পারল না। দরজা পেরোনোর সময়ে জোর ঠোক্কর খেল একটা।

—ইশ্, লাগল তো ! তনুময় ঝটিতি ঘুরে তাকিয়েছে।

—ঠিক আছে।

—আপনার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গরম কিছু তো আনেননি, একটা চাদর দিয়ে দিই ?

—লাগবে না। থ্যাংক ইউ। শুভাশিসের স্বর বিরস।

—পথে কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে খুব।

—তোমার ঘরের চেয়ে বেশি নয়। শুভাশিস ব্যাগটা তনুময়ের হাত থেকে নিয়ে নিল।

—তবে চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই।

—প্রয়োজন নেই।

—জঙ্গলের পথ ধরবেন না। বাঁধানো রাস্তা ধরে সোজা চলে যান, ওটাই আপনার জন্য ভাল। টর্চ থাকলে তাও নয়...

তনুময়ের কথাগুলো কি খুব বেশি ইঙ্গিতবহ ? তার সম্পর্কে কীই বা জানে তনুময় ? নাকি সোজা মনেই কথা বলছে তনুময়, তার কানে এসেই বেঁকে যাচ্ছে কথাগুলো ?

শুভাশিস গম্ভীর মুখে বলল,— আমি কীভাবে ফিরব, সেটা আমাকেই ভাবতে দাও। নেমে এসেছি যখন, উঠতেও পারব।

—আপনি আমার ওপর অযথা রাগ করছেন। যা হয় না তার জন্য জোর করছেন কেন ? সত্যিই আমি আমার মধ্যবিত্ত পরিচয়টা মুছে ফেলতে চাই, মনেপ্রাণে চাই। আর এখানে আমি খুব ভাল আছি। জীবনযাপন আর আদর্শর মাঝে ফারাক না থাকলে তবেই না মানুষ মানুষ হয়। ভাবনাটা কি ভুল ডাক্তারবাবু ?

কথাগুলো যেন পুট পুট ফুটছে। শুভাশিস অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল,— কলকাতায় ফিরে তোমার দিদিকে আমি কী বলব ?

—যা দেখলেন, যা শুনলেন, তাই বলবেন। আরও ভাল হয় যদি কিছু না বলেন। দিদি যদি এসে টানাটানি করে আমাকে হয়তো বারশুয়া ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। ভীম বাইগার মা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, আমাকে ছেলের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন, তাঁর মায়াতেও আমি বাঁধা পড়িনি ডাক্তারবাবু।

ইন্দ্রাণীর ভাই বলেই কি তনুময় এত নির্দয় ! স্বার্থশূন্য মানুষেরও কি এক ক্রূর স্বার্থপর চেহারা থাকে ! আপনজনদের আঘাত করেই তাদের বেশি সুখ !

হা ঈশ্বর, ইন্দ্রাণীর ভাইকে কেন শুভাশিসই খুঁজে পেল !

রাতদুপুরে বদ্ধ মাতাল হয়ে গেল শুভাশিস। কনকনে বারান্দায় টলমল হাঁটছে, খালি পায়ে। মেঝের শৈত্য চিনচিনে নেশা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে।

আচমকা শুভাশিস হুঙ্কার ছাড়ল,—ছন্দা, ছন্দাআআ... আমার বোতল শেষ। আর একটা লাগাও।

ঘাড়ে গলায় নাইট ক্রিম মাখছিল ছন্দা। ছুটে এল। কটমট চোখে তাকাচ্ছে,— আর খেতে হবে না, সাড়ে এগারোটা বাজে, এবার শুয়ে পড়ো। কাল আবার সকাল সকাল ওঠা আছে।

—নো। আই ওয়ান্ট মোর।

—তোমার ব্যাপারখানা কী বলো তো ? সন্ধেবেলা কোথায় না-কোথায় চরকি মেরে এলে, এসেই এই বোতল মহাকাব্য শুরু হয়ে গেল ! মিস্টার রানাডে তোমার জন্য কতক্ষণ এসে বসেছিলেন। বললাম একটা ফোন করো, একটু ভদ্রতা দেখাতে কী অসুবিধে হয় তোমার ?

—আ, লেকচার মেরো না। আই হেট লেকচারস। আই অ্যাম সিক অফ লেকচারস। ডিসগাস্টেড অফ লেকচারস...

—কী প্রলাপ বকছ ? কে তোমায় লেকচার শুনিয়েছে ?

—সব্বাই শোনায়। এভরিবডি। বাপ শোনায়...যে চান্স পায় সেই শোনায়...ওই যে দ্যাট লেডি যার সঙ্গে তোমার নিটিপিটি হিংসে হিংসে খেলা চলে, সে শোনায়...

ছন্দার ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। ঘন ভাঁজ। স্থির তাকাল,— ঠিক করে বলো তো কোথায় গিয়েছিলে ?

—বলব ? শুভাশিস ছন্দার মুখের ওপর ঝুঁকল,— তোমার টিনুর কাছে। টিনু। টিইইইনু। শালা ডিক্লাসড হতে চায় ! মধ্যবিত্ত আইডেনটিটি ওয়াইপ আউট করে দেবে ! হিহি ।...মধ্যবিত্ত আইডেনটিটি যদি সত্যি মুছতে চাস, তবে আয়, শুভাশিস সেনগুপ্তর কাছে ট্রেনিং নে। অ্যান্ড ইউ উইল গেট দা হ্যাপিনেস ।...আজব খেলা অ্যাঁ ? তনুময় থেকে টিনু ! বেড়ে খেলা !

—কে তনুময় ?

—শুনবে ? বলব ?...উঁউউঁহুঁ, তোমাকে তো বলা যাবে না। তুমি তা হলে আবার ডিপ্রেশানে চলে যাবে। শুভাশিস চেতনার প্রান্তসীমায় ঘোরাফেরা করছে। আঙুল তুলে স্খলিত স্বরে বলল,— তোমাকে আমি আর দুঃখ দেব না। কক্ষনও না। তুমি পৃথিবীর সব থেকে হ্যাপি উওম্যান হবে। আমি হব হ্যাপি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। উইথ অল মাই ভাইসেস...উইথ অল মাই ভারচুজ ।...ভাইসেস...ভারচুউজ...

বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল শুভাশিস। দু' হাতে আঁকড়ে ধরেছে ছন্দাকে, শিশুর মতো।

সুখ আর পাপপুণ্য তালগোল পাকিয়ে গেল।

৭৯

জাহাজের ব্রিজে বসে রুটিন নেভিগেশনের কাজ করছিল বাপ্পা। তাদের মার্মেড জাহাজটি অত্যাধুনিক, এর গতিপথ কম্পিউটার নির্ধারিত, তবু নিয়মিতভাবে সারা দিন সারা রাত জাহাজের যাত্রাপথের অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নোট করতে হয় বাপ্পাদের। আটলান্টিক মহাসাগরে বাতাসের কোনও ঠিকঠিকানা নেই, হঠাৎ হঠাৎ ঝড় চলে আসে, তখন এই ব্রিজ থেকেই জাহাজের অভিমুখ স্থির রাখতে হয়। ব্রিজ অর্থাৎ জাহাজ চালানোর ঘরটি জাহাজের মাথায়, সামনের দিকে। কাচঘেরা ঘরখানা থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। দৃশ্য অবশ্য খুবই সীমিত, একঘেয়ে। উল্টোনো বাটির মতো আকাশ, আর টাল খাওয়া থালার মতো সমুদ্র। তবে এই মুহূর্তে বাপ্পার কিছু দেখার নেই, বাইরে এখন কুচকুচে আঁধার।

বাপ্পাদের জাহাজে লোকলস্কর খুব বেশি নেই। মাত্র সাঁইত্রিশ জন মানুষ এই বিশাল চল্লিশ হাজার টনের অর্ণবপোতটিকে গোটা পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাপ্পা হিসেব করে দেখেছে তাদের জাহাজটা দুটো ফুটবল গ্রাউন্ডের চেয়েও বেশি লম্বা। চওড়াও কম নয়, তিরিশ মিটার। অমনি ঘুরেফিরে বেড়ালে এর বিশালত্ব নজরে পড়ে না, কিন্তু জাহাজের খোলে যখন থাক থাক গাড়ি সাজানো থাকে তখন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এই নিয়ে তৃতীয় রাউন্ড সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে বাপ্পা, এখনও তার বিস্ময়বোধ পুরোপুরি কাটল না। এখন অবশ্য জাহাজের খোল অনেকটাই খালি। লস এঞ্জেলেস সানফ্রান্সিসকো হাউস্টন বোস্টনে প্রায় ছাব্বিশ শো জাপানি গাড়ি নেমে গেছে, মার্মেড এখন চলেছে ডোভারের পথে। চল্লিশ নটিকাল মাইল বেগে। পথে যদি আকস্মিক ঝড়ঝঞ্ঝা না আসে তবে ডোভার পৌঁছতে আরও দু দিন।

রামালু এসে গেছে। বাপ্পার রিলিভার। মছলিপত্তনমের ছেলে, বয়সে বাপ্পার চেয়ে বছর তিন-চারের বড়। তারই মতো ডেক ক্যাডেট, তবে এক বছরের সিনিয়ার। হাসিখুশি ছেলে, সিনেমার পোকা। অবসর পেলেই এন্টারটেনমেন্ট হলে গিয়ে ভিসিআর চালিয়ে বসে থাকে।

রামালু ডাকল,— হাই নীল !

—হাই। ঘড়ি দেখল বাপ্পা। দশটা দশ। হেসে বলল,— সো আর্লি ?

—আর্লি কোথায় ! আই অ্যাম ইন টাইম।

দশ মিনিট লেট, তাও বলে ইন টাইম ! তবু ভাল, অন্য দিনের মতো আধ ঘণ্টা দেরি করেনি ! বাপ্পা উঠে দাঁড়াল। টুপি চাপাচ্ছে মাথায়।

রামালু বলল,— কি বলছে ওয়েদার ?

—ফাইন। একুশ ডিগ্রি নর্থে একটা মাইনর স্টর্ম আছে, এদিকে আসবে বলে মনে হয় না।

—গুড নট। ডোভারে ইন টাইম রিচ করলে সুধাকে একটা রিঙ করব।

হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাপ্পা। প্রতিটি বন্দর থেকে ফিঁয়াসেকে ফোন করা রামালুর ডিউটি। সুধা নাকি পৃথিবীর সব থেকে সুন্দরী মেয়ে। বাপ্পাকে ছবি দেখিয়েছে, গাবলু-গুবলু ছাড়া কিছু মনে হয়নি বাপ্পার। তিতিরকে দেখলে রামালু বোধহয় ফেন্ট হয়ে যেত।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল বাপ্পা। তাদের জাহাজটা চোদ্দতলা, অষ্টম তলায় বাপ্পার ঘর। নিজের ঘরে ফিরে বাপ্পা কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর উঠে পোশাক-টোশাকগুলো বদলাল। পরে নিয়েছে ঢোলাঢালা নাইট ড্রেস। আবার সেই ছটায় ডিউটি। ওসাকা থেকে কেনা রিস্টওয়াচটায় অ্যালার্ম দিল। পাঁচটায়। কঁকর কঁক শব্দ করে ঘড়ি, ঠিক মোরগের মতো।

এত তাড়াতাড়ি বাপ্পার ঘুম আসে না। সাড়ে সাতটায় ডিনার সেরেছে, একটু একটু খিধেও পাচ্ছে। টিন থেকে খানিকটা জেলি বার করে সরাসরি মুখে চালান করল বাপ্পা। পোশাকের ওপর একটা উইন্ডচিটার চাপিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এই সময়টা তার ডেকে দাঁড়ানোর সময়। জাহাজের ভেতরে এয়ার কন্ডিশনিং প্ল্যান্ট আছে, ঠাণ্ডা-গরম কিছুই তেমন বোধ হয় না। কিন্তু

ডেকের হাওয়া এখন বেশ শীতল, মিনিট খানেক দাঁড়ালেই কাঁপুনি এসে যায়। হবে নাই বা কেন! অক্টোবর শেষ হয়ে গেল, অক্ষাংশের হিসেবে সে এখন আছে চুয়াল্লিশ ডিগ্রি নর্থে, একটু কনকনে ভাব তো আসবেই।

হাঁটতে হাঁটতে ডেকের একদম কোনায় চলে এল বাপ্পা। ইয়া মোটা ক্যাপস্টানটা পার হয়ে ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। ধু ধু কালো। মিশমিশে কালো।

বাপ্পা চোখ বুজে প্রিয় খেলাটায় নেমে পড়ল। একা থাকার সময়ে এই খেলাটা আজকাল তাকে আবিষ্ট করে রাখে। ঠিক এই মুহূর্তে কী ঘটছে কলকাতায়? কী হচ্ছে বাড়িতে? এই মাত্র সে দেখে এসেছে মার্মেড আছে আঠাশ ডিগ্রি সাতান্ন মিনিট ওয়েস্টে, আর কলকাতা হল গিয়ে অষ্টআশি ডিগ্রি চব্বিশ মিনিট ইস্ট। এখানে এখন দশটা পঞ্চাশ, তার মানে কলকাতায়.... ছটা উনচল্লিশ। কাল সকাল। ভাবতেই কী আশ্চর্য লাগে! আগামী কালটা শুরু হয়ে গেছে কলকাতায়! অথচ সেই একই মুহূর্তে এই অ্যাটলান্টিক মহাসাগর এখন রাত পিঠে নিয়ে বসে! কী করছে এখন মা? স্কুলের পথে রওনা হয়ে গেছে? তিতিরটা যা ঘুমকাতুরে, নিশ্চয়ই ওঠেনি। স্কুল যাওয়ার পথে কি এখন বাপ্পার কথা মনে পড়ছে মা'র? ঠিক এই মুহূর্তে? যদি মনে পড়ে, তো কী ভাবছে মা? কল্পনা করতে পারছে একই মুহূর্তে মা'র কথা ভাবছে বাপ্পাও। নিঃসীম একা হয়ে! তটহীন এক মহাসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে!

একটা ভিজে নোনা হাওয়া বাপ্পার মুখে ঝাপটা মারল। বুকটা হু হু করে উঠল বাপ্পার। প্রায়শই করে আজকাল। মাকে দেখতে ইচ্ছে করে হঠাৎ হঠাৎ। বোনকে দেখার জন্য উথাল-পাথাল করে মন। কান্না পায় বাপ্পার, সামনের অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় আর বুঝি কোনওদিন কোনও আপনজনের সঙ্গে দেখা হবে না। সব থেকে আশ্চর্যের কথা সেই লোকটাকেও দেখতে খুব ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে লোকটা, বাপ্পার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রোগা মুখে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল। কলকাতা ছাড়ার দিন বাবা এয়ারপোর্টে আসতে চেয়েছিল, বাপ্পা খেঁকিয়ে উঠেছিল। ম্লান হয়ে গেল বাবার মুখ, নিঃশব্দে বাপ্পার জন্য ট্যাক্সি ডেকে এনে চলে গেল ভেতরে। বাবা হয়ে উঠতে পারেনি বলে কি মর্মপীড়ায় ভোগে বাবা? তাকে কখনও কটু কথা বলেনি বাবা, জোর ফলায়নি। একটু অধিকারবোধ না দেখালে কি তার ওপর টান জন্মায় না? যদি তাই হয়, তবে সহস্র মাইল দূরে থেকে বাবা তার স্বপ্নে হানা দেয় কেন! সেই শহরটাই বা কেন তাকে টানে আজকাল! নোংরা ঘিঞ্জি ক্লেদাক্ত পূতিগন্ধময় সেই শহরটা! অত ঘৃণা করেছে বলেই কি সেই মায়াবিনী কুহকজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে তাকে! কত সুন্দর জিনিস দেখল পৃথিবীতে, কত ঐশ্বর্যময় শহর দেখল, তবু কোনও কিছুতেই যেন মন ভরে না। কেন?

চোখ বুজল বাপ্পা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কলকাতার সকাল। একটু ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব, নরম হাওয়া বইছে, অলস পায়ে হাঁটছে লোকজন। ঢাকুরিয়া ব্রিজের পাশে চা দোকানটায় আড্ডা মারছে বাস কন্ডাক্টাররা, লেক থেকে ফিরছে রুন্টুর বাবা। লেক নিশ্চয়ই এখন ঘন সবুজ, টিলটিল জল ছুপ ছুপ ধাক্কা মারছে পাড়ে। পিপুল শিমুল জারুল কৃষ্ণচূড়া গুলমোহরের নীচে শিশির পড়েছে খুব, এখনও শুকোয়নি। ছোটকার জগিং শেষ, ফিরছে এবার। বড়কাকা সিগারেট কিনতে বেরিয়েছে, দোতলার বারান্দা থেকে অ্যাটম চেঁচিয়ে ডাকছে বড়কাকে। মিনতি বাজারে বেরোবে, একতলার রান্নাঘরে কাকিমার কাছ থেকে নির্দেশ নিচ্ছে। চায়ের কাপ প্লেট হাতে সন্ধ্যার মা উঠছে দোতলায়।

ধুস, বাড়িটাই তো নেই। এখন তো সব...।

বাপ্পাদের নতুন বাড়িটা কেমন হয়েছে? বড়কাকার ডেরাটাই বা কেমন?

—হেই নীল! নট স্লিপিং?

বাপ্পা জাহাজে ফিরল। লিয়েম। টলমল পায়ে আসছে। সারা দিনই চড়িয়ে থাকে লিয়েম, সন্ধে থেকে একটু একটু দোলে।

বাপ্পা হাসল,-- ঘুম আসছে না।

লিয়েমের মঙ্গোলিয়ান ভারী মুখে দাঁতগুলো ফুটে উঠল,— দিস থিঙ হ্যাপেনস। ফার্স্ট টাইম বাড়ি ছেড়েছ তো! কত দিন হল?

—চার মাস সাতাশ দিন।

প্রায়প্রৌঢ় স্থূল লোকটা হা-হা হাসল। অভ্যস্ত ক্রিয়াপদবিহীন ইংরিজিতে বলল,— ফিলিং হোমসিক? কাউন্টিং ডেজ?

বাপ্পা ধরা পড়া মুখে বেফাঁস বলে ফেলল,— তুমি এর কী বুঝবে? তোমার তো হোমসিকনেস নেই।

—আছে বইকি। নইলে দরিয়ায় ঘুরি কেন? দরিয়াই হল আসল কাঁদার জায়গা। বাড়ির দুঃখে কি বাড়িতে বসে কাঁদা যায়!

সর্বনাশ। এক্ষুনি লিয়েম তার জীবনী শোনাতে শুরু করবে। অন্তত সত্তরবার বাপ্পার শোনা হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও। কবে লিয়েমের বউ পেনাং ছেড়ে মালাক্কা পালিয়েছিল, কত কষ্ট করে নিনিকে মানুষ করেছে লিয়েম, নিনি এখন বিয়ে করেছে এক বার্মিজ ছোকরাকে, উ মঙ তার নাম, মেয়ে জামাই লিয়েমের পেনাং-এর বাড়িতেই থাকে, কিন্তু জামাই তাকে দুর দুর করে, ঘরে ঢুকতে দেয় না, নিনিও তাকে কিছু বলে না, এই সব। লিয়েমের তেমন কোনও বদ নেশা নেই, শুধু এই সারাক্ষণ মদ খাওয়াটুকু ছাড়া। একটাই বান্ধবী আছে লিয়েমের, হংকং-এ, তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই ক'দিন যা চনমনে থাকে লিয়েম, নয়তো বছরভর তার শুধু দুঃখই দুঃখ।

বাপ্পা কথা ঘুরিয়ে নিতে চাইল,— আজ একটু তারা-টারা হবে না লিয়েম?

—হোক। লিয়েমের ভুরুহীন দুই চোখ পলকে জ্বলে উঠেছে,— কোন দিক থেকে শুরু হবে?

—পশ্চিমই হোক।

প্রথম সমুদ্রযাত্রার সময়ে আকাশের একটি তারাও চিনত না বাপ্পা। না, একটা চিনত। পোলারিস। ধ্রুবতারা। তারাটা মা চিনিয়েছিল তাকে, খুব ছোটবেলায়। বাকি গোটা আকাশ সে চিনেছে এই লিয়েমের কাছ থেকে। লিয়েমই তাকে তারাদের উদয়-অস্ত বুঝিয়েছে, কোন তারা কেন কবে সৃষ্টি হল তাই নিয়ে উপকথা শুনিয়েছে বিস্তর। অদ্ভুত সব গল্প। বলেছে সিফিউস আর ক্যাসিওপিয়ার কন্যা অ্যান্ড্রোমিডার কাহিনী, দেখিয়েছে আকাশের তিমিমাছ সেটাসকে যার খাদ্য হয়ে শিকল দিয়ে পাহাড়ে বাঁধা ছিল অ্যান্ড্রোমিডা। বলেছে জুপিটার আর ডানাই-এর পুত্র দুঃসাহসী পারসিউসের কথা। কোথা থেকে এল ওই আকাশের গায়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগাসাস, কোন কৌশলে পারসিউস মায়াবিনী মেডুসার মুণ্ডু কাটল, সব লিয়েমের ঠোঁটস্থ। এখন লিয়েম প্রায়ই পরীক্ষা নেয় বাপ্পার, এ আর একটা ভারী মজার খেলা।

লিয়েম বাপ্পার কাঁধে হাত রেখেছে,— অ্যালটেয়ার কোথায়?

খাড়া পশ্চিমে গাঢ় নীল তারাটাকে চট করে খুঁজে নিল বাপ্পা,— ওই তো।

—গুড। লিয়েম পিঠ চাপড়াল,— আরিগা কোথায়?

ধ্রুবতারার ডান দিকে চোখ চালাল বাপ্পা। পারসিউসের পূর্ব দিকে ছায়াপথের মধ্যে চারটে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। সরলরেখায়। বাপ্পা আঙুল তুলল,— ওই যে।

—এরিডেনাসটা দেখাও।

—স্বর্গের নদী? ওই তো পুব-দক্ষিণ আকাশ জুড়ে এঁকেবেঁকে গেছে। আচ্ছা লিয়েম, এরিডেনাসের একদম সাউথের ওই লাস্ট তারাটা আচের্নার নয়?

—উহুঁ, ওটা ফিনিক্স। আচের্নার এখন দেখা যাচ্ছে না, আরও নীচে আছে।

খেলা জমে গেছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে জ্বলছে ভেগা, অ্যাকুইলা ক্রমশ সরে যাচ্ছে পশ্চিমে, পেগাস্যাসের উত্তরে হাঁটছে অ্যান্ড্রোমিডা....

কত শত ছবি ফুটে থাকে আকাশে। ভাল্লুক হরিণ সিংহ কুকুর গরু বাছুর, গাছপালা কত কি।

দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায় বাপ্পার।

বাপ্পার এই তারা দেখার কথা জাহাজে চাউর হয়ে গেছে। চিফ অফিসার সুজিত পোদ্দারের বউ অনুরাধা বউদি ঠাট্টা করে বলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লিয়েমের কী হাল হয়েছে তো দেখেছ! গোটা জাহাজে ওই লোকটাই শেষে তোমার গুরুঠাকুর হল!

বাপ্পা হাসে চুপটি করে। কি করে বোঝায় লিয়েমের অনেক আগেই আর এক গুরুঠাকুর আকাশটা ঢুকিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। তারই ধাঁধার উত্তর খুঁজতে সুলিভানের বইটা ঘাঁটত বাপ্পা, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকত, আর তখন থেকেই কি করে যেন ওই প্রকাণ্ড নভোমণ্ডল ছড়িয়ে গেছে বাপ্পার বুকের গভীরে। কেউ জানে না প্রতি রাতে তাকে একটা করে চিঠি লেখে বাপ্পা, কিন্তু পাঠায় না। প্রতিটি চিঠিই গোপনে রাখা আছে নাইট স্কাই-এর পাতায় পাতায়। কলকাতা ফিরে রোজ একটা করে চিঠি তুলে দেবে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে। ততদিন তারারাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে মনের কথা বলুক।

লিয়েম চলে যাওয়ার পরও আরও খানিকক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে রইল বাপ্পা। মা বাবা বোন কেউ নয়, এখন শুধু একটাই মুখ ভেসে উঠেছে নিকষ অন্ধকারে। আট ঘণ্টা আগে ওই ক্যাপেল্যা নক্ষত্রটা কলকাতায় জেগেছিল, সে এখন ফুটে উঠেছে বাপ্পার আকাশে। ওই নক্ষত্র কি কোনও বার্তা বয়ে আনল! আবার কাল ফিরে গিয়ে তাকে কি শোনাবে বাপ্পার কথা!

এটাই বুঝি বিষ্ণুপ্রিয়ার পাজল্!

সিঁড়ি ভেঙে এন্টারটেইনমেন্ট হলে এল বাপ্পা। এত রাতেও একা একা বিলিয়ার্ড খেলছে তাইল্যান্ডের সোমপাল। মালয়েশিয়ার মিসবুন, গোয়ার ডিক্রুজ আর কেরালার ভার্গিজ রামি খেলায় মত্ত, হাতে তাদের রঙিন পানীয়। ভিসিআর চলছে, বিশাল টিভির রঙিন পর্দায় নেচেকুঁদে প্রেম জানাচ্ছে নায়ক, দেখছে না কেউ।

ডিক্রুজ হাত নেড়ে ডাকল বাপ্পাকে।

বাপ্পা সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জাহাজে এসে তিন-চার রকম তাস খেলা শেখা হয়ে গেছে তার, সবই জুয়া। রামি ফিশ ফ্ল্যাশ পোকার। হাই স্টেকে খেলে ডিক্রুজরা, যখন তখন একশো-দুশো ডলার এ-হাত ও-হাত হয়ে যায়। দু-চার দিন দেখে বাপ্পা বুঝে গেছে এদের সঙ্গে খেলা খুব নিরাপদ নয়।

ভার্গিজ বলল,— বসে পড়ো নীল।

—নো। বাপ্পা কপালে আঙুল রাখল,— গট আ হেডএক।

মিসবুন ছুঁচোলো দাড়িতে হাত বোলাল,— হ্যাভ এ সিপ। মাথা ছেড়ে যাবে।

বাপ্পা আবার হাসল,— থ্যাঙ্ক ইউ। ড্রিঙ্কস নিলে আমার হেডএক বেড়ে যায়।

আবার তিন ইঞ্জিনিয়ার ডুবে গেছে খেলায়। বাপ্পার একটু বসে গান শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এ ঘরে থাকলেই মিসবুনরা হয়তো আবার পীড়াপীড়ি শুরু করবে।

বেরিয়ে এল বাপ্পা। সিঁড়িতে ক্যাপ্টেন বিশালা তেনিকুনের সঙ্গে দেখা। একজন ডেক-ক্রু আর মোটরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নামছে। বাপ্পা আলতো নড করল,— প্রত্যুত্তর দিল তেনিকুন, ব্যস্ত মুখে কথা বলতে বলতে চলে গেল।

নিজের কেবিনে ফিরল বাপ্পা। ঘরখানা ছোট্ট, বাহুল্যবর্জিত। একটা খাট, চেয়ার টেবিল, ক্লোসেট, দু-তিনখানা গদিমোড়া টুল— মোটামুটি এই সম্বল।

বাপ্পা চেয়ারে বসল। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে চিঠি লিখছে। রোজকার মতো। ডিয়ার নাইট স্কাই, আজকের দিনটাও একইরকম কাটল। কোনও বৈচিত্র্য নেই। রোজ সেই আট ঘণ্টা ডিউটি, আট ঘণ্টা অফ, সেই ব্রিজে বসে রাশি রাশি ইন্ডিকেটারে চোখ বোলানো, কখনও একা, কখনও দল বেঁধে, কিংবা ডেকে ঘুরে ঘুরে ছোটখাট কিছু মেরামতি ওয়াচ করা, কিংবা...

দরজায় কে নক করছে। এত রাতে কে এল রে বাবা!

দরজা খুলে বাপ্পা চমকে গেল। অনুরাধা বউদি!

বাপ্পা নার্ভাসভাবে বলল,— কী হয়েছে বউদি?

—তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ভাবলাম এখনই... তুমি শুয়ে পড়েছিলে?

—নাহ্, তোড়জোড় চলছে।

—তুমি তো বেশ ভাল ছেলে। জাহাজে এসে লেটনাইট করছ না, বুজিং করছ না... তোমার সুজিতদা তো তোমার মতো যখন ব্যাচিলার ছিল, কাউকে সারা রাত ঘুমোতেই দিত না।

বাপ্পা হাসল সামান্য। জাহাজে সে মদ্যপান করে না, এমন নয়। একদিন তো চূড়ান্ত বেহেড হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয়েজটায় সুজিতদা ছিল না। বাপ্পা তুমুল হইহল্লা করেছিল সেদিন, ঘরে ফিরে বমিও করেছিল খুব। তখনই কেমন যেন মনে হল আদিত্য রায়ের প্রোটোটাইপ হয়ে যাচ্ছে নাকি বাপ্পা! তারপর থেকে অনেক সংযত হয়ে গেছে সে, অকেশান ছাড়া গ্লাসে চুমুকই দেয় না।

বাপ্পা ঘাড় চুলকে বলল,— রাত্তিরবেলা এই সার্টিফিকেট দিতে এলেন বউদি?

বছর পঁয়ত্রিশের মিষ্টিমুখ অনুরাধা ভারী সুন্দর করে হাসল,— বাঙালি ছেলেরা তোমার মতো শান্তশিষ্ট হলে আমার খুব ভাল লাগে। তোমার সুজিতদা তো ঠিক এমনটা নয়...

—কেন, সুজিতদা তো খুব ভাল লোক। ঠাণ্ডা মানুষ।

—সে তো আমি সঙ্গে থাকি বলে। ছেলেও নৈনিতালের হোস্টেল থেকে চিঠিতে কড়া শাসন করে বলে। যাক গে, কাল সকালে তুমি একবার আমার ঘরে আসবে।

—কেন বউদি?

—কাল ভাইফোঁটা না! এই প্রথম বছর ভাইফোঁটার দিন আমি জাহাজে আছি। কাউকে তো একটা ফোঁটা দিতে হবে, না কি?

বাপ্পার রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ঢোঁক গিলে বলল,— যাব। নিশ্চয়ই যাব।

—আমি নিজে একটা স্পেশাল ডিশ তৈরি করব। তোমাকে ফোঁটা না দেওয়া অবধি আমার খাওয়া নেই। মাথায় থাকে যেন।

অনুরাধা চলে যাওয়ার পর পাথরের মতো চেয়ারে বসে রইল বাপ্পা। চিঠি লিখতে পারছে না। ধুপ ধুপ নেহাই পড়ছে বুকে।

তিতিরের কি এ বছর খুব মন খারাপ হবে দাদার জন্য!

৮০

—ছোটকা, ও ছোটকা...

স্নানঘরের দরজায় দুম দুম ধাক্কা পড়ছে। কন্দর্প শাওয়ার বন্ধ করল,— কি?

—তাড়াতাড়ি বেরোও। আজ আমার স্কুল খুলছে না! কখন ঢুকেছ...

সুখী সুখী মেজাজটায় টান ধরল কন্দর্পর। স্নান তার বড় প্রিয় ব্যসন। আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের কমে তার গোসল হয় না। দীর্ঘ সময় ধরে গাত্রমার্জনা, দু দিন বাদে একদিন শ্যাম্পু, শাওয়ারের ধারা থেকে প্রতিটি রোমকূপে জল আহরণ, সবই তার পেশার জরুরি রসদ। সুখও বটে। রায়বাড়িতে কোনও তাড়া থাকত না, কিন্তু এখানে...

কন্দর্প গা মুছতে মুছতে চেঁচাল,— দু মিনিট দাঁড়া।

—দু মিনিট নয়, এক্ষুনি বেরোও। পৌনে নটা বাজে।

তিতিরের স্বর বড় রুক্ষ হয়ে গেছে ইদানীং। অপ্রসন্ন মুখে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এল কন্দর্প। ঘরের দিকে গেল না, দাঁড়িয়ে পড়ে তিতিরকে দেখল একঝলক। গোমড়া মুখে প্রশ্ন করল,— কাল বিকেলে তোর সঙ্গে ছেলেটা কে ছিল রে?

তিতির সুড়ুৎ করে বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছিল। কন্দর্প হাতটা চেপে ধরল,— উত্তর দিলি না?

তিতির নাক কুঁচকোল,— কোন ছেলেটা ?

—আজকাল অনেক ছেলের সঙ্গে ঘুরিস বুঝি ?

—বারে, আমার স্কুলের বন্ধু নেই ?

—ছেলেটা তোর স্কুলের নয়। যথেষ্ট দামড়া। কাল বিকেলে ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর দিয়ে যার সঙ্গে হাঁটছিলি।

—ও, সুকান্ত ! তিতির আলগোছে হাত ছাড়িয়ে নিল,— ও-ও আমার একটা বন্ধু।

—করে কী ?

—কিছু একটা করে। তিতির অদ্ভুত এক ভ্রূভঙ্গি করল,— অত জেরা করছ কেন বলো তো ?

কন্দর্প আর কিছু বলল না। চোখের সার্চলাইট ফেলে আর একটু দেখল ভাইঝিকে। এই বয়সে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা ঘটে যায়, তিতিরটা যা সরল, কোনও বোকামি না করে বসে !

এসব পলকা চিন্তা মনে বেশিক্ষণ থাকে না, বিশেষত যদি কাজের চিন্তা থাকে মাথায়। খেয়ে উঠেই এক্ষুনি ডাবিং থিয়েটারে ছুটতে হবে, দিনভর ছবির সঙ্গে মেলাতে হবে ঠোঁট।

সন্ধ্যার মা'র রান্না হয়ে গেছে, দ্রুত খাওয়া সেরে তৈরি হয়ে নিল কন্দর্প। আদিত্য সবে ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙছে, চা চাইছে সন্ধ্যার মা'র কাছে, সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাড়ার গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা ডাবিং সেন্টার।

সাড়ে তিনটে নাগাদ কাজ শেষ হল। অসম্ভব ধকল গেছে, ডাবিং রুমের বাইরে এসে সিগারেট ধরাল কন্দর্প। রিসেপশনে একটা সুন্দরী মেয়ে বসে, হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। কন্দর্পও হাসল, একটু নাম হয়েছে তার, এখন আর অভদ্র হওয়া সাজে না। মেয়েটি সিট ছেড়ে এগিয়ে এল,— আপনার একটা ফোন এসেছিল। মিস্টার অশোক মুস্তাফির।

—কখন ?

—দুটো নাগাদ। খুব জরুরি দরকার। আজই আপনাকে ওঁর অফিসে একবার যেতে বলেছেন।

—আমাকে ডাকেননি কেন ?

—আপনিই তো বলেছেন কাজের সময়ে আপনাকে ডিসটার্ব না করতে।

হক কথা। ডাবিং-এর সময়ে মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটলে খুব অসুবিধে হয়।

ঝটিতি মুস্তাফির বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট অফিসে ছুটল কন্দর্প। গিয়ে দেখে অশোকদার গাল ঝোলা, যা শুনল তাতে নিজেরও চক্ষুস্থির। সামনের সপ্তাহের যে কোনও দিন নাকি অশোকদার ফিনান্স কোম্পানিতে রেড হবে। পুলিশের এনফোর্সমেন্ট আর ইনকাম ট্যাক্স একসঙ্গে জাঁতা দিতে আসবে মুস্তাফিকে।

মুস্তাফি কপাল চাপড়াচ্ছে,— কে আমাকে এমন বাঁশটা দিল বলো তো কন্দর্প ?

কন্দর্প মাথা চুলকোল,— হবে আপনার কোনও বিজনেস রাইভাল।

—ব্যবসার রাইভালরা কেউ এভাবে কাঠি দেয় না। কেউই তো আর সতীসাবিত্রী নয়, সকলের কাপড়ে ফুটোফাটা আছে। দিস মাস্ট বি সামওয়ান এলস।

—কিন্তু আপনি খবরটা পেলেন কোত্থেকে ?

—ওদের অফিসে আমার লোক নেই ! মুস্তাফি মুখ ভেংচাল,— যারা সব মাসকাবারি খাম নিয়ে যায়, তারা কি গাব জাল দিতে বসে আছে !

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুস্তাফিকে দেখে একটু মজা পাচ্ছিল কন্দর্প। বিজ্ঞের মতো বলল,— বাঘের ঘরে আপনি ঘোগের বাসা করে রেখেছেন, তেমন হয়তো আপনার ঘরেও বাঘ ঘাপটি মেরে আছে।

মুস্তাফির চোখ ছুন্নি গুলির মতো হয়ে গেল,— মানে ?

—আপনার অফিসেরই কেউ হয়তো ইনফরমেশন পাস করেছে।

—ফুট, তুমি একটা ছাগল। লো পয়েন্টে চলা অফিসঘরের এসিটা বেয়ারাকে ডেকে বাড়িয়ে দিতে বলল মুস্তাফি। সিগারেট ধরাল,— আজ আমার কোম্পানিতে তালা ঝুললে ওরা খাবে কী ?

কোন এনফোর্সমেন্ট ইনকামট্যাক্সবাবারা অন্ন দেবে ?

—তা ঠিক। কন্দর্প মাথা নাড়ল,— আপনি আপনার সেফগার্ডগুলো রেডি করুন।

—সে তো করবই। আজ সন্ধেবেলা আমার কনসালটেন্টের সঙ্গে বসছি। কিন্তু...

—কিন্তু কি ?

—কিছু টাকা তো আমাকে হোয়াইট করতেই হবে। এ বিষয়ে আমি কি তোমার হেলপ পেতে পারি ? সাপোজ আমি তোমায় কিছু টাকা ক্যাশ দিলাম, তুমি সেগুলো তোমার অ্যাকাউন্টে জমা করে আমায় কটা চেক দিয়ে দিলে...

—কত টাকার ?

—এই ধরো, পাঁচ-সাত লাখ। তোমার মতো আরও কয়েকজনকে আমি ধরছি... তারাও কিছু কিছু এইভাবে...

—আমি অত টাকা কী করে দেখাব ? কন্দর্প আঁতকে উঠল,— আমাকেও তো ইনকাম ট্যাক্স...

—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পনেরো-বিশটা ফিকটিশাস প্রোডিউসার তোমাকে ফিলমের জন্য অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দেবে। তার জন্য যা ট্যাক্স লাগে, আই শ্যাল বেয়ার।

—কিন্তু আমার চেক দেওয়াটা কি ইনকাম ট্যাক্স মানবে ?

—ওদের চোদ্দপুরুষ মানবে। মুস্তাফি ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল,— আমি তো ফিলম প্রোডিউস করার জন্য তোমার কাছ থেকে লোন নিচ্ছি কন্দর্পভাই।

প্যাঁচটা কন্দর্পর মাথায় ঢুকছিল না। মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। বিপদের গন্ধও যেন পাওয়া যায় আবছা।

মুস্তাফি সিগারেট নেবাল,— তা হলে তুমি এগ্রি করছ ? আমি তাহলে পেপার তৈরি করতে বলি ?

থতমত মুখে কন্দর্প বলল,— কিসের পেপার ?

—আরে বাবা, কোনও প্রোডিউসারের কাছ থেকে তুমি কোন ছবির জন্য কত টাকা নিচ্ছ, তার একটা লিখিত-পড়িত ডকুমেন্ট থাকবে না ?

কন্দর্পকে আর প্রশ্ন করার অবকাশ না দিয়ে উঠে গেল মুস্তাফি। হলঘরে গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলছে, কন্দর্প উঁকি মেরে দেখল। বড়বাবু হাসি হাসি মুখে তাকাচ্ছে এদিকে, ঘন ঘন ঘাড় নাড়ছে। এ কী গেরোয় পড়া গেল রে বাবা! কতদিন পথে গাড়িটা বেগড়বাই করে, আজ কোথাও একটা বেমক্কা খারাপ হয়ে গেল না কেন! এখান থেকে এখন পালানো যায় না! জানলা দিয়ে ঝাঁপ মারবে! রেনপাইপ বেয়ে নেমে যাবে!

ধুস, ওসব কাজ তো স্টান্টম্যানরা করে! সে এখন নায়ক, তার কি সে ক্ষমতা আছে!

মুস্তাফি ফিরে এসেছে। চেয়ারে বসতে বসতে বলল,— ঠাণ্ডা খাবে ?

কন্দর্প দীর্ঘশ্বাস ফেলল,— বলুন।

বেল বাজিয়ে হুকুম জারি করে দিল মুস্তাফি। রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে ছোট্ট পাক খেয়ে মা কালীর ছবির দিকে তাকিয়ে রইল করুণ মুখে। ম্রিয়মাণ স্বরে বলল,— বড় ঝামেলায় ফেঁসে গেছি গো। সব দিকে ঝঞ্ঝাট, সব দিকে ঝঞ্ঝাট। কাল-পরশুই দিল্লির গভর্নমেন্ট ফল করবে, আবার ডামাডোলের বাজার শুরু হয়ে যাবে। ভাবতে পারো, রেলে আমার কত টাকা বাকি ? তেরো লাখ। শালা মিনিস্টার বদলাক ঠিক আছে, মিনিস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যুরোক্র্যাটগুলোও বদলে যায়...

—তাতে আপনার কী ? সবাই তো টাকা খায়। কন্দর্প একটু তেতো স্বরে বলল।

—খায়, নিশ্চয়ই খায়। যারা খায় না মন্ত্রীরা তাদের ধারেকাছে রাখে না। মুস্তাফি ঘুরে কন্দর্পর মুখোমুখি হল;— বাট দা প্রবলেম ইজ নতুন মানুষ মানেই আবার নতুন করে চ্যানেল তৈরি করো। কে টাকা নেবে, কে কন্টিনেন্ট ঘুরবে, কে মেয়েছেলে চাইবে... ডিসগাসটিং।

—দ্যান কেন ? কন্দর্প সাহস করে বলে ফেলল,— অনেক তো কামালেন, এখন বাকি জীবনটা

শান্তিমতো এনজয় করুন না। এ সবের মধ্যে আর নাই বা রইলেন।

—পুড়কি মারছ ?

—ছি ছি, আমি আপনার ছোট ভাই। জাস্ট বলছিলাম।

মুস্তাফির মুখটা একটু যেন অন্যরকম হয়ে গেল। কেমন যেন উদাসীন, দূরমনস্ক। চেনা মুস্তাফির মধ্যে একটা অচেনা মুস্তাফি যেন ভেসে উঠল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে মিলিয়েও গেল। হাসি হাসি মুখে বলল,— এসব কথা আটার কোরো না কন্দর্প, মনটা দুর্বল হয়ে যায়। তোমার কী ধারণা টাকা রোজগার আমাকে এখন কোনও নতুন সুখ দিতে পারে ? না। পারে না। বাট স্টিল আই হ্যাভ টু রান ফর মানি। আমাকে টাকা অ্যাকোয়্যার করতে হবে, টাকা বাড়াতে হবে, প্রয়োজন হলে টাকা লুঠ করতে হবে। এটা আমার প্যাশান। বেঁচে থাকার অবলম্বন। তোমার যেমন অভিনয়।

জীবনে প্রথম মুস্তাফির জন্য ঈষৎ করুণা হল কন্দর্পর। মুস্তাফি যেন নিজের অলকাপুরীতে আটকে পড়া যক্ষরাজ।

মুস্তাফিকে একটু হালকা করতে চাইল কন্দর্প। বলল,— আমি সে কথা বলছি না অশোকদা। আপনার মতো কর্মী মানুষ কজন আছে !

—বলছ ?

—বলছিই তো। এই সব রেড-ফেড আপনার করবেটা কী ? আপনার মেজর টাকা তো শেয়ারে খাটছে, বড়বাজারে ঘুরছে...

—সেখানেও তো টালমাটাল, তাই না চিন্তা। কী সব তোমরা রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ নিয়ে গোল পাকাচ্ছ, আর হুড়কো যাচ্ছে আমাদের। আরে বাবা, থাক না, সবই থাক। আমরাও একটু শান্তিতে...ওই যে তোমার ইউ পি মহারাষ্ট্রে কারফিউ হয়ে বসে আছে, তার এফেক্ট তো শেয়ার মার্কেটেও পড়ে, না কি ? তারপর ধরো গভর্নমেন্ট পড়ে গেলে যদি মিডটার্ম ইলেকশানই হয়, কেমন গভর্নমেন্ট আসবে নো ওয়ান ক্যান সে। তিনঠেঙে, না পাঁচঠেঙে, না চারঠেঙে, না দুঠেঙে... ! বলতে বলতে মুস্তাফি থামল, ধুস, ভাললাগে না। কনখলে একটা বাড়ি করে নদীর পাড়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকব। সেই ভাল।

কন্দর্প মুচকি হাসল,— আপনি তো আমার দাদার মতো কথা বলছেন।

—মানে ?

কোল্ড ড্রিঙ্কস-এ টান দিতে দিতে আদিত্যর অভিলাষটা ব্যক্ত করল কন্দর্প। মন দিয়ে শুনল মুস্তাফি। ঘাড় দোলাচ্ছে,— তোমার দাদাই জীবনের সার বুঝতে পেরেছে হে। দুনিয়ায় কেউ কারও নয়। হঠাৎ গলা নামাল মুস্তাফি,— ইন ফ্যাক্ট নিকটজনেরাই হল রিয়েল বাম্বু।

কন্দর্প আহত গলায় বলল,— আমরা দাদাকে বাম্বু দিই !

—তুৎ, সেই ছাগলের মতো কথা। আই অ্যাম টকিং অ্যাবাউট মাইসেলফ। আই ডাউট, এই রেড-ফেডের চক্করটার পেছনে আমার সাহেবজাদাই আছে।

—যাহ্, বাবুরাম এসব করতে যাবে কেন ?

—খারে। ছেলেই হল বাবার সব থেকে বড় শত্রু। তুমি মোগল হিস্ট্রি পড়নি ? ছেলের জন্যই বাবা সম্পদ বানায়, সেই ছেলেই বাবার বুকে ছুরি মারে। ক'দিন ধরেই মাকে খুব শাসাচ্ছিল বাবুরাম। দেখে নেবে। মালের দোকানটা করতে পারল না তো, শুয়োরের বাচ্চা তাই খেপে ষাঁড় হয়ে গেছে। বাট আই অ্যাম হিজ ফাদার। ও যদি হারামজাদা হয়, আমি সেই হারামজাদার বাপ। দুখানা লোক লাগিয়ে দিয়েছি বাবুরামের পেছনে। টোয়েন্টিফোর আওয়ারস ওরা তাকে কুকুরের মতো শ্যাডো করছে। কার সঙ্গে কি কথা বলে, কোথায় যায়...

কন্দর্প বিস্ফারিত চোখে মুস্তাফিকে দেখছিল। লোকটা দেবতা, না দানব, না মানুষ !

মুস্তাফি হাসছে,— বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তো ? আরে ব্রাদার, ছেলেকে যখন সন্দেহ করছি, অবশ্যই কিছু ডেফিনিট প্রুফ আমার আছে। অনেকগুলো সিক্রেট ডকুমেন্ট বাড়ি থেকে মিসিং। ওই

ফিনান্স কোম্পানিরই। আমার ছেলে ছাড়া আমার বাড়ি থেকে ওই সব পেপার কে সরাতে পারে ?

কাগজপত্র এসে গেছে। টাইপ করা, রেভিনিউ স্ট্যাম্প লাগানো। কন্দর্প পড়ল না কিছু, সই করে দিল। একটু বুঝি কাঁপছিল আঙুল, ঘামছিল।

কাগজের তাড়া ড্রয়ারে রাখল মুস্তাফি। পেশাদারি ভঙ্গিতে বলল,— তোমার কোনও ভয় নেই কন্দর্প। আমি অ্যাসিওর করছি তুমি কোনও মেজর বিপদ বা কেলেঙ্কারিতে জড়াবে না। ইফ আই ফাইন্ড এনিথিং রং, সমস্ত ফিনান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি আমি নিয়ে নেব। ওয়ার্ড অব অনার। কাল সকালে তোমার কাছে টাকা পৌঁছে যাবে, তুমি প্লিজ চেকটা দিয়ে দিয়ো।

পথে বেরিয়ে মেজাজটা আরও খিঁচড়ে গেল কন্দর্পর। কাগজগুলো যদি কুচি কুচি করে উঠে আসত, কী করতে পারত অশোকদা ? ছবিতে চান্স দেবে না ? বয়েই গেল। ফ্ল্যাট নিয়ে কিছু বখেড়া করবে ? অত সহজ নয়। মেজদা আছে, বউদি আছে, পাকা এগ্রিমেন্ট আছে, ওখানে মুস্তাফির নড়াচড়া করার জায়গা নেই। বড় জোর দু-চার মাস দেরি করতে পারে। তাতেও মুস্তাফিরই লোকসান বেশি। তবু...

ওই তবুটাই তো কন্দর্প।

স্টিয়ারিং-এ আলগা হাত পড়ে আছে, চলছে গাড়ি। শেষ বিকেলে থইথই করছে রাস্তাঘাট, পশ্চিম আকাশে বিচ্ছুরিত হচ্ছে গোলাপি আভা। পার্ক স্ট্রিটের মোড় জ্যাম-জমাট, শয়ে শয়ে গাড়ি খোঁয়াড়ে আটকানো পশুর মতো ছটফট করছে। একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট, গোটা তিন-চার কনস্টেবল ছোটাছুটি করছে রাস্তায়। আলো কমছে ক্রমশ।

কন্দর্প স্যাস ক্লিনিকে পৌঁছল ছটার পর, তখন সন্ধে নেমে গেছে। মধুমিতা প্রতীক্ষাতেই ছিল। বলল,— আমি কিন্তু আর একটু দেখেই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

—সরি। যা জ্যাম। কন্দর্প দরজা খুলে দিল,— এসো।

ইতালিয়ান ফিয়াট সুছন্দে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পার হল। বাইপাস কানেক্টারের দিকে এগোচ্ছে। চারদিন পর দেখা হল, কত কথা জমে আছে। কিন্তু কি কথা ? দুজনের কারুরই যেন মনে পড়ে না। নিশ্চুপ চলতে থাকে গাড়ি।

কন্দর্পর বুকে চিড়িক চিড়িক করছে মুস্তাফি। চাপা কিরকিরে ভাব নীলচে শিখা হয়ে দপদপ করছে মাথায়। মুস্তাফিকে ভুলতে চাইল কন্দর্প। অনুচ্চ স্বরে ডাকল,— মিতা ?

—উঁ ?

—কী ভাবছ ?

—ভাবছি না তো। বাড়ি ফিরছি।

—ভাইফোঁটার দিন তোমার দাদা এসেছিল ?

—হুঁ।

—কথা হল কিছু ? বললে ?

—নাহ্।

—কেন বলোনি ?

মধুমিতা নিরুত্তর। নীল শিফনের কোণ পাকাচ্ছে আঙুলে।

আঁধার দিনের তাপ শুষে নিয়েছে। এখন কীটপতঙ্গ আর ফুলেদের জেগে ওঠার সময়।

কন্দর্প জোরে শ্বাস নিল,— মা'র সঙ্গে কিছু কথা হয়েছে ?

—না।

—কেন না ? কন্দর্প সামান্য অসহিষ্ণু হল,— তোমার ব্যাপারখানা কী বলো তো ? তুমি কী চাও ?

—রোজ বলতে হবে ?

—তাহলে তুমি মা দাদার সঙ্গে কথা বলছ না কেন ?

—বলব।

—কিন্তু কবে ? আর কবে ?

মধুমিতা আবার নিরুত্তর।

চার নম্বর পুল পার হল গাড়ি। নীচ দিয়ে একটা ট্রেন ঝঙ্কার তুলে ছুটে গেল।

কন্দর্প গোমড়া মুখে বলল,— তুমি কি এখনও ডিসিশান নিতে পারছ না ?

—তাই বলেছি ?

—মউকে নিয়ে কোনও প্রবলেম হচ্ছে ? আমি তো বলেছি মউকে আমি লিগালি অ্যাডপ্ট করে নেব। মউ এখন আমার মেয়ে।

দু পাশে ফাঁকা ফাঁকা জমি। এদিকটায় আলো কম, চাপ চাপ কুয়াশায় অন্ধকারে সাদা সাদা ছোপ।

আর একটা কি যেন প্রশ্ন পাক খেয়ে চলে কন্দর্পর মাথায়। কন্দর্প হাতড়াতে থাকে, কুয়াশার দিকে তাকায় বারবার। খুঁজে না পেয়ে অন্য প্রশ্ন করে,— আমাকে একটা কথার উত্তর দেবে মিতা ? তোমার মা দাদার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে কি তুমি...

—প্রশ্নই ওঠে না। মধুমিতার রিনরিনে স্বর চুড়ির আওয়াজের মতো শোনায়,— আমার জীবন আমারই জীবন। অন্যের ফালতু খবরদারি আমি মানব কেন ?

—তাহলে তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলছ না কেন ? আবার কেনই বা বলো তাদের না বলে কিছু করবে না ?

উত্তর দেয় না মধুমিতা। কি যেন ভাবে। কি যেন একটা কথা আসি আসি করেও আটকে যায়। এ নারীর রহস্যের কূলকিনারা পায় না কন্দর্প। নিজেদের ভবিষ্যৎ তারা স্থির করে ফেলেছে, তবু যেন সবই ঘোর অনিশ্চিত। মাঝে একবার রেজিস্ট্রি করার কথা তুলেছিল কন্দর্প, মধুমিতা সম্মত হয়নি। শুধু বলে, তাড়া কিসের! একটা একটা করে যে দিন চলে যায়, প্রতিদিনই তিল তিল কমে যায় আয়ু, এ কথা কি মধুমিতা বোঝে না ?

গাড়ি বাইপাসে ঢুকে পড়েছে। দু পাশের উগ্র দুর্গন্ধ হঠাৎ হঠাৎ ঝাপটা মারে নাকে। পথের দু ধারে সদ্য ফোটা ফুলকপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়ে পুরুষ, ছায়া ছায়া। হেডলাইট জ্বেলে তীব্র গতিতে পাশ দিয়ে ছুটে যায় গাড়ি। পুব আকাশে চাঁদ উঠেছে। ডোঙা নৌকোর মতো ভাসছে চতুর্থীর চাঁদ। হিম পড়ছিল।

গাড়ি একটা ছোট্ট ব্রিজ পার হল। বাঁক নিয়ে ছুটছে সোঁ সোঁ। আলোকিত এক চৌরাস্তার মোড়ে এসে থেমে গেল। পুলিশ পথ আটকেছে। কোনও ভি আই পি বোধহয় ঢুকবেন সল্ট লেকে। পর পর গাড়ি দাঁড়াতে দাঁড়াতে ক্রমশ যানের মিছিল হয়ে গেল।

কন্দর্প নিরাশ মুখে সিগারেট ধরাল। মধুমিতা আচ্ছন্ন করে আছে মন, তবু মুস্তাফিও মাঝে মাঝে চোরা উঁকি দেয়। কাল সকালে অশোকদার লোক আসবে, টাকাটা যদি তখনই ফেরত পাঠিয়ে দেয় কন্দর্প! অত লাখ লাখ টাকা দেখলে বউদিই বা কী ভাববে! উঁহু, বউদি তখন থাকবে না। কিন্তু তিতির, কিংবা দাদা...! কন্দর্প জোরে জোরে সিগারেটে টান দিল। মধুমিতার দ্বন্দ্বটা কোথায় ? কন্দর্পে অনাস্থা! তবে কেন...! অশোকদা ডাহা মিথ্যে বলল না তো! হয়তো কোনও একটা জটিল দুষ্কর্ম করিয়ে বেঁধে রাখছে কন্দর্পকে! মধুমিতার সঙ্গে পরামর্শ করবে ? মেয়েদের বাস্তববুদ্ধি অনেক প্রখর হয়।

কন্দর্প মধুমিতার দিকে ঘাড় ঘোরাল। কথা বলতে গিয়ে বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে। মধুমিতার আঁখি দুটি বোজা, জোর জোর শ্বাস নিচ্ছে। মধুমিতার ঠাণ্ডার ধাত। জানলার কাচ আধখানা তোলা, থেমে থাকা গাড়ির অন্দর ভরে গেছে পোড়া তামাকের ধোঁয়ায়। হাঁ করে যেন ধোঁয়া গিলছে মধুমিতা। দৃশ্যটা কী অপার্থিব! কে এই নারী!

কন্দর্প অস্ফুটে আবৃত্তি করে উঠল,— এ যেন নিশিডাক, মৃতের হাতছানি/ এ যেন কুহকের

অজানা বীজ/ এমন মোহময় কিছুই কিছু নয়/ হৃদয় খুঁড়ে তোলা মায়া-খনিজ।

মধুমিতা ফিসফিস করে বলল,— কিছু বলছ ?

কন্দর্পর স্বর প্রায় শোনা গেল না,— তুমি ধোঁয়া খাচ্ছ কেন মিতা ?

মধুমিতা আরও জোরে নিশ্বাস নিল,— ভাল লাগছে।

কন্দর্প মধুমিতার মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়ল,— পাগলি। ধোঁয়া কি আদর ?

—আদরই তো। মধুমিতা চোখ বুজেই হাসল,— তুমি ঠিক দীপঙ্করের মতন। দীপঙ্করও এভাবেই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে দিত। কী ভাল যে লাগত !

কন্দর্পর মধ্যে দীপঙ্করকেই খুঁজছে মধুমিতা ! তবে যে... ! তবে যে... !

৮১

খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে বিছানায় শুয়ে চিঠিটা পড়ছিলেন শিবসুন্দর। কমলেশের চিঠি, সকালের ডাকে এসেছে। শিবসুন্দরকে একবার জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন কমলেশ। শুধু শিবসুন্দরের জন্যই দোতলায় একটা ঘর তুলে ফেলেছেন, শিবসুন্দর পা রাখলে তবেই নাকি সে নির্মাণ সার্থক হবে। স্মৃতিকণাকে নিয়ে এ বছর আর দক্ষিণবঙ্গে নামা হবে না কমলেশের, স্ত্রীর বাতের ব্যথা বেড়েছে খুব। শিবসুন্দরের শেখানো ব্যায়ামগুলো আর নাকি তেমন কাজ করছে না, এক বৃদ্ধ কবিরাজের সন্ধান পেয়েছেন মাটিগাড়ায়, স্মৃতিকণা এখন তাঁরই চিকিৎসাধীন। একটাই আশার কথা, স্মৃতিকণা নাকি ঈষৎ কৃশ হয়েছেন, এখন তাঁর ঢলঢলে মুখের লাবণী দেখে শিবসুন্দর নিশ্চয়ই মোহিত হয়ে যাবেন ! চিঠির শেষে ছোট মেয়ে-জামাইকে নিয়ে একটু অভিমানও প্রকাশ করেছেন কমলেশ। অপারেশানের পর ছন্দাকে বার বার লিখেছিলেন ক'দিন এসে থেকে যাওয়ার জন্য, এল না ছন্দা। বড় মেয়ে-জামাই তবু আসে মাঝে মাঝে, ছোট জামাই নৈব নৈব চ। শেষবার সেই এসেছিল.....। ওড়িশায় বেড়াতে গেল দুটিতে, জলপাইগুড়িতেও তো আসতে পারত। কমলেশের বহুকালের সাধ দুই মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনি বেয়াই-বেয়ান সবাইকে একত্রে জলপাইগুড়িতে পাওয়া, আর কি এ জীবনে পূর্ণ হবে সে সাধ !

এরকমই অজস্র আক্ষেপোক্তিতে ভরা চিঠি। পড়তে পড়তে হাসিখুশি প্রাণখোলা মানুষটার জন্য মায়া হচ্ছিল শিবসুন্দরের। মায়া, নাকি অনুকম্পা ? কমলেশ বোঝেন না এ পৃথিবীতে কারুর জন্য প্রতীক্ষা করে থেকে লাভ নেই, প্রতিটি মানুষকেই নিজের জীবন নিজেকেই যাপন করতে হয়। নিজেকেই খুঁজে নিতে হয় সুখটুকু, দুঃখকে মেনে নিতে হয়। এখন কমলেশ কর্মহীন জীবন কাটান বলেই কি একাকিত্বের বেদনাটা বেশি বাজে বুকে ? চিনে বুড়োরা নাকি মহল্লা পরিষ্কার করা, নাগরিকদের সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য দেখা, স্বাস্থ্যবিধির দিকে কড়া নজর রাখা, এইসব কাজ করে দল বেঁধে। তেমন একটা কিছু গড়ে নিতে পারেন না কমলেশ ?

শিবসুন্দর ক্ষণিকের জন্য ভাবলেন এই উপদেশটা পাঠালে কেমন হয়, পরক্ষণে ঝেড়ে ফেললেন চিন্তাটা। উপদেশ দান, নীতিবাক্য শোনানো, পরামর্শ দেওয়া, এসব তাঁর ধাতে সয় না। তবু কমলেশের জন্য একটু কষ্ট বুঝি রয়েই যায়। পিনপিন করে বুকে। ঠিক দুঃখও নয়, এক ধরনের সমবেদনা। ছোট মেয়ে-জামাই-এর বিবাহিত জীবন যে তেমন সুখের নয়, এ কথা কি কমলেশের অজানা ? বোধহয় না। তাই হয়তো চিঠি জুড়ে এত অভিমান, এত অভিযোগ।

কার্তিক মাসের আর কটা দিন বাকি। দুপুরের বাতাসেও তেমন তাপ নেই, পাখার হাওয়ায় একটু শীত শীত করে। বিছানা থেকে উঠে পাখা দু পয়েন্ট কমিয়ে দিলেন শিবসুন্দর। পাশে মনোরমা সামান্য গুটিয়ে ঘুমোচ্ছেন, পাতলা একটা চাদর টেনে দিলেন স্ত্রীর গায়ে। পুজোর পর হঠাৎ সুগার আবার চড়ে গিয়েছিল মনোরমার, অ্যাটাক যে হয়নি এটাই ভাগ্য। শরীরের মেটাবলিজম নষ্ট হয়ে গেছে, এখন থেকে এটা বোধহয় আরও ঘন ঘন হবে। সুগার অবশ্য নামানো গেছে, তবে মনোরমার

ঘুম বেড়েছে খুব। বিকেলে বারান্দায় বসিয়ে দিলেও ঢুলে ঢুলে পড়ে। গত সপ্তাহে ছোট্ট একটা বেডসোর মতন দেখা দিয়েছিল কোমরে, বারে বারে প্রলেপ লাগিয়ে সারিয়েছেন শিবসুন্দর। এই শয্যাক্ষত অসুখটিকে শিবসুন্দরের বড় ভয়, সতর্ক থেকেছেন চিরদিন। কী করে যে হঠাৎ এমনটি হল !

বিছানায় ফিরে শিবসুন্দর চোখ বুজলেন। কমলেশের চিঠি তাঁকে টানছে অল্প অল্প। বহুকাল উত্তরবঙ্গে যাওয়া হয় না, প্রায় ষোলো বছর। এখনও সেখানকার মাটি গাছপালা জঙ্গল বাড়িঘরদোর সবেরই স্মৃতি বড় উজ্জ্বল। উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গাই তাঁর ঘোরা। কর্ম উপলক্ষে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কুচবিহার....। তুফানগঞ্জ তাঁকে এক সন্তান উপহার দিয়েছে, বালুরঘাট পুত্রবধূ, সেই সূত্রে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তাঁর যেন নাড়ির যোগ। একবার তো ভেবেও ছিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি কোথাও সেটল্‌ই করে যাবেন পাকাপাকি। হঠাৎ পুরনো ভিটেটার কথা মনে না পড়ে গেলে হয়তো এখন তিনি....। কী সুন্দর আকাশ ছিল উত্তরবঙ্গে, এখানকার থেকেও যেন অনেক বেশি নীল। এক দিকে কালচে ধোঁয়ার মতো দিগন্ত ব্যেপে হিমালয়, শীতের টোকায় বাদামি শালপাতা ঝরে ঝরে পড়ছে, বিছিয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়, ইউক্যালিপটাসের সরু পাতা শব্দ বাজাচ্ছে ঝুম ঝুম, কালো কালো মাটি, সবুজ ভেলভেটের মতো চা বাগান, আকাশছোঁয়া চিরহরিৎ বৃক্ষের মিছিল, তামাকের ক্ষেত, চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা টিনের চালঅলা ঘরবাড়ি......নাহ্‌, ওখানকার সৌন্দর্যই আলাদা। কী দাপট ছিল বৃষ্টির ! কত নদী, কত নদী ! মানসাই কালজানি তিস্তা তোর্সা মহানন্দা জলঢাকা—সকলেই উচ্ছল, সকলেই চঞ্চল।.....দুর, এই বাড়িঘর ফেলে শিবসুন্দরের এখন ছোটার উপায় কোথায় ! এই নস্টালজিয়াও খুব ভাল কথা নয়, স্মৃতি রোমন্থন বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করে। বেঁচে থাক বাবা শিবসুন্দরের মাধবপুরের রুগীরা, বেঁচে থাক এই সুস্থিত গৃহকোণ।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল শিবসুন্দরের। রোজই আসে। ঘণ্টা খানেকের মতো। আজ বরাদ্দটা পুরো হল না, টুকির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

—দাদু, ও দাদু....দাদু গো.....

চোখ রগড়ে উঠে বসলেন শিবসুন্দর,— কী হল ? ঠেলছিস কেন ?

—আমার এরোপ্লেনটা ভেঙে গেল।

—সেকি ! কী করে ?

—জানি না। আমার এরোপ্লেন আর উড়ছে না। টুকির চোখ ছলছল।

আবিষ্ট চোখে টুকিকে দেখছিলেন শিবসুন্দর। হেমন্তের নরম বিকেলে ঘুম ভেঙেই ওই কোমল মুখখানা, তাতে আবার বিষাদের আভাস, এ যে কী মধুর ! বড্ড মিষ্টি দেখতে হয়েছে টুকি। চ্যাপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখে যেন জীবন্ত পুতুল। আবার এক নতুন মায়া, গাঢ় মায়া।

শিবসুন্দর টুকির চুল ঘেঁটে দিলেন,— তোর বাবাকে গিয়ে বল না। সে তো অনেক খুটখাট জানে, ঠিক করে দেবে।

—বাবা নেই গো।

—গেল কোথায় এখন ?

—মায়াপিসিকে নিয়ে বেরোল।

কথাটা কানে লাগল শিবসুন্দরের। বললেন,— তুই আগে মায়ামাসি বলতিস না ?

—মা পিসি বলতে বলেছে।

শিবসুন্দরের ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটে উঠল। অলকার মধ্যেও এই ছেলেমানুষি কেন ! তুফানকে কি চেনে না অলকা ! নাকি গাঁ-গঞ্জের মুখরোচক আলোচনা এড়াতেই এই পন্থা !

উঠলেন শিবসুন্দর। সিঁড়ি দিয়ে নামছেন পায়ে পায়ে, টুকির হাত ধরে। টুকি সমানে আশঙ্কা প্রকাশ করে চলেছে,— দাদা খুব রেগে যাবে, না দাদু ?

—কেন ? ওটা তো তোর জিনিস।

—বারে, দাদা দিয়েছে না !

—দিয়ে দেওয়ার পরে এখন তো তোর।

—দাদা বলেছিল, তুই দশটা দিনও জিনিসটা টেকাতে পারবি নারে টুকি। হাত নেড়ে নেড়ে টুকি বলছে,— দাদার কথাটাই ফলে গেল।

উঁউহ্, পাকা বুড়ি। নাতনির গালে আলগা চিমটি কাটলেন শিবসুন্দর,— তা ক'দিন টেকাতে পারলি ?

—দাদা এসেছিল সোমবার। আঙুলের কড় গুনছে টুকি। এক থেকে একশো মুখস্থ আছে তার, অলকা ছোটখাট যোগবিয়োগও শেখাচ্ছে তাকে, এখন দাদুর কাছে তার অঙ্ক পরীক্ষা।

দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসলেন শিবসুন্দর,— হিসেব পারছিস না তো ? আট দিন। .....দে, যন্তরটা দে। আমিই এর চোদ্দটা বাজাই।

দৌড়ে ঘর থেকে খেলনাটা নিয়ে এসেছে টুকি। মিনি উড়োজাহাজটা নাড়াচাড়া করছেন শিবসুন্দর। ভাইফোঁটার দিন হঠাৎ এবার টোটো এসে উপস্থিত, একা একাই। হাতে ওই মহার্ঘ খেলনা। ব্যাটারি চালিত। সুইচ টিপে ছেড়ে দিলেই সাঁ করে উড়ে যায় প্লেন, আট-দশ সেকেন্ড শূন্যে পাক খেয়ে ফিরে আসে স্বস্থানে। এরকমই প্লেন চেয়েছিল টুকি, ঠিক মনে ছিল টোটোর। একটু একটু যেন মাধবপুরের ওপর টান জন্মেছে টোটোর। বোনের ওপরেও। কলকাতার সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই নেই মাধবপুরে, তবু হুটহাট এখানে চলে আসে। একটা কি দুটো রাত থেকেই অবশ্য পালাই পালাই। তা যাক, টানটা তৈরি হয়েছে এটাই অনেক। শুভ আর ছন্দা তো সুতো ক্রমশ ঢিলে করে চলেছে।

শিবসুন্দর মাথা ঝাঁকালেন। এও তো কমলেশের মতো ভাবনা ! খেলনা উল্টে ব্যাটারিগুলো বার করে ফেললেন শিবসুন্দর,— তোর বাবার টর্চের ব্যাটারিগুলো নিয়ে আয় তো।

টুকি লাফিয়ে উঠে ঘরে গেল। চার সেলের আস্ত টর্চখানা ঘাড়ে করে হাজির।

—ধুস্, এ টর্চটা কেন, পেনসিল টর্চ নিয়ে আয়।

টুকির মুখ করুণ হয়ে গেল,— ওটা কোথায় আমি তো জানি না গো।

শিবসুন্দর উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন। সচরাচর তিনি তুফানদের ঘরে ঢোকেন না। অলকা বোধহয় আছে ঘরে, কাজকর্ম সেরে শুয়েছে। গলা খাঁকারি দিয়ে শিবসুন্দর বললেন,— তোর মাকে বল না, মা বার করে দেবে।

কাজ হল। অলকা কাঁধে আঁচল গোছাতে গোছাতে বেরিয়ে এসেছে। চোখ ছোট করে বলল,— নষ্ট করে ফেলেছে তো ? ওই অলবড্ডি মেয়ের হাতে কিচ্ছু দেওয়া উচিত নয়।

টুকি পিটপিট তাকাচ্ছে মা'র দিকে। দাদুর গা ঘেঁষে বসল।

শিবসুন্দর আলতো হাতে জড়ালেন টুকিকে,— ওকে বোকো না। ব্যাটারিটা বদলে দেখি।

চার ব্যাটারির খেলনা, দুটো পেনসিল টর্চ লাগল। লাগাতেই ম্যাজিক। মিনি উড়োজাহাজ আবার সচল। সোঁ করে উঠোনের দিকে উড়ে গেল, কামিনী ফুলের গাছটাকে ছুঁয়ে ফিরে এল দাওয়ায়। সিঁড়ির দিকে গেল, ছোট্ট একটা গোঁত্তা খেয়ে সোজা নেমে এল টুকির পায়ের ওপর। টুকি হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে কাঁচকলা দেখাচ্ছে মাকে। উড়ছে উড়োজাহাজ, উড়ছে উড়ছে, ফিরছে। দেখছেন শিবসুন্দর, দেখছে অলকা।

আনমনে অলকা বলল,— জিনিসটা ভারী অদ্ভুত, তাই না বাবা ?

—হুঁ।

—জাপানি জিনিস তো, বেশ মজবুতও আছে। কত ঠোক্কর খাচ্ছে, কিন্তু ভাঙছে না।

শিবসুন্দর শুনছিলেন না, অন্য কথা ভাবছিলেন। মানুষও যদি এই খেলনাটার মতো হত ! সুইচ টিপলেই উড়ে যেত যত্রতত্র, আবার আপনা-আপনি ফিরে আসত ঘরে ! প্রথম প্রথম ওই খেলনাটার মতো ফেরে হয়তো, ক্রমে ওড়াটাই নেশা হয়ে যায়। তখন সে হয় উড়তেই থাকে, নয়তো মুখ

থুবড়ে পড়ে থাকে এই দাওয়ায়। এর মাঝামাঝি কিছু নেই। কোন দশা হবে শুভর ?

অলকা রান্নাঘরের দিকে এগোল,— চা খাবেন বাবা ?

—এত তাড়াতাড়ি ? বেশ, করো।.....আমার চায়ে দুধ দিয়ো না।

ইদানীং দুধ-চা খাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন শিবসুন্দর। এক-আধবার অভ্যাসবশে পান করেন বটে, কিন্তু লিকারই এখন তাঁর বেশি পছন্দ। আমেজও আসে বেশ, অম্বলও কম হয়। হৃদ্‌যন্ত্রে মৃদুতম আঘাতও আর শিবসুন্দর চান না। ইদানীং জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র তৃষ্ণা বেড়েছে। মৃত্যুকে তিনি ভয় পান তা নয়, তবুও।

টুকি নতুন উদ্যমে উড়োজাহাজ নিয়ে মেতেছে উঠোনে। শিবসুন্দর সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে অল্প গলা ওঠালেন,— তুফান নাকি মায়ার সঙ্গে বেরিয়েছে ? গেল কোথায় ?

—রসপুর।

—হঠাৎ ?

—একটা বউয়ের হাসপাতালে সিজার হয়েছিল। স্টিচ পেকে গেছে, ডেকেছে মায়াকে।

মায়া আজকাল ছোটখাট এসব কাজে যায় এদিক সেদিক, কানে আসে শিবসুন্দরের। সরকারি নার্সদের এ ধরনের কাজে যাওয়ার নিয়মও নেই, প্রয়োজনও নেই, গ্রামসেবিকারাই এসব সামলে দিতে পারে। তবু যায় মায়া। রোজগার বাড়াচ্ছে।

শিবসুন্দর রুষ্ট মুখে বললেন,— তা তুফান সেখানে কী করবে ?

—আমিই মোপেডে নিয়ে যেতে বললাম। পথ তো অনেকটা।

—এমনকী দূর ! মায়ার কোয়ার্টার থেকে বড় জোর তো সাত-আট কিলোমিটার।

—তাই বা কম কি বাবা ? ওদিকটা রাস্তাও তো ভাল নয়।

শিবসুন্দর আরও রুষ্ট হলেন,— পার্টির যখন ঠেকা পার্টি নিজে ব্যবস্থা করত। তুফান মিছিমিছি মোপেডের তেল পোড়াবে কেন ?

অলকা উত্তর দিল না। চা এনে রেখেছে সামনে।

অলকার দিকে একবার দেখলেন শিবসুন্দর, মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অলকার অত মায়ার জন্য টেনে বলার কী আছে ! খুব সখীর জন্য দরদ, ওদিকে তো মাসি নয়, পিসি ! তুফানও ছাগলের ছাগল। অঞ্চলে যখন কথা ওঠে, ওই মেয়েকে পিঠে করে তোর সতেরো জায়গায় বেড়ানোর দরকার কী !

দাওয়ার কোণে দাঁড়িয়ে অলকা চা খাচ্ছে। প্লেটে ঢেলে চা খায় অলকা, একটু একটু শব্দ করে মুখে। কানে লাগে।

শিবসুন্দর সামান্য কড়া সুরে তাকে আদেশ করলেন,— ওপরে একবার তোমার মাকে দেখে এসো তো। যদি জেগে উঠে থাকেন চা দিয়ে দিয়ো।

—যাই বাবা।

—আর শোনো। যদি ঘুমিয়ে থাকেন তো পাশ ফিরিয়ে দিয়ো। অনেক কষ্ট করে সোর কমানো গেছে, নতুন করে আর যেন কিছু না হয়।

কাপ-ডিশ রেখে প্রায় দৌড়ে ওপরে উঠে গেল অলকা। তার গমনভঙ্গি দেখে রাগটা নিবে এল শিবসুন্দরের। কেন যে তুচ্ছ কারণে আজকাল স্নায়ুর নিয়ন্ত্রণ হারান ? তুফান তো অকারণেই তেল পোড়ায়, তেলের খোঁটাটা না দিলেই হত। ইদানীং প্রেশারের ওষুধ নিয়মিতই খাচ্ছেন তবু যেন খিটখিটে ভাব বেড়েই চলেছে। মায়ার কি উপকার তিনি করেছেন যে মায়াকে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন ? খুব খারাপ, ঘোরতর অন্যায়। উল্টে তাঁরই তো মেয়েটির কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সে এক সময়ে যেচে এ সংসারের হাঁড়ি ঠেলে গেছে। তখন তিনি খুব কাছ থেকে তো দেখেছিলেন মেয়েটিকে, মায়াকে কি খুব লোভী বলে মনে হয় ? মোটেই না। প্রত্যাশা হয়তো ছিল, কিন্তু.....। শুধু টাকার লোভে যে ছুটে ছুটে যাচ্ছে মায়া এ তো নাও হতে পারে। হয়তো নিজের নিরাপত্তা আরও দৃঢ় করার জন্য চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে মায়া। গাঁগঞ্জে এটাও

কাজে লাগে বইকি। ধীরে ধীরে মায়া এখানে নিজেকে অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছে, নয় কি? চলে যাওয়ার কথা বলে না আজকাল। শুভর নার্সিংহোমে চাকরির কথা তো নয়ই। কিন্তু সোমেনরা কি মায়াকে তিষ্ঠোতে দেবে? পুজোর মরসুম গেল, ওষুধ বিক্রি করে দেওয়া নিয়ে পরোক্ষ বিবাদটা এখন যেন ধামাচাপা পড়ে আছে, কোনওদিন ফুঁসে উঠলেই হল।

অলকা নেমেছে। রান্নাঘরে গেল না, উঠোনের তারে মেলা কাপড়-চোপড় তুলছে। মনো ওঠেনি নিশ্চয়ই। প্রশ্নটা তাই অলকাকে করলেন না শিবসুন্দর, পিছনের সবজিবাগানে নেমে গেলেন মন্থর পায়ে। কপি পালং কিছুই এখনও বোনেনি অলকা। জমি ঝুরো ঝুরো করা আছে, এবার বোধহয় চারা পুঁতবে। এত দেরিতে কেন? বেগুন নিয়ে তুফানকে সেদিন কি যেন বলছিল অলকা, এবার কি বেগুন ফলাবে? বেগুনের চারা পুঁতবে, না বীজ? কীভাবে ক্ষেতে বেগুনগাছ হয়? চারা থেকে, না বীজ থেকে?

আপন মনে হা হা হেসে উঠলেন শিবসুন্দর। মানুষের শরীরের কলকবজা ছাড়া আর কিছুই শেখা হল না জীবনে। তাই বা কতটুকু জানেন? প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে প্রতিনিয়ত দেখা মনোরমার মস্তিষ্কের রহস্যই ভেদ করতে পারলেন না এখনও। মনোরমার সামনে নিজেকে কখনও কখনও এত অসহায় মনে হয়। আরও কত জানতে হবে মানুষকে, আরও কত শিখতে হবে।

অলকার সবজিবাগান পেরিয়ে পিছনের পুকুরধারে এলেন শিবসুন্দর। বসতে গিয়েও বসলেন না, পাড় ধরে হাঁটছেন। অনেকটা ভরে আছে পুকুর, সবজেটে জল প্রায় স্থির এখন। না তো, কাঁপছে থির থির। ছোট ছোট অসংখ্য জাফরি দুলছে জলে। জলপোকারা হঠাৎ হঠাৎ রচনা করছে বৃত্ত, একটা জলজ সাপ এঁকেবেঁকে ভেসে গেল। আকাশের ছায়া পড়েছে পুকুরে, কিন্তু মেঘ নেই বলে কিছুই বোঝা যায় না। নিমগাছের ডাল থেকে একটা পাখি ডেকে উঠল। কি পাখি ওটা? ডাকটা যেন চেনা চেনা, অথচ চেনা নয়। কয়েক সেকেন্ড কান খাড়া করে রইলেন শিবসুন্দর। উঁহু, পাখিটা ভারী চালাক। তার নির্জন ডাক শুনবে একজন, সে চায় না বোধহয়। নারকেল গাছ থেকে একঝাঁক টিয়া শূন্যে তুলি বুলিয়ে কোথায় যেন উড়ে গেল। মাঝে মাঝে মৃদু আওয়াজ ছুটে আসছে একটা, টুকির উড়োজাহাজের। ওই ধ্বনিটুকুই যা নিসর্গশোভার ছন্দপতন।

এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে কারুর কি মন চায়!

অলকা খিড়কির দরজায় এসেছে,— বাবা, ও বাবা....

শিবসুন্দর ঘুরে তাকালেন।

—দিবাকরবাবু এসেছেন। সঙ্গে আর এক জন লোক।

এমন অসময়ে দিবাকরের হানা! শিবসুন্দর ভুরু কুঁচকোলেন,— বসতে বলো। আসছি।

চেম্বারের সামনের বেঞ্চিতে বসে আছে দিবাকররা। শিবসুন্দরকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল,— একটু বিরক্ত করতে এলাম ডাক্তারবাবু।

ভুরুর ভাঁজ এখনও মেলায়নি শিবসুন্দরের। বললেন,— কী ব্যাপার বলো।

—জানি আপনি বিকেলে চেম্বার করেন না....এই আমার পিসির দেওরপো পরশু এসেছে, কাটোয়া থেকে। এসেই ধুম জ্বর। চলে যাবে বলে জোরাজুরি করছিল। আমি বললাম,— না, ডাক্তারবাবুকে না দেখিয়ে আমি ছাড়ব না।

সঙ্গীটিকে ভাল করে নজর করলেন শিবসুন্দর। বয়স বেশি নয়, বছর পঁচিশ। মুখ লাল হয়ে আছে ছেলেটার, চাপা নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে বোঝা যায়।

ইচ্ছে হলে শিবসুন্দর এদের সরাসরি ভাগিয়ে দিতে পারেন। দিবাকর তাঁর নামে আড়ালে অনেক নিন্দামন্দ করে। পুকুরটা লিজ চেয়েছিল, পায়নি বলে ভারী তেতে ছিল কিছুকাল। রাস্তায় দেখা হলে অন্যমনস্ক মুখে হেঁটে যেত। ইদানীং ব্যবহার বদলেছে, সামনা-সামনি মাথা নোয়ায়। আজ পিসির দেওরপোকে ভাগিয়ে দিলে কাল থেকে আবার কুচ্ছো গাওয়া শুরু হয়ে যাবে। রাজনীতির লোক, এরা সাপেরও বেহদ্দ। তাছাড়া ছেলেটা ধুঁকছে.....

শিবসুন্দর হাঁক পাড়লেন,— অলকা, স্টেথোটা দিয়ে যাও তো। সঙ্গে আমার টর্চটাও।

স্টেথো আসার আগেই ছেলেটাকে নিয়ে পড়লেন শিবসুন্দর। নাড়ি পরীক্ষা করলেন। জ্বর ভালই আছে, দুই-টুই হবে। গলার গ্ল্যান্ড দুটো দেখলেন টিপে টিপে। ফুলেছে বেশ, জিজ্ঞাসা করলেন,— কাশি আছে ?

দিবাকর বলে উঠল,— তেমন নয়।

—ঠাণ্ডা লেগেছে। ওষুধ-টোষুধ খাওয়া হয়েছে কিছু ?

—আজ্ঞে না ডাক্তারবাবু। এবারও দিবাকরের উত্তর,— ওরা হোমিওপ্যাথির ভক্ত। ট্যাবলেট দিতে চেয়েছিলাম, খায়নি।

—তাহলে আমার কাছে আসা কেন ? আমার ওষুধও তো খাবে না।

—সে আমি ঘেঁটি ধরে খাওয়াব। আপনার ওষুধ না খাওয়া মানে মাধবপুরকে অসম্মান করা। সে আমি সইব কেন ?

তেল মারা কথাবার্তা ! শিবসুন্দর মৃদু ধমক দিলেন,— এই, তুমি চুপ করো তো। রুগী কে, অ্যাঁ ?

দিবাকর থতমত খেয়ে থেমে গেল।

স্টেথো এসে গেছে। বুক পিঠ দেখে নিলেন শিবসুন্দর। টর্চ জ্বেলে দু চোখের কোনা দেখলেন, হাঁ করিয়ে ফ্যারিঙস্। যা ভেবেছেন তাই। সিজন চেঞ্জের জ্বর।

চেম্বার খুলে চেয়ারে বসেছেন শিবসুন্দর। প্রেসক্রিপশান লিখছেন। দিবাকর বেশিক্ষণ চুপ থাকতে জানে না। গলা ঝেড়ে বলল,— আজ দুপুরের খবরটা শুনেছেন ডাক্তারবাবু ?

—কেউ মারা-টারা গেল নাকি ?

—এমন অফসিজনে কেউ মারা যায় ? মরবে তো সব শীতে, পটাপট লাইন পড়ে যাবে। দিবাকর কথা বলতে শুরু করেছে, এখন তাকে থামানো কঠিন। চোখেমুখে এক অদ্ভুত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে বলল,— আজ আবার আমাদের গভর্নমেন্ট ফর্ম হল।

কাগজে শিবসুন্দর দেখছিলেন বটে আগের রুলিং পার্টির একটা ভগ্নাংশ বেরিয়ে এসে সরকার গড়তে চাইছে দিল্লিতে, কিন্তু দিবাকর তো সে পার্টির লোক নয় !

শিবসুন্দরের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,— তোমরা গভর্নমেন্ট করেছ ?

—ঠিক আমরা নই। আবার আমরাই। পেছন থেকে আমরাই সরকার চালাব। যখন চাইব রাখব, যখন চাইব না উল্টে দেব।

শিবসুন্দর আড়ে একবার দেখে নিলেন দিবাকরকে, কোনও মন্তব্য করলেন না। ছেলেটিকে বললেন,— ওষুধ বুঝে নাও। প্রথমটা ক্যাপস্যুল, দিনে তিন বার, পাঁচ দিন। খালি পেটে নয়, মোটামুটি আট ঘণ্টা ছাড়া-ছাড়া। ভিটামিনটা সকালে খাবে। ভাত খাও, কিন্তু চান নয়। মানে যতক্ষণ গায়ে জ্বর আছে। আর সব এমনি খাওয়া দাওয়া। নরমাল। তেলমশলা কম খাওয়াই ভাল। প্রেসক্রিপশান ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিলেন শিবসুন্দর,— গলায় একটা ইনফেকশান হয়েছে। তিন নম্বর ওষুধটা উষ্ণ উষ্ণ জলে ফেলে দিনে অন্তত চার বার গার্গল করবে....

দিবাকর আবার বলে উঠল,— এবার সোমেনদের খুব টাইট দিয়ে দেব।

শিবসুন্দর এড়াতে চাইলেন প্রসঙ্গটা। বললেন,— হুঁউ।

—হুঁ না ডাক্তারবাবু। এবার ওদের ছুঁড়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেব।

—দিয়ে ?

দিবাকর যেন একটু ফাঁপরে পড়ে গেল। তার কথায় অনেকে হাঁ হাঁ করে ওঠে, অনেকে ভীষণ খুশি হয়, তবে এই প্রশ্নটা বুঝি কেউ করেনি কোনওদিন। মাথা চুলকে বলল,— দেখবেন, দেখবেন কী হয়। ধান কাটার সিজন এল বলে, সোমেনদের প্যাঁচবাজি করা বার করে দেব। নিজের লোক দিয়ে ক্ষেতের ধান তুলিয়ে যাবে, আর আমরা বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষব, এবার আর সেটি হচ্ছে

না।

দিবাকরের কথা বলার ভঙ্গিটি প্রায় তামসিক। কিন্তু কথাগুলো পুরোপুরি মিথ্যে নয়। গ্রামের অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে ঠিকই, তবু কোথায় যেন আগের সঙ্গে একটা মিল ঘোচেনি। জোতদার-মহাজনরা ঠিক আগের চেহারায় নেই বটে, আবার যেন আছেও। পঞ্চায়েতের কেষ্টবিষ্টুরাই যেন এখন অপ্রত্যক্ষ জোতদারের ভূমিকায়। আগে জোতদাররা টাকা ধার দিয়ে সুদে বাঁধত গরিবগুরবোদের, আর এরা এখন সার বীজ কৃষিঋণ দিয়ে ভোটের বাক্সে বেঁধে রাখে। প্রতিবাদহীন আনুগত্য চাই। আমার বাক্সে যদি বাঁধা থাকো, তো আছ। নাহলে তুমি কোত্থাও নেই। সার চাইতে গেলে হয়রানি, বীজ চাইতে গেলে হয়রানি, কর্জ চাইতে গেলে হয়রানি। সোমেনরা বোঝে না এতে তারা নিজেরাই ক্ষয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। একদিন হয়তো এদের জোতদার জমিদারদের থেকেও বেশি ঘেন্নার চোখে দেখবে মানুষ।

তবু দিবাকরকে আমল দিতে রাজি নন শিবসুন্দর। উঠে পড়লেন।

দিবাকর ফিসফিস করে বলল,— সোমেন একটা কালার টিভি কিনেছে, জানেন ডাক্তারবাবু।

শিবসুন্দর বিরস মুখে বললেন,— সে তো তোমারও আছে।

দিবাকরের বাদামি চোখের মণি পলকের জন্য জ্বলে উঠেই নিবে গেল। যেন শাটার টিপে মন-ক্যামেরায় ছবিটা তুলে রাখল শিবসুন্দরের। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল,— আমাদের তো তিন পুরুষের পয়সা ডাক্তারবাবু। শুধু কালার টিভি কেন, ভিসিপি-ভিসিআর সবই আমাদের ঘরে আছে। আমরা তো আর ইঁদুরের মতো গর্তে একটা একটা করে ধান সরিয়ে পয়সা করিনি।

শিবসুন্দরের বলতে ইচ্ছে হল, তোমরা মরাইকে মরাই ধান সাফ করতে পারো, তাই তো ? না বলে ছেলেটির পিঠে আলগা চাপড় দিলেন,— যাও, বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। কালও হয়তো খুব একটা উন্নতি হবে না শরীরের, তবে পরশু থেকে...

দিবাকররা চলে যাওয়ার পর দোতলায় এলেন শিবসুন্দর। বিকেল পড়ে আসছে, পশ্চিম দিগন্তে গোলাপি হয়ে গেছে আলো। একটা কাক খুব নিচু দিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে গেল, বাসাটা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না বোধহয়। দূরের হলুদ হয়ে আসা ধানক্ষেত এবার ধীরে ধীরে ঢেকে যাবে কুয়াশায়। কালস্রোতে আর একটা দিন ভেসে গেল।

শিবসুন্দরেরও আয়ু থেকেও খসে গেল একটা দিন। গতানুগতিক দিন। সেই চেম্বার, রুগী, সেই মনোরমা, একটু বিশ্রাম, একটু ভাবনা, অলকা তুফান টুকি, সেই অপছন্দের তর্কবিতর্কে ঢুকে যাওয়া....ক্লান্তি আসে শিবসুন্দরের, বড় ক্লান্তি আসে আজকাল। বিকেলের পিপাসা মরে আসে সন্ধেয়।

অন্ধকার নামার পর তুফান ফিরল। শিবসুন্দর তখন দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে নোনতা সুজি খাচ্ছেন। মাদ্রাজি রান্না, খবরের কাগজের পাতা দেখে শিখেছে অলকা। পিছনের বাগানে কারিপাতার গাছ লাগিয়েছে অলকা, পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে রান্নায়।

মোপেডের গর্জন থামিয়ে দুপ দুপ ওপরে উঠে এল তুফান।

শিবসুন্দর টেরিয়ে তাকালেন,— তোর রসপুর ভ্রমণ হল ?

—সে তো কখন ফিরেছি। মোড়া টেনে বসল তুফান,— শ্মশানের সেই সাধুটার কাছে গেছিলাম বাবা।

—কোনটা ? যেটা কালীপুজোর দিন আড্ডা গেড়েছে ?

—একটাই তো আছে এখন। বাবাটা অদ্ভুত এক যোগ দেখাল। পদ্মাসনে বসে কীভাবে শরীরটাকে....

—অ্যাই, কদ্দিন না বলেছি, আমার সামনে তুই সাধুদের বাবা বাবা বলবি না। আমি আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগি।

তুফান হেসে ফেলল। পা মুড়ে মুড়ে হাঁটুর আড় ছাড়াচ্ছে। বলল,— বাবা, খবর শুনেছ ?

—কী, দিল্লির নতুন গভর্নমেন্ট ? শুনেছি।

—তুস্, ও খবরে আমার ইন্টারেস্ট নেই।

ক্ষণিক রাজনৈতিক উন্মাদনা বহুকাল আগেই কেটে গেছে তুফানের। বাবার সামনে রাজনীতির কথা তুলতে এখন সে লজ্জা পায়। হাসতে হাসতে বলল,— পলাশ ডাক্তার তো চলল।

—তাই নাকি ? মাত্র তো মাস কয়েক হল এসেছে।

—তলে তলে ট্রান্সফারের চেষ্টা করছিল। হেলথ ডিপার্টমেন্টের এক মুরুব্বিকে ধরেছিল, কলকাতার দিকে পোস্টিং পেয়ে গেছে। বারুইপুরে।

—তোকে কে বলল ? মায়া ?

ঘাড় দোলাল তুফান,— মায়া খুব চিন্তায় পড়ে গেছে বাবা। পলাশ ডাক্তার ছিল, তাও একটা বল ছিল মেয়েটার।

—কারুর ভরসায় বল তৈরি হলে সে বল টেকে না রে।

—সবাই তো তোমার মতো ডাকাবুকো নয় বাবা।

—আমি ডাকাবুকো ! হা হা। শব্দ করে হাসছেন শিবসুন্দর। আধো অন্ধকার বারান্দা যেন আলোকিত হয়ে উঠছে হাসিতে। বললেন,— বড়জোর বলতে পারিস আমি কখনও কাউকে তেলটেল মারিনি। তার জন্য সাফার যা করার সে আমিই করেছি, কাউকে ব্লেম দিয়েছি কখনও ? দু বছর-তিন বছরের বেশি কোনও জায়গায় আমায় রাখেনি, কখনও ওপরতলার সঙ্গে ঝগড়া করতে পেরেছি ? ডাকাবুকোই বল আর সাহসীই বল, মানুষ কখন সেটা হতে পারি জানিস ? যখন মানুষ নিজের চাহিদাকে ছোট করে নিতে পারে। বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে পড়াতে গেলাম, সেখানেও সেই দুটো বছর...

—ঠিক আছে বাবা তাই। মানছি। তোমার মনের জোর ছিল। কিন্তু সবার তো সে জোর না থাকতেও পারে। তুফান অন্ধকার আমগাছটার দিকে তাকাল,— মায়া আবার অ্যাপ্লিকেশান করছে।

—করুক। ও-ও হয়তো পেয়ে যাবে। শিবসুন্দর হাসলেন,— সোমেনদের গিয়ে ধরতে বল, আরও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

—তুমি বড় জিদ্দি বাবা।

শিবসুন্দরের হাসিটা মিলিয়ে গেল। নিয়ম মেনে চলাটাকে কেন যে এরা অন্য চোখে দেখে ? শুভর নার্সিংহোম গড়াটাকেই তিনি কখনও সমর্থন করেননি, সেখানে তিনি মায়ার চাকরির জন্য বলেন কী করে ? এতটা আপোস কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ? বরং মেয়েটার যদি কোনও বিপদ হয়, এখানেই তিনি মেয়েটাকে প্রাণপণে আগলানোর চেষ্টা করবেন। পলাশ ছেলেটাই বা কী রকম ? এত সৎ সৎ শুনতেন, সে মুরুব্বি ধরে পালায় কেন ? নিজের গাটুকু বাঁচিয়ে সততার আভরণ পরে থাকা, এও তো কাপট্য ! এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি !

ভার গলায় শিবসুন্দর বললেন,— তোরা আমার দিকে আঙুল দেখাস কেন, নিজেরা শুভকে বলতে পারিস না ?

তুফান উত্তর দিল না। নখ খুঁটছে। চলে যাচ্ছিল, শিবসুন্দর পিছু ডাকলেন,— বিকেলে দিবাকর এসেছিল। এক আত্মীয়কে দেখাতে। ..... খুব খোশমেজাজে আছে দিবাকর।

—থাকবে না ! কটা দিন যেতে দাও, ধানকাটার সময় তো আসছে....দিবাকররা এবার খুব বড় গণ্ডগোল পাকাবে। জগদীশ পাড়ুই, শ্যামা মুখুজ্যে, সবার জমিতে নতুন বর্গা রেকর্ড করিয়েছে সোমেনরা, দিবাকর তেতে আগুন হয়ে আছে। লাঠি সড়কি ছেড়ে এবার না গুলিগোলা চলে।

—আমার তো লাভই রে। সকাল বিকেল চেম্বারে কেস আসবে।

—না। ওসব কেস তুমি করবে না। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। ফালতু টেনশান নেওয়া....

উত্তরের অপেক্ষা না করে নেমে গেল তুফান। শিবসুন্দরও উঠে ঘরে এলেন। গত সপ্তাহে দুটো বিদেশি জার্নাল এসেছে, বসলেন সে দুটো নিয়ে। সন্ধ্যাবেলা আজ কল নেই, একটু পড়াশুনোর

সময় পাওয়া গেছে। হেপাটাইটিস বি-র ওপর কিছু গবেষণা হয়েছে, ডুবে গেলেন তাতে।

অলকার সাড়া পেয়ে মগ্নতা ভাঙল। মনোরমার খাবার এনেছে অলকা। সযত্নে শাশুড়িকে খাইয়ে পরিপাটি করে শুইয়ে দিল। দরজায় গিয়েও দাঁড়িয়ে আছে।

শিবসুন্দর তাকালেন।

অলকা অস্ফুটে বলল,— সামনের মাসে দু-তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ি যাব ভাবছি।

শিবসুন্দরের ভুরুতে ভাঁজ।

অলকা আবার বলল,— আমার খুড়তুতো বোন....শ্যামলীর বিয়ে।

—ও। যেয়ো।

—কাকা চিঠি দিয়েছে। নেমন্তন্ন করতে আসবে। আপনাকেও যেতে বলবে। একবার যাবেন বাবা ?

—আমি ! কী করে যাব ?

—একবার গিয়ে দাঁড়িয়ে চলে আসবেন। সবাই ভীষণ খুশি হবে।

অলকাকে মুখের ওপর না বলতে বাধল শিবসুন্দরের। চাপাডাঙা এমন কিছু বিলেত আমেরিকা নয়, তুফানকে রেখে একবেলার জন্য যাওয়াই যায়। অলকার বাপের বাড়ির লোকের সূক্ষ্ম অভিমান আছে তুফানের বাবা খুব নাকউঁচু মানুষ। এ ধারণাটা ভেঙে দিয়ে আসা দরকার। অলকার দাদার বিয়েতেও যাব যাব করে যাওয়া হয়নি।

শিবসুন্দর ঘাড় নাড়লেন,— দেখি, তখন তোমার মা'র শরীরস্বাস্থ্য কেমন থাকে।

খাওয়াদাওয়া সারতে সাড়ে নটা বেজে গেল। ওপরে উঠে আসার আগে শিবসুন্দর দেখলেন ঘুমিয়ে পড়েছে টুকি, ঘুমন্ত হাতে আঁকড়ে ধরে আছে খেলনা এরোপ্লেনটাকে। দৃশ্যটা ক্ষণিকের জন্য ছুঁয়ে গেল হৃদয়কে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শিবসুন্দরের মনে নতুন এক ভাবনা এল। মাধবপুরের বাড়ি-জমি টুকি আর টোটোর নামে লিখে দিলে কেমন হয় ! তুফান অলকাই নয় সারা জীবন দেখাশুনা করল। শুভর সঙ্গে তুফানের গ্রন্থিটা পুরোপুরি ছিঁড়বে না কোনওদিন, জানেন শিবসুন্দর। টুকি আর টোটোকে এমন একটা বাঁধনে বেঁধে ফেললে কেমন হয় !

আইডিয়াটা শিবসুন্দরের মাথায় বহুক্ষণ নড়াচড়া করল। হুঁ, মন্দ নয়, এমনটি করাই যায়। শুভর মনেও যদি কোনও আহত ভাব এসে থাকে, সেটাও হয়তো এই বন্দোবস্তে কেটে যাবে।

রুটিন মতো মনোরমার রক্তচাপ মাপছেন শিবসুন্দর। ভাবছেন। মশারি টাঙিয়ে দিলেন। ভাবছেন। নিজের ওষুধগুলো খেলেন একে একে। লিখলেন দিনপঞ্জি।

একটা জানলার পাট খোলা। দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ঘর। জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েও করলেন না শিবসুন্দর, পাখা অফ করে দিলেন। এসেছেন বিছানায়। বেডসুইচ নিবিয়ে আলগা হাত রাখলেন মনোরমার মাথায়। ফিসফিস করে বললেন,— শুভকে তো আমরা কাছে টানতে পারলাম না, শুভর ছেলেটাকে একবার চেষ্টা করে দেখব ? তুমি কী বলো ?

শরীরে একটা বস্তুর স্পর্শ পেয়ে নড়ে উঠেছেন মনোরমা।

শিবসুন্দরের স্বর গাঢ় হল,— কষ্টের কথা তুমি ছাড়া আর কাকে বলি মনো ? বুকটা হঠাৎ হঠাৎ কেমন খামচে ধরে। শ্বাস আটকে আসে। আমি কি ফুরিয়ে যাচ্ছি মনো ? শুভরা যদি ঘন ঘন একটু আসত.....। আমার কাছে নয় নাই এল, তোমার ছেলে তোমার কাছে তো আসতে পারে।

ঠিক সেই সময়ে একশো কিলোমিটার দূরে সেলিমপুরের এক ছোট্ট ঘরে বসে আছে শুভাশিস। রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। এখনও সে নিচু স্বরে বিনবিন করছে। সামনে ইন্দ্রাণী, দু চোখ তার বিস্ফারিত।

ক্ষণিকের জন্য সমস্ত স্নায়ু অসাড় হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রাণীর, ক্ষণ পরে চেতনা ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র অভিমানে ছেয়ে গেছে বুক। বিপ্লব কি শুধু নিষ্ঠুরতা শেখায়! আসতে হবে না তনুময়কে, পা রাখতে হবে না এই শহরে। হৃদয়ের একটা কুঠুরি চিরকালের মতো বন্ধ করে দেবে ইন্দ্রাণী, ভুলেও আর তনুময়ের কথা মনে আনবে না। বাবা-মা'র কাছেও যেমন জীবন্মৃত আছে, তেমনই না হয় থাক তনু। কেন আবার তাদের নতুন করে আঘাত দেওয়া!

শুভাশিস বসে আছে চেয়ারে, সিগারেট ধরিয়েছে। আঁকাবাঁকা ধোঁয়ার রেখা পাখার বাতাসে একটু দুলে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তবু যেন রয়ে যায় ধোঁয়া, অদৃশ্য উপস্থিতি তার ভারী করে তোলে বাতাস। কার্তিকের শেষ এখন, রাতের দিকে এ সময়ে পাখার হাওয়ায় শীত শীতও করে বেশ, তবু এই হাওয়াটুকু না থাকলে ইন্দ্রাণীর বুঝি দম বন্ধ হয়ে যেত।

ঘরের দরজা খোলা। ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে তিতির, একাই। নীরবে। এখান থেকে মেয়ের শুধু পিঠটুকু দেখা যায়। প্রায় সোজা হয়ে বসে আছে তিতির, ঝুঁকছে না টেবিলে। আদৌ খাচ্ছে কি? অজান্তেই দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ গেল ইন্দ্রাণীর, এগারোটা বাজতে যায়।

শুভাশিস নড়েচড়ে বসল। গলা খাদে নামিয়ে বলল,— কিছু একটা বলো রানি।

—কী বলব?

—ভাবছটা কী?

—কিছু না। ইন্দ্রাণী আবার ঘড়ির দিকে তাকাল,— রাত অনেক হল, তুমি বাড়ি যাবে না?

শুভাশিসের দৃষ্টি বুঝি মুহূর্তের জন্য ভেদ করে গেল ইন্দ্রাণীকে। একটু পরে নিশ্বাস ফেলে বলল,— আমার বোধহয় তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল। আসলে আমি নিজেই এত মেন্টালি এক্সাইটেড হয়ে গেলাম। ...জানো, আমাদের চলে আসার দিনও ও গেস্টহাউসে দেখা করতে এসেছিল। বলেছিল চাইলে ও দু'কলম লিখে দিতে পারে। তোমাকে।

ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকে তাকাল।

—বুঝলে না, বিবেকের তাড়না। আফটার অল সে তো একটা এস্‌কেপিস্ট ছাড়া কিছু নয়।

ইন্দ্রাণীর মনে হল শুভাশিসের কথায় তেমন প্রত্যয়ের ছাপ নেই। যেন নিজেই নিজেকে শব্দের ভিটামিনে উজ্জীবিত করতে চাইছে শুভ। যত অভিমানই হোক, এখনও তনুকে ঠিক পলায়নবাদী ভাবতে মন যেন সায় দেয় না। পালিয়ে যাওয়া কাকে বলে? যে বিশ্বাসে স্থির থেকে জাগতিক মায়ামমতাকে দু' পায়ে মাড়িয়ে যায় সে পলাতক? নাকি যে বেঁচে থাকার জন্য বিশ্বাসহীনতাকেই দু'হাতে আঁকড়ে থাকে, সে?

শুভাশিস বিড়বিড় করে বলল,— সে চিঠি আমি রিফিউজ করেছি রানি। বলেছি দরকার হলে তুমি নিজে আসবে। আমি কি ভুল করেছি?

নিঃশব্দে দু দিকে মাথা নাড়ল ইন্দ্রাণী।

—যদি চাও তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। ... একাও যেতে পারো।

—দেখি।

—দ্যাখো ভেবে।

শুভাশিস উঠে পড়ল। খাওয়ার জায়গায় গিয়ে মেয়ের কাঁধে হাত রেখে কি যেন বলছে হেসে হেসে। মাথা তুলল না মেয়ে, আড়ষ্টভাবে কি একটা উত্তর দিল। দরজায় দাঁড়িয়েও ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না ইন্দ্রাণী। অথবা তার শ্রবণেন্দ্রিয় ঠিক ঠিক কাজ করছিল না। মাস খানেক পরে এসেছে শুভ, মেয়ে তার সামনে সামান্যতম সৌজন্যও দেখাচ্ছে না, এ ঘটনাও তাকে নতুন করে আহত করছে না আজ। পলকের জন্য শুধু মনে হল তনুর অভিমান তিতিরেও চারিয়ে গেল!

উঁহু, এ বুঝি নিছকই মনের ভুল। এক পাপবোধ থেকে মুক্তি পেলেই বোধহয় আর একটা

পাপবোধের জন্ম হয়। অথচ তনুময় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এসব পাপবোধের সব কারণই মনগড়া। অলীক। তিতিরের আচার-আচরণ বদলে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার আরও অজস্র হেতু থাকতে পারে। এই বয়সের মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের বোধ হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। হয়তো কোনও আপন কারণে শুভকে আর ভাল লাগছে না তিতিরের। হয়তো আদিত্যর সঙ্গে শুভর এত অমিল বলেই...।

কোন আপনজনের সঙ্গই বা আজকাল পছন্দ করে তিতির ? এক আদিত্য ছাড়া ? মানিকতলায় এবার বিজয়ার প্রণাম পর্যন্ত করতে গেল না। চাঁদুও কত দুঃখ করছিল সেদিন। তিতিরটা কেমন চোয়াড়ে হয়ে যাচ্ছে বউদি, কোনও কথার সোজা জবাব দেয় না ! দীপুর বাড়িই কি যায় ? অ্যাটমকে পর্যন্ত ভুলে গেছে ! ভাইফোঁটার দিন জয়িরা এসেছিল, কী দায়সারাভাবে ঝান্টুকে ফোঁটা দিল তিতির ! দাদার জন্য মন কেমন করছিল তিতিরের ? বাজে কথা। দাদাকে তাহলে দু লাইনও চিঠি লেখে না কেন ?

গ্রিলদরজায় তাল্য লাগিয়ে এসে ইন্দ্রাণী দেখল তিতিরের খাওয়া শেষ, আবার সেঁধিয়ে গেছে বাবার ঘরে। আদিত্যবাবু আজ সন্ধে সন্ধে ফিরে এসেছেন, বিছানায় এখন নিমীলিত চক্ষু, তাঁর সামনে বইখাতা ছড়িয়ে বসেছে তিতির। টেস্টের প্রস্তুতি। কী ছাই পড়ে কে জানে, প্রিটেস্টে ওই তো রেজাল্টের ছিরি ! টিউটোরিয়ালটা কি খুবই ওঁচা, নাকি তিতিরই ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে ? কতকাল তার কাছে বইখাতা নিয়ে বসে না তিতির, এবার কড়াভাবে চেপে ধরতে হবে মেয়েকে।

নিজের চিন্তায় নিজেই ইন্দ্রাণী শিহরিত হল সহসা। এই মুহূর্তে তিতিরকে নিয়ে এত কেন ভাবছে সে ? তনুময়ের ভাবনা এড়াতে চায় বলেই কি ? চেষ্টাটা কি বেশি হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে না ? কোথায় সে ঠাণ্ডা মাথায় স্থির করবে উড়ে আসা আগুনের ফুলকিটা চিরতরে বুকের গোপন প্রকোষ্ঠে চালান করে দেবে কিনা, তা নয়...। বাবা-মাকে কিছুই না জানানো উচিত হবে কি ? তাঁদের এত লম্বা প্রতীক্ষা বিফলে যাবে ? কিন্তু জানলে তাঁরা... ?

উচিত অনুচিতের দ্বন্দ্বে জীর্ণ হচ্ছে ইন্দ্রাণী, একা ঘরে ছটফট করছে। এক সময়ে গলা চড়াল, তিতির, শোন।

তিতির অলস পায়ে দরজায় এসেছে।

—তোর বাবার খাওয়া হয়েছে ?

—না।

—ঘুমিয়ে পড়েছে ?

—বোধহয় না।

—বল মা খেতে ডাকছে।

থালা সাজিয়ে খেতে বসেছে দুজনে। এক সঙ্গে। এ বাড়িতে এই দৃশ্য এখন অতি বিরল। আদিত্য বসেছে সঙ্কুচিতভাবে, কিন্তু খাচ্ছে গপগপিয়ে। ইন্দ্রাণী অনাড়ষ্ট, অথচ তার মুখে কিছু রুচছে না। কপির ডালনায় রুটির টুকরো ডুবিয়ে গরাস তুলল। মুখে কচকচ ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে রুটি, ঢকঢক জল খেয়ে নিল খানিকটা। আদিত্যর নিরুদ্বেগ খাওয়া দেখে ঈর্ষা হচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। ওই গা-ছাড়া দেওয়া মানুষটা কী সুখী !

ইন্দ্রাণী ভার গলায় বলল,— আজ ছাইপাঁশ গিলে আসোনি যে বড় ?

আদিত্য মুচকি হাসল। লাস্ট বেঞ্চের মেয়ে কোনও একদিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলতে পারলে যেমনটি হাসে, অবিকল সেই হাসি।

ওই হাসিতেই ইন্দ্রাণী যেন একটু সহজ হল। মনের চিন্তাটা একপল নাড়াচাড়া করে বলল,— আচ্ছা, তুমি না বলেছিলে কাশীতে কোন সাধুকে দেখে মা খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিল ?

—হুঁ। সেই সামলাতে যা ধকল গেছে ! জ্বর, ডিলিরিয়াম, বাপস্।

—আচ্ছা.. ধরো, সেদিন যদি সাধুটা সত্যি সত্যি তনু হত, তাহলে মা'র কী রিঅ্যাকশন হত ?

—মানে ? আদিত্য ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল।

—আমি কি গ্রিক ল্যাটিন কিছু বলেছি ? প্রশ্ন ঠিকমতো বোঝাতে না পেরে অল্প তেতে গেল ইন্দ্রাণী। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলল,— মানে বলছিলাম সাধুটা সত্যি সত্যি তনু হলে সে তো আর মা'র আঁচল ধরে সুড়সুড় করে ফিরে আসত না, তখন মা কী করত ?

এমন কঠিন প্রশ্ন বুঝি জন্মে শোনেনি আদিত্য। মুখভাব আমূল বদলে গেছে তার। বুড়ো আঙুল ঘষে ঘষে থালার মধ্যিখানটা চকচকে করে ফেলল। ভুরু ভাঁজ হচ্ছে, খুলছে। পিটপিট করছে চোখ। ঘ্যাস ঘ্যাস মাথা চুলকে বলল,— আমার মনে হয় সেটা খুব খারাপই হত।

—কেন ?

—বারে, রবি ঠাকুর পড়োনি ? পেয়ে হারানোর চেয়ে না পাওয়া ঢের ভাল।

রবীন্দ্রনাথ কোথায় এমন উক্তি করেছেন মনে পড়ল না ইন্দ্রাণীর। সামান্য ঝেঁঝে বলল,— রবীন্দ্রনাথের কথা জানতে চাইনি। তোমার মত বলো।

—আমারও সেই মত। আবার মুচকি হাসল আদিত্য,— আমার মত বললে তো তুমি মানবে না, তাই রবি ঠাকুরের নাম করলাম।

উফ, এই মানুষের সঙ্গে আলোচনা করাই বৃথা। তবু মতামতটা পুরো ঝেড়ে ফেলল না ইন্দ্রাণী। হয়তো নিজের সঙ্গে মিলে গেছে বলেই। উমাকে অনেক শক্তপোক্ত বলে মনে হত ইন্দ্রাণীর, কাশীর ঘটনাটায় সে ধারণা চুরচুর হয়ে গেছে। নির্ঘাত মা নতুন ধাক্কা সইতে পারবে না।

ইন্দ্রাণী চোখের কোণ দিয়ে দেখল আদিত্যকে,— আর বাবা হলে ওই পরিস্থিতিতে কী করত ?

—এটা বলা বেজায় শক্ত। বাবা তো কথাই শুরু করেন র‍্যাম্পার্ট-এর ওপার থেকে, চিন্তা হয়তো গঙ্গার ওপার থেকে শুরু হবে। এমন মানুষের মনের তল পাওয়া ভার। বলতে বলতে উঠল আদিত্য। বেসিনে গিয়ে আঁচাচ্ছে। কুলকুচি করতে করতে বলল,— হঠাৎ তোমার আজ কাশীর কথা মনে হল কেন ?

—এমনিই।

বলে চুপ করে গেল ইন্দ্রাণী। তনুময়ের কথাটা আদিত্যকে বলতে খুব ইচ্ছে করছিল, একজনকে জানালেও বুকের ভার কিছুটা নামে। থাক। শুনেই হয়তো আদিত্য ধেই ধেই নাচতে শুরু করবে, ছুট্টে গিয়ে সকালেই খবরটা দিয়ে আসবে বাবা-মাকে। যা বুদ্ধি ! বলে অবশ্য বারণ করে দিলে হয়। শুনবে।

এত ভেবেও ইন্দ্রাণী শেষ পর্যন্ত কিছুই বলতে পারল না। গোপন কথা আদানপ্রদান না করে করে কেমন যেন কুণ্ঠা এসে গেছে, সম্পর্কের মাঝের অবরোধটাকে তার বড় দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়। মাস খানেক আগে কাশী যাবে বলে জোর ঢক্কানিনাদ তুলে হঠাৎ চুপ মেরে গেছে আদিত্য, সেই নিয়েও কি কোনও প্রশ্ন করতে পেরেছে ইন্দ্রাণী ? রোজই ঘুরে ফিরে লেটারবক্স হাতড়ায় আদিত্য, কোনও চিঠি এসেছে কিনা চাঁদু তিতিরকে জিজ্ঞাসা করে। কাশী থেকে কোনও ডাকের প্রতীক্ষায় আছে কি ? ক'দিন ধরে নেশার মাত্রাও যেন কম, মাতাল হোক আর যাই হোক বাড়ি ফিরছে, মনে মনে আবার কী ভাঁজছে কে জানে !

কন্দর্পর আজ খাওয়ার পাট নেই। সে গেছে ফিলমি পার্টিতে, ফিরতে রাত হবে বলেই গেছে। এঁটো বাসন-কোসন রান্নাঘরে নামিয়ে দিল ইন্দ্রাণী, আলগা হাতে খাবার টেবিল মুছে নিল। আবার সেই অবরুদ্ধ তনুময় কামড় বসাচ্ছে মাথায়, ইন্দ্রাণী অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করল। শুভ ফিরেছে হপ্তাখানেক আগে, মাঝে বারকয়েক ফোনও করেছে, একটি বারও ভুল করে তনুর কথা উচ্চারণ করেনি, আজ এসে খবরটা দিল কেন ? সেও কি দ্বিধায় ছিল এ ক'দিন ? শুভ তো এখন প্রায় বাইরের মানুষ, ইন্দ্রাণীর ভাল-মন্দ থেকে সে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে নিজেকে, সেই শুভরই যদি এত সংশয় থাকে, ইন্দ্রাণী কি তুড়ি মেরে সিদ্ধান্ত নিতে পারে ?

অনেক ভাবা দরকার, অনেক ভাবা দরকার।

টিফিনে নীলিমার ঘরে ডাক পড়ল ইন্দ্রাণীর। দু'রাত পর পর ঘুম হয়নি, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, হাফ-ডে সি এল নিয়ে ইন্দ্রাণী বাড়ি চলে যাবে ভাবছিল, এমন সময়ে এই আহ্বান!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইন্দ্রাণী উঠল। স্টাফরুম থেকে নীলিমার ঘরে পৌঁছেই চমক। স্কুলের সেক্রেটারি বসে আছেন ঘরে। মানুষটি ইন্দ্রাণীর পরিচিতই। শুধু রেবার দাদা বলেই নয়, অম্বরীশবাবু ঢাকুরিয়ারই পুরনো বাসিন্দা, পথে-ঘাটে কখনও সখনও দেখা হলে হেসে কথা বলেন। পেশায় অধ্যাপক, রাজনীতির সঙ্গেও খানিকটা যোগ আছে অম্বরীশ ব্যানার্জির, জানে ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীকে দেখে হাত তুললেন অম্বরীশবাবু,— আসুন দিদিমণি, নীলিমাদি আপনাকে একটা সুখবর শোনাবেন।

ইন্দ্রাণী চেয়ার টেনে বসল। তার স্নায়ু এত শিথিল যে সুসংবাদের প্রত্যাশাও তাকে টানটান করতে পারছে না। তবু হাসল, একজন পরিচিত লোকের সামনে যেমন হাসতে হয়।

নীলিমার মুখ নিয়মমাফিক রাশভারী। কেজো স্বরে বললেন,— তোমার কনফার্মেশনের ডেটের ভুলটা রেক্‌টিফাই করা হয়েছে। নেসেসারি অর্ডারও বেরিয়ে গেছে, তবে এখনও আমার হাতে আসেনি। আশা করি এবার তোমার গ্রিভান্স মিটে যাবে।

ইন্দ্রাণী অল্প মাথা দোলাল,— থ্যাংক ইউ।

—ধন্যবাদ আমাকে নয়, অম্বরীশবাবুকে দাও। গভর্নমেন্টে ওঁর চেনা লোক আছে, তাকে দিয়ে উনি তোমার প্রোপোজালটা থ্রু করিয়েছেন।

ইন্দ্রাণী অম্বরীশের দিকে ফিরে হাসার চেষ্টা করল,— থ্যাংক ইউ।

—তাহলে বুঝতে পারছ তো ম্যানেজিং কমিটি মানেই কিছু শয়তান বদমাইশ নয়?

—আমি তো সে কথা কখনও বলিনি।

—তোমার লেটার ইমপ্লায়েড সো। তোমার ল্যাংগুয়েজ ইমপ্লায়েড সো।

—আমি সত্যিই এমন কিছু মিন করতে চাইনি নীলিমাদি। আপনারা যদি হার্ট হয়ে থাকেন, আই অ্যাম সরি।

এতক্ষণে নীলিমার মুখে হাসি ফুটল,— ঠিক এই কথাটাই তোমার কমিটিকে লিখে জানানো উচিত। অম্বরীশবাবুও তাই চান। এটা স্কুলের ডিসিপ্লিনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করব তুমি ওঁকে ডিজ্যাপয়েন্ট করবে না।

ইন্দ্রাণী টান হল,— অর্থাৎ মুচলেকা?

নীলিমা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, অম্বরীশ থামালেন তাঁকে, আপনি ওভাবে নিচ্ছেন কেন দিদিমণি? আপনি তো আর পারসোনাল কারুর কাছে ক্ষমা চাইছেন না, অথরিটির সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিন। এ কথা তো মানবেন, ম্যানেজিং কমিটির যথেষ্ট ভিন্‌ডিক্‌টিভ হওয়ার স্কোপ ছিল। কিন্তু তারা আপনার সঙ্গে যথেষ্ট ম্যাগনানিমাস আচরণ করেছে।

ইন্দ্রাণী ঝটিতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো এঁচে নিল। যদি অর্ডার বেরিয়ে গিয়ে থাকে, তবে এখন বুড়ো আঙুল দেখালেও এদের কিছু করার নেই। কিন্তু যদি অর্ডার না বেরিয়ে থাকে? গোটা ঘটনাটাই যদি সাজানো হয়? নীলিমাদি এক পয়লা নম্বর মিথ্যেবাদী, ম্যানেজিং কমিটিতে নীলিমাদির চেয়েও ক্রূর লোক আছে কয়েকজন, তবে সেক্রেটারি লোকটা রেবার দাদা হওয়া সত্ত্বেও মন্দ নয়, স্টাফরুমে রেবার অসাক্ষাতেই শুনেছে কথাটা। সত্যিই যদি তিনি ইন্দ্রাণীর জন্য কিছু করে থাকেন, তাহলে ইন্দ্রাণীই বা অকৃতজ্ঞ হবে কেন? এতে যে ইন্দ্রাণী নিজের কাছে নিজে হীন হয়ে যাবে।

বড় করে বুকে বাতাস টানল ইন্দ্রাণী। ঘরে যুদ্ধ, বাইরে যুদ্ধ, হৃদয়ে যুদ্ধ, শয়নে স্বপনে যুদ্ধ, আর ভাল লাগে না।

মাথা নেড়ে ইন্দ্রাণী বলল,— তাই হবে।

—চিঠিটা তাহলে ড্রাফ্‌ট্ করে ফেলি? নীলিমা উৎসুক চোখে তাকালেন,— ছুটির পর এসে সই করে দিয়ো।

—না। চিঠি আমি নিজেই করব। আপনিই তো বলেন ইংরিজি আমি ভাল জানি।

বলেই ইন্দ্রাণী উঠে পড়েছিল। অম্বরীশ ডাকলেন,— দিদিমণি এক সেকেন্ড। কথা ছিল।

ইন্দ্রাণী ঘুরে দাঁড়াল।

—আপনাদের বাড়ি ভেঙে যে ফ্ল্যাটগুলো হচ্ছে, সেগুলো কি অল সোল্ড্ ?

ইন্দ্রাণী সে রকমই শুনেছে, তবু কথাটা ভাঙল না। বলল,— আমি তো ঠিক জানি না। যে প্রোমোটার ভদ্রলোক প্রোজেক্টটা করছেন, সবই তাঁরই হাতে।

—ও। ...তাঁকে পাওয়া যাবে কোথায় ?

—বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে অফিস। বলেন তো ঠিকানা এনে দিতে পারি।

—প্লিজ। আমার মেয়ে-জামাই হন্যে হয়ে একটা ফ্ল্যাটের চেষ্টা করছে। দরে বনে তো জায়গা পছন্দ হয় না। জায়গা পছন্দ হলে দাম লাফিয়ে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। সেদিক থেকে ঢাকুরিয়াই ওদের অপটিমাম চয়েস।

— ভালই তো। মুস্তাফিবাবুর সঙ্গে কথা বলুন।

—আপনি একটু কাইন্ডলি বলে দিন না। অম্বরীশের হাসিটা ছড়িয়ে গেল,— বোঝেনই তো, চেনা লোকের থ্রু দিয়ে গেলে বারগেন করতে একটু সুবিধে হয়। কত করে যেন দিচ্ছে স্কোয়্যার ফিট ?

—আমি ঠিক জানি না, বিশ্বাস করুন। ইন্দ্রাণী এড়াতে চাইল।

—আমি শুনেছি। ছ'শো করে। আপনার রেফারেন্সে যদি পঁচিশ টাকাও স্কোয়্যার ফিটে কমে...

প্রচণ্ড বিরক্ত হচ্ছিল ইন্দ্রাণী। অদ্ভুত এক দোলাচলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মন, তার মধ্যে এইসব আমড়াগাছি ভাল লাগে ! অথবা আমড়াগাছি নয়, এটাই অম্বরীশ ব্যানার্জির মূল কথা। তদ্বিরের বিনিময়ে তদ্বির ! ভাবলে ঘেন্নায় রি-রি করে ওঠে গা। লোকটার সম্বন্ধে ধারণা বদলে গেল !

বিরস স্বরে ইন্দ্রাণী বলল,— দেখব।

—প্লিজ দেখুন। কাজ তো রমরমিয়ে চলছে। পরশু দেখলাম দোতলার ঢালাই হচ্ছে। এখনও বাইচান্স দু-একটা যদি পড়ে থাকে তো গিয়ে কথা বলা যায়।

টিফিন শেষ হতে এখনও মিনিট কয়েক বাকি। স্টাফরুমে ফিরে ইন্দ্রাণী চিঠির মুসাবিদা করতে বসল। চোখ টানছে, মনও বিক্ষিপ্ত, কিছুতেই গুছিয়ে দু' লাইন লেখা যাচ্ছে না। অম্বরীশবাবুর খবর, ফ্ল্যাটের কাজ পুরোদমে এগোচ্ছে। এদিকে চাঁদু বলছিল অশোক মুস্তাফি নাকি বড় ঝামেলায় ফেঁসেছে, ফ্ল্যাটের কাজ হয়তো কয়েক দিন বন্ধ থাকবে। কে ঠিক, কে ভুল বুঝে ওঠা ভার। পরশু শুভকে দেখে মনে হল তনুকে নিয়ে সে চিন্তিত খুব। যেন খানিকটা মানসিকভাবে বিপর্যস্তও। অথচ কাল সন্ধেবেলা সে দিব্যি হেসে হেসে নার্সিংহোমের এক উদ্ভট পেশেন্ট নিয়ে গল্প করে গেল। যাওয়ার আগে ছোট্ট প্রশ্ন, খবরটা দিয়েছ মানিকতলায় ! শুভ কি প্রকৃতই উদ্বিগ্ন ছিল, নাকি... ? কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে কে বিচার করবে ! ইন্দ্রাণীই বা তেমন প্রফুল্ল হতে পারছে না কেন ? তনু ফিরতে চায় না বলে ? না কি সে মনে মনে তনুময়ের কোনও সংবাদই চায়নি ? নিজের মনকে পড়াও যে মাঝে মাঝে এত কঠিন হয়ে যায় !

যা হয় একটা খাড়া করে চিঠিটা হেড মিস্ট্রেসের ঘরে দিয়ে এল ইন্দ্রাণী। নীলিমা আলগা চোখ বোলালেন, মন্তব্য করলেন না। কোনও মতে বাকি তিনটে ক্লাস নিয়ে ইন্দ্রাণী যখন স্টাফরুমে এসে বসল, তখন তার শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ।

সহকর্মিণীরা চলে গেল একে একে। ফাঁকা স্টাফরুমে বসে আছে ইন্দ্রাণী। একা। হেমন্তের মিঠে কড়া রোদ্দুর জানলা বেয়ে গড়িয়ে এসেছে ঘরের এক প্রান্তে। ওইটুকুই যা আলো ঘরে, বাকিটা ছায়াচ্ছন্ন।

বুড়ো ছবিলাল এসেছে দরজায়,— ঘর যাবেন না দিদি ?

ইন্দ্রাণীর চোখ ছায়াতেই স্থির,— যাব।

চাবির গোছা বাজিয়ে ঘরে ঢুকল ছবিলাল, বন্ধ করছে জানলা। আলোর রেখাটুকুও মুছে গেল। এখন শুধু আঁধার, পাতলা আঁধার।

দরজা খুলেই উমার মুখে মধুর হাসি, জানতাম তুই আজ আসবি। ইন্দ্রাণী ভেতরে ঢুকে চটি ছাড়ল,— কী করে জানলে ?

—নতুন একটা রান্না করেছি যে। তুই না চাখলে হয়!

—কী রান্না ?

—ছোলার ডালে পালং দিয়ে, ছানা দিয়ে... রাতুলদের বাড়িতে যে বউটা ভাড়া এসেছে, সে কাল শিখিয়ে গেল। তোর বাবা তো খেয়ে আঙুল চাটছিল।

—বাবা কোথায় ?

—এই তো শুলো।

ব্যাগ রেখে ইন্দ্রাণী সোজা বাথরুমে চলে গেল। উমার বালতির জল বেশ ঠাণ্ডা এখন, এতটা পথ রোদে এসে গায়ে মুখে ছেটালে ভারী আরাম হয়।

তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে ইন্দ্রাণী পিছনের বারান্দায় এল। উমা রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছেন। ফিরে তাকিয়ে বললেন,— খেতে দিই ?

ইন্দ্রাণীর ইচ্ছে করছিল না। মনে সর্বক্ষণ জগদ্দল পাথর চেপে থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ জাগে! তবু ইন্দ্রাণী না করল না, তার খাওয়া হলে মা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে।

ভাত বেড়ে উমা বললেন,— ও হরি, তোকে তো আসল খবরটা দেওয়াই হয়নি। বাপ্পা আমাদের একটা চিঠি দিয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে। আমাকে আলাদা লিখেছে, তার দাদুকে আলাদা।

ইন্দ্রাণীর বিস্ময়বোধ ইদানীং মরে গেছে। তবু যেন সামান্য নাড়া খেল। বাপ্পার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এসেছে, প্রতি চিঠিতেই টের পায় ইন্দ্রাণী। দূরে চলে গিয়ে কি টান বাড়ল বাপ্পার ? হয়তো প্রথম প্রথম এমনটাই হয়। দূরে থাকাটা রক্তে মিশে গেলে তনুর মতোই নিস্পৃহ হয়ে যাবে বাপ্পা!

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল,— কী লিখেছে বাপ্পা ?

— সে অনেক গল্প। তার জাহাজের গল্প, সমুদ্রের গল্প। লিখেছে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন আসবে, দাদুর জন্য একটা মেমপুতুল নিয়ে আসবে। জাপানি। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সে পুতুল নাকি দুলে দুলে নাচে।

ইন্দ্রাণী একটু রসিকতা করার চেষ্টা করল,— দেখো, মেমসাহেব পেয়ে বাপ্পার দাদু যেন দিদাকে না ভুলে যায়।

—যেতেই পারে। উমা ভ্রূভঙ্গি করলেন, তার এখন শরীর মন খুব তরতাজা। বলতে নেই সিজন চেঞ্জের সময়ে এবার তেমন কষ্ট-টষ্টও নেই। এখন তো আবার বায়না জুড়েছে ভোরবেলা হেদো অবধি হাঁটতে যাবে।

—ভালো তো। যাক না।

—হ্যাঁ, তারপর পথে কোথাও মাথা ঘুরে পড়ে থাকুক আর কি। বলতে বলতে উমা হঠাৎ চোখ কোঁচকালেন,— এ কি, তুই খা। শুধু শুধু ভাত চটকে যাচ্ছিস।

—কই না। খাচ্ছি তো। তোমার সেই ডাল পালং কই ? দাও।

উমার মুখে হাসি ফিরল। হাতায় বেশি করে ছানার টুকরো তুলে বললেন,— হ্যাঁরে, তোর ছোট দেওরের বিয়ের কদ্দূর ? সেই কার সঙ্গে নাকি ঠিকঠাক হয়ে আছে...

এ তথ্য আদিত্য সম্প্রচার করে গেছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন আসব না আসব না করেও এসেছিল শেষ পর্যন্ত, তখনই এসব গল্পগাছা করে গেছে। এদিকে সাধু হওয়ার শখ, ওদিকে সংসারের সব ব্যাপারেই আগ্রহ ষোল আনা! পেটে কথাও থাকে না। তাও ভাল, কাশী যাওয়ার ঘোষণাটা এ বাড়িতে করে যায়নি!

ইন্দ্রাণী বলল,— চাঁদু কী করবে চাঁদুই জানে। এখনও বলেনি তো কিছু। বোধহয় নিজের ফ্ল্যাট-ট্যাট হলে তবে করবে।

—মেয়েটা কিন্তু প্রকৃত সুন্দরী। তোর শ্বশুরের কাজের দিন ঘর আলো করে ছিল।

—হুঁ।

—তোর দেওরও অবশ্য কম সুন্দর নয়। দু'টিতে মানাবে বেশ।

—হুঁ।

—অভাগা মেয়েটাকে বিয়ে করলে ছেলেটা একটা কাজের মতো কাজ করবে।

—হুঁ।

—খালি হুঁ হুঁ করছিস কেন ? হয়েছেটো কী তোর ?

—অ্যাঁ ?

—তোর কি শরীর খারাপ ? উমা ঝুঁকে মেয়ের কপালে হাত ছোঁয়ালেন, খাচ্ছিস না তো কিছু ?

ইন্দ্রাণী দ্রুত হাত চালাল,— তোমার ডাল-পালং দারুণ হয়েছে।

উমা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। যেন মেয়ের স্বরের কৃত্রিমতা ধরে ফেলেছেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন,— ক্লান্ত ? স্কুলে খুব খাটুনি গেছে ?

ইন্দ্রাণীর বলতে ইচ্ছে করল মনে স্ফূর্তি থাকলে খাটুনিতে ক্লান্তি আসে না মা। আর যত ক্লান্তই হোক এই শ্রান্তি তাকে জীবনভর বয়ে চলতে হবে। অন্যথা হওয়ার ক্ষীণ আশাটুকু নিবে গেছে।

ইন্দ্রাণী কষ্ট করে হাসল,— ঠিক আছি মা।

উমা আর কথা বাড়ালেন না। মেয়ে যে শতেক ঝঞ্ঝাটে থাকে সে তো তিনি জানেনই। বুঝি তাই মায়া হল। কোমল চোখে দেখছেন মেয়েকে। স্বামী ছেলে মেয়ে বাবা মা স্কুল সংসার সব মিলিয়ে বড় নাগপাশে বাঁধা পড়ে আছে মেয়ে।

বড় খাটে ঘুমোচ্ছেন ধীরাজ, পাশের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল ইন্দ্রাণী। এটা তার ছেলেবেলার ঘর, যৌবনের ঘর। এ ঘরখানাই সব থেকে ছোট, তবু ভারী স্মৃতিময়। দুটো সিঙ্গল বেড খাট আছে এখানে, আছে কাঠের আলমারি, ছোট আলনা, চেয়ার টেবিল। সবেতেই কী ওম ! বিষণ্ণতা মাখা ! পারতপক্ষে এ ঘরে ঢোকে না ইন্দ্রাণী, আজ শুয়ে শুয়ে কান্না পাচ্ছিল। চেয়ার টেবিলে বসে পড়তে পারত না ইন্দ্রাণী, খাটে পা ঝুলিয়ে দুলে দুলে পড়ত, আর ছোট্ট তনু গুড়ি মেরে খাটের তলা দিয়ে এসে চিমটি কাটত পায়ে। তনু একটু বড় হতেই চেয়ার টেবিল তনুর দখলে, দূর থেকে কাগজ পাকিয়ে ছুঁড়ত তখন। ইন্দ্রাণী ধরতে গেলেই পিছলে পিছলে পালাচ্ছে। একবার যদি বাগে পেয়ে গেল ইন্দ্রাণী, তো চিলচিৎকারে বাড়ি মাত। আবার এই তনুই... একবার তুচ্ছ কারণে ভাইকে ও-খাটে ফেলে খুব পিটিয়েছিল ইন্দ্রাণী। কেন আমার পেনের নিব ভেঙেছিস, কেন ভেঙেছিস ! নতুন পেলিকান পেন, খাঁটি বিদেশি, ক্লাস টেনে ভাল রেজাল্ট করার জন্য সেবার মেয়েকে কিনে দিয়েছিল বাবা। চোরের মার খেয়েও এতটুকু প্রতিরোধ নেই তনুর। চোখ দিয়ে জল পড়ছে টসটস, মুখে তবু এক বুলি। মার, যত খুশি মার, মেরে ফ্যাল, কিছুতেই আমাকে দিয়ে বলাতে পারবি না আমি তোর পেনে হাত দিয়েছি। হল্লা শুনে মা ছুটে এসেছে রান্নাঘর থেকে। অ্যাই ইনু, করিস কী ! তনু তোর পেনে হাত দেবে কেন, আমি ধোপার হিসেব লিখতে নিয়েছিলাম, হাত থেকে পড়ে...। প্রহারের জ্বালা ভুলে তনুর ঠোঁটে তখন বাঁকা হাসি। মিছিমিছি নিজের হাত ব্যথা করলি তো !

ইন্দ্রাণীর চোখ কর কর করে উঠল। দ্বিরাগমনে এসে এই খাটে চোখ ঢেকে শুয়ে ছিল ইন্দ্রাণী, ও-খাটে এসে বসল তনু। কচি ঘাসের মতো গাল ভরা দাড়ি, এক ঝোড়া গোঁফ, চুল উসকো-খুসকো। তোর বিয়ে হয়ে বড় কেলো হয়ে গেছে রে দিদি, ঘরগুলো একেবারে গড়ের মাঠ ! আদিত্যদাকে ঘরজামাই করে নেওয়া যায় না !

সেই তনু এত নির্মম হয়ে যায় কী করে ?

মাগোঃ !

কার্তিকের দুপুর দৌড়ে দৌড়ে এগোয়, আজ যেন হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। শুকনো বাতাস ঝাপটা মারে মাঝে মাঝে। কাছেপিঠে কোথাও একটা ঘুঘুপাখি ডেকে উঠল, বোধহয় গলির ক্রোটন গাছটায়। ওই ডাকে দুপুরটা যেন আরও দুঃসহ হয়ে যাচ্ছে।

উমা এসেছেন,— এ ঘরে তো ফ্যান নেই, এখানে শুলি কেন ?

—শুলাম। ইন্দ্রাণী পাশ ফিরল,— আমার ফ্যান লাগবে না।

—হঠাৎ ভূতের মুখে রাম নাম ! তুই তো পারলে পোষ-মাঘেও ফ্যান চালাস ! ইন্দ্রাণী উত্তর না দিয়ে উঠে বসল। যেন ঘুম কাটাচ্ছে এভাবে আঁচলে চোখ মুছে বলল,— মা, তুমি এখনও সেই স্বপ্নটা দ্যাখো ?

—কোন স্বপ্ন ?

—সেই যে, তনু খাঁকি প্যান্ট-শার্ট পরে পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটছে !

উমা যেন থমকালেন সামান্য। দু' ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক হল, হঠাৎ ও কথা মনে পড়ল ?

—পড়ল। বলো না, দ্যাখো ?

—দেখি ক্বচিৎ কখনও। এই তো সেদিনই দুপুরে...

—যদি স্বপ্নটা সত্যি হয়ে যায়, কেমন লাগবে মা ?

—তা কি কখনও হয় !

—যদি হয় মা ?

উমা দু'দণ্ড চুপ। তারপর বললেন,— তুই কি আমায় নিয়ে ঠাট্টা করছিস ?

—ঠাট্টা নয় মা। আমি যদি এখন তোমায় বলি সত্যি তনু বেঁচে আছে ! সে একটা ওরকমই পাহাড়ি দেশে থাকে, খাঁকি ইউনিফর্ম পরে চাকরি করতে যায়, খুব হাট্টাকাট্টা চেহারা হয়েছে তার...

—চুপ কর। চুপ কর। চোখ বুজে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন উমা,— আমাকে তুই পরীক্ষা করছিস ?

—না মা...

—না মা আবার কি ? মাকে নিয়ে মজা করতে লজ্জা করছে না তোর ? চকিতে উমা কেমন পাগলপারা। ইন্দ্রাণীর একটি কথাও শুনতে তিনি রাজি নন আর, চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছেন মেয়েকে। মাকে শান্ত করার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল ইন্দ্রাণী। মাথা নত, বসে আছে স্থাণুবৎ।

হট্টগোলে ধীরাজের ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে এসেছেন,— হল কী তোমার ? এমন করছ কেন ? তুই কখন এলি ইনু ?

ইন্দ্রাণীকে কথা বল্যর ফুরসত দিলেন না উমা। হাউমাউ করে উঠলেন,— তোমার মেয়েকে তুমি সাবধান করে দাও।

ধীরাজ ভোঁতা চোখে তাকালেন,— কী করেছে ইনু ?

—ওকেই জিজ্ঞেস করো। ওর দয়ায় বেঁচে আছি বলে আমাদের নিয়ে যা-খুশি খেলা করছে।

ইন্দ্রাণী মাকে থামাতে চাইল, স্বর ফুটল না।

উমা বিকারগ্রস্তের মতো ফোঁসফোঁস করছেন,— মায়ের দুঃখ তুই কী বুঝবি ? নিজেকে তো কখনও ছেলেমেয়ে হারাতে হয়নি !

ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘর থেকে ব্যাগ নিয়ে সোজা বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। ঝাঁ-ঝাঁ করছে মাথা, চুলের পাশের রগ দুটো ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। মা'র সব কটা কথাই কি প্রলাপোক্তি ? রাগের মাথায় মানুষ তো সত্যি কথাই বলে, মনের জমা ক্লেদ উগরে দেয়, নয় কি ? মা মেয়ের সম্পর্কের মাঝেও এত নিষ্করুণ রঙ থাকে ! ক্ষোভ, ঈর্ষা, হীনমন্যতাবোধ... ! বাবা-মা'র প্রতি কর্তব্য করতে করতে ইন্দ্রাণীর মনে বুঝি সূক্ষ্ম অহং জন্মেছিল। সেই অহংবোধ বুঝতে দেয়নি যাদের প্রতি মানুষ কর্তব্য পালন করে তাদের মধ্যেও এক বিপরীত ক্রিয়া চলতে থাকে অহর্নিশি। তাদের কাছে গ্রহণ করাটাও ক্রমশ গ্লানিময় বোঝা হয়ে যায়। অন্তত গ্রহীতার মধ্যে যদি আত্মসম্মানবোধ থাকে।

তা বলে তার শান্ত নিরীহ মা... !

কী করবে ইন্দ্রাণী ? মা-বাবার সংসার থেকে একটু একটু করে দূরে সরিয়ে নেবে নিজেকে ? ধ্যুৎ, তা হয় না। দু'-দশ মিনিট পরেই স্বাভাবিক হবে মা, নিজের ভেতরের কালো ছায়াগুলোকে দেখতে পেয়ে কুঁকড়ে যাবে লজ্জায়, হয়তো বা অসুস্থ হয়ে পড়বে। বরং সে সহজ ভাবে আসা-যাওয়া করলে ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দ হবে মা, অন্তত সে রকমটা ভান করবে। ওই অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আর কষ্ট বাড়িয়ে কী লাভ !

বাড়ি ফিরে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল ইন্দ্রাণী। কতক্ষণ ইন্দ্রাণী জানে না। কে বাড়িতে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে হুঁশ নেই। কখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধে এল, সন্ধে গড়িয়ে রাত, ইন্দ্রাণী জানে না। অস্থির অস্থির লাগছে। তনুর কথাটাও শেষ পর্যন্ত বলা হল না বাবা-মাকে। এক দিক দিয়ে ভালই হল। মা তার স্বপ্নের তনুময়কে নিয়েই থাক। বাবা খুঁজুক ছেলেকে, কাগজ আর টিভি-র পর্দায়। এও হয়তো এক ধরনের সুখ। যদি কখনও তনু আসেও, তার সঙ্গে বোঝাপড়া হোক বাবা-মা'র। শুধু ইন্দ্রাণীই যে কেন বাতাসহীন জালে আটকে গেল ? সে মা-বাবার পাশে থাকলে তারা কৃতজ্ঞতার ভারে হাঁসফাঁস করবে, আবার ইন্দ্রাণীকেই গিয়ে গিয়ে সে বোঝা লাঘবের চেষ্টা করতে হবে— এ এক বিচিত্র অলাতচক্র। তনুর মৃত্যুসংবাদ এলে কি ছবিটা অন্য রকম হত ?

খুট শব্দ। আলো জ্বলেছে ঘরের। ইন্দ্রাণী চোখ কুঁচকে তাকাল। তিতির। ড্রয়ার খুলে কি যেন ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

—কী করছিস ওখানে ?

—ওষুধ খুঁজছি। তিতির ফিরে তাকাল না,— পেইন কিলার।

—পেইন কিলারে কী দরকার ?

—আছে। খুঁজছি যখন, তখন নিশ্চয়ই দরকার আছে।

চড়াং করে রক্ত উঠে গেল মাথায়,— ঢ্যাঁটামো করবি না। যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দে।

তিতির সোজা হল,— বাবার লাগবে। পেটে ব্যথা হচ্ছে।

—আবার গিলে এসেছে বুঝি ?

জবাব দিল না তিতির, ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা যেন ঝাঁকি মেরে দাঁড় করিয়ে দিল ইন্দ্রাণীকে। দুমদাম পায়ে আদিত্যর ঘরে এসেছে।

ছত্রখান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে আদিত্য, মুখ বিকৃত হচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘরময় উগ্র দিশি মদের গন্ধ। আদিত্যর সামনে তিতির, হাতে জলের গ্লাস।

ঝাপটা দিয়ে মেয়ের হাত থেকে গ্লাসটা ফেলে দিল ইন্দ্রাণী। তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠেছে,— মরতে পারো না তুমি ! একটু শান্তি দাও আমাকে, একটু শান্তি দাও।

৮৩

হল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল তিতির। মন্থর পায়ে। টেস্ট চলছে, আজ ফিলজফি হয়ে গেল, আর মাত্র একটা পরীক্ষা বাকি। ইকনমিক জিওগ্রাফি। আজকের পেপার দুটো মন্দ হয়নি, এখন শেষ দিনটা ভালয়-ভালয় কাটলে হয়। এবার তার অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রস্তুতি ভালই হয়েছে, কিন্তু তাকে আত্মতুষ্ট হলে চলবে না। প্রিটেস্টে ওই ফোর্থ সাবজেক্টে সে মাত্র চুয়াল্লিশ পেয়েছিল। ছিহ্।

—তিতির...অ্যাই তিতির ?

দুদ্দাড়িয়ে নেমে আসছে ঝুলন। হাঁপাচ্ছে,— হিয়ার খবর শুনেছিস ? হিয়া হাসপাতালে...না না না, নার্সিংহোমে।

নিমেষে তিতিরের মুখ পাংশু, —কেন ?

—অপারেশান হয়েছে। অ্যাপেনডিসাইটিস।

—কোত্থেকে শুনলি ?

—ওদের সেকশানের পৌলোমী বলল। ইশ, বেচারার টেস্টটা দেওয়া হল না। বছর না নষ্ট হয়ে যায় !...একদিনও এগজামের পর ওকে দেখতে পাই না, আমার আগেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল...

অল্প অল্প ভাললাগা মন ঝুপ করে নিবে গেল তিতিরের। নীরবে সিঁড়ি ভেঙে স্কুলের চাতালে এসে দাঁড়াল। দেওয়ালের গা ঘেঁষে সার সার টবে ক্রিসেনথিমাম ডালিয়া জিনিয়া গাঁদা, সেদিকে চোখ পড়তেই বুক সিরসির। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী অপরাধী লাগছে। মনে হচ্ছে হিয়ার এই শারীরিক বিভ্রাটের জন্য সেই যেন দায়ী ! তিতির কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, সে মনে মনে হিয়ার অমঙ্গল কামনা করেনি ! অথচ এই হিয়া এককালে তার কত প্রাণের বন্ধু ছিল !

ঝুলনেরও সদা উজ্জ্বল মুখে ছায়া,— আমাদের তো একদিন দেখতে যাওয়া উচিত, কী বল ?

—হুঁ।

—কাল এগজামের পর যাবি ?

তিতিরের চোখ আবার টবের দিকে। কত রঙের ফুল ফুটেছে ! লাল সাদা খয়েরি হলুদ গোলাপি...আইসক্রিম পার্লারের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল টোটো আর হিয়া ! লাল-সাদা ডালিয়া হাসছে হাওয়ায়...টোটোর হাতে ম্যাজিক মুন, হিয়ার হাতে পিঙ্ক অ্যাফেয়ার ! রঙিন আইসক্রিম দুটো থেকে আহ্লাদের বাষ্প উঠছে !

তিতির ঝট করে মুখ ফেরাল,— তুই ঘুরে আয়। আমার যাওয়া হবে না।

—একা যাব ?

—কাউকে একটা সঙ্গে নিয়ে নে। দেবস্মিতার সঙ্গে কনট্যাক্ট কর। আমাকে কাল পরীক্ষার পর দিদার বাড়ি যেতে হবে।

ঝুলন আর পীড়াপীড়ি করল না। মাথা দুলিয়ে বলল,— হিয়ার লাইফটা খুব কমপ্লেক্স হয়ে গেছে রে।

—সে তো ছিলই। নতুন কি হল ? তিতিরের গলা ভার ভার।

—বা-রে, ওর ঠাকুমা ওল্ড এজ হোমে চলে গেছেন না !

তিতির ছোট্ট ধাক্কা খেল। এ খবরটাও রাখে না সে !

মনের ভাব যথাসম্ভব গোপন রেখে বলল,— তো ?

—বেচারাকে এখন একসঙ্গে তিন দিক ব্যালেন্স করতে হচ্ছে। একবার ঠাকুমার কাছে ছোটে, একবার মা ভাই, এদিকে বাড়ি তো আছেই।

তিতিরের হাসি পেয়ে গেল। আর একটা দিকও আছে হিয়ার, ঝুলন জানে না।

ঝুলন ব্যাগটাকে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে সরাল,— জানিস তো, হিয়াদের ফোন এসে গেছে ?...মাঝখানে একদিন ফোন করে অনেক গল্প করল।

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের মতো সতর্ক হয়েছে তিতির,— কী গল্প ?

—ঠাকুমার কথাই বেশি বলছিল। ঠাকুমার জেদের কাছে হার মেনে হিয়ার বাবা নাকি বাধ্য হয়ে ওল্ড হোম অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছেন। নাউ শি ইজ হ্যাপি দেয়ার। আমাদের সকলের কথা নাকি খুব জিজ্ঞেস করেন। হিয়ার বাবাও নাকি এখন হিয়াকে চোখে হারান। স্টেপমাদারের ওই ফান্টুস ছেলেটা, সে নাকি হোস্টেলে চলে গেছে। স্টেপমাদারও এখন ওর ওপর বেশ অ্যাফেকশনেট।

—তা-হলে আর প্রবলেম কি ? সূক্ষ্ম বিদ্রূপ ছুঁড়ল তিতির।

—আছে। ঝুলন চোখ টিপল,— সেই চুড়েলের নাকি আবার বাচ্চা হবে।

—যাহ। এই বয়সে ?

—হতেই পারে। মেনোপজ তো হয়নি। হয়তো সেকেন্ড হাজব্যান্ডকে বলেছে আমি তোমারও

একটা সন্তান ধারণ করতে চাই ! হিহি। একটু হেসেই গম্ভীর হল ঝুলন,— হিয়া এই নিয়ে ভীষণ মনমরা ছিল। জানিসই তো, বাবার ব্যাপারে ও কেমন পজেসিভ। হয়তো অ্যাপেনডিসাইটিসটাও সেই কারণে...জানিস তো, মেন্টাল টেনশানে অ্যাপেনডিসাইটিস বাড়ে।

অপরাধবোধের পাথরটা একটু যেন সরল তিতিরের, ঈর্ষার জ্বালাও যেন কমল সামান্য। চাপা বিষাদে ভরে গেল বুক। হিয়ার জন্য, শুধু হিয়ার জন্য। পড়ন্ত বিকেলে তাদের ছাদে এসে আগুন উগরে ছিল হিয়া, বৃষ্টির মতো কেঁদেছিল। সেই বিকেলের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে। ছোট্ট থেকে হিয়ার যত কথা তিতিরের কাছে। তিতিরও কি কম ভালবাসত হিয়াকে ! হঠাৎ সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার জন্য কে দায়ী ? টোটো ? হিয়া ? নাকি তিতির নিজেই ? হিয়া কী করে বুঝবে টোটোর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা কোথায় বাজে তিতিরের ? মুখ ফুটে কোনওদিন তিতির তাকে বলেছে কিছু ? শুধুমুদু ওই দুঃখী মেয়েটার ওপর রাগ দেখাচ্ছে তিতির।

গেটের মুখে ঝুলনের নতুন বয়ফ্রেন্ড। অনির্বাণ। এবার শুশুনিয়া পাহাড়ে গিয়ে আলাপ হয়েছে, এখন সে ঝুলনের ছায়াসঙ্গী। যাদবপুরে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, সেকেন্ড ইয়ার। অনির্বাণের বাবা বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। লুঙ্গি পরে অনির্বাণের মা, মাঝে মাঝে। এতে অবশ্য ঝুলনের একটুও আপত্তি নেই।

ঝুলন উসখুস করছে,— তা হলে যাই রে। কাল...

তিতির পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল,— কোন নার্সিংহোমে আছে রে হিয়া ?

—সাদার্ন ক্লিনিক।

—সেটা কোথায় ?

—যাদবপুর। স্টেট বাস গুমটির পেছনটায়।

তিতির অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ি ফিরছিল। সেলিমপুরে বাস থেকে নেমে তাকাল এদিক ওদিক। নিজের অজান্তেই। অভ্যেসমতো। সুকান্ত নেই আজ। বাঁচা গেছে। ছেলেটার বকবক আজ ভাল লাগত না। বুক আবার ভারী হয়ে যাচ্ছে তিতিরের। যাবে একবার হিয়াকে দেখতে নার্সিংহোমে ? উচিত, খুবই উচিত। কিন্তু চোরকাঁটাটা যে খচ খচ করেই বুকে, মিলিয়েও মেলাতে চায় না। ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে, তিতিরই হিংসুটে। কিন্তু তুই কি করেছিস হিয়া ! মনে যদি তোর পাপ না থাকে, তিতিরকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিস কেন ! ঝুলন এখন প্রিয় বন্ধু হল, তিতির মন থেকে ভ্যানিশ ! ওই অভদ্র দাম্ভিক ছেলেটা তোকে কি এমন জাদু করল যে তিতিরের কাছে কিছু না জানতে চেয়ে... ! যাবে না তিতির, মোটেই দেখতে যাবে না হিয়াকে। তুই পেট কেটে পড়ে থাক, তোর একটা বছর নষ্ট হোক, সৎমার বাচ্চাকে দেখে পা ছড়িয়ে বসে বসে কাঁদ, মনের দুঃখে মরে যা, তিতির খুশি, খুব খুশি। তোর আর এত দুঃখই বা কিসের, তোর না রাজর্ষি আছে !

আকাশের রঙ মরে আসছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ডিসেম্বরের শুরুতেই বেশ শীত পড়ে গেছে এবার, দিনমানেও তার কামড় স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। হঠাৎ হঠাৎ বাতাস উঠছে একটা। শুকনো। এলোমেলো। নগরীর ক্ষীয়মাণ সবুজ বাদামি হচ্ছে ক্রমশ, এবার তাদের পাতা ঝরানোর পালা।

বাড়ি পৌঁছে তিতিরের তিতকুটে মনটা তিরিক্ষি হয়ে গেল। বাইরে থেকে মা আর সন্ধ্যার মা'র গলা পাওয়া যাচ্ছে, জোর চেঁচামেচি করছে দুজনে। কাপড় কাচা নিয়ে বিকৃত ফ্যাসফেসে স্বরে কি যেন বলছে মা, সন্ধ্যার মা সমানে টক্কর দিয়ে চলেছে। আজকাল বড্ড মেজাজ বেড়েছে মা'র ! সর্বক্ষণ শিরা ফুলিয়ে একে শাসাচ্ছে, ওকে ধমকাচ্ছে... ! ক'দিন আগে সামান্য খাবার ঢাকা নিয়ে ছোটকাকে ছ্যার ছ্যার করে কথা শুনিয়ে দিল। বাবা আর তিতির তো রোজকার খদ্দের, তাদের তো যখন তখন গালাগাল করছে। কারণে, অকারণে, নিজের তৈরি করা কারণে। বাবার অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিসটা বাড়ছে দিন দিন, প্রায়ই ব্যথা নিয়ে শুয়ে থাকে, ভয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। মা চেঁচালে পরদিন আরও বেশি করে খেয়ে আসে। মাঝে তো রোজ বেশ ফিরছিল বাড়িতে, আবার গায়েব হওয়া শুরু হয়েছে। কোন দিন না কিছু অঘটন ঘটে যায়। যদি ঘটে, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী

হবে ওই মা। যার পথ চেয়ে সারা সন্ধে বসে থাকত, সে এলেও আজকাল মা'র বাক্যবাণ বন্ধ হয় না! স্ট্রেঞ্জ!

বেল বাজাতেই ঝুপ করে ঝগড়া থেমে গেছে। দুই যুযুধান প্রতিপক্ষের মাঝখান দিয়ে তিতির সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল ঘরে, দড়াম করে দরজা ভেজাল, ইউনিফর্ম বদলে বেরিয়ে এসেছে। খাবার টেবিলে বসে নিস্পৃহ স্বরে বলল,— পেটে কিছু ফেলা যাবে?

যেন এমনই একটা কোনও ইন্ধন চাইছিল বাড়ি। মুহূর্তে রান্নাঘর থেকে হাঁ হাঁ ছুটে এল সন্ধ্যার মা,— তোমার খাবারই তো করতেছিলাম, তোমার মা করতে দিল কই! সাঁঝের বেলা তার চাদর কাচানোর বাই উঠল!

—নোংরা থাকলে বলব না? ঝামরে উঠেছে ইন্দ্রাণী,— এখানে কাদা, ওখানে দাগ, সাবানগুলো কি মাগনা আসে?

—অত যদি পিটপিটিনি, কাচার জন্য আলাদা লোক রেখে নাও। আমি পারবনি। আছড়ে আছড়ে কাঁধে ব্যথা ধরে যায়, তবু কাউর মন ওঠে না!

আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেছে সন্ধ্যার মা, ছ্যাঁকছোক কি যেন ছাড়ছে কড়ায়, বোধহয় ডিম-পাঁউরুটি। সেখান থেকেই গজগজ করে উঠল, সন্ধ্যার মা ছিল বলে তরে গেলে, অন্য কেউ এত মুখ ঝামটানি সহ্য করত না।

উত্তরে কিছু একটা বলল ইন্দ্রাণী, তার উত্তরে সন্ধ্যার মা, তার জবাবে ইন্দ্রাণী...। তিতিরের অসহ্য লাগছিল। গটমট করে উঠে আদিত্যর ঘরে এল, আবার দড়াম করে দরজা বন্ধ। টানটান শুয়ে পড়েছে। এত তুচ্ছ কারণে মা'র মতো একজন সন্ধ্যার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করছে, ভাবা যায়! কিন্তু মা এরকমই করে আজকাল, প্রায়শই করে। আগে মা কথা বলত কম, কিন্তু তার চোখে চোখ রাখলে রক্ত হিম হয়ে যেত। আর এখন মা'র দাপাদাপি নিষ্ফল আস্ফালন ছাড়া আর কিচ্ছু মনে হয় না। কেন এত খেলো হয়ে যাচ্ছে মা!

দরজায় গুমগুম কিল পড়ছে,— দিদি, তোমার খাবার।

—আমার ক্ষিধে নেই। টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখো।

বন্ধ দরজার ওপার থেকে এবার ইন্দ্রাণীর গলা,— ন্যাকামো করতে হবে না, খেয়ে উদ্ধার করো।

—বলছি তো আমি খাব না।

—তবে আর কি, ঢঙ করে পড়ে থাকো। দুনিয়াসুদ্ধু লোকের ঢঙ সহ্য করাই আমার কপাল-লিখন। এক্ষুনি না গিললে ওই খাবার আমি টান মেরে নর্দমায় ফেলে দেব।

আবার একটা নাটক আরম্ভ হতে চলেছে! থমথমে মুখে খাবার টেবিলে এসে বসল তিতির। মাথা নত করে কচকচ চিবোচ্ছে ডিম-পাঁউরুটি, জিভে কোনও স্বাদ পাচ্ছে না, তবুও। চোখ থেকে টুপ করে একফোঁটা জল প্লেটে ঝরে পড়ল। আর একটা ফোঁটা। আর একটা ফোঁটা। আগে আগে পরীক্ষা দিয়ে ফিরলে কোয়েশ্চেন ধরে ধরে জেরা করত মা, আজ পেপারটা কেমন হল তাও একবার জিজ্ঞাসা করল না! উল্টে মেজাজ মেজাজ মেজাজ। গলায় মণ্ড হয়ে আটকে যাচ্ছে পাঁউরুটি, চেষ্টা করেও গিলতে পারছে না তিতির। বাবার পক্ষ নিয়ে কথা বলে তিতির এত চক্ষুশূল হয়ে গেল!

সন্ধ্যার মা চা এনেছে,— আর এক পিস রুটি দেব?

তিতির চোখ মুছে দ্রুত দুদিকে মাথা নাড়ল।

সন্ধ্যার মা ফিসফিস করে উঠল,— তোমাদের মায়াতেই পড়ে আছি দিদি। নইলে কবে এই কাজের মুখে লাথি মেরে চলে যেতাম।

বড় একটা শ্বাস ফেলল তিতির। এ-বাড়ি থেকে সক্কলের চলে যাওয়া উচিত। কোনও জনমনিষ্যি যেন এ বাড়ির ছায়া না মাড়ায়।

একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে বই-খাতা খুলে বসল তিতির। আদিত্যর খাটে। মন বসে না। কখনও মা, কখনও হিয়া, কখনও টোটো হানা দেয় অক্ষরের ছদ্মবেশে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়

একাগ্রতা। তবু তিতির জোর করে ঢুকে পড়ল ভূগোলের পাতায়। নিত্যদিনের মতো কেটে গেল সময়টা।

রাত তখন সাড়ে নটা। দরজায় পরিচিত স্বর,— পরীক্ষা আজ কেমন হল ম্যাডামের?

একবার শুভাশিসের দিকে চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল তিতির,— ভাল।

—কোয়েশ্চেন কেমন ছিল?

—মোটামুটি।

—ফিলজফি তো? ইন্ডিয়ান, ওয়েস্টার্ন...

তিতির একটু চোয়াল ফাঁক করল।

—কী পড়ায় তোদের ওয়েস্টার্নে? হেগেল মার্কস আছে? মেটিরিয়ালিজম? ডায়লেকটিকস?

ডাক্তার আঙ্কলের কৌতূহলটা অনেক দিন পর হঠাৎ ভাল লাগছিল তিতিরের। সঙ্গে একটা সন্দেহ উঁকি মারছে। মা জানতে পাঠায়নি তো! হেসে অল্প মাথা নাড়ল তিতির, না হ্যাঁ-এর মাঝামাঝি।

শুভাশিস খাটের দিকে এগিয়ে এল,— এইচ এসে জব্বর একটা রেজাল্ট কর তো। টোটোকে একদম ডাউন দিয়ে দে।

যেন কাঁটা ফুটল সর্বাঙ্গে, তবু হাসিটা অমলিন রাখল তিতির। তেরচাভাবে বলল,— সায়েন্সের সঙ্গে কি হিউম্যানিটিজের কম্পিটিশন হয়?

শুভাশিস বসেছে পাশে,— তোকে আমি দশ পারসেন্ট গ্রেস দেব।

চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে, না বিদ্রূপ করছে! তিতির শক্ত হয়ে গেল,— আমার গ্রেস চাই না ডাক্তার আঙ্কল।

শুভাশিস আলগা ঘেঁটে দিল তিতিরের চুল,— পাগলি মেয়ে।

সহসা তিতির আড়ষ্ট। ডাক্তার আঙ্কলের এই স্পর্শটুকু ভাল লাগছে, আবার এই স্পর্শই তৈরি করছে এক তীব্র বিতৃষ্ণা। যেন টোটোর বাবা টোটোর হয়ে মজা করছে তার সঙ্গে! তিতির জানে ডাক্তার আঙ্কলের তাকে ভালবাসায় কোনও খাদ নেই, তবু এমনটা মনে হচ্ছে। আরও কি যেন একটা চিনচিনে অনুভূতি! কি যেন!

তিতিরের পিঠে হাত রেখেছে শুভাশিস,— দেখতে দেখতে তুই কত বড় হয়ে গেলি রে তিতির! মনে আছে, যখন ছোট্ট ছিলি, তোকে কত্ত ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আমি লোফালুফি খেলতাম! তুই খিলখিল হাসতিস, আর ছোড়া থামালেই কান্না জুড়ে দিতিস! আমাকে আরও ওপরে তুলে দাও আঙ্কল, আরও ওপরে!

এ ধরনের কথা আজকাল প্রায়ই বলে ডাক্তার আঙ্কল। কেন বলে? তার প্রতি তিতিরের ঔদাসীন্য টের পেয়েছে বলেই কি?

তিতির মনে মনে বলল,— তখন অনেক কিছু বুঝতাম না যে।

শুভাশিস হাত সরিয়ে নিল,— সত্যিই তুই বড় হয়ে গেছিস তিতির।

তিতির আবার নিঃশব্দে বলল,— হয়েছিই তো। তোমার ছেলেই আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে বড় করে দিল।

উঠে পড়ল শুভাশিস। তিতিরের কাঁধে হাত রেখে খুব আস্তে আস্তে মাথা দোলাচ্ছে। দু ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

তিতির ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল শুভাশিসকে। ইশ, ডাক্তার আঙ্কল যদি মা'র কেউ না হয়ে, টোটোর কেউ না হয়ে, শুধুই ডাক্তার আঙ্কল হত!

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে হিয়াকে দেখতে গেল তিতির। একাই। পরের পরের দিন।

নার্সিংহোম খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না, হিয়ার কেবিনও না। একতলার বোর্ডে সার সার

কেবিনের নম্বর লেখা আছে, সঙ্গে রুগীর নাম। ভিজিটিং কার্ডেরও তেমন কড়াকড়ি নেই, সোজা তিতির তিনতলায় উঠে গেল।

কেবিনের পর্দা সরিয়েই অপ্রস্তুত। কাঁদছে হিয়া, ঘাড় নিচু করে চোখ মুছছে। সামনে হিয়ার মা আর ভাই। মা হাত বোলাচ্ছে মেয়ের মাথায়।

তিতিরের দিকে চোখ পড়তে সেকেন্ডের জন্য থমকেছে হিয়া, পরক্ষণে তার ভেজা চোখের মণি জ্বলজ্বল। হাত তুলে ডাকল,— আয়। মা দ্যাখো কে এসেছে!

হিয়ার মা ইন্দ্রাণীরই সমবয়সী প্রায়, জোর এক-আধ বছরের বড় হবে। কিন্তু চেহারায় বেশ বয়সের ছাপ পড়ে গেছে, ফর্সা লম্বাটে মুখে এখনই উঁকি দিচ্ছে বলিরেখা। তিতিরকে চিনতে বুঝি কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার।

তিতিরই বলে উঠল,— মাসিমা, আমি তিতির। ...রনি, তুমি আমায় চিনতে পারছ? সেই যে তোমার ইয়া লম্বা বেলুনটা আমার হাতে লেগে ফেটে গেছিল, তুমি রেগেমেগে আমায় কামড়ে দিয়েছিলে!

দিদির কাছে আসার জন্য আজ ফুলপ্যান্ট পরেছে রনি, নিজের গুণপনার কথা শুনে লজ্জায় ধরণীতে মিশে গেল।

হিয়ার মা হাসছে,— কতকাল পর তোমায় দেখলাম! তুমি কী সুন্দর হয়েছ তিতির!

হিয়ারও কান্না-মোছা মুখে হাসি,— আগে বুঝি তিতির খুব কুৎসিত ছিল?

—আহা, তাই বলেছি? হিয়ার মা তিতিরের চিবুক ছুঁল,— তখনকার সৌন্দর্য একরকম, এখনকার সৌন্দর্য একরকম। ...তুমিও তো রেজাল্ট ভাল করেছিলে তিতির, হিয়ার সঙ্গে সায়েন্স নিয়ে পড়লে না কেন?

—ওরেব্বাস, অঙ্ককে ও যমের মতো ভয় পায়।

—তাই বুঝি?...অবশ্য হিউম্যানিটিজই বা মন্দ কি! ইংলিশ নিয়ে পড়তে পারো, হিস্ট্রি নিয়ে পড়তে পারো...

আরও দুটো-চারটে কথা বলে আবার মেয়ের মাথায় হাত রেখেছে মা,— তোর তো বন্ধু এসে গেছে, এবার তা হলে আমরা আসি মুন্নি? মন খারাপ করিস না, আমি আবার কাল আসব।

—তাড়াতাড়ি আসবে কিন্তু। রনি, তুইও আসবি।

দিদির দিকে একটুকরো লাজুক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে মা'র সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে রনি, হিয়া দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে, কেমন আকুল চোখে। তিতিরের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আহা রে হিয়া!

হিয়ার বিছানার কাছ ঘেঁষে টুল টেনে বসল তিতির। নরম গলায় বলল,— মাসিমা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন যে? ভিজিটিং আওয়ার শেষ হতে তো ঢের দেরি।

—বাবা আসবে যে। হয়তো মিসেস বাবাও।

—ও।

তিতির চুপ করে গেল। হিয়ার সমস্যাটা পুরোপুরি বোঝে না সে, আবার অনেকটা বোঝেও। তার বাবা-মা'র বিচ্ছেদ ঘটেনি বটে, তবে নৈকট্যও তো নেই বড় একটা। বাবা-মাকে কি কখনও একত্রে বাড়ির বাইরে দেখেছে সে? চট করে মনে করতে পারল না।

পাতলা সবুজ কম্বলে হিয়ার বুক পর্যন্ত ঢাকা। সাদা বিছানার চালচিত্রে ভারি পবিত্র দেখাচ্ছে হিয়াকে। একটু বুঝি শীর্ণ মুখ, ঠোঁটে ফ্যাকাসে ভাব, গালে এখনও লেগে আছে জলের রেখা, সবই যেন এ ঘরের সঙ্গে মানানসই।

হাত বাড়িয়ে তিতিরের হাত ধরল হিয়া,— এলি তবে! আমি জানতাম তুই আসবি।

তিতির ঢোঁক গিলল,— ওমা, আসব না কেন? আগেই আসতাম, খবরটা পেলাম এই পরশু।

—ঝুলনের কাছে?

ঘাড় নাড়ল তিতির। জিজ্ঞাসা করল,— হঠাৎ এমনটা হল কেন?

—কী জানি রে ভাই, পরীক্ষার আগের আগের দিন রাত্তির থেকে কী পেইন। আগেও ব্যথা হত, মাঝে মাঝে। বাবাকে বলিনি। ভেবেছি বাবা বাবাকে নিয়ে থাকুক, আমি আমাকে নিয়ে...নয় কষ্ট পেলামই। সেদিন এমন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল!

—কতটা কেটেছে পেট ?

—বেশি না, চার-পাঁচ সেন্টিমিটার। হাতের আঙুলের মাপে বোঝাতে চেষ্টা করল হিয়া।

—স্টিচ আছে ?

—নেই! বাপস, কী টান লাগে।

—কাটবে কবে ?

—কাটবে না। এ স্টিচ শরীরে মিলিয়ে যায়।... পরশু ছেড়ে দেবে।

—টেস্ট তো দিতে পারলি না, কী হবে ?

—রেক্টর ম্যাডামের সঙ্গে বাবা কথা বলে এসেছে। উনি তো বলেছেন প্রিটেস্টের বেসিসে অ্যালাও করে দেবেন। তবু একটা ইনফরমাল টেস্ট নিতে পারেন। জানুয়ারিতে। জাস্ট প্রিপ্যারেশানটা দেখার জন্য।

—পারবি ?

—দেখি। দিতেই হবে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাচ্ছিল দুজনেই। যেন বুঝতে পারছিল এইসব নগণ্য কথা বলার জন্য তারা মুখোমুখি হয়নি আজ, যেন অন্য কিছু কথা আছে। মনে হতেই আরও বেশি তুচ্ছ কথায় জড়িয়ে পড়ছে দুই বন্ধু। দু' বিনুনি বেঁধে হিয়াকে কেমন ছোট্টমেয়ে ছোট্টমেয়ে মনে হচ্ছে, এই নিয়ে তিতির হাসাহাসি করল খানিক, তিতিরের সালোয়ার কামিজটার প্রশংসা করল হিয়া। ডাক্তারির জন্য হিয়া জয়েন্টে বসছে কিনা প্রশ্ন করল তিতির, হিয়া মজা করল তিতিরের প্রায়বিস্মৃত নান হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। ঠাম্মার কথা বলে হিয়া ঘরের বাতাস ভারি করে দিল একটুক্ষণ, ঠাম্মার ওল্ড এজ হোমের ঠিকানা চেয়ে নিল তিতির।

বড় দ্রুত ফুরিয়ে যায় কথারা। পলকের নৈঃশব্দ্য তীব্র হিমেল বাতাস হয়ে শীতল করে দেয় ছোট্ট কেবিন।

মানসিক চাপ বাড়ছে ক্রমশ। যেন অতল সমুদ্রের নীচে বসে কথা বলছে দুজনে, প্রবল চাপে ফেটে যাচ্ছে ফুসফুস।

ভুস করে যেন ভেসে উঠল তিতির। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,— তোদের সেকশানের কেউ দেখতে আসছে না ?

সাদা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল হিয়া,— তুই সেদিন গঙ্গার ধারে ওরকম সিন করছিলি কেন রে ?

তিতির গম্ভীর হল,— রাজর্ষি আসে না এখানে ?

হিয়া চোখ বুজল,— নাম কী রে ছেলেটার ? ওকেই সিনেমা হলের সামনে ঝুলন একদিন ঝাড় দিয়েছিল না ?

তিতির ক্রূর চোখে তাকাল,— জয় রাইডে বেরিয়ে তো মরতে বসেছিলি, তবু শিক্ষা হয়নি ?

হিয়ার চোখ স্থির হয়ে থাকা পাখার ব্লেডের দিকে,— তুই শেষে ওই বোকা বোকা ছেলেটাকে পছন্দ করলি ?

তিতির টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল,— তুই কী করে জানলি সুকান্ত বোকা বোকা ? ওই পাকা স্নব ছেলেটা তোকে বুঝিয়েছে বুঝি ?

হিয়া হিসহিসিয়ে উঠল,— তুই জানলি কী করে রাজর্ষি স্নব ? তুই বুঝি ওর সঙ্গে ফ্লার্ট করতে গিয়েছিলি ? তাই রাজর্ষি তোর নাম সহ্য করতে পারে না!

তিতির দপ করে জ্বলে উঠল,— জানিস, আমি তোর রাজর্ষির ছাল ছাড়িয়ে নিতে পারি ? একবার

সুকান্তকে বললেই...

তিতিরের মুখ লাল হয়ে গেছে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলো আসছে ঘরে, সোনালি আভায় আগুনের মতো জ্বলছে তিতিরের মুখ। তীরবেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হিয়া কাতর স্বরে ডাকল,— তিতির, যাস না। শোন। রাজর্ষি সুকান্তকে নিয়ে আমরা কেন ঝগড়া করে মরব ? আবার কি আমরা আগের মতো বন্ধু হতে পারি না ?

হিয়ার রুগ্‌ণ স্বর শুনতে পেল না তিতির। চলে গেছে অনেকটাই।

৮৪

কনকনে শীতে দুপুরভর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে আদিত্য। নেহাত মৌজ করে নয়, অনেকটা দায়ে পড়ে। অঘ্রান সংক্রান্তির দিন সন্ধে থেকে হঠাৎ বৃষ্টি নামল খুব, ভিজে ন্যাতা হয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরল, তারপর থেকে টানা চার দিন সর্দি কাশি জ্বর। কাল থেকে জ্বর আর নেই, তবে শরীর বড় দুর্বল। খেতে ইচ্ছে করে না, উঠতে ইচ্ছে করে না, বাথরুমে পর্যন্ত যেতে ইচ্ছে করে না, সারা দিন এই লেপের ওমে শুয়ে থাকাটাই যা আরাম। পেট ব্যথা তো সঙ্গী হয়ে আছেই, সর্বক্ষণ আছে। চিনচিন দুঃখের মতো, আধচেনা কষ্টের মতো। সকাল থেকে আজ ব্যথাটাও বেশ কম, দু-এক মুহূর্তের জন্য যেন হারিয়েও যাচ্ছে কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে উতলা হয়ে পড়ছে আদিত্য, যেন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না। যন্ত্রণাও কি এক মাদক নেশা !

আদিত্য গোদা পাশবালিশটাকে কাছে টানল। খানিক আগে তন্দ্রার ঘোর ছিঁড়ে গেছে। তিতিরের এক বন্ধু এল, তার কলিংবেলের ডাকে। দুটিতে এতক্ষণ কলকল করছিল বারান্দায়, শুনতে পাচ্ছিল আদিত্য। কলকল্যানি থেমে গেছে, গেটে একটা শব্দ মতন হল যেন, তিতির কি বন্ধু নিয়ে বেরিয়ে গেল ! যাক, মেয়ের বেরোনোই ভাল। কেন দিনরাত এই পুন্নাম নরকে বন্দি থাকবে মেয়ে !

ঘোর না থাকলে মনে নানান ভাবনা আসে। চিত্তাকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘের মতো ওড়ে ভাবনারা, ফেনা ফেনা ঢেউ হয়ে দোলে। পরিতোষটা একেবারে পথে বসিয়ে দিল ! এত দিন পর টাকাটার প্রাপ্তিস্বীকার করেছে, কিন্তু আদিত্যর যাওয়া নিয়ে চিঠিতে উচ্চবাচ্যটি নেই ! ভাষার কী ছিরি ! কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোকে ছোট করতে চাই না রে ! ভবিষ্যতে সাহায্যের প্রয়োজন হলে এই দীনদরিদ্র আবার তোর কাছে হাত পাতবে, মনে থাকে যেন ! ব্যাটা গাঁটে গাঁটে জোচ্চোর, গঙ্গার ধারে ওর ছদ্মবেশ দেখেই আদিত্যর সাবধান হওয়া উচিত ছিল। রঘুবীর বলছিল, দ্যাখেন গে যান আপনার হাজার টাকা গাঁজার কলকেয় এখনও বুম বুম ফাটছে ! যদি তাই হয় ইন্দ্রাণী তো গায়ে থুতু ছেটাবে। পরিতোষ অবশ্য অতটা ফেরেব্বাজ নাও হতে পারে। মুখ ফুটে সে তো না লেখেনি, আদিত্য গিয়ে পড়লে সে কি ফিরিয়ে দেবে ? হয়তো হেসে বলবে, তোর মন পরীক্ষা করছিলাম রে ! সাধু-সন্নিসির আশ্রমে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই, এসেছিস যখন থাক তবে ! যাবে চলে, চোখ-কান বুজে গোটাবে তল্পিতল্পা ? এই শহরে বড় অপমান, শুধু অপমান... ! অপূর্ব পর্যন্ত সেদিন কী হেনস্থাই না করল ! ত্রিমূর্তি এন্টারপ্রাইজ উঠে গেছে শুনে শেয়ালদা স্টেশনের জনসমুদ্রের মাঝে খ্যাক খ্যাক হাসি ! পকেট হাতড়ে পড়ে থাকা তেত্রিশটা টাকা বার করে নিল ! তিন টাকা ফেরত দিয়ে বলল,— মনে আছে সত্তর টাকা বাকি রেখেছিলি ! বাকি চল্লিশ টাকা দিয়ে যাস ! আর ওই তিন টাকা দিয়ে বউকে ঝালমুড়ি কিনে খাওয়াগে যা ! নাহ্‌, মোহমুদ্গর ঝেড়ে ফেলে ওই কাশীতেই বড়ি ফেলতে হবে। আশ্রম খুলেও তো জীবনে শাইন করা যায়, না কি ? পরিতোষ আর সে মিলে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের মতো দেশে-বিদেশে শাখা খুলবে, প্লেনে চড়ে আমেরিকা ইউরোপের ভক্তদের কাছে ছুটবে, কাগজে কাগজে নাম উঠবে, ছবি বেরোবে...তখন যদি অপূর্বদের শিক্ষা হয় ! গেরুয়া বসন পরে সে যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, ইন্দ্রাণীও কি গলায় আঁচল দিয়ে তাকে প্রণাম করবে না !

ব্যথাটা চড়াং করে চাগিয়ে উঠল। অজান্তেই লেপের মধ্যে কুঁকড়ে গেল আদিত্য। ধীরে ধীরে টান করছে পা, ডান কাত থেকে চিত হল আস্তে আস্তে। চাপ সরতেই কমছে ব্যথা। আবার শুধু চিনচিন, কাছের বন্ধুর মতো।

কলিংবেল বাজছে আবার। ঘন ঘন। তিতির ফিরল কি ? আদিত্য কান খাড়া করল। উঁহু, তিতির নয়, তবে চেনা গলা। পুরুষ নারীর। জয়ি না ? সঙ্গে কে, শংকর ?

মুখ থেকে লেপ সরাল আদিত্য। ইন্দ্রাণীর গলা শুনতে পাচ্ছে,— তোমরা হঠাৎ ?

শংকর বলল,— আপনারা নয় আমাদের ভুলে যেতে চান বউদি, আপনার ননদ রক্তের টান কী করে মুছে ফেলে বলুন ? দাদা চাঁদু কেউ নেই ?

—আছে। বলেই ইন্দ্রাণী আদিত্যর ঘরে এসেছে।

পুট করে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল আদিত্য, অমনি ইন্দ্রাণীর চাপা স্বর শুনতে পেল,— মটকা মেরে পড়ে থেকো না। তোমার বোন ভগ্নীপতি এসেছে।

লেপটা কোমর পর্যন্ত সরাল আদিত্য, কায়দা করে আড়মোড়া ভাঙছে। অতি সাবধানে, যেন পেটের ডান দিকে বেমক্কা টান না পড়ে। হাতের ভরে আধশোওয়া হয়ে বাড়ির অভিভাবকের সুরে বলল,— এসো শংকর।...দুজনেই এসেছ ? ঝান্টু এল না ?

—ঝান্টু এখন দামড়া ছেলে, সে কি আর বাবা-মা'র সঙ্গে বেরোয়। শংকর বাপ্পার খাটে বসল,— পাড়ায় টেনিস বলের টুর্নামেন্ট চলছে. আপনার ভাগ্নে এখন সুব্রত মনা হওয়ার বাসনা ছেড়ে কপিলদেব হতে চায়।

শংকরের পরনে গলাবন্ধ বিদেশি পুলওভার, দামি কাশ্মীরি শালে ঝলমল করছে জয়শ্রী। উগ্র পারফিউম মেখেছে জয়শ্রী, গন্ধটা নাকে লাগে।

কন্দর্প ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। দাড়ি কামাচ্ছিল, বেরোবে বোধহয়, মুখে এখনও ফোঁটা ফোঁটা সাদা ফেনা। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জয়শ্রীকে জরিপ করল। হালকাভাবে বলল,— শংকরদার এদিকে কোনও ক্লায়েন্ট আছে নাকি ?

জয়শ্রী ভ্রূভঙ্গি করল,— অ্যাই, টিজ করবি না। গাড়িটা ছুটির দিন পড়েই থাকে, ভাবলাম দাদা-বউদির কাছ থেকে ঘুরে আসি। মেজবউদিও তোর শংকরদার কাছে দুঃখ করে, জয়ি আসে না, জয়ি আসে না...বলতে বলতে টুপ করে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে নিল জয়শ্রী,— ও বাড়িতে আগে গেছিলাম, ওখান থেকে...। তোর কী হয়েছে রে চাঁদু, অনেক দিন যাচ্ছিস না ?

—হেব্‌বি বিজি। পর পর শুটিং চলছে।

—আমাকে একদিন শুটিং দেখালি না ?

—যাবি ? ভীষণ বোরিং কিন্তু। বসে থাকতে থাকতে মাথা ধরে যাবে।

—আহা, কাটাচ্ছ কেন ? শংকর ফুট কাটল,— ডিরেক্টরের চোখে পড়ে গেলে ও-ও তো একটা রোল-টোল পেয়ে যেতে পারে। নায়িকা না হোক নায়িকার মাসি-পিসি।

—অথবা কোনও মুটকি কমেডিয়ান।

—চাঁদু, খারাপ হয়ে যাবে। আমার কিন্তু তিন কেজি ওজন কমেছে।

—পাহাড় থেকে এক খাবলা মাটি গেলে কী বা কমে রে !

—মারব এক থাপ্পড়। বলে ভাইকে চিমটি কাটল জয়শ্রী,— অ্যাই চাঁদু, একদিন আয় না সময় করে। আমাদের পাড়ায় একটা নতুন ভাড়াটে এসেছে, তাদের বাড়ির মেয়েটা তোর খুব ফ্যান। তোকে দেখার জন্য পাগল হয়ে আছে।

—বয়স কত ? পাঁচের নীচে নয় তো ?

—তার ওপরে হলেই বুঝি তুই প্রেম করিস ? ছি ছি।

আদিত্য খাড়া হয়ে বসল। বহুকাল পর ভাইবোনের খুনসুটি দেখতে বেশ লাগছে। জয়ি এসে বাড়ির হুঁকোমুখো ভাবটা যেন পলকে মিলিয়ে দিল।

হাসি হাসি মুখে আদিত্য বলল,— চাঁদুর এখন কী ডিমান্ড তুই জানিস না জয়ি । দিনে কতগুলো মেয়ের ফোন আসে তোর বউদিকে জিজ্ঞেস কর ।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী । ছোট্ট শব্দ করল,— হুঁ । ...জয়ি, তোমাদের চা বসাই ?

—শুধু চা কিন্তু । মেজবউদি আজ প্রচুর খাইয়েছে । চিকেন ফ্রাই, ফিশ ফিঙ্গার, পেস্ট্রি, সন্দেশ...

—ও । চায়ের সঙ্গে দুটো বিস্কুটও খাবে না ?

ইন্দ্রাণীর স্বর এত রসকষহীন, ঘরে যেন তাল ভঙ্গ হল । কন্দর্প টুক করে চলে গেল নিজের কুঠুরিতে, জয়শ্রী আঙুলে আঁচল পাকাচ্ছে, আদিত্যর চোখ সরে গেছে জানলায়, শংকর সিগারেট ঠুকছে প্যাকেটে ।

অদ্ভুত এক শব্দহীনতা বিরাজ করছে ঘরে । জয়শ্রী একবার বলার চেষ্টা করল,— তিতির নেই ?

—বেরিয়েছে । ইন্দ্রাণী দরজা থেকে সরে গেল ।

আবার নীরবতা । কথা নেই ।

এবার শংকর বরফ ভাঙল,— শুধু চাঁদু চাঁদু করছ কেন ? দাদাও তো অনেক দিন আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন না । সেই গত রোববারের আগের রোববার শেষ বসেছিলাম...

—শশশশরীরটা ভাল নেই । তটস্থ আদিত্য তোতলা হয়ে গেল । এত চেঁচিয়ে কথা বলে কেন শংকর ।

শংকরের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই । টেবিল থেকে অ্যাশট্রে নিয়ে এল । সিগারেট ধরিয়ে বড় বড় টান দিচ্ছে । চোখ টিপে বলল,— ঘরে বসে থাকলে শরীর ভাল থাকবে কি করে ? একটু সুখ-দুঃখের কথা হোক, দেখবেন...শীতের বিকেলে শুধু শুধু লেপের তলায় ঢুকে থাকলে চলবে ?

—আহ্ শংকর ! আদিত্য ত্রস্ত চোখে দরজার দিকে তাকাল ।

শংকর থামার বান্দা নয় । ফিক ফিক হাসছে,— কেন দাদা, সুখ-দুঃখের কথা বলা কি খারাপ কাজ ? না আমি আপনি সুখ-দুঃখের কথা বলি না ?

এই শংকরের দোষ । কথা বলতে শুরু করলে ইচ্ছে করে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যায় ।

জয়শ্রী বুঝি দাদার মুখ দেখে আন্দাজ করল কিছু । মৃদু ধমক দিল শংকরকে,— ওসব কথা এখন ছাড়ো তো । ...হ্যাঁ দাদা শোনো, যে জন্য আসা । বাবার বাৎসরিকের সময় তো এসে গেল, খেয়াল আছে ?

চকিতে প্রবল নাড়া খেয়ে গেল আদিত্য । উল্কাগতিতে মন ছুটে গেছে এক শীতার্ত রাতে । পুকুরের জলে চাঁদটা নেই, মধ্যরাতে একা এক নারকেল গাছ ছায়া কাঁপাচ্ছে সরসর । অন্ধকার ছাদে ফিসফিস ঘুরছে শব্দটা ! খোকন ! খোকন !

এক বছর হয়ে গেল !

আদিত্যর আবার খুব শীত করছিল । জ্বরটা কি ফিরে আসছে !

জয়শ্রী বলল,— কি করবে কিছু ভেবেছ ?

আদিত্য দু'দিকে মাথা নাড়ল ।

—মাসে মাসে কিছু করলে না, তিন মাসেরটা করলে না, বাৎসরিকটা অন্তত বড় করে করো ।

—করো বলছ কেন ? তুমি কি ছেলেমেয়ের মধ্যে নেই ? শংকর সুখটান দিয়ে নেবাল সিগারেট,— তোমাদের চার ভাইবোনেরই তো উচিত ঘটা করে বাবার কাজটা করা ।

—সে তো করবই । মেজদাও তো বড় করেই করতে চায় ।

—শুধু তোমার মেজদা বললেই তো হবে না, দাদা চাঁদু কী চায় সেটাও আলোচনা করে নাও ।

—আহা, তাই তো করছি । ...দাদা, তুমি কিছু বলো ।

ইন্দ্রাণী চা নিয়ে এসেছে । একটু বুঝি শশব্যস্ত হল স্বামী-স্ত্রী । জয়শ্রী বলল,— তুমি কী বলো বউদি, বাবার প্রথম বাৎসরিক বড় করে করা উচিত নয় ?

—আমি কী বলব ? কাজ তো তোমাদের ।

—মেজদা বলল তোমার সঙ্গে নাকি আলোচনা করে গেছে ?

—সে বলেছে, আমি শুনেছি।

—তার মানে তুমি ঘটা-পটা চাও না ?

ইন্দ্রাণী যেন ঈষৎ তপ্ত হল,— এ কথা কখন বললাম ? যা করবে তোমরা ডিসাইড করো, আমাকে জড়াচ্ছ কেন ?

শংকর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। ইন্দ্রাণীর দিকে না তাকিয়ে বলল,— আপনি না বললে কি এই ফ্যামিলির বাতাস নড়ে বউদি ?

—খুব নড়ে। যে নাড়ায় সে ঠিক জানে কোথায় কতটা ফুঁ দিলে কতটা বাতাস নড়বে।

শংকর খোঁচাটা গায়ে মাখল না। আদিত্যর দিকে ফিরে বলল,— দাদা, আপনার তা হলে আপত্তি নেই তো ? আমরা এস্টিমেট শুরু করে দিই ?

আদিত্য অস্ফুটে ঘাড় নাড়ল,— করো।

জয়শ্রী কন্দর্পকে ডেকে এনেছে। নিজের কাপটি হাতে তুলে সে সব শুনল মন দিয়ে। এবং ব্যাগড়া দিল,— এসব ডিসকাশান কি এভাবে হয়! মেজদা নেই!

জয়শ্রী বলল,— আমরা মেজদার সঙ্গে কথা বলে এসেছি।

—তুই বললে হবে কেন ? কাজ তো রায় ফ্যামিলির। উই থ্রি ব্রাদারস উইল সিট টুগেদার অ্যান্ড ডিসাইড। তোরা ডেলিগেট মেম্বার হিসেবে সেখানে থাকতে পারিস, কিন্তু তোদের ভোটিং রাইট থাকবে না। হ্যাঁ, লেট জয়মোহন রায় তোরও বাবা, মেয়ে হিসেবে তুই যদি কিছু কনট্রিবিউট করতে চাস, ওয়েলকাম।

কথাটা হালকা ছলে বলা, তবু বড় রূঢ় শোনাল এই মুহূর্তে। জয়শ্রীর মুখ কালো হয়ে গেছে।

আদিত্যর বোনকে দেখে মায়া হল। গলা ঝেড়ে বলল,— মুস্তাফিবাবুর সঙ্গে থেকে থেকে তুই তো বেশ কথা শিখে গেছিস চাঁদু!

—আমি চিরকালই ন্যায্য কথা বলি। ঠিক কিনা শংকরদা ?

পলকে শংকর ম্যানেজ করে নিয়েছে পরিস্থিতিটা। বলল,— ঠিকই তো।

—মেজদার অ্যাবসেন্সে কথা বলা উচিত, কি উচিত না ?

—কক্ষনও না। তবে কিনা তোমার মেজদাই...

আদিত্য কড়া গলায় বলল,— খালি মেজদা মেজদা করছ কেন ? আমি এখন এ ফ্যামিলির হেড, আমিই তো ডিসিশান নিতে পারি।

—হ্যাঁ ঠিকই। তুমিই পারো। কন্দর্প আড়চোখে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে নিল,— আফটারঅল কাজটা তো তুমিই করবে। আমরা তো শুধু সেজেগুজে ঘুরে বেড়াব। এমনকী শংকরদাও।

পেটের ব্যথাটা চিড়িক চিড়িক লাফাচ্ছে আবার। আদিত্য কষ্টটাকে ভুলে থাকতে চাইল। ভারিক্কি মুখে বলল,— কি রে জয়ি, তা হলে তো হাতে আর সময় নেই!

জয়শ্রী চুপ।

—কি রে, কিছু বল।

—আমি কী বলব ?

—আহা, চাঁদুর ওপর রাগ করিস কেন ? চাঁদু তো সব সময়েই তোর পেছনে লাগে।

অভিমান ভাঙল জয়শ্রীর। চোখ পিটপিট করে বলল,— তিথি ধরে করবে, না ডেট ধরে ?

—তিথি ধরেই তো করে সবাই, না রে চাঁদু ?

—এ ডিসিশানটা দিদিই নিক। কিরে দিদি, ডেট না তিথি ? কোন দিন আমাদের পুরুতঠাকুর ফ্রি থাকবে ?

—মানে ?

—আমি তো জানি পুরুতরা ওসব নিজেদের সুবিধে মতো ফিক্স করে।

জয়শ্রী হেসে ফেলল,— তোর সব কথাই বড় বাঁকা বাঁকা চাঁদু।

—মেনে নিলাম। তোরা কি এখন সোজা পথে যাবি ?

শংকর আর জয়শ্রী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কন্দর্প অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল, নার্ভাস হয়ে গেলি তো ? সোজা পথে না চলে চলে তোদের এই অভ্যেস হয়েছে। আমি তোদের বাড়ির দিকেই যাব, তোরা সরাসরি ফিরলে আমি আর গাড়িটা বার করি না। কি, মাথায় ঢুকল কিছু ?

বাড়ি ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর বিছানা ছেড়ে উঠল আদিত্য। বিকেল ফুরিয়ে যেতেই শীত আরও জেঁকে বসেছে, আলোয়ান জড়িয়ে নিল গায়ে। বৃষ্টি পড়ার পর থেকে ঠাণ্ডাটা এবার হঠাৎ বেড়ে গেছে, সন্ধে হলেই গা হাত পা হিম হয়ে আসে।

বারান্দায় একটু বসার জন্য ঘর থেকে বেরোচ্ছিল আদিত্য, দরজায় ইন্দ্রাণী। শীতমাখা বাড়িতে আর একটু ঠাণ্ডা যোগ করে বলল,— তোমাকে একটা কথা আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই।

আদিত্য ভয়ে ভয়ে তাকাল,— কী কথা ?

—বাবার বাৎসরিকে ক'শো লোক গাণ্ডেপিণ্ডে খাবে, মাছ করবে না মাংস করবে, বিরিয়ানি রাঁধবে না পোলাও বানাবে, সে তোমাদের ব্যাপার। আমি কিন্তু দশ-বারো হাজার টাকার বেশি দিতে পারব না।

—তুমি টাকা দেবে কেন ? টাকা তো আছে।

—না। নেই।

আদিত্য ফ্যালফ্যাল তাকাল,— মুস্তাফিবাবুর দেওয়া লাখ টাকা তাহলে গেল কোথায় ?

—যেখানে থাকার সেখানেই আছে। ও টাকায় আমি হাত দিতে দেব না।

—কেন জানতে পারি ?

—ও টাকা তিতিরের বিয়ের জন্য তোলা থাকবে।

—তিতিরের বিয়ে ! আদিত্য হেসে ফেলল,— সে তো এখন ঢের দেরি। তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।

ইন্দ্রাণীর মুখ বিদ্রূপে বেঁকে গেল,— তার মধ্যে তুমি মনে হচ্ছে লাখ লাখ টাকা রোজগার করবে ?

এসব ব্যঙ্গ আদিত্যকে আজকাল একটুও বেঁধে না, তবু আজ যেন সামান্য বিরক্ত হল,— কথাটা আমায় আগে বলতে পারতে। তা হলে আমি ঘটা করার ব্যাপারে যেতামই না।

—আমি বলব কেন ? তোমার একটা আক্কেল বিবেচনা নেই ? লোকের সামনে আমাকেই কেন যেচে মন্দ হতে হবে ? যার রোজগার করার সামর্থ্য নেই, তার অত ওড়ানোর শখ আসে কোত্থেকে ?

চিনচিন ভাবটা বাড়ছে ক্রমশ। আদিত্য দাঁতে দাঁত চাপল,— এটা ওড়ানো নয়, ছেলে হিসেবে এটা আমার ডিউটি।

—উঁউহ্, কর্তব্য করনেওয়ালা রে ! বাবা জীবিত থাকতে অনেক তো কর্তব্য করেছ, এবার মরার পরে তাঁকে একটু ক্ষ্যামা দাও।

পেটের ব্যথা সারা শরীরে যেন ছড়িয়ে পড়ল আদিত্যর, সর্বাঙ্গে কাঁটা হয়ে ফুটছে। উদ্যত ক্রোধকে কোনওক্রমে পোষ মানাল,— বাবার সঙ্গে আমার কি রিলেশান, তুমি তার কী জানো ? ও টাকা বাবার। বাবার অকেশনে আমি ও টাকা খরচ করব। প্রতি বছর করব।

—তাই বুঝি তাঁর মৃত্যুকামনা করেছিলে ?

বড় গভীর ক্ষতয় হাত দিয়ে ফেলেছে ইন্দ্রাণী, ভেতরে জমাট পুঁজ-রক্ত গলগল করে বেরিয়ে এল। বিস্ফোরিত হল আদিত্য,— আর তুমি কী করেছিলে ? আমি যদি মৃত্যুকামনা করে থাকি, তুমি তো খুনি। কেউ কিছু জানে না ভেবেছ, অ্যাঁ ? চারদিকে টি টি পড়ে গেছে। জোর করে বাবাকে দিয়ে সই করানোর সঙ্গে সঙ্গে বাবা মারা যায়নি ?

সহসা যেন বাকরোধ হয়েছে ইন্দ্রাণীর। এত বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে, মনে হয় চোখ দুটো এক্ষুনি ফেটে বেরিয়ে আসবে। ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছে, আহত নাগিনীর মতো।

হাত থেকে ঢিল ছুটে গেছে আদিত্যর, আর ফেরানোর উপায় নেই। এই কথা কি আদিত্য বলতে চেয়েছে কোনওদিন ? কেন বলে ফেলল ? ওই শংকরটাই যত নষ্টের গোড়া, ওর মুখ দেখলেই অনর্থ হয় বাড়িতে।

আলোয়ানের আড়ালে পেট চেপে ইন্দ্রাণীর দিকে একটু এগোল আদিত্য। মিনতির সুরে বলল,— কেন আমায় রাগিয়ে দাও ইন্দু ? কি কথা বলতে কী বলে ফেলি!

ইন্দ্রাণী পিছোচ্ছে পায়ে পায়ে,— তুমি আমায় ইন্দু বলে ডাকবে না। কক্ষনও না।

—ইন্দু...

—ফের ? আমি নিষেধ করছি। কোন অধিকারে তুমি ইন্দু বলো আমায় ? বোঝার বুদ্ধি নেই তোমার সঙ্গে আমি দয়া করে ঘর করছি এতকাল ?

এ কথা আদিত্যর চেয়ে কে বেশি বোঝে! তবু যেন আদিত্যর শরীরের সব শক্তি উবে গেল সহসা। সত্য জানার চেয়ে সত্যের অভিঘাত সহ্য করা অনেক বেশি কঠিন।

মাথা নিচু করে কয়েক পল দাঁড়িয়ে রইল আদিত্য। এক-পা দু-পা করে ফিরে এসেছে ঘরে। বোধহীন চৈতন্যের মাঝে প্যান্ট-শার্ট পরল, বিবশ মস্তিষ্কে বেরিয়ে এসেছে পথে। সেলিমপুরের মোড়ে এসে তিতিরকে দূরে দেখতে পেল, উল্টো দিকের ফুটপাথে একটা ছেলের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। মেয়েকে যেন চিনতেই পারল না আদিত্য, ভাঙাচোরা উঁচুনিচু ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। ঠোক্কর খেল দু-তিনটে, পড়তে পড়তে সামলে নিল, হাঁটছে। এই বিশাল পৃথিবীতে যেন তার কোনও ঠাঁই নেই, কোথায় যাচ্ছে এই মুহূর্তে তাও সে জানে না, হাঁটছে। কত আদিত্য যে কিলবিল করছে খাঁচায়! এক আদিত্য তাকে ঠেলে পার করাল রাস্তা, আর এক আদিত্য হেঁচকা টানে তুলে নিল বাসে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শীত করে উঠল আদিত্যর। তাকাল এদিক-ওদিক, প্রায় আলো নেই এই এবড়ো-খেবড়ো পথে সে চলেছে কোথায়! এটা তো রেললাইন! কখন সে শেয়ালদা পৌঁছল, কখন নামল দমদমে ? একটা হাফহাতা সোয়েটারও গায়ে নেই, কনকনে বাতাস ছুরির মতো শরীরে কেটে বসছে। আলোর ঝলক দেখিয়ে অবিরাম ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। এ-পাশ দিয়ে, ও-পাশ দিয়ে। কিসের হাতছানি ? মিথ্যে জেনেও মনের গভীরে একটা ক্ষীণ বিশ্বাস ছিল, তাও আজ নিবে গেল। এর পরও মানুষ বেঁচে থাকে!

আকাশ জোড়া হিমেল অন্ধকারে সহসা ভেসে উঠেছে এক আশ্চর্য জিমন্যাস্টের মুখ। প্রায় জনহীন ট্রেনের কামরায় শরীরটাকে দোমড়াচ্ছে মোচড়াচ্ছে...!

তীব্র আলো ফেলে খুব কাছে এসে পড়েছে একটা ট্রেন। ট্রেন নয়, যেন একচক্ষু মৃত্যুদূত।

ছিটকে লাইন থেকে সরে এল আদিত্য। ট্রেন চলে যাওয়ার পরই নিকষ অন্ধকার, তার মধ্য দিয়েই অভ্যস্ত ঢাল বেয়ে নেমে এল দ্রুত।

মাথা ঘুরছে, টলছে দুর্বল দেহ। আশ্চর্য, সেই কুকুরটা ঠিক চলেছে আদিত্যর পিছু পিছু। ঘেয়ো নেড়িকুত্তা লেজ নাড়ছে, তাকাচ্ছে জুলজুল।

আদিত্য বিড়বিড় করে বলল,— বেঁচে থাক ব্যাটা।

৮৫

রঘুবীরের দরজায় বড়সড় তালা ঝুলছে। যৎসামান্য বাসন-কোসন থাকে দালানে, তাও আজ নেই। উনুন নিথর, স্টোভ নীরব, দেখেই বোঝা যায় এ-ঘরের বাসিন্দারা কাছেপিঠে কোত্থাও নেই।

আদিত্য ধপ করে দালানে বসে পড়ল। অদ্ভুত ঘোরে এতটা পথ চলে এসে শরীর এখন একেবারে ছেড়ে যাচ্ছে। অজান্তেই গুটিয়ে এল দেহ, কুঁকড়ে গেল হাত-পা। ডান পেটে ব্যথাটা চিড়িক দিয়ে উঠল একবার, ঝিমিয়ে গেল। বারবার ঘুরে তালাখানা দেখছে আদিত্য, যেন বিশ্বাস

হচ্ছে না। এখানেও দরজা বন্ধ! আশপাশের ভাড়াটেদের ঘরে বাতি জ্বলছে, কথা ভেসে আসে, রান্নার গন্ধ পাওয়া যায়। কাছাকাছি এত মানুষ তবু যেন এ এক জনহীন লোকালয়।

কী হবে এখন! কোথায় যাবে! নিজের ঘরেও বুঝি এত নিরাশ্রয় লাগে না কখনও।

—কে রে? ওখানে অন্ধকারে কী হচ্ছে?

আদিত্য চমকে তাকাল। সুবল মিস্ত্রি। লো পাওয়ারের বাল্‌বটাকে পিছনে রেখে ছায়ার মতো এগিয়ে আসছে লোকটা। একটু-বা টলছে। সামনে এসে ঝুঁকল, অ, আপনি। রায়বাবু!

আদিত্য শূন্য চোখে তাকাল,— এরা গেল কোথায়?

—ফুড়ুৎ। তারাপীঠ গেছে। মাসি বোনপো দুজনেই।

শ্বাস ফেলল আদিত্য,— ফিরবে কবে?

—বলি কী করে? সকালেই তো বেরুল।

—ও। আদিত্য দেওয়াল ধরে ধরে উঠে দাঁড়াল,— চলি তবে।

এক মাথা সাদা চুল ছোট্টখাট্টো মানুষটা একটু কার্নিক মেরে দাঁড়িয়েছে। পরনে মলিন জোব্বা সোয়েটার, গায়ে তার শতেক ফুটো। চোখ টিপে বলল,— শরীরটা আপনার জুত নেই মনে হচ্ছে?

—নাহ্, ঠিক আছি।

—বললেই হল! দেখেই বোঝা যাচ্ছে ফিউজ উড়ে গেছে। একটু বুঝি অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করল সুবল,— চলেন আমার ঘরে। বডিতে একটু চার্জ দিয়ে নিন।

বিজলিকে ডাকাডাকি শুরু করেছে সুবল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মতো চেলাচ্ছে।

রোখা মেজাজে বাবাকে গাল পাড়তে পাড়তে বেরিয়ে এল বিজলি। আদিত্যকে দেখেই মুখভাব আমূল বদলে গেছে,— এ কি রায়দা, কী হয়েছে আপনার? এমন দেখায় কেন?

সুবল মিনমিন স্বরে বলল,—রঘু নেই দেখে রায়বাবু বড় ভেঙে পড়েছে।

—থামো তো। আধ পাঁইট গিলেই চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ? দেখছ না, মানুষটা কেমন কাঁপছে!

আদিত্য অস্ফুটে বলল,— বড় শীত।

—আহারে মরে যাই! গায়ে সোয়েটার নেই কেন?

—ভুলে গেছি।

—দু পাত্তর চড়িয়ে নিন, জাড় কেটে যাবে। সুবল দাঁত বার করে হাসল, রায়বাবুকে ঘরে নিয়ে বসা রে বিজলি। আর কটা টাকা দে.....

—চুপ, একদম চুপ। ঘরদোর তো তোমার ছেলেরা পায়খানা করে রেখেছে। ওখানে এমন মানী লোককে বসানো যায়!.....দাঁড়ান রায়দা, আসছি।

বলেই মিনিট খানেকের জন্য উবে গেল বিজলি। ফিরেছে চাবির গোছা হাতে। তালা খুলছে।

আদিত্য একটু স্বস্তি বোধ করল। সুবল তার অচেনা নয়, লোকও খারাপ নয়, তবে বড্ড বেশি প্যানর-প্যানর করে। মাঝে মাঝে পয়সাকড়িও চায়। এখন ঘরে নিয়ে গেলে নির্ঘাত অতীতে কত বড় বড় কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দিতে দিতে হাত পাতত। পকেটে আজ মানিব্যাগও নেই, টাকা না পেলে নেশার ঘোরে কি মুখখিস্তি করত সুবল কে জানে! বেচারা সুবল, বোঝে না যার কাছে টাকা চায় সে তার চেয়েও বড় ভিখিরি।

দরজা খুলে বিজলি ঘরের আলো জ্বেলেছে। ডাকল,— আসুন রায়দা, আপনার কথা ভেবেই রঘুদা আমার কাছে চাবি রেখে গেছে।

আদিত্য ফ্যালফ্যাল তাকাল,— জানত আমি আসব!

—আন্‌জাদ করেছিল। সুবল গুটি গুটি পায়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে, সেদিকে চোখ পড়ে গেছে বিজলির। ভুরু পাকিয়ে বলল,— না। যাও তুমি।

—একটু বসি। গলাটাও ভাল করে ভেজেনি.....

—না, যাও। রঘুদা তোমায় এ ঘরে পা দিতে বারণ করেছে।

—তাহলে দশটা টাকা দে।

বাবার দিকে কূট চোখে তাকাল বিজলি। আঁচলের খুঁট থেকে দুমড়ানো একটা নোট বার করে ছুঁড়ে দিল, রোজগারের মুরোদ নেই, গেলার শখ ষোলো আনা! বাপ, না মুদ্দোফরাস। নিঘিন্নের নিঘিন্নে। মেয়ের রক্তখেকো....

চলে যাচ্ছে সুবল। ভাঙাচোরা পায়ে। একটু যেন কুঁজো হয়ে। বুকটা হঠাৎ কুয়াশায় ভরে গেল আদিত্যর। ঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজলির ঝনঝনে মুখ পলকে আবার স্বাভাবিক। খাটের চাদর ঝাড়তে ঝাড়তে বলল,— বসুন রায়দা। রেস্ট করে নিন।

আদিত্য বিড়বিড় করে উঠল,— মানুষটা বড় দুঃখী।

—দুঃখী, না কচু। শয়তানের জাশু। ঘরাঞ্চি ধরতে গেলে হাত কাঁপে, লোকের ঘটি-বাটি সরানোর বেলায় হাত একেবারে এতখানি লম্বা! বেলচা হয়ে আছে। ওই ছোঁচা লোকের জ্বালায় আমি এখন আর কোথাও মুখ দেখাতে পারি না, জানেন। এই পরশু এঘর থেকে একখানা কাঁসার গেলাস চুরি করতে গেছিল, রঘুদা হাতেনাতে ধরেছে।

আদিত্য আবার বিড়বিড় করে বলল,— অভাব বড় জ্বালা।

—আপনি আর ধুনো দেবেন না তো রায়দা। আমি বলে জ্বলেপুড়ে মরে গেলাম। কই, কখনও আমার জ্বালাটা তো দেখেন না?

আদিত্যর স্বর আরও নেমে গেল,— হ্যাঁ, তুমিও বড় দুঃখী।

বিজলি হেসে ফেলল,— বোঝেন?

—বুঝি বৈকি।

—কী করে বোঝেন?

—দেখেই বুঝি।

বিজলি খিলখিল হেসে উঠল,— রঘুদা ঠিকই বলে। আপনি হলেন গিয়ে দুঃখের গুরুঠাকুর।

—বলে?

—বলে গো বলে। ঝুপ করে হাসি নিবল বিজলির,— বলে আমাদের সকলের দুঃখ এক ঝুড়িতে ভরলে যতটা হয়, আপনি তার থেকেও বেশি দুঃখী। বলে, মানুষটা বড় একলা রে বিজ্‌লি, সব থেকেও কেউ নেই। নইলে কি আর সংসার ফেলে সন্নিসি হতে চায়! এই তো যাওয়ার আগেও বলে গেল, রায়দা এলে ঘর খুলে দিস বিজ্‌লি। এখানে একটু জুড়োতে আসে মানুষটা, এসে যেন ফিরে না যায়।

আদিত্যর শরীরে কাঁপুনিটা ফিরে আসছিল। এক বিস্তারিত যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ। কষ্টের উৎসটা যে ঠিক কোথায়? পেটে? বুকে? নাকি কোন গহীন অবচেতনায়?

হতচকিত বিজলি ছুট্টে এসেছে, কি হল রায়দা? অমন করেন কেন?

আদিত্য বিজলির হাত খামচে ধরল,— কষ্ট।

—ইশ্, গা যে একেবারে হিম গো!

আদিত্য আবার বলল,— বড় কষ্ট।

আদিত্যকে ধরে ধরে বিছানায় নিয়ে এল বিজলি। শুইয়ে দিয়েছে। নিজের সস্তা দামের চাদরখানা খুলে বিছিয়ে দিল গায়ে। ঠকঠক কাঁপছে আদিত্য, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। চাদরের ওপর কম্বল চাপাল বিজলি। হাতে হাত ঘষে ঘষে উত্তাপ আনার চেষ্টা করছে।

চোখ বুজে ফেলল আদিত্য। এই উষ্ণতাটুকুর জন্যই কি এতক্ষণ তৃষিত ছিল হৃদয়!

আদিত্যর চোখের কোলে এক বিন্দু জল জমেছে। আঁচল দিয়ে মুছে দিল বিজলি। মাথার নীচে একটা বালিশ দিয়ে বলল,— চা খান একটু। করে দিচ্ছি।

আদিত্য দু দিকে মাথা নাড়ল। চা আর বেশি কী উত্তাপ সঞ্চার করবে!

—খাওয়া-দাওয়া জুটেছে কিছু?

আদিত্যর ঠোঁট নড়ল। শব্দ নয়, বাতাস বেরোল শুধু। সে বাতাস বুঝি বলতে চাইল যার জীবনে খিদেই খিদে, তার খিদে কি শুধুমাত্র খাবারে মেটে! নাড়িভুঁড়ি পাক খাক, অগ্ন্যাশয় হাহাকার করুক, কোনও খাবারেই আদিত্যর আর রুচি নেই।

বিজলি হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়। কোমল সতেজ স্পর্শ। যেন বড় বড় দানার বৃষ্টিফোঁটা মাটি ভিজিয়ে দিল, রোমে রোমে অঙ্কুরিত হচ্ছে প্রাণ।

আরও কাছে নেমে এল বিজলির মুখ। তার গাঢ় নিশ্বাস আদিত্যর গালে এসে ঠেকছে। আদিত্য হারিয়ে গেল ধীরে ধীরে, ডুবে গেল। বাতাসহীন নিমজ্জন নয়, এক অনন্ত সম্মোহক স্রোতে মিশে যাচ্ছে চেতনা। দিন মাস বছর টপকে উল্টোপানে ধেয়ে গেল মন। কুলু কুলু ধ্বনি শুনছে একটা। গভীরে, অনেক গভীরে। সময়ের নিবিড় অরণ্য পেরিয়ে সে তবে এতদিনে এল!

দু হাতে বিজলিকে আঁকড়ে ধরল আদিত্য,— ইন্দু...ইন্দু...আমার ইন্দ্রাণী....

কাচভাঙা ঝনঝনে হাসিতে ভেঙে পড়েছে বিজলি,— ইন্দু কে গো রায়দা? আপনার বউ? হিহি আমি কিন্তু আপনার বউ নই।

সপাং করে চাবুক খেল আদিত্য। বিজলিকে ছেড়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। মেকি কেয়াফুলের গন্ধ এতক্ষণে ঝাপটা মেরেছে নাকে। গা গুলিয়ে উঠল।

—কিগো, রাগ হয়ে গেল?

আদিত্য নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

—বউয়ের কথা মনে পড়ছে?

ইন্দ্রাণীর বিকেলের মুখটা ক্ষীণ মনে পড়ল আদিত্যর। গত জন্মের স্মৃতির মতো। জোরে জোরে মাথা দোলাল। না।

—মনে পড়া তো উচিত নয়। যে বউ সকাল-সন্ধে তোমায় খেদায়, তার কথা তুমি ভাববে কেন?

—ভাবব না?

—মোটেও না। বলতে বলতে অবলীলায় আদিত্যর কাঁধে হাত তুলে দিল বিজলি,— তোমাকেও বউ নেয় না, আমাকেও বর নেয় না। আমাদের দুজনের খুব মিল, তাই না গো?

—হুঁ, অনেকটা তাই বটে।

—অনেকটা নয় গো, পুরোটাই। আমাদের অদ্দেষ্টই খারাপ। তুমিও বজ্জাত লোক নও, আমিও খুব হারামী মেয়েছেলে ছিলাম না। অথচ দ্যাখো, দুজনেরই কেমন কপালটা পোড়া। এর কি কোনও বিহিত নেই সংসারে?

আদিত্য বিমূঢ় চোখে বিজলির দিকে তাকিয়ে আছে। অসংকোচে তাকে তুমি তুমি করছে সুবল মিস্ত্রির মেয়েটা, কই তেমন খারাপ লাগছে না তো! নাকের পাটা ফুলছে বিজলির, চোখের মণি কাঁপছে ডাইনে বাঁয়ে। বিজলির আগুন নিশ্বাসে পুড়ে গেল আদিত্য।

তীব্র মেয়েলি স্বরে বিজলি বলল,— বিহিত তো একটাই গো। আজ রাতে তুমি না হয় আমার বর হলে, আমি তোমার বউ।

বলেই উঠে গেছে বিজলি। উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিল একবার। বেমালুম দরজায় খিল তুলে দিল। প্রায় কোল ঘেঁষে বসেছে আদিত্যর। বুক থেকে আঁচল খসে গেছে। সাপিনীর মতো বেষ্টন করল গলা। ঘন হচ্ছে আরও। গরম ঠোঁট শুষে নিচ্ছে শীতলতা। স্খলিত স্বর হিসহিস করে উঠল,— নাও গো। শান্তি নাও।

অচেনা নারীদেহের নিষ্পেষণে ছটফট করে উঠল আদিত্য। দুর্বল হাতে সরানোর চেষ্টা করল মেয়েটাকে। পারছে না। নাকি চাইছে না?

মেকি কেয়াফুলের গন্ধ ক্রমশ তীব্র, আরও তীব্র। গন্ধ এখন আর গন্ধ নয়, ঝাঁঝ। কানের কাছে পোষা বেড়ালের মতো আদুরে শব্দ করছে বিজলি। ঝিমঝিম করে উঠল মাথা।

বিবশ আদিত্য ইচ্ছে অনিচ্ছের মধ্যিখানে। কত বছর পর একটা আস্ত মেয়েমানুষ তাকে আহ্বান করছে! শেষ সেই তিতির হওয়ার আগে ইন্দ্রাণী....

মস্তিষ্কে ভূমিকম্প হয়ে গেল আদিত্যর। এ কে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে! মাংস মাংস মাংস! শুধুই রিরংসা!

আদিত্য ক্লান্ত গলায় বলল,— তেষ্টা তেষ্টা।

বিজলি ফিসফিস করল,— মিটছে না?

—বড্ড গলা শুকিয়ে গেছে।

বুঝিবা সামান্য মায়া হল বিজলির। আলগা আঙুল বোলাল আদিত্যর নাকে গালে কণ্ঠায়। ভূতুড়ে গলায় বলল,— বাবার একটা পাঁইট লুকিয়ে রেখেছি। চলবে?

আদিত্য পেটে হাত বোলাল। অনেকক্ষণ ঘাপটি মেরে আছে ব্যথাটা। ধরা গলায় বলল,— একটু খাই।

আঁচল গুছিয়ে কি যেন ভাবল বিজলি। হয়তো অদৃষ্টের কথা। হয়তো যে লোকটা তাকে ছেড়ে একটা ক্ষয়াটে মেয়ে নিয়ে ঘর করছে, তার কথা। কিংবা দেহে জ্বালা পোড়া ধরানো এই মুহূর্তটার কথা। নিঃসাড়ে খিল খুলে বেরিয়ে গেল।

নিশ্বাস নেওয়ার অবকাশটুকু পেয়ে আদিত্য খাট থেকে নামল। ঘোর কাটেনি এখনও, ঘোলাটে চোখে শ্রীহীন ঘরখানা ছায়াচ্ছন্ন লাগে। হলদেটে আলো পড়েও আলমারি ট্রাঙ্ক পালঙ্কের খাঁজে খাঁজে কালির পোঁচ। আদিত্যও কি এই আঁধারেরই অংশ? দেওয়াল থেকে হাত-আয়নাখানা পাড়ল আদিত্য। মাথা ঝাঁকিয়ে দেখছে নিজের মুখ। ক'দিন দাড়ি কামানো হয়নি, খোঁচা খোঁচা আগাছায় ভরে গেছে গাল। চোখ দুখানা গর্তে ঢুকে গেছে, ঠেলে উঠেছে হনু, কেমন যেন চোরের মতো লাগছে নিজেকে। এ কি মুখেরই প্রতিবিম্ব? না মনেরও?

কোঁচড়ে বোতল নিয়ে ফিরল বিজলি। আবার দরজায় খিল তুলছে, তোমার ভাত বসিয়ে দিয়ে এলাম। রঘুদার মতো মাছ মাংস খাওয়াতে পারব না। শুধু আলু-কপির তরকারিতে হবে তো?

আদিত্যর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল। মেয়েটা খ্যাপা বাঘিনী হয়ে আছে, তবু যত্নআত্তির কথা ভোলেনি। এই মেয়েটাকে দেখে এখন আর একটুও কাম জাগছে না, বরং যেন স্নেহ করতে সাধ হয়।

বিজলি কৌটোবাটা ঘেঁটে ছোলাভাজা বার করল কিছুটা। গ্লাসে ঢকঢক পানীয় ঢালল। ডিশ গ্লাস খাটে সাজিয়ে বলল,— জল দেব?

হাতের ইশারায় বারণ করল আদিত্য। বিছানায় ফিরে বিজলির পাশটিতে বসেছে,— তুই বড় ভাল মেয়ে রে বিজলি।

বিজলি কাঁধে মাথা রাখল,— কতটা ভাল? তোমার বউয়ের চেয়েও?

—সে তার মতো। তুই তোর মতো।

—তার মানে সেও ভাল?

—মানুষ কখনও খারাপ হয় না রে বিজলি। যাকে তুই খুব মন্দ ভাবিস তাকেও ঝেঁকে দ্যাখ। দেখবি তারও অনেক জ্বালা।

বিজলি কয়েক পল ভাবল কি যেন। ঘাড় টেরা করে আদিত্যকে দেখল,— সেই লোকটাকেও তবে তুমি ভাল বলো?

—কোন লোকটা? কে?

—আমার বর গো। সাত পাকে বাঁধা সোয়ামী। বিনে দোষে দুর দুর করে তাড়াল আমায়, অন্যের বউ ভাগিয়ে এনে ঘর বাঁধল। কি? না আমাকে বিয়ে করার আগেই কোথায় নাকি তার সঙ্গে

আশনাই হয়েছিল। ভাল ভাল। তাতেই যদি মজেছিলি, পিরীত দেখিয়ে আমাকে বিয়ে করতে যাওয়া কেন ? একেও তুমি ভাল লোক বলবে ?

আদিত্যর গায়ে কাঁটা দিল। এক সঙ্গে অনেকখানি তরল ঢেলে দিয়েছে গলায়। জোর একটা হেঁচকি উঠল। বুকের মধ্যে শত শত বিষফোড়া জানান দিচ্ছে অকস্মাৎ। ঘুমিয়ে থাকা ব্যথাটা লাফিয়ে উঠল জোর। বল্লমের খোঁচা দিচ্ছে পেটে। যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে গেল মুখমণ্ডল, দাঁতে দাঁত চাপল আদিত্য।

বিজলি বুকে হাত রেখেছে,— কি হল গো ? কী কষ্ট ?

পলকের জন্য মনে হল বিজলি নয়, এ বুঝি তিতিরেরই ছোঁয়া। পরক্ষণে ইন্দ্রাণী আঙুল নাচাচ্ছে। তোমার সঙ্গে এতকাল দয়া করে ঘর করেছি, বুঝতে পারো না!

এক চুমুকে গ্লাস শেষ। গলা বেয়ে দৌড়ে গেল তরল, খাদ্যনালী জ্বলে উঠল দাউ দাউ। পেট থেকে যন্ত্রণাটা ঠিকরে এল ওপরে। একটা বল্লম হাজারও খণ্ড হয়ে বিঁধে যাচ্ছে যকৃতে। দুমড়ে গেল শরীর, তবু আবার বোতলের দিকে হাত বাড়াল আদিত্য।

বিজলি বোতলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পারল না। সবটুকু দিশি মদ নিমেষে চালান হয়ে গেল আদিত্যর পেটে। যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে, নীল হয়ে গেছে মুখ। পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে। দু হাত মুঠো করে আছাড় মারছে বিছানায়।

বিজলি দরজা খুলে হাউমাউ চিৎকার জুড়ল,— এ কি সব্বোনাশ হল গো! কে কোথায় আছ গো! মানুষটা যে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে গো!

মুহূর্তে ঘরে ভিড় জমে গেছে। কিলবিল করছে মুখ, অজস্র কোলাহল। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না আদিত্য, শুনতে পাচ্ছে না। নিকষ এক অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে সে, তলিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে...।

চৈতন্যের শেষ সীমায় পৌঁছোনোর আগে একটাই শুধু স্বর শুনতে পেল আদিত্য।

—মরতে পারো না তুমি!

হিমেল ভোর। বাড়িতে ইন্দ্রাণী ছাড়া এখনও কেউ জাগেনি। রাতভর যার ঘুমই হয় না তার আর জাগরণে অসুবিধে কি!

স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছিল ইন্দ্রাণী। কমলা-সবুজ ডুরে সাদা শাড়ির আঁচল কাঁধে ক্লিপ করে ঠোঁটে একটু ক্রিম লাগাল, ছোট ব্যাগ খুলে দেখে নিল খুচরো পয়সা আছে কিনা। গা'টা ম্যাজম্যাজ করছে খুব, মাথা টিপ টিপ, তবু যাবে স্কুলে। অলস শুয়ে-বসে থাকলে চিন্তারা বেশি কামড় বসায়, তার থেকে স্কুলই ভাল। কিছুক্ষণ অন্তত মন অন্য দিকে রাখা যায়।

বাড়ির ভেতরে এখনও চাপ চাপ অন্ধকার। রান্নাঘরের আলো জ্বেলে গ্যাসে চায়ের জল চড়াল ইন্দ্রাণী। ফ্রিজ থেকে দুধের ডেকচি বার করে ঢিমে আঁচে বসাল। শীত করছে খুব, ঘর থেকে শাল এনে জড়াল গায়ে।

তখনই শব্দটা পেল। ট্যাক্সি থামার। কে যেন চেঁচাচ্ছে, ওই বাড়ি ওই বাড়ি।

কে জানে কেন ইন্দ্রাণীর বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠল। আদিত্য ফিরল কি ? কিন্তু সে তো ট্যাক্সিতে ফেরে না কখনও, এত সকালে তো নয়ই! কাল দুম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, সবে জ্বর থেকে উঠেছে, এই ঠাণ্ডায় সারা রাত কোথায় ছিল কে জানে! তার কিছু হয়ে গেল না তো!

বারান্দায় উঁকি মারতে এসে হকচকিয়ে গেল ইন্দ্রাণী। ট্যাক্সি তার দরজাতেই থেমেছে, বন্ধ কাচের জানলায় একটা উসকোখুসকো চুল মেয়ের মুখ দেখা যায়। মাঝবয়সী একটা লোক গ্রিলগেটের ওপারে দাঁড়িয়ে ডোরবেল হাতড়াচ্ছে। দেখে মনে হয় মিস্ত্রি-মজুর ক্লাসের।

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে এল,— কাকে চাই ?

—আদিত্য রায় এ বাড়িতে থাকেন ?

—হ্যাঁ। কেন ? ইন্দ্রাণীর গলা কেঁপে গেল।

—উনি খুব অসুস্থ। ওই ট্যাস্‌কিতে রয়েছেন।

ইন্দ্রাণী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল,— কী হয়েছে ?

নোংরা মাফলার জড়ানো, মলিন ফুলহাতা সোয়েটার পরা লোকটা ঘাড় চুলকোচ্ছে, —কাল ইয়ে খাচ্ছিলেন, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পেটে হেভি পেন। বিজ্‌লি একা আনতে ভরসা পাচ্ছিল না...

ইন্দ্রাণী ঝটিতি তালা খুলল। দৌড়ে নেমে গেছে ট্যাক্সির কাছে। জানলায় চোখ পড়তেই পাথর হয়ে গেল। একটা সস্তা উগ্র মেয়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আদিত্য, মেয়েটা এক হাতে বেড় দিয়ে আছে তাকে।

ইন্দ্রাণীকে দেখেই জানলার কাচ নামাল মেয়েটা,— পৌঁছে দিতে এলাম বউদি। ডাক্তারবাবু বলছিল সোজা হাসপাতালে নিয়ে যেতে, আমি ভাবলাম...। খুব বেদ্‌না হচ্ছিল বউদি। ডাক্তারবাবু এসে ইনজেকশান দিয়েছে।

ঝাঁকুনি খেয়ে সংবিতে ফিরল ইন্দ্রাণী। ছি ছি ছি, শেষ পর্যন্ত একটা নোংরা মেয়ের সঙ্গে আদিত্য... ! কত দিনের সম্পর্ক ? এর ঘরেই রাত কাটায় ? মেয়েটার সাহস কী ! দাঁত বার করে বউদি বউদি বলছে ! এক্ষুনি ঢুকে গিয়ে ইন্দ্রাণী দরজা বন্ধ করে দেবে ! চিৎকার করে বলবে, যেখান থেকে এসেছ সেই নরকেই নিয়ে চলে যাও !

ঘৃণায় অপমানে বিতৃষ্ণায় লজ্জায় মুখে কথা ফুটছে না ইন্দ্রাণীর। অসাড় পায়ে ফিরে এল বাড়িতে। কন্দর্পর দরজায় ধাক্কা দিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসেছে কন্দর্প,— হল কী ? হল্লা কিসের ?

—তোমার দাদা ফিরেছে। তাকে ট্যাক্সি থেকে নামাও গে।

—কেন ? কী হয়েছে দাদার ?

ইন্দ্রাণীর স্বর হিমাঙ্কের নীচে নেমে গেল,— নিজে গিয়ে দ্যাখো।

কন্দর্প পড়িমরি করে ছুটল। তিতিরেরও ঘুম ভেঙে গেছে, বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। দাদাকে নামাচ্ছে কন্দর্প, লোকটা আর মেয়েছেলেটার সঙ্গে কথা বলছে টুকটাক। টেনে হিঁচড়ে দাদাকে এনে শোওয়াল ঘরে। ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দিল লোকটাকে।

ট্যাক্সি চলে গেল।

কাঠ হয়ে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রাণী। নড়ল এতক্ষণে। ঘিনঘিনে দুঃস্বপ্নটা চোখের সামনে থেকে সরে যেতেই ব্যাগ তুলে নিয়েছে কাঁধে। চটি পরে আদিত্যর ঘরে ঢুকল। তিতির আর কন্দর্প কথা বলছিল নিচু গলায়, তাকে দেখেই চুপ।

আদিত্যর দিকে তাকিয়েও চোখ সরিয়ে নিল ইন্দ্রাণী। কঠিন গলায় বলল,— চাঁদু, এ ঘরে ওকে রাখবে না। হাসপাতালে ফেলে দিয়ে এসো। স্কুল থেকে ফিরে এখানে যেন না দেখি।

৮৬

দরজা খুলে হিয়া বলল,— ওয়াও ! হোয়াট আ সারপ্রাইজ ! তুই না এই উইকে আসবি না বলেছিলি !

টোটো কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল,— চলে এলাম।

—টিউটোরিয়াল যাসনি ?

—আজ তো টিউটোরিয়াল ছিল না। ফিজিক্স স্যার ছিল।

—নতুন স্যার ?...কেমন পড়ান রে ?

উত্তর দিতে গিয়ে টোটো সামান্য ধাঁধায় পড়ে গেল। তার নতুন শিক্ষকটি বেহালার ওদিকের এক

কলেজের অধ্যাপক। তিনি ভাল পড়ান, না খারাপ পড়ান, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি টোটো। আগের স্যার রোজ কিছু না-কিছু নোট দিতেন, মেপেজুপে কঠিন কঠিন প্রবলেমস্ সলভ্ করাতেন, ইনি ওসবের ধার দিয়েও যান না। এক একটা টপিক ধরে একটানা অনেকক্ষণ বুঝিয়ে চলেন, অনেক খুঁটিনাটি কৌতূহল তৈরি করেন নিজে, আপন মনেই উত্তর দিয়ে দেন। কিন্তু একদমই কিছু লেখান না। প্রশ্নোত্তর ফর্মে প্রিপেয়ার না করলে এই স্যারকে দিয়ে কি উপকার হবে ? তবে হ্যাঁ, এই স্যার তাঁর মনে ফিজিক্সের প্রতি একটা গভীর আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছেন। বিশেষত অ্যাটম মলিকিউল নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের জগৎ নিয়ে। কত বিচিত্র কণার নাম জানছে সে। পাই-মেশন, মিউ-মেশন, নিউট্রিনো...।

অত কথায় গেল না টোটো। হেসে বলল,— চলতা হ্যায়।

হিয়া এখনও ধীরে ধীরে হাঁটে। স্টিচের জায়গায় এখনও তার ব্যথা আছে, হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। তার পিছন পিছন ঘরে গিয়ে বসল টোটো। কায়দা করে হেলান দিল খাটে, পড়াশুনো শুরু করেছিস ?

—কাল চেষ্টা করেছিলাম। বেশিক্ষণ টানা বসতে পারছি না রে।

—শুয়ে শুয়ে পড়।

—তাও চেষ্টা করেছিলাম। ঘুম এসে যায়।

—তাহলে আর তোর ডাক্তার হওয়া হল না। নিউ ইয়ার পার হয়ে গেল, এখনও তুই ফিট্ হলি না...এর পর তুই জয়েন্টের প্রিপ্যারেশন করবি কবে ?

হিয়া মিষ্টি করে হাসল, —তোর দেখছি আমার চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না !

দু পলক হিয়াকে দেখে চোখ সরিয়ে নিল টোটো। হিয়া কি সত্যি জানে না তার চিন্তায় টোটোর ঘুম হয় না ? বই খুললেই হিয়ার মুখ, কলম আঁচড় টানলেই হিয়ার অবয়ব, ঘরের জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে হিয়া, টেবিল ল্যাম্পের আলো নেবালে হিয়া...সবই কি মুখ ফুটে বলতে হবে টোটোকে ?

সন্ধে নেমে গেছে বহুক্ষণ। হিয়ার ঘরের সব জানলা বন্ধ, তবু কোথা থেকে যেন একটা চোরা বাতাস আসছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। শীত এবার অনেকদিন ঘাঁটি গাড়ল কলকাতায়। দিনের বেলা সূর্যের পাহারাদারিতে তাও একটু হাত-পা ছড়ায় লোকজন, বাইরে বেরোয়। সন্ধে হলেই যে যার নিজস্ব কোটরে।

টোটো তালুতে তালু ঘষল,— বাড়িতে সাড়াশব্দ নেই কেন ?

—বাবা আজ ঠাম্মার হোমে যাবে। আর উনি তো সেই পুরুলিয়ায়। ছেলেকে হোস্টেলে পৌঁছতে। পরশু বোধহয় ফিরবে।

—তার মানে তুই একা ?

—বাসন্তীদি আছে। কেন রে ?

টোটো হেসে ফেলল,— না এমনিই।

—হাসলি কেন ? হিয়া চোখ পিটপিট করল।

—তুই বুঝবি না। টোটো হাতে মাথা রেখে চিত হয়ে শুল, তোর বাসন্তীদিকে বল কিছু খাওয়াতে। স্যারের কাছে ফ্লেমিং'স্ লেফট্হ্যান্ড রুল বুঝতে বুঝতে পেট খালি হয়ে গেছে।

—কী খাবি ? প্যানকেক চলবে ?

—এনিথিং এনিথিং।

হিয়া রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে বলল,— এই জানিস, আজ একটা খারাপ খবর শুনলাম।

টোটো ঘাড় ফেরাল,— কী রে ?

—তোকে বলব না। তুই চটে যাবি।

—বল না। ঝোলাচ্ছিস কেন ?

হিয়া খাটের অন্য প্রান্তে বসল। নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল,— তিতিরের বাবার খুব অসুখ। হসপিটালে আছেন।

টোটোর চোয়াল মুহূর্তের জন্য শক্ত হল। পরক্ষণে হেসে ফেলেছে,— এতে আমি রাগব কেন ? কোথায় কার অসুখ হয়েছে তাতে আমার কী এসে গেল! বাই দা বাই, হয়েছে কী ? অ্যামিবায়োসিস্ ?

—না রে, ওর বাবা তো খুব...হিয়া থেমে গেল। একটু পরে বলল,— কী অসুখ ঠিক জানি না। শুনলাম লিভারের গণ্ডগোল।

টোটো চোখ কুঁচকোল,— খুব বুজিং চলে ?

—হবে হয়তো। আমি জানি না।

—আমি জানি। লোকটা এর আগেও একবার হসপিটালাইজড্ হয়েছিল। ড্রিঙ্ক-ফিঙ্ক করেই...টোটো উঠে বসল,— তোকে বলেছি না, ওদের ফ্যামিলিটা ভাল না! লোকটার লাইফটা খুব স্যাড। ওয়াইফের জন্য। মানে ওই তোর তিতিরের মা।

—তুই বড্ড বাজে কথা বলিস রাজর্ষি। তিতিরের মাকে আমি ছোট্টবেলা থেকে জানি। কী রিজার্ভড্, কী পারসোনালিটি, দারুণ গ্রেসফুল লেডি।

টোটো মনে মনে বলল,— ওই জন্যই তো আমার বাবা ওখানে পড়ে থাকে।

হিয়া আবার বলল,— আমরা যখন ছোট ছিলাম, ওদের বাড়িতে গেলেই মাসিমা মুঠো মুঠো চকোলেট দিতেন আমাদের।

টোটো আবার নিঃশব্দে বলল,— ওই চকোলেট আমার বাবার পয়সাতেই কেনা।

হিয়া পা গুটিয়ে বসল,— ওর মা কী স্ট্রাগল্ করেছেন জানিস ? ওর বাবা তো বরাবরই একটু বোহেমিয়ান টাইপ, উনি একা চাকরি করে...স্কুলে পড়ান, নিজে একটা প্রেস চালাতেন...আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

টোটোর গা কিশকিশ করে উঠল। বিরক্ত মুখে বলল,— টপিকটা থামাবি ?

—এই দ্যাখ, তুই কিন্তু রেগে গেলি।

টোটো আরও রাগত মুখে বলল,— আমার এনিথিং রিলেটেড টু ওই তিতির শুনতে ভাল লাগে না। বেসিকালি একটা বাজে মেয়ে, অত্যন্ত রটন্ একটা ছেলের সঙ্গে ঘোরে...ওর জীবনে অনেক দুঃখ আছে দেখে নিস।

—যাহ্, অভিশাপ দিচ্ছিস কেন ? ও আমার অনেক দিনের বন্ধু। ঝগড়া করুক আর যাই করুক, আমি নার্সিংহোমে শুনে দৌড়ে দেখতে এসেছিল তো।

টোটো আবার চোখ কুঁচকোল,— তোর সঙ্গে ঝগড়া করেছে ?

—না না, তেমন কিছু না। এমনিই বললাম।

—চেপে যাচ্ছিস ?

হিয়া উত্তর দিল না। কথা ঘুরিয়ে বলল,— এই, আমাদের স্পেশাল ক্লাস কবে থেকে শুরু হচ্ছে রে ?

টোটো গুম হয়ে গেল। হিয়া কথা গোপন করছে। বন্ধুর ওপর হিয়ার খুব টান, তার সম্পর্কে কোনও কথাই খুলে বলে না। টোটো নিজেও কি সব বলে হিয়াকে ? কেন বলে না ? হিয়ার সঙ্গে তার এখন যা সম্পর্ক, তাতে পরস্পরের কাছে কোনও কথাই লুকোনো উচিত নয়। তবু থাকে। তবে কি দুটো ছেলেমেয়ে যখন কাছাকাছি আসে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু গোপনীয়তা থেকেই যায় ? কেন থাকে ?

খাবার এসে গেছে। খেয়েদেয়ে আরও কিছুক্ষণ আড্ডা মারল টোটো, পৌনে আটটা নাগাদ উঠে পড়ল।

হিয়া দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে,— কাল আসবি ?

—কেন রে ?

হিয়া মুচকি হাসল,— কিছু না। এমনিই।

—হাসলি কেন ? টোটো চোখ পিটপিট করল।

—তুই বুঝবি না।

বুঝেছে টোটো। মুখটা খুশিতে ভরে গেল। হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে রামদেওকে বলল,— গাড়ি একদম তেজ চালাবে না। ম্যাক্সিমাম ফরটি। বুঝেছ ?

রামদেও অবাক হয়ে গেছে। এ তো একেবারে ভূতের মুখে রাম নাম ! চোখ গোল গোল করে বলল,— কেন ?

টোটো ঠোঁট টিপে হাসল,— এমনিই।

—হাসছ কেন ?

—তুমি বুঝবে না।

রামদেও গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে। গম্ভীর গলায় বলল,— বুঝেছি।

হো হো হেসে উঠল টোটো। মনটা হঠাৎ পালকের মতো হালকা হয়ে গেছে। অতি ধীরে চলছে গাড়ি, শীতকাতুরে বিরল পথচারী জবরজঙ পোশাকে ঠাণ্ডার ভয়ে হেঁটে চলেছে হনহন, শীতল বাতাস ভোঁতা ছুরি হয়ে ঘষা খাচ্ছে নাকে মুখে, ফুটপাথে আগুন জ্বেলে শরীর সেঁকছে গরিব লোকেরা, ট্রাফিক কনস্টেবলগুলো হিহি কাঁপছে, সবই যেন দারুণ মজার।

বাড়ি ফিরে খুশিটা আরও বেড়ে গেল। মাসি এসেছে। তাকে দেখেই মাসি হই হই করে উঠল,— এই টোটো, তুই ক'দিন তোর বাবাকে সামলাতে পারবি ?

—বাবাকে সামলানো ! টাফ জব। টোটো ভুরু নাচাল,— ক'দিনের জন্য ?

—দিন আট-দশ।

—কেসটা কি ?

—আমি আর তোর মা জলপাইগুড়ি যাব ভাবছি। বাবা অনেক দিন ধরে লিখছে...

টোটো আশ্চর্য হয়ে গেল। তাকে একা ছেড়ে তার মা-বাবা কোথাও যাবে তা তার কল্পনাতেও ছিল না, এখন বাবাকে একা রেখে মা যেতে চাইছে ! মা'র হলটা কি ! বাবার সঙ্গে হানিমুন গোছের একটা ভ্রমণ সেরে এসে মা যেন অন্য মানুষ। বাবার সঙ্গে কথায় কথায় ফাটাফাটি নেই, বাবা বেশি রাত করে ফিরলে মুখ ভার নেই, টোটো পড়ছে কি না জানার জন্য আড়ি পাতা নেই, দিব্যি রামদেওকে নিয়ে গাড়ি করে মার্কেটিং-এ বেরিয়ে যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, সেদিন তো একা একা অ্যাকাডেমিতে কি একটা নাটক দেখে এল !...ডাক্তারগিন্নির হঠাৎ এত বড় পরিবর্তন যে ! মা যেন কেমন নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ধরনের হয়ে গেছে। তেনসা না টেনশা কোথায় গিয়ে বাবা কি বশীকরণ বাণ মারল !

টোটো এক হাত ঘাড় বেঁকিয়ে দিল,— কুছ পরোয়া নেই। তোমরা নিশ্চিন্তে চলে যাও। ডক্টর শুভাশিস সেনগুপ্তকে আমি চোখে চোখে রাখব।

ছন্দা উদাসিনীর মতো বলল,— কে কাকে চোখে চোখে রাখে !

মাকে একঝলক দেখে নিয়ে শিস ভাঁজতে ভাঁজতে নিজের ঘরে চলে গেল টোটো। বইখাতা খুলে বসেছে। অঙ্ক কষছে। ট্রিগোনোমেট্রি। টেস্টপেপার দেখে দেখে। তারই মধ্যে শুনতে পেল বিদায় নিয়ে চলে গেল মাসি। মা টিভি খুলেছে। কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলল মা, হাসছিল। সবিতা রাতের খাবার তৈরি করছে, ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ আসছে রান্নাঘর থেকে।

সাড়ে নটা নাগাদ ছন্দা ডাকল,— টোটো, খাবি আয়।

টোটোর একটা অঙ্ক মিলছিল না। চিন্তিতভাবে বলল,— একটু পরে মা।

—উঁহু, খেয়ে নিয়ে পড়ো।

অগত্যা উঠল টোটো। মা-ছেলেতে খেতে বসেছে মুখোমুখি। গলদা চিংড়ির মালাইকারি হয়েছে

রাত্তিরে, টোটোর প্রিয় ডিশ। গোবিন্দভোগ চালের ভাতের সঙ্গে মালাইকারি মেখে গপাগপ খাচ্ছে টোটো।

খেতে খেতে প্রশ্ন করল। অনেকটা গার্জেনের ভঙ্গিতে,— এই জানুয়ারির শীতে হঠাৎ জলপাইগুড়ি যাওয়ার প্ল্যান করছ যে ?

ছন্দা বলল,— এমনিই।

টোটো সদ্য গজানো গোঁফে আঙুল বোলাল, —হাসলে না তো ?

—মানে ?

—মানে কথাটা বলতে বলতে তো হাসতে হয়।

—কেন ?

—তুমি বুঝবে না। বলেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল টোটো।

ড্রয়িং স্পেসে ফোন বাজছে। খাওয়া ফেলে উঠতে যাচ্ছিল টোটো, তাকে বসিয়ে দিল ছন্দা। নিজে গিয়ে টেলিফোন তুলেছে। কানে রিসিভার চাপার ক্ষণ পরেই আর্তনাদ করে উঠল,— কবে ? কখন ?

কথা বলতে বলতে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ছন্দার মুখ। ঠকঠক কাঁপছে। ফোন রাখতেই টোটো দৌড়ে এল,— কী হয়েছে মা ?

ছন্দা কথা বলতে পারছে না। ভীষণ বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

টোটো অধৈর্য ভাবে বলল,— কার ফোন বলবে তো ?

—তোর তুফানকাকার।

—হঠাৎ ?

—তোর দাদুর স্ট্রোক হয়েছে। ইমিডিয়েটলি আমাদের যেতে বলল। ছন্দা টোটোর হাত চেপে ধরল,— কী হবে রে টোটো ? তুফান টেলিফোনে হাউমাউ কাঁদছিল।

টোটো মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,— দাদু বেঁচে আছে তো মা ?

—কিছু তো বলল না। বোধহয় আছেন।

—বাবাকে তাহলে এক্ষুনি খবর দিতে হয়। টোটো নার্ভাস হাতে টেলিফোন তুলল,— বাবাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?

ছন্দা বসে পড়েছে। কপাল টিপে মাথা নাড়ল,— জানি না।

টোটোর বুকের মধ্যিখানটা হু হু করে উঠল। শেষবার যখন গেছিল, দাদু যেন কেমন মিইয়ে ছিল। টুকি দুজনকেই ফোঁটা দিল। টোটোকে, দাদুকেও। টোটো খেলনাটা দিল, দাদু বলল,— ওই এরোপ্লেন করে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবি টুকি ? দূরে, অনেক দূরে ?

কাঁপা হাতে বোতাম টিপল টোটো। নার্সিংহোমে। ওপারে শালিনী।

—বাবা আছে আন্টি ?

—না তো। সন্ধেবেলা আসেনি আজ। সকালে এসেছিল।

—কোথায় পাওয়া যাবে আন্টি ?

—সানশাইনে একবার দেখতে পারিস। ওখানে একটা পেশেন্ট সিরিয়াস বলছিল। ...কেন রে ? কিছু হয়েছে ?

টোটোর গলা বুজে এল,— মাধবপুর থেকে ফোন এসেছিল। দাদুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

—ও নো। তুই সানশাইনে দ্যাখ। আমি দেখছি আর কোথাও পাওয়া যায় কি না।

দ্রুত হাতে টোটো সানশাইনের নম্বর টিপল। রিঙ হয়ে যাচ্ছে, রিঙ হয়ে যাচ্ছে, অধৈর্য হয়ে পড়ছে টোটো। বহুক্ষণ পর একটা ঘুমন্ত গলা ফোন তুলেছে।

টোটো গর্জে উঠল,— আপনাদের নার্সিংহোমে এত দেরি করে ফোন তোলে কেন ? ফাজলামি হচ্ছে ?

ও প্রান্ত নির্বিকার,— কী চাই বলুন ?

—ডক্টর সেনগুপ্ত আছেন ?

—আপনি কে বলছেন ?

—তাঁর ছেলে।

দূরভাষী একটু সচকিত হয়েছে এবার,— এসেছিলেন স্যার। বেরিয়ে গেছেন।

উদভ্রান্ত হয়ে গেছে টোটো। একের পর এক নার্সিংহোমের নম্বর টিপে চলেছে, কোত্থাও নেই শুভাশিস। প্রতিটি চেম্বারে ফোন করল, নেই। ব্লু হেভেন শুধু এনগেজড টোন শুনিয়ে যাচ্ছে, ল্যান্সডাউনের চেম্বারে অবিরল রিঙ্‌ বেজে গেল।

হতাশ মুখে বসে পড়েছে টোটো,— কি হবে মা ?

ছন্দা সামলেছে অনেকটা। চঞ্চল পায়ে পায়চারি করছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল,— ঢাকুরিয়ায় একবার ফোন করে দ্যাখ তো।

কী অদ্ভুত নির্বিকার স্বর ! এই প্রচণ্ড উদ্বেগের মধ্যেও স্বরটা কানে লেগেছে টোটোর। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,— ওখানে আমি করতে পারব না।

ছন্দা সাইডটেবিল থেকে টেলিফোনের ইনডেক্স বইটা তুলল,— বেশ, আমিই করছি।

—না। কক্ষনও না। টোটো হঠাৎ গর্জে উঠেছে।

ছেলের এই অকস্মাৎ রুদ্র মূর্তিতে থমকে গেছে ছন্দা। কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে টোটোর দিকে। ঠিক অসহায় নয়, করুণও নয়, এ-এক বিচিত্র বিস্মিত দৃষ্টি।

টোটো থমথমে গলায় বলল,— দাও, নাম্বারটা বার করে দাও।

টেলিফোন বাজছে ঢাকুরিয়ায়। অজান্তেই টোটোর শরীর শক্ত হয়ে গেল।

৮৭

লেলিহান চিতার দিকে অপলক তাকিয়ে ছিল শুভাশিস। দেখতে দেখতে কী ভয়ানক হয়ে উঠল আগুন ! সহস্র ফণা তুলে হিসহিসিয়ে নাচছে শিখা। পুট পুট শব্দ বাজিয়ে পুড়ছে কাঠ। ছোট ছোট অগ্নিকণা ছিটকে উঠছে চিতা থেকে, মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলোয়। নীলচে ধোঁয়ায় শ্মশানভূমি ছেয়ে গেল।

নিঃশেষ হচ্ছেন শিবসুন্দর।

একটা মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে এত আগুন লাগে !

শুভাশিসের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। কষ্টে নয়, পথশ্রমের ধকলে নয়, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে নয়, নিছকই ধোঁয়ায়। ছাই উড়ছে বাতাসে, সঙ্গে কি বিশ্রী একটা পোড়া গন্ধ ! চিতার সামনে থেকে সরে এল শুভাশিস। শ্মশানে এখনও ছোট ছোট জটলা। ভোরে সাত গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়েছিল বাড়িতে, তারই রেশ। দু-চারজন প্রতিবেশী আত্মীয় ছাড়া সবাই প্রায় অচেনা। অবয়বহীন এই জনতাকে দেখে কেমন যেন ঘোর ঘোর লাগে। এত অজস্র মানুষের ভালবাসা পেয়েও কোন শক্তিতে একা হয়ে ছিল বাবা !

বটতলার বাঁধানো বেদিতে বসে আছে তুফান, পাশে টোটো। তুফানের মুখ হাঁটুতে গোঁজা, গরম চাদর মোড়া দেহটাকে অতিকায় পুঁটুলির মতো দেখায়। টোটোর পরনে জিনস পুলওভার, কাল রাতের মাফলারটাও সে এখনও খোলেনি গলা থেকে।

পায়ে পায়ে তুফানের পাশে এল শুভাশিস। ভেতরটা থম মেরে আছে, দু ভায়ে কথা বললে খানিকটা হালকা হবে হয়তো। ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল, তুফান ?

—উঁ।

—ডি.সি-টা তোর কাছে আছে না ? দে তো একটু।

মাথা তুলল না তুফান, পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজটা বার করে দিল।

মৃত্যুর শংসাপত্রে আরেকবার চোখ বোলাল শুভাশিস। আপন মনে মাথা দোলাল। লেফট ভেন্ট্রিকিউলার ফেলিওর। এমনটাই যে হবে বাবার, আন্দাজ করা উচিত ছিল। করেই বা কী হত, বাবা কি বদলাত জীবনধারা ! অন্য কিভাবেই বা বাঁচতে পারত বাবা !

কাটাছেঁড়ার সময় নেই, কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে তুফানের কাঁধে হাত রাখল শুভাশিস,— মন শক্ত কর, এখনও অনেক কাজ বাকি।

মুখ তুলেছে তুফান। করমচার মতো লাল চোখ চাদরের খুঁটে মুছল।

—এখানে যা দেওয়ার দিয়ে দিয়েছিস ?

ঘাড় নাড়ল তুফান।

—অলকাকে বলেছিস শ্মশানবন্ধুদের জন্য মিষ্টি আনিয়ে রাখতে ?

—রাখবে মনে হয়। নয়তো ফিরে... তুফানের গলা বুজে গেল।

শুভাশিস আর কথা খুঁজে পেল না। একটু পরে ছেলেকে বলল,— এই টোটো, এদিকের কাজ তো সব মিটে এল। তুই এবার চলে যা না।

টোটো উত্তর দিল না, ফিরেও তাকাল না। টাপু কি যেন বলছে ডোমকে, ডোমটা বাঁশ দিয়ে চিতাটা খুঁচিয়ে দিল, সেদিকেই টোটোর চোখ স্থির। কাল রাতে শুভাশিস বাড়ি ফেরার পর থেকেই ছেলের চোয়াল শক্ত হয়ে আছে, মুখ থমথমে, গাড়িতে গোটা পথ একটাও কথা বলেনি। এত দাদু অন্ত প্রাণ ছিল টোটো, আশ্চর্য ! নাকি এই প্রথম কোনও প্রিয়জনের মৃত্যু দেখছে তাই... !

অলকার বাবা কাকা এসেছেন শ্মশানে, দাদাও। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এদিকে আসছেন। কাছে এসে অলকার বাবা বললেন,— এবার তো অসীমকে একটু রামনগরে পাঠাতে হয় শুভ।

—কেন মেসোমশাই ?

—তোমাদের কাপড়চোপড়গুলো এবার আনিয়ে নিই। স্নান করে তো পরতে হবে। বউমার, অলকার লালপেড়ে শাড়ি...

শুভাশিস কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়তে যাচ্ছিল, তার আগেই তুফান বলে উঠল,— আমাদের ওসব কিছু লাগবে না।

—সে কি ! কেন ?

—বাবা অশৌচ শ্রাদ্ধশান্তি কিছু মানতেন না। ওসব অনুষ্ঠান হবে না বাড়িতে।

কথাটা এমন জোরের সঙ্গে বলল তুফান, শুভাশিসও হতবাক।

অশেষ চোখ বড় বড় করে বললেন,— তিনি না মানতে পারেন, তুমি তো মানো।

—আমার মানা না-মানায় কিচ্ছু এসে যায় না। বাবার ইচ্ছেই আমার কাছে আদেশ।

—বাবা কি তোমাকে বলেছিলেন কিছু ?

—বলেননি, তবে তাঁর বিশ্বাসটা আমি জানি। তাতে আঘাত করব এমন স্পর্ধা আমার নেই।

এইসব আচার-বিচার, পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে শুভাশিসেরও গভীর আস্থা নেই। তবু শোক জ্ঞাপনের রেওয়াজ হিসেবে এসব তাকে মানতে হবে এমনটাই ধারণা ছিল তার। তাকে টপকে তুফানের এত দৃঢ়ভাবে কথা বলাটা তার পছন্দও হল না। বাবার কাজ হবে কী হবে না এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার তুফান কে !

অলকার বাবা কাকা সরে গেছেন। শুভাশিস চাপা স্বরে বলল,— ফট করে তুই মতামত দিয়ে দিলি যে ! আমার সঙ্গে আলোচনা করারও প্রয়োজন মনে করলি না ?

তুফান নাক টানল,— তুমি কি চাও এসব হোক ?

শুভাশিস অস্বস্তিতে পড়ে গেল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে থাকা মানুষের এটাই তো সমস্যা। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল,— আমার চাওয়া না-চাওয়াটা বড় নয়। রিলেটিভরা রয়েছে,

প্রতিবেশীরা রয়েছে, গাঁয়ে নানান কথা উঠবে...

—তুমি তো জানো দাদা, বাবা কখনও এসব কেয়ার করত না।

—কিন্তু বাবা তো আর নেই। গ্রামে তুই থাকবি, তোকে কথা শুনতে হবে।

—ছাড়ো তো। বাবাকে দু'দণ্ড গাঁয়ে কেউ সুখে তিষ্ঠোতে দিল না, এখন তাদের কথার ভয়ে আমি...

—তুফান... !

তুফান চুপ করে গেল। আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজেছে।

শুভাশিস একবার আড়চোখে দেখল টোটোকে। যেন কিছু দেখছেও না, শুনছেও না, এমন ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে ছেলে। মুখ ফিরিয়ে নিল শুভাশিস, জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকাল। আগুন প্রায় নিবু নিবু, সরু ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। তুফানের কথা ভাবছিল শুভাশিস, তার মনোবেদনাটা অনুভব করার চেষ্টা করছিল। গ্রামীণ কোন্দল রাজনীতি দলাদলি এসবের মধ্যে কোনওদিন মাথা গলাতে চায়নি বাবা, তবু যেন কিভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আর এটাই বাবার মৃত্যু ত্বরান্বিত হওয়ার সব থেকে বড় কারণ। কালকেও কি একটা ওরকম উত্তেজনা থেকেই বাবা... ! তুফান এত হাউহাউ করে কাঁদছিল তখন, ভাল করে শোনা হয়নি। বাড়ি ফিরে জানতে হবে।

সহসা শুভাশিসের শরীর ঝিনঝিন করে উঠল। কী সব তুচ্ছ কথা সে ভাবছে এখন! কী করে ভাবতে পারছে! বাবার মৃত্যুতে যে সর্বগ্রাসী সর্বপ্লাবী দুঃখে আপ্লুত হওয়ার কথা ছিল তার কিছুই তো হচ্ছে না! যার মা থেকেও নেই, যাকে বাবা প্রায় একা হাতে বড় করে তুলেছে, তার তো বাবার মৃত্যুতে সব থেকে বেশি ভেঙে পড়ার কথা। বাবা তার খুব প্রিয় ছিল না, তাদের পিতাপুত্রের সম্পর্ক কোন স্বার্থের দ্বন্দ্বে চিড় খেয়েছিল— এমনও তো নয়! তা হলে? নীতির প্রশ্নে তাদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছিল ঠিকই, শুধু তাতেই কি হৃদয়ের সম্পর্কে পলি পড়ে গেল? সে কি তবে এক আবেগহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে? একটা রোবট ছাড়া আর কিছু নয়?

দুঃখ না হওয়ার জন্য দুঃখ হচ্ছিল শুভাশিসের। পুড়ছিল।

দুপুরের খাওয়া সারা হতে বেলা গড়িয়ে গেল। শ্মশান থেকে শুভাশিসরা ফেরার পরও জ্ঞাতি-পরিজনরা ছিল অনেকক্ষণ, একটু অসন্তুষ্ট হয়েই চলে গেছে। ছেলে কাছা নিল না, অশৌচ মানা হবে না, শ্রাদ্ধ নেই, এ কেমন ছিরির কথা! পাড়ার বিধবাদের ডেকে এনে, কান্নার রোল তুলে এক অথর্ব বৃদ্ধার হাতের শাঁখা পর্যন্ত ভাঙা হল না, অলকা নিঃশব্দে হাত থেকে খুলে নিল, কোনও মানে হয়! আড়ালে অনেকেই বলাবলি করল, অলকার কপাল পুড়বে।

টোটো অনেকটা সহজ হয়েছে যেন। কথা বলছে। সে এখন নীচে, অলকা আর টুকির সঙ্গে। তুফান এসেই শুয়ে পড়েছে ঘরে, ওঠেনি এখনও। দুটি ভাতে-ভাত রান্না হয়েছিল, তাও খেল না। মনোরমার সেবাযত্ন আজ নিজের হাতে করছে ছন্দা। স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো সব। একটা কাজ অবশ্য কম আজ। মনোরমাকে সাজিয়ে সিঁদুর পরাতে হয়নি।

শুভাশিস দোতলার বারান্দায়। স্নান খাওয়ার পর শরীর একদম ছেড়ে গেছে, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। পৌষের নরম দুপুরে জড়িয়ে আসছে চোখ, কিছুতেই খুলে রাখা যায় না।

ছন্দা পাশে এসে বসল। মুখ চোখ এখনও ফোলা ফোলা, সকালে আজ কেঁদেছে খুব।

তন্দ্রা কাটাতে শুভাশিস সিগারেট ধরাল,— মা ঘুমিয়েছে?

—হুঁ। সকাল থেকে আজ খুব বেশি ঘুমোচ্ছেন।

মা'র সুগারটা কি বাড়ল আবার? শেষ কবে চেক করেছিল বাবা? তুফান বলতে পারবে।

ছন্দা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল, —কী অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? মা কিচ্ছু বুঝতে পারলেন না।

—হুঁ।

—কার যাওয়ার কথা, কে চলে যায়!

শুভাশিসের হঠাৎ খুব তেতো লাগছিল সিগারেটটা, ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,— হুঁ, বড্ড হঠাৎ হয়ে গেল।

ছন্দা সোজা হয়ে বসল, —হঠাৎ বলছ কেন? ... অলকা বলছিল ইদানীং হাঁটাচলা একটু বেশি হয়ে গেলেই বাবা নাকি খুব হাঁপাতেন। গত মাসে অলকার বোনের বিয়ে গেল না, ... সেই যে তুফান এসে আমাদের কার্ড দিয়ে গেল... বাবা তো গেছিলেন অলকাদের বাড়ি।

—তাই! স্ট্রেঞ্জ!

—হ্যাঁ গো, এসে ক'দিন জ্বরেও পড়েছিলেন। শরীর তখন থেকেই আরও দুর্বল হয়েছিল। তারপর কাল অমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল...

—এগজ্যাক্টলি কি ঘটেছিল? বলেছে অলকা?

—বলেছে। মায়াকে নিয়েই তো গণ্ডগোল।

—কে মায়া?

—ওই যে, সকাল থেকে যে মেয়েটা ছিল... আমাদের ভাত ফুটিয়ে দিয়ে গেল... এখানকার হেলথ সেন্টারের নার্স।

—ও। শুভাশিসের কপালে ভাঁজ পড়ল,— গণ্ডগোলটা কী?

—একা একটা মেয়ে থাকলে যা হয়। লোকজন উৎপাত করত খুব। মেয়েটা পালিয়ে পালিয়ে এখানে চলে আসত। তুফান আর বাবা গার্ড দিত ওকে, লোকাল গার্জেনের মতো। হেলথ সেন্টারে একটা ইয়াং ডাক্তার এসেছিল, তাকে নিয়ে বদনাম রটেছিল মেয়েটার। লোকাল লোকজনই রটিয়েছিল। সেই ছেলেটা এ মাসের এক তারিখে বদলি হয়ে চলে গেছে, তারপর থেকেই কিছু লোকজন আবার বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। কাল বিকেলে মেয়েটা রামনগর বাজারে গেছে, ওকে তখন কয়েকটা বজ্জাত ছেলে হেকল করে, কুপ্রস্তাব দেয়। মেয়েটা ভীষণ ভয় পেয়ে তুফানকে খবর দিতে এসেছিল, তুফান ছিল না। বাবা শুনে একদম ফায়ার, তক্ষুনি থানায় যাবেন। অলকা বলেছিল, অন্ধকার হয়ে গেছে বাবা, একটু অপেক্ষা করুন, আপনার ছেলে আসুক। উনি কিছুতেই শুনবেন না, বেরিয়ে হানটান করছেন, ... তখনই ফার্স্ট অ্যাটাকটা...। ... তুফান তার দশ-পনেরো মিনিট পরেই ফিরেছে। ... ফিরেই দৌড়ে ডাক্তার ডেকে এনেছিল...

—হ্যাঁ, লোকাল ডাক্তার। শুভাশিস বিড়বিড় করে উঠল।

—না, না, লোকাল ডাক্তার নয়। তারকেশ্বরের ডাক্তার। রামনগরে একদিন-দুদিন নাকি চেম্বার করে। সে এসে ইসিজি করেছিল, বাড়িতেই। ইনজেকশান-ফিনজেকশানও দিয়েছিল। তারপর তো...

ইসিজি রিপোর্ট, প্রেসক্রিপশান এখানে এসেই দেখেছে শুভাশিস। তখন আর নেই শিবসুন্দর, তবুও। গ্লোবাল ইনফার্কশান। ইসিজি-তে কিউ ওয়েভ আর এস টি এলিভেশান পরিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গেই ফর্টউইন আর ক্যামপোজ পুশ করা হয়েছে। ঠিকই আছে, কিন্তু...

শুভাশিস বিমর্ষ স্বরে বলল,— তুফানের উচিত ছিল তক্ষুনি বাবাকে হাসপাতাল নার্সিংহোম কোথাও রিমুভ করা।

—সে কথা ডাক্তারও বলেছিল। বাবা রাজি হননি। কিছুতেই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল ছন্দা,— সেই তো যেতে হল...

ক্ষণিকের জন্য পেশাদারি ভাবনায় ডুবে গেল শুভাশিস, আরেকটা সিগারেট ধরাল। ল্যাসিকস ডেরিফাইলিন পুশ করা হয়নি কেন? এল ভি এফ যখন অকার করেছে, তখন নিশ্চয়ই অ্যাকিউট ব্রেথলেসনেস ছিল। কখন থেকে? ডাক্তার চলে যাওয়ার পর? অক্সিজেন সিলিন্ডার তো পড়ে আছে নীচে, তুফান বলল তারকেশ্বর থেকে নিয়ে এসেছিল। দেওয়া গিয়েছিল কি? ডেথ

সার্টিফিকেটে বাবার মৃত্যুর সময় লেখা আছে বারোটা তিরিশ। অর্থাৎ আরেকবার ডাক্তারকে আনা হয়েছিল। তখন কি বাবার সেন্স ছিল ?

হঠাৎ শুভাশিসের মনে পড়ল কাল রাতে ঠিক ওই সময়ে তারা হাওড়ার ব্রিজ পার হচ্ছে। ফাঁকা ব্রিজ, তবু একটা লরি সামনে রাস্তা আটকে আটকে যাচ্ছিল, বারবার হর্ন দিচ্ছিল শুভাশিস, ঘড়ি দেখছিল ঘন ঘন। তখনই কি মনে মনে কোনও মৃত্যুর সংকেত পেয়েছিল সে ?

ছন্দা যেন মনের কথা পড়ে ফেলেছে। আঁচলে চোখ মুছে বলল,— কাল ফোন পেয়েই আমার মনটা কেমন কু গাইছিল। খালি মনে হচ্ছিল বাবাকে এসে আর দেখতে পাব না।

শুভাশিসের বুকে টুক করে লাগল কথাটা। কাল রাতেই সে বেরোনোর পক্ষপাতী ছিল না, আজ ভোরে রওনা হতে চেয়েছিল, ছন্দাই তক্ষুনি তক্ষুনি বেরোনোর জন্য জেদ করল। রাতে এতটা পথ গাড়ি চালানোর আদৌ অভ্যেস নেই শুভাশিসের, ড্রাইভার বাড়ি চলে গেছে তাকে ডেকে আনা অসম্ভব, কোনও যুক্তিই শুনতে চায়নি ছন্দা। শুভাশিস কেন তেমন তীব্র টান অনুভব করেনি সে সময় ? ছন্দা টের পেল, শুভাশিস কেন পেল না ?

ছন্দা আবার কি বলতে যাচ্ছিল, শুভাশিস হাত তুলে থামাল। বিস্বাদ গলায় বলল,— ছন্দা প্লিজ, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

বিকেলে একা হাঁটতে হাঁটতে রামনগর গেল শুভাশিস। কাল তাড়াহুড়োয় অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়ে বেরোনো হয়নি, টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনা দরকার। ছন্দা টুথব্রাশের কথা বলছিল, কিনল তিনটে। গেঞ্জি কিনল, হাওয়াই চপ্পল কিনল। দুপুরে অনেক দিন পর গামছা ব্যবহার করে গা কুটকুট করছিল, তোয়ালে কিনল একটা। বাজারের সারের দোকানের মালিকটি শুভাশিসের মুখ চেনা, তার দোকান থেকে স্যাস ক্লিনিকে একটা ফোন করল। এ সপ্তাহে অনেকগুলো অপারেশন ছিল, সব জায়গায় জানিয়ে ডেট পিছিয়ে দিতে বলল। অরূপ শালিনী নার্সিংহোমে নেই, দুজনকেই পৌঁছে দিতে বলল বাবার মৃত্যুসংবাদ। তেমন কোনও এমারজেন্সি কেস এলে কী করতে হবে তারও নির্দেশ দিয়ে দিল।

টেলিফোন রেখে এক সেকেন্ড ভাবল শুভাশিস। আবার রিসিভার তুলেছে, ডায়াল ঘোরাল।

—হ্যালো, কে তিতির ? আমি ডাক্তার আঙ্কল বলছি। মাধবপুর থেকে।

তিতির চুপ।

—হসপিটালে যাসনি আজ ?

—এই ফিরেছি।

—তাড়াতাড়ি চলে এলি ? আদিত্যবাবু কেমন আছেন ?

—ওই এক রকম।

—ডেক্সট্রোজ এখনও চলছে ?

—না। সকালে অফ করেছে।

কী নিস্পৃহ স্বর ! শুভাশিসের পাঁজরটা চিনচিন করে উঠল। কাল রাতে তিতিরই ফোন ধরেছিল শুনেছে শিবসুন্দরের হার্ট অ্যাটাকের কথা, অথচ তিনি কেমন আছেন, আদৌ আছেন কি নেই, সেটুকু জানারও কৌতূহল নেই মেয়ের। শুভাশিস বলবে নিজে থেকে ? হাজার হোক শিবসুন্দর সেনগুপ্ত তিতিরের ঠাকুর্দা, জয়মোহন রায় নন।

তখনই তিতিরের স্বর শুনতে পেল,— ধরো। মাকে ডেকে দিচ্ছি।

ইন্দ্রাণীর গলা পেয়ে শ্বাস নিল শুভাশিস। গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে দুঃসংবাদটা দিল।

ইন্দ্রাণী দু-এক সেকেন্ড নীরব। একটা ভারী নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল শুধু। উষ্ণ বাতাস প্রতিফলিত হল শুভাশিসের কানের পর্দায়।

আরও চাপা গলায় শুভাশিস বলল,— হার্টের সব কটা দেওয়ালই চৌচির হয়ে গেছিল।

ইন্দ্রাণী যেন শুনল না কথাটা। শুকনো গলায় বলল,— উনিই চলে গেলেন ?

—কপাল।

বলে থেমে রইল শুভাশিস। বলতে পারল না শেষ সময়ে বাবার কাছে পৌঁছতে পারেনি সে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, তবুও না। শুনলে হয়তো ইন্দ্রাণী হাসবে মনে মনে। শুভাশিস কি কখনও কোথাও যথাসময়ে পৌঁছতে পেরেছে !

আবার একটা শ্বাস পড়ল ইন্দ্রাণীর। বলল,— তোমরা কি কাজকর্ম সব সেরে ফিরছ ?

—কাজ-টাজ কিছু হচ্ছে না। বাবা বারণ করেছিলেন তাই আমরা আর... তুফানের কথাটা এড়িয়ে গেল শুভাশিস,— তবে থাকব কয়েক দিন।

—মা'র এখন কী হবে ?

—কি হবে মানে ?

—ওখানেই থাকবেন, না নিয়ে আসছ ?

চিন্তাটা শুভাশিসের মাথাতেই আসেনি। মাকে তো এখন নিয়ে যাওয়াই উচিত। বাবা নেই, এখন মা'র দায়িত্ব শুভাশিসের ওপরই বর্তায়। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নার্স আয়া রেখে দিলেই মোটামুটি ম্যানেজ করা যাবে মনে হয়। কিন্তু তুফানরা কি রাজি হবে ?

শুভাশিস অস্পষ্ট স্বরে বলল,— দেখি, কি করা যায়। ... ছাড়ছি।

টেলিফোন রেখে পকেট থেকে পার্স বার করল শুভাশিস,— দুটো কল করলাম। কলকাতায়। কত দেব ?

দোকান মালিক জিভ কাটল,— ছি ছি, কী বলছেন ! আপনি আমাদের ডাক্তারবাবুর ছেলে... সদ্য তিনি গত হয়েছেন... আমি আপনার কাছ থেকে সামান্য...

শুভাশিস জোর করল না। পার্স পকেটে রেখে দিল।

লোকটা আপন মনে বলে চলেছে,— কী বড় মাপের মানুষ ছিলেন ডাক্তারবাবু ! ক্ষণজন্মা। মহাপুরুষ। এই মদন দত্তর বাড়িতে কম বার পায়ের ধুলো দিয়েছেন তিনি। বকাবকি করেছেন, চিকিৎসা করবেন না বলে ভয় দেখিয়েছেন, আবার নিজেই ডেকে...। এমন একটা মহান মানুষের মৃত্যু ডেকে আনল, দিবাকরের ছেলেগুলোর হাতে হাতকড়া পরানো উচিত...।

সংবাদটা গ্রামে মোটামুটি চাউর হয়ে গেছে। শুভাশিস বিশেষ কথায় গেল না, টুপ করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। গঞ্জ মতো জায়গাটা পেরিয়ে ফিরছে মাধবপুর। সন্ধে নেমে গেছে, মাত্র সাড়ে পাঁচটাতেই ঘোর অন্ধকার চারদিক। রাস্তাতেও আলো বড় কম, খানাখন্দও আছে বেশ, সাবধানে পা ফেলে হাঁটছে শুভাশিস। শীত করছিল। শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। মাকে এখানে ফেলে রাখার কিছু প্র্যাকটিকাল সমস্যাও আছে। রোজগার তো টুঁ-টুঁ, মা'র খরচাপাতি কেমন করে চালাবে তুফান ? বাবা ছিল, ঝঞ্ঝাট ছিল না। পেনশান ছাড়াও নয় নয় করে চার-পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করত বাবা, মা'র ওষুধপত্রের খরচা সামলানো কোনও ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু এখন... ? তুফান যদি জেদ করে মাকে রাখে মাসে মাসে একটা টাকা দিয়ে দেবে শুভাশিস ? হাজার পাঁচেক মতো ? তুফানদেরই বা চলে কিসে ? মা'র নামে ফ্যামিলি পেনশানের টাকাটা বার করা যায়, তুফান মাস মাস তুলে নিতে পারে। তারও তো শতেক বখেড়া। বাবার ব্যাংকে কিছু টাকা থাকার কথা, সবটাই নয় দিয়ে দিল তুফানকে, কিন্তু তাতেই বা কদ্দিন ? মাধবপুরের পাটটা তুলে দিলে কেমন হয় ? লেক গার্ডেন্সের জমি তো কেনা হয়েই গেছে, নয় তুফান অলকা টুকি তাদের সঙ্গেই রইল। ছন্দার একাকিত্বটাও কাটে তাহলে। দোতলা বাড়ি যদি তুলে নেওয়া যায়.... ! মা'রও অনাদর হয় না, টোটো খুব টুকি টুকি করে, টুকিটাকেও একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যায়। তুফানকেও নার্সিংহোমে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বাবার সঙ্গে থেকে থেকে অনেক কিছু শিখেছে তুফান, কেয়ারটেকার ধরনের কাজ মোটামুটি ভালই চালাতে পারবে।

ফের সেই কেজো ভাবনা ! বাবা মারা গেছে এখনও চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি, এখন কি এসব ভাবার

সময় ! মনকে শাসনে আনতে চাইল শুভাশিস। বাবার অনুষঙ্গগুলো মনে করার চেষ্টা করল। সবই চোখের সামনে ভারী জীবন্ত। বাবার হাঁটা-চলা, হাসি, গমগমে স্বরে কথা বলা, বাবার ব্যক্তিত্ব, মাথা উঁচু ভাব, বাবার শাসন অনুশাসন, সবই। এই প্রায় বিজন অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাঁশের সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট মানুষটা, স্বচ্ছ চোখ পড়ন্ত সূর্যের দিকে স্থির। এক চাপা অপ্রসন্ন ভাব খেলে বেড়াচ্ছে মুখে, বিষাদও।

তবু কেন ওই ঋজু মানুষটার জন্য শোকে মূহ্যমান হচ্ছে না শুভাশিস ! ওই মদন দত্ত না কে, সেও তো... !

শুভাশিস খরখরে চোখে ওপর পানে তাকাল।

আকাশের কোণে এক পাণ্ডুর চাঁদ। ক্ষয়াটে, হিম মাখা। যেন তারই প্রতিবিম্ব।

পাঁচটা দিন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। বাড়ি থেকে শোকের ছায়া এখনও এতটুকু মোছেনি। দিন আসে, দিন যায়, বাতাসের ভারী ভাব কাটে না কিছুতেই। একটা মানুষের অভাব গোটা বাড়িটাকেই শূন্য করে দিয়েছে। কেউ জোরে কথা বলে না, উচ্চকিত স্বরে হাসে না, প্রতিটি কথায় তাঁর কথা এসে পড়ে, তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি এখনও যেন প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায়। তুফান তারকেশ্বর থেকে শিবসুন্দরের কয়েকখানা ফটো বাঁধিয়ে এনেছে, নিজের ঘরে টাঙিয়েছে একটা, আরেকটা মনোরমার ঘরে। অলকা সকাল-বিকেল প্রদীপ জ্বালায় ছবির সামনে, ধূপ জ্বালে, মালা দেয়।

দু দিন দুটো শোকসভা হয়ে গেল গ্রামে। সোমেনরাও করল, দিবাকররাও করল। এ বাড়ির সকলকে আন্তরিকভাবে ডেকেছিল তারা। তুফান যেতে রাজি হয়নি, অগত্যা শুভাশিসকেই এ বাড়ির প্রতিনিধি সেজে হাজিরা দিতে হল। সে ভারি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। শিবসুন্দর যা করেছেন, যা করেননি, যা করার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি, সবই আবেগ থরথর গলায় বলে চলেছে বক্তারা, জড়সড় হয়ে বসে গিলতে হচ্ছে শুভাশিসকে। শিবসুন্দর যে দু দলেরই একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, এ কথাও শোকসভাতে প্রথম জানল শুভাশিস। এবং আশ্চর্যের কথা, কিংবা হয়তো এটাই স্বাভাবিক, মায়া নামের মেয়েটির নাম কোথাও একবারও উচ্চারিত হল না।

ছন্দা আর টোটোর উদ্যোগে বাড়িতেও একটা স্মরণসভা হল। গতকাল বিকেলে। খুবই ছোট আয়োজন, যেসব আত্মীয়দের সঙ্গে ছন্দা অলকার কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে তাদেরই শুধু ডাকা হয়েছিল। অলকার বাপের বাড়ি থেকেও এসেছিলেন কয়েকজন। নীরস কথার কচকচি নয়, সবাই মিলে তাঁর কথা ভাবা, তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো, আর কিছু ঘরোয়া স্মৃতিচারণা। মায়াও ছিল, সে পর পর কয়েকটা গান গাইল। রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভরা থাক স্মৃতিসুধায় গাইতে গিয়ে তার সুরেলা সতেজ স্বর কান্নায় বিধুর হয়ে গেল।

শিবসুন্দরের চেম্বার ক'দিন ধরে তালাবন্ধ। মাঝে একদিন শুধু অলকা খুলে ঝাড়পোঁছ করেছিল। বিকেলের দিকে খালপাড় ধরে একটু হেঁটে এসে শুভাশিস দেখল আজ চেম্বারে আলো জ্বলছে, ভেতরে তুফান আর সোমেন।

শুভাশিস বিস্মিত হল। তুফান গ্রামের লোকজনের সঙ্গে একদমই দেখা করছিল না, আজ হঠাৎ... !

ভেতরে এসে অলকাকে জিজ্ঞাসা করল,— ব্যাপারখানা কী ? ওই ভদ্রলোক আবার এসেছেন যে ?

অলকা লেপের ওয়াড় সেলাই করছিল। ভেতর দাওয়ায় বসে। চোখ তুলে বলল,— ঠিক বলতে পারব না দাদা। কি সব দিবাকর টিবাকর বলছিল।

—দিবাকর মানে সেই অন্য পার্টির ছেলেটা ?

—হুঁ। অলকা আলতো ঘাড় নাড়ল।

শুভাশিস দাদাসুলভ স্বরে বলল,— তুফান যেন সোমেন-টোমেন কাউকে পাত্তা না দেয়। নতুন করে আর ঘোঁট পাকানোর কি প্রয়োজন ?

অলকার নিষ্প্রভ মুখ আরও মলিন দেখাল,— আপনার ভাই সোমেন দিবাকর কাউকেই পাত্তা দেয় না দাদা। বাবাও দিতেন না।

শিবসুন্দরের নাম উঠতেই এক পলক আনমনা হল শুভাশিস। অলকার সবজি বাগানে ফুলকপি ফুটে আছে, শেষ বিকেলের আধো অন্ধকারে সাদা সাদা কপি কেমন মায়াবী দেখায়। সেদিকে চোখ রেখে দাওয়ায় বসল শুভাশিস। ভার গলায় বলল,— ওই মায়া মেয়েটি সম্পর্কেও তোমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

—কেন দাদা ?

—ওই তো যত গণ্ডগোলের মূল। গাঁ-গঞ্জে বদনাম এমনি রটে না, পেছনে কিছু না-কিছু কারণ থাকে। তাছাড়া সে খুবই ইরেসপন্সিবল। নইলে সেদিন বাবার শরীর খারাপ জেনেও বাবাকে ওভাবে উত্তেজিত করে দিত না।

অলকা একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল,— ওর সম্পর্কে রটনাগুলো নির্জলা মিথ্যে দাদা। বাবাও সে কথা জানতেন। মেয়েটা বড় দুঃখী।

—কিসের দুঃখ ? কয়েকটা বদমাইশ ছেলের উপদ্রব ? এখান থেকে চলে গেলেই পারত।

—ট্রান্সফারের চেষ্টা করেছিল। পায়নি।

—চাকরি ছেড়ে দিতে পারত। গভর্নমেন্টের নার্স, মানে নার্সিং-এর ডিগ্রি আছে, কলকাতার কত নার্সিংহোমে চান্স পেয়ে যেত।

—হুট করে চাকরিটা ছাড়া ওর পক্ষে কঠিন ছিল দাদা। একটা গোটা সংসার ওর ওপর নির্ভর করে আছে। ও একটা দিন বেকার থাকলে বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। ছুঁচ গেঁথে ওয়াড়টাকে ভাঁজ করল অলকা। উঠে ঘরের দিকে এগোতে গিয়েও থামল,— ওর খুব ইচ্ছে ছিল আপনার নার্সিংহোমে চাকরি করার।

—আমার নার্সিংহোমে ?

—হ্যাঁ। বাবাকে বলেওছিল। বাবা পছন্দ করেননি।

—কেন ?

—জানি না। তবে মেয়েটার অসুবিধেটা বুঝতেন। তাই ওর ওপরে একটা দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। ওর বিপদ-আপদ নিয়ে খুব চিন্তিত থাকতেন।

—আশ্চর্য ! আমার কাছেও পাঠাবে না, আবার তাকে নিয়েও ওরিড থাকবে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। শুভাশিস হাত উল্টোল,— তোমরাই বা কি ? তোমরা আমায় বলতে পারতে। তুমি তো কলকাতায় ছিলে, তখনও তো কিছু উচ্চবাচ্য করনি !

অলকা কোনও উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে ঘরে চলে গেল।

বিকেলের কাঁচা অন্ধকার গলে গলে মিশে যাচ্ছে সন্ধের সঙ্গে। পুকুরের দিক থেকে হিমেল বাতাস আসছে একটা, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। শুভাশিস চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। দোতলার বড় ঘর থেকে টোটো আর টুকির গলা উড়ে আসছে মাঝে মাঝে। ছন্দা মনে হয় মা'র ঘরে। সবাই কেন শুভাশিসের থেকে এত দূরে দূরে থাকে ! বাবারও কী উদ্ভট জেদ ! তুফান অলকাও তাকে আপন ভাবে না ! অলকা নয় পরের ঘরের মেয়ে, কিন্তু তুফান ?

বাতাসের হিমকণা শুভাশিসের শরীরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। মায়া কলকাতায় চলে গেলে বাবা বেঁচে যেত। মায়াকে তার কাছে না পাঠিয়ে বাবা কি শুভাশিসকেও তার মৃত্যুর জন্য এক কণা দায়ী করে গেল !

অলকা চা রেখে গেছে। কাপে চুমুক দিয়ে একটু বুঝি তাপ এল শরীরে। সোমেন চলে যাওয়ার পরও তুফান বসে আছে চেম্বারে, শুভাশিস উঠে গেল সেখানে।

বাবার ফাঁকা চেয়ারে বসে সরাসরি বলল,— মায়া মেয়েটা কলকাতায় চাকরি চেয়েছিল, তুই আমাকে জানাসনি কেন তুফান ?

তুফান চোখ পিটপিট করল—বাদ দাও। ও নিয়ে আর ভেবে কি হবে !

—না তুই বল। আমার জানা দরকার।

তুফানের ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল,— কারণটা তো খুব সিম্পল। বাবা তোমার নার্সিংহোম করাটা মেনে নিতে পারেননি, তাই সেখানে কারুর জন্য সুপারিশও করতে চাননি।

—আমি বাবার কথা জিজ্ঞেস করছি না। তোর কথা বল।

তুফানের মুখটা করুণ হয়ে গেল,— বাবা যা চাননি, সেটা আমি করব, তুমি ভাবলে কী করে দাদা ?

শুভাশিস যেন থাপ্পড় খেল একটা। বাবার ক্রিয়াকর্ম কিছু হবে না, এটা প্রায় মালিন্যহীন মনে মেনে নিতে পেরেছে এত দিনে, কিন্তু তুফানের এই কথাটা যেন তার মর্মমূলে নাড়া দিল।

গোমড়া মুখে বলল,— এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। তুই বাবাকে নিয়ে একটু বেশি নীতিবাগিশপনা করিস।

তুফানের মুখটা এবার বড় অসহায় দেখাল,— কী করব দাদা ? তুমি বাবাকে জন্মসূত্রে পেয়েছ, তাকে মানতেও পারো, অগ্রাহ্যও করতে পারো। তাতে তোমাদের বাপবেটার সম্পর্কের সুতো ছিঁড়বে না। কিন্তু আমাকে প্রতিটি কাজে প্রতিটি পদে প্রমাণ করতে হবে আমি বাবার ছেলে। বাবা আমায় ভালবাসতেন, তার বিনিময়ে তিলে তিলে আমায় বাবাকে অর্জন করতে হয়েছে। তাই তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছে আমার কাছে এত মূল্যবান।

হঠাৎ শুভাশিসের ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তুফান যেভাবে অনুভব করেছে বাবাকে তার এক বিন্দুও তো শুভাশিস পারেনি ! আজ অনেক কথা বলবে ভেবেছিল তুফানকে। মাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার কথা, তুফানের চাকরি-বাকরির কথা, টুকির ভাল স্কুলে পড়াশুনো করার কথা...। থাক, এই মুহূর্তে ওসব কথা তুললে তুফানকে অপমান করা হয়। বাবা মা অলকা টুকি মাধবপুর সব কিছু নিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে আছে তুফান, এখানে শুভাশিসের অনুপ্রবেশ করার কোনও অধিকার নেই। না হয় শুভাশিস অন্য কোনও ভাবে তুফানকে বুঝিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে মাসে মাসে।

পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করল শুভাশিস। ধরাল। নীলচে ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর, ভরে যাচ্ছে শুভাশিসের ফুসফুস।

অনেকটা সময় নিয়ে শুভাশিস বলল,— যাক গে। পাস্ট ইজ পাস্ট। তোর সঙ্গে আরেকটা কথা ছিল।... আমি কাল চলে যাব ভাবছি। অনেক কাজ পড়ে আছে। তোর বউদি এখানে ক'দিন থাকতে চায়, থাকুক। টোটোকে নিয়ে যেতেই হবে... সামনে পরীক্ষা... বলতে বলতে উঠল শুভাশিস, দশ-পনেরো দিন পরে আমি একবার আসব।

তুফানও উঠে দাঁড়িয়েছে। দাদার সঙ্গে চেম্বারের বাইরে এল। দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে বলল,— তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব দাদা ? রাখবে ?

—বল।

—আপত্তি থাকলে কিন্তু সরাসরি না করে দিয়ো। তুফান শুভাশিসের মুখোমুখি দাঁড়াল,— এই চেম্বারটা বাবার প্রাণ ছিল। এটা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে ভাবতে কেমন লাগছে। তুমি যদি মাসে একটা-দুটো রোববারও এখানে এসে বসো... তুমি তো জানো বাবা আত্মা-টাত্মায় বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু আমি করি। তুমি চেম্বারটা চালু রাখলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল তুমি....। সোমেন চাইছিল তমালডাক্তার এখানে বসুক, আমি না বলে দিয়েছি।

ঠিক মিনতি নয়, কেমন যেন গভীর আকুতি থেকে কথাগুলো বলছে তুফান। শুভাশিস তুফানের কাঁধে হাত রাখল। চাপ দিল মৃদু।

শিবসুন্দরের মত্যুর পর এই প্রথম অমলিন হাসল তুফান।

এই প্রথম শুভাশিসের বুকে কান্না জমছিল। বাবার জন্য।

ছন্দা বারান্দায় এসে বলল,— তোমরা কাল কখন বেরোচ্ছ ?

অন্ধকারে সিগারেট খাচ্ছিল শুভাশিস। তুরীয় শীতে শরীর কেমন অবশ অবশ লাগে, তবু বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রিলে হাত পড়তেই সরিয়ে নিল হাত, ঠাণ্ডা বরফ হয়ে আছে লোহা। মুখ ফিরিয়ে বলল,— দেখি, টোটো কখন বেরোয়।

—খেয়েদেয়ে দুপুরে বেরোনই ভাল। সন্ধের আগে পৌঁছে যাবে, তারপর রেস্ট নিয়ে কাল থেকে...

—হুঁ। ... মাকে শুইয়ে দিয়েছ ?

—অনেকক্ষণ। ছন্দা হাই তুলল,— তুমিই তাহলে মা'র ঘরে থাকছ আজ ?

—থাকি। অলকা আজ টুকির কাছে শুক।

—সে নয় আজ অলকাকে রিলিফ দিলে। সারা বছর কী হবে ? যে ক'দিন আমি আছি তাও নয় কেটে যাবে কোনও রকমে। তারপর ?

—সে তুফান বুঝবে। মনে করলে একটা লোক রেখে নেবে।

ছন্দা চোখের কোণ দিয়ে দেখল শুভাশিসকে। চোখে কোনও প্রশ্ন আছে কিনা বুঝতে পারল না শুভাশিস। মগজটা ইদানীং ভাল কাজ করে না। টোটো ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল। সিগারেট ফেলে মনোরমার ঘরে যেতে গিয়েও থামল,— তুমি ফিরছ কবে ?

—তুমি এসো ঘুরে। তুফান অলকা ততদিনে একটু সামলে নিক। অলকা আমার অসুখের সময় যা করেছিল...

ও, এখানেও বিনিময় প্রথা ! শুভাশিস মনে মনে হাসল। ছন্দার ঔদাসীন্য আজকাল তাকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে, কিন্তু তার কর্তব্যজ্ঞানটা যে টনটনে আছে এটাই শুভ লক্ষণ। তৃপ্তিদায়কও বটে।

মা'র ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল শুভাশিস। মশারির গায়ে এসে কয়েক পল দেখল মনোরমাকে। লেপের তলায় নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছেন শুভাশিসের বোধহীন মা, নিশ্বাস পড়ছে কিনা তাও বোঝা যায় না। গ্লুকোজ স্টিকে কাল মা'র সুগারটা দেখেছিল শুভাশিস। একটু বেশির দিকে, তবে ঠিকই আছে মোটামুটি। সন্ধেবেলা প্রেশার মেপেছে, অনেকটা লো। আরেকবার দেখবে এখন ? থাক। যদি মা জেগে যায় !

কোথায় শোবে তাই নিয়ে শুভাশিস একটু ধন্দে পড়ে গেল। মা'র পাশে শুলে তার ঘুম আসবে না, পুরনো আতঙ্কের স্মৃতি হয়তো তাড়িয়ে বেড়াবে সারা রাত। তাছাড়া অনভ্যাসটাও একটা কারণ বটে। মা'র পাশে কবে আর শুয়েছে শুভাশিস !

সন্তর্পণে বিছানা থেকে দ্বিতীয় লেপটা বার করে বাবার ইজিচেয়ারে গা ছড়াল শুভাশিস। একটা তো রাত, ঠিক কেটে যাবে। হাত বাড়িয়ে বাবার টেবিল থেকে একটা মেডিকেল জার্নাল টানল। উল্টোচ্ছে। পাতায় পাতায় পেনসিলের দাগ দিয়েছে বাবা, মার্জিনের ধারে ছোটখাট মন্তব্য লিখে রেখেছে। করত তো সাধারণ জ্বরজারির চিকিৎসা, এত পড়াশুনো করে কী লাভ হত বাবার !

শুভাশিস ঘড়ি দেখল। দশটা পঞ্চাশ। জার্নাল টেবিলে রাখল শুভাশিস, অন্যমনস্ক হাতে বাবার ড্রয়ারটা খুলল। কত কী হাবিজাবি জিনিস ! আধ খালি ওষুধের শিশি, ছোট একটা ছুরি, কাঁচি, সুতোর রিল, এক পাতা সরবিট্রেট, শুধু দুটো খাওয়া হয়েছে। অজান্তেই শুভাশিসের ভুরু কুঁচকে গেল। হাতড়ে হাতড়ে আরও কয়েকটা ওষুধের ফয়েল বার করল। হার্টের। প্রেশারের। তুফানের মুখে শুনে কতবার শুভাশিস জিজ্ঞাসা করেছে, প্রতিবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে বাবা। কেন ? জীবনে কি স্পৃহা ছিল না বাবার ! ভাবতেই কোথায় যেন খোঁচা লাগে। হাতড়ে একটা কার্ড পেল। টোটোর পাঠানো, নিউ ইয়ারস গ্রিটিংস। কার্ডের পিছনে ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে কি যেন লিখে

রেখেছে বাবা, পড়া যাচ্ছে না । শ্বশুরমশাই-এর চিঠি রয়েছে গোটা কতক । কলকাতারও কোনও ডাক্তারবন্ধুর কাছে থেকে আসা মনোরমার কিছু প্রেসক্রিপশন । এক রাশ ডায়েরিও আছে, অবিন্যস্তভাবে ছড়ানো । বাবা ডায়েরি লিখত ? মোটা একটা ডায়েরি খুলল শুভাশিস । প্রতিটি পাতায় বিনা মন্তব্যে ঘটনার উল্লেখ । তার মধ্যেই যেন ছবি পাওয়া যায় অনেক । ... শুভ সকালে এসেছিল । থাকল না, বিকেলে চলে গেল । ... মনো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল আবার । ... শুভ ছন্দা আজ খুব ঝগড়া করছিল । ... ছন্দা নাকি পুজো করে খুব, তুফান বলছিল । ছোট ছোট তীক্ষ্ণ বিবরণী থেকে কেমন যেন অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটে ওঠে । তাদের নিয়ে এত ভাবত বাবা ? পাতার পর পাতা উল্টোচ্ছে শুভাশিস । এক জায়গায় চোখ গেঁথে গেল । কোন এক গেঁয়ো খেলুড়ে ট্রেনে কি বিপজ্জনক খেলা দেখায় তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা । লোকটা বলেছে, বেঁচে থাকাটাই তো সুখ, তাও লিখে রেখেছে বাবা ।

শুভাশিসের মাথা দুলে উঠল । এটাই কি বাবার মনের কথা ? তাহলে কেন ব্যাধি নিয়ে এত গোপনীয়তা ছিল বাবার ? অভিমান ? বিতৃষ্ণা ?

ঘরে খুট করে একটা শব্দ হল । চমকে তাকিয়ে শুভাশিস দেখল লেপ ছেড়ে উঠে বসেছেন মনোরমা । এদিক ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছেন । শুভাশিসের দিকে ক্ষণিকের জন্য স্থির হল অক্ষিগোলক, সরে গেছে । অস্থির, একটু যেন চঞ্চল ।

শুভাশিসের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল । টেবিলে রাখা বাবার ছবির দিকে এবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মা । বাবাকে কি মা চিনতে পারত ? নাকি শুধুই অভ্যাসের বশে রোজ দেখা মানুষকে... !

না । মা'র চোখ বাবাকেই খুঁজছে ! হাত দিয়ে দিয়ে হাতড়াচ্ছে পাশের বিছানা ! উঠে গিয়ে মাকে শুইয়ে দেবে ? শুভাশিসের পা পাথর, নড়ে না । বুকের থম ধরা ভাবটা ফেটে বেরিয়ে এল, কান্না হয়ে । দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল শুভাশিস । জড়বুদ্ধি মা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বাবা নেই ।

বাবা আর কোত্থাও নেই ।

৮৮

হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আর মাত্র সাতষট্টি দিন বাকি, তিতির জোরকদমে লেগে পড়েছে পড়াশোনায় । সারা দিন বই-খাতায় ডুবে থাকে, রাতেও ঘণ্টা চারেকের বেশি ঘুমোয় না । ঘড়ি মেপে শোয়, ঘড়ির পাগলাঘণ্টিতে জেগে ওঠে, ঘড়ি ধরে স্নান, ঘড়ি ধরে খাওয়া, ঘড়ি ধরে বাইরে বেরোনো, ঘড়িই এখন তার দিন রাতের নিয়ন্তা । ডাক্তার আঙ্কল একদিন ঠাট্টাচ্ছলে টোটোর সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা বলেছিল, কথাটা তিতিরের মনে গেঁথে আছে । টোটোর মতো নম্বর না পাক, টোটো আর টোটোর বাবা দুজনকেই পরীক্ষার ফল দেখিয়ে উচিত জবাব দিতে হবে । দিতেই হবে ।

ক'দিন ধরে ঠাণ্ডাটা আবার বেশ বেড়েছে । পৌষ সংক্রান্তির পর পর শীত অনেকটা কমে গিয়েছিল, মাঘের মাঝামাঝি জাঁকিয়ে ফিরে এল । থার্মোমিটারের পারাই শুধু নামেনি, একটা জোর হাওয়াও চলছে দিনভর । এলোমেলো, ঝোড়ো বাতাস । এমন বাতাস, দরজা জানলা বন্ধ রেখেও হাড়গোড় হিম হয়ে যায় ।

আষ্টেপৃষ্ঠে শাল জড়িয়ে চেয়ারে বসেছে তিতির । গুটিসুটি মেরে । সামনে টেবিল ল্যাম্পের আলো, খোলা খাতাবই টেবিল জুড়ে ছড়ানো, আঙুলে ডটপেন । বিকেলে ঝুলন অসহযোগ আন্দোলনের ওপর একটা নোট দিয়ে গেছে । তিতির টুকছে মন দিয়ে । টুকতে টুকতে পড়ছে বার বার, মাঝে মাঝে বই থেকেও দু-একটা পছন্দমতো পয়েন্ট যোগ করে নিচ্ছে, বিষয়টাকে মগজে সাজিয়ে নিচ্ছে ভাল করে । অন্ধকার ঘরের কোণে এক টুকরো ফুটে ওঠা আলোয় তাকে এখন

ধ্যানমগ্ন তপস্বিনী বলে মনে হয়।

মৃদু একটা শব্দ হল ঘরে। বিছানায়। অস্ফুট ধ্বনি যেন। উজ্জ্বল আলো থেকে ছায়া ছায়া অন্ধকারে মুখ ফেরাল তিতির।

নিচু স্বরে ডাকল, —কিছু বলছ বাবা ?

আর সাড়াশব্দ নেই।

চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণতর হল তিতিরের স্বর, —বাবা...ঘুমোওনি এখনও ?

কোনও উত্তর নেই।

তিতিরের হাসি পেল। বাবা জেগে আছে, জানাতে চায় না। তিতিরের কান্নাও পেল একটু। রাতের পর রাত ঘুমোয় না বাবা, ঠিক টের পেয়ে যায় তিতির। বাবা কি জেগে জেগে নিজের সঙ্গে কথা বলছিল ? বলে মাঝে মাঝে। স্বচক্ষে বাবার ঠোঁট নড়া দেখেছে তিতির। রাতে, দিনে, বহু সময়ে। কখনও বা চোখের কোলে জল জমে বাবার, গাল বেয়ে গড়িয়ে আসে। এখনও কি কাঁদছিল বাবা !

দিন পনেরো হল হাসপাতাল থেকে ফিরেছে আদিত্য। শরীর এখন অনেক সুস্থ, তবু সারাক্ষণ কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে। সেবারও হাসপাতাল থেকে ফিরে আদিত্য দুর্বল ছিল খুব, কিন্তু এমন নিষ্প্রভ, এত নিরানন্দ ছিল না। ফাঁক পেলেই ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ বেরিয়ে যেত, নিষেধ মানত না, উল্টোপাল্টা খাবার খেয়ে নিত, আর কারুর সঙ্গে না হোক তিতিরের সঙ্গে তালবেতাল কথা বলত কত। আর এবার সে প্রায় নির্বাক, স্বেচ্ছাবন্দি, খাট ছেড়ে নড়তেই চায় না বড় একটা।

হাসপাতালেও প্রায় এমনটাই ছিল। মলিন শয্যায় শুয়ে আছে, চোখ বিবর্ণ দেওয়ালে স্থির সারাক্ষণ। সিস্টারদের সঙ্গে কথা নেই, আশপাশের বেডের মানুষজনের সঙ্গে বাক্যালাপে তিলমাত্র আগ্রহ নেই, এমনকী রঘুবীরের সামনেও পুরোপুরি নিরুচ্ছ্বাস। তিতির কতদিন দেখেছে আদিত্যর বিছানার পাশে টুল টেনে একা একা গলা ফাটাচ্ছে রঘুবীর, কিছুই শুনছে না আদিত্য। সুদীপ কন্দর্প বা জয়শ্রী শংকর গেলে কয়েকটা রুটিন সংলাপ, আবার চোখ বন্ধ, আবার সেই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

তিতির ভেবে পায় না সত্যিই কি বাবা তখন এত অসুস্থ ছিল ? কী করে হয়, অসুখ তো সেই একই ! অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস। যার ওষুধ বলতে শুধু ডেক্সট্রোজ আর বিশ্রাম। প্রথম দিকে নয় সিডেটিভে আচ্ছন্ন থাকত, তারপর ? এবার হাসপাতালে নতুন করে শরীরের ওপর কোনও অত্যাচারও করেনি বাবা। তবু তিন সপ্তাহ থাকতে হল হসপিটালে। কেন ?

তিতির আনমনে চোখ রগড়াল। জোর করে মন বসাতে চেষ্টা করছে পড়ায়। পারছে না। খোলা পাতার চেনা অক্ষরগুলো যেন কালো কালো পিঁপড়ের সারি, নড়াচড়া করছে আপন খেয়ালে। লাখো চিন্তা সূক্ষ্ম তন্তুজাল নির্মাণ করছে মস্তিষ্কে। অসহযোগ আন্দোলন গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেল। হাই উঠছে। বসে বসেই গরম শালে সেঁধিয়ে থাকা দু' হাত বার করে ছোট্ট আড়মোড়া ভাঙল তিতির, আবার দ্রুত গায়ে সাপটে নিয়েছে গাঢ় নীল শাল। বড় শীত। পায়ে চটি গলিয়ে ছুট্টে বাথরুম থেকে ঘুরে এল। ফেরার পথে আড়চোখেও মা'র দরজার দিকে তাকাল না। কন্দর্পর ঘর থেকে ফরর ফরর নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। দার্জিলিংয়ে শুটিংয়ে গিয়েছিল কন্দর্প, প্রবল সর্দি নিয়ে ফিরেছে। আদিত্যর পাশের খাটে মশারির তিনটে খুঁট লাগানো আছে, চতুর্থটা পেরেকে আটকাল তিতির। নীল রাতবাতি জ্বালিয়ে নেবাল টেবিল ল্যাম্প, পায়ে পায়ে বাবার মশারির পাশে এল।

—বাবা ?

সাড়া নেই।

তিতির ঝুঁকে বাবার মুখ দেখার চেষ্টা করল। আবছায়ায় ঠিক ঠাহর হয় না, থুতনি পর্যন্ত লেপে ঢাকা শীর্ণ মুখখানা ভারী রহস্যময় লাগে। আধচেনা আধচেনা।

মশারির ওপর দিয়ে আদিত্যর কপাল ছুঁল তিতির। ঘরের আলোর মতো নরম স্বরে ডাকল, —জল খাবে না বাবা ?

একটু বুঝি চমকে চোখ খুলল আদিত্য, —কেএএ ? ...ও, তুই। আমি ভাবলাম...

—কী ভাবলে ?

—কিছু না। ...কে যেন এসেছিল না ঘরে ?

ও, বাবা তাহলে স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ ? রোজকার নিয়মে বাবাকে জল খাওয়াতে যাওয়াটা কি তবে ভুল হয়ে গেল ?

তিতির মৃদু স্বরে বলল,— এত রাতে আবার কে আসবে ? তুমি ঘুমোও। চোখ বোজো।

চোখের পাতা বন্ধ হল না আদিত্যর। লেপ ঠেলে উঠে বসেছে,— একটু জল দে। তালুটা শুকিয়ে গেছে।

টেবিলে রাখা জগ থেকে গ্লাসে জল ঢালল তিতির। সন্তর্পণে মশারি তুলে এগিয়ে দিল গ্লাস। এক-দু' চুমুক খেল কি খেল না, আদিত্য গ্লাস হাতে বসে আছে।

—কী হল ? খাও।

—সত্যি কেউ আসেনি ? আদিত্য বিড়বিড় করল,— আমি যে স্পষ্ট দেখলাম।

—কাকে দেখেছ ? কে ?

আদিত্য উত্তর দিল না। নিশ্চুপ ভাবছে।

নতুন উপসর্গ। তিতিরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। বাবার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে টেবিলে রেখে মশারি গুঁজছে। আদিত্যর ছায়া ছায়া অবয়বের দিকে চোখ। বলল,— মা এ ঘরে আসে না বাবা।

আদিত্য নিঃসাড়। লেপ টেনে ঠাণ্ডা আটকাচ্ছে।

তিতির পাশের খাটের মশারির ভেতর ঢুকে পড়ল। শাল খুলে বালিশের পাশে ভাঁজ করে রাখছে। হিম ভাবটা ঝাপটে এল গায়ে তবু লেপের দিকে হাত বাড়াল না। নিচু স্বরে বলল,—মা'র কথা কেন ভাব বলো তো বাবা ? আমি তো আছি।

আদিত্য কিছু একটা বলল, শোনা গেল না।

তিতির সামান্য গলা ওঠাল,— এই যে তোমার এতদিন টালমাটাল সিচুয়েশান গেল, আমি তোমার কোনও অসুবিধে হতে দিয়েছি ? মা তো একদিনও হসপিটালে যায়নি, তার জন্য তোমার ট্রিটমেন্টে কোনও অবহেলা হয়েছে ? নাকি বাড়ি ফেরার পর তোমার নার্সিংয়ে কোনও ত্রুটি হয়েছে ? একটা কথা মাথায় রেখো, তুমি আর এখন একা নও। তিতির সব সময়ে তোমার পাশে আছে।

আদিত্য চুপচাপ শুয়ে পড়ল। একটুক্ষণ নৈঃশব্দ্য। মা'র মুখটা মনে করার চেষ্টা করছিল তিতির। রুক্ষ রাগী নিষ্ঠুর মুখ, মায়াদয়ার লেশমাত্র নেই। বিজলি নামের ওই মেয়েটাকে দেখে আরও যেন স্টিফ হয়ে গেছে মা। কী হাস্যকর আচরণ! রঘুবীরের ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিল বাবা, রঘুবীর ছিল না, মেয়েটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাবাকে ডাক্তার দেখিয়েছে, বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে, এতে মা'র এত মানে লাগার কী আছে ? মহিলা হসপিটালে বাবাকে দেখতেও এসেছিল, তিতিরের সঙ্গে তার আলাপও হয়েছে। একটু অমার্জিত ঠিকই, মাঝে মাঝে শালা-ফালা বলে ফেলে, তা বলে মোটেই শয়তানি ডাইনি টাইপ নয়। বাবাকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করে, মিস্ত্রির ঘরের মেয়ের যেমন করা উচিত। ওই রকম একটা মহিলাকে জড়িয়ে বাবাকে সন্দেহ করে মা ? ছি। যাদের নিজেদের মনে পাপ তারাই বুঝি এমনটা পারে।

ও পাশের খাট থেকে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল। মাত্র একটা শ্বাস পতনের শব্দে ঘরের ঠাণ্ডা বাতাস হঠাৎ যেন একটু ভারী হয়ে গেছে।

তিতির বিরক্তমুখে গায়ে লেপ টানল,— তুমি দিন দিন বড় ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ বাবা। মাকে অত পাত্তা দেওয়ার দরকার কী শুনি ? লক্ষ করে দেখেছ তোমার কথা ভেবে মাকে আমি কেমন একঘরে করে দিয়েছি ? যেচে মা'র সঙ্গে একটা কথা বলি ? ঢুকি মা'র ঘরে ? শুই মা'র পাশে ? কেন

করি এসব ? তোমাকে মা নেগলেক্ট করে বলেই না !

এতক্ষণে আদিত্যর স্বর ফুটেছে। বিনবিন করে বলল,— তুই মা'র ওপর বড্ড বেশি রেগে আছিস তিতির।

আঁধারে তিতিরের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোল। মনে মনে বলল, কেন রাগব না ? মা'র জন্য কমবার অপমানিত হয়েছি আমি ? কাকে টোটো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল ? কার জন্যে ? এই ক'দিন আগে ডাক্তার আঙ্কলের বাবার হার্ট অ্যাটাক হল, টোটো ফোনে কী বিশ্রী ভাষায় কথা বলল আমার সঙ্গে ! মা'র ওপর ঘেন্নাগুলো কেন আমার দিকে ছিটকে আসবে ?

টোটোর কথা মনে পড়তেই একটা অচেনা কষ্টে কুঁকড়ে গেল তিতির। অনেককাল আগে, কোন ছোটবেলায়, এক পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। ঠিক পাহাড় নয়, ছোট ছোট সবুজ টিলায় ভর্তি ছিল জায়গাটা। বোধহয় হাজারিবাগের দিকে কোথাও, জায়গাটার নাম এখন আর মনে নেই। দাদু ঠাম্মা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, দাদুর এক বন্ধুর বাড়ি ছিল পাহাড়ের কোলে। আর কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে রাতভর অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরেছিল একদিন। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল বৃষ্টি তখন থেমে গেছে, কিন্তু কী বিচিত্র এক ধ্বনি বাজছে চারদিকে ! পাহাড়ের জল অজস্র সরু সরু স্রোত হয়ে নেমে আসছে, বয়ে যাচ্ছে, নুড়ি পাথরে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ তুলছে ঝমঝম !

আজ সহসা বুকে যেন সেই ধ্বনি। শুনে শিউরে উঠছিল তিতির, শীতার্ত অন্ধকারে মথিত হচ্ছিল। লেপ জড়িয়ে শুয়ে পড়ল, তবু কাঁপছে। বন্ধ চোখের ওপর থেকে ছুটে আসছে অজস্র রঙিন কাচের টুকরো, বিঁধে যাচ্ছে শরীরে। উফ, কী কষ্ট।

পোস্তদানা মনটা কুনকুন করে উঠল,— তিতির সাবধান, তোর কিন্তু দুঃখ আরও বাড়বে।

তিতির হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে নিয়ে এল,— আরও দুঃখ ? কেন ?

—টোটোকে যে তুই ভুলতে পারছিস না।

—বাজে কথা। ওই নাকউঁচু ছেলেটাকে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না।

—কার কাছে লুকোস নিজেকে ? তুই মরেছিস।

—মরেছি তো মরেছি, তোর কি ?

—আমার আর কি। বিপদ তো তোরই। আরও অনেক বড় ধাক্কা খাবি তুই। ভেঙে চৌচির হয়ে যাবি।

—চোপ।

তিতির ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। এই ঠাণ্ডাতেও নাকের ডগায় ঘাম জমেছে।

নীলাভ আঁধারে আবার আদিত্যর ক্ষীণ গলা শুনতে পেল,— উঠে পড়লি যে বড় ?

তিতির কথা বলল না।

—কষ্ট পাচ্ছিস তো ? কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের ওপর রাগ করলে শুধু দুঃখই বাড়ে রে। তোর মাও সেরকম।

তিতির থ হয়ে গেল। এত অপমান, এত অনাদর, এত অবহেলার পরেও মায়ের কথা ভেবে চলেছে বাবা ! কিসের প্রত্যাশায় ?

৮৯

ইন্টারন্যাশনাল সার্কাসে একটা খেলা দেখাত। গেম অফ সিক্স নাইভস্। একটা বড়সড় কাঁসির কিনার ধরে লাগানো থাকত ছ' ছ'খানা ছুরি। এক সার্কাস-কন্যা রঙিলা বাজনার তালে তালে বাঁশের ডগায় তুলে ধরত কাঁসিটাকে। উঁচুতে দোলাত। ক্রমশ চড়া হত বাজনা, উদারা মুদারা পেরিয়ে তারায়। তারপর ঝাং শব্দ, পরক্ষণে এক বিপুল নিস্তব্ধতা। সার্কাস-কন্যা শূন্যে ছুঁড়ে দিল কাঁসি,

উৎক্ষিপ্ত কাঁসি থেকে তীরবেগে নেমে আসছে ছুরিগুলো, চিত হয়ে ভূমিতে শুয়ে পড়েছে সার্কাস-কন্যা, আধডজন ছুরি তার মুখ ঘিরে পলকে মাটিতে গেঁথে গেল। এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড। পুট পুট সবক'টা ছুরি তুলে নিয়ে সার্কাস-কন্যা উঠে দাঁড়াল, যান্ত্রিক হেসে অভিবাদন গ্রহণ করল দর্শকদের।

বেশ কয়েকবার খেলাটা দেখেছে ইন্দ্রাণী। কৈশোরে। গায়ে কাঁটা দিত, বাড়ি ফিরে রাতে ঘুমোতে পারত না।

আজকাল অহরহ খেলাটার কথা মনে পড়ে। তবে তেমন রোমাঞ্চ জাগে না। শুধু সেই অচেনা সার্কাস-কন্যার জন্য ফোঁটা ফোঁটা দুঃখ জমা হতে থাকে বুকে। ইন্দ্রাণী বেশ টের পায় খেলাটা চলছে এখনও।

শুধু খেলোয়াড়টা বদলে গেছে।

সে নিজেই এখন সেই সার্কাস-কন্যা।

অস্তিত্বের কাঁসি মাদক বাজনার তালে নাচল কিছুক্ষণ। উঁচুতে উঠল, আরও উঁচুতে, সংসার-তাঁবুর কানাত ফুঁড়ে ছিটকে মহাশূন্যে চলে গেল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—ছ' ছ'খানা ধারালো ছুরি শূন্য থেকে ধেয়ে আসছে, আসছে, যে-কোনও মুহূর্তে বেষ্টন করে ফেলবে ইন্দ্রাণীকে।

কোন রিপুকে কুড়িয়ে নিয়ে অভিবাদন গ্রহণ করবে ইন্দ্রাণী ? প্রতিটি রিপু তাকেই যে রক্তাক্ত করে চলেছে অবিরাম।

খেলাটায় বড় ভুল হয়ে গেছে। ইন্দ্রাণীর এখন মঞ্চের কোণে দীনহীন মুখে বসে থাকার পালা।

তাই-ই আছে। নিজেকে এক পাশে ফেলে রেখে। শুকনো মুখে জোয়াল ঠেলছে সংসারের, ভারিক্কি দিদিমণি হয়ে ক্লাসে পড়াচ্ছে, কর্তব্যপরায়ণ কন্যা হয়ে নিয়মিত ছুটে যাচ্ছে মানিকতলায়। যাদের কাছে সে যতটুকুনি প্রয়োজনীয়, সেটুকুনিই এখন তার গণ্ডি। অধিকারের সীমানা।

প্রায় সন্ধেতেই আসে শুভাশিস, সুখদুঃখের গল্প করে। দুঃখের পাল্লাই ভারী বেশি, তার কাছে সুখ এখন এক জটিল ধাঁধা। টোটোকে নিয়ে শুভাশিসের ইদানীং দুশ্চিন্তা বেড়েছে খুব। ছেলে নাকি বাবার সঙ্গে তির্যক ভঙ্গিতে কথা বলে। অথবা বলেই না। বাপছেলেতে মাধবপুর থেকে একসঙ্গে ফিরেছিল, গোটা পথ নাকি টুঁ শব্দটি করেনি টোটো। ফেরার সময়ে কামারকুণ্ডুর আগে গাড়ির সামনে একটা গর্ভিনী ছাগল এসে পড়ে, তাকে বাঁচাতে প্রাণপণে ব্রেক কষেছিল শুভ। তেমন চোট লাগেনি ছাগলটার, বেঁচে গেল, কিন্তু কোত্থেকে উড়ে এল বিশ-পঁচিশ জন গ্রামবাসী। উত্তেজিত, মারমুখী, গাড়ি-চড়া মানুষদের ওপর তাদের বিষম রাগ। গাড়ি থেকে নেমে তাদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিল শুভ, ক্ষমা চাইছিল, অথচ টোটো সিট থেকে নড়লই না। বসে আছে উদাস, গম্ভীর। যেন কোনও আকর্ষণহীন চলচ্চিত্রের শুটিং দেখছে। বাবার মৃত্যু নিয়েও শুভ খুব ভাবে আজকাল, মাকে নিয়ে চিন্তায় থাকে।

শুভাশিসের এসব কোনও দুঃখই তেমনভাবে ছুঁতে পারে না ইন্দ্রাণীকে। কেমন দূরের জগতের কাহিনী বলে মনে হয়। তবু সে এলে তাও সময় কাটে, বিবর্ণ সন্ধে একটু বুঝি দ্রুত গড়ায়।

একদিন মুস্তাফি এল বাড়িতে। ছুটির সকালে। একাই। কত উৎসাহ নিয়ে পীড়াপীড়ি করল, বউদি একবার চলুন, নিজের চোখে দেখে আসবেন কতটা এরিয়া নিয়ে আপনাদের ফ্ল্যাট হচ্ছে। এরপর তো পার্টিশান ওয়াল বসে যাবে, তখন কিন্তু একটু ছোট ছোট লাগবে। দেওয়ালে কোথায় আলমারি করবেন, কোথায় কটা তাক তাও একবার দেখিয়ে দেবেন চলুন। মিস্তিরিদের সেইমতো তো ডিরেকশান দিতে হবে। বাথরুমে কি আপনাদের দুটো সিস্টেমই রাখব ? আপনার দুই দেওর কিন্তু শুধু ইংলিশই পছন্দ করছে। শান্ত মুখে তাকে ফিরিয়ে দিল ইন্দ্রাণী। বাড়ি ছেড়ে বেরোলই না। ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। মাসখানেক-মাসদেড়েক বাপ্পারও কোনও চিঠি নেই, তারও ফেরার সময় প্রায় হয়ে এল, এসব নিয়েও ইন্দ্রাণী এতটুকু চিত্তচাঞ্চল্য বোধ করে না। কোনও

কিছুতেই মন উচাটন হয় না আর। বিচিত্র এক ক্ষয়রোগ যেন বাসা বেঁধেছে তার ফুসফুসে, কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছে জীবনীশক্তি।

মাঘের শীত হপ্তাখানেক দাপট দেখিয়ে পাততাড়ি গুটোতে শুরু করেছে। কনকনে বাতাসটা কোথায় যেন চলে গেল। ক'দিন ধরেই আকাশে মেঘ-মেঘ ভাব। একদিন হঠাৎ তেড়ে বৃষ্টি হল, স্কুল থেকে ভিজে জাব হয়ে ফিরল ইন্দ্রাণী। সেদিন থেকেই জোর সর্দিকাশি, সঙ্গে একটা বিশ্রী ঘুষঘুষে জ্বর। নড়তে ইচ্ছে করে না, হাঁটতে চলতে ইচ্ছে করে না। পাছে বাড়ির লোক কিছু বুঝতে পারে জোর করে স্কুলে গেল রোজ। স্টাফরুমে কপাল টিপে বসে থাকে, ইরাক আমেরিকার যুদ্ধ নিয়ে সহকর্মীরা কলকল করে চলে, শুনেও শুনতে পায় না ইন্দ্রাণী। বাড়ি ফিরেই দরজা বন্ধ। শুয়ে আছে। শুয়েই আছে।

নিস্তরঙ্গ জীবন। শ্বাসহীন বেঁচে থাকা। উদ্যমহীন অস্তিত্ব।

ইন্দ্রাণীর বাড়ি এখন বদ্ধ ডোবা। পানায়-পানায় হেজে-মজে যাচ্ছে। তার মধ্যেই কোনও কোনও রাতে কন্দর্পর সেতার বেজে ওঠে।

ওই সুরঝংকারটুকুই যা একটু ব্যতিক্রম।

সেদিন বদ্ধ ডোবায় ছোট্ট ঢিল পড়ল। হালকা একটা ঢেউ উঠল।

বিকেলবেলা হঠাৎ উমা ধীরাজ এসে হাজির। ট্যাক্সিতে।

ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করার আগেই উমা বললেন,— জামাইকে দেখতে এলাম।

অবাক ইন্দ্রাণীর কথাটা তেমন বিশ্বাস হল না। আদিত্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত বার দশেক মা-বাবার কাছে গেছে সে, কখনও তো জামাইকে দেখতে আসার বাসনা কেউ প্রকাশ করেনি!

নিস্পৃহ স্বরে বলল,— এসো। ...বাড়ি চিনতে অসুবিধা হয়নি?

—রেললাইন পার হয়ে হচ্ছিল সামান্য। তো মোড়ের পানের দোকানে তোর ছোট দেওরের নাম করতেই এককথায় দেখিয়ে দিল।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়িতে এসেছেন ধীরাজ। বারান্দায় উঠতে উঠতে ব্যস্তমুখে বললেন,— হ্যাঁরে ইনু, তোর নাকি শরীর খারাপ?

—আমার!

—আদিত্য বলল যে। ...হ্যাঁ গো, কবে যেন তুমি এ বাড়িতে ফোন করলে?

উমা যেন ঈষৎ অপ্রস্তুত হলেন। ঢোঁক গিলে হাসলেন,— এই তো পরশু। কেন জামাই বলেনি? ...ক'দিন তুই যাচ্ছিস না, খোঁজখবর নেই...

ও, এটাই তাহলে আসল কথা। ইন্দ্রাণী মনে মনে হিসাব করল। মাত্র আট দিন মানিকতলায় যায়নি সে। কতবার তো এর থেকেও বেশিদিন যাওয়া হয়নি, করছি করব করে টুনুমাসির বাড়িতে ফোন করাও হয়নি, কবে এভাবে ছুটে এসেছে মা-বাবা! সম্পর্কে শীতলতা এসে গেলে বোধহয় এমনটাই হয়। টান ভালবাসা দেখাতে হয়।

তিতির বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। দাদু-দিদাকে দেখে মুখোশে অনাবিল হাসি ফুটল,— ওমা, কী কাণ্ড! তোমরা কখন এলে?

—এই তো। ...তুই দাদু-দিদাকে একেবারে ভুলে গেলি রে দিদিভাই?

—ওমা, আমার পরীক্ষা না!

—সে তো ঢের দেরি।

—দেরি কোথায়! আর মাত্র বাহান্ন দিন।

নাতনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আদিত্যর ঘরে ঢুকলেন ধীরাজ। উমা ঘুরে ঘুরে দেখছেন বাড়িটাকে। উঁকি দিলেন রান্নাঘরে, বাথরুমে, মেয়ের ঘরেও। এ বাড়িতে আজ তাঁর প্রথম

পদার্পণ। জয়মোহনের বাৎসরিকের দিন আসার একটা সম্ভাবনা ছিল, আদিত্য হাসপাতালে থাকায় অনুষ্ঠানটা নমো নমো করে সারা হয়েছে, সুদীপই কাজ করেছে বাবার, কাউকেই আর তেমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সন্ধ্যার মা আটা মাখছে। হাতের কাজ রেখে তাকে একটু ময়দা মাখতে বলল ইন্দ্রাণী। নিজেই গ্যাসে কেটলি বসাল। মা কোথাও গেলে আগে একটু চা খেতে ভালবাসে।

উমা রান্নাঘরের দরজায় এসেছেন,— ঘরগুলো সত্যিই বড় ছোট ছোট রে ইনু।

ইন্দ্রাণী আলগা হাসল,— চলে তো যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, হলেই হল। আর তো কটা মাত্র মাস।

ইন্দ্রাণীর বলতে ইচ্ছে হল ফ্ল্যাটের ঘরও আগের মতো বড় বড় হবে না মা। না বলে ঘাড় নাড়ল অল্প।

—তবে এখানে স্যাঁতসেতে ভাবটা কম। যাই বল, তোদের ও বাড়ির একতলাটা একদম ড্যাম্প ধরে গিয়েছিল।

—হুঁ। ...তোমার জামাইকে দেখতে গেলে না?

—এই যাই। দু' পা এগিয়েও থামলেন উমা,— তোর কি জ্বর এসছিল?

—অত কিছু নয়। গা ম্যাজম্যাজ ধরনের।

—তোর বাবা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জানিসই তো তোর বাবাকে। একবার যদি মাথায় ঢোকে তো...। আমি তো ভয়ে মরি। ওই ভুলো মানুষকে নিয়ে একা একা রাস্তায় বেরোনো...। ঠিকই করেছিলাম, চিনতে না পারলে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আবার ফেরত চলে যাব।

এত কৈফিয়ত দিচ্ছে কেন মা? মেয়ের কাছে আসতে গেলে এত কারণ দেখাতে হয় নাকি? নাকি ইন্দ্রাণীর নিজের মনই প্যাঁচালো হয়ে গেছে, সোজা কথা সরল মনে নিতে পারছে না?

ও-ঘর থেকে তিতিরের হাসি উড়ে আসছে। অনেক দিন পর জোরে জোরে হাসছে মেয়ে। ধীরাজের কথার পিঠে আদিত্যর গলাও শোনা গেল। নিশ্চয়ই একটা সুখী সুখী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভাল।

উমা হঠাৎ জিভ কাটলেন,—এই দ্যাখো, তোদের জন্য একটু কড়া পাকের সন্দেশ এনেছিলাম। তোর বাবার ফোলিও ব্যাগে নিশ্চয়ই এতক্ষণে পাউডার হয়ে গেল। বলতে বলতে প্রায় ছুটে গেছেন আদিত্যর ঘরে।

ইন্দ্রাণী একটু স্বস্তি বোধ করল। এ বাড়িতে কেউ মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার ভালমন্দ ভাবছে, ড্যাব ড্যাব করে দেখছে কতটা শুকিয়েছে ইন্দ্রাণী, ভাবতেই শরীরের পেশি কেমন শক্ত হয়ে আসে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। একাকিত্বে অশান্তি নেই।

কেটলির ঢাকনা খুলে ফুটন্ত জলে চা-পাতা ফেলল ইন্দ্রাণী। গ্যাসটা নিবিয়ে দিল। খানিক আগে একবার চা হয়েছিল, দুধ এখনও গরম আছে, কাপ সাজিয়ে চামচে করে দুধ তুলছে। হাত বাড়িয়ে চিনির বয়াম তাক থেকে নামাল।

তিতির মিষ্টির বাক্স হাতে খাওয়ার জায়গায় এসেছে। হাসি উবে গিয়ে অভ্যস্ত ভাবলেশহীন স্বর,— এটা কোথায় রাখব? ফ্রিজে?

—রাখো।

—দোকান থেকে খাবার আনতে হবে?

—না। সন্ধ্যার মা লুচি ভাজছে।

—ও। এক পা এগোল তিতির, চা নিয়ে যাব?

ইন্দ্রাণী পলকের জন্য ভাবল,— থাক। আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

তিতির মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। আত্মীয়স্বজন আদিত্যকে দেখতে এলে ভদ্রতা করে ওঘরে একবার যেতে হয় ইন্দ্রাণীকে। বেশিক্ষণ থাকে না, টুকটাক দুটো-একটা কথা বলে চলে আসে।

তিতির জানে। মা'র এই ভান ভনিতা মেয়ের চোখে গোপন থাকার কথা নয়। কী আর করা, সঙ সাজার জন্যই তো সংসার।

সন্ধ্যার মাকে ছোটখাট কয়েকটা নির্দেশ দিল ইন্দ্রাণী। লুচির সঙ্গে কী হবে, কোন প্লেটে মা বাবাকে খেতে দেবে, কন্দর্প কাল রসগোল্লা এনেছিল, ফ্রিজে পড়ে আছে সেগুলোকে বার করে দিতে হবে, এই সব।

ট্রেতে চা-বিস্কুট সাজিয়ে ঘরে এসে দেখল শ্বশুর-জামাই বসে আছে পাশাপাশি। জামাই বাবু হয়ে, শ্বশুর পা ঝুলিয়ে। পাশের খাটে দিদিমার কোল ঘেঁষে নাতনি। দিদিমার হাত নাতনির কাঁধে। সকলের মুখেই হাসির ছোপ। কী মনোরম পারিবারিক দৃশ্য! ছবি তুললেই হয়।

ধীরাজ বলে উঠলেন,— অ্যাই ইনু, তুই একটু বল না আদিত্যকে। ও তো কিছুতেই যেতে চাইছে না।

ইন্দ্রাণী অপেশাদার অভিনেত্রীর মতো হাসল,— কোথায়?

—একটু সমুদ্র দেখতে যাব ভাবছিলাম। ঠাণ্ডা তো কমেই গেছে...

উমা বললেন,— হ্যাঁ, জামাইয়েরও শরীরটা সারত ভাল করে। বেশি দূর নয়, দিঘা থেকে ঘুরে আসি।

ধীরাজ বললেন,— আদিত্য সঙ্গে থাকলে আমরা অনেক বলভরসা পাই। সেবার কি চমৎকার আমাদের বেড়িয়ে নিয়ে এল কাশীতে। কি বড় বড় বেগুন কিনে আনত।

তিতির মিটিমিটি হাসছে,— হ্যাঁ বাবা, যাও না বাবা। ঘুরে এসো না কটা দিন। আমার যে পরীক্ষা, নইলে আমিও ঠিক যেতাম।

আদিত্য চোখ বুঁজে দু দিকে ঘাড় নাড়ল,— পারব না রে। শরীরে জুত নেই।

—খুব পারবে। যাও, গেলেই ফিট হয়ে যাবে। সমুদ্রের ঢেউ গায়ে লাগলে সব উইকনেস ভ্যানিশ।

—নারে বাবা না। আমার এই গৃহকোণই ভাল। ওই ছ' ঘণ্টা-আট ঘণ্টা বাস জার্নি... অত ধকল আমার সইবে না।

ধীরাজের মুখ মলিন হয়ে গেল,— না-গেলে যে আমাদের যাওয়া হয় না আদিত্য।

উমা বললেন,— বড় আশা ছিল তুমি যাবে।

বাবা মা'র হঠাৎ এত দিঘা যাওয়ার বাসনা জাগল কেন বুঝতে পারছিল না ইন্দ্রাণী। এটা বলতেও কি আজ আসা এখানে? আগ্রহটা কার বেশি? বাবার, না মা'র? তনুময়ের কথায় সেদিন হঠাৎ উত্তেজিত হওয়ার পর থেকে অদ্ভুত রকমের চুপচাপ হয়ে গেছে মা, ছেলের কথা আর ভুলেও তোলে না। অন্তত ইন্দ্রাণীর সামনে। মা কি তবে ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছে? ক'দিন একটু মুক্ত হাওয়া চায়? নাকি মা-মেয়ের এই শীতল ব্যবধান বাবার সহ্য হচ্ছে না?

আদিত্য মাথা চুলকোচ্ছে। একবার উমার দিকে তাকাচ্ছে, একবার ধীরাজের দিকে। ইন্দ্রাণীর খারাপ লাগছিল। কাশীতে মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ফাঁপরে পড়েছিল বলে এবার বোধহয় এড়াতে চাইছে আদিত্য। না হলে তিন দিনের জন্য দিঘা ঘুরে আসতে পারবে না এমন অসুস্থ তো সে নয়।

নিরস গলায় ইন্দ্রাণী বলল,— যে যেতে চাইছে না তাকে জোর করছ কেন বাবা? চলো, আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।

—তুই!

—কেন, আমি যেতে পারি না? ইন্দ্রাণী কাষ্ঠহাসি হাসল, —আমারও শরীরটা ভাল লাগছে না, নয় ক'দিন সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে এলাম।

আদিত্য দেখছে ইন্দ্রাণীকে। তিতিরও। ইন্দ্রাণী চোখ সরিয়ে নিল,— কবে যাবে বলো? এই শনিবার যেতে চাও?

উমা আড়ষ্ট স্বরে বললেন,— তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো ?

—একটুও না। আমি কালই স্কুল থেকে ফেরার সময়ে বাসের টিকিট করে আনছি। শুক্রবার রাত্তিরে মানিকতলায় থাকব, শনিবার ভোরে বেরিয়ে যাব। মঙ্গল, বুধ সরস্বতী পুজোর ছুটি আছে, বৃহস্পতিবার ফিরে আসব।

উমা কি ঘাড় নাড়লেন ? ধীরাজ ?

ইন্দ্রাণী দেখতে পেল না। দেখতে চাইলও না।

হোটেলটা সমুদ্রের ধারে। উপনগরীর এদিকটায় সমুদ্র খানিকটা খাঁড়ির আকারে নিয়েছে, একটু ভেতর পর্যন্ত ঢেউ চলে আসে। বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো আছে পাড়, সেখান থেকে বালি মাড়িয়ে বিশ তিরিশ গজ হাঁটলেই হোটেল। বারান্দায় বসে সারাদিন সমুদ্র দেখা যায়, এটাই এই হোটেলের সব থেকে বড় আকর্ষণ।

দিঘাতে আগে একবারই এসেছে ইন্দ্রাণী, সেও প্রায় পনেরো-ষোলো বছর হয়ে গেল। তিতির তখন হাঁটছে সবে, এক-দেড় বছর বয়স। বাপ্পা তখনও নার্সারিতে। বাড়িসুদ্ধ সবাই এসেছিল। সুদীপ কন্দর্প, সবাই। জয়মোহন শোভনাও। দিঘাও নাকি লোকে বছরে পাঁচবার করে আসে, কমলিকা শেফালিরাই তো কথায় কথায় উইকএন্ড করে, ইন্দ্রাণীই শুধু...। কোথায়ই বা কবে গেছে ইন্দ্রাণী ? ছোটবেলায় পুরী, দার্জিলিং, শিমূলতলা, মধুপুর। বিয়ের পর ধর্মের মধ্যে কর্ম, আদিত্যর সঙ্গে একবার মুসৌরি দেরাদুন। সে স্মৃতি তো দুঃস্বপ্নের মতো, কবেই তা ভুলে গেছে ইন্দ্রাণী। তারপর থেকে তো যাবজ্জীবন মেয়াদ খেটে চলেছে। ক'দিনের জন্য তাও প্যারোলে বেরোনো হল।

পৌঁছনোর দিনই বাবা-মাকে নিয়ে ইন্দ্রাণী সন্ধেবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিল। জায়গাটা কেমন বদলে গেছে। আগে বেশ নির্জন ছিল, এত বাড়িঘর ছিল না, এখন চতুর্দিকে শুধু হোটেল আর হোটেল, টুরিস্টদের ভিড় আর যানবাহনের চিৎকার। দু' পা হাঁটলেই মুখচেনা কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, বিরক্ত লাগে। সমুদ্রর ধারে পাড় বাঁধিয়ে একটা রাস্তা বানানো হয়েছে, সেই পথটুকুই যা একটু নিরালা। উমা, ধীরাজেরও ভিড়ভাট্টা বেশি পছন্দ নয়, নিরালা পথের ধারে বাঁধানো ধাপিতে তাঁরা বসে রইলেন সারা সন্ধে। অন্ধকার সমুদ্রকে সামনে রেখে। পাশে ইন্দ্রাণী। নীরব নিথর। সমুদ্রের রূপসুধা পান করছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটার চেহারা যেন একদম বদলে গেল। পথশ্রমে শ্রান্ত উমা ধীরাজ হোটেলে ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, বারান্দার বেতের চেয়ারে এসে বসল ইন্দ্রাণী। তখনই শহরের আলোগুলো সব নিবে গেল হঠাৎ। চতুর্দিক গাঢ় অন্ধকার, সামনে এক গাঢ়তর কালির আধার। উথাল পাথাল হাওয়া বইছে, হঠাৎ হঠাৎ থমকে যাচ্ছে হাওয়া, ঝাউবনে শব্দ বাজিয়ে ফিরছে আবার। কোটি কোটি তারা বুকে নিয়ে ঘন আকাশ নেমে গেছে সমুদ্রে, অসংখ্য ঢেউ নিয়ে সমুদ্র ছুটে আসছে তীরে, আকাশ, মাটি, সমুদ্র একাকার হয়ে গেল। ইন্দ্রাণীর বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। যেন তার সামনে বারিরাশি নয়, এক অনন্ত হাহাকার। যেন ঢেউ নয়, অবিরল উত্তাল অশ্রুধারা। অবিরাম কান্না আছড়ে পড়ছে বোল্ডারে। নাকি পাঁজরায় ? কখন দ্বিতীয়ার ফালি চাঁদ উঠল, অস্ত গেল, দেখতে পেল না ইন্দ্রাণী। চকিতে ঢেউয়ের মাথায় নীলাভ দ্যুতি ঝলসে উঠছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে ইন্দ্রাণী। কেন আদিত্যর কথা মনে পড়ে এ সময়ে ? আদিত্যকে একটি বারের জন্য হাসপাতালে দেখতে গেল না, মানুষটা বাড়ি ফেরার পরও একটা কথা বলল না—কেন ? আদিত্য শুধু সারাজীবন তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, তাই ? শ্বশুরমশাইয়ের মৃত্যুর জন্য তার দিকে আঙুল তুলেছিল, তাই ? নাকি অন্য কোনও গূঢ় কারণ আছে ? অভিমান ? যে-মানুষটার সঙ্গে তেমন কোনও সম্পর্কই কখনও তৈরি হয়নি, তার ওপর অভিমান কিসের ? অপমান ? যে-মানুষটাকে ইন্দ্রাণীই চিরকাল উপেক্ষা করেছে, তার উপেক্ষায় ইন্দ্রাণীর কিসের অপমান ? ঈর্ষা ? যাকে

কোনওদিন মনপ্রাণ দিয়ে চায়নি ইন্দ্রাণী, তাকে অন্যের বাহুতে দেখে কি অসূয়া মানায় ? নাকি এসব কিছুই নয় ? আদিত্যর সরাসরি আক্রমণ, একটা অতি সাধারণ মেয়ের কোলে মাথা রেখে আদিত্যর বাড়ি ফেরা, ইন্দ্রাণীর অহংবোধকে তোলপাড় করে দিয়েছে। আদিত্য চিরকাল তার বশংবদ হয়ে থাকবে, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে, তার ভয়ে থরথর কাঁপবে, এরকমই কি চেয়েছিল ইন্দ্রাণী ?

অসীম সমুদ্রকে সামনে রেখে ইন্দ্রাণী নিজেকে পরপর প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, কূলকিনারা পাচ্ছিল না। আদিত্যর কথা সে এত ভাবছেই বা কেন ? চোখ বুজে ইন্দ্রাণী শুভাশিসকে মনে করার চেষ্টা করল। আবছা ধোঁয়ার শরীর গড়ে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে কি ইন্দ্রাণী তার শুভর প্রতি আর একনিষ্ঠ নয় ?

কান্না পাচ্ছিল ইন্দ্রাণীর। বহুকাল পর। সমুদ্রের হুঙ্কার কান্নাকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল আরও।

কটা দিন গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল। এখানেও এক বাঁধা রুটিন। খাওয়া, ঘুম, হাঁটা, বসে থাকা। উমা, ধীরাজ নিয়ম করে ভোর ভোর উঠেছেন, সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে বসে থেকেছেন দুটিতে। ভোরের বর্ণহীন সমুদ্রে শান্ত ঢেউয়ের লুটোপুটি দেখে তাঁদের কী তৃপ্তি ! বেলা বাড়লে সূর্য যখন হিরের কুচি ছড়ায় সমুদ্রে, তখন তাঁরা ফিরে আসতেন ঘরে। সমুদ্রস্নানে তাঁদের কোনও আগ্রহ নেই, ইন্দ্রাণীরও না। দূর থেকে সে দেখত ঢেউয়ের ধাক্কায় কেমন ছিটকে পড়ছে রঙিন মানুষ, উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে জলে। সমুদ্রও যে কতবার রঙ বদলায় ! এই দ্যাখো ধূসর, তো এই নীল, এই সবজে। কাছে গেলে ফেনা দোলায়, বাষ্প ছড়ায়, দূরে গেলে চুম্বকের মতো কাছে টানে।

আগেরবার সমুদ্রকে ঠিক এভাবে উপলব্ধি করেনি ইন্দ্রাণী। দলের সঙ্গে আসা, হুড়োহুড়ি, বাপ্পা-তিতিরকে সামলানো..., এবার যেন সবই অন্যরকম। ফেরার দিন ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। জীবন যে কেন সমুদ্রের মতো হয় না ! কেন যে শুধুই একরঙা ! ধূসর !

ফেরার দিন সকালে অল্পস্বল্প কিছু কেনাকাটি করলেন উমা। শাঁখের আংটি, ঝিনুকের মালা, কাজুবাদাম। আশপাশের বাড়িতে দেবেন, জামাই-নাতনিকেও পাঠাবেন। তিতিরের জন্য সুন্দর একজোড়া ঝিনুকের দুল কিনল ইন্দ্রাণী। মেয়েকে দেওয়া যাবে কিনা জানে না, তবু কিনল।

বাজারে রাতুলের সঙ্গে দেখা। মেয়ে-বউ নিয়ে গতকাল দিঘায় এসেছে, এক-দু' দিন থাকবে। ইন্দ্রাণীকে দেখে রাতুলের একগাল হাসি,— ভাল আছ ইনুদি ?

ইন্দ্রাণীও হাসল,— আছি একরকম। তোর কী খবর ?

রাতুল কাঁধ ঝাঁকাল,— কেটে যাচ্ছে।

—সি এম ডি এ-তে আছিস এখনও ?

—নাহ্। পিটারসন অ্যান্ড পিটারসনে জয়েন করেছি। খুব বড় অফার পেলাম। নেক্সট ইয়ার হয়তো কানাডা পাঠাবে।

—বেশ আছিস, অ্যাঁ ? তরতর উঠছিস ?

—তাও তো কতগুলো বছর সরকারি চাকরিতে নষ্ট হয়ে গেল। রাতুল দাঁত ছড়িয়ে হাসছে,— যত সব পেটি মীন লোকজন নিয়ে কাজ, রাস্তায় মজুর খাটানো...কোনও জব স্যাটিসফ্যাকশান ছিল না।

কথাগুলো কোথায় যেন ফুটছিল ইন্দ্রাণীকে। এই ছেলেটা তনুর বন্ধু ছিল ? এক রাজনীতি করত ?

আলগাভাবে বলল,— মাসিমা কেমন আছেন ?

—জানো না, মা তো নেই ! এই লাস্ট অক্টোবরে...ওহ্হো, তারপর তো মানিকতলার দিকে আর যাওয়া হয়নি। খানিক দূরে রাতুলের বউ ঝিনুকের পর্দা দর করছে, সঙ্গে মেয়ে, সেদিকে একঝলক

তাকিয়ে রাতুল বলল,— ওর আর কিছু খবর পেলে না, তাই না ?

ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল।

রাতুল আপন মনে বলল,— খ্যাপা ছেলে। কি করল ! কোথায় যে গেল ! ...এখন তো আবার নতুন করে তখনকার শহিদদের লিস্ট হচ্ছে, সেখানে খোঁজ করে দেখেছ ? ...মানে তা হলেও ওর একটা ট্রেস হয়... মানে বলছিলাম...

পলিথিন ব্যাগ হাতে উমা আসছেন এদিকে, রাতুল কথা থামিয়ে দিল। দু-আড়াই বছর পর রাতুলকে দেখে উমা খুব খুশি, নতুন করে খবর দেওয়া-নেওয়ার পালা চলল। বউ-মেয়েকে ডাকল রাতুল, তাদের সঙ্গেও খানিক কথা বললেন উমা। রাতুলের মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনে থম মেরে রইলেন একটুক্ষণ।

হোটেলে এসে ইন্দ্রাণীরা দেখল ধীরাজ ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে স্নান-টান সেরে রেডি। আজকাল বেশ সপ্রতিভ হয়ে গেছেন ধীরাজ। দিব্যি গুছিয়ে কাজকর্ম করেন, কথাবার্তাতেও এলোমেলো ভাব অনেক কম। কাশীতে স্ত্রীর ওই পাগলামি দেখার পর টিভি খবরের কাগজে নিরুদ্দেশের খবর খোঁজাও একরকম বন্ধ করে দিয়েছেন, এককথায় না বলে বেরিয়েও পড়েন না। সত্যি বলতে কি, এবার বেড়ানোর সময়ে তাঁকে এতটুকু সামলাতে হয়নি।

ফেরার বাসে ইন্দ্রাণীর পাশে বসেছেন উমা, পিছনের সিটে ধীরাজ। উমা কথা বলছিলেন না বিশেষ, বোধহয় রাতুলের মা'র কথা ভাবছিলেন। ম্যানিকতলার বাড়িতে থাকতে রাতুলের মা তাঁর খুব বন্ধু ছিল।

হঠাৎ এক সময়ে বললেন,— রাতুল তখন তোকে কী বলছিল রে ? আমাকে আসতে দেখে চুপ করে গেল ?

—কই, কিছু না তো। ইন্দ্রাণী তড়িঘড়ি বলল।

উমার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি,— তনুর কথা বলছিল, না ?

অজান্তেই মাথা দুলিয়ে ফেলল ইন্দ্রাণী, —হুঁ।

—কী বলছিল ?

—বাদ দাও না ওসব কথা।

একটু চুপ থেকে মেয়েকে দেখলেন উমা। তারপর বললেন, —তুই কি আমার ওপর এখনও রাগ করে আছিস ইনু ?

—কেন মা ?

উদাস চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন উমা। ছুটন্ত গাছগাছালি দেখছেন। মেয়ের দিকে না ফিরেই বললেন,— তোর রাগটা আমি বুঝি রে ইনু। আমার রাগটা তুই বুঝিস না। আমি নিজেও বুঝতাম না। তাই মন শান্ত করতে এবার...সমুদ্র আমাকে অনেকটা জুড়িয়ে দিয়েছে রে। ভাগ্যিস তোর বাবা জোর করে নিয়ে এল।

মা তবে অশান্ত মনকে জুড়োতে এসেছিল ! বাবা ভোলাতে এনেছিল মাকে ! ইন্দ্রাণী ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল উমার দিকে।

উমা মেয়ের হাতে চাপ দিলেন,— হ্যাঁ রে। বিশাল সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে নিজেদের সুখ-দুঃখ কেমন তুচ্ছ হয়ে যায়। ভেবে দেখলাম তনু যদি বেঁচেও থাকে, এতদিনেও তো সে ফিরে আসেনি ! তার মানে, হয় তার আসার ইচ্ছে নেই, নয় তার আসার উপায় নেই। আমরা তো তাকে তেমনভাবে বাঁধতেও পারিনি, যার টানে সে...ঠিক কিনা বল ? বেঁচে যদি থাকে ভাল থাকুক, আর কি চাই আমরা ? তোর বাবাও বলছিল, যার মুখটা আমরা ঠিকমতো মনেও করতে পারি না তার কথা ভেবে আর কতদিন কাঁদব ? যদি তনু ফিরেও আসে, সে কি আর একই তনু আছে ? যে-ঢেউটা সমুদ্রে চলে যায়, সেই ঢেউটাই কি আর ফেরে ?

ইন্দ্রাণীর বুকটা ধকধক করছিল। বাবা-মা কি জেনে গেছে তনুর কথা ? তনু কি চিঠি-ফিটি

লিখেছে কোনও ? কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে ?

জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। কথাই ফুটল না মুখে। শুকনো চোখে কাঠ হয়ে বসে রইল।

উমা ধীরাজকে মানিকতলায় নামিয়ে একা ট্যাক্সিতে আচ্ছন্নের মতো ফিরছিল ইন্দ্রাণী। ফাল্গুন পড়ে গেছে, বাতাসে এখনও চোরা ঠাণ্ডা। সন্ধের বাতাস নাকে মুখে বিঁধছে। মানিকতলাতেই কটা দিন থেকে গেলে হত। এ কোন ঘরে ফিরছে সে ? কার কাছে ফিরছে ? ক্ষীণ স্মৃতির মতো কালি ঢালা সমুদ্রটাকে মনে পড়ল একবার। বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হয়ে গেল মন।

রাস্তা জুড়ে সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল। ইন্দ্রাণী লাইনের এপারে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হাতে বেল বাজাচ্ছে।

প্রায় অচেনা একটা স্বরে চমকে গেল ইন্দ্রাণী,— ওয়েলকাম হোম।

৯০

ইন্দ্রাণী অবাক চোখে তাকাল,— তুই !

—ইয়েস। মি।... ইন্দ্রনীল রায়। হাঁটুঝুল শর্টস, ঢোল্লা টিশার্ট পরা বাপ্পা হাসছে মিটিমিটি,— পরশু ইভনিং-এ ক্যালকাটা ল্যান্ড করেছি।

—আগে কিছু জানাসনি তো ?

—সুইট সারপ্রাইজ।

মিঠে চমকই বটে ! ইন্দ্রাণীর বুক ক্ষণিকের জন্য তিরতির করে উঠল। এ যেন বাপ্পা নয়, অনন্ত মেঘ ঢাকা আকাশে হঠাৎ এক ফালি রোদের ঝিলিক।

শুধু ওই মুখখানি দেখে কতবার যে কত সন্তাপ ভুলেছে ইন্দ্রাণী !

ঘরে এসে ইন্দ্রাণী খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। দেখছে ছেলেকে। অনেক বদলে গেছে বাপ্পা। চোয়ালে একটা দৃঢ় ভাব এসেছে, কাঁধ আরও চওড়া লাগে, শরীরের পেশি অনেক শক্তপোক্ত, মোটা গোঁফের আড়ালে মুখের নরম-সরম ভাবটা প্রায় নেইই। পুরোদস্তুর একটা লোক হয়ে গেছে বাপ্পা। কবে হল !

ইন্দ্রাণীর পাশে এসে বসল বাপ্পা। এক হাতে আলতো জড়িয়ে ধরেছে মাকে,— টায়ার্ড ?

—একটু। ইন্দ্রাণী হাসল, এতটা পথ বাসে আসা...

—মজাসে বেড়ালে ?

—ওই এক রকম। তোর দাদু দিদা ধরল খুব... কটা দিন হাওয়া বদল...

—দাদু দিদা আছে কেমন ? দাদুর ইর‍্যাটিকনেস একটু কমেছে ?

—হুঁ। সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল ইন্দ্রাণী। একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল,— তিতির কোথায় রে ?

—ঘর বন্ধ করে পড়ছে। ডাকব ?

—না, ডাকতে হবে না। মেঘটা আবার আকাশ ঢাকছে, ইন্দ্রাণী শ্বাস চাপল।

—এবার এসে তোমার মেয়ের অনেক চেঞ্জ দেখছি। বাপ্পা চোখ নাচাচ্ছে,— হেভি সিরিয়াস টাইপ হয়ে গেছে।

—হুঁ, সামনে পরীক্ষা। টেস্ট প্রিটেস্টের রেজাল্টও খুব ভাল হয়নি...

—নট ওনলি দ্যাট। সব ব্যাপারেই। কী ঠানদি-ঠানদি মুখ করে বাবার নার্সিং করে ! কী শাসনের বহর ! সন্ধেবেলা বাবা একটু বেরোল, একদম স্টপওয়াচ টিপে ছাড়ল বাবাকে ! দু ঘন্টার মধ্যে ফিরবে, নইলে খারাপ হয়ে যাবে ! তিতিরের গলা নকল করে জোরে হেসে উঠল বাপ্পা,— জানো, তোমার মেয়ে ও ঘর থেকে আমায় চাক্ আউট করে দিয়েছে !

অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল ইন্দ্রাণীর,— সেকি !

—তবে আর বলছি কী ! ও ঘরে না থাকলে ওর নাকি টেনশান হয়। রাত জেগে পড়ে... বাবা বার বার ওঠে... বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়...

—ভালই তো। তুই এ ঘরেই থাক। অসুবিধে হবে ?

বাপ্পার যেন কানে গেল না কথাটা। হাত ইন্দ্রাণীর পিঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল,— আচ্ছা মা, তুমি আমাকে জানাওনি কেন বলো তো ?

—কী ?

—এই বাবার অসুখ... হসপিটালাইজড় হওয়া...

ইন্দ্রাণীর বুকে ঠুং করে বাজল কথাটা। বুকেই বাজল, না আরও গভীরে ? আগেরবার হাসপাতালে থাকার সময়ে এই ছেলে না দেখতেই যেতে চাইত না বাবাকে !

একটু অপ্রস্তুত মুখে ইন্দ্রাণী বলল,— এ তো আর নতুন কিছু নয়। আর জেনে তুই করতিসই বা কি, বল ?

—কিছুই হয়তো করতে পারতাম না। তবুও... বাপ্পা খুঁতখুঁত করছে,— বাবা নাকি আজকাল মাঝে মাঝেই খুব ডিপ্রেশানে ভোগে ?

—কে বলল ? তিতির ? ইন্দ্রাণীর স্নায়ু টান।

—না। তিতির কিছু বলেনি। শুনছিলাম।

বাপ্পার কথায় কি কোনও অনুযোগের সুর ? সেই বাপ্পার ? ইন্দ্রাণী ঠিক বুঝতে পারল না। খাট থেকে নেমে আলমারি খুলে একটা ধোওয়া শাড়ি বার করল। শাড়ি সায়া ব্লাউজ নিয়ে ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়াল একটু। চাপা গলায় বলল,— তোর বাবা তো সারাটা জীবনই ডিপ্রেশানে ভুগে গেল বাপ্পা। আর আমি সারাটা জীবন মনের সুখে তাথৈ তাথৈ নেচে গেলাম।

বাপ্পা হো হো হেসে উঠল,— আরে আরে, তুমি হঠাৎ এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লে কেন মা ?

কেন পড়ল তা যদি সত্যি-সত্যি বোঝানো যেত ! কে বুঝবে ! কে বোঝে ইন্দ্রাণীকে !

বাথরুমে গিয়ে মুখেচোখে জল থুপল ইন্দ্রাণী। ফাল্গুন পড়ে গেছে, জলের ছোঁয়া ভাল লাগে বেশ, তবু যেন ঠিক জুড়োচ্ছে না শরীর। স্নান করে নেবে ? থাক, ক'দিন আগেই জ্বর জ্বর মতো হয়েছিল। একটু আগের ভাল লাগা ভাবটা মরে আসছে ক্রমশ। কেন আসছে ?

আদিত্যর ঘরের দরজা এখনও বন্ধ। তিতির একবারও বেরোল না। আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল ইন্দ্রাণী। গ্যাস জ্বালিয়ে গলা ওঠাল,— বাপ্পা, চা খাবি ?

—কফি করো না। কফি নেই ?

আছে। চাঁদু গত সপ্তাহেই এনেছিল। তিতির কি এখন কফি খাবে ? ভাবতে ভাবতে কেটলির ঢাকা খুলে আর এক কাপ জল বাড়িয়ে দিল ইন্দ্রাণী।

বাপ্পা রান্নাঘরের দরজায়,— তিতির আজ একটা ফ্যান্টাসিক চিঁড়ের পোলাও বানিয়েছিল। ঝড়তি-পড়তি আছে বোধহয়, টেস্ট করে দেখতে পারো।

খাবারের কথা শুনে যেন ক্ষিধেটাকে টের পেল ইন্দ্রাণী। বিকেলে মেচেদায় চায়ের সঙ্গে একটা আলুর চপ খেয়েছিল। তারপর থেকে কিছুই পেটে পড়েনি। খেলে হয়। সঙ্গে সঙ্গেই এক উদ্ভট অভিমান ধেয়ে এল বুকে। খাবে না। মেয়ের মেজাজ আছে, তার নেই !

বাপ্পার হাতে দু কাপ কফি ধরিয়ে দিল ইন্দ্রাণী। নিজেরটা নিয়ে এসেছে ঘরে। তিতিরকে কফি দিয়ে ও ঘর থেকে ইয়া এক বিলিতি ঝোলা নিয়ে ফিরেছে বাপ্পা। মেঝেতে থেবড়ে বসে ঝোলা থেকে পরের পর জিনিস বার করে চলেছে। সঙ্গে চলছে রানিং কমেন্টারি। এই কসমেটিকস্‌গুলো কাকিমা আর পিসির জন্য এনেছি মা। লিপস্টিকের শেডগুলো দ্যাখো, ভাল নয় ? তিতির একটা পারফিউম আর দুটো নেল পালিশ আগে বেছে আলাদা করে নিয়েছে।... ডিওডোরেন্টের গন্ধটা শোঁকো। খুব ম্যাচো স্মেল। ছোটকার।... আর অ্যাটমের জন্য এই টিটি ব্যাট। দু সাইডে দু রকম সারফেস। দু রকম স্পিন করবে। ...রিস্টওয়াচটা তোমার পছন্দ হয়েছে মা ? ডেট্রয়েট থেকে

কিনেছি। ...সকলের জন্যই মনে করে কিছু না-কিছু এনেছে বাপ্পা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ বাপ্পার লিস্ট থেকে বাদ নেই। এমনকী সন্ধ্যার মা'ও।

ব্যাগ হাতড়ে একটা লাইটার বার করল বাপ্পা,— এটা দ্যাখো। তিন রকম মিউজিক প্রোগ্রাম করা আছে। মিউজিকের রিদমে নীল ফ্লেম নাচে। শুনবে বাজনা ?

ক্লান্তিটা আবার ফিরে আসছিল ইন্দ্রাণীর বলল,— পরে শুনব।

—পরে কেন ? শোনো না। বলেই জ্বালাল লাইটারটা। মিষ্টি যান্ত্রিক বাজনায় ভরে গেল ঘর। একটার পর একটা সুর বাজছে।

বাপ্পা চোখ নাচাল,— কী, কেমন ?

—খুব ভাল। ...বাবার জন্য ?

—ভাবছিলাম ডাক্তার আঙ্কলকে দেব। বাবার জন্য একটা অন্য জিনিস এনেছিলাম। ম্যারিকান ব্র্যান্ডি। বাবার যা হাল দেখছি শরীরের... ব্র্যান্ডিটা ডাক্তার আঙ্কলকে দিয়ে দিলে কেমন হয় ? বাবাকে নয় লাইটারটাই দিলাম। ডাক্তার আঙ্কল তো খায়। খায় না ?

কথার ভঙ্গিটা ইন্দ্রাণীর পছন্দ হল না। গম্ভীরভাবে বলল,— ছোটরা বড়দের ড্রিঙ্কসের বোতল দিচ্ছে এটা আমার একটুও ভাল লাগে না বাপ্পা।

বাপ্পা হেসে উঠল,— দুর, ব্র্যান্ডি আবার ড্রিঙ্কস নাকি ? ও তো ওষুধ।

ইন্দ্রাণী আরও বিরক্ত মুখে বলল,— সে তোমার ধারণা। আমার যা মনে হয় বললাম।

—তুমি না মা একেবারে পিউরিটান। ডাক্তার আঙ্কল মোটেই তোমার মতো মরালিস্ট নয়। দেখো, ঠিক খোলা মনে নিয়ে নেবে।

—নেবে হয়তো। যা ইচ্ছে করো।

ইন্দ্রাণী গুম হয়ে গেল। একটু যেন বেশি বেশি সাবালকত্ব দেখাচ্ছে ছেলে। এটা ভাল না মন্দ ? নিজেকে মনে মনে ধমকাল ইন্দ্রাণী। দেশবিদেশে ঘোরার সময়েও ডাক্তার আঙ্কলের কথা ভেবেছে ছেলে, তার জন্য কিছু আনার কথা চিন্তা করেছে, এতেই তো তার প্রফুল্ল হওয়ার কথা। বিশ বছরের ওপর মাতাল নিয়ে ঘর করার পর ব্র্যান্ডি দেখে নাক কুঁচকোনরও কোনও মানে হয় না। তবু কেন প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারছে না ইন্দ্রাণী !

ঘরে যেন কোথায় সুর কেটে গেছে। ঝোলা কাঁধে ও ঘরে উঠে গেল বাপ্পা। তিতিরের সঙ্গে কি সব কথা বলছে। স্পষ্ট বোঝা যায় না, মাঝে মাঝে বাপ্পার গমগমে স্বর ঠিকরে ঠিকরে আসে। আদিত্যও ফিরল। তার সঙ্গেও কথা বলছে বাপ্পা। হাসছে। ভাল, ক মাস বাইরে থেকেই বাবার ওপর টান বেড়েছে ছেলের। এমনটাই হোক এক সময়ে মনে মনে চেয়েছিল ইন্দ্রাণী, কিন্তু আজ কেন ওই আনন্দের কলরোল সহ্য হয় না ? অংশীদার হতে পারছে না বলে ? নিজেকে বিচ্ছিন্ন লাগছে ? বাপ্পা এখন ডাকলেও কি ও ঘরে যাবে ইন্দ্রাণী ? কক্ষনও না।

খাওয়াদাওয়ার পর মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছিল ইন্দ্রাণী। মাথাটা ভার ভার লাগছে। কন্দর্পর সঙ্গে খানিক আড্ডা মেরে ঘরে এল বাপ্পা। গুঁড়ি মেরে ঢুকল বিছানায়। শুয়েছে।

হঠাৎই ইন্দ্রাণী একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। কত কাল পর ছেলে শুয়েছে পাশে ! সেই তিতির হওয়ার পর থেকেই তো ছেলে পাশ ছাড়া। এক সময়ে বাপ্পা গুটি গুটি উঠে আসত মা'র কাছে, ঝগড়া করে তিতিরকে সরিয়ে দিত, অথবা নিঃসাড়ে শুয়ে পড়ত মা'র গা ঘেঁষে। কিন্তু এখন যে পাশে এসে শুল, এই বাপ্পা কি সেই বাপ্পা ? একটা চাপা পুরুষালি গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারছে ইন্দ্রাণীর। অস্বস্তি হচ্ছে। বড্ড কাছ ঘেঁষে শুয়েছে বাপ্পা, একটু সরে যেতে বলবে ?

বাপ্পা কথা বলে উঠল,— ঘুমোলে ?

ইন্দ্রাণী সাড়া দিল,— না।

—মশারিটা খুলে দিলে হয় না ?

—মশা কামড়াবে। কেন ?

—মশারিতে শোওয়ার হ্যাবিটটা একদম চলে গেছে। কেমন চাপা চাপা লাগছে। বাপ্পা চিত হয়ে শুল, এ বাড়ির ঘরগুলোও খুব খুপরি খুপরি মা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আরেকটু বড় বাড়ি পেলে না ?

—এরই ভাড়া দু হাজার।

—তো কি আছে! নয় প্রোমোটারের টাকার সঙ্গে আরও হাজার খানেক অ্যাড করে নিতে। ছোটকার কথা শুনে মনে হয় ছোটকা আজকাল ভালই কামায়। সে না দিলেও তোমার ইন্টারেস্টের টাকা আছে, আমার টাকাও আছে...

—কটা তো মাত্র মাস। জুলাই অগাস্টে তো চলেই যাব।

—কটা মাস বলেই তো ভাল করে হাত পা ছড়িয়ে থাকা উচিত ছিল।

—দীপুর বাড়ি তো এখনও দেখিসনি। ওদের ঘর দুটো আরও ছোট।

—ওদের সঙ্গে তুলনা করছ কেন ? বড় কাকার ফ্যামিলি মেম্বার কম। আড়াই জন। তাছাড়া বড় কাকা একা ইনকাম করে, সেখানে ফ্যামিলিতে কোনও বাপ্পাও নেই।

ছেলের স্বরটা ভারী অহঙ্কারী শোনাল। নিজেকে জাহির করার প্রবণতা চিরকালই একটু বেশি ছিল বাপ্পার, স্বভাবটা এখনও যায়নি! দেওয়ালের দিকে ঘুরে শুয়ে ইন্দ্রাণী বলল,— নতুন ফ্ল্যাটের ঘরগুলোও এমন কিছু বড় হচ্ছে না বাপ্পা, সেগুলোও তোমার পায়রার খোপের মতো লাগবে।

—তবু সে হল নিজের জিনিস। তিনতলার ওপর, কত আলো-হাওয়া পাওয়া যাবে... অনেক মডার্নাইজড ঘর। আগে থেকে বলে দিলাম আমার জন্য একটা আলাদা ঘর রাখবে। সাউথ ফেসিং।

ইন্দ্রাণী উত্তর দিল না। চোখ বুজেছে। রাতের দিকে ফ্যানের হাওয়ায় হালকা সিরসিরে ভাব, যেন ফাল্গুনের বাতাসে মাঘের স্মৃতি লেগে আছে। সামনের রাস্তা দিয়ে ঝনঝন করে একটা সাইকেল রিকশা চলে গেল। একঘেয়ে শব্দ তুলে মালগাড়ি যাচ্ছে একটা, যাদবপুরের দিকে চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধ্বনিটা লেগে রইল কানে।

এ পাশ ফিরে শুয়েও ইন্দ্রাণী টের পাচ্ছিল বাপ্পা উসখুস করছে বিছানায়। মনে মনে হাসল ইন্দ্রাণী। বাপ্পা একটুও বদলায়নি। সামান্য কোনও সুখের ব্যত্যয় সহ্য করতে পারে না ছেলে। বাপ্পা যখন এইটুকুনি ছিল, তনু বলত তোর ছেলেকে আমার হাতে ছেড়ে দিস দিদি। ভাগ্নেকে আমি আমার মতো করে গড়েপিটে নেব! হায় কী দুরাশা!

তনুর কথা মনে পড়তেই ইন্দ্রাণীর নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। বাপ্পার কি একটুও মনে নেই তনুর কথা ? তনুরই কি মনে আছে ? বাপ্পা তো নিশ্চয়ই এখন ক'দিন থাকবে, ছেলেকে পাঠাবে একবার তনুর কাছে ? চুপিচুপি ?

ও ঘরে ঘঙঘঙ কাশছে আদিত্য। রাতটা বুঝি ছিঁড়ে গেল কাশির আওয়াজে। কি যেন বলছে তিতির, জলটল দিচ্ছে বোধহয়। থেমে গেছে কাশি। ইন্দ্রাণী আরও একটুক্ষণ কান পেতে রইল। বাপ মেয়েতে আরও কিছু কথা হয় কিনা শোনার চেষ্টা করছে।

অন্ধকারে বাপ্পা নড়ে উঠল,— বাবা কিন্তু এবার খুব উইক হয়ে গেছে মা।

—হুঁ। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল ইন্দ্রাণী।

—একটা কথা বলব ? রেগে যাবে না ?

—কী ?

—হসপিটালে না পাঠিয়ে বাবাকে এবার একটা ভাল নার্সিংহোমে রাখলে পারতে। আরও বেটার চেকআপ দরকার ছিল।

বাপ্পা কি শোনেনি আদিত্যর চিকিৎসায় ইন্দ্রাণী এবার বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণ করেনি ? নাকি জেনেশুনে মাকে বাজাতে চাইছে ? কতটুকু জানে ? জানে তার দাদুর মৃত্যুর জন্য মাকে দায়ী করে বাবা ? জানে একটা সস্তা মেয়েছেলে এসে বাবাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল ? চাঁদু বলছিল

মেয়েটার সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর ধারণা নাকি ঠিক নয় ! রঘুবীর ছিল না বলেই মেয়েটা নাকি দেখভাল করছিল দাদার ! হুঁহু, দাদার হয়ে সাফাই গায় ! তাও যদি না নিজের চোখে দেখত ইন্দ্রাণী !

সেই মানুষটার চেকআপ ! ইন্দ্রাণীর ঝামরে উঠতে ইচ্ছে হল, কোনও চেকআপেই তোমার বাবার কিচ্ছু হবে না। আগে তার কুঅভ্যেসগুলো ছাড়াও।

মুখে শুকনো গলায় বলল,— কেন হসপিটালে তো ভালই ট্রিটমেন্ট হয়েছে। নার্সিংহোমে এর বেশি কী হত ?

—তাও ডিফারেন্স একটা আছে।

—কী ডিফারেন্স ? খালি গাদা খানেক খরচা ছাড়া ?

—খরচার কথা তোমায় কে ভাবতে বলেছে ? আমার টাকা তো ছিল।

ইন্দ্রাণী থমকাল সামান্য। ছেলে কী বলতে চায় ? তার বাবার চিকিৎসা তার টাকায় করা হয়নি কেন ?

মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল,— বলছি তো তোর বাবার ট্রিটমেন্টের কোনও ত্রুটি হয়নি। দীপুকে জিজ্ঞেস করে দেখিস, চাঁদুকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

বাপ্পা একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল,— বুঝেছি। আমার রোজগারের টাকায় তুমি হাত দিতে চাও না।

—সত্যিই তো চাই না। ইন্দ্রাণী ছেলের দিকে ফিরল। আলগা হাত রাখল বাপ্পার মাথায়,— তোর একটা ভবিষ্যৎ নেই ? আজ বাদে কাল তোর বিয়ে হবে, ঘরসংসার হবে, ছেলেপুলে হবে, তখন তোর এই জমানো টাকা তোর কত কাজে লাগবে বল তো ?

—তোমার বড় জেদ মা। ইন্দ্রাণীর হাত সরিয়ে দিল বাপ্পা। উল্টোদিকে ফিরল,— শুধু তোমার এই জেদের জন্য কারুর সঙ্গে তোমার কোনওদিন বনিবনা হল না। সাধে কি বাবা কষ্ট পায় !

কী বলে বাপ্পা ! আচম্বিতে ইন্দ্রাণীর বুক শূন্য হয়ে গেল। ফাঁকা, বেবাক ফাঁকা। ছেলে তো দূরে ছিলই, তাকে আর মায়ার বাঁধনে বাঁধতে পারবে না কোনওদিন এও তো জানাই ছিল ইন্দ্রাণীর। তা বলে এত দূরে ! মা'র বিষাদ যন্ত্রণা লড়াই কোনওদিনই কি দেখেনি বাপ্পা ! কোন মন্ত্রবলে তার বাবা আজ তাকে এত জাদু করে ফেলল !

তিতির তো সরেই গেছে কবে, বাপ্পাও একটু থাকল না !

তোর টাকায় কেন হাত দেয়নি মা তাও একটু তলিয়ে ভাবলি না ! খরখরে চোখে অন্ধকারকে দেখছিল ইন্দ্রাণী। দূরে দূরে তো ভালই ছিলি বাপ্পা, কেন আবার এলি !

৯১

জাহাজের নির্জন কেবিনে শুয়ে রোজ একটা দৃশ্য কল্পনা করত বাপ্পা। তাকে দেখা মাত্র খুশিতে তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে তিতির, মা'র বরফ মুখ গলে আনন্দের ঝর্না হয়ে গেল, বাবার তৃষ্ণার্ত চোখে আলো জ্বলে উঠল ঝিকঝিক...। আশ্চর্য, সে রকম কিছুই হল না ! তার চকিত আগমনে তিতির চমকাল বটে, কিন্তু সে যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে খসে পড়া কোনও জীবকে দেখে অবাক হওয়া। বাবা হাসল কি হাসল না বোঝাই গেল না, ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছে। মা'র মুখেও খুশি ছিল কি ? হয়তো ছিল, বাপ্পা তেমন কিছু বুঝতে পারেনি। মাঝখান থেকে তুচ্ছ কারণে ঝগড়া বেধে পুরোপুরি হাঁড়িমুখ হয়ে গেল মা। এমন একটা অভ্যর্থনাই কি প্রাপ্য ছিল বাপ্পার !

তার নিজেরই বা কি হল ! ওসাকা থেকে প্লেনে ওঠার সময়ে যেমন তড়াক তড়াক লাফাচ্ছিল হৃৎপিণ্ডটা, বাড়ি পৌঁছে তার ছিটেফোঁটাও রইল না। তিতিরকে দেখে মনে হল আট মাস পরে নয়, এই যেন কলেজ থেকে ফিরে দেখল তিতিরকে। মা যেন স্কুলে গিয়েছিল, ফিরল এই মাত্র। বাবার কথা ভাবলেই যে একটা সর্ষেদানা পাক খেত বুকে সেটাই বা গেল কোথায় !

দূর কাছে এলে কি টান কমে যায় ! জাহাজে দিনরাত মন হুহু করাটাও কি মিথ্যে ছিল !

হিসেব মেলে না। অনেক হিসেবই মেলে না বাপ্পার। কস্মিনকালে স্কুল আর মানিকতলা ছাড়া কোথাও যায় না মা, বাপ্পা ফিরে দেখল সেই মা উধাও। কখন ? না, যখন বাবা হসপিটাল থেকে ফিরেছে এবং মোটেই তেমন সুস্থ নয়। এ সময়ে দাদু-দিদাকে নিয়ে দুম করে মা বেড়াতে যায় কী করে ! তিতির তো আরও স্ট্রেঞ্জ। রেশন করে হাসছে, মাকে ছেড়ে বাবার ঘরে ঘাঁটি গেড়েছে, সারা দিনে একবার উঁকি পর্যন্ত দেয় না মা'র দরজায়। অত বাধ্য মেয়ের ঘাড় এমন ট্যাড়া হয়ে গেল কেন ? আর বাবাকে দ্যাখো, আট মাসে যেন আশি বছরের হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘন্টা ঝিমোচ্ছে তো ঝিমোচ্ছে। এক পা বেরোল তো চার ঘন্টা ঢুলবে। যে বাবা চান্স পেলেই সুটসাট উড়ে যেত তার এ কী দশা ! এই এঁদো পচা বাড়িটাতে এসে সবাই কেমন বদলে গেছে। ছোটকা যে ছোটকা, ভাঁড়স্য ভাঁড়, তার মধ্যেও কি রকম হেক্কড় হেক্কড় ভাব ! কিহ্ বাপ্পাহ্, হাউ ইজ লাইফ ! আমার তো খাটতে খাটতে জীবন বেরিয়ে গেল !

বাপ্পা ভুল বাড়িতে এসে পড়ল না তো ! তার চেনা লোকের ছদ্মবেশে অন্য কেউ বাস করছে না তো এ বাড়িতে !

মা দিঘা থেকে ফেরার দিন দুয়েক পর একদিন ছোটকাকেই ধরল বাপ্পা,— কেসটা কি বলো তো ? মা তিতির সবাই এমন স্টোনফেস নিয়ে ঘোরাফেরা করছে কেন ?

একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনে নিজের ছবি মোহিত হয়ে দেখছিল ছোটকা। পুকুরপাড়ে গেঁয়ো নায়িকার সঙ্গে বোকা বোকা মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ছবি। পাতাটা খুলে রেখে কায়দা করে হাসল,— তুইও টের পেয়ে গেছিস ?

—পাব না ? এ বাড়িতে এক ঘন্টা থাকলেই বোঝা যায় সামথিং রং। একটা কোনও আন্ডারকারেন্ট চলছে। তিতির আর মা'র কি জোর ফাইট হয়েছে ? ইস্যুটা কি ?

—কিছুই না। সেই পুরনো ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের লড়াই। তোর বাবা যা কেলোটা করল।

—কিন্তু ড্রিঙ্ক করে বাবার হসপিটালে যাওয়া কী আর এমন নতুন ?

—তা ঠিক। তবে বউদি এবার সাংঘাতিক ফিউরিয়াস। আর তিতিরকে তো জানিসই, তোর বাবার ব্লাইন্ড চামচি। সে এবার পুরো জার্সি-টার্সি পরে ডিফেন্সে নেমে পড়েছে। হসপিটাল এপিসোডটা তো একা ওই সামলাল। তোর মা দেখতেও যায়নি।

—তাই ?

—তাই। ছোটকা খাটে হেলান দিয়ে ঠোঁটে সিগারেট চাপল,— মাঝে তোর বাবা সন্নিসি হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল সে খবর রাখিস ?

—না তো।

—ইয়েস। এই কাশী চলে যায় আর কি। পেটে ব্যথাটা না বাধালে অ্যাদ্দিনে হরিশচন্দ্র ঘাটে গায়ে ছাই মেখে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকত। ওসব ভ্যানতাড়ার জন্যই তো বউদি খচে ব্যোম। এখন চুপ থেকে দাদাকে জাঁতা দিচ্ছে। বলতে বলতে ছোটকার চোখ ঢুলু ঢুলু,— বুঝলি বাপ্পা। উঁহু, তুই বুঝবি না, সাইলেন্সই হল মেয়েদের সব চেয়ে বড় ওয়েপন।

বাপ্পা যেন একটু ধন্দে পড়ে গেল। ছোটকার কথা পুরো বিশ্বাস হল না। আবার হলও। নীরবতাই যে মেয়েদের অমোঘ অস্ত্র তা হাড়ে হাড়ে টের পায় বাপ্পা। ঠিকানা নিয়েও বিষ্ণুপ্রিয়া একটাও চিঠি লেখেনি, ব্যথাটা খচখচ করে ফোটে বুকে। এসেই যে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি ছুটতে পা সরল না, সে তো খানিকটা ওই কারণেই। নীরবতার তীর হেনে তার কলজেটা ফালা ফালা করে দিয়েছে ওই মেয়ে।

মা কি একই পদ্ধতিতে রগড়াচ্ছে বাবাকে !

দুর দুর, মা'র অত প্রেম ভালবাসা নেই বাবার ওপর। না হলে বাবার হয়ে দুটো কথা বলতেই মা অত চটিতং হয়ে যায় ! বাবার জন্য মা'র যা আছে তা শুধুই এক ধরনের হতাশা। বিরক্তি। মা'র

টান ভালবাসা তো অন্য আরেক জনের জন্যে। বাপ্পা জানে।

তেতো চিন্তাটা আসতেই বাপ্পার বুক হিম। বিষ্ণুপ্রিয়ারও অন্য কারুর ওপর টান এসে যায়নি তো!

ঝটপট দু দিনে দুটো কর্তব্য সেরে ফেলল বাপ্পা। এক দিন পিসির বাড়ি আর মানিকতলা ঘুরে এল। আর এক দিন বড়কাকা।

পিসির বাড়ি গেল দুপুরবেলায়। ভেবেচিন্তে। যাতে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে না দেখা হয়। ভারি অদ্ভুত তির্যক ভঙ্গিতে কথা বলে পিসেমশাই, বাপ্পার একটুও পছন্দ হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ঝান্টু তখন বাড়িতে ছিল, সে জিনিস পেয়ে যত না খুশি, তার থেকে দশগুণ তার বিটকেল বিটকেল কৌতূহল। বাপ্পা একেবারে জেরবার হয়ে গেল। সমুদ্রের মাঝখান থেকে দূরবীন দিয়ে মহাদেশ দেখতে পাওয়া যায় বাপ্পাদা? তোমাদের জাহাজ কখনও চড়ায় আটকেছে? ক্যানিং-এর বিদ্যেধরীতে আমাদের ভুটভুটি একবার আটকে গিয়েছিল। তোমরা সমুদ্রে থাকো, অথচ সমুদ্রস্নান করো না? ...পিসি তাকে আদরযত্ন করল খুব, কিন্তু বাপ্পা ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাক কান মুলে প্রতিজ্ঞা করেছে, যে ক'দিন কলকাতায় আছে, মরে গেলেও আর কেষ্টপুরমুখো হচ্ছে না।

ফেরার পথে মানিকতলায় গিয়ে অবশ্য মন ভরে গেল। দাদু একবার আদর করে, একবার দিদা, বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে বাপ্পাকে। সমুদ্র নিয়ে কৌতূহলের থেকেও বাপ্পা কেমন ছিল তা জানার আগ্রহই তাদের বেশি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হয় কিনা, ডাক্তার-ফাক্তার থাকে কিনা জাহাজে, বাপ্পার সময় কাটে কী করে, সঙ্গীসাথীরা কি রকম, এইসব। বাপ্পার আনা ডান্সিং ডল আর সাবানঘড়ি দেখে বুড়োবুড়ি দুজনেই কী খুশি! কোথায় রাখলে সুন্দর দেখাবে তাই নিয়ে দুজনের ঝগড়া বেধে যায় যায়। দাদু-দিদার মনমরা ভাবটাও অনেক কেটে গেছে, বাপ্পা বহুক্ষণ প্রাণ খুলে গল্প করল তাদের সঙ্গে। একটাই শুধু খটকা লাগল। বাবার শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছিল দিদা। মা তো প্রায়ই এখানে আসে, বাবার কথা কি কিছুই বলে না?

বড়কাকার বাড়িতে অভ্যর্থনা তো রীতিমতো রাজকীয় হল। সন্ধে সন্ধে গিয়েছিল ও বাড়ি, বড়কাকাকে আগেই অফিসে ফোন করা ছিল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিল বড়কাকা। এত্ত খাবার নিয়ে। বিরিয়ানি চাঁপ মিষ্টি...। বড়কাকার কাছ থেকেই কথায় কথায় জানতে পারল বাবা নাকি আরেকটা খ্যাপামি শুরু করেছিল মাঝে। পুরনো বাড়িটা ভাঙার সময়ে রোজ নাকি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বাবা, জোরে শাবল গাঁইতি চালালে মিস্ত্রিদের বকাবকি করত। কাকিমা কত দুঃখ করল, মা নাকি একবারও আসেনি এ বাড়িতে। ছোট্ট বাড়িটা কাকিমা কী সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে! ক মাসে কাকিমা মুটিয়েছেও বেশ। অ্যাটম তাকে দেখে পিড়িং পিড়িং নাচছিল, সে উঠে পড়তেই অ্যাটমের চোখ ছলছল।

—আবার আসবে তো দাদাভাই?

—নিশ্চয়ই আসব।

—দিদিভাইও এরকম বলে, আসে না।

—দুর পাগলা, দিদিভাইয়ের সামনে পরীক্ষা না!

—এর পর তুমি যখন কলকাতায় আসবে, তখন তো আমরা নতুন বাড়িতে চলে যাব, তাই না? তখন আবার আমরা এক সঙ্গে থাকব, কি বল?

—থাকব তো।

—খুব মজা হবে, না? আমরা সবাই আবার... এক সঙ্গে... আমাকে তখন একদিন জাহাজ দেখাতে নিয়ে যাবে দাদাভাই?

ভারী বুকে বেরিয়ে এল বাপ্পা। সামনে ঢাকুরিয়া লেক, জলের ধারে এসে বসে রইল কিছুক্ষণ। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু, পাড়ে এসে আলতো ধাক্কা খাচ্ছে জল। অন্ধকার জলের মাঝে ছায়া ছায়া দ্বীপ

দেখা যায়। আপাতচোখে মনে হয় দ্বীপেরা বুঝি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন, যে যার একা, কিন্তু সত্যিই কি তাই ? জলের তলায়, অনেক তলায়, একই মাটির ওপর তো দাঁড়িয়ে আছে তারা। ওই গোপন যোগটার নামই বুঝি সম্পর্ক।

ফেরার পথে বাপ্পা হাঁটছিল এলোমেলো। অন্যমনস্ক মনে। মন্থর পায়ে। হঠাৎ চমকে উঠল। এ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে ! সেলিমপুর না গিয়ে পুরনো রায়বাড়ি... ! দীর্ঘকালের অভ্যেসই কি ভুল করে তাকে এ পথে নিয়ে এল !

ভুরু কুঁচকে বাড়িটাকে দেখছিল বাপ্পা। কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। চারতলা অবধি ঢালাই কমপ্লিট, ইটের খাঁচা মোটামুটি তৈরি, এবার দরজা জানলা বসবে। নির্মীয়মাণ অট্টালিকার গায়ে আশপাশ থেকে আলো এসে পড়েছে, আঁধারে আলোয় কাঠামোটাকে কেমন যেন এক বিষণ্ণ অবয়বের মতো লাগে। দরজা জানলার খোপগুলো জমাট কালো, রহস্যময়।

কী এক কৌতূহলে বাপ্পা বাউন্ডারির ভেতর ঢুকে পড়ল। একতলায় সারি সারি অপূর্ণ থাম, এখানটায় বোধহয় গ্যারেজ-ট্যারেজ হবে। দারোয়ানের ঘরে আলো জ্বলছে, সে দিকে একবার তাকিয়ে নিল বাপ্পা, তারপর পায়ে পায়ে নিঃসাড়ে উঠে এসেছে দোতলায়। বিশাল ফাঁকা থামঅলা জায়গা, এখনও পার্টিশান ওয়াল পড়েনি, ইট বালি সুরকি দাঁত বার করে আছে। ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছিল বাপ্পা, হাঁটছিল, আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল ঠিক কোন জায়গাটাতে ছিল তাদের আগের ঘর। বড়কাকারা যেন কোনখানটায় থাকত ? নতুন ফ্ল্যাটের ঘরগুলোই বা ঠিক কি রকম হবে ?

—খুব খুশি, অ্যাঁ ?

একা বাপ্পা আমূল কেঁপে উঠল। কে ? ঘুরে আলোছায়ায় চোখ চালাল দ্রুত। কেউ কোত্থাও নেই।

—বাড়ি ভাঙতে পেরে খুব আহ্লাদ ?

বাপ্পার স্যারা শরীর থরথর। চেনা গলা। সেই বুড়ো।

হাঁটুর জোর কমে গেল বাপ্পার। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। পড়িমড়ি করে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। দু দিক খোলা এবড়ো-খেবড়ো ধাপি বেয়ে দুপদাপ নামছে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রায় দৌড়চ্ছে বাড়ির দিকে।

দরজা খুলতে এসে তিতির অবাক,— হাঁপাচ্ছিস কেন এত ? কোত্থেকে এলি ?

উত্তর দিল না বাপ্পা। বোনকে ঠেলে সরিয়ে বাবার ঘরে ঢুকেছে। দু-এক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রইল। বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছছে।

জুলজুল চোখে দাদাকে দেখল তিতির,— হল কি তোর ? কোথাও মারপিট করে এলি নাকি ?

বাপ্পা কষ্ট করে হাসল। প্রাণপণে স্বাভাবিক করছে নিজেকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। জয়মোহনের ছবিতে চোখ আটকে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তাকিয়েই আছে।

তিতির মুখের সামনে এসে হাত নাড়ল,— অ্যাই, কী দেখছিস ?

বাপ্পা ফ্যাসফেসে গলায় বলল,— দাদুর ছবিটাকে রোজ একবার করে মুছিস না কেন ?

—মুছি তো। মাঝে হয়তো কটা দিন...

—ছাই মুছিস। কবে একটা মালা পরিয়েছিলি, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ফ্রেশ একটা মালা দিতে পারিস না ?

বিছানায় আধশোয়া আদিত্য উঠে বসেছে। বাবা মেয়ে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। বাপ্পা ঘর থেকে সরে এল।

রাতে ঘুম হল না বাপ্পার।

আরও কটা দিন কেটে গেল।

নিছক আলস্যে দিন কাটছে বাপ্পার। শুয়ে। বসে। মা জিজ্ঞাসা করে, তিতির কৌতূহল দেখায়,

বাপ্পার একই উত্তর, ধুস ভাল্লাগে না। বিশ্রাম নিচ্ছি।

বন্ধুবান্ধবদের ফোন আসে মাঝে মাঝে। এসেই শেখরকে ফোন করেছিল, তার মুখ থেকে খবর পেয়ে অনেকেই বাপ্পার খোঁজখবর নেয়। শুধু একটা ফোনই এখনও এল না ! ফোনটার প্রতীক্ষায় আছে বাপ্পা। শেখর ধীমানদের পার্ট টু পরীক্ষা এসে গেল, কলেজ বন্ধ, তারা এখন কোচিং টিউটোরিয়াল নিয়ে মহা ব্যস্ত। তারই মধ্যে তারা ইন্দ্রনীলকে ডাকাডাকি শুরু করেছে। কোন কোন বন্দরে বাপ্পার কটা গার্লফ্রেন্ড হল, কোথায় কী নিষিদ্ধ আনন্দ ভোগ করল, তার সবিস্তার কাহিনী শুনতে চায় তারা। হাহ্, কী সব আজগুবি ধারণা ! জাহাজিদের যেন চরিত্রের ঠিকঠিকানা থাকতে নেই ! বিষ্ণুপ্রিয়াও কি এ রকমই ভাবে !

শেখর বলছিল বিষ্ণুপ্রিয়া নাকি পার্ট ওয়ানে দারুণ রেজাল্ট করেছে। ধীমানের মুখে শুনল কম্পিউটারে ভর্তি হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। এণাক্ষী উচ্ছ্বসিত হয়ে খবর দিল ইন্টার কলেজ কুইজ কম্পিটিশানে তাদের কলেজের মুখ পুড়িয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া, গোবেড়েন হেরেছে। সবই প্রাণহীন তথ্য, বাপ্পার নাইট স্কাই-এর খবর দেয় কে ! সেলিমপুরের এই বাড়ি থেকে বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি আর ক'পা, তবু মনে হয় ছায়াপথের ওপারে। নীল সমুদ্রে বিষ্ণুপ্রিয়া অনেক অনেক কাছে ছিল।

ক্যাপেলা নক্ষত্র কি খবর দেয়নি বাপ্পা এ শহরে ফিরে এসেছে ?

এক-আধ দিন বিকেলে হাই পাওয়ার চশমা রোগাসোগা ওই মেয়েটা চুম্বকের মতো টানতে থাকে বাপ্পাকে, মোহগ্রস্তের মতো বাপ্পা বেরিয়ে পড়ে। দু-দশ গজ গেলেই অদৃশ্য এক নেভিগেটার হুইলটা ঘুরিয়ে দেয়, একদম উল্টো পথে চলে যায় বাপ্পা। ঝিল রোড ধরে হাঁটে, যাদবপুরের দিকে। আগে এ দিকটায় অনেক পুকুর-টুকুর ছিল, এখন সব বুজে গেছে। রোজ বাড়ি উঠছে নতুন নতুন। বাপ্পা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বটে, মস্তিষ্কে কোনও ছবিই রেখাপাত করে না। জাহাজে থাকতে শহরটার ওপর যা একটু মায়া জন্মেছিল তাও যেন ফিকে হয়ে আসছে ক্রমশ। ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না। চোখের সামনে মরে যায় হলুদ বিকেল, সন্ধ্যা নামে। এতাল-বেতাল ঘুরে কোটরে ফেরে বাপ্পা।

বাড়ির হাল একই রকম। গয়ংগচ্ছ। ঘরের বন্ধ বাতাসে সময়ের ঘোরাফেরা সেই শামুকের মতো। তিতির বাবা মা ছোটকা সবাই যে যার বৃত্তে ঘুরছে। বড়কাকা দু-দিন এক দিন পরপর সন্ধের দিকে আসে, খানিক গল্পটল্প করে চলে যায়। রবিবার বিকেলে কাকিমা আর অ্যাটমও এসেছিল। তিতিরের পরীক্ষা বলে বেশিক্ষণ রইল না, তার মধ্যেও একটা মলয় বয়ে গেল বাড়িতে। ছোটকা পিছনে লাগছে সকলের, তিতির হাসছে, কাকিমা হাসছে, কলকল করছে অ্যাটম। এমনকী মা'র গোমড়া মুখেও হঠাৎ হঠাৎ আলগা হাসি। তার পরেই অবশ্য বাড়ি আবার যে-নিঝুম সে-নিঝুম। ডাক্তার আঙ্কলও আজকাল খুব কম আসে। বসে না বেশিক্ষণ, কথাবার্তাও বলে না বিশেষ। বাবা মারা যাওয়ার পর ভারী চুপচাপ হয়ে গেছে মানুষটা।

সে রাতে ভয় পাওয়ার নেপথ্য কাহিনীটা গল্পচ্ছলেও কাউকে বলেনি বাপ্পা। দুঃস্বপ্ন বা মনের ভুল ভেবে নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, সেই খোচো বুড়োটার জন্য এক ফোঁটা কষ্ট জমেছে বাপ্পার বুকে। ট্রাঙ্ক ঘেঁটে ঘেঁটে দাদুর একটা ছবি বার করল একদিন। ভরে রেখেছে নিজের স্যুটকেসে। জাহাজে নিয়ে যাবে। বুড়ো তার পিছনে লাগত খুব, কিন্তু তার দৌলতেই না বাপ্পা আজ...

হঠাৎই বাপ্পা ওশান লাইনারসের বম্বে অফিস থেকে একটা চিঠি পেল। সার্ভিস রেকর্ডে তার কি একটা ডিক্লারেশান দেওয়া বাকি আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার কলকাতা অফিসে গিয়ে দেখা করতে হবে। কী সব নমিনি-টমিনি করার ব্যাপার, যত দূর মনে হয় ইনসিওরেন্সের।

পর দিন দশটা নাগাদ বেরোনোর উদ্যোগ করছিল বাপ্পা। কন্দর্প সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে, ইন্দ্রাণী স্কুলে, তিতিরও একটু আগে নোটসের খোঁজে বন্ধুর বাড়ি গেল। সন্ধ্যার মাকে ভাতের তাড়া লাগিয়ে বাপ্পা দাড়ি কামাতে বসল। বিলিতি টিউব টিপে দেখে ফোম শেষ। ইশ, কালকেই এখান

থেকে একটা কিনে নেবে ভেবেছিল। ভুলে গেছে। বেরিয়ে নিয়ে আসবে ? পাঠাবে সন্ধ্যার মাকে ?

কি ভেবে বাপ্পা পাশের ঘরে এল,— তোমার শেভিং ক্রিমটা দাও তো বাবা।

আদিত্য কাগজ পড়ছিল। আমেরিকা ইরাকের যুদ্ধে মশগুল। বাপ্পার কথায় শশব্যস্ত হয়ে উঠল,— ক্রিম তো নেই রে। আমি তো কেক ব্যবহার করি। নিবি ?

—অঁ। বাপ্পা মাথা চুলকোল,— দাও।

তাড়াতাড়ি উঠে নিজের দাড়ি কামানোর বাক্স ঘাঁটছে আদিত্য। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন ছেলে কিছু চেয়ে তাকে ধন্য করে দিয়েছে।

বাপ্পা সাবানটা নেড়েচেড়ে দেখল। হাসিমুখে বলল,— তোমার জন্য আজ একটা ভাল শেভিং ক্রিম কিনে আনব। কী যে মান্ধাতার আমলের জিনিস ব্যবহার করো !

—আমার এই ভাল রে। ...রোজগারপাতির ক্ষমতা নেই, মিছিমিছি আরেকটা শৌখিন অভ্যেস করি কেন ?

বাবা এ রকমই কথা বলে আজকাল। আগে হলে বাপ্পা রেগে যেত, এখন কেমন করুণা হয়। মাথা নেড়ে বলল,— রোজগারপাতি করো না কেন ? তোমার রঘুবীরবাবু তো প্রায়ই এসে ঘুরে যাচ্ছে, কী সব করছিলে আবার শুরু করে দাও।

—দুর, ও হবে না রে।

বাপ্পা চোখ কুঁচকে ভাবল একটু,— বিজনেস না পারো চাকরি-বাকরির চেষ্টা করো।

—এই বয়সে ?

—এর চেয়ে বেশি বয়সে লোকে চাকরি জোটাতে পারে বাবা। তুমি ছোটকাকে একবার বলে দ্যাখো।

—চাঁদু !

—হ্যাঁঅ্যা। ছোটকা মুস্তাফিবাবুকে বললেই কিছু ছোটখাট বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তোমার তো আর সংসার চালানোর জন্য চাকরি করতে হবে না, জাস্ট পাসটাইম। চুপচাপ ঘরে বসে আছ...

আদিত্য কাঁচুমাচু মুখে বলল,— তোর মা পছন্দ করবে না।

—কি ? চাকরি করা ?

—না। মুস্তাফিবাবুকে বলা।

বাপ্পা হা হা করে হেসে উঠল,— ও তোমার মনগড়া ধারণা। ...শোনো, মাথাটাকে এবার একটু ঠাণ্ডা করো। আবোল-তাবোল কাণ্ড আর না ঘটিয়ে কিছু একটা নিয়ে থাকো। শরীরও ভাল থাকবে, মনও ভাল থাকবে। ডোন্ট অ্যাক্ট লাইক এ ডেকাডেন্ট বুর্জোয়া। চাকরির ব্যাপারটা নয় আমিই বলব ছোটকাকে, তুমি করবে তো ?

আদিত্য হ্যাঁ না কিছুই বলল না। যেন তার সম্মতি মূল্যহীন এমন একটা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাপ্পা চলে আসছিল। বাবার ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল,— বলবে কিছু ?

আদিত্য ফ্যালফ্যাল করে দেখছে বাপ্পাকে।

—কী হল ?

—না...ক'দিন ধরেই তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

—কী ?

—বাড়ি ছেড়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে তোর ভাল লাগে ?

বাপ্পা কাঁধ ঝাঁকাল,— চাকরি ইজ চাকরি।

—তা ঠিক। তবে কিনা...তুই আর ডাঙায় ফিরবি না বাপ্পা ?

ভেতরে ভেতরে একটা নিশ্বাস পড়ল বাপ্পার। মনে মনে বলল,— ডাঙা ভাল, না জল ভাল

এখনও বুঝতে পারিনি বাবা। মুখে বলল,— কটা বছর যাক। পরীক্ষা-টরীক্ষাগুলো দিয়ে প্রোমোশানগুলো পাই। ক্যাপ্টেন না হই চিফ অফিসার তো হতেই হবে।

—তার মানে তুই ফিরবি না ?

—তা কেন, প্রতি বছরই আসব। ছুটিতে...পরীক্ষা দিতে...আমার চিন্তা ছেড়ে নিজের কথা ভাব। আমি কিন্তু বলব ছোটকাকে।

খেতে বসেও বাবার কথাগুলো ঘুরছিল মনে। আরও যেন ভিতু জড়সড় হয়ে গেছে বাবা। চূড়ান্ত অসফল মানুষের কি শেষ পর্যন্ত এই পরিণতিই হয় ? কীভাবে আর সাহায্য করা যায় লোকটাকে ? মনে হয় হাতে এখন কিছুই নেই, হাতখরচা বলে টাকা দিয়ে দেবে কটা ? দেওয়াই যায়। ছেলে হিসেবে বাপ্পারও তো কিছু কর্তব্য আছে। মা যখন তার একটা পয়সাও ছোঁবে না...

দিল বাপ্পা। বেরোনোর মুখে। দুশো টাকা। ভেবেচিন্তে কমই দিল, বেশি টাকা পেলে যদি আবার মতি বিগড়োয় ! হেসে বলল,— উল্টোপাল্টা খরচা কোরো না। লাগলে বোলো, আবার দেব।

একটু বুঝি কিন্তু কিন্তু ছিল আদিত্যর। শেষ পর্যন্ত নিয়েও নিল। সামান্য দুশো টাকা পেয়ে কোনও মানুষের মুখ যে এমন উদ্ভাসিত হতে পারে বাপ্পা জন্মে দেখেনি।

হালকা মেজাজে বেরিয়ে পড়ল বাপ্পা। দেওয়াতেও এত আনন্দ !

বাস স্টপে অনীকের সঙ্গে দেখা। অনীক তাকে খেয়াল করেনি, ব্যস্ত চোখে ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। বাপ্পাই কাছে গেল,— কি রে, কি খবর ?

অনীক অকৃত্রিম মুখে হাসল,—তুই ! কবে এসেছিস ?

—এই তো দশ-বারো দিন। ...তারপর বল্, আছিস কেমন ?

দুই বন্ধুতে কথা হল খানিকক্ষণ। কলেজে শেষের দিকে অনীক তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত, আজ মোটেই সে তেমনটা করছে না। তবে শুধু নিজের কথাই বলে চলেছে এই যা ! ...শিগগিরই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির ফাউন্ডেশান কোর্সে ভর্তি হচ্ছে... অবশ্য সি-এ টি-এ হওয়া তার পছন্দ নয়...জামাইবাবুর ভাই অস্ট্রেলিয়া থেকে জব ভাউচার পাঠাচ্ছে...ঘ্যামচ্যাক চাকরি...ইমিগ্রেশান নিয়ে ওখানেই সেটল্ করে গেলে মন্দ হয় না...ইত্যাদি ইত্যাদি। বাপ্পার জাহাজ, চাকরি, দেশবিদেশ কোনও কিছু নিয়েই তার কোনও প্রশ্ন নেই।

কি প্রসঙ্গে আলগা জিজ্ঞাসা করল,— গত মাসে অ্যাটলান্টিকে একটা জাহাজ ডুবে গেছিল না ? তোরা তখন কোথায় ছিলি ?

মিনিবাসে উঠেও আপন মনে হাসছিল বাপ্পা। অনীকের হৃদয়ের ক্ষতটা শুকোয়নি, বারফাট্টাই মেরে জ্বালা জুড়োতে চায় ! অনীকের জামাইবাবুর ভাই অস্ট্রেলিয়া থাকে বলে তো কস্মিনকালে শোনেনি !

টিকুর টিকুর এগোচ্ছে ভিড়ে ঠাসা মিনিবাস। আট মাসে কলকাতায় যানবাহনের গতি যেন আরও কমে গেছে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম পার হয়ে লম্বা জ্যামের পিছনে আটকে গেল। নিথর। অধৈর্য অফিসবাবুরা উঁকিঝুঁকি মারছে জানলা দিয়ে, বিরক্ত হয়ে উঠছে। মন্তব্য শোনা গেল,— আমেরিকান এম্ব্যাসির সামনে আজ র‍্যালি আছে না ?

—কিসের ? কাদের ?

—হবে একটা কোনও পার্টির। লাল নীল হলদে সবুজ।

—গালফ্ ওয়ার নিয়ে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ইরাককে একদম পেড়ে ফেলেছে না।

—শ্যালা ইরাক গভর্নমেন্ট যদি জানত এখানে তাদের এত সাপোর্টার আছে, তাহলে এখান থেকেই লোক ধরে ধরে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিত।

—ইরাককেই তো সাপোর্ট করা উচিত। বাঘের বাচ্চার মতো লড়ছে। ওরা হারলে তেলের দাম

চড়চড় করে বেড়ে যাবে।

—তাতে আপনার কি মশাই ? চড়েন তো মিনিবাসে !

ইত্যাকার শব্দের ফুলঝুরির মাঝে হঠাৎই বাইরে একটা হট্টগোল। পাঁই পাঁই করে লোক ছুটে এল পার্ক স্ট্রিটের দিক থেকে। এক জায়গায় থেমে গেল। জটলা করছে।

বাস থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল,— কী হয়েছে দাদা ?

উত্তরের আগেই আধলা ইট উড়ে এল, ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল একটা জানলার কাচ। যাত্রীরা শিউরে উঠেছে, দুদ্দাড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। আরও ইটের টুকরো ছুটে এল, সশব্দে আছড়ে পড়ছে প্রাইভেট গাড়ির চালে, ট্যাক্সির বনেটে। সে এক বিদিকিচ্ছিরি দৃশ্য।

বাপ্পার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সাধে কি শহরটাকে সে সহ্য করতে পারে না ! একটা কাজও কি এখানে শান্তিতে করা যায় ! কি যে করে ? পাতাল রেল স্টেশনের দিকে ছুটবে ? এসপ্ল্যানেডে নেমে বাকিটা পথ নয় হেঁটেই...। যাবে যাবে করছে, হঠাৎই ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে চারদিক। নির্ঘাত টিয়ার গ্যাসের শেল ছুঁড়ছে পুলিশ। মারাত্মক চোখ জ্বালা করছে। ইচ্ছে অনিচ্ছের পরোয়া না করেই বাপ্পার চোখ জলে ভরে গেল।

তখনই পুরনো একটা দিন এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। সে আর বিষ্ণুপ্রিয়া অন্ধের মতো ছুটছে। বইয়ের দোকানে ঢুকেও লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। নাইট স্কাই কিনে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া...

সব বন্ধুদের ছেড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া কেন বাপ্পাকেই খুঁজেছিল সে দিন !

টিয়ার গ্যাসের শেলই কি বার্তা এনে দিল বিষ্ণুপ্রিয়ার ? বার্তা, না আমন্ত্রণ ? অফিসে নয় কালই যাবে বাপ্পা !

মুহূর্তের জন্য চমকেছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। পরক্ষণেই কপালে ইয়া ইয়া ভাঁজ। চোয়াল শক্ত। টেরচা চোখে তাকিয়েছে,— তুই ! তুই কি মনে করে ?

বাপ্পা বিবর্ণ মুখে হাসল,— এলাম।

—ও। বিষ্ণুপ্রিয়া গটগট করে ঢুকে গেল।

বাপ্পা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভেতরে যাবে, কি যাবে না !

হনহন করে আবার দরজায় এসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া,— তোর কি কিছু বলার আছে ?

বাপ্পা আরও নার্ভাস হয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া কি তাকে দেখে খুশি হল না ? দরজা থেকেই বিদায় করতে চায় ?

থতমত মুখে বলল,— না, নেই। মানে...হ্যাঁ হ্যাঁ আছে।

—তাড়াতাড়ি বল। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

বাপ্পা মিইয়ে গেল,— ভেতরে যেতে বলবি না ?

—আসবি আয়।

বাপ্পার যাওয়ার ইচ্ছে চলে গিয়েছিল। তবু পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরে এসে চেয়ার টেনে বসল,— আমি ছুটিতে এসেছি। সামনের মাসে চলে যাব।

বিষ্ণুপ্রিয়া যেন শুনেও শুনল না। পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বইখাতা গোছাচ্ছে। যেন এটাই এখন ভীষণ জরুরি কাজ।

বাপ্পা কথা খুঁজছিল,— মাসিমা মেসোমশাই কেমন আছেন ?

—ভাল।

—অফিস গেছেন ?

—যাওয়ারই তো কথা।

—আমি এখন এসে পড়াতে তোর কি অসুবিধে হল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দিল না। কটমট তাকিয়ে আছে।

তখনই বাপ্পা ভাল করে নজর করল বিষ্ণুপ্রিয়াকে। গাল দুটো একটু ভরাট হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। মাজা রঙে অল্প চিকন আভা। না মিডি না ম্যাক্সি একটা লতরপতর পোশাক পরে আছে, কেমন যেন পাগলি পাগলি লাগে। পুরুষছাঁট চুল বেশ বড় এখন, মুখ বেয়ে ঝুলছে থোকা থোকা।

চশমার ব্রিজ তুলল বিষ্ণুপ্রিয়া,— হাঁ করে দেখছিস কি ?

—কিছু না। বাপ্পা চটপট মাথা নাড়ল। —মনে হচ্ছে এসে তোকে ডিসটার্ব করলাম...

—করেছিসই তো। বিষ্ণুপ্রিয়া ফোঁস করে উঠল,— এখানে আসার কি দরকার ছিল ? বারো দিন ধরে যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস ঘোর না।

—তুই জানতিস আমি এসেছি ? তবু খবর নিসনি ?

—কেন খবর নেব ? তুই আমাকে গিয়ে চিঠি দিয়েছিস ?

জমানো চিঠিগুলো এখনও খামে ভরা আছে। বাপ্পা একটা শ্বাস গোপন করল। ফিস ফিস করে বলল,— তুইও তো দিসনি।

—বেশ করেছি দিইনি। তুই চলে যা এখান থেকে। বলতে বলতে হঠাৎ বিস্ফোরিত হল বিষ্ণুপ্রিয়া। ড্রেসিং টেবিলের দিকে ছুটে গেছে। পাউডার লিপস্টিক চিরুনি ক্লিপ যা হাতের কাছে পাচ্ছে ছুঁড়ছে বাপ্পার দিকে। টেবিল থেকে বইখাতা নিয়ে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল,— যা বলছি। চলে যা। চলে যা।

উড়ন্ত মিসাইলগুলো দু হাতে আটকানোর চেষ্টা করছে বাপ্পা। নির্বোধের মতো হাসছে,— কী হচ্ছে কী ? কী হচ্ছে কি ? থাম। ...তোকে অনেক গল্প বলার ছিল...জানিস বস্‌ফরাস পার হওয়ার সময়ে সে কী ফগ...সামনে একটা ডুবোপাহাড়...

—চুপ। কে তোর কাছে গল্প শুনতে চায় ! বালিশ তুলে সজোরে বাপ্পার মাথায় আছাড় মারল বিষ্ণুপ্রিয়া। লালচে মুখে ভাঙচুর হচ্ছে ক্রমশ। গলা ভেঙে এল। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। চোখের কোণে কী যেন চিকচিক করছে। জল, না বিদ্যুৎ ?

বালিশ ফেটে পেঁজা তুলোয় ভরে গেল গোটা ঘর। ফাল্গুনের হাওয়ায় ভাসছে তুলো। স্বপ্নের মতো।

৯২

সময় এক উদাসীন স্রোত। মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদ উল্লাস-অবসাদ কোনও কিছুতেই তার কৌতূহল নেই। সে চলে আপন খেয়ালে। জীবন কখনও কখনও থমকে যায়, সময় দাঁড়ায় না। কোথায় কোন এক ইন্দ্রাণী নিজের ঊর্ণনাভে নিজেকে আরও জড়িয়ে নিল, অথবা কে এক আদিত্য রোগশয্যা ছেড়ে সুস্থ মানুষের মতো আবার পথে বেরোচ্ছে, সময় তার কোনও খবরই রাখে না। দেখতে দেখতে বাপ্পার ছুটি ফুরিয়ে এল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেছে তিতিরের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা।

তিতিরের সিট পড়েছে শেয়ালদায়, লরেটো হাউসে। কন্দর্প বা বাপ্পা কেউ এসে পৌঁছে দিয়ে যায় তাকে। আদিত্য আসে টিফিন টাইমে, পরীক্ষা শেষে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তার। দায়িত্বটা সে স্বেচ্ছায়ই নিয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে বাবার সঙ্গে ফিরতে তিতির লজ্জা পায় খুব, আবার খুশিও হয়। মেয়ের খুশিটুকুতেই আদিত্য খুশি।

আজ তিতিরের ইতিহাস পরীক্ষা। টিফিনের পর মেয়ে আবার হলে ঢুকে যেতে রঘুবীরের কাছে গেল আদিত্য।

সম্প্রতি বউবাজারের এক সোনার দোকানে বসছে রঘুবীর। দোকানটা তেমন বড় নয়, তবে অনেক কালের পুরনো, প্রায় আশি-নব্বই বছরের। একসময়ে যখন এ-পাড়ায় নিষিদ্ধ আনন্দের রমরমা ছিল তখন খুব চালু ছিল দোকানটা, এখন অবস্থা পড়তির দিকে। দোকান-মালিক দমদম

নাগেরবাজারে প্রকাণ্ড এক টিভি ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিনের শোরুম খুলেছে, তিন পুরুষের এই কারবারে তার তেমন মতি নেই। তবে ইদানীং গ্রহরত্নের কারবারে ঈষৎ আগ্রহ জন্মেছে তার, কয়েকজন জ্যোতিষীকে এনে বসিয়েছে দোকানে। পিছন দিকে চেম্বার করে দিয়েছে একটা। ছোট্ট, চার বাই ছয়। সন্ধের দিকটা নামী দামি ভাগ্যগণকের জন্য বরাদ্দ, রঘুবীরের ভাগে দুপুর। দুটো থেকে চারটে। খদ্দেরদের কপাল বিচার করা ছাড়াও আর একটা বাঁধা কাজ পেয়েছে রঘুবীর। সহজ কাজ। ভাল-মন্দ মিশিয়ে দৈনিক রাশিফল লিখে প্রতিদিন দোকানের সামনে টাঙিয়ে রাখা। মাস গেলে এর জন্য একটা মাইনে মতো পায়। দু ঘণ্টার চেম্বারে তার খদ্দের আর কত হয়, ওই টাকা কটাই যা লাভ।

আজ রঘুবীরের চেম্বার ফাঁকা নেই, এক মহিলা বসে। বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স। ক্ষয়াটে রূপের মলিন দীপ্তি লেগে আছে মহিলার মুখে, চোখের তলায় কালি, ফর্সা গালে ফুট ফুট বাদামি ছোপ। দরজায় উঁকি দিয়ে ঢুকতে ইতস্তত করছিল আদিত্য, রঘুবীরের ইশারায় পিছনে গিয়ে বসল। চৈত্রের তাপে ঝলসানো শরীর জুড়োচ্ছে আস্তে আস্তে।

রঘুবীরের পরনে গেরুয়া, খালি গা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, সাদা পৈতে কাঁধে ঝকঝক। কাগজে কী সব আঁকিবুকি কাটায় মগ্ন রঘুবীর। হঠাৎ নাক কুঁচকে চোখের কোণ দিয়ে দেখল মহিলাকে,— মেয়ের বয়স কত বললেন যেন ?

—জুলাইয়ে ষোলো পুরবে। তেইশে আষাঢ়।

—হুঁ। রঘুবীর মুখ নামাল। আবার কাগজে চোখ। ইয়া বড় মাথাখানা আপনমনে দোলাচ্ছে। একটু পরে পরিপূর্ণ চোখে তাকাল মহিলার দিকে, আপনার মেয়ের এখন তো কোনও বিবাহের যোগ নেই। অন্তত সাত বছর তিন মাস।

—সাআআত বছর ! মহিলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে,— ওটা একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না ঠাকুর ?

—যায়। তবে সমস্যা আছে।

—কী সমস্যা ?

—সেটা অবশ্য একটা পোখরাজ দিয়ে সামাল দেওয়া যায়। তাতে কিন্তু আপনার মেয়ে সুখী হবে না। মাতার প্রভাব পড়বে। আপনার মেয়ের মাতৃস্থান, মানে চন্দ্রের স্থানও একটু দুর্বল।

—তাহলে ?

—আপনি আগে একটা মুক্তো ধারণ করুন। তিন রতির।

মহিলা কি যেন ভাবছে। আবার কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, আড়ে দেখল আদিত্যকে।

আদিত্য অস্বস্তি বোধ করল। তার কি এখন উঠে যাওয়া উচিত ?

রঘুবীর দাড়ি চুমরে হাসল,— এঁকে দেখে সঙ্কোচ করবেন না। ইনি হলেন আমার গুরুদেবপ্রতিম। ...বলুন আর কি ? পাত্র কেমন হবে জানতে চান ?

মহিলা মাথা নাড়ল।

—আপনার মেয়ের পতিস্থানে বুধের যোগ আছে। ছেলে ভালই হবে।

—গৃহী হবে তো ?

হা হা হেসে উঠল রঘুবীর,— আপনি গৃহী চান ?

মহিলার মুখ আচমকা পাংশু হয়ে গেল।

রঘুবীর হাসি থামিয়ে বলল,— আপনার মেয়ে আপনার চেয়ে অসুখী হবে না এটুকু আমি বলে দিতে পারি। মুক্তো ধারণ করার পর ছ মাস অপেক্ষা করুন, তারপর আমার কাছে আসবেন। মেয়েকেও তখন সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

—সে তো এখানে নেই ঠাকুর।

—জানি। হোস্টেলে আছে। পড়াশুনো করছে।

—কী করে জানলেন ঠাকুর ? আমি তো বলিনি।

রঘুবীর চোখ বুজে হাসল,— কপালের লিখন পড়াই তো আমার কাজ। ...যাক গে শুনুন, মেয়ের পিতা যখন থেকেও নেই, সব ভাবনা আপনার। রত্ন ধারণের সময়ে কার্পণ্য করবেন না। মুক্তোটি কিনুন, আমি শুদ্ধ করে দেব। মন্ত্রধারণের দিন দেহ মন সব শুচি রাখবেন। না হলে হিতে বিপরীত হবে। ....এই দোকান থেকেই কিনতে হবে তার কোনও মানে নেই। তবে এখান থেকে নিলে আমি মুক্তোটি পরীক্ষা করে দিতে পারব। ...অনেক ঠক প্রবঞ্চক তো আছে এই লাইনে...

মহিলা পার্স খুলে একটা কুড়ি টাকার নোট রাখল টেবিলে। ঘুরে গিয়ে রঘুবীরকে প্রণাম করল। আদিত্যরও পায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল, প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠল আদিত্য।

মহিলা চলে গেল।

রঘুবীর হাঁক পাড়ল,— রবি, দুটো চা দিয়ে যাও দেখি। রায়বাবু এসেছেন।

আদিত্য মিটিমিটি হাসছিল,— খুব জপালেন যা হোক ?

রঘুবীর চেয়ারে বাবু হয়ে বসেছে,— আরে রায়দা, এদের হল গিয়ে কাঁচা টাকা। দুইয়ে না নিলে হয়।

—মানে ?

—চেহারা দেখে বুঝলেন না ? আঙুলে একটি চার রতির বৈদুর্যমণি রয়েছে। বৈদুর্যমণি কেন ধারণ করে ?

—কেন ?

—গুপ্ত শত্রু থাকলে... রঘুবীর চোখ টিপল, আর গুপ্ত রোগ থাকলে। কী বুঝলেন ?

—বুঝলাম না।

—মেয়েটা ভাল নয়। ...হাঁটার সময়ে কোমরের দুলুনিটা লক্ষ করেছিলেন ? বাইজি। এখন তো আর ওইসব কত্থক-ফত্থক হয় না, খেমটা নাচে, আর আলু পটলঅলা ধরে। লাইনে নামাবে না বলে মেয়েকে সরিয়ে রেখেছে, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পার করে দিতে চায়।

—আহা রে বেচারা। আদিত্য সামান্য উদাস হল,— যতই হোক মায়ের প্রাণ তো।

—হুঁহ, মায়ের প্রাণ ! রঘুবীরের ঠোঁট বেঁকে গেল,— মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিষ্কণ্টক হয়ে ব্যবসা করতে চায়। ...অত সহজে পার পাওয়া যায় ? পাপ করছিস, একটু ভোগ। মাল খসা।

—ওভাবে বলছেন কেন ? মা'র কত যাতনা বোঝেন ?

—ছাড়ুন তো। মা'র যাতনা ! মা-ফা আমার দেখা আছে। মেয়েছেলেরা সব এক। মা কেমন হয় আমি দেখিনি ?

রঘুবীরের জ্বালাটা কোথায় একটু একটু বুঝতে পারছিল আদিত্য। কোমল স্বরে বলল,— একজনের ওপর অভিমান করে নারী জাতির ওপর আপনি অবিচার করতে পারেন না ভাই। আপনার মাসিও তো মহিলা, নয় কি ?

রঘুবীর পলকের জন্য গুম। তারপর জোরে হেসে উঠেছে,— আপনি মাসি দেখিয়ে আমার দুর্বল করে দিতে চাইছেন ? আরে মশাই, মাসি কপালদোষে আমার সঙ্গে এক জাঁতাকলে পেষাই হচ্ছে। আরে বাবা, সেই ব্যাটা হারামির পো মাসিকে ছেড়ে না গেলে মাসি থোড়াই আমায় আপন বলে ভাবত ! আমার মাসিকে যতটা দরকার ছিল, মাসিরও আমাকে ততটাই দরকার ছিল। আর এটাই হল গিয়ে সম্পর্ক। ঘরসংসার, আপনার লোক, মা বাবা ছেলেমেয়ে সব বোগাস। সব হল গিয়ে দিবে আর নিবে। সব সম্পর্কই তৈরি হয় শুধুই প্রয়োজনে, বুঝলেন ?

আদিত্যর বুকে খুট খুট বাজছিল কথাগুলো। এত চাঁছাছোলাভাবে তো না বললেও হয়। সম্পর্কের ব্যাখ্যা কি এতই নীরস ? সম্পর্কে তো যন্ত্রণাও থাকে, সুখ আনন্দ থাকে, আর থাকে এক অনন্ত হাহাকার। প্রয়োজনের খড়ির গণ্ডিতে তাকে বেঁধে ফেললে মানুষ বাঁচে কী করে ? তাছাড়া সম্পর্কের সংজ্ঞা বোধহয় অত সরলও নয়। ছকে বাঁধাও নয়। না হলে হাসপাতালে আদিত্যর

বেডের পাশে দাঁড়িয়ে বিজলি চোখ মোছে কেন ? ইন্দ্রাণী তাকে কীটাণুকীট ভাবা সত্ত্বেও কেন সম্পর্কের সুতো ছিঁড়তে চায় না ? যে মা'র মুখটাও মনে নেই, কেন তার প্রসঙ্গ উঠলে জ্বলে ওঠে রঘুবীর ?

আদিত্য মিন মিন করে বলল,— আপনি বড্ড নিরাশাবাদী হয়ে যাচ্ছেন রঘুবীরবাবু।

—মোটেই না। প্লাস্টিকের হাত দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছে রঘুবীর, আমি কড়োয়া সচ বলি। আরও কঠিন সত্যি শুনবেন ? মানুষ এই পৃথিবীতে কিস্যুটি নিয়ে আসে না, আবার কোনও কিছুই তার এখানে রেখে যাওয়ার জো নেই। যা যা ভাল কাজ করবে তার ফল এখানেই পাবে। মন্দ কাজ করলে তার সাজাও এখান থেকেই পেতে হয়। কড়ায়গণ্ডায় সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে আপনার ছুটি। মানেন তো ?

—হঠাৎ এ কথা এসে গেল কেন ?

—কারণ ওই যে মেয়েটার দুঃখে আপনার প্রাণ কাঁদল। আরে, খবর নিয়ে দেখুন এককালে কাকে দাগা দিয়ে কার সঙ্গে ভেগে পড়েছিল মেয়েটা। তার জন্য ঘানি টানতে হবে না ? আমার মা ছাড়ান পেয়েছে ? এই যে আমি, পেট পিঠের যন্ত্রণায় সাত দিনে এক দিন কেতরে পড়ে থাকি, সে কি কোনও পূর্ব জন্মের পাপে ?

আদিত্যর আর শুনতে ভাল লাগছিল না। বড্ড মায়ামমতাহীন নির্দয় কথা বলে রঘুবীর। বড্ড বেশি অনুভূতিহীন। মেয়েটা তো জন্মসূত্রেও খারাপ পথে এসে পড়তে পারে। অনেক সময়ে তো ভালবাসার টোপ দিয়েও এদের এনে ফেলে দেয়। জোর করেও তো ধরে আনা হয় কতজনকে। পেটের টানেও আসে কেউ কেউ। রঘুবীর এসব কিছুই বোঝে না। বোঝে না, না বুঝতে চায় না ?

তেতো হেসে রঘুবীর বলল,— সবই তো বুঝলাম চাটুজ্যেমশাই। কিন্তু এত সত্যি জেনে, এত সত্যি বুঝে আপনি করলেনটা কী ? এখানে বসে যে কাজটি করছেন সেটাই তো মিথ্যের বেসাতি।

—মোটেই না। রঘুবীর পিঠ চুলকোনো থামাল। গমগম হেসে বলল,— মিথ্যের ব্যবসা তো আমি করি না। আমি মানুষের কাছে স্বপ্ন বেচি। আশা বেচি। দুঃখ-কষ্ট ভুলবার সুলুকসন্ধান বেচি। মানুষের কপালের সামনে একটা খুড়োর কল ঝুলিয়ে দিই, কলে বাঁধা স্বপ্নটার পেছনে দৌড়য় মানুষ। তার জন্য তারা একটা মূল্য ধরে দেয়।

স্বপ্ন বেচারও কত রকমফের ! দুর্লভের কথা মনে পড়ল আদিত্যর। তিতিরের কাছে শুনেছে সেও নাকি পাঁচ-দশ পয়সায় স্বপ্ন বেচত কচিকাঁচাদের। দুর্লভের স্বপ্নও বানানো, কিন্তু তা মনে আনন্দ দেওয়ার জন্যে, কল্পনার জগতে তুলি বোলানোর জন্যে। আর এই লোকটা নির্জলা মিথ্যে বেচে তাতে স্বপ্নের লেবেল মেরে দিতে চায়।

দোকানের কর্মচারীটা চা এনেছে। ভাঁড় হাতে তুলে চুমুক দিল রঘুবীর। কর্তালি ভঙ্গিতে বলল,— যাক গে যাক, ছাড়েন। আপনার মেয়ের পরীক্ষা কেমন হচ্ছে বলুন।

—ভালই তো হওয়া উচিত। এবার খেটেছে খুব।

—বলছে না কেমন হচ্ছে ?

—মেয়েরা বলে না। আদিত্য অনেকক্ষণ পর সহজ হল। হাসছে,— কলেজে ক্লাসের মেয়েগুলোকে তো দেখতাম, পরীক্ষার পর সবার মুখ বেজার, এদিকে রেজাল্ট যখন বেরোল...

—কলেজে আপনার মেয়ে বন্ধু ছিল ?

—তা ছিল।

—তাদের মধ্যে থেকে একটাকে জপাতে পারেননি ?

—জপাতে আমি কারুকেই পারি না ভাই। এটাই তো আমার মহা দোষ।

—দোষই বটে। রঘুবীর হ্যা হ্যা হাসছে,— তা এই বুড়োবয়সে কি সেই দোষ কাটানোর চেষ্টা করছেন নাকি ?

—কেন ?

—না, মানে আজকাল যা-সব চকরা-বকরা ড্রেস মারছেন !

—ওহ। আপনি আমার সেই চকোলেট রঙের শার্টটার কথা বলছেন ? ওটা আমাকে বাপ্পা দিয়েছে।

—ছেলে ! আপনার তো কপাল খুলে গেল মশাই। আর কি, এবার টেরিটি কেটে, নবকার্তিকটি সেজে, চোখে একটা গগলস হাঁকিয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে ছিপ ফেলে বসে থাকুন।

—যাহ। আদিত্য ভীষণ লজ্জা পেল।

—যা নয়, হ্যাঁ। কাজকর্ম করতে হবে না, এখন থেকে ছেলেমেয়েই খাওয়াবে, বউদিকেও পরোয়া করার দরকার নেই... আপনার তো এখন সুখই সুখ।

আদিত্য ঘাড়ে হাত বোলাল,— কাজ বোধহয় একটা করব।

—ওই অনিলটার সঙ্গে ? রঘুবীরের মুখ বদলে গেল,— কন্ট্রাক্টরি শিকেয় তুলে ওই ফিরিওলার কাজ আপনার মনে ধরল ?

—না না না, অনিল-ফনিল নয়। আদিত্য জিভ কাটল। লাজুক মুখে বলল,— আমি বোধহয় আবার একটা চাকরি করব।

রঘুবীরের ঠিক বিশ্বাস হল না কথাটা। একটু হাঁ হয়ে থেকে বলল,— বোধহয় বলছেন কেন ?

—বাপ্পা চাঁদু ঠিক করছে তো, তাই। দেখা যাক কী হয়। নইলে আপনি তো রইলেনই।

রঘুবীরের মুখটা বিমর্ষ দেখাল। টুক করে একটা বিড়ি বার করে ঘষল তেলোয়। ধরানোর আগে একবার উঠে কিউবিকলের বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে এল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল,— না। আপনার সঙ্গে আমার কাট্টি হয়ে গেল। হাসপাতালে যে মানুষটার সঙ্গে আমি যেচে আলাপ করেছিলাম, সে ছিল আমারই মতো। তফাত, আমি ছিলাম ষণ্ডাগুণ্ডা, আপনি ছিলেন দুবলা। তবে মনটায় আপনার অ্যাডভেঞ্চার ছিল। আমারই মতো। কিন্তু আপনি ছাপোষা গেরস্থ হয়ে গেলে আপনার সঙ্গ আমার ভাল লাগবে কেন ?

—তা কেন ! অবরে-সবরে আমরা একসঙ্গে বসব, একটু খাব-টাব...

—আবার খাবেন ?

—ছেলে বলেছে মাসে দু মাসে এক আধদিন খেলে ক্ষতি কিছু নেই।

—খুব ছেলে ছেলে করছেন ! ছেলে ফিরে এসে আপনাকে বশ করে ফেলেছে দেখছি !

আদিত্য চুপ হয়ে গেল। সত্যিই ছেলের সামান্য মিষ্টি কথা, একটু দরদ কেমন যেন বদল ঘটিয়ে দিয়েছে ভেতরে। একটা অপার স্নেহ, একটা নিঃশর্ত বাধ্যতা টিপটিপ নড়াচড়া করে বুকে। ইন্দ্রাণীর তীক্ষ্ণ কটু বাক্য, হাসপাতালে একটি দিনের তরেও দেখতে না যাওয়া, ফিরে আসার পরেও নিঃশব্দ অবহেলা তাকে যে গভীর আচ্ছন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল তা যেন কেটে যাচ্ছে ক্রমশ। বরং এখন করুণা হয় ইন্দ্রাণীর জন্য। নিজের জেদে ছেলেমেয়েদের হারাচ্ছে ইন্দু।

বাপ্পার ওপর আদিত্যর এই টানটা যে ঠিক কিরকম ! তিতিরের প্রতি আদিত্যর যে ভালবাসা, তার তীব্রতার সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা চলে না। কিন্তু বাপ্পা যেন পরতে পরতে ঘিরে থাকা এক অদৃশ্য মায়া। চিরকাল ছেলের একটু ভালবাসার কাঙাল ছিল আদিত্য, এতদিনে বুঝেছে ছেলে। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া এই সুখটুকু যে কোথায় রাখে আদিত্য !

রঘুবীর ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,— বুঝলাম, আপনি এখন মৌজে আছেন। আমারও আর ভাল লাগে না। কটা টাকা যদি জমাতে পারি, এই খুঁটে খুঁটে খাওয়া জীবনটাকে শেষ করে দেব।

—ওমা, ও কি কথা ! আদিত্য আঁতকে উঠল,— জীবন শেষ করে দেবেন...

—না না মশাই, মরব না। রঘুবীর চাটুজ্যে লড়তে এসেছে, পালিয়ে যেতে নয়। ভাবছি মাসিকে নিয়ে কুলগাছিয়ার দিকে চলে যাব। হাতে কিছু টাকা থাকল, বাড়িখানা বেচেও কিছু এল, মাসি বোনপোর শান্তিতে কেটে যাবে জীবনটা। বলেই ফিক করে হাসল লোকটা, কিন্তু তা হওয়ার নয়, আমি জানি। ...আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে। লোকের কপাল দেখার ছল করতে গিয়ে

কখন যে নিজের কপালটা পুড়ে গেছে ! ওই শান্তি-মাস্তির জীবন বোধহয় আমার পোষাবে না। গাঁয়ে গেলেও হয়তো...

রঘুবীরের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্বের চোরা রেখা ! পাহাড়ের মতো মানুষেরও তবে ভাঙচুর চলে। এই ভাঙচুরের নামই কি বেঁচে থাকা !

রঘুবীরের কাছে আর একটা ক্লায়েন্ট এসে গেছে আজ। বোধহয় জমি বাড়ি বা ব্যবসা সম্পর্কে গণনা করাতে চায়। রঘুবীরের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও বেরিয়ে এল আদিত্য। চৈত্রের রোদ্দুর পড়ে এসেছে খানিকটা, কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরল রাস্তায়। লেবুতলা পার্কে এসে ছায়া দেখে বসেছে। ধুলো মাঠে ফুটবল খেলছে বাচ্চারা, ছোট ছোট ঘূর্ণি উঠছে হাওয়ায়, ক্ষণে ক্ষণে ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যায় মাঠ, আবার স্বচ্ছ, স্বাভাবিক। কৃষ্ণচূড়ার গাছে গাছে আগুন লেগেছে যেন, লাল ফুলকি ঝরে পড়ে মাঝে মাঝে। একটা মজুর মতো লোক নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে ছায়ায়, একটা ঘেয়ো কুকুর তার পাশে গিয়ে বন্ধুর মতো শুয়ে পড়ল। রঘুবীরের রাহু-কেতুর বিচার দেখার চেয়ে এই দৃশ্য ঢের বেশি সুন্দর। ভাল লাগে, বেঁচে থাকাটা সার্থক মনে হয়।

পাঁচটা নাগাদ পরীক্ষার হলের সামনে পৌঁছে গেল আদিত্য। একটু দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই তিতির হাজির। পরীক্ষা আজ 'মন্দ হয়নি' মেয়ের, ঝরনার মতো কলকল করছে।

হাঁটছে দুজনে। মৌলালি থেকে বাস ধরবে।

ক' পা গিয়ে আদিত্য জিজ্ঞাসা করল,— খাবি কিছু ?

—কী খাওয়াবে ? ...আগের দিনের মতো রোল-টোল নয়, অন্য কিছু।

—তুইই বল কি খাবি ?

বাবার হাত ধরে টানল তিতির,— ফুচকা খাওয়াবে বাবা ?

—তাহলে তো আবার উল্টোদিকে ফিরতে হয়।

—চলো না বাবা। কতদিন আমরা দুজনে ফুচকা খাইনি।

ফিরতে গিয়ে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল আদিত্য। শোকেসে একটা গাঢ় মেরুন টিশার্ট ঝুলছে। গায়ে তার টানা টানা হরফে লেখা, রিমেমবার মি।

—তিতির, ওই টিশার্টটা কেমন রে ?

—রঙটা চলেবল্। সাদা দিয়ে লেখাটা ক্যাটক্যাট করছে।

—আমার তো বেশ লাগছে। কিনব ? কিনে ফেলব ?

—ওমা, কেন ?

—তোর দাদার জন্য।

—ফালতু কিনবে কেন ? দাদার কি টিশার্টের অভাব ? এই তো সেদিন নিউ মার্কেট থেকে এককাঁড়ি কিনে আনল।

—তা হোক। আমি নয় একটা দিলাম। পরশু ছেলেটা চলে যাচ্ছে... শ খানেক-শ দেড়েকের মধ্যে হয়ে যাবে না ?

—হতে পারে। বলেই তিতিরের চোখ ছোট,— তুমি টাকা কোথায় পেলে বাবা ?

আদিত্য মুচকি হাসল,— বাপ্পারই টাকা। আমায় দিয়েছিল।

—দাদার টাকায় দাদাকেই... স্ট্রেঞ্জ তো !

টাকা নয়, এ যে কুড়িয়ে পাওয়া ভালবাসা। আদিত্য মনে মনে বলল কথাটা। এই ভালবাসা লেনদেন করাতে যে কী তৃপ্তি !

বাপ্পার ফ্লাইট ছটায়। দমদম থেকে মুম্বাই হয়ে সে চলে যাবে লঙবিচ, সেখানেই এখন অপেক্ষা করছে মার্মেড। তারপর আবার সেই বন্দরে বন্দরে ঘোরা, আবার সেই সাগর-মহাসাগরে ভেসে চলা অবিরাম।

মনটা খারাপ লাগছিল বাপ্পার। শেষদিকে ছুটিটা যেন আলোর গতিতে কেটে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে পরীক্ষা, তবু একদিন বাপ্পার দেখা না পেলে তার মুখে কালবৈশাখীর মেঘ থমথম। বকম-বকম চলছে তো চলছেই। কত কথা যে জমে ছিল দুজনের বুকে, একই কথা কতবার বলল তারা। কিছু না হলেও কমসে কম পনেরোটা সিনেমা দেখা হয়ে গেল। সেলুলয়েডের পর্দায় অরুচি ধরলে হাঁটো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। চলো লেকের পাড় কিংবা গঙ্গার ধার। নদীর কিনারই বাপ্পার বেশি প্রিয়। এখানে বসে অনেক একা সন্ধে কেটেছে বাপ্পার। এখন বিষ্ণুপ্রিয়াকে সেসব কথা গল্প করতে ভারি ভাল লাগে। বিষ্ণুপ্রিয়া কথা দিয়েছে এবার শুধু রাতের আকাশে নয়, দিনের আলোতেও সে কাছাকাছি থাকবে বাপ্পার।

বন্দরের গন্ধ নিয়ে প্রথম যে সীগালটা মার্মেডে এসে বসবে সেটাই হবে বিষ্ণুপ্রিয়া। পাগলি কোথাকার।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে চিঠিগুলো দেওয়া হয়নি। বাপ্পা দিতে চেয়েছিল, বিষ্ণুপ্রিয়াই নেয়নি। বলেছে তারা যখন বুড়ো হবে, পাকা চুল আর বাঁধানো দাঁত নিয়ে দিনরাত খিটিমিটি করবে দুজনে, তখনই ওই চিঠি একটা একটা করে নেবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

আদিত্য ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। সুদীপ ভাইপোর অনারে অফিস ডুব মেরেছে, অ্যাটমকে নিয়ে আদিত্যর সঙ্গে সেও আজ বাপ্পাকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে যাবে। তিতিরেরও যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। উপায় নেই। পরীক্ষা।

মা কাকিমাকে প্রণাম সেরে ডিকিতে ঢাউস সুটকেস দুখানা তুলল বাপ্পা। তিতির ছলছল চোখে তাকিয়ে, তার মাথায় একটা আলগা চাঁটি মেরে নিল,— ঠিকঠাক থাকিস।

সুদীপ ট্যাক্সিতে বসে ডাকছে,— আয় রে। এক ঘণ্টা আগে তোকে রিপোর্ট করতে হবে।

বাপ্পা বলল,— যাই।

ট্যাক্সি ছাড়ছে। ঘুরে গ্রিল বারান্দার দিকে তাকাল বাপ্পা। এই মাত্র বারান্দায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে ছিল মা কাকিমা আর তিতির, মা গেল কোথায়! ট্যাক্সি ছাড়ার আগেই ঘরে ঢুকে গেল!

গলির শেষে ব্যাক করে ট্যাক্সি আবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কাকিমা তিতিরকে হাত নাড়ল বাপ্পা। তখনই মা'র ঘরের জানলায় চোখ আটকে গেছে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে মা। বাইরে বিকেলের আলো, ঘরের ভেতরটা অন্ধকার, ছায়া ছায়া মাকে কী ভয়ঙ্কর একা লাগছে!

একটা অজানা আতঙ্কে, কে জানে কেন, বাপ্পার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

৯৩

—কিরে চাঁদু, একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছিস, অ্যাঁ?

গাড়ির তেলট্যাঙ্কির ঢাকনা হাতে নিয়ে কন্দর্প এদিক-ওদিক তাকাল। পেট্রল পাম্পের সামনের ফুটপাথ থেকে চেঁচাচ্ছে শ্যামল। রাসবিহারীর চা-আড্ডার বন্ধু।

পাম্পের কর্মচারীকে গাড়িতে দশ লিটার তেল দিতে বলে শ্যামলকে হাত নেড়ে ডাকল কন্দর্প। কাছে আসতেই বলল,— একদম সময় পাই না রে।

—হুঁ, সে তো জানি। তুই এখন বিগ স্টার...

—ধুস, স্টার না কচু! তারপর বল, তোদের সব খবর কি? পঞ্চুদা আসছে রোজ? রবিনের টুপি দেওয়ার অভ্যেস কমল?

—সে জেনে তোর আর কি লাভ! তোর কাছে আমরা তো এখন নন-এনটিটি। ...এখনও এই গাড়ি চড়ছিস যে? মারুতি-ফারুতি লাগা।

ঠাট্টার সুর, কিন্তু যেন চাপা ক্ষোভও আছে সঙ্গে। থাকাটা অসঙ্গত নয়। এককালে এই শ্যামলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্টুডিওপাড়া চষে বেরিয়েছে কন্দর্প, পা রাখার মাটি খুঁজেছে, একই

ডিরেক্টরের কাছে একই ভাষায় গলাধাক্কা খেয়েছে দুজনে। যেভাবেই হোক, ছবিটা আজ বদলে গেছে তো! শ্যামল তার চেয়ে কোনও অংশে খারাপ অভিনেতা নয়, চেহারাতে মোটামুটি জৌলুস আছে, কী ভরাট কণ্ঠস্বর, অথচ শ্যামল সেভাবে সুযোগই পেল না। আজকাল অবশ্য স্টুডিও পাড়ায় আসাই ছেড়ে দিয়েছে।

তেল ভরা হয়ে গেছে। ট্যাক্সির ক্যাপ আটকে কর্মচারীকে তিনটে পঞ্চাশ টাকার নোট দিল কন্দর্প। ঘুরে তাকিয়ে বলল,— তুই কী করছিস এখন ?

—আগে যা করতাম। চাকরি। এল ডি থেকে ইউ ডি হয়েছি।

—নাটক করছিস না ?

—সময় পাই না রে।

—সেকি !

—বিয়ে করেছি। যতই নন-এনটিটি হই, সামওয়ানের কাছে স্পেশাল কেউ তো বটে। তাকে অনেকটাই সময় দিতে হয়।

কন্দর্প আহত হল। নাকি আহত ভাব ফোটাল মুখে ? বলল,— বিয়ে করলি, আমাকে জানালি না ? একটা কার্ড ড্রপ করতে পারতিস ?

—আসতিস তুই ?

—খবর দিয়েই দেখতিস যাই কি না।

—ছাড়। শ্যামল মুখে একটা দূরত্ব মাখানো হাসি ফুটিয়ে রেখেছে,— শুনলাম ফ্ল্যাট বুক করেছিস ?

—আমি !

—কেন চেপে যাচ্ছিস বাপ ? সব খবর পাই। ঢাকুরিয়াতে বিশাল ফ্ল্যাট নিচ্ছিস...

—কী যে বলিস না ! ও তো আমাদের নিজেদের বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট হচ্ছে। বাড়ির ছেলে হওয়ার সুবাদে আমারও একটা জুটছে।

—শুনলাম অশোক মুস্তাফি করছে ?

কন্দর্প প্রসঙ্গটা চেপে গেল। কোন কথা কিভাবে পল্লবিত হয়ে ছড়াবে, ঠিক কি! তাদের রাসবিহারীর চা-আড্ডাটা নিন্দুকে ছেয়ে থাকে, সেখানে এর মধ্যেই মুস্তাফির চামচা বলে তার বদনাম রটেছে, আর নতুন কোনও খোরাক জোগানোর মানেই হয় না।

পিছনে একটা গাড়ি তেল নিতে এসে গেছে। হর্ন দিচ্ছে। চটপট দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসল কন্দর্প। ডাকল বন্ধুকে,— আয়। কোনদিকে যাবি ?

সন্ধে নামছে। এদিকে রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়, যানবাহনের ভিড় লেগেই থাকে। আজ ভিড় একটু বেশি, প্রচুর লোক বেরিয়েছে রাস্তায়। চারদিকের দোকানপাটে উৎসব উৎসব ভাব, গান বাজছে কোথাও কোথাও।

মন্থর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল কন্দর্প। কায়দা করে বুকপকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। এগিয়ে দিল শ্যামলকে,— দুটো ধরা। আমাকে একটা দিস।

প্যাকেটটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করল শ্যামল,— এখনও দিশি খাচ্ছিস ? বিলিতি ধরিসনি ?

কন্দর্প অকারণে জোরে হেসে উঠল,— ভাবিস কী বল তো ? আমি কি উত্তমকুমার গোছের কিছু হয়ে গেছি নাকি ? কপাল ভাল, দুটো-একটা চান্স পাচ্ছি, করে খাচ্ছি। লাইনটা তো জানিস। চোরাবালি। আজ আছি কাল ডুবতে কতক্ষণ ? চালবাজির অভ্যেস করে শেষে মরব নাকি !

শ্যামল বুঝি খুশি হল সামান্য। সিগারেট ধরিয়ে বন্ধুর ঠোঁটে গুজে দিল। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দেখছে বন্ধুকে,—কপালে ফোঁটা লাগিয়েছিস কেন রে ? ঠাকুরদেবতায় ভক্তি বেড়েছে খুব ?

—বারে, আজ পয়লা বৈশাখ না ! ... একটা মহরত ছিল।

শ্যামল আবার একটু শক্ত হয়ে গেল। ক্ষণিক চুপ থেকে বলল,— কার বই ? ডিরেক্টর কে ?

—ও তুই চিনবি না। জগদীশ সামন্ত। যাত্রা-ফাত্রা লিখত এক সময়ে। কিছুদিন রুনুবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। ফিলম-টিলমের কিস্যু বোঝে না। প্রোডিউসার পাকড়েছে, ধরে লাইনে নামিয়ে দিয়েছে।

—আর তুইও তার হিরো হয়ে গেলি! কিসের রোল ? গাঁ থেকে শহরে আসা বোকাসোকা নায়ক ? নাকি কোমর নাচানো ধুমধাড়াক্কা প্রেমিক ? নাচ-টাচ শিখে নিয়েছিস ?

কন্দর্প এবার সত্যি সত্যি আহত হল। আয়না থাকলে দেখত পেত পোজটা এবার ভীষণ ন্যাচারাল। অভিমানী সুরে বলল,— লাইনে টিকতে গেলে সব কিছুই করতে হয় রে শ্যামল, অনেক আপোস করতে হয়। মনের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, কনসেন্সের সঙ্গে। চান্স পেলে ভাল রোলও তো আমি করি। তুই আমার বনেদ ছবিটা দেখেছিলি ?

—স্মরজিৎ লাহিড়ির ? তার বই তো এ দেশে রিলিজ হয় না! ও তো ছবি করে ফরেন ফেস্টিভালের জন্য। বিদ্রূপ লেপটে গেল শ্যামলের মুখে, শালা প্রগতিবাদের নামে দেশের পভার্টি বেচে খাচ্ছে! যাদের নিয়ে ছবি করে তারা ওর ছবি দেখতে সিনেমাহলে মুততেও আসে না। শালা সল্টলেকে কী ঘ্যামা একটা বাড়ি বানিয়েছে! গরিবি বেচে বেচে! একেই বলে শালা কপাল। যার ফুটপাথেও জায়গা হওয়ার কথা নয়, সুড়সুড়ি মেরে মেরে সে ব্যাটা ইন্টারন্যাশনাল আঁতু বনে গেল!

শ্যামলের ব্যঙ্গের লক্ষ্যটা কে, কন্দর্প সঠিক বুঝতে পারছিল না। স্মরজিৎ লাহিড়ি, না তার বইতে অভিনয় করা কন্দর্প ? স্মরজিৎ সম্পর্কে শ্যামলের ধারণাটা খুব ভুল নয়, তবে লোকটা ফিলম বোঝে, তাকে দিয়ে কাজও করিয়ে নিয়েছে সুন্দর করে। শ্যামলের কথার ঝাঁঝে বোঝা গেল না ছবিটা সে আদপেই দেখেছে কিনা। সত্যি সত্যি হলে রিলিজ করেনি তা তো নয়, দু হপ্তা তো চলেছিল।

আনোয়ার শা রোডে পড়তে শ্যামল বলল,— আমাকে নবীনার সামনে নামিয়ে দে।

—বাড়ি ফিরছিস এখন ?

—বললাম না, তার জন্য এখন আমাকে অনেক সময় দিতে হয়। শী ইজ ক্যারিইয়িং।

—বাহ, এ তো ভাল খবর। বাঁ দিক ঘেঁষে কন্দর্প গাড়ি দাঁড় করাল।

শ্যামল নামতে গিয়েও থমকেছে,— যাবি নাকি আমার বাড়িতে ?

কন্দর্প আলগোছে মাথা নাড়ল,— নারে, আজ থাক।

—চল না। আমার বউ-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। বিয়ের খাওয়াটা মিস করেছিস, সে দুঃখটাও ঘুচিয়ে দেব ...।

—থ্যাংক ইউ, আজ থাক রে। রিয়েলি এখন আমার একটা আরজেন্ট কাজ আছে। লেক গার্ডেনসে। আই অ্যাম টু মিট সামওয়ান। অলরেডি আমি লেট।

শ্যামল ফিচেলের মতো হাসল,— কেন তোকে নেমন্তন্ন করিনি, বুঝেছিস ? ... মাঝে মাঝে আমাদের রাস্তাঘাটে দেখা হবে, তুই আমায় একটু গাড়ি চড়িয়ে দিবি, দু-দশ মিনিট গল্প করবি, এই ভাল। চলি রে।

দু-এক সেকেন্ড হতবুদ্ধি বসে থেকে গাড়ি স্টার্ট দিল কন্দর্প। কেউ একটু নাম করে গেলে পুরনো লোকজন ভাবে তার বুঝি একটা লেজ গজিয়ে গেছে। সে যাই করুক, ভাববে দেমাকে মটমট করছে। শ্যামল তো অনেক দিন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে, সে পর্যন্ত ...। কেউ বোঝে না। কাজ থাকলে যে কন্দর্পকে কাজটা সময়ে করতেই হবে। বাপ্পা যাওয়ার দিন কন্দর্প রইল না বলে ঠোঁট ফোলাল তিতির, কথা শোনাল রুনা। ভাইপো চলে যাচ্ছে বলে শুটিং ক্যানসেল করে দিতে পারে কন্দর্প ? হয় তা ? এই মুহূর্তে অশোক মুস্তাফির কাছে যাওয়াটা তার কর্তব্যের অঙ্গ, ফি বছরের মতো সে লোকটার অফিসে সকালে যেতে পারেনি, এ কথা বোঝালেও শ্যামল বুঝবে ? তুই নিজে কিছু করে উঠতে পারিসনি সেটা কার দোষ ? তোর উদ্যোগ কম, লেগে থাকার ধৈর্য নেই, এ কথা খোলাখুলি মেনে নে। তা নয়, শুধুই হিংসে! বন্ধুর সাকসেসটাই শুধু দেখলি, অধ্যবসায়টা দেখেছিস ? কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় তার খবর রাখিস ? ফালতু কমপ্লেক্স।

ভাবতে গিয়ে কন্দর্প হঠাৎ ঠোক্কর খেল একটা। সে নিজে মুস্তাফির সঙ্গে লাইন করেছে, শ্যামলকেও তো অনায়াসে তার কাছে নিয়ে যেতে পারত, যায়নি কেন ? যেচে প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে আনতে চায় না, তাই ? এটা বুঝি কমপ্লেক্স নয় ?

চোরকাঁটাটা লেগেই রয়েছে বুকে। একটু বিস্বাদ মনে মুস্তাফির লেক গার্ডেন্সের ফ্ল্যাটে এল কন্দর্প। বচ্ছরকার দিন মুস্তাফি এখানেই রাতটা কাটায়।

মণিকা দরজা খুলেছে। পরনে ঢোলা ঢোলা কাফতান, শ্যাম্পু করা ফোঁপানো চুল হাওয়ায় উড়ছে। মিষ্টি হেসে বলল,— আরে কন্দর্পদা, আপনি !

কন্দর্প বিশেষ অবাক হল না। মাস কয়েক হল মণিকা মাঝে মাঝেই মুস্তাফির ফ্ল্যাটে থাকে রাতে, জানে কন্দর্প। জিজ্ঞাসা করল,— অশোকদা নেই ?

—আছে। ফোন করছে। আসুন না।

রীতিমাফিক কার্পেটে গ্লাস বোতল। থেবড়ে বসতে বসতে কন্দর্প লক্ষ করল তিনটে নয়, পাঁচটা গ্লাস রয়েছে আজ। একটা নয় মণিকার, কিন্তু আরও একটা বাড়তি কেন ? আবার কোনও নতুন বিজনেস ফাঁদছে অশোক মুস্তাফি ?

মণিকা ভেতরে যেতে গিয়ে দাঁড়াল,— গরম গরম ফিশ চপ ভাজছি কন্দর্পদা, খাবেন তো ?

—ও শিওর।

—সঙ্গে সস, না মাস্টার্ড ?

—সসই ভাল। না না মাস্টার্ড। কন্দর্প হেসে ফেলল,— দুটোই দাও।

নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে গেল মণিকা। মনে মনে হাসি পাচ্ছিল কন্দর্পর। শয্যাসঙ্গিনীদের হাতের রান্না খেয়ে কি বিশেষ কোন সুখ পায় অশোকদা ? নাকি অপারিবারিক ফ্ল্যাটে একটা পরিবার পরিবার ভাব আনতে চায় ?

বিশাল হলঘরের কোণে বসে টেলিফোনে কথা বলছে মুস্তাফি। কন্দর্পকে দেখে একবার আঙুল নাড়ল, কথা বলে চলেছে নিচুগ্রামে।

হঠাৎ স্বর চড়ে গেল। একেবারে নীচের সা থেকে ওপরের সা। কাকে ধমকাচ্ছে অশোকদা ? চোখা চোখা শব্দ বুলেটের মতো ছিটকে ছিটকে এল। ... ইউ ডার্টি বীচ ! ... আই উইল টিচ ইউ আ লেসন ! ... ভাব কী তুমি, তোমার বিষদাঁত আমি উপড়ে নেব ! ...

ঘটাং রিসিভার নামিয়ে রাখল মুস্তাফি। দু আঙুলে রগ টিপে বসে আছে। মণিকা একবার সভয়ে উঁকি দিয়ে চলে গেল। কন্দর্প হতবাক।

লুঙ্গি পরা মুস্তাফি ধীরে ধীরে উঠল, কার্পেটে এসে বসেছে। সিগারেট ধরাল। গ্লাস তুলে চুমুক দিল অল্প। প্রায় গোটা সিগারেটটা ঘষে ঘষে নেবাল, দুমড়ে মুচড়ে ঢুকিয়ে দিল ছাইদানে।

হিম হিম গলায় বলে উঠল,— তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। নইলে আমিই তোমায় ডেকে পাঠাতাম।

—নববর্ষের দিন আপনার সঙ্গে একবার দেখা করব না, এ হয় ? মহরতের পরে খাওয়া দাওয়ায় আটকে গেলাম, সেনবাবু ছাড়লেন না, নয়তো আপনার অফিসেই ...

—হুম। আরেকটা সিগারেট ধরাল মুস্তাফি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঠোঁট টিপল,— তুমি আজকাল অনেক ল্যায়েক হয়ে গেছ।

কন্দর্প একটু ঘাবড়ে গেল। কার না-কার সঙ্গে ঝগড়া করে তার ওপর ঝাল ঝাড়ছে কি অশোকদা ? ঢোক গিলে বলল,— এ কথা কেন দাদা ?

—কেন কি, তুমিই আমার সর্বনাশ করে ছেড়েছ। তোমার ভ্যানতাড়ার জন্যই ...

—আমি কী করলাম ? কন্দর্প হাঁ।

—বাবুরামের সঙ্গে পার্টনারশিপে তোমায় ব্যবসায় নামতে বলেছিলাম ? বলেছিলাম, কি বলিনি ?

—হ্যাঁ ... কিন্তু ... আপনি তো জানেন দাদা আমার সিচুয়েশানটা। সময় দিতে পারব না,

দেখাশুনা করতে পারব না। মোরওভার এই উঠতির সময়ে একটা মদের দোকান খুললে ...

—হ্যাঁ, তোমার কাছে তো আবার হিরো হওয়াটা আগে। সিচুয়েশান দেখাচ্ছ, অ্যাঁ ? মুস্তাফির গলা একটু চড়ল, আমি তোমায় পর্দায় না ফেললে ওই থোবড় কেউ চিনত কোনওদিন ?

মণিকা ফিশ চপের প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। কন্দর্পর কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল,— আমি যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এ কথা কি কখনও অস্বীকার করেছি ?

—গান গেয়ো না। মুস্তাফি আড়ে মণিকাকে দেখল একবার, ইশারায় প্লেট নামিয়ে রেখে চলে যেতে বলল। গেল না মণিকা, খানিক তফাতে গিয়ে সোফায় বসেছে। মুস্তাফি গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল,— ফোনে কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল জানতে চাইলে না ?

কন্দর্প চুপ করে রইল। অশোক মুস্তাফি রেগে থাকলে কৌতূহল প্রকাশ করতে তার সাহস হয় না, এ কথা শুনলে কি খুশি হবে অশোকদা ?

মুস্তাফি গরগর করে উঠল,— তোমাদের ঋতুশ্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ডু ইউ নো ওই বীচটা আমার কী করেছে ? আমার ছেলেটার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে। পরশু বাবুরামকে নিয়ে একটা রিসর্টে ফুর্তি করতে গিয়েছিল। ডায়মন্ডহারবারের রাস্তায়। শুধু পরশুই নয়, লাস্ট ওয়ান মানথে এই ঘটনা চারবার ঘটেছে। কাল বাবুরামকে ধরলাম, সে বলে ঋতু আমার রক্তে মিশে গেছে বাবা। ওকে বিয়ে করতে চাই! ভাবতে পারো, একটা নষ্ট মেয়েছেলে ... বলতে বলতে মণিকার দিকে তাকাল মুস্তাফি,— তুড়ি মারলে যার-তার সঙ্গে শুয়ে পড়ে, সে হবে আমার পুত্রবধূ!

এই তবে ব্যাপার! কন্দর্প মিউ মিউ করে বলল,— কিন্তু ঋতুর সম্পর্কে তো তেমন কোনও বদনাম শুনিনি!

—হোয়াট ননসেন্স! এতক্ষণে ফেটে পড়ল মুস্তাফি,— এ লাইনের সব মেয়ে সমান। ওই যে বসে আছে, আমি যদি হুকুম করি এক্ষনি ও কাপড় খুলে দাঁড়িয়ে যাবে। তুমি আমাকে মেয়েছেলে চেনাচ্ছ, অ্যাঁ ?

কন্দর্পর কান লাল হয়ে গেল, আগুন বেরোচ্ছে। মণিকার দিকে তাকাতে পারল না। কী ভাবে নিজেকে লোকটা! যাদের সঙ্গে ওঠাবসা, যাদের কাছ থেকে সব সুখ আনন্দ নিংড়ে নেয়, তাদের মানুষ পর্যন্ত জ্ঞান করে না! মণিকারা যদি চরিত্রহীন হয়, তাহলে এই ভাল্লুকটা কি ?

ঝাঁ করে কন্দর্প বলে উঠল,— এ রকম একটা জেনারেল মন্তব্য করা ঠিক নয় অশোকদা। স্টুডিও পাড়ায় তো আমার কম দিন হল না, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ঋতু খুব সাচ্চা মেয়ে। অ্যাটলিস্ট আপনি যা বলছেন তা নয়।

—চোপ। একটা কথা নয়। জানো, কী আস্পর্ধা, মেয়েটার! ইম্যাজিন করতে পারো আমায় কি বলল ? চামড়ার বক্‌লস্ কিনে দেব, ছেলেকে গলায় পরিয়ে বেঁধে রাখবেন। আপনি কার সঙ্গে শোন তাই নিয়ে আমি মাথা গলাই না, আপনিও আমার পারসোনাল ব্যাপারে ছড়ি ঘোরাতে আসবেন না! আই উইশ আই কুড কিল হার।

কন্দর্পর শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মোক্ষম জবাব পেয়েছে মুস্তাফি। লোকটা ভাবে টাকা ছড়িয়ে যাকে যেভাবে খুশি অসম্মান করা যায়।

অনেকটা রাগ উগরে একটু যেন থিতু হয়েছে মুস্তাফি। গোঙা গলায় বলল,— শোনো, যদি তোমার এতটুকু কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, ডু সামথিং ফর মি। এটাই হাই টাইম। তোমার দাদার চাকরির একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। একটা নতুন কোম্পানি ফ্লোট করছি, শেয়ার কেনাবেচার। তোমার দাদাকে দেখে মনে হয় তোমার মতোই বিশ্বাসী হবে, চুরিচামারি করবে না, ওঁকে ওখানেই ফিড করে দেওয়া যাবে। বাট অন ওয়ান কন্ডিশান। তুমি তো বাবুরামের কোনও দেখভালই করলে না, এবার কাজটা তোমায় করতেই হবে। ওই মেয়েছেলেটার ক্লাচ থেকে আমার ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে।

কন্দর্প আকাশ থেকে পড়ল,— আমি কী করে করব ?

—সে তুমি জানো। আমি তোমাকে লাগিয়ে দিলাম, এবার তুমি ভাব কী ভাবে কী করবে। ফ্লার্ট করো। আমি জানি ওই হারামজাদী তোমায় খুব পছন্দ করে। ভজিয়ে-ভাজিয়ে বিয়ে করো, তারপর চার-ছ মাস বাদে ছেড়ে দেবে। বাট আই ওয়ান্ট দা জব টু বি ডান।

কান থেকে আগুনটা এবার কন্দর্পর মাথায় ছড়িয়ে গেল। একটু একটু করে পূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়েছে মুস্তাফি। লোকটার কাছে সিনেমায় একটা চান্স চাইতে গেল, বিনিময়ে বাড়ি ভাঙার ঠিকাদারি চাইল লোকটা। সুতো ছেড়ে বসে রইল, ঠিক কব্জা করে নিল এক সময়ে। কন্দর্পকে একটা সুযোগ করে দিয়ে তাকে পোষা কুকুর করে রাখতে চাইল। কেন রে, আমি কি তোর ছেলের মাসমাইনে করা দারোয়ান ? তোর কালো টাকার জিম্মাদার ? সুগন্ধী বিরিয়ানির প্লেট সাজিয়ে আত্মাকে কিনে নিতে চাস তুই ? ধাপে ধাপে এগোয় ! এখন কন্দর্পকে নোংরা দালাল বানাতে চায়। এ রকমটাই হয় বোধহয়। জো-হুজুর শিল্পীর বোধহয় এটাই পরিণতি।

নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছিল কন্দর্পর। এই লোকটার ছায়ায় থেকে থেকে ছায়াটাই গ্রাস করে নিয়েছে তার সত্তাকে। এই হাঙর-কুমির-শেয়াল-ভাল্লুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঋতুশ্রী যা বলে দিতে পারে, সেটুকুনিও কি বলার ক্ষমতা নেই কন্দর্পর !

ঘাড় ফিরিয়ে সোফার দিকে তাকাল কন্দর্প। মণিকা নেই, উঠে গেছে।

ওই অসহায় মেয়েটা প্রতিবাদ না করতে পারুক, অন্তত লজ্জা পেতে জানে। কন্দর্প কি ওর চেয়েও হীন দশায় আছে ? একবার অন্তত মনের আড় ভাঙা দরকার। অন্তত একবার।

কন্দর্প শান্ত স্বরে বলল,— সরি অশোকদা, পারলাম না। আপনি বরং আমার থেকেও স্পাইনলেস কাউকে ট্রাই করে দেখতে পারেন। রূপেন-টুপেনকে বলে দেখুন না। ঋতু যদি ওদের কাউকে পছন্দ করে।

মুস্তাফির কুতকুতে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, তুমি জানো কি বলছ ? তোমার মতো একটা পাখা-ওঠা-পিঁপড়েকে টিপে মারতে আমার সাতটা দিনও সময় লাগবে না। মনে রেখো, তোমরা এখনও ফ্ল্যাটে এনট্রি পাওনি। হাজার একটা ঝামেলা বাধিয়ে দুটি বছর কনস্ট্রাকশান স্টপ করে দিতে পারি। আই হ্যাভ দ্যাট পাওয়ার !

নাফা ছেড়ে দেবে লোকটা ! হাহ। মহীনবাবুর ছুরি চমকানো দেখা হয়ে গেছে কন্দর্পর। হেসে বলল,— আপনি কিচ্ছু পারবেন না। আয়নায় নিজেকে দেখেছেন ? রাগলে আপনাকে একটা ভাঁড়ের মতো লাগে। ওই মেয়েটা, মণিকা, আপনার দুর্গন্ধে সারা রাত বমি করবে। চলি। নববর্ষের সন্ধেটা বেশ কাটল।

ফ্ল্যাটের বাইরে এসে বিশাল বড় একটা নিশ্বাস ফুসফুসে ভরে নিল কন্দর্প। অবরোধটা সরে গেছে, মুছে গেছে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। এক্ষুনি মধুমিতার কাছে যেতে হবে। আত্মায় পুরু শ্যাওলা জমে গিয়েছিল, তাই কি মধুমিতাকে নিয়ে এত দোলাচল ছিল এতদিন।

নীচে নেমে কন্দর্প গাড়িতে স্টার্ট দিল। ছুটছে পক্ষীরাজ।

অনেক অনেক রাতে সেতার নিয়ে বসেছে কন্দর্প। ইমন কল্যাণ বাজাচ্ছে। বিলম্বিত পেরিয়ে দ্রুত ধরেছে। আলাপ থেকে ক্রমে ক্রমে ঝালায় পৌঁছে গেল। অস্থির মেজরাফ আলোড়ন তুলছে তন্ত্রীতে। বাড়ির প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি দরজায়, জানলায়, মেঝেতে, আসবাবে অনুরণিত হচ্ছে ধ্বনি। আনন্দের রেণু প্লাবিত করে দিল রাতের বাতাস।

সহসা কন্দর্পর ধ্যান ভাঙল। আধভেজা দরজার ওপারে ছায়া !

কন্দর্প বাজনা থামাল,— কে ? তিতির ?

সাড়া নেই।

—কী হল, কিছু বলবি ?

দরজায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল কথাটা।

বিছানায় সেতার নামিয়ে দরজায় এল কন্দর্প,— বউদি তুমি ! ঘুমোওনি ?

ইন্দ্রাণীর মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে যেন ছায়ামানবী বলে ভ্রম হয়।

—কী বলছ বউদি ?

—তুমি এত রাতে ইমন কল্যাণ বাজাচ্ছ কেন ? ইন্দ্রাণীর গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা শোনাল।

—দোষ কী ?

—ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ভুলভাল রাগ বাজাতে নেই চাঁদু।

ছায়ামানবী সরে গেল।

৯৪

শায়িত রুগীর পেটের ওপর দিকে আলগা চাপ দিল শুভাশিস,— লাগছে ?

মধ্যবয়স্ক হাটুরে মানুষটার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল,— উইফফ্।

শুভাশিসের হাত আর একটু নীচে সরল,— এখানে ?

—অতটা নয়।

—এখানে ?

—ননা।

—জিভ দেখি। উঁহু, ওইটুকু নয়। পুরোটা। অ্যাঅ্যাঅ্যা।

মোটা সাদা সর পড়া জিভ বেরিয়ে এল।

—হুম। উঠে বসুন।

শুভাশিস চেয়ারে ফিরল। এই সেদিনও শিবসুন্দর যে চেয়ারে বসতেন সেই চেয়ারে। মাস দুয়েক হল মাধবপুরের চেম্বারটা আবার চালু করেছে শুভাশিস, এক রবিবার ছাড়া নিয়ম করে এসে বসছে এখানে। ভোর ভোর রামদেওকে নিয়ে কলকাতা ছাড়ে, সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছে যায়। আধ ঘণ্টাটাক জিরিয়ে নিয়ে শুরু হয়ে যায় রুগী দেখা। আজ তার এই চেম্বারে পঞ্চম দিন।

শুভাশিস প্যাড টানল,— এমন ব্যথা আগে কখনও হয়েছে ?

—হয়েছে দু-এক বার। তবে ঠিক এরকম নয়।

—কী রকম ?

—সে হল গিয়ে কুনকুনে ব্যথা। এ যেন একেবারে বিষফোঁড়া চরকি খাচ্ছে। কাল থেকে কিছু মুখে তুলতে পারিনি ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করেন। যা খাই বমি হয়ে যায়।

মামুলি গ্যাসের পেইন। মাত্রা একটু বেশির দিকে, তবে আলসার-ফালসার হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রেসক্রিপশান লিখে তুফানের দিকে বাড়িয়ে দিল শুভাশিস। তুফানই রুগীদের বুঝিয়ে দেয় কিভাবে কখন কোন ওষুধটা খেতে হবে। আনুষঙ্গিক পথ্যের নির্দেশও তুফানই দেয়, শিবসুন্দরের সঙ্গে থেকে থেকে সে অনেক কিছু শিখে গেছে।

পরের রুগীর জন্য ঘন্টি বাজিয়ে ঘড়ি দেখল শুভাশিস। একটা বাজতে দশ। এখনও বাইরে জনা তিন-চার বসে, উঠতে উঠতে আজ দেড়টা বেজে যাবে। প্রথম এক-দুটো রবিবার চেম্বার বলতে গেলে প্রায় ফাঁকাই ছিল, গত দিন থেকে রুগী সমাগম বেড়ে গেছে অনেক। কারণটা কী ? শিব ডাক্তারের ছেলে বসছে বলে ? নাকি কলকাতা থেকে মারুতি হাঁকানো বড় ডাক্তার আসছে, তাই ? কে জানে !

শুভাশিস আজ একা নয়। টোটোর উচ্চ মাধ্যমিকের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা গত বুধবার শেষ

হয়েছে, সে আর ছন্দাও আজ এসেছে মাধবপুর। রুগী দেখতে দেখতে টোটোর গলা শুনতে পাচ্ছিল শুভাশিস। টুকির সঙ্গে কি যেন খুনসুটি করছে ছেলে, হাসছে জোর জোর। কলকাতায় আজকাল টোটোর এই উচ্ছ্বাস বড় একটা দেখাই যায় না, অথচ মাধবপুরে এলে সে যেন আগের মতো ছেলেমানুষ হয়ে যায়। মাধবপুরের বাতাসে কি কোনও জাদু আছে ? কে জানে !

শেষ রুগীটিকে পার করে শুভাশিস সিগারেট ধরাল। ভারী ক্লান্ত লাগছে। কাল রাতে ভাস্করের বাড়িতে পার্টি ছিল, অনেক রাত অবধি প্রমত্ত হইহুল্লোড় হয়েছে, পর্যাপ্ত ঘুম হয়নি, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে কেমন। গাড়িতেও যে একটু চোখ বুজে নেবে তার উপায় আছে ? পথের যা হাল ! এই খানা, এই খন্দ ! পিঠ কোমর খসে যাওয়ার দশা। এক দিন যাতায়াত করেই গাড়ি গ্যারেজে পাঠাতে হয়। কেন যে আবেগের ঝোঁকে তুফানের কথায় রাজি হয়েছিল ? সারা সপ্তাহ গাধার খাটুনি খেটে এতটা রাস্তা ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে নিয়মিত আসা কি সোজা কাজ ? নাহ, খেয়ে উঠে ঘণ্টা দুই গড়িয়ে নিতে হবে।

তুফান বাক্স খুলে টাকা গুনছে। বেশির ভাগই দশ টাকা বিশ টাকার নোট। পাঁচ টাকাও আছে। টাকাগুলো সাজিয়ে গার্ডারে বাঁধল। খুশি খুশি মুখে বলল,— আজ বেশ ভালই হয়েছে দাদা।

—কত ? শুভাশিস চোখ কুঁচকোল।

—একশো পঁচাশি। বাবার সময়ে এরকমই আসত। বাক্স বন্ধ করে চেম্বারের কোণে রেখে দিল তুফান। উঠে জানলা বন্ধ করতে করতে বলল,— চেম্বারটা তাহলে জমে গেল, কি বলো ?

কথাটায় শুভাশিস মোটেই উদ্দীপ্ত হল না। তার মাত্র দুটো পেশেন্টেই এর থেকে বেশি পয়সা আসে। এই সামান্য টাকা নিয়ে ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করার এতটুকু ইচ্ছে ছিল না শুভাশিসের, সে চেয়েছিল এটা বরং একটা দাতব্য চিকিৎসালয় হোক। তুফান আপত্তি তুলল। বলল,— বিনে পয়সায় চিকিৎসা তো বাবাই করতে পারত দাদা, কিন্তু করেনি। টাকার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও করেনি। প্রথাটা কি উঠিয়ে দেওয়া উচিত হবে দাদা ? বাবা বলত, বিনে পয়সার ডাক্তারদের ওপর লোকে তেমন ভরসা করতে পারে না রে তুফান।

সত্যি সত্যি বাবা এ কথা বলত কিনা কে জানে ! হয়তো বাবার নাম করে নিজেদের সংসার খরচের টাকাটা তুলে নিচ্ছে তুফান। জানে দাদা এ টাকা ভুলেও ছুঁয়ে দেখবে না। অথচ মুখ ফুটে দরকারের কথাটা বললে এর থেকে বেশি টাকা তো মাসে মাসে পাঠিয়েই দিতে পারে শুভাশিস।

ছি ছি, এ সব কী ভাবনা ! শুভাশিস ধমকাল নিজেকে। তুফান অলকা যে মা'র এত সেবাশুশ্রূষা করছে, ডানা মেলে আগলে রেখেছে মাকে, তার কোনও বৈষয়িক মূল্য নেই ? সে তো শুধু মাসে দু দিন মা'র শারীরিক চেক-আপ করেই খালাস, তুফান-অলকাই তো.....। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তুফান কটা টাকা নিয়েছে শুভাশিসের কাছ থেকে ? মা'র খরচা বলে শুভাশিস তো টাকা দিতে গিয়েছিল, তুফান নিল এক পয়সা ? সবিনয় জানিয়ে দিল, তোমার কাছ থেকে তো টাকা নিতে হবেই দাদা, যখন লাগবে ঠিক চেয়ে নেব ! তুফান চালাচ্ছেই বা কী করে ? মা'র খরচ তো কম নয় ! ওষুধ-বিষুধ মিলিয়ে মাসে আট ন'শো টাকা তো হবেই। তবে কি বাবার সঙ্গে তুফানের কোনও জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট ছিল ? যথেচ্ছ টাকা তুলছে সেখান থেকে ?

ছিহ, আবার সেই বিশ্রী ক্লিন্নতা। শুভাশিস আবার ধমকাল নিজেকে। মাধবপুরে এলেই কেন এসব কূটচিন্তা আসে মাথায় ? মাধবপুরের বাতাসে কি বিষ আছে ? একই বাতাসে বিষ আর জাদু মিশে থাকতে পারে ? হয়তো পারে। কে জানে !

কিংবা হয়তো এও হতে পারে মা'র জন্য যে এত করছে তুফান, এটা মনে মনে মেনে নিতে পারছে না শুভাশিস। মাঝে মাঝেই একটা চিন্তা বঁড়শির মতো বেঁধে তাকে, সুতীক্ষ্ণ হুল হয়ে খোঁচা দেয়, কীট হয়ে দংশন করে। মনোরমা কার মা ? তুফানের, না শুভাশিসের ? তার কর্তব্য তুফান যেচে করছে বলেই কি সে তুফানকে মনে মনে..... ?

সিগারেট অ্যাশট্রেতে নিবিয়ে শুভাশিস তেতো গলায় ডাকল,— তুফান.....

শিবসুন্দরের কাচের আলমারিতে ঝাড়ন বোলাচ্ছে তুফান। ঘুরে তাকাল,—কিছু বলছ দাদা ?

শুভাশিস মাথা ঝাঁকাল,— নাহ। চল, চান-টান সেরে খেতে বসি।

—হুঁ, চলো। তুফান দরজার কাছে গিয়েও ফিরে এল,— তোমায় একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

—কী কথা ?

—পুকুরধারে তো অনেকটা জায়গা পড়ে আছে, তুমি যদি অনুমতি দাও ওখানে আমি একটা পোলট্রি খুলতে পারি।

—হাহ, অনুমতি দেওয়ার কী আছে ! এ বাড়িতে তোর কি কম অধিকার !

—ওটা তো কথার কথা। তুমিই সব দাদা।.... তোমার তাহলে আপত্তি নেই ?

—বিন্দুমাত্র না। উঠে তুফানের পিঠে হালকা চাপড় দিল শুভাশিস,— হঠাৎ পোলট্রি খোলার বাসনা হল ?

—কিছু তো একটা করতে হবে। এই বয়সে কি আর চাকরি জুটবে আমার ? লেখাপড়াতেও তো আমি তেমন....

—একটা মাস্টারি-ফাস্টারি দ্যাখ না। সেকেন্ডারি স্কুলে না হয় প্রাইমারি স্কুল-টুলে। যেমনই হোক, তোর একটা গ্র্যাজুয়েশানের ডিগ্রি তো আছে।

—কী যে বলো না দাদা ! তুফান লাজুক হাসল, কত আচ্ছা আচ্ছা ছেলে একটা মাস্টারির জন্য ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে। ষাট-সত্তর হাজার টাকা সেলামি না দিতে পারলে আজকাল আর কেউ কলকে পায় না। তাও পার্টির ব্যাকিং চাই, ওমুক চাই, তোমুক চাই। এই তো, দুধগঞ্জ সেকেন্ডারি স্কুলে কী কেচ্ছাটাই না হয়ে গেল। সিঙ্গুর থেকে একটা ছেলে ইন্টারভিউ কল পেয়ে এসেছিল, কোয়ালিফায়েড ছেলে, ইতিহাসে এম. এ, হাই সেকেন্ড ক্লাস, স্কুলেরই সেক্রেটারি লোক দিয়ে পিটিয়ে তাকে আউট করে দিল।

—তাই ! কেন ?

—এখন এরকমই চলছে দাদা। হয় মাল ফেলো, নয় পার্টি শো করো, ওসব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ-টেক্সটেঞ্জ চলবে না।

—গাঁয়ে-গঞ্জেও এই অবস্থা ?

—সর্বত্র। তোমাদের শহরের তাও একটু পালিশ-টালিশ আছে। এখানে বলম যস্য ফলম তস্য। তার চেয়ে আমার বাবা মুরগির ব্যবসাই ভাল। মুরগিরাও দানা খুঁটে খাবে, আমারও ভাত জুটে যাবে। অলকার এক কাকার পোলট্রি আছে, অলকা এসব মোটামুটি জানে বোঝে। আমিও একটু-আধটু....তুফান একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল,— আর একটা প্রবলেম আছে দাদা। সেটাও তোমাকেই সলভ করতে হবে।

—কী ?

—টাকা। ক্যাপিটাল। মূলধন। আমার যা জমানো আছে তাতে তো.....

অনেকক্ষণ পর শুভাশিস অনাবিল হাসল,— কত চাই ? দশ ? পনেরো ? বিশ ? যা লাগে নিয়ে নে।

—তুমি বাবার টাকা থেকেও আমাকে লোন দিতে পারো।

—মানে ?

—মানে বাবার তো এখানে ব্যাংকে কিছু টাকা আছে, হাজার চল্লিশ মতন। এখন তুমি হাজার কুড়ি টাকা আমায় দাও, বাবার সাকসেশান সার্টিফিকেটটা বেরিয়ে গেলে তুমি পুরো টাকাটাই তুলে নিয়ো।

—আমি কেন নেব ? ও টাকা সবটাই তোর।

—দুর, তা হয় নাকি ! তুফান কথাটাকে আমলই দিল না,—জমি বাড়ি ভোগ করছি এই না

কত।.... তাহলে তুমি টাকাটা দিচ্ছ তো দাদা ?

—দিতে পারি, কিন্তু লোন হিসেবে নয়। শুভাশিসের ভেতরে তেতো ভাবটা ফিরে আসছিল। একটু রুক্ষ স্বরেই বলল,— তুই কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারিস, আমি পারি না ?

—ওভাবে বলছ কেন ?

—কীভাবে বলব ? উদারতা দেখাচ্ছিস বলব ? প্রমাণ করতে চাস তুই মহৎ, আর আমি চশমখোর ?

তুফান থতমত খেয়ে গেল। এতটা কড়া কথা সে বোধহয় আশা করেনি। মাথা নিচু করে বলল,— আমি ঋণ শোধ করছি দাদা।

—তিরিশ বছর বাড়ির ছেলে হয়ে থাকার পর এসব ঋণ-টিনের কথা আসে কী করে ? ফারদার আমি যেন এসব কথা না শুনি। বাবার জমি বাড়ি টাকাকড়ি যা আছে সব আমাদের দুজনের। দুই ভায়ের সমান সমান। ইন্সিডেন্টালি আমার অনেক আছে, এবং আমার পক্ষে এখানে এসে পারমানেন্টলি বসবাস করা সম্ভব নয়, তাই আমি তোমাকে সবটাই দিয়ে দিচ্ছি। দরকার হলে দানপত্র করে দেব। তুমি যদি না নাও আমি সেটাকে পারসোনাল ইনসাল্ট বলে মনে করব। অ্যান্ড আই শ্যাল নেভার টাচ দা সয়েল অফ মাধবপুর। বুঝেছ ?

তুফান করুণ চোখে তাকাল,— তুমি যে একেবারে আইনের কথায় চলে গেলে দাদা !

—এ ছাড়া অন্য কথা কি তুই বুঝবি ! শুভাশিস দালান ধরে এগোল,— আমার বিশ্বাস বাবার আত্মা এই ব্যবস্থাতেই শান্তি পাবে। বাবা এরকমই চেয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এসেছে তুফান। এতক্ষণে ঠোঁটের কোণে তার মিটিমিটি হাসি,—বাবা কিন্তু অন্য রকমও চেয়েছে দাদা। বাবার শেষ ইচ্ছের কথা ধরতে গেলে তো.....তাতে কিন্তু তুমিও পিকচারে থাকো না, আমিও সিনে নেই।

শুভাশিসের ভুরু জড়ো হল।

—শেষ দিকে বাবা কি বলত জানো ? শুভ আর তুফানে তো মিলমিশ থাকবেই, সম্পত্তি বরং টুকি আর টোটোর নামে থাক। এই জমি বাড়ি দিয়েই ওরা যেন এক সুতোয় বাঁধা থাকে। অর্থাৎ বাবার শেষ ইচ্ছে ধরতে গেলে তোমার দানপত্র করারও কোনও অর্থ হয় না। হাসছে তুফান। হাসতে হাসতেই বলল,— আমি অবশ্য কথাটাকে একদমই ধরিনি। বাবা কত সময়ে কত রকম কথাই তো বলেছে। তা মুখে যাই বলুক, প্র্যাকটিক্যালি দেখতে গেলে বাবার যেখানে যা-কিছু আছে সবই তোমার। তোমারই।

তুফানের শেষ কথাগুলো কানে যাচ্ছিল না শুভাশিসের। মন্থর পায়ে সিঁড়ি ভাঙছে। অলকা স্নান করার জন্য তাগাদা লাগাচ্ছে, আবছা শুনতে পাচ্ছিল শুভাশিস। বুকটা হঠাৎ ভারী হয়ে আসছিল তার। আবার মত বদলেছিল বাবা ! নিজের উত্তরাধিকারটা দান করে দেওয়ার সুখটুকুও দিতে চায়নি শুভাশিসকে !

এ কি শুধুই অভিমান !

বৈশাখের প্রখর তাপে পুড়ছে পৃথিবী। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে এলোমেলো। শুকনো। গরম। রোদমাখা ধরণী দুলে ওঠে হাওয়ায়, কাঁপে তিরতির। দূরের গাছগাছালি এ সময়ে মরীচিকা বলে ভ্রম হয়।

শিবসুন্দরের দোতলা বাড়ির ফাঁক-ফোকরেও ঢুকে পড়েছে ঝাঁঝ। উত্তাপ এখন চরমে। বাথরুমে ঢুকে ধড়াস ধড়াস গায়ে জল ঢালল শুভাশিস, একটু বুঝি শীতল হল শরীর। নীচে নেমে দেখল টোটো টুকির খাওয়া শেষ, তুফান ছন্দা অলকা তারই প্রতীক্ষায় বসে। ছন্দার শতেক অনুরোধেও এক সঙ্গে খেতে বসল না অলকা। সবাইকে খাইয়ে তবে খাবে। সে এখনও শিবসুন্দরের আমলের প্রথা বজায় রাখতে চায়।

খেতে বসে কথা হচ্ছিল টুকটাক। গ্রামের কথা, শহরের কথা, রাজনীতির কথা। ক'দিন পরেই

পার্লামেন্টের মধ্যবর্তী নির্বাচন, তাই নিয়ে গ্রামের হাওয়া বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে, বলছিল তুফান। এ সবে শুভাশিস কোনও কালেই বিশেষ উৎসাহ বোধ করে না, মাধবপুর প্রসঙ্গে তো নয়ই, সে শুধু হুঁ হ্যাঁ করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মাধবপুর এখনও তার কাছে ভিনদেশ।

কথায় কথায় অলকা বলল,— মায়ার কথা শুনেছেন দাদা ?

—কী হয়েছে ? ওকে তো বড় একটা আর দেখি না !

—খুব ছুটোছুটি করছিল কলকাতায়। ওর বদলির অর্ডার এসে গেছে। ইলেকশানটা হয়ে গেলেই চলে যাবে।

—তাই ? কোথায় পোস্টিং হল ?

—ওর বাড়ির কাছাকাছিই। বালির ওদিকে কোন হাসপাতালে।..... অনেক ধরাকরা করতে হয়েছে।

ছন্দা ফস করে বলে উঠল,— এই ধরাকরাটা ছ মাস আগে করলেই পারত। তাহলে হয়তো বাবা....

ছন্দা থেমে গেল, তবু যেন কথাটা দুলতে থাকল চারদিকে। একটু বুঝি গোমড়া হয়ে গেল বাতাস। পলকের জন্য শুভাশিসের মনে হল ছন্দা ভুল বলেনি। কোথাকার কোন মায়া কোত্থেকে এসে ত্বরান্বিত করে দিল বাবার মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু তো একটা অমোঘ পরিণতি, তাকে কি কোনও মায়া বা ছায়া এসে ত্বরান্বিত করতে পারে ? অথবা বিলম্বিত ? তবু কখনও কখনও কেউ কেউ বুঝি নিমিত্ত হয়ে যায়। জয়মোহনের মৃত্যু নিয়ে ইন্দ্রাণীরও এরকম একটা ধারণা আছে না ?

দোতলার ঘরে চোখ বুজে শুয়েও ঘুম আসছিল না শুভাশিসের। হালকা তন্দ্রা আসছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে। খানিক এপাশ-ওপাশ করে উঠে মনোরমার ঘরে এল। ঘুমোচ্ছেন মনোরমা। ইদানীং মনোরমার শরীরে আর শাড়ি জড়িয়ে রাখা হয় না, ছন্দা বেশ কয়েকটা নাইটি কিনে দিয়েছে, তাই বদলে বদলে পরায় অলকা। বাদামি রঙ ঢোল্লা আলখাল্লার ভেতরে গুটিসুটি পড়ে থাকা শীর্ণ শরীরটাকে কেমন যেন বিকৃত পুতুলের মতো লাগছে এখন। মাথার পাতলা চুল ক'গাছা ধবধবে সাদা, কপালের কোঁচকানো চামড়ায় অসংখ্য কাটাকুটি, বন্ধ চোখের দুই পাতা সামান্য ফোলা ফোলা। এই ক'মাসে কি আরও বেশি বুড়িয়ে গেল মা ? নাকি এখন অনেক গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বলেই শুভাশিসের চোখে বেশি বেশি করে লাগে ? মা কি বাবাকে খোঁজে আর ? মনে হয় না। এমনি মানুষই নতুন অভ্যাসে রপ্ত হয়ে গেলে পুরনোকে দিব্যি ভুলে যায়, সেখানে মা তো নিছকই এক জড় বস্তু।

মাকে নিয়মমতো পরীক্ষা করে নিল শুভাশিস। নাড়ি, রক্তচাপ, শ্লেষ্মা কফ, রক্তে শর্করার মাত্রা....। ঘুমন্ত অবস্থাতেই মনোরমা চোখ খুললেন, বুজলেন, আবার খুললেন, আবার বুজলেন। সরে এল শুভাশিস। বাবার ড্রয়ার খুলে ডায়েরিগুলো বার করল। এ ঘরে এলে উল্টোয় মাঝে মাঝে। বিশেষণহীন ছোট ছোট তথ্য, তাতেই স্মৃতিরা ঝঙ্কার তোলে হঠাৎ হঠাৎ। বেশ লাগে।

একটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ডায়েরি হাতে সরু তক্তাপোশে আধশোওয়া হল শুভাশিস। মা'র সঙ্গে এক খাটে শুতে বোধহয় অস্বস্তি হয় অলকার, তাই এ ঘরে তক্তাপোশটা ঢুকেছে আজকাল। পাতা উল্টোতে উল্টোতে কোত্থেকে একটা হলদেটে দিন সামনে উঠে এল। পঞ্চান্ন সালের ডিসেম্বর মাস, তেইশ তারিখ।.... শুভ পরীক্ষায় থার্ড হয়েছে। অঙ্কে সাতাত্তর, ইংরিজিতে অষ্টআশি, বাংলায় চুরাশি.... মনোর মাথায় আজ একটা গাঁদাফুল লাগিয়ে দিয়েছিল হিমি...

দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শুভাশিস। রেজাল্ট হাতে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ফিরছে, কোয়ার্টারের সামনে এসে থমকে গেল, বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে আছে মা, গায়ে টুকটুকে লাল শাল, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ, খোঁপায় এক ইয়া হলুদ গাঁদা। সূর্যের আলো পড়েছে মা'র মুখে, কী অপরূপ যে দেখাচ্ছে মাকে ! পাশে দাঁড়িয়ে হিমিপিসি হাসছে মিটিমিটি ! দ্যাখ শুভ, তোর মাকে সাজালে কেমন দুগ্‌গা প্রতিমার মতো দেখায় !

শুভাশিসের বুকটা টনটন করে উঠল। একে কি সুখস্মৃতি বলে? চোখ বুজে আরও এরকম দৃশ্য মনে করার চেষ্টা করল শুভাশিস। কিছুই আর আসছে না মনে। এই দৃশ্যটাই বা কোথায় ছিল? বাঁকুড়ায়? মালদায়? নাকি রামপুরহাটে?

তীক্ষ্ণ স্বরে একটা পাখি ডাকছে বাইরে, চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। পাখির ডাকটাও কেমন চেনা চেনা। একটা মন-কেমন-করা শৈশব যেন মিশে আছে ডাকটায়। কোন পাখি ওটা? পাপিয়া? বসন্তবৌরি?

উঠে বারান্দায় এল শুভাশিস। একটুখানি থেমে ছিল, আবার ডাকছে পাখিটা। সামনের ঝাঁকড়া আমগাছ কচি কচি আমে ভরে আছে, সবুজ পাতা আর ফলের মাঝে কোথায় লুকিয়ে আছে পাখি?

শুভাশিস পাখিটাকে খুঁজছিল। দুপুর ক্রমে বিকেল হয়ে এল।

ছন্দা ফ্লাস্কের ঢাকনায় চা ঢালল,— খাবে নাকি একটু?

চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে চোখ ফেরাল শুভাশিস,— নাহ। তুমিই খাও।

—খেতে পারো। অলকা ফ্লাস্ক ভর্তি করে দিয়েছে।

—ভাল লাগছে না।

ছন্দা ভুরু কুঁচকে তাকাল,— তোমার চায়ে অরুচি!

শুভাশিস উত্তর দিল না। আবার চোখ ফিরিয়েছে বাইরে।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো? শরীর খারাপ? টায়ার্ড? থেকে গেলেই পারতে। কাল ভোরে নয় রওনা দিতাম।

এবারও উত্তর দিল না শুভাশিস, আড়চোখে সামনের সিটে রামদেওর পাশে বসে থাকা টোটোকে দেখে নিল। চোখের খুব কাছে একটা ইংরিজি ম্যাগাজিন ধরে আছে টোটো। আলো কমে এসেছে, চলন্ত গাড়িতে এভাবে বই পড়াটাও ঠিক নয়, বলতে গিয়েও বলল না শুভাশিস। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে আজকাল কেমন যেন স্নায়ুর চাপ অনুভব করে, কেবলই মনে হয় এই বুঝি তর্ক বেধে গেল।

গাড়ি সবে তারকেশ্বর পেরিয়েছে, কলকাতা পৌঁছতে কম পক্ষে আরও দু' ঘণ্টা। এদিকের রাস্তাঘাট তবু মোটামুটি চলনসই, খানিক পরেই ভাঙাচোরা পথে গাড়ির গতি অনেক কমিয়ে ফেলতে হবে। তবে আজ রবিবার বলে গাড়িঘোড়া একটু কম আছে এইটুকুই যা ভরসা। শুভাশিস সিটের পিছনে মাথা রেখে চোখ বুজল।

ছন্দা চা শেষ করে ফ্লাস্ক বন্ধ করছে। টেরচা চোখে শুভাশিসকে দেখে নিয়ে বলল,— মাধবপুরে এলে তোমার কি হয় বলো তো? মুখ তোলো হাঁড়ি করে রাখো?

শুভাশিস অল্প হাসার চেষ্টা করল,— কই, না তো!

—করো করো। আয়নায় নিজের মুখ দেখতে পাও না তো, তাই টের পাও না।... আমার কিন্তু আজকাল মাধবপুর খুব ভাল লাগে।

—তার মানে আগে লাগত না?

—তা কেন? ছন্দা মুখ টিপে হাসছে,— বাবা যখন ছিলেন তখন আসাটা ছিল শ্বশুরবাড়ি আসা। সে ভাল লাগাটা এক রকম। এখন এ হল গিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি নিজেরা এসে দেখে যাওয়া। তার একটা আলাদা চার্ম নেই? সুন্দর একটা ডে-স্পেন্ট হচ্ছে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে গল্প করছি, আমার তো এলে ফিরতেই ইচ্ছে করে না।

টোটো টুকিকে নিয়ে বাবার শেষ ইচ্ছে, তুফানের ভাগ, তার ভাগ, এসবের মধ্যে গেল না শুভাশিস। লঘু স্বরে বলল,— থেকে গেলেই পারো।

—আহা, আমার বুঝি কলকাতায় কাজ নেই! কাল সকালে নীপা ফোন করবে। ওর সঙ্গে কাল বরানগর যেতে হবে।

—সমীরণের বউটাও তোমাদের দলে ভিড়েছে নাকি?

—ভিড়েছে আবার কী কথা ! ও তো আমার আগে থেকেই উইমেন্স ফোরামে আছে। লাস্ট ইয়ারে ও দু-দুটো ডেস্টিটিউড মেয়েকে স্পনসর করেছিল।

—বাহ্, সমীরণ এক হাতে কামাচ্ছে, নীপা এক হাতে ওড়াচ্ছে !

—ওভাবে বলছ কেন ? সমীরণদার কি কম আছে ? আর নীপা তো একটা ভাল কজের জন্য খরচা করছে। ছন্দা হঠাৎ উদাস,— আমাদের দেশের মেয়েদের সত্যিই যে কী অবস্থা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এত টরচারড ! এত অসহায় ! বাচ্চাসুদ্ধ বউকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়ে পতিদেব দিব্যি আবার আর একটিকে ধরছেন ! বাপের বাড়ি ফেরত নেবে না, শ্বশুরবাড়িতে জায়গা নেই, শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে...

ইদানীং নারীকল্যাণে আগ্রহ জন্মেছে ছন্দার। ভাল, কোনও একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা সংসারের পক্ষে শান্তির। অন্তত অবসাদগ্রস্ত হয়ে ঠাকুরঘরে পড়ে থাকার থেকে তো ভাল বটেই। যাদের পেট সব সময়ে ভরাভর্তি থাকে, টুসকি মারলে বিলাসের উপকরণের কমতি থাকে না, সমাজসেবাই তো তাদের শ্রেষ্ঠ বিনোদন। লেক গার্ডেন্সের জমিটা তো নেওয়া হয়েই গেছে, মিউটেশানের বখেড়াটা মিটে গেলে ছন্দাকে এর পর আর্কিটেক্ট প্ল্যান বাড়ি তৈরি এসবে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। না হোক আরও এক-দু বছরের জন্য নিশ্চিন্ত।

হালকা গলায় শুভাশিস একটু খোঁচাল ছন্দাকে, তোমাদের এইসব দুঃস্থ মেয়েগুলো কেঁউ কেঁউ করে পড়ে থাকেই বা কেন ? তোমরা উদ্ধার করবে এই আশায় ?

—মোটেই না। এক একজন এমন হেলপলেস সিচুয়েশনে থাকে...

—বকোয়াস। আসল কথা হল কনশাসনেসের অভাব। প্রপার শিক্ষার অভাব।

—শিক্ষা যাদের আছে তারা যে কী আমি জানি। ছন্দা ফস করে বলে বসল।

কথাটার প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝে সামান্য ঘাবড়ে গেল শুভাশিস। গলা নামিয়ে বলল,— আমি বলছিলাম প্রতিটি মেয়ের সেলফ সাফিশিয়েন্ট হওয়ার জন্য কনশাসনেস থাকা দরকার। সে কি গরিব, কি বা বড়লোক, কি মধ্যবিত্ত।

ছন্দা আবারও কি একটা ঝেঁঝে উঠে বলতে যাচ্ছিল,— তার আগে টোটো ঝট করে ঘুরে তাকিয়েছে,— উইল ইউ স্টপ দিস বাজে টপিক ?

শুভাশিস হেসে ফেলল,— আমরা একটু খুনসুটি করছি, তাতেও তোর আপত্তি ?

—আমার ভাল লাগে না।

শুভাশিস অপ্রস্তুত মুখে সিগারেট ধরাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা গর্ত পার হল গাড়িটা। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে হাত থেকে খসে গেছে সিগারেট। তড়িঘড়ি সিট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে নিল শুভাশিস। রামদেওকে ধমকাতে গিয়েও সামলে নিল। টোটোকে প্রসন্ন করার জন্য তোষামোদের ভঙ্গিতে বলল,— টোটো, আমি একটা কথা ভাবছিলাম, জানিস। টুকিটার তো এবার স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় হয়ে এল, তুই তো এক সময়ে টুকিকে আমাদের কাছে এনে রাখার কথা বলেছিলি, ভাবছিলাম এখন থেকে যদি এনে রাখি ? একটা ভাল কনভেন্টে যদি ওর অ্যাডমিশানের ব্যবস্থা করে দিই...

ঘাড় ফেরাল না টোটো। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল,— মে মাস পড়ে গেছে বাবা। সব স্কুলে এখন সেশান শুরু হয়ে গেছে।

স্বর যেন বিদ্রূপের ছুরি। ছেলে যেন তার কথার ফাঁকি ধরে ফেলেছে। হার মানল না শুভাশিস, হাসতে হাসতেই বলল,— সো হোয়াট ? সেশানের মাঝে কি কেউ ভর্তি হয় না ? আই ডু হ্যাভ দ্যাট পাওয়ার। আমার কানেকশানস আছে। দরকার হলে মোটা ডোনেশান দেব।

—তুমি চাইলেই কাকা কাকিমা রাজি হবে ভাবছ কী করে ?

—আলবত হবে। গাঁয়ে পড়ে থাকলে মেয়েটা প্রপার এডুকেশান পাবে ?

—আমারও ও-রকম চাইল্ডিশ ধারণা ছিল বাবা। বাংলা মিডিয়ামে, মফস্বলের স্কুলে পড়েও

অনেকেই আখছার ভাল রেজাল্ট করছে। আমাদের মাধ্যমিকের রেজাল্ট তো তুমি ভাল করে স্টাডি করোনি, তুমি জানো না। আমাদের ফার্স্ট টোয়েন্টির মধ্যে আটটা তোমার সোকলড মফস্বল ছিল।

—ওগুলো সব এক্সেপশন। শুভাশিস যুক্তি দিয়েই চলেছে,— তুমি যে রকম এডুকেশান পেয়েছ, তোমার বোনেরও সেরকম পাওয়া উচিত।

—থাক না বাবা। টোটোর স্বর আরও শীতল,—টুকি একটা হ্যাপি ফ্যামিলিতে একটা হ্যাপি বাবা-মার কাছে রয়েছে, সেখান থেকে ওকে উপড়ে আনার কোনও দরকার নেই।

টোটোর বন্দুকের নিশানা একেবারে সোজাসুজি। শুভাশিসের মুখ কালো হয়ে গেল। পথের দু ধারে থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে, সে দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ। চোখের কোণে জ্বালা জ্বালা ভাব, তবু পাতা ফেলতে পারছে না।

নিঃশব্দে বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল শুভাশিসের। গরম। ভিজে। তিতিরের জন্য ছটফট করতে গিয়ে কি টোটোকে লালন করায় কোনও গাফিলতি হয়ে গেছে? তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের শূন্যগর্ভ রূপ ছেলের কাছে আর এতটুকু গোপন নেই, তাই কি বারবার মাধবপুরে ছুটে যায় টোটো? একটা ভরাট সম্পর্ক দেখার জন্য? টোটোর জন্যই তো শুভাশিসের সব কিছু। এই বেঁচে থাকা, এই পরিশ্রম, এই প্রাণান্তকর জোড়াতালি দিয়ে চলা। কেন তবু ছেলে সরে যায় দূরে!

কী করে যে ছেলেকে নিজের হৃদয়টা দেখায় শুভাশিস!

পরদিন থেকে আবার সেই অভ্যস্ত জীবন শুরু হয়ে গেছে শুভাশিসের। আবার সেই চোখে ঠুলি এঁটে অন্তহীন ছোটা, অবিরাম ছুরি কাঁচি ফরসেপ, অপারেশন থিয়েটারের চড়া আলো, পুঁজ রক্ত ব্যান্ডেজ, মুখহীন রুগীর মিছিল।

এর মধ্যেই স্যাস ক্লিনিকে একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে গেল। শালিনীর এক পেশেন্ট সাড়ে সাত মাসের মাথায় অপরিণত এক শিশু প্রসব করেছিল, মায়ের এখনও বুকে দুধ আসেনি, অরূপের নির্দেশে রাতের নার্স বাচ্চাটাকে বোতলে দুধ খাওয়াতে গিয়ে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলল। বাচ্চাটার গলায় দুধ আটকে গেছে, হেঁচকি তুলছে বাচ্চা, কাশছে, তবু তার মুখে ঠুসে আছে বোতল। পরিণাম, মিনিট দশেকের মধ্যে বাচ্চাটা শেষ। খবর পেয়ে, রাত পোয়ানোর আগেই, বাড়ির লোক চড়াও হয়েছে নার্সিংহোমে। চিৎকার চেঁচামেচি হল্লা ভাঙচুর, সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। শুভাশিস পড়িমরি করে ছুটে এল, অরূপ শালিনীও হাজির। প্রাণপণে শান্ত করার চেষ্টা করছে সকলকে, নার্স মেয়েটা ঠক ঠক কাঁপছে ভয়ে, ক্ষমা চাইছে, তবু মারমুখী ভিড় নরম হয় না। শেষে পুলিশই ডাকতে হল। তাতেও নিস্তার নেই, বাচ্চার বাবা নার্স আর অরূপ দুজনের বিরুদ্ধেই কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ এনে এফ আই আর করে বসল। অরূপ তার চৌকশ কথাবার্তা দিয়ে, প্রিম্যাচিওর বেবির এমন ঘটনা ঘটতেই পারে, বাচ্চার কন্ডিশান প্রথম থেকেই খুব খারাপ ছিল, এরকম সাতসতেরো বুঝিয়ে-টুঝিয়ে ওসিকে অনেক নরম করে ফেলল বটে, কিন্তু খবরটা গোপন রইল না, পরদিন ফলাও করে বেরিয়ে গেছে কাগজে। কোনও এক কাগজে আবার ফুটুস করে মন্তব্য করে বসল নার্সটা ট্রেন্ড নার্স নয়, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল আর এক দফা এনকোয়ারি। সকাল বিকেল পুলিশ আসছে, এই কাগজ ঘাঁটছে, ওই ফাইল দেখছে। গভর্নমেন্টের লোক যাদের কোনও সময়ে টিকি দেখা যায় না, তারাও এসে জেরার পর জেরা করে চলেছে নার্সিংহোমের প্রতিটি স্টাফকে। শালিনীর মতো লৌহমানবীরও নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়ার জোগাড়।

দিন পাঁচ-সাত পর ব্যাপারটা ক্রমশ থিতিয়ে এল। নার্স মেয়েটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যাস ক্লিনিক থেকে, লালবাজারে পুলিশের কয়েকজন বড় কর্তাকে ধরে করে স্থানীয় থানাকে প্রশমিতও করা গেছে। কেস একটা হয়েছে অরূপ আর ন্যার্সের বিরুদ্ধে, তবে পুলিশের এনকোয়ারি রিপোর্ট অনুযায়ী অভিযোগ খুব একটা ধোপে টিকবে না। অরূপের বিরুদ্ধে তো নয়ই। তবে বাচ্চাটার বাবার পয়সা আছে, মামলা সে চালাবে।

মাঝখান থেকে স্যাস ক্লিনিকের সুনামে খানিকটা চিড় খেয়ে গেল, টাকাপয়সাও কম ছড়াতে হল না। সব দিক দিয়ে অরূপ শালিনী শুভাশিস একেবারে জেরবার। কী টেনশান! কী টেনশান!

ধাক্কাটা একটু সামলে ওঠার পরে ইন্দ্রাণীর কাছে গেল শুভাশিস। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা, মুখের খাঁজে খাঁজে এখনও উদ্বেগের ছাপ।

ইন্দ্রাণী মাধ্যমিকের খাতা দেখছিল। ঠিক দেখছিল না, ট্যাবুলেশান শিটের সঙ্গে উত্তরপত্র ধরে ধরে রোল নম্বর দেখে মার্কস মেলাচ্ছিল। পরশু তার প্রধান পরীক্ষকের কাছে খাতা জমা দেওয়ার কথা।

শুভাশিসকে দেখে ইন্দ্রাণীর মুখে তেমন ভাবান্তর হল না। একই রকম পাথরের মতো মুখ, একই রকম ভাষাহীন চোখ। যেন জানতই ওই অশান্তির পর শুভাশিস যখন আসবে তাকে ঠিক এরকমটাই দেখাবে।

শুভাশিসই কথা শুরু করল,— বাড়ি এত চুপচাপ? আদিত্যবাবু তিতির কেউ নেই?

—আছে হয়তো। হয়তো নেই। ইন্দ্রাণী শুকনো জবাব দিল,— যার যার কাছে চাবি থাকে, যে যার মতো আসে, যায়। হোটেলখানায় রান্না রেডি থাকে, খায়। শুয়ে পড়ে।... তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, চা কফি কিছু খাবে? করব?

—থাক।

—তা হলে দু মিনিট বোসো। হাতের কাজটা সেরে নিই।

শুভাশিস বসেই আছে। খাট থেকে একটু তফাতে, চেয়ারে। বিছানায় ঝুঁকে খাতা কাগজে ডুবে আছে ইন্দ্রাণী। চোখে একটা রিডিং গ্লাস পরেছে, থেকে থেকে বাঁ হাতের তর্জনী তুলে ঠিক করছে চশমা, কপালে আঙুল বোলাচ্ছে। কাজে নিমগ্ন ওই ইন্দ্রাণী এখন এক ভিন্ন মানবী। তাকে এখন আর আগের মতো অপরূপা মনে হয় না শুভাশিসের। দৃঢ় চোয়াল, ঈষৎ বসে যাওয়া চোখ, ঠেলে ওঠা কণ্ঠার হাড় ইন্দ্রাণীর মুখমণ্ডলকে বড় বেশি কঠিন করে দিয়েছে। এই ইন্দ্রাণীকে দেখে শুভাশিসের মনও আর উথাল-পাথাল হয় না তেমন। একটাই শুধু অনুভূতি জাগে। এই নারীই তার একমাত্র আশ্রয়। শত অবহেলায় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া পরও।

এই নারীই তার অদৃশ্য নিয়তি।

অনন্তকাল, সময়ের হিসেবে মিনিট পাঁচেক পর, খাতা কাগজ সরিয়ে রাখল ইন্দ্রাণী। চশমা খুলে চোখ রগড়াচ্ছে,— তোমাদের ঝঞ্ঝাট সব মিটল?

শুভাশিসের বুকটা কনকন করে উঠল। ভুল করে তাও তবু আজ খোঁজ নিল ইন্দ্রাণী। গলাটাকে উদাস করার চেষ্টা বলল,— ওই এক রকম।

—অরূপকে কি বেল টেল নিতে হল?

—নাহ, প্রয়োজন হয়নি।

—শালিনীর শরীর এখন ঠিক আছে?

শুভাশিস সোজাসুজি তাকাল,— শালিনীর কথা তোমায় কে বলল?

অতি মৃদু এক হাসি ফুটল ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে,—কে আর বলতে পারে? একজনই তো আছে।

—মধুমিতা?

ইন্দ্রাণী খুব আস্তে মাথা নাড়ল।

শুভাশিস সিগারেট ধরিয়ে অ্যাশট্রে খুঁজল,— মধুমিতার মা দাদার আসার কথা ছিল, এসেছিল?

—হুঁ।

—কথাবার্তা হল?

—ওরা খুব ঘটাপটা চাইছে না। ... চাঁদু নিজেও রেজিস্ট্রি করার পক্ষপাতী।

—সে কী কথা! বিধবার বিয়ে বলে ঘটা হবে না, এ কেমন চিন্তা?

—আমিও তো চাঁদুকে তাই বললাম। মধুমিতাও নাকি রাজি নয়।

—কবে করছে বিয়ে ?

—এখন হয়তো রেজিস্ট্রিটা করে রাখবে। পরে নতুন ফ্ল্যাটে গিয়ে বন্ধুবান্ধব ডেকে ছোট অনুষ্ঠান করবে।

—ও। ... মধুমিতা মেয়েটা কিন্তু বড় ভাল। কী ঠাণ্ডা মাথায় নার্সিংহোমের কেসটা ফেস করল।

একটু ক্ষণ ইন্দ্রাণী চুপ। খানিক পরে বলল,— তোমাকে ক'দিনেই খুব রোগা দেখাচ্ছে।

দুম করে শুভাশিসের বুকে অভিমানটা ফিরে এল। ভার গলায় বলল,— কীভাবে ছিলাম, কেমন ছিলাম, ক'দিনে একটি বারের জন্যও তো খোঁজ করলে না !

ইন্দ্রাণী স্থির চোখে শুভাশিসকে দেখল,— তুমি যে পেশায় নেমেছ তাতে তো এগুলো অবভিয়াস হ্যাজার্ড। আমি অনর্থক উতলা হয়ে কী করব ?

—তা হলে আর এখন এত খোঁজ করছ কেন ?

—তোমার পছন্দ হচ্ছে না ?

—না।

—বেশ, আর করব না।

বলে ইন্দ্রাণী ঝুম হয়ে গেল। বিচিত্র এক নৈঃশব্দ্য জমাট বাঁধছে ঘরে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে বনবন, পতপত উড়ছে ক্যালেন্ডারের পাতা, তবু নৈঃশব্দ্য ভাঙে না।

একটু পরে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল শুভাশিস,— একটি বারের জন্যও ভাবলে না আমি কত একা ! বিপদে আপদে তুমি পাশে থাকলে আমি কত ভরসা পাই।

—সে তো আমিও একা। ইন্দ্রাণীর স্বর নীরস,— তুমি তোমার মতো একা, আমি আমার মতো একা। তুমি যখন নার্সিংহোমের ব্যবসায় নেমেছিলে, আমার পরামর্শ নিয়ে নেমেছিলে ? ঝামেলা হলে তো তোমাকেই সামলাতে হবে।

—আমি শুধু নার্সিংহোমের কথা বলছি না রানি। শুভাশিসের স্বর অসহায় শোনাল,— ইন অল রেসপেক্ট আমি অ্যাবসোলিউটলি লোনলি এখন। ঘরে, বাইরে, সর্বত্র। কে আছে আমার দুনিয়ায় ? টোটো পর্যন্ত আমাকে কী হিউমিলিয়েটিং ভাষায় ...

—হয়তো এটাই আমাদের ভবিতব্য। একা হয়ে যাওয়া। ক্রমশ আরও একা হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রাণী যেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল কথাটা। ধীর পায়ে নামল বিছানা থেকে। আলমারি খুলে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিয়েছে।

—কী এটা ?

—বাপ্পার চিঠি। পড়ো।

চিঠিটা খুলল শুভাশিস। ছোট্ট চিঠি, আট-দশ লাইনের।...

....শ্রীচরণেষু মা, আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। কলকাতা থেকে চলে আসার দিন তোমায় জানলায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব খারাপ লাগল। কেমন যেন দেখাচ্ছিল তোমাকে। জাহাজে আসার পর থেকে বারবার তোমার ওই মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে। রিজন দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছি তোমার প্রবলেমটা কী ? একটাই উত্তর পাচ্ছি। তুমি কিন্তু নিজের দোষে নিজে সব হারিয়েছ মা। তুমি কোনওদিন কাউকে এতটুকু বোঝার চেষ্টা করোনি, আর তাই তোমার এত কষ্ট। এখনও সময় আছে, নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করো। ...

শুভাশিস ফ্যাল ফ্যাল তাকাল,— এ চিঠির অর্থ ?

ইন্দ্রাণী দু দিকে মাথা নাড়ল। হঠাৎই তার দু চোখ ভরে গেছে জলে। ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। টকটকে লাল হয়ে গেল মুখ।

শুভাশিসের গলা কেঁপে গেল,— তুমি কাঁদছ রানি ?

মুহূর্তে লম্বা একটা বাতাস বুকে ভরে নিল ইন্দ্রাণী। ঢোঁক গিলে বলল,— উঁহু। ইন্দ্রাণীর কি

কাঁদার উপায় আছে ? শুধু ভাবছি সত্যিই আমার কী করা উচিত ছিল ? আমার কি অনেক দিন আগেই তোমার সঙ্গে চলে যাওয়া উচিত ছিল ? বাবা মা সবাইকে অগ্রাহ্য করে আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারতাম না ? বাপ্পা ঠিকই লিখেছে। আমি তো নিজের দোষেই নিজে সব হারিয়েছি।

শুভাশিস বিহ্বল চোখে তাকাল,— এখন আর এসব ভেবে কী লাভ রানি ?

—লাভ নেই, না ?... টাইম, দা এন্ডলেস ক্যারাভ্যান গোজ অন ... ইন্দ্রাণীর গলা আবার ধরে এল,— হলটস ফর নান, ফিলস ফর নান, উইপস ফর নান...শুধু মানুষই পড়ে থাকে।

শুভাশিস কপাল টিপে ধরল,— তোমার আজ কী হয়ে গেল রানি ? এরকম করছ কেন ?

ইন্দ্রাণী অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে,— কী পেলাম বলো ? কী পেলাম ? উল্টে সবাই এখন আমার দিকে আঙুল দেখায়। আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে। তিতির যখন পেটে এসে গেল, তখনই যদি সংসারটাকে লাথি মেরে চলে যেতে পারতাম ! তুমি আমি আর আমাদের একমাত্র মেয়ে...তিন জনে মিলে একটা অন্য ধরনের জীবন... ! হলটা কি ? কাউকেই সুখ দিতে পারলাম না। মাঝখান থেকে তোমার মেয়ে আমাকেও শ্রদ্ধা করতে পারল না, তোমাকেও না।

—রানি !

—আমায় বলতে দাও শুভ। টোটো তোমার হল ? বাপ্পা আমার হল ? আদিত্য ছন্দার কথা বাদই দাও। কী ভুল ! কী ভুল ! তুমি তো জানো না শুভ, আমি কতবার আমার পেটের মধ্যে তোমার তিতিরকে মেরে ফেলতে চেয়েছি। হয়তো আজ সেই জন্যই তোমার মেয়েও...

সহসা ইন্দ্রাণী নির্বাক হয়ে গেল। কোন এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় শুভাশিসও চমকে তাকিয়েছে পিছনে।

দরজায় তিতির !

৯৫

থানার সেরেস্তায় বসা ডিউটি অফিসার ডায়েরি লিখতে লিখতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, বয়স কত বললেন যেন ? —আঠেরো। না না, সতেরো। সুদীপ টেবিলে ঝুঁকল। —ঠিকঠাক বলুন। আঠেরো, না সতেরো ? আঠেরো সতেরোয় বিস্তর ফারাক। আঠেরোয় অ্যাডাল্ট, সতেরোয় মাইনর। দুটো কেস সম্পূর্ণ আলাদা লাইনে চলে যাবে। যদি আপনাদের মেয়ে কারুর সঙ্গে ভেগে থাকে তাহলে নাবালিকা হরণের চার্জে সে ছোকরার পেছনে হুড়কো চলে যাবে। কি বুঝলেন ?

সুদীপ আর কন্দর্প মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তিতির তো তাদের কাছে তিতিরই, সে সাবালিকা হয়ে গেছে কি না এ চিন্তা মাথাতেই আসেনি কোনওদিন। কিন্তু এখন তো ভাবতেই হয়।

ঘাড় ঘুরিয়ে আদিত্যর দিকে তাকাল সুদীপ, —দাদা, তিতিরের কি আঠেরো হয়েছে ? নাকি এই জুনে...

আদিত্য যেন এ জগতেই নেই। পিছনের একটা চেয়ারে বসে শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে ঝুলপড়া একটা সাদা দেওয়ালের দিকে। সুদীপের কথা কি তার কানে গেল ? নাকি তিতিরের নাম শুনে কেঁপে উঠল একটু !

ডিউটি অফিসার এক চোখের কোণ দিয়ে দেখছে আদিত্যকে, অন্য চোখ কন্দর্পর দিকে, —ইনিই তো বাবা ?

—হ্যাঁ। ...খুব আপসেট...

টুসকি বাজিয়ে ছোট্ট একটা হাই তুলল ডিউটি অফিসার। নাক কুঁচকে বলল, —তাহলে কি লিখব ? মাইনর ?

কন্দর্প মাথা চুলকোল, —হিসেব মতো তাই তো হয়। সামনের মাসের আট তারিখে আঠেরো

হওয়ার কথা।

—হুম। এবার বলুন কি হয়েছে, কি বৃত্তান্ত, কখন মেয়ে পালাল...

ইলেকশানের আর দু দিন বাকি, গভীর রাতের থানা এখন অস্বাভাবিক রকম কলরবমুখর। আর্মড পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর লোকজন ভিড় করে আছে বাইরে, মাঝে মাঝেই হাঁকাহাঁকি চলছে, সেরেস্তা ঘরে বসেও তাদের গলা শোনা যায়। কনস্টেবল কিছু কম বটে, তবে তেমন টের পাওয়া যায় না। পাশেই সাব ইন্সপেক্টরদের ঘরে কে যেন জোরে চেঁচিয়ে উঠল। সামনে দাঁড়ানো কনস্টেবলটা বেরিয়ে গেল বাইরে। নিরীহ চেহারার আট-দশ জন সদ্য নিযুক্ত হোমগার্ড নার্ভাস মুখে ইতিউতি উঁকিঝুঁকি মারছে। দরজায় দাঁড়ানো একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মুখ ঘুরিয়ে নিল কন্দর্প।

ডিউটি অফিসার আবার কলম ধরেছেন, —বলুন।

—কী বলব ?

—সে আপনারাই জানেন। ...কটা নাগাদ মেয়েকে শেষ দেখা গেছে ?

—তা ধরুন আটটা-সাড়ে আটটা হবে। সুদীপ সোজা হয়ে বসল।

—আজ সন্ধে সাড়ে আটটা ? চারদিকে খুঁজে দেখেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কোনও আত্মীয় টাত্মীয়র বাড়ি চলে যায়নি তো ? বন্ধুবান্ধব ?

—নাহ্। তিতির আমাদের ওরকম মেয়েই নয়। না বলে কোত্থাও যায় না। ভীষণ ইনোসেন্ট... খুব শাই।

ঘরের এক পাশে বেঞ্চিতে বসে থাকা একজন, সম্ভবত কনস্টেবল, ফুট কাটল, —নিজেদের বাড়ির মেয়েদের সবাই ওরকম ভাবে মশাই।

সুদীপ কটমট চোখে তাকাল, —দেখেননি ওকে। দেখলে বুঝতেন।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। লম্বা সিড়িঙ্গে বছর পঁয়তাল্লিশের মাছি গোঁফ ডিউটি অফিসার কলম উল্টে ঘাড় চুলকোচ্ছে, —তা সেই মেয়ে আপনাদের পালাল কেন ? বাপ মা'র সঙ্গে কোনও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ?

পিছন থেকে আদিত্য প্রায় ককিয়ে উঠল, —আজ্ঞে না।

—মেয়ে যে পালিয়েই গেছে, তাহলে বুঝলেন কী করে ?

আদিত্যকে নিরুত্তর দেখে সুদীপ আবার হাল ধরল। সেকেন্ডের জন্য ইন্দ্রাণীর পাথর হয়ে বসে থাকা চেহারাটাও বুঝি স্মরণে এল তার। নিচু স্বরে বলল, —বউদি, মানে মেয়ের মা-ই প্রথম ধরতে পারল।

—তিনি তখন কোথায় ছিলেন ?

—বাড়িতে। নিজের ঘরে। ...হঠাৎ কি কাজে যেন পাশের ঘরে গিয়েছিল ...বলতে গিয়ে সুদীপ একটু যেন হোঁচট খেল। সত্যিই বউদি কি করে আবিষ্কার করল তিতির পালিয়েছে, তা তার জানা নেই। সবটাই অনুমান। আন্দাজে আন্দাজে বলল, —তারপর দেখল বাইরের গেট হাট করে খোলা.... প্রথমে ভেবেছিল কাছেপিঠেই কোথাও গেছে। দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে, মেয়ে ফেরে না, তখন আমাদের...

—আপনারা সব কোথায় ছিলেন ?

—আমি মানে... আমি বড়কাকা, আমি আলাদা থাকি... ওদের কাছ থেকে খবর পেয়ে... আমার দাদা আজ একটু রাত করে ফিরেছিল... বিজনেসের কাজ ছিল... আমার এই ছোট ভাই ওদের সঙ্গেই থাকে, ফিলম টিভিতে অ্যাক্টিং করে... শুটিং ফুটিং-এর জন্য প্রায়ই ওর রাত হয়... আজও...

—আপনি ফিল্ম স্টার ? ঝট করে কন্দর্পর দিকে ফিরল ডিউটি অফিসার, —নামটা জানতে পারি ?

—কন্দর্প রায়।

কয়েক সেকেন্ড কন্দর্পর আগাপাশতলা দেখল ডিউটি অফিসার, —হুঁ, তাই মুখখানা চেনা চেনা লাগছিল। পোস্টার ফেস। বলেই চোখ আবার সুদীপের দিকে, —হ্যাঁ, তারপর বলুন।

দৃষ্টিটা যেন বড় বেশি তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী। সুদীপ অস্বস্তি ভরা মুখে বলল, —অ্যাই চাঁদু, তুইই তো এসে ডাকলি আমায়, আমি তো... তুই ডিটেলে বল না।

—ডিটেল আবার কি! আমি ফিরেছি অ্যারাউন্ড ইলেভেন। তখন দেখি দাদা বাড়ির সামনে হানটান করছে, বউদি ঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর বইখাতা ডায়েরি ঘেঁটে স্কুল-টুলের যত বন্ধুবান্ধবের নাম-টাম পেয়েছি, সকলকেই ফোন করেছি। কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে তেমন যেত না, এক নিজের দাদু দিদিমার বাড়ি ছাড়া। মানিকতলায়। তা সেখানেও আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি।

—বয়ফ্রেন্ড টয়ফ্রেন্ড ছিল? তার সঙ্গে হাওয়া হয়নি তো?

—কতবার তো বলছি, তিতির ওরকম মেয়ে নয়। সুদীপ ঝেঁঝে উঠল।

—অত জোর দিয়ে বলবেন না। ওই বয়সের মেয়ে বাড়ি থেকে যখন কেটেছে, তখন একটা ল্যাঙবোট নিয়েই কেটেছে। বাড়িতে কিছু মিসিং হয়েছে কি না দেখেছেন? টাকা? গয়না?

—বলছি তো তিতির ওরকম মেয়ে নয়! সুদীপ টেবিলে হাত ঠুকল।

—উত্তেজিত হবেন না। ভাবুন। চিন্তা করুন।

নিমেষে ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যেন আলপিন পড়লেও শব্দ শোনা যাবে। চিড়িক চিড়িক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে যাচ্ছিল কন্দর্পর মাথায়। তিতির কি সেই ছেলেটার সঙ্গেই পালাল? কথাটা আগেই মাথায় এসেছে, তিতিরের খাতাপত্তর ঘেঁটে নামটা খোঁজারও চেষ্টা করেছিল। নেই। কি যেন নাম বলেছিল তিতির? সুব্রত? সুজিত? মনে পড়ছে না। পুলিশকে বলবে ছেলেটার কথা? না। যদি সত্যিই তিতির তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে থাকে, মিছিমিছি আর কেচ্ছা বাড়িয়ে কি লাভ! পুলিশ টানাটানি করবে... চতুর্দিকে জানাজানি হয়ে যাবে...। যদি সংশয়টা অমূলক হয়, সন্দেহের কথাটা পুলিশকে বলে ফেলে কন্দর্প, তিতিরের পক্ষেও মোটেই সেটা মঙ্গলের হবে না। বরং তিতিরকে খুঁজে বার করে, বুঝিয়ে শুনিয়ে...। কিন্তু তিতির এভাবে পালাবেই বা কেন! বোকা মেয়েটা কি ফেঁসে গেল! হয়তো নিরুপায় হয়ে লজ্জায় ঘেন্নায়...। ছি ছি, তিতির সম্পর্কে এসব কী ভাবছে সে! তিতিরের সঙ্গে ওই ছেলেটার সত্যিই যদি হৃদয়ঘটিত কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠে থাকে, তিতিরের বন্ধুরা কি একটু আঁচ দিত না! অনেক সময়ে বন্ধুরা অবশ্য মুখ খুলতে চায় না.... কিন্তু তিতির কি এত সেয়ানা হয়ে গিয়েছিল! সকালেও কন্দর্পর সঙ্গে তিতিরের কথা হয়েছে, তখনও ওই মেয়ে দিব্যি সহজ স্বাভাবিক, আর সেই মেয়ে কিনা রাত আটটার পরে, বলা নেই কওয়া নেই, একটা ছেলের সঙ্গে হাপিস! একটা কিছু তো আভাস ইঙ্গিত থাকবে! উহুঁ, কন্দর্প ঠিক মেনে নিতে পারছে না।

ঘরের একদিকে সার সার সবুজ আলমারি। উঠে গিয়ে একটা আলমারির মাথা থেকে গোটাকতক ধুলো মাখা ফাইল নামাল ডিউটি অফিসার। চটাস চটাস ঝাড়ছে। পাখার হাওয়ায় ধূলিকণা ছড়িয়ে গেল ঘরময়। একটা আঁধছেড়া মোটা ফাইল নিয়ে টেবিলে ফিরল। সরু ফিতে খুলতে খুলতে বলল, —ছবি এনেছেন মেয়ের?

সুদীপ ঝটিতি পকেট থেকে একটা ছোট্ট খাম বার করল। পাসপোর্ট সাইজের ছবি, হায়ার সেকেন্ডারির অ্যাডমিট কার্ডের জন্য তোলা। বুদ্ধি করে খুঁজে-পেতে এনেছে।

চোখ কুঁচকে ছবিখানা দেখছে ডিউটি অফিসার, —এ তো বেশ সুন্দরী দেখছি। এসব মেয়ে একবার উধাও হয়ে গেলে তো আর...। হুঁউ, অ্যাপারেন্টলি মুখটাও বেশ ইনোসেন্ট।

—অ্যাপারেন্টলি নয়, ও সত্যিই ইনোসেন্ট।

—থাক। হাত তুলে উত্তেজিত সুদীপকে দমিয়ে দিল লোকটা, —পূতপবিত্র মুখ তো জীবনে কম

দেখলাম না ! এর থেকে ঢের ইনোসেন্ট ফেস ঠাণ্ডা মাথায় মা বাপকে জবাই করে পিরিতের নাগরের সঙ্গে কদম্বতলায় বসে থাকে ।

—আহ্ অফিসার, হোয়াই ডোন্ট ইউ বিলিভ আস ? আমাদের মেয়ে ডিফারেন্ট, একদম অন্যরকম । আমি বলছি সে স্বেচ্ছায় কোথাও যায়নি । শি হ্যাজ বিন কিডন্যাপড্ ।

—যাহ্ শালা । এ যে ফ্রেশ চার্জ । সেকশান থ্রিসিক্সটিসিক্স ! না না, এ তো মাইনর গার্ল । মানে ! থ্রিসিক্সটিসিক্স-এ !

—তাহলে তাই লিখুন । সুদীপ ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে, —কোনও কারণে রাস্তায় বেরিয়েছিল, কেউ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তুলে নিয়েও যেতে পারে ।

একটা হোমগার্ড কেটলিতে চা এনেছে । ইলেকশানের দৌলতে থানায় আজ রাতে চা-অলাদেরও মোচ্ছব । গরম ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে ডিউটি অফিসার ঠাণ্ডা চোখে তাকাল, —আপনারা কি চান বলুন তো ? যদি কোনও ছেলের সঙ্গে ভেগে থাকে তাকে হাতকড়া পরাতে চান ?

—মানে ?

—গরমকালের ভর সন্ধেবেলা একটা মেয়ে নিজে নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিডন্যাপড হয়ে গেল ! সাক্ষী আছে ?

সুদীপ দু দিকে মাথা নাড়ল, না ।

—তাহলে শুধু মিসিংই লিখছি । ...ঠিক কোন সময়ে মেয়ে পালিয়েছিল ? স্পেসিফিক টাইম বলুন ।

—আবার পালিয়েছে বলছেন ? লিখুন, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । কন্দর্প আহত মুখে বলল ।

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হো হো হেসে উঠল ডিউটি অফিসার, —কেন ভাবের ঘরে চুরি করছেন মশাই ! মানুষ উবে যায় না । হয় নিজেই চলে যায়, নয় কেউ ফুসলে নিয়ে যায় । বলতে বলতে ঝপ করে গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা, —ধরে নিলাম আপনাদের মেয়ে অতি সুশীল । পেয়ার মোহব্বত দিল্লাগি কিছুই বোঝে না । সুতরাং কারুর সঙ্গে পালায়ওনি । তাহলে অন্য যে ব্যাপারটা ধরে নিতে হয় সে তো আরও মারাত্মক । আপনাদের মেয়ে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে । কেন গেছে ? নিশ্চয়ই কারণটা আপনাদের বাড়ির ভেতরেই আছে, আপনারা চেপে যাচ্ছেন । নিশ্চয়ই ওই মেয়েকে আপনারা বকাবকি করেছেন, নয়তো মারধর করেছেন । অথবা এমন কিছু বলেছেন যাতে ওই বয়সের মেয়ে... । আপনাদের মেয়ে সবে তো হায়ার সেকেন্ডারি দিয়েছে, রেজাল্টের এখনও ঢের বাকি, এটাও মোটেই পরীক্ষায় ফেল মেরে গঙ্গার ঘাট কি রেলের লাইনের দিকে দৌড়নোর সিজন নয়... অতএব বলা যায় মেয়ে যদি ছুপকে ছুপকে লটঘট করে না কেটে পড়ে থাকে, অর্থাৎ আপনাদের কথামতো মেয়ে যদি সত্যিই ভাল হয় তাহলে আপনাদের মধ্যেই একটা বড়-সড় গলতি রয়ে গেছে । আপনাদের সংসারের মধ্যে । মধ্যবিত্ত বাড়ির কেচ্ছার তো শেষ নেই ! কী খুঁড়তে যে কী বেরোবে ! কি বুঝলেন ?

লোকটার অযাচিত মন্তব্যে নতুন করে তপ্ত হয়ে উঠছিল সুদীপ, গলা চড়াতে যাচ্ছিল, তার আগেই আদিত্য হাউহাউ কেঁদে উঠেছে, —আমি কিছু বুঝতে চাই না দারোগাবাবু, আপনি শুধু আমার মেয়েটাকে ফেরত এনে দিন । ওর কিছু হয়ে গেলে আমি মরে যাব । মেয়েটা আমার...

—আহ্ দাদা, শান্ত হও । কন্দর্প কাতর মুখে অফিসারের দিকে তাকাল, —আপনার যা লেখবার লিখুন । অ্যান্ড প্লিজ ডু সামথিং ।

লোকটাও একটু যেন থমকেছে । পুলিশের উর্দি থেকে একটা মানুষ মানুষ ভাব দেখা দিয়েছে এতক্ষণে । ঈষৎ নরম গলায় বলল,— দেখছি কি করা যায় । কাল বাদে পরশু ইলেকশান, পুলিশ ফোর্সের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই, কে কোথায় যায়... এর মধ্যে এর সিকিউরিটি, তার সিকিউরিটি... তার মধ্যে আপনারা এমন একটা ঝামেলা নিয়ে এলেন... আমি মিসিং পারসনস স্কোয়াডকে এখনই মেসেজ দিয়ে দিচ্ছি । নিয়ার বাই পি এস-গুলোকেও ওয়্যারলেসে ইনফর্ম করে

দিচ্ছি। বাই দা বাই, আপনারা কি হসপিটালগুলোতে খোঁজখবর করেছেন? বাইচান্স যদি অ্যাক্সিডেন্ট...

আদিত্য বেভুলের মতো ভাইদের দিকে তাকাল।

ডিউটি অফিসার বলল,— আমি দেখছি। আপনারাও খোঁজ করে দেখুন। ও, একটা পয়েন্ট নোট করা হয়নি। কি ড্রেস ছিল মেয়ের?

এটা তো কারুর জানা নেই! সুদীপ ঢোঁক গিলে বলল,— সম্ভবত সালোয়ার-কামিজ।

—এই তো মুশকিল, স্পেসিফিক বলতে পারছেন না! মেয়ের কোনও বন্ধুবান্ধবের অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার আছে?

—বাড়িতে আছে। লাগলে বাড়িতে গিয়ে ফোনে...

—ঠিক আছে, আপনাদের ফোন নাম্বার তো রইল। লাগলে আমি নিজেই চেয়ে নেব।

ডায়েরির কপি নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো থানা থেকে বেরিয়ে এল তিন ভাই। নির্বাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ক্যাঁচ করে সামনে একটা পুলিশ ট্রাক এসে থামল। একের পর এক সশস্ত্র উর্দিধারী নেমে আসছে। নির্বাচনের প্রস্তুতি। ভারী বুটের শব্দে গমগম করে উঠল রাত।

কন্দর্পর চোখ করকর করছে। এত পুলিশে ছেয়ে আছে থানা, নিশ্চয়ই শহর জুড়েও আজ পুলিশের কমতি নেই, কিন্তু তাদের মেয়েটাকে খোঁজার জন্য একজনও নেই কোথাও। কত মহৎ কাজে ব্যস্ত থাকবে এরা, কোথায় কোন সংসারে এক নগণ্য মেয়ে হারিয়ে গেছে তাতে কার কি আসে যায়! সাধে কি নকশালরা রাষ্ট্রযন্ত্র শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে থুতু ছেটাত।

পকেট থেকে ডায়েরির কপি বার করল সুদীপ। খুলল, ভাঁজ করল, আবার পকেটে রাখল। হঠাৎ চমকে তাকিয়েছে,— এই চাঁদু, দাদা কোথায় গেল রে?

কন্দর্প এদিক ওদিক তাকিয়ে আদিত্যকে দেখতে পেল না। এই তো পাশে ছিল, গেল কোথায়!

আধো অন্ধকার রাস্তায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো এগিয়েছে দু ভাই। কয়েক পা গিয়েই দেখতে পেল আদিত্যকে। নির্জন পথে হাঁটছে দ্রুত গতিতে।

সুদীপ চেঁচাল,— দাদা? অ্যাই দাদা? কোথায় যাচ্ছিস?

আদিত্য তাকাল না।

কন্দর্প দৌড়ে গিয়ে ধরেছে,— এদিকে হাঁটছ কোথায়?

আদিত্য আচ্ছন্নের মতো তাকাল,— পুলিশ আমাদের খুঁজে দেখতে বলল যে! যদি তিতির এদিকেই গিয়ে থাকে।

—খ্যাপামি কোরো না। চলো, বাড়ি চলো।

—তোরা যা। আমি একটু দেখি। এই রাত্তিরে মেয়েটা কোথায় একা একা ঘুরছে! মেয়েটার তো আজ খাওয়াও হয়নি!

এমন একটা ভারী মুহূর্তে তিতিরের খাওয়ার কথা মনে পড়ল দাদার! এমনটাও হয়! কন্দর্পর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। এই প্রথম তিতিরের ওপর রাগ হচ্ছিল কন্দর্পর! দাদার মতো মানুষকে কষ্ট দিয়ে চলে গেল তিতির! পারল যেতে!

দাদাকে টানল কন্দর্প,— চিন্তা কোরো না। তিতির চলে যাবেটা কোথায়? ঠিক ফিরে আসবে। আমরা ঠিক ওকে খুঁজে বার করব।

আদিত্য ফ্যালফ্যাল মুখে বলল,— ও কি রাগ করে চলে গেল চাঁদু?

—কার ওপর রাগ?

—ওই যে দারোগাবাবু বলল ...তোর বউদি হয়তো সত্যিই ওকে খুব বকাঝকা করেছে।

ইশ, কন্দর্পর মাথায় এ চিন্তাটা এতক্ষণ আসেনি কেন? তিতির আর বউদির আজকাল সাপে-নেউলে সম্পর্ক, অহরহ খিটিমিটি চলছে, কিন্তু তার জন্য তিতির গৃহত্যাগ করবে এ কথাও তো ঠিক বিশ্বাস হয় না।

জবাবটা এড়িয়ে আদিত্যকে নিয়ে গাড়িতে ফিরল কন্দর্প।

আদিত্য পিছনের সিটে বসেছে। সামনে কন্দর্প সুদীপ। রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা, তবু গাড়ি চলছে ধীরে, বেশ ধীরে। মৃদু একটা শব্দ উঠছে ইঞ্জিন থেকে, ঠিক যেন হৃদয়ের শব্দ। গুমরোচ্ছে। বহুকাল পর বড় ঘনিষ্ঠ হয়েছে তিন ভাই, কিন্তু তিনজনের চিন্তা ছুটছে তিন দিকে। কন্দর্প ভাবছিল অশোক মুস্তাফিকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? অশোকদার তো কলকাতা পুলিশের অনেক বিগ শটের সঙ্গে চেনাজানা। সে চেষ্টা করলে পুলিশ কি একটু বেশি উদ্যোগী হবে না! কিন্তু সেদিন যে বিশ্রী ঝগড়াটা হয়ে গেল, তারপর কি অশোকদা আর তাকে সাহায্য করবে! ফিলম লাইনের আর কাকে ধরা যায়? লালবাজারের ক্রাইম ব্রাঞ্চে বিপ্লব ছিল আগে, কলেজের বন্ধু, এখনও কি সে ওখানেই আছে? অনেককাল তো আর যোগাযোগ নেই। কাল সক্কালবেলা কি একবার যাবে লালবাজারে? এই ইলেকশানের ডামাডোলে লাভ হবে কোনও? সুদীপের মনে প্রশ্ন জাগছিল, শুভাশিসদাকে খবর দেওয়া হয়েছে কি? দাদা আর চাঁদু যেভাবে দৌড়ে এল, মনে হয় শুভাশিসদার কথাটা ওদের মাথায় আসেনি। হাসপাতাল টাসপাতালে খবরাখবর নিতে গেলে শুভাশিসদাই ফিটেস্ট পারসন। কিন্তু রাত এখন দেড়টা, এখন কি শুভাশিসদাকে ডাকাডাকি করাটা উচিত হবে? রায়বাড়ির কারুর বিপদ হয়েছে শুনলে যত রাতই হোক শুভাশিসদা কিন্তু ছুটে আসবেই।

আদিত্য অবশ্য এসব কিছুই ভাবছিল না। তার বুক জুড়ে এখন শুধুই তিতির। ছোট্ট তিতির, পুতুল তিতির, লাজুক তিতির, হাস্যমুখী তিতির, অভিমানী তিতির, সেবিকা তিতির, রাগে গরগর তিতির। একটার পর একটা তিতির। কোথায় গেলি তিতির? ফিরে আয়।

৯৬

এক একটা রাত কখনও কখনও এমন নিষ্ঠুর হয়! হিংস্র পশুর মতো সময়ের টুঁটি কামড়ে ধরে থাকে। ছাড়তেই চায়, ছাড়তেই চায় না। মনে হয় এ রাতের হাত থেকে বুঝি আর কোনওভাবে নিস্তার নেই।

তবু যায় রাত। সময়ের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে হার মানে এক সময়ে। প্রহর ফুরোয়।

রাতভর স্থির বসেছিল তিতির। নিদ্রাহীন, নিস্পন্দ। লম্বা রাতের শেষে কখন যেন চোখের পাতা ভারী হয়ে গেল। তখনই স্পষ্ট শুনতে পেল ডাকটা, ফিরে আয় তিতির, ফিরে আয়।

বাবার গলা!

চমকে চোখ খুলল তিতির। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। আলো আঁধারে কড়িবরগা পাখা দেওয়াল দরজা জানলা সব কেমন অন্যরকম। এ কার ঘর? কার বিছানা? কোথায় আছে তিতির?

ক্ষণ পরেই মনে পড়ে গেছে। বাড়ি ছেড়ে সে তো চলে এসেছে বহু দূর, এখানে বাবা আসবে কোত্থেকে!

সবে ভোর ফুটছে। খোলা জানলার বাইরে আবছা আবছা সাদাটে আলো। যেন আলো নয়, আলোর মায়া। কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল পিক পিক। ছলাত করে একঝলক শিরশিরে হাওয়া ঢুকে পড়েছে ঘরে, ছুঁয়ে গেল তিতিরকে। পৃথিবী এখন কী স্নিগ্ধ! কী নরম!

হঠাৎই তীব্র এক কষ্টে তিতিরের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। বাবার জন্যে, শুধু বাবার জন্যে। একটা লোহার বল আটকে গেছে গলায়, বুজে এল কণ্ঠনালী। বাবার জন্যে, শুধু বাবার জন্যে। খরখরে শুকনো চোখে হঠাৎ জ্বালা জ্বালা ভাব। বাবার জন্যে, শুধু বাবার জন্যে।

বাবা কি পাগলের মতো খুঁজছে তিতিরকে!

দূর দূর, কে বাবা! কার বাবা! তিতিরের কোনও বাবা ফাবা নেই। ওরে বোকা মেয়ে, সত্যিটাকে মেনে নে, হজম কর, মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। যা ফেলে এসেছিস তা ফেলেই এসেছিস।

তার জন্য এখনও কেন পিছুটান !

ভাবতেই তিতির ঝাঁকি খেয়ে সিধে হল। পিছুটানের কথা আসে কোত্থেকে ! সে কি ফেরার কথা ভাবছে ! ওই শয়তানীটার কাছে ! ওই নষ্টচরিত্র মেয়েছেলেটার নকল সংসারে ! কক্ষনও না।

পার হয়ে আসা রাত ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ল তিতিরের বুকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন হাঁটছে তিতির। কতদূর হেঁটেছে তিতির ? যাদবপুর ফাঁড়ি ? সামনে একটা টেলিফোন বুথ, তিতির থমকে দাঁড়াল। একটা মোটাসোটা অবাঙালি ব্যবসায়ী ফোন করছে, ফুটপাথে পায়চারি করছে তিতির। অনন্তকাল কথা বলে যাচ্ছে লোকটা, ছটফট করছে তিতির। লোকটা বেরোতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছে রিসিভার। কাকে ডাকবে ? কোথায় যাবে ? ঝুলন ? দেবস্মিতা ? টোটোকে ফোনে ছ্যারছ্যার করে বলে দেবে সব কিছু ? চুরমার করে দেবে সুখী অহঙ্কারী ছেলেটার মুখ ? থাক, আদরের ছেলে নিশ্চিন্তে ঘুমোক লম্পট বাপটার কোলে। সুখে থাক।

তিতিরের আঙুল ডায়াল ঘোরাচ্ছে,— আমি তিতির বলছি। ...হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তিতির। তুমি এক্ষুনি একবার আসতে পারবে ?

—কোথায় ?

—আমি যাদবপুর থানার সামনে ওয়েট করছি। শিগগিরই এসো।

—কি হয়েছে তোমার বলো তো ? এত তড়বড় করছ কেন ?

—আহ, যা বলছি শোনো। এক্ষুনি চলে এসো। এক্ষুনি।

আনোয়ার শাহ রোডের দিকে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে তিতির। নটা বত্রিশ... নটা পঁয়ত্রিশ... চল্লিশ... পঁয়তাল্লিশ...। উফ, কী ক্যালাস ছেলে ! এইটুকু আসতে এতক্ষণ লাগে !

অবশেষে এসেছে। দুলতে দুলতে। মুখে এক গাল হাসি,— মাঝরাত্তিরে জরুরি তলব কেন ? আমার সঙ্গে পালাবে নাকি ?

—হ্যাঁ। এক্ষুনি। এই মুহূর্তে।

—মসকা মারছ ! হেসে উঠতে গিয়েও থমকেছে সুকান্ত,— কেসটা কি বলো তো ? মুখে লোডশেডিং কেন ? বাড়িতে বাওয়াল হয়েছে ?

—বাজে বোকো না। যা বলছি, পারবে ? যাবে আমার সঙ্গে ?

—এত তেতে আছ কেন ? মাথা ঠাণ্ডা করো। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না। বাড়িতে আমি ফিরব না।

—রাগ করে বাড়ি থেকে কাটার পরিণাম কি জানো ? তুমিও ধরা পড়বে, আমিও ফেঁসে যাব।

—তুমি ভয় পাচ্ছ ? এত যে মুখে বুকনি শুনি, ভালবাসা ! ভালবাসা ! আমার জন্য নাকি জীবন দিতে পারো ! ... থাক, তোমাকে আমার দরকার নেই।

বলেই উল্টো মুখে হাঁটা দিয়েছে তিতির।

দৌড়ে এসে খপ করে কবজি চেপে ধরল সুকান্ত,—কী পাগলামি করছ !

—আমাকে ছেড়ে দাও। ছাড়ো বলছি।

সুকান্ত তবু হাত ছাড়ছে না,—হয়েছে কি খুলে বলো তো ? রাগী বাপটা বকেছে ? মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছ ?

রাগে তিতিরের মুখে বাক্য সরল না।

—এরকম করে না। লক্ষ্মী মেয়ে ...

—অ্যাই অ্যাই, উপদেশ দিয়ো না। আমি লক্ষ্মী মেয়েও নই, বাচ্চা মেয়েও নই। তুমি আমাকে কতটা চেনো, অ্যাঁ ? এক হেঁচকায় হাত ছাড়িয়ে নিল তিতির,—তুমি কি ভাবছ একা একা আমি কোথাও যেতে পারি না ?

—কোথায় যাবে ?

—যেখানে খুশি। জাহান্নমে। নরকে।

তিতির কি খুব চেঁচাচ্ছিল ? ভিড় জমে যাচ্ছিল কি চার পাশে ? বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত মানুষের অত কিছু স্মরণে থাকে না । শুধু মনে আছে, কোত্থেকে একটা ট্যাক্সি ডাকল সুকান্ত । ঝড়ের গতিতে ছুটেছে ট্যাক্সি, সোজা শেয়ালদা স্টেশন । তারপর যেন কি হল ? তারপর যেন কি হল ? সুকান্তর পিছন পিছন এক ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে উঠেছে তিতির, ভোঁ ভোঁ করছে মাথা । আশপাশে এত লোক, ঘাম, দুর্গন্ধ, চিৎকার, তবু যেন কোথাও কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই । অন্তহীন সময়ের পর কি একটা স্টেশনে যেন নামল তারা, প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে হাঁটছে পিচ রাস্তায় । ডাইনে ঘুরল, বাঁয়ে ঘুরল, ডাইনে ঘুরল, বাঁয়ে ঘুরল । তারপরই তো এই বাড়ি ! সুকান্ত বেশ কয়েক বার হাঁকডাক করার পর এক আধবুড়ো মতো লোক গেট খুলে দিল । ঘরের দরজাও । লোকটা খুব অবাক হয়ে দেখছিল তিতিরকে । কি দেখছিল ? বাজে মেয়ে ভাবছিল ? বয়েই গেল তিতিরের । ওই ডাইনিটার চেয়ে তো খারাপ নয় ! তিতিরের তো কোনও ভণ্ডামি নেই ! উফ্, তিতির কাল মরে গেল না কেন ! ইশ, তিতির মরবেই বা কেন ! ঢং করে পাথর সেজে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ দুটোকে কালই যদি চোখের আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারত তিতির ! চোরের মতো পালিয়ে গেল লোকটা ! মুখ ঢেকে বসে আছে আর এক জন ! বায়োলজিকাল ফাদার ! বায়োলজিকাল মাদার ! থুঃ থুঃ !

এক ঝটকায় তিতির উঠে দাঁড়াল । ঘৃণাটা সাপটে নিয়ে খাটে পড়ে থাকা ওড়না কুড়োল । বিছিয়ে নিল গায়ে । প্রকাণ্ড খাটের পাশে দেওয়ালে একটা গোল আয়না, কারুকাজ করা স্টিল ফ্রেমে বাঁধানো । অজান্তেই চোখ পড়ল আয়নায় । আবছায়া মাখা আরশিতে ও কে ? ঝাপসা ঝাপসা ? এলোমেলো চুল ? মুখ ভরা অন্ধকার ?

চোখ ঘুরিয়ে নিল তিতির । দরজা খুলে বাইরে এসে অবাক হল একটু । গোলমতো বারান্দার এক কোণে বেতের চেয়ারে ঘাড় হেলে আছে সুকান্তর । দু'পা মেঝেতে ছড়ানো । হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো । আরও তো ঘরদোর ছিল, এখানে ঘুমোচ্ছে কেন ? বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু বুঝি মায়াও হল তিতিরের । বেচারার বোধহয় খাওয়া দাওয়াও জোটেনি রাতে । এখানে পৌঁছে টাকা বার করে আধবুড়ো লোকটাকে কি যেন কিনতে পাঠাচ্ছিল মাঝরাতে, এমন বিশ্রীভাবে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল তিতির ! কি করবে, একা থাকতেই যে তখন তিতিরের মন চাইছিল । খিদেতেষ্টার বোধই ছিল না ... !

রাতে কি ডেকেছিল সুকান্ত ? সম্ভবত না । অন্তত তিতির শুনতে পায়নি । বন্ধ দরজার বাইরে সারা রাত তিতিরকে পাহারা দিচ্ছিল ছেলেটা !

ফর্সা হচ্ছে সকাল । প্রচুর পাখপাখালির ডাক শোনা যায় চারদিকে । তিতির পায়ে পায়ে বারান্দার মুখটায় এল । কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি, সামনে একটুখানি লন, তারপর লোহার গেট ঘিরে মানুষসমান পাঁচিল । কাল রাতে জায়গাটাকে অনেক ছোট মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে কম্পাউন্ড বেশ বড় । একটু প্রাচীন প্রাচীন ভাব আছে জায়গাটায় । লনের ডান দিকে ছোট একখানা ঘর, আউটহাউস মতন, দরজায় তার এক মলিন চেহারার ব্লাউজবিহীন মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে । ওটাই কি আধবুড়ো লোকটার ডেরা ? লনের ঘাসগুলো বেশ বড় বড় হয়ে গেছে, ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে বাড়ির পিছন দিকে যাচ্ছে মহিলা । যেতে যেতে তিতিরকে একবার আড়চোখে দেখে নিল । ওদিকে পুকুর টুকুর আছে নাকি ! ওপাশে কয়েকটা কলাগাছ দেখা যায় না ।

—মাথা ঠাণ্ডা হল ?

তিতির ঘাড় ঘোরাল । জেগেছে সুকান্ত । হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছে । চেয়ারে বসে বসে ।

উদাসভাবে তিতির বলল,—মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে ।

—হুঁউ, বুঝলাম । সুকান্ত হাই তুলল,—ঘুমিয়েছিলে একটু ?

অর্থহীন প্রশ্ন । তিতির উত্তর দিল না ।

—মধুদা উঠেছে ? চা ফা দিয়েছে তোমায় ?

—কে মধুদা ?

এ বাড়ির কেয়ারটেকার। দ্যাখোনি কাল রাতে ?

—হুঁ। তিতির ভুরু কুঁচকে তাকাল,—এই বাড়িটা কার ?

—ধরো আমারই।

—মানে ?

—মানে বাবা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ বাবার। তারপর আমারই।

—এখানে তোমাদের বাড়ি আছে কখনও বলোনি তো ?

—বলিনি পলতার বাগানবাড়িটার কথা ? বলেছিলাম, তোমার মনে নেই।

হবেও বা। আলাপের প্রথম দিকে সুকান্ত একটানা তাদের পরিবারের ধনসম্পত্তির ফিরিস্তি দিত, কিছুই তেমন শুনত না তিতির, তখন বলে থাকলেও থাকতে পারে। ইদানীং অবশ্য সুকান্তর শোঅফ করার অভ্যেসটা চলে গেছে।

সুকান্ত উঠে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তিতির আলগাভাবে বলল,—এ বাড়িটা বুঝি ফাঁকাই পড়ে থাকে ?

—ফাঁকা পুরোপুরি থাকে না। বাবা মাঝে মাঝেই আসে। সব ফুর্তিফার্তা তো কলকাতায় হয় না, কিছু কিছু শহরের বাইরে এসে করতে হয়।

—মানে তোমার বাবার ফুর্তির বাড়ি ?

—বলতে পারো।

—তুমিও এখানে আসো নাকি মাঝে মাঝে ? তিতির টেরচা চোখে তাকাল,—কাল দেখলাম লোকটা তোমায় খুব খাতির করছিল।

—সে তো মনিবের ছেলে বলে।

—চিনল কী করে তোমায় ?

—বা রে, দোকানে মাইনে আনতে যায় না ! তখন আমাকে ...

—ব্যাস, ওইটুকুই ?

—না মানে ... এসেছি এক আধ বার ... ন'মাসে ছ'মাসে ... সুকান্ত খপ করে তিতিরের হাত চেপে ধরল,—বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে ভাব হওয়ার পর আমি আর এখানে কোনওদিনও আসিনি।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতে আসত সুকান্ত ? নাকি কাউকে নিয়ে ... ? যাই করুক না, তিতিরের কি আসে যায় ! শান্তভাবে হাতটা ছাড়িয়ে নিল তিতির। সুকান্তকে তো দেবচরিত্র মহাপুরুষ ভেবে তার সঙ্গে চলে আসেনি সে। প্রতিশোধ যদি নিতেই হয়, নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করতে হয়, তবে সুকান্তর চেয়ে যোগ্য সঙ্গী আর কে হতে পারে !

সুকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নিচু করে। একটু পরে ধীর পায়ে লনে নেমে গেল। কেয়ারটেকারের ঘরের দিকে যাচ্ছে। চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল আধবুড়ো লোকটা, অনুগত মুখে কথা বলছে সুকান্তর সঙ্গে। ফিরছে সুকান্ত।

ঝলমল করছে সকালটা। উজ্জ্বল হলুদ আলো এসে পড়েছে পাঁচিলধারের নারকেল গাছটার মাথায়, ঝিকমিক করছে। বাইরের রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল রিকশা হর্ন বাজাতে বাজাতে চলে গেল। কাছে কোথাও কারখানায় ভোঁ বাজছে। আবার একটা দিন শুরু হয়ে গেল।

তিতির বেতের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। সুকান্ত সামনে এল। নিচু গলায় বলল,—মুখটুখ ধুয়ে নিতে পারো। বাথরুমে পেস্ট রাখা আছে।

—নেব'খন।

—খিদে পেয়েছে তো ? আমি কিন্তু জলখাবার বলে দিয়েছি। মধুদা এক্ষুনি চা দিয়ে দিচ্ছে।

সত্যিই পেট চুঁই চুঁই করছে। খিদেতেষ্টার কোনও বোধই ছিল না সারা রাত, সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জৈবিক অনুভূতিগুলো ফিরতে শুরু করেছে। সেই কখন কাল সন্ধেবেলা তিন চামচ চাউমিন

খেয়েছিল, বারো ঘণ্টা হয়ে গেল একটা দানাও পেটে পড়েনি। তিতির চুপচাপ উঠে বাথরুমে চলে গেল। ফিরে দেখল সুকান্ত চিন্তিত মুখে বসে আছে চেয়ারে। চা এসে গেছে, টেবিলে রাখা কাপ দুটো থেকে গরম ধোঁয়া উঠছে।

আর একটা চেয়ার টেনে পাশে বসল তিতির,—কী ভাবছ ?

—কিছু না। সুকান্ত মাথা নাড়ল,—কী ঠিক করলে ?

—কীসের কি ?

—আজ বাড়ি ফিরবে তো ?

—কেন ? আমি থাকলে তোমার অসুবিধে হচ্ছে ?

—তা নয়। কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ ... এতক্ষণে তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই হুলুস্থুল ...

—সে তোমাকে দেখতে হবে না।

—বেশ ...। সুকান্ত চায়ে চুমুক দিল,—কিন্তু আমাকে তো একবার বাড়ি যেতে হবে।

তিতিরের গলায় ব্যঙ্গ ফুটল,—কেন ? বাবা বকবে ?

—নাহ্, বাবা এখন নেই। ব্যবসার কাজে মালদা গেছে, ফিরবে সেই শনিবার।

—তাহলে ?

সুকান্ত জবাব দিল না। একটু সময় নিয়ে বলল,—কি কিচাইনটা হয়েছে একটু খুলে বলো তো ?

দু-এক মুহূর্ত চিন্তা করল তিতির। এখানে যদি থাকতেই হয়, সুকান্তর কাছে একটা কিছু জবাবদিহি করতেই হবে। কী বলা যায় ? কতটা বলা যায় ? আদৌ বলা যায় কি !

নিপুণ অভিনেত্রীর মতো হাসল তিতির,—মনে করো, তোমাকে ভালবাসি বলে সব ছেড়ে চলে এসেছি।

পলকের জন্য সুকান্তর চোখ বিহ্বল। অস্ফুটে বলল,—সত্যি যদি তাই হত !

—সত্যিই তাই।

—আমাকে নিয়ে মজাক করছ ? সুকান্তর গলা কেঁপে গেল,—আমার জন্য তিতির মোটেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসবে না।

—কেন নয় ?

—আমি জানি আমি কী মাল। একটা অপদার্থ, নির্বোধ, বখা ...

ঠিক যেন বাবার কণ্ঠস্বর ! বুকটা টনটন করে, উঠল তিতিরের। নিশ্বাস ভারী হয়ে এল। অকম্পিত রাখতে গিয়েও গলা কেঁপে গেল তিতিরের,—তোমাতে আমাতে এখন আর খুব তফাত নেই সুকান্ত। তুমি বলো, তোমার বাবা তোমার মাকে খুন করেছেন ? আমার মাও তেমনি আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে !

—যাহ্, কী বলছ তুমি ! সুকান্তর চোখ বড় বড় হয়ে গেল, —তোমার মা ...

—সব খুন ফিজিকাল মার্ডার হয় না সুকান্ত। ইংরিজিতে একটা কথা আছে অ্যানিহিলেশান। ধ্বংস। ধরো, সেভাবেই আমার বাবাকে ... প্রাণপণ চেষ্টা করেও তিতির চোখের জল আটকাতে পারল না। ফুঁপিয়ে উঠল,—এর বেশি তোমাকে আর কিছু আমি বলতে পারব না।

সুকান্ত কী বুঝল কে জানে, চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। পায়চারি করছে অশান্ত পায়ে। আর একটা কি প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ করে গেল।

দু আঙুলে চেপে চেপে চোখ মুছল তিতির। নাক টেনে বলল,—যাক গে, আমি ওসব ভুলে গেছি। আমার কোনও পাস্ট নেই। কাল সারা রাত ধরে আমি অনেক ভেবেছি ... আমরা দুজনে নিউ লাইফ স্টার্ট করতে পারি। আমরা বিয়ে করে ফেলতে পারি।

সুকান্ত স্ট্যাচু হয়ে গেল। তোতলাচ্ছে,—বিবিবিবিয়ে !

—হ্যাঁ। বিয়ে। আর এক-দেড় মাসের মধ্যে আমার হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে,

আঠেরো বছর বয়সও হয়ে যাবে ... আমি একটা ছোটখাট চাকরি জোগাড় করে নেব ... এই ধরো, নার্সারি টার্সারি কি কিন্ডারগার্টেনে পড়ানো ... তুমিও একটা কিছু করবে। কারখানা টারখানায় কাজ হোক, যা হোক ... কোনও কাজই তো খারাপ নয়, কী বলো ? ... তবে, কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতে পারবে না। আমরা এখান থেকে চলে যাব। অন্য কোথাও গিয়ে থাকব। ... একদম পরিচিত পৃথিবীর বাইরে ...

এই বয়সই বুঝি এমন অদ্ভুত অবাস্তব কথা বলে যেতে পারে, অবিরাম। এমন বয়সই বুঝি এসব স্বপ্ন বিশ্বাস করতে চায়। জীবন যেন এমনই সোজা সরল পথ ! যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতো অতি সহজ ক্রিয়া ! টোটোর ঘরে দেখা সেই স্বপ্নের বাড়িটার কথা কি মনে পড়ল তিতিরের ! হায় রে বয়স !

নিজেরই অলীক কল্পনায় তিতিরের বুকটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। সার সার মুখের মিছিল দুলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। দাদা ছোটকা অ্যাটম বড় কাকা কাকিমা ... কারুর সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হবে না। দাদা কি বাড়ি এসে খুব মিস্ করবে তিতিরকে ? অ্যাটম খুঁজবে দিদিভাইকে ? ছোটকা একটা ক্যামেরা কিনে দেবে বলেছিল। দামি ক্যামেরা, টোটোর যেমন আছে। ছোটকার বিয়েতে তিতিরের আর থাকা হল না। বড়কাকা কাকিমারও তিতিরের জন্য মন কেমন করবে। করবেই। তিতির জানে। সকলে এরা এত আপন তিতিরের, তবু তিতির এদের কেউ নয় ! এরা কি কেউ জানবে কোনওদিন !

সুকান্তকে লুকিয়ে আবার চোখের জল মুছল তিতির।

ও প্রান্তে রিঙ্ হচ্ছে টেলিফোনে। সুকান্ত ঝুপ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল। হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, হাঁটুর জোড়গুলো যেন ঢলঢলে হয়ে গেছে হঠাৎ। জীবনে অনেক লুচ্চামি তো করেছে সে, আজ তার এই বেহাল দশা কেন !

ক্রেডলে হাত চেপে আছে সুকান্ত। ওষুধের দোকানের কর্মচারী সন্দিগ্ধ চোখে প্রশ্ন করল,—রঙ্ নাম্বার হল ?

দু'দিকে ঘাড় নাড়ল সুকান্ত,—এনগেজড্।

—কলকাতার লাইন তো ?

—হ্যাঁ।

—আজ কলকাতার লাইন এনগেজড্ই থাকবে। কাল ইলেকশান, আজ সারাদিন শুধু লিডারে ক্যাডারে ফোনাফুনি চলবে।

—যত্ত সব বাজে কথা। অন্য দিন যেন এক চান্সে কলকাতার লাইন পাওয়া যায় ! ক্যাশ কাউন্টারের কর্মচারীটি সরবে প্রতিবাদ করল।

দু'জনে তর্ক বেধে গেছে।

সুকান্ত তাদের কথা শুনছিল না। প্রাণপণে শক্ত করে নিচ্ছে নিজেকে। ডায়াল ঘোরাল। তিতির কি বেরিয়েছে স্নান সেরে ? হে ঈশ্বর, এক্ষুনি যেন কিছু টের না পায়।

রিঙ্ বাজতেই পুরুষকণ্ঠ,—হ্যালো !

—আমি কি একটু আদিত্য রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

—কে বলছেন ?

—আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার আদিত্য রায়কে দরকার, তাঁকে একটু ডেকে দিন।

—ধরুন।

ফোন ধরে আছে সুকান্ত। জোরে নিশ্বাস টেনে ফুসফুস দুটোকে পরিপূর্ণ করে নিল। স্বপ্নটা চোখে লেগে থাকতে থাকতেই জেগে ওঠা ভাল।

৯৭

—কালকের জন্য কি মশলা বেটে রেখে যাব বউদি ?

—উঁ ? দূরমনস্ক ইন্দ্রাণী জানলা থেকে ফিরল,— কেন, কাল তুমি আসবে না ?

—বারে, কাল ভোট দিতি যাব না ? আমার তো নাম উঠেছে সেই তালদিতে। সন্ধ্যার মা আঙুলে আঁচলের খুঁট পাকাচ্ছে,— তোমাকে তো পরশু বলেছিলাম।

—ও।

—আজ কিন্তু আমি একটু তাড়াতাড়ি চলে যাব। দিদি জামাইবাবু দেশে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে... দুটো দশের কেনিং-এ।

সন্ধ্যার মা দেশে যাবে শুনলেই ইন্দ্রাণী বিরক্ত হয়। আজ কোনও ভাবান্তর নেই। বলল,— যেয়ো। ...রান্নাবান্না হয়ে গেছে ?

—ভাত বসিয়েছি। ছোড়দা তো আজ বাজারে গেল না ...ফিজে কটা ডিম ছিল, ওরই ঝোল...। ভাজা-টাজা কিছু করতে হবে ?

—থাক।

সন্ধ্যার মা যেতে গিয়েও দরজায় দাঁড়িয়ে গেছে। কী দেখে সন্ধ্যার মা ? ইন্দ্রাণীর মুখে চোখে কি কোনও অস্বাভাবিকতার ছাপ পড়েছে ? গলা কাঁপছে কি তার ? খুব বেশি বিচলিত দেখাচ্ছে ? উঁহু, এমনটা তো হওয়ার কথা নয় ! চরম সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে পর্যন্তই যা আলোড়ন ছিল বুকে, এখন তো আর তা নেই ! ইন্দ্রাণীর হৃদয় এখন উথাল-পাথাল ঝঞ্ঝা শেষে শান্ত সমুদ্র। জলোচ্ছ্বাস থেমে গেছে।

সন্ধ্যার মা'র চোখের দিকে তাকাল ইন্দ্রাণী,— কিছু বলবে ?

—না... বলছিলাম... দিদিমণি কখন ফিরবে গো বউদি ?

—দুটো-তিনটে বেজে যাবে।

—ওমা, সে কি গো ! কদ্দূর গেছে দিদিমণি ? কোন বন্ধুর বাড়ি ?

—তুমি কি ওর সব বন্ধুদের চেনো ?

উত্তরের বদলে পাল্টা প্রশ্ন এল,— ওই প্যান্টশার্ট পরে যে মেয়েটা আসে ? খুব হাত পা নেড়ে কথা বলে ?

—না। অন্য একজন। তুমি চেনো না।

—দাদা কেন দিদিমণিকে আনতে গেল গো ? দিদিমণির কি শরীর খারাপ ?

—ওই একটু।

—কাল তো দিদিমণি ঠিকই ছিল ! সন্ধ্যার মা'র স্বরে অবিশ্বাস,— শরীর খারাপ নিয়ে গেছে ? না গিয়ে হয়েছে ?

—গিয়ে হয়েছে।

—জ্বর ? পেট খারাপ ?

—পেট খারাপের মতো। ...সেইজন্যই রাতে ফেরেনি।

ইন্দ্রাণী বোধহয় জীবনে এই প্রথম সন্ধ্যার মা'র সঙ্গে এত কথা বলছে। নাকি জীবনে শেষবার ? অত প্রশ্নই বা করে কেন সন্ধ্যার মা ? খটকা লেগেছে কোনও ? লাগতেই পারে, সকালে এসে যে দশায় দেখেছে মানুষজনদের ! কেউ মাথায় হাত দিয়ে বসে, কেউ ঘাড় ঝুলিয়ে, কেউ মুখ গুঁজে। একটা করে ফোন বাজে, ঝাঁপিয়ে পড়ে তিন ভাই। সুদীপ কি বাড়ি যাওয়ার সময়ে সন্ধ্যার মা'র সামনে কিছু বেফাঁস কথা বলেছিল ? ফোনটা আসার পর আদিত্য যেমন চেঁচাচ্ছিল, তাতেই কি সন্ধ্যার মা আঁচ করল কিছু ?

কী আসে যায় ! কে কী বুঝল, কে কী ভাবল, কে কী জানল, তাতে আর ইন্দ্রাণীর কী !

তবু তাকে এরকম সাজানো গোছানো মিথ্যে বলতেই হবে। যারা এই পৃথিবীতে এখনও বহুকাল থেকে যাবে তাদের জীবন যাতে আরও বিষময় না হয়ে ওঠে, অন্তত সেইজন্যে। তাছাড়া সত্যি মিথ্যে সবই তো এখন ইন্দ্রাণীর কাছে নিতান্তই অলীক। মিথ্যে দিয়ে যার জীবন সাজানো, সত্যি মিথ্যে নিয়ে ভাবতে বসা তার বোধহয় শোভাও পায় না।

সন্ধ্যার মা রান্নাঘরে গেছে। তার বাসন-কোসন নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ইন্দ্রাণী। ঝনঝন শব্দ হল হঠাৎ, বোধহয় হাত থেকে কাঁসি পড়ে গেল। কী যে করে! সব বাসনগুলোকে তুবড়োচ্ছে!

এ সময়েও এই ভাবনা আসে, আশ্চর্য!

শব্দের রেশটুকু মিলিয়ে যেতেই বাড়ি আবার নিথর, নিস্পন্দ। ইন্দ্রাণী জোরে শ্বাস টানল। না, বাড়িটা নিঝুম বটে, তবে তেমন দমবন্ধ ভাব আর নেই। দিব্যি সহজে নিশ্বাস নেওয়া গেল। বুকের পাথর সরে গেছে বলেই কি এমনটা বোধ হচ্ছে?

পাথর সরল? না পাথরের নীচে চাপা পড়ে গেল ইন্দ্রাণী? আমূল। আপাদমস্তক।

টেলিফোন বেজে উঠেছে। সহসা। বাইরে, খাওয়ার জায়গায়। ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য ছিঁড়েখুঁড়ে ককিয়ে ককিয়ে বাজছে। ইন্দ্রাণীর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে গেল। শুভ নয় তো? ওই একটি ফোনের থেকে সে শত হস্ত দূরে থাকতে চায়। এখন, এই মুহূর্তে। কাল রাতে দীপু চাঁদু বারকয়েক শুভর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল, ইন্দ্রাণীই বারণ করেছে। অনেক তো হল, আর জটিলতা বাড়িয়ে কী লাভ! তিতির যখন মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল, কী ভীষণ পাংশু হয়ে গিয়েছিল শুভর মুখ! তারপরে মাঝরাতে ওই দুঃসংবাদ কি সহ্য করতে পারত শুভ! অত মনের জোর শুভর নেই। হয়তো বেশি উদভ্রান্ত হয়ে পড়ত, হয়তো ধরা পড়ে যেত ছন্দার কাছে। মাগোঃ, ভাবতেই শরীর অবশ হয়ে আসছে। হৃৎপিণ্ডে সপাং সপাং চাবুকের আওয়াজ। জানলে জানুক শুভ, নিজে নিজে জানুক। খবর দিয়ে ইন্দ্রাণী আর নিমিত্তের ভাগী হতে রাজি নয়।

সন্ধ্যার মা টেলিফোন ধরে চেঁচাচ্ছে,— মেজদা তোমায় ডাকছে গো বউদি।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ইন্দ্রাণীর। স্খলিত পায়ে এসে রিসিভার তুলেছে।

—হ্যালো বউদি? ...চাঁদু এই মাত্র খবর দিয়ে গেল। উফ, কী রিলিফ!

—হুঁ। অজান্তেই ইন্দ্রাণীর গলা বেয়ে শব্দটা উঠে এল।

—ছেলেটা কে? চেনো তুমি?

—নাহ্।

—ছেলেটাকে ভাল বলতে হবে।

—হুঁ।

—বেঁচে গেল মেয়েটা। কত কি হয়ে যেতে পারত, বলো তো? ...ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

—হুঁ।

দু-এক সেকেন্ড থেমে রইল সুদীপ,— আমি তা হলে এখন আর ও-বাড়ি যাচ্ছি না বউদি। বিকেলে রুনা অ্যাটমকে নিয়ে...। রুনাও কাল সারা রাত ঘর-বার করেছে। ভাবছি দুপুরে একটু রেস্ট করে...

—ঠিক আছে।

—বউদি, একটা কথা বলব? তিতির ফিরলে তুমি কিন্তু প্লিজ ওকে বকাবকি কোরো না। ঝোঁকের মাথায় একটা ভুল করে ফেলেছে...

—হুঁ।

—বোঝোই তো, এই বয়সের মেয়েরা সব সময়েই একটু হাই স্ট্রাং থাকে। কোথায় কখন কি কথায় মানে লেগে যায়...

—হুঁ।

—তাহলে বিকেলে দেখা হচ্ছে। রাখছি।

রিসিভার নামিয়েই ইন্দ্রাণী ঘড়ি দেখল। এগারোটা বাজতে পাঁচ। সময় নেই, হাতে আর বেশি সময় নেই। আদিত্য নিশ্চয়ই এতক্ষণে শেয়ালদা পৌঁছে গেছে। সন্ধ্যার মাকে বলল বটে ওদের ফিরতে দুটো-তিনটে হবে, তার আগেও তো এসে যেতে প্যারে। যদি আসে ? চাঁদু তো বলেই গেল, সামান্য কাজ আছে স্টুডিওতে, চারটের মধ্যে ফিরবে। যদি আরও আগে এসে যায় ? সন্ধ্যার মা'ই বা যাবে কখন ? এখনই ছুটি দিয়ে দেবে সন্ধ্যার মাকে ? না। যদি কিছু সন্দেহ করে ?

নিপুণ অপরাধীর মতো একটুক্ষণ মনে মনে হিসেব ছকল ইন্দ্রাণী। তারপর দ্রুত কাঁধে শাড়ি সায়া ব্লাউজ গুছিয়ে নিল। বাথরুমে ঢোকার আগে ডাকল সন্ধ্যার মাকে,— ভাত গালা হল ?

—হ্যাঁ বউদি। এবার সব টেবিলে গুছিয়ে দিচ্ছি।

—কালকের মশলা কি বাটা হয়ে গেছে ?

—না। যাওয়ার আগে করে দিয়ে যাব।

—থাক, লাগবে না। তুমি ভাত খেয়ে চলে যাও। খাবারগুলো সব ভাল করে ঢাকা দিয়ে যেয়ো।

—সে কি ! তুমি খাবে না ?

—ওরা ফিরলে খাব।

—সকাল থেকে কিছু দাঁতে কাটোনি, তারা কখন ফিরবে ঠিক নেই...

—যা বলছি করো। ধমকে উঠতে গিয়েও ইন্দ্রাণী স্বরের অসহিষ্ণুতা সতর্কভাবে দমন করল,— আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। কাল নিশ্বাসের খুব কষ্ট হচ্ছিল, রাতে ভাল ঘুম হয়নি। চান করে আমি একটু শোব। ডেকো না। যাওয়ার সময়ে গেটে তালা দিয়ে চাবিটা বারান্দায় ফেলে দিয়ে যেয়ো।

—ছোড়দা কয়েকটা জামা প্যান্ট রেখে গেছে, কেচে দিয়ে যাব ?

মুহূর্তের জন্য টাল খেয়ে গেল ইন্দ্রাণী। এ সময়ে এভাবেই বুঝি বিঘ্ন আসে। সব কিছুতেই 'না না' 'থাক থাক' করাটা কি সোজা চোখে দেখবে সন্ধ্যার মা ? উঁহু, সময় বয়ে যাচ্ছে, সময় বয়ে যাচ্ছে।

স্বর অকম্পিত রাখল ইন্দ্রাণী,— এখন ভিজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাচলে তোমার ছোড়দার জামাকাপড় পরিষ্কার হবে ? পরশু এসে কেচো।

সন্ধ্যার মা'র মুখে খুশির ঝলক। বাথরুমে ঢুকে ইন্দ্রাণী দরজা বন্ধ করল ! দরজার পিঠে কন্দর্প একটা আয়না লাগিয়েছে, অনেক সময়ে বাথরুমেই দাড়ি কামায়। নিষ্পলক ইন্দ্রাণী আয়নায় দেখছে নিজেকে। কার মুখ বিম্বিত হয়েছে আরশিতে ? চোখের কোল কুঁচকে যাওয়া, হনুর হাড় ঠেলে ওঠা, খসখসে চামড়ার ওই নারীই কি ইন্দ্রাণী ? এর কাছেই কি ছুটে আসে শুভ ? এর মুখের একটু হাসি দেখার জন্যই কি ব্যাকুল হয়ে থাকে আদিত্য ? কক্ষনও না। ওটা একটা ভুল ইন্দ্রাণী। অন্য কেউ। ইন্দ্রাণীর ছদ্মবেশে এক সর্বনাশা স্ত্রীলোক। এ জীবনে যা যা করতে চায়নি ইন্দ্রাণী, তাকে দিয়ে সেই সেই কাজ করিয়ে নিয়েছে ওই মহিলা। ঠিক ঠিক মুহূর্তে ইন্দ্রাণীর মনের সমস্ত জোর কেড়ে নিয়েছে।

আজ তোর শেষ দিন। আমি নেই তো তুইও নেই !

ইন্দ্রাণী জোরে শাওয়ার খুলে দিল। অবিরল জলধারায় ধুয়ে যাচ্ছে নিরাবরণ দেহ, প্রতিটি রোমকূপে জলকণার স্পর্শ অনুভব করছে ইন্দ্রাণী। চেপে চেপে ঘা ঘষল, ডলে ডলে মুখ ঘষছে। থুপে থুপে প্রতিটি চুলে ছোঁয়া লাগাচ্ছে জলের। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর নিজেকে শেষবারের মতো স্নান করাচ্ছে ইন্দ্রাণী !

হঠাৎই বুকটা হু হু করে উঠল। এখন থেকে বাকি সময়টা কত কাজই তো শেষবারের মতো করা হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো চুল আঁচড়াবে, শেষবারের মতো টিপ পরবে

কপালে, শেষবার চেনা বিছানায় শোবে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবে একবার, শেষবারের মতো ? শেষ কাজগুলো সব কমে যাবে ক্রমশ, তারপর, তারপর...

স্নান সেরে শুকনো জামাকাপড়গুলোর দিকে ইন্দ্রাণী শেষবারের মতো হাত বাড়াল। যাহ্, শাওয়ারের ছাঁটে শাড়ি সায়া ব্লাউজ সব ভিজে গেছে। কোনও মানে হয় ? কতদিন ধরে ওদিকের দেয়ালে একটা অ্যালুমিনিয়াম ব্র্যাকেট টাঙাবে টাঙাবে ভাবছে, আর হয়ে উঠল না।

আলগা শাড়ি জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ইন্দ্রাণী। ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে ভেজাল দরজা, সন্তর্পণে ছিটকিনি তুলে দিল। শেষবারের মতো।

পৃথিবীতে আজ বড় তাত। নির্মেঘ আকাশে দাউ দাউ জ্বলছে সূর্য। খর গ্রীষ্মের তীব্র দাহে পুড়ছে আকাশ, পুড়ছে মাটি, মানুষ পুড়ছে। পশুপাখিরা খুঁজছে শীতল আশ্রয়, গাছেরা এখন রুদ্ধশ্বাস।

পুকুরপাড়ে জামরুল গাছের ছায়ায় বসেছিল তিতির। পুকুর নয়, ডোবা একটা। মিহিন সবুজ পানায় ঢেকে আছে তার জলতল। গরম বাতাস বইছে হঠাৎ হঠাৎ। জল কাঁপছে থর থর, তিতিরের চোখ সেই জলে স্থির। জলে, না ঘন সবুজ পানায় ? ছোট ছোট মাটির ডেলা কুড়োচ্ছে মেয়ে, ছুঁড়ছে ডোবায়। ফেটে যাচ্ছে সবুজ আস্তরণ, বৃত্তাকার তরঙ্গ ফুটে উঠছে জলে। ভেঙে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। সবুজ পানা ছেতরে যাচ্ছে। বিশ্রীভাবে।

খানিক দূর থেকে দৃশ্যটা একটুক্ষণ দেখল আদিত্য। চারদিকে অকরুণ রোদ্দুরের মাঝে একটুখানি ছায়ায় কী দুঃখী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে !

নিচু গলায় আদিত্য ডাকল,— তিতির ?

অন্যমনস্কভাবে ওপর পানে তাকাল তিতির, যেন চেনা কোনও পাখির ডাক শুনতে পেয়েছে। পরমুহূর্তেই ভীষণ চমকে পিছন ফিরল,— তুমি ! তুমি কোত্থেকে এলে ?

—বাড়ি থেকে। আদিত্য বিহ্বল গলায় বলল,— তোকে আমি সারা রাত পাগলের মতো খুঁজেছি রে তিতির।

তিতির ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে,— জানলে কী করে আমি এখানে আছি ? বলেই চোখ ছোট করল। কয়েক পা দৌড়ে গেল কটেজের দিকে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে,— সুকান্ত গেল কোথায় ?

—এই তো ছিল। হয়তো ওদিকে বারান্দায়... আদিত্য হাসার চেষ্টা করল,— ওই তো আমাকে স্টেশন থেকে...

কথা শেষ হল না, তার আগেই তীর বেগে ছুটে গেছে তিতির। লম্বা লম্বা ঘাস মাড়িয়ে ছপছপ সমুখভাগে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড নিশ্চল থেকে আদিত্যও দৌড়েছে পিছু পিছু।

বারান্দার এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, তিতির এক লাফে তার সামনে পৌঁছে গেছে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল,— তুমি খবর দিয়ে দিয়েছ ? তুমি ! ইউ বিট্রেয়ার।

ছেলেটা মাথা নিচু করল। কথা বলছে না।

টকটকে লাল হয়ে গেছে তিতিরের মুখ। নাকের পাটা ফুলছে, তোমার সঙ্গে বেরোনই আমার ভুল হয়েছে। কাপুরুষ... স্পাইনলেস...

ছেলেটা ঘাড় গোঁজ করে বলল,— যা করেছি তোমার ভালর জন্যই করেছি।

—হু দা হেল ইউ আর টু সি মাই ভাল ? রাগী টাট্টু ঘোড়ার মতো মেঝেয় পা ঠুকছে তিতির,— আমার ভাল মন্দ দেখার তুমি কে ?

ছেলেটা মিন মিন করে বলল,— আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

—চোপ। কর্তব্য দেখাচ্ছ ? ভাল ছেলে সাজছ ? তিতির ঠাস করে ছেলেটার গালে চড় কষিয়ে দিল,— এত কাকে ভয়, অ্যাঁ ? বাপকে ? পুলিশকে ? সোজাসুজি আমায় সেটা জানিয়ে দিলেই পারতে ? আমি এখান থেকে চলে যেতাম !

চোখে দেখেও তিতিরের এই খুনে রূপ বিশ্বাস হচ্ছিল না আদিত্যর। তার তিতির পাখি কবে এত পালটে গেল! মাত্র একদিনে কেউ এমন আদ্যন্ত বদলে যায়!

কয়েক পল স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থেকে হন হন বারান্দায় উঠে এল আদিত্য। ভারিক্কি গলায় বলল,— ওকে অত বকছিস কেন? ঠিক কাজই করেছে। কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছিস...

তিতির আদিত্যকে দেখলই না। দু চোখে আগুন ছেটাল ছেলেটার দিকে। গটমটিয়ে ঢুকে গেছে ঘরে। সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। নতমুখেই পায়ে পায়ে লনে নেমে গেল। গেটের দিকে এগোচ্ছে। থামল, ফিরল কয়েক পা। শুকনো গলায় বলল,— মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে আমাদের কেয়ারটেকারকে বলে দেবেন, ও দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কান্নার মতো হাসল ছেলেটা, জবাব দিল না। বড় বড় পা ফেলে গেট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল।

ঘামছিল আদিত্য। হাতের পিঠে কপাল মুছল। মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার ক্ষণিক খুশিটুকুর কিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই! কোথা থেকে কী হচ্ছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

তিতিরের দরজায় আস্তে টোকা দিল আদিত্য।

সাড়া নেই।

আলতো ঠেলল,— তিতির, দরজা খোল।

সাড়াশব্দ নেই।

আদিত্য ধরা-ধরা গলায় ডাকল,— আমায় আর কষ্ট দিস না রে তিতির। লক্ষ্মী মা আমার, কথা শোন।

ভেতর থেকে হিসহিস শব্দ উড়ে এল,— আমি যাব না। তুমি চলে যাও।

—কেন যাবি না মা?

উত্তর নেই।

—ঠিক আছে, যাস না। দরজাটা তো খোল। তেতে পুড়ে এলাম, দুটো কথা তো বলবি।

—আমার কোনও কথা নেই।

—আমার আছে। বুকটা যে আমার ফেটে যাচ্ছে রে তিতির।

আবার কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর ধড়াস করে দরজা খুলে গেছে,— কি বলবে বলো।

—এমন করে কি কথা হয়! মেয়ের কাঁধে আলগা হাত রাখল আদিত্য,— চল, বসি।

তিতির ঝটকা মেরে কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে দিল। দ্রুত বিছানায় গিয়ে বসল। জানলার বাইরে চোখ।

আদিত্য ক্ষণকাল দেখল মেয়েকে। মাত্র এক রাতেই অনেক শুকিয়ে গেছে মেয়ে। চোখ দুটো অসম্ভব ফোলা ফোলা, মনে হয় সারা রাত কেঁদেছে খুব। আপাত রুক্ষ চোয়ালে এখনও যেন জলের রেখা।

আদিত্য মেয়ের পাশটিতে গিয়ে বসল। নরম গলায় বলল,— তোর হঠাৎ কী হয়ে গেল রে তিতির? কী হয়েছিল?

—কিছু না। তিতিরের চোয়াল আরও কঠিন।

—কিছু তো একটা হয়েছেই। ...মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল?

—না।

—মা কিছু বলেছে? বকেছে?

—না।

—তবে? কথাটা বলেই আদিত্য সচকিত হল। গোয়েন্দা চোখে দেখল মেয়েকে,— ওই ছেলেটা... কী যেন নাম.... সুকান্ত.... ওকে তুই... তোরা বিয়ে করতে চাস?

তিতির চুপ।

—তা আমাকে বললি না কেন ? এরজন্য তোর বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার কী দরকার ?

—আমি সুকান্তর জন্য বাড়ি থেকে চলে আসিনি।

—তা হলে ?

—তা হলে আবার কি ? ও-বাড়িতে থাকব না বলে চলে এসেছি।

—কিন্তু কেন ?

—শুনতে চেয়ো না। তুমি সহ্য করতে পারবে না।

—খুব পারব। তুই আমাকে বল।

তিতির আবার চুপ। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে। কামড়ে ধরেছে ঠোঁট।

আদিত্য মেয়ের মুখ ঘোরাল,— আমাকেও বলবি না তিতির ?

তিতির চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। ঢোঁক গিলছে। খটখটে চোখ একটু একটু করে জলে ভরে গেল। হঠাৎই ডুকরে উঠেছে,— তুমি আমার বাবা নও।

—ওমা, ও কী কথা ! আমি কী করলাম ? আদিত্য হতভম্ব,— তুই আমার ওপর অভিমান করছিস কেন ?

সজোরে মাথা ঝাঁঝাল তিতির। ফোঁপাচ্ছে। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে শরীর। হেঁচকি তুলছে। তারই মধ্যে উগরে দিল ইন্দ্রাণী আর শুভাশিসের গত রাতের সংলাপ। পুঞ্জীভূত ঘৃণা গলগল বমি করল।

আদিত্যর ভেতরটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে গেল। নিঃসীম মহাশূন্যের মতো ফাঁকা। কিন্তু প্রকৃতি যে শূন্যতা পরিহার করে, ক্রমে আদিত্যর অন্তস্তল ভরে গেল এক ভয়ানক যন্ত্রণায়। যন্ত্রণা, না বিষবাষ্প ? জ্বলে গেল বুকটা। লক্ষ লক্ষ বুনো ষাঁড় ছুটে এল কোত্থেকে, দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে মাথায়। এত অপমান ? এত বড় প্রতারণা ? হাতের কাছে ওই দুই প্রবঞ্চককে পেলে এক্ষুনি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে আদিত্য। ভাবে কি তারা নিজেদের, অ্যাঁ ? অসূয়া নেই বলেই কি আদিত্য এক জরদ্গব প্রাণী বনে গেছে ? শেষ করে দেবে, এক কফিনে ঢুকিয়ে দেবে দুটো লাশ।

হায় রে, আদিত্য সত্যি যদি তা পারত ! উন্মাদ মস্তিষ্ক কেমন ঝিম মেরে আসছে। ব্যথা, বড্ড ব্যথা। গরম সিসেয় ঝাঁঝরা হয়ে এল ফুসফুস, সুতীক্ষ্ণ এক শলাকা হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। একটা মাত্র সুখস্মৃতি নিয়ে বেঁচে ছিল আদিত্য, তাও ভেঙে গেল ? কটা তো মাত্র রাত স্বেচ্ছায় মোহিনী হয়েছিল বউ, সেখানেও শঠতা ? ওরে বউ, কাকে ঠকালি তুই ?

হা ঈশ্বর, এখনই আদিত্য মরে যাচ্ছে না কেন ?

মৃত্যুকে চেনে না আদিত্য। মৃত্যু বড় তেএঁটে বজ্জাত, সে কারুর হুকুমদাস নয়। এমনকী ঈশ্বরেরও না। তাছাড়া আদিত্য ট্রেনের কামরায় সেই আশ্চর্য জিমন্যাস্টের খেলা দেখেছে, সে কি এখন চাইলেই মরতে পারবে ?

তিতির মুখ ঢেকে বসে আছে। চাপা গোঙানির স্বর শুনে চমকে তাকাল,— তুমি কাঁদছ ?

আদিত্য করুণ স্বরে বলে উঠল,— তুইও আমার রইলি না রে তিতির !

আদিত্যর ওই স্বরে বুঝি কিছু ছিল। কিংবা চোখে, কিংবা শরীরের জ্যামিতিতে। বাঁধ ভাঙা নদীর মতো আদিত্যর কোলে আছড়ে পড়ল তিতির,— তোমায় ছেড়ে আমি কোত্থাও যাব না বাবা। কোনওদিন না।

মমতায় প্লাবিত হচ্ছিল আদিত্য। ঘৃণা ক্রোধ যন্ত্রণা অপমানবোধ খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে, পিতৃত্ব শুধুই এক জৈবিক পরিচিতি নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। অনেক গভীর এক অনুভূতি।

তিতির অঝোরে কাঁদছে। মেয়ের পিঠে হাত বোলাচ্ছে আদিত্য। আহা, কাঁদুক। কেঁদে হালকা হোক মেয়ে। আদিত্যও বুঝি তাতে কিছুটা লঘু হতে পারে। এক সময়ে থামল মেয়ে। কতক্ষণ

পর, আদিত্য জানে না। পাঁচ মিনিটও হতে পারে, দু ঘণ্টাও হতে পারে। শুধু টের পেল, খোলা জানলা দিয়ে ঝামরে আসা গরম হাওয়া আর বুঝি তত তপ্ত নেই।

আদিত্য ঠেলল মেয়েকে। উঠে বসেছে মেয়ে, চোখ মুছছে ওড়নায়।

আদিত্য গলা ঝাড়ল,— চল, ফিরি।

তিতির অস্ফুটে বলল,— ওখানেই আমায় ফিরতে হবে বাবা ?

—কোথায় যাবি বল ?

—অন্য কোথাও। যেখানে খুশি।

কোন কাঁটাটা মেয়েকে বিঁধছে, বুঝতে পারছিল আদিত্য। ইন্দ্রাণীর জন্য হঠাৎ কেমন যেন মায়াও হচ্ছিল। মায়া, না করুণা ? ন্যাকি এ এক ধরনের আনন্দ ? যার কাছে আদিত্য চিরকাল হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, তাকে ভিখিরি দেখতে পাবার এক গোপন সুখ ?

আদিত্য মলিন হাসল,— বেশ তো, তোর বড়কাকার বাড়িতেই চল না হয়। ওখানেই থাক কিছুদিন।

মনে মনে বলল,— আমার এখন একা ফেরাই ভাল। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে একটিবার অন্তত বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

তিতির আপত্তি করল না।

ঝাঁঝাঁ দুপুর। পলতা স্টেশন প্রায় জনবিরল। বাপ-মেয়ে বসে আছে ট্রেনের প্রতীক্ষায়। শেডের নীচে, সিমেন্টের বেঞ্চিতে। তিতিরের চোখ দূরে, প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে।

আচমকা আদিত্যর হাত টানল তিতির,— বাবা... সুকান্ত।

—কই ?

—ওই তো। ওই গাছটার নীচে... ওকে ডেকে নেব বাবা ?

অনেকক্ষণ পর আদিত্য অনাবিল হাসল,— যা।

মলিন শীর্ণ জল-না-পাওয়া ম্যাগনোলিয়া গাছটার কাছে চলে গেল মেয়ে। আদিত্য সিগারেট ধরাল। ধোঁয়াটা বেশ স্বাদু লাগছে। অন্যমনস্ক চোখ হঠাৎই ট্রেন লাইনের তারে আটকে গেল। একটা কাক তারে বসে। হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে তার, কাকটাও দুলছে।

আদিত্যর গা সিরসির। তারে তারে না লেগে যায় !

জোর জোর তালি বাজাল আদিত্য,— হ্যাট হ্যাট। সরে যা। মরবি যে !

নড়ছে না কাক। দোল খাচ্ছে উদাস।

তৃতীয়বারও তনুময়কে লেখা চিঠিটা মনোমত হল না ইন্দ্রাণীর। হচ্ছে না, কিছুতেই ঠিক গুছিয়ে লেখা যাচ্ছে না। চিন্তাশক্তি কি জট পাকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ ? এ সময়ে বোধহয় এমনটাই হয়।

ইন্দ্রাণী চিঠিটা পড়তে শুরু করল। নিঃশব্দে, কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। ...প্রিয় তনু, যখন এই চিঠি পাবি তখন আমি আর কোথাও নেই। তোকে বোধহয় এই আমার প্রথম চিঠি, এই শেষ। কেন লিখছি জানিস ? হঠাৎ একটা পুরনো ঘটনা খুব মনে পড়ছে। তোর মনে আছে, টুনুমাসির বাড়ি একবার কে এক সাধুবাবা এসেছিল ? গোকুলানন্দ না কি যেন নাম ? তুই বোধহয় তখন ক্লাস নাইন-টাইনে পড়িস। খুব ভিড় হচ্ছিল টুনুমাসির বাড়ি, আজব আজব ভেলকি দেখাচ্ছিল সাধুটা। শূন্য থেকে শাঁকালু বার করে আনছে, ফাঁকা মুঠো খুললেই হাত ভর্তি গোলাপ! এর পরীক্ষার ফল কি হবে বলে দিচ্ছে, ওর চাকরি কবে হবে তার দিনক্ষণ! মা তোকে আমাকে দুজনকেই তার কাছে নিয়ে যেতে চাইল। তুই সোজা বলে দিলি, ম্যাজিক দেখতে হলে পয়সা দিয়ে ম্যাজিক দেখব, কিছুতেই ওই ভণ্ড বুজরুকের কাছে যাব না। আমি মা'র মুখের ওপর না বলতে পারলাম না। গেলাম। বাবরি চুল, ঢুলুঢুলু চোখ লোকটাকে দেখে আমার এতটুকু ভক্তি আসেনি, তবু মা'র কথায় তাকে প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ ছলে লোকটা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। আঙুলগুলো মাকড়সার

মতো ঘুরছিল লোকটার । কী ঘেন্না ! সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি । তোকে আভাসে ইঙ্গিতে কথাটা জানাতেই তুই বললি, ঠিক হয়েছে । যা মন থেকে চাস না, তা জোর করে করতে গেলে এরকমই হয় ।

মন থেকে চাওয়াটা কী রে তনু ? আমার ভেতরের আমি যা চায় ? কেন আমি তার উল্টো মুখে হেঁটে গেলাম রে সর্বদা ? কে হাঁটাল ? সংস্কার ? অসহায়তা ? অহং ?...

বিরক্ত মুখে পড়া থামাল ইন্দ্রাণী । এ কী আত্মবিলাপ রচনা করে চলেছে সে । হতে পারে তনু তার লক্ষ্যে স্থির, বিশ্বাসে দৃঢ়, আদর্শে অটল, তা বলে তার কাছে ইন্দ্রাণী কেন নিজেকে মেলে ধরবে ? ন্যায়-অন্যায় পাপপুণ্য বিচার করার তনু কে ? যা যা ভুল হয়েছে, প্রতিটি ভুলের জন্য ইন্দ্রাণী একমাত্র ইন্দ্রাণীর কাছেই দায়ী । একটা মানুষ যদি অবিরাম নিজের বিবেক বিশ্বাস ইচ্ছে আবেগের সঙ্গে লড়াই করে চলে, তবে তার জবাবদিহি তো নিজের কাছেই নিজেকে করতে হয় । তার অপরাধবোধ তো তারই । দহনও তার একার ! অন্য কেউ যদি তাতে পুড়েও থাকে, তার জ্বালা ইন্দ্রাণীর চেয়ে বেশি হতে পারে না ।

তাছাড়া তনুকে সে চিঠি লিখছেই বা কেন ? তনু তার চিঠি পেয়ে ছুটে আসবে, বাবা-মা'র দায়িত্ব নেবে, এই আশায় ? প্রথমত, এই আশাটাই মূর্খামি । দ্বিতীয়ত যদি তনু আসেও, সেটা হবে তার পিছুটান, বিচ্যুতি । কেন ইন্দ্রাণী তার ওপর অপ্রত্যক্ষ চাপ তৈরি করবে ? একজন অন্তত নিজের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বাঁচুক । আর বাবা-মা ? তাদেরও দিন চলে যাবে । বরং সব সময়ে নিজেদের নির্ভরশীল ভাবার যন্ত্রণা থেকে তো বেঁচে যাবে ।

চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ল ইন্দ্রাণী । ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলল না, বন্ধ জানলা খুলে উড়িয়ে দিল পথে । সুনসান রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলল । এ সময়ে একজন জীবিত মানুষের মুখ দেখলে বুঝি ভাল লাগত ।

এমন ইচ্ছে এখন এল কেন ? তবে কি ইন্দ্রাণীর বাঁচার লোভ হচ্ছে ?

ত্বরিত পায়ে সরে এল ইন্দ্রাণী । ড্রয়ার খুলে ঝটিতি নতুন ব্লেডটা বার করল । খাটে বসেছে । বিছানায় পুজোয় কেনা নতুন বেডকভার, হাতি উট কত কি প্রাণীর ছবি । এত সুন্দর চাদরটাকে নষ্ট করবে ? ইন্দ্রাণী মেঝেয় নেমে এল । মাথার ওপর বনবন ঘুরছে পাখা, তবু ঘামতে শুরু করেছে ভীষণ । ঘড়ি দেখল । একটা বেজে গেছে, আর সময় নেই । যদি তিতিররা ফিরে আসে ! ফিরবে কি তিতির ? যদি না ফেরে ? যদি আদিত্য গিয়ে দেখে তিতির নেই, চলে গেছে অন্য কোথাও ?

তখনই বন্ধ ঘরের পলকা আঁধারে ফুটে উঠেছে একটু আগে বাথরুমে দেখা আয়নার সেই মুখ । তার ফিসফিস কথা স্পষ্ট শুনতে পেল ইন্দ্রাণী, বোকামি করিস না । কেন মরবি তুই ? যদি তিতির আদৌ না ফেরে তাহলে তো আর কোনও সমস্যাই নেই । তোর গোপন কথাটি গোপনই রয়ে গেল । তিতিরকে হারিয়ে তোর কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু ভেবে দেখ, তোর বাবা-মাও তো তনুকে হারিয়ে দিব্যি বেঁচে আছে । বরং বসে বসে প্রার্থনা কর, তিতির যেন চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যায় । ভাবনা কি, তোর তো বাপ্পা আছে । ওই দেখ আকাশের মতো ইউনিফর্ম পরে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে বাপ্পা... তোর বাপ্পা...

প্রাণপণে চোখ টিপে বাঁ হাতের কবজিতে আড়াআড়ি ব্লেড টেনে দিল ইন্দ্রাণী । মুহূর্তে হাত বদলেছে ইস্পাতের ফলা, ঘষে চিরে দিল ডান কবজি । পলকের জন্য চাপা চিনচিনে অনুভূতি, পরক্ষণে রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেছে হাত । আহ্ মুক্তি । আর তুই আমাকে নিয়ে কোনও সর্বনাশা খেলা খেলতে পারবি না রে শয়তানি ।

দেহাধার থেকে মুক্তি পেয়ে কুলকুল ছুটে আসছে রক্তধারা, বয়ে যাচ্ছে অবিরাম । গাঢ় লাল আলপনা আঁকা হয়ে যাচ্ছে মেঝেয় । শরীরটা হঠাৎ কেমন কেঁপে উঠল । শীত শীত করছে । মৃত্যু কি খুব ঠাণ্ডা !

ইন্দ্রাণী কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে পড়ল । বন্ধ চোখের পাতায় সার সার ছবি । কলেজ স্ট্রিটে পড়ে

আছে লাশ, ফুটপাথ ধরে বেভুল হাঁটছে ইন্দ্রাণী। তালহীন সুরহীন আদিত্য বাসর ঘরে গান গাইছে, লজ্জা লজ্জা মুখে নববধূর দিকে তাকাচ্ছে। কতটুকুনি এক বাপ্পা সর্ষের বালিশে শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। শুভ দরজা খুলে বলল,— এসো, তনু আমার কাছেই আছে। শুভ বুকে মুখ গুঁজল। বেসিনে বমি করছে ইন্দ্রাণী, আয়নায় বিস্ফারিত চোখ। ছবি ঝাপসা হয়ে এল। জয়মোহন কলম ভেঙে দিলেন। তিতির আঙুল নাচিয়ে উঠল, তোমায় কি আমি চিনি না!

ইন্দ্রাণীর ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসি ফুটল। কে চিনেছে ইন্দ্রাণীকে? ইন্দ্রাণী নিজেই কি...? নাহলে ঠিক এখনই আদিত্যকে মনে পড়ে কেন? ...তোমার সঙ্গে আমি দয়া করে এতকাল ঘর করেছি... সত্যি, না মিথ্যে? ...শুভর জন্য একটা কুঠুরি, আদিত্যর জন্য একটা... কোন কুঠুরিটা কোথায়?

শীত বাড়ছে। ইন্দ্রাণী আর একটু কুঁকড়ে যেতে চাইল। পারছে না। আবছা একটা সুর দুলছে দূরে... ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে... কে গায়? কে নিতে এল ইন্দ্রাণীকে? ....আমার গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে দে না রে তিতির।

অন্ধকার। চাপ চাপ অন্ধকার। দুপুর যেন রাত হয়ে এল। ওরা কারা কলকল করতে করতে স্কুল থেকে দৌড়ে বেরোচ্ছে? হজমিঅলার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, ওই মেয়েটা কে? ইন্দ্রাণী? না না, তিতির। না না, ও তো ইন্দ্রাণী। হজমি শেষ, বুভুক্ষুর মতো পাতা চাটছে মেয়েটা। শূন্য পাতা... চাটছে... চাটছে। ওভাবে চাটিস না তিতির, পাতাটা ফেলে দে।

ইন্দ্রাণীর বুকটা শেষবারের মতো হু হু করে উঠল। তিতিরের জন্য কি? ইন্দ্রাণী জানতে পারল না।

৯৮

শোকের সঙ্গে সময়ের এক সূক্ষ্ম রেষারেষি আছে। তাদের মধ্যে এক চাপা লড়াই চলছে অবিরাম। এই দ্বৈরথের প্রথম দফায় শোকই জেতে, চকিত আঘাত হেনে সময়কে সে নিশ্চল করে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে সময় বলবান হয়ে ওঠে, তার অদৃশ্য শরজালে হঠে যেতে থাকে শোক। ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ে সে। তবে তাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার শক্তি বুঝি সময়েরও নেই। এক শীতল বিষণ্ণতা হয়ে সে টিকে থাকে বহুকাল। অনেকটা যেন মেরুপ্রভার মতো। ক্ষীণ দীপ্তি, অথচ কী তার অপার বিস্তার!

সেই মেরুপ্রভায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে শুভাশিস। এখন, ইন্দ্রাণীর মৃত্যুর তিন মাস পর।

ইন্দ্রাণীকে দাহ করে আসার পর হৃৎপিণ্ডে এক তীব্র ব্যথা অনুভব করে শুভাশিস। এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসেও ঘামছে গলগল, চেনা নিয়তি যেন আঁচড় টানছে বুকে। সরবিট্রেট মুখে পুরতে ব্যথা একটু কমল বটে, কিন্তু মেল্যাল না। সঙ্গে সঙ্গে উতলা ছন্দা ফোনে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। অরূপকে ডাকছে, উৎপলকে ডাকছে...। শুভাশিস টের পাচ্ছিল পেইনটা রিট্রোস্টার্নালি, তবে এসে এসে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ হৃদয়ের ইনফিরিয়ার ওয়ালে বড়জোর একটা ছোটখাট ইনফার্কশান হয়েছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ উৎপলও ই সি জি করে সেরকমটা বলল। নাড়ি আর রক্তচাপের বেহিসেবি ওঠাপড়া দেখে ভুরু কুঁচকোল। কামপোজ ইনজেকশান দিয়েই কড়া হুকুম, মিনিমাম পনেরো দিন বিছানা থেকে উঠবি না।

বাড়িতেই কার্ডিয়াক মনিটর চলছে, টানা তিনদিন কড়া সিডেটিভে চেতন-অচেতনের মধ্যিখানের সাঁকোয় ঘোরাফেরা করছে শুভাশিস, তার মধ্যেই ইন্দ্রিয় মেসেজ পাঠাচ্ছে... ছন্দা এসে বসল মাথার কাছে... কখনও বা টোটো... অরূপ শালিনী আসছে ঘন ঘন... উৎপল এল, টোটো উদ্বিগ্ন স্বরে কথা বলছে উৎপলের সঙ্গে... নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে শালী ভায়রাভাই... থেকে থেকে ড্রয়িংরুমে ফোন বেজে উঠছে... রবিবার মাধবপুর যায়নি বলে ছুটে এল তুফান... দাদার হাল দেখে হাউমাউ

কান্না জুড়ল, থামাল ছন্দা... শুভাশিসের হাত ধরে বসে আছে তুফান, উঠে গেল একসময়ে...। অর্ধচেতন শুভাশিস মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিল, তাকে অন্তত কারওর সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে না। চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে থাকে। অস্বচ্ছ কাচের ওপারে নিথর শুয়ে থাকে ইন্দ্রাণী। বিড়বিড় করে শুভাশিস ডাকে তাকে, ইন্দ্রাণী শুনতে পায় না। কখনও ঘষা কাচে ফুটে ওঠে তিতির। আদিত্যকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে ডুকরে কাঁদে মেয়ে, নোনতা জলে ভিজে যায় শ্মশানভূমি। একটিবারের জন্যও মেয়ের মাথায় হাত রাখতে পারল না শুভাশিস!

সময় বয়ে যায়। কীভাবে বয় শুভাশিস জানে না, শুধু বয়ে যায়। আপন মর্জিতে হেঁটে চলে সময়।

সময়ই একদিন ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিল শুভাশিসকে।

থেমে থাকার জো নেই, অনেক কাজ জমে গেছে, দিন কুড়ি বিশ্রাম নিয়ে আবার রুটিনে ফিরতে হল শুভাশিসকে। আবার অপারেশন থিয়েটার, আবার ছুরি কাঁচি ফরসেপ, এ চেম্বার থেকে ও চেম্বার, নার্সিংহোম থেকে নার্সিংহোম। টলমল পায়ে ছোটা, ধুঁকতে ধুঁকতে ছোটা, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছোটা। স্পৃহাহীন উদ্যমহীন শুভাশিস যেন এক অদৃশ্য পরিচালকের আজ্ঞাবহ দাস। নিজেই নিজের জন্য গোলকধাঁধা তৈরি করেছিল একদিন, এখন কি আর চাইলেই বেরোনো যায়! ক্লান্ত শুভাশিস বাড়ি ফিরে উগরে দিচ্ছে নোটের বান্ডিল, ব্যাঙ্কের টেলার মেশিনের মতো। শুভাশিসের অভ্যস্ত হাত মানুষের দেহ খুঁড়ছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির মতো।

সময় বয়ে যাচ্ছে।

জোর কদমে বর্ষা নেমে গেল।

টোটোর জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট বেরিয়েছে। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেয়ে কানপুর আই আই টিতে চলে গেল ছেলে, ছন্দা আপত্তি করল না, শুভাশিস বাধা দেওয়ার জোরই পেল না। বাড়ি আরও খাঁ খাঁ করতে লাগল। শুধু শুভাশিস আর ছন্দা, ছন্দা আর শুভাশিস। ছন্দা এখন আর উঁচুগ্রামে কথা বলে না, কখনও ঝগড়া করে না, ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে শুভাশিসের সুখ-সুবিধের দিকে তার এখন তীক্ষ্ণ নজর। অনেক বদলে গেছে ছন্দা, বুঝি বুঝে গেছে যে ছিল তাকে সরানোর জন্য যুদ্ধ করা চলে, কিন্তু যে নেই তাকে মুছে ফেলা তার সাধ্যের অতীত। এক এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় শুভাশিসের, দেখে বিছানায় উঠে বসে আছে ছন্দা, হাঁটুতে থুতনি রেখে কী যেন ভাবছে। কী ভাবে? ইন্দ্রাণীর পরিণামের কথা? হারজিতের হিসেবটা খতিয়ে দেখে? এত কাছে ছন্দা, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়, তবু অন্ধকারে তাকে কেমন অপার্থিব লাগে! শুভাশিস কিছুতেই তার কাছে যেতে পারে না। ইন্দ্রাণী থাকতে যেটুকুনি বা মানসিক নৈকট্য ছিল দুজনের, ইন্দ্রাণী চলে যেতে তার কণামাত্র বুঝি অবশিষ্ট রইল না। কী অবলীলায় ছন্দাকে একদিন ভালবাসি বলেছিল শুভাশিস, আজ কেন সেই মিথ্যেটুকুনিও বলতে পারে না!

ইন্দ্রাণীর অনস্তিত্ব শুভাশিস আর ছন্দার মাঝে বাতাসের নতুন প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

সপ্তাহভর ছটফট করে শুভাশিস, শনিবার হলেই চলে যায় মাধবপুর। নিয়মিত দু' দিন করে এখন বাবার চেম্বারে বসে। ছন্দাও যায় সঙ্গে। ঘোরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি, তুফান-অলকার সঙ্গে এতাল-বেতাল কথা বলে, হুটহাট তুফানকে নিয়ে চলে যায় দুধগঞ্জের হাটে, আলতু-ফালতু হাজারো জিনিস হাট থেকে সওদা করে আনে। হয়তো বা এতে খানিক তাজা বাতাসের ঝলক পায় ছন্দা। হয়তো বা তাদের দুজনকে ঘিরে গড়ে ওঠা নির্জনতার ফাঁস একটু আলগা হয়।

মাধবপুরে এসে শুভাশিস অবশ্য বড় একটা বাড়ি থেকে বেরোয় না। রুগী দেখা ছাড়া বাকি সময়টুকু সে এখন মনোরমার ঘরে কাটায়। কখনও বা নিশ্চুপ বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও বা অনর্গল কথা বলে যায়। কত কথা, কত প্রশ্ন, কত কৈফিয়ত যে জমে আছে শুভাশিসের রক্তমাংসের খাঁচায়! জরতী দেহ, বোধহীন মনোরমা যেন এক কনফেশান বক্স, তাঁর সামনে শুভাশিস নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে। ভুলের কথা বলে, অপরাধের কথা বলে, লোভের কথা বলে, যন্ত্রণার

কথা বলে। বলতে বলতে কখনও মনে হয় মনোরমা নয়, শিবসুন্দরের সামনে বসে আছে সে। শিবসুন্দর যেন মিশে আছেন মনোরমায়। কখনও মনে হয় এই মনোরমার গর্ভ থেকে জন্ম হয়েছিল তার, এই বসে থাকা যেন নিজেরই-মুখোমুখি বসে থাকা।

মাঝে মাঝে মাধবপুরে বৃষ্টি নামে জোর। ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যায় চারদিক, অবিরল জলধারায় ধুয়ে যায় পৃথিবী। সেসব দিনে, রাতে মনোরমার পাশের চৌকিতে শুয়ে ঝমঝম ধ্বনি শুনতে শুনতে আশ্চর্য সব অনুভূতি জাগে শুভাশিসের। মনে হয় সে আর তার মা ছাড়া গোটা দুনিয়াটাই বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। মনে হয় মনোরমা আর ইন্দ্রাণীর মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর মিল আছে। ঠিক মিলও নয়, এক ধরনের অভিন্নতা। সময়ই কি চারপাশের জগৎ থেকে ওই দুই নারীকে উপড়ে তুলে দেয়নি ? সময়, না শুভাশিস নিজে ? ইন্দ্রাণীর মৃত্যুর জন্য শুভাশিসের যদি কোনও প্রত্যক্ষ দায় থাকে, তবে কি মনোরমার এই জীবন্মৃত থাকার জন্যও তার কোনও পরোক্ষ দায় নেই ? শুভাশিস না জন্মালেই কি ভাল ছিল না ?

হ্যাঁ, এসব আজগুবি চিন্তারা আসতে থাকে সার সার। আসে, আসতেই থাকে। সময় বয়ে যায়।

ভাদ্র মাস চলছে।

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে গড়িয়ার চেম্বারে যাচ্ছিল শুভাশিস। ক'দিন ধরে চিটপিটে গরম পড়েছে। ছাড়া ছাড়া বৃষ্টি হয়, কিন্তু গুমোট ভাব কাটে না তাতে। শুভাশিস গাড়ির পিছনের সিটে বসে টিপটিপ ঘামছিল।

আজকাল শুভাশিস গাড়ির পিছনের সিটেই বসে। মাইল্ড অ্যাটাকটার পর থেকে স্টিয়ারিং-এ বসা তার বারণ হয়ে গেছে। আরও অনেক কিছুই বারণ। যেমন, সিঁড়ি ভাঙা, সিগারেট খাওয়া, টেনশান করা....। সব নিষেধ কি অক্ষরে অক্ষরে মানা যায় ! মাধবপুর গেলে দু' চারবার ওপর-নীচ করতেই হয়, ও-টি থেকে বেরোনোর পর একটা অন্তত সিগারেট না খেলে চলে না। আর তার কাজের প্রকৃতিটাই এমন যে টেনশানও সঙ্গী হয়ে থাকবেই। শুধু গাড়ি চালানোটাই যা সে পুরোপুরি ছাড়তে পেরেছে। বেছে বেছে এক বয়স্ক ড্রাইভার রেখেছে, যাতে গাড়ির গতিও খুব বেশি বাড়ে না এখন। আর জোরে ছুটতে ভাল লাগে না।

টালিগঞ্জের ঘিঞ্জি রাস্তা। সামনে একটা গাড়ি খারাপ হয়েছে, ট্রাফিক জ্যাম। শুভাশিসের সাদা মারুতি দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যমনস্ক চোখ রাস্তার ধারের চা দোকানে পড়তে পিঠ সোজা করল শুভাশিস। তথাগত না ? খুব হাত মুখ নেড়ে তথাগত কথা বলছে একজনের সঙ্গে, ভারী সতেজ সপ্রাণ ভঙ্গি।

শুভাশিসের দু' চোখ করকর করে উঠল। পাছে তথাগত দেখে ফেলে, মুখ ঘুরিয়ে আড়াল করল নিজেকে। তখনই বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁত করে উঠেছে। তনুময়কে তো ইন্দ্রাণীর খবরটা দেওয়া হয়নি ! নিজের দুঃখ নিয়েই নিজে বিভোর ছিল, ধীরাজ-উমা কেমন আছেন কে জানে ! একটা চিঠি লিখে তনুময়কে সব জানিয়ে দেওয়া কি শুভাশিসের কর্তব্য নয় ? কালই লিখে দেবে ? নাকি নিজে গিয়ে বলে বুঝিয়ে অন্তত একটিবারের জন্যও.... ? তনুময়রা কি ফেরে ?

চিন্তাটা সঙ্গে নিয়েই গড়িয়ার চেম্বারে পৌঁছল শুভাশিস। রতিকান্তর ঘরে যথারীতি কিটকিটে ভিড়, তার ঘরেও আজ নয় নয় করে পাঁচজন পেশেন্ট। একজন রিপোর্ট দেখাবে, দুজনের চেকআপ আছে, একজন নতুন। পঞ্চমজনটি পুরনো পেশেন্ট, গলব্লাডারে পলিপ্ আছে, মাঝে মাঝেই অ্যাসিডিটিতে কষ্ট পায়, তবু অনেককাল ধরে অপ্যারেশান করব করব করছে, কিন্তু করাচ্ছে না। একটু মেন্টাল প্রবলেম আছে লোকটার, নিজেই নিজের ডাক্তারি করে মুঠো মুঠো ওষুধ খায়, ব্যথা বাড়লেই চিঁচিঁ করতে করতে এখানে ছুটে আসে। শুভাশিসকে দেখে বছর চল্লিশের রুগীটি ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মতো হাসল, মেজাজ খিঁচড়ে গেল শুভাশিসের।

নিজের চেয়ারে এসে বসতেই লোডশেডিং হয়ে গেল। পুরনো জেনারেটর নিয়ে কার্তিক যথারীতি বিব্রত হয়ে আছে, হাঁকাহাঁকি করতে ঘরে মোমবাতি দিয়ে গেল। রতিকান্তর এমার্জেন্সি লাইট-জ্বলা ঘরে গজল্লা চলছে, স্বল্প আলোয় সর্বক্ষণের সঙ্গী হিমেল বিষাদ বেড়ে যাচ্ছে আরও, ভার ভার মুখে শুভাশিস একে একে রুগীদের ডাকল।

পুরনো রুগীটি এসেছে সবার শেষে।

শুভাশিস গোমড়া মুখে বলল,— আবার আপনার কী প্রবলেম ?

রুগী বলার আগে তার ভালমানুষ চেহারার স্ত্রী উত্তর দিল, কিছু খেতে চাইছে না ডাক্তারবাবু। জোর করে খাওয়ালে বমি করে দিচ্ছে। সবাই মানা করল, তবু সকালবেলা গিয়ে ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশান নিয়ে এল....অফিস যাওয়া বন্ধ করে বসে আছে....

—তা আমি কী করব ? বলেছি তো অপারেশান না করালে হবে না।

—সেই পলিপ্‌টা কিন্তু আর নেই স্যার। লোকটা তড়িঘড়ি বলে উঠল,— এ ব্যথাটা অন্য কিছু।

—বুঝলেন কী করে ? টেস্ট-ফেস্ট কিছু করিয়েছেন ?

—টেস্ট মানে তো আলট্রাসোনোগ্রাম ! মুখ বিকৃত করল লোকটা,— ছবি তুলে মানুষের ভেতরটা বোঝা অত সহজ নয় স্যার। ছবি যা ধরতে পারে স্যার, ভেতরটা তার থেকে অনেক বেশি জটিল।

—তবে আর কী ! আপনি তো ডাক্তারি পড়েই ফেলেছেন।

—না স্যার। মেডিকেল বুক পড়লেই কি সব বুঝে ফেলা যায় ? আপনি কি নিজেই জানেন আপনার ভেতরে কোথায় কী চলছে এখন ? লোকটা পিটপিট তাকাচ্ছে। হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল,— একটা পলিপ্‌ নয় আপনি বাদ দিলেন, কিন্তু ভেতরে আরও যে হাজারো পলিপ্‌ নেই তা কে বলতে পারে ? তার চেয়ে বরং....

—ওর কথা আপনি শুনবেন না ডাক্তারবাবু। বউটি ঝংকার দিয়ে উঠল,— অপারেশানের ভয়ে এরকম আবোল-তাবোল বকছে। আজও কি আসতে চায় ? এত কষ্ট পাচ্ছে তবু...। অনেক সাধ্যসাধনা করে ধরে এনেছি। আপনি একটা ডেট দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, আমি ওকে ঠিক সেই মতো নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেব।

প্রতিবারই এ দৃশ্যের অবতারণা হয়। শুভাশিস বিরস মুখে বলল,— ই.সি.জি. আর ব্লাড টেস্টগুলো করিয়ে আনুন আগে। তারপর...। বলতে বলতে রুগীর দিকে তাকাল,— আসুন, শুয়ে পড়ুন।.... রাতে এখন কটা করে ঘুমের বড়ি খাচ্ছেন, অ্যাঁ ?

রুগীটি প্রেসক্রিপশান নিয়ে চলে যাওয়ার পর মনে মনে একটু হাসল শুভাশিস। ধূসর হাসি। খুব ভুল কিন্তু বলেনি লোকটা। ভেতরকার কতটুকু ছবি বাইরের যন্ত্রে ধরা পড়ে ! কত জায়গায় কত যে অতিরিক্ত মাংসপিণ্ড গজাচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে ! ইন্দ্রাণী কি ভেতর থেকে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল ? না হলে শেষ দেখার দিন অত ভেঙে পড়ল কেন ?

চোখ বুজে ইন্দ্রাণীর মুখটা মনে করার চেষ্টা করছে শুভাশিস। মাথা নিচু করে খাতা দেখছে ইন্দ্রাণী, টেবিলল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে মুখে। হঠাৎ হঠাৎ পেনসিল দাঁতে চাপছে, অতি সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ছে ভুরুতে, মিলিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বসংসার ভুলে ডুবে থাকা ওই মুখটাই যে কেন মনে পড়ে বারবার !

দোল-দরজায় মৃদু শব্দ। চোখ খুলতেই মস্তিষ্কে লক্ষ ভোল্টের শক। সামনে ইন্দ্রাণী, পরনে সেই সাদা খোলের ছোট ছোট বুটিঅলা শাড়ি ! এ কী করে সম্ভব।

—তুমি আসছ না কেন ?

—ও, তুই ! আমি ভাবলাম....! শুভাশিস মাটির পৃথিবীতে ফিরল।

তিতিরের মুখে এক অচেনা হাসি। আবার ঠিক যেন অচেনাও নয়। একটু ঝুঁকে বলল,— আমাকে আশা করনি, তাই না ?

—না না, সে কি !....বোস। তিতিরের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল শুভাশিস,— তোরা সব

কেমন আছিস ?

—কেটে যাচ্ছে।

—তোর হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট কেমন হল ?

—মোটামুটি।

—কী নিয়ে ভর্তি হলি ?

—ইংলিশ। মা চেয়েছিল...তিতির চুপ করে গেল। চোখ নামিয়ে হাতের নখ দেখছে। মোমের শিখা কাঁপছে থর থর।

শুভাশিস অস্ফুটে বলল,— টোটো তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে গেল। কানপুর। শুনেছিস ?

তিতির যেন শুনতেই পেল না,— তোমার শরীর এখন কেমন আছে ?

—মন্দ কি !

—সাবধানে থাকছ ?

শুভাশিসের বুকটা কনকন করে উঠল। খুব নিচু গলায় বলল,— তোরা খবর পেয়েছিলি ?

—হুঁ। মধুমিতা আন্টি খবর দিয়েছিল।

শুভাশিস মনে মনে বলল,— তবু তোরা কেউ আমার খোঁজ নিসনি। আমি তো মরেও যেতে পারতাম রে তিতির। মুখে বলল,— তেমন কিছু হয়নি। ক'দিন রেস্ট নিয়ে নিতেই....হ্যাঁরে, বাপ্পা এসেছিল ?

—হ্যাঁ। দাদা দিন সাতেক ছিল। আবার বোধহয় ডিসেম্বরে আসবে।

—ছেলেগুলো কেমন সব দূরে দূরে চলে গেল। টোটো সেই কানপুর, কবে কোন ভেকেশান পড়বে... আসবে...

তিতির এবারও যেন কথাটা শুনতে পেল না। সিলিং-এর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল,— আমরা পুজোর পরে নতুন ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।

—তৈরি হয়ে গেল ?

—মোজাইকের কাজ চলছে। কিছু ফিটিংস-টিটিংস বাকি।

কতদিন পর তিতির ভাল করে কথা বলছে ! ভাবলেশহীন, কিন্তু স্বচ্ছ ঋজু স্বর। ভাল লাগছিল শুভাশিসের। পুরনো ক্ষতয় যেন নরম প্রলেপ পড়ছে। চোরা মায়ায় ভরে গেল হৃদয়।

অনেকটা সহজভাবে বলল,— আমরা তো লেকগার্ডেন্সের জমিটা বোধহয় রাখব না। তোর ছন্দা আন্টি বলছিল টোটো আলটিমেটলি কোথায় সেটল্ করে ঠিক নেই....

এবারও তিতির শুনল না। কথার মাঝখানে বলে উঠেছে,— জানো, বাবা গত মাস থেকে একটা চাকরি করছে।

বাবা শব্দটা শুভাশিসের কানে টঙ্ করে বাজল। বাজার কথা নয়, চিরকাল এমনটাই তো শুনে এসেছে, তবুও। সব জেনেশুনেও তিতির এত স্বচ্ছন্দে তার সামনে শব্দটা উচ্চারণ করল কী করে !

শুভাশিস আহত মুখে বলল,— এই বয়সে চাকরি করছেন ? কোথায় ?

—ছোটকার এক বন্ধুর ট্রাভেল কোম্পানিতে। কন্ডাক্টেড ট্যুরে কোম্পানির লোক হয়ে যেতে হয়। অনেকটা ম্যানেজারের মতো। এই তো জয়েন করেই পুরী ভুবনেশ্বর চিলকা ঘুরে এল।

—সে তো খুব ছোটাছুটির কাজ। ওঁর পোষাচ্ছে ?

—বলছে তো ভালই লাগছে। নানা রকম মানুষের সঙ্গে থাকে, মানুষ দেখে....করছে করুক, কিছু নিয়ে তো আছে। তিতিরের গলা হঠাৎ ভারী হয়ে এল,— মা মারা যাওয়ার পর বাবা খুব একা হয়ে গেছে ডাক্তার আঙ্কল।

শেষ বাক্যটা এবার বুকে বেজেছে। অনেক অনেক গভীরে, মর্মমূলে। সঙ্গে একটা বল্লমের ফলাও বিঁধল কি ? বুক জ্বলে যায় কেন ? শুভাশিসের গলা কাঁপিয়ে দু টুকরো অসংলগ্ন শব্দ ছিটকে এল, —হুঁ...একা...

—হ্যাঁ আঙ্কল, একা। লোনলি। মা যে বাবার কতখানি ছিল, আগে আমি বুঝেও বুঝতে পারিনি। মা চলে যাওয়ার পর থেকে বাবা আমাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। যেন নিজেই মা, নিজেই বাবা। আমি ছাড়া আমার বাবারও এখন আর কেউ নেই। তবু আমি বুঝতে পারি, বাবার লসটা আমি কোনও ভাবেই...হঠাৎ হঠাৎ কী ভীষণ আনমাইন্ডফুল হয়ে যায় বাবা....এই ট্যুরে গেছিল, আমার যা চিন্তা হচ্ছিল....

মেয়ে কি আজ তাকে যন্ত্রণা দিতেই এসেছে ? ইন্দ্রাণীর হয়ে প্রতিশোধ নিতে চায় তিতির ? নাকি আদিত্যর হয়ে ? শুভাশিস আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না।

বিস্বাদ গলায় বলে ফেলল,— আদিত্যবাবুর জন্য তোর এই ফিলিংস্ খুব জেনুইন, আমি জানি।

মুহূর্তের জন্য তিতিরের চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কঠিন গলায় বলল,— জেনুইন নয়, বলো অবভিয়াস। স্বতঃসিদ্ধ। আমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালই এরকম।

তিতির নয়, ইন্দ্রাণী কথা বলছে ? সেই এক জেদী ভঙ্গি ! তিতির কি বুঝবে না তার বাবা হওয়ার জন্য কত হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করে আছে শুভাশিস !

করুণ গলায় শুভাশিস বলতে চাইল, তিতির প্লিজ, একবার আমাকে...

তিতির উঠে দাঁড়িয়েছে,— তা হলে তুমি আমাদের বাড়ি আসছ তো ?

শুভাশিস মলিন মুখে বলল,— দেখি।

—দেখি নয়। এসো। বোঝো না, তুমি না এলে মা'র অসম্মান হয় ? এতদিনের আসা-যাওয়া তোমার, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল....তিতির ফিরতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল,— অন্তত আমার জন্যও এসো।

শুভাশিস চোখ বুজে ফেলল। বন্ধ চোখের পাতায় ভেসে উঠেছে এক দ্বীপ। দ্বীপ থেকে অসংখ্য গাছ নেমে এসেছে জলে, পর পর দাঁড়িয়ে আছে। জলঅরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে খেলা করছে আদিম আলোছায়া। ওই আলোছায়ায় প্রতিটি জলডুবি গাছই কী ভীষণ একা ! পাশাপাশি থেকেও।

একা ? না পরস্পরের নিশ্বাস পরস্পরকে ছুঁয়ে যায় গোপনে ?

একা ? না এক গাছের ছায়ায় সম্পৃক্ত হয় অন্য গাছ ?

চোখ খুলল শুভাশিস। সুয়িংডোর দুলছে অল্প অল্প। ইন্দ্রাণীর প্রতিবিম্ব মিলিয়ে গেছে আবছায়ায়।

শুভাশিস অস্থির ভাবে মাথা নাড়াল। ইন্দ্রাণীর আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারেনি। তিতিরের ডাকেও সাড়া দিতে হবে। রবাহূতের মতোই হাজিরা দিতে হবে আবহমানকাল। ছন্দা টোটোর বন্ধন থেকেও তার মুক্তি নেই।

এটাই শুভাশিসের নিয়তি।

এ'ই মানুষের বেঁচে থাকা।